সন ১৩২১ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অতিথি (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল ... ২৫৪
অথ টিকিমেধ যজ্ঞ (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৭৮
অভিভাষণ	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪
অরণ্য ষষ্ঠী	...	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ... ১৯৩
আত্মবলি (কবিতা)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... ৮৬
আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৪,১৪০,৫৯৬
আর্ট—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১৫
আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪০২
আর্মেনী-দেশের উপকথা (গল্প)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৭১
ইতরপ্রাণীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ (সচিত্র)	...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ৫১৬
কালীপ্রসন্ন সিংহ (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৭৮
ক্যামেরার দ্বারা বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ		শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী ... ২১৭
ক্যামেরার সাহায্যে বন্যজন্তুর ছবি (সচিত্র)		শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ... ৩১৯
গড়ের মাঠ (সচিত্র)	...	... ৪২১,৪৮৫,৫৯৬
গান	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫,১০৫
চড়ক বা নীলপূজার মূততত্ত্ব	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ৪৬৭
চন্দ্ররশ্মি	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৪১৬
চিত্রে ছন্দ ও রস	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি,আই, ই, ... ১৮৭
জবাব (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬২০
জন্মাষ্টমী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৪৪৭
জাগৃহি ঐ	...	ঐ ... ৩
জাপানের শিক্ষা ও বাণিজ্য (সচিত্র)	...	শ্রীযদুনাথ সরকার ... ১৪৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (সচিত্র)	...	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭৯,২০৩,৩০৫,৩৬৩ ৫০১,৫৩৪
জ্যোতিঃহারা (গল্প)	...	শ্রীমতী সুরূপা দেবী ... ৪৪৮
তোমায় (কবিতা)	...	শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী ... ৩৩৮
দুর্দ্দৈব (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ, ... ৪০১
দ্বন্দ্বযুদ্ধ	...	ঐ ২৭৮,৩৩৯
নবজন্ম (কবিতা)	...	ঐ ... ৪৪৪
নবাব (উপন্যাস)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, ৫০, ১৭৭,৩১১,৩৮৮,৪৯৩,৬০০
নূতন বর্ষে (কবিতা)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... ১৬
পরিচয়	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি,আই,ই, ... ৫৯
পিপীলিকা	...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ৩৯৫,৫২১,৫৪০

বিষয়		পৃষ্ঠা
পিয়ানোর গান (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৩২৬
পুরাতন স্মৃতি (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, ... ৫২২
পূজার তত্ত্ব (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... ৬২৩
প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু	...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, ... ১৯
প্রেমের খেয়াল (কবিতা)	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-য়্যাট-ল... ৪৩
প্রেমের আগমন	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ ... ৪০৮
বন্ধু (গল্প)	...	শ্রীমতী রত্নাবলী দেবী ... ৫৫৩
বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা প্রণালী	...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি-এল, ... ৫৮২
বসন্ত-সায়াহ্নে (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, ১০২
বম্বে হইতে আগত বনফুলের প্রতি (কবিতা)		শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-য়্যাট-ল... ১৩১
বিবাহ সমস্যা	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় ... ১০৭
বেদে উষা	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ২০৯
ব্রাহ্মণ মহাসভা	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-য়্যাট-ল... ৭১
ভাল তোমা বাসি যখন বলি (কবিতা)	...	ঐ ... ১৬৬
ভারত ষড়ঙ্গ	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই, ... ২৬১
ভারতীয় আর্য্যদিগের উদ্ভিদ পরিচয়ের ইতিহাস		শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ২৮৪
ভারতীয় আর্য্যদিগের স্বর্গরাজ্যের অবস্থান		ঐ ... ৫৮৯
ভিজিগাপত্তন	...	শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ... ৩২৪
ভিটের মাটি (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, ... ১৮৪
মধ্যযুগের ভারত	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪৫৭
মরণ (কবিতা)	...	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ... ৬২৮
মহালয়া	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ৪১১
মল্লিনাথ	...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, কাব্যতীর্থ... ২২৯
মাতৃত্ব	...	শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী ... ৫৪৪
মানভূমবাসীর দিক্‌বিদিক জ্ঞান	...	শ্রীহরিনাথ ঘোষ, বি-এল, ... ২৪৮
মুক্তি (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬০৫
মেজর থুরির নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞান (সচিত্র)		শ্রীদীনবন্ধু সেন, বি-এল, ... ১৬৭
মোগল-শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক অবস্থা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪৫
মোগল আমলের বিদ্বজ্জন ও কবিবৃন্দ	...	ঐ ... ১৭১
মোগল-আমলের শিল্পকলা	...	ঐ ... ২৫৫
মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ভারতের দশা		ঐ ... ৩৩৫
রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনা (সচিত্র)	...	... ৬১৭
রাসায়নিক গবেষণার ফল	...	শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী, এম-এ, ... ৪৪০
রেডিয়মের আবিষ্কারকের সহিত সাক্ষাৎ (সচিত্র)		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২৯
লাইকা (কাহিনী)	...	শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী ...৮৭,১৬২
শারদীয়া (কবিতা)	...	২৪০, ৩৭৩, ৪৭৭,৫২৭
শান্তিবাদীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ, ... ৬০৪
শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৫৭
শোকসংবাদ (সচিত্র)	...	ঐ ... ১২৩
		... ৩২৭
		...

বিষয়		পৃষ্ঠা
ষড়ঙ্গ দর্শন	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই,... ৩৩১
সবুজ পরী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ২০১
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা ১১৯, ২২৪, ৪২৫, ৫২৩,৬২৭
সমালোচকের পত্র	..	জনৈক পাঠিকা ... ৫১৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (সচিত্র)		... ৫১০
সাফ্রেজিষ্ট প্রসঙ্গ	...	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক, এম-এ, এম-ডি, ... ২২২
সুদূর (গল্প)	..	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল... ১৫১
স্নান-মাহাত্ম্য (সচিত্র)	...	শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী ... ৪৮৮
স্রোতের ফুল (উপন্যাস)	...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ৩৪,১৩২ ২৯২,৩৫০,৪২৯,৫৬০
স্বরলিপি	...	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০৬
স্বপ্নশিশু (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ... ৪২০
স্বেচ্ছাবিবাহ	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ... ৩০২

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ...	৩০৬	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৩৮
অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ...	৬২৩	গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮১
আর্ল রবার্টস ...	৫৯৭	"চলতহিঁ পেখনু" (বহুবর্ণ)	
আর্ল অফ মেয়ো ...	৫৯৯	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৫২৬
আলো-ছায়া		গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৬৩
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২৭	জগদীশচন্দ্র বসু (ডাক্তার) ...	৫১৩
রাজনৈতিক বিদ্যালয়—তোকিও	১৪৯	জানকীনাথ ঘোষাল ...	৫৩৬
একটি ময়ূর অন্যটির ঘাড়ে পড়িতেছে	৫৫৮	জাপান ব্যাঙ্ক—তোকিও ...	১৫০
কাড়ীর পূজো		জর্ম্মান সম্রাট ...	৬২৩
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২৫৯	জেব্রার পার্শ্বে সিংহ ...	৩২১
কলিশ পয়েণ্ট—মহাবলেশ্বর ...	১৪১	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৯, ২০৪, ৩০৭	
কুপমধ্যে রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের		দুটি ময়ূর লেজ বিস্তার করিতেছে ...	৫৫৮
পরিত্যক্ত যষ্টি ...	৪৮৯	দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ...	৪৮৬
কেশবচন্দ্র সেন ...	২০৭	দ্বারিকানাথ গুপ্ত (ডাক্তার) ...	৫০৮
ক্রিমাদাম ...	৩১	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭, ৫০২	
গুহার ...	৩২০	নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৩

বিষয় পৃষ্ঠা

নারায়ণ গণেশ চন্দ্র বারকর ... ৯৫
নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৫০৭
প্রতাপগড়—মহাবলেশ্বর ... ১৪২
ফটোচিত্র ২০৬, ২১৮, ২২০, ২২১
ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পয়েন্‌কার ... ৬২২
বর্ণাশ্রমে বর্ণপরিচয়
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ১৮৬
বাণিজ্য ও নৌবিদ্যালয়—তোঁ ... ১৪৭
বুদ্ধ (বহুবর্ণ) ... ২২৮
বৃদ্ধ সিন্ধুঘোটক ... ৩২২
ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে সন্তান ও জননী ৬১
মনোমোহন ঘোষ ৩৬৬, ৩৬৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ...
মার্কুইস অফ্ ডফেরিণ ... ৫৯৭
মার্কুইস অফ্ ল্যান্সডাউন ... ৫৯৯
মান্দানদী তীরে শ্রীবৎস ও চিন্তা ... ২৯৬
মুনিমোহন (বহুবর্ণ) ... ১২২
মোরগের যুদ্ধ ... ৫৫৭
মৃতজন্তুর পার্শ্বে সিংহী ... ৩২৩
যাত্রীদের স্নানের স্থান ... ৪৯০
যুগলমূর্ত্তি (কালীঘাটের পট) ... ৪৪
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ... ১০০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—আচার্য্য ... ৬১৮
রুসিয়ার সম্রাট নিকোলাস ... ৬২২
লক্ষ্মীনারায়ণ (বহুবর্ণ) ... ৪২৮
লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন মন্দিরে অঙ্কিত চিত্র ২৬৯
লর্ড হার্ডিং ... ৪২২
লর্ড অকল্যাণ্ড ... ৪২৩
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ... ৪৮৬

বিষয় পৃষ্ঠা

লীলা-তরঙ্গ
শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত ... ৪
লেডী হার্ডিং ... ৫
শকুন্তলা (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত ...
শেষশায়ী নারায়ণ (বহুবর্ণ) ... ৩
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা স্যর) ... ৩
শ্রাবণ-ধারা
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ৪
ষাঁড়ের যুদ্ধ ... ৫
সব চলে, তলে তলে
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ১
সঙ্কীর্ত্তন—মেদিনীপুরে প্রাপ্ত পুঁথির পাটা
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ... ৬
সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ... ৪
সাপের শিকার-কৌশল ... ৫
সার্ভিয়ার রাজা ... ৬
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৫
সিন্ধুঘোটক ... ৩
সেনাপতি ব্যারণ নেপিয়র ম্যাগদালা ... ৪
স্যর জেম্‌স আউটরাম ... ৫
স্যর এস্‌লি ইডেন ... ৪
স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ... ৪
স্যর টি, পালিত ৩৭০, ৩
স্যর উইলিয়ম পিল্ ... ৪
হরিণের দল ... ৩
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫
ক্ষেতের পথে
শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটো

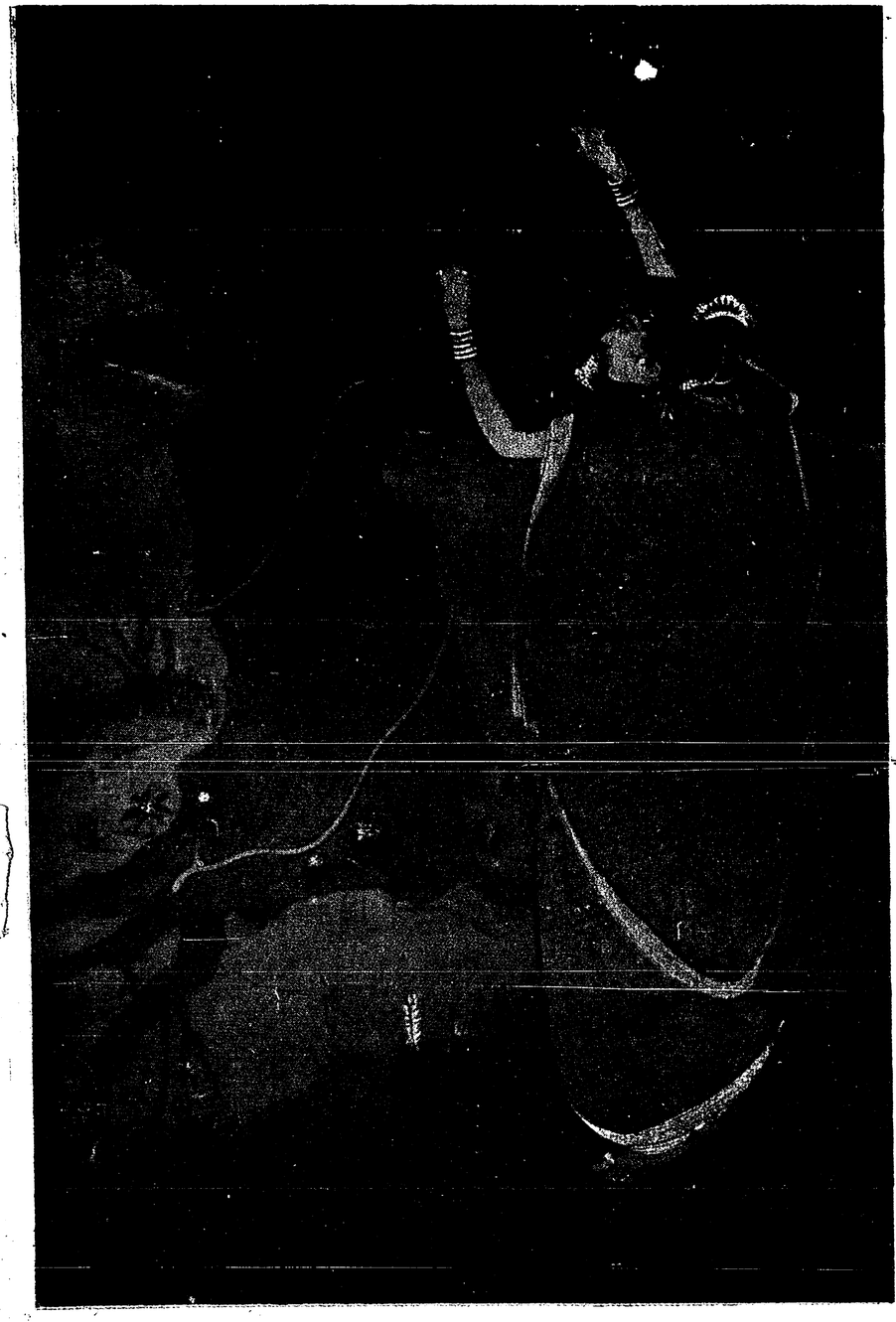

শকুন্তলা

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত

কার্ত্তিক প্রেস] [২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

৩৮শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২১ [১ম সংখ্যা

ভারতী

'জাগৃহি'

পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী,—
তার মাঝে কে ঘুমিয়ে আছ,—নয়ন মেল,—তোমায় ডাকি ;
জাগ, ওগো ! ধূসর ধরার হিরণ-বরণ জীবন-কণা !
জাগ পুরাতনের পুরে নূতনেরি সম্ভাবনা !

পুরাতনের ডিম্ব টুটে বাইরে এস নূতন পাখী !
নূতন আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারের ফুটাও আঁখি ;
জাগাও আশা নূতন আশা নূতন ছন্দ নূতন গতি
গরুড় যদি না হও তুমি সূর্য্যরথের হও সারথি !

শক্ত পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শক্ত সম পলে পলে
মহাকালের বজ্রকঠোর নিবিড় আলিঙ্গনের তলে।
মৌনমুখে যায় পুরাতন শক্ত-কলস মাথায় ক'রে,
তুমি এস নূতন জীবন ! কুম্ভ তোমার সুধায় ভ'রে।

তুমি এস নূতন বর্ষে নূতন হর্ষ! নূতন জ্যোতি!
সর্ষে-পারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি!
এস অজয়!—পরাজয়ে, এস অমর! মৃত্যুপুরে;
বস ধূলায়,—আসন পেতে দূর্ব্বা-লতার শ্যামাঙ্কুরে।

বিধাতা আর ধাতায় মিলে ঘুরায় মুহু অয়ন্-ঘড়ি,
সমীর ফেরে শমীবনে অগ্নিমন্থ মন্ত্র পড়ি';
প্রাচীন দিনের সূর্য্য ঢলে প্রলয়-জলে শয্যা পেতে,
জাগ তুমি নূতন সূর্য্য! নীহারিকার বুদ্বুদেতে।

পুরাতনের স্তন্ত চিরে বাইরে এস সিংহতেজে
জাগ জড়ের সুপ্ত জীবন গোপন শিখায় নয়ন মেজে;
অবিশ্বাসের হোক অবসান, তুমিই তাহার নিশাস রোধ',
অন্তরে হও আবির্ভূত হে আত্মদ! বলপ্রদ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অভিভাষণ*

১ কলিকাতা-মহানগরীর এই বিশাল পুরশ্রী-মণ্ডপে বঙ্গ-সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত পুত্র-গণকে একত্রে সমাসীন দেখিয়া আমার কী যে আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হইতেছে দুই দণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া অকূল আনন্দ-সাগরে মন'কে ভাসাইয়া দিই। সেদিন বই না, আমার চক্ষের সম্মুখে ভারতী-মাতার জন দশ বাছা বাছা ভক্ত সেবক বঙ্গ-বিদ্যা'র পতিত ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র চারা-গাছ রোপণ করিয়া সক্ করিয়া তাহার নাম দিলেন সাহিত্য-পরিষৎ। ইহারই মধ্যে তাহা একটা বৃক্ষের মতো বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার মনে আনন্দ ধরিতেছে না—বিধাতার কাণ্ড দেখিয়া আহ্লাদে আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না। সে দিন নিম্নে গ্রীবা নত করিয়া যাহাকে আমি দেখিয়াছি ক্ষুদ্র একরত্তি চারা-গাছ—আজ ঊর্দ্ধে নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিতেছি প্রকাণ্ড একটা বনস্পতি—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কী হইতে পারে? ঈশ্বরের কৃপায় তাহার শুভ ফল বঙ্গের আপাদমস্তক জুড়িয়া যে কিরূপ প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনারা যতটা জানেন, ততটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নহে যদিচ;—কেননা

* কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

প্রথমত ষোলো-সাতারো বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ আমি লোকালয় হইতে বহুদূরে বোলপুরের নির্জন কুটীরে বাস করিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি সংবাদপত্র ছুঁইনা; কিন্তু তবুও যখন ভাল ভাল লোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্য-পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির কথা—সুদূর আকাশ-মার্গে যেন শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি হইতেছে এইরূপ মৃদু-মধুর ভাবে—আমার কর্ণে পৌঁছিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, এ আগুন খড়ের আগুন নহে—বাড়বানল যেমন জলে নেভে না, ঝড়ে টলে না, এ আগুন তাহারই ছোটো ভাই! অপার করুণার সাগর বিশ্ববিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে! কিন্তু সকলেই আমরা এটা বুঝিতে পারি যে, মঙ্গলের সূচনা যেখানে যত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই অভিপ্রেত, সুতরাং তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। এখন যাঁহারা আজিকের মতো এইরূপ ঘটাড়ম্বরকেই সাহিত্য-পরিষদাদি সভার সার সর্ব্বস্ব মনে করিতেছেন—কতিপয় বৎসর পরে যখন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দৈবী শক্তির প্রভাবে বঙ্গলক্ষ্মীর বিষাদাচ্ছন্ন মলিন বদন মেঘমুক্ত শারদ পূর্ণিমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর, তাহা দেখিয়া লোকে যখন সাহিত্য-পরিষদের জয়জয়কার করিতে থাকিবে, তখন তাঁহারা বলিবেন এ যাহা দেখিতেছি এ'কে তো শুধু কেবল ঘটা-আড়ম্বর বলা সাজে না—এ যে মঙ্গল মূর্ত্তিমান্! দশজন কলহ-প্রিয় বাঙ্গালীর সংসদ্ হইতে যাহা কস্মিন্‌কালেও হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও মনে করি নাই—এ যে দেখিতেছি তাহা চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান! ধন্য জগদীশ্বর! তোমার লীলা অদ্ভুত! তোমার করুণা অপার!

বঙ্গবিদ্যার এই মহাসাগরে কী যে আমি আজ অর্ঘ্য প্রদান করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার ঘটে যৎকিঞ্চিৎ সরস্বতীর প্রসাদ যাহা সংগোপিত আছে, তাহার মূল্য আমার নিকটে যদিচ নিতান্ত কম না, কিন্তু যাঁহাদের একত্র-সম্মিলনে আজিকের এই সভা গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই-সকল বড় বড় বিদ্যা'র জহরীগণের নিকটে তাহার মূল্য অতীব যৎসামান্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু আপনারা যখন আপনাদের মহত্ত্বগুণে আমার ক্ষুদ্রত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমাকে আজিকের এই শুভ সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমার পুতুল-খ্যালা-গোচের ছোটো খাটো নৈবেদ্যের ডালা সভা'র সমক্ষে অনাবৃত করিতে কুণ্ঠিত হওয়া এখন আর আমার পক্ষে শোভা পায় না; অতএব সাহসে ভর করিয়া তাহা-তেই এক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার একটি অবশ্যম্ভাবী অপরাধ যাহা আমার পক্ষে সাম্‌লানো দুষ্কর তাহার জন্য আপনাদের নিকটে অগ্রিম ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি:—আমার বক্তব্য কথাটি আমি সংক্ষেপে সারিতে চাই; আর সেই জন্য তাহার বারো আনা ভাগ আমার মনের মধ্যে আটক পড়িয়া থাকিবে;—আমার এ অপরাধটি আপনারা যদি দয়ার্দ্র চিত্তে ক্ষমা না করেন তবে আমি নিরুপায়; কেননা আয় সংক্ষেপের সহিত যুঝিতে হইলে ব্যয়-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে যেমন গৃহস্থের গত্যন্তর নাই—সময়-সংক্ষেপের সহিত

যুঝিতে হইলে তেম্নি বচন-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে বক্তার গত্যন্তর নাই। আমার একটি অনতিক্রমণীয় ভাবী অপরাধের দায় হইতে কথঞ্চিৎপ্রকারে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে একটু যাহা আমার বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। এক্ষণে অনুমতি হোক্—সভাস্থ-সজ্জনগণকে সাদরে অভিনন্দন করিয়া অভি-ভাষণ কার্য্যটা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ করি।

আর্য্য-সভ্যতা **এখন এই যে** মহা মহা সাগরকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া—মহা মহা পর্ব্বতকে বল্মীক জ্ঞান করিয়া—অজেয় বল-বিক্রমের সহিত পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করিতেছে, এ সভ্যতার মূল-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অমরাপুরী হইতে কল্পতরুর একটা ডাল কাটিয়া আনিয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে রোপন করা হইয়াছিল **সমবেত অরণ্যবাসী ঋষিমহর্ষিগণের সামগানের সহিত তান মিলাইয়া ;** তাহাই এক্ষণে পাতালে মূল প্রসারিত করিয়া এবং আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া শত সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অযুত সহস্র দল-পল্লবে এবং নানা রসের নানা রঙের ফলফুলে পৃথিবীর আপাদ-মস্তক ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর্য্য-সভ্যতা ভুঁইফোঁড়-শ্রেণীর নূতন সভ্যতা নহে; পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতা'র নামই আর্য্য-সভ্যতা। যেমন, হিমালয় যে দেখে নাই, সে পর্ব্বত কাহাকে বলে তাহা জানে না; ভাগীরথী যে দেখে নাই, সে নদী কাহাকে বলে তাহা জানে না; ভারতভূমি যে দেখে নাই, সে পৃথিবী কাহাকে বলে তাহা জানেনা; তেম্নি, আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য-সভ্যতা যে দেখে নাই, সে সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। কেহ যদি আমাকে বলেন "বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া এ যাহা তুমি বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কি?" তবে আমি তাঁহাকে বলিব—ভারতের মহা সভ্যতার প্রমাণ ভারতেরই মহাভারত! প্রশ্নকর্ত্তা যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত মহাভারতখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে সভ্যতা যে **বলে কাহাকে** —সভ্যতা'র যে কতগুলি গঠনোপকরণ; সভ্যতার যে কোথায় কি দোষ, কোথায় কি গুণ; কাহাকে বলে রাজধর্ম্ম, কাহাকে বলে আপদ্‌ধর্ম্ম, কাহাকে বলে মোক্ষধর্ম্ম; কোন্ ধর্ম্ম কখন কী অংশে সেবনীয়—কোন্ ধর্ম্ম কখন্ কী অংশে বর্জ্জনীয়—সমস্তই তাঁহার নখ-দর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। সভ্য-তার একটা সর্ব্বাঙ্গীন এবং সমীচীন আদর্শ মনোমধ্যে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্য যত কিছু মালমস্‌লার প্রয়োজন সমস্তই তিনি দেখিবেন—তাঁহার হাতের কাছে মৌজুত; তাহার কিছুরই জন্য তাঁহাকে দেশ বিদেশে ঘুঁটিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা যদি বলেন **"তবে কেন আমাদের এ দশা?"** তবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে! আজ কিন্তু ঐ বৃহৎ মাম্‌লাটার একটা সরাসরি রকমের বিচার-নিষ্পত্তি ভিন্ন পাকাপাকি রকমের চরম নিষ্পত্তি এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমা-কর্ত্তৃক ঘটিয়া ওঠা অসম্ভব। কিন্তু তা বলিয়া একেবারেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া আমি শ্রেয় বোধ করি না। আমার ক্ষুদ্র আদালতের মোটামুটি রকমের বিচার্য্য কার্য্য আমি

উপস্থিত মতে নির্ব্বাহ তো করি—তাহার পরে আপীল আদালতের সূক্ষ্ম বিচারের মালিক আপনারা আছেন—সেজন্য আমার মাথা ভাবাইবার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না!

আমার এইরূপ ধারণা যে, আম'দের দেশের সভ্যতা'র মস্তক **তত্ত্বজ্ঞান**; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সভ্যতা'র মস্তক **বিজ্ঞান**। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—দুটার মধ্যে কোন্‌টা ভাল? তত্ত্বজ্ঞান ভাল—না বিজ্ঞান ভাল? তবে আমি তাঁহাকে বলিব—দুটাই ভাল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছেঃ—প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই ত্রিগুণাত্মক। সকল বস্তুরই দুই দিক্ আছে; ভাল'র দিক্‌ও আছে—মন্দের দিক্‌ও আছে। সব জিনিসেরও ভাল'র দিক্ আছে—ভাল জিনিসেরও মন্দের দিক্ আছে। উচিত ব্যবহার দুয়েরই ভাল'র দিক্ ফুটাইয়া তোলে; অনুচিত ব্যবহার দুয়েরই মন্দের দিক্ ফুটাইয়া তোলে। ধোঁয়া-কলের নৌকা খুবই ভাল জিনিস; কিন্তু **কখন্** তাহা ভাল জিনিস্? যখন তাহা পাকা মাঝির হাতে পড়ে তখনই তাহা ভাল জিনিস্; আনাড়ি মাঝির হাতে পড়িলে তাহা সর্ব্বনাশের মূল। তত্ত্বজ্ঞানও ভাল মন, বিজ্ঞানও তেম্নি, দুইই পরমোৎকৃষ্ট জিনিস, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু বলিতে হইবে কি—তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে; বিজ্ঞানের অপব্যবহার ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হই-য়াছে এবং হইতেছে। বিজ্ঞানের অপব্যব-হার-জনিত দুর্গতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ ভয়ানক—আগে সেই কথাটা বলি; তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ বিসদৃশ—পরে তাহা বলিব।

ইউরোপ-আমেরিকায় মহা মহা বিজ্ঞান-প্রসূত কলকারখানার ঘূর্ণাচক্রের টানে পড়িয়া সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের ইহকাল পরকাল ক্রমশই রসাতলের নিকট-বর্ত্তী হইতেছে—তাহাদের মা-বাপ বলিবার কেহই নাই। বড়লোকেরা দুষ্ট লক্ষ্মীর পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মকে গির্জার ফাটকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর সেই-সব বড়লোকদিগের মনস্কামনা আশু সফল করিবার জন্য গির্জার কারাধ্যক্ষেরা ধর্ম্মকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইতেছেন; সংকীর্ণতা কৃত্রিমতা এবং আত্মগরিমা'র কালকূট মিশাইয়া ঈশা মহাপ্রভুর উদার সরল এবং সুধাময় উপদেশান্ন ভক্ষণ করাই-তেছেন। বড় বড় বণিক মহাজনদিগের হ্যাঁপায় পড়িয়া মধ্যবিধ শ্রেণীর কর্ম্মী লোকেরা ব্যবহার-বিজ্ঞানকে (political economyকে) ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লক্ষ্মীবেশধারিণী অলক্ষ্মীর পশ্চাতে, এক কথায়—আলেয়া-কিন্নরীর পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন;—কেবল ঈশা মহাপ্রভুর গোটা চার-পাঁচ সেরা সেরা ধর্ম্মোপদেশের বাল্যসংস্কার তাঁহাদিগকে ভয়ানক অধোগতি হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা দেশের বড় বড় রুই-কাৎলা-শ্রেণীর বণিক্ জনেরা পুঁটিমাছ-শ্রেণীর বণিক্‌দিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। ছোটো

ছোটো মাছেরা বড় বড় মাছদিগের সঙ্গে বল-বিক্রমে এবং ফন্দিবাজিতে আঁটিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঙাচী-বেচারীগুলির উপরে ঝাল ঝাড়িতেছেন **যমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া,** ইহাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সভ্যতাকে **ধিক্** !

তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকের যাহা ঘটিয়াছে তাহাও শোচনীয় কম না। তাহা যে-সূত্রে যে রকম করিয়া ঘটিয়াছে তাহা বলিতেছি —প্রণিধান করুন্।

বহু পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল। কিয়ৎ কাল পরে তাহা তপোবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বামিত্র জনক ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-কুলের মস্তক স্থানীয় কতিপয় মহাত্মার হস্তে ধরা দিয়াছিল; আর, সেই সঙ্গে বিদুরের ন্যায় দুই এক জন নিম্নবংশীয় সাধু পুরুষের কুটীরদ্বারেও মাথা নোয়াইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু তদ্ব্যতীত অপরাপর লোকের নিকটে—জনসাধারণের নিকটে—তাহা একপ্রকার প্রহেলিকার আকার ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল; তবে যদি দৈবের কৃপায় উহার দুর্ভেদ্য রহস্যের ভিতরে প্রবেশের অধিকার সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তির ভাগ্যে কোনো গতিকে ঘটিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহাও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। তত্ত্বজ্ঞানের দেবস্পৃহনীয় অমৃত মান্ধাতার আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিদ্যার ভাণ্ডারে এত যে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং যত্ন সমাদরের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কেন-যে তাহা পূর্ব্বতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মতো ভোগে আসে নাই এবং অধুনাতন কালেও জনসাধারণের উচিত মতো ভোগে আসিতেছে না, তাহার কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্য থাকিবে। তাহার প্রধান একটি কারণ যাহা আমার বিবেচনায় সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেছি—প্রণিধান করুন্।

কাহাকে যে বলে **বিজ্ঞান** —অধুনাতন কালের পাঠশালার বালকদিগেরও তাহা জানিতে বাকি নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশ যেহেতু **আমাদের দেশ** নহে, এইজন্য ভারত-বর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের **মূর্ত্তি যে কিরূপ** তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও **নিজ-বুদ্ধির অগোচর;** কেবল তাহার এক-একখানি বিকলাঙ্গ ছবি যাহা তাঁহারা ছাত্র-পাঠ্য ইংরাজি পুস্তক হইতে আপন আপন মানস-পটে ফটোগ্রাফ্ করিয়া লইয়াছেন, সেই আব্‌ছায়া-গোচের ফটোগ্রাফের ফটোগ্রাফ্ তাঁহাদের নিকটে ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার সর্ব্বস্ব। প্রথমে আমি তাই ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিব—কিন্তু খুব সংক্ষেপে; এইরূপে আমি আমার বক্তব্য কথাটি'র গোড়া ফাঁদিয়া তাহার পরে একটি ছেলেভুলানিয়া গোচের ছোটো খাটো গল্পের আকারে তাহাকে আমি সভা'র মাঝখানে উপস্থিত করিব। এ রকমের একটা বিসদৃশ ব্যাপার দৃষ্টে পাছে আপনারা আশ্চর্য্য হ'ন

এইজন্য আমি আগে ভাগে আপনাদিগকে তাহা জানাইয়া রাখিতেছি। ইহাতে আমার অপরাধ নাই; কেননা তাহা না করিয়া আমি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের পুরাকালের ঐতিহাসিক বিবরণের গহন অরণ্যে ধৃষ্টতা'র সহিত প্রবেশ করি, তাহা হইলে দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া কোথায় যে কোন অন্ধকার অমানব পুরীতে গিয়া পড়িব তাহার ঠিকানা নাই।

ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা আমি বেদান্তাদি শাস্ত্রের মধ্য হইতে নিষ্কর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমার বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :—

সত্য যদিচ এক বই দুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা তাই বলেন—

সত্য তিন প্রকার,

(১) পারমার্থিক সত্য,

(২) ব্যাবহারিক সত্য,

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য;

আর, তদনুসারে তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের পংক্তি-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছেন তিনটি;

(১) পরাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান,

(২) অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান,

(৩) অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান।

বিজ্ঞান ব্যষ্টি-জ্ঞান বা শাখা-জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। মোট জ্ঞানের মোট সত্যের নাম পারমার্থিক সত্য। সে সত্য কী—আপনারা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সত্য কথা যদি বলিতে হয়—তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আবার—**একটা কথা** কোমর বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া পথের মাঝখানে থামিয়া যাওয়াও দোষ! অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির মোটামুটি-রকমের একটা মীমাংসা যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে,—সংক্ষেপে তাহা আপনাদের সুবিবেচনায় সমর্পণ করিতেছি, প্রণিধান করুন্।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক মতামতের রাজ্যে নগর-সংকীর্ত্তনের ধুম বেজায় অতিরিক্ত! সে নগর-সংকীর্ত্তন কম নহে কীর্ত্তন! তাহা মতবাদীদিগের স্ব স্ব মতের এবং দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের **মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন** ! সে নগর-সংকীর্ত্তনের খোলপিটন হ'চ্চে **বাদের** বাদ্যোদ্যম, আর, করতালসংঘর্ষণ হ'চ্চে ISMএর ঝমাঝম ধ্বনি। **বাদের** বাদ্যোদ্যমের চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে **বিবাদের** উন্মত্ত কোলাহল; ISMএর ঝমাঝম ধ্বনির চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে SCHISMএর দন্ত-আস্ফালন। আমাদের দেশে যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সর্দ্দারশ্রেণীর প্রধান দুই মল্ল হ'চ্চে **অদ্বৈতবাদ** এবং **দ্বৈতবাদ**। দেশসুদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা যে, উপনিষদের **তত্ত্বমসি** বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ তাহা **অদ্বৈতবাদ**। আমার কিন্তু এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপনিষদে এক যা বাদ আছে **সত্যবাদ,** তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। তবে যদি উপনিষদ্-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ঐ সাঙ্কেতিক সাধন-

মন্ত্রটকে কোনো দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করা'ন্—সে কথা স্বতন্ত্র; যিনি সাজাইয়া দাঁড় করা'ন তিনিই তাহার জন্য দায়ী, তা' বই উপনিষদ্ তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও দায়ী নহে। তত্ত্বমসি-বচনটি'র শব্দার্থ যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, তৎ শব্দের অর্থ তাহা বা সে-বস্তু। ত্বং শব্দের অর্থ তুমি। "তৎ ত্বং" কি না সে-বস্তু তুমি। কথাটা ওটা যে নিতান্তই একটা হেঁয়ালি-ঢঙের সংকেত-বচন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যটি তলাইয়া না বুঝিলে উহা কেবল একটা মুখের কথা হইয়া—ফাঁকা আওয়াজ হইয়া—বাতাসে উড়িয়া যায়। ত্বং শব্দের বাক্যার্থ তুমি—কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু তাহার ভাবার্থ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি, তুমিও তেম্নি আমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন কর; আর, বেদান্তের সেই যে দেবদত্ত ("সোঽহং দেবদত্ত") যিনি ভাগ্যক্রমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ইঁহাকে আমরা উভয়েই ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি। তুমি ত্বং আমার নিকটে, আমি ত্বং তোমার নিকটে, দেবদত্ত ত্বং আমাদের উভয়েরই নিকটে। অতএব অ্যাকা কেবল তুমি যে ত্বং তাহা নহে; তুমিও ত্বং, আমিও ত্বং, দেবদত্তও ত্বং। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ত্বং আমি-তুমি-তিনি'র প্রতিনিধি স্বরূপ; এক কথায়—সমষ্টি আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ। তবেই হইতেছে যে ত্বং শব্দের বাক্যার্থ যদিচ "তুমি" বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আত্মা কিনা পরমাত্মা। এমতে দাঁড়াইতেছে, যে, "তত্ত্বমসি" বচনটির **বাক্যার্থ** যদিচ "সে বস্তু তুমি" কিন্তু তাহার **ভাবার্থ** "সে বস্তু পরমাত্মা।" উপনিষদে তত্ত্বংও আছে—তদ্‌ব্রহ্মও আছে—দুইই আছে। তার সাক্ষী "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"; ইহার অর্থ এই যে, সে বস্তুকে বিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর সেইজন্য সাংখ্যের পারিভাষায় ব্রহ্ম প্রকৃতিরই আর এক নাম। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দ স্থূল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে এবং স্থূল-বিশেষে পরমপুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন—

"সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি। আবার

পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবং অজং বিভুং॥
আহুস্ত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্তু তৎসৎ শব্দ এবং তদ্‌ব্রহ্ম শব্দের মধ্যে মূলেই কোনো অর্থ-ভেদ নাই। সৎ শব্দের অর্থ ধ্রুব সত্য। সকল শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য—প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। তবেই হইতেছে যে "তৎসৎ" বলাও যা (অর্থাৎ "সে বস্তু ধ্রুব সত্য" বলাও যা) আর, "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা" বলাও তা, একই কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, তিন স্থানের এই যে তিনটি উপনিষদ্ বচন (১) তত্ত্বং, (২) তদ্‌ব্রহ্ম, (৩) তৎসৎ, তিনটিরই ভাবার্থ "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা।" তৎ শব্দের সামান্য অর্থ হ'চ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটি'র ন্যায় যা-তা জ্ঞেয় বস্তু, আর, তাহার বিশেষ অর্থ হ'চ্চে পরম জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু। সৎ শব্দের বহুবচন হ'চ্চে "সন্তঃ", সন্তঃ শব্দের অর্থ সৎপুরুষেরা! এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে এই যে, সৎ শব্দের সামান্য অর্থ তুমি-আমি-তিনি প্রভৃতির ন্যায় যে-সে সৎলোক বা সৎপুরুষ; আর, তাহার বিশেষ অর্থ পরম-পুরুষ পরমাত্মা! বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম শুধুই কেবল পরম জ্ঞেয় বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন; এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তৎ,আর এক দিকে তেম্নি তিনি আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা সদাত্মা বা পরমাত্মা। "তৎ" কিনা সত্যস্বরূপ পরম বস্তু; "সৎ" কিনা মঙ্গলস্বরূপ পরম আত্মা। ইংরাজি দার্শনিক ভাষায়—তৎ হ'চ্চে Fundamental Substance, সৎ হ'চ্চে Supreme Subject। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আর বেশী বাক্যব্যয় এবং সময়-ব্যয় না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথাটার উপসংহার করি।

পারমার্থিক সত্যের মূল মন্ত্র ওঁ তৎ-সৎ। এই মহা মন্ত্রটির অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে আমি যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই ঃ—

তৎ কিনা জ্ঞেয় প্রকৃতি। }
সৎ কিনা জ্ঞাতা পুরুষ। }
তৎ উপাদান কারণ। }
সৎ নিমিত্ত কারণ। }
তৎ সত্য; সৎ মঙ্গল।

"ওঁ তৎসৎ" কিনা যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা তিনি সত্য এবং মঙ্গল একাধারে; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে; তিনি Substance এবং Subject একাধারে; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে; এক কথায়; তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য আর তাহারই নাম পারমার্থিক সত্য।

পারমার্থিক সত্য যেমন মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য; যেমন—জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদি-ঘটিত সত্য; বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য; ক্ষেত্রতত্ত্বের স্থানাধিকার-ঘটিত সত্য; রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রব্যগুণ-ঘটিত সত্য; ইত্যাদি।

পারমার্থিক সত্য এবং ব্যাবহারিক সত্য ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম—প্রাতিভাসিক সত্য। "প্রাতিভাসিক" অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে Phenomenal। রীতিমত বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সত্যকেই (যেমন পৃথিবী গোলাকার এই একটি সত্যকে) বিজ্ঞান-রাজ্যে যত্ন সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; আর সেই সঙ্গে মনের সংস্কার-মূলক আপাত-সুলভ সত্যকে (পৃথিবী চ্যাপটা এই রকমের কাঁচা সত্যকে) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যের সুপরীক্ষিত সত্য খুব কাজের সত্য

তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তথাপি তাহা ব্যাবহারিক সত্য বই পারমার্থিক সত্য নহে। বিজ্ঞানের সত্যকে ব্যাবহারিক সত্য বলিবার কারণ কি—আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই :—

বড় বড় বণিক্ মহাজনেরা কিছু আর জাহাজ-বোঝাই-করা সমগ্র বিক্রেয় বস্তুর মোট ভাঙিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহারার্থে আপনারা বিক্রয় করেন না, সে কার্য্যের ভার তাঁহারা খুচরা জিনিসের ব্যাপারী-দিগের হস্তে গছাইয়া দ্যা'ন্। তত্ত্বজ্ঞানের সমগ্র সত্য বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারে না এই জন্য—যেহেতু অত বড় মহামূল্য সামগ্রী যে মানুষ ক্রয় করিতে পারে তদুপযুক্ত ক্রোড়পতি বিদ্বজ্জন-সমাজে সুদুর্লভ। তাহা ক্রয় করিতে হইলে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত শমদমাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক—পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত যমনিয়মাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক! যিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্ না কেন তাঁহার ঘরপোরা বিরাট্ বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্যানিধির সিকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনেরা যেমন স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সামগ্রী-সকল ছোটো-খাটো দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে, তা' বই বড় বড় বণিক্ মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা তেম্নি স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সত্য-সকল বিজ্ঞানের দোকানদারদিগের নিকট হইতেই ক্রয় করেন, তা' বই তত্ত্বজ্ঞানের মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না; আর সেইজন্য বিজ্ঞানের সত্যসকল ব্যাবহারিক সত্য নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

আমাদেরই এই ভারতবর্ষ যে, বিজ্ঞানের জন্মভূমি তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে; কিন্তু তাহা কৃতবিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রখরবুদ্ধি জুরি-মহোদয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিবার মতো ঐতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয়া ওঠা আমি বড় সহজ মনে করি না। যাহাই হো'ক্ না কেন—পূর্ণ বিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার মহোদয়গণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও ভীত নহি যে, পুরাকালে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বয়স যদি চ খুব অল্প ছিল—কিন্তু তাঁহার সেই কচি বয়সেই তিনি যেরূপ তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহার নিকটে বড় বড় প্রবীণ পণ্ডিত-গণের বিদ্যা-বুদ্ধির মাথা হেঁট হইয়া যায়। এ বিষয়ে বেশী ওকালতি করা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা তেলা-মাথায়-তেল-দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কার্য্য; কেননা, পুরাতন ভারতে জ্যোতিষ-বিদ্যা, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়ণ-বিদ্যা, পশুপালনী-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্যা, চিত্র-কর্ম্ম, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অনেকানেক বিদ্যা কতদূর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়া-ছিল তাহা ত্রিজগতে রাষ্ট্র। তা ছাড়া —রাবণের পুষ্পকবিমানের কথার ভিতরে যদি কোনো প্রকার ঐতিহাসিক সত্য চাপা দেওয়া থাকে—তবে তো ত্রেতাযুগেরই জিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটা তাম্রলিপি বা আর কোনো প্রকার মাতব্বর-গোচের ঐতিহাসিক দলিল ভারতবাসীর হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনো কথার উচ্চবাচ্য না করাই

ভারতের উকিল ব্যারিষ্টারগণের পক্ষে সৎপরামর্শসিদ্ধ।

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহা জানি না—কিন্তু আমার কণ্ঠের তেজ নরমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মন বলিতেছে **সময় নাই**। অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমার অবশিষ্ট বক্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র উপকথা'র বেশ পরিধান করাইয়া তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি যাচ্ঞা করিতেছি। আপনাদিগকে মাঝে মাঝে হুঁ দিতে বলিতে আমি সাহস করি না—কেবল যদি আপনারা গল্পটিকে অযোগ্য-বোধে শ্রবণদ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দ্যা'ন, তাহা হইলেই আমি আজ আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত মনে করিব।

পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা রাজ্যের রাজর্ষি। পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাঁহাদের সবে-মাত্র একটি পুত্র। স্মৃতিপুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান মনে মনে সংকল্প করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ন্যায় পত্নী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট বৎসরের অধিক না—তা নহিলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যময় ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণকে ডাকা-ইয়া প্রজারা যাহাতে অক্ষয় রাজ-ভাণ্ডারের অমৃতোপম ভক্ষ্য-পানীয়-সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা সদ্ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন, আর সেই সঙ্গে কিরূপে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ব্ববিদ্যায় এবং সর্ব্ব-গুণে সম্ভৃত করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের একটা সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবরের হস্তে তাহা সযত্নে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিবর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃ পুন শপথ করিলেন যে, তাঁহার জীবন থাকিতে উপদেশ-পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান পত্নী সহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন।

মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজ-ভাণ্ডারের অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয়-সকল যাহাতে প্রজারা সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিতমতো ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনেক কালের বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সব দিক বাঁচাইয়া যে দ্রব্যের যে মূল্য ধার্য্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের আদবেই মনঃপূত হইল না। কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয়-সকল আমরা বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী। নিতান্তই যদি আমা-দিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে এক টাকার জিনিষ এক পয়সা মূল্যে

লইতে আমাদের মনকে কোনোমত প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি ; নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।" মন্ত্রিবর ফাঁপরে পড়িলেন। মন্ত্রিবরের মন্ত্রিণী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপত্নী। তাঁহার কৌশল্যা ছিলেন রক্ষানীতি, আর, তাঁহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের ঐরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিণী ঠাকুরাণীরই কর্ণে পৌঁছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া ভালো করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রিণী রক্ষানীতি বলিলেন "ভাব্‌চ কেন অত ; প্রজাদের যারা প্রধান মোড়ল—যাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই তারা বুঝ্‌বে, আর প্রধানেরা বুঝ্‌লেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝ্‌বে ; তা হ'লেই আপদ্ বালাই চুকে যাবে।" ছোটো মন্ত্রিণী লোকরঞ্জনা বলিলেন "দিদি যা ব'ল্‌চেন তা যদি ভাল বোঝো তবে তাই কর'। সখীমণি ঘাটে জল তুল্‌তে গিয়েছিল—জল তুলে এসে আমাকে ব'ল্লে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় হ'য়েচে এম্নি যে, দুই দণ্ড তা'কে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল ; আর, প্রজারা সবাই মিলে যা ব'লছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনেচে ; তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর খুচ্‌রো চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে ব'ল্‌ছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশশুদ্ধ লোক না খেয়ে ম'চ্চে—আমি তা চ'কে দেখ্‌তে পার্‌ব না ; তার আগে যা'তে তা আমাকে দেখ্‌তে না হয়, আমি তা না-খেয়েই হো'ক্ আর যা-খেয়েই হো'ক—যেমন ক'রে হো'ক, ক'রে ক'ম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হ'ব। তা হ'লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন আর তোমার সব আপদ বালাই চুকে যাবে।" মন্ত্রিবর তাঁর কৈকেয়ী ঠাকুরাণী লোকরঞ্জনা'র শক্ত আব্‌দার কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না ; তিনি আর কোনো উপায় না দেখিয়া রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ তত্ত্বান্নের সহিত নানা প্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্ম্মের ভেজাল মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার জিনিস সিকি পয়সা মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন যদিও খুব কম তথাপি মন্ত্রিবরের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য তাঁহার একটুও ভালো লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছ ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনা করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় নাই ; আমার মতো যখন তোমার চুল পাকিবে তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রিটি ছিলেন বলিয়া রাজ্য এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, নহিলে কোন্‌কালে তাহা রসাতলে যাইত।" বিজ্ঞান বলিল "আপনি ঐ যে কদর্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও যে বিষ !" মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ বলিলেন "ঐ-দ্রব্যগুলারই মধ্যে দুই চারি ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে তাহা অমনধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া

খাইতে পারে।" মন্ত্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিবরকে বলিল, "আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্য করিবেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই ! বছর-আষ্টেক পরে যখন আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে "সত্য কথা বালকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে, আর, অশুভ কার্য্য প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশুভ বই শুভ নহে।" বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিয়া, আর, কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার বাহুবলে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রী-সকল উদরস্থ হওয়াতে-করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক পদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম্মের ভারে তত্ত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়া আর্য্য-সভ্যতা অধম বর্ব্বরতায় পর্য্যবসিত হইল। তাই আমাদের আজ এই দশা !

বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারের যে কিরূপ বিষময় ফল এই তো তাহা দেখিলাম। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণা অপার ! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য জ্যোতিকে তিল মাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই, পারিবেও না।

প্রবীণ স্মৃতিপুরাণ নবীন বিজ্ঞান'কে এই যে একটি কথা বলিয়াছিলেন—যে রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয় সামগ্রীতে সহস্র ভেজাল-মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা সকল রোগের মহৌষধ, তাঁহার এ কথা সত্য বই মিথ্যা নহে ; তা'র সাক্ষী—রামায়ণ এবং মহাভারত এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সভ্যতা'কে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, তা'ও বলি—মন্ত্রিবরের উপরে রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে, তাঁহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে আপনার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। ব্যাবহারিক সত্যের জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া ওঠা যতদূর সম্ভবে—বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পারমার্থিক সত্যের ক-খ-গ-ঘও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা

দিল না। বিজ্ঞানের উচিত ছিল—ভারত-ভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের শূন্য উপর-মহলটা পুরাইয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারত-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা'তে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী—প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়া—কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয় যাহা যাহা ঘটিবে তাহা ভারতময় ঢ্যাঁঢ়রা পিটিয়া দেওয়াইয়া-ছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর হিত-পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন; ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার লোকপূজ্য পিতা'র নিকটে দীক্ষিত হউন্; দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভ্যতা'র যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূরণ করুন্; তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে, আর, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রতীচ্য রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে। আমার ক্ষুদ্র উপকথাটি ফুরাইল। আমারও শান্তি হইল, আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন বর্ষে

নূতন দেখিব বলি উঠিয়াছি জাগি,
প্রাণ কিন্তু হাহা করে পুরাণোর লাগি'
নয়নে সুন্দর রাগে রঞ্জিত প্রভাত,
হৃদয়ে জাগিয়া আছে অন্ধকার রাত!
কার তরে গাঁথি ফুল, কারে দিই মালা,
কি রহস্য দ্বন্দ্বময় জীবনের পালা!
নিদ্রা যবে ভেঙ্গে যায়, স্বপ্ন যায় ছুটে,
সত্যের আলোক-হাসি—সকৌতুকে ফুটে।
জীবন স্বপ্নের শেষ কে জানে কেমন?
মৃত্যু কি আনিবে নব স্মৃতি জাগরণ?

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু *

নৃপতি প্রভাকরবর্দ্ধন দারুণ দাহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া আজ শয্যাগত।

রাজার পীড়ার সংবাদে নগরীর শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। নৃপতির জয় ঘোষণা আর শোনা যাইতেছে না। চারণগণের গীত ও তূর্য্যনিনাদ আজ কর্ণগোচর হইতেছে না। নগরের সমস্ত উৎসব থামিয়া গিয়াছে। নৃত্য গীত বন্ধ, বিপণিতে আর সেরূপ দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ার্থে সজ্জিত হয় নাই। নৃপতির রোগ শান্তির জন্য বহুস্থলে হোম আরম্ভ হইয়াছে। পবনচালিত সেই হোমানলের ধূমরাশি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূন্যে উঠিতেছে। রাজার অনুরক্ত বান্ধবমণ্ডলী রাজার আরোগ্য-কামনায় শিবপূজায় নিরত। কোথাও কুল-পুত্রগণ চতুর্দ্দিকে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শিখায় দগ্ধ-প্রায় হইয়া সপ্তমাতৃকার আরাধনা করিতেছে। কোথাও দ্রবিড় দেশীয় উপাসক নরমুণ্ড বলি দিয়া বেতালকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কোথাও চণ্ডিকামূর্ত্তির সম্মুখে বাহুযুগল উত্তোলিত করিয়া অন্ধ্রদেশীয় উপাসক রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। তরুণ রাজসেবকগণ মস্তকে জ্বলন্ত গুগ্‌গুল ধারণ করিয়া মহাকালের উপাসনা করিতেছে। কোন আত্মীয়স্বজন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নিজ দেহের মাংস কর্ত্তিত করিয়া রাজার মঙ্গলার্থ হোমানলে তাহা আহুতি দিতেছে, কোথাও সামন্তরাজপুত্রগণ প্রকাশ্যে নরমাংস লইয়া পিশাচদিগকে বিতরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে (১)। থাকিয়া থাকিয়া আকাশে বায়সমণ্ডলী কটুস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আসন্ন অমঙ্গল সূচনা করিতেছে।

প্রধান রাজপথে এক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া একখানি যম-পট প্রদর্শন করিতেছে। দণ্ডের উপর হইতে চিত্রপট ঝুলিতেছে। চিত্রে ভীষণ মহিষের উপর অধিষ্ঠিত যমের মূর্ত্তি চিত্রিত। দক্ষিণহস্তে দীর্ঘ শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া সে চিত্রে পরলোক ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেছে—

"যুগে যুগে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা বিগত জীবন হইয়াছে! তুমি কার? কেই বা তোমার?" (২)

রাজপ্রাসাদে ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করা

* বাণভট্ট বিরচিত "শ্রীহর্ষচরিত" সংস্কৃত কথা সাহিত্যে একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বাণভট্ট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে সময়কার আচার ব্যবহার রীতি নীতির সুস্পষ্ট উজ্জ্বল চিত্র ঐ গ্রন্থে বিদ্যমান। খণ্ডচিত্রগুলিও অপূর্ব্ব। আজ এই খণ্ডচিত্রগুলির একটি সংক্ষেপে অনূদিত হইল। [হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ।]

(১) নরমুণ্ড উপহার, নরমাংস বিক্রয় প্রভৃতি সেকালের এক বিশেষত্ব। মালতীমাধব নাটকেও মাধব শ্মশানে নরমাংস লইয়া পিশাচগণকে দিতেছেন বর্ণিত আছে।

(২) যমপট প্রদর্শন প্রাচীন ভারতের এক প্রথা ছিল। মুদ্রারাক্ষস নাটকেও এই যমপট প্রদর্শনকারীর চরিত্র-চিত্র বিদ্যমান।

হইতেছে। কুলদেবতার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। রোগশান্তির জন্য দেবগণকে যে চরু উপহার দেওয়া বিধি, সেই চরু রন্ধন হইতেছে। হোমানলে দধিযুক্ত ঘৃত দ্বারা লিপ্ত দুর্ব্বাপল্লব নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোথাও মহামায়ূরী মন্ত্রপাঠ, কোথাও ভূতপ্রেত যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য উপহার প্রদান, কোথাও শান্তিস্বস্ত্যয়ন বিধান, কোথাও বা সংযমী ব্রাহ্মণের বেদপাঠ হইতেছে। শিবমন্দিরে রুদ্রৈকাদশী মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, নির্ম্মল শিবভক্তগণ সহস্র কলস দুগ্ধে শিবকে স্নান করাইতেছে—সকলেরই উদ্দেশ্য যাহাতে দেবতা প্রসন্ন হন।

প্রাঙ্গণে অধীন রাজমণ্ডলী উপবিষ্ট। প্রভুর অদর্শনে তাঁহারা দুঃখিত। মধ্যে মধ্যে প্রভাকরবর্দ্ধনের কক্ষ হইতে পরিচারকবর্গ নির্গত হইলে তাহাদের নিকট হইতে রাজার সংবাদ জানিতেছেন। নিজেদের স্নান, ভোজন, শয়নের কথা আর মনে নাই। নিজেদের দেহসংস্কারের প্রতিও দৃষ্টি নাই। বসন মলিন। দিন রাত্রি এইরূপে কাটিয়া যাইতেছে।

পরিজন সকল বিভিন্ন কক্ষে, দ্বারপ্রান্তে দলবদ্ধ হইয়া অনুচ্চস্বরে মলিন বদনে কথোপ-কথন করিতেছে। কেহ কোন চিকিৎসকের দোষ বাহির করিতেছে, কেহ অসাধ্য রোগের লক্ষণ সকল বলিতেছে, কেহ দুঃস্বপ্নের বর্ণনা করিতেছে, কেহ পিশাচের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছে। কেহ বা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কি গণনা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিতেছে, কেহ বা অমঙ্গলসূচক কি কি লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছে। কোথাও বা একজন 'সংসার অনিত্য' 'কলিকালের মহাদোষ' 'দৈব কি নির্দ্দয়' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। তখন আর একজন 'ধর্ম্ম কি আর আছে?' 'রাজকুলদেবতাই বা কি করিতেছেন?' বলিতেছে। কোথাও বা আশ্রিত কুলপুত্রগণ আশ্রয়-নাশ-শঙ্কায় নিজ নিজ ভাগ্যের নিন্দা করিতেছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে বিবিধ ঔষধের গন্ধ। অগ্নিতে বিবিধ ঘৃত, তৈল ও কাথের পাক হইতেছে।

তৃতীয় মহলে রাজার কক্ষ। সেখানে পীড়িত রাজা কক্ষমধ্যে শয্যায় শায়িত। সে মহলের দ্বারপথে বহু বেত্রধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তিনগুণ পর্দ্দা দ্বারা কক্ষে কক্ষে যাইবার পথগুলি ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। পক্ষদ্বার সকল রুদ্ধ। গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া প্রবল বেগে বায়ু-প্রবেশ বন্ধ করা হইয়াছে। কবাট উন্মোচন বা বন্ধ করিবার শব্দ নিষিদ্ধ। কাহারও সোপানে উঠিবার সময় পদশব্দ হইলে প্রতিহারী ক্রুদ্ধ হইতেছে। সকল কার্য্য ইঙ্গিতে সম্পন্ন হইতেছে। বাক্য ব্যয় নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাছে শব্দ হয় বলিয়া বর্ম্মধারী পরিচারক বহুদূরে অবস্থিত হইয়াছে। রাজার আচমন জল লইয়া পরিচারক এককোণে বসিয়া আছে, ইঙ্গিত মাত্রেই চকিত হইয়া উঠিয়া আসিতেছে।

অন্তঃপুরে বারাঙ্গনাদের অধর আজ তাম্বূলরাগহীন। কঞ্চুকীরা শোকে সঙ্কুচিত। বন্দিগণ নিরানন্দ। আশাহীন নিকটস্থ পরিচারক নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। চন্দ্রশালিকায় প্রধান ব্যক্তিবর্গ স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন।

রাজবান্ধবসমূহের পত্নীগণ প্রচ্ছন্ন বাতায়ন দিয়া উঁকি দিতেছেন। দারুণ পীড়ার সংবাদে তাঁহারা শোকবিধুর। চতুঃশালিকায় উদ্বিগ্ন পরিজন সকল দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে। মন্ত্রীরা বিমর্ষ। বিষম জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া বৈদ্যেরা ভীত। পুরোহিতগণ বিষণ্ণ। বন্ধু-বান্ধব অবসন্ন। সামন্তরাজগণ সন্তপ্তচিত্ত। রাজার প্রিয় অধীনস্থ ভূপালগণ স্বামীভক্তিতে আহার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণদেহে অবস্থিত। সমস্ত রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলদেহ রাজপুত্রগণ ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। চামরধারিণী হতচেতনা হইয়া বিলুণ্ঠিত, শিরোরক্ষী দুঃখে পাণ্ডুবদন। রাজার কক্ষের নিকটে কেবল অতিশয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

একদিকে বিমর্ষ বৈদ্যগণ পাকশালার অধ্যক্ষকে পথ্যের বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, অপরদিকে দ্রব্যগুণজ্ঞ জনসমূহ ঔষধসমূহ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে।

পীড়িত রাজা ধবল-গৃহে শায়িত। তাঁহার অতিশয় তৃষা। সেই তৃষার কথঞ্চিৎ শান্তির জন্য রাজার সমক্ষে একজন অনুচর আর একজন অনুচরের মুখে উচ্চ হইতে জল ঢালিয়া দিতেছে। রাজার আজ্ঞায় বহু ব্যক্তিকে ভোজন করান হইতেছে। নিজে পানভোজনে অক্ষম, অপরের পানভোজন-দর্শনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেছেন। রাজাও অনবরত শীতলজল পান করিতেছেন। তাঁহার পানের জন্য বিবিধপ্রকার পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। জলপাত্রে তক্র (ঘোল) রাখিয়া পাত্রটি তুষারে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। দেহে স্পর্শের জন্য শলাকায় শ্বেত বস্ত্রখণ্ড স্থাপিত কর্পূরচূর্ণ লেপিত হইতেছে। গণ্ডূষ-গ্রহণের জন্য দধিমণ্ড সংগৃহীত, তাহা নব মৃণ্ময়পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। পাত্রের উপর পঙ্কলেপন করা হইতেছে। একধারে মৃণাল-রাশি, সেগুলি জলার্দ্র নলিনীপত্রে আবৃত। যে স্থলে পানীয়পাত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে সে স্থলটি নীলোৎপল সমূহে আচ্ছাদিত। কোথাও উত্তাপে শোষিত সলিল বারিধারা-পাতে শীতল করা হইতেছে। পাটল বর্ণের শর্করার গন্ধে কক্ষ আমোদিত। কাষ্ঠাধারে জলপূর্ণ বালুকানির্ম্মিত জলাধারের দিকে পীড়িত নরপতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বহুচ্ছিদ্র জলপাত্রের চতুর্দ্দিকে জলার্দ্র শৈবাল বেষ্টিত করা হইয়াছে। মণিপাত্রে লাজ, শক্তু ও কর্কশর্করা রক্ষিত। চারিদিকে শীতজনক ঔষধ প্রক্ষিপ্ত। স্ফটিক, শুক্তি ও শঙ্খনিচয় বিরাজমান। মাতুলুঙ্গ, আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম প্রভৃতি বহু ফল সঞ্চিত হইয়াছে। নানা গ্রাম হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া কক্ষমধ্যে শান্তিজল ছিটাইতেছেন। দাসীরা ললাটে লেপনার্থ পদার্থবিশেষ শিলাতলে চূর্ণ করিতেছে।

নরপতি বিষম জ্বরজ্বালায় অনবরত পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছেন। শয্যার আস্তরণ অনবরত লুণ্ঠনে ভাঁজ হইয়া গিয়াছে। পরি-চারিকাগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মুক্তাচূর্ণ ও চন্দন লেপন করিতেছে। অনবরত কমল, কুমুদ ও ইন্দীবররাশি তাঁহার গাত্রে স্পর্শ করান হইতেছে। মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা; দৃঢ়ভাবে শিরোদেশ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। ললাটে নীল শিরারাশি প্রকটিত, চক্ষুকোটর অন্তঃপ্রবিষ্ট, দন্তশ্রেণী অতিধবল, জিহ্বা কালিমাময়। নরপতি

অনবরত উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার বক্ষে মণি-মুক্তাহার, চন্দন, ও চন্দ্রকান্ত মণি। বেদনায় মধ্যে মধ্যে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন। কখনও কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। বৈদ্যেরা সভয়ে তাঁহাকে দেখিতেছে। তাঁহার কান্তি আর নাই। দেহ ক্ষীণ, নিদ্রাহীন নিশাযাপনে বিবর্ণ। জৃম্ভা ও গাত্রসন্ধিতে বেদনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ নানা রসে লিপ্ত। সজলনয়নে চামরধারিণী চামর-ব্যজন করিতেছে। রাজমহিষী দেবী যশোবতী মুহুর্মুহুঃ মস্তক ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "আর্য্যপুত্র! ঘুমাইলে কি?"

নৃপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন পিতার পীড়ারম্ভের সময় নগরে ছিলেন না। দূতমুখে সংবাদ পাইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্বচালনায় নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন সুষেণ নামক বৈদ্যকুমার রাজপুরী হইতে অপ্রসন্নমুখে বাহির হইয়া আসিতেছে। সুষেণ হর্ষবর্দ্ধনকে নমস্কার করিলে হর্ষবর্দ্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুষেণ! বাবা একটু ভাল ত?" সুষেণ বলিল "এখনও ভাল লক্ষণ কিছু নাই। তবে আপনাকে দেখে যদি কিছু ভাল হয়!" হর্ষবর্দ্ধন একেবারে পিতার কক্ষে উপনীত হইয়া পিতার অবস্থা দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

প্রভাকরবর্দ্ধন দূর হইতে তনয়কে দেখিয়া সেই অবস্থাতেও হাত বাড়াইয়া "আয় বাপ আয়" বলিয়া শয্যা হইতে অর্দ্ধশরীর উত্তোলন করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে নিকটে গিয়া বিনয়ে অবনতশীর্ষ হইলে প্রভাকরবর্দ্ধন বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন এবং অঙ্গে অঙ্গ ও কপোলে কপোল স্পর্শ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়ন নিমীলন করিয়া জ্বরজ্বালা ভুলিয়া গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে হর্ষবর্দ্ধন পিতৃবাহুপাশমুক্ত হইয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে আসনে উপবেশন করিলেন। নরপতি নিমেষরহিত নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন এবং কম্পমান কর দ্বারা পুনঃপুনঃ তনয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "রোগা হয়ে গেছ।" তখন হর্ষবর্দ্ধনের মাতুলপুত্র ভণ্ডি বলিলেন "দেব! রাজকুমার আজ তিনদিন কিছু আহার করেন নাই।"

তাহা শ্রবণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরপতি বলিলেন "বৎস—তুমি পিতাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমার হৃদয়ও অতি কোমল। তোমাতেই আমার সুখ, রাজ্য বংশ ও প্রাণ অবস্থিত। কেবল আমার কেন সকল প্রজার প্রাণ ও সুখও তোমার উপরই নির্ভর করিতেছে। যাও, স্নানাহার কর। তুমি আহার করিলে তবে আমি পথ্য গ্রহণ করিব।"

হর্ষবর্দ্ধন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে পিতা পুনরায় আহার করিতে আদেশ করিলে, সেই ধবলগৃহ হইতে নির্গত হইয়া নিজ গৃহে গিয়া কয়েক গ্রাস অনিচ্ছার সহিত আহার করিলেন। আচমন করিতে করিতে চামর-ধারিণীকে আজ্ঞা করিলেন "জানিয়া আইস

পিতা কেমন আছেন।" সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "দেব! সেইরূপই।" হর্ষবর্দ্ধন এই শুনিয়া তাম্বূল গ্রহণ না করিয়া নির্জ্জনে বৈদ্যগণকে ডাকাইয়া বিষণ্ণহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" তাহারা বলিল "দেব! ধৈর্য্য ধারণ করুন। কতিপয় দিনের মধ্যেই পিতা সুস্থ হইয়াছেন শ্রবণ করিবেন।"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রসায়ন নামক অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক রাজকুলে সংবর্দ্ধিত একজন বৈদ্যযুবা কোনও কথা কহিলেন না। সে প্রভাকরবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সযত্নে লালিত হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ তাহার আয়ত্ত। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। সে অশ্রুপূর্ণনয়নে অধোমুখে নীরব রহিল দেখিয়া হর্ষবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই রসায়ন! কোনও কিছু খারাপ দেখ্‌ছ কি?" সে বলিল "দেব! কাল সকালে জানাইব।"

বৈদ্যেরা চলিয়া গেল। রজনীর প্রারম্ভে হর্ষবর্দ্ধন পুনর্ব্বার ধবল গৃহে গেলেন। সেখানে প্রভাকরবর্দ্ধনের তখন মহান্ প্রদাহ উপস্থিত। তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন "হারিণি! হার আন। বৈদেহি! মণিদর্পণ দাও। লীলাবতি! হিমচূর্ণ ললাটে লেপন কর। ধবলাক্ষি! চন্দনচূর্ণ দাও। কান্তিমতি! চক্ষে চন্দ্রকান্ত মণি স্পর্শ করাও। কলাবতি! কপোলে কুবলয় দাও। চারুমতি! অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দাও। পটলিকে! বস্ত্র দ্বারা ব্যজন কর। ইন্দুমতি! দাহ শান্তি কর। মদিরাবতি! জলার্দ্র অরবিন্দ দ্বারা সুখোৎপাদন কর। মালতি! মৃণাল আন। আবন্তিকে! তালবৃন্ত সঞ্চালন কর। বন্ধুমতি! শিরোদেশ ধারণ কর। ধারণিকে! গলদেশ ধর। তুরঙ্গবতি! বক্ষে সজল হস্ত দাও। বলাহিকে! হস্ত মর্দ্দন কর। পদ্মাবতি! পা টিপিয়া দাও। অনঙ্গসেনে! গাত্র মর্দ্দন কর। বিলাসবতি! কত রাত্রি? কুমুদ্বতি! ঘুম আস্‌ছে না, গল্প বল।"

হর্ষবর্দ্ধন পিতার এইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন তখন নগরে ছিলেন না। তিনি সসৈন্যে হূণবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। প্রভাতে তাঁহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে হর্ষ-বর্দ্ধন উপর্য্যুপরি দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহী দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় হর্ষবর্দ্ধন শুনিলেন তাঁহার সম্মুখে স্থিত বিমলিন তরুণ রাজপুত্রগণ অনুচ্চস্বরে 'রসায়ন' বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "রসা-য়নের কথা কি বলিতেছ?" তাহারা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে তাহারা দুঃখে অতি কষ্টে বলিল "দেব! রসায়ন অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে।" হর্ষবর্দ্ধন এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে অপ্রিয় বাক্য শুনাইতে হইবে বলিয়া রসায়ন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দুঃসহ দুঃখে অভিভূত হইয়া উত্তরীয়ে মুখ আবরণ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন শয্যায় নিপতিত হইলেন। রাজপ্রাসাদে আর গমন করিলেন না।

প্রজাবর্গ সকলে তখন দুঃখে অভিভূত। সকলে গালে হাত দিয়া কাঁদিতেছিল ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'হায় হায়' বলিয়া খেদ

করিতেছিল। তাহাদের নিদ্রা ছিল না। নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ, হাস্য পরিহাস, সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বসন ভূষণ প্রভৃতি সকল উপভোগের বস্তু অনাদৃত। আহার ও পানীয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এই সময় অমঙ্গলসূচক উৎপাত সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ধরিত্রী ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উদ্ঘাত উপস্থিত হইল। দিকে দিকে দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতু সকল দেখা দিল। সূর্য্য দীপ্তিহীন, তাহার মধ্যে কবন্ধকায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। (১) চন্দ্রের চারিদিকে দীপ্ত মণ্ডল দেখা দিল। দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। অকালে মেঘোদয় হইয়া দশদিক অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল বায়ু ভীষণ শব্দে বহিতে লাগিল। পাংশু বৃষ্টিতে আকাশ ধূসর বর্ণ বোধ হইতে লাগিল। উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইল। শিবাগণের মুখে অগ্নি উদ্‌গীরিত হইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদে মুক্তকেশা কুলদেবতাগণের প্রতিমা দৃষ্ট হইল। সিংহাসন সমীপে ভ্রমরমণ্ডলী উড়িতে লাগিল। অন্তঃপুরের উপর বায়সের কর্কশ স্বর অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। শ্বেত রাজহত্রের প্রধান মণি একটা গৃধ্র মাংসখণ্ড ভ্রমে চঞ্চু পুটের আঘাতে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

সেদিন কাটিয়া গেল। তারপর দিন প্রভাতে হর্ষবর্দ্ধনের সমীপে রাজমহিষী দেবী যশোবতীর প্রতিহারী বেলা কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূতলে হস্ত রক্ষা করিয়া অধোমুখী হইয়া বলিল "দেব! রক্ষা করুন্। রক্ষা করুন্। স্বামী জীবিত থাকিতেই দেবী কি করিতে যাইতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে রাজমহিষীগণ অনলে প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে একবার পরিচিতগণের সহিত শেষ সম্ভাষণ করিতেছিলেন। কেহ নিজ পালিত চূতবৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল "বাছা তোমার মা চলিল।" কেহ জাতীগুচ্ছকে বলিল "যাচ্ছি, আজ থেকে তোমায় দেখবার কেউ রইল না।" কেহ অশোক বৃক্ষে পাদপ্রহার করিয়াছিল, দাড়িমলতার পল্লবভঙ্গ করিয়া কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছিল, আজ তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল। কেহ যে বকুলবৃক্ষে গণ্ডুষে করিয়া মদ্য নিক্ষেপ করিত তাহার নিকট গিয়া শেষ দেখা করিল। কেহ প্রিয়ঙ্গুলতাকে শেষ আলিঙ্গন করিল। কেহ পিঞ্জরে স্থিত শুক সারিকার সহিত শেষ সম্ভাষণে রত হইল। কাহারও পালিত ময়ূর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কেহ নিজ পালিত হংসমিথুন অন্যকে পালন করিতে অনুরোধ করিয়া গেল। কেহ চক্রবাক ও চক্রবাকীর বিবাহ দেয় নাই, তজ্জন্য অনুতপ্তচিত্তে বিদায় লইল—সে আর

(১) অনুরূপ বর্ণনা—ভট্টি কাব্য দ্বাদশ সর্গ ৭০ শ্লোক।

বিবাহ দেখিতে পাইবে না। কেহ অনুসরণরত গৃহহরিণকে ফিরাইয়া দিল। কেহ বা শেষবার বীণাকে আলিঙ্গন করিয়া লইল।

সঙ্গীগণ ও পরিচিত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও সকলে বিদায় লইতেছিল। "চন্দ্রসেনে! একবার ভালকরে দেখে নাও।" "বিন্দুমতি! এই শেষ প্রণাম।" "চেটি। পা ছেড়ে দাও।" "আর্য্যে কাত্যায়ণিকে, কাঁদ্‌ছ কেন? দৈব আমায় নিয়ে যাচ্ছে।" "কঞ্চুকি, আমি অলক্ষণা, আমায় প্রদক্ষিণ কর্‌ছ কেন?" "ধাত্রি! ধৈর্য্য ধর। পায়ে প'ড়ো না।" "ভগিনি! একবার গলা জড়িয়ে ধর।" "আহা, মলয়বতীকে একবার দেখ্‌তে পেলুম না।" "সানুমতি! এই শেষ প্রণাম।" "কুবলয়বতি! এই শেষ আলিঙ্গন।" "সখীগণ! প্রণয়বশতঃ কলহ করেছি, ক্ষমা করো।" চারিদিকে এইরূপ আলাপ শ্রুত হইতেছিল।

রাজমহিষী যশোবতী তখন স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাজপুরী হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। সবে মাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছেন—পরিধানে রক্তবাস ও কাঁচলি। কণ্ঠে রক্তসূত্র ও হার। কর্ণে কুণ্ডল। সর্ব্বাঙ্গে রক্তিম কুঙ্কুমরাগ। বলয় স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। গলদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন। পতির অস্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রাজছত্রের সম্মুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সচিবগণকে উপদেশ দিতে দিতে আসিতেছিলেন। চারিদিকে শোকার্ত্ত বন্ধুবান্ধব রোদন করিতেছিল। কঞ্চুকীগণ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তিনিও সজলচক্ষে স্নেহভাজন অনুগত জনগণকে দেখিতে দেখিতে, পশুপক্ষীগুলিকে পর্য্যন্ত শেষ সম্ভাষণ করিয়া ও বৃক্ষগুলিকে পর্য্যন্ত শেষ আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইতেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতার চরণে নিপতিত হইলেন। বলিলেন "মা, আমি হতভাগ্য, তুমিও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ?" দেবী যশোবতী আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে তুলিয়া তাহার নয়ন মুছাইয়া বহুবিধ আশ্বাস দিলেন। বুঝাইলেন, বিধবা হইয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাই বিধবা হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন অধোমুখে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবী যশোবতী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন এবং পদব্রজেই অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। সেখানে দীপ্ত অগ্নিশিখায় পতিব্রতা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন তখন পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন তাঁহারও শেষ মুহূর্ত্ত আসন্ন। নেত্রের তারকা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রভাকরবর্দ্ধন ক্ষীণকণ্ঠে দুই চারিটি উপদেশ দিতে দিতে মরণের অঙ্কে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রোদয় হইলে হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং পিতার শবশিবিকায় স্কন্ধ অর্পণ করিয়া সামন্ত রাজবর্গ, পুরোহিত ও পৌরজনগণের সহিত সরস্বতী-তীরে উপনীত হইলেন। তথায় রাজোচিত চিতায় প্রভাকরবর্দ্ধনের দেহ ভস্মীভূত হইল।

হর্ষবর্দ্ধন সেই রজনী ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার চারিদিকে পরিজনেরা শোকে অভিভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। পিতৃ-দেবের অতুল গুণরাশির কথা চিন্তা করিতে করিতে হর্ষবর্দ্ধন রজনী যাপন করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া তিনি রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্তঃপুরে তখন নূপুর-ধ্বনি নীরব, কেবল কতকগুলি কঞ্চুকী বিচরণ করিতেছে। কক্ষমধ্যে বিষণ্ণ পিতৃপরিজন নিপতিত। রাজহস্তী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। হস্তিপালক অনবরত রোদন করিতেছে। অশ্বপালগণের অবিরাম ক্রন্দনে মন্দুরায় অশ্বনিচয় নীরব। 'জয়' শব্দ আর উচ্চারিত হইতেছে না। রাজপ্রাসাদে কলকল রবও আর নাই।

হর্ষবর্দ্ধন সরস্বতীতীরে গিয়া পিতার উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। পরে স্নান করিয়া, মাথা না মুছিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। চামর, ছত্র পরিহার করিয়া পদব্রজেই ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মৃত নরপতির অতিপ্রিয় ভৃত্য, বন্ধু ও সচিবগণ দারাপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়-গণের নিষেধ না মানিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল। কেহ উচ্চ পর্ব্বত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। কেহ জলন্ত অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিল।† কেহ তীর্থযাত্রা করিল, কেহ কুশশয্যায় অনাহারে শয়ন করিয়া রহিল। কেহ তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে, কেহ বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপত্যকায়, কেহ বা বনে গিয়া মুনিব্রত অবলম্বন করিল। তাহারা শিরে জটা ও পরিধানে গৈরিক বসন ধারণ করিল। কেহ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া কপিলপ্রচারিত মত অনুসরণ করিল।

পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রাচীন কুলপুত্রগণ, গুরুগণ, শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পারদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, বিচক্ষণ অমাত্যগণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীগণ, প্রশান্তচেতা মুনিগণ, ব্রহ্মবাদীগণ ও পৌরাণিককথাকুশল ব্যক্তিগণ হর্ষদেবকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অশৌচদিবসগুলি অতিবাহিত হইয়া গেল। অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণ প্রথমে মৃত নরপতির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডভোজন করিল। ব্রাহ্মণগণকে মৃত নরপতির ব্যবহারার্থ সংগৃহীত শয্যা, আসন, চামর, ছত্র, বস্ত্র, বাহন, শস্ত্র প্রভৃতি বিতরিত হইল। রাজহস্তীকে অরণ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যেখানে নৃপতির চিতা রচিত হইয়া-ছিল সেখানে সুধাধবলিত চৈত্য নির্ম্মিত হইল। নৃপতির অস্থিখণ্ডগুলি তীর্থস্থলে প্রেরিত হইল।

তখন দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে ক্রন্দন মন্দীভূত হইয়া আসিল। বিলাপও বিরল হইল। দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রু-প্রবাহও ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইয়া গেল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

† জাপানের হেরি-কেরি প্রথা স্মরণ করুন।



আলো-ছায়া

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

রেডিয়মের আবিষ্কারকের সহিত সাক্ষাৎকার

(ফরাসী হইতে)

Pantheon-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে, একটা সরু রাস্তা,—অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পরিত্যক্ত; সেই রাস্তার ধারে কতকগুলা কালো-কালো, পলস্তারা-ওঠা ফাট্‌ধরা বাড়ী—তার ধারে নড়নড়ে তক্‌তার একটা পদ-পথ; আর সেই বাড়ীগুলার মধ্যে একটা জঘন্য "ব্যারাক্"-বাড়ীর কাঠের দেয়াল খাড়া হইয়া আছে; ইহাই ভৌতিক-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যার ম্যুনিসিপাল-স্কুল। M. Pierre Curie কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করায় স্কুলের দরোয়ান একটা রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমি একটা অঙ্গন পার হইলাম। সেই অঙ্গনের দেয়ালের উপর নিষ্ঠুর কাল যারপর নাই অত্যাচার করিয়াছে। তারপর একটা নিঃসঙ্গ খিলান; সেই স্থানটা আমার পদ-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তার পরেই একটা স্যাঁতসেঁতে এঁধো গলি; তারই কোণে, কতকগুলা তক্‌তার মাঝখানে একটা আঁকা-বাঁকা মরা গাছ। সেইখানে, শাসি-ওয়ালা, দীর্ঘ, নীচু, কতকগুলা কাঠের ঘর বিস্তৃত; আরও সেইখানে কতকগুলা ঋজু অগ্নি-শিখা ও বিচিত্র গঠনের কতকগুলা কাচের যন্ত্রও দেখিতে পাইলাম। কোন শব্দ নাই; একটা গভীর ও বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা। যদৃচ্ছ-ভাবে উহার একটা দ্বারে আঘাত করিলাম, আঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিল—আর আমি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ লাভ করিলাম। পরীক্ষাগারটি এরূপ সাদাসিধা ধরণের যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহার মেজে মাটি-দিয়া ঘুমুর্‌স-করা ও ঢিবি-বিশিষ্ট; দেয়ালে চুণ বালীর পলস্তারা; লম্বা সরু সরু কাঠের নির্ম্মিত ছাদ; ধূলাচ্ছন্ন জান্‌লার ভিতর দিয়া অতি ক্ষীণভাবে আলোক প্রবেশ করিতেছে।

কতকগুলা জটিল যন্ত্র-সরঞ্জামের উপর ঝুঁকিয়া একজন যুবক কাজ করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া মাথা উঠাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"M. Curie কোথায়?" সে উত্তর করিল—"ঐখানে আছেন।" এই কথা বলিয়াই আবার তাহার কাজে মন দিল। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইল। বড় ঠাণ্ডা। একটা বক-নলের ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছিল; দুই তিনটা গ্যাসের বাতি জ্বলিতেছিল। অবশেষে একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; লম্বা, পাত্‌লা, অস্থিময় মূর্ত্তি, কর্কশ কটা দাড়ী, মাথায় একটা গোলাকার চ্যাপ্‌টা ব্যবহার-জীর্ণ টুপি। ইনিই M. Curie।

হায়! তাঁহার প্রতিধ্বনি-মুখর নবোদিত খ্যাতি তাঁহার অনুশীলন-পথের কি বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। রেডিয়ামের আবিষ্কারক বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নাম জগৎময় প্রচার হইয়া পড়িল, এবং

নোবেল-পুরস্কারের জয়মাল্যধারী সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি অচিরাৎ খ্যাতি-দেবীর অসংখ্য দূতকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি খ্যাতিতে অভ্যস্ত হন নাই। এই খ্যাতি তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল, তাঁহার সময় অপহরণ করিতে লাগিল, তাঁহার প্রয়োগ-পরীক্ষা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল.....লোকে তাঁহাকে সম্মান-চিহ্নে ভূষিত করিতে চাহিতেছিল না কি? সম্মান-চিহ্নের তাঁহার কি-প্রয়োজন? তথাপি,—তাঁহাকে বদ্-মেজাজের লোক বলিয়া ন ঠাওরায় এবং ভাগ্য লক্ষ্মীর উৎপাড়নে স্বীয়া অন্তরের উদ্বেগ না প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই মনে করিয়া তিনি যাহাতে দিনের মধ্যে কোন এক সময় অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আপনাকে পরের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন তাহার সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন.....প্রাতঃকাল? —অসম্ভব; অপরাহ্ণ?—অসম্ভব; সায়াহ্ণ? —অসম্ভব। ঈষৎ বক্রীভূত শ্মশ্রুরাশি হস্তের দ্বারা আলোড়িত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "একটু অপেক্ষা কর"—এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু এবার আট-পৌরে পরিচ্ছদ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার মাথায় যে ব্যবহার-জীর্ণ একটা বিশ্রী টুপি দেখিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে একটা নরম ফেল্টের টুপি পরিয়াছেন এবং কোর্ত্তার উপর একটা হাতা-হীন জোব্বা পরিয়াছেন: পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া এবং প্রয়োগ পরীক্ষার টেবিলের উপর হাতের কনুই রাখিয়া তিনি বলিলেন; "আমি আপনাকে পনর মিনিটের সময় দিতে পারি।"

তাঁহাকে এইবার পাকড়াইয়াছি মনে করিয়া নিজেকে আমি অভিনন্দন করিলাম; ইঁহার নিকট হইতে এইবার কিছু বৈজ্ঞানিক সংবাদ আদায় করিতে হইবে, মঃ-ক্যুরি আপনা হইতে কখনই ত আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন না। আত্মসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে জানেন না—সে কৌশল তাঁহার নাই। উত্তরে তিনি কেবল "হাঁ" বলেন, "না" বলেন, একটু মাথা নোয়ান—তা ছাড়া আর কিছুই না।

আমি বলিলাম:—শ্রীমতী ক্যুরি সকল সময়েই আপনার সহকর্ম্মিণীরূপে আপনার সঙ্গে একত্র কাজ করিয়াছেন—না? আমার বোধ হয় উনি পোলাণ্ডের লোক, এবং সেখানকার বিদ্যা-পরিষদের বিজ্ঞান-বিভাগে আপনার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়; অথবা হয়ত এইখানেই হইয়াছিল—যে সময়ে আপনি, M. Schutzenberger-এর পরিচালনাধীনে পরীক্ষা-কার্য্যাদির কর্ত্তা ছিলেন। আমি যদি না ভুলিয়া থাকি,—বোধ হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী কুরি ভৌতিক বিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন, এবং সেই সময়ে Radio-active বস্তুগুলি সম্বন্ধে তিনি একটি সন্দর্ভ লেখেন। এখন তিনি, Sevres-এ অধ্যাপক—না?"

—"হাঁ"—তিনি বলিলেন "হাঁ"।

আবার আমি বলিলাম:—"আর আপনি ১৮৮০ হইতে এইখানেই কাজ করিতেছেন—অনেক গুরুতর বৈজ্ঞানিক আলোচনা

ক্রমাগত প্রকাশ করিয়াছেন, "Institute"-কর্ত্তৃক অনেকবার আপনি জয়মাল্যও প্রাপ্ত হইয়াছেন। একথা কি সত্য নহে?"

—"হাঁ," শুধু তিনি বলিলেন—"হাঁ"।

ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর উত্তর লাভের আশায় তৃষিত হইয়া, আমি ব্যক্তিগত ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষান্ত হইলাম। দেখিলাম, এইরূপ প্রশ্নে তিনি যেন একটু সংকোচ অনুভব করেন.....অতিনম্রতার মধ্যে গর্ব্বের সাদৃশ্য থাকিতে পারে।

রেডিয়মের সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে, তাঁহার যে একটু বেশী মুখ ফুটিবে না, ইহা অসম্ভব.....পণ্ডিতের প্রচণ্ড উৎসাহ বোধ হয় মানুষের ভীরুতার উপর জয়লাভ করিবে। তাই হঠাৎ আমার মুখ হইতে একটা প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়িল:—কিরূপ প্রয়োগ-পরীক্ষার ফলে আপনি এই আশ্চর্য্য পদার্থটির আবিষ্কার করিলেন—যে-পদার্থের ধর্ম্ম কতক-গুলি মূল-নিয়মকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে?" এক কথায় তিনি আমাকে থামাইয়া দিলেন: —"আমি আপনাকে একটা পুস্তিকা দিতেছি।"

অমনি তিনি কয়েক পদ দূরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আর হাত বাড়াইয়া আমাকে একটা উদ্ঘাটিত পুস্তিকা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন:— এই দেখুন!

আমি সুবাধ্য সুবোধ বালকের ন্যায় উহা পড়িতে লাগিলাম। তা ছাড়া আমি আর কি করিতে পারি? পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া

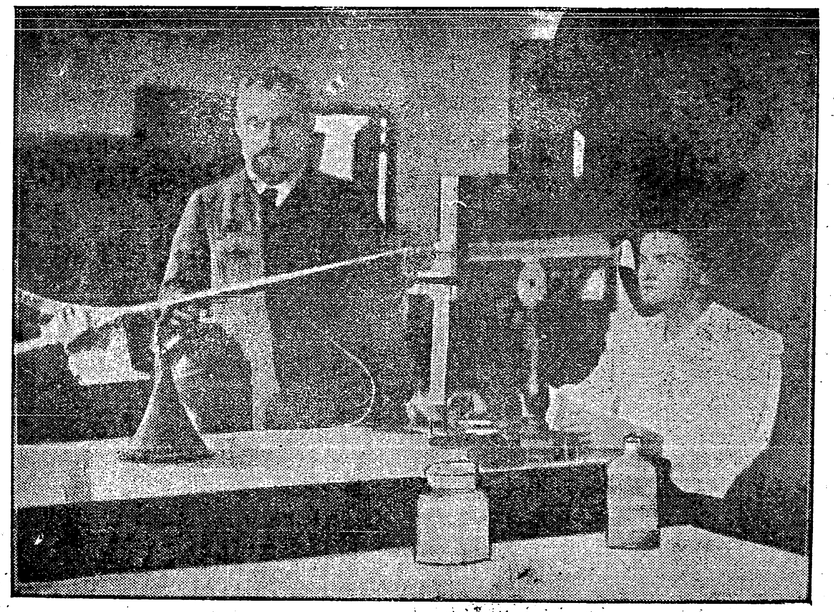

শ্রীমতী ক্যুরী

আমি জানিতে পারিলাম—Becquerel যে Uranium-রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শ্রীমতী ক্যুরি তাহার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঐ রশ্মি হইতে যে কতকগুলি পরীক্ষিত ফল তিনি প্রাপ্ত হন, সেই পরীক্ষার ফলগুলি তাঁহার স্বামীর গোচরে আসিলে, এই বিষয়ে তাঁহার স্বামীর খুব একটা ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি আপনার কাজ ছাড়িয়া, তাঁহার পত্নীর কাজে যোগ দিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই প্রশ্নটি করিলেন, য়ুরানিয়মের কতকগুলি ধাতুর যদি এইরূপ কিরণ-নিঃসারণের শক্তি থাকে, তবে স্বল্প পরিমাণে তাহাদের মধ্যে আরও এমন কতকগুলি অজ্ঞাত পদার্থ কি থাকিতে পারে না যাহার কিরণ-নিঃসারণী শক্তি আরও প্রবল। এই পদার্থগুলি তাঁহারা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ২৭ মণ পরিমাণ Pechblende ধাতুর ভিতর এক গ্রেণের কিছু বেশী রেডিয়ম থাকে। এবং এই অল্প পরিমাণ রেডিয়ম বাহির করিতে ২০০০০ ফ্র্যাঙ্ক খর্চ্চা পড়ে। যে য়ুরানিয়মের ধাতু হইতে রেডিয়ম বাহির হয়, সে সকল ধাতু ধরণীপৃষ্ঠে অতীব বিরল। বোহেমিয়া দেশের একটিমাত্র কারখানায় এই ধাতুর ব্যবহার আছে—ইহা হইতে কতকগুলি পীতবর্ণ রং বাহির করা হয়। এই রং শ্রমশিল্পের কাজে লাগে। আমেরিকায় ইহার আর একটি কারখানা আছে, কিন্তু ঐ কারখানার ধাতুগুলি ততটা সমৃদ্ধ নহে। কেননা, এক গ্রেণ রেডিয়াম বাহির করিতে হইলে ৪০৫ মণ পরিমাণের ধাতু আবশ্যক হয়।

আমার পাঠ শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার এখানে কি পরিমাণ রেডিয়ম আছে?"

টেবিলের ধারটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বরাবর টেবিলের উপর ভর দিয়া ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যেন একটু হৃষ্ট হইয়াছেন এই ভাবের একটি স্মিতহাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। আমার এই কথাবার্ত্তায় তিনি প্রায় নীরব হইয়াছিলেন; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে নাই। এইবার যেন তাঁহার রূঢ়তা একটু কমিল—একটু বেশী মুখ ফুটিল। তিনি বলিলেন:—

"আমাদের নিকট এক গ্রেণ মাত্র রেডিয়ম আছে। উজ্জ্বল দিবালোকে দেখিলে মনে হয় যেন কোন-একপ্রকার লবণ; কেবল অন্ধকারে উহা ভাস্বর হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যেন একটা জোনাকি পোকা। কিন্তু ইহার ক্ষয় নাই। উহা হইতে সমধিক পরিমাণে ও অবিরতভাবে শক্তি বিমোচিত হইলেও উহার অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। এক গ্র্যাম রেডিয়ম হইতে প্রতি ঘণ্টায় এতটা তাপ বাহির হয় যে তাহার দ্বারা সমান ওজনের বরফ গলিয়া যাইতে পারে। তথাপি এই এক গ্রেণ রেডিয়ম একই ভাবে থাকে। এত যে তাপ ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতেছে তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোনপ্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয় না। অতএব ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আমরা এই এক গ্রেণ রেডিয়ম লইয়াই আমাদের সমস্ত প্রয়োগ-পরীক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।"

এইবার হঠাৎ যে তিনি একটু বাচাল হইয়া উঠিয়াছেন—এ সুযোগ ছাড়া নহে। এতটা বাচালতা আমি প্রত্যাশা করি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, এইবার আমার কথা তাড়াতাড়ি বুঝি শেষ করিতে হইবে। এখন তাহার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রেডিয়ম হইতে যে রশ্মি বাহির হয় তাহার প্রখরতা কি খুব বেশী? বোধ হয় য়ুরেনিয়মের রশ্মি অপেক্ষা ১০ লক্ষগুণ বেশী? এবং ইহার গুণও বোধ হয় য়ুরেনিয়মের মতই সংখ্যাবহুল ও বিস্ময়জনক?"

আলখাল্লার পকেটে হাত গুঁজিয়া এইবার তিনি একটু আগিয়া আসিলেন। বলিলেন; "হাঁ"।

আর আমি যে মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার বিস্ময়োক্তি করিতেছিলাম তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি—খুব তাড়াতাড়ি—রেডিয়মের কিরণ-নিঃসারণী শক্তির প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলি বিবৃত করিলেন। তিনি অন্ততঃ মনে করিয়াছিলেন, ঐ কথাগুলি শুনিলেই আমি ক্ষান্ত হইব—আমার মুখ বন্ধ হইবে।

তিনি আমাকে এইরূপ বুঝাইলেন:—দেখিবেন খুব অল্পদিনের মধ্যেই, এই কিরণগুলি ফোটোগ্রাফ্-প্লটের উপর ছাপ ফেলিবে; ঐ কিরণের সম্মুখে একটা পর্দ্দা ধরা যাইতে পারিবে; পর্দ্দা যতই অস্বচ্ছ হউক না কেন, উহা ঐ কিরণ শোষণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। যে বায়ুর মধ্য দিয়া উহা যাইবে সে বায়ু তড়িৎ-পরিচালক হইয়া উঠিবে।

ফটোগ্রাফি-ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপর আলোক যে ক্রিয়া প্রকটিত করে, রেডিয়মের কিরণও সেই ধরণে ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া থাকে। কাচকে বেগ্‌নি রঙে বা শ্যামবর্ণে রঞ্জিত করে; কাগজকে, Celluloidকে পীতাভ করিয়া তুলে; কাগজকে ফাড়িয়া ফেলে। একটা অস্বচ্ছ বাক্সের মধ্যে, মোটা জমাট-কাগজে, ধাতুতে, একটু রেডিয়মের লবণ অর্পণ কর দেখি;—দেখিবে, উহা তোমার চোখের উপর ক্রিয়া প্রকটিত করিতেছে,—একটা আলোকের অনুভূতি উৎপাদন করিতেছে। এই ফলটি পাইবার জন্য,—যে বাক্সের মধ্যে রেডিয়ম-লবণ আছে, সেই বাক্সোটি তোমার নিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে রাখ, অথবা কপালের রগে ঠেকাইয়া রাখ, দেখিবে, রেডিয়ম-রশ্মির প্রভাবে, তোমার চোখের ভিতরটা ফস্‌ফরস্-ধর্ম্মী আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। সে আলোকের সূত্রস্থান চক্ষের মধ্যেই অবস্থিত। রেডিয়মের রশ্মি গাত্রচর্ম্মের উপরেও কাজ করে; যদি একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রেডিয়ম পূরিয়া সেই শিশিটি গাত্রচর্ম্মের উপর কয়েক মিনিট ধরিয়া রাখ,—তোমার বিশেষ কোন অনুভূতি হইবে না; কিন্তু ১৪।১৫ দিন পরে, ঐ যায়গাটা লাল হইয়া উঠিবে, তাহার পর ঐখানকার চামড়াটা পোড়া-পোড়া হইয়া যাইবে। যদি রেডিয়ম উহার উপর একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া কাজ করে, তাহা হইলে একটা ক্ষত গড়িয়া উঠিবে—এবং সে ক্ষত সারিতে অনেক মাস লাগিবে। আমার বাহুর উপর এই ধরণের একটা ক্ষত আছে। রেডিয়ম-রশ্মি স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের উপরেও কাজ করিয়া থাকে—এবং তাহার ফলে

পক্ষাঘাত ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। জীবিত ব্যক্তিদের যে সকল পেশী-তন্তু পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, সেই সকল পেশী-তন্তুর উপরে এই রশ্মি অপূর্ব্ব প্রখরতার সহিত কার্য্য করে।

মঃ-ক্যুরি পকেটহইতে ঘড়ী বাহির করিয়া একবার দেখিলেন, তাহার পর আবার আরম্ভ করিলেন ;—লোকে যে বলিয়া থাকে, রেডিয়মের সাহায্যে অন্ধ চক্ষু ফিরিয়া পায় —সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। লোকের আরও এই বিশ্বাস, উহা দ্বারা ক্যান্‌সার-রোগ আরাম হইতেছে। আরোগ্যলাভের আশায় কত ক্যানসার-রোগী যে আমাদের পত্র লিখিতেছে তার সংখ্যা নাই। ইহা বড়ই কষ্টজনক।—না, না, এখনও তা হয় নাই.....হয় ত এমন একদিন আসিবে যখন উহার দ্বারা ক্যানসার আরাম হইবে।

সম্প্রতি প্যাষ্টার ইন্‌ষ্টিটুটে, ফ্রান্সের কলেজে, ক্যান্‌সারের চিকিৎসায় রেডিয়ম-রশ্মিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার মধ্যে এইটুকুমাত্র সত্য।

আবার তিনি ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন ; তাঁহার সুখের হাসিটী তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে পলায়ন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার শিষ্যের সমীপে গিয়া তাহার কাজে আবার যোগ দিলেন। তাঁহার শিষ্য বরাবর সেই জটিল যন্ত্রজালের উপর এতক্ষণ ঝুঁকিয়া ছিল। মঃ-ক্যুরি বলিয়া উঠিলেন ;—এইবার শেষ হইয়াছে !

কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার এক বন্ধু নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন।

বন্ধু একটু পরিহাস ও মধুর মমতা সহকারে বলিলেন ; —

—ওহে তুমি ত এখন বিখ্যাত হয়ে উঠেছ।

মঃ ক্যুরি বাহুদ্বয় আন্দোলন করিয়া উত্তর করিলেন ;—আঃ ! আঃ !

সামান্য দুই অক্ষরের অব্যয় শব্দে অতটা হৃদয়ের ভাব কেমন করিয়া প্রকাশ হয় আমি ত এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্রোতের ফুল

মথুরাপুরের দশ-আনির জমিদার হরি-বিহারী বাবুর অন্দরমহলের দেউড়িতে একজন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া আগমনী গান গাহিতেছিল—

"পুরবাসী বলে রাণী, তোর হারা তারা এল ঐ।
অমনি পাগলিনীপ্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কৈ আমার উমা কৈ ?"

সেই সময়ে অন্দরের ছাদের উপর একজন বিধবা একাকী বড়ি দিতে দিতে সেই গান শুনিতেছিলেন।

বিধবার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয় ; একহারা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা ; তাঁহার মুখশ্রীতে দুঃখ-অসন্তোষের একটি মলিন বিষণ্ণ কঠোরতার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের একটি

জ্যোতি কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মতো ফুটিয়া রহিয়াছে।

শরতের প্রভাত। শারদাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যই যেন এই গৌরবর্ণা বিধবা সদ্যস্নাত শুচি অবস্থায় শাদা ধবধবে থান কাপড় পরিয়া রৌদ্রকিরণে পিঠ দিয়া রূপার কাঁশিতে কলায়ের দাল-বাঁটা লইয়া শারদ-লক্ষ্মীর পূজার বড়ি দিতেছিলেন। চারিদিকে সমস্তই শুভ্র শুচি। বিধবার সুগৌর হস্তের ক্ষিপ্র তাড়নায় শুভ্র দাল-বাঁটা শুভ্রতর হইয়া সমুদ্রফেনের ন্যায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, এবং বিধবা অমনি বিছানো নূতন চটের উপর চুনকামকরা মঠমন্দিরের মতো সুঠাম সুডৌল বড়িগুলি সারি গাঁথিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া বসাইয়া দিতেছিলেন।

বড়ি দেওয়ার দিকে কিন্তু বিধবার মন ছিল না। ভিখারীর আগমনী গানে বঙ্গের মাতা ও কন্যার চিরন্তন প্রতিনিধি মেনকা ও উমার সোহাগ-পুলকের কাহিনীর স্পর্শে তাঁহার অন্তরে যে শুভ্র নির্ম্মল ভাবরাশি ফেনার মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, তাহারই দিকে তাঁহার মন পড়িয়া ছিল। এই আদর্শ মাতা-কন্যার আদর-আব্দার, অভিমান সোহাগ, অন্তরে অন্তরে কল্পনায় অনুভব করিয়া আপনার অজাত কন্যার কল্পিত মমতায় শরতেরই শিশিরসিক্ত কুবলয়ের মতো তাঁহার চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিতেছিল।

সেইখানে বছর তিনেকের ছোট্ট একটি মেয়ে সোনার মত ফুটফুটে, ননীর মতো নরম, মৃণালের মতো গোলগাল, এক-গা সোনার গহনা পরিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া একটি খাঁদা বোঁচা কাঠের পুতুলের সঙ্গে অনর্গল বকিয়া বকিয়া আপনার ভাবীকালের সন্তানটিকেই আদর করিতে শিখিতেছিল।

মেয়েটি কি মনে করিয়া বিধবার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হঠাৎ আপন মনেই বলিতে লাগিল—কুলি-মা বলি দেবে, আল বিনি কাবে ! কুলি-মা বলি দেবে, আল বিনি কুলকুল কলে কাবে !—না কুলি-মা ?

বিধবা তাহার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—না বিনু, ও কথা বলতে নেই। এ বড়ি দুগ্‌গা ঠাকুরের। আগে ঠাকুর খাবে, তার পর বিনি পেসাদ খাবে। কেমন ?

ইহা শুনিয়া বিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আগে থাকুল কাবে, তা'পল বিনি পেচাদ কাবে। না কুলি-মা ?

—হ্যাঁ, বিনি আমার লক্ষ্মী মেয়ে।..... আমি বড়ি দি, তুমি চুপটি করে' বসে বসে দেখ, কথা কয়ো না। কেমন ?

বিনি ঘাড় কাত করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া আপনার দারুময় সন্তানটির প্রতি শিশু-জননীর অকপট-স্নেহ-সিঞ্চিত সমস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কোলে শোয়াইয়া কোল নাচাইতে নাচাইতে সুর করিয়া ছড়া বলিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল—

দুত্ত মেয়ে ঘুমুলো,
পালাতি দে দুরুলো ;
আয় ঘুম আয়,
আমাল চোনাল চোকে ঘুম আয় !

এই শিশু-জননীর মাতৃত্বের অভিনয় দেখিয়া আর আগমনী গান শুনিয়া খুড়িমার অন্তরের নিষ্ফল নিরবলম্ব মাতৃস্নেহ উদ্বেল

হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার সেই ক্ষুধিত স্নেহ কাহাকেও অবলম্বন করিবার ব্যাকুলতায় অক্ষিপল্লবে অশ্রুরূপে বার বার দুলিতে লাগিল এবং খুড়িমা তাড়াতাড়ি তাহা অঞ্চলে মুছিয়া মুছিয়া ফেলিতেছিলেন।

এমন সময় নীচের তলায় একটা কলরব উঠিল; বহু কণ্ঠ একই সঙ্গে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—ও রোহিণী, রোহিণী, ও রোহিণী, ও কার চিঠি রে?

জমিদারের অন্তঃপুরে চিঠিপত্র সচরাচর সাত দেউড়ি ডিঙাইয়া প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। যদি কালে-ভদ্রে জমিদার-গৃহিণীর নামে এক-আধখানা চিঠি দুঃসাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না; কে সেই চিঠি পড়িয়া জটিল অক্ষরজাল হইতে কুণ্ঠিত মর্ম্ম-টুকুকে উদ্ধার করিয়া শুনাইবে, তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। চিঠি আসিলে ভুবন সরকারকে ডাক পড়ে; সে এত্তেলা পাঠাইয়া অন্দরে আসিয়া দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী চিঠির-মালিককে চিঠির মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া শুনাইয়া দিয়া যায়।

সুতরাং রোহিণী দাসীর হাতে চিঠি দেখিয়াই পুরন্ধ্রীরা সচঞ্চল হইয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল—ও কার চিঠি।

রোহিণী গম্ভীর ভাবে বলিল—এ চিঠি খুড়িমার।

খুড়িমার বড়ি দিবার একাগ্রতা নষ্ট হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া ছাদের আল্‌সের উপর ঝুঁকিয়া নীচে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন; তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া নিবিষ্টমনে বড়ি দিতে বসিলেন, যেন তাঁহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্যের কারণ ঘটে নাই। কারণ জমিদারের অন্তঃপুরে আশ্রয় যেদিন হইতে পাওয়া ঘটে সেইদিন হইতে বাহিরের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে হয়; বাহিরের সংবাদ পাইবার ব্যাকুলতা থাকে সকলেরই, কিন্তু অধিকার থাকে না কাহারও।

তাই নীচেকার পুরমহিলাদের আগ্রহ কলরবে বাড়িয়া উঠিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমাকে আবার কে চিঠি দিলে? খুড়িমার তিনকুলে কেউ আছে নাকি?

রোহিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কে আছে না-আছে তা আমি কেমন করে জানব? আমি জানও নই, খুড়িমার একপ্রাণও নই।

রোহিণীর রকম দেখিয়া প্রশ্নকারিণী চুপ করিয়া গেল; আর কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

একজন কে গিন্নি ধরণের মোটা গলায় বলিলেন—ও চিঠি আমার বিপিন দিয়েছে হয়ত। নইলে ছোট বৌকে আর কে চিঠি দিবে?

তখন আবার কলরব উঠিল—দে রোহিণী চিঠি দে.....খুড়িমাকে দিয়ে আসি.....

ছোট ছোট বালকবালিকারা পর্য্যন্ত রোহিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া চিঠি কাড়িবার জন্য লাফাইতে লাফাইতে চেঁচাইতেছিল—রোহিণী, রোহিণী, আমায় দে।.....ও রোহিণী আমায় দে।.....ওকে দিসনে আমায় দে।.....

রোহিণী বাঁ হাতে চিঠিখানি মাথার উপরে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ডাহিন হাতে

ছেলের ভিড় সরাইতে সরাইতে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—নে নে সব থাম।.....আমি যদি কাছারী-বাড়ী থেকে বয়ে আন্‌তে পেরে থাকি ত আমিই খুড়িমাকে গিয়ে দিতে পারব। .....ও খুড়িমা, তুমি কোথায় গো?...

রোহিণী কথা টানিয়া সুর করিয়া ডাকিল।

তখন খুড়িমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছাদের আল্‌সের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন—কি রোহিণী ডাকছিস কেন? আমি এই ছাতে বড়ি দিচ্ছি।

রোহিণী একখানা খামের চিঠি উঁচু করিয়া ধরিয়া খুড়িমাকে দেখাইয়া একটু মিহি সুর টানিয়া বলিল—তোমার চিঠি এয়েচে!

খুড়িমা কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখাইয়া বলিলেন—কাগে বড়ি খেয়ে যাবে, তুই এখানে দিয়ে যা না মা রোহিণী।

হেলিতে দুলিতে রোহিণী ছাদে আসিল। সে জমিদার-বাড়ীর সেরা চাকরাণী। স্বয়ং জমিদার বাবুও না কি এককালে তাহার নিতান্ত বশীভূত ছিলেন। তাঁহার উপর ইহার প্রভাব এখনো একেবারে লোপ না পাওয়ার সন্দেহে চাকর দাসী আশ্রিত পরিজন সকলেই তাহাকে একটু খাতির করিয়া সমঝিয়া চলে। তাহার আঁটসাঁট চেহারা; মেটে রং, সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় থাকার দরুণ পালিশকরা বাদামী জুতার মতো চকচকে; দুটি গালে মেচেতার কৃষ্ণচক্র; দাঁতগুলি মিসির প্রসাদে একেবারে আতার বিচির মতো। তাহার উপর হাতে সোনার মোটা অনন্ত; মণিবন্ধশূন্য, যেহেতু সে বিধবা। গলায় সোনার দমা হার; কোমরে সোনার বিছে, পাতলা কাপড়ের ভিতর হইতে চিকচিক করিতেছে—এ ত আর সখের জন্য পরা নয়, সে বিধবা মানুষ তাহার বাহারের দরকার কি? চাবিকাঠিটাও দিনে পঞ্চাশ বার হারায়, তাই কোমরে একগাছা সুতার ঘুনসি না রাখিয়া একটু সোনা রাখিয়াছে, সময়ে অসময়ে কাজ দিবে, মানুষের গতরের কথা ত বলা যায় না; তাহার মুড়া চুলগুলি ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, আর দুই হাত অনাবৃত রাখিয়া তাহার আঁচল কোমরে জড়ানো; ছোট ছোট চোখ দুটি দম্ভভরে কাহারো প্রতি দৃক্‌পাত করিতে চাহে না; কিন্তু যাহার প্রতি একবার তাহার শুভদৃষ্টি পড়ে তাহার তখন শনির দৃষ্টিও শ্লাঘ্য বলিয়া মনে হয়।

রোহিণীর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে বৌ ঝি দাসী চাকরাণী অনেকেই ছাদে আসিয়া সকৌতুকে খুড়িমার দিকে দেখিতে লাগিল। আজ এই অসাধারণ ঘটনায় খুড়িমা যেন রাজান্তঃপুরের ভিড়ের ভিতর হইতে নূতন করিয়া সকলের দৃষ্টিতে পড়িতেছেন।

বালক বিনোদ তাহার সঙ্গী পাঁচুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ ভাই পাঁচু, মেয়েমানুষেরও চিঠি আসে?

পাঁচু তাহার দশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন এই অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিয়াছে। তাহার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এরূপ ব্যাপার আজ এই প্রথম। সুতরাং সে তাহার প্রশ্নকারী সঙ্গীকে সাহস করিয়া কোনোই সদুত্তর দিতে পারিল না। পাঁচু খুব গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিল—হুঁ! আশ্চর্য্য বটে, মেয়েমানুষেরও চিঠি আসে!

খুড়িমা বাঁ হাতে করিয়া চিঠিখানি লইয়া চকিতে একবার দেখিয়া লইলেন, এ কাহার হাতের লেখা। এ লেখা তাঁহার পরিচিত নহে। তার পর যেন নিরুপায়ের স্বরে বলিলেন—আমায় আবার কে চিঠি লিখলে? কাকে দিয়েই বা পড়াই?.....বাবা পাঁচু, তুই পড়তে পারবি?

খুড়িমা অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানিতেন। তাঁহার স্বামী একালের তন্ত্রের লোক, তিনি স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। কিন্তু স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সে পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খুড়িমা জমিদার হরিবিহারী বাবুর সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ; তাঁহাকে অপুত্রক অসহায় দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া হরিবিহারী তাঁহার অভিভাবক হন; কিছুদিন পরেই তাঁহার সমস্ত জমিদারী, এমন কি স্বামী-শ্বশুরের ভিটাটুকু পর্য্যন্ত, যখন না জানি কেমন করিয়া হরিবিহারীর নিকট বিক্রয় হইয়া গেল, তখন খুড়িমাকে বাধ্য হইয়া হরিবিহারী বাবুর সংসারেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই জমিদার-বাড়ীতে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন এখানে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাটা ভয়ানক নিন্দার কথা; এখানকার মেয়েপুরুষের ধারণা যে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখিলে বিধবা, এমন কি অসতী হয়; গৃহলক্ষ্মীদের বাণীসেবা দেখিলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন; তখন হইতে খুড়িমা তাঁহার স্বল্প বিদ্যাও ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সযত্নে সকলের কাছে নিজের অক্ষর-জ্ঞান পর্য্যন্ত গোপন রাখিতেন। এই চিঠি-খানি পাইয়া যদিও তাঁহার কৌতূহল হইতে-ছিল ফস করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেখেন কে তাঁহাকে অকস্মাৎ চিঠি লিখিল, তথাপি তিনি সে কৌতূহল দমন করিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে সেখানে উপস্থিত পুরুষদিগের মধ্যে বর্ষীয়ান্ ও জ্ঞানে গরীয়ান্ পাঁচুর শরণাপন্ন হইলেন।

দশ বছরের ছেলে পাঁচু। মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে সে। পাঁচুঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে কোলে লইয়া পূজা দিবার মানত করিয়া, কত কবচ মাদুলি পরাইয়া তুকতাক করাতে শত্রুমুখে ছাই দিয়া যেটের কোলে পাঁচু এই দশ বছরে পা দিয়াছে। তাহার মাথাটি প্রকাণ্ড, শরীরটি কৃশ, পেটটি বাতাসভরা ফুটবলের মতো, গলায় একগাছি ময়লা ঘুনসিতে অনেকগুলি মাদুলি—কোনো-টার মৃদঙ্গের মতন আকার, কোনটার ঢোলের মতন, কোনোটা হরিতকীর মতন শিরাতোলা, কোনোটা বা চৌপলা যশমের মতন; তাহার কোনোটা তামার, কোনোটা লোহার, কোনোটা রূপার, কোনোটা সোনার, কোনোটা অষ্টধাতুর এজমালি; মাদুলির সঙ্গে একটা সোনায় বাঁধানো আমড়ার আঁঠি, ও একটা ঘসা ফুটো পয়সা; মাদুলি-গুলির অষ্টেপৃষ্ঠে পাঁচুর পোকাধরা ক্ষয়া দাঁতের অত্যাচার-চিহ্ন অঙ্কিত। পাঁচুর মাথায় মানতের বড় বড় চুল, স্থানে স্থানে ছড়া ছড়া জট বাঁধিয়া তেঁতুলগাছে তেঁতুলের মতো নড়নড় করিয়া ঝুলিতেছে; অবশিষ্ট চুল চিপি করিয়া খোঁপা বাঁধা। তাহার ডাহিন হাতে সুতার তাগা, পায়ে লোহার বেড়ি, ডাহিন নাকে সোনার মাকড়ি। এমনি করিয়া অষ্টেপৃষ্ঠে রশারশি কষিয়া, সর্ব্বাঙ্গে নোঙর বাঁধিয়া কোনো মতে বেচা-

রাকে এই ভবসমুদ্রের তুফান হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু যমের দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে পাঁচুকে ইংলোকে টানিয়া রাখিবার জন্য এত রকম বন্ধনও তাহার স্নেহ-শঙ্কাতুর মাতার কাছে যথেষ্ট মনে হইত না।

এহেন পাঁচু, খুড়িমার চিঠি পড়িবার আমন্ত্রণ পাইয়া এত লোকের মধ্যে আপনার বিশেষ গৌরব অনুভব করিল। উৎসাহে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁ পারব খুড়িমা।

সকলে অবাক হইয়া পাঁচুর মুখের দিকে চাহিল। পাঁচুর এই অত্যাশ্চর্য্য সাহস দেখিয়া সকলে পাঁচুকে মনে মনে অভিনন্দন করিল—কোথায় কে কাগজের উপর যা-ইচ্ছা-তাই কালির কি হিজিবিজি আঁচড় কাটিয়াছে, আর পাঁচু এখান হইতে তাহার মনের কথাটি হুবহু বলিয়া দিবে। এ আর হারাধন দৈবজ্ঞের চেয়ে কম কি হইল। আহা, ছেলেটা বাঁচিয়া থাকিলে যে, একজন হাকিম হইয়া লোকের মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়া সুবিচার করিবে, সে বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ রহিল না। সকলের সপ্রশংস ভাব দেখিয়া পাঁচুর মায়ের মন, পাঁচুর মনেরই মতো, আনন্দে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়া-ছিল; সেও আপনার ছেলের দিকে স্নেহ-গর্ব্বমিশ্র সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

পাঁচু পরম বিজ্ঞের মতন গম্ভীর ভাবে চিঠিখানা হাতে লইয়া মহা ফাঁপরে পড়িল—খাম হইতে চিঠি বাহির করিবে কেমন করিয়া। সে কোন্ পথে ব্যূহভেদ করিয়া বন্দী চিঠিকে উদ্ধার করিবে তাহাই স্থির করিবার জন্য খামখানি লইয়া দুচারবার উল্টাপাল্টা করিল। তাহার মা সন্তানের বিপদ বুঝিয়া বলিল—দে, আমি খুলে দিচ্ছি।

মায়ের এই সাহায্যদানে পাঁচু আরামও অনুভব করিল এবং এত লোকের সামনে নিজের অক্ষমতা ধরা পড়াতে একটু লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণও হইল; মাতার উপর রাগও হইল, কেন সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে চিঠি কাড়িয়া লইল—পাঁচু আর একটু ভাবিবার সময় পাইলেই গোটা খামের পেট হইতে চিঠি বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিত। খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠি বাহির করিতে কে না পারে? পাঁচুকে বলিলেই হইত, খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাহার একটুও দেরী লাগিত না।

মা চিঠি বাহির করিয়া দিলে পাঁচু চিঠি প্রসারিত করিয়া ধরিয়া দেখিল চিঠির অক্ষর-গুলার ছাঁদ তাহার বর্ণপরিচয়ের অক্ষরের সহিত একটুও মেলে না; অক্ষরগুলা কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পরস্পরে পুঁটুলি পাকাইয়া গিয়াছে তাহার সূত্র সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াও কিছুতেই আবিষ্কার করিতে পারিল না। এর চেয়ে সে তালপাতে ঢের বড় বড় আর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া থাকে। পাঁচু পাঠে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে চিঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ছাই লেখা! ক্ষুদ্দি ক্ষুদ্দি, এমন এমন জড়ানো!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ভঙ্গি দ্বারা জড়ানো লেখার ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

ইহা দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। হাসির ধাক্কা পাইয়া পাঁচু সেখান হইতে দৌড় দিল।

তখন সকলে ভাবিল—নাঃ, ছেলেটা কোনো কর্ম্মেরই না! যেমন আকাট মুখ্খু বাপ শিবচরণ, তাহারই ত ছেলে!

পুত্রের পরাভবে পাঁচুর মা অপ্রতিভ হইয়া মাথা নত করিয়া পা দিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে লাগিল, তাহার কালো মুখখানি লজ্জায় বেগুনে হইয়া উঠিয়াছে।

খুড়িমা আবার মুস্কিলে পড়িলেন।

রোহিণী বলিল—খুড়িমা, ঠাকুরঘরে ভটচাজ্জি মশায় পূজো করছেন, যাও না তাঁর ঠেঞে পড়িয়ে নেওগে না।

এই প্রস্তাব সকলেরই খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো মনে করেছিস রোহিণী!

এত লোকের মধ্যে রোহিণী নিজের উপস্থিত-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব-গৌরবে স্ফীত হইয়া বিনয়ের ভাবে স্মিত মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল, যেন এ প্রশংসায় তাহার কিছুই আসিয়া যায় না—এমন বুদ্ধির পরিচয় হামেশাই সে দিয়া থাকে এবং এমন প্রশংসাও সে নিত্যনিরন্তরই পায়। কিন্তু তাহার বিড়ালের মতন গোল গোল ছোট ছোট চোখ দুটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া সকলের মুখের উপর দিয়া প্রশংসার দৃষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেছিল।

রোহিণীর পরামর্শ শুনিয়া খুড়িমা সমাগতা পুরন্ধ্রীদের মধ্যে একজনকে অনুরোধের স্বরে বলিলেন—ক্ষ্যামা, তুই বড়ি ক'টা দিয়ে দে না মা, ফেনা বসে যাচ্ছে, আমি চিঠিখানা পড়িয়ে নিয়ে আসি।

সকলে চিঠি শুনিতে যাইবে আর তাহাকে একলাটি রোদে বসিয়া বড়ি দিতে হইবে ভাবিয়া ক্ষেমঙ্করী ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—খুড়িমা, যাক্‌গে ফেনা বসে, আমি এসে আবার ফেনিয়ে দেবো।.....ডাল-বাঁটার কাঁশিটা চটের তলে ঢেকে রাখ, নইলে কাগে টাগে আবার মুখ দেবে।

খুড়িমা আর কিছু না বলিয়া কাঁশির কানায় হাতের ডাল যথাসম্ভব মুছিয়া কাঁশি ঢাকিয়া রাখিয়া বাঁ হাতে চিঠি লইয়া ভট্টাচার্য্যের সন্ধানে রওনা হইলেন।

জমিদারদের বাস্তুদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা। নন্দকিশোর স্মৃতিরত্ন জমিদার বাবুদের কুলপুরোহিত। তিনিই নিত্য অন্দরে আসিয়া বাস্তুদেবতার পূজা করেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় দীর্ঘায়ত সুন্দর সুগৌর পুরুষ; বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ; মাথাভরা টাক, কেবল দুইকানের পাশ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ঘন চুল আছে, কিন্তু শিখা নাই।

ভট্টাচার্য্য পুরু গালিচার আসনে সরল উন্নত হইয়া বসিয়া পূজা করিতেছেন। পরণে গরদের কাপড় ও উত্তরীয়, গরদের ও দেহের রঙে মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গেছে। উপবীতগুচ্ছ সুশুভ্র। পাশে মারবেল পাথরের স্বচ্ছ শুভ্র মেজের উপর অমল শুভ্র একখানি গামছা ভাঁজ করা রহিয়াছে। পূজারীর ন্যায় পূজার স্থান, উপকরণ সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পূজার ঘরটি ধূপ ধূনা চন্দনের গন্ধে আমোদিত।

খুড়িমা ঘরে ঢুকিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রথমে নারায়ণকে, পরে পুরোহিতকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন, অপর সকলে তাঁহার পশ্চাতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এতগুলি লোককে একসঙ্গে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা?

খুড়িমা ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—এই চিঠিখানা দেখুন ত কে দিয়েছে?

স্মৃতিরত্নের সহিত বাড়ীর প্রায় সকল মেয়েই কথা বলিত। স্মৃতিরত্ন এ বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হিতৈষী বন্ধু। সকলে নিজের দুঃখবেদনা অকপটে ইঁহার নিকট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং ইনিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া উপদেশ দিয়া পরামর্শ দিয়া উপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই স্নিগ্ধচরিত্র সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টবাক্ ব্রাহ্মণ সেইজন্য সকলেরই পরমাত্মীয়।

খুড়িমা অগ্রসর হইয়া স্মৃতিরত্নের কাছে চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আগে দেখুন ত চিঠিখানা লিখেছে কে?

চিঠিতে কি লেখা আছে তাহার চেয়ে কে দিয়াছে তাহাই জানিবার কৌতূহল খুড়িমার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য চিঠির পাতা উল্টাইয়া পড়িলেন—অভাগিনী মালতী।

খুড়িমা বলিলেন—ও! মালতী! মালতী আমার বোনঝি। আহা, মেয়েটা জন্ম-দুঃখিনী; অভাগিনীই বটে! বিয়ে হতে না হতে বিধবা হল; শ্বশুরবাড়ীতে একদিনের তরে লক্ষ্যস্থল পেলে না; বাপের ভিটেয় পা দিতে না-দিতে বাপ মরল; এখন ওরা মায়ে ঝিয়ে টিমটিম করচে। আমার বাপের সম্পর্কে আপনার বলতে এখন ওরাই।

প্রভাতের আগমনী গানের কথায় ও সুরে খুড়িমার চিত্ত স্নেহার্দ্র ও শোকার্ত্ত হইয়াই ছিল; এখন এই দূরগত ও অপরিচিত আপনার জনের দুঃখ স্মরণ করিয়া তাঁহার মন স্নেহে মমতায় একেবারে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; এই নিঃসম্পর্কীয় পরের বাড়ীর মধ্যে বন্দী অবস্থায় দূরের আপনার জনকে স্মরণ হওয়াতে তিনি যেন অমৃতের আস্বাদ পাইলেন, তাঁহার অন্তরে নিষ্ফল মাতৃস্নেহ আজ অকস্মাৎ মালতীর নাগাল পাইয়া বুভুক্ষুর মতো দুই হাত বাড়াইয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। খুড়িমা অঞ্চল তুলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

ভট্টাচার্য্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আলোর দিকে চিঠি ধরিয়া চক্ষু একটু বিস্ফারিত করিয়া একটু চেষ্টার সহিত চিঠি পড়িতে লাগিলেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মাসিমা, আমি অভাগিনী, আমার শেষ আশ্রয়ও হারিয়েছি; আমার স্নেহময়ী মা.....

ভট্টাচার্য্য চিঠিপড়া বন্ধ করিয়া করুণ নেত্রে খুড়িমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমার চশমা নেই, ভালো দেখতে পাচ্ছিনে, বিকেলে এসে চিঠি পড়ে দেবো, এখন এখানা আমার কাছেই থাক.....

খুড়িমা চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ভট্চাজ্জি মশায়, আমি সব বুঝতে পেরেছি, আমার দিদি আর নেই। .....আমি পাষাণী, আমার সব সইবে, আপনি চিঠি পড়ুন।

ভট্টাচার্য্য বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন—

আমার স্নেহময়ী মা আমাকে অকূলে ভাসিয়ে গত ২রা আশ্বিন স্বর্গে গেছেন। মাসিমা, এখন তোমার কাছ ছাড়া আর কোথাও আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। তুমি আমাকে শীগগির তোমার কাছে নিয়ে যাবার উপায় কোরো। এখানে একলা থাকতে আমার বড় ভয় করছে। এক এক দিন যাচ্ছে, না এক এক যুগ যাচ্ছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দেরী কোরো না। ইতি—অভাগিনী মালতী।

এক দণ্ড কাঁদিয়া খুড়িমা ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—আমি মেয়েমানুষ, পরাধীন; আমিই ত পরের দয়ার ওপর আছি, আমি তাকে কোথায় ঠাঁই দেবো? রাক্ষুসী সবাইকে খেয়ে এখন আমার ভরসা করছে!

রোহিণী সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই ত বটে! তোমার হয়েছে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

দাসীর এই কথা বিষদিগ্ধ-শেলের মতন খুড়িমার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। অথচ আশ্রয়-দাতার আদরের চাকরাণীকে কিছু বলিবার সাহস তাঁহার ছিল না। খুড়িমা তাহার কথার বিষটাকে একটু সহনীয় করিয়া লইবার জন্য নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়া বলিলেন—সত্যিই ত! আমি নিজেই পরের গলগ্‌গেরো, আমি আবার কাকে আশ্রয় দেবো? যা থাকে তার কপালে তাই হবে, আমি তার কি করব? পোড়াকপালী আমায় চিঠি দিয়ে শুধু আমার যন্ত্রণা বাড়ালে বৈ ত নয়!

রোহিণী বলিল—সত্যি বাপু! মেয়েটার কি আক্কেল! তুই ত তবু নিজের ভিটেয় পড়ে আছিস; আর খুড়িমার বলে চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো পরের বাড়ী হবিষ্যি!

স্মৃতিরত্ন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা ভরিয়া বলিলেন—মা রোহিণী, তুমি একটু চুপ কর। .....দেখ বৌমা, তুমি ছোটরাণীমাকে একবার বলগে; তাঁর দয়ার শরীর—তিনি যেন মা বসুন্ধরা; এত লোকের ভার যখন অক্লেশে বহন করচেন, তখন আর একটি নিরাশ্রয়াকেও ঠাঁই দিতে তিনি কাতর হবেন না।.....যাও মা! বিপদে অধৈর্য্য হতে নেই; স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করলে বিপদ অধিকক্ষণ টিঁকতে পারে না। নারায়ণে ভক্তি রেখো মা! জেনো, যার কেউ নেই নারায়ণ তার সহায়। যাও একবার গিন্নি-মাকে বুঝিয়ে বলগে, আমিও একবার হরি-বিহারীকে বলব।

গিন্নির দয়া সম্বন্ধে খুড়িমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও এত লোকের সম্মুখে ভট্টাচার্য্যের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় তাঁহার ছিল না। তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন—অবিশ্যি, দিদির দয়ার শরীর। তিনি যেন রাজি হবেন। কিন্তু সেই আবাগীকে কলকেতা থেকে আনবে কে? সোমত্থ মেয়ে, যার-তার সঙ্গে আসা ত ভালো দেখাবে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—তার জন্যে ভেবো না মা! আমি নবকিশোরকে লিখে দেবো, সে-ই তোমার বোনঝিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে।.....এখন তুমি যাও, ছোটরাণীমাকে বলে' রাজি করগে।

খুড়িমা আশা আশঙ্কা লজ্জা সঙ্কোচ অন্তরে ভরিয়া লইয়া গিন্নি-রাণীর সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের খেয়াল

শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

(১)

প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখিনি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখিনি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী,
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহিনি
কাঁপানো গান।

(২)

প্রেমের খেয়াল সহজে মানেনা
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম জানেনা
ফুলের বাণ।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানেনাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।

(৩)

তূরিতে ভেরিতে কখনো বাজেনা
তরল তান।
পরীর শরীরে কখনো সাজেনা
জরীর থান।
আছে যা লুকায়ে ভাষার অন্তরে,
পার যদি দিতে মনের যন্তরে
হাল্‌কা টান,
তবে তা আসিবে সুরের মন্তরে
ধরিয়া প্রাণ।

(৪)

থাকেনা কবির সাজানো ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ।
পড়েনা কবির সাজানো পাশায়
মনের দান।
করো যদি তুমি আকাশ-ফুলের
করো যদি তুমি অনন্ত ভুলের
মদিরা পান।
তাহলে গাহিবে প্রাণের মূলের
রসের গান।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

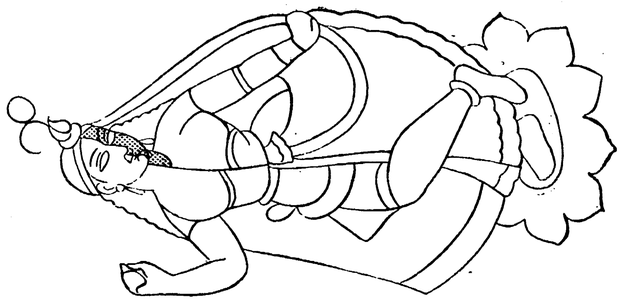

যুগলমূর্ত্তি—কালীঘাটের পট।



সঙ্কীর্ত্তন—মেদিনীপুরে প্রাপ্ত পুঁথির পাটা।

শ্রীযুক্ত অমিতকুমার হালদার প্রণীত "অজন্তা" গ্রন্থ হইতে

গান

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে।

বাতাস বহে মরি মরি,
আর বেঁধে রেখনা তরী,
এস এস পার হয়ে মোর
প্রেমের মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে।
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোগল-শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

মোগল-আমলে, লোকসাধারণের দারিদ্র্য-সত্ত্বেও, এসিয়া ও য়ুরোপের সহিত খুব উত্তমের সহিত বাণিজ্য চলিত।

ভারত হইতে গরম-মশলা, সোরা, চিনি, নীল, কাফি এবং কাপড় প্রভৃতি কতকগুলি তৈয়ারি মাল রপ্তানী হইত। রেশমের ও সূতার বস্ত্র-বয়নে হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ছিল। করমণ্ডল উপকূলে ও বঙ্গদেশে মস্‌লিন ও ছিটের কাপড় তৈয়ারি হইত। ঢাকায় লঘু ও অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার মস্‌লিন হইত, তাহার নাম ছিল "প্রভাতের শিশির"। একদা অওরংজেব তাঁহার কন্যাকে এইপ্রকার স্বচ্ছ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি তাহাকে বলিলেন, "মুসলমান রমণীর সাত-ফের-দেওয়া ভাঁজের কাপড় পরা উচিত।" শাজাদী উত্তর করিলেন, "এই রকমই আমার পরিচ্ছদ। আমি প্রভাত-শিশির পরিয়া থাকি।" সকরি প্রদেশে ও

মসলিকাপত্তনের আশপাশে নানা-রঙ্গে-ছাপা ছিট কাপড় ও রঞ্জিত-সূত্রে-নির্ম্মিত গিংহাম-কাপড় তৈয়ারী হইত। সিন্ধুদেশে ছাপ-মারা চর্ম্ম; গুজরাটে বিশেষতঃ আহমদাবাদে কার্পাসের বয়ন ও রঞ্জন কার্য্য ভাল হইত। বারাণসী ও দিল্লি, রঞ্জিত রেশমের কাপড় ও সোনালি ও রূপালী কিংখাপের জন্য, এবং উত্তর পশ্চিম-অঞ্চল, কাশ্মীরী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে, ভারতে আমদানি হইত;—জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে লবঙ্গ, জায়ফল ও ডালচিনি; চীন হইতে চীনে-বাসন; সিংহল ও পারস্য-উপসাগর হইতে মুক্তা; আফ্রিকা হইতে দাস ও অশ্ব; ট্রান্‌সক্‌সিয়ানা ও পারস্য হইতে তাজা ও শুষ্ক ফল, ও ফ্রান্স হইতে কাপড়। তাছাড়া ভারত, আরব্যদেশ হইতে সুগন্ধ দ্রব্য, এথিওপিয়া হইতে মৃগনাভি, এবং সিংহল হইতে হস্তী ক্রয় করিত। কেননা, সম্রাটের জন্য, রাজাদিগের জন্য, আমিরদিগের জন্য বহুসংখ্যক হাতীর প্রয়োজন হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, ইংলণ্ড ভারতের প্রধান খরিদ্দার হইয়া উঠিয়াছিল। (১)

ভারতে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশি হওয়ায়, ভারত সমস্ত পৃথিবীর বহুমূল্য ধাতুগুলাকে শোষণ করিয়া লইত। তথাপি, ভ্রমণকারীরা বলেন, মুদ্রা বিরল ছিল। রত্নালঙ্কারের প্রতি হিন্দুদের একটা স্বাভাবিক আসক্তি আছে। উহাদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ উহারা রত্নাদিতে, সোনারূপার বলয়াদিতে পরিণত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে; উৎসবের দিনে এই সকল অলঙ্কার প্রদর্শন করে এবং শুকা-হাজার সময়ে বিক্রয় করিয়া থাকে। মোগল-রাজকর্ম্মচারীদিগের অর্থগৃধ্নুতাবশত ঐ সকল অলঙ্কার অন্তর্হিত হইত। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই উহা লুকাইয়া রাখিত। এই অভ্যাসটা উহাদের এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরাজদিগের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ প্রভূত অর্থ সঞ্চিত ছিল।

***

এক্ষণে মোগল-ভারতের কতকগুলি বিশেষ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি। পঞ্জাবে, খাস হিন্দুস্থানে, বঙ্গদেশে, উড়িষ্যায়, গুজরাটে ঘননিবিষ্ট নিবিড় লোকপুঞ্জ। পারতপক্ষে

(১) ইংলণ্ডের ভারত কোম্পানী, ১৭৯২ হইতে ১৮০৯ পর্য্যন্ত—ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে Murray তাঁহার Discoveries and Travels—গ্রন্থে একটা গড়পরতা হিসাব দিয়াছেন। যথা;—

কাপড়.....	পৌণ্ড	১,৫৩৯,৪৭৮
রেশম.....	"	১৩,৪৪৩
গোলমরিচ...	"	১৯৫,৪৬১
সোরা... ...	"	১৮০,০৬৬
গরম-মশ্‌লা...	"	১১২,৫৯৭
চিনি, নীল...	"	২৭২,৪৪২
কাফি... ...	"	৬,৬২৪

Travernierও কতকগুলি খরিদপত্রের এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—কাশিমবাজারের (বঙ্গদেশে) বার্ষিক দ্রব্যজাতের তালিকা;—২২ হাজার বস্তা রেশম (প্রতি বস্তার ওজন ১০০ পৌণ্ড) সুরাট ও আমেদাবাদের কিংখাপ; আগ্রার নিকটস্থ ফতেপুরের পশ্‌মি গালিচা; গোলকুণ্ডা ও মসলিপত্তনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের রঞ্জিত কার্পাস। লাহোর, সিরঞ্জ, বুরহানপুর প্রভৃতি প্রদেশের ছাপা কার্পাস-কাপড়। আগ্রা ও আহামদাবাদে কাপড় রাঙ্গান হইত। লাহোর, আগ্রা- বরোদা, ব্রোচ্ ও বঙ্গদেশের সাদা কার্পাস-কাপড়।

সর্ব্বত্রই একই ভূমি পুনঃপুনঃ কর্ষিত হইত; কেননা, মনসবদার ও জমিদারেরা যতদূর সম্ভব ভূমিকে শোষণ করিবার চেষ্টা করিত।

সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবে যবাদি শস্য, গাঙ্গেয় উপত্যকায় চাউল ও বাজরা, মালবার উপকূলে এবং মধ্যভারতের কতকগুলি প্রদেশে কার্পাস ও রেশম, গুজরাটে আগ্রার নিকটে, নীল, দাক্ষিণাত্যে গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ গাছগাছরা।

আকবরের আমলে, এমন কি ঔরংজেবের আমলেও যে সকল বড় বড় রাস্তা সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই সকল রাস্তা পরিত্যক্ত হয়।

দস্যুর ভয়ে, বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিত। উত্তরাঞ্চলে উষ্ট্রপৃষ্ঠে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে গরুর গাড়ী করিয়া মাল চালান হইত। গাড়ীর সাজসরঞ্জাম এখনকারই মত। গরুর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া একটা হাঁসুলী এবং সেই হাঁসুলী ককুদের উপর ভর করিয়া থাকে। এই স্বার্থবাহদিগের সহিত শত শত শকট কখন-কখন শত সহস্র শকট চলিত। প্রধান শকটগুলিতে লবণ ও চাউল বোঝাই থাকিত। এক-এক জাতীয় চালানী মাল এক-এক বিশেষ জাতের একচেটিয়া ছিল। কোন কোন প্রদেশে যেখানে বন্যাপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্র রাস্তার ধারে পড়িত, সেই সব স্থানে কিছুদিনের জন্য স্বার্থবাহদিগের গতিরোধ হইত।

আমীরেরা অশ্বপৃষ্ঠে, এবং অনেক সময়েই পাল্কীতে ভ্রমণ করিতেন। স্বার্থবাহদিগের পণ্যাদির সহিত, বিশেষত সামরিক দ্রব্যাদির সহিত একদল রক্ষী-সৈন্য চলিত। বণিকেরা আসিয়া মাঠের মধ্যে মাটির ঘরে আশ্রয় লইত। সেখানকার হিন্দুরা চাউল, তরী-তরকারী ও ফলাদি উহাদিগকে বিক্রয় করিত; মুসলমান বণিকেরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে মাংস খরিদ করিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইত। নগরে পান্থশালা ছিল। তন্মধ্যে দিল্লির পান্থশালাটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। উহা বাদ্‌সার ঘরোয়ানা একজন শাজাদি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

***

সমস্ত প্রদেশে, বিশেষত পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে, বড় বড় লোকাকীর্ণ নগর। নগরের উপকণ্ঠগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। নগরের অভ্যন্তরদেশে কতকগুলি প্রাচীর—উহাই দরিদ্রদিগের অঞ্চল। কোন প্রকার নক্‌সার পরিকল্পনা নাই; বড় বড় গলি। সোজা রাজপথ, কতকগুলা আঁকা-বাঁকা গলি। এদিকে একস্থানে কতকগুলা মেটে ঘর—ঘরের উঠানে কলাগাছ পোঁতা; ওদিকে আর একস্থানে কতকগুলা কাঠের বাড়ী; গ্রীষ্ম-রজনীতে সেই সব বাড়ীর ছাদে লোকেরা নিদ্রা যায়।

য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ অতি জঘন্য ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এই সকল অঞ্চলের বর্ণনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতীয় গ্রন্থকার-দিগেরও অভিমত কম কঠোর নহে।

লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে হসন এইরূপ বলিয়াছেন:—

"এই নগর? লক্ষ্ণৌ, এক ধ্বংসদশাপন্ন সহর। সর্ব্বত্রই উচ্চ স্থান ও নিম্ন স্থান:—একটা বাড়ী স্বর্গে, আর একটা বাড়ী পাতালে। লোকের বসতি এরূপ নিবিড় যে, দায়ে পড়িয়া যদি কোন নূতন অধিবাসীকে সেখানে আসিতে হয়, তখনি সে দম আটকাইয়া মরে। রাজপথে কালো ও পচা কাদা, যেন হাবসীর বগলের ঘাম।

জট্-পাকান চুলের মত হাজার হাজার আঁকাবাঁকা গলি.....(২)

যে সকল অঞ্চলে রাশি-রাশি গৃহ, সেখানকার লোকেরা জ্বরে পচিয়া মরিত; প্রায় প্রতি বৎসরে ওলাউঠার মড়ক হইত। হাজার হাজার বাড়ী অগ্নিদাহে প্রায়ই দগ্ধ হইত (এক বৎসরের মধ্যে দিল্লিতে ৬০ হাজার বাড়ী দগ্ধ হয়); আর গ্রীষ্মকালে জলপ্লাবন।

কবি জুরাট বর্ষাঋতু সম্বন্ধে এইরূ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"মুষলধারে বৃষ্টি এবং নদী উচ্ছলিত.....ফোপ্‌রা পিঠা জলে ভিজাইয়া লইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বাড়ীর সংলগ্ন ভূমি; অল্প বাতাসেই কুটীরের চাল উড়িয়া যায়। আর কোঠাবাড়ীর কথা যদি বল, তাহার চূণ-কামকরা ছাদ ছাকুনী হইয়া দাঁড়ায়—তাহার ভিতর দিয়া জল চোয়াইতে থাকে.....দোকানঘরের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিতে থাকে; সেখানে কর্দ্দম ও বৃক্ষশাখা ভিন্ন আর কিছুই বিক্রয় করিবার নাই..... গৃহসমূহ মৃতদেহে পূর্ণ...সর্ব্বত্রই পরিপ্লাবিত ক্ষেত্র..... এই সমস্ত বিপদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল।"

যে বাজার মুসলমানদিগের খুব প্রিয় সেই বাজার নগরের মধ্যস্থলে। দুইটা বড় বড় পথ, তাহার ধারে ধারে খিলান-বারণ্ডা; এবং এই দুই পথ পরস্পরের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে সোজা চলিয়াছে। এই দুই পথের মধ্যে আবার আঁকাবাঁকা গলি এবং বারাণ্ডা-ওয়ালা গরাদে-বিশিষ্ট দ্বিতল কাঠের বাড়ী। এখানে জহুরী ও পোদ্দারেরা থাকে (গুজরাটে পার্শি ও ইহুদী)। আর একটু দূরে চিকণ-কাজের শিল্পী, খোদাইকর ও গজদন্তের ভাস্কর।

সর্ব্বত্রই হিন্দুর নিবিড় জনতা;—ক্ষুদ্রকায়, শীর্ণকলেবর, ক্ষীণাঙ্গ, শ্যামবর্ণ। কাহারো কোমরে জড়ান সাদা ধুতি, কেহ বা রঙ্গীন রেখা-বিশিষ্ট লম্বা কোর্ত্তা পরিয়াছে। বণিকদের একটা দীর্ঘ পরিচ্ছদ, একটা প্যাঁচাল পাগ্‌ড়ী। ব্রাহ্মণদিগের মাথায় শিখা, গায়ে সাদা চাদর, বক্ষের উপরে যজ্ঞোপবীত। কারিগরদিগের রমণীরা খুব উজ্জ্বল রং-এর কাপড় পরিধান করে; তাহাদের নাকে নথ, কাণে কাণ-বালা; নিম্ন শ্রেণীর রমণীরা সাদা 'ট্যানা' পরে, তাহাদের পা ও বাহু অনাবৃত; তাহাদের শিশুসন্তানেরা একেবারে নগ্ন। মুসলমানেরা আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত;—লম্বা চাপকান অথবা আজানু-লম্বিত ফুলো পিরাহান, মাথায় সাদা বা সবুজ পাগ্‌ড়ী। মুসলমান-রমণীদের পরিচ্ছদ;—একটা ওর্‌না; একটা চওড়া পাজামা—পাদ-মূল আঁটিয়া ধরিয়াছে। পার্সিদের কালো ফুলকাটা ধুচ্‌নী-টুপি; পার্সি রমণীদের গাত্র সুনম্য উজ্জ্বল রং-এর কাপড়ে জড়ান। চিকণ-কাজের পাড়ওয়ালা সাদা ওর্‌না মাথায় সংলগ্ন। সে সময়ে ভারতে সকল দেশের লোকই দেখা যাইত:—তুর্ক ও মোগল অশ্বারোহী সৈনিকদিগের কটিবন্ধে তূণ; বেলুচি ও আফগানেরা পশমী চাদরে আবৃত—তাহার ভিতর হইতে উহাদের বহিরুন্মুখ থুতি ও শূক চঞ্চুনাসা পরি-দৃশ্যমান। নেপালী, তিব্বতী, চীনে, জাপানী, কাফ্রি ও য়ুরোপীয়। নগ্ন যোগীগণ, বিচিত্র-বর্ণের ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত দর্বেশগণ ভিক্ষা করিত, অথবা উহাদের দণ্ডের দ্বারা আঘাত

(২) Garcin de Tassyর গ্রন্থ হইতে এই অংশ ও পরবর্ত্তী অংশ উদ্ধৃত হইল।

করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিত। সর্ব্বদাই অনুচরবর্গের সহিত কোন রাজা, অথবা রক্ষি-অনুসৃত অশ্বারূঢ় আমীরেরা এই জনতা ঠেলিয়া চলিত।

কবি হসেনের কবিতায় (অষ্টাদশ শতাব্দী) আমরা ফৈজাবাদের এইরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হই:—

"একটি শ্রীবৃদ্ধিশীল নগর, অধিবাসীগণ হৃষ্টচিত্ত, সকলের হৃদয় গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল। বৃহৎ ও সুবিধাজনক বাজার ও রাস্তাগুলা চিত্ররক্ষণাধার পুস্তকের রেখার মত ঋজু রেখায় পরস্পরের উপর দিয়া গিয়াছে। দুই সারি বৃক্ষ.....ত্রিদ্বার-বিশিষ্ট একটা চতুষ্ক.....এই-এখানে জহুরিরা, ঐ-ওখানে কাপড়ের দোকানদারেরা; আর একটু দূরে পোদ্দার—আরও বেশী দূরে স্বর্ণকারগণ। যেন রজত কাঞ্চনের বৃষ্টি, নার্গেশ ফুলের তোড়ার মত স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রাসকল কাষ্ঠমঞ্চের উপর সজ্জিত রহিয়াছে। মিষ্টান্ন, সর্ব্বৎ, সরের পনির। এই কট্ কট্ শব্দ কিসের? চিনি বাহির করিবার জন্য ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গা হইতেছে। যেখানে স্তূপাকার জিনিষ সজ্জিত সেই দোকানের দফ্‌তরে দোকানদার বসিয়া আছে। উহারা বিক্রেয় দ্রব্যের নাম ধরিয়া সজোরে হাঁক দিতেছে:—

"লঙ্কা," "নেবুর আচার," "আদা;" "চাউল চাই," "কাবাব চাই", "রুটি চাই", "দুধের রুটি চাই"। "এইখানে গাছগাছরা ঔষধের আরক"; "বরফ", "গোলাপী বাদাম"। "কাফি", "সুপারী", "তর্ম্মুজ"। পরিশেষে কাপড়:—কিংখাপ; জরির কাজ; ঝালর; চর্ম্মকার:—চন্দ্রমা-সদৃশ জুতা; ও জুতার অলঙ্কার তারকা-পুঞ্জের ন্যায়। পুস্তক ও চিত্র। পক্ষীজাতি:—টিয়া, পায়রা, বুলবুল। এইখানে একদল লোক! একজন গল্প-কথক। আরও দূরে ঐ জনতা কিসের? বংশীবাদক, কাশ্মীরের নর্ত্তকীবৃন্দ। এইখানে বাইজি ও বারাঙ্গনা:—সংখ্যায় হাজার-হাজার.....তাহাদের নৃত্য-পরিচালিত পরিচ্ছদ হইতে যেন বিজুলী ছুটিতেছে। উহাদের কর্ণভূষণের পান্না দেখিয়া টিয়াপাখীরা হিংসায় মরিয়া যায়। উহাদের রঞ্জিত মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে—যেন ফুলের উপর শিশির-বিন্দু। কাহারও কাহারও জরির পরিচ্ছদের মধ্য হইতে গ্রীবা ও বক্ষ প্রকাশ পাইতেছে!"

বারাঙ্গনার সংখ্যা সম্বন্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত নগরই ফৈজাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। Tavernier বলেন, হাইদ্রাবাদে ২০ হাজার বারাঙ্গণা ছিল। সায়াহ্নে তাহারা স্বীয় কুটীরের সম্মুখে আসিয়া থাকিত এবং রাত্রি-সমাগমে, উহাদের ঘরে দীপ জ্বালিত। উহারা তাড়ী বিক্রয় করিত।

হীনদশাপন্ন দাসত্বগ্রস্ত ইতরসাধারণ, কুসীদজীবি তস্কর-বণিকের দল—যাহারা অতিরিক্তহারে সুদ গ্রহণ করিয়া ধনোপার্জ্জন করিত এবং সেই ধন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিত, সুরামত্ত পশুবৎ নিষ্ঠুর সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈনিক, সহস্র-সহস্র বারাঙ্গনা—ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় নগরসমূহের চিত্র।

ষোড়শ শতাব্দীর উন্নতি-প্রবণ মর্ম্মভাব এবং আক্‌বরের প্রতিভা কিয়ৎকালের জন্য যে সমাজের উন্নতিসাধন করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির দ্বারা সেই সমাজের অবনতি ও আসন্ন উচ্ছেদ পরিসূচিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগীর দল

শীতের প্রভাত। কুয়াশায় চারিধার তখনও ঢাকিয়া রহিয়াছে। গৃহের দ্বারে সজ্জিত গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। রবার্ট জেঙ্কিন্স আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলে ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠে কে কহিল, "বাড়ীতে এসে খাবে ত?"

রবার্ট জেঙ্কিন্স শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতে ফিরিলেন। মুখে তাঁহার ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "না, মাদাম জেঙ্কিন্স।" সাধারণের সম্মুখে এই নারীকে 'মাদাম' বলিয়া সম্বোধন করিতে জেঙ্কিন্সের বিশেষ একটু চাড় দেখা যাইত। ইহাতে তিনি ভিতরে ভিতরে কেমন-একটু আনন্দ বোধ করিতেন! যে নারী অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার অবসরটুকুকে আনন্দের উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে মাদাম বলিয়া আপ্যায়িত না করিলে বিবেকও যে গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলে। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "আমার জন্য তুমি বসে থেকো না। আমি আজ প্লাস্ ভাঁদোমে খাব। নিমন্ত্রণ আছে।"

মাদাম জেঙ্কিন্স কহিলেন, "ও! নবাবের ওখানে?" মাদামের স্বরে ঈষৎ একটু শ্রদ্ধা মিশানো ছিল। সে শ্রদ্ধা এই নবাবের নামে! আরব্য উপন্যাসের নায়কের মতই যে নবাব দৈত্য-প্রদত্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্ভার লইয়া অকস্মাৎ এই পারি সহরের বুকে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে, যাহার কথা, যাহার আলোচনা লইয়া সারা পারি আজ এই এক মাস ধরিয়া মাতিয়া রহিয়াছে,—সেই নবাব! তাহার নামে শ্রদ্ধা একটু হওয়া বিচিত্র নহে। পরে স্বর ঈষৎ নামাইয়া মাদাম কহিলেন, "কিন্তু মনে আছে—আমি যা বলেছি। আমার সে কথা রাখবে ত? দেখো—কথা দিয়েছ!"

স্বরের ভঙ্গীতে বোধ হইল, কথাটা কিছু কঠিন এবং সে কথা রক্ষা করাও নিতান্ত সহজ নহে! জেঙ্কিন্স কোন উত্তর দিলেন না; ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন। মুখে তাঁহার হঠাৎ একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়িল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। ধনী রোগীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া মিথ্যা আশ্বাস দিয়া সৌখীন ডাক্তারদিগের মুখ ও চোখ কেমন-একটা চতুরতায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ডাক্তার জেঙ্কিন্স পর মুহূর্ত্তেই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কথা যখন দিয়েছি, তখন তা রাখবই। এ তুমি নিশ্চয় জেনো, মাদাম জেঙ্কিন্স। নাও, এখন যাও। জানলাগুলো বন্ধ করে দাও গে—আজ ভারী কুয়াশা হয়েছে।" জেঙ্কিন্স বিদায় লইলেন।

রবার্ট জেঙ্কিন্স ডাক্তার, জাতিতে তিনি আইরিশ,—সস্মিত মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, সুস্থ সবল দেহ, সাজসজ্জাটুকু পরিপাটী,

বেশ-ভূষাতেও সৌখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপাধি তাঁহার প্রচুর, খ্যাতি-প্রতিপত্তিও সামান্য নহে—বিস্তর বিজ্ঞান ও সেবা-সভাদির সদস্য ও সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেগুলিকে তিনি অনুগৃহীত করিয়াছেন। বেথলিহাম আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কীর্ত্তি। অর্থাৎ এক-কথায় পার্লের আবিষ্কারক ডাক্তার জেঙ্কিন্স সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান। একতিল বিশ্রাম নাই,—সারা পারি সহরে তাঁহার কার্য্যপটুতায় ধন্য-ধন্য রব উঠিয়াছে। পারির সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য গৃহের তিনি চিকিৎসক। ক্ষুদ্র শিশুর দাঁত-ওঠা হইতে বৃদ্ধ ডিউকের সর্দ্দি অবধি সমস্তই ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে দেখিয়া বেড়াইতে হয়।

কুয়াশার রন্ধ্র ভেদ করিয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সের ব্রুহাম আসিয়া হোটেল দ্যে মোরার সম্মুখে থামিল। প্রাসাদের মত অট্টালিকা, দীর্ঘ, সজ্জিত। গাড়ী থামিতেই দ্বারে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স গাড়ীতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, ঘণ্টার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন।

কুয়াশা থাকিলেও ডাক্তার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কাতার দিয়া পথে আরও দশখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। অপ্রসন্নভাবে তিনি ভাবিলেন, "যত সকালেই আসি না কেন, দেখি, আমার আগেই বিস্তর লোক এসে জমে গিয়েছে।" তথাপি এ বিশ্বাস তাঁহার মনে বেশই ছিল, যিনি যখনই আসুন না কেন, সংবাদ পাঠাইয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে কখনও প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। তাঁহার জন্য দ্বার অবারিত।

এই প্রাসাদ-তুল্য গৃহে ডিউক দ্যে মোরার বাস। ডিউকের খাস-কামরার সম্মুখে বড় একখানা ঘর। সেই ঘরে অসংখ্য উমেদার উদ্‌গ্রীবভাবে বসিয়া আছে,—কখন্ কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়,—হুজুরে হাজির দিবার সেলাম আসিয়া পৌঁছায়!

ডাক্তার জেঙ্কিন্স কাষ্ঠ অভিবাদন করিয়া দ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার পালা চলেছে?"

রক্ষক মৃদু স্বরে যে নাম উচ্চারণ করিল, তাহা শুনিতে পাইলে উপস্থিত জন-সঙ্ঘে ক্রোধের একটা রক্ত শিখা বিদ্যুতের মত ঝিলিক্ হানিয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এতগুলা সম্ভ্রান্ত লোক, কাজের জন্য কত ক্ষণ বসিয়া আছে, তাহার ঠিক নাই, আর ডিউক কি না থিয়েটারের নগণ্য একটা পোষাকওয়ালার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নামটা কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না।

কতকগুলা শব্দের ঝঙ্কার,—আলোর একটা রশ্মি·· জেঙ্কিন্স ডিউকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; একটা সংবাদ পাঠাইবারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। চিম্‌নির দিকে পিছন ফিরিয়া, উন্নত শির তুলিয়া কৌন্সিলের সভাপতি ডিউক একটা পোষাক হাতে লইয়া দর্জীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। আগামী বল্-নাচে ডিউস্ কি পোষাক পরিবেন, সেই সম্বন্ধেই ডিউক দর্জীকে গোটাকয়েক উপদেশ দিতেছিলেন। "গলার দিকে সামান্য ফ্রিল দিয়ো; কফে মোটে ফ্রিল হবে না।···এই যে, ডাক্তার জেঙ্কিন্স!...একটু আমায় মাপ করবেন।"

জেঙ্কিন্স অভিবাদন করিয়া ঘরের মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জানালা খোলা ছিল। জেঙ্কিন্স আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলেন। নিম্নে প্রকাণ্ড বাগান—সীন্ নদীর তীর অবধি শ্যামল তরুলতাগুলিকে কে যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে! তাহার অন্তরালে সেতু ও ও-পারের গির্জ্জার চূড়া ছায়ার মত ফুটিয়া রহিয়াছে। কুয়াশার পটে পেন্সিলের রেখায় কে যেন একখণ্ডে প্রকৃতির দৃশ্য আঁকিয়া রাখিয়াছে! ঘরের দেওয়ালে ডচেসের তৈল-চিত্র; চিমনির মাথায় ডিউকের মৃণ্ময় মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিসিয়া গত সালোঁয় শ্রেষ্ঠ পদক লাভ করিয়াছে!

"হ্যাঁ, তারপর, জেঙ্কিন্স, খপর কি, বল।" দর্জীকে বিদায় দিয়া ডিউক ডাক্তারকে সম্ভাষণ করিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, "কাল রাত্রে থিয়েটারে থাকার দরুণ আপনাকে খারাপ দেখাচ্ছে!"

ডিউক কহিলেন, "রেখে দাও তোমার কথা! এর চেয়ে কবেই বা ভাল থাকি? তবে তোমার পালে মন্দ বোধ কচ্ছি না! একটু বল পাচ্ছি, তেজ পাচ্ছি···ওঃ, ছ'মাস পূর্ব্বে শরীরের যা দশা হয়েছিল।"

জেঙ্কিন্স ডিউকের বুকের উপর মাথা কাত করিয়া রাখিলেন। ডিউক গণিলেন, "এক, দুই, তিন, চার।" জেঙ্কিন্স তাঁহার বুকে কান পাতিয়া কহিলেন, "কথা কয়ে যান দেখি।"

ডিউক কহিলেন, "কাল ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে হে, ডাক্তার? সেই লম্বা লোকটা,—তামাটে রঙ, ভারী বিশ্রী জোরে হাসছিল!—সেই যে কাল থিয়েটারে যার সঙ্গে ষ্টেজ-বক্সে তুমি বসেছিলে,—কে সে?"

"ওঃ, তার কথা বলচেন? সেই ত নবাব—জাঁসুলে, যখের ধন নিয়ে পারিতে এসেছে। সহরে হৈ-চৈ পড়ে গেছে, একেবারে!"

"বটে! ঐ সেই নবাব! আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম! সবাই ওর দিকে হরদম চাইছিল। অভিনেত্রীগুলোর অবধি আর অন্য দিকে নজর চলছিল না! তুমি তাহলে লোক টাকে জান—এ্যাঁ? লোকটা কেমন?"

"আমি? হ্যাঁ, ওকে জানি বৈ কি,—আমি হলুম গে, ওর ডাক্তার।...হ্যাঁ, বুক দেখা হয়েছে। না, বেশ আছেন আপনি। ও, হ্যাঁ, সে আজ এক মাসের কথা হতে চলল। পারির বাতাস নবাবের কেমন সহ্য হচ্ছিল না, তাই আমায় ডাকিয়ে পাঠায়। সেই অবধি আমার সঙ্গে আলাপ বেশই জমেছে। ওর সম্বন্ধে আমি এমন বিশেষ কিছু জানিনা বটে, তবে টিউনিস থেকে লোকটা একেবারে টাকার আণ্ডিল নিয়ে এসেছে। কোন্ বে'র কাছে কাজ করত। মনটা বড় ভালো, ভারী সাদা-সিধে লোক, দয়া ধর্ম্মও বেশ আছে—"

বাধা দিয়া ডিউক কহিলেন, "টিউনিসে? তা, নবাব নাম হল কেন?"

"বাঃ! ঐ ত হল গে মজা! পারির ধরণই ত তাই। বিদেশী পয়সাওলা লোক দেখলেই ওরা 'নবাব' খেতাব দিয়ে বসে থাকে, তা সে যেখানকারই লোক হোক্ না। যাহোক একে কিন্তু খেতাবটা মানিয়েছে। তামাটে রং, জ্বলজ্বলে চোখ, আর অগাধ টাকা! তা হক্-কথা বলব, টাকাটা সৎকার্য্যে খুবই ব্যয় করছে! ওর কাছে আমি ঋণীও আছি"—ডাক্তারের স্বর কৃতজ্ঞতায় নম্র হইয়া পড়িল,—"ওরই সাহায্যে আমি বেথলিহাম আতুরাশ্রম খুলতে পেরেছি। আশ্রমটার সম্বন্ধে মেসেঞ্জার কাগজখানা খুব লিখেচে। লিখেচে, এত-বড় সদাশয়তার কাজ বোধ হয় এক শ' বছরের মধ্যে আর দুটি হয় নি! দেখি, কাগজখানা বুঝি সঙ্গেই আছে।"

কথাটা শেষ করিয়া ডাক্তার পকেটের মধ্য হইতে ভাঁজ-করা একখানা খবরের কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। ডিউক কিন্তু বাজে কথায় ভুলিবার লোকনহেন! বক্র দৃষ্টিতে কাগজখানার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "তাহলে তোমার নবাবের অঢেল টাকা, বল। শুনচি কার্দ্দেলাকের থিয়েটারটা ওরই টাকায় ভাল করে ফের খোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মঁপাভঁর দেনা ঐ লোকটাই শুধে দিয়েছে। বোয়া ল্যান্দ্র্ ওর জন্যে আস্তাবল খুলচে, বুড়ো সোলবাক্ ওকে বিস্তর ছবি এঁকে দিচ্ছে। এ সব ত অল্প টাকার খেলা নয়।"

জেঙ্কিন্স হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "তবে বলি, ডিউক সাহেব, নবাব বেচারা আপনার নামে একেবারে মরে আছে। এখানে এসে সহুরে বলে নাম কেনবার ঝোঁক ওর বেজায়। আপনাকেই ও আদর্শ ঠিক করে চলেচে। আপনার কাছে লুকোব না, আপনার সঙ্গে একবার মিশতে পেলে ও বেচারা যেন বর্ত্তে যায়।"

"জানি—আমি তা শুনেচি। মঁপাভঁ আমায় বলছিল, আমার মতও চাইছিল। ...কিন্তু কি জান? দুদিন আরও সবুর করে আমি সব দেখতে চাই। লোকটার সত্যিই শাঁস আছে কি না! বিদেশের টাকা-কড়ির ব্যাপার—একটু সাবধান হয়েই মেশা উচিত।···তা বলে অন্য কিছু ভেবো না—আরে নাঃ, আমি তা বলচি না। ...কি জান, আমার নিজের বাড়ীতে অবশ্য নয়, তবে অন্য কোথাও, এই ধর,—থিয়েটারে, কি কোন পার্কে টার্কে, কি আর কারও বাড়ীতে—"ডিউকের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া ডাক্তার কহিলেন, "বেশ,—সুবিধেও হয়েছে। আসছে মাসে মাদাম জেঙ্কিন্স বাড়ীতে একটা পার্টি দিচ্ছেন—অনুগ্রহ করে সেই পার্টিতে যদি আপনি—"

"বাঃ! এ হলে ত চমৎকার ব্যবস্থা হবে, ডাক্তার। নবাব যদি সেখানে আসে, আলাপ করিয়ে দিও—ব্যস্!"

এই সময় দ্বার খুলিয়া ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মন্ত্রীসভার সভাপতিমহাশয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন—তাঁর শুধু হুজুরের সঙ্গে একটি কথা আছে।···নীচে পুলিশ সাহেবও বসে আছেন।"

ডিউক কহিলেন, "বলগে, আমি যাচ্ছি।... তার পর ডাক্তার, তোমার পাল্টাই আপাততঃ তা হলে চলবে?"

"হ্যাঁ চলবে। বিশেষ, যখন উপকার পাওয়া যাচ্ছে।" ডাক্তারের মুখে প্রসন্নতার একটা স্নিগ্ধ কিরণ ফুটিয়া উঠিল। ডিউক তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া নিমন্ত্রণ-সভাটিকে আপ্যায়িত করিবেন! সঙ্গে সঙ্গে নবাবকেও তিনি ডিউকের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার সুযোগ লাভ করিবেন। এতখানি সৌভাগ্য!

সেদিনকার মত বিদায় লইয়া জেঙ্কিন্স জন-পরিপূর্ণ ডিউকের প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে ইঙ্গিত করিলেন, "ক্লাবে চল।"

রু রয়েলের সীমানায় আসিয়া ডাক্তার গাড়ী হইতে নামিলেন। ভৃত্যের দল ভিতরে বড় বড় কার্পেটগুলা নাড়িয়া ধূলা ঝাড়িতেছিল, ঘর সাফ করিতেছিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স রুমালে নাক ঢাকিয়া মার্কুইস মঁপাভঁর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মার্কুইস কহিলেন, "ডাক্তার যে! আরে এস, এস।"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "নীচে চাকরগুলো যে ধূলো উড়িয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্য দিয়ে উপরে আসে।"

মার্কুইস কহিলেন, "বসো।"

ডাক্তার বসিলে মার্কুইস এক নিশ্বাসে আপনার উপসর্গাদির তালিকা দিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পার্লের গুণের কথাও বলিতে ভুলিলেন না। বলিলেন, পার্ল ব্যবহার করিয়া তিনি যেন আবার নবযৌবন লাভ করিয়াছেন। শুনিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তার পার্লের পুনর্ব্যবহারে পরামর্শ দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম।...নবাবের ওখানে আবার দেখা হচ্ছে ত?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই। আজ ওখানেই খাবার কথা আছে! জান ত, মতলবখানা যা ঠাওরানো গেছে—সেটা ত সারা চাই,—না হলে ওখানে কি সাধ করে যাওয়া যায়? আঃ! বাড়ী ত নয়, যেন চিঁড়িয়াখানা।"

ডাক্তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় যাহা কহিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ দাঁড়ায়, যে নবাবের সঙ্গ শুধুই আনন্দের সৃষ্টি করে না, তাহার মধ্যে অস্বস্তিও বিলক্ষণ আছে, সত্য। তবু ইহার জন্য নবাবের উপর রাগ করাটা ভাল দেখায় না। বেচারা সভ্য-সমাজের আদব-কায়দা জানিবার অবসর ত কখনও পায় নাই! আর তাঁহাদের ত কাজ লইয়া কথা! একটু অসুবিধা হইলে আর—ইত্যাদি।

মঁপাভঁ কহিলেন, "আর শিখতেও পারবে না। যে যাবে, তার সঙ্গেই প্রাণ খুলে মিশবে,—একেবারে হলা-হলা গলাগলা ভাব! এতে কি আর মানুষের ভদ্রতা থাকে? ...দেখেচ ত, বোয়া ল্যান্দ্র্ কি রকম ঘোড়া গচিয়েচে, এক-দম্ অপদার্থ, কাগজের ঘোড়া বললেও চলে; আর তাই ও হাজার টাকায় কিনেচে! আমি বেশ বলতে পারি, বোয়া ল্যান্দ্র্ বড় জোর পাঁচশ টাকায় ঘোড়াগুলো কিনেচে!"

"যাক্—নবাব কিন্তু ভারী ভদ্রলোক।"

মঁপাভঁ কহিলেন, "কিন্তু নবাব কেন ঘোড়াগুলো নিয়েচে, তা জানো? ওগুলো এককালে ডিউকের ঘোড়া ছিল বলে—"

"সে কথা ঠিক। ডিউকের চলা, বলা, হাসি-কাশী সমস্ত ধরণগুলো নকল করবার জন্য নবাব যেন উঠে পড়ে লেগেছে। জানেন, আজ নবাবকে গিয়ে এমনএকটা খবর দেব যে শুনলে সে আহ্লাদে গলে যাবে।"

"কি খবর?"

"নবাবের সঙ্গে ডিউকের পরিচয় করিয়ে দেব। সে বিষয়ে ডিউক আজ আমায় অনুমতিও দিয়েছেন।"

মার্কুইসের মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি

কহিলেন, "দেখ ডাক্তার,—আমাদের মধ্যে কোন রকম রাখারাখি ঢাকাঢাকি থাকাটা ঠিক নয়—তুমিও দাঁও বাগাতে চাও, আমিও তাই চাই। তোমার গণ্ডীতে আমি কখনও পা দিতে যাই না, তুমিও আমার গণ্ডীতে পা দিতে এসো না। আমি যখন নবাবকে কথা দিয়েছি, ডিউকের সঙ্গে তার পরিচয় আমি করিয়ে দেব—তোমার সঙ্গেও যে ডিউকের পরিচয় হয়, তা আমারই দ্বারায়, মনে আছে ত? তখন এ ভারও আমার। এতে তুমি হাত দিতে এসো না।"

জেঙ্কিন্সের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তাই ত! মার্কুইসের মত বন্ধু, ডিউকের কেহ নাই, এ কথা কে না জানে! মার্কুইস কহিলেন, "না, চুপ করে থেকো না। বল। আমাদের মধ্যে এর একটা বোঝাপাড়া হয়ে যাক্—"

"নিশ্চয়! ইজ্জতের জন্যও বোঝা-পড়াটা হওয়া দরকার—"

"ইজ্জত! অত বড় কথা নয়, ডাক্তার। ইজ্জত আবার কি? তার চেয়ে বল, কায়দা-কানুনের জন্য—"

ডাক্তার অপ্রতিভভাবে অস্পষ্ট দুই-চারিটি কথা কহিয়া বিদায় লইলেন। এখনও বিস্তর জায়গায় ঘুরিতে হইবে।

ডাক্তারের রোগীগুলি সহরের সেরা রোগী! ঐশ্বর্য্যের কাহারও সীমা নাই! ধনীর প্রাসাদে কার্পেট-মণ্ডিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পুষ্প-বাস-ফুল্ল কক্ষে রেশমী কোমল কৌচে গিয়া ক্ষণিকের জন্য শুধু বসিতে হয়। রোগ যেখানে বিলাসের মূর্ত্তি ধরিয়াই সাজিয়া বসিয়া থাকে, রোগের শীর্ণ তপ্ত হস্ত যেখানে এতটুকু রুদ্রতারও আভাষ দিতে সাহস করে না, সেই সকল স্থানেই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের প্রসার-প্রতিপত্তির সীমা নাই। অর্থাৎ এ সকল রোগীকে রোগী ঠিক বলা যায় না। হাঁসপাতালে গেলে এ সকল রোগীকে তখনই অসঙ্কোচে তাহারা বিদায় করিয়া দেয়। রোগের চিহ্ন শরীরের কোথাও নাই এবং ডাক্তারের সূক্ষ্ম নিপুণ যন্ত্রগুলা রীতিমত অভিনিবেশেও শরীরের কোথাও এতটুকু রোগ আবিষ্কার করিতে পারে না। বিলাসের জড়তায় মৃত্যু যেখানে বহুপূর্ব্বেই বাসা বাঁধিয়াছে, সেখানে আবার নূতন করিয়া কোন্ রোগ উঁকি দিবে? কি রোগ বাসা বাঁধিবে? মৃতের আবার রোগ কি! এ সকল রোগী ত বহুকালই মরিয়া গিয়াছে। প্রাণ কি কাহারও আছে? পোষাকের ভারে মৃত দেহগুলা শুধু সাজানো আছে বৈ ত নয়! মাথায় কাহারও চিন্তা নাই, প্রাণে আনন্দ নাই, জীবনে শৃঙ্খলা নাই—এ ত মৃতের দল! তাই ডাক্তারের পার্লের এতখানি নাম বাহির হইয়া গিয়াছে। সে যেন চাবুক মারিয়া ইহাদের জীবনে একটু সাড় আনিয়া দিয়াছে।

কোন রোগী বলে, "ডাক্তার, থিয়েটারে না গিয়ে ত আর থাকা যাচ্ছে না।" রোগিণী বলে, "কাল ভারী একটা জম্‌কালো বল্ আছে, যেতে পাব ত?" ডাক্তার মৃদু হাসিয়া আশ্বাস দিয়া আসেন, "তা যেয়ো। কিন্তু দু তিন ঘণ্টার বেশী থেকো না।" ইহাই তাঁহার রোগীর ইতিহাস, ইহাই তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালীর সার মর্ম্ম।

এমনই রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া

ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া বিখ্যাত আর্টিষ্ট ফেলিসিয়ার ভবন-দ্বারে দাঁড়াইল। ডাক্তার নামিয়া উপরে গেলেন। গৃহখানি তেমন বড় নহে; তবে সজ্জিত সুন্দর ঘরগুলি দেখিলে গৃহ-স্বামীর সুরুচি ও ভব্যতার পরিচয় পাইতে এতটুকু বিলম্ব ঘটে না। কবির কুঞ্জের মতই পরিচ্ছন্ন গৃহ।

পদশব্দে চমকিয়া ফেলিসিয়া ঘাড় ফিরাইল। "কে,—ডাক্তার?"

ডাক্তার নম্র স্বরে কহিলেন, "তুমি কাজে এতই মন দিয়েছিলে যে, ডাকতে আমার ভরসা হত না। নতুন কিছু গড়ছ, বুঝি!"

ফেলিসিয়া মাটি দিয়া মূর্ত্তি গড়িতেছিল। কহিল, "কাল রাত্রে হঠাৎ কেমন খেয়াল হল! তাই আলো জেলেই কাজে লেগে গেলুম। কাহুরের কিন্তু এতখানি জবরদস্তি পছন্দ হচ্ছে না।"

কাহুর ফেলিসিয়ার কুকুর। একজন দাসী তাহার পা দুইখানা ধরিয়া রাখিয়াছিল, ফেলিসিয়া তাহা দেখিয়া কাহুরের মূর্ত্তি গড়িতেছিল।

ফেলিসিয়ার ললাটে হাত রাখিয়া ডাক্তার কহিলেন, "কিন্তু এখনও তোমার একটু জ্বর রয়েছে, দেখচি। অসুখ শরীরে রাত জাগা, পরিশ্রম করাটা ঠিক হচ্ছে না ত।"

ফেলিসিয়ার মুখে লজ্জার একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। চোখ দুইটি সরমের শান্ত শ্রীতে ভরিয়া গেল। ফেলিসিয়া কহিল, "কৈ! আপনার পালে ত কিছু ফল পাচ্ছি না। আর কাজ! কাজ করলেই আমি থাকি ভাল। চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না, কেমন অস্বস্তি ধরে, কেবলই মনে হয়, জীবনটা যেন কিছু নয়! ঐ জলের মতই ঘোলাটে হয়ে উঠছে! ঐ যে কঁস্তা,—ও তবু ঢের মনের সুখে আছে—একদিন ত ও সুখের মুখ দেখেচে—সেই সুখ মনে করে ও ভাল থাকে। কিন্তু আমার মনে করবার মত কিছু নেই। জীবনটা চিরদিনই একটানা বয়ে চলেছে—থাকবার মধ্যে আছে শুধু আমার কাজ, খালি কাজ। তাই কাজ করেই আমি থাকি ভাল।"

অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া, মূর্ত্তির গায়ে স্থানে স্থানে সরু তুলিটি বুলাইতে বুলাইতে কোনখানে মুছিয়া, কোনখানে মাটির লেপ আরও ঘন করিয়া দিয়া ফেলিসিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল। তাহার মুখে মৌন কাতরতার একটা করুণ ছাপ ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার বিষাদ-করুণায় মাখা সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে জেঙ্কিন্সের প্রাণে এক নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল। জেঙ্কিন্স কোন কথা বলিলেন না। তাহা লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ কি বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া ফেলিসিয়া আপনা হইতেই যেন অপ্রভিত হইয়া পড়িল। প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া দিবার জন্য সে বলিল, "হ্যাঁ, আপনার নবাবকে যে সেদিন দেখলুম—শুক্রবার দিন অপেরায় গেছলেন।" কথাটা শেষ করিয়া ফেলিসিয়া জেঙ্কিন্সের পানে চাহিল।

"তুমিও বুঝি গেছলে—?"

"হ্যাঁ!—ডিউক একটা বক্সের টিকিট পাঠিয়ে ছিলেন।"

জেঙ্কিন্সের মুখে কে যেন এক ঘা চাবুক

মারিল। মুখ তাঁহার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ফেলিসিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কস্তাঁকে কত করে বল্‌লুম, সঙ্গে যেতে। পঁচিশ বচ্ছর পরে সে আবার অপেরা দেখলে। ও যেন কি রকম হয়ে পড়ছিল! যখন নাচ হচ্ছিল ওর সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল—চোখ দুটো যেন জ্বলে জ্বলে উঠছিল—পুরোনো কথা বোধ হয় কিছু মনে পড়ছিল...হ্যাঁ, নবাবের চেহারাখানি বেশ,—আমার এখানে একদিন নিয়ে আসবেন না? আমি তাঁর মাথার একটা ছক্ গড়ব।"

"সে কি করে হবে! লোকটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত যে।"

"মোটেই নয়। তিনি আমাদের ঠিক সামনের বক্সে বসেছিলেন--চমৎকার মূর্ত্তি—পুরুষের চেহারা বটে! মার্ব্বেলের মূর্ত্তির মত—সাধারণতঃ এমন একখানি মূর্ত্তি ত ফস্ করে কৈ চোখে পড়ে না। আর যখন কুৎসিত বলেই আপনার ধারণা, তখন ভাবনাটাই বা কিসের! ভয় নেই, ডাক্তার সাহেব, ভয় নেই।"

এ কথার উত্তরের আশামাত্র যেন না করিয়া ফেলিসিয়া আবার মূর্ত্তি গড়িতে মন দিল। ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ফেলিসিয়ার নিকটে আসিলেন, কহিলেন, "তাহলে আজ আসি ফেলিসিয়া।"

ফেলিসিয়া তুলি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "চল্‌লেন! তাহলে তাঁকে আন্‌চেন একদিন?"

"কাকে আনব?"

"কেন, নবাবকে।"

"নবাবকে?"

"হ্যাঁ, নবাবকে। না, আমি শুনচি না। আনতেই হবে। আনা চাইই। বাঃ, কেন আনবেন না?" ফেলিসিয়া আবার সহসা বসিয়া পড়িয়া ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া মূর্ত্তিটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যেন আনন্দের পুতলি! কোন কিছুতে আকর্ষণ নাই, কোন কিছুর সন্ধান রাখে না, আত্ম-ভোলা সরলা বালিকা, ফেলিসিয়া! জেঙ্কিন্স বিদায় লইলেন। আজ তাঁহার মনের মধ্যে কাঁটার মত কি-একটা খচ্ খচ্ করিয়া ফুটিতে ছিল।

বিদায় লইয়া ডাক্তার সহরের সীমানায় এক দরিদ্র পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একখানা জীর্ণ বাটির দ্বারে গাড়ী থামিল। ডাক্তার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছিন্ন মলিন বেশ পরিহিত অপরিচ্ছন্ন বালক বালিকার দল অদূরে ধূলা-মাটি লইয়া খেলা করিতেছিল,—সজ্জিত গাড়ী দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া সদলে আসিয়া তাহারা গাড়ীর সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

সিঁড়ি বাহিয়া বাড়ীর চতুর্থ তলে উঠিয়া একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাক্তার দাঁড়াইলেন। ঘরের সম্মুখে একটা তামার পাত আঁটা ছিল। তাহাতে লেখা ছিল, "এম. জুজ, একাউনটাণ্ট।" পাতটার পানে চাহিয়া দেখিয়া ডাক্তার মৃদু হাসিলেন, পরে দ্বারের হাতলে ঘা দিলেন।

ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিয়া দিল। ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, "ভালো আছ, আঁদ্রে?"

"আসুন মস্যুঁ জেঙ্কিন্স।"

ডাক্তার আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি দেখচ, আমার ব্যবহার। তুমি যে এই তোমার আত্মীয়দের ছেড়ে নিজের গোঁ-ভরে এতদূরে এসে বাসা নিয়েছ, তবু দেখ, আমরা এখানেও তোমায় দেখতে আসছি। আমার এতে মাথা হেঁট হয়, তা জানো! যত বড় বড় ঘরে আমার কাজ—আমায় এখানে নিত্য আসতে দেখলে লোকে কি ভাববে,—কিন্তু কি করব? না এলে তোমার মা ওদিকে কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে দেয়। তাই না এসেও পারি না।"

ডাক্তার জেঙ্কিন্স ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। বালি-চূণ-খসা দেওয়াল, ঘরের মধ্যে দুই-চারিখানা জীর্ণ চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, একখানা খাট, নূতন একটা ক্যামেরা, ইহাই গৃহের প্রধান আসবাব পত্র। এক কোণে ধূলি-মাখা ছোট একটা জর্ম্মান্ ষ্টোভ্ পড়িয়া আছে, তাহারই পার্শ্বে লোহার একটা ছোট কেট্‌লি। পরে আঁদ্রের পানে তিনি চাহিলেন। শীর্ণ দেহ, পাণ্ডু মুখ, দাড়ি কবে কামানো হইয়াছে, ঠিক নাই, —খোঁচা খোঁচা কাঁটার মত সেগুলা আবার দেখা দিয়াছে। চোখে দারিদ্র্যের ছায়ার মধ্য হইতে একটা উজ্জ্বলতা উঁকি দিতেছে। জেঙ্কিন্স বলিলেন, "শোন আমার কথা। যেদিন তোমার মাকে আমি বিবাহ করেছি, সেই দিন থেকেই তোমাকে আমি নিজের ছেলের মত দেখে আসছি। আমার সঙ্গে থেকে তুমি কাজ কর, আমার এই ঘরগুলো হাত করে নাও, ডাক্তারি করে ভদ্রলোকের মত থাক, এই আমার ইচ্ছা ছিল। তোমার মারও সেই সাধ। কিন্তু তুমি,—কোন কথা নেই, বার্ত্তা নেই, কাকেও কিছু না বলে সটান আমার বাড়ী থেকে চলে এলে! লোকে এতে কি ভাবচে, বল দেখি। শুধু আমায় অপদস্থ করা! লেখাপড়া ছেড়ে দিলে, নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করলে—সব খোয়ালে। কেন? না, যাতে পয়সা নেই, নাম নেই, ইজ্জৎ নেই, দুনিয়ার যত হতচ্ছাড়া বখা নিষ্কর্ম্মাগুলো যা করে দিন গুজরান করে, সেই হাভাতে পেশা নেবে, ঠিক করেছ! ছিঃ!"

"এ কাজে আমার আনন্দ হয়, করে সুখও পাই। আর এতে পয়সা নেই, তাই বা আপনাকে কে বললে! মান খুবই আছে।"

জেঙ্কিন্স ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "ছাই আছে! আমায় আর তুমি বুঝিয়ো না—আমার কিছু জানতে বাকী নেই। সাহিত্য-চর্চ্চায় আবার ইজ্জৎ! ও সব পাগলের কথা! যাক্, শোন, আমি কি বলতে এসেছি। ও-সব লক্ষ্মীছাড়া খেয়াল ছাড়,—আমার পরামর্শমত কাজ কর, মান, সম্ভ্রম—সব হবে। একটা মস্ত সুযোগও উপস্থিত, হেলায় হারিয়ো না। আমি বেথলিহাম আতুরাশ্রম খুলেচি, জান ত! এত বড় সদনুষ্ঠান একশো বছরের মধ্যে কারও মাথায় আসেনি, তাও জানো! এ কথা আমার কথা নয়, খবরের কাগজে অবধি লিখেচে। এর জন্য নাতেঁয়ারে বিস্তর জমি কেনা হয়েছে, কাজও সেখানে সুরু হয়েছে। আমার ইচ্ছা, সেখানকার ভার তুমিই নাও, তুমি সেখানকার কর্ত্তা হবে। তোফা বাড়ী পাবে, লোকজন পাবে। একবার শুধু তুমি রাজী হও—আমি গিয়ে নবাবকে এখনি বলচি—আমার কথা সে তখনই রাখবে।"

সহজভাবেই আঁদ্রে উত্তর দিল, "না।"

"না!" জেঙ্কিন্সের ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি কহিলেন, "বেশ! আমিও ভেবেছিলুম, তোমার এ সুবুদ্ধি হবে কেন? তা বেশ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ, ঠেল। এক দিন পস্তাবে! আমি অবশ্য নিজে থেকে তোমায় সাধতে আসিনি—তোমার মার জেদেই এসেছিলুম। তা তোমার জেদই বজায় থাকুক। আমরা ত কেউ নই! তাই হবে—তুমি নিজে যে পথ ধরেছ, সেই পথেই থাকো—অভাবের মধ্যে পড়ে এর পর যখন ছটফট করবে, তখনই তোমার উচিত শিক্ষা হবে! লিখে আবার মানুষের পয়সা হয়,—নাম হয়—! আরো জেনে রাখো, ছুতো-নাতায় যে আমার ওখানে গিয়ে পয়সার পিত্যেশ্ করে দাঁড়াবে, তা হবে না। আমি একটি কড়ি দিয়ে তোমায় সাহায্য করব না। আমার সঙ্গে যেমন, তোমার মার সঙ্গেও তেমনি তোমার সব সম্পর্ক চুকে গেল। সে আর আমি—দুজনে আমরা এক, এ জেনে রেখো!"

আঁদ্রের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কাশিয়া সে উত্তর দিল, "বেশ। তবে মা যদি কখনও আমায় দেখতে চান ত এখানে আসতে বলবেন। আমার দ্বার তাঁর জন্য চিরদিন খোলা থাকবে,—এইটুকু তাঁকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আপনার বাড়ীতে আমি আর কখনো যাব না, ঠিক জানবেন। এ কথার কখনও নড়চড় হবে না।"

ডাক্তার জেঙ্কিন্স কহিলেন, "কিন্তু, কেন —কেন—সে কথা শুনতে পাই না?"

"না। প্রয়োজন নাই।"

ডাক্তারের অস্বস্তি বোধ হইল। দারিদ্র্য যাহাকে পিষিয়া মারিতেছে, এতখানি তাহার তেজ যে তাঁহার সম্মুখে একবার সে শির নোয়াইতে চাহে না! বাহিরে যাঁহার এতখানি প্রতিপত্তি, সেদিনের একটা হতভাগা সংস্থান-হীন ছোকরা সটান্ তাঁহার মুখের উপর সমানে জবাব দিয়া গেল! আশ্চর্য্য! তিনি ভাবিয়াছিলেন, বাড়ী ঢুকিতে দিবনা এই ভয় দেখাইলে আঁদ্রেকে হাতের মধ্যে আবার পাওয়া যাইবে। কিন্তু আঁদ্রের সেই সুদৃঢ়ভাব দেখিয়া পরাজয়ের ক্ষোভে প্রাণ তাঁহার পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

বিদায় লইয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ডাক্তার গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কোচ্‌ম্যানকে আদেশ করিলেন, "প্লাস্ ভাঁদোম্—" ডাক্তারের গাড়ী নবাবের গৃহোদ্দেশে ছুটিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরিচয়

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাব লাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতিচিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের এই ছয় অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য, ষষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ।

কামসূত্রের রচনাকাল কাহারো মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৭১ কাহারো মতে বা খৃঃ পূর্ব্ব ৩১২ আবার কাহারো মতে ২০০ খৃঃ অব্দ বই নয়। যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা রচনা করেন ১১ শত হইতে ১২ শত খৃষ্ট অব্দের মধ্যে।

যে সকল প্রাচীন ও বৃহত্তর শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন সে সকল শাস্ত্র এখন লুপ্ত সুতরাং বাৎস্যায়ন-কথিত পূর্ব্ব শাস্ত্রসমূহে —যেমন বাভ্রব্যের সূত্রার্থ ও আগম ইত্যাদিতে এই ষড়ঙ্গের প্রয়োগ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই ; কামসূত্রের টীকাকার যশোধর পণ্ডিতও কোন্ প্রাচীন টীকা অবলম্বন করিয়া নিজের জয়মঙ্গল টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করেন নাই। কাজেই চিত্রে এই ষড়ঙ্গ যে কত প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা বলা কঠিন ; তবে কামসূত্রে যখন চিত্রকলার উল্লেখ আছে তখন বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই চিত্রবিদ্যার সহিত চিত্রের ষড়ঙ্গও এদেশে প্রচলিত ছিল এটা সহজেই মনে হয়। অন্তত বাৎস্যায়ন যে সময়ে কামসূত্র রচনা করিতেছিলেন সে সময়ে চিত্রের এই ষড়ঙ্গ যে জনসাধারণের নিকট সুবিদিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা কামসূত্রের উপসংহারে বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন "পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ। কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥" অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাদির প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল বিদ্যাদি কার্য্যত কি ভাবে লোকে প্রয়োগ করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া যত্নপূর্ব্বক সংক্ষেপে আমি এই কামসূত্র রচনা করিলাম। ইহা ছাড়া, আমরা দেখিতেছি যে বহু প্রাচীন কাল হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর, চিত্রকলা-চর্চ্চায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে ; যশোধর পণ্ডিত যিনি কামসূত্রের টীকাকার তিনি এই জয়পুরাধিপতি প্রথম জয়সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন ; সুতরাং চিত্রের যে ষড়ঙ্গ জয়পুর চিত্রকরগণের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত ছিল সেটির সন্ধান পাওয়া যশোধরের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না ; কাজেই চিত্রের ষড়ঙ্গ যশোধরের বা তাঁহার কোন ছাত্রের কপোল কল্পিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আমাদের ষড়ঙ্গ, যশোধরের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন কাল হইতেই ভারত শিল্পীগণের নিকট সুবিদিত ছিল ;—কেননা দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ৪৭৯ হইতে ৫০১ শাতব্দীর মধ্যে চীন দেশে শিল্পাচার্য্য Hsich Ho চিত্রের যে ষড়ঙ্গ—Six canons লিপিবদ্ধ করেন তাহা কার্য্যত আমাদের ষড়ঙ্গেরই অনুরূপ। ইহা ছাড়া আমরা আরও দেখি যে, চীন দেশে ৩০০ খৃঃ অব্দে অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তি সবপ্রথম চীন শিল্পী Tai Kuci গঠন করেন। সুতরাং Hsich Hoর পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত আমাদের চিত্রের ষড়ঙ্গও চীন দেশে নীত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। চীন চিত্র-বিদ্যাটি Hsich Ho তিন কিম্বা চার কি পাঁচ ভাগে বিভক্ত না করিয়া ষড়ঙ্গে বিভক্ত করেনই বা কেন তাহাও দেখিবার বিষয়। Hsich Hoর লিখিত ষড়ঙ্গ চীনে



ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে সন্তান ও জননী

(শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত "অজন্তা" গ্রন্থ হইতে)

জাপানে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে প্রাচ্য শিল্পের মূলমন্ত্ররূপে যেরূপ আদর পাইয়াছে ও পাইতেছে আমাদের ষড়ঙ্গের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই; এমন কি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্য শিল্প লইয়া আজকাল বিশেষ আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহই ভারতীয় চিত্রের ষড়ঙ্গটির এপর্য্যন্ত কোনো উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, অথচ প্রায় সমস্ত ভাষাতেই কামসূত্র ও তাহার টীকার অনুবাদ হইয়া গেছে। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই মহাদেশে প্রচলিত চিত্রের ষড়ঙ্গ দুইটি যে নিকট-আত্মীয় তাহা নিম্নলিখিত চীন-ষড়ঙ্গের অনুবাদের সহিত আমাদের ষড়ঙ্গটি মিলাইলেই বোঝা যায়।

চীন দেশের ষড়ঙ্গ যথা—

(1) Chi-yun Shêng-tung = Spiritual Tone and Life-movement.

(2) Ku-Fa yung-pi = Manner of brush-work in drawing lines.

(3) Ying-wu hasiang hsing = Form in its relation to objects.

(4) Sui-lei Fu-tsai = Choice of colours appropriate to the objects.

(5) Ching-ying Wei-chih = Composition and Grouping.

(6) Chuan-mo i-hsich = The copying of Classic Models.

জাপানের শিল্প-সম্বন্ধে মাসিক-পত্রিকা 'কোক্কা'র ২৪৪ সংখ্যায় চীন ষড়ঙ্গের উপরি-উক্ত ইংরাজী অনুবাদের সহিত চীন ভাষা-বিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ও জাপানের সুবিখ্যাত শিল্পী স্বর্গগত ওকাকুরার অনুবাদের সম্পূর্ণ মিল নাই; সুতরাং সেগুলিও নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল যথা :—

GILES—(Introduction to the History of Chinese Pictorial Art Page 24) :—

(1) Rhythmic vitality, (2) Anatomical structure, (3) Conformity with nature, (4) Suitability of colouring, (5) Artistic composition, (6) Finish.

HIRTH—(Scraps from a Collector's Note book. Page 58) :—

(1) Spiritual Element, life's Motion, (2) Skeleton-drawing with the brush, (3) Correctness of outlines, (4) The colouring to correspond to nature of objects, (5) The correct division of space. (6) Copying models.

PATRUCCI—(La philosophie de la Nature dans l'Art de l'Extrême-Orient Page 89):—

(1) La consonance de l'esprit engendre le mouvement [de la vie]

(2) La loi des os au moyen du pinceau.

(3) La forme représentée dans la conformité avec les êtres.

(4) Selon la similitude (des objects) distribuer la couleur.

(5) Disposer les lignes et leur attribuer leur place hiérarchique.

(6) Propager les formes en les faisant passer dans le dessin.

BINYON—(The Flight of the Dragon Page 12):—

(1) Rhythmic vitality, or Spiritual Rhythm expressed in the movement of life.

(2) The art of rendering the bones or anatomical structure by means of the brush.

(3) The drawing of forms which answer to natural forms.

(4) Appropriate distribution of the colours.

(5) Composition and subordination or grouping according to the hierarchy of things.

(6) The transmission of classic models.

OKAKURA—(Ideals of the East Page 52):—

(1) The Life-movement of the spirit through the Rhythm of things...the great Mood of the Universe, moving hither and thither amidst those harmonic laws of matter which are Rhythm.

(2) The Law of Bones and Brush work. The creative spirit, according to this, in descending into a pictorial conception must take upon itself organic structure.

চীনদেশের ষড়ঙ্গটি নানা মুনির নানা মতের কুহেলিকার ভিতর দিয়া কেমন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সেটা কি ভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা যদিও আমাদের দেখিবার বিষয় এবং প্রাচ্য জগতের দুই মহাদেশে প্রচলিত দুই ষড়ঙ্গের মধ্যে কোনটা প্রাচীনতর তাহারও মীমাংসা করা যদিও আমাদের কর্ত্তব্য তথাপি চিত্র ও তাহার ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে যে স্বাধীন চিন্তা ও ধ্যানাদি বাৎস্যায়নের বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহারই যথাসম্ভব আলোচনা আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

পঞ্চদশীর চিত্রদীপ অধ্যায়ে শাস্ত্রকার চিত্রপটের অবস্থা চতুষ্টয় দিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্ণয় করিতেছেন। চিত্রকলা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সখের খেলা ছিল না,—আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে চক্ষে দেখিতেন এক চীন ও জাপান ছাড়া আর কোনো জাতি যে সে চক্ষে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না। আমাদের নিত্য-কর্ম্মের ভিতরে চিত্র ও আলিম্পন ইত্যাদির যেরূপ অধিকার দেখা যায় তাহাতে চিত্রের এই ষড়ঙ্গটির প্রয়োগ বহুকাল হইতে যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং সেটার সম্বন্ধে একটা চর্চ্চা এখনকার কালেও যে আমাদের প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য; এবং আমরা নূতন করিয়া যেমন চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করিতে অগ্রসর হইয়াছি

তেমনি চিত্রের ষড়ঙ্গটির সঙ্গেও নূতন করিয়া আর-একবার পরিচয় করিয়া লওয়া আমাদের আবশ্যক বোধে ইংরাজি অনুবাদের সহিত ইহা প্রকাশ করিতেছি, যথা:—

(১) রূপভেদাঃ—Knowledge of appearances. (২) প্রমাণানি—Correct perception, measure and structure of forms. (৩) ভাব—The action of feelings or forms. (৪) লাবণ্য যোজনম্—Infusion of grace, artistic representation. (৫) সাদৃশ্যং—Similitudes. (৬) বর্ণিকাভঙ্গ—Artistic manner of using the brush and colours.

চিত্রযোগের এই ষড়ঙ্গসাধনের যথাসাধ্য বিশদ্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভারত ও চীন শিল্পাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট দুই পন্থার পার্থক্য কতখানি সেটা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি—ষড়ঙ্গ দুইটি পর্য্যায়ক্রমে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিল না থাকিলেও দুয়ের একটা সামঞ্জস্য ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটিই যে একই বস্তু তাহা বলা চলে না। নদীর এপার ওপার দুই পারকে যেমন একই পার বলিতে পার না, তেমনি চিত্রসম্বন্ধে চিন্তা-প্রবাহটির দুই পারে যে এই দুইটি ষড়ঙ্গ তাহাদের একই বস্তু বলা যায় না। আমাদেরটি যেন কর্ম্মের পার ও তাহাদেরটি যেন মর্ম্মের পার,—মাঝ দিয়া চিত্রসম্বন্ধে চিন্তা-প্রবাহটি কখনো এপার কখনো ওপার স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। আমাদের পারের পথটি রূপ-নারায়ণের বাঁধা ঘাটে গিয়া মিলিয়াছে আর ওপারের পথ সেই আঘাটাতে গিয়া মিশিয়াছে জীবনের অপরূপ ছন্দটি যেখানে উঠিতেছে, পড়িতেছে।

ভারতের ষড়ঙ্গটি যেমন বাঁধা-ঘাটের মত সুচারুভাবে ধাপে ধাপে সজ্জিত ও সুনির্ম্মিত—চিত্রের সবটুকু সেখানে যেমন বাঁধিয়া ছাঁদিয়া যেটির পর যেটি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, চীন ষড়ঙ্গটি মোটেই সেরূপ নয়। সেখানে ছাঁদের সঙ্গে বাঁধকে জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই, কাজেই আমাদের মন সেখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে এবং একটা বাঁধা-গণ্ডির ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ভারতের ষড়ঙ্গটি যেন চিত্রের দিক দিয়া, আর চীন ষড়ঙ্গটি যেন চিত্রকরের দিক দিয়া ব্যাপারটার মীমাংসা করিতে চলা। চিত্র যখন আমাদের সম্মুখে রূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ভারত ষড়ঙ্গটি যেন তখনকার ইতিহাস, আর, চীন ষড়ঙ্গটি যেন সেখানকার কথা যেখানে চিত্রটির প্রাণের ছন্দ মহাশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন।

দুইটি ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যেটুকু মিল বা যেটুকু অমিল দেখা যায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না কিন্তু ষড়ঙ্গ দুইটির শীর্ষস্থান যেমন—'রূপভেদাঃ' এবং Rhythmic Vitality (প্রাণছন্দ)—এই দুইটিতে যে আড়াআড়ি তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এখন বিচারের বিষয় এই যে, ছন্দ—যাহাকে চীন-শিল্পাচার্য্য চিত্রের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন সেই যথার্থই প্রয়োজনীয় কথাটি আমাদের ষড়ঙ্গকার উল্লেখ মাত্র না করিয়া

রূপভেদকেই প্রাধান্য দেন কেন? আমাদের আচার্য্যগণ, দেখিতে পাই, যখন যে তত্ত্বটি লইয়া পড়িয়াছেন তখন সেটির গভীর হইতে গভীরতর, সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম দিকটি পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন, কেবল আলেখ্য-তত্ত্বের বেলাই তাহার ব্যতিক্রম হয় কেন? আমাদের ষড়ঙ্গ সূত্রটি যে কোনো-বৃহৎ-এক সূত্রের অংশ মাত্র তাহা বলা চলে না, কেননা স্পষ্টই বলা হইয়াছে 'ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্'—চিত্রের এই ছয় অঙ্গ—ইহা ছাড়া আর নাই। ছয়ের উপর আরো কয় আমরা অপেক্ষাকৃত শিথিল-ভাবে-গ্রথিত চীন ষড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারি কিন্তু আমাদের ষড়ঙ্গে কোথাও সেরূপ শিথিলতা নাই যাহাতে শাস্ত্রকার যাহা বলিতে চাহেন নাই তাহাও সূত্রটিতে আমরা আরোপ করিয়া দিব।

প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই পাঁচ সাক্ষী এবং রূপভেদ এই সুমেরুটি দিয়া ষড়ঙ্গের যে জপ-মালাটি চিত্রসাধনার জন্য আমাদের শাস্ত্রকার গাঁথিয়া দিয়াছেন সে মালায় কোন্ মন্ত্র জপ করিবার উপদেশ রহিয়াছে তাহাই দেখিবার বিষয়। মালা ফিরাইবার কালে সাধকের অঙ্গুলি সুমেরু হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক সাক্ষীকে স্পর্শ করিয়া আবার সুমেরুতেই গিয়া বিশ্রাম করে,—সুমেরুতেই জপের গতি আরম্ভ এবং সুমেরুতেই আসিয়া জপের মুক্তি বা স্থিতি। এখন দেখা যাইতেছে যে, চিত্রের গতি মুক্তি ষড়ঙ্গের সুমেরুতেই; সেই সুমেরু আমাদের শাস্ত্রকারের মতে 'রূপভেদাঃ' আর চীন-শাস্ত্রকারের মতে Rhythmic Vitality বা জীবন-ছন্দ। এখন এই দুই সুমেরু একই পদার্থ কি না, অথবা একই পর্ব্বতের এপিঠ ওপিঠ কি না—সেটাই জানা আবশ্যক।

'রূপভেদ' আমাদের এবং 'জীবন-ছন্দ' চীনের যে মূলমন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপ এবং প্রাণ এই দুইটিই চিত্রের গোড়া এবং শেষ;—প্রাণ প্রকাশ পাইবার জন্য রূপের আকাঙ্ক্ষা রাখে, রূপ বর্ত্তিয়া রহিবার জন্য প্রাণের প্রতীক্ষা করে। শুধু রূপ লইয়া চিত্র হয় না, শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বলা যায় শুধু রূপ তবে ভুল হয়, যদি বলা যায় শুধু প্রাণ তবেও ভুল হয়! এই জন্য চীন ষড়ঙ্গকার Vitality বা প্রাণের সঙ্গে Rhythm অর্থাৎ ছন্দ বা ছাঁদটি জুড়িয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ঙ্গকার শুধু 'রূপ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূপভেদাঃ'!

এখন এই 'ভেদ' কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা অথবা না-বুঝার উপরে আমাদের ষড়ঙ্গের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

যদি আমরা রূপভেদের অর্থ ধরি তাবৎ সৃষ্টবস্তুর বিভিন্নতা, তবে আমাদের ষড়ঙ্গটি নির্জ্জীব ও জড়সাধনার উপায় হইয়া পড়ে; কিন্তু চিত্র তো জড় সামগ্রী নহে। চিত্র যে রচে এবং চিত্র যে দেখে উভয়ের জীবনের সহিত চিত্রিতের আত্মীয়তা, তা ছাড়া, চিত্রের নিজেরও একটা সত্ত্বা আছে; সুতরাং রূপ-ভেদের অন্য অর্থ হওয়া সম্ভব কিনা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। 'ভেদ' শব্দ বিভিন্নতা বুঝাইতেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, আবার হিন্দুস্থানীরা ভেদকে বস্তুর মর্ম্ম বা রহস্য

বলিয়া জানে। এখন 'রূপভেদাঃ' বলিতে এরূপে-ওরূপে ভেদাভেদ ইহা হইতে পারে কিম্বা রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্য-উদ্ঘাটন—ইহাও হয়। "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে"! কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যে সদ্‌গুরু চিত্রের ষড়ঙ্গে 'রূপভেদাঃ' এই কথাটি বসাইয়াছেন তিনি রূপভেদের ভেদ বা রহস্যটুকু আমাদের খুলিয়া বলেন নাই; কিন্তু তথাপি রহস্যটুকু আমরা যে ধরিতে পারিতেছি না, এমন নয়।

চিত্রকে আমাদের ষড়ঙ্গকার যে সজীব বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ ষড়ঙ্গেই বিদ্যমান,—চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় দিকও নয়, ছয় অঙ্গ! আমাদের হাত-পা ইত্যাদির মত শক্তিশালী ছয় অঙ্গ দান করিয়া তবে ষড়ঙ্গকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শুধু ইহাই নয়; ষড়ঙ্গটির রচনা-প্রণালী দেখিলেও চিত্রটাকে ষড়ঙ্গকার যে একটা জীবন-শক্তির প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সেই প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া ষড়ঙ্গ-সূত্রটিকে একটা সজীবতা দিয়া গড়িয়া যাওয়াই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাহাও বেশ বোঝা যায়। ষড়ঙ্গ-সূত্রটিকে ব্যাকরণের একটি নির্জ্জীব সূত্রের মত করিয়া ষড়ঙ্গকার গড়িয়া যান নাই; চিত্র যে ছয়ের সমষ্টি সেই ছয়টিকে কোন প্রকারে কথায় গাঁথিয়া একটি সূত্র রচনা করাই যদি ষড়ঙ্গকারের উদ্দেশ্য হইত তবে আমরা দেখিতাম যে ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘ্যঃ" সূত্রের মত ষড়ঙ্গটি খুব ছোট কাজেই দুর্বোধ আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখানে দেখিতেছি ষড়ঙ্গের একটি অঙ্গের সহিত আরেকের যোগ এবং সম্বন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, যেটির পরে যেটি আসা উচিত, যেখানে যাহার স্থান সেইরূপভাবে তাহা সাজাইয়া, চিত্রের যেন একটা সজীব মন্ত্রমূর্ত্তি খাড়া করা হইয়াছে। ষড়ঙ্গের সমস্তটির ভিতরে ছন্দের স্রোত বহাইয়া রূপভেদকে প্রমাণ ভাবকে লাবণ্য সাদৃশ্যকে বর্ণিকাভঙ্গ দিয়া ও সকল অঙ্গের সহিত সকলের একটি অকাট্য ও অবিরোধ সম্বন্ধ ঘটাইয়া ষড়ঙ্গটিকে এমন একটা পরিমিত গতি ও ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে ষড়ঙ্গটি একটা ছন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন্তরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না।

রূপ প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা করে সুতরাং প্রমাণ আসিয়া রূপে মিলিয়াছে। অমনি ভাবের উদয়, লাবণ্যের সঞ্চার, সাদৃশ্যের গলাগলি ও বিচিত্র রঙ্গ ভঙ্গ! যেন নট ও নটী আমাদের চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে! ষড়ঙ্গটির এই স্বচ্ছন্দ গতিই সাক্ষ্য দিতেছে যে আমাদেরও ষড়ঙ্গের মূলে প্রাণের ছন্দ তরঙ্গায়িত এবং রূপভেদের অর্থ শুধু আকারের বিভিন্নতা দেওয়া বা বোঝা নয় কিন্তু আকার কোথায় সজীব, কোথায় নির্জীব রূপে দেখা যাইতেছে তাহাই বোঝা ও বোঝানো।

চেতন অচেতন উৎপত্তি নিবৃত্তি ইহারি ছন্দে বিশ্বজগৎ বাঁধা। তেমনি জীবিত রূপ ও নির্জীব রূপ ইহারই লয়ে আমাদের ষড়ঙ্গটি বাঁধা। বস্তুরূপটি চেতনার স্পর্শে কখন্ কোথায় প্রাণবান কোথায় বা চেতনার অভাবে সেটি ম্রিয়মাণ ইহাই আমাদের ষড়ঙ্গের মূল মন্ত্র। আর ষড়ঙ্গের গোড়াতেই যে 'ভেদ' আর সব শেষে যে 'ভঙ্গ' শব্দ দুইটি

রাখা হইয়াছে তাহারাই হইতেছে আমাদের ষড়ঙ্গ মন্ত্রণাগারের দুই কুলুপ অথবা ডবল তালাবন্ধ দুই কবাট; ইহারি মধ্যে রূপকথার 'পরাণ ভৃঙ্গের' মত ষড়ঙ্গের ছয় কৌটার অন্তরালে চিত্রের ও চিত্রকরের প্রাণের রহস্যটুকু গোপন রহিয়াছে। ভেদ আর ভঙ্গ দুই কবাটকে বাহিরের দিকে টানিয়া মিলাইলে বাহিরটাই দেখা যায়, মন্দিরের ভিতরটা আড়াল পড়ে, আবার সে দুটিকে একটু কষ্ট করিয়া ঠেলিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করাইলে ভিতর বাহির হইয়া পড়ে বাহিরটা ভিতরে গিয়া মেলে। এই ভেদ আর ভঙ্গের ওঠা-পড়ার ছন্দটিই হচ্ছে ষড়ঙ্গের মরণ-বাঁচনের কাঠি এবং এই কাঠির স্বচ্ছন্দ প্রয়োগেই চিত্রকরের গুণপনা। তা ছাড়া ষড়ঙ্গকার 'যোজনম্' এই শব্দটি ষড়ঙ্গের ঠিক হৃদয়ের মাঝখানটিতে বসাইয়াছেন; ষড়ঙ্গের মস্তিষ্কে ভেদাভেদ জ্ঞান, দুই পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হৃদয়-গ্রন্থিটি দিয়া দুইকে এক করা হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতেও আলেখ্যের গোড়ার কথা হচ্ছে—Contrast, Unity, Variety অথবা ভেদ, যোজন ও ভঙ্গ বা ভেদ ও ভঙ্গের যোগসাধন পরিণয়।

ভেদ আর ভঙ্গের মাঝে যোজনম্ কথাটি যেন সাদা কালো জুড়ি ঘোড়ার মুখের লাগাম! ডাহিনের ঘোড়া ডাহিনে যাইতে চাহিতেছে, বামের ঘোড়া বামেই দৌড়িতে চাহিতেছে, রথ আর কোন দিকে অগ্রসর হইতেছে না, যেমনি যোজনের লাগামের টান পড়িয়াছে অমনি দুই ঘোড়ার মুখ এক হইবার দিকে ঝুঁকিয়া আসিয়াছে এবং সাদা কালো দুই ঘোড়া পাশাপাশি ভঙ্গী সহকারে সারথির মনোমত স্বচ্ছন্দ গতিতে মনোরথকে টানিয়া চলিয়াছে।

সারথি যেমন লাগামের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তিটুকু সঞ্চালিত করিয়া দুই অশ্বের, উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যান, বাহন ও নিজের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন শিল্পীও তেমনি বার্ণিকা বা বর্ণবর্ত্তিকা—আমরা যাহাকে বলি তুলি তাহারই টানটোনের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা-শক্তি বা বাসনাকে প্রবাহিত করিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের সৃষ্টি যে চিত্র এবং নিজেকেও এক ছাঁদে বাঁধিয়া চলেন; এই কথা চীন ষড়ঙ্গকার স্পষ্ট করিয়া জোর করিয়া বলিয়াছেন আর আমাদের ষড়ঙ্গকার সেই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া ঠারে ঠোরে বলিতেছেন। চিত্রের সহিত, চিত্র যে দেখে, চিত্র যে লেখে, এবং চিত্রে যাহাদের লেখা যায় তাহাদের পরস্পরের প্রাণের পরিচয় ঘটানোই দুই ষড়ঙ্গ সাধনারই চরম লক্ষ্য।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ক্ষেতের পথে

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ব্রাহ্মণ মহাসভা

কালীঘাটে সম্প্রতি বাঙ্গলার মহাব্রাহ্মণ-মণ্ডলী যে মহাগর্জ্জন করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই! কেননা সে গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ হবে না; কিন্তু লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে—বহু আরম্ভে লঘু ক্রিয়া অজা-যুদ্ধেই শোভা পায়। মানুষে ওরূপ ব্যবহার করলে, মানুষের তাতে হাসিও পায়—কান্নাও পায়।

আমি বিলেত-ফেরৎ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের নাম-কাটা সেপাই; কিন্তু নাম-কাটা হলেও সেপাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কালীঘাটে যে প্রহসনের অভিনয় করেছেন, তার জন্য লজ্জিত হবার আমার অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, আমি ইংরাজি-শিক্ষিত এবং বাঙ্গালী, এবং এই দুই কারণেই এই বিনা-মেঘে গর্জ্জনরূপ ব্যাপারটিতে আমি ভীত না হই, স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

(১)

আমার একটি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান কায়স্থ বন্ধু আমার প্রতি কটাক্ষ করে এই কথা বলেন যে, ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ইংরাজি শিক্ষা লাভ করলেও, বিলেত গেলেও, তার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার এবং তজ্জনিত মানসিক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করতে পারে না। আমার অপরাধ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়ের আবিষ্কার এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমি ইতস্ততঃ করি। আমার বিশ্বাস,—সে আমি ব্রাহ্মণ বলে নয়, আইন ব্যবসায়ী বলে। কিসে কি প্রমাণ হয়, আর না হয়, সে বিষয়ে আমার কতকটা জ্ঞান আছে। সে যাই হোক, পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ যে কতক পরিমাণে সত্য, এ কথা কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তান পৈতা-ছুঁয়ে অস্বীকার করতে পারবেন না। জাত্যভিমান আমাদের মনের কোণে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে এবং সময়ে অসময়ে বের হয়ে পড়ে। কুল-গৌরব করাটা এদেশে যদি কারও পক্ষে মার্জ্জনীয় হয় ত সে ব্রাহ্মণের পক্ষে। আমি জানি যে, আমরা যে মুনিঋষিদের বংশধর এ কথা আজকাল নির্ভয়ে বলা চলে না। কেননা তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিম্বা ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই নিয়ে এমন একটি তর্ক উত্থাপিত করা হয়েছে যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমাদের জাতিগৌরব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এ মামলার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার দরকার নেই। উপনিষদ, ক্ষত্রিয়ের পৈতৃক সম্পত্তি হলেও, ব্রাহ্মণে তা এতকাল ধরে ভোগদখল করে আসছেন যে সে দখলী সত্ব নষ্ট করবার জন্য কোনো পুরাণো দলিল দস্তাবেজ আর সমাজের আদালতে গ্রাহ্য হবে না। বহুকাল ধরে যে যোগসূত্র হিন্দুর অতীতকে তার বর্ত্তমানের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে—সে হচ্ছে যজ্ঞসূত্র। দূর অতীতের কথাও ছেড়ে দিলে, এ সত্য কারও অস্বীকার করবার যো নেই যে, ভারতবর্ষের সাতশ বৎসর ব্যাপী ঘোর অমানিশার মধ্যে যে জাতি বিদ্যার ঘীয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, অশেষ দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্যের মধ্যে যে জাতি সাগ্নিকের অগ্নির মত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন, সে জাতির

নিকট ভারতবর্ষ চিরঋণী হয়ে থাকবে। হিন্দুজাতির মন নামক পদার্থটি যে এতদিন রক্ষিত হয়েছে, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গুণে। সুতরাং হিন্দুমাত্রেরই নিকট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা প্রামাণ্য না হলেও মান্য। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে আজ অনাবশ্যকে নব্যশিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট নিজেদের উপহাসাস্পদ করেছেন, এতে আমার জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। শিষ্টের পালন ও দুষ্কৃতের শাসনের জন্য কালীঘাটে সভা আকারে অবতীর্ণ হয়ে নানারূপ লীলাখেলা কর্‌বার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এটি স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, ভগবান আর যে রূপ ধারণ করেই অবতীর্ণ হোন না কেন, ইতিপূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হন্‌নি। এ ভুল তাঁরা কখনও কর্‌তেন না, যদি না এ ব্যাপারে জনকয়েক ইংরাজি-শিক্ষিত বিষয়ী ব্রাহ্মণের প্ররোচনা এবং পৃষ্ঠ-পোষকতা থাকত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অবশ্য জানেন যে তাঁরা সমাজের শাসক নন, শাস্ত্রী; —তাঁরা ধর্ম্মের রক্ষক নন, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের রক্ষক। এক কথায় তাঁরা শুধু সমাজের Books of Reference, বড় জোর Guide Book। ধর্ম্মের উচ্চ আদালত গড়ে তাতে ফুলবেঞ্চ বসানো এঁদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র; —কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যা খুসি তাই ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু সে ডিক্রী সমাজের উপর জারি করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। উদাহরণস্বরূপে দেখান যেতে পারে যে, সমুদ্রযাত্রারূপ অপরাধের জন্য, আমার জ্ঞাতিকুটুম্বেরা যখন আমাকে সমাজচ্যুত করেন, তখন যদি আমি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করে, নবদ্বীপ হতে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এই মর্ম্মে একটি পাঁতি নিয়ে গিয়ে তাঁদের সুমুখে উপস্থিত হতুম, তা হলে তাঁরা সে বিধান সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর্‌তেন। বিষয়ী ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনযাত্রা, বিষয়ী ব্রাহ্মণের দক্ষিণার উপরে নির্ভর করে; কারণ পণ্ডিতেরা গৃহস্থ; বিষয়ী নন্‌। আমি ইংরাজি-শিক্ষিত বলে, এ ব্যাপারে লজ্জিত, কেননা আমাদের একদলের প্রলোভনে পড়েই পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই সব অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন করেছেন।

ইংরাজি-শিক্ষিত ধর্ম্ম-রক্ষকেরা নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, চরিত্র এবং অবস্থা অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু মোটামুটি ধরতে গেলে এঁদেরও চার বর্ণে বিভক্ত করা যায়।

যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাঁরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। শুনতে পাই হার্বার্ট স্পেন্‌সর এঁদের গুরু। এঁরা প্রচার করেন যে, মনোজগৎ জড়জগতের অধীন, জড়জগৎ মনোজগতের নয়; অতএব যে সমাজ যত জড় সে সমাজ তত আধ্যাত্মিক। সুতরাং জড় বস্তুর নিয়মে এঁরা সমাজকে বাঁধতে চান,মানুষকে জড়ে পরিণত কর্‌তে চান। সাহিত্যে এই ব্রাহ্মণ পাচকের দল, সংস্কৃত শাস্ত্র এবং ইংরাজি বিজ্ঞান একত্র ঘেঁটে নিত্য খিচুড়ি পাকান, যাতে না আছে নুন, না আছে ঘী, না আছে মশলা। সে খিঁচুড়ি গলাধঃকরণ করা, আর না করা, আমাদের স্বেচ্ছাধীন। এঁদের পাণ্ডিত্যের উপদ্রব, বাঙ্গালীর মনের উপর,

সমাজের উপর নয়। এঁরা যে কথা নিজে বিশ্বাস করেন না তাই অপরকে বিশ্বাস করাতে চান;—অবশ্য লোক-হিতের জন্য।

আর একদল আছেন, হিঁদুয়ানি করা যাদের ব্যবসা। এঁরা হচ্ছেন বৈশ্য। এ শ্রেণীর লোক সমাজে চিরকাল ছিল এবং থাক্‌বে;—এঁরা সকলের নিকটেই সুপরিচিত, সুতরাং এঁদের বিষয় বেশি কিছু বলবার নেই। তবে কালের গুণে এঁদের ব্যবসা নতুন আকার ধারণ করেছে। এঁরা হিঁদুয়ানির লিমিটেড কোম্পানী করে বাজারে ধর্ম্মের সেয়ার বেচেন;—অবশ্য গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য।

আর একদল আছেন, যাঁদের পক্ষে সমাজের বিধি-নিষেধের দাসত্ব করা স্বাভাবিক;—এঁরা শূদ্র। এঁরা একটা কিছু না মেনে চল্‌লে, চলতে পারেন না; এঁরা ভালবাসেন পরের দ্বারা যন্ত্রের মত চালিত হওয়া। এঁরা তর্কযুক্তিকে ভয় পান; এঁরা আদেশের বশবর্ত্তী বলে কারও উপদেশ কানে তোলেন না। এঁরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করেন,—নির্ব্বিচারে তার নিয়ম পালন করে'। এঁরা নিজে শাসিত হতে চান্‌, পরকে শাসন করতে চান না।

আর একদল হচ্ছে নব্য-ক্ষত্রিয়; এঁরাই হচ্ছেন সকল নাটের গুরু। এঁরা শূদ্রের ন্যায় স্বর্গে যাবার সস্তা টিকিট স্বরূপে টিকি শিরোধার্য্য করেন না—করেন ধর্ম্মের ধ্বজা স্বরূপে, এবং তারই আস্ফালন করে' বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য। এঁদের বিশ্বাস, এঁদের মস্তকের শিখা চাণক্যের শিখা;—যাতে গিঁট বাঁধলেই আমাদের মত প্রকাশ্য অনাচারীদের বংশ সবংশে উৎসন্ন হয়ে, অনাচারীদের গুপ্ত বংশ সমাজের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে যাই হোক্‌, এঁদের ধর্ম্ম হচ্ছে, শুধু ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি করা। ধর্ম্মক্ষেত্রে একটা কুরুক্ষেত্তর না বাধিয়ে এঁরা স্থির থাক্‌তে পারেন না। অথচ এঁদের নব্য-তান্ত্রিকদের শাসন করবার ইচ্ছা যদ্রূপ, ক্ষমতা তদ্রূপ নেই। যাঁরা জুতো পায়ে দিয়ে জল খান, সেই মহাপতকীদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য বাঙ্গালী-সমাজের এই ধনুর্ধরেরা সুমুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-রূপ শিখণ্ডী খাড়া করে তার পশ্চাৎ থেকে যে বাণ নিক্ষেপ করেছেন তাতে সে সম্প্রদায় যে আজ জুতো পায়ে দিয়ে শরশয্যায় শয়ান হয়ে, "জল" "জল" বলে চীৎকার কর্‌ছেন, তার ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রমাণ শুধু এরই পাওয়া যায় যে, এদেশে আজও এমন এক শ্রেণীর ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁরা রীতিকে যতই নিরর্থক হোক নীতির অপেক্ষা, মিথ্যাকে যতই স্পষ্ট হোক সত্যের অপেক্ষা, আচারকে যতই কদর্য্য হোক সততার অপেক্ষা উচ্চ আসন দিতে লজ্জা বোধ করেন না। এরা সভা করে এই মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান যে, সামাজিক কপটতাই হচ্ছে সামাজিক ধর্ম্ম, অতএব আচরনীয়। অবশ্য লোকে বলে যে "ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না" কিন্তু ও কাজ করলে শিবের বাবা টের না পেতে পারেন্‌ কিন্তু শিব যে পান না, এ কথা কোন শাস্ত্রেই বলে না। যে যুগে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সকল চিন্তা, সকল যত্ন হচ্ছে জাতি গঠনের দিকে, সেই যুগের সেই সমাজের জনকয়েকের চেষ্টা যে

শুধু জাত মারবার দিকে, এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে! অবশ্য এঁদের ছোঁড়া সংস্কৃত অক্ষরাঙ্কিত কাগজের গুলির ঘায়ে, কেউ আর বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বেন না! কিন্তু সেই কারণেই ব্যাপারটি নিতান্ত হাস্যকর। তাঁদের হাতেই হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার করে তোলা। আর যাঁরা ছোঁয়ানাড়ার বিচার নিয়েই আছেন, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে চুলো পৃথক করে নেওয়া, তাঁদের হাতে পড়লে সমাজ চুলোয় যাবে।

(৩)

ব্রাহ্মণ মহাসভায় এই লম্ফঝম্ফের দরুণ আমি বিশেষ লজ্জিত, কারণ আমি বাঙ্গালী। এই সব ছেলেখেলা আর-যারই পক্ষে শোভা পাক না কেন, বাঙ্গালীর পক্ষে শোভা পায় না। কারণ একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বাঙ্গালী ভারতবর্ষে নূতন প্রাণ এনেছে, সমগ্র ভারতবাসীকে নতুন সুর ধরিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের কাব্য, ইউরোপের দর্শন, ইউরোপের বিজ্ঞান, বাঙ্গালীর মনে অইলক্লথের উপর জলের মত গড়িয়ে যায় নি; অল্প বিস্তর সে মনকে আর্দ্র ও সরস করে তুলেছে। অপরদিকে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন সম্পূর্ণ অভিভূতও হয়ে পড়েনি। ইংরাজি সভ্যতার দুর্ব্বার শক্তি আমরা কতক পরিমাণে আয়ত্বও কর্‌তে পেরেছি। আমরা কতক বাধ্য হয়ে, কতক স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমাদের মনকে এই নবাগত সভ্যতার অধীন করেছি। এর কারণ, এই নব সভ্যতার শিক্ষা গ্রহণ কর্‌বার জন্য আমাদের মন প্রস্তুত ছিল।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি মনোভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা! এ তিনেরই বীজমন্ত্র, চৈতন্য বাঙ্গালীর কানে দিয়ে গেছেন। তিনি আপামরচণ্ডালকে কোল দিয়ে সাম্যের প্রতি, প্রেম ভক্তির উদ্বোধন করে মৈত্রীর প্রতি, এবং লোকাচারের অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার প্রতি বাঙ্গালীর মনকে অনুকূল করে গেছেন। তিনি যে ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করেন নি তার প্রমাণ, বাঙ্গলার অধিকাংশ লোক আজ চৈতন্য-পন্থী বৈষ্ণব এবং এই নতুন পন্থার প্রদর্শক তাঁদের কাছে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলে গ্রাহ্য। যে স্বল্প সংখ্যক লোকের মতে তিনি "ন চ পূর্ণ নচাংশ চ" তাঁদেরও যে চৈতন্য চেতন করে তোলেন নি—এ কথাও বলা চলে না। চৈতন্য কখনও ধর্ম্ম শাস্ত্রের দোহাই দেনও নি, মানেনও নি। এর জন্য অবশ্য তাঁর সমসাময়িক শাস্ত্রব্যবসায়ীরা তাঁকে বিধিমত জ্বালাতন কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি ভগবদ্ভক্তিকে মৃগী বলে, তাঁরা শচীমাতাকে, ওঝা ডাকিয়ে মহাপ্রভুকে ঝাড়াফুঁকো কর্‌বার, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য যে ভাবের বন্যা এনেছিলেন তাতে সমগ্র দেশ ভেসে গেছে;—শাস্ত্রের বাঁধ তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে নি। ভারতবর্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে 'যুগধর্ম্ম' বলে যে একটি জিনিষ আছে সে কথা স্বজাতিকে বুঝিয়ে দেন। এই "যুগধর্ম্ম" অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও

বিভিন্ন। শাস্ত্রের ধর্ম্ম হচ্ছে অতীতের "যুগধর্ম্ম"; সুতরাং বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হতে পারে না। আমরা বাঙ্গলা দেশের নব্য-তান্ত্রিকেরা বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" অনুসারেই জীবন গঠন করবার চেষ্টা কর্‌ছি। সে জীবন শাস্ত্রের দ্বারা কেউ সম্পূর্ণ শাসিত কর্‌তে পারবে না।

যদি কেউ বলেন যে, স্বয়ং চৈতন্যও যখন এ সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়্‌তে পারেন নি, তখন তোমরা কি ভরসায় হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে গড়্‌তে চাও? ও চেষ্টার ফলে বড় জোর তোমরা একটি নূতন ভেকধারীর দল গড়্‌বে। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র মনের জোরে সমাজের সম্পূর্ণ বদল করা যায় না,—যদি না সামাজিক অবস্থা সেই মনের সহায় হয়। চৈতন্যর সময় এমন কোনও বাহ্য ঘটনা ঘটে নি, যাতে করে সমাজকে পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য কর্‌তে পার্‌ত। তখনকার সমাজের গায়ে কর্ম্ম-জীবনের প্রবল ধাক্কা লাগে নি। কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। একদিকে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের মনের বদল করছে, অপর দিকে ইংরাজের শাসন আমাদের কর্ম্মজীবনে অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব দিচ্ছে।

আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোনই যোগ নেই। ওকালতি, জজিয়তি, ডাক্তারি, মাষ্টারি,, এঞ্জিনিয়ারি, কেরাণিগীরিতে বর্ণভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই। বিদ্যালয়ে ও কর্ম্মক্ষেত্রে সকলে সমান,—সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ ব্যক্তিগত;—জাতিগত নয়। সে প্রভেদ কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে;—জন্মের উপরে নয়। সুতরাং জাতিভেদ এখন সমাজে নেই;—আছে শুধু ঘরে। তার পর তুমি চাও, আর না চাও, কর্ম্মজীবনের বাধাস্বরূপ অশনবসনের সামাজিক নিয়ম, নিষ্কর্ম্মা ছাড়া অপর সকলেই লঙ্ঘন কর্‌তে বাধ্য। সেই কারণে বাঙ্গলাদেশের যত নিষ্কর্ম্মার দলই, অর্থাৎ, জমিদার ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দলই খাদ্যাখাদ্যের বিচাররূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে বৃথা কালক্ষেপ করতে পারেন। সুতরাং শুধু জ্ঞানে নয়, কর্ম্মেও—এই নবযুগ আমাদের সমাজ-শাসনের বহির্ভূত করে স্বাধীন করে দিচ্ছে। যে জ্ঞানের ও যে কর্ম্মের স্রোত আমাদের সমাজের ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে—তার গতি কেউ ফেরাতে পারবেন না। ও যমুনা উজান বহাতে স্বয়ং ভগবানের বাঁশির আবশ্যক। কিন্তু আশা করি, ব্রাহ্মণের বংশধরেরা নিজেদের বংশাধারী বলে মনে করেন না। তা ছাড়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি ধরাধামে পুনরাগমন করে' বাঁশি বাজান, তাহলে, এ যমুনা যতক্ষণ সেই বাঁশি বাজবে ততক্ষণই উজান বইবে। সে বাঁশি যেই থামা, অমনি আবার স্রোত সুমুখের দিকে ছুটবে,—সম্ভবতঃ দ্বিগুণ বেগে। এ স্রোতের বলে সমাজে যে ফাট্ ধরেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই,—কিন্তু তা বলে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। যে ফাট দেখা দিয়েছে তা ভাঙ্গনে পরিণত হবে,—কিন্তু রাতারাতি নয়। তার পর পূর্ব্বকূলে যা শিকস্তি হবে পশ্চিম কূলে আবার তাই পয়স্তি হবে। এই নূতন জীবনের স্রোত সামাজিক মনের ও চরিত্রের ক্ষুদ্রত্ব ভেঙ্গে, কি মহত্ব গড়ে তুল্‌ছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দামোদরের বন্যার

সময় পাওয়া গেছে। আমাদের যুবক সম্প্রদায়, ভাইকে অস্পৃশ্য করে তুল্‌তে চায় না; ছত্রিশ জাতকে ভাই করে নিতে চায়। যে সাম্য, যে মৈত্রী ও যে স্বাধীনতার ভাব চৈতন্য প্রথমে এদেশে প্রচার করেন—সেই ভাবের উপরই বাঙ্গালীর নবজীবন গঠিত হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় সভ্যতার উত্তর-সাধকতায়, নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সমাজ কোন ছায়াময়ী বিভীষিকা দেখিয়ে তাদের সে সাধনা থেকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

(৪)

ব্রাহ্মণ-মহাসভা যে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছেন, তার বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষে নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতিরিক্ত কাজ কর্‌তে গেলে নিজে কাঁদতে পারে; কিন্তু অপরকে হাসায়।

প্রথমতঃ হিন্দুসমাজ শাস্ত্রশাসিত নয়; লোকাচার-চালিত। সমাজ আবহমানকাল যে এইভাবে চলে আস্‌ছে তার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। মনু এ কথা স্বীকার করেছেন; শুধু তাই নয়, তাঁর মতে লোকাচার এত প্রবল যে তার উপর হস্তক্ষেপ কর্‌বার ক্ষমতা রাজারও নেই। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের পাতা একবার উল্টে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালী-হিন্দুসমাজ মনুর শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ শতকরা পাঁচটিও পালন করেন না। শাস্ত্রে বলে লোক সমাজ,—লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারের বশবর্ত্তী। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ এই তিনটির উপর আর একটিরও বিশেষ অধীন—সেটি হচ্ছে স্ত্রী আচার। সুতরাং হিন্দু-সমাজের বিধি-নিষেধ পুঁথিতে নেই, আছে পাঁজিতে। এ অবস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজকে কি করে শাসন করা যেতে পারে—তা আমার বুদ্ধির অগম্য। লোকাচার রক্ষা কর্‌বার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যক নেই; লোকাচার নষ্ট কর্‌বার জন্য শাস্ত্র অনেক সময়ে আমাদের হাতে অস্ত্র। শাস্ত্রকে এই অস্ত্র হিসেবেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং দয়ানন্দ স্বামী ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ মহাসভার প্রথম ভুল এই যে, তাঁরা শাস্ত্রের সাহায্যে লোকাচারের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চান।

এঁদের দ্বিতীয় ভুল এই যে, এঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজকে শাসন কর্‌তে চান। হিন্দুসমাজ বলে' কোনও একটা সমগ্র সমাজ নেই। আমাদের হাজারো-এক জাতির এবং তাদের শাখা উপশাখার সমাজ সব স্বতন্ত্র সমাজ। এই অসংখ্য খণ্ড সমাজসকল সব স্বস্ব প্রধান, কোনও বিশেষ জাতির কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের শাসনাধীন নয়। অবশ্য এ সকল সমাজেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব আছে। কিন্তু সে হচ্ছে ধর্ম্মযাজক হিসেবে;—সমাজের শাসনকর্ত্তা হিসেবে নয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট ব্রাহ্মণের মত, ক্রিয়া-সম্বন্ধে গ্রাহ্য;—কর্ম্ম সম্বন্ধে নয়। বাঙ্গলার কায়স্থসমাজ বিলেতফেরতকে সমাজভুক্ত করে নিয়েছেন এবং যদৃচ্ছা উপবীত ধারণ করছেন। ব্রাহ্মণসমাজের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যাতে করে এর জন্য কায়স্থসমাজকে হিন্দু-সমাজ হ'তে বহিষ্কৃত করে দিতে পারেন; কিম্বা কায়স্থদের আবার শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করাতে পারেন

তারপর ব্রাহ্মণ-সমাজ বলেও ভারতবর্ষে কোন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র সমাজ নেই। আমরা শত শত খণ্ড-সমাজে বিভক্ত এবং তার একখণ্ডের সঙ্গে আর একখণ্ড সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। হিন্দুদের জাতমারা-বিদ্যে কত দিন থেকে হয়েছে তা আমি জানি নে; কিন্তু সে বিদ্যেয় আমরা এমনি পারদর্শী হয়েছি যে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিকাংশ লোককে আমরা জাতিভ্রষ্ট করে রেখেছি। আমরা যে-শূদ্রের হাতে জল খাই সেই-শূদ্র-যাজক-ব্রাহ্মণের হাতে জল খাই নে। শুধু তাই নয়, বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা যে দেবতার পূজা করেন সে দেবতারও আমরা জাত মারি। শূদ্রের ঠাকুরের সুমুখে আমরা মাথা নীচু করি নে; তার ভোগ আমরা স্পর্শ করিনে। যদি ব্রাহ্মণমাত্রকে একত্র করে আমরা একটি সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ গড়ে তুলতে পারতুম, তা হলেও নয় হিন্দুসমাজকে শাসন কর্‌বার কথা বলা চল্‌ত। কিন্তু আমরা আমাদের জাত-মারা-বিদ্যের গুণে পারি শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেল্‌তে। আমাদের গুণীপনার পরিচয় গুণে নয়, ভাগে। ব্রাহ্মণ-সভা কালীঘাটে শুধু সেই বিদ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। বিলেত ফেরত প্রভৃতি অনাচারীদের জাত মেরে তাঁরা আর একটি খণ্ড-সমাজ গড়ে তুল্‌তে চান। তাতে আর যার ক্ষতি হোক, আর না হোক্, এই নূতন খণ্ডের কোনও ক্ষতি হবে না। হিন্দুসমাজ পুরুভুজের ন্যায় জীব;—তার খণ্ডিত অঙ্গগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়। সত্যকথা বল্‌তে গেলে, আমরা বিলেত যাওয়ার দরুণ সমাজ হতে যে মুক্তি লাভ করেছি তার জন্য হিন্দুসমাজের এই বহিষ্করণী শক্তির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

আমার শেষকথা এই যে,—ইউরোপের সমাজের সকল আচার পদ্ধতি যে নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কিম্বা মঙ্গলকর তা অবশ্য নয়। জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে যে, তা মানুষকে ভালর দিকেও এগিয়ে দিতে পারে মন্দের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। জীবন্ত পদার্থের স্বেচ্ছা বলে' একটা জিনিষ আছে;—জড়পদার্থই কেবল ষোল আনা জড়জগতের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বজাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য কি ভাল, আর কি মন্দ, সে বিচার কর্‌বার শক্তি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নেই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিচার—সে ত পুঁথিগত-বিদ্যার মল্ল যুদ্ধ—তার উদ্দেশ্য সত্যনির্ণয় করা নয়, বিপক্ষকে চিৎ করা। পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন শুধু ন্যায়ের প্যাঁচ ও কাটান্। এ মল্লযুদ্ধ দেখতে আমোদ আছে কিন্তু করে কোনও ফল নেই। কুস্তিগির পালোয়ানেরা যেমন আখ্‌ড়ার বাইরে অকর্ম্মণ্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও তেমনি শাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে অকর্ম্মণ্য। যে জ্ঞানের দ্বারা, যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা—আমাদের নব-জীবনকে জাতীয় মঙ্গলের পথে চালিত করা যায়—সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি টোলে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। সে বিচার নব্য-তান্ত্রিকদেরই করতে হবে, যখন তা করা আবশ্যক হবে। এখন হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার যুগ;—ঘরে বসে ভয়ে ভাবনায় শক্তি অপব্যয় করবার নয়। আমরা যে হালখাতা খুলেছি তাতে বকেয়া টানা শুধু পণ্ডশ্রম। যদি প্রথম ঝোঁকে ভুল পথে যাই তবে ঠেকে শিখে সে পথ

ছাড়ব। উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করেছেন, সাধ করে আর তা পায়ে পরবেন না। বিদ্যাপতি বলে গেছেন "পানী পিয়ে পিছু জাতি বিচারি।" জ্ঞানের অভাবে,কর্ম্মের অভাবে আমরা শত শত বৎসর ধরে শুকিয়েছিলুম। সুতরাং যে জ্ঞানের ও কর্ম্মের স্রোত আমাদের দুয়োর দিয়ে বয়ে যাচ্চে আমরা অঞ্জলিভরে তার জীবন পান করব। জাতি বিচার হবে এখন নয়, তখন—যখন জাতির বিচারবুদ্ধি পরিপক্ক হবে।

আমি বিলেত-ফেরৎ সুতরাং স্বজাতির কাছ থেকে আমার ভয় নেই কিন্তু তার উপর আমার ভরসা আছে। শাস্ত্র আজও ব্রাহ্মণের হাতের অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে যদি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা না করে' ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত হিন্দুসমাজের লোকাচারের নাগপাশ ছিন্ন করেন তাহলেই তাঁরা তাঁদের বর্ণোচিত কাজ করবেন।

শাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, হিন্দুসমাজে মানবজাতির "সামান্য ধর্ম্মের" পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ রকমের "বিশেষ ধর্ম্ম" নষ্ট করতে হবে। ব্রাহ্মণ সমাজে আজও যে এমন অনেক যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও নির্ভিক পণ্ডিত আছেন, যাঁদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজসংস্কার সাধিত হতে পারে, তার প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ-মহাসভাতেই পাওয়া গেছে। কিন্তু এই আর একটি মহা লজ্জার কথা যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উক্ত সভায় ধর্ম্মধ্বজী "বৈড়াল-ব্রতিক" এবং "বক-ব্রতিক" ব্রাহ্মণদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়েছেন।—ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অথ টিকিমেধ যজ্ঞ

দেবতা দিলেন চুল, মানুষ কাটিয়া কৈল 'টিকি'!
খেয়ালে সে কৈল কাবু সুবিখ্যাত শেয়ালের বাপে
টিকির মাহাত্ম্য লিখি'! সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্দ্ধ ধরা; ব্যাখ্যা হইল "অহো! টিকি! কিনা বৈদ্যুতিকী!"
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী...সেই টিকি...কালো ঝিকিমিকি
নির্ম্মূল করিল সিংহ,—তার রৌপ্য কাঁচিটির চাপে।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে,—
সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি...বৈদিকী...তান্ত্রিকী
টিকিমেধ যজ্ঞে তার;...নষ্ট হৈল সর্প সম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ;...মনে মনে মূল্য পেয়ে খুসী
টিকির মালিক যত। অন্তরীক্ষে হাসিল দেবতা;—
অন্ততঃ এ-হেন কাণ্ডে দেবতার হাসিবার কথা।
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান;
কলিযুগে কালীসিংহ উদ্ধারিল দেবতার মান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

তারা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বক্‌রীদে;—
করুক্ যা' খুসী পরে,—প্রথমে তো মূল্য দিয়ে আনে,
মূল্যে হয় গৌণ শুদ্ধি। কিন্তু যারা বঞ্চি' যজমানে
গোদানে প্রবৃত্ত করে,—শেষে বেচে কসায়েরে সিধে
দুধ বন্ধে দ্বিধাহীন,—মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে—
নরকের গন্ধময়,—তা'দের কী বলে অভিধানে?—
বল, খেয়ালীর রাজা! হে রসিক! বল কানে কানে
কিম্বা বল উচ্চকণ্ঠে;—যখন রেখেছ তুমি বিঁধে
গৃহভিতে,—মুখসর্ব্ব ভণ্ড যত গর্ব্বিতের টিকি—
করিয়াছ যজ্ঞ টিকিমেধ,—তখন কিসের দ্বিধা?
পুনঃ তুমি এস বঙ্গে পুণ্যশ্লোক সিংহ গুণধাম।
মোহর কিস্মৎ কার, কার টাকা, কার মূল্য সিকি
জেনে নাও, কর নব্য ব্রাহ্মণ্যের মূল্য মুসাবিদা,
কাট টিকি, লেখ নাম, রফা ক'রে ফেলে দাও দাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি *

জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে একজন গুরু-মহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটই ইহার হাতে খড়ি হয়। সেই পাঠশালায় পাড়াপ্রতিবেশী-দিগের অন্যান্য ছেলেরাও পড়িতে আসিত।

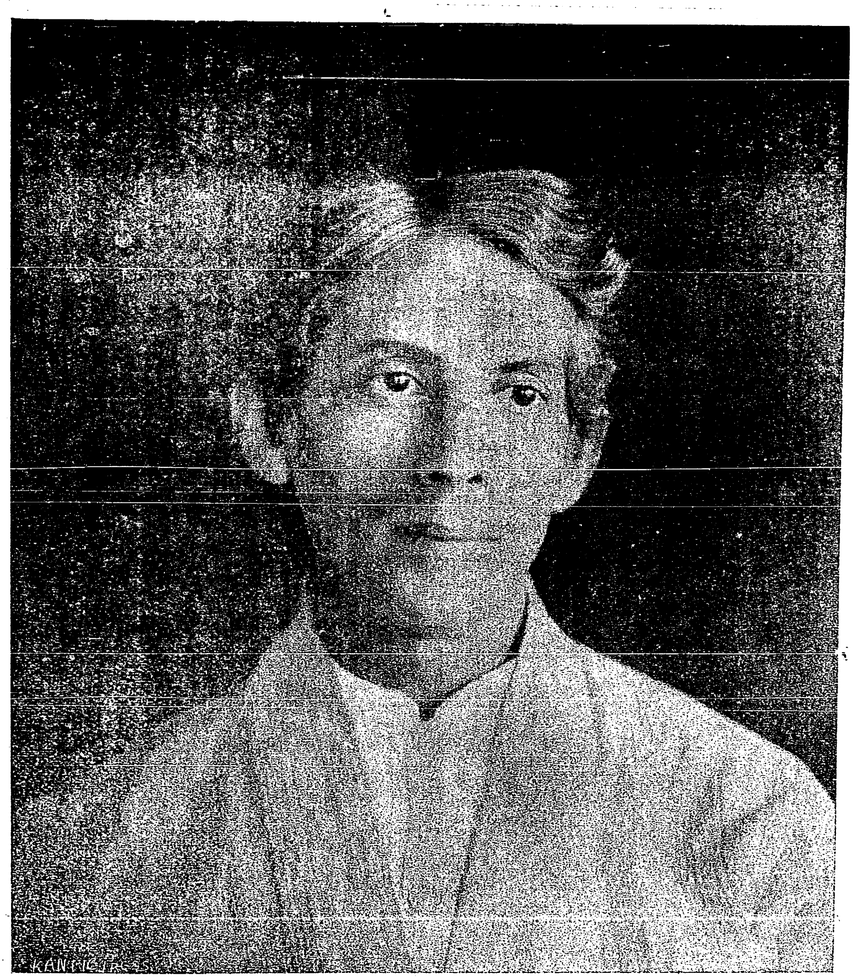

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

* এই প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কথা প্রসঙ্গে সংগৃহীত। অনেক স্থলে কোটেশন চিহ্ন দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখের কথা অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই গুরুমহাশয়টি একবারে সেকেলে গুরু-মহাশয়ের জলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপ-যোড়া মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়, কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। চুল লম্বা, উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ।

ঠাকুরদালানে একটা কালিপড়া মাদুরের উপর পাঠশালার ছেলেরা বসিত। গুরু-মহাশয়ের মুখে কখনও হাসি দেখা যাইত না, যদি বা ওষ্ঠপ্রান্তে কখনও একটু হ সির বক্ররেখা দেখা দিত ত' সে সুতীব্র কুটিল হাসি। ছাত্রদের বেত মারিবার সময় সে হাসিটুকু ফুটিত। বোধ হয় সে শুধু হাতের সুখ অনুভব করিয়া। গুরুমহাশয় পড়াইবার সময় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়া "গুরুচ্ছাদি" তৈল মর্দ্দন করিতেন। সে তৈলের কি-এক বিট্‌কেল গন্ধ! তাঁর এক গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল মাখাইতেন। নিয়মিত তৈলমর্দ্দনে বেত গাছটিতেও বেশ একটা পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্রবাৎসল্য ছিল। একবার তাঁর সেজদাদা ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুষ্টামি করিয়া এই বেতখানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুমহাশয়ের ঠিক যেন পুত্রশোক উপস্থিত হয়। পরে অনেক খোসামুদি, সাধ্যসাধনা করিয়া বেতটি তাঁর নিকট হইতে ফিরিয়া পাইয়া তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েন। অপরাধে, বিনা অপরাধে, যখন তখন, এই বেত গাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকণ্ডূয়ন যে, যখন ছুটি দিতেন তখনও দুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।

ইহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতি বাবুর অভিভাবক তাঁহার সেজ্‌দাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তাঁহার শিক্ষা-রীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে বসিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার মনে হইত, তিনি যেন জেলখানায় আছেন—সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকারময়—তাঁহার হৃদয় ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন হইত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর তাঁর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন্ ফেলা প্রভৃতি অভ্যাস করাইতেন, এবং তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সেজ্‌দাদা হেমেন্দ্র-বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল, তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সদা সর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির আলোচনায়



গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপন-মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—বেশ ব্যুৎপত্তিও একটু জন্মিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম-ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গুরুভার মুদ্গর অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক সময় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, ঘায়ে তাহাই লাগান' হইত। একদিন একজন হিন্দুস্থানী বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে এই ঘায়ে ব্রাণ্ডি দিয়া এক কড়াই গম্‌গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিকে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বেশী বয়সে অশ্বারোহণ শাকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

তারপর তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসন হইতে তিনি কতকটা অব্যাহতি পাইলেন। ফলতঃ শৈশবকাল তাঁহার সুখে কাটে নাই। কিন্তু একটা সুখস্মৃতি, কালো মেঘের ধারে রজত-কিরণ রেখার ন্যায় তাঁহার চিত্তপটে এখনও পরিস্ফুট রহিয়াছে।

তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খুব ঘটা-পূর্ব্বক দুর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়ীতেই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত। প্রথম যখন গরুর গাড়ী করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণের কাঠাম' আসিয়া পড়িত, তখন হইতেই জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ঔৎসুক্য আরম্ভ হইত। তারপর খড়বাঁধা, একমাটি, দোমাটি, রং দেওয়া মুণ্ড বসান' প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমা খানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন তাঁহার ঔৎসুক্য এবং আনন্দের আর সীমা থাকিত না। স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াই তিনি ঠাকুরদালানে উপস্থিত হইতেন এবং তন্ময় হইয়া কারিকরদের গঠনকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেন। তারপর আবার "চালচিত্র।" কত হাতী ঘোড়া দেব দেবীর মূর্ত্তি পটুয়া-দিগের নিপুণ তুলিকায় নানারঙে সাদাজমির উপর ফুটিয়া উঠিত—তিনি একমনে বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ করিতেন; এবং পটুয়া-দিগকে মধ্যে মধ্যে পানের খিলি যোগাইয়া মনে-মনে একটা বালসুলভ গৌরব অনুভব করিতেন। এক বৎসর "চালচিত্রের" সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভগিনী ঐ পাঠশালায় তালপাতায় "ক" "খ" র দাগা বুলাইতেন। (সে ভগিনীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়।) পটুয়ারা চালচিত্র সম্পূর্ণ করিয়া কাপড় ঢাকা

দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—পূজার আর দুই এক দিন মাত্র বাকী,—এমন সময় সেই ভগ্নীটির কি এক খেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাপড়খানার ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত চালখানি কালির পোঁচে চিত্রবিচিত্র করিয়া দিলেন। এতদিনকার সযত্ন-সম্পাদিত চিত্রকর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তখন আবার পটুয়া-দিগকে ডাকাইয়া যেমন-তেমন করিয়া চালচিত্রিত হইল।

তারপর পূজার তিন দিন বাড়ীর উঠানে যাত্রা হইবে। তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সে কি আমোদ! উঠানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বড় বড় কাঠের থাম পোতা হইতেছে, তাহার সহিত কাঠের গরাদে' জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে! সেই ঘরের ভিতর যাত্রা গান হইবে! সেই স্তম্ভ পরিবেষ্টিত বিস্তৃত পরিসর



নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমির উপর বড় বড় গালিচা পাতা; পাড়ার ছেলেরা আসিয়া মহানন্দে বৈকাল হইতেই তাহার উপর ডিগ্‌বাজী খেলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। কাষ্ঠস্তম্ভের মাথা হইতে বক্র লোহার শিকে ঝাড় ঝুলিতেছে। সায়াহ্নে যখন সেই সব ঝাড় জ্বালান' হইতে লাগিল, তখন কি আনন্দ! আরতির সময় ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন দেবীর অস্পষ্ট মুখ তাঁহার মনে অজানা রহস্যের এক সুন্দর মোহ-জাল বিস্তার করিত। বাড়ীর ছেলেদের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া চাকরেরা সকাল সকাল বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিত যে, ভোরের সময় আসিয়া তাহারা আবার যাত্রা শোনাইতে লইয়া যাইবে। বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাত্রা শুনিবার জন্য চোখে ঘুম নাই। এগারটা রাত্রে যেই ঢোলে চাঁটি পড়িল অমনি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে বাহিরের মজ্‌লিশে গিয়া হাজির। উঠান লোকে লোকারণ্য। বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ভিড় করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইয়া। এ তিন দিন অবারিত-দ্বার! অনেকগুলি মশালচী মশাল-হাতে উঠানের নানাদিকে রহিয়াছে। লালপাগড়ী-ধারী দারোয়ানেরা "বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে" করিয়া লোকদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে বেত্রচালনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এই যাত্রা কেবল বাড়ীর ছেলেছোকরা এবং বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য।

বৈঠকখানায় অভিভাবকদের মজ্‌লিশ্। সেখানে বাইনাচ চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীনু ঘোষালের উপর। দীনু ঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্য-মহাশয়দের একজন মোসাহেব—সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীনু ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদালানের রোয়াকে মজ্‌লিশ্ করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে রুমালে টাকা বাঁধিয়া ছেলেদের হাত দিয়া "পেয়ালা" দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাই দাস এবং নিতাই দাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোষাক ছিল জরির চাপ্‌কান, জরির কোমরবন্দ, পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য ঝুটা। যে কালে যে পোষাকের ফ্যাশান্ যাত্রা-ওয়ালারাও তাহাই অনুকরণ করিয়া থাকে।

এই যাত্রার "কেলুয়া ভুলুয়া" প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। "শুম্ভ নিশুম্ভ"র পালায় যখন রক্তবীজ সাজঘর হইতে "রে রে রে রে" করিয়া ডাকাতি-হাঁক্ দিতে দিতে আসরে আসিত তখন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ডাকাতদের মত তাহার লম্বা চুল, ইয়া চৌগোপ্পা, মালকোঁচামারা রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে ঢাল তলোয়ার—সে এক ভীষণ চেহারা। আর মুকুটভূষিতা আলুলায়িত-কেশা দুর্গা যে সাজিত সে যেন রূপে আলো করিয়া আসিত। আর তার তলোয়ার খেলার কি কস্‌রৎ। বন্ বন্ করিয়া তলোয়ার ঘুরাইত যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত। আবার রাক্ষসের মুখস্ পরা' ধূম্রলোচন পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য যখন ছেলেদের বসিবার স্থান দালানের রোয়াক দিয়া নামিত তখন ছেলেরা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিত—কেহ কেহ একবারে কাঁদিয়া উঠিত।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু বলিলেন,

"বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়িতে বিষ্ণু গায়কের বিজয়া গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া শান্তির জল লইতাম তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্নে আমরা অভিভাবকগণের সহিত ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া প্রতিমা ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর বাড়ী আসিয়া বড়ই ফাঁক ফাঁক ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত।

"এই দুর্গোৎসবে—দেব,মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃশ্যই দেখা যাইত। বিজয়ার দিন, সকল শত্রুতা ভুলিয়া বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন, গুরুজন বলিয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ এবং কনিষ্ঠদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদের যে ধুম পড়িয়া যাইত—আমার মনে হয় এ একটা স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা। মানব ভাব,—যেমন কোন আত্মীয়ার আগমনে ও বিদায়-কালে অশ্রুপাত। দেবীকে "মা, মা" বলিয়া ডাকিয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রীতি জন্মিত তাহা কথায় বলা যায় না। এইরূপে হৃদয়ের কি এক অপূর্ব্ব কোমলতা বিকাশিত হইত! অপর দিকে চালচিত্র-অঙ্কনে ও প্রতিমানির্ম্মাণে চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্য্য বিদ্যারও একটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণনগরের কুমোর পটুয়াদের এ বিষয়ে এত উৎকর্ষ লাভেরও ইহা একটা প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। এই উৎসবে, মানুষের হৃদয়ে দেবভাব ও মানব-ভাব যেমন উদ্বোধিত হয়, দানব-ভাবও তেমনি আর-একদিকে দৃষ্ট হয়। পূজার আরম্ভ হইতে চতুর্দ্দিবসব্যাপী মদ্যের ছড়াছড়ি। টেকচাঁদ ঠাকুর ঠিক্‌ই লিখিয়া গিয়াছেন "সিদ্ধিরস্তু" শুধু নয়, "অ-আ" পর্য্যন্ত গড়াইত। দ্বিতীয়তঃ পশু বলিদান। সে এক বীভৎস ব্যাপার! বড় বড় মহিষ ছাগ প্রভৃতির রক্তে পূজাঙ্গনে রক্ত বন্যা বহিয়া যাইত,—এই রক্ত-কর্দ্দমিত স্থান দেখিলে মনে এক অতি নিষ্ঠুর দানব ভাব জাগিয়া উঠিত সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়ীতে অবশ্য পশুবলি হইত না, কুমড়া বলিতেই কায হইত।

"পূজার সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে থাকিতেন না। কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পূজার ভার আমার দুই কাকা স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের উপরই ন্যস্ত থাকিত।

"মেজ' কাকা (৺গিরীন্দ্রনাথ) বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি পরীক্ষাগার (Laboratory) ছিল, তাহাতে Battery প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র ছিল। তাহা দ্বারা তিনি অনেক বিষয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিতেন। তিনি খুব ভাল গান রচনাও করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "বাবুবিলাস" নামে যাত্রা, আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা তখন খুব ছোট - উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতাম মনে আছে। উদ্যানরচনাতেও তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণদাদাতেও (তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোট কাকামহাশয় ৺নগেন্দ্রনাথ

ঠাকুর আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণ জালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপ-চিকির্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়া অপরকে ঋণ-মুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য তিনি বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোট কাকা মহাশয়ই এ কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত সদর রাস্তা ও আমাদের গলি একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর Spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের (মহর্ষি) একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে আচার্য্যের পদে বৃত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম্ম বেশ সুচারুরূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাবুর কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহারে মহারাজা কেমন বিরক্ত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আত্মবলি

ইচ্ছা আছে শক্তি নাই, নিরুদ্যম যন্ত্রী,
স্বর্ণবীণা ভূমে লোটে, ছিন্ন সব তন্ত্রী।
ছন্দহীন মহাকাব্য, ভাবশূন্য ভাষা,
পুঞ্জীকৃত কর্ম্মরাশি, নাহি পুণ্য আশা।
হাসি শুধু দুঃখময়, ফুল গন্ধহীন,
হৃদি প্রেমভরা, কিন্তু নীরস মলিন।
দেহ সচেতন, তাহে নাহি রূপ কান্তি,
জীবন রয়েছে পড়ে হৃত সুখ শান্তি।
ভাল যাহা ছিল, চোর নিয়ে গেছে ছলি,
কি দিয়ে পূজিব দেব! লহ আত্মবলি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

লাইকা

(হিন্দুস্থানী গানের ছায়া অবলম্বনে)

(১)

লাইকা তরুণ যুবা; তাহার যত্নবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিবেষ্টিত মুখশ্রী, চঞ্চল চক্ষু, মৃদুমধুর হাসি যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। সে সকলেরই প্রিয়। তাহার ঘর ছিল না বলিয়া ঘরের অভাব ছিল না, সমস্ত দেশের সকল ঘরেই তাহার সমান অধিকার ছিল। লাইকা যে দিন যাহার ঘরে অতিথি হইত তাহার ঘরে সেদিন উৎসব! বালক বালিকা লাইকার গল্প শুনিতে ছুটিত, নারীরা তাহার স্নেহের অভিমান গ্রহণ করিয়া প্রীত হইত, মালিনী তাহাকে মালা পরাইয়া যাইত—গোপিকা তাহার ক্ষীর সর লাইকাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইত! যুবকদলে লাইকার অপ্রতিহত প্রভাব—। তাহার গান তাহার কবিতা সর্ব্বোপরি তাহার সুকুমার কণ্ঠে দ্রুত ললিত গতিতে উচ্চারিত সুনিপুণ ভাষার রঙ্গরহস্য—যখন হাসিতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত, প্রতি অঙ্গ চালনায় সঞ্চালিত হইতে থাকিত, সাগরজলে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সে সুন্দর দেহে অপরূপ জ্যোতির খেলা দেখা যাইত, তখন এমন কোন নরনারী ছিল না যে, সে মাধুর্য্য দেখিয়া বা শুনিয়া ক্ষণেকের জন্যও আত্মবিস্মৃত মুগ্ধ না হয়! তাই যে দিন লাইকা যেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিত সে ভবন সেদিন আনন্দ-গৃহে পরিণত হইত! সেদিন সেখানে বীণকার আসিয়া বীণা লইয়া বসিত, মালাকার আসিয়া সে গৃহের দুয়ারে মালা দোলাইয়া যাইত।

তরুণসমাজে লাইকা ভিন্ন আমোদ ছিল না,—শ্রাবণে ঘনপুষ্পিত কদম্বশাখায় হিন্দোলা দুলাইয়া তাহারা লাইকাকে লইয়া দুলিত;—ভাদ্রে নদীপ্লাবনে সুসজ্জিত নৌকায় লাইকাকে বসাইয়া সকলে দাঁড় টানিয়া জলক্রীড়া করিত! শরতের কোজাগর বসন্তে হোলির উজ্জ্বল দিনগুলি লাইকা ভিন্ন কিছুতেই সুশোভিত হইত না!

কিন্তু তবু,—লাইকা কোথাও বাঁধা পড়িত না। দেখা যাইত, কখন কখন সেই জ্যোৎস্নাগঠিত সুরূপসুন্দর যুবা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! লাইকা নাই—তাহার প্রিয়বন্ধু চম্পনের নিমন্ত্রন উপেক্ষা করিয়া, তাহার প্রিয়তমা বালিকা সুরতিকে ঘুমের ঘোরে বিছানায় শোয়াইয়া লাইকা গভীর রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

গ্রাম তখন বিষণ্ণতায় ভরিয়া যাইত, বয়োবৃদ্ধেরা লাইকার নাম করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, যুবকেরা কিছুদিন সঙ্গীতচর্চ্চা ত্যাগ করিত, শিশুরা সন্ধ্যার ম্লানজ্যোৎস্নায় মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণ চাঁদের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিত "লাইকা আছে না?" সচিন্ত ম্লান হাস্যে জননী বলিতেন—"জানিনা যাদু, আর আসে কি না?"—

আর কি বনের পাখী ফিরিবে?—

কিন্তু লাইকা আবার ফিরিত! হঠাৎ

একদিন রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে, কি শিশুদের ক্রীড়াক্ষেত্রে আবার তাহার সেই চিরপরিচিত সহাস অম্লানমূর্ত্তি উদিত হইত! একবার সে প্রায় তিন চার মাস ফিরে নাই সকলে তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছিল,—অবশেষে যেদিন ষাঁড়া নদীর প্রকাণ্ড বান পাশের বড়ুয়া নদীকে ছাপাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল,—আগন্তুক বিপদকে দেখিয়া ঘরে ঘরে বিপদের আর্ত্তনাদ উঠিল, কত ঘর দুয়ার মানুষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল—তখন দেখা গেল যে লাইকা ফিরিয়াছে! একটা কলার ভেলায় গ্রামের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের তুলিয়া লইয়া লাইকা বাঁশ বাহিয়া চলিয়াছে! মুখে সেই প্রসন্ন হাসি, ক্ষেপণি-ক্ষেপের তালে তালে লাইকার গান যেন উলটিয়া উলটিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! তাহাকে দেখিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল, তাহার দেখাদেখি শত শত ভেলা ভাসিল,—গ্রামের বালক বালিকা রুগ্ন আতুর নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে চলিল!

(২)

ক্রমে পল্লী ছাড়াইয়া এই উদাসী যুবার কাহিনী মহারাজাধিরাজের কাণে প্রবেশ করিল। শুনিয়া রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। লাইকাকে আনিতে স্বর্ণমণ্ডিত দোলা চলিল, হস্তী চলিল, অশ্ব চলিল! সুবেশভূষিত ভৃত্য গিয়া তাহাকে মহারাজার আহ্বান জানাইল। লাইকা তখন তল্‌তা বাঁশকে সযত্নে একটি দীর্ঘ ছিপে পরিণত করিয়া তাহার গোড়ায় আপনার প্রিয় একটি গানের কয়টি ছত্র কুঁদিয়া তুলিতেছিল! তাহার মাথার উপর ঝাউ গাছের সরু সরু পাতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—সম্মুখে কাশবনে শ্বেতবর্ণের হিল্লোলিত প্রবাহ! ঈষৎ শীতল বায়ুতে লাইকার অঙ্গের শেফালিসুবাসিত পদ্মরক্ত উত্তরীয় থর থর কাঁপিতেছে! রাজদূত মুগ্ধচিত্তে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। লাইকাও মৃদু হাসিয়া রাজাজ্ঞায় সসম্মান নমস্কার জানাইয়া তাহার সঙ্গী হইল।

শত সুধীসমাদৃত, বলবিদ্যা ধনৈশ্বর্য্য পরিপূরিত রাজসভায় লাইকার বীণা বাজিয়া উঠিল, তাহার পর তাহার তরুণ কণ্ঠ কাঁপাইয়া গীতধ্বনি ছুটিল, তখন সেই বহুজনসমাকীর্ণ সভা মন্ত্রমুগ্ধ, সিংহাসনে রাজাধিরাজ মোহাচ্ছন্ন, একি দেবতা না মানব?—

সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মহারাজ আসিয়া লাইকাকে আলিঙ্গন করিলেন! কণ্ঠের মুক্তাহার খুলিয়া কবির শিরোভূষণ করিয়া দিলেন, তাহার পর ওস্তাব করিলেন, লাইকা তাহার সভায় চির আসন গ্রহণ করুন! রাজসভা ভিন্ন তাহার উপযুক্ত স্থান নাই!—

লাইকাও মৃদু হাসিয়া একথা স্বীকার করিল, কিন্তু বলিল, আজ নয় কিছুদিন পরে আসিয়া সে মহারাজাধিরাজের এই অনুগ্রহ গ্রহণ করিবে।

রাজা লাইকার সমুদয় বিবরণ জানিতেন। এ বনের পাখী সহরে বাঁধা পড়িবে না তাহাও জানিতেন। কিন্তু এই অমানুষী কণ্ঠ—এই তরুণ মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছিল, এই যুবককে নিকটে রাখিবার জন্য তিনি বোধ হয় সর্ব্বস্বও দিতে পারিতেন।—

রাজা অপুত্রক,—অষ্টম বর্ষীয়া গৌরীকন্যা

বারি তাঁহার একমাত্র দুহিতা! সেদিন স্নানান্তে রাজা লাইকাকে সঙ্গে লইয়া আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন কপালে চন্দনচর্চ্চিতা মুক্তকেশা বারি আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। হস্তে শিবপূজার নির্ম্মাল্য মাল্যচন্দন—সে প্রত্যহ পূজা করিয়া পিতাকে এই পূজার ফুল আনিয়া দিত!—অদ্য পিতার সহিত এই নবীন অতিথিকে দেখিয়া বালিকা পশ্চাদ্‌পদ হইল, শিশুপ্রিয় লাইকা মৃদু হাসিয়া বলিল—"মহারাজের কন্যা?"—

"হাঁ"—স্নেহপূরিত হাস্যের সহিত রাজা বলিলেন—"হাঁ, এই আমার বারি!—বারি মা!—এই যে ইনিই লাইকা! তুমি যাঁহার গান শুনিতে চাহিয়াছিলে?—

"বালিকা ঈষৎ সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়াছিল,—লাইকা গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিল—মুখের উপর লম্বিত চুলগুলি সরাইয়া কৌতুককোমল দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমার গান শুনিবে তুমি—রাজকুমারি?—ভাল লাগিবে?"

ঘাড় নোয়াইয়া বারি জানাইল, হাঁ! প্রচুর হাস্যের সহিত আদর করিয়া লাইকা বলিল "না শুনিয়াই হাঁ বলিলে তুমি—রাজকুমারি তুমি কখনই চতুর হইবে না!"

রাজা হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "না, আমার বারি বড় বুদ্ধিমতী, লাইকা! এই বারেই মা আমার "সিংহাসনবর্ত্তিশি শেষ করিয়া সুখসাগর পড়িতেছে!—

লাইকা উচ্চ হাস্য করিল। বলিল—সিংহাসনবত্তিশী? হাঁ মহারাজ! সিংহাসনেরই এই গুণ! স্মরণ হয় কি—বত্রিশসিংহাসনের উপর বসিলে রাখালও রাজবুদ্ধি ধরিত! এই রাজকন্যা যে এই শিশু বয়সে এমন ধী শক্তির পরিচয় দেন তাহা ইঁহার নিজস্ব গুণ নয় তাহা আপনার সিংহাসনের গুণ,—ঔরসের গুণ মহারাজ!—কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখুন এই কুমারীকে দেখিয়া কি প্রতিভাময়ী দেবী সরস্বতীকে স্মরণ হয়? ইনি যে সাক্ষাৎ পদ্মবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী!

রাজা হাসিয়া উঠিলেন। বারিরও পেলব অধর হাসিতে স্ফুরিত হইল, সে সলজ্জে কোল হইতে নামিয়া গেল। রাজা বলিলেন, তোমার আশীর্ব্বাদ দিলে না বারি?" বারির রক্তচরণে নূপুর বাজিয়া উঠিল, অগ্রসর হইয়া বালিকা পিতার সম্মুখে তাহার হস্তধৃত স্বর্ণপাত্র ধরিল। একটি প্রকাণ্ড শতদল পদ্ম তাহার স্থানে স্থানে কুঙ্কুম চন্দনবিন্দুতে পূজাস্মৃতি অঙ্কিত, রাজা সেই কমল উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। বালিকা ফিরিয়া যায়—লাইকা অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমি কি নির্ম্মাল্যের অযোগ্য রাজকুমারি, একটি ফুল প্রসাদ পাইব না?"

হাসিয়া কন্যা দাঁড়াইল। একবার পিতার প্রতি চাহিয়া হাসিল—রাজাও আনন্দে হাসিয়া বলিলেন "দাওত মা লক্ষ্মি! ওই সরস্বতীর সন্তানকে তোমার আশীর্ব্বাদ দাও—যাহাতে" রাজার অসমাপ্ত কথা লাইকার হাসিতে ডুবিয়া গেল! "সরস্বতী আমার জননী কিন্তু শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী যে আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহারাজ—"

এমন সময় বারি বলিল "আর ত পদ্ম আনি নাই!—

লাইকা আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিল,

বলিল, কি মধুর স্বর ইহাঁর মহারাজ, বীণাপাণির বীণা যে আপনার কন্যার কণ্ঠে! আপনি কি তুচ্ছ লাইকার গান শুনিতে চান? —পদ্ম নাই? প্রয়োজন নাই আমায় দাও —তোমার হাতের ওই মালাগাছি। আমার মাথায় দাও, আমি ফুলের মালা বড় ভালবাসি!"—বলিয়া লাইকা তাহার সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া দিল।

বারি আর দ্বিরুক্তি করিল না—সর্ব্বজয়ার রক্তদলে গ্রথিত সেই ফুলমাল্য তুলিয়া কবির মস্তকে পরাইয়া দিল—মালা গড়াইয়া তাহার কণ্ঠে পড়িল। লাইকা সানন্দ নয়নে রাজার প্রতি চাইয়া বলিল, "মহারাজ আপনার আশীর্ব্বাদী মুক্তাহার বহুমূল্য ও বহু মান্যাস্পদ বটে কিন্তু রাজকুমারীদত্ত এই সর্ব্বজয়া হার কি সে গজমতি হার অপেক্ষাও মূল্যবান্ নয়?

রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, লাইকার প্রশস্ত গৌর বক্ষে লোহিত মাল্য দুলিতেছিল—তাহার প্রতি চাহিয়া মধুর হাসিতেছিলেন। তাহার কথা-শেষ হইলে বলিলেন—"নিশ্চয় মূল্যবান্! সে মুক্তামালা আমার ভাণ্ডারের একটি সামান্য দ্রব্য লাইকা! কিন্তু এই যে হার তুমি গলায় ধারণ করিলে ইহা যে আমার সর্ব্বস্ব! আমার বারি তোমার গলায় হার দিয়াছে—তুমিও আহ্লাদে তাহা গ্রহণ করিয়াছ—তুমি যে আজ হইতে আমার জামাতা! আমার পুত্র—!"

রাজা আসিয়া আবার লাইকাকে আলিঙ্গন করিলেন।—লাইকা বিস্মিত হইল —কি বলিতে গেল কিন্তু বাক্যস্ফুরিত হইল না! সদা সঙ্গীতপরায়ণ কলভাষী বনবিহঙ্গ আজ সহসা নির্ব্বাক হইয়া গেল।—

রাজা ডাকিলেন, "রাণি রাণি!"

পট্টবস্ত্রাবৃতা রাজমহিষী আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তখন কন্যার ক্ষুদ্র হস্তখানি লাইকার হস্তের উপর ধরিয়া কহিলেন "এই লও রাণী তোমার কন্যা জামাতা!—তোমার পুণ্যের সীমা নাই—তাই এই কন্যা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে—তাই এই দেবতুল্য জামাতা লাভ করিলে!—" আবার লাইকা কি বলিতে গেল কিন্তু পারিল না!—

(৩)

শঙ্খ বাজিতে লাগিল!—রাজপুরী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। রাজকন্যার বিবাহ—লাইকার সহিত!—

দেশবিদেশে মহারাজার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, কে এমন গুণগ্রাহী আছে—?—কন্যার বিবাহে রাজা মুক্ত হস্তে দান করিলেন —তাহার দানে দেশ অদৈন্য হইল,—কে এমন দাতা?—সকলে উচ্চকণ্ঠে তাঁহার জয় ঘোষণা করিল—আর অকুণ্ঠিত চিত্ত-কণ্ঠে প্রার্থনা করিল রাজকুমারীর কুশল!

কিন্তু—যখন আলোকে সৌন্দর্য্যে গীতরঙ্গে রাজপুরী নবোদ্বোধিত রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সুশোভন, তাহার অধিবাসী জনতা যখন আনন্দে মহাচঞ্চল সাগরের ন্যায় বিহ্বল,—তখন যাহার জন্য এত উৎসব সে ক্রমশঃ ম্লান হইতেছিল! এ কয়দিন লাইকার বাঁশী বাজে নাই—সদা চঞ্চল শিশুপ্রকৃতি লাইকা কয়দিন কেন নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া কাটাইয়াছে তাহা কেহ বুঝে নাই! আহারের সময় সে আহার করিত অন্যমনে;—রাজমহিষী উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিতেন—সে হাসিত!—ক্বচিৎ বা অন্যমনে

গান করিত—কিন্তু তাহা যেন রোদনের ন্যায় শুনাইত!—

কেহ কিছুই লক্ষ্য করিল না—কেহই কিছু বুঝিলনা—হঠাৎ একদিন প্রভাতে দেখা গেল পাখী উড়িয়াছে! লাইকা নাই! শয্যায় একখানি পত্র পড়িয়া আছে—তাহাতে লেখা, আমার চিত্ত অত্যন্ত বিকল বোধ হইতেছে, তাহাই একবার ঘুরিয়া আসিতে চলিলাম—আমি আবার আসিব"।

পাঠ করিয়া রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—রাজপুরীর সকল আনন্দই যেন নিবিয়া গিয়াছিল! মুখ তুলিয়া রাজা কন্যার প্রতি চাহিলেন—সে তেমনি অম্লান চিত্তে বেড়াইতেছে! তিনি কন্যাকে ডাকিয়া ক্রোড়ে লইলেন। মূর্ত্তিখানি যেন নূতন,—চন্দ্রকলার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ললাটরেখার উপর ঘন কেশরাশির মাঝে তরুণ অরুণ বর্ণ সিন্দুর বিন্দু! তাহার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া স্বর্ণমুক্তা গ্রথিত বসনাঞ্চল নামিয়া বালিকাকে নববধূর বেশ দিয়াছে, কর্ণে মুক্তাকুণ্ডল, নাসিকায় গজমতি বেসর ঝলমল করিতেছে, —পিতাকে দেখিয়া লজ্জায় চক্ষু দুটি যেন মুকুলিত হইয়া আসিল, ইহাও নূতন!—রাজা মুগ্ধ হইলেন,—তাঁহারও সেই নববিবাহিতা গিরিকন্যাকে স্মরণ হইল। পিতার অন্তর একবার যেন কন্যার দেবীমূর্ত্তির নিকট ভক্তিনত হইতে চাহিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয় স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! শশব্যস্তে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া রাজা কন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—লাইকা আসিল না। প্রত্যহ রাজা রাণী, দেশবাসী আশা করিতে থাকে এই বুঝি লাইকা আসে। কিন্তু সে আশার ধন আর আসিল না।

সে দেশেই আর সে নাই—মুক্তবায়ু কোন্ আকাশে সঞ্চরণ করে তাহা কে জানে? রাজদূত তাহাকে খুঁজিল, পাইল না।

বৎসর শেষ হইল, আবার নবীন বৎসর আসিল,—তাহাও চলিয়া গেল! আবার বসন্তসেনা সহ নবীন বর্ষ দেখা দিয়া শীতের বায়ুর সহিত চলিয়া গেল! কিন্তু কই লাইকা?—চঞ্চল ক্রীড়াশীলা বারির নয়নে একটি ম্লান ছায়া দেখা দিল—পিতামাতা তাহাও লক্ষ্য করিলেন।

(৪)

পাঁচ বৎসর অতীত। লাইকার আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছে। রাজার অন্তঃকরণ অনুশোচনায় দুর্ব্বল, রাণী তরুণী কন্যার পানে চাহিলেই অবসন্ন হইতেন। আর বারি?—প্রভাতে স্নানশুচি শুভ্রবেশা বালিকা স্বহস্তে ফুল তুলিয়া শিবপূজা করিয়া সন্ধ্যায় দেবারতির প্রদীপ সাজাইয়া পিতামাতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া সানন্দ মনেই থাকিত—কিন্তু?—হায়—কিন্তু পিতামাতা সর্ব্বদাই তাহার উজ্জল নয়নের কোলে কালিমা চিহ্ন দেখিতেন!—হায় তাঁহারা কি করিলেন!

সে দিন অপরাহ্নে,—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া বৃষ্টিসংরম্ভ ঘনমেঘ প্রসারিত, অনতিদূরে গঙ্গাপ্রবাহে তাহার কৃষ্ণছায়া ভাসিতেছে,—তটান্তে শ্যামল বনানী ঈষৎ

মুখরিত, নিম্নে আর্দ্র পথরেখায় বধূজনের অলক্তকরঞ্জিত পদচিহ্ন! তাহার উপর সারি দিয়া সিক্তপক্ষ রাজহংসশ্রেণী মৃদু চরণে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পশ্চাতে ও কে? ভাগীরথীর পবিত্র ফেনহাস্যের মত উছলিত সহাসকান্তি মূর্ত্তি? ও কি লাইকা? হাঁ লাইকাই বটে!

রাজভৃত্য আসিয়া রাজার নিকট তাহার আগমন বার্ত্তা জানাইল! রাজভবনে মৃদু আনন্দ গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাজা পুলকিত হইলেন না, বরং আঘাতের উপর পুনরাঘাতের আশঙ্কায় তিনি বিষাদযুক্তই হইলেন।

প্রত্যেক পথিকজনের সহিত সম্ভাষণে কুশল বার্ত্তার আদান প্রদান করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যায় লাইকা আসিয়া রাজার চরণ বন্দনা করিল। গম্ভীর মুখে রাজাও আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

লাইকা বসিল; রাজা নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাহার মৃদু হাস্যযুক্ত সলজ্জ মুখখানিতে একটি মৃদু প্রশ্নের আভাষ পাওয়া যায়। তাহার চঞ্চল চক্ষে যেন ব্যগ্র আগ্রহ, সে মুহুর্মুহু আপনার ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিতেছে! বহুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিলেন, অবশেষে রাজা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

অতি মৃদু কণ্ঠে লাইকা বলিল "হাঁ মহারাজ!"

রাজা যেন একটা বিপদকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন "তোমার অভিপ্রায় স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

লাইকা প্রথমত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—রাজপুরীতে অবস্থান আমার পক্ষে অসাধ্য তাহা এ কয় বৎসর চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছি। এ অবস্থায়,—" বলিতে বলিতে লাইকা থামিল, আমার পত্নী বলিতে গিয়া সে বলিতে পারিল না। বলিল—"আপনার কন্যা কি আমার সঙ্গিনী হইতে পারিবে?"

চমকিত হইয়া রাজা বলিলেন—তোমার সঙ্গিনী? কোথায়?"

মাথা নীচু করিয়া লাইকা বলিল "আমি যেখানেই থাকি।"

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ভিখারীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন—পরে বলিলেন, "তোমার স্ত্রী কে তাহা কি তুমি ভুলিয়াছ, লাইকা?

"না মহারাজ ভুলি নাই, তিনি সম্রাট-দুহিতা;—কিন্তু কিন্তু আমি যে তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রভু!—আমি যে রাজভবনে বাস করিতে পারিব না। এ অবস্থায়—

লাইকা আর বলিতে পারিল না—রাজা কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"এ অবস্থায় তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

"আর আপনার কন্যা?"

"সে যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকিবে।"

লাইকা অধোবদন হইল। রাজার মুখে রোষচিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল! অনেকক্ষণ পরে লাইকা বলিল—একবার কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

রাজা বলিলেন—"কাহার সহিত? বারির সহিত?—না লাইকা ইহা চেষ্টা করিও না! সে বালিকা এখনও তোমায় চেনে না জানে না, সে এই অবস্থায় বেশ সুখে আছে। তোমার সহিত আলাপ সাক্ষাৎ হইলে অভাগিনী চির দুর্ভাগিনী হইবে!"

বলিতে বলিতে সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজাধিরাজের নয়নও ভিজিয়া গেল! লাইকা অবনত মুখে ছিল তাহা দেখিতে পাইল না, বলিল,—মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিলেন! তাহাই হইবে!" বলিতে বলিতে সে উঠিল রাজা বলিলেন,—"কোথায় চলিলে?"

লাইকা বলিল—"আমি যাই মহারাজ! সম্ভবত আমার এখানে বাসও আপনাদের শুভদায়ক হইবে না!—কিন্তু একটি প্রশ্ন—"

লাইকার স্বর কাঁপিল, তাহার চির প্রসন্ন নয়নও সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইল—সে আপনার পদনখরে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—ব্যগ্রস্বরে রাজা বলিলেন—"শোন লাইকা?"

শরাহত পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুলস্বরে লাইকা বলিল—"না না—মহারাজ একটি প্রশ্ন! আর আমি এদেশে ফিরিব কি না তাহা—"

রাজা আবার ব্যগ্রস্বরে কি বলিতে গেলেন—বাধা দিয়া লাইকা বলিল,—"না এ প্রশ্নও নয়, মহারাজ—আপনি আমার প্রতি কৃপালু—আর আমি চির অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর হতভাগ্য! নত জানু হই—পিতা! সন্তানকে মার্জ্জনা করিবেন—আর এ পাপ মুখ আপনাকে দেখাইতে আসিব না।"

রাজার চিত্ত তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না! তিনি একবার লক্ষ্য করিলেন, যেন তাহার আসননিম্নে স্তূপীকৃত চন্দ্রকরের ন্যায় লাইকার দেহ নুইয়া পড়িয়াছে! তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন!

বহুক্ষণে রাজা যেন সম্বিৎ লাভ করিলেন,—কিন্তু মুখের হাত খুলিয়া দেখিলেন লাইকা নাই। কি সর্ব্বনাশ—সে কি চলিয়া গেল?

"লাইকা! লাইকা!" রাজা আসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিলেন,—দ্বারপাল সসম্ভ্রমে জানাইল—রাজজামাতা বহুক্ষণ রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছে!—

চলিয়া গিয়াছে?—উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত রাজা দ্বারপথে ছুটিয়া চলিলেন,—কোথায় গেল সে?—কে তাহাকে দেখিয়াছে?—সকলেই বলিল তিনি গঙ্গাভিমুখে গিয়াছেন!—গঙ্গাতীর ঘন-বনে ঘন থাকায়—আম্রবনে ঝিল্লিরব প্রবল হইয়াছে,—এই মৃদুবর্ষণ ক্ষুব্ধ অন্ধকারে লাইকা কোথায় গেল? "কেন তোমরা কেহ তাহাকে বারণ করিলে না?"—গভীর বিষাদে সকলেই নিরুত্তর,—সম্রাট উন্মাদের ন্যায় সেই বর্ষণ মধ্যে ছুটিয়া চলিলেন!—

রাজপুরে একি সর্ব্বনাশ! একটা কল্লোলধ্বনি উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী সকলকে নিষেধ করিলেন—এ বার্ত্তা যেন প্রচার না হয়,—অন্তঃপুরে না যায়!—তাহাই হইল, একটি মাত্র আলোকধারী রাজার সহিত চলিল,—ছত্রধারী পশ্চাতে চলিল! সকলে গঙ্গাতীরে আসিলেন—অন্ধকার তীরে কোথায় লাইকা? সে ত নাই!

(ক্রমশঃ)

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৭)

প্রার্থনাসমাজ

পরমহংসমণ্ডলী ধ্বংস হইবার পর তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ 'প্রার্থনাসমাজ' নাম ধারণ করিয়া উত্থিত হইল। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্ ও তাঁহার ন্যায় আর কতকগুলি সজ্জনের প্রযত্নে ১৮৬৭ সালে এই সমাজ স্থাপিত হয়। জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কু-রীতির উচ্ছেদ-সাধন মানসে সমাজ কার্য্যারম্ভ করেন। পরে সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন সামাজিক বিধানে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ করায় কোন ফল নাই। যেখানে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের আশা নাই সেখানে আক্রমণের অন্যতর কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-সংস্কারের উপর দাঁড়াইয়া সমাজ-সংস্কার সহজসাধ্য, এই বিবেচনায় পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ প্রচার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দুই একবার বোম্বাই আসিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা লোকের মন উত্তেজিত করিয়া যান। ক্ষেত্র প্রস্তুত, উপযুক্ত সময়েই বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। ১৮৬৭ সালে সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৭২ সালে উহার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আসিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সুবিখ্যাত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে সমাজের প্রথম সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন, পরে বামন আবাজী মোদক সেই পদে নিযুক্ত হন।

সমাজের প্রথম অবস্থায় শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা তাহার উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ হইতে ঐ সমাজ বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। সভ্যগণের যত্ন ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, শ্রমজীবিদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, এই কয়েকটি শুভকার্য্য-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়।

১৮৮২ সালে নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর (এইক্ষণে যিনি নাইট উপাধিধারী বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি) (১) প্রার্থনাসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। বর্ত্তমানকালে তিনিই সমাজের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্য্য। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বগুণে প্রার্থনাসমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল উভয় পক্ষেরই হৃদয়গ্রাহী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত জষ্টিশ চন্দবারকরের কতক বিষয়ে সহানুভূতি দেখা যায়, কিন্তু আদি সমাজ যেমন সামাজিকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, তিনি সেরূপ নহেন। সমাজ-সংস্কার সাধনে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ়

(১) ইনি সম্প্রতি ইন্দোরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।



নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর

শ্রদ্ধা ; সেই সকল শাস্ত্র হইতে যাহা কিছু সদুপদেশ ও সুশিক্ষা লাভ করা যায় তাহা গ্রহণ ও প্রচার করিতে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর। অথচ আবার এই নবযুগে আমাদের এই জাতিবিমর্দ্দিত সমাজ-সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক্ অনুভব করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে সকল অংশ এ কালের অনুপযোগী—যাহা জাতীয় একতাবন্ধনের বিরোধী তাহা সংশোধন করা হয় এই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়, কিন্তু এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রের সহযোগিতা চাই, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বনে আত্ম-মত সমর্থন করা সুসাধ্য নহে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্রের যে সার শিক্ষা—যে শিক্ষা বলে সাম্য মৈত্রী মনুষ্যত্ব প্রশ্রয় পায়, যাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতাবন্ধনের সাধনীভূত, সেই বল প্রয়োগ করিয়া তিনি সমাজসংস্কার কার্য্যে সিদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন। সেই অস্ত্র ধারণ করিয়া জাতীয় বন্ধন স্থাপন উদ্দেশে তিনি আর্য্য-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া জাতীয় সমিতি আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার এই সাধু চেষ্টা অভিনন্দনীয়। তিনি এই কার্য্যে জয়যুক্ত হউন এই আমার একান্ত কামনা।

আর্য্যসঙ্ঘের আমন্ত্রণপত্র নিম্নে পাদটীকায় প্রকাশিত হইল * :—

*THE ARYAN BROTHERHOOD.

AN ANTI-CASTE CONFERENCE

The following has been issued by the Aryan Brotherhood of Bombay, of which Mr. Justice Chandavarker is the President.—

It is generally felt by the enlightened portion of the Hindu community, and even the orthodox section of it have come to realise, to some extent, that a more sustained and organized effort than has up to now been attempted must be made to correct the evils of certain social customs, which either under cover of Shastras or of immemorial usage, have retarded the progress of the community, and checked the growth of a spirit of union and fellow-feeling among the numerous castes which compose it. Religious bodies and Social Reform Associations have indeed borne their share in propagating the principles of social reform suited to the requirements of the present times ; and it is due to them, and to the enlightening character of British Rule, that public opinion in the Hindu community regards social reform with greater sympathy now than was the case 20 or 25 years ago.

The main cause of the weakness of the Hindu community is its institution of caste in the form in which it has existed for centuries. On this point no doubt a serious difference of opinion still prevails, but the more thoughtful of Hindus perceive that owing to its innumerable congeries of castes, the community has suffered from disintegrating forces that have sapped its energy and vitality.

This is the root of the social evil ; and it is to it mainly that the propaganda of social reform must now be directed.

With this view the Aryan Brotherhood has been established. By bringing together members of different castes of the Hindu community and setting a practical example in the matter of caste reform, it has initiated a work which, it is hoped, will materially further the cause of solid progress. Towards that end the Aryan Brotherhood has resolved to hold in Bombay a Conference of those Hindus who have recognized the evil of caste and attempted to reform the institution on modern lines by the light of the sacred and humanising principles which form the soul of the teaching of the Vedas, the Upanishads and the *Bhagawad Gita*. These, well-studied and dearly cherished, are fitted more than any other to give the message of *Brotherhood* and *Humanity* needed by the times.

The conference will be held on the 9th November. Leading members of the community in sympathy with the object of the Conference will be invited to take part in its deliberations. It will consider only the question of caste, its attendant evils and the measures to be adopted for their removal.

প্রার্থনাসমাজের অধীনে শ্রমজীবিদিগের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, মিলের নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতি শ্রমজীবি লোকদের রাত্রে শিক্ষাদান করা এই বিদ্যালয়গুলির কার্য্য। এইরূপ আটটি নৈশ বিদ্যালয় সহরের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে ৩০০র অধিক ছাত্র মারাটী গুজরাটী ইংরাজিতে শিক্ষা লাভ করিতেছে।

অন্ত্যজ জাতীয়দের শিক্ষাদান।

এই প্রসঙ্গে অন্ত্যজজাতীয় বালক বালিকাদিগের (depressed classes) শিক্ষোপযোগী যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের কথা না বলিলে এই কার্য্য বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকে। সিন্দে যিনি পূর্ব্বে প্রার্থনাসমাজের প্রচারক ছিলেন, তিনি এই মিশনের প্রধান উদ্যোগী। তিনি ও তাঁহার দুই ভগিনী, যনাবাই, মুক্তবাই, এই শুভকার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় চারিটি ; ও বালক বালিকা মিলিয়া বিদ্যার্থীর সংখ্যা চারিশত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আকোলা, অমরাবতী, ইন্দোর প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আহ্লাদের বিষয় যে বোম্বাই অঞ্চলে এই মিসন সভার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে এই সভা তাহার সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এই অল্প কাল মধ্যে ইহার কার্য্যক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার আর্থিক অবস্থাও সন্তোষজনক। স্বর্গীয় ওয়াডিয়া সম্পত্তির ট্রষ্টিগণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই সভায় বার্ষিক ৬০০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ সাহায্যে অধ্যক্ষগণ পারেলে একটি শিল্প বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুণাক্ষেত্রেও বোর্ডিং শিল্পবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সভার অধীনে সবশুদ্ধ ২৭ বিদ্যালয়, ১২০০র অধিক ছাত্র এবং ৫৭ জন বেতনভুক্ শিক্ষক আছেন। ছাত্রগণ ছয় ছয় বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে ভজন-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে

সাপ্তাহিক উপাসনা ও সময়ে সময়ে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

গত বর্ষে পুণায় এই সকল জাতির একটি প্রাদেশিক সমিতি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ১৭ বিভিন্ন মারাঠা প্রদেশ হইতে অন্ত্যজ-জাতির পঞ্চশাখাভুক্ত সবশুদ্ধ ৩০০ লোক সমবেত হইয়া এই সভার কার্য্যে উৎসাহ পূর্ব্বক যোগদান করে। দুই দিন এই সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে পুণায় নারী মণ্ডলীর যে একটি সভা হয়, শ্রীমতী রাণাডে-পত্নী তাহার অধ্যক্ষতা করেন। তথায় অন্ত্যজ জাতীয় প্রায় ২০০ স্ত্রীলোক এবং শতাধিক উচ্চকুলমহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই সমবেত অনেক বর্ণ নারীকুলের পরস্পর সদ্ভাবে মেলা মেশা ও মিষ্টালাপ—ইহা পুণা সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। সাতারায় এইরূপ আর একটি সমিতি আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইতেছে ও সেখানকার প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী।

এই সভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সর্ব্বসমেত ৮৫০০০ টাকার প্রয়োজন; তাহার মধ্যে মহারাজা তুকোজী হোলকর প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাই হোলকরের নামে পুণায় একটি অন্ত্যজ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। অতিরিক্ত যে টাকার প্রয়োজন বোম্বায়ের ধনকুবেরগণ স্বীয় ধন-কোষ মুক্ত করিয়া সে অভাব মোচন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রার্থনা সমাজ যদিও 'ব্রাহ্ম' নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তথাপি ইহার গতি ও বিশ্বাস ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই অনুযায়ী। সমাজের কোন দীক্ষিত উপাচার্য্য নাই, সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সুবক্তা ও ধর্ম্মোপদেশে সক্ষম তাঁহারাই অবকাশমতে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে বিস্তৃত দেখিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইত। আহমদাবাদ যেখানে আমি প্রথমে যাই, সেখানকার সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন ভোলানাথ সারাভাই। মহীপত রাম রূপরাম তাঁহার সহযোগী। মহীপত রাম ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করেন, বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি হিন্দুসমাজ হইতে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন সহ্য করিতে-ছিলেন; ভোলানাথ ভাই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণে সাহায্য করেন। এই দুই বন্ধু মিলিয়া সমাজের কার্য্যারম্ভ করেন ও অন্যান্য কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম সেই কার্য্যে যোগ দেন। আমি যখন আহমদাবাদে ছিলাম, দেখি ভোলানাথ ভায়ের যত্নে ও উৎসাহে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজ খুব জমকিয়া উঠিয়াছে। আমিও তাঁহাদের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে সচেষ্ট ছিলাম। উপাসনার সময় ভোলানাথ প্রণীত প্রার্থনামালা ব্যবহারে আসিত ও তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত আর আমাদের বাঙ্গলা সঙ্গীত অনুবাদ করিয়া গাওয়া হইত। আমার মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় আমার ওখানে গিয়া দিন কতক ছিলেন। সমাজে আমরা দুই ভায়ে মিলিয়া সমস্বরে গান করিতাম। ১৮৮৬ সালে ভোলানাথ ভাই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

গেলেন, যেন নগরের একটি উজ্জ্বলদীপ নির্ব্বাণ হইল। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি আহমদাবাদ হইতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যুর পর মহীপতরাম সমাজের সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। মহীপতরাম পরলোকগত হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রমণভাই ও পুত্রবধূ সমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মহাত্মার নাম উল্লেখযোগ্য—লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর। ভোলানাথ ভায়ের পর ইনি আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজের নেতৃদলের মধ্যে গণ্য। সম্প্রতি তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। লালশঙ্কর একজন স্বদেশের পরম হিতৈষী সাধুপুরুষ ছিলেন। দেশহিতকর এমন কোন সৎকার্য্য ছিল না যাহার অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহের সহিত যোগ না দিতেন। তিনিই পণ্ডরপুর অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী, সুরাপান নিবারণী সভার প্রধান উদ্যোগী, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনে তিনি সতত যত্নবান ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে মত-ভেদ বশতঃ যদিও হিন্দুসমাজ তাঁহাকে স্বীয় গণ্ডীর ভিতর স্থান দিতে সঙ্কুচিত হইত তথাপি তিনি সকলকেই তাঁহার ভ্রাতৃ-আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র জাতিনির্ব্বিশেষে এত প্রসারিত ছিল যে তিনি আপামর সকল লোককেই আপনার জালে আকর্ষণ করিতেন, কাহাকেও আপনা হইতে দূরে রাখিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা সরল সাধুচরিত্রগুণে সকলেরই চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না, সকলকেই তিনি মিত্ররূপে বরণ করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে প্রার্থনা সমাজ, এমন কি গুজরাটের সমগ্র হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গুজরাটে যে ব্রহ্মোপাসনার বীজ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতেছে; কালক্রমে ফলবান্ বৃক্ষরূপে সমুত্থিত হইবে, এরূপ আশা করা দুরাশা নহে।

সাতারা, যেখানে আমার সর্ব্বিসের শেষ ভাগ অতিবাহিত হয়, সেখানেও একটি প্রার্থনা সমাজ ছিল। সেখানকার কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিয়া সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ও তাহার সাম্বৎসরিক উৎসবে বোম্বাই পুণা প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরের লোকেরও সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে একটি সুগায়ক ইহুদী ব্রাহ্মকে আমার বেশ মনে পড়ে। চিন্তামণ নারায়ণ ভট, আমার একটি বন্ধু, এই সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেন। সমাজ-সংস্কার-ব্রতী উন্নতিশীল যুবকবৃন্দের তিনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। শুধু মুখে নয়, অনুষ্ঠানেও তিনি তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। হায়, তিনিও আর এক্ষণে নাই।

পুণাপ্রার্থনাসমাজের অধিনায়ক আমাদের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক, ডাক্তার ভাণ্ডারকর। তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তবলে সেখান-কার সমাজ উন্নতির মার্গে পরিচালিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডারকর যতদিন হাল ধরিয়া আছেন ততদিন সে সমাজের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনা নাই। এক-দিকে যেমন ভাণ্ডারকর, অন্য দিকে তেমনি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পত্নী স্ত্রী-মণ্ডলের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। পুণা-

সমাজে তিনি তাঁহার মৃত পতির সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী। উচ্চশ্রেণী বালিকাবিদ্যালয়, বিধবাশ্রম প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান স্ত্রীদিগের শিক্ষা ও উন্নতিরকল্পে পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া যোগ্যতাসহকারে কার্য্য চালাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে এমন কোন সৎকার্য্য নাই যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন।



রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর

সিন্ধুদেশেও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। হাইদ্রাবাদে তাহার গোড়াপত্তন করেন—নবলরাও আড়বাণী। আমি সে সময়ে হাইদ্রাবাদে ডিষ্ট্রিক্ট জজের কর্ম্ম করি ও নবলরাওকে তাঁহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করি নাই। তাঁহার বিনয় নম্রতা ও সাধুতাগুণে সিন্ধিরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। জেলের কয়েদীদের মধ্যে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার অনুমতি আনাইয়া তিনি প্রতি সপ্তাহে জেল পরিদর্শনে যাইতেন। সেখানে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনাদির সুফলও ফলিয়াছিল। নবলরাওয়ের পরবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার ভ্রাতা হীরানন্দ। ইনি কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস ও নববিধান শাখার সংস্রবে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইঁহার ন্যায় পরোপকারী সেবাপরায়ণ নির্ম্মল চরিত্র সাধুপুরুষ ঐ প্রদেশে অতি বিরল। সাধু হীরানন্দের স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত ও অঞ্চলে জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর

পর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র করাচীতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধ্যাপক বসওয়ানী কিয়ৎকাল করাচী সমাজের কার্য্য করেন, সম্প্রতি তিনি পঞ্জাবে দয়ালসিং কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া লাহোর গিয়াছেন। মোটের উপর সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে।

বোম্বায়ের প্রার্থনাসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে ওখানকার আধুনিক ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার চেষ্টা কিছু কিছু জানা যাইতেছে। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য আপন সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিতেছে কিন্তু বিরাট হিন্দুসমাজে তাহা বিন্দুমাত্র। তাহার প্রভাব কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদ্র বলিয়া তাহা হেয় নহে। কোন্ অল্পসূত্র হইতে কি বৃহৎ কার্য্য প্রসূত হয় তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিয়তই পাঠ করা যায়। আমরা অদূরদর্শী, বিশ্ববিধাতার কার্য্য প্রণালীর সকল দিক্ দেখিতে পাই না, সুদূর পরিণাম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেবল এ কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় যে ঈশ্বরের রাজ্যে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, যাহা সত্য মঙ্গল তাহা স্থায়ী, যাহা অসত্য শীঘ্রই হউক্ বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই তার পতন। যেমন গীতা বলিয়াছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" যাহা অসৎ তাহা নশ্বর - যাহা সৎ তার বিনাশ নাই।

বোম্বাই সমাজে যে সকল শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে প্রার্থনাসমাজ তাহার অন্যতর। আর আর শক্তির কার্য্য কতক আমাদের বোধগম্য, কতক বা দৃষ্টিবহির্ভূত। যাহা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা ভারতের সর্ব্বত্রই সমান—সে হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষ, পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোক-কিরণ, এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। এই শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কত না পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভবিষ্যতেও কিরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইবে তাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার মনে হয় আমাদের সকল প্রকার সামাজিক রোগের মহৌষধ—নরনারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। আমাদের গোড়ার অভাব সেই শিক্ষার অভাব। লোকসাধারণে শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা—বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ-সংস্কার চেষ্টা সর্ব্বৈব ব্যর্থ হইতেছে। শিক্ষা চাই, শিক্ষা চাই, এই আমাদের আর্ত্তনাদ। যাহা হইয়াছে তাহা অল্পই, আরো অনেক দরকার। এই কারণেই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। তবে এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই হিন্দু য়ুনিবার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা যেন সব দিক দেখিয়া উদারভাবে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারা যদি কালস্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, যে সকল কুসংস্কার হইতে আমরা বহু তপস্যায় মুক্তি লাভ করিয়াছি সে সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন, যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম আমাদের জাতীয় একতার বিরোধী, জাতীয় উন্নতির প্রত্যবায় সে সমস্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে এই য়ুনিবার্সিটি স্থাপনের ফল হিতে বিপরীত হইবে। ঘড়ির কাঁটা উল্টা দিকে ফিরাইতে

গেলে ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এই য়ুনিবর্সিটি চালাইবার ভার লইবেন তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে শাস্ত্র অপেক্ষা সত্য গরীয়ান্, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যেন সত্যের অবমাননা না হয়, ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামি প্রশ্রয় না পায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্ত-সায়াহ্নে

(গল্প)

সেদিন শনিবার। হাইকোর্টের ছুটি ছিল। বৈকালে গাড়ী চড়িয়া মাঠের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

রেস্-কোর্স ছাড়াইয়া হেষ্টিংসের ভিতর দিয়া গাড়ী গঙ্গার ধারে ছুটিল। পথের এক পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানে সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল লইয়া খেলা করিতেছে; মেয়েরা দড়ি দুলাইয়া ডিঙ্গাইতেছে, লাফাইতেছে! যেন আনন্দের সজীব মূর্ত্তি! অপর পার্শ্বে সাহেবদের ছোট ছোট বাঙ্‌লো। সম্মুখস্থ পরিচ্ছন্ন খোলা জায়গায় বেতের চেয়ারে বসিয়া নর-নারীর দল চা খাইতেছে, গল্প করিতেছে। চারিধারেই যেন বিশ্রাম ও আনন্দের একটা কলধ্বনি ছুটিয়াছে!

অদূরে কর্ম্মশ্রান্ত যাত্রীর দল বুকে লইয়া ট্রামগাড়ী চলিয়াছে। কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুতে মিশাইয়া ক্লান্ত ধরণী যেন আরাম ও বিশ্রামের সুমধুর সম্ভাবনায় ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে!

ফাল্গুন মাসের শেষ। মাঠের ধারে বড় বড় গাছগুলা নূতন চিক্কণ পত্র-পল্লবের মালা বুকে দুলাইয়া নায়িকার মতই সাজিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। কোন গাছে গোলাপী ও হরিদ্রা বর্ণের ফুল ফুটিয়া বাতাসকে মদির গন্ধে বিহ্বল, চকিত করিয়া তুলিয়াছে।

গাড়ী আসিয়া গঙ্গার ধারে পড়িল। ওপারের চিমনি হইতে গাঢ়-কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইয়া আকাশটাকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গঙ্গার নির্ম্মল বুকে সে কালিমার ছায়াপাত হইয়াছে। সেই ছায়া দুলাইয়া ভাঙ্গিয়া মৃদু তরঙ্গ নাচিয়া খেলা করিতেছে! একটা বড় বাড়ীর আড়ালে থাকিয়া লোহিত সূর্য্য এ পারের পানে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। তাহার রশ্মিচ্ছটাগুলা চারিধারে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্য যেন অসংখ্য বাহু বিস্তার করিয়া এ পারকে আঁকড়িয়া থাকিতে চাহিতেছে! তাহারই প্রতিবিম্ব জলে পড়ায় মনে হইতেছিল, জলের উপর স্থানে স্থানে কে যেন লাল কালির রেখা টানিয়া দিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য জাহাজ। নৌকা ও ষ্টিমার দ্রুত ছুটিয়াছে! সকলেই কাজ সারিয়া ঘরে ফিরিয়া বিশ্রাম-শান্তি পাইবার জন্য যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে!

গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। চারিধারে মহিমাময় দৃশ্য চোখে পড়িল। প্রকৃতি

যেন গোপন কক্ষ খুলিয়া আপনার সযত্ন-সঞ্চিত সমস্ত সৌন্দর্য্য মুক্ত করিয়া জগতের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে! সে সৌন্দর্য্য-রস-ধারায় প্রাণ আমার স্নিগ্ধ হইল, মন জুড়াইয়া গেল।

সপ্তাহের কয়টা দিন, শুধুই পয়সার সন্ধানে বাক্-চাতুরী দেখাইবার মিথ্যা শ্রমে কাটিয়া যায়! নজীরের কেতাব ও মক্কেলের ব্রিফের মধ্যেই জগতের সর্ব্ব-সুখ ও সর্ব্ব-সম্পদের পরিচয় লইতে সমস্ত সময় ব্যয় করিয়া ফেলি,—জগতের পানে প্রকৃতির পানে চাহিবার মুহূর্ত্ত অবসরও খুঁজিয়া পাই না! আজ একটা আকস্মিক অবসরের শুভ-মুহূর্ত্তে বাহিরের কি অমর সম্পদ এ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল!

খানিকটা হাঁটিয়া আসিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম। চোখের পলক যেন আর পড়িতে চাহে না। পাও সরিতে জানে না! সূর্য্যাস্তের মহিমাময় দৃশ্যে আমি কেমন তন্ময় হইয়া পড়িলাম। এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য এমনভাবে ছড়ানো রহিয়াছে! ইহার কাছে পয়সার দাসত্ব আজ নিতান্তই তুচ্ছ মনে হইল। কর্ম্ম-কাতর প্রাণের মধ্যে শান্তির একটা হাওয়া বহিয়া গেল।

সহসা একটা কথা কানে গেল,—"তুমিও যেমন! বড় বাবুটা সাহেবের ভারী খোসামুদি ধরেছে। দেখ না, নিজের সম্বন্ধীকে এনে কাজে লাগিয়ে দিলে, আর আমরা এতদিন মুখে রক্ত তুলে খাটচি, তবু সে যে ত্রিশ টাকা, সেই ত্রিশ টাকা! উন্নতির এতটুকু সম্ভাবনা অবধি নেই!"

আমি মুখ ফিরাইয়া চাহিলাম। দুইজন ভদ্র লোক ধীর পদে পথে চলিয়াছে। অপর জন কহিল, "বড়বাবুর খোসামুদি করতে পার, দু'বেলা তাঁর বাড়ীতে হাজিরে দাও, তাঁর সেই খোসে-ধরা ছেলেটাকে কোলে তুলে আদর কর, তবে যদি দু-চার টাকা মাইনে বাড়ে!" লোক দুইটি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। আমি তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম। তৈল-ঘর্ম্ম নিষিক্ত মলিন শার্ট পরিয়া রুক্ষ কেশে শুষ্ক মুখে ছিন্ন জুতায় পা ঢাকিয়া চলিয়া রাস্তা বাঁকিয়া চোখের আড়ালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অন্তর মথিত করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। আহা, বেচারা!

পর-মুহূর্ত্তেই আবার চারি-পাঁচজন লোক দেখা দিল। মুখ দেখিয়া মনে হয়, কাজ হইতে তাহারা গৃহে ফিরিতেছে। একজন কহিল, "হেঁঃ! সত্য এসেছিল চালাকি করতে, বুঝলে নবীন! চেনেন না ত— আমা-হেন ধনী, তার চোখে ধুলো দেবে! আমার সঙ্গে এ? হেঁঃ!"

সঙ্গীর দল হাসিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। তখনই আবার আর এক দল দেখা দিল। একজন অপরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভালো করিয়া কি-যেন বুঝাইতেছে! হাতে তাহার একটি শততালি-যুক্ত ছাতা,—পায়ে ছিন্ন চটি, হাঁটু অবধি ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। সহসা তাহার কথা কানে গেল। সে বলিল, "জামাইটা রোজগার করে মন্দ নয়! তা হলে কি হবে! এদিকে যে মানুষ নয়! নেশা-ভাঙেই উচ্ছন্ন গেল। মেয়েটা আমার চোখের জলে দিন কাটাচ্ছে। আমার কি কম আদরের মেয়ে! ওর

বিয়েতে সাধ্যের অতিরিক্ত পয়সা খরচ করেছি। দুটো পাশ দেখে জামাই করি! বিয়ে দিতে আমায় ভিটে অবধি বাঁধা পড়ে। সে বাঁধা আর খোলসা করতে পারিনি। বাড়ী বিকুল, সব গেল। ছোঁড়াদুটোরও লেখাপড়া দেখতে পারলুম না,—সে-দুটোও বকে গেল। আর আমার সেই মেয়ে—"

লোক দুইজন চলিয়া গেল।

এ যেন সংসারের রঙ্গশালায় দৃশ্যের পর দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হইতেছিল। শুধুই করুণ নাটকের মর্ম্মস্পর্শী ইঙ্গিত! সকলেই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ অভিশাপে বসন্তের এই মধুর সায়াহ্নকে চিরিয়া দাগিয়া পথ চলিয়াছে। সকলের মুখেই ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগের কথা। হারে অভাগার দল!

মনে একটা কেমন চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠিল। আর একটু আমি অগ্রসর হইলাম। দুইজন ভদ্রলোক,—একজনের পরণে কোট্ পেণ্ট্‌লেন, মাথায় ক্যাপ, অপরের কালা-পাড় ধুতি,—গায়ে আদ্ধির পাঞ্জাবি। পেণ্ট্‌লেন পরিহিত ভদ্রলোকটি কহিলেন, "বিষম ফ্যাসাদ! বড় ভাই এসে জুটেচেন। তাঁর অসুখ! তাঁকে দেখাও, চিকিৎসা করাও। কম হাঙ্গাম! যেমন আমি কোন ঝঞ্ঝাট ভালবাসি না—"

ধুতি-পরিহিত দুই নম্বরের বাবুটি কহিলেন, "কেন, তাঁর কি চাকরি বাকরি নেই?"

ভদ্রলোকটি রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। এক-নম্বর কহিলেন, "কেন থাকবে না? পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পান, তাও আবার মফঃস্বলের চাকরি! বুঝে চললে কখনও পরের গলগ্রহ হতে হয়! সেকালের এই জয়েণ্ট ফ্যামিলির ব্যাপার আমার ভারী বিশ্রী ঠেকে। ও বিলিতি ধরণ বেশ! যে যার নিজের পায়ে দাঁড়াও। আর আমাদের দেশে একজনের সময় ভালো হল ত, পঞ্চাশ জন জ্ঞাতি-কুটম এসে অমনি ঘাড়ে চড়ে বসল!"

দুই নম্বর বলিলেন, "তা কি করবে বল? বড় ভাই!"

এক নম্বর রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "হলেনই বা বড় ভাই! আমারও ত ছেলে-পিলে আছে—বিপদ আপদ আছে! আজ যদি আমি চক্ষু মুদি—?"

কে যেন আমার বুকের মধ্যে ফ্যাঁস্ করিয়া একখানা ছুরি টানিয়া দিল। এ কি কথা! বড় ভাই! তাহার দুর্দ্দিনে তাহাকে দুই দিন আশ্রয় দিতে হইয়াছে, অমনই মনের মধ্যে গরলের উৎস শতধারে উছলিয়া উঠিয়াছে। ইহারই নাম, জীবন-অভিনয়? কি ক্রূর পৈশাচিক এ অভিনয়!

এ জগৎ নাট্যশালা, সত্যই নাট্যশালা। কিন্তু কৈ, প্রমোদের মধুর নাটকের অভিনয় ত বড় দেখিতে পাই না। এমন সুন্দর মধুর বসন্ত-সায়াহ্ন, শুধুই করুণ নাটক, শুধুই বুক-ফাটা হাহাকারের তীব্র উচ্ছ্বাস! শুধু দুঃখ, শুধু শোক, শুধু দ্বন্দ্ব! শুধুই দুর্ম্মদ অহঙ্কারের মত্ত হুঙ্কার!

ওপারের পানে চাহিলাম। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে! চারিধারে ছায়ার যবনিকা নামিয়া পড়িয়াছে! আমার মনে হইল, প্রকৃতি যেন অভিমান করিয়াই আপনার

সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু আবার গোপন-কক্ষে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। মিথ্যা এ সৌন্দর্য্য লইয়া বাহিরে আসা! মানুষের চোখ নাই, মন নাই! কে এ সৌন্দর্য্য দেখিবে? কে বুঝিবে? শুধুই তর্ক তুলিয়া, পয়সার মাপ-কাটি লইয়া সকলে পথে চলিয়াছে। এ মুক্ত অবাধ সৌন্দর্য্যের পানে কেহ ত চাহিয়া দেখিল না! আপনাকে লইয়াই অহর্নিশা শুধু মত্ত রহিয়াছে! এতটুকু মুহূর্ত্ত, এতটুকু ক্ষণও তাহারা বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবে না? আশ্চর্য্য।

আকাশে দুই-একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাস্তার আলোগুলা কে ক্ষিপ্র জ্বালিয়া চলিয়াছিল। কোন দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া পথের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী গম্-গম্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই অন্তরাল ভেদ করিয়া প্রকৃতির মৌন অভিমানের বেদনা-কাতর ম্লান দীর্ঘ-শ্বাসের করুণ ঝঙ্কারটুকু আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। গাড়ী আলোক-উজ্জ্বল ঈডেন উদ্যানের দিকে ছুটিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গান

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে
পাপ্‌ড়ি হোথায় লুটায় ছিন্ন।

এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে জানালো তাই,
এমন করে আমারে হায়,
কেবা কাঁদায় সে জন ভিন্ন!

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত সে রঙিন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ!

সেদিন খবর মিলল না যে!
রইনু বসে ঘরের মাঝে।
আজকে পথে বাহির হব.
বহি আমার জীবন জীর্ণ!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

বেহাগ—একতালা

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ ম II প । র্স। । ন ।। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ ।I
আ মার ভা ঙা ০ প থে র রা ঙা ০ ধূ লা য়

। ম ন। ধ পঃক্ষাঃ প। ম গ ।। ন্ র স I
প ড়ে ০ ছে কা র পা য়ে র চি ০ হ্ন

সঃন্ঃ স ।। ম গ ।। ন্ স ম। । গ রঃংঃ I
তা রি ০ গ লা র মা লা ০ হ তে ০

গঃপঃ । ।। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ ।। ন্ র স I
পা প্ ড়ি হো থা য় লু টা য় ছি ০ ন্ন

পঃক্ষাঃ প ।। পঃনঃ । র্স। র্স । ।। র্সঃনঃ র্স ।I
এ ল ০ য খ ন সা ড়া ০ টি না ই

পঃর্সঃ । ।। র্ র্স ।। ন নঃপঃ র্স। । ন ।I
গে ল ০ চ লে ০ জা না ০ লো তা ই

প । র্স। । ন ।। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ গ I
এ ম ন ক রে ০ আ মা ০ রে হা য়

গ । ম। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ ।। ন্ র স II
কে ০ বা কাঁ দা য় সে জ ন ভি ০ ন্ন

স II স । প। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। স । ম। । গ ।I
তখন ত রু ণ ছি ল ০ অ রু ণ আ লো ০

ন্ । স। গ । ম। প ম গ। ন্ র স I
প থ টি ছি ল ০ কু সু ম কী ০ র্ণ

। । ।। গ । ম। প । র্স। । ন ।I
ব স ন্ ত সে ০ র ঙি ন বে শে ০

পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ রঃপঃ। ম গ ।। ন্ র স II
ধ রা য় সে দ ন অ ব ০ তী ০ র্ণ

II প । ন। । । র্স। । । ।। র্সঃনঃ র্রঃসঃ । I
সে দি ন থ ব র মি ল্ ল না যে ০

প র্স ।। র্সঃনঃ র্রঃর্সঃ ।। ন নঃধঃ পঃর্স। । ন ।I
র ই নু ব সে ০ ঘ রে র মা ঝে ০

প র্স ।। । ন ।। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ ।I
আ জ কে প থে ০ বা হি র হ ব ০

। । ম। পঃক্ষাঃ ধঃপঃ ।। ম গ ।। ন্ র স I
ব হি ০ আ মা র জী ব ন জা ০ র্ণ

বিবাহ সমস্যা

আজ কাল বঙ্গদেশে বিবাহ সম্বন্ধীয় বহুবিধ আলোচনার উত্থাপন হইতেছে। পাঠ্য জীবনে এক সময়ে এই সমস্যাটি আমাদিগকে কতকটা চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। আজ সেই চাঞ্চল্যের যতটুকু ঢেউ এই আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রতিঘাতস্বরূপ দুই একটি কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

স্নেহলতা দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে কলিকাতায় বেশ একটা আন্দোলন চলিয়াছে; কেহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সীমাবদ্ধ বয়সে বিবাহ দিতে বাধ্য হওয়ার দরুণ কন্যার পিতার নানা প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়; এই বয়সের সীমানা উপযুক্ত ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে কেহ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ বা পণ গ্রহণ ইত্যাদি প্রথাকে কন্যার পিতার দুর্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, সে প্রথা উৎপাটিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কলিকাতায় যে ভাবের-তরঙ্গ আন্দোলিত হইয়া ওঠে, সুদূর পল্লীগ্রামগুলিতে যে তাহার আঘাত কতকাংশে গিয়া পৌঁছায় না তাহা নহে। তবুও পল্লীগ্রামে সহরের প্রভাব বিস্তার করা তেমন সহজ নহে। অথচ পল্লীগ্রামই দেশের প্রকৃত সমাজ, সহরে ভাব তেমন জমাট বাঁধিতেই পারে না। ইহারই জন্য সহরের লোককে পল্লীবাসিগণ অনেক বিষয়ে উচ্চাসন দান করিয়াও, বিধি-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। বিশেষতঃ সহরের লোক গ্রামে পদার্পণ করিয়া বসন্তকোকিলের ন্যায় ডালে বসিয়া গান গাহিয়াই চলিয়া আসে, ভূতলে নামিয়া গ্রামের সকল প্রকার সুখ দুঃখের স্থায়ী ভাগ লইবার তাহাদের

অবসর হয় না। অতএব কলিকাতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মিতা, সমাজসংস্কারের প্রবল আন্দোলন, বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছায় কিনা এবং পৌঁছিলেও কার্য্যকর হয় কি না সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ।

আর এক কথা, কলিকাতার সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রকারের আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলন বাস্তবিক পক্ষে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না? আমার মনে হয়, অন্তরে যাহার দুঃখ রহিয়াছে বাহিরে তাহার মলম ব্যবহারে কি উপকার হইবে? অন্তরের ভিতরে যাহাতে মলম প্রয়োগ করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত যতদিনে না হয়, অন্তর হইতে যতদিনে ঘা শুকাইয়া না উঠে, তত দিনে উপরের ঘা কিছুতেই ভাল হইবে না। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে ছাদ কাহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে? বঙ্গদেশের সুধীবৃন্দ বিবাহ সংস্কারের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাহাতে সমাজের অন্তরের ব্যাধি নির্ম্মুক্ত হইবে না, বরং বাড়িয়াই চলিবে। বিবাহোপযোগী বয়স নির্দ্ধারিত করিলে কি লাভ হইবে? চৌদ্দর স্থলে ষোল হইলে কন্যার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার পিতার ধন বৃদ্ধির কি কোনও সম্ভাবনা আছে? বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ বৃদ্ধির সম্পর্ক কোনও শাস্ত্রে আজও পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। অধিকন্তু যখন অধিক বয়স্কা কন্যা স্কন্ধের উপর বিরাজিতা থাকিবে, তখন কন্যাভারাবনত পিতার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবারই সম্ভাবনা। তখন ফোর্থ ক্লাশ হইতে বিতাড়িত কুলরত্নগণও তাঁহাকে এক ধাক্কায় ধুলিসাৎ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। কন্যার পিতার ইহাতে দুর্গতি বাড়িয়া চলিবে বই কমিবার আশা বিন্দুমাত্রও আছে বলিয়া মনে হয় না। এবং এই সকল ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমতী কন্যাগণ পিতৃলাঞ্ছনা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিবে।

তারপরে বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ারই বা কি প্রয়োজন আছে? কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়সে বাংলায় বিবাহ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে কি? এক বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন্ বয়সে না বাংলার হিন্দু সমাজে বিবাহ হইয়া থাকে? অষ্টম বর্ষে গৌরীদান কয়জনে এখন করিয়া থাকে? কচি বয়সে বিবাহ দেওয়া অকল্যাণকর জ্ঞান করিয়া যাঁহারা বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করিতে উৎসাহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। কিন্তু বিবাহকালীন কন্যার পিতার লাঞ্ছনা ইহাতে কমিবে বলিয়া ত মনে হয় না। পণগ্রহণ-প্রথার সংস্কারেও বিবাহের দুর্গতি নিবারিত না হইয়া বরঞ্চ দৃঢ় হইবারই সম্ভাবনা। তবে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এ দুর্গতি দূর হইবে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য সমস্যা। অবশ্য আমি নিঃসন্দেহে স্বীকার করি যে পণ গ্রহণ প্রথাটি সামাজিক আত্মহত্যা বই আর কিছুই নহে। উহাতে বরের পিতা ধনী হন না এবং কন্যার পিতা রসাতলে গমন করেন। এক পাড় ভাঙ্গিয়া আর এক পাড় যদি ভরিয়া উঠিত, বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিবাহের পরের দিন পণের টাকা কোনও বরকর্ত্তার সিন্ধুকে জমা থাকে বলিয়া প্রায়ই শোনা যায় না। পরের রক্ত শোষণে টাকা উপায় করিয়া মানুষ সে টাকা সুখে ভোগ করিবে কেমন করিয়া! পাপে উপার্জ্জিত টাকা প্রায় সবই বৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়। নিতান্ত গরীব ব্যক্তিও হাতে টাকা পাইয়া নানা প্রকার বড়মানুষী অবলম্বন করিয়া দিনেকের জন্য ছোট খাট একটি নবাব সাজিয়া বসেন। পরের হৃদয়ের রক্ত, জীবন মরণের সমস্যা লইয়া এমন ভাবে ছিনিমিনি খেলা যে ঘোর পাশবিক ব্যাপার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তথাপি আমাদের এ প্রসঙ্গেও কিছু কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস এই পণগ্রহণের প্রথাটি বিদ্যমান আছে বলিয়া আমাদের মেয়েদের সামান্য কিছু মূল্য আছে। ইহার অভাবে আমাদের মেয়েগুলি রাস্তার নুড়ি খোয়ায় পরিণত হইবে। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের কন্যাগণ পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত। মেয়ে স্বামীর ঘরে আসিবার সময় কোনও পিতৃসম্পদ লইয়া আসে না। কাজেই তাহাকে আশ্রয় দিয়া এক বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ সম্বন্ধীয় কোনও প্রকার সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। এই ভীষণ জীবন

সংগ্রামের দিনে কোন্ শ্বশুর শাশুড়ী, বা কোন্ স্বামী ঘরের বউকে কোনও মূল্যবান জিনিষ জ্ঞান করিয়া আদর যত্ন করিতে পারে? মুসলমানের মেয়েরা পিতৃ সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে, তাহাদিগকে সংসারের ভার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কেহ অবহেলা করিতে পারে না। আমাদের মেয়েদিগকে সুধু বিবাহ দিলেই ত হইবে না। তাহারা যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহারও ত বন্দোবস্ত করা দরকার। শ্বশুর ঘরে গিয়া তাহারা কোনও প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য না করে, তাহারও ত উপায় খুঁজিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। আমার ত মনে হয়, সুধু এই ভাবনার প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া অনেকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও শান্তি বোধ করেন। মনে করেন, কন্যার সঙ্গে এমন কিছু প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে কন্যাকে কেহ অবহেলা করিতে পারিবে না। পণগ্রহণ প্রথাকে তাড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে আমাদিগের এই ভাবেও খানিকটা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে আইন করিয়া কন্যাকে পিতৃ সম্পত্তির অংশীদার করা হয়, অথবা যদি বঙ্গদেশীয় নেতৃবৃন্দ কন্যাকে সম্পত্তির অংশদান করিতে বদ্ধ পরিকর হন, তাহা হইলে যাঁহাদের সম্পত্তি আছে তাহাদের কন্যাগণের জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ সম্পত্তিই বা কয়জনের আছে? সহস্র সহস্র বাঙ্গালী বাবু আফিসে আফিসে দুঃসহ কেরানী জীবন যাপন করিয়া মাসিক পনের বিশ টাকা উপায় করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করেন। সংসারে আর কোনও অবলম্বন নাই, সুধু ঐ বিশ টাকা। পাঁচডিগ্রী জ্বর লইয়াও ঐ চাকুরী করিতে হইবে, একদিন শয্যাশায়ী থাকিলে তার পর দিন অন্ন জুটিবে না। এমন বাঙ্গালী বাবুর সংখ্যা ত নিতান্ত কম নহে। ইহাদের কন্যাদায় হইতে মুক্তির উপায় বাংলার নেত্রবৃন্দ কি সাব্যস্ত করিবেন?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, সংসারের সকলেই কি সুখ ভোগ করিবে? বাংলায় সকলেই কি বর্দ্ধমানের মহারাজা বা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী হইবে? সুখী যেমন আছে দুঃখীও তেমনি থাকিবে। এ কথার কেহই প্রতিবাদ করিতে পারেনা। মানুষের পৌরুষ যত দূরে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার বাহিরে গিয়া কোনও বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দুঃখীর দুঃখ কি ভাবে মোচন করা যায়? গৃহীকে আশ্রয়, অন্নহীনকে অন্ন, সন্তাপিতকে সান্ত্বনা, কি ভাবে দেওয়া যায়? সেই চিন্তাই সমাজের চিন্তা। সেই কার্য্যেই মানুষের পৌরুষ। আজ, এই ভাবেই দরিদ্রপিতার লাঞ্ছনা কি ভাবে দূর করা যায়, তাহা আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে। নতুবা দিনে দিনে কত স্নেহলতা আপনাকে উৎসর্গ করিবে, তাহার ইয়ত্তা থাকিবে না।

আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে এই একটি সামান্য দুর্ঘটনাকে দূর করিতে হইলে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। বিবাহপদ্ধতি সম্যক পরিবর্ত্তিত না হইলে অন্য কোনও উপায়ে হিন্দু সমাজের বিবাহ লাঞ্ছনা দূরীভূত হইবে না। ঘায়ের উপরিদেশে মলম দেওয়ার মতন সকল চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। আজ কাল কন্যার পিতার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিছুকাল পূর্ব্বে বরের পিতাকেও কিন্তু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তখন নির্দ্দিষ্ট অর্থ পণ স্বরূপ কন্যাপক্ষকে প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে হইত। আজ বরপণরূপ দুর্নীতিকে দূর করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া না গেলে চলিবে না। যখন পঞ্জরের ভিতরে বন্দুকের গোলা প্রবেশ করিয়াছে, চামড়া, মাংস, হাড় কাটিয়া তবে সে গোলাকে বাহির করিতে হইবে।

কি পন্থা অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কল্যাণজনক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি অন্য দুই একটি কথা বলিব। এক সমাজে সকল লোকই বলবান হয় না, সকল লোকই সুন্দর হয় না সকল লোকই ধনী হয় না। কেহ দুর্ব্বল, কেহ কুৎসিত, কেহ দরিদ্র থাকেই। কিন্তু সমাজের সকলেরই যে বিবাহ করিতে হইবে, এমন আইন থাকা এই নিয়মের বাহিরের ব্যাপার। সকল মেয়েকেই বিবাহ করিতে হইবে, সময় মত বিবাহ না দিলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে, এমন আইনের সৃষ্টিও অদ্ভুত ব্যাপার বই, কি? পশু পক্ষীদের সম্মুখে পৃথিবী উন্মুক্ত রহিয়াছে,

নিজেদের ভরণপোষণ তাহাদের যেমন সহজলভ্য মানুষের পক্ষে সেরূপ হইলে তাহাদের কর্ত্তব্যহান বিবাহজীবন যাপন করা অপরাধযোগ্য হইত না। কিন্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম বিভিন্ন শ্রেণীর। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে যেখানে উদরন্নটুকু সংস্থান করা দুষ্কর, সেখানে মেয়ের জাতি-রক্ষার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন? এই সকল বিবাহে লাভ কি? মানি, বিবাহ উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শৃঙ্খল দান করে, উদ্দাম প্রবৃত্তিকে শান্তি দান করে, মানুষকে আশা উৎসাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া কার্য্যক্ষম করে। কিন্তু আমাদিগকে বিবাহ কি ভাবে উন্নতির পথে লইয়া যায়? য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ, যে সকল জায়গায় ধনরত্ন ছড়ান রহিয়াছে, সে দেশের লোক বিবাহদ্বারা কি ভাবে উপকৃত হয়, এবং আমরাই বা কি ভাবে উপকৃত হই? আমরা কার্য্যক্ষম হইয়া দশ ঘণ্টার স্থলে পনের ঘণ্টা আফিসের কার্য্য করিতে রাজি হই, এবং বিশ টাকা স্থলে ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি। পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে আমাদের কার্য্যক্ষমতা কি যথোপযোগী? আমাদের ত মনে হয়, উপযুক্ত পরিমাণ আয় করিতে অক্ষম হইয়া বিবাহ করিয়া আমরা সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করি। আমরা শুধু নিজেরাই যে উহাতে বিপন্ন হই এমন নহে; দেশকে এবং সমাজকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলি। বিবাহের অল্প দিন মধ্যেই আমরা এক এক ঘর কাঙালের সৃষ্টি করি, যাহারা দিন রাত হা অন্ন হা অন্ন করিয়া জীবনের খেলা খেলিতে আরম্ভ করে। তার পর দারিদ্র্যের যে সকল অবশ্যম্ভাবী ফল, ক্রমশঃ তাহাও ফলিতে আরম্ভ করে; এই ভিখারীর দল অন্ন সংস্থানের জন্য যে কোন প্রকারের হীনত্ব অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। দিনে দিনে সমাজ ভয়ানক কদর্য্য ভাব ধারণ করে। যাহারা যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া বিবাহ করে তাহাদের সুখ-কল্পনা নিতান্ত মূর্খতা এবং গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া ইহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিলেও বিশেষ অন্যায় কার্য্য হয় না।

মেয়েদিগকেও এই ভাবে আমরা বিচার করিতে পারি। এবং যাহারা তাহাদিগকে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় তাহাদের ব্যবহারও বিচারের যোগ্য।

আমাদের মেয়েরা যেখানেই বাস করুন না কেন অনেকটা সমাজের বোঝাস্বরূপ। পিতামাতা মেয়েরূপ বোঝাকে যত সত্বর সম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচেন। আজকালকার বাজারে মেয়ে তাই এত বেশি সস্তা যে কোনও প্রকারের ছেলের জন্য যথেষ্ট মেয়ে সংগ্রহ করা যায়।

আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। অর্থ সংস্থান ব্যাপারে মেয়েদের কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? তাহারা ঘরে বসিয়া সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে, আর কি কোনও প্রকারে সহায়তা করিবে না? অথবা দেশের পুরুষগণ মেয়েদিগকে কি এত স্নেহময় করিয়া থাকেন, যে সংসারের কঠোরতার বিন্দুমাত্র আঘাত মেয়েদের গায়ে লাগিলে তাঁহারা কাতর হইয়া পড়েন? অবশ্য পুরুষ তাহার কাছে অনেক সুখ শান্তির আশা রাখে। তাহারা কি পুরুষের কাছে সুখ শান্তির আশা রাখে না? তাহারা দেবীর মত কি শুধু দুই হস্তে বর প্রদান করিয়া পুরুষকে কৃতার্থ করে? ঘরের রান্না বান্না ও অন্যান্য অনেক কার্য্য করিয়া তাহারা সংসারের অনেক খরচ বাঁচাইয়া থাকে বটে। কিন্তু যাহার ঘরে একজনার অন্ন মেলা ভার তাহার ঘরে খরচ বাঁচানর উদ্দেশ্যটা কি প্রকার?

যিনি মেয়ের জন্মদান করিয়াছেন, মেয়ের ভরণ পোষণের জন্য ত তিনিই দায়ী। ধনীর হস্তে মেয়ে দিতে পারেন দিন, নতুবা মেয়েকে পরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া পরকে বিপন্ন করেন কেন? আমার ত ইহার জন্য মনে হয়, পুত্রের পিতাই যে পুত্রকে বিবাহ দিয়া শাপগ্রস্ত হন, তাহা নহে; কন্যার পিতাও শাপগ্রস্ত হন!

তবে দরিদ্র পিতামাতার সন্তানগণের কি দশা হইবে? আমার বিবেচনায় বিবাহ করিয়া ভিখারীর দল পরিপুষ্ট করার চেয়ে অবিবাহিত থাকা অনেক প্রকারে কল্যাণকর। য়ুরোপীয় প্রথা বলিয়া অনেকে ইহা অবজ্ঞা করিবেন সন্দেহ নাই! ইহাতে সমাজের নৈতিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে এমন আশঙ্কা অনেকেই করিবেন কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজের ভিতরেই যে



—"সব চলে, তলে তলে!"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

কালোপযোগী যেমন কতকগুলি প্রথা বিদ্যমান আছে, তেমনই সার্ব্বজনীন কল্যাণের অনুষ্ঠানও কিছু কিছু আছে। এই সার্ব্বজনীন্ অনুষ্ঠানগুলির সূত্রেই সমগ্র মানব সমাজ ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া বিবাহ করার প্রথাটী নিশ্চয়ই একটি সার্ব্বজনীন্ অনুষ্ঠান। ঘৃণা করিয়া উহাকে উড়াইয়া দিবার আমাদের সাধ্য নাই। বিশেষতঃ যখন আমরা য়ুরোপীয় রাজ্যশাসনে বাস করি এবং য়ুরোপীয় জীবন সংগ্রাম আমাদের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তখন য়ুরোপীয় সমাজের কতকাংশ আমরা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক গ্রহণ করিতে বাধ্য। য়ুরোপে ঐ প্রথা বর্ত্তমান থাকার দরুন তাহাদের সমাজ জাতীয়তা সৃষ্টি করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে; এবং এই কারণে য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দ যে নরকগামী হইয়াছে, সচ্চরিত্রতা, সাধুতা যে য়ুরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এমন কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে?

বিবাহ সংস্কার বিষয়ে আমার প্রথম প্রস্তাবনা এই যে, যোগ্য ব্যক্তির সহিত মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, মেয়েকে অবিবাহিতা রাখিলে জাতিচ্যুতি বা অন্য কোনও লাঞ্ছনা সমাজে বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য নহে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা এ দেশে কোনও দিন প্রচলিত হইবে কি না জানি না, কিন্তু তাহা যে না হইলেই চলিবেনা একথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য সুখসম্ভোগ নহে, সমাজ সংরক্ষণ। মানবসমাজ শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই জন্য সমাজের শাসন নিম্নে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। জঙ্গলের বর্ব্বর জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, সুসভ্য আর্য্যজাতির মধ্যে সর্ব্বত্র কোন না কোনও ধরণে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। সমাজ সর্ব্বত্রই মানুষকে আপনার অনুশাসনে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। সমাজের এ অনুশাসন আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই, মানুষই আপনার সৃজিত চক্রে আপনি আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে। আমরা যে অনুশাসনের নিম্নে মানুষ হইতেছি, তাহা যে আমরা ভাঙ্গিতে গড়িতে পারিব না এমন কোনও কথা নাই। আর বাস্তবিক পক্ষেও আমরা প্রতিদিন নূতন নূতন কত প্রকারের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যে চলিয়া যাইতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। দিবারাত্রি সংসার শুদ্ধ পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহাকে রোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। কিন্তু আমরা যে ভাবে পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিতে উৎসাহিত, তেমন উৎসাহ কোনও ক্রমে সামাজিক এবং জাতীয়তার পক্ষে সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। যখন কোনও ভাবের বন্যা দেশে প্লাবিত হয়, তখন যে নীরবে বসিয়া থাকিতে চাহে, সে নিতান্ত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করে। তাহাকে সমর্থন করিয়া তাহাকে বহাইয়া দিতে চেষ্টা করাই মানব ক্ষমতার সুযোগ্য ব্যবহার। বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে আজ যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাকে উদ্বেলিত করিবার জন্য সকলেরই আপন আপন শক্তি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটি সম্পূর্ণভাবে ইউরোপের আদর্শ। ইহা স্বেচ্ছা বিবাহ। আমাদের দেশে যে কোন কালে এই আদর্শ বর্ত্তমান ছিল না তাহা নহে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয়া বালিকাদিগের নানাপ্রকার দুর্গতির ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল সংবাদ প্রদান করা সত্ত্বেও আমি এই প্রথাটিকে সমর্থন করিতেছি। আমরা যে ভাবে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি, আমার মনে হয় তাহাতে আমরা প্রকৃতির অনুশাসনকে অবজ্ঞা করিয়া পুরুষকারকে বলীয়ান্ করিতে যত্নবান্ হই। এবং প্রকৃতিদেবী যে এই অনধিকার প্রবেশকে ক্ষমা করেন তাহাও নহে। সরলভাবে, আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে এই বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে আমার এই প্রস্তাবটা বোধ হয় সহজে অগ্রাহ্য হইবে না। আমাদের বিবাহিত জীবনের চিত্র অঙ্কন নিষ্প্রয়োজন, তবু দুই এক কথা বলিব। অনেকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন যে শত শত পরিবার এইভাবে বিরচিত হওয়ার দরুণ বেশ সুখে শান্তিতে দিনপাত করিতেছে, আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে তাঁহাদের সুখশান্তিতে জীবনযাপন করার ভিতরে নির্জ্জীব অবসাদ ছাড়া জীবন্ত কোনও মহৎ ভাব বা প্রাণের

প্রসারতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ভেড়ার পালের মতন নীরবে চুপচাপে জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা শুধু ভেড়ার বংশ বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের মিলনে সিংহ শিশুর উৎপত্তি হওয়ায় সম্ভাবনা অতিশয় বিরল। ভাগ্যের জোরে যে স্থলে তেমন উত্তপ্ত মিলন ঘটিয়া থাকে সেই স্থলেই দুই একটি মানুষের মতন মানুষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। আমরা বিবাহিত না হইয়া স্বয়ং বিবাহ করিলে এক পক্ষে এই দীনতা ঘুচিবে, অন্য পক্ষে পূর্ব্বানুরাগবশত স্ত্রীগণও বিনামূল্যে রত্নস্বরূপ গৃহীত হইবে।

দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবৃত্তগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও মহাপুরুষের এবং মহৎ ব্যক্তির জন্ম ইতিহাসের সহিত কোনও না কোনও রহস্য বিজড়িত রহিয়াছে। এমনকি আধুনিক মনীষী ব্যক্তিগণের জন্ম রহস্যও তাহাদের পিতামাতার গভীর প্রণয়ের কৌতুকপূর্ণ কাহিনীতে ঝলমল করিতেছে। এবং ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের দ্রোণ কর্ণ পাণ্ডবদের জন্মবৃত্তান্ত, খৃষ্ট প্রভৃতি বহু মহাজনের জন্ম ইতিহাস এই বিধানটিকে সমর্থন করিবে। পুত্র কন্যার জন্মের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া বিশেষজ্ঞগণ ইহাকে অনুমোদন করিয়া থাকে। পিতামাতার প্রণয় অত্যন্ত গভীর আবেগময় হইলেই পুত্রকন্যাগণ, স্বাস্থ্যশালী, সৌন্দর্য্যশালী, এবং উন্নতচেতা হইয়া থাকে। নিতান্ত নির্জীবভাবে যে বিবাহ সংঘটিত হয়, আর সজীব প্রণয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া যে মিলন ঘটিয়া থাকে, তাহাদের ফলাফলের তারতম্য ঘটিবেই। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে য়ুরোপে এবং স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রচলিত অন্যান্য দেশসমূহে জাতীয় উন্নতি কি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে; ঐ সকল দেশে বৎসরে বৎসরে কত বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহার আলোচনায় ভারতবর্ষের দীনতা বেশ স্পষ্টভাবে সপ্রমাণিত হইতে পারে। রোম্যান্স্ থাকিলেই যে সমাজ নরকগামী হইবে, এমন ধারণা ভুল ধারণা।

আমার মনে হয় স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলে বরকন্যার পিতৃদেবগণ আর কোনও প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন না, এবং মেয়ের জন্ম সমাজের পক্ষে দুর্ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

কিন্তু আরও অনেক ভাবিয়া দেখিবার আছে। কঠোর অবরোধ প্রথা যে সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে সমাজের মেয়েরা এত বেশি লজ্জাশীল, এত বেশি ভীরু সে সমাজে কি প্রকারে, কত দিনে এই প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা এ স্থলে করা সম্ভবপর নহে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই বলা যাইতে পারে, একদিন না একদিন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় আমরা উহাকে ত্যাগ না করিয়াই পারিব না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের উপস্থিত একটি মাত্র দুর্গতিকে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে। ভিতরের ক্ষত আরোগ্য করিতে হইলে বাহিরে মলম প্রয়োগে বিশেষ কোনও উপকার হইবে না। সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন কল্পে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌরবকে (?) বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অবরোধ প্রথা ইত্যাদি বহু প্রকার অতীত মাহাত্ম্যকে জলাঞ্জলি না দিলে আমাদের দুর্গতির অন্ত হইবে না। গৃহাভ্যন্তরে পরিষ্কার হাওয়া বওয়াইতে হইলে চারি দিকের দরজা জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে সমাজ শুদ্ধ সকলেই খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে এমন ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, বরং হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাতেই বজায় থাকিবে।

মোটামুটি আমার বক্তব্য এই যে, ছেলেরা যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া বিবাহ না করিলে এবং যোগ্য বর জোটান অসম্ভব হইলে মেয়েকে অবিবাহিত রাখিলে, সমাজ এই দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হইলে কন্যাদের অবিবাহিত জীবন যাপন করিবার অন্যান্য বহু পন্থা আছে। সমাজের কর্ত্তব্য, সেই সকল পন্থা তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রাখা। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়।

আর্ট—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিখ্যাত শিল্প--সমালোচক মিঃ লরেন্স বিনিয়ন্ লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধের সারসঙ্কলন।

প্রাগৈতিহাসিক মানব-অঙ্কিত চিত্র য়ুরোপে প্রথম আবিষ্কৃত হয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। স্পেনদেশীয় জনৈক জমিদার স্পেনের উত্তরে তাঁহার জমিদারিতে একটি গুহা দেখিতে গিয়াছিলেন—প্রাগৈতিহাসিক মানবের কোনো নিদর্শন আবিষ্কারের আশায়। সেখানে গিয়া প্রথমে তিনি রাশীকৃত ঝিনুক, ভগ্ন অস্থি, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ও রন্ধনের ধূমচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তাঁহার শিশু কন্যা তাঁহাকে গুহার ছাদে দৃষ্টিপাত করিতে বলায়, তিনি উপরে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে অঙ্কিত একটা বাইসনের ছবি রহিয়াছে। আরো মনোযোগ পূর্ব্বক দেখাতে হরিণ, ঘোড়া, বন্যবরাহ প্রভৃতি নানা জন্তুর ছবি দেখা গেল।

এই সব বন্যজন্তুর চিত্ররচনা করিতে আদিম গুহাবাসী মানব এত সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াছিল কেন? কিসের জন্য তাহাদের এই আর্টের প্রয়োজন? সে কোন্ প্রবল প্রেরণা যাহা শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবকে এই শিল্প সৃষ্টি করিতে বাধ্য করিয়াছিল? কেহ হয়ত বলিবেন, ইহা যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের ফল। গুহাবাসীরা হয় ত ভাবিত যে, এই সব প্রতিকৃতি গুহাভ্যন্তরে অঙ্কিত করিলে খনিগুলি তাহারা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবে। এই কথাই সত্য? না চিত্ররচনা তাহাদের একপ্রকার ধর্ম্ম ছিল? অথবা তাহারা এইসব বন্য জন্তুগুলিকে ও সেই সঙ্গে তাহাদের নিজেদের মৃগয়া-শক্তিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতেছিল? না ইহা তাহাদের অনুসৃষ্টি করিবার আনন্দ মাত্র?

জানিনা, হয়ত পূর্ব্বোল্লিখিত সকল উদ্দেশ্যগুলিরই কিছু কিছু একটু চিত্ররচনার মূলে নিহিত আছে। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে শীকারের জন্তুগুলির সহিত প্রাগৈতিহাসিক মানবের একটা গভীর সম্বন্ধ ছিল;—সেই সকল জন্তুর মাংসে উদর-পূর্ত্তি, তাহাদের চর্ম্ম লইয়া দেহ-রক্ষা না করিলে তাহাদের উপায় ছিল না। এই জন্তুই তখন তাহাদের জীবনের সহিত অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হইয়া ছিল। তাহাদেরই চিন্তা সেই আদিম যুগের মানবকুলের মনের সম্মুখে নিয়ত জাগরিত হইয়া থাকিত—এবং হয় ত অন্য কোনো দিকে তাহাদের নজরই পড়িত না। সেই জন্য যাহাদের সহিত তাহাদের জীবনের এমন রক্তমাংসের সম্বন্ধ তাহাদের বিষয় চিন্তা তাহাদের কল্পনাকে পাইয়া বসিত এবং সেই কল্পনার স্বপ্ন, রঙে এবং রেখায় পুনর্জন্ম লাভ করিয়া এই আর্টের সৃষ্টি করিত; এবং এই আর্টের অর্থই তাহাই প্রকাশ করা যাহার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আর্টের গোড়াকার কথাই হইতেছে ইহাই। মানুষের নিজের সহিত বিশ্বের যে সম্বন্ধ—সে বিশ্বটাকে যে ভাবে পাইয়াছে, তাহার কাছে বিশ্ব যে রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, বিশ্বের

সামগ্রী হইতে সে যে আনন্দ বা দুঃখ লাভ করিতেছে—যাহা তাহার প্রাণকে কেবলই নাড়া দিতেছে—তাহাই প্রকাশ করার চেষ্টাতেই আর্টের সৃষ্টি। এই সভ্যতার যুগেও কি আর্টের মূলে ঐ কথাই নাই? হইতে পারে এখন মানুষের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ সেই প্রাগৈতিহাসিক মানবকুলের মতো সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ নহে;—এখনকার মানব-সন্তানের কাছে আহার বিহারের সামগ্রীটা তত বড় হইয়া উঠে না—সেইটেই তাহার জীবনের একমাত্র প্রাণের সামগ্রী নহে; কিন্তু তাই বলিয়া কি অসভ্য মানব-সমাজের আর্ট এবং এখনকার সভ্যসমাজের আর্ট এই দুইয়েরই ভিতরকার কথা—এবং উভয়েরই প্রেরণা একই নহে?

একদিকে বিরাট বিশ্ব, প্রকৃতির নিত্য নূতন রূপ ও রহস্যের আনন্দ ও ভয় লইয়া বর্ত্তমান আর একদিকে মানুষ বিশ্বের সেই সকল জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় শক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া কেবলই খুঁজিতেছে, কেবলই প্রশ্ন করিতেছে—কেবলই জানিতে চাহিতেছে—এ বিশ্বটা কি? আমার কাছে এ বিশ্বের সার্থকতা কি? এবং আমিই বা এ বিশ্বের কে?

আমাদের জীবনের এই কথাটিকে আমরা আর্ট দিয়া যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়া থাকি। প্যাটার্ণ বা নক্‌সা হইতেছে এই কথাটিকে ব্যক্ত করিবার ভাষা; কাজেই নক্‌সার ভিতরে একটা অর্থ থাকেই থাকে। জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর যে অভিজ্ঞতা, ধারণা, প্রত্যয় তাহা শিল্পীর রচিত চিত্রের বিষয় অপেক্ষা চিত্রটি নক্সা-করিবার-ধরণে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য নক্‌সার প্রধান লক্ষণ হইতেছে পরিপূর্ণতা ও অজস্রতা। ইহা পাশ্চাত্য মনেরই নিদর্শন,—যাহা সকল অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে চায়, কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ রাখিতে চায় না। পাশ্চাত্য মন শূন্য স্থান বরদাস্ত করিতে পারে না—সর্ব্বদা নির্জ্জনতা হইতে দূরে থাকিতে চায়।

য়ুরোপে বহুদিন যাবৎ একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, মানুষের প্রকৃতিগত অনুকরণ প্রবৃত্তির ফলেই আর্টের জন্ম। এ ধারণা একেবারেই ভুল। নকল করায় একটা সুখ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু একটা-কিছু সৃষ্টিকরার ভিতর যে আনন্দ আছে সে আনন্দ অনুকরণের মধ্যে কোথায়? যাহা আছে তাহার নকল করিয়া তো মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না—সে বলে উহা তো আছে, উহাতে আমার কৃতিত্ব কোথায়! আমি জগৎকে কিছু দিব—যাহা আমার! স্বীকার করি যে, আর্টে বাস্তবতার প্রয়োজন আছে—বাস্তবতা আমরা চাইও। কিন্তু সেটা যে বাস্তবতার খাতিরে চাই তাহা নহে। কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে বাস্তবতা কিছুই নয়; যতক্ষণ না তাহা কোনো একটি বিশেষ আদর্শ বা আইডিয়াতে রূপান্তরিত হইতেছে।

য়ুরোপীয় চিত্ররচনার প্রথম জিনিস যাহা আমাদের চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে বিষয়ের উপর অদ্ভুত দখল। এই কারণেই আর্ট যে স্বভাবের অনুকরণ, এই ধারণা লোকসমাজে এত প্রচলিত;—যদিও য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ কখনই এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া চিত্ররচনা করেন নাই। Leonardo, Correggio, Rembrandt প্রভৃতি

চিত্রকরগণ ছায়া-সুষমার রহস্য আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন নাই। শারীর-বিদ্যা শিখিবার জন্য, বা চিত্ররচনার মাপজোখ যাহাতে নির্ভুল হয় সে জন্য Michaelangelo অ্যানাটমির রহস্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা এ সব বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন প্রকাশের একটা ভালোরকম পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য। কিন্তু অনেক অক্ষম চিত্রকর উপায়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া উদ্দেশ্যের কথাটা একেবারেই ভুলিয়া যান।

* * *

চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশে জনৈক চিত্রকর ছিলেন। তিনি আবার কবিও ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার সংগৃহীত কতকগুলি চিত্র একটি বাক্সে ভরিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট গচ্ছিত রাখেন। বাক্সের তালা বন্ধ করিয়া তিনি তাহার উপর শীলমোহর করিয়া দেন। চিত্রগুলির উপর বন্ধুর লোভ জন্মিল। সে বাক্সের তলদেশের তক্তা খুলিয়া ছবিগুলি আত্মসাৎ করিল। বাক্স খুলিয়া চিত্রকর দেখিলেন বাক্সের মধ্যে একখানি ছবিও নাই,—সব লোপ পাইয়াছে। চিত্রগুলি যে চুরি গিয়াছে এ সন্দেহ তাঁহার হইল না—তিনি বিস্ময় প্রকাশও করিলেন না। তিনি বলিলেন, সুন্দর ছবি অলৌকিক জীবের নিকট যাতায়াত করে! মানুষ যেমন করিয়া অমরলোকে যাত্রা করে ছবিগুলিও তেমনি আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া উড়িয়া গেছে! চীনাদের ধারণার-জগৎ আমাদের হইতে কত বিভিন্ন তাহা দেখাইবার জন্যই এই ক্ষুদ্র গল্পের উল্লেখ করিলাম।

প্রাচ্যদেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, শিল্পী শক্তিশালী হইলে বিশ্বের জীবনী শক্তি তাহার দখলে আসিত। তাহাতে তাহার অঙ্কিত চিত্রে প্রকৃত জীবনের সৃষ্টি হইত! কথিত আছে, এমন সব অশ্ব অঙ্কিত হইত যাহারা গতির বেগে এত সজীব যে তাহারা চিত্রের গণ্ডি ভাঙিয়া শূন্যে ছুটিয়া যাইত! এবং ডাগনের চিত্রে ওস্তাদ যেই তুলিকার শেষ পোঁচ লাগাইয়াছিলেন অমনি তাহা বজ্রনাদে কক্ষের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উড়িয়া গিয়াছিল! চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ-চিত্রকরের জীবন-অবসান সম্বন্ধে যে গল্প শুনা যায় তাহার আদর্শ যে মহান্ সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ হইবে না। চিত্রকর শেষ বয়সে দেওয়ালের গায়ে একখানি দৃশ্যচিত্র রচনা করিয়া উহা সম্রাটকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। সম্রাট যখন বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে চিত্রের প্রতি চাহিলেন তখন ওস্তাদ বলিলেন—পশ্চাতে আরো সৌন্দর্য্য আছে। এই বলিয়া তিনি হাততালি দিলেন। অমনি চিত্রমধ্যস্থ পাহাড়ে একটি গুহা প্রকাশিত হইল, চিত্রকর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইলেন! দেওয়ালের উপরের চিত্র ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, শূন্য দেওয়ালে চিত্রের চিহ্নমাত্র রহিল না!

চিত্রকে প্রাচ্যদেশীয়েরা সেই অপার্থিব পদার্থই বলিয়া ভাবিতেন যাহা চিত্রকরের ব্যক্তিত্বকে একেবারে অভিভূত করিয়া তাহাকে তাহার নিজের জীবন অপেক্ষা এক মহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিত।

পাশ্চাত্য চিত্রে পূর্ণতা দিবার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। ছবিটির সমস্ত কথা ছবির মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু চীনগণ এই পূর্ণতাকে আমল দেয় না। তাঁহারা বলেন যেখানে পূর্ণতা, যেখানে শেষ—সেখানেই মৃত্যু। তাই তাঁহারা সসীমকে স্বীকার করেন না। সেই জন্য চীনের চিত্রে এতটা শূন্য স্থান থাকে যাহার মধ্যে আমাদের কল্পনা অবগাহন করিয়া বাধা মুক্ত হইতে পারে। চীনশিল্পীগণ তাঁহাদের জীবনী-শক্তির কল্পনাকে মানুষের প্রতিকৃতিতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন কখনো অনুভব করেন নাই। ভগবানকে তাঁহারা পথরূপে অর্থাৎ গতি বা শক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। এবং জীবনের অপরিবর্ত্তনীয় গতির মধ্যেও যে নিত্য নিয়ত পরিবর্ত্তন চলিতেছে এ তথ্য তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই আমরা প্রায়ই চীনা চিত্রে দেখি কোনো কবি বা জ্ঞানী জল-প্রপাতের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জলপ্রপাতই জীবনের স্বরূপ; উহার অসংখ্য বিন্দু প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ দেখিলে বোধ হয় যেন সেই জলধারার কোনো পরিবর্ত্তন নাই। আকাশে যে মরালের দল উড়িয়া যায় আমরাও তাহাদেরই মত যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি! কিন্তু আমরা পথশ্রান্ত নই, আমরা পথের অবসানের জন্য অধীর হইয়া নাই! যে গতির শেষ নাই, যাহা অনন্ত ও শাশ্বত সেই গতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।

পাশ্চাত্যের আকৃতি-অঙ্কন ও প্রসাধন-চিত্রে দেখা যায় যে, চিত্রবর্ণিত বিষয়ের মধ্যে যে ঐক্য তাহা চিত্র মধ্যে কোনো এক স্থানে গিয়া কেন্দ্র রচনা করে। কিন্তু খাঁটি চীনা বা জাপানী চিত্রে একটা-কোনো প্রধান বিষয় নাই। চিত্রবর্ণিত বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যই পরিকল্পনার অবিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য চিত্রে চিত্র-বর্ণিত বিষয়গুলির যথামতো সমাবেশ দেখা যায়; চিত্রের প্রান্ত ও ফ্রেমের মধ্যে কতকটা শূন্য স্থান থাকে, তাহা কোনো-না-কোনো-প্রকারে ভরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাচ্য চিত্রে সেই স্থানটুকুতে এমন আভাষ জাগাইয়া দেওয়া হয় যাহা চিত্রের সীমাহীনতাই নির্দ্দেশ করে।

জীবন যেখানে, সেখানেই গতি। স্বাভাবিক গতি যেখানে সেইখানেই ছন্দ। মানুষ ছন্দ চায়, যেহেতু উহা জীবনেরই স্বাভাবিক প্রকাশ। চীনগণ জানেন যে জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে এক অনন্ত জীবনধারা প্রবাহিত; তাই তাঁহারা বলেন, এই জীবনের ছন্দে ছন্দিত হওয়াতেই চিত্রের সার্থকতা; অন্যথা নয়।

প্রাচ্যভূমির আর্টে আমরা তিনটি প্রধান লক্ষণ দেখি যাহা পাশ্চাত্য আর্ট হইতে বিভিন্ন। সেগুলি হইতেছে:—(১) চিত্র বর্ণিত বিষয়ের যথাযথ সমাবেশের স্থানে উহাদের সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠান (২) শূন্য স্থানকে চিত্রের ভাষারূপে ব্যবহার (৩) গতির প্রকাশ।

বিজ্ঞানবিদেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে আমাদের যেমন অনুভব করিবার শক্তি আছে উদ্ভিদজগতেও সে শক্তি বিদ্যমান। তাই বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় চিত্রকলায় কেবল যথাযথ প্রতিরূপ প্রকাশ করার বিপক্ষে একটা বিদ্রোহ সাড়া দিয়া উঠিতেছে। সেই জন্য য়ুরোপীয় চিত্রকরেরা আজকাল চিত্রে কতকগুলা জিনিস অঙ্কিত করার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, তাই তাঁহার গতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং চিত্রেরও যে একটা বিশেষ ছন্দ আছে, এই ধারণা হইতে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা

সাগর-সঙ্গীত।—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য লিখিত নাই। এখানি কাব্যগ্রন্থ। ইহার কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। নানা কারণে চিত্তরঞ্জন বাবুর নাম বাঙ্গালার ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সুদক্ষ ব্যারিষ্টার বলিয়া চিত্তরঞ্জন বাবুর যথেষ্ট সুনাম আছে—তিনি যে একজন ভাবুক কবি, এ কথা বোধ হয় সকলে জানিতেন না। সাগর-সঙ্গীত-পাঠে তাঁহারা চিত্তরঞ্জন বাবুর কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। বহিখানি হাতে পড়িলে প্রথমেই ইহার বাহ্য সৌষ্ঠবে চোখ জুড়াইয়া যায়। এমন উৎকৃষ্ট ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই, কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে পূর্ব্বে আমাদের চোখে পড়ে নাই। প্রতি পৃষ্ঠাতেই সাগরের ভীষণ মধুর চিত্রাবলী; তরঙ্গভঙ্গের মৃদু আভাসের মধ্যে কবিতার ছত্রগুলি যেন ভাসিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। চমৎকার পরিকল্পনা! তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র কয়েকখানি সাগর-চিত্রও আছে। উপরে নিকষ-কালো মেঘ তাহারই পদতলে সমুদ্রের কালো জলে তরঙ্গের ফেনোজ্জ্বল হাসির ছটা! এ গ্রন্থের বহিঃ-সৌন্দর্য্য মধুর, অপূর্ব্ব! তাহার পর ভিতরের কথা। কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাব-ছায়া বড় নিবিড় রেখাপাত করিয়াছে! তাহা হইলেও এমন কবিতাও আছে যেগুলি পাঠ করিলে চিত্তরঞ্জন বাবুর স্বাধীন ভাবেরও সুগভীর কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাই। সাগর-সঙ্গীতের ভাষা শক্তিমানের ভাষা। সে ভাষায় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য বেশ সরল-সহজভাবে মিশ্‌ খাইয়াছে। কবিতাগুলির সমস্তই সাগরকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইলেও প্রত্যেকটি কবিতা স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং সে কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। আইনের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও যে চিত্তরঞ্জন বাবু বঙ্গ-বাণীর পূজার অর্ঘ্য সাজাইবার অবসর করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার সে অবসর সার্থক হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। আশা করি, বঙ্গ-বাণীর পূজায় ব্যাপৃত থাকিয়া কালে তিনি সুন্দরতর চারুতর অর্ঘ্য সাজাইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন, নিজেও ধন্য হইবেন!

অবসর-চিন্তা।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রণীত। কটন্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। প্রবন্ধ-পুস্তিকা। 'কামনা', 'সৎ প্রবৃত্তি' 'কৃপণতা', 'পিতাপুত্র,' 'ভদ্রতা' প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের কয়েকটি চিন্তা এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয় পত্র।—ট্রাষ্টীদের আদেশানুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এই গ্রন্থখানি কলিকাতা মিউজিয়মের (যাদুঘর) গাইড্-পুস্তক। মিউজিয়মের কোন্ কক্ষে কি আছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি হাতে লইয়া মিউজিয়ম দেখিতে গেলে কোন বিষয় জানিবার জন্য 'আনাড়ির' মত পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না—এই গ্রন্থ দেখিয়া সহজেই সকলে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কলিকাতা মিউজিয়ম-সংক্রান্ত সকল প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ এবং ইহার উপযোগিতাও বিলক্ষণ। এ গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় প্রকাশ এবং সাধারণের অনায়াসে-লব্ধ হইবে এই ইচ্ছায় ইহার মূল্য যৎসামান্য করিয়া দিয়া মিউজিয়মের ট্রাষ্টীগণ প্রকৃতই সাধারণের উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

পণগ্রহণে বিবাহ। অর্থাৎ বিবাহের আদর্শ, পণগ্রহণের অবৈধতা ও অপকারিতা এবং তাহা দূরীকরণের উপায়। কলিকাতা বণিক প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা মাত্র।

নীরব সঙ্গীত।—বিজন-কুসুম রচয়িত্রী প্রণীত। কলিকাতা নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। কবিতা-পুস্তক।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। বিবেকানন্দ স্বামী একজন আদর্শ কর্ম্মী ও মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত ব্যক্তি সমাজের পক্ষে guide-post স্বরূপ। এরূপ মহাপুরুষের কথা যত অধিক আলোচিত হয়, দেশের ও জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। স্বামীজির জীবন ও শিক্ষার কয়েকটি স্থূল তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিবৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় মহাপুরুষ ও সুলেখকগণের মহা-বাণী সকল সংগ্রহ করিয়া 'ডায়ারি' গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালায় সেরূপ চেষ্টা আজিও দেখিতে পাইতেছি না, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই! এই সকল মহাবাণী শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, তাপিতকে শান্তি, পথহারাকে পথের সন্ধান দেখাইয়া দেয়। কতকটা সেই ধরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। তবে প্রভেদ এই, গ্রন্থকার নিজের কথায় স্বামীজির শিক্ষা ও উপদেশাদির (teachings) সার-সঙ্কলন (epitome) করিয়াছেন।

ছায়াপথ।—শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম-এ-বি-এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদুলভকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এল, বসিরহাট। কলিকাতা নববিভাকর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। ইহার কবি ভুজঙ্গধর বাবু বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। ছায়াপথ তাঁহার পরিণত রচনা। গ্রন্থের মুখবন্ধে সুধী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, কবি-চক্ষু যেন ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর ঊর্দ্ধলোকের নক্ষত্র-দীপ্ত ছায়াপথের সন্ধান পাইয়াছে; সেই জন্যই বুঝি এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে "ছায়াপথ।" আমরাও হীরেন্দ্র বাবুর কথার অনুমোদন করি। কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠকের মন সত্যই সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করে। কবিতাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা ও কাব্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আজকাল মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া অনেক তরুণ কবির আধ্যাত্মিক কল-কাকলী ছন্দাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আধ্যাত্মিকতা সে শ্রেণীর নহে। এ আধ্যাত্মিকতায় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আছে, শক্তির ছাপ আছে, ভাবের ছাপ আছে! "শিশুর প্রতি" "আত্মবিৎ" "আত্মদীপিকা" "বীণা" "আনন্দলহর" প্রভৃতি বহু কবিতাই ভাব-সম্পদে সমধিক উজ্জ্বল। সনাতন প্রাচ্য ভাবে কবিতাগুলি ওতঃপ্রোত, উদার গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত। আধ্যাত্মিকতার কুয়াশায় কাব্য কোথায়ও ঢাকা পড়ে নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল।

ভারতবাণী।—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং। কলিকাতা লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব কি ইহাই কয়েকটি প্রবন্ধের সাহায্যে এই গ্রন্থে লেখক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আদর্শাদিরও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি হইতে লেখকের ভূয়োদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই; কিন্তু তাঁহার যুক্তি সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ হয় নাই। না হোক, তথাপি এ গ্রন্থখানি স্বদেশ ও স্বজাতির হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই আমরা পাঠ করিতে বলি।

জয়নলোদ্ধার কাব্য—বা দমস্ক কারাগার হইতে হজরত জয়নল্ আবেদীনের মুক্তিলাভ। শ্রীআকুল মা আলী মহম্মদ হামিদ আলী প্রণীত। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। কাপড়ের বাঁধাই ৷৵০ আনা। এখানি কাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা পাঠে মুসলমান ইতিহাসের কিয়দংশ জানিতে পারা যায়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কাস্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ভারতী

৩৮শ বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১　　[২য় সংখ্যা

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৃচ্ছকটিকা—একটি সংকীর্ণ প্রকরণ-জাতীয় নাটক। ইহা কবির স্বকপোল-কল্পিত রচনা, এবং ইহা কোন মহাকাব্যমূলক কাহিনী বা পৌরাণিক কাহিনীর উপর সংস্থাপিত নহে। ইহার নায়ক একজন ব্রাহ্মণ এবং ইহার দুইটি নায়িকা। একটি বারাঙ্গনা, অপরটি ধর্ম্মপত্নী। আমরা যতদূর জানি, নাট্য-রচনায় এরূপ ধরণের নায়িকা প্রায়ই দেখা যায় না। মালবিকাগ্নিমিত্র ব্যতীত, নিম্নোক্ত এই প্রকরণগুলিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যথা ;—উদ্দণ্ড-কবিকৃত "মল্লিকা-মারুত", "পুষ্পভূষিত" এবং "তরঙ্গ-দত্ত" বা "রঙ্গদত্ত" ; "সূক্তিমুক্তাবলী"র একটি শ্লোক হইতে আমরা অবগত হই, অবন্তি বর্ম্মনের আশ্রিত কবিগণের মধ্যে শিবস্বামিন্ নামক এক কবিকর্ত্তৃক কতকগুলি প্রকরণ রচিত হয়। (৮৫৭—৮৮৪ খৃঃ-পূঃ)। পুঁথির তালিকায় অল্পসংখ্যক প্রকরণের নাম যে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার কারণ, নাটক ও প্রকরণের মধ্যে প্রায়ই একটা গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ফলত মৃচ্ছকটিকা ছাড়া, বিদিত প্রকরণমাত্রই বিশুদ্ধ-জাতীয় প্রকরণ,—উহার পাত্রগণ উচ্চপদস্থ লোক ; সুতরাং নাটক ও প্রকরণের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মৃচ্ছকটিকা—এই নামকরণ হইতেই দেখা যায়, উহা একটা প্রাসঙ্গিক কথার অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র তথ্য। অর্থাৎ বসন্তসেনা বালক রোহসেনাকে শান্ত করিবার জন্য কতকগুলা অলঙ্কারে পূর্ণ করিয়া একটা মাটির খেলনা—শকট-দিয়াছিল। অবশ্য এই ছোট কথাটির গুরুত্ব বিলক্ষণ আছে ; কেননা নবম অঙ্কে চারুদত্তের বিরুদ্ধে ইহা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই নাটকের দৃশ্যে যে আচার ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। মালবিকাসম্বন্ধে এই কথা আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। মৃচ্ছকটিকায় ভারতীয় সমাজের যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহার সহিত বাস্তব সমাজের নিশ্চয়ই কোন সাদৃশ্য নাই। সেই প্রাচীন কালে শূদ্রকের আমলে, কতকগুলা গোয়ালা বিনা ষড়যন্ত্রে তিন দিনের মধ্যে যে রাজত্বলাভ করিতে পারে নাই তাহা বিশ্বাস করা বেশ স্বাভাবিক; অপূর্ব্ব রূপসী হইলেও উজ্জয়িনীর বারাঙ্গনা-গণের বাসবদত্তার ন্যায় এরূপ সুবিস্তৃত ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া চৌর্য্যবৃত্তিতে যতই সিদ্ধহস্ত হউক না কেন, সেই সময়কার চোরেরা শর্ব্বিকারের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি করিবে হইাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। শূদ্রক, নাট্যকার্য্যের মধ্যে ও পাত্রগণের মধ্যে যেরূপ একটা তীব্র জীবন্ত ভাব আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তব বলিয়া একটা বিভ্রম উপস্থিত হয়। মনে হয় যেন আমরা ঠিক উজ্জয়িনীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু উপাখ্যান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই এই ভ্রম অন্তর্হিত হয়। অন্যান্য ভারতীয় নাট্যরচনার ন্যায় এখানেও আমরা গতানুগতিকতার ও কল্পনালীলার পূর্ণ প্রতাপ দেখিতে পাই।

মৃচ্ছকটিকার আদর্শ-পাত্রগণ ও মৃচ্ছ-কটিকার বর্ণিত রীতি-নীতি, গল্প ও আখ্যা-য়িকাদি কাল্পনিক জগৎহইতে গৃহীত এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যের শাস্ত্র-নিয়মানুগত। ভারত যে স্বীয় শ্রেণী বিভাগের প্রতিভা ও পুঙ্খানু-পুঙ্খ রূপে লিখিবার ধৈর্য্য শুধু নাট্যসাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছে তাহা নহে, প্রত্যুত ললিত-কলা, সামান্য ব্যবসায়, এমন-কি অতি জঘন্য বৃত্তি সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলঙ্কারিক গ্রন্থ ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছে।

জয়াপীড়ের রাজত্বকালে (অষ্টম শতাব্দী) দামোদর গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত "কুট্টনী মাতার উপদেশ", ক্ষেমেন্দ্রের "কলাবিলাস" এবং ঐ গ্রন্থকারের "সময়মাত্রিকা"—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদির পদ্য-অনুকরণ মাত্র—এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে, এই সকল পারিভাষিক উপদেশের প্রকৃতিগত লক্ষণ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। দণ্ডীর দশকুমার চরিতে (সপ্তম শতাব্দী) কর্ণিসুত, বা কলাঙ্কুর বা মূলভদ্র, বা মূলদেব নামক এক পৌরাণিক তস্কর কর্ত্তৃক প্রণীত চৌর্য্যবৃত্তিবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কোন দরিদ্রজনের প্রতি একান্ত আসক্ত এক বারাঙ্গনার আখ্যায়িকা—ইহা প্রাচীন কাহিনী সমূহের অন্তর্গত একটি কাহিনী—যাহা বারংবার শুনিয়াও লোকে ক্লান্ত হয় না। বৃহৎকথায় বর্ণিত হইয়াছে, কেমন করিয়া, স্বীয় পরিণামদর্শিনী জননীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রূপিণিকা নামক এক ধনাঢ্যা বারাঙ্গনা লোহজঙ্ঘা নামক এক ব্রাহ্মণের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা সে নিষ্ফল প্রেমিককে বিদূরিত করিয়াছিল এবং পরে তাহার উপর কিরূপ প্রতিশোধ লইয়াছিল। অন্যত্র আর একটা বর্ণনা মৃচ্ছকটিকাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উজ্জয়িনীর রাজা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কুমুদিকা নাম্নী এক রূপবতী রমণী আসক্তা হয়। সেই রমণী সিংহাসনচ্যুত রাজা বিক্রমসিংহের সহিত মিত্রতা করে, এবং তাহারই অর্থ-

সাহায্যে তিনি স্বীয় সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন। সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন, এবং তাহার সহিত কুমুদিকার বিবাহ দিয়া দেন। দশকুমারচরিতে বর্ণিত রঙ্গ-মঞ্জরী নাম্নী এক বারাঙ্গনার কন্যা, এক সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকের সহিত বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু তাহার মাতা স্বীয় দুহিতার এই দুরাগ্রহে নিতান্ত ব্যথিত ও হতাশ হইয়া তাহাকে কর্ত্তব্য-পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজার নিকট আবেদন করে।

উক্ত আখ্যায়িকাদিতে রীতিনীতির যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কোন স্পষ্টতর ও স্ফুটতর চিত্র আমাদের এই আলোচ্য নাটকটিতে নাই। বৃহৎকথা ও দশকুমারচরিত জুয়ারীর গল্পে পরিপূর্ণ; পৌরাণিক যুগ হইতেই দ্যূতক্রীড়া ভারতে মারাত্মক ব্যাধিরূপে অবস্থিত। মহাভারতের নায়ক ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় স্বীয় পত্নী সাধ্বী দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন এবং ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীকে হারাইয়াছিলেন। যেখানে জ্বালাময় উদ্বেগ অশান্তি ও নিত্য বিবাদকলহ—দশকুমার-চরিতে এইরূপ একটা জুয়ার আড্ডার বর্ণন আছে; সোমদত্তের গৃহে, একজন জুয়ারী সর্ব্বস্বান্ত, নিজের ঋণ পরিশোধে একান্ত অসমর্থ, ও দ্যূত গৃহের সভিক-কর্ত্তৃক দারুণ প্রহারে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া পলায়ন করতঃ এক শূন্য শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়ঃ—ইহাই মৃচ্ছকটির দৃশ্য-সংস্থান (২ অঙ্ক); যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রবৎ বিবরণ, চৌর্য্যদৃশ্যে একটা জীবন্ত বাস্তবতার ভাব আনয়ন করিয়াছে উহা দণ্ডির আখ্যায়িকার বর্ণনার সহিত বর্ণেবর্ণে মিলিয়া যায় (দ্যূত-গৃহের বর্ণনার পরে)। এক প্রয়োগনিপুণ তস্কর কতকগুলি আবশ্যকীয় যন্ত্র যোগাড় করিল, যথা;—পরিমাপসূত্র ...দীপনির্ব্বাণের জন্য এক কোটা পূর্ণ পক্ষযুক্ত কীট...ইত্যাদি, তাহার পর দেয়ালে সিঁধ কাটিয়া ধনরত্ন অপহরণ করতঃ অলক্ষিত ভাবে পলায়ন করিল। দেয়ালে সিঁধকাটা চোরদিগের একটা প্রচলিত প্রকরণ। (দশকুমারচরিত ও পূর্ব্বপীঠ দ্রষ্টব্য)। আমাদের সমসাময়িক মেলোমাড্রামায় বর্ণিত বিচার ও প্রাণদণ্ডের দৃশ্যের সহিত যেরূপ বাস্তবতার কোন যোগ নাই, মৃচ্ছকটিকায় বর্ণিত বিচার ও প্রাণদণ্ডের দৃশ্যও তদ্রূপ। যে রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্র নাট্যকার্য্যের সহিত একসঙ্গে বিকাশ লাভ করিয়াছে, শূদ্রক উহার ভাবটি সমসাময়িক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু লোক-প্রচলিত কাহিনী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। Windisch বলেন, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত আর্য্যকের ইতিহাসের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। দৈব্যজ্ঞদিগের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে, গোপাল আর্য্যকা রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করায়, তৎকালীন রাজা তাহাকে কারাবদ্ধ করেন, কিন্তু পরিশেষে আর্য্যকই স্বীয় শত্রুর উপর জয়লাভ করিল। বাসুদেব-কংসের দ্বন্দ্ব-কাহিনীর সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই-রূপ ব্যাপার যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে কৃষ্ণ তাহার একটা বিশেষ প্রয়োগস্থল মাত্র।

M. Windisch যে সাদৃশ্য ঘটাইয়াছেন শূদ্রক ঐ অপূর্ব্ব সাদৃশ্যের কথা শুনিলে নিশ্চয়ই অবাক্ হইয়া যাইতেন। বসন্তসেনার সহিত যোগনিদ্রার, ও বাহন-বিনিময়ের সহিত শিশু-বিনিময়ের যে লেশমাত্র যোগ আছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে করিতে পারিতেন না। মোটকথা, মৃচ্ছকটিকা আর কিছুই নহে, একটা গল্পকে অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ভারতীয় রীতি অনুসারে উহার মধ্যে কতকগুলা ঘটনা ও পল্লবিত কথা ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। নাট্যকার্য্যের দশ বিভাগ-অনুরূপ দশ অঙ্ক সন্নিবেশ করিবার জন্য কবি প্রচলিত প্রকরণই অবলম্বন করিয়াছেন। উহার মধ্যে তিনি রাশি-রাশি গীতিকবিতা ও স্বভাব বর্ণনার শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম অংশটি দারিদ্র্য-দুঃখের বর্ণনায় পরিপূর্ণ; অনুসরণ দৃশ্যটিতে ভীতিবিহ্বলা বসন্তসেনার পলায়ন বর্ণিত হইয়াছে। শকার, বিট্ ও দাস একই ভাবের কথা বলিতেছে, কিন্তু উহাদের পরস্পর কথার ধরণের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, বিশেষরূপে তাহা হইতেই হাস্যরস নিঃসৃত হইয়াছে। চন্দ্রোদয়ের বর্ণনায় প্রথম অঙ্কটি শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শ্লোকগুলিতে দ্যূতের পরিণাম ফল এবং তাহার পর একটা পলাতক হস্তীর মত্ততা বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের শ্লোকগুলিতে গায়কের গুণ, অস্তমান্ চন্দ্রের শোভা ও পরে চৌর্য্যবিদ্যাসম্বন্ধীয় উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে নারীজাতি ও বারাঙ্গনা সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশপরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে; তাহার পর মৈত্রেয়ী, বসন্তসেনার প্রাসাদে যে অষ্ট অঙ্গন পার হইয়াছিল তাহার এক দীর্ঘ বর্ণনা আছে। নিশ্চয়ই এই স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী এক কবির রচনা শূদ্রকের স্মৃতিপথে পতিত হয়। কথাসরিৎ-সাগরের একস্থলে বারাঙ্গনা মদনমালার প্রাসাদের সপ্ত প্রাকার-বেষ্টনের বর্ণনা আছে। এই জাতীয় সাহিত্যে, ইহা বর্ণনার একটি সাধারণ বিষয় সন্দেহ নাই। পঞ্চম অঙ্ক, প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রেম-সংশ্লিষ্ট এক ঝটিকার বর্ণনায় পূর্ণ। চারুদত্ত, বসন্তসেনা ও বিট, পালা করিয়া পরপর এই অপূর্ব্ব বিষয়ের বর্ণনা করিতেছে। আর অধিক বিশ্লেষণ করা বাহুল্য। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কালিদাসের ন্যায়, ভবভূতির ন্যায়, শূদ্রক-কবিও মহাকাব্য-সুলভ বর্ণনা-প্রকরণ নাটকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য "ক্লাসিক" রচনায় যেরূপ সাহিত্যিক বিকাশ উপলব্ধি হয়, মৃচ্ছকটিকা হইতেও সাহিত্যিক বিকাশ সম্বন্ধে সেই একই প্রকার অবস্থা অনুমান করা যায়। মৃচ্ছকটিকার ভাষা কালিদাসের ভাষার সহিত তুলনা করিলে, কোনও প্রকার লক্ষণগত পার্থক্য ধরা পড়ে না।

ইহার ভাষা বিষদ ও সরল, উহাতে পাণ্ডিত্য ফলাইবার চেষ্টা নাই। রচনাগুলি প্রায় তিন চারি চরণের অধিক নহে; ভবভূতির নায় উহাতে অপরিমিত দীর্ঘতা নাই। কিন্তু রচনাকাল সম্বন্ধীয় তর্কে, এই ভাষাগত সরলতার বিশেষ কোন মূল্য নাই। এইরূপে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, এই দুই কবি, দুই বিভিন্ন সাহিত্য-সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কালিদাসের রচনার পাকা-

পোক্ত ও জমাট বাঁধুনীর সহিত তুলনা করিলে খুব একটা তফাৎ বুঝা যায়। নাট্য-শাস্ত্রের প্রচলিত নিয়মগুলিসম্বন্ধে শূদ্রক যেন নিতান্ত বালকবৎ অনভিজ্ঞ। মৃচ্ছকটিকায় প্রতি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোন নাট্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে কালের অবকাশ আবশ্যক, সে সকল অবকাশ নির্দ্দয়রূপে লঙ্ঘিত হইয়াছে।

এইরূপ দশম অঙ্কে বিচারপতি, বসন্ত-সেনাকে হাজির করিবার জন্য রক্ষীকে আদেশ করিলেন। রক্ষী বাহির হইয়া বসন্ত-সেনার সহিত কথা কহিল ও তখনি তাহাকে আদালতে আনিয়া হাজির করিল। ঐ একই প্রকারে সাক্ষী চারুদত্তকেও হাজির করা হইল। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে এই প্রণালীর প্রয়োগে কোন নিষেধ নাই—প্রত্যুত এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত কাহিনীতে, এই প্রণালীর আশ্রয় না লইলেও চলে না। এই নাটকে অনেকগুলি প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ আছে দেখিয়া অনেকে মনে করে, ইহা প্রাচীনত্বের একটা প্রমাণ:—১১ জন, সৌরসেনী ভাষায়, ২ জন, অবন্তিকা ভাষায়, একজন, প্রাচ্য-ভাষায়, এবং ৬ জন, মাগধী ভাষায় কথা কহিতেছে। শকার, চণ্ডালেরা, মাথুর ও তাহার সহচর কতকগুলি অপভ্রংশ ভাষার ব্যবহার করিতেছে—শাকারী-ভাষা, চাণ্ডালী-ভাষা ঢাক্কাভাষা। Cowell, weber ও de garrez এর গবেষণার ফলে, এই সকল প্রাকৃতের মধ্যে আধুনিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাকৃতের ব্যাকরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রাচীন ব্যাকরণ সেই বররুচির ব্যাকরণে চারিটি মাত্র প্রাকৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার পর আলঙ্কারিক ও কবিগণ অতিসূক্ষ্মতার প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, এবং মূল-প্রাকৃতগুলি বিবিধ বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত হইল। যে দেশের যে ভাষা তদনুসারে নাটকের ছাত্রগণ ভাষা ব্যবহার করিবে, এবং স্থলবিশেষে কোন বিশেষ দেশের ভাষা না হইলেও কোন কোন পাত্র সেই ভাষা ব্যবহার করিবে এই যে ভরত মুনির নিয়ম—এই নিয়ম অনুসারেই মৃচ্ছ-কটিকায় পাত্রগণের ভাষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্লাসিক যুগের কেবল একটিমাত্র নাটকে নিকৃষ্ট জাতীয় পাত্রগণের অবতারণা দেখিতে পাই; শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে, কালিদাস একজন ধীবর, দুইজন নগর-রক্ষী ও রাজার এক শ্যালককে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিয়া-ছেন। এবং নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাহাদিগকে বিশেষ-বিশেষ প্রাকৃত ভাষায় কথা কহাইয়াছেন। "দশ-রূপ" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে যার নাম মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই "তরঙ্গদত্ত" নামক প্রকরণের ন্যায় যদি আরও দুই একখানি প্রকরণ আমরা পাঠ করিতে পাইতাম তাহা হইলে মৃচ্ছকটিকার ন্যায় তাহাতেও হয়ত আমরা বিচিত্র প্রকারের প্রাকৃত দেখিতে পাইতাম। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শকার ও বিট সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। অন্যান্য বিদ্যমান নাটকের সহিত যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মৃচ্ছকটিকার উক্ত দুই ভূমিকার চরিত্র প্রচলিত নিয়মানুসারে অসঙ্গত, ও ব্যতিক্রম-স্থল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এইরূপ তুলনার প্রণালীটি ঠিক্ নহে। রাসীনের ট্রাজেডির

সহিত মোলিয়েরের কমেডির যেরূপ প্রভেদ, —নাটকের সহিত ও মালতীমাধবের ন্যায় শুদ্ধ জাতীয় প্রকরণের সহিত মৃচ্ছকটিকারও সেইরূপ প্রভেদ! Muscarell-এর চরিত্র রাসীনেয় নাটকে বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বলিয়া রাসিনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যদি মোলিয়েরকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে এই সমালোচনার প্রণালী অত্যন্ত হাস্যজনক ও অসঙ্গত হইবে সন্দেহ নাই। আর এই যুক্তি অনুসারেই শূদ্রকের অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে।

মৃচ্ছকটিকায় বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে সিদ্ধান্ত বাহির করা হইয়া থাকে, তাহাও তত নিশ্চয়াত্মক নহে। নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত নিয়মানুসারেই নাট্যসাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবতারণা হইয়া থাকে। যেরূপ আখ্যায়িকাদিতে, সেইরূপ নাট্যসাহিত্যেও বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা বা কুট্টনীর ভূমিকা নিয়োজিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, অষ্টাব্দী শতাব্দের আরম্ভে, ভবভূতিও এই প্রচলিত নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন। তাছাড়া, যখন শ্রীহর্ষ নাগানন্দ রচনা করেন, তখন হুয়েংসাং ভারতের বৌদ্ধতীর্থ সমূহে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; সেই সপ্ত শতাব্দীর মধ্য ভাগেও শাক্য-মুনির ধর্ম্মের বেশ উন্নত অবস্থা।

মোট কথা মৃচ্ছকটিকাকে কালিদাসের পূর্ব্বে স্থাপন করিবার পক্ষে কোন বলবৎ হেতু নাই, বরং উহাকে কালিদাসের পরবর্ত্তী কালে স্থাপন করিবার পক্ষে কতকগুলি হেতু আছে ঃ—যথা;—কালিদাসের নীরবতা, বাণের নীরবতা; এবং এই নাটকের রচনা, রাজা শূদ্রকের প্রতি আরোপ করা। এরূপ বিশ্বাস করিতেও একটু প্রলোভন হয় যে, এই নাটকের প্রকৃত রচয়িতা বিক্রমাদিত্যের গৌরবান্বিত যুগের পরে জীবিত ছিলেন, কিন্তু একটা উচ্চতর খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রদান করিবার জন্য, একটা প্রাচীনত্বের মহিমাচ্ছটায় ভূষিত করিবার জন্য, গ্রন্থকার শূদ্রকের নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছেন। প্রাচীন কিম্বদন্তী শূদ্রককে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

জাল-শূদ্রকের প্রকৃত আবির্ভাব-কাল যাহাই হউক না কেন, ভারতের নাট্যকবিদিগের মধ্যে কালিদাসের সহিত তিনি সমান আসন পাইয়াছেন। শকুন্তলার গ্রন্থকারের রচনায় যেমন অতিসূক্ষ্ম ও সুকুমার একটি কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, পরিপক্ক বিদ্যা ও অব্যর্থ বাক্-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ সৃষ্টিশক্তি ও জীবন-চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, মৃচ্ছকটিকায় যে ১৭টি পাত্র নাট্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই চরিত্রে একটা প্রবল বিশিষ্টতা আছে। চারুদত্তের ন্যায় একটি সুন্দর চরিত্র-কুসুম ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রিত প্রভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি জগতের নশ্বরতা ও পার্থিব পদার্থের শূন্যতা এতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে মৃত্যু কালে বিনা পরিতাপে সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অথচ তাঁহার হৃদয় স্নেহ মমতা ও মধুর রসের প্রতি কম উন্মুক্ত ছিল না। পাছে তাঁহার বন্ধু মৈত্রেয়ের কোন

অনিষ্ট হয়, তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এই ভয়ে তিনি শঙ্কিত। তিনি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং মর্ম্মস্পর্শী স্নেহভরে তাঁহার শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ভারতীয় নাট্য সমূহের নায়কের প্রেমে সচরাচর যেরূপ দেখা যায় সেরূপ তাঁহার প্রেমে রূপজ লালসানল দৃষ্ট হয় না। তিনি বসন্তসেনার হৃৎ-স্পন্দন নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বারাঙ্গনাকে তাঁহার হৃদয় উৎসর্গ করিবার যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আসক্তি মৈত্রীয় দ্বারা বিশোধিত, প্রেমের দ্বারা পবিত্রীকৃত। তাঁহার প্রেমানল যতই জ্বলন্ত হউক না কেন, তাঁহার আত্মসম্ভ্রমবোধ তদপেক্ষা আরও প্রবল। বসন্তসেনার সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে অভিযোগের কথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সেই অভিযোগে অভিমুক্ত হইয়াও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। দারিদ্র্যই তাঁহার অপরাধ ঃ—তিনি তাহা জানেন, বহুদিন হইতেই তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন, এবং জানিয়া-শুনিয়াই তিনি অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার পুত্রটি যে তাঁহার কলঙ্কিত নামের উত্তরাধিকারী হইবে, শুধু ইহার জন্যই তাঁহার কষ্ট। এবং যখন স্থাবরক দণ্ডিত ব্যক্তির নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করিয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল, তখন চারুদত্ত মৃত্যুকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বসন্তসেনাও সাধারণ রকমের প্রণয়িণী ছিলেন না। বহুকাল ধরিয়া তিনি তাঁহার তনু মন প্রাণ বিক্রয় করিয়াছেন, এবং তাহারই জন্য তিনি কষ্ট সহ্য করিতেছেন। কেবল চারুদত্ত ও তাঁহার পত্নীই বসন্তসেনার উচ্চতর হৃদয়ের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন। অন্যদের বিশ্বাস, বসন্তসেনা শুধু ইন্দ্রিয়লালসার আবেগে এই প্রণয়-আবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই জন্য তাহারা বসন্তসেনাকে উপহাস করিতে, অবমাননা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই; এমন কি, বিচারপতিও, ইহা অকপট প্রেম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, এবং চারুদত্তের অকলঙ্ক খ্যাতি সত্ত্বেও, শুধু অনুমানের হেতুবাদে, তিনি রায় প্রকাশ করিলেন, যে চারুদত্ত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই বসন্তসেনাকে গুপ্তহত্যা করিয়াছে। শকারের চরিত্রেও একটা বেশ মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা আছে ঃ—শকার একটা নিছক পশু; বিটের ন্যায় বিদগ্ধদিগের সংসর্গে তাহার প্রকৃতিগত পাশবত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শকার রাজার শ্যালক, শকার ধনশালী, শকার একজন গণ্যমান্য লোক, অতএব বসন্তসেনার প্রেমের উপর, বসন্তসেনার উপর তাহার অবিসম্বাদী অধিকার আছে, এইরূপ তাহার ধারণা; এবং বসন্তসেনা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায়, তাহার নিজের অবমাননা যত না হউক, তাহার অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া তাহার এত ক্রোধ। শকার যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভীরু, যেমন বাক্যবীর, তেমনি কাপুরুষ; যেমন অজ্ঞ, তেমনি পণ্ডিতাভিমানী; মিথ্যা কথা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারেই

তাহার বুদ্ধি বেশ খুলিয়া থাকে। বিটের চরিত্রে একটু মানসিকতার লক্ষণ আছে; এমন কি আমরা বলি, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে উহা একমাত্র সুরসিক পাত্র; ইহার কথার একটা সূক্ষ্ম ভাব আছে, সৌকুমার্য্য আছে, উচ্চ শিক্ষিত লোকের মত একটা স্বাধীন ভঙ্গী আছে। সর্ব্বত্রই ইহাঁর স্বাগত আহ্বান, সর্ব্বত্রই ইহাঁর সমাদর, এবং সকলেই ইহাঁর সংসর্গের অভিলাষী। তাছাড়া, ইহাঁর মহৎ অন্তঃকরণ। একবার তিনি শকারের কবল হইতে বসন্তসেনাকে উদ্ধার করেন, আর একবার উদ্যানে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন এবং সংস্থাপকের দারুণ কঠোর ব্যবহারে বিতৃষ্ণা জন্মায়, তিনি তাঁহার সেই নিষ্ঠুর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া, আর্য্যকের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চারুদত্তের প্রতি মৈত্রেয়ীর অটল ভক্তি থাকায়, তাহার স্বাভাবিক চিত্তদীনতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির কতকটা প্রাশশ্চিত্ত হইয়াছে! যখন ভাল ভাল উপাদেয় সুখাদ্য সকল আহার করিতে পাইত সে সুখের কাল গত হইয়াছে বলিয়া সে আক্ষেপ করে কিন্তু তথাচ প্রভুর প্রতি, প্রভুর পরিবারের প্রতি, সে সমানভাবে অনুরক্ত। বদ্‌মেজাজ সত্ত্বেও মৈত্রেয়ী মৃত্যুর দ্বারা পর্য্যন্ত চরুদত্তকে অনুসরণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং তাহার বন্ধুর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে সম্মত হইয়াছে। আরো ছোটখাটো পাত্র অনেক আছে; তাহাদের চরিত্রও বেশ সুগঠিত ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু আমরা তাহাদের লক্ষণ নির্ণয়ে বিরত হইলাম। শর্ব্বিলক জাতিতে ব্রাহ্মণ ও চৌর্য্যবৃত্তিতে অনুরাগ-বশতঃ তস্কর। সে তাহার এই নূতন ব্যবসায়ে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়-সুলভ চাতুর্য্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেকার সম্বাহন-ব্যবসায়ী সম্বাহক, প্রথমে জুয়া খেলায় জুয়াচুরী করিতে চেষ্টা করে, পরে নিজের দেনাশোধ না করিয়া পলায়ন করে। তাহার পর, বসন্তসেনার বদান্যতা ও ঔদার্য্যে এরূপ মুগ্ধ হয়, যে, হঠাৎ স্বীয় অতীত জীবনের কদর্য্যতা উপলব্ধি করিয়া, বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ ধারণ করে। মাথুর, জুয়ার আড্ডার 'সভিক', জুয়ারী-সুলভ ফিকির ফন্দিতে সুদক্ষ; কোন প্রকার রসিকতা বা অনুনয় তাহার হৃদয়কে আর্দ্র করিতে পারে না ইত্যাদি···মৃচ্ছকটিকা পাঠ করিতে করিতে, মোলিয়ের ও সেক্‌সপিয়ারের নাম স্বভাবতই মনোমধ্যে উদয় হয়, এবং শূদ্রকের প্রশংসার পক্ষে এই নৈকট্য ও সাদৃশ্যের উপলব্ধিই যথেষ্ট—ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কি-হইতে পারে।

মৃচ্ছকটিকা, অনধিকার-হস্তক্ষেপণের হাত এড়াইতে পারে নাই। যার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা নাই, সেই নীলকণ্ঠ নামক এক ব্যক্তি শূদ্রকের দোষ ত্রুটি সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রামাণ্য সংস্করণটিতে—দশম অঙ্কের শেষভাগে সমস্ত পাত্রগণ একত্র সমবেত হয় নাই। চারুদত্তের স্ত্রী, তাঁহার পুত্র, তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু মৈত্রেয় নাটকের উপসংহার-স্থলে প্রবেশ করে নাই। নীলকণ্ঠের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, গ্রন্থকার সূর্য্যের উদয়কে ভয় করিতেন। ইহার যে হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা বড়ই অস্পষ্ট; Wilson ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "সূর্য্যোদয়কে ভয় করা" – ইহা একটা স্থানীয় প্রবাদ-বাক্য মাত্র:—

ইহার গূঢ় অর্থ—রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইবার ভয়; কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ করিলে যে অর্থ হয়, সে অর্থেও এই বাক্যটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং সে অর্থটি আরও একটু স্পষ্ট হয়।

নাট্যাভিনয় সূর্য্যোদয়েই আরম্ভ হইত; এই অভিনয় যদি বেশীক্ষণ ধরিয়া চলিত তাহা হইলে, বেলা অধিক হওয়ায় প্রখম সূর্য্যোত্তাপে দর্শকের ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা ও আশঙ্কা ছিল। সুতরাং মৃচ্ছকটিকার গ্রন্থকার, অভিনয়সংক্ষেপ করিবার জন্য, শেষ দৃশ্যগুলিকে একটু সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ এই সমস্ত দৃশ্যে কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক কিছুই পূর্ব্বে চিন্তা করেন নাই, প্রত্যুত গ্রন্থকারের উপর কলম চালাইয়া একটা নূতন দৃশ্য সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। চারুদত্তের স্ত্রী ও পুত্র চারু-দত্তকে বধ্যস্থানে যাত্রা করিতে দেখিয়াছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিল;—তাহারা তাঁহার সহিত পরলোকে মিলিত হইবার আশায় তাঁহার সহিত একত্র চিতারোহণ করিতে ব্যগ্র হইল। বধ্যস্থানে যে জনতা উপস্থিত ছিল, তাহাদের চীৎকার শুনিয়া চারুদত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারুদত্ত ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন, তাঁহার অগেমনে এই তিন ভীষণ আত্মহত্যা নিবারিত হইল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সুখী হইল। এই প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনা বেশ নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সুরুচিসমন্বিত ব্যক্তির ন্যায় নীলকণ্ঠ, শূদ্রকের রচনাভঙ্গী ও প্রকরণের নকল করিয়াছেন; কিন্তু শূদ্রক অবশ্য এই নব যোজনাকার্য্যে কখনই সম্মতি দিতেন না। যে মুহূর্ত্তে বারাঙ্গনা শুদ্ধ চরিত্রের পুণ্য মহিমায় বিভূষিত হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গ্রন্থকার, সুকুমার সংকোচ-বোধের প্রেরণায় ধর্ম্মপত্নীকে বারাঙ্গনা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিলেন। যাহা হউক, এই প্রক্ষিপ্ত রচনার ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলজনক। একজন ওস্তাদের রচনা সুরুচির হাতে সংশোধিত হইয়া রচনার মূল্য কিছুমাত্র কমে নাই; বরঞ্চ নীলকণ্ঠের ধৃষ্টতা মৃচ্ছকটিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বম্বে হইতে পত্রাভ্যন্তরে আগত বনফুলের প্রতি

পত্রপুটে এলে কোথা বনবাসী ফুল?
অঙ্গরাগ হেরি তব সমুদ্রের নীল,
তোমার পরশে আছে মলয় অনিল,—
এ তো নহে কুঙ্কনের সাগরের কূল!
হিমের আলয়ে হেথা বড় অপ্রতুল
সুখস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল।
সুকুমার কুসুমের কি আছে দলিল
এত ঊর্দ্ধে উঠিবার, না হলে বাতুল?

এ দেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা,
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্ব্বতের শৃঙ্গ,
উজ্জ্বল কিরীটে যার হীরক তুষার।
ক্ষীণ প্রাণে ধরি কোন প্রস্ফুটিত আশা,
এসেছ এ পরদেশে, যেথা নাই ভৃঙ্গ?—
বরফের বুকে নাহি তোমার সুসার!

হিমালয়। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

স্রোতের ফুল

(২)

গিন্নিরাণী অন্দরের পুকুর-ঘাটের মার্ব্বেল-বাঁধানো চাতালে একখানি অতি মিহি কাঠির বিচিত্র বুননের মছলন্দের মাদুর পাতিয়া বসিয়া তেল মাখিতেছিলেন। দুজন ঝি কাপড়ের উপর কোমরে গামোছা জড়াইয়া রাণীর স্থূল দেহে ডলিয়া ডলিয়া তেল মাখাইতেছিল।

গিন্নির আকার দীর্ঘপ্রস্থে প্রায় সমান; গায়ের বর্ণ মেটে, অত্যধিক মার্জ্জন ও প্রসাধনের সাহায্যে জ্যোৎস্নারাতের মেঘের মতন; কষিয়া খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে সীঁথি এক আঙুল চওড়া হইয়া গিয়াছে, কপাল দরাজ হইয়া উঠিয়াছে; চুল উঠিয়া গিয়া কপাল প্রশস্ত হইয়া পড়াতে মনে হয় চোখ নাক যেন যথাস্থানের অনেক নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং উল্কির তিলক যেন বঁড়শীতে নাকটিকে গাঁথিয়া ললাটসমুদ্রে তলাইয়া যাওয়া হইতে কোনো মতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। গিন্নির গলায় খুব মোটা হেঁসোহার; মণিবন্ধে মোটা হাঙরমুখো স্ক্রু-পাকের বালা ও বেঁকি চুড়ি; বাহুতে হাঁসুলির মতো প্রকাণ্ড অনন্ত; পায়ে একগাছা করিয়া মোটা বাঁকমল; নাকে সুদর্শন চক্রের মতো মস্ত নথ, মুক্তার ডোর দিয়া ছোট্ট খোঁপাটার সঙ্গে টানিয়া বাঁধা; কানে মাকড়ির সারি; কাঁকালে চার-আঙুল চৌড়া চন্দ্রহার। গিন্নির বয়স তেমন বেশী নয়, চল্লিশের কাছাকাছি। তাঁহার গর্ভজাত সন্তান তিনটি——দুটি পুত্র, পুলিনবিহারী ও বিনোদবিহারী, এবং একটি কন্যা বিনোদিনী। পুলিন আজন্ম রুগ্ন ছিল; সে যে বারো বৎসর বাঁচিয়াছিল একদিনের জন্যও রোগ-যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে নাই; তাই তাহার মায়ের মনে একটি গভীর বেদনার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বিনোদের বয়স এখন বছর আট, আর বিনোদিনীর বয়স বছর তিন। কিন্তু নিজের গর্ভজ সন্তান ছোট থাকিলে কি হয়, মৃত বড় রাণীর পুত্র বিপিন এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে; বিপিনকে আঁতুড়েই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যখন তাহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন ছোটরাণীর বয়স অল্প, তখনও তিনি নিঃসন্তান; তবু তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া মাতৃহীন সপত্নীপুত্রের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে যদিও তখন মনে করিয়াছিল যে ইহা সতীনের ছেলেকে বাঁচিতে না দিবার ফন্দি, ডাইনের মায়া, কিন্তু বাস্তবিক বিপিনই প্রথমে তাঁহার প্রাণে মাতৃস্নেহের অমৃত-উৎসের সহস্র বিচিত্র ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; বিপিন তাঁহার প্রথম-লব্ধ স্নেহের ধন, তাঁহারই কোলে সে মানুষ হইয়া এখন অতবড়টি ডাগর হইয়াছে, এখন বরণ করিয়া বৌ ঘরে তুলিলেই হয়। তাঁহার বড় সাধ ছিল যে বিপিনের অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়া কিশোর কিশোরীর প্রণয়-লীলা দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবেন; কিন্তু বিপিন এক-রোখা ছেলে, সে পাঠ সমাপ্ত না করিয়া কিছুতেই বিবাহ করিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে। এই অঘ্রাণ মাসে বিপিন এম-এ এগজামিন দিবে; মাঘ মাসে না হয় ত ফাল্গুন মাসে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। বৌ ঘরে আসিলে ত অধিক সাজসজ্জা করা ভাল দেখাইবে না, তাই গিন্নিরাণী বিবিধ প্রকারের গহনা ও কাপড় সদাসর্ব্বদা পরিয়া থাকিয়া জন্মের সাধ মিটাইয়া লইতেছিলেন।

বামা দাসী হাতে তেল ডলিতে ডলিতে বলিতেছিল—রাণীমা, তাগাটা হাতে বড় কসে গেছে, এটাকে ভেঙে একটু ফাঁদালো করে' গড়তে দিয়ো।

অপর দাসী হাবার মা অমনি বলিয়া উঠিল—আ মর, তোর যেমন কথা! রাণীমার শরীর ত দিনকের দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ফাঁদে বড় হলে যে হাতে ঢনঢন করবে! এই ত...এই এতখানি ঢল!...তা মা, তোমাদের গায়ে কি পুরোণো গয়না মানায়? নিত্যি নতুন নতুন গড়াবে বৈ কি? কিন্তু ভেঙে গড়াতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমরা গরিবগুরবো মানুষ, একখানা গহনা কষ্টে সৃষ্টে গড়াই, রোগা হয়ে ঢনঢন করলেও পরতে হয়, মোটা হয়ে এঁটে বসলেও পরতে হয়। তোমরা হলে রাজারাজড়া, পুরোণো গয়না কাপড় পেরসাদী করে চাকরদাসীকে হাত তুলে দিলে তারা বর্ত্তে যাবে আর তোমাদেরও নাম হবে।

গিন্নি ছোট বৌয়ের চিঠির সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন। তিনি গিন্নি মানুষ, কৌতূহল তাঁহার সাজে না, তাই তিনি কোনো ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিলেন যে এইবার রোহিণী আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ শুনাইবে। দাসীরা যখন তাঁহার মোটা তাগা দুগাছার উপর নজর দিয়া তাঁহাকে দান করিয়া নাম কিনিতে পরামর্শ দিতেছিল তখন তাঁহার মন দাসীদের কথার দিকে ছিল না। গিন্নি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—এসব গয়না আমি আর কদিনই বা পরব? বিপিনের বৌ এলে তাকেই ভেঙে গড়িয়ে দেবো।

দাসীরা অমনি সেই সূত্র ধরিয়া উল্লাস করিয়া বলিল—হ্যাঁ রাণীমা, দাদাবাবুর কবে বিয়ে? আমরা কিন্তু খুব ভালো রকম বকশিশ নেবো, তা বলে রাখছি। গরদের কাপড়, সোনার কণ্ঠী আর তাগা দিতে হবে বাপু।

গিন্নি বলিলেন—আমরা ত মনে করেছি, এই মাঘ ফাগুনে বিপিনের বিয়ে দেবো। দেখি সে বাড়ী এসে কি বলে। যুগ্যি ছেলের মত না নিয়ে ত আর কিছু করা চলে না।

হাবার মা বলিল—তাই ত মা, দাদাবাবুর কেমন এক ধারা, বিয়ে করতে চায় না কেন বল দেখি। কলকেতায় থেকে স্বভাব চরিত্তির বিগড়ে গেল নাকি?

রাণী বলিলেন—না না, বিপিন আমার সোনারচাঁদ ছেলে, ওর শরীরে এতটুকু দোষ নেই। লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছে, তাই বিয়ের দিকে মন যায় না। এইবার পড়া শেষ হবে; এখন বিয়ে করবে বৈ কি।

অমনি রাণীর কথার সূত্র ধরিয়া বামা বলিয়া উঠিল—দাদাবাবুর সাধু চরিত্তির তা আর একবার করে বলতে? কিন্তু বাপু রাতদিন শুধু পড়া আর পড়া, এ কি রকম বাই! তোমার কি বাপু চাকরী করে খেতে হবে, না দাদাঠাকুরের মতন টোল খুলতে হবে?

ঐ ছোট তরফের মেজবাবু ত আমাদের দাদা-বাবুদেরই বয়সী; এর মধ্যে তিন তিনটে বিয়ে করেছে। তার ওপর আবার রঘুনাথ দেওয়ানের বিধবা ভাজ কালীতারাকেও ত বাড়ীতে এনে রেখেছে। হ্যাঁ মা শুনছি কি না যে তাকেও না কি বিয়ে করবে! ওমা বিধবার আবার না কি বিয়ে হয়! তা বড়লোকে ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে! একেই ত বলে জমিদারী চাল! আর আমাদের দাদাবাবুর, কথা নেই বার্ত্তা নেই কারুর সঙ্গে, রাতদিন মুখে বইয়ে লেগে রয়েছে। রাত্তির দিন যদি কাগজই ঘাঁটলে ত মুহুরী গোমস্তায় আর জমিদারে তফাৎটা রইল কোথায়?

হাবার মা বলিল—আমাদের দাদাবাবুর চাল ত দাদাঠাকুর হতেই বেগড়াল; সে উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে! আমি শুনেছি নিজের স্বকর্ণে, দাদাবাবুকে সলা দেওয়া হয়—ছেলে মেয়ের অপ্‌প বয়সে বিয়ে দিতে নেই, বিধবার বিয়ে দিতে হয়, আমোদ আহ্লাদ করা খারাপ!..... শুনেছ একবার কথা! রাজার বেটাকে ফকিরীর পরামর্শ!.....মা, তুমি দাদাবাবুকে দাদা-ঠাকুরের সঙ্গে আর বেশী মিশতে দিয়ো না।

রাণী বলিলেন—বিপিন ত মানা শুনবে না, ও যে নবকিশোরকে একেবারে ভাইয়ের মতন দেখে। জ্ঞানবুদ্ধি হলে আপনিই সামলে যাবে, বাঘের বাচ্চা বাঘই হবে।

বন্ধুবিচ্ছেদের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া হাবার মা ক্ষুণ্ণ মনে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ রাণীমা, দাদাবাবুরা কবে আসবে?

গিন্নিরাণী মাতৃগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এইবার বিপিনের শেষ এগজামিন; অঘ্রাণ মাসে এগজামিন দিয়ে বাড়ী আসবে।

হাবার মা বলিল—ওমা! তবে কি এবার পূজোর সময় দাদাবাবু বাড়ী আসবে না? .....তবে দাদাঠাকুর এখন আসবে কেমন করে?

গিন্নি বলিলেন—না, নবকিশোর বিপিনের সঙ্গেই আসবে; এখন আসবে না।

হাবার মা বলিল—না, আসবে। ভটচায্যি মশায় বলছিলেন। আমি তেল নিয়ে আসতে আসতে শুনে এ াম।

গিন্নি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলছিলেন ভটাচায্যি মশায়?

হাবার মা বলিল—ছোট খুড়িমার বোনঝি এখানে আসবে কিনা! ছোট খুড়িমা ভাবছিল যে কে তাকে নিয়ে আসবে, তাই ভটচায্যি মশায় বল্লেন যে তার আর ভাবনা কি, নব-কিশোর নিয়ে আসবে 'খন।

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ছোট বৌএর বোনঝি? সে এখানে আসবে বুঝি?

হাবার মা এতবড় একটা নূতন খবর গিন্নিকে প্রথমে শুনাইবার সুযোগ পাইয়া আনন্দে ও গৌরবে স্ফীত হইয়া বলিল—ওমা! সবাই শুনেছে আর যার পর নাই তুমি কাণ্ডখানা শোননি বুঝি রাণীমা? খুড়িমার বোন যে মারা গেছে! বিধবা বোনঝি তাই এখানে আসবে বলে মাসিকে চিঠি দিয়েছে। এ খবর সবাইকে জানালে আর যার বাড়ীতে থাকবে তাকেই না জানিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলা হল! ওমা, খুড়িমার ত ভ্যালা আক্কেল যা হোক!

দাসীর এই ইঙ্গিতে গিন্নির মন ভারী হইয়া উঠিল, তিনি মনে করিলেন ছোট বৌ তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নিজের বোনঝিকে নিজের কাছে আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গিন্নিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হাবার মা বলিতে লাগিল—রোহিণী যথার্থই বলছিল—আপনি শুতে ঠাঁই পান না, আবার শঙ্করাকে ডাকেন। রোহিণী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে মরে, ওর ঐ যা এক দোষ; নইলে যা বল তা বল বাপু, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে; এক-একটা কথা বলে ভাল!

গিন্নি লোকটি বড় সরল; কেবল, তিনি যে একজন মস্ত লোক, এই জমিদার সংসারের গিন্নি, এই অহঙ্কার তাঁহাকে অতিমাত্র প্রভুত্বপ্রিয় ও তোষামোদলিপ্সু করিয়া তুলিয়াছে। তিনি রাণী বলিয়া বাড়ীর পরিজনদের সহিত মিশিতে পারিতেন না, বাহিরের পাড়াপ্রতিবাসিনীদের মধ্যেও তাঁহার সমকক্ষ সঙ্গিনী হইবার মতন কেহ ছিল না; ইহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই দাসীদের লইয়াই দিন কাটাইতে হইত; ছোট লোকের সংসর্গে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনটি ভালোয় মন্দে জড়াইয়া জটিল হইয়া গিয়াছিল। কোনো একটা বড় বিষয়ে তিনি যে কেন উদার এবং এক-একটা সামান্য ছোট ব্যাপারে কেন যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাহা বুঝা যাইত না! তাঁহার সংসারে সম্পর্কীয়া ও নিঃসম্পর্কীয়া আশ্রিতার সংখ্যা ছিল না, কেহ আসিয়া আশ্রয় চাহিলেই সে পরিবারভুক্ত হইয়া রাজার হালে থাকিতে পাইত; কিন্তু খুড়িমার মুখে আবেদন শুনিবার পূর্ব্বেই দাসীর মুখে খুড়িমার নিরাশ্রয়া বোনঝির আগমন-সংবাদটা বিরূপ ভাবে শুনিয়া তাঁহার মন বাঁকিয়া বসিল। অধিকন্তু খুড়িমা যে এককালে তাঁহারই সমকক্ষ শরিক ছিলেন, এ কথা রাণী কিছুতেই ভুলিতে পারিতেন না; তিনি তাই পদে পদে খুড়িমার অহঙ্কারের পরিচয় পাইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার কোনো আচরণই সহজভাবে লইতে পারিতেন না; অপর আশ্রিতাদিগের যে ত্রুটি তিনি লক্ষ্যও করিতেন না, খুড়িমার পক্ষে সেই ত্রুটি কল্পনা করিয়াই তিনি মনকে বিরূপ করিয়া তুলিতেন।

সজলনেত্রা খুড়িমা যখন মালতীর চিঠি হাতে করিয়া সেই পুকুরঘাটে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন রাণীগিন্নি মুখ ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন, দাসীরা একমনে তেল মাখাইতেছে। খুড়িমার সঙ্গ সঙ্গে গর্ব্বিতা রোহিণী ও রঙ্গদর্শিকা পুরাঙ্গনা-গণ ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিও অবুঝ ঔৎসুক্যে খেলা ভুলিয়া এই জনতার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়াইয়া ফিরিতেছিল; তাহারা গিন্নির মুখের ভাব দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; এবং ছোট বৌএর বোনঝির ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে এমন একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া গিন্নির মুখ অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ব্যাপার বুঝিতে খুড়িমার বিলম্ব হইল না। ভিক্ষুকের দৈন্য ও লজ্জা তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না,—কিন্তু চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল বিস্তর। আজ তাঁহার শোকের চেয়ে তাঁহার ভিক্ষার কথাটাই যে লোকের কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে এই

লজ্জায় তাঁহার মর্ম্মবেদনা অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল; আর সেই সঙ্গে মনে হইতেছিল, এমন দিন তাঁহার চিরকাল ছিল না; তিনি গিন্নিরই একজন সমকক্ষ ছিলেন, তাঁহারও এমনই ঐশ্বর্য্য বিলাস দাসদাসী সব ছিল; তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া কত চাটুবাণী অহরহ তাঁহারও কর্ণে ধ্বনিত হইত। তারপর সে কী দুর্দ্দিন যেদিন তিনি অকস্মাৎ বিধবা হইয়া অসহায় হইলেন এবং হরিবিহারী বাবুর চক্রান্তে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারই সংসারে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরিবিহারী বাবু ও তাঁহার গিন্নি ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একেবারে পথে বসাইতেই চাহিয়াছিলেন, কেবল বিপিনের জেদে তাহা হইতে পায় নাই! বিপিনের ভক্তিযত্নে তিনি পরাধীনতার সকল গ্লানি একরূপ ভুলিয়া ছিলেন; কিন্তু আজ আবার যে রাক্ষসী মেয়েটার জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ভিক্ষার গ্লানি স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহার দিক হইতে খুড়িমার মন কাজেকাজেই বিমুখ হইয়া পড়িতেছিল। তিনি দীনতার লজ্জার দ্বিধায় পড়িয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না তখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? ভিক্ষা চাহিতেও মাথা কাটা যাইতেছিল, ভিক্ষা চাহিতে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়াও অশোভন অহঙ্কার বলিয়া মনে হইতেছিল।

খুড়িমাকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া রোহিণী আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—কি হল গো খুড়িমা, রাণীমাকে বল না গো, চুপটি করে কাঁদলে রাণীমা জানবে কেমন করে?... রাণীমা খুড়িমা বল্‌তে এসেছে...

খুড়িমার অপেক্ষা না করিয়া রোহিণী নিজেই খুড়িমার আবেদন গিন্নিকে জানাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া খুড়িমা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; রোহিণী কথাটাকে কেমনভাবে উপস্থিত করিবে তাহার ঠিক নাই, তাহার চেয়ে নিজের কথা নিজেই বলা ভালো মনে করিয়া খুড়িমা তাড়াতাড়ি রোহিণীর কথার উপসংহার করিয়া বলিলেন—দিদি, আমার দিদি মারা গেছে।

গিন্নি অপ্রসন্ন মুখে বসিয়া রহিলেন, সান্ত্বনার একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না।

হাবার মা বলিয়া উঠিল—তা রাণীমা সব কথা আগেই শুনেছে; তোমার বোনঝির আসবের কথাও শুনতে বাকি নেই।

খুড়িমা বুঝিলেন তাঁহার ভিক্ষার খবর তাঁহার বলিবার আগেই গিন্নির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সেইজন্যই গিন্নি অমন বজ্রগম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়া আছেন। গিন্নির এই নিষ্ঠুর নীরবতা ও দাসীদের ধৃষ্টতার মধ্যে বোনঝির আশ্রয়-প্রার্থনার কথা আর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিল না। খুড়িমা তীব্র দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

খুড়িমাকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গিন্নি একটু ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিলেন—ওসব কিছু পিত্যেশ কোরো না ছোট বৌ। তোমার বোনঝির এখানে আসা সুবিধে হবে না।

খুড়িমা বলিলেন—আমায় ঠাঁই দিয়েছ দিদি; আমার নিতান্ত আপনার জন সে, তাকেও একটু ঠাঁই দাও।

গিন্নি মুখ বক্র করিয়া বলিলেন—তোমায় ঠাঁই দিয়েছি বলে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমার বাড়ী সরাই, না হোটেল, যে, যে আসবে তাকেই ঠাঁই দিতে হবে?

খুড়িমা মিনতির স্বরে বলিলেন—কত লোক ত তোমার আশ্রয়ে রয়েচে, আর একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া তোমার পক্ষে এমনই কি ভার দিদি?

গিন্নি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—লোকের হিংসেতেই তুমি গেলে। কেন লোকের করব না, তাদের কল্লে দেশ বিদেশে আমার নাম হবে। আর তোমাদের কিছু করা সে ত ভস্মে ঘি ঢালা।

খুড়িমাকে কিছু সাহায্য করা যে দয়া করা নয়, খুড়িমার ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা, এই বোধ গিন্নির মনে স্পষ্ট হইয়া থাকিয়া তাঁহাকে পীড়া দিত, তাঁহার প্রভুত্বকে সঙ্কুচিত করিত। এইজন্য তিনি খুড়িমাকে দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন না। খুড়িমার স্বভাব সহজে হীনতা স্বীকার করিতে পারিত না, মিথ্যা খোসামোদের কথা সব সময় তাঁহার মুখে জোগাইত না। গিন্নির কথা শুনিয়া খুড়িমার বাক্যস্রোত আবার বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রোহিণী বলিয়া উঠিল—তা খুড়িমা, তোমার বোনঝি ত কম মেয়ে নয় বাছা? নিজের ঘরবাড়ী থাকতে পরের বাড়ীতে আসবার এত সাধ কেন?

খুড়িমার উত্তর শুনিবার জন্য গিন্নি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

খুড়িমা লজ্জায় ব্যথিত হইয়া গিন্নির দিকে চাহিয়া বলিলেন—সোমত্থ মেয়ে একলা কেমন করে থাকবে, তাই তোমায় বলতে এসেছি।

রোহিণী বলিল—তা তুমি গিয়ে বোন্‌ঝির কাছে থাক গে না।

দাসীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া খুড়িমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। খুড়িমা রোহিণীর দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—দেখ রোহিণী, দাসী তুই, দাসীর মতো থাক। আমি তোর কাছে ভিক্ষে করতে আসিনি।

খুড়িমার ভর্ৎসনায় রোহিণী অপ্রস্তুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিন্তু গিন্নি তাহার সাহস বাড়াইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—তা রোহিণী এমন মন্দ কথা কি বলেছে? তুমি গিয়ে বোনঝিকে আগলাও গে না।

খুড়িমা দৃপ্তভাবে বলিলেন—বিধবার সর্ব্বনাশ যারা করে তাদের মুখেই এমন বিদ্রূপ শোভা পায়। বড়ঠাকুর যদি আমার একবেলার হবিষ্যির একমুঠো ভাতেরও সংস্থান রাখতেন তবে এ বাড়ীতে আমার বাস যে একদণ্ডও উচিত নয় তা আর কাউকে বলে দিতে হত না। দিদি, শেষ কথা আমায় বলে দাও, আমার বোন্‌ঝিকে একটু আশ্রয় দেবে কি না।

খুড়িমা উত্তরের প্রত্যাশায় গিন্নির মুখের দিকে দৃপ্ত ভাবে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টির সম্মুখে গিন্নির দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া অবনত হইয়া পড়িল। তিনি নীরবে হাতের বালা খুঁটিতে খুঁটিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বিপিন যদি ঘুণাক্ষরেও এই সংবাদ জানিতে পারে তাহা

হইলে সে তাঁহার উপর রাগ ত করিবেই, হয়ত বা কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া মালতীকে আনিয়া উপস্থিত করিবে। অতএব মালতীকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করাই ভালো। কিন্তু এত আপত্তির পর কেমন করিয়া হঠাৎ স্বীকার করা যায় তাহারই উপায় তখন ভাবিতে লাগিলেন।

উত্তর পাইতে বিলম্ব দেখিয়া খুড়িমা মনে করিলেন গিন্নির মত নাই। খুড়িমা ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া গিন্নি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—ছোট বৌ, তোমার দেখছি একটুতেই রাগ হয়ে যায়। ওঁয়াকে একবার বলে দেখি, উনি কি বলেন...

খুড়িমা গিন্নির ধাত বুঝিতেন। তাঁহাকে একটু নরম হইতে দেখিয়া তিনিও নরম সুরে বলিলেন—দিদি, তুমিই ত কর্ত্তা। তুমি যা হুকুম করবে তাতে বড়ঠাকুর কখনো না বলবেন না। তোমার দয়া হলেই সব হবে···

গিন্নি এই কথায় প্রসন্ন হইয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তবু ওঁকে একবার বলা ত উচিত, হাজার হোক একজন কর্ত্তা যখন মাথার ওপরে বসে আছে...বিকেলে যা হয় হবে।

—যা হয় না দিদি। মেয়েটাকে তোমার পায়ে আশ্রয় দিতেই হবে। পোড়াকপালী মেয়েটা একে সোমত্থ, তায় রূপের ডালি, তুমি আশ্রয় না দিলে তার জাতধর্ম্ম থাকবে না। দিদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি।—বলিয়া খুড়িমা গিন্নির পায়ে ধরিলেন।

গিন্নি একেবারে গলিয়া গিয়া বলিলেন—আঃ ও কি করিস ছোট বৌ, তোর বোনঝি আর আমার বোনঝি কি পৃথক। তোর কিছু ভাবতে হবে না, যা।

খুড়িমা অন্দরের দিকে ফিরিলেন। কাহারো মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল তাঁহার মনে হইতেছিল সকলের দৃষ্টি যেন তাঁহার উদ্ঘাটিত হীন দীনতাকে উপহাস করিতেছে। নিজের দৈন্যের লজ্জা তাঁহার কাছে যত তীব্র হইতেছিল, তাঁহার মন মালতীর প্রতি ততই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সেই সর্ব্বনাশীর জন্যই যে তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা, এত অপমান সহ্য করিতে হইল, এই ধারণা প্রবল হইয়া স্নেহকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার মন অধিকার করিতে লাগিল।

(৩)

সন্ধ্যার সময় স্মৃতিরত্ন মহাশয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আরতি করিতে ও শীতল দিতে আসিয়াছেন। ঠাকুরঘরে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া খুড়িমা ঠাকুরদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—রাণীমাকে বলেছিলে মা?

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ বলেছি। তিনি ত রাজি হচ্ছিলেন না; অনেক করে' বলাতে শেষে বললেন বড়ঠাকুরকে বলে' যা হয় করবেন।

—আমি হরিবিহারীকে বলেছি। সে খুব সহজেই রাজি হয়েছে। এতে কিন্তু আমার মনটা দমে গেছে——কোনো ভালো কাজে তার উৎসাহ ত কখনো দেখা যায় না। তোমার বোনঝি এ বাড়ীতে টিকতে পারবে কি না তাই ভাবছি।

খুড়িমা কাতর স্বরে বলিলেন—এ বাড়ীতে

আমারও আর বেশী দিন টিকতে হবে না, ভটচায্যি মশায় তার পরিচয় আমিও যথেষ্টই পাচ্ছি।

ভট্টাচার্য্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন—তা ভয় কি মা। আর দুমাস পরেই বিপিন বাড়ী ফিরবে, তখন তার ভয়ে তোমাদের ওপর কেউ কোনো অত্যাচার করতে পারবে না।

খুড়িমা বলিলেন—তা বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ত বোঝবার জো নেই, কখন কিসে চ'টে যায়। একবার বেঁকে বসলে তখন তাঁকে বোঝানো কারুর সাধ্যে কুলোয় না।

এমন সময় বাহির হইতে গিন্নি ক্রোধ-কর্কশ স্বরে ডাকিলেন—ছোটবৌ!

খুড়িমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক কাঁপিতে লাগিল, গিন্নি যদি আড়ি পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া থাকেন তবেই ত সর্ব্বনাশ! গৃহিণীর আহ্বান শুনিয়া খুড়িমা হরিরলুট মানসিক করিতে করিতে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—কেন দিদি?

খুড়িমা দেখিলেন যে গিন্নি ঠাকুরঘরের দিকেই আসিতেছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার কথা শুনেন নাই, ইহাতে খুড়িমা একদিকে আশ্বস্ত হইয়া নূতন অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

গিন্নি ঠাকুরঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—বোনঝির কথা বাবুর কাছে যখন নিজেই বলানো হয়েছে, তখন চং করে আবার আমার কাছে বলতে যাওয়া হয়েছিল কেন?.....শুনেছ ত ছোটগিন্নি, বাবুর হুকুম হয়েছে! নিয়ে এস এইবার সুন্দরী বোনঝিকে, তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না।

এই কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটি খুড়িমার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—দিদি!

গিন্নি খুড়িমার তেজস্বী স্বভাব খুব ভালো করিয়াই চিনিতেন। খুড়িমার একটি কথায় সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদের উগ্রতা অনুভব করিয়া গিন্নি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন খুড়িমা উচ্চকণ্ঠে গিন্নিকে শুনাইয়া বলিলেন—আমি এই ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি যদি মালতীকে এবাড়ীতে আনি তবে.....

ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—ছি বৌমা, শপথ করতে নেই, থাম থাম, অনর্থক ক্রোধ করে' একজন নিরাশ্রয়ার সর্ব্বনাশ কোরো না মা!

করুণা ও স্নেহের স্পর্শে খুড়িমার ক্রোধ চোখের জলে গলিয়া পড়িল। তিনি সরোদনে বলিলেন—আমি তার ছন্দাংশে আর থাকব না ভটচায্যি মশায়; পোড়া-কপালীর অদেষ্টে যা থাকে হবে। নারায়ণ! কতকাল আর আমায় এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—ছি মা, মৃত্যুকামনা করা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করা, মহা পাপ। নারায়ণে ভক্তি রেখ মা, সকল দিকেই কল্যাণ হবে। তুমি গিন্নির মন ত জানো, তিনি মাটির মানুষ, তাঁকে আর একবার তুমি বল্লেই তাঁর রাগ জল হয়ে যাবে।

খুড়িমা চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—আমি মালতীকে আনবার মধ্যে নেই ভটচায্যি

মশায়। মুখে উচ্চারণ না করি মনে মনেও ত দিব্যি করেছি। তার কপালে যা আছে তাই হবে।

ভট্টাচার্য্য চক্ষুমুদ্রিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—নারায়ণ!

খুড়িমা গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তারপর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত রুদ্ধ বেদনার অশ্রুজল মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আপনার নিভৃত কক্ষটির উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত হইয়া গিন্নির নিকট নিবেদিত হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৮)

বোম্বাই ও বাঙ্গলাদেশ

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমি বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আমার কর্ম্মস্থান কেন পছন্দ করিলাম? তাহার উত্তর এই যে বঙ্গদেশ নির্ব্বাচনের অধিকার আমার আদৌ ছিল না। পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদের মধ্যে যে শ্রেণীতে যাহার নাম সেই অনুসারে তাহার নির্ব্বাচন ক্ষমতা; আমার নাম যেখানে পড়িয়াছিল তাহাতে আমার বাঙ্গলাদেশ লইবার অধিকার হইল না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই দুয়ের মধ্যে বাছিয়া লওয়া, এইটুকু আমার অধিকারের সীমা, এই দুয়ের মধ্যে আমি বোম্বাই বরণ করিলাম। তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার বিশ্বাস যে বাঙ্গলাদেশের তুলনায় বোম্বায়ের আবহাওয়া উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্মকালে দুই তিন মাস যা গরম ভোগ করিতে হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য যেখানে আমি অনেক বৎসর ধরিয়া বাস করিয়াছি সেখানে সকল ঋতুই উপভোগ্য। বর্ষার ত কথাই নাই। গ্রীষ্মকালও কষ্টদায়ক নহে। তা ছাড়া বোম্বাই মফস্বল কোর্টের গ্রীষ্মাবকাশের যে নিয়ম তাহাতে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ কাল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে অনায়াসে দূরে থাকা যায়। বোম্বায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া ধার্য্য। শীতের সময় নিজ বোম্বাই সহর, বর্ষায় পুণা, গ্রীষ্মে মহাবলেশ্বর, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপুরুষেরা এই তিন স্থানে পালায় পালায় অধিবেশন করেন। আমরা অনেক সময় গ্রীষ্মকালে মহাবলেশ্বর পাহাড়ের আশ্রয় লইতাম। সে অতি মনোরম স্থান। পশ্চিমঘাট শ্রেণীর মধ্যে অনেক সুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয় কিন্তু মহাবলেশ্বর সকলের সেরা। এই পর্ব্বতের শিখর পঞ্চনদীর আকর স্থান। তথায় মহাবলেশ্বর নামে শিব মন্দির আছে, তাহা হইতেই এই পাহাড় স্বনাম গ্রহণ করিয়াছে। এই পাহাড় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিহার ভূমি, ইহা ৫০০০ ফীট উচ্চ বৈ নয়। আসামের



কার্লিশ পয়েণ্ট—মহাবলেশ্বর

শৈলনিবাস সিলঙ যত উঁচু এও তার সমান উঁচু; সম্ভবত এই দুই পাহাড়ের শোভা-সৌন্দর্য্যও এক প্রকার। আমি নিজে সিলঙ দেখি নাই কিন্তু সে দিকে বেড়াইতে গিয়া আমার কন্যা সিলঙের যা বর্ণনা করিয়াছেন তা মহাবলেশ্বরেও ঠিক খাটে। তিনি লিখিতেছেন, "ছোট খাটোর মধ্যে সবই বেশ নিট্‌নাট্ ফিট্‌ফাট্ যেন বড় মানুষের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির বিরাট বা দুর্দ্দান্ত ভাব নেই, এখানে তিনি গৃহিণীরূপে মানুষের মত ঘরকন্না সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছেন। দৃশ্যের খুব গাম্ভীর্য্য না থাক্ সৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে। লাল লাল রাস্তা ব্যাড়াবার বেশ সুবিধা! ৫০০০ ফীট উঁচু সুতরাং বেশী ঠাণ্ডাও নয়।" মহাবলেশ্বরের ভাবও অবিকল এইরূপ। দেখিতে যেমন সুন্দর, ব্যাড়াইবার স্থানও অপর্য্যাপ্ত পড়িয়া আছে। গাড়ী চলাচলের কোন বাধা নাই, আবহাওয়া শীতোষ্ণের মাঝামাঝি! সুন্দর লাল রাস্তা, বিপনি, বাঙ্গলা, উদ্যান পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া আছে। উপরে সমান জমি এত আছে যে ঘরে থাকিয়া পাহাড়ে বাস করিতেছি মনেই হয় না। পাহাড়ের শোভা দেখিতে গেলে এক এক

প্রান্তে গিয়া দেখিতে হয়--এক এক Point যেমন Tiger point, Sidney point Elphinstone point ইত্যাদি এক এক কোন্ হইতে পার্ব্বত্য শোভা নব নব মূর্ত্তি ধারণ করে। কোনখানে গাছ পালা শূন্য কঠোর পর্ব্বত শ্রেণী। কোন পাহাড় "বপ্র-ক্রীড়া পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়।" কোন কোন পাহাড় দুস্তর বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাতালে নামিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে প্রতাপ-গড়ের পাহাড় বনরাজির মধ্য হইতে গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের উপর শিবাজী রাজা দুর্গ বাঁধিয়া বাস করিতেন। মহাবলেশ্বরের মত সুন্দর সুগম স্বাস্থ্যনিবাস এদেশে অল্পই পাওয়া যায়, কেবল বৃষ্টির আধিক্য বশতঃ বর্ষায় কয়েক মাস উহা বাসযোগ্য নহে।

আমাকে অনেকে খোঁটা দিতেন, বিদেশে সমস্ত জীবনটা চাকরী করে কাটানো কি ঝকমারি তার চেয়ে স্বদেশে কেরানীর কাজ করাও ভাল।" কিন্তু বিদেশে চাকরী করিবার যেমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, তেমনি সুবিধাও বিস্তর। আত্মীয় স্বজন হইতে সুপারিসের দরখাস্ত আসেনা সেই এক মহৎ লাভ। বিচ্ছেদের পর মিলনের আনন্দ সে কি কম? স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র স্থাপন করিবার অবসর পাওয়া সেও কি সামান্য লাভ? যতদিন আমি ওদেশে ছিলাম, মনে হইত বোম্বাই

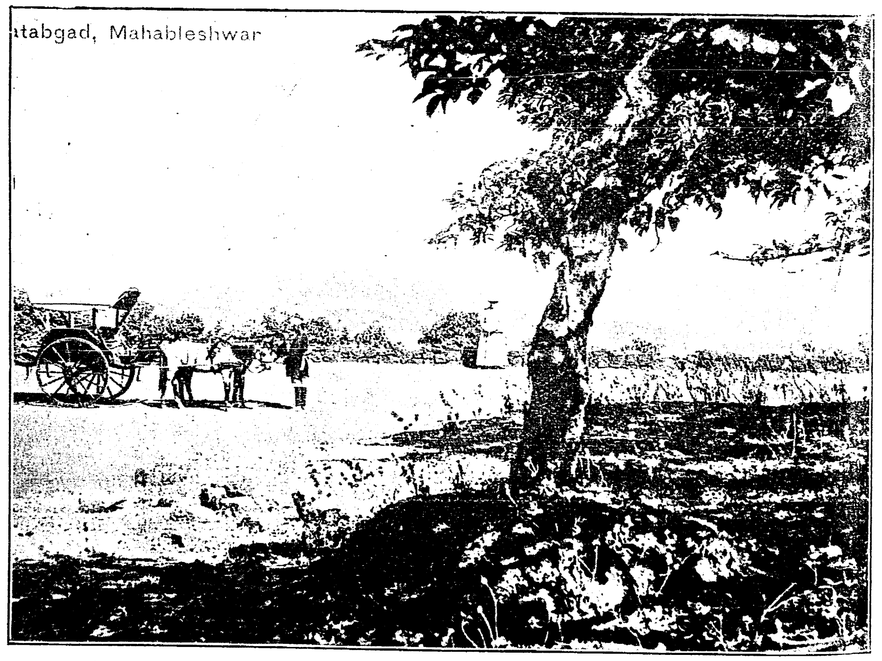

প্রতাপগড়—মহাবলেশ্বর

বাঙ্গলা যেন একটি যোগসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। বাঙ্গলাদেশ হইতে আমার পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্য হইতে একটা লোকের স্রোত একটানা বহিতেছিল, তাহাদের যাওয়া আসার বিরাম ছিল না। ইহাতে এই দুই দেশের লোক-দের পরস্পর সখ্যবন্ধন হইবার দিব্য সুযোগ হইত। আমি ওদেশে থাকিয়া বোম্বাই বাসীদিগের যে সকল সদ্‌গুণ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম আর আমার যা দিবার তা দিতেও সক্ষম হইলাম। আমি যেখানেই কর্ম্ম করিতাম, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চার হয় সে বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটি করি নাই। আমার এইরূপ কর্ত্তব্য সাধনের যে পুরস্কার তাহাও যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, আমার আত্মপ্রসাদ আর লোকের প্রসাদভাজন হওয়া এ দুইই আমার লাভ হইয়াছিল। কালক্রমে বোম্বাই আমার নিজের দেশ হইয়া গেল—সেখানকার অধি-বাসীদের আতিথ্যসৎকারে তাহা আমাদের বিদেশ বলিয়া মনেই হইত না।

উপসংহার

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে সিবিলিয়ন ও অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব ও হৃদ্যতার অভাব ছিল না। ইংরাজমহিলাদের সঙ্গেও আমাদের সর্ব্বদা দেখাশুনা মেলামেশা হইত। একসঙ্গে টেনিশ খেলা, ভোজনগৃহে একত্র মিলন, মফস্বল ষ্টেশনে ইংরাজদিগের যে সমস্ত সমাজ-বন্ধনের নিয়ম, আমরাও সেই গণ্ডীর অন্তর্ভূত ছিলাম। ইহারা কেহই আমার সম্বন্ধে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি ভদ্রব্যবহারের ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজি-ক্লবের প্রবেশদ্বার আমার জন্য মুক্ত ছিল— এমন কি সোলাপুর ক্লবের প্রেসিডেণ্টরূপে আমি কয়েক বৎসর কার্য্য করি। কিন্তু এই যে দেশী ও ইংরাজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এ কেবল আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। সাধারণতঃ দেশী ও আঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ তেমন সন্তোষজনক বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে যে বৃহৎ প্রাচীর পরস্পরকে বিযুক্ত রাখে তাহা উল্লঙ্ঘন করা সহজ নহে। তার অনেকগুলি কারণ আছে—

প্রথম, যা কথায় বলে East is East West is West—পূর্ব্ব সে পূর্ব্ব পশ্চিম সে পশ্চিম, তাদের বিধাতাদত্ত প্রকৃতিগত যে পার্থক্য তাহা ঘোচাইতে পারে কাহার সাধ্য? তাছাড়া ইংরাজেরা রাজার জাতি আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। তার উপর 'এক গোরা এক কালা'। আবার এই বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম্ম সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বৈদিককালে আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণে যে বিষম বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, বেদের মধ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়, ইংরাজেরা এদেশে চারিদিনের যাত্রী। অর্থোপার্জ্জনের জন্য এ দেশে আসা ও টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাওয়া। তাঁদের শরীর এক দিকে মন অন্য দিকে। বিশেষত ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের এমন সুবিধা হইয়াছে তাহাতে

এদেশের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। আগেকার কালে দেশীয়দের উপর এক একজন ইংরাজের সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত। তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিককাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আর সেভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বিহরে সুখে প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।"

তৃতীয়ত, ইংরাজের স্বভাব কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। তাঁহারা আপনাদের জাতীয় ঔদ্ধত্য—John Bull ভাব কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের কবি যেমন স্বজাতির বর্ণনায় বলিয়াছেন তাঁহাদের দেখিয়া কাহার না মনে হয়—

চলন গরবে ভরা, ধরা সরা গণে,
পৃথিবীর পতি যেন চলে ঊর্দ্ধাননে!

আর এক কথা এই এখানকার অধিকাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, তাঁহাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুবিধা হয় না। বোম্বায়ের মত সহরে যাহাই হউক, মফস্বল ষ্টেসনে ওরূপ হওয়া অসম্ভব। এই সকল নানা কারণে আমাদের উভয়তঃ যে বিচ্ছিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা অপসারিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমাদের সম্রাট জর্জ যুবরাজ থাকিতে যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তিনি ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছিন্নভাব দর্শন করিয়া ব্যথিত হন, ও দেশে ফিরিয়া গিয়া বলিয়া পাঠান যে সহানুভূতি (Sympathy) ব্রিটিশ রাজনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এই Sympathy কি কেবল কথার কথা, কার্য্যত কখনই দেখা দিবে না? তাহা কে বলিবে? এক সময় আমাদের যাহা অসাধ্য মনে হয় বিধাতা তাহা কালেতে সুসাধ্য করিয়া দেন। কালক্রমে এই দুই জাতির অধিকতর চেনা পরিচয় হইলে কি হয় কে বলিতে পারে? ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই সংঘটন করিয়াছেন। ইহা শুধু শক্তির লৌহবন্ধন না হয়, প্রীতির বন্ধন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু এই উদ্দেশে উভয় জাতিরই যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। উভয়ের পরস্পর সহানুভূতি ও সাহায্য চাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা যেন মনে রাখেন যে তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। প্রেমদান করিলেই তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়। যেমন উদারচরিত Revd. Andrews সাহেব বলিয়াছেন:—

"একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—আমি নিজের মনেও এখনো পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা সত্য, যে কোন কোন অসাধারণ মনীষী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, যাঁহারা এদেশের জীবনের মর্ম্মস্থলে তৎক্ষণাৎ যেন সহজ জ্ঞানের দ্বারা প্রবেশ লাভ করেন, প্রেমের দ্বারা তাহার সহিত এক হইয়া যান। এই যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়ের উদ্রেক তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। ভগ্নী নিবেদিতা এই দলের একজন ছিলেন; চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত রদেনষ্টাইন আর একজন। ভারতবাসীগণও তৎক্ষণাৎ এই সহজাত প্রীতির প্রতিদান করেন। প্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেয়। এই যে প্রচ্ছন্ন ভালবাসা এক মুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠিতে প্রস্তুত, ইহা সুষুপ্ত মনের কোন্ গভীর প্রদেশে থাকে? মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম! কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপের নিগূঢ় ঐক্য ইহা দ্বারা সূচিত হয়, এবং ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক বংশজাত ছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এমন অবিলম্বে, এমন অভূতপূর্ব্বভাবে এই আত্মীয়তা অনুভব করিয়া থাকি," *

ভারতবর্ষের প্রতি প্রেম ও মমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগেকার কালে ডেভিড হেয়ার ও একালে অ্যালেন হ্যম এই দুই মহাত্মারও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; একজন আমাদের শিক্ষাগুরু, অন্যজন রাজনৈতিক মন্ত্রদাতা। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল সহৃদয় মহাত্মা আমাদের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করেন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইয়া আত্মীয়ভাবে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত। ভারতবন্ধু হ্যম সাহেবের মৃত্যুতে আমাদের হৃদয়ের গভীর শোকোচ্ছ্বাস কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে না? তাঁহার ন্যায় উদারচেতা মমতাবান্ কর্ম্মবীরেরাই এই বাঞ্ছনীয় মিলন ঘটাইবার পক্ষে অনেক করিতে পারেন। নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, কেননা পূর্ব্বপশ্চিমে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে এমন একটা স্থান আছে যেখানে এই সমস্ত ভেদাভেদ বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা এই শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং
উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং

এ নিজ এ পর লঘুচেতাদের এইরূপ গণনা; উদারচরিত যাঁহারা, তাঁদের আত্মপর নাই, বসুধাই তাঁহাদের কুটুম্ব সমান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* With Ravindranath in England—Modern Review for January 1913.

জাপানের শিক্ষা ও বাণিজ্য

জাপান অতি অল্পকাল মধ্যে শিক্ষা-বাণিজ্যে যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে এরূপ পৃথিবীর কোনজাতি কোন বিষয়ে দেখাইতে পারে নাই। ইহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে অনেকেই বলিয়া থাকেন যেন দৈব শক্তির প্রভাবে জাপানীরা ভেল্কিবাজীর ন্যায় অসম্ভব কার্য্যসমুদায় অতি সহজে নীরবে সুসম্পন্ন করিতেছে। সামরিক কৌশলে ইহারা চীন ও রুষকে পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্য-যুদ্ধে জাপানী-

দের অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শনে শিল্পবীর ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণি এবং মার্কিন জাতি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছেন।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও জাপানের শিল্প বাণিজ্যে বৈদেশিক জাতির ভিতর তেমন ত্রাসের লক্ষণ দেখা যায় নাই।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে চিকাগো প্রদর্শনীতে জাপানী সূতী ও রেশমী বস্ত্র, চীনামাটীর বাসন, বাঁশ ও বেতের জিনিষ মাদুর এবং বার্ণিশের কাজ দেখিয়া আমেরিকগণ অবাক্ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া পর বৎসর তথাকার শিক্ষাবাণিজ্যসমিতি কর্ত্তৃক মিঃ পোর্টার জাপানী শিল্পের তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত জাপানে প্রেরিত হন। মার্কিন জাতি যে জাপানকে যথেষ্ট লাভজনক ক্ষেত্র মনে করিয়া ১৮৫৪ এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপন করেন, আজ মিঃ পোর্টার আসিয়া দেখেন লাভজনক দূরের কথা বরং জাপানই মার্কিন দেশ হইতে অর্থশোষণের বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। তিনি তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ করেন যে আমেরিকানদের পক্ষে তাহার প্রাচ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত প্রতিযোগিতা চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব যেহেতু জাপানে অতি অল্প বেতনে সুচতুর, দ্রুত অনুকরণশীল, উৎসাহী ও কর্ম্মোৎসুক কুলির অভাব নাই, পক্ষান্তরে আমেরিকায় ঐরূপ সামান্য বেতনে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কুলি পাওয়াই কঠিন।

মাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়েরা বলে আমরা তিন পুরুষের চেষ্টায় বস্ত্রবয়নে যে নিপুণতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম জাপানীরা দশ বছরেই তাহা শিখিয়াছে! তাহাদের সহিত আমরা কিরূপে প্রতিযোগিতা চালাইব?

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না হইলেও বস্ত্রাদি বহু জিনিস অনেক পূর্ব্বেই জাপানে প্রস্তুত হইত কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকার সহিত ঐ সকল দ্রব্য প্রতিযোগিতা সংরক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় জাপান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত দলে দলে ছাত্র বিদেশে পাঠাইতে থাকেন। তাঁহারাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শিল্প বিজ্ঞানের স্কুল কলেজ এবং কারখানা স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করেন।

জীর্ণঘর সংস্কার করিলে ঠিক মনের মত না হইতে পারে বটে কিন্তু দশখানা বাড়ী দেখিয়া একখানা বাড়ী ইচ্ছানুরূপ প্রস্তুত করা তেমন শক্ত নহে। জাপানীদের শিল্প এবং বাণিজ্য অনেকটা নূতন বাড়ীর ধরণে গঠিত। বিভিন্ন সভ্যদেশের শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া যেটি সব চেয়ে সহজসাধ্য অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুন্দরভাবে সামান্য মূলধনে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা সংরক্ষণে পারক জাপানীরা নব্যপ্রণালীতে তেমন পন্থাটিই অবলম্বন করিয়াছে।

জাপান অন্যান্য দেশের ন্যায় আমদানী রপ্তানী দুইই করিতেছে। শিল্পবাণিজ্যের নূতন দেশ, তাই ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য এখনও প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে বিস্তর কল কব্জা আনিতে হইতেছে। ক্ষুদ্র জাপানের শতকরা ৮৪ ভাগের অধিকাংশ পাহাড়াবৃত এবং বাসোপযোগী ভূমির তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কাযেই সভ্যদেশের আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্য এবং কারখানার জন্য তুলা

পশম চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য (raw materials) সঙ্কুলান হইতে পারে না, এই সব কারণে জাপানকে যথেষ্ট টাকার জিনিস বিদেশ হইতে আনিতে হয়। কিন্তু বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাপান সুদে আসলে সে সকল টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে শতকরা ৬০ জন সূচিকার্য্যে, ৩১ জন শিল্পবাণিজ্যে, এবং অবশিষ্ট ৫ জন অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত। বৎসরের যে সময়টায় কৃষি বন্ধ থাকে তখন কৃষকেরা শিল্প কর্ম্মে যোগ দেয়। জাপানে এমন লোক অতি বিরল, যিনি ঘরে বসিয়া অন্ন ধ্বংস করেন। সকলেই কিছু না কিছু করিতেছে।

জাপানীরা প্রথমতঃ ক্ষুদ্রাকারে কারখানা স্থাপন করে, ক্রমে কারবার বড় করিতে থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্ট নূতন কারখানা খুলিবার জন্য টাকা হাওলাত দেন; ক্রমে কারখানার আয়ের দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে থাকে। কারখানাতে কার্য্য শিক্ষার পক্ষে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের পক্ষে জাপানই উপযুক্ত স্থান। কেন না ইউরোপীয় এবং আমেরিকার ধনাঢ্যের ন্যায় ভারতবাসী কেহই কোটী কোটী মূলধনে কারবার খুলিতে প্রস্তুত নহে। কাযেই শিল্প বাণিজ্যের প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তনে আরম্ভ করিবার পক্ষে জাপানী পন্থাই আমাদের অনুকরণীয়।

জাপানে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক একটি মহাসভা আছে। ঐ সভায় প্রাদেশিক চেম্বার্শ অব কমার্শের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির উপায়

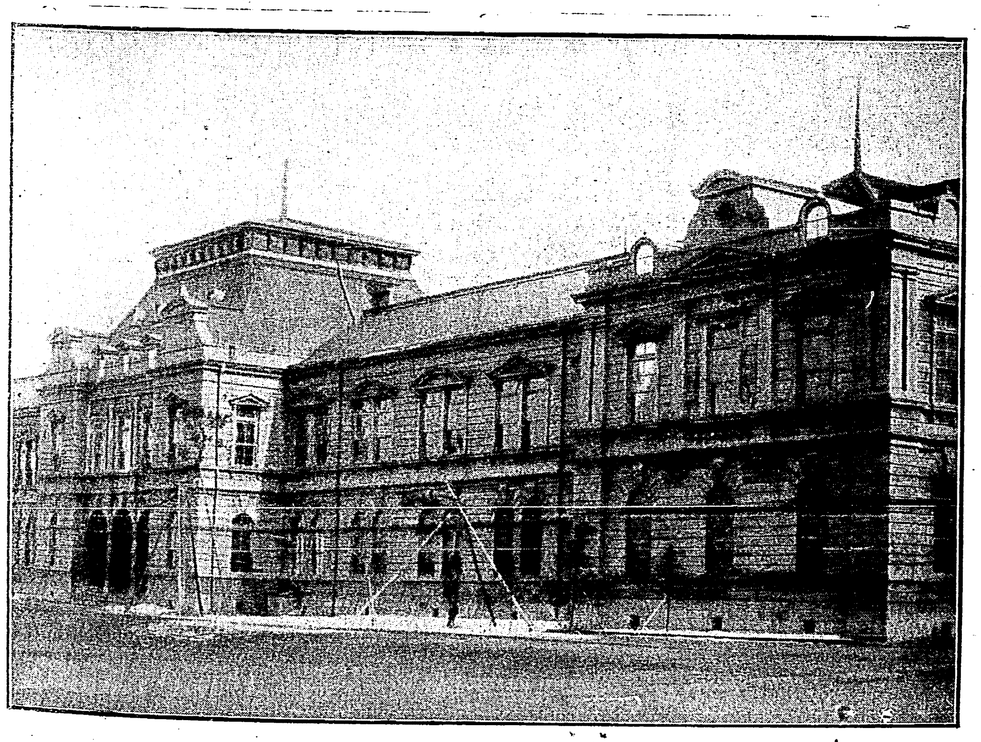

বাণিজ্য ও নৌবিদ্যালয়—তোকিও

আলোচনা করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে হাকোদাতে নামক স্থানে যে মহাসভার অধিবেশন হয় তাহাতে মিঃ কার্ণেকো বলেন—

"যে যে কারণে দেশ শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হইতে পারে আমাদের সে সমস্তই আছে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিব এইজন্যই বুঝি পরমেশ্বর কৃপা করিয়া ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় জাপানে বেশী লোকের সৃজন করিয়াছেন। জাপানীদের কার্য্য করিবার শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতীব প্রখরা। তাহারা সব বিষয়েই সূক্ষ্মদর্শী এবং পৃথিবীর মধ্যে সব জাতির চেয়ে চতুর। এই জন্যই সুচতুর মার্কিন জাতি পর্য্যন্ত আমাদিগকে ভয় করিয়া চলে"।

কৃষি ও শিক্ষা বিভাগীয় ভাইস মিনিষ্টার বলেন,

"মেইজি অব্দের (১৮৬৮ খ্রীঃ) প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে সকলের চক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে। দেশে অনেক কুসংস্কার ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের (দাইমিয়োর) ক্ষমতা তখন অসাধারণ ছিল। তাঁহাদের জন্যই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দেশে রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আবার তাঁহাদের চেষ্টাতেই উহার অবসান হয়। এবং প্রায় ঠিক সেই সময়ই তাঁহাদের যত্নে দেশের যাবতীয় লোক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে কসাই চামারের ব্যবসা অবলম্বনকারীগণ সমাজচ্যুত হইত, কালচক্রের আবর্ত্তনে সে ভাব এখন কিছুই নাই। এখন কোন্ ব্যবসা উচ্চ, কোন্ ব্যবসা নীচ এবং কোন্ ব্যবসা ছোট কোন ব্যবসা বড় তাহা নির্দ্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি মূলধন।

কল কারখানা সম্বন্ধে যে জাপানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কোন জ্ঞানই ছিল না, যে জাপানীরা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডোর পেরির জাহাজ জাপানউপকূলে দেখিয়া অবাক হইয়াছিল, সেই জাপানীরা এ কয়েক বৎসরে কলকারখানায় দেশকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তোকিও কিম্বা ওসাকা সহরের কোন উচ্চ-স্থানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইলে কারখানার অসংখ্য চিম্‌নি দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে জাপান শিল্প বাণিজ্যের দেশ। দুপুর ১২টা বাজিলে কারখানার বাঁশীর ধ্বনিতে ঘরে বসিয়াই টের পাইতাম জাপানে শিল্প বাণিজ্যের সংগ্রাম কি তুমুল ভাবেই চলিতেছে। শুধু বড় বড় সহরে নহে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে, এমন কি ঘরে ঘরেই কারখানা। ওসাকা সহর প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া খ্যাত। জাপানের কত সহর কত গ্রাম কত রকম শিল্প জাতের জন্য বিখ্যাত। ক্রমেই আরো কতস্থান নূতন নূতন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। আর আমাদের ভারতের প্রাচীন শিল্প এবং শিল্প-প্রধান স্থান গুলির নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে শুধু বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, বাগবাজারের রসগোল্লা, ভীমনাগের সন্দেশ, জয়হরির কুল্লি বরফ, ফতুল্যার চিঁড়া, বিক্রম পুরের পাতক্ষীর এবং এই জাতীয় কিছু।

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু বুঝিতে

পারি না এ পর্য্যন্ত কেন ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখি নাই; ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ ব্যবসাবাণিজ্যে হীনতর বলিয়া মনে হয়। এই বিকানীর মরুর মাড়োয়ারীগণ কলিকাতার বড়বাজারকে এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে। সুদূর আসামের বড় বড় গ্রামে পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর দোকান। বিকানীর রাজ-পুতানার মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, অথচ এই একমাত্র বিকানীর মরুরাজ্যেই ছয় শতাধিক লক্ষপতির বাস। বৈদেশিক বণিকগণ বিকানীরকে ভারতের চিকাগো বলিয়া থাকেন।

পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু, এবং পার্শী মুসলমান প্রভৃতি সওদাগরগণ এসিয়ার এবং ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছে। সুদূর জাপানের এক ইয়োকোহামা সহরেই প্রায় দেড়শত পশ্চিম ভারতীয় সওদাগর ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছে। জাপানের কোবে সহরেও ভারত বাসীর সংখ্যা প্রায় তদনুরূপ। উহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিয়াছি যে অনেকেরই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে কারবার আছে। চীনদেশে, ফিলিপ্পাইন দ্বীপে, শ্যাম, হঙ্কং এবং সিঙ্গাপুরে বিস্তর পশ্চিম ভারতীয় সওদাগর ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে। কেবল একটি মাত্র বাঙ্গালী যুবককে সিঙ্গাপুরে ব্যবসা চালাইতে দেখিয়াছি।

বাণিজ্যের উন্নতি এবং প্রসারণ রেল, ষ্টীমার এবং ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সুবন্দোবস্তের

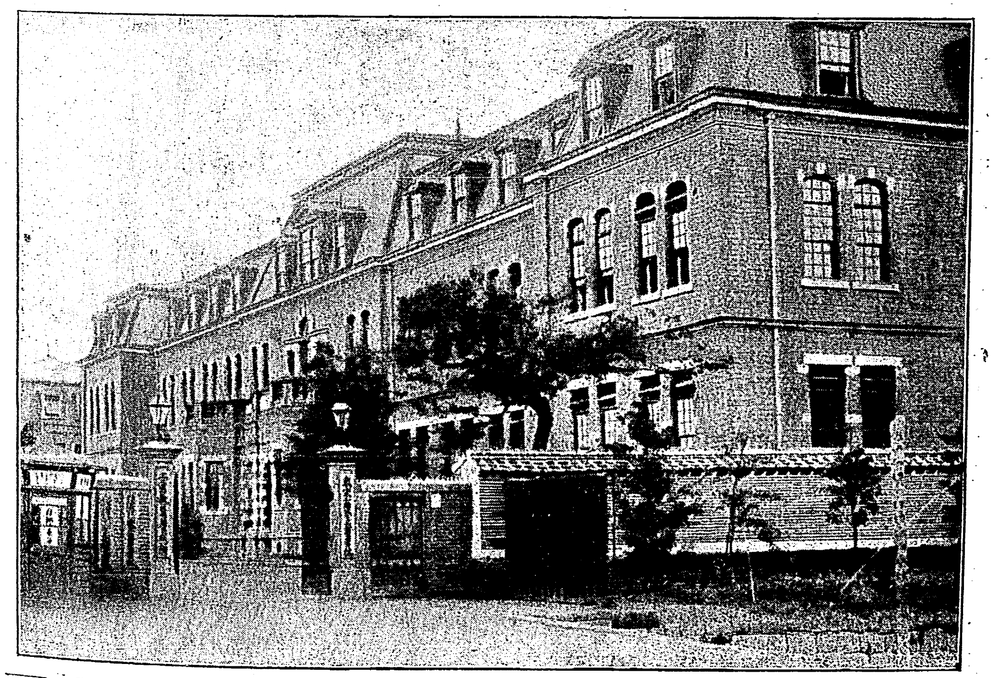

উচ্চ রাজনৈতিক বিদ্যালয়—তোকিও

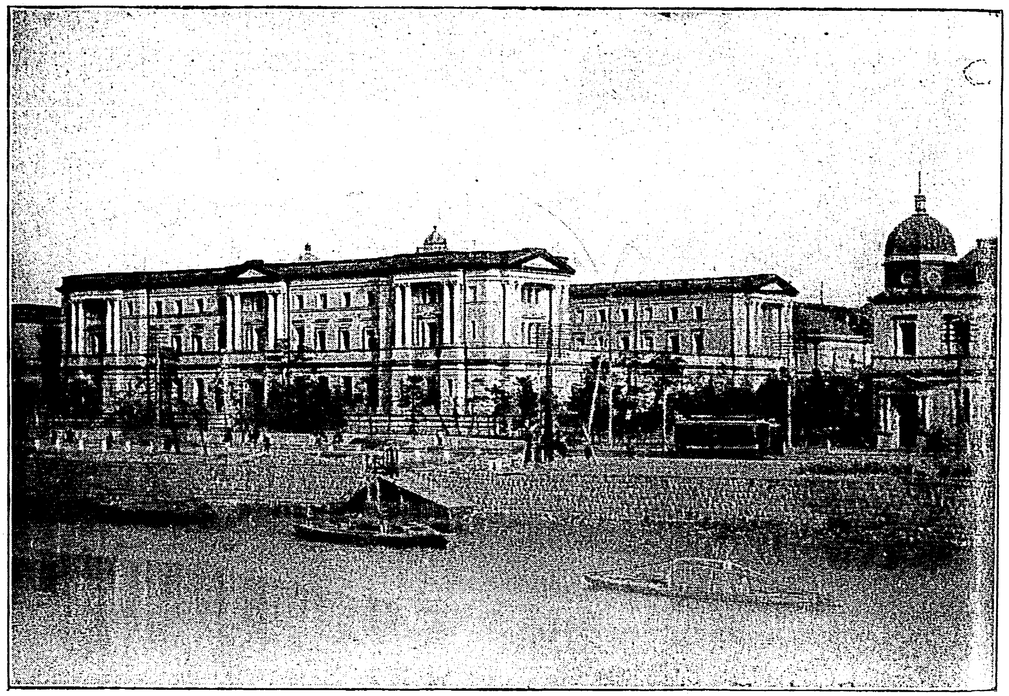

জাপান-ব্যাঙ্ক—তোকিও

উপর অনেকটা নির্ভর করে। ৪০,৫০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জাপান এ তিন বিষয়েই বিশেষ পশ্চাৎপদ ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইয়োকোহামা হইতে তোকিও পর্য্যন্ত ১৮ মাইল রাস্তার উপর সর্ব্ব প্রথম রেলের লাইন বসে। তারপর ৯ বৎসরে আর এক মাইলেরও বৃদ্ধি হয় নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে "জাপান রেল কোম্পানী নামক" একটি প্রাইভেট কোম্পানী ৪৫ মাইল রেলরাস্তা প্রস্তুত করে। ইহার পর রেলের কাজ এতই দ্রুত চলিতে থাকে যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রেল পথের দীর্ঘতা ৫২৯৫ মাইলে দাঁড়াইয়াছে। বাষ্পীয় ট্রেন ছাড়া বড় বড় সহরে এবং সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে বিস্তর বৈদ্যুতিক ট্রাম এবং টেন চলিতেছে। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বেশী দিনের কথা নয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাপানের রেলগাড়ীতে যখন কাচের দরজাজানালা হয় তখন গাড়ীতে ঢুকিবার সময় সেগুলি খোলা দুয়ার ভ্রমে অনেক আরোহীকে আঘাত পাইতে হইয়াছে। আজ তাহারাই শিল্প বাণিজ্য এবং সমরকৌশল প্রভৃতিতে বড় বড় জাতিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে আর তাহারাই বলিতেছে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর জাতি। কাচের দুয়ার জানালায় আঘাতের কথায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা মনে হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম জাহাজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জাপানে ১৪০০ খানা ষ্টীমার ও জাহাজ ছিল। ষ্টীমার

ও রেলের সংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৭৪৪০ খানায় দাঁড়াইয়াছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম কারবার এবং গতায়াতের সহায়তার জন্য সেই বৎসর ষ্টীমার ও জাহাজ লাইনের সংখ্যা ছিল ৭১টি। বলা বাহুল্য এ কয়েক বৎসরে ঐ লাইনের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

জাপানে নেশন্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপন মানসে প্রিন্স ইতো ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে তথাকার ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী সংগ্রহ করিয়া জাপানে প্রেরণ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নেশনাল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় আইন জারি হয়। উহার পর হইতেই স্থানে স্থানে উৎসাহী কর্ম্মবীরগণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৯৫০টি ব্যাঙ্ক ছিল, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে ২২৩৩টি ব্যাঙ্কের উল্লেখ রহিয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে স্থানে স্থানে কোম্পানী গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সংখ্যা ৯০০৬ ছিল; ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১২৩০৮ দাঁড়াইয়াছে!

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কৃষি-শিল্প-জাত দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারণের সহায়তাকল্পে গবর্ণমেণ্ট Businees guilds স্থাপন সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়ন করেন। দেখিতে দেখিতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভার সংখ্যা ৮৭০ হইয়াছে।

অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে কো অপারেটিভ সোসাইটির প্রচলন থাকিলেও উহার প্রসারণ অতি ধীরে ধীরে হইতে থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কোঅপারেটিভ সোসাইটি সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়ন হয়। উহার পর হইতেই সোসাইটির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কোঅপারেটিভ সোসাইটির সংখ্যা ১৬৭১ ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ৭৩০৮ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

সুদূর

(গল্প)

নবীন কবির পক্ষে ভক্ত পাঠক-লাভ অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। কমলের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিপিন ছিল কমলের আশৈশব বন্ধু। এক গ্রামে উভয়ের বাস। কমলের পিতা গ্রামের জমিদার, বিপিন সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থের পুত্র। গ্রামের স্কুলে বিপিনের শিরে সরস্বতীর কৃপা অকুণ্ঠিত ধারে বর্ষিত হইলেও, কমলের ভাগ্যে তাহার অভাব ঘটে নাই। বিপিনের জন্য অনেকখানি কৃপা বর্ষণ করিয়া অবশিষ্টটুকু কমলকে দান করিয়া সরস্বতী দেবী প্রসন্নই ছিলেন। ক্লাসে বিপিন প্রথম স্থান অধিকার করিত, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানটিতে কমলেরই অপ্রতিহত অধিকার

ছিল। স্কুলের ছুটির পর কমল যখন আপনাদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, বিপিনের তখন সে ছাদে অব্যাহত প্রবেশ-লাভ ঘটিত। বিপিন ধরাই দিত, কমল ঘুড়ি উড়াইত। সুতায় মাঞ্জা দিবার কল্পনা কমলের মনে উদিত হইবামাত্র বোতল-চুর ও বেলের আঠা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া বিপিন যে কোথা হইতে নিমেষ-মধ্যে আবির্ভূত হইত, তাহা দেখিয়া কমলেরও তাক্ লাগিয়া যাইত। সে শুধু বিস্ময়ে সম্ভ্রমে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিত।

এইরূপে অর্থগত দারুণ বৈষম্যের ব্যবধান-সত্ত্বেও এই দুইটি তরুণ-হৃদয় আশৈশব এক সঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক হইয়াই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা একই স্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল। তাহার পর এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দুই বন্ধুতে কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিল।

গ্রামের স্নিগ্ধ পবন-শিহরিত কুঞ্জ-তলে শ্যামার শিষের মধুর স্পর্শ যে হৃদয়ে কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই, সহরের রুদ্ধ আকাশ ও রুদ্ধ বাতাস সে প্রতিভা জাগাইয়া তুলিল। সহসা একদিন নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে পাথর ঠেলিয়া কমলের প্রাণে নির্ঝরের মতই ভাব ভাষা বিচিত্র ছন্দে কবিতার আকারে ঝরিয়া পড়িল। কমল কবিতা লিখিল। গ্রামের সেই ভাঙ্গা ঘাট, জীর্ণ শিব-মন্দির, খেলার মাঠ ও নিভৃত ছাদের কোণ এক অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কমলের বিরহ-তপ্ত প্রাণে সজীব সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মায়ের আদর, ভাইয়ের ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ দূরত্বের ব্যবধান ঠেলিয়া ফেলিয়া কমলের মনকে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিল।

সে রাত্রে কমলের নিদ্রা হইল না। কখন্ সকাল হইবে,—বিপিন আসিবে? কবিতা লিখিয়া সুখ নাই, কাহাকেও তাহা পড়ানো চাই! সে পড়ানোও আবার যাহাকে-তাহাকে নহে। প্রাণের যে প্রিয় জন, প্রাণের সমস্ত অলি-গলির যে সন্ধান জানে! যে শুধু কবিতার ছত্র দেখিয়াই তারিফ করিবে না, যে এই ছত্রগুলির অন্তরাল দিয়া একেবারে অতি সহজে কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে, তাহাকে,—তাহাকেই পড়ানো চাই। সে লোক, বিপিন। এই রাত্রে যদি সমস্ত সহর-বাসী ছুটিয়া আসিয়া কমলকে বলে, ওগো তরুণ কবি, আমরা আসিয়াছি, শুনাও, শুনাও, তোমার কবিতা শুনাও! তাহাতে কমলের তত আনন্দ হইবে না, যতখানি হইবে, একবার যদি বিপিন শুধু আসে! নিভৃতে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বিপিনকে যদি এ কবিতা সে পড়িয়া শুনাইতে পারে, তবেই তাহার কবিতা লেখা সার্থক হয়! অধীর আগ্রহে একরূপ বিনিদ্রভাবেই কমলের সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

সকালেই বিপিন আসিয়া কমলের বাসায় উপস্থিত হইল। নিত্য সে প্রাত-র্ভ্রমণ সারিয়া কমলের এখানে চা খাইতে আসিত। আজও আসিল। কিন্তু চায়ের পরিবর্ত্তে সে আজ কমলের কবি-হৃদয়-নিঃসা-

রিত যে আনন্দ-রস পান করিল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুর ললাটে জয়টীকা পরাইয়া বিপিন সে দিন যখন বিদায় লইল, তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে বিপিন ও কমলের মিলন-সূত্রে আর-একটা নূতন গ্রন্থি পড়িল। বন্ধন দৃঢ়তর হইল। তরুণ কবি বিহ্বল নেশায় কবিতা লিখিয়া যাইতে লাগিল এবং ভক্ত পাঠক নিত্য আসিয়া কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ চিত্তে কবির কণ্ঠে আশা-প্রশংসার বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিতে এতটুকু অবহেলা রাখিল না।

২

তাহার পর ঝড় উঠিল। মানব-জীবনে এ ঝড় নূতন নহে,—এ ঝড় নিত্য বহে। এ ঝড়ে নিকট দূর হইয়া যায়, দূর নিকটে আসে। এ ঝড় বন্ধুকে বন্ধুর পার্শ্ব হইতে ছিনাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, বন্ধুর সভায় নূতন আগন্তুককে টানিয়া আনিয়া মহা সমাদরে আসন বিছাইয়া বসাইয়া দেয়।

কমল ও বিপিনের জীবনেও এ ঝড় দেখা দিল। সহসা একদিন প্রাতে উঠিয়া কমল দেখে, বিপিন নাই—অর্থের জন্য, সংসারের জন্য বিপিন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। এ দূরত্বকে চিঠির শৃঙ্খলে কিছুদিন বাঁধিয়া রাখা গেলেও চিরদিন বাঁধিয়া রাখা যায় না। চিঠি কাগজের শৃঙ্খল—কতটুকুই বা তাহার বল! সভায় নিত্য নূতন নূতন লোক আসিয়া দেখা দিতেছে—কত দিন তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা যায়! তাহাদের কোলাহলে বাধ্য হইয়া তাহাদের পানে চাহিতেই হইবে। তাহাদের দাবী তাহারা ছাড়িবে কেন? যখন তাহারা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদের ঠেলিয়া চলিয়া যাইবার সাধ্য কি!

যশ! কি তাহাতে মোহ আছে। কি সে কুহক জানে! মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া স্রোতের ফুলের মতই ভাসিয়া যখন কমলের কবিতাগুলি বঙ্গবাসী নরনারীর অন্তর-তটে ছুঁইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার পক্ষে চিঠির দুর্গে বসিয়া দূর-গত বন্ধুর পানেই চাহিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এখন কমল আর বিপিনের কবি নহে, এখন সে সকলের কবি, বাঙ্গালীর কবি! বিপিন শুধু আর তাহার একটিমাত্র পাঠক নহে, এখন তাহার পাঠক-সংখ্যা বহু। একের কাছে পূর্ব্বে সে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ধরিত, তাহাতে সুখ ছিল। এখন একের স্থানে অনেক আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকেও সুখ আছে, তাহার উপর অনেকে আর-একটা অতিরিক্ত-কিছু আছে। সে অতিরিক্ত-কিছু, নেশা! নেশার শক্তি অসাধারণ—সে শক্তি এড়ানো তরুণ কবির সামর্থ্যের বাহিরে।

বেচারা বিপিন কোন্ সুদূর গৃহ-কোণে পড়িয়া আছে। যাহারা কলরব-কোলাহলের মধ্যে থাকে, তাহাদের একটা সুখ আছে। স্মৃতি তাহাদের জ্বালাইতে যায় না। স্মৃতি দুরন্ত হইলেও নারী। নারীর মতই তাহার সহজ কুণ্ঠা আছে। তাই সে ভিড়ে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু যাহারা বিরহ-ম্লান নীরব গৃহ-কোণে পড়িয়া থাকে, স্মৃতি তাহাদিগকে বড় জ্বালায়! বিপিনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।

একা সে এক কোণে নিরালায় পড়িয়া

থাকিত, স্মৃতি তাহাকে ছাড়িত না। নিভৃত বিজন ঘরের কোণ! বাহিরের কলরব সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। নীরব অবসরে সে তাহার স্মৃতির দেওয়া পুঁথিখানা খুলিয়া বসে। পুঁথি জীর্ণ হইয়াছে, তবু তাহার কয়েকটা পৃষ্ঠা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে! সেই পাতাগুলার পানে মৌন-মূক বিপিন চাহিয়া থাকে। চোখ তাহার জলে ভরিয়া যায়! ঝাপসা চোখে পুঁথির পাতাও মিলাইয়া আসে। নূতন ছবি অজ্ঞাতে তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। সে ছবি কমলের। পত্র-পুষ্পে খচিত আলোর লহরে ভূষিত বিরাট সভা-মণ্ডপ। সে মণ্ডপের এক পার্শ্বে উচ্চ বেদিকা। বেদিকায় বসিয়া কমল গান ধরিয়াছে। শিরে তাহার মণিময় মুকুট, ভালে ললাটিকা, ওষ্ঠে সস্মিত হাসি, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ! আর তাহারই চারিধার ঘেরিয়া সারা বাঙ্গালার লোক বসিয়া আবেশ-বিহ্বল ভাবে সে গীতি-সুধা পান করিয়া ধন্য হইতেছে! সে সভায় সকলে আছে, সকলের উপর দিয়াই কবির প্রসন্ন স্মিত হাস্য অজস্র ধারে বহিয়া চলিয়াছে! শুধু নাই সেথা বিপিন! কৈ, কবির চক্ষু বিপিনকে একবারও খুঁজিতেছে না ত! না, আজ আর বিপিনকে তাহার প্রয়োজন নাই! সুর সাধিতে হয় নির্জ্জনে—সে সময় একজন,—একজনের শুধু পার্শ্বে থাকা প্রয়োজন! যদি ভুল হয়, সে শুধরাইয়া দিবে! যদি ঠিক হয়, সে তারিফ করিবে! আজ সুর সাধা হইয়া গিয়াছে,—আজ আর তাহাকে কি প্রয়োজন! উপরে উঠিবার সময় সিঁড়ির প্রয়োজন—কিন্তু উপরে উঠিয়া সিঁড়ির পানে চাহিয়া থাকা মূঢ়তা! সিড়ির কাজ তখন ফুরাইয়াছে। নামিবারও যখন প্রয়োজন নাই, তখন সে সিঁড়ি রহিল কি গেল, তাহা দেখিয়া কাজ কি!

৩

কমলের খ্যাতি কাব্যের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ক্রমে নাটকের ক্ষেত্রে দেখা দিল! দুই মাস ধরিয়া বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রে মাসিক পত্রে দুন্দুভি বাজিতেছিল, কবিবর কমলকুমার নাটক লিখিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রধান নাট্যশালা হীরক রঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় হইবে— মহাসমারোহে নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে।

সুদূর প্রবাসে বসিয়া বিপিন সে দুন্দুভি-নাদ কর্ণে শুনিল। তাহার মাথার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। এ সেই কমল, তাহার কমল! সে আজ বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! আর সে?

বিপিনের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে বাক্স খুলিয়া কমলের চিঠিপত্রগুলা বাহির করিল। এই তাহার হস্তাক্ষর, এই তাহার হৃদয়! চিঠির পর চিঠি খুলিয়া বিপিন পড়িতে লাগিল। কৃপণের ধনের মতই চিঠিগুলিকে সে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই সেই প্রথম চিঠি! আট পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া চিঠি! ভাদ্রের কূলে কূলে ভরা নদীর মতই কমলের সমস্ত হৃদয়টুকু এই আট পৃষ্ঠায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে! তাহার পর—? চিঠির পাতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও গুড়াইয়া গিয়াছে! শেষে—আজ তিন বৎসর চিঠির আর দেখা নাই। শেষ চিঠিখানি তিন বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা! শুধু দুইটি ছত্র —"মাসিক-পত্রের তাড়ায় চিঠি দিতে অবসর

পাই না। ক্ষমা করো। কেমন আছ?" শুধু এই কয়টি কথা! 'অবসর পাই না!'—একখানা চিঠি দিবারও অবসর হয় না—এত কাজ! বিপিনের সমস্ত বুকখানাকে নাড়া দিয়া একটা প্রবল নিশ্বাস ঝড়ের মতই বেগে ছুটিয়া বাহির হইল। এ চিঠি নয়, বিদ্যুৎ-শিখা! এ শিখা বিপিনের প্রাণখানাকে দলিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

৪

বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বিপিন কলিকাতায় আসিল। সেদিন শনিবার। হাবড়ার পুল পার হইতেই রাস্তায় একটা বাড়ীর দেওয়ালের উপর বিপিনের নজর পড়িল। নানারঙের চিত্র-বিচিত্র-করা বড় অক্ষরে ও কি লেখা! কবিবর কমলকুমার রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক, "মণি-হার"। উত্তেজনায় বিপিনের মাথার শিরা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে রক্ত নাচিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর নাট্যশালার সম্মুখে গিয়া সে দেখে, কি ভিড়! সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! সকলের মুখেই মণি-হারের কথা, কমলের কথা! দলে দলে লোক টিকিট কিনিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিতেছিল। বিপিন উদ্‌গ্রীব চিত্তে কাহার আশায় চারিধারে একবার চাহিয়া দেখিল! আলোর চমক্ দিয়া ট্রামগাড়ী থামিয়া আরোহী নামাইয়া আবার ছুটিয়া চলিয়াছে, মোটর, জুড়ি সশব্দে আসিয়া নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইতেছে, বিপিন চারিদিকে চাহিয়া নিতান্ত অপরাধীর মতই সঙ্কুচিতভাবে আপনার মনিব্যাগ খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল। টাকাটি বাহির করিয়া আবার চারিধারে সে চাহিয়া দেখিল। যেন সে কত-বড় অপরাধী!—যেন সে চুরি করিতে যাইতেছে! এমনই বিবর্ণ তাহার মুখ, এমনই দীপ্তিহীন তাহার দুই চোখ! তাহার মনে হইল, ভিড়ের মধ্য হইতে যত লোক ব্যঙ্গ কৌতুক-দৃষ্টিতে তাহারই পানে যেন চাহিয়া রহিয়াছে! বিপিনের পা কাঁপিতেছিল, গা টলিতেছিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে যাইয়া টিকিট-ঘরে কোনমতে টাকাটা ফেলিয়া দিয়া সে একখানি টিকিট কিনিল, কিনিয়াই দ্রুত পদে নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

নাট্যশালা তখন লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। অধীর দর্শকের কলরব-কোলাহল বিপুল জল-কল্লোলের মতই শুনাইতেছিল। কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ পান খাইতেছে। সম্মুখস্থ পটের পিছনে এখনই যে বিরাট সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিবে, নিঃশেষে তাহা উপভোগ করিবার জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত হইয়া লইতেছে।

ঐক্যতান বাজিল! এইবার! বিপিনের অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতেছিল। একবার সে উপরের পানে চাহিল। ঐ যে রাজাসনে বসিয়া—কমল! পার্শ্বে তাহার অসংখ্য ভক্ত! কমলের মুখে কুণ্ঠিত স্মিত হাস্যরেখা! দর্শকদের পানে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতেই যেন সে চাহিয়া দেখিতেছিল। কমল কি তাহাকে দেখিবে না? বিপিন কোথা হইতে আসিয়াছে! কেন সে আসিয়াছে? কিসের আকর্ষণে? সে কি তাহা বুঝিবে না? যদি না বুঝে? বিপিনের মনে হইল, একবার সে চীৎকার করিয়া বলে,— হে

বন্ধু, তোমার এ শুভ আনন্দের মুহূর্ত্তে তোমারই সহিত আনন্দের কণা উপভোগ করিতে আসিয়াছি। এই অযুত দর্শকবৃন্দের মুগ্ধ স্তুতি-কণ্ঠের সহিত আমিও আপনার কণ্ঠ মিলাইতে আসিয়াছি! কিন্তু হায়, সে কথা কেমন করিয়া সে বলে! সে কথা কে মানিবে? রাজাসনে কবির পার্শ্বে ত আজ তাহার ঠাঁই নাই! সে যে আজ এই সাধারণ দর্শকের মত নিতান্তই একজন এক টাকার দর্শক মাত্র।

পট উঠিল। একটা আনন্দ-সম্ভাবনায় দর্শকের দল স্তব্ধ হইল। অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অঙ্কের প্রতি দৃশ্যের মধ্য দিয়া দর্শকের মন তন্ময়ভাবে চলিয়া কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে বিলীন হইয়া গেল।

যখন অভিনয় থামিল, মুগ্ধ দর্শকদল সহসা তখন চেতনা-লাভে ক্ষুব্ধ হইল। ইহারই মধ্যে শেষ হইল! এ গান এখনই থামিল! এ যেন কোন্ নিপুণ ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়া যষ্টির বলে ম্লান ধরণী-তলে স্বর্গের এক উজ্জ্বল অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল! দর্শকের দল মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে নাট্যকারের জয়-গানে নাট্যশালা মুখরিত করিয়া তুলিল।

বিপিন আবার উপরের পানে চাহিল। কমল চলিয়া যাইতেছে—সার্থকতার বিরাট আনন্দে মুখ তাহার ভরিয়া গিয়াছে! বিপিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বাহিরে আসিল।

নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানা মোটর গাড়ী বিজয়-গর্ব্বে যেন ফুঁসিতেছিল! কমল আসিয়া গাড়ীতে বসিল, সঙ্গে আরও তিন চারিজন ভক্ত আসিয়া উঠিল। জম্‌কালো পোষাক-পরা কয়েকজন দর্শক আসিয়া কমলের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল। প্রশংসার ঘটা পড়িয়া গেল। বিপিন দূরে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতে লাগিল। তাহার মনে একটা দারুণ জ্বালা গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! চোর! চোর ইহারা! কমলকে তাহার কাছ হইতে ইহারাই চুরি করিয়া রাখিয়াছে! প্রশংসা ইহাদের ওষ্ঠাগ্রেই শুধু লাগিয়া আছে! হৃদয়ের গোপন তল অবধি তাহার শিকড়টা পৌঁছিয়াছে কি না, সন্দেহ! ইহাদেরই কথাতে, ইহাদেরই অলস চাটুবাণীতে কমল এতখানি ভুলিয়া রহিয়াছে। বিপিনের মনে হইল, দুরন্ত রোষে ইহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলকে সে তাড়াইয়া দেয়—কমলকে আপনার দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে চাপিয়া ধরিয়া সে বলে, বন্ধু, কাহাদের কথায় তুমি ভুলিয়া রহিয়াছ? ইহারা তোমার হৃদয়ের কি খপর রাখে! শুধু বাহিরের একটুখানি দেখিয়াছে বৈ নয়! তুমি এস আমার কাছে, তুমি এস আমার বাহুর নিবিড় বাঁধনে—তুমি এস আমার হৃদয়ের মধ্যে! যে হৃদয়ে শুধু তোমারই আসন, তোমারই ঠাঁই! ইহাদের কাজ আছে, কলরব আছে, আরও অনেক আছে, কিন্তু আমার শুধু তুমি আছ, শুধুই তুমি! কবি তুমি, মানুষ তুমি, কমল তুমি,—

কিন্তু কিছুই বলা হইল না! মোটর গাড়ী কমলকে বুকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিনের যখন চেতনা হইল, তখন সে দেখিল, দর্শকের দলে গাড়ী ভাড়া করিবার বিষম গণ্ডগোল চলিয়াছে—এবং কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দভাবে সে নাট্যশালার গাড়ীবারাণ্ডায় একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহার চোখের সম্মুখে রাস্তার আলোগুলা বুয়াশা-য়ান তারার মতই মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে এবং দর্শকের কোলাহল স্বপ্ন-শ্রুত অস্পষ্ট ধ্বনির মতই কানে আসিয়া লাগিতেছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শান্তিবাদীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার

(ফরাসী হইতে)

রুস্ জাপানীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, আল্‌-বানীরা উত্থান করিয়াছে, হেরেরোরা জর্ম্মন-দিগকে হত্যা করিতেছে, এবং তুর্ক-বুলগারী-দের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে ...সাগর-গর্ভচর নূতন এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে, বাষ্পজাহাজ হইতে অনবরত বাষ্পধূম উত্থিত হইতেছে, সৈন্যদলের চলাফেরা আরম্ভ হইয়াছে, সমর-সরঞ্জাম চালান করা হইতেছে, দুর্গে খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করা হইতেছে,—ইহা ভিন্ন আজকাল আর কোন কথা শুনা যায় না...যাঁহারা জাগতিক শান্তি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের স্বপ্ন দেখিতেছেন এই সময় তাঁহাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা কি উত্তম-কল্প নহে? এই সপ্তাহের প্রারম্ভে, শান্তিবাদীদিগের অভূতপূর্ব্ব সাফল্য ঘোষণা করিবার জন্য প্যারিস নগরে একটা আনন্দভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে প্রধান প্রধান সমস্ত শান্তিবাদীই উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাহার পরদিনই,—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সমধিক বিখ্যাত ও উৎসাহী, তাঁহাদের সহিত আমি সহজেই সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; —যথা, মঃ-ফ্রেডেরিক পাসি, মঃ-দেতুর্ণেল দে কঁস্তাঁ, মিঃ-টমাস্ বার্ক্লে; তাঁহারা সকলেই, সু-পরিবেষিত ভোজ-টেবিলের চারিধারে বসিয়া, পূর্ব্ব দিনে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারই অতিমাত্র শ্রমে এখনও যেন কম্পিত-কলেবর।

***

বিশ্বজনীন শান্তি স্থাপনের পূর্ব্বেই মঃ-ফ্রেডেরিক-পাসি তাঁহার নিজগৃহে শান্তি স্থাপনে সফল-কাম হইয়াছেন। বন-প্রান্তে, Neuilly-গ্রামে যে গ্রাম্য ধরণের একটি কুটীরে তিনি বাস করেন, নগরের কোলাহল সে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। এবং প্রাচ্যখণ্ডের কামানের আওয়াজ তাঁহার উদ্যানের বহুদূরেই মরিয়া যায়।

তাঁহার নিকটে যাওয়া বড় সহজ নহে। দুর্গপতি সৈনিক যেরূপ জেদের সহিত স্বীয় দুর্গ রক্ষা করে, তিনি সেইরূপ জেদের সহিত তাঁহার গৃহের প্রবেশ দ্বার রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি যখন তাঁহার কামরায় গিয়া পৌঁছিলাম, কি-ভাবে তিনি যে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রাতৃত্বের প্রচারক শান্তি-বীর

আমার সম্বন্ধে কেমন উদার ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলিবার কথা নহে! তাঁহার মস্তকের চূড়াদেশ কেশশূন্য—পার্শ্বদেশ হইতে শুভ্র কেশরাশি গ্রীবা পর্য্যন্ত বিলম্বিত, ঝোঁপের মত দাড়ি বক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, বক্র-রেখ নাসিকা, চস্‌মার পশ্চাতে সংকীর্ণ নেত্রযুগল, দীর্ঘ শীর্ণকায় পুরুষ; তিনি আসন হইতে উত্থান করিলেন, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ায় কোর্ত্তাটা পিঠের উপরে একটু উঠিয়া পড়িল; বাহু নাড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ—

—"কি চাও? কি চাও? আমি কাগজ-ওয়ালাদের সঙ্গে কখন দেখা করিনে। আঃ! এই কাগজওয়ালারা!"

যিনি ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথমে নোবেল পুরস্কারের জয়মাল্য পাইয়াছিলেন, সেই উদারচিত্ত বৃদ্ধের প্রতি ভক্তিরসার্দ্রচিত্তেই আমি উপনীত হইয়াছিলাম। তাঁহার উপরোক্ত উক্তি শুনিয়া আমি খুব একটা আঘাত পাইলাম; সেইখানে একটা অস্থাবর সিঁড়ি ছিল, আমার এই আঘাত সামলাইবার জন্য সেই সিঁড়িটার উপর ভর দিয়া রহিলাম। তাহার পর অতি সাবধানে ও ভয়ে-ভয়ে আমার আগমনের কারণটা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম, এবং আমি যে এই শান্তিময় নিভৃত স্থানে বাহিরের দূষিত হাওয়া আনিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

তিনি তখন পুনর্ব্বার উপবেশন করিয়া বলিলেনঃ—"যুদ্ধ, শান্তি!—তা বৈ আর কি! বর্ত্তমান যুদ্ধ শান্তির পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয় এমন আর কিছুই না; কেননা, শান্তি কত প্রয়োজনীয় তাহা যুদ্ধই দেখাইয়া দেয়।

"১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে আমরা এরূপ বিরাট সফলতা লাভ করিব; আমাদের এখন একটা সালিশের আদালৎ হইয়াছে, সালিশের কমিটি আছে, সালিশের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে···এ এক অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার!"

এ সমস্ত বুদ্ধিবিহ্বলকারী চমৎকার বিভ্রম মাত্র;—আদালৎ আছে বটে কিন্তু সেখানে কেহ যায় না, কমিটি আছে বটে কিন্তু সেখানে কেবল ভোজেরই অনুষ্ঠান হয়, এবং সন্ধির নিয়ম আছে বটে কিন্তু তাহা কোন কাজে আসে না! আমি কথা কহিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু আমার প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্বেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত একজন চিত্রকরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, এবং সহসা সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিত্রকরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার ছবি আঁকিতে চান? কি রকম-ভাবে বসিতে হইবে? এই রকম ভাবে? না—এই-রকম ভাবে?" পরিশেষে তাঁহার আরাম-কেদারায় ভাল করিয়া বসিয়া লইলেন, পা ছড়াইয়া দিলেন, মাথাটা পিছনে হেলাইয়া রাখিলেন—এমন-ভাবে বসিলেন যাহাতে তাঁহার লেশমাত্র সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়। তাঁহার খাস-মুন্সী এক যুবতী রমণী এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিলেন সেই যুবতীকে তাঁহার নিকট সংবাদপত্রাদি হইতে পাঠ করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। যুবতী পূর্ব্বদিনের ভোজে য়ুরোপীয় প্রথামত সুরাপানসহকৃত ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া যে সকল স্তুতিবাদ হইয়াছিল সেই সকল বক্তৃতাদির বিবরণ পড়িয়া শুনাইতে লগিলেন।

এই সকল বড় বড় কথা আমাদের কানে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, যথাঃ—দয়া, ভ্রাতৃ-ভাব, শান্তি, অস্ত্রবিসর্জ্জন, নবযুগ, সার্ব্বজনিক কল্যাণ। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন সুরের কথাও আমাদের কানে আসিতেছিল যথাঃ—"শান্তিতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা অতি নির্ব্বোধ, তাহারা কোন কর্ম্মেরই নয়...; জাপানিদের ন্যায় রুসেরাও চোর..." M. Frederic Passy এই সব কথায় সায় দিয়া কখন কখন মাথা নোয়াইতেছিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুল ঘুরাইতেছিলেন। আমি বাধ্য হইয়া যে কোণটি আশ্রয় করিয়াছিলাম, সেইখান হইতে একটু নড়িবামাত্র তাঁহার রোষকষায়িত কটাক্ষ আমার উপর নিপতিত হইল। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, বিশ্বজনীন শান্তির একজন প্রচারক—তিনি এখন ছবি তুলাইবার জন্য বিশেষ ভঙ্গীতে বসিয়াছেন, এখন তাঁহাকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে নাই! এখন তিনি একজন চিত্রকর, একজন সংবাদপত্র-লেখক ও একজন যুবতীমহিলার সম্মুখে, চিত্রপটে অমরত্ব লাভের জন্য স্থিরভাবে উপবিষ্ট।

"লোকে বলে আমরা কতকগুলা পাগল কিন্তু সে কথা সত্য নহে।"

পকেটে হাত রাখিয়া, একটু মাথা হেলাইয়া M. d'Estournelles de constant উক্ত কথাটি বলিলেন। তাঁহার ললাট উদ্বেগ-রেখাঙ্কিত; সে উদ্বেগ শুধু একটি দেশের জন্য নহে, শুধু নিজের দেশের জন্য নহে, পরন্তু সকল দেশের জন্য। সমস্ত অন্তর্জাতিক ফলাফলের বিরাট ভার নিজ স্কন্ধে বহন করিতেছেন বলিয়া তিনি নিয়ত অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার ওষ্ঠের উপর একটি ক্ষীণ স্মিতহাস্য ভাসমান, ওষ্ঠের নীচে গোঁফ ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং চোখে একটুও উৎসাহের আগুন নাই। নব ধর্ম্মের নবীন প্রচারকদের মধ্যে যে জ্বলন্ত উৎসাহ দেখা যায়, ইনি যেন সেই উৎসাহ হারাইয়াছেন। সেই একই অলস কণ্ঠস্বরে, পূর্ব্ব কথার সূত্র ধরিয়া যদৃচ্ছাক্রমে, স্বগত উক্তির ন্যায় আবার তিনি আরম্ভ করিলেনঃ—

"একটা প্রধান কথা এই—মনোমধ্যে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বিভ্রম পোষণ না করা.....Hagne নগরের অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল,—যাহাকিছুর সহিত কোন দেশের মানসম্ভ্রম বা জীবনযাত্রার সংস্রব আছে তাহা আলোচনার বাহিরে রাখিতে হইবে.....আমরা এমন মনে করি না যে, যুদ্ধ একেবারেই উঠিয়া যাইবে···যদি কাল ফ্রান্সকে শত্রুরা আক্রমণ করে, আমি সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিব···Monetকর্ত্তৃক চিত্রিত ছবিগুলিকে প্রথম প্রথম লোকে বীভৎস-ভীষণ বলিয়া মনে করিত, কিন্তু এখন ঐগুলি মহার্ঘ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। তাই বল্‌চি! শান্তিও ঠিক এই রকম। যতদূর সম্ভব শান্তিমূলক উপায়ে আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনৈক্যের মীমাংসাচেষ্টা করি বলিয়া লোকে আমাদিগকে এখন উপহাস করে···আর কয়েক বৎসর পরে, উপহাস করিবে না। কিন্তু আমরা যেন কোন প্রকার বিভ্রম পোষণ না করি!

তিনি হস্ত উত্তোলন করিলেন, মাথা নাড়িলেন, গোঁফ ধরিয়া টানিলেন।—তাহার পর বলিলেন;—"আমরা জাপানের

উপর কি-প্রভাব প্রকটিত করিতে পারিয়াছি ?”

* *
*

এইমাত্র আমি যে-শান্তিবাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, তিনি শান্তি-বাদীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম শান্তিপ্রবণ ! আর তিনি আপনার ছবি তুলাইতেই ব্যস্ত। তাহার পর যে শান্তিবাদীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার শান্তির বিভ্রম-মোহটা ছুটিয়া গিয়াছে। এখন কেবল একজনের দর্শন বাকী রহিল—তিনি ইংরেজ,—Mr. Thomas Barclay, তিনি প্যারিসের ইংরাজি-চেম্বার-অফ্-কমার্সের সভাপতি এবং “হৃদ্যতা-মূলক সন্ধি” স্থাপনের প্রকৃত উদ্যোগী। Bedford-হোটেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেখানে চা-পানের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লোকটি বেঁটেখেটে, চট্‌পটে, চঞ্চল-প্রকৃতি, গ্যাঁটাগোঁটা, দাড়ী-ওয়ালা, একটু খঞ্জ। একটা টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট। তাঁহার সঙ্গে একজন মহিলাও সেইখানে বসিয়া আছেন। Barclay তাঁহার মন হইতে কোন আশা অন্তর্হিত হইতে দেন নাই, এবং ভবিষ্যতের উপর তাঁহার বিশ্বাসও অক্ষুণ্ণ ছিল। লোকটি খুব ব্যস্ত ও কাজের লোক। তিনি অকেজো গোড়া-পত্তনের কথা লইয়া সময়ের অপব্যয় করেন না! তিনি চায়ের পেয়ালায় চা ঢালিলেন, একটি মাখন-মাখা তোষ-রুটি গ্রহণ করিলেন এবং দোলনা-চৌকিতে বসিয়া আনন্দে দুলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন ;—বিভিন্ন আকারের শাসন-তন্ত্রের বাহিরে, গণতন্ত্রপ্রধান দেশ-সমূহের শিল্পী, বণিক ও শ্রমজীবিদিগকে লইয়া এমন একটি শক্তিশালী দল গড়িয়া তুলিতে চাই যাহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করিয়া তুলিতে পারিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ রক্ষার্থে ধর্ম্মযুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সকল দেশেরই অধিকাংশ লোক সর্ব্বপ্রকার শান্তিময় উপায় অবলম্বন করিবার জন্য কৃতসংকল্প' যুদ্ধবিগ্রহ গণতন্ত্রের অনুকূলে কখনই কিছু নিষ্পত্তি করে নাই। যুদ্ধ কেবল সরকারী ঋণ বাড়াইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ প্রত্যেকের দেয় রাজকর বাড়াইয়াছে। আমিই গণতন্ত্র-মণ্ডলীকে এই মৎলবটা দিয়াছি যে, তাহাদিগের হাতেই তাহাদিগের অন্তর্জাতীয় ফলাফল নির্ভর করিতেছে। পররাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রনীতিপরিচালন এখন আর বিকৃতস্বায়ু, নারীপ্রকৃতি, শুধু পাঁচ ঘটিকার চা-প্রভৃতির নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে পটু সেই সব উচ্চ শ্রেণীর লোকের কাজ নহে।

মধ্যে মধ্যে তাঁহার সেই সঙ্গিনী মহিলাটি একটু মাথা নাড়িয়া, অথবা একটা ইংরাজি শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কথায় সায় দিতেছিলেন। তাঁহার কথা আর ফুরায় না—অবিরাম গতিতে চলিয়াছে।—“আমি ব্যবসায়ী লোকদিগকে বিশ্বাস করি :—ইহারা বেশী খাঁটি—কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহাদের চরিত্র পরিশোধিত হয়—তা ছাড়া উহারা বেশ কাজের লোক। এই জন্যই আমি ব্যবসায়ী লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছি। যেমন আমার মতে, তেমনি তাহাদের মতেও যুদ্ধ-জিনিষটা

কাজের লোকের মত' কাজ নহে। যেমন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তেমনি আমেরিকাতেও, আমার এই প্রচারকার্য্যে তাহাদের ঔৎসুক্য জন্মিয়া দিয়াছি, এবং সেই সঙ্গে Exchange ও Chamber of Commerceকেও কতকটা আমার মতে আনিয়াছি। অতএব মনে করিয়া দেখ, আমি তিন বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা ঘনিষ্টতা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি—আরও সমর্থ হইয়াছি.....

হঠাৎ এইখানে থামিলেন—তাঁহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইল, তাহার ললাটে একটা রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

—এই ইংঙ্গ-ফ্রাঙ্ক সন্ধিটা আমার দ্বারাই হইয়াছে, অথচ যাহারা ইহার কিছুই করে নাই তাহারাই ইহার গৌরবের দাবী করিতেছে ; তাহারাই ইহার জন্য সম্মান লাভ করিতেছে। মহিলাটি খুব আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন :—

ঠিক্ ঠিক্! এই Estournellesকে ওরা মুদ্রা পুরস্কার দিতে চেয়েছিল। আপনাকে ফরাসী নাইটের উপাধি দিল না, আর এখন,—যে ব্যক্তি আপনার পরে এসেছে সেই এতুর্নেল্‌কে কিনা ওরা জয়মাল্যে ভূষিত করলে।

টমাস বার্ক্লে তাঁর দোলনা চৌকিতে আরও সজোরে দুলিতে লাগিলেন এবং ভঙ্গিসহকারে কাঁধ ঝাঁকাইলেন—(এই ভঙ্গির অর্থ—“এর উপায় কি ?”) তিনি বলিলেন :—

“—সোমবারের ভোজে, M. d' Estournelles-ই সমস্ত সম্মান পেলেন—“টোষ্টের” সময় আমার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হল না। এ যেন প্যারিসে আমাদের রাজার ভ্রমণের মত' :—আমিই সমস্ত প্রস্তুত করিলাম, আর যে কিছুই করে নাই সেই Avebury কি না সম্মান লাভ করিল। কিন্তু আমি এ সমস্তের বহু ঊর্দ্ধে ; আমি গণমণ্ডলীর জন্য কাজ করিতেছি।” মহিলা বলিলেন :—ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা ; কিন্তু ওরা...কি বলেন আপনি ?...দুর্ব্বল মানুষ বই ত নয় ; মানুষের স্বভাব কোথায় যাবে..... ওরা অবশ্য অনায়াসেই M. Barclayকে ফরাসী নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতে পারিত।”

আমি মনে মনে করিলাম ; বিশ্বজনীন শান্তিরূপ এই বিরাট ব্যাপারটা কাজে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, Thomas Barclay ও M. d', estournelles এঁদের দুজনের মধ্যে কিরূপে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে তাহা ভাবা উচিত ছিল না কি ?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লাইকা

(কাহিনী)

সেদিন অধিক রাত্রিতে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যে আশায় আসিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল না,—দেখিলেন দীপছায়ার নিকট নতনয়না তন্বী প্রতিদিনের ন্যায়ই অপেক্ষা করিতেছে! রাজা আসিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিলেন। সম্মুখে রাণী বসিয়াছিলেন,--অনেকক্ষণ মৌনের পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—শুনিলাম জামাতা আসিয়াছিলেন—কথাটা কি সত্য?

রাজার মুখে বিরক্তিচিহ্ন দেখা দিল—তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, "হাঁ"—

রাণী বলিলেন, "তবে গেলেন কেন?"—

"তাহার ইচ্ছা!"

বিস্মিতভাবে রাণী বলিলেন—"তাহার ইচ্ছা?—তুমি বারণ কর নাই?"—

"না"—; রাজার স্বরভঙ্গিতে রাণী আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না! আবার গৃহ নীরব হইয়া উঠিল, রাজা আচমন করিলেন,—স্বর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধি জলধারা কন্যা পিতার হাতে ঢালিয়া দিল। রাজা একবার অলক্ষ্যে কন্যার প্রতি চাহিলেন, তাহার মুখশ্রী পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত! সে অচঞ্চলচরণে গিয়া পিতাকে তাম্বুলপূর্ণ বিচিত্র পাত্র অগ্রসর করিয়া দিল,—তাহার পর মাতাকে প্রশ্ন করিল তিনি এক্ষণে আহার করিবেন কিনা? তিনি অনিচ্ছা জানাইলেন এবং তাহাকে আহার করিবার জন্য অনুমতি দিলেন,—সে পিতার আহার্য্য পাত্র হইতে কিছু প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল!

তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাজা বলিলেন, "রাণী কবে তোমার বুদ্ধি হইবে?—তুমি ওই প্রশ্ন কেন করিয়াছিলে?"—

একটু অপ্রস্তুতভাবে রাণী বলিলেন—"তাহা কি বারি জানে না মনে কর?"—

রাজা আর কিছু বলিলেন না; সে রাত্রি তাঁহার নিদ্রা ছিল না—পুষ্পকোমল সুখসেব্য শয়নে রাজরাজ সেদিন কণ্টকযন্ত্রণা ভোগ করিলেন—রাজমহিষী গোপনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন!

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, রাজভবন পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্যউদ্বেল,—জয়ধ্বনিমুখর! প্রভাতে সন্ধ্যায় তেমনি সানাইএ মধুর রাগিণী গাহে—তেমনি মধুর ভৈরবী, তেমনি কোমল পুরবী? কিন্তু হায়! ভৈরবীতে সে অরুণোজ্জ্বল প্রভাতালোকপুলকিত নব-জাগরণোল্লাস কই?—গঙ্গাবক্ষে প্রতিবীচি-বিক্ষেপে যাহা নাচিয়া ছুটিত—প্রতি লতান্দোলনে যাহা পুষ্প গন্ধ বিতরণ করিত সে জাগ্রৎ রাগিণী ত আর বাজে না!—এ কোন্ শোকগাথা, এ কোন্ রোদন-রাগিণী—যাহা প্রতি মূর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া ডুব দিয়া—জাহ্নবীতটে প্রহত হইতেছে?—হায়, পুরবী যে এত তন্দ্রাময়, এত অলস, এমনভাবে সকল কার্য্যে উদ্যমহীনতা আনিয়া দেয় তাহাও কেহ জানিত না?—

বৎসর অতীত হইল। পরমাদরপালিতা রাজকন্যার দেহে বসন্তের উন্মেষ হইতেছিল,

অঙ্গে শিশু শালতরুর পেলবসৌন্দর্য্য—কপোলে সদ্যস্ফুট পলাশের আরক্ত জ্যোতি,—কিন্তু—হায়! নয়ন দুটি বসন্তকানন প্রবাহিনী শীর্ণ-তটিনীর ন্যায় ম্লানকান্তিহীন। হায়!

বারি প্রত্যহ প্রভাতে জলে নামিয়া পদ্ম-চয়ন করিত, জাতির স্থূলহার গাঁথিয়া দিত, বিল্বদলে চন্দনচিত্র করিয়া শিবপূজার জন্য সাজাইয়া রাখিত,—কিন্তু নিজে আর মহাদেবের পূজা করিত না! পুরোহিত পূজা করিতেন সে নিবিষ্টমনে বসিয়া দেখিত, পূজান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইত!—কিন্তু স্বয়ং আর পূজা করিত না!

তাহার জ্ঞাতিভগিনী ও বাল্যসহচরী শারি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল--একদিন প্রশ্ন করিল, বারি তুই আর পূজা করিস না কেন?—

বারি মৃদু হাসিল—কোন উত্তর দিল না। তখন শারি কাছে আসিয়া আবার বলিল "বলিবি না বহিন্?" সে আদরে বারি নতমুখী হইল,—বলিল—,বলিব আর কি দিদি, ভোলানাথ কি আমার পূজা গ্রহণ করিবেন যে আমি পূজা করিব!"

"তোর পূজা গ্রহণ করিবেন না?—বারি তুই কি বলিতেছিস্?"

ঠিক বলিতেছি বহিন্! ভাবিয়া দেখ।" বারি অন্যমনা হইল,—শারি তাহার স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল,—বলিল, "কি ভাবিব বারি? ইহার মধ্যে ভাবিবার কি কথা আছে?—তোর পূজা মহাদেব লইবেন না;—ইহাও কি ভাবিবার কথা?—

বারির স্তব্ধ মুখে বিদ্যুতের ন্যায় চকিত হাসি দেখা দিল,—অকম্পিত কণ্ঠে সে বলিল

৬

"যে নারী স্বামী পূজা করে নাই—দেবপূজায় তাহার কি অধিকার ভগিনি!"

শারি চমকিত হইল, ব্যস্তস্বরে বলিল—ও কি কথা—ও কি কথা বারি!—তুই স্বামীপূজা করিস্ নাই কি? স্বামীই তো তোর পূজা লইলেন না—সে নিষ্ঠুর——"

সর্পদংশিতের ন্যায় আহততাবে বারি পশ্চাৎপদ হইল,—স্থির স্বরে বলিয়া উঠিল—"চুপ! তুমি জান না দিদি!—তিনি দেবতা—তিনি আমার পূজা লইতে আসিয়াছিলেন—আমি—আমি—"

বলিতে বলিতে বারি থামিয়া গেল; দুই হাতে মুখ চাপিয়া মাথা হেঁট করিল। শারি বিস্মিত হইল, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বারি বারি দিদি আমার!—"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বারি বলিল "আমায় আদর করিস্ না দিদি, আমি কারও আদরের পাত্র নই।"

"তুই আদরের পাত্র নস্—? পিয়ারি! দুলালি!—"শারি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। তখন স্নেহের আদরে বারির স্তব্ধ হৃদয় গলিয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল,—সখীর সাক্ষাতে সে এই প্রথম অশ্রুত্যাগ করিল! শারি জানিত যে বারি অন্তরে অন্তরে ব্যথা পায়—কিন্তু এতটা জানিত না!—সে তাহার বেদনার আধিক্য দেখিয়া ভীত হইল।—

৬

শারির নিকট রাজরাণী সমস্তই শুনিলেন। তিনি এই বিবরণ অশ্রুজলে ভাসিয়া স্বামীকে জানাইলেন! তখন রাজাধিরাজের জ্ঞান

হইল শুধু ধনে কাহারও সুখ হয় না!—আরও বুঝিলেন স্বামী জীবিতমানে স্বামীত্যক্তার ন্যায় দুর্ভাগিনী জগতে বিরল! বিধবা পরকাল চাহিয়া ঈশ্বর চাহিয়া সুখী হইতে পারে—কিন্তু এই—জীবন্ত দেবতার অধিষ্ঠানেও তাহার পূজাবিহীনা নারী কি বলিয়া আপনার অন্তরকে প্রবুদ্ধ করিবে?—তখন—সেই একমাত্র অপত্যের পিতা—তাঁহার সন্তানের জীবনের অন্ধকার কল্পনা করিয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলেন!—

গোপনে রাজদূত আবার ছুটিল, কিন্তু কোথায় লাইকা? সন্ধান হইল না, দূত ফিরিয়া আসিল! তাঁহার গুপ্তচর ভারতময় কিন্তু কেহই সন্ধান দিতে পারিল না, সকলেই বলিল, "তাঁহাকে দেখিয়াছি—কিন্তু এখন নয় বহুপূর্ব্বে। হতাশ হইয়া রাজা স্থির হইলেন, কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত কেহ জানিল না! রাজপুরে প্রকাশ্যে লাইকার নাম গ্রহণে রাজার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত ছিল!—

কাল চক্র আবার দুইবার ফিরিল,—দুই বৎসর চলিয়া গেল!—রাজকন্যার প্রতি আর চাওয়া যায় না, শরীরে অযত্ন এখন স্পষ্ট প্রকাশিত,—অন্তরের গ্লানি সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট।

অবশেষে মহারাজ তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। দুহিতা পত্নী সহিত স্বল্পমাত্র সঙ্গী সহায়ে তাঁহারা বহির্ভ্রমণে চলিলেন। রাণী দেখিলেন কন্যার মুখ যেন কতকটা মেঘমুক্ত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশ্যে করজোড় করিয়া তিনি শত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহাদের এই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য বিফল না হয়!—

ছদ্মবেশে রাজপরিবার অনেক দেশ ফিরিল, কেহ জানিল কেহ জানিল না যে অর্দ্ধ ভারতের করগ্রাহী নরপতি সেখানে আগমন করিয়াছিলেন!—এইরূপে এক বৎসর কাটিল। অনেক দেশ ফিরিয়া তাঁহারা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময় বাধা ঘটিল, বারি বলিল, সে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না তাহাকে তীর্থবাস করিতে আজ্ঞা হোক—! এই কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, কন্যাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সংসারে স্বামীই কি সর্ব্বোপরি? পিতামাতা কি কেহই নহেন?—"

কন্যা পিতার স্বর শুনিয়া তাঁহার রোষের মাত্রা অনুভব করিল; সে বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া থাকিল,—রাজা বলিয়া গেলেন—"শোন বারি! আমিই ইচ্ছা করিয়া তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছি, কিন্তু তথাপি বলিতেছি তুমি সে বন্যপশুকে ভুলিয়া যাও!—সে তোমার অযোগ্য—সে আমার জামাতা হইবার অযোগ্য! সে যাদুকর, আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল,—তাহাই আজ আমায় এ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে!—আর আর ইহাও শোন, যদি পুনর্ব্বার সেই নরাধমের প্রসঙ্গ আমার নিকট উপস্থিত হইবার কারণ ঘটাও বারি,—তুমি যে আমার কন্যা ইহাও আমি বিস্মৃত হইব!"

রাজা চলিয়া গেলেন; রাণী নিকটেই ছিলেন, কন্যার মুখ দেখিয়া তাহার অবস্থা বুঝিলেন,—তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—"ওমা, ওমা! বারি, কি হইল মা?—"

বারি কিছু বলিতে পারিল না, রাণী কাঁদিয়া অধীর হইলেন।

* * *

গভীর রাত্রি, রাজার পটাবাসের সকলেই নিদ্রিত বারি উঠিয়া বাহিরে আসিল। গঙ্গার তীর বহিয়া কিছুদূর চলিল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে দুইজন সন্ন্যাসিনী নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাদের কে ঠেলিয়া তুলিল, একজন উঠিয়া বলিলেন, "একি মা তুমি আসিয়াছ?"

বারি বলিল, "হাঁ মা, আসিয়াছি, গৃহবাস আমার অসহ্য হইয়াছে!" সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিলেন,—বলিলেন "মা, তুমি রাজনন্দিনী—পথের কষ্ট সন্ন্যাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কি?"

"পারিব! কি সুখে আছি মা! পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া আসিয়াছি—আর নিজের এইটুকু সামান্য কষ্টই কি এত বড়?" বলিতে বলিতে বারি কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন লাইকাকে আমি প্রায়ই দেখিতে পাই; এখন চল দেখি তোমার অদৃষ্ট যদি—"

বাধা দিয়া বারি বলিল, "অদৃষ্ট আর কি মা! যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই, এ দেহ আর রাখিব না। আমি যে রাজ-রাজেশ্বরের মুখ হাসাইয়া আসিলাম এ কথা কি ভুলিব?"

দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী যুবতী,—সে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল এইবার বলিল,—"আসিয়াছ, স্বামী অন্বেষণে, কিন্তু বার বার তুমি নিজের পিতৃপরিচয় কেন দিতেছ ভগিনি!—"

বারি বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল—বয়োধিকা সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ছি সাবিত্রী! তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ—এই বালিকা কি মনোকষ্টে গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহা তোমাদের বুদ্ধির অগম্য!"

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বারির হাত ধরিল—বলিল, "না কিছু অন্যায় বলি নাই মা! কি বল তুমি ভগিনি!—"

অতি কাতরস্বরে বারি বলিল "না কিছু অন্যায় নয়—কিছু অন্যায় নয়?—কিন্তু আমি অহঙ্কার করিয়া বলি নাই ভগিনি!—কিন্তু আমি কি করিয়া ভুলিব যে আমার পিতা-মাতার আমি একমাত্র সন্তান!"

মৃদু হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "হিন্দু-কন্যা! কেন ভুলিতেছ যে তুমি সাবিত্রী গৌরী সীতার দেশে জন্ম লইয়াছ?—কেন ভুলিতেছ তুমি বেহুলার ভগিনি,—তাঁহাদের পিতার কয় সন্তান ছিল রাজকুমারি! যাহার নামে ঘর ভুলিয়াছ তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া আজ সব ভুলিতে হইবে। তোমার—পিতা-মাতা?—তাঁহাদের নিয়তির ফল তুমি কি করিয়া খণ্ডন করিবে বল?—তাই বলিয়া কি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে?—জান কি যে—"

অপরা সন্ন্যাসিনী এবারও তাহার কথায় বাধা দিলেন,—বলিলেন, "স্থির হও মা, রাজকুমারী এখন শোকাতুরা—"

তখন সবেগে বারি বলিল—"না না জননি! শোক ইহাতেই উপশম বোধ করিতেছি!—কে তুমি? দেবী সাবিত্রী?—কে তুমি আমায় ভগিনী সম্বোধন করিলে? বল আবার বল তোমার এই অমৃতময় কথা আমি আবার শুনিতে চাই?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল!—বলিল, আমি মার মুখে তোমার কথা শুনিয়া অবধি ভগিনি, তোমায় বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। ভোগৈশ্বর্য্য-পালিতা রাজকুমারীর চিত্তবৃত্তি এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—ইহা ভাবিয়া আমি বড় আনন্দিত

হই,—তাই তোমার মুখে ওই সব কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইয়াছিল ভাই? বড় উঁচু কথা বলিয়াছি, তুমি কি রাগ করিলে দিদি!"

বারি বলিল "না না—আমি রাগিব কেন? আপনি"—

সাবিত্রী তাহার মুখে হাত চাপিয়া কহিল—"যাও ভাই, ওকি কথা?—আমি বুঝি তোমার অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বড়,—তাই আমায় আপনি মহাশয় করিতেছ?—"তাই হবে, তোমার নাম কি ভাই? তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?—"

"তা যাই নাম হোক্—শোন, আমায় কেহ বুড়ী বলিলে আমার বড় রাগ হয়, তাই আমার কাছে যখন থাকিবে তখন বুঝিয়া কথা বলিও!"—

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন "চুপ পাগলের মেয়ে! মা বারি? আমার এই পাগল মেয়েটি বড় বাচাল মা, ইহার কথা তুমি কাণে করিও না!"

বারি সেই স্বচ্ছ অন্ধকার ভেদ করিয়া তৃষিতনয়নে সাবিত্রীকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, সে ভাবিতেছিল—"অন্ধকারে এ কে আলোকময়ী?—মরুভূমে এ কোন মন্দাকিনী-ধারা?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—চল মা! আমরা এই আঁধারেই চলিয়া যাই, নতুবা প্রভাতে তোমার পিতা তোমার সন্ধান করিবেন।—উঠ সাবিত্রী! বারিকে একখানি গৈরিক বস্ত্র দাও। যাও মা, তুমি বেশ পরিবর্ত্তন কর!—

অনতিবিলম্বে সেই তিন সন্ন্যাসিনী গঙ্গাতীর প্রবাহী পথে অন্তর্হিত হইল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

ভাল তোমা বাসি যখন বলি

(১)

"ভাল তোমা বাসি" যখন বলি-
তোমায় ছলি।
প্রেমের কলি,
মরমে আমার সরমে ভয়ে
ফোটেনা রক্ত কমল হয়ে॥

(২)

"ভাল নাহি বাসি" যখন বলি
আপনা ছলি।
প্রেমের কলি,
ভয়ের বাধার আঁধার ঘরে
আশার বাতাসে জীবন ধরে॥

(৩)

ভাল তোমা আমি বাসি না বাসি,
কাছেতে আসি।
তোমার হাসি,
মনের কোণেতে প্রদীপ জেলে
নিতি নব দেয় আলোক ঢেলে॥

(৪)

তোমা ছেড়ে যবে দূরেতে আসি,
তোমার বাঁশি
আকাশে ভাসি,
করুণ সুখেতে ভোরে ও সাঁঝে
ব্যথার মতন বুকেতে বাজে॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মেজর থুরির নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞান

সম্প্রতি য়ুরোপে ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক গঠন প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার শারীর-স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি নিরূপণ ও তাহার জীবন যাত্রাপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার এক বৈজ্ঞানিক রীতি প্রচলিত হইতেছে। জীব বিজ্ঞানের এই অভিনব বিদ্যার উদ্ভাবক লিয়েয়োঁ প্রদেশের ফরাসী ডাক্তার সিগড্ (Dr Sigoud) নামক একজন অপেক্ষাকৃত অনতিপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। মেজর থুরি (Major M. A. Thooris) ইহার নিকট এই বিদ্যার সন্ধান পাইয়া মনুষ্যের হিতার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমরা এই অভিনব বিদ্যাকে শারীর-গঠন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান নামে (Morphology) অভিহিত করিতে পারি।

সকল মনুষ্যেরই দেহের গঠন ঠিক এক নহে। কাহারও মস্তক বৃহৎ, কাহারও কটিদেশ স্থূল, কাহারও বক্ষ প্রশস্ত এবং কাহারও বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুগঠিত এবং মাংসপেশীবহুল! এইরূপ শারীরিক গঠনভেদে মানুষকে মূলতঃ চারি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মেজর থুরি এই চারি শ্রেণীর মনুষ্যের আদর্শ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথাক্রমে শ্বাসক্রিয়াপ্রধান, (Respiratory,) পরিপাকক্রিয়া প্রধান, (Digestive) মাংসপেশী প্রধান (Mascular) ও মস্তিষ্কপ্রধান (Cerebral) নামে সংক্ষেপতঃ অভিহিত করিয়াছেন।

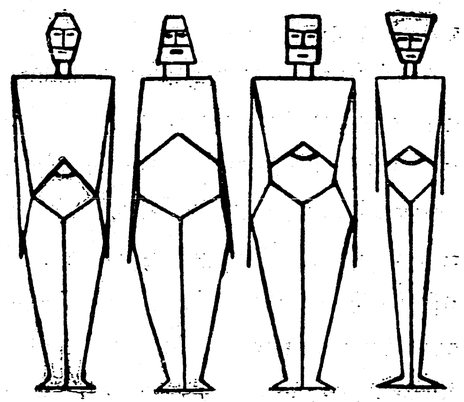

ক খ গ ঘ
শ্বাসক্রিয়া-প্রধান পাকক্রিয়া-প্রধান মাংসপেশী-প্রধান মস্তিষ্ক-প্রধান

প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট 'ক' চিহ্নিত চিত্র শ্বাস ক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির প্রতিকৃতি। ইহার স্কন্ধদেশ প্রশস্ত এবং দেহ পদনিম্ন পর্য্যন্ত ক্রমসূক্ষ্ম। এই আদর্শানুরূপ দেহধারী ব্যক্তির ফুসফুস তাহার শরীর যন্ত্রের মূলাধার। বায়ুকোষের সুস্থ সতেজ ক্রিয়ার উপরই ইহার জীবনের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে এইরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

'খ' চিহ্নিত মূর্ত্তি পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির আদর্শ প্রতিলিপি। ইহার শরীরের নিম্নাংশ স্থূল, উদরের তলদেশ স্ফীত ও বৃহৎ এবং কটি সুপ্রশস্ত। পরিপাক যন্ত্রগুলিই

ইহার শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় অংশ এবং ইহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে উদরের পরিচর্য্যার উপর নির্ভর করে। ইহার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিলে, কিংবা ইহার শরীরের অনুপযোগী আহার্য্য ইহাকে প্রদান করিলে, এই ব্যক্তির দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ইহার মানসিক তেজ অন্তর্হিত ও কর্ম্ম-ক্ষমতা লুপ্ত হইবে।

'গ' চিহ্নিত ব্যক্তির শরীর মাংসপেশীবহুল। প্রকৃতি দেবী ইহাকে কর্ম্ম করিবার জন্যই যেন সৃষ্টি করিয়াছেন। সুগঠিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যথোচিত পরিচালনা করিতে না পাইলে, এই ব্যক্তির স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক অল্প খাদ্যে ইহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু ইহাকে কেরাণীর টুলে বসাইয়া আফিস ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে দেখা যাইবে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঘ) চিহ্নিত চিত্র মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তির প্রতিকৃতি। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপরিপুষ্ট কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি অপরিমিত। এই ধরণের লোক যখন জীবনে অবসাদ অনুভব করিয়া মুসড়িয়া পড়ে, তখন তাহার শরীরের পরিচর্য্যা করিয়া কিংবা তাহাকে তেজস্কর ঔষধাদি সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ হয় না। মস্তিষ্কই এইরূপ ব্যক্তির শরীর যন্ত্রের মূলাধার। সুতরাং ইহাকে পুনর্জ্জীবন দিতে হইলে ইহার মানসিক চিন্তার ধারা বিভিন্ন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া ইহার মস্তিষ্ক নব নব ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে।

উপরে যে চারি শ্রেণীর বিভিন্ন মনুষ্যের উল্লেখ করা গেল, মুখের আকৃতি এবং ভাব দেখিয়াও তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধ করা যায়। শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির মুখমণ্ডল অনেকটা বিষমকোণ চতুর্ভুজের ন্যায়; গণ্ডের অস্থিদ্বয়ের নিকট উহা প্রশস্ততম। শ্বাসযন্ত্রই এই ব্যক্তির জীবনীশক্তির মূল ভিত্তি; এই হেতু নাসিকা এবং নাসারন্ধ্রই ইহার মুখমণ্ডলের প্রধান ভাবব্যঞ্জক অংশ। পাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির মুখ দন্তপাটির নিকট সমধিক প্রশস্ত, এবং মুখের সমগ্র ভাব মুখগহ্বরের নিকট কেন্দ্রীভূত। কোন আয়ত কটি, লম্বোদর ব্যক্তির বদনমণ্ডলের ঊর্দ্ধাংশ আবরিত করিয়া দেখিবেন, তাহার মুখ আননের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক ভাব অভিব্যক্ত করিতেছে। মাংসপেশীপ্রধান ব্যক্তির মুখমণ্ডল সমচতুরস্র; তাহার দৃষ্টি সরল এবং স্বচ্ছ। মস্তিষ্ক প্রধান ব্যক্তির আনন দীর্ঘ এবং মস্তিষ্ক গম্বুজাকৃতি। সুপ্রশস্ত ললাটদেশ এবং করোটি ছাড়িয়া দিলে, ইহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাবহীন।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জীবন ধারণ করিতে মনুষ্যের যে চারিটি প্রধান উপাদান আবশ্যক—বায়ু, খাদ্য, গতি এবং ভাব—উপরি বর্ণিত চারি শ্রেণীর মনুষ্যে তাহার কোন একটির আবশ্যকতা অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা অত্যধিক।

অতঃপর, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, এই নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কত উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। মনে করুন, কোন প্রশস্তবক্ষঃ শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। ঔষধ প্রয়োগে ইহার বিশেষ কোন ফল হইবে না। কিন্তু ইহাকে নগর হইতে, পল্লীতে কিংবা সমতল

ক্ষেত্র হইতে পার্ব্বত্যদেশে প্রেরণ করুন, দেখিবেন শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ হওয়ায়, ইহার অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হইয়াছে। আবার, কোন পরিপাকক্রিয়া প্রধান ব্যক্তির ক্ষয়কাশ রোগ দেখা দিলে, তাহার আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিয়া পথ্যের উৎকর্ষ সাধন করিলেই, দেখা যাইবে তাহার ফুসফুস নীরোগ হইয়াছে। এইরূপ কোন মাংসপেশী-প্রধান ব্যক্তি মানসিক অশান্তি ও দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পাইলে প্রতিদিন ২।৩ ক্রোশ ভ্রমণে তাহার ব্যাধি আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, কোন মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি রক্তহীনতা ও মানসিক অবসাদে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে, যদি তেজস্কর, বীর্য্যবান্ ঔষধে ও কোন ফল লাভ না হয়, তাহা হইলেও পীড়িত ব্যক্তির মানসিক চিন্তা অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করিলে, নানা সুন্দরভাবে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিতে পারিলে, তাহার সুস্থভাব ফিরিয়া আসিবে।

কে কিরূপ পরিবেষ্টনের মধ্যে বাস করিবে এবং কাহার পক্ষে কিরূপ প্রণালীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ বাঞ্ছনীয়, তাহাও নিরূপণ করিতে শারীরগঠনতত্ত্ববিজ্ঞানের মূল্য বড় কম নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মাংসপেশী প্রধান মনুষ্যের ব্যাঙ্কে কাজ করা কখনও উচিত নহে। কারণ, প্রচুর অঙ্গ সঞ্চালনের উপরই যাহাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, কেরাণীর টুলে বসিয়া থাকিলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হানি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে, ব্যাঙ্কের কেরাণী-গিরি কোন শ্বাসক্রিয়াপ্রধান বা পরিপাক-ক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর নহে—অবশ্য যদি আফিসঘরে পর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু থাকে এবং অগ্নিপ্রধান ব্যক্তি জঠরাগ্নির প্রচুর ইন্ধন প্রাপ্ত হন। এদিকে মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি প্রচুর অঙ্গসঞ্চালন ব্যতিরেকে এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন থাকিয়াও মস্তিষ্কের সম্যক্ পরিচালনা করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

বিভিন্ন শরীরগঠনবিশিষ্ট ছাত্রগণকে একই পরিবেষ্টনের মধ্যে এবং একই প্রণালী অনুসারে বিদ্যাদান যে কত দূষনীয়, তাহা এই নূতন বিদ্যার আলোকে ক্রমেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে!

এই অভিনব বিজ্ঞানের সারবত্তা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেজর থুরি তাঁহার গবেষণাপ্রসূত সত্য-সমূহের মূল্যবত্তা সম্বন্ধে ফরাসী দেশের সমর বিভাগের মন্ত্রীসভাকে এতদূর বিশ্বাস করাইয়া-ছেন যে তাঁহার পরামর্শমত শরীরগঠন দেখিয়া ফরাসী সৈন্যদিগের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিবার উপযোগিতা স্থিরীকৃত হইতেছে।

মেজর থুরির মতে শ্বাসক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তি পদাতিক সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। এইরূপ ব্যক্তির গভীর বক্ষঃ, প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ এবং সবল বায়ুকোষ পদাতিকের কার্য্যে ইহাকে স্বতঃই যোগ্যতা দান করে। আবার, পরিপাকক্রিয়াপ্রধান ব্যক্তিকে প্রকৃতিদেবী স্বভাবতঃই অশ্বারোহী হইবার উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রশস্ত কটিদেশ শরীরের ভারকেন্দ্র নিম্নাভিমুখী করে; সুতরাং লম্বোদর স্থূলকটি ব্যক্তি অশ্বারোহণ করিলে, বৃষস্কন্ধ এবং প্রশস্তবক্ষ ব্যক্তির ন্যায়

ঝুঁকিয়া পড়ে না পরন্তু অশ্বপৃষ্ঠে তাহার আসন দৃঢ় ও স্বাভাবিক ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, মাংসপেশীবহুল দেহই শরীর গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি এবং এইরূপ দেহধারী ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিক হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। মাংসপেশী-প্রধান ব্যক্তির বিশেষত্ব এই যে যে কোন প্রকারের অঙ্গ সঞ্চালনে এই লোক নিজেকে উপযোগী করিয়া লইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিকে অশ্বারোহণ করিতে, প্রস্তর ছুঁড়িতে বা ভার তুলিতে দাও, দেখিবে যে অবস্থায় যেরূপ শারীরিক প্রক্রিয়া বিজ্ঞান সম্মত, এই ব্যক্তি স্বাভাবিক সংস্কার বশে অতি সহজ ভাবে তাহাই করিতেছে।

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক মেজর থুরির গবেষণা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলেন "মেজর থুরি চারি শ্রেণীর মনুষ্যের যে আদর্শ প্রতিকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে পরিপাক-ক্রিয়া প্রধান ব্যক্তির মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র এবং মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তির শরীর শীর্ণ করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে দীর্ঘ ও শীর্ণ দেহ এবং প্রশস্ত ললাট দেহ মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু ইতিহাস নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে প্রচুর মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কোন বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা বরং অনেকাংশে পরিপাকক্রিয়া প্রধান ব্যক্তির আদর্শের অনুরূপ। অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে, তাঁহাদের দেহ-পরিপাক ক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়া প্রধান এই উভয় আদর্শের সমবায়। নেপোলিয়ন বুঢ়োরস্ক ও বৃষস্কন্ধ ছিলেন অথচ তাঁহার কটিদেশ স্থূল ও বিস্তৃত ছিল। সিসিল রোড্‌স্ (Cecil Rhodes) এবং জনসনও ঐ একই প্রকার আদর্শের ছিলেন। ইঁহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি কেবলমাত্র উদরের পরিচর্য্যার উপরই নির্ভর করে নাই। অবশ্য ইঁহারা (বিশেষতঃ জনসন) ভোজ্য অনুরাগী বড় কম ছিলেন না। কিন্তু তথাপি আবশ্যক হইলে ইঁহারা অতি সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর আহার্য্য গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে ইঁহাদের মানসিক তেজ ও শক্তির কোন ব্যতিক্রম দেখা যাইত না।

"যাহা হউক, মেজর থুরি শ্বাসক্রিয়া প্রধান ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অনেক প্রশস্তবক্ষঃ ব্যক্তি যে অবস্থায় ক্ষয়কাশ রোগগ্রস্ত হইয়াছে, সেই একই অবস্থায় পড়িয়াও অনেক ক্ষীণবক্ষঃ ব্যক্তি অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার মস্তিষ্ক-প্রধান ব্যক্তি পর্য্যাপ্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহার বিশেষভাবে শারীরিক ব্যায়াম করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই, মেজর থুরির এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য।"

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

মোগল-আমলের বিদ্বজ্জন ও কবিবৃন্দ

মোগল আমলের "নবজীবন"-যুগে (Renaissance) বিদ্বজ্জন ছিল, শিল্পী ছিল, কবি ছিল।

আইন-ই-আকবরী ঐ সময়কার বিদ্বজ্জন দিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে যথা—যাঁহারা বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের রহস্য বুঝিয়াছেন; যাঁহারা বাহ্যজগৎকে অবজ্ঞা করিয়া নিজ অন্তরাত্মার অনুশীলনে প্রীতিলাভ করেন; যাঁহারা একাধারে দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বেত্তার আসনে উপবিষ্ট হইয়া যে-সকল বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ও যে-সকল বিজ্ঞান সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন; যাঁহারা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে সংশয়ের ধূলিজালে কলুষিত বিবেচনা করেন এবং এই হেতু কেবল মাত্র দর্শনের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকেন; যাঁহারা ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত প্রত্যাদেশের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখেন।

প্রথম শ্রেণীর ২১ জনের মধ্যে, আবুল-ফজলের পিতা শেখ-মুবারক সর্ব্বপ্রধান। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ১৪ জন পীর বা ধর্ম্মগুরু, তন্মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ১২ জন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য; তন্মধ্যে তক্ষন্দের হাফিজই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত—তিনি তুর্কদিগের ন্যায় কটিবন্ধে তূণ বাঁধিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন,—এবং সমস্ত মুসলমান-জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহাকে কোন উচ্চপদ প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। চতুর্থ শ্রেণীতে বিখ্যাত চিকিৎসকদিগেরই নাম পাওয়া যায়, যথা;—শেখ-বীণা ও তাঁহার পুত্র শেখ-হসন। পঞ্চম শ্রেণীতে আবুল-ফজল তাঁহার বিপক্ষগণকে স্থাপন করিয়াছেন—ঐতিহাসিক বদাওনী তাহাদের মধ্যে একজন।

যাই হোক, আকবরের উৎসাহদান সত্ত্বেও এবং বিবিধ ধর্ম্মের বাদবিসম্বাদ ও বিচিত্র সভ্যতার সংঘর্ষ সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর ভারতে কোন দার্শনিক প্রসূত হয় নাই; আরব, পারসীক ও য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে শিক্ষিত বিজ্ঞানাদির উন্নতি সাধন করিয়াছেন এরূপ কোন বিদ্বজ্জনও প্রসূত হয় নাই।

***

তদ্‌বিপরীতে, আকবরের যুগকে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা প্রায়ই ফার্সি ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন; তাহার মধ্যে প্রধান—আবুল ফজল ও বদাওনী; এই উভয় লেখকেরই শিষ্য ছিল, অনুকরণকারী ছিল।

সাদী ও হাফিজের অনুকরণে সাধু-সম্মত প্রাচীন ধরণে লিখিত হইলেও, তৎকালের কবিতা হৃদয়ের আবেগ ও মৌলিকতায় পূর্ণ ছিল।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারেরা পারস্য-ভাষা ব্যবহার করিতেন; যথা—ফইজি (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়)।

"ফইজির ভ্রাতা আবুল ফজল বলেন, ফইজি সৌম্য

দর্শন মধুরপ্রকৃতি, প্রফুল্ল উদারচিত্ত, অতীব কর্ম্মতৎপর ছিলেন; তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতে ভালবাসিতেন...তাঁহার জীবনের গাম্ভীর্য্য, তাঁহার আচরণের মাধুর্য্য তাঁহার প্রতিভার মহিমাচ্ছটাকে আরও সমুজ্জল করিয়াছিল। বিবিধ বিষয়ে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; আরবী ও ফার্সি গ্রন্থাদির জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী...তাঁহার মতে, ধনদৌলতের একমাত্র উদ্দেশ্য, মুক্তহস্ত দানের দ্বারা আপনাকে রিক্ত-হস্ত করা। এবং তাঁহার চক্ষে, দুঃখদুর্দ্দশা খোষ-মেজাজ-জাত একটি নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে। চির-পরিচিত, অপরিচিত, শত্রু ও মিত্র, সকলেরই জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। তাঁহার গৃহ দরিদ্রদিগের আশ্রম ছিল। আত্মরচনায় তিনি সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না, তাই তাঁহার রচনাবলী সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না। তিনি গর্ব্বিত ছিলেন, তিনি কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন না। তাঁহাকে কেহ আত্মশ্লাঘা করিতে দেখে নাই। নিজে প্রতিভাবান্ হইলেও পদ্যের প্রতি তাঁর বড় একটা আগ্রহ ছিল না, বিদগ্ধদিগের সমাজেও তিনি যাতায়াত করিতেন না। তাঁহার দর্শনতন্ত্র অতীব গভীর ছিল। স্বীয় নেত্র তৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু চিত্ত তৃপ্তির জন্যই তিনি গ্রন্থপাঠ করিতেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; এবং বিনাদর্শনীতে দরিদ্র রোগীদিগের সেবা করিতেন।

যে সকল কবিতায় তাঁহার সূক্তিমুক্তাগুলি দীপ্যমান, সেই সকল কবিতা কেহ বিস্মৃত হইবে না। আমার কাজের মধ্যে যদি কখন একটু অবসর পাই, আমি তখনই স্বীয় যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই লেখকের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বাছিয়া লই; এই নির্ব্বাচনকার্য্যে, যেমন এক দিকে সমালোচকের কঠোর দৃষ্টি প্রয়োগ করি, তেমনি বন্ধুর কোমল হস্তও প্রসারণ করি। আজ আমি যে কথা বলিতেছি তাহা ভাইয়ের হিসাবে,—সমালোচকের হিসাবে নহে। এই কবিতাগুলি আমার স্মরণ হইতেছে।"

তাহার পর, আবুল-ফজল কতকগুলি সুন্দর রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"হে মানব, মুদ্রার দুই পিঠের ন্যায়, তোমার উপর যুগল ছাপ মুদ্রিত:—আত্মা ও শরীর। তোমার প্রকৃতি?—দ্যুলোক হইতেও উচ্চতর, ভূলোক হইতেও নিম্নতর। চতুর্ভূতে গঠিত বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না, সপ্ত রাজ্যের দর্পণ বলিয়াও আপনার শ্লাঘা করিও না।

স্বর্গের প্রতিবিম্ব, মর্ত্ত্যের প্রতিবিম্ব যে তুমি, তুমি স্বর্গীয় হইতেও পার, পার্থিব হইতেও পার, নির্ব্বাচন-ভার একমাত্র তোমারই হাতে।

মুদ্রাটি সাবধানে ওজন করিয়া দেখ। তোমার বিবেকের তৌলদণ্ডটাই ঠিক:—অতএব এই তৌলদণ্ডই ব্যবহার করিবে।

প্রেমিক, তুমি কষ্ট পাইতেছ বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু তোমার জীবনটাই যে তোমার জ্বর-ব্যাধি, তোমার হৃদয়টাই যে তোমার জ্বর-ব্যাধি।

আমি ভালবাসি; আমার প্রিয়তমাই আমার ধমনীর রক্ত, আমার ক্ষত স্থানেরও রক্ত।

ওরে কাল, আমার 'সাকী'! এখনও কেন তুই খুৎ খুৎ করিতেছিস্? এখন যে আকবরের রাজত্ব: দীপ্ত মহিমার রাজত্ব। ওরে কাল! আমার সাকী, এক-পেয়ালা সুরা দে!

যাহা মাথায় চড়ে, যাহা নিয়তি অপেক্ষাও খারাপ, যাহা জ্ঞানীকেও পাগল করিয়া তুলে, এমন সুরা আমি চাহি না।

সে সুরা নহে যাহা যুদ্ধের সময় পিত হয়। সেই সুরা পান করিয়া সৈনিকেরা ঘাড় নীচু করিয়া সবেগে চলিতে থাকে ও পশুবৎ প্রতীয়মান হয়।

সেই নির্লজ্জা সুরা নহে, যাহা হাত পা বাঁধিয়া বিবেককে প্রবৃত্তিরূপ তুর্কের হস্তে সমর্পণ করে।

সেই অগ্নিময়ী সুরাও নহে যাহা সুরাপাত্রকে গলাইয়া ফেলে; তবে সে সুরা কি?—না একটি মধুর দৃষ্টি, সে সুরাপাত্রটি কি?—না আমাদের হৃদয়।

না; সেই বিশুদ্ধ সুরা, সেই রহস্যময় মধুর সুরা যাহা খামখেয়ালী অদৃষ্টের উপর জয়লাভ করিতে আমাদিগকে সমর্থ করে।

সেই স্বচ্ছ সুরা যাহার মধ্যে সন্ন্যাসীরা নিষ্পাপ-অবস্থা লাভ করেন, সেই দীপ্তিময়ী সুরা যাহা রাজসভা-

সদ্‌কে সম্মানের পথ ও প্রকৃত রাজভক্তির পথ দেখাইয়া দেয়।

সেই মুক্তাময়ী সুরা যাহা চিত্তবিদূষণ সমস্ত চিন্তাকে ধরাশায়ী করে।"

ফইজি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, শিরাজের উর্ফি (১৫৯১ অব্দে মৃত্যু হয়) কতকগুলি সুন্দর কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন।

"বুল্‌বুলের করুণস্বর যে হৃদয়কে বিগলিত করে সেই হৃদয়ের প্রতি আসক্ত হও। সেই হৃদয়ই জ্ঞানীর হৃদয়।

যদি তুমি প্লেটো না হও,—তোমার অজ্ঞতাকে রক্ষা কর; সমস্ত অর্দ্ধ বিজ্ঞানই মৃগতৃষ্ণিকা ও অতৃপ্ত তৃষ্ণা।

পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে প্রেমের অনিষ্ট সহ্য করিতে পারে। প্রেমিক বলিলেই বুঝায়:—পাণ্ডু-বর্ণ ও বিকৃত মুখমণ্ডল।

নিরুপায় জেলেখার মুখবর্ণের মত আমার হৃদয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। অপবাদগ্রস্ত জোসেফের অপবাদ কাহিনীর মত আমার দুঃখ।"

কিন্তু ক্রমে উর্দ্দু ভাষা সুমার্জ্জিত হইল; তখন মুসলমানেরা এই কথা বলিতে সমর্থ হইল:—"আরব ভাষা মাতৃস্বরূপা; তুর্ক ভাষায় লঘু সাহিত্য; পারস্য ভাষায় কবিতা; উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন।" উর্দ্দু সাহিত্য বিচিত্র বিষয়াত্মক। যথা:—

রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ও দর্শন সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ, ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ, গদ্য ও পদ্যে রচিত আখ্যায়িকা এবং ব্যঙ্গ-কাব্য।

দাক্ষিণাত্যের ওয়ালীই উর্দ্দু কবিতার প্রতিষ্ঠাতা (সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশ) ওয়ালী বলিতেন, তাঁহার কবিতা, সঙ্গীত-রাজ বুলবুলের গান অপেক্ষাও মধুরতর; এবং এরূপ উচ্চতর যে উহার দ্বারা মানব বুদ্ধি অনন্ত পুরুষের সিংহাসন-সমীপে সমুত্থিত হয়।

কতকগুলি প্রেম সংক্রান্ত গজলের জন্য আমরা উঁহার নিকট ঋণী:—যথা।

"তোমার কর্ণের মুক্তায় খচিত তোমার কৃষ্ণবর্ণ অলকদাম—মনে হয় যেন, সাতারার অবরোধে ভারতীয় সৈন্য।

তোমার অলকদাম যমুনার তরঙ্গরাজি এবং তোমার চখের কালো তারা যেন এক তাপস, পবিত্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।"

কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি, ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত সুফীদিগের লেখনীপ্রসূত।

"অনুক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা—অনুক্ষণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ।

কেন এই পার্থিব সাম্রাজ্যের অভিলাষী হইয়াছ? আমার সাম্রাজ্য তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর—পীর দিগের দারিদ্র্য।"

উর্দ্দু কবিতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। জামী ও নিজামীকে স্বকীয় গুরুরূপে বরণ করায়, ঐ সময়কার কবিতায় উচ্চ ভাবের কথা ও অতি সূক্ষ্ম ভাবের কথা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অনুকরণের অস্তিত্ব সত্ত্বেও মৌলিকতার অভাব ছিল না, আবেগ ও উচ্ছাস-জনিত সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না।

সৌদার কবিতা। (১৭৮০ খৃঃ মৃত্যু হয়)

"তোমার যদি চক্ষু থাকে ত দেখিতে পাইবে,—গোলাপ হইতে কণ্টক পর্য্যন্ত ঈশ্বরের করুণা প্রকাশ করিতেছে। সেই পরম সখার সৌন্দর্য্য, তাঁহার সখারা প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থেই দেখিতে পান। ভক্তির সূত্র ভিন্ন ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করা যায় না।—নচেৎ মুসলমানদের জপমালাই বা কিজন্য? ব্রাহ্মণদিগের উপবীতই বা কিজন্য?

"হে ঈশ্বর, আমার প্রিয়তম, তোমার কঠোরতা আমার আসক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে। যেমন—তিক্ত ঔষধ রোগীর কল্যাণসাধন করিয়া থাকে।"

মীরের কবিতা। (১৯ শতাব্দীতে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হয়)

"কাঁদিতে কাঁদিতে লোকে বলিয়া থাকে, কেমন করিয়া যৌবন পালাইল?—হায়! যৌবন পালাইল, যেরূপ মলয়ানিল পলায়ন করে, যেরূপ গোলাপের সৌরভ পলায়ন করে।—মীর, বার্দ্ধক্য ঝড়ের মত সহসা আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিল। এই প্রচণ্ড আঘাত কে প্রতিরোধ করিতে পারে? আমরা যেন শরৎকালের বৃক্ষপত্র।"

হাতিমের কবিতা। (১৬৯৯—১৭৯১)

"আমার প্রিয়তমা যখন আমার গৃহের চৌকাঠ পার হইয়া যাইবেন, আমি আপনাকে বলিদান দিব। আমার বিরাম শয্যা আমার দুঃখশয্যায় পরিণত হইয়াছে। তোমার সুন্দর পদযুগল দ্বারা যে সকল গদি বিমর্দ্দিত হইত, সেই সব মখমলের গদিতে আমি কি করিয়া নিদ্রা যাইব?—প্রিয়তমে, এই দেখ আমার আত্মা তোমার পদবিক্ষেপের জন্য, তোমার সুন্দর গঠনের জন্য, তোমার সৌন্দর্য্যের জন্য, তোমার কুঞ্চিত অলকদামের জন্য লালায়িত হইয়াছে।"

সোজের কবিতা। (১৮০০ অব্দে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু হয়)

"যাহারা ভালবাসিতে পারে না, প্রেমের নাম করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? প্রেম ত যাতনার ন্যায় একটা মারাত্মক মত্ততা। হাঁ! আমার কথায় বিশ্বাস কর, প্রেমের পেয়ালা স্পর্শ করিও না। একটি চুম্বন! তোমার ঐ মিথ্যাবাদী চুম্বন হইতেই সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি। প্রকৃত প্রেমের অপমানও ইহা অপেক্ষা ভাল। এইরূপ লেখা ছিল:—জীবনের যত কিছু লজ্জা আমার অদৃষ্টেই মিলিবে। হে ঈশ্বর কোন জীবকে প্রেমের দ্বারা অবমানিত হইতে দিও না।"

এই সকল আবেগময়ী কবিতার বিপরীতে, হসনের রচনায় (১৭৮৬ মৃত্যু হয়) একটা গতানুগতিক কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার কবিতায় আর সেরূপ আবেগ নাই, আন্তরিক ভাবস্ফূর্ত্তি নাই; উহা একটা আমোদের বিষয় মাত্র।

"ইরানের উদ্যান" হইতে এই অংশটী উদ্ধৃত হইল:

"এই দুই উদ্যান স্বর্গের উদ্যানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রমণীগণ যেন কতকগুলি ফুল্ল কুসুম। কাহারও বা জল-চেক্‌নাই পরিচ্ছদ, কাহারও বা মস্‌লিন ও রেশমের পরিচ্ছদ। আবার কাহারও বা জরির পাড়-ওয়ালা লাল বা সবুজ পরিচ্ছদ। কিংখাপের কটিবন্ধ, শাল, একটি ওরনা স্কন্ধে লুটিয়া পড়িয়াছে। নূপুরে ভূষিত পদপল্লব প্রেমিকজনের মনোহরণ করিতেছে।

তাহাদের আঙ্গিয়ার মধ্য হইতে গ্রীবা ও বক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাদের কাঁচুলী গাত্র চাপিয়া ধরিয়াছে এবং তাহাদের লাল পায়জামা তাহাদের গোলাপী-বর্ণাভ গাত্রেরই অনুরূপ। কিন্তু আর এক রূপসী পাল্কী আরোহণ করিয়া উপনীত হইলেন; তিনি অবতরণ করিবামাত্রই আলোকচ্ছটা মনে করিয়া প্রজাপতিরা ছুটিয়া আসিল এবং বুলবুল পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে রাজি হইল:—বুলবুল তাহার চিরবাঞ্ছিত গোলাপকে পাইয়াছে। (১)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উর্দ্দু কবিতা আরও গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ের কবিরা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কবিদিগের অনুকরণ করিতে লাগিল—সেই পূর্ব্ব যুগের কবিরাও আবার পারসীকদিগের অনুকরণ করিয়াছিল।

ব্যঙ্গ কাব্যের ক্রমবিকাশে চরিত্রের ক্রম-

(১) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দ্দু লেখকদের মধ্যে, দিল্লিতে যিনি বাস করিতেন সেই হাইদ্রাবাদের আজদ, আরজু, য়কীন, ফিগাম, দরদ অমজাদ্ সমস্তই দিল্লির—ইহাদেরও নামোল্লেখ করা আবশ্যক।

বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে, এই ব্যঙ্গ কবিতা উৎপীড়নকারী বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত; মামুদের বিরুদ্ধে রচিত ফর্দ্দুসীর প্রসিদ্ধ কবিতা এই ধরণের। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিরা সাহিত্যিক কলহ ভিন্ন আর কোন কারণে উত্তেজিত হইতেন না।

কবি সৌদা স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ফিদুইর বিরুদ্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

তিনি এক মূর্খের বিবরণ লিখিয়াছেন। ঐ মূর্খ বাজ পাখী মনে করিয়া এক পেচক কিনিয়াছিল:—

"এই পেচক যে বাজ পক্ষী সাজিয়াছে—সে কে? সে ফিদুই স্বয়ং.....ফিদুইর পদ্য লিখিবার বাতিক হইয়াছে। ফিদুই গন্ধ-বণিক; কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "গরম মস্‌লা আছে?" সে উত্তর করে "পদ্য" আছে। কেহ যদি কোন গাছগাছড়া চাহে তাহাকে সে বলিয়া উঠে:—"এই যে আমি ফিদুই।" পদ্য রচনা করিতে অসমর্থ, যশের জন্য তৃষিত, ফিদুই সেই গল্পপ্রসিদ্ধ বণিকের পেচক।"

পরে, আর একটি ব্যঙ্গ কবিতা,—পূর্ব্বোক্ত কবিতাটিরই মত আবেগময়ী,—এই কবিতায় মুসলমান হিন্দুদিগকে উপহাস করিয়াছে; এবং বলিয়াছে ভারত, ভারতের আইন, ভারতের রীতিনীতি, নূতন কেতা, তাহার মুসলমান ভ্রাতৃগণকে নীতিভ্রষ্ট করিয়াছে।

জুরার কবিতা। (১৮১০ অব্দে মৃত্যু) ঋতু বর্ণনা;

ইহার বাগ্‌বিন্যাসে কোন বিশেষত্ব নাই:—

"আমরা কি দেখিতেছি? বৃষ্টি? বিপ্লাবিনী বন্যা? সর্ব্বত্রই জল; জল ছাড়া আর কিছুই নাই। নদী ও স্রোতস্বিনী সকল উদ্বেলিত হইয়া ঘর বাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং অজস্র বর্ষণে আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে।"

ভাবের কৃত্রিমতা:—

"আকাশ যেন তরঙ্গোপরি ভাসমান একটা জাহাজ; তারকাগণ, প্রেমিক নয়নের অশ্রু ধারার মত, জলের মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তরঙ্গ সকল এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, পাখীরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। এবং মৎসেরা চন্দ্রের নিকট গমন করিতেছে।

পরিশেষে গদ্যসুলভ আলোচনা:—

"শস্যের মূল্য কম; তথাপি দুর্ভিক্ষ-সময়ের ন্যায় গৃহ সকল মৃত দেহে পূর্ণ।

কোন খাদ্য দ্রব্যের খরিদ্দার নাই, কোন তৌলদণ্ড নাই। কি ফলের দোকানে, কি কসায়ের দোকানে, কি পান্থশালার পাচকদের দোকানে, সর্ব্বত্রই হাহাকার ও সকল সামগ্রীই সচরাচর-সময় অপেক্ষা পাঁচগুণ মহার্ঘ।" (২)

এই সকল কবিতার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, গদ্য-যুগের পর, কবিতার যুগ ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের যুগ আসিয়াছিল। ১৯ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারগণই প্রধান উর্দ্দু লেখক ছিলেন। তা ছাড়া, মুসলমানের প্রাধান্য চলিয়া যাওয়ায়, হিন্দু ও দ্রাবিড়ীয় রীতির প্রভাবে পরাভূত হইয়া মুসলমান ভাষা অবনতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতেই এই সমস্ত ভাষাগত বিশেষ প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। গদ্য বিভাগে, দুইজন প্রধান ধর্ম্ম সংস্কারক—নানক ও চৈতন্য।

ভারতের সমস্ত চলিত ভাষাতেই সুন্দর

(২) Garcin de Tassy সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

সুন্দর কাব্য পরিদৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে তামুল ভাষায় সিত্তরদিগের গ্রন্থাদি রচিত হয়, মারাট্টাদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের গ্রন্থকার সমূহ এবং পরে জনপ্রিয় কবি তুকারাম (১৫৮৮—১৬৪৯) আবির্ভূত হন; রাজপুত কবিগণের মধ্যে একজন কবি বিহারী তাঁহার প্রেমাসক্ত রাজকুমারকে, এক নবযুবতীর কথা বলিতেছেন:

"যখন ফুলটি ফুটিয়া উঠিবে, তখন ভ্রমরের কি দুর্দ্দশা! কেননা তখন তাহাকে সৌরভ হীন, বর্ণ হীন, মাধুর্য্য হীন এক মুকুলের উপর বসিতে হইবে।"

বঙ্গদেশ হইতে মুকুন্দরাম প্রসূত হয়। (সপ্তদশ শতাব্দী) অসম্ভব অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনার মধ্যে তাঁহার রচিত পারিবারিক জীবনের বর্ণনাই অতীব মধুর! এইরূপ শ্রীমন্তের ইতিহাস।

ধনপতি নামক এক বণিকের দুই পত্নী; একটি বয়স্থা, আর একটি তরুণী—আর এই তরুণী অপূর্ব্ব রূপসী। ইহা হইতে দুই পত্নীর মধ্যে বিবাদকলহ। পতির অনুপস্থিতি কালে, এই তরুণী নির্য্যাতন সহ্য করিয়া পতির প্রত্যাগমনে তাঁহার ভালবাসা পাইবে বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিল। শ্রীমন্ত নামে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু বণিক ধনপতি সিংহলে যাত্রা করিয়া সেখানে ১৪ বৎসর কাল কারাবদ্ধ রহিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্ত পিতৃ-অন্বেষণে বাহির হইল। বিচিত্র অদ্ভুত কাণ্ডের পর, বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল।

খাস হিন্দুস্থানে তিনজন লোক-গুরু:—সুরদাস, কেশবদাস, তুলসীদাস। সুরদাস (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম) "বাল লীলা"র গ্রন্থকার। এই গ্রন্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে কতকগুলি দোঁহা রচিত হইয়াছে। কেশবদাস (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী) ইনি একজন নীতি-উপদেশ-লেখক এবং পারসীক গ্রন্থকারদিগের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তুলসীদাস (১৫৪৩—১৬৪০) হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়।

তুলসীদাসের গুরু ছিলেন নাভাজী। নাভাজী একজন দরিদ্র ভগবদ্‌ভক্ত, ক্ষীণকায়, ও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত ভক্তমাল গ্রন্থের রচয়িতা। কাশী রাজের মন্ত্রী হইয়া তুল্‌সীদাস কাশী নগরে বাল্মীকি রামায়নের স্বাধীন অনুকরণে এক রামায়ণ রচনা করেন। সপ্তকাণ্ড:—প্রথম বালকাণ্ড; গ্রন্থকার এই বালকাণ্ডে, রাম বিষ্ণুরই অবতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহার পর অযোধ্যা কাণ্ড; এই অযোধ্যা কাণ্ডে, ইচ্ছাপূর্ব্বক রামের আত্মনির্ব্বাসন, বনে রাম ও সীতার জীবনযাত্রানির্ব্বাহ, ও সীতাহরণ বর্ণিত হইয়াছে; যুদ্ধকাণ্ডে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দম্পতিযুগলের অক্ষুণ্ণ অটল প্রেম, সীতা উদ্ধার, রাবণের মৃত্যু এবং পরিশেষে, জনসাধারণ সীতার সতীত্বে সন্দেহ করায়, রামকর্ত্তৃক সীতার প্রতি বনবাসের আদেশ বর্ণিত হইয়াছে। বনে গিয়া সীতা দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। পরে রাম অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় পত্নী ও পুত্র যুগলের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এবং ১৮ বৎসর ব্যাপী বিচ্ছেদের পর তাহাদিগকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

নবযুগের প্রকৃত কবি তুলসীদাস, রামায়ণকে স্বকীয় যুগে প্রত্যারোপিত করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণগত পাত্রগণের প্রতীতি, ভাব, ধারণা, রীতিনীতি সমস্তই ষোড়শ শতাব্দীর অনুরূপ; আর তিনি চিত্র আঁকিয়াছেন ষোড়শ শতাব্দীরই; সেই বড় বড় বাণিজ্য বহুল নগরাদি, সেই দুর্জ্জয় দুর্গসমূহ, সেই অশ্বারোহী সৈনিকের দল, সেই সামন্ত রাজাদিগের উৎসব ও মল্লক্রীড়া, সেই বিভিন্ন জাতিবর্ণ, সেই ব্যবসায়-সংঘ, সেই বিলাসিতা, সেই ভোগসুখ, সেই সংশয়বাদ ও সরল বিশ্বাসের সংমিশ্রণ, সেই বিজ্ঞান ও ভ্রান্ত সংস্কার, সেই বর্ব্বরতা ও মর্জ্জিতভাব যাহা সকল দেশের নবযুগেই পরিলক্ষিত হয়। এবং তাঁহার ভাষা—ব্রজভাষা; এই ভাষা যেমন একদিকে লোকব্যবহারোপযোগী তেমনি বিশুদ্ধ; ইহা নমনীয়, বিশ্লেষণাত্মক, সুরঞ্জিত; পুরাতন বিষয়ের আলোচনা ক্ষেত্রে, লোকপ্রিয় কবির বর্ণনার পক্ষে এমন উপযোগী ভাষা আর নাই। এইরূপ ইতালী দেশের Gozzoliর কলাকৌশল যেমন জনতার উপযোগী সরল, তেমনি রোমক ও গ্রীসীয় এই দুই প্রাচীন সাহিত্য-যুগের অনুরূপ—মহান্! কিন্তু "নবজীবন" যুগের সাহিত্যের ইহাই বিশেষ ধর্ম্ম ও প্রতিভা যে, উহা ইতিহাসের গৌরবান্বিত ঘটনাসমূহকে ও পুরাণাদি বর্ণিত সরল ও ভক্তিরঞ্জিত ব্যাপারগুলিকে আধুনিক ভাবে গড়িয়া তুলে কিন্তু উহাদিগকে কখনই নীচে নামাইয়া আনে না।

ইহার বিপরীতে, নবযুগঅভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে, যে সাহিত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সুসংযত ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচায়ক; কিন্তু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুশীলিত না হওয়ায় তৎকাল প্রচলিত ভাষাগুলি হইতে নিকৃষ্ট রচনা সকল প্রসূত হয়। উহাদের যাহা কিছু গৌরব তাহা মুসলমান সভ্যতার অবনতি প্রযুক্তই হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-অনুশীলন আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধিকারভুক্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবাব গৃহ।

নবাবের গৃহের ভোজন-কক্ষ সেদিন আড়ম্বর-সজ্জায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের সমুদয় উপাদানে আধুনিক কেতায় সজ্জিত বিরাট কক্ষ উজ্জ্বল শ্রীতে মণ্ডিত। প্রকাণ্ড টেবিলটাকে ঘেরিয়া প্রায় বিশজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আনন্দ-কলরবে কক্ষটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। পারি সহর যাঁহাদিগকে বক্ষে ধরিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সকলেই প্রায় এই নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন না শুধু ডিউক। মুখে এক টুকরা রুটি পুরিয়া মঁপাভঁ কহিলেন, "হাঁ, কাল ডিউক আমাকে ডেকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন,—বুঝলেন, নবাব বাহাদুর—?"

আনন্দে গর্ব্বে নবাবের বুকখানা ফুলিয়া

উঠিল। তিনি কহিলেন, "তাই না কি! আমার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন—?"

"হাঁ। শীঘ্র একটা সুযোগ পেলেই তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বেন।"

"বটে। এ কথাও তিনি বলেছেন?"

"তা না ত কি। এই যে গবর্ণর সাহেব রয়েছেন, ইনিও সে কথা শুনেছেন।"

যাঁহাকে গবর্ণর বলা হইল, তিনি একজন খাটো ধরণের লোক, নবাবের অপর পার্শ্বে টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। মাথায় টাক। একমনে তিনি ভোজ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। নাম তাঁহার পাগানেতি; কর্সিকা প্রদেশের তিনি গবর্ণর। মঁপাভঁ তাঁহাকে নবাবের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণর কহিলেন, "ডিউক তাই বলছিলেন বটে!"

এই নিমন্ত্রণ-সভাটি দেশের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন ধরণের সম্ভ্রান্তগণ-সম্মিলনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। টিউনিসের বে'র প্রধান কর্ম্মচারী ব্রাহিম বে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেউলিয়া-গ্রহণে সমধিক খ্যাতি-পরায়ণ কার্দ্দেলাক, চিত্র-ব্যবসায়ী সোল্‌বাক, তদ্ভিন্ন নবাবের মুর ও মিশর-বন্ধুগণ নিমন্ত্রিতের দলভুক্ত ছিল। বিভিন্নশ্রেণীর লোকজন থাকিলেও সভায় এতটুকু কলরব ছিল না। সকলেই নিঃশব্দে ভোজন করিয়া চলিয়াছিলেন; চোখের কোণে বক্র কটাক্ষে পরস্পরের পানে চাহিতেও কেহ ভুলেন নাই। সহসা নবাব বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ডাক্তার জেঙ্কিন্স! এত দেরী যে!" মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমরা ডাক্তার মানুষ। বাঁধাধরা সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি, এমন আমাদের সাধ্য কি!"

নবাব কহিলেন, এঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন, কাজেই আপনার জন্য অপেক্ষা করাটা —"

ডাক্তার কহিলেন, "তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। আমি এখনই সকলকে ধরে ফেলছি—"

ডাক্তার নবাবের সম্মুখস্থ শূন্য আসনে বসিয়া গেলেন। ক্ষিপ্রভাবে কয়েকটা জিনিষ মুখে পুরিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আজকের মেসেঞ্জার কাগজখানা দেখেছেন, নবাব বাহাদুর?

নবাব কহিলেন, "না।"

"সে কি! দেখেনইনি মোটে! আপনার সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড প্যারা বেরিয়েছে যে!"

নবাবের মুখে সরমের একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সম্বন্ধে আবার কি বেরুল?"

"দু কলম লিখেচে! মোসার কোথায়? আপনাকে দেখায় নি! এই যে মোসার!"

মোসার অপ্রতিভভাবে কহিল, "অতটা মনে ছিল না।"

মোসার একখানা ছোটখাট সংবাদ-পত্রের মালিক। তরুণ বয়সেই তাহার শীর্ণ মুখে-চোখে দারিদ্র্য ও অভাবের একটা রুক্ষ ছাপ পড়িয়াছে। আর কোন জায়গায় অর্থ উপার্জ্জনের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সে এই সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া বসিয়াছে। বুকে দুনিয়ার প্রতি ঈর্ষা-পীড়িত একটা জ্বালা লইয়া সে এই কাজে নামিয়াছে। যেখানে অর্থ পাইবে, সেখানেই সে প্রশংসা ও স্তুতির মধু বর্ষণ করিবে। যেখানে সে সম্ভাবনা নাই, সেখানকার জন্য তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে,

শুধু হুলের বিষ! অর্থশালী লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কালিমা-লিপ্ত চরিত্রে যশের চুণকাম করাই তাহার কাজ। এই কারণেই মঁপাভঁ জেঙ্কিন্সের দলে অবাধ প্রবেশের অধিকার সে লাভ করিয়াছিল। জয়-দুন্দুভি বাজাইয়া আপনাদের পানে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এমনই একজন সংবাদ-পত্র-পরিচালকের অভাব মঁপাভ-জেঙ্কিন্সের দল বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। তাই মোসারকে পাইয়া তাহারা যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে। এবং অর্থ-আহরণের উদ্দেশ্যেই জেঙ্কিন্স-কোম্পানি নবাবের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যখন এক, তখন সমবেত সম্মিলনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নবাব কহিলেন, "তাহলে একখানা কাগজ আমায় এখনই আনিয়ে দিতে হবে যে। কি লিখেচে, জানবার জন্য আমি ভারি অস্থির হচ্ছি।"

মোসার কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, নবাব বাহাদুর। কাগজ—আমার কাছেই আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য একখানা কাগজ পকেটে করে আমিও এনেওচি। এই নিন।" বলিয়া মোসার একখণ্ড ভাঁজ-করা কাগজ নবাবের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল।

নবাব কাগজখানা টানিয়া লইলেন। নীল পেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটা স্থান সহজেই তাঁহার নজরে পড়িল। তিনি নীরবে পড়িতে লাগিলেন। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "না, না, চুপি চুপি পড়লে চলবে কেন! এঁরা সকলে জানতে পারবেন না যে। দিন আমায়—আমি চেঁচিয়ে পড়ি!"

কাগজখানা টানিয়া লইয়া জেঙ্কিন্স পড়িতে লাগিলেন। দুই কলম ধরিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য। "বেথলিহাম আতুরাশ্রম ও এম্ বার্ণার্ড জাঁসুলে।" তাহার পর ভাষার ছটায় মাতৃস্তন্যের নানাবিধ অপকারিতা ও অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়া ছাগদুগ্ধের অশেষপ্রকার কল্যাণকর গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এ-সমস্ত কথাই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের কপোল-কল্পিত এবং ভাষায় যেটুকু আড়ম্বর ফলানো হইয়াছে, তাহাতেও জেঙ্কিন্সের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ! এই সকল কথার উল্লেখান্তে নান্তেয়ারের জল ও জল-বায়ুর বিশদ সুখ্যাতি এবং তাহারই অব্যবহিত পরে জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্ক ও জাঁসুলের দান-মুক্ত হস্তের প্রতি প্রশংসা-বৃষ্টি হইয়াছিল! জাঁসুলেকে অসহায় রোগ-পীড়িত শীর্ণ শিশুর দেবোপম রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া সম্পাদক আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

সংবাদটুকু যখন মজলিসে পড়িয়া শুনানো হইতেছিল, শ্রোতৃবর্গের মন তখন বিরক্তি ও ঘৃণায় কতখানি পূর্ণ হইয়াছিল, মুগ্ধ জাঁসুলের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরই ছিল না। সকলেই ভাবিতেছিল, কি পাজী শয়তান এই, মোসারটা। যাউক, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সে গুছাইয়া লইয়াছে! মিথ্যা চাটুবাণীতে কাগজের এই দীর্ঘ স্তম্ভ ভরাইয়া কে জানে সে আপনার তহবিল কতখানি পূর্ণ করিবে। তথাপি তহবিল যে রীতিমত ভারী হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। ঘৃণা ও ঈর্ষা-মিশ্রিত বক্রদৃষ্টিতে সকলেই মোসারের পানে চাহিয়া দেখিল।

কাগজ পাঠ শেষ হইলে নবাব অধীরভাবে কহিলেন, "আঃ! আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা বলতে পারি না! শুধু আনন্দই বা কেন—গর্ব্বও কি কম হচ্ছে!"

জাঁস্থলে আজ দেড়মাসমাত্র পারি সহরে আসিয়াছেন। দুই-চারিজন পুরাতন সঙ্গী ব্যতিরেকে আজ যে সকল বন্ধুর বন্ধুত্ব গর্ব্বে আপনাকে তিনি সমধিক গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, পারির মাটীতে পা দিবার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাদের কাহারও সহিত জাঁস্থলের এতটুকুও জানা-শুনা ছিল না! কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়! সূর্য্যোদয় হইলে জগতের লোককে যেমন সে সংবাদটুকু বলিয়া দিতে হয় না, সূর্য্যকে দেখিয়া আলোক ও উত্তাপ লাভ করিবার জন্য সকলেই আঁধার ছাড়িয়া গৃহ-কোটরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তেমনই এই নবাবের অজস্র ঐশ্বর্য্য-রশ্মির ছটায় পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ পুলকিত চিত্তে সে ঐশ্বর্য্য-রশ্মির সংস্পর্শ-লাভের জন্য এক নিমেষে নবাবের চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। টাকার মোহিনী শক্তি আছে! টাকা ধার দিয়া অচিরেই নবাব বন্ধু-সংগ্রহে সক্ষম হইলেন।

নবাব বলিলেন, "কাগজে যা ছাপা হয়েছে, তা ত দেখলুম। কিন্তু এর উপর যখন দেখি, পারির বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোকেরা আজ আমার বন্ধু, তখন আমার পুরানো দিনের কথা সব মনে পড়ে। আমার বুড়ো বাপের কথা, তাঁর সেই ছোট দোকানখানির কথা মনে পড়ে। আমার বাবা ঘোড়ার ক্ষুর বিক্রী করতেন। আপনারা চমকাবেন না। সত্যই তাই। এক অজ পাড়াগাঁয় চটির ধারে আমার বাপের ছোট্ট দোকান ছিল। রোজগার-পাঁতিও এত কম ছিল যে পেটে দিতে একখানা আস্ত রুটিও কোন দিন আমার ভাগ্যে জোটেনি। বিশ্বাস না হয়, আপনারা এই কাবাস্থকে বরং জিজ্ঞাসা করুন। কাবাস্থ পুরানো লোক, ও সব জানে। সে যে কি দিন ছিল—!" নবাব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ রহিলেন। পরে অন্ধকার অতীতের পার্শ্বে এই আলোকোজ্জ্বল বর্ত্তমানের কথাও তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! ঈষৎ গর্ব্বে বুকখানাও ফুলিয়া উঠিল। নবাব আবার কহিলেন, "কাল কি খাব, আজ তার সংস্থান থাকত না! খিদের জ্বালায় দিন-রাত জ্বলতুম! না খেয়ে কতদিন বিছানায় পড়েই কাটিয়ে দিছি। শীতকালে বেরুতে পারতুম না। গায়ে দেবার মোটা জামা একটা ছিল না। তার পর বাপ মারা গেলেন —বুড়ো মাকে নিয়ে বিপদের সাগরে ভাসলুম। এ রকমে দিন কাটানো যায় না—কখনও না—শেষে একদিন শেষ-রাত্রে পালালুম। তখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর। এখনও পঞ্চাশ বৎসর পার হইনি—সেই ত্রিশ বৎসর বয়সে ভিখিরির অধম ছিলুম—একটা কড়িও সম্বল ছিল না—কি সে অসহ্য কষ্ট!"

শ্রোতার দল অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কেন এ অতীতের ধূলি-জঞ্জাল টানিয়া বাহির করা! বিশেষ এই বিলাসের মধ্যে, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে! দারিদ্র্যের এ ভয়ঙ্কর কঙ্কালসার মূর্ত্তিখানা দেখিবার জন্য ত তাহারা দিব্যবেশে সাজিয়া আজ এখানে আসে নাই! দৈন্যের এ কদর্য্য কুৎসিত মূর্ত্তিখানা বাহির করিয়া আনিয়া সজ্জিত সভায় দারুণ বীভৎসতা সৃষ্টি করিবার অধিকারও কাহারও নাই। নবাবেরও না। তবুও সেকথা সাহস করিয়া কে বলিবে? নেটের পর্দ্দা ঝালর-মণ্ডিত সভাগৃহে নবাবের কবেকার সেই ছিন্ন দীন বস্ত্রখণ্ড অবাধে ঝুলিতে লাগিল। অগাধ টাকার মালিক—তাহার উচ্ছ্বসিত ভাব-স্রোতে বাধা দিতে যাওয়া মূঢ়তা! অসহ্য

বোধ হইলেও তাহা শুনিতে হইবে! নহিলে আদব দুরস্ত থাকে না! তাই সকলে আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে কোনমতে আপনাদিগকে অচপল রাখিলেন।

নবাব বলিতে লাগিলেন, "মার্শেলের বন্দরে ঘুরে ঘুরে কত দিন কাটিয়ে দিলুম। এক দোকানির দয়া ছিল, সে ডেকে দু'চার দিন পোড়া রুটি খেতে দিয়েছে। কি করব, কি হবে, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছিলুম না। এমন সময় এক সঙ্গী জুটল। সঙ্গী বটে—কিন্তু আজ সে আমার পরম শত্রু। তার নাম করলে এখনই তাকে আপনারা চিন্‌তে পার্‌বেন। আজ তার মস্ত নাম, কিন্তু সে ভণ্ড—নিরেট ভণ্ড। তার নাম হেমার-লিঙ। ঐ যে হেমারলিঙ্‌ এণ্ড সনের প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক, তারই মালিক বড় হেমার-লিঙ্‌। আজ সেও অনেক পয়সা করেছে, কিন্তু তার সেদিনকার দশা আমারই মত ছিল। সে-ও ভাগ্য-পরীক্ষায় বেরিয়েছে। দুজনে ভারী মিশ খেয়ে গেলুম। শেষে পরামর্শ করলুম, দুজনেই বিদেশে যাব। কিন্তু যাই কোথায়? কাগজে কতকগুলো দেশের নাম লিখে লটারি কর্‌লুম। একটা কাগজ উঠল, 'টিউনিস।' ব্যস্‌ আর কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একদম টিউনিসে রওনা হলুম। কোনমতে জাহাজে জায়গা করে নিলুম। যেদিন বেরুলুম, হাতে সে দিন একটাও পয়সা ছিল না, কিন্তু ফিরলুম পঁচিশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে।"

ঘরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পঁচিশ লক্ষ টাকা! আরব্য উপন্যাসের কাহিনী যে। কার্দ্দেলাক বলিয়া উঠিল, "অদ্ভুত!" মঁপাভঁ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবাব কহিলেন, "হাঁ, সাহেব, পঁচিশ লক্ষ নগদ। তা ছাড়া টিউনিসে আমার দেদার টাকা ছড়ানো আছে! গোলেতার বন্দরে খানকতক জাহাজ আছে, তা-ছাড়া মণি মুক্তো হীরে এ-সবের ত কথাই নেই। এ পঁচিশ লক্ষ যদি আজ হঠাৎ উড়ে যায় ত কালই আবার পঁচিশ লক্ষ আমার হাতে মজুত দেখবেন!"

শুনিয়া সকলে যেন জ্বলিয়া উঠিল। এই বর্ব্বরের এত অর্থ! মনের ভাব গোপন রহিয়া গেল। চারিধারে কলরব উঠিল, "অদ্ভুত!"

"চমৎকার!"

"খাসা!"

"এতক্ষণ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনছিলুম!"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "এই লোকেরই ডেপুটি কাউন্সিলর হওয়া উচিত।"

পাগানেতি কহিলেন, "আমি বলছি একদিন হবেনও নিশ্চয়।" সকলেই সসম্ভ্রমে নবাবের করমর্দ্দন করিলেন।

উত্তেজনাটা কিছু কমিলে নবাব কহিলেন, "একটু কফির ফরমাস করা যাক—কি বলেন?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

কফি আসিল। নিমেষেই পাত্রগুলা নিঃশেষ হইল। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "তাহলে নবাব বাহাদুর, আজ ওঠা যাক। ইতিমধ্যে আমি একবার আতুরাশ্রমের প্ল্যানখানা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। আপনি শেষ একবার না দেখে দিলে আমি ত কিছু ঠিক করতে পাচ্ছি না। কোথাও যদি কিছু বদলাতে চান ত বদ্‌লাবেন।"

প্রসন্নভাবে নবাব কহিলেন, "বেশ!"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "এ হপ্তায় ওদের টাকাও কিছু দিতে হবে। ওঃ, কাজ যা হচ্ছে, কি বলব! আপনি একবার চলুন, দেখে আসবেন—কেমন হচ্ছে সব।"

নবাব সে কথা কাণে না তুলিয়াই কহিলেন, "কত টাকা চাই? আজই নিন না।"

"আপাততঃ হাজার পনেরো হলেই চলবে!"

"মোটে হাজার পনেরো!" বলিয়া নবাব জনৈক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য চেক্-বহি লইয়া আসিল। নবাব চেক কাটিলেন, "ডাক্তার জেঙ্কিন্স—পনেরো হাজার টাকা—" তাহার পর নবাব মার্কুইসের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ডেপুটি হতে কত খরচ পড়তে পারে?"

মার্কুইস কহিলেন, "কত আর—এক লাখ—?" বলিয়া মার্কুইস পাগানেতির পানে চাহিলেন। পাগানেভি সে চাহনির অর্থ বুঝিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এক লাখ! কর্সিকার ডেপুটি কাউন্সিলর। তা হবে—হাঁ হবে বৈ কি! আমি বলছি নবাব বাহাদুর, এবার সমস্ত কর্সিকা দেশটাকে আপনার পায়ের তলায় ফেলে দেব। দেখে নেবেন, আমার কথার নড়চড় হয় না!"

নবাব কহিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহ! তাহলে টাকাটা আপনার নামে আজই কেটে ফেলি। ও আর দেরি করা কেন?"

আবার চেক-বহিতে কালীর আঁচড় পড়িল। এক লাখ টাকা! চেক কাটিয়া নবাব মোসারের পানে চাহিলেন, কহিলেন, "ও কাগজের কলম দুটোর জন্য আমার ধন্যবাদ জানবেন। কাগজটার ফণ্ডে আমি কিছু সামান্য সেবা দিতে ইচ্ছা করি—"

মোসের কহিলেন, "আপনার দয়াতেই ত কাগজখানা টিঁকে আছে, নবাব বাহাদুর, আপনিই ত এর পেট্রন। এর জন্য আবার আমায় কিছু দিতে চাইছেন কেন? এ ত আপনারই কাগজ! তা দিতে চান দিন, আপনার কথার উপর আবার আমার কথা কি! আর আপনার এ ছিটে ফোঁটা কিন্তু মেসেজারের পক্ষে পাহাড়ের সমান।"

আবার চেক কাটা হইল। দশ হাজার!

তাহার পর আরও দুই-চারিটা সদ্ব্যয়ের বন্দোবস্ত হইলে অভ্যাগতের দল বিদায় লইলেন। নির্জ্জন কক্ষে জানালার ধারে বসিয়া নবাব তখন আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন, পারি সহরের বুক চিরিয়া যেন একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। সে ধ্বনি যেন তাঁহারই বিজয় সঙ্গীত! কি সে মধুর, প্রাণারাম! তিনি দেখিলেন, পারি নগরী স্বয়ং আসিয়া দুই কোমল ভুজ বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে বক্ষে ডাকিতেছে।

সহসা একজন ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া নবাবের হাতে একখানি কার্ড দিল। কার্ডের সঙ্গে একখানি পত্র। খামের উপর নারী-হস্ত-লিখিত অক্ষর দেখিয়া নবাব কহিলেন, "এ যে আমার মার চিঠি,—কে আনলে?"

ভৃত্য জানাইল, পত্রবাহক এক তরুণ যুবা, বাহিরে নবাবের আদেশ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন!

নবাব কহিলেন, "যাও, তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে নবাব পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

মা লিখিয়াছেন, "বাবা জাঁসুলে, তোমার

বোধ হয় এম ছে গেরিকে মনে আছে। আমাদেরই এই বুর্জ স্তাতে দোঁলে এঁদের বাড়ী। এক-কালে এঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন নানা বিপদ-আপদে তাঁরা গরিব হয়ে পড়েছেন। গেরি সাহেব মারা গেছেন। তোমার কাছে যিনি চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন, ইনি তাঁর বড় ছেলে। ছেলেটির ঘাড়েই এখন সংসার পড়েছে। সে ঠিক করেছিল, উকিল হবে, কিন্তু এ অবস্থায় পড়াশুনার জন্য ছেলেটির আর এক দিন বসে থাকা চলে না। এঁরা মানুষ বড় চমৎকার। এই ছেলেটির যদি কোন উপায় করে দিতে পার ত এরা প্রাণ পায়। চেষ্টা করে একটা উপায় তোমার করে দেওয়া চাইই। আমি এদের বড় মুখ করে কথা দিয়েছি—দেখো বাবা—এদের সংসার যাতে চলে, তার একটা কিনারা তুমি করে দিও। তুমি কেমন আছ? অনেক দিন তোমায় দেখিনি—" ইত্যাদি—

মা! মা! জাঁসুলের সেই চিরস্নেহময়ী মা! পারির এই বিলাস-বিভবের মধ্যে পড়িয়া দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটিয়া জাঁসুলে মাকে হারাইয়া বসিয়াছে—মার কথা এক দিনের জন্যও ত মনে পড়ে নাই। ছার ঐশ্বর্য্য! ছার সম্মান! বিস্তর অনুরোধেও মা তাঁহার সেই পল্লীর নিভৃত বিজন কোণটুকু ছাড়িয়া আসিতে রাজী হন নাই। আজ ছয় বৎসর মার সঙ্গে দেখা নাই। দীর্ঘ ছয় বৎসর! আজ যেন নূতন করিয়াই জাঁসুলে সুমধুর মাতৃস্নেহ-স্পর্শ লাভ করিলেন।

মুখ তুলিয়া জাঁসুলে দেখিলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তরুণ যুবা। সুন্দর সুশ্রী মুখে দারিদ্র্যের মলিন ছাপ পড়িলেও মুখের স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দিব্য দীপ্ত চক্ষু! জাঁসুলে বলিলেন, "তুমিই মার চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?"

যুবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।" সেই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যে আর্ত্তের আশ্রয়-প্রার্থনার ব্যাকুল সুর ফুটিয়া বাহির হইল। জাঁসুলে যুবার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার বাবার নাম আমার খুবই মনে আছে। তাঁর কাছ থেকে একদিন অনেক পরামর্শ, অনেক সাহায্য পেয়েছি। তা থাক, তুমি আমার কাছে যখন এসেছ, তখন যতটুকু আমার সাধ্য, তোমার আমি ভালো করব! তুমি আমার সঙ্গে এখানেই থাকো—অন্য কোনখানে পয়সার সন্ধানে তোমায় যেতে হবে না। তুমি লেখা-পড়া শিখেছ—সুতরাং আমার অনেক উপকার করতে পারবে। আমিও তোমারই মত একজন লোক খুঁজছিলুম,—যার উপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি, সকল বিষয়ে যার পরামর্শ নিতে পারি, এমন লোক! তোমার মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছে, তুমি সেই লোক। আমার সঙ্গে মিশ খাবে! আমার মাথায় অনেক মতলব আছে, অনেক কাজ আমি করতে চাই। সেই সব কাজ করতে তুমিই আমার ডান হাত হবে। আমার প্রকৃত বন্ধু হবে তুমি। অর্থাৎ আমার একজন সেক্রেটারির দরকার। যে সব পুরানো লোক আছে, তাদের মাথায় এত কাজ এত মতলব ঢোকে না। তুমিই ঠিক লোক! এই পারি সহরে তুমি আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। কেমন, বুঝলে! পারবে ত? দেখো। পারিতে আজ আমি যেমন একটু

ঠাঁই করে দাঁড়িয়েছি, আমার সঙ্গে থাকো, তুমিও ঠিক এমনি-করে আমারই মত দাঁড়াতে পারবে। আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব।"

আনন্দের অধীরতায় গেরির বুক কাঁপিতেছিল। একেবারে এতখানি!

নবাব কহিলেন, "কেমন, রাজি ত? তুমি আমার সেক্রেটারি হবে! একটা বাঁধা বন্দোবস্ত তোমার জন্য করে দেব—কথাবার্ত্তা কয়ে এখনই সেটা ঠিক করে ফেলছি! আমি তোমায় যে সুযোগ দিচ্ছি, তার সদ্ব্যবহার করলে কালে তুমি ক্রোড়পতি হবে,—"

অনিশ্চয়তার সকল দুর্ভাবনা গেরির মন হইতে দূর হইয়া গেল। নবাবের প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে হৃদয় তাহার লুটাইয়া পড়িল, কৃতজ্ঞতার চোখে তাহার জল আসিল। সে নির্ব্বাক্ নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

গেরির হাত ধরিয়া নবাব একটা কৌচে তাহাকে বসাইলেন, পরে নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "এখন কিছু খাবার আনতে বলে দি—তুমি বসে বসে খাও আর আমার মার কথা বল, শুনি—আমার মার কথা!" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভিটের মাটি

১

দীঘির পাড়ের বাঁশের ঝাড়ে
পড়ো' বাড়ী পড়্ছে খসে',
বাদুড় চেঁচায় দেখ্ছে পেঁচা
ভাঙ্গা নীড়ে ধীরে বসে'।
স্বচ্ছ গভীর জলে রবির
দ্বিপ্রহরের কিরণ পড়ে,
ললাট ভাগের চিন্তা দাগের
মতন, কাটা রেখার পরে।
আজ্ও জ্বলে দীঘির জলে
তেম্নি বরণ সূর্য্য-করে;
হীরার কুচির দীপ্তি রুচির
উঠ্ছে ফুটে রেখার স্তরে।
বাঁশের ছায়ে জলের গায়ে
বাতাস লুটায় শ্বাসের চাপে;
স্বচ্ছ শীতল দীঘির দ্বিতল
তলায় তলায় আকাশ কাঁপে।

২

সঙ্গোপনে বাঁশের বনে
দীঘির তটে ওগো বিধি!
পড়ো' বাড়ীর ধূলা ঝাড়ি
খুঁজি লুপ্ত সুখের নিধি।
সোর করে জলের পরে
উঠ্ছে ফুটে উজল স্মৃতি;
দীঘির তলায় গলায় গলায়
ঐ যে ঘুমায় প্রাচীন প্রীতি।
দাগে দাগে চিন্তা জাগে
রেখার গায়ে রেখার প্রকাশ;
জলের মাঝে শুয়ে আছে
আমার ছায়া আমার আকাশ।
আমার বক্ষের কক্ষে কক্ষে
ভাঙ্গা ঘরের আঁধার জড়ায়;
বাঁশের ঝাড়ে প্রাণের পাড়ে
মায়ায়-রচা ছায়া গড়ায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।



বর্ণাশ্রমে বর্ণপরিচয়

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

চিত্রে ছন্দ ও রস

'ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্!'

ছয়টি সুশিক্ষিত ঘোড়ার মত ষড়ঙ্গ যাহাকে রথের ন্যায় আমাদের সম্মুখে বহন করিয়া চলিয়াছে সেই চিত্র কি? তাহার নির্ম্মাতা কে এবং সেই চিত্র বিচিত্র রথের অধিষ্ঠাতাই বা কোন্ দেবতা?

প্রথমেই দেখা যাক্ চিত্র কাহাকে বলি। যাহাতে রূপের ভেদাভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি বর্ত্তমান তাহাই চিত্র যদি এই কথা বল তবে আমার ঘরের মেঝেতে পাতা এই বিলাতি গালিচা-খানিকেও চিত্র বলিতে হয়; কেননা ইহাতেও নানা ফুলফলের রূপভেদ, গালিচাখানির চতুষ্কোণ মানপ্রমাণ, গালিচায় লিখিত এক এক ফুলের ও ফলের ভাব ও লাবণ্য, ঠিক টাটকা ফুলের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য এবং যাহার যে বর্ণটি তাহা পুরামাত্রাতেই দেখা যাইতেছে। যদি বল যে গালিচা দেওয়ালে খাটানো চলে না,—পুস্তকেও দেওয়া চলে না সুতরাং তাহা চিত্র নয়। কিন্তু আমি যদি চমৎকার সূক্ষ্ম করিয়া বুনিয়া একখানি গালিচা দেওয়ালে খাটাই অথবা পুস্তকে দিই, তখন কি হইবে তাহা চিত্র? দেওয়ালে খাটাইলেই, পুস্তকে দিলেই চিত্র হয় না। তুলির দ্বারা যাহা চিত্রিত হয় তাহাই চিত্র। কিন্তু তুলির দ্বারা লাঠিমটি চিত্রিত হইয়াছে, তুলির দ্বারা ঘরখানি নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে তবে এগুলিকে কি বলিবে চিত্র? সুতরাং দেখ, যাহাই তুলি দিয়া চিত্রিত হয়—মৃত্তিকা কিম্বা কাষ্ঠ কিম্বা একখণ্ড বস্ত্র—তাহাই চিত্র নয়; কিম্বা বাহ্য বস্তুর নকল যেমন ফটোগ্রাফ বা এই বিলাতি গালিচা ইহাও চিত্র নয়।

অভিধান লিখিলেন 'চীয়তে ইতি চিত্রম্'। চিত্রকর চয়ন করেন সত্য;—বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ উভয়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ চষন করেন। কিন্তু এই চয়ন কার্য্য কিম্বা এই চয়নের সমষ্টিকেও তো চিত্র বলিতে পার না;—ফুল বাছিয়া সাজি ভরান মালীর বাহাদুরি কিন্তু সেই বাহাদুরিটুকু তো চিত্রের সব নয়। পাঁচটা সংগ্রহ একত্র করিয়া প্রকাশ করিলে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রস্তুত হয়, চিত্র তো হয় না! কাজেই বলিতে হইতেছে যে চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক পরিণতি যে চিত্ত-হরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমালা তাহাই চিত্র।

বাহিরে বিশ্বজগৎ, রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছায়াতপে আলোআঁধারে পাঁচ-ফুলের মালঞ্চের মত প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে পদ্মসরোবর, সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদ ভাব-ভক্তির সুরে লয়ে লহরীতে ভরপুর রহিয়াছে; চিত্রকর এতদুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছেন ও মনন্-সূত্র দিয়া অপূর্ব্ব হার গাঁথিতেছেন এবং সেই হারে সাজাইয়া পুষ্পক-রথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কিন্তু কাহাকে বহন করিবার জন্য, কোন দেবতাকে মালা পরাইয়া এই রথে অধিষ্ঠিত করিয়া

আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য? আমি বলি আত্ম-দেবতাকে;—চিত্রকরের নিজের আত্মাকে। এই আত্মা যদি পটে চিত্রিত বা অধিষ্ঠিত রহেন তবে তাহাই চিত্র,—যদি গালিচায় অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাই চিত্র, —যদি গৃহভিত্তিতে অথবা যদি গ্রন্থের কাগজে অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাও চিত্র।

আত্মা আত্মীয়তার জন্য ব্যাকুল;—চারিদিকের আত্মীয়তার ভিতর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ভিতরে বিপুল একটা প্রকাশ-বেদনা উদয় হইয়া নিয়ত কার্য্য করিতেছে। এই প্রকাশ-বেদনের—এই উদয়ের অভিব্যক্তিই হচ্ছে চিত্র। এই উদয়ের রং, এই বেদনের শোণিমা যখন আসিয়া সাদা কাগজকে রাঙাইতেছে;—তাহাকে রূপ দিতেছে, প্রমাণ দিতেছে, ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ দিতেছে, তখনই হইতেছে চিত্র। সূর্য্য উদয় হইতেছেন কোন অন্ধকারের অন্তরালে তাহা কে জানে? আমরা তখনি তাঁহাকে দেখি যখন উদয়ের রশ্মিজালে আকাশপটকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে,—যখন সূর্য্যোদয়, জলস্থল অন্তরীক্ষের বিচিত্র রূপ, প্রমাণভাবলাবণ্যাদিকে সোনার এক জাগ্রৎ স্বপ্নে উদ্বোধিত করিয়া আপনার উদ্বোধন আমাদের জানাইতেছে। সুতরাং দেখিতেছি চিত্র যাহা তাহার গোড়াতে হচ্ছে গোপন একটি উদয়-উৎস যাহার ভিতরে প্রকাশ-বেদন আছে; আর শেষ একটি অনির্ব্বচনীয় রসোদয় যেখানে হচ্ছে চিত্রের পরিণতি। এবং এই দুই উদয়ের মধ্যে আছে রূপ ভাব লাবণ্য ইত্যাদির ছন্দ ছাঁদ ছাঁচ বা আচ্ছাদন। চিত্র হয় তখন যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত উদয়-বাসনা বা প্রকাশ-বেদনা ছন্দের নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহ্য দুই রূপে নিজেকে সঙ্গত করিয়া রসোদয়ে পরিণত হয়। শব্দচিত্র, সঙ্গীত, বাচ্য-চিত্র, কবিতা, দৃশ্যচিত্র, পট ও মূর্ত্তি ইত্যাদি কেহই সৃষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ না করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। যদি কিছু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া উদয় হয় তাহাকে বলিবনা সঙ্গীত, কবিতা কিম্বা চিত্র;—তাহাকে পাগলের খেয়াল, মাতালের প্রলাপ বলিতে পারি। পাগলের এবং মাতালের অন্তরের উৎকট প্রকাশ-বেদনা, উদয়-বাসনা কিছুতেই আপনাকে ছন্দে বাঁধিতে পারিতেছে না;—ছন্দের আবরণ ও আচ্ছাদন সে দূরে ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে; কাজেই বেদনাতেই তাহার পরিসমাপ্তি রসোদয়ের আনন্দে নয়।

চিত্র প্রথমোদয়ে বা প্রকাশ-বেদনের অবস্থায় অরুণ বা অব্যক্তরাগ শব্দরহিত; উদয়ের দ্বিতীয় অবস্থায় সে প্রনূন্ন,—ছন্দের মধ্যে সংপ্রেষিত প্রচলিত বা কল্পিত; আর উদয়ের তৃতীয় অবস্থায় সে অনূন, অখণ্ড সমগ্র অর্থাৎ রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে পরিপূর্ণ সূর্য্যের ন্যায় অখণ্ডমণ্ডলাকারে উদিত।

এখন দেখা যাইতেছে চিত্রের প্রথমোদয় এবং পূর্ণোদয়ের ঠিক মর্ম্মস্থানটিতে আছেন ছন্দ—ঊষার ন্যায় দীপ্তিমতী, শোভার জন্য জলোর্ম্মির ন্যায় উত্থিতা—সমস্ত স্থান সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করিয়া। চিত্রকরের মনের প্রকাশ-বেদন এবং চিত্রের প্রকাশ ইহারই মাঝখানটিতে ঊষার আনন্দ কাকলীর মত ছন্দ; এইজন্য ছন্দকে বলা হইয়াছে

'চন্দয়তি ইতি ছন্দ'। কেননা ইনি আনন্দিত করেন। ইনি উদয়ের উন্মেষ এবং উদয়ের শেষ এই দুয়ের শুভদৃষ্টির উপরে প্রচ্ছদ-পটখানির মত দোদুল্যমান; সেই জন্য বলা হইয়াছে 'আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দ'। ঊষার ভিতরে যেমন উদয়ের অভিপ্রায় নিহিত রহে, তেমনি ছন্দের ভিতর দিয়া চিত্রকরের মনোভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে; সেই জন্য ছন্দকেই বলা হয় 'অভিপ্রায়'। এখন দেখিতেছি, ছন্দ সে আনন্দকারী, ছন্দ, সে আচ্ছাদনকারী। ছন্দ অভিপ্রায়, ছন্দ অভিপ্রায়কে বাহিত করিবার সুপথ, ছন্দ নদীজলে তরঙ্গমালার শোভা। "ছন্দস্তু নানা বিধম্।" ছন্দ বহুবিধ; —রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণিকাভঙ্গের ছন্দ। ছন্দ—ছাঁদ্ বা ছাঁচ। ছন্দ—ছাঁদিয়া বাঁধা বা বাঁধা ছাঁদা। ছন্দ কিসে নাই? কোথায় নাই? ছন্দ ছেঁদো কথায়, ছন্দ ছাঁদ্না তলায়, ছন্দ নববধূটির তাড় ও কঙ্কণের রিণিঝিণির মাঝখানে, ছন্দ সমুদ্র ও চন্দ্রের পূর্ণ মিলনে, ছন্দ দিনমণির বিরহে, কমলিনীর ম্লানমুখে, ছন্দ আহ্লাদে, বিষাদে, শুষ্কতায়, পূর্ণতায়; ছন্দ হাসিকান্নাভরা খরা পূর্ণিমা অমাবস্যা,—শীতে বসন্তে জগৎ জুড়িয়া উঠিতেছে পড়িতেছে; ছন্দ আমাদের নিজের নিজের মনে; ছন্দ বাহিরে বিশ্ব জগতে এককে অনেকে, অনেককে একে মিলাইয়া—

তুম হম দো তুষ বীচ সুর।
বাজৈ তাজা তাজা,
উজর কবহি কাজর কবহি
রঙ্গ রঙ্গ নিত বাজা।

অন্তর এবং বাহির এই দুই তুম্বির মাঝে অসীম বিরহ, অনন্ত মিলন নূতন নূতন ছাঁদে বাঁধা পড়িয়া, বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদির বৈচিত্র্যে যেন আলো-ছায়ার রূপ ধরিয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে, তরঙ্গায়িত হইতেছে! এই তরঙ্গ এই ঝঙ্কৃতিই হয় ছন্দ। এবং কবি ও চিত্রকার এই তরঙ্গিত ঝঙ্কৃত রেখা ও লেখার বর্ণ-মালার বরমাল্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রূপে রস, রসে রূপ সম্প্রদান করেন। অন্তর বাহিরের দিকে এবং বাহির অন্তরের দিকে হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে;—এই দুই হাত যেখানে আসিয়া বাঁধা পড়িতেছে সেইখানেই রহিয়াছে। ছন্দ-মালাটি দোদুল্যমান। এক সুর প্রাণের কূল হইতে অকূলের দিকে ছুটিয়াছে, আর-এক সুর কোন্ অকূল হইতে প্রাণের কূলে আসিতে চাহিতেছে;—এই দুই কূলের দুই সুরের আকুলি-ব্যাকুলি যেখানে আসিয়া মিলিতেছে সেইখানেই দেখি ছন্দের শুভ্র তরঙ্গমালা রূপ ধরিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, গড়াইয়া পড়িতেছে। অন্তর হইতে পিচকারি ছুটিয়া বাহিরকে রাঙাইতেছে, বাহির হইতে পিচকারি আসিয়া অন্তরকে রাঙাইতেছে;—এই ছুটিয়া-বাহির-হওয়া ও ছুটিয়া-ভিতরে-আসার মধ্যে যে দোল, দোলা বা দোললীলা তাহাকেই বলি ছন্দ।

আমরা যে লোকে বাস করিতেছি তাহাকে বলা হয় ব্রহ্মলোক। এখানকার যাহা কিছু সকলি ছায়াতপ দিয়া আমাদের গোচরে আসে! 'ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'। সুতরাং ছন্দটিও দেখি ছাঁদ এবং বাঁধ এই ছায়াতপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। ছন্দের ছায়ার দিকটি যেন বধূ;—অনেকটাই অবগুণ্ঠনে ঢাকা; আর আতপের দিকটি যেন

বর—গোপনতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। ছন্দের এই ছায়াতপের যুগল মিলন ও সমস্ত রহস্যটির চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত আমরা ঘরে ঘরে ছাঁদনা তলায় বর-বধূকে ছাঁদিয়া বাঁধার আদ্যন্ত ব্যাপারটির মধ্যে পাইয়া থাকি। ছাঁদনা তলা—আচ্ছাদন তলা বা ছন্দস্থলীতে যে ব্যাপারটা ঘটে তাহাকে বলা হয় ছাঁদনী নাড়া—ছন্দনী শক্তিকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তোলা বা ছন্দের নাড়া (মঙ্গল সূত্র) বাঁধা।

এই ছাঁদনা তলা বা ছন্দস্থলী পাতা হয় বাড়ীর উঠানে গৃহস্থালীর সাত-মহলের সাত ছন্দের যেন প্রাচীর ঘেরিয়া। আর মাথার উপরে থাকে একবারে খোলা আকাশের চন্দ্রাতপ—লক্ষ কোটী গ্রহ-উপগ্রহের বিরাট ছন্দে দোদুল্যমান; পায়ের নীচে রহে সমস্ত উঠান জুড়িয়া রেখা ও বর্ণের ছন্দে বাঁধা পদ্ম ও ভ্রমরের, নয়তো রাজহংস মৃণালের, চক্রবাকচক্রবাকীর মিলন-বিরহের ছন্দ-কল্পনাটি।

এই ছন্দ বন্ধন ব্যাপারের সমস্তটুকু যাঁহারা পরিণীতা এমন রমণীদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহ হওয়া বিধেয়—কুমারী কিম্বা বিধবা যাঁহার জীবন-ছন্দ অন্য একটি জীবন-ছন্দে গিয়া এখনও মিলিত হয় নাই বা মিলিয়া আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে এরূপ কাহাকেও এই ব্যাপারে যোগ দিতে দেওয়া হয় না।

প্রথমেই বর বা ছন্দের আতপের দিকটিকে সভায় আনিবার পথে ধুতুরার বা নবরসের নেশার, নয় তো সাত বর্ণের বা সাত সুরের ত্রিসপ্তকের সংখ্যানুসারে নয়, সাত, কিম্বা একুশ প্রদীপ কুলায় সাজাইয়া বরের মাথার উপর দিয়া লাজাঞ্জলি বা পুষ্পবৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর বরকে ছাঁদন তলায় রাখিয়া রমণীগণ অপরিণত নবাগত ছন্দটির অন্তর বাহির দুই ছাঁদেরই মাপটুকু গ্রহণ করেন,—প্রথমে একটি সরল বেণুযষ্টি দিয়া ছন্দটির হ্রস্ব দীর্ঘ প্রমাণ, তৎপরে নিমুখ লতা যাহার কাঁটা নাই ও যাহার পাতার মুখ সূচ্যগ্র ও তীক্ষ্ণ নয় এমন একটি লতাবল্লরী দিয়া ছন্দের ভঙ্গিটুকু, ও পরিশেষে এক-গাছি রঞ্জিত মানসূত্র দিয়া ছন্দের অন্তরের রং ও গভীরতা—জলে যেন রশি ফেলিয়া—দেখিয়া লওয়া হয়। অন্তরের এই মানসূত্র যিনি রঞ্জিত করেন তিনিও সধবা বা পরিণীতা ছন্দ। তারপর যেন বর্গের পাঁচ পাঁচ অক্ষরকেই ছন্দটির সহিত একত্র গাঁথিয়া পাঁচ পান, পাঁচ ফল, পাঁচখানি আল্‌তা ইত্যাদি দিয়া লতা এবং রক্তসূত্র—যেন প্রমাণ লাবণ্য এবং ভাব দিয়াই ছন্দের বন্ধন করা—বরের হাত বাঁধা হয়। ইহার পরে সমস্ত ছন্দটিকে যেন সুশীতল মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশেই দুই রমণীতে—স্বামী সোহাগিনী বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে এমন দুই রমণীতে—মিষ্টান্ন মুখে দিয়া বা মাধুর্য্য রসের আস্বাদ লইতে লইতেই নিরালায় বসিয়া 'আই আমলা'—সখীর প্রেমের মধ্যে যে সুশীতল অম্লরসটুকু তাহাকেই যেন বণ্টন করিয়া মাধুর্য্যে মিশাইয়া যে অমৃতরসটুকু প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাই সাতটি পানে রাখিয়া যেন বর্ণ-সপ্তকে ও সুর-সপ্তকে মিলাইয়া বরকে বা ছন্দকে শ্রবণ আঘ্রাণ দর্শন স্পর্শন করান হয়। যেন বলা হয় ছন্দ তুমি মধুর হও, তোমার রূপ, তোমার স্পর্শ, ধ্বনি ও সৌরভ মধুর

হোক, তোমার স্বাদ মধুর হোক, তোমার আপাদমস্তক, অন্তর-বাহির, মধুর ও শীতল হইয়া বহুক। এইরূপে বর বা ছন্দকে মাধুর্য্য প্রদান করিয়া, সাত রমণী বা সপ্ত ছন্দ এক একজন এক একটি রাং-চিত্রের আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া জ্যোতির এক ছন্দ-মালার মত বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ছাঁদন তলার বা ছন্দ-বাঁধার প্রথম রীত সম্পন্ন করেন।

ছাঁদন তলার দ্বিতীয় রীতে ছন্দ-বন্ধন ব্যাপারটি স্পষ্টতর হইয়া আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। এই রীতের প্রথম অঙ্কে হয় সাত পাক; প্রথমা জলের ঝারি লইয়া জলোর্ম্মির ছন্দে, দ্বিতীয়া সাতটি আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া সূর্য্যের সপ্ত-রশ্মির ছন্দে, তৃতীয়া শ্রী লইয়া, চতুর্থা মধ্যমা বা প্রধানা একটি আচ্ছাদিত ভাণ্ডে জ্বলন্ত প্রদীপ—মঙ্গল ভাঁড় বা বউ ভাঁড় কিম্বা আইভাঁড়—যেন নববধূর মনের গোপন ছন্দকেই বহন করিয়া, পঞ্চমা বরণ ডালা যেন ষড়-ঋতুর বর্ণিকা-ভঙ্গের সবটুকু ছন্দ লইয়া, ষষ্ঠা শঙ্খ-ধ্বনির মঙ্গল ছন্দটি বহিয়া এবং সপ্তমা উলু দিয়া বা বাণীর ঝঙ্কার রচিয়া সাত পাকে বরকে বেষ্টন করেন।

এই রীতের দ্বিতীয় অঙ্কে সাত ছন্দের এক-একটি দিয়া বরণ। ইহার প্রথমেই জল-হাত বা জলোর্ম্মি এবং সব শেষে নয় প্রদীপের সেঁক বা নবরসের অভিসিঞ্চন।

তৃতীয় অঙ্কে কন্যাকে বা অনূঢ়া ছন্দকে বরের দিকে, বায়ু-তরঙ্গের ছন্দটির উপর দিয়াই চারি পুরুষ-ছন্দ চারিবেদ বা ছন্দস্‌গণ বহন করিয়া আনেন আচ্ছাদন (ছন্দের ?) আড়াল দিয়া এবং বধূছন্দ বা ছন্দের ছায়ার দিকটিকে লইয়া বরছন্দ বা ছন্দের আতপের দিকটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান। পিতার সহিত কন্যার মনের ছন্দ, ভাবের ছন্দ যেন হইতেছে ছিন্ন সেই কারণেই পিতা-মাতা ইঁহারা এ সময়ে কন্যা-ছন্দকে বহন করেন না।

রীতের চতুর্থ অঙ্কে শুভ দৃষ্টি! এপারে যাহা ওপারে যাহা তাহাদের শুভ দৃষ্টি—ছায়াতপের শুভ দৃষ্টি? আচ্ছাদনকে (ছন্দকে) মাথায় ধরিয়া।

পঞ্চম অঙ্কে মালা-বদল বা দুই পারের, অথবা ছায়াতপের গান্ধর্ব্ব-পরিণয়ে, ছন্দ-বন্ধন সার্থক হয়। "যথাপ্সূপরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে"—গন্ধর্ব্বলোকে সমস্তই যেমন বায়ু-তরঙ্গের, শব্দ-তরঙ্গের, রস-তরঙ্গের উপরে তরঙ্গিত ভাবে দেখা দেয় তেমনি ছাঁদনাতলার এই গন্ধর্ব্বপরিণয়ের সমস্তটা ছন্দময়-একটা-হিল্লোলের ভিতর দিয়া যেন ছন্দকেই আমাদের গোচরে আসিতেছে দেখি।

এদেশে স্ত্রীলোকদের হাতে পরিবার অনেকগুলি গহনা আছে, তাহার মধ্যে একটির নাম হচ্ছে ছঁদ্ বা ছন্দ। এই ছাঁদটি ধারণ করিবার নিয়মে এবং এই আভরণটির গঠন-কল্পনাতে ছন্দ ও ছন্দ-বোধের সমস্ত রহস্য-টুকু নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রথমত ছাঁদটির গঠন একটি পূর্ণচন্দ্র এবং একটি বিকশিত পদ্মফুল পরে পরে সাজাইয়া—যেন অরুণোদয়ের ছন্দ এবং চন্দ্রোদয়ের ছন্দের সহিত পদ্মের ছন্দটির গোপন-সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া। তার পরে ছঁদটি পরিধানের নিয়ম

হচ্ছে—একদিকে টাঁড় * অর্থাৎ তট তাহার কোলে তিন জল-তরঙ্গ চুড়ি, আর-একদিকে পহুঁছা এবং কঙ্কণ তাহার কোলে আর তিন জল-তরঙ্গ। দুইদিকে দুই ভূষণ-তরঙ্গ ও তাহার দুই কূল উপকূলের ঠিক মাঝখানটিতে থাকে ছঁদ্ বা ছন্দটি—দুই কূলের মিলন ঘটাইয়া—টাঁড় ও কঙ্কণের উভয় ঝঙ্কারকে একটি সুমধুর নিক্কণে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। এই ছঁদ্‌টি না দিয়া ভূষণ পরা যেমন, আর ছন্দ না দিয়া চিত্রলেখাও তেমনি অশোভন।

অলঙ্কার পরিধানের আর একটি নিয়মে আমাদের দেশের সেকালের স্ত্রীলোকদের ছন্দ জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাইতেছি। সমস্ত গহনা পরিয়া সমস্তটির চাকচিক্যের উপরে অতি সূক্ষ্ম মলমলের আচ্ছাদন দেওয়া সেকালে প্রথা ছিল;—যেন আভরণের পূর্ণ-প্রকাশের মাঝে শুভ্রবর্ণা ঊষার আবরণ, আচ্ছাদন বা ছন্দটি।

এই ছন্দকে পরিত্যাগ করিলে ঘরে ছিরি ছাঁদ থাকে না, কাজে ছিরিছাঁদ রহেনা। ছাঁদ হচ্ছেন শ্রী। তাঁহাকে বাঁধাই হচ্ছে ছাঁদে বাঁধা বা শ্রীরাধিকার কাণড়া-ছাঁদে কবরী বাঁধা। শুধু যে বাঁধা সে কষ্টের বাঁধা,—হাতকড়ির বন্ধন। আর যে ছাঁদিয়া বাঁধা সে হচ্ছে যেন শীত-গ্রীষ্মের মাঝে বসন্ত তিলকের মত মনোহর। ছাঁদ না দিয়া যে বাঁধা তা কে না পারে? এক রসিক ছাড়া ছাঁদিয়া বাঁধা আর কাহারও কর্ম্ম নয়।

এত ছাঁদে কে না বাঁধে চুল
তোমার চূড়ায় মজাইল জাতি কুল।

* * *

কেবা নাহি গাঁথে বনমালা
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা

* * *

কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া
প্রাণ কান্দে এরূপ হেরিয়া।

* * *

কেবা নাহি কহে কথা খানি
তোমার চাঁদমুখে সুধা খসে জানি।

এই যে যাহা জাতিকুল মজায়, জ্বালা দেয়, প্রাণ কাঁদায়, মুখের কথায় সুধা খসায়, রূপকে ভঙ্গিমা দেয় তাহাই হইতেছে ছন্দ। এই ছন্দের শক্তি বোধ করা ও বোধ করানই হচ্ছে ছন্দ-বোধ এবং এই ছন্দ-শক্তিকে রূপ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই হচ্ছে চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

এখন, চিত্রের যে প্রাণের প্রাণ যে রস তাহা কি? ছন্দ। যাহাকে চিত্রকারের চিত্ত হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আবার আমার চিত্তে বাহিত করিতেছে! 'রসো-বৈসঃ!' রসনা, রসের আস্বাদ গ্রহণ করাই যাহার কাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে 'রস সে রসই'। বলিতে কহিতে রসনা কোনো কালেই নিরস্ত নয়, কিন্তু কেবল রসের বেলাই সে বলিতেছে ব্যস্। ছন্দের পরিণতি রসে, কিন্তু রসের পরিণতি কিসে? বলিতে হয় তাই বলি 'ব্যস্'এ,—নয় তো দুই ফোটা অশ্রুজলে। ইহা

* হিন্দিতে টাঁড়কে তট বলে।

অপেক্ষা রসকে অধিকতর পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জো নাই। এই হ'ল রস—একথা বলা চলে না। কেননা 'স চ ন কার্য্যঃ নাপি জ্ঞাপ্যঃ'! তবে কি সে আকাশ-কুসুমের মত অলীক? কখনই না। রস যে হচ্ছে। রস যে পাচ্ছি! রস যে রয়েছে দেখছি। 'পুরইব পরিস্ফুরণ'—যেন সম্মুখে। 'হৃদয়মিব প্রবিশন্' —যেন বুকের ভিতরে, 'সর্ব্বাঙ্গীনমিবমালিঙ্গন' সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করে।

রসোন্মত্ত ময়ূরের সকল গায়ে রস, মণি-মাণিক্যের জ্যোতির মত ফুটিয়া উঠিতেছে —এ যে চোখে দেখিতেছি, রসে তাহার বুক সুরা-পাত্রের মত ভরিয়া উঠিতেছে, রস তাহার বিচিত্র পিচ্ছের রোমে রোমে শিহরণ দিয়া নির্ঝরের মত ঝরিয়া পড়িতেছে! রসকে যে দেখিতেছি, রসকে যে শুনিতে পাইতেছি, কেমন করিয়া বলি রস অলীক? নব নব চিত্র বিচিত্র রঙ্গ ও ভঙ্গ যে রসের শৃঙ্গার বেশ! 'অয়ম্ শৃঙ্গারাদিকো রসঃ অলৌকিক চমৎকারি'—সে অলৌকিক এক চমৎকার সামগ্রী। সে রহিয়াছে, সে আসিতেছে। 'অন্তৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ'—তাহার সম্মুখে কিছু আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, রসে সব ভাসাইয়া লইতেছে, রসের মধ্যে সকলি ডুবিয়া যাইতেছে! বিরাট প্লাবনের মত সকলের উপরে 'ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন্'—যেন বৃহতের আস্বাদে আমাদেরও বড় করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে সেই প্রকাণ্ড আস্বাদ - রস।

রস যখন চিত্রের সর্ব্বস্ব, তাহার প্রাণেরও প্রাণ তখন এক প্রাণ-রসনা ব্যতিরেকে আর কোন ইন্দ্রিয়—না চক্ষু না শ্রোত্র—চিত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, চিত্রিতব্যের স্বাদ পাইতেছে। চিত্রের উৎপত্তি চিত্রের পরিণতি এই দুইটিই যখন রহিল প্রাণের ভিতরে, তখন প্রাণ দিয়াই তাহাদের উভয়কে দেখিতে হয়, শুধু চোখ দিয়া নয়,—এমন কি যেটুকু চোখে দেখিতেছি, হাতে ধরিতে পারিতেছি তাহাকেও চোখ দিয়া দেখা শুধু নয়, হাত দিয়া ছোঁয়া শুধু নয়,—প্রাণ দিয়া দেখা, প্রাণ দিয়া স্পর্শ করা।

"চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলো আর মাটি।
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখা রসের সাঁই খাটি।
চোখে ধুলো আর মাটি, প্রাণে রসের সাঁই খাটি।

রূপের রসের ফুল ফুইটা যায়
আমার পরাণ সুতা কই।
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশি
আমি শুইনা আকুল হই।
আমার মিলন মালা হইল নারে
লাজে পথ হাঁটি
কেবল হাঁটি আর হাঁটি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অরণ্য ষষ্ঠী

পঞ্চমীর একটুখানি চাঁদ পশ্চিম-আকাশের এক কোণ হইতে ম্লান আলোকের ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র কর প্রসারণ করিয়া, গৃহস্থের অঙ্গনের তুলসী-তলার মৃৎ-প্রদীপের নিকট পড়িয়া, বালিকা বধূটির মত সঙ্কুচিত ভাবে যেন প্রণাম করিতেছিল; ঠাকুর-ঘরে শঙ্খশব্দ নীরব

হইয়াছে। সমস্ত দিনের গুমো গরমের পর, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বায়ু একটু উদ্দাম ভাবেই উঠানের পার্শ্বস্থিত কদলী বৃক্ষের দীর্ঘ দীর্ঘ পাতাগুলা লইয়া খেলা করিতেছে! আম্র বৃক্ষের পল্লবরাশির মধ্যে লুকাইয়া একটা কোকিল পক্ক আম্রের স্বাদে তুষ্ট হইয়া এক এক বার ডাকিতেছে কু-উ! বাড়ীর বাহিরে পথি পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে সেই কু-উ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী সাড়াও একবার একবার আসিতেছে 'চোখ গেল'।

প্রভাতে "অরণ্য" বা "জামাই ষষ্ঠী"। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের এই ষষ্ঠীই বারোমাসের তেরো ষষ্ঠীর মধ্যে "রাজষষ্ঠী"! তাই আজিকার ঐ বালচন্দ্র ও তারাসনাথ আকাশখানির মত গৃহস্থের অঙ্গনখানিরও বড় শোভা। সেখানে আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে বালকবালিকারা মা ষষ্ঠীর "কোল বায়নার" সজ্জা তৈয়ারী করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত! কেহ কলার "পেটো" (খোলা) গুলি একহাত দেড় হাত পরিমাণ কাটিয়া রাখিতেছে, কেহ নারিকেলের খিল্ ভাঙ্গিয়া তাহাতে শুষ্ক কদলী-ত্বকের "ছেটো" বাঁধিয়া খিলগুলি বাঁকাইয়া ধনুএবং নারিকেলের খিলের দুইধারে কড়ি পরাইয়া তীর তৈয়ারী করিতেছে; কেহবা শুষ্ক 'বাস্না' টুকরা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইয়া ঐরূপে পাখা তৈয়ারী করিতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কিশোরী "সিদি" বা "বৌদিদিরা" আতব চাউলের গুড়ি বা পিটালীর সঙ্গে কয়লার গুড়া মিলাইয়া "পোনা"ঘেরা একটা সোল মাছ আর গৃহস্থের বাড়ীর সেই "কালো বিড়াল" ও তাহার বাচ্ছা গড়িতেছে; এবং পিঠালিতে হলুদ-গুঁড়া মিশাইয়া মা ষষ্ঠীর খাড়ু কঙ্কণ ও গায়ে সিঁদুরের ডোরা টানিয়া শঙ্খ চিত্রিত করিতেছে। কেহবা ষষ্ঠ গাছি দূর্ব্বা ও ধানের শিষ সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু তাহাদের সময়ই সব চেয়ে কম। বাড়ীর জামাই দুইটি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন;—তাঁহাদের জল-খাওয়ানো পান-দেওয়ার জন্য অনোগোনায় মাঝে মাঝে কিশোরীদের চপলগতি চরণের রুণুঝুণুর সঙ্গে আনন্দের কলকণ্ঠও বাড়িয়া উঠিতেছে "মাগো! বারে বারে এমন করে ফরমাস্ খাট্‌তে হলে, কেবল পান সাজা আর জল খাবার যোগাতে হ'লে আমাদের কাজ এগোবেনা দেখ্‌ছি, আমরা কখন্ কি করব!"—"ওঃ—বেজায় কাজের লোক যে সব"—উত্তর দিবার অছিলায় মধুর সম্পর্কীয় কেহ এই কোন্দলটি একটু জাঁকাইয়া তুলিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঝঙ্কারে প্রতিবাদ উঠিতেছে—"নাঃ তা কেন! দাবা টেপা আর পান চায়ের শ্রাদ্ধ করাই সব চেয়ে গুরুতর কাজ!" বাড়ীর বধূও জ্যেষ্ঠা কন্যারা রন্ধন ও তাহার উদ্যোগাদিতে ব্যস্ত। গৃহিণী ঠাকুর ঘরের দ্বারে বসিয়া খানিকটা ক্ষীর লইয়া ক্ষীরের নাড়ু ও পুতুল গড়িতে গড়িতে কিশোরী কন্যাদের কোন্দল শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ষাট্ ষাট্!—বাছারা আমার কতদিন পরে আমার কত ভাগ্যে এসেছে! মেয়েগুলো যেন দিন দিন ধিঙ্গি হচ্চেন!" বড়বধূ রন্ধনগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কনিষ্ঠা ননদের কোন্দল শুনিয়া হাসিয়া অঞ্চলে হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন "ওরা কেবল দাবা বড়ে টেপো আর তোরা বুঝি কলেজ কাছারীর কাজট

সেরে দিস্।" প্রতিবাদী পক্ষ এতবড় একটা পৃষ্ঠপোষক পাইয়া খুসী হইয়া বলিল "বলুন ত বৌদিদি?" তাহাতেও নিস্তার নাই!—"তাই কি না পারতাম নাকি? এমনি করে টাকা ঢেলে পড়াতে পারনি?" গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া প্রতিপক্ষরা বহির্বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইল।

আনন্দে রহস্যে পানভোজননিদ্রায় বাকী রাত্রিটুকু শেষ হইতে না হইতে গৃহিণী বধূ ও কন্যাদের লইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ষষ্ঠী পূজার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। পল্লী গ্রামের মত সহরের মধ্যে তাঁহারা ষষ্ঠীতলায় পূজা দিতে যাইতে পারেন না, তাই গৃহের মধ্যেই অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের ডাল পুতিয়া তাহার চারিদিকে আলপনা দিয়া ষষ্ঠীর 'ভার' 'বাটা' ও "কোল্‌বায়না" সাজাইতে লাগিলেন। ষষ্ঠী বৃক্ষের বিকল্পে অশ্বত্থ বটের প্রোথিত ডাল দুটির দুই পাশে বড় বড় কাঁঠাল, কদলীছড়া, বোঁটাসহ পক্ক আম্র, নারিকেল, জাম, খেজুরকাঁদি, ও দধির 'কোর্' দিয়া ষষ্ঠীর 'ভার' সাজানো হইল এবং বাড়ীর প্রত্যেক 'পোয়াতির' (সন্তানের মাতার) ছয়খানি হিসাবে "কোল্ বায়না" দুই ধারে লম্বা সারি দিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল! 'কোল্ বায়না'-গুলির সাজও বড় সুন্দর। নারিকেলের কাঠিতে লাল নীল নানা রঙের ফুল গাঁথিয়া নৌকাকার মোচার খোলার দুই পাশে বিঁধিয়া বিঁধিয়া মাথাগুলি দুইটি দুইটি একত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে! তাহার ভিতরে নানা রকম ফলের টুক্‌রা, পক্ক আম্র, ছোট ছোট দধির ভাঁড় মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং তাহার উপরে পূর্ব্বদিনের নির্ম্মিত তীর ধনুক ও পাখাগুলি শোভা পাইতেছে। তাহার পাশে জামাতৃ অর্চ্চনের জন্য নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত রেকাবীর উপরে কোঁচান ধুতী চাদর সমন্বিত "ষষ্ঠীর বাটা"। এইজন্যই এদিনের নাম "জামাই ষষ্ঠী"! বাড়ীর নূতন জামাতাটিকে অন্ততঃ এ ষষ্ঠীতে আনা চাইই। ষষ্ঠীগাছটি ঘেরিয়া কয়েক ফের্ হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্র জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে! গাছতলায় সেই কয়লার গুঁড়া ও পিঠালিরঞ্জিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিড়ালটি শাবক সহ মোচার খোলার উপরে বিরাজ করিতেছেন, তা ছাড়া গোলা সিন্দুর শাঁখা ও কঙ্কণের নিকটে পিঠালির শোলমাছ, করমচা, ক্ষীরের ভাঁটা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি বঙ্গের আদর্শ সন্তান—মা ষষ্ঠীর দুলাল "ষাটের বাছা"দের কীর্ত্তি কাহিনীর স্মৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনার্থে শোভা পাইতেছে! ইহা ছাড়া পুষ্প পত্র, তৈল হরিদ্রা, আমান্ন, চিনির নৈবেদ্য ও কর্ত্তিত ফল মূলাদি উপকরণে গৃহের মধ্যে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ! তথাপি গৃহিণীর মনের খুঁৎখুঁতানি যাইতেছে না। "ঘোষাণি মাগী বেশী দুধ দিতে পারলে না, যা দিয়েছে তাও শুধু জল! মণির মাপে মা ষষ্ঠীকে ক্ষারের পুতুল দেব মানৎ ছিল তা পুতুলের ছিরি হল দ্যাখ্! মণির কি সেবার বাঁচ্‌বার কথা ছিল! মা যাই মুখ রক্ষা করেছেন তাই! হাঁরে মার ডানে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে তো? বিনুর অসুখেও মেনে ছিলাম! সে সব অদিনে আমার মা বই কিছুরি ভরসা থাকে না! কপালে যা ছিল হয়েছে, এখন এই যমের এঁটো কুড় ঝাঁটদেওয়া ক'টিকে মা "বাঁচিয়ে

বত্তিয়ে” রাখুন! ওরে তোরা ভাল করে মনে করে দ্যাখ্ পূজোর কিছু অঙ্গহানি হয়নি তো মা-র, সব দেওয়া হয়েছে ত? “ষাট্ বাঁচানো”র পাখা কই? এই ছাখ্ দিকি যা আমার মনে না পড়্বে তা আর কারুর মনে আসবে না! এখনি কি হত আমার?” —বধূ কন্যারা আস্তে আস্তে ষাট গাছা দুর্ব্বা ও ষাট গাছি বাঁশের শিষবাঁধা একখানি নব তালবৃন্ত আনিয়া মা ষষ্ঠীর পায়ের গোড়ায় রাখিল। “সবই ত হয়েছে মনে হচ্চে এখন পুরুত ঠাকুর এলেই যে হয়! আমার পাঁচ্টা বাচ্চা কাচ্চার ঘর, ক্ষিদেয় ছট্ফট্ করে সব, পুরুত ঠাকুরের আগে আমার বাড়ী আসা উচিত—তা বল্লেত তিনি শুন্বেন না! ওরা যে চা খেতে পায়না।”—ছোট বধূটি হাসিয়া বলিল “এতক্ষণে মার তাড়াতাড়ির আসল কারণটা বেরিয়ে পড়্ল! মণি বিনুতো ক্ষিদেয় এখনো কাঁদেনি, কিন্তু চায়ের জন্যে যে কি হচ্ছে কি রকম গলা শুকুচ্চে ওদিকে, তা কেবল মা-ই বুঝ্তে পার্ছেন!” গৃহিণী কৃত্রিম কোপে বলিলেন “তোরা চুপ্ কর্তো বাপু! তোদের ঝগড়ার জ্বালায় আর বাঁচিনা! বাছারা আমার কত ভাগ্যে এসেছে! মা যে আমায় এমন দিন দেবেন এ কি কখনো আশা কর্তে পেরেছি!”

পুরোহিত আসিয়া পূজা করিতে বসিলেন! সেই নধর শ্যামল বৃক্ষশাখার তলে “দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গী” অঙ্কাশ্রিত সুতশোভী—বঙ্গ মাতাকে আবাহন করিয়া ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। চিরজীবি মার্কণ্ডও ষষ্ঠী দেবীর সহিত অদ্য বঙ্গের গৃহে পূজা পাইয়া থাকেন।

পূজান্তে গৃহিণী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিলেন “ওদের স্নান করতে বল—মাষষ্ঠীর এই তেল হলুদ মাখিয়ে দিয়ে আয়!” বড়বধূ হাসিয়া ফেলিল “মা যেন কি!—ওরা কিনা কচি খোকা! তোমার তেল হলুদই তো মাখবার জন্য বসে আছে!”—“আহা কপালে একটু ছুঁইয়ে দিয়ে ‘লক্ষণ’ করতে বলছি, তোদের জ্বালায় আর বাঁচিনা ত!”—বধূ সপরিহাসে বলিল “যাও ঠাকুরঝি! মার খোকাদের হলুদ কাজল দিয়ে এস!—আমার হাতে একটু দিয়ে যাও আমি ছোটগুলোর কপালে ছুঁইয়ে দি!” ঠাকুরঝি জ্যেষ্ঠার দায়িত্ব পূর্ণ গাম্ভীর্য্য সহকারে হলুদ তেলের বাটী লইয়া মাতৃনির্দ্দেশ মত ভ্রাতা ও ভগ্নিপতিদিগের কপালে ছোঁয়াইতে গেল।

গৃহিণী তখন বাড়ীর এবং প্রতিবাসী “পোয়াতি দোয়াতি”দের ডাক্ দিলেন ‘আয় সবাই ষষ্ঠীর কথা শুনবি আয়।”

স্নানান্তে পুত্রকন্যাদের “হাতে কোলে” লইয়া পট্টবস্ত্র পরিহিতা তরুণী জননীগণ, নাতি নাতিনীর হাত ধরিয়া দিদিমা ঠাকুরমারা—সকলে আসিয়া সেই কৃত্রিম ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইল!—“কালো বেড়ালের” অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিবার জন্য বালক বালিকারা যথাসাধ্য সংযত ভাবে মায়ের বা দিদিমা ঠাকুরমার কোলে পিঠে পার্শ্বে স্থান করিয়া লইয়া উৎসুক ভাবে চাহিতে লাগিল। মাতৃহস্তের সদ্যঃ যত্ন-বিন্যস্ত কালো চুল গুলি ও ঈষৎ হরিদ্রারঞ্জিত ললাটের নীচে কাজলের রেখা টানা ডাাবডেবে চোখগুলি—সেই তীর ধনুক ও পুষ্প নিশানে শোভিত কলার খোলা, ক্ষীরের পুতুল, এবং ক্ষীরের ভাঁটার পানে চাহিয়া ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল! বধূ ও কন্যাদের আশে

পাশে লইয়া গৃহিণী পুরোহিতপরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া অশ্বত্থ শাখার গাত্রস্থ হরিদ্রারঞ্জিত সূতার “থেই” নিজ হস্তে ধরিলেন এবং বধূ-কন্যাদেরও হস্ত স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। প্রত্যেক “পোয়াতির” হস্তে ছয়টি করিয়া ক্ষীরের শিশু এবং তাহাদের দুইটি জনক জননী পুতুল ধরিতে দিয়া মা ষষ্ঠীকে প্রণাম করিয়া গৃহিণী ষষ্ঠীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এক থাকেন “গেরোস্তো। গেরোস্তর একটি বেটা একটি বৌ! গেরোস্তোর গোলায় ধান মড়্ মড়্ করছে, ঔরি চৌরি দক্ষিণ দুয়ারি ঘর, গোয়াল ভরা গরু বাছুর, একখানা ভুঁয়ে সাতখানা নাঙোল, রাখাল কৃষাণে বাড়ী ভরা অতুল সুখ সম্পদ, কিন্তু কর্ত্তা গিন্নির মনে সুখ নেই!—একটি বেটা একটি বৌ, সেই বৌয়ের সন্তান হয় না! সন্তান হবে কি বৌটা বড় “আলিষি! বড় ‘নোলা’! গেরোস্তের অঢাল্ ভরপুর ঘরকন্না—কিন্তু বৌটোর স্বভাব বড় মন্দ। বৌটো করে কি কড়াভরা দুধের সরখানা তুলে টপ্ করে খায়, “কোচ”ভরা দইয়ের সরখানা তুলে গালে ছায়, হেঁসেলের ভাজা মাছের আগ্ তুলে খায়, ঠাকুর দেবতা মানা নেই, বামুন বৈষ্ণব মানা নেই, ভাল জিনিষ দেখলেই তার আগ্ তুলে খায়, আর যেই “কি হ’ল—কে খেলে” বলে খোঁজ পড়ে অমনি বাড়ীর “কালো বেড়ালটার নামে দোষ ছায়!—” কে আর খাবে ঐ কালো বেড়াল্ খেয়ে গেল!”—তখন ধর্ কালো বেড়ালটাকে, মার্ কালো বেড়ালটাকে!—

নিত্যি নিত্যি বিনি দোষে এই রকম ‘প্রহার’ কালো বেড়ালের ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠ্ল! কালো বেড়াল—মা ষষ্ঠীর বাহন। সে বনে গিয়ে মাষষ্ঠীকে জানালে “মা গেরোস্ত দের বৌটা বড় বজ্জাত। নিজে খায় আর বিনি দোষে আমার এই রকম লাঞ্ছনা করে, মা আমার আর সহ্য হয় না! বৌটাকে তোমায় জব্দ করতেই হবে।” মাষষ্ঠী বল্লেন বটে? আহা! বৌটা তো বাঁজা হ’য়ে আছে এইবার তার সন্তান সম্ভাবনা হবে। যে দিন ছেলে হবে সেই রাত্রেই তুই ছেলে চুরী করে এনে আমার ছেলে আমার কাছে দিয়ে যাবি। তাহ’লেই গেরোস্তর বৌ জব্দ হবে!” কালো বেড়াল খুসী হয়ে চলে এল; এদিকে অল্পদিনের ভেতরই সবাই টের পেলে বৌ পোয়াতি হয়েছে। কর্ত্তা গিন্নির আর আনন্দের সীমা নেই,—একে একে বৌকে পঞ্চামৃত সাধ সোমন্তন সব দিলে। বৌটা একেই বজ্জাত, তাতে সকলের আদরে আরও আদুরে হয়ে ঠাকুরদের নৈবিদ্যির মণ্ডা পর্য্যন্ত নিয়ে খেতে লাগল এবং কালো বেড়ালের দোষ দিতে লাগ্ল! কালো বেড়াল মার্ ধোর খেয়েও বৌমাকে জব্দ করবার জন্য গেরস্তর বাড়ী পড়ে রইল। তারপরে দশমাসে গেরস্তদের বৌর একটি চাঁদের মত ছেলে হ’ল, আনন্দে আহ্লাদে দিন কেটে গেল, রাত্রে সবাই যেমন ঘুমিয়ে পড়েছে “কালো বেড়াল” অমনি নিঃশব্দে আঁতুরে ঢুকে ছেলেটিকে মুখে ক’রে নিয়ে বনে মাষষ্ঠীর কাছে দিয়ে এল। (এইখানে সকলে এক একটি ক্ষীরের পুতুল কালো বেড়ালের নিকট ষষ্ঠীর গাছতলায় রাখিয়া দিল।

সকালে গেরস্তর বাড়ী হাহাকার পড়ে গেল। কত ভাগ্যে একটি ছেলে,—সে ছেলে

আঁতুর থেকে কোথায় গেল ? খোঁজ খোঁজ, আর খোঁজ, মা ষষ্ঠী যাকে নিয়েছেন মানুষে তাকে কোথায় খুঁজে পাবে ! "ভগবানের মার দুনিয়ার বার !" অনেক কেঁদে কেটে আর কি কর্‌বে ক্রমেই সকলে চুপ্ কর্‌লে ! আবার দিন যায় কিন্তু গেরস্তর বৌর স্বভাব শোধ্‌রালো না ! "কালো বেড়াল"ও প্রতি-শোধ দেবার জন্য মাষষ্ঠীকে নালিশ করে করে ঐ রকমে আরও ৪টি ছেলে গেরস্তর বৌর কোলে থেকে আঁতুর ঘর থেকেই চুরী করে মাষষ্ঠীর কাছে দিয়ে এল। গেরস্তর বাড়ীতে শোকের সীমা নেই, বছর বছর বৌর একটি করে চাঁদের মত ছেলে হয় আর ২।১ দিন না কাট্‌তেই আঁতুর থেকে ছেলেটি যে কিসে নিয়ে যায় কেউ টের পায় না। গেরস্তরা কত পাহারা বসিয়ে কত তন্ত্র মন্ত্র তুক্‌তাক্ করে, কিছুতেই ৫টি ছেলের একটিকেও রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না ! (এই-খানে সকলে হাতে একটি মাত্র পুতুল অবশিষ্ট রাখিয়া বাকী সব কটি বেড়ালের মুখে ধরিয়া মাষষ্ঠীর নিকটে পৌছাইয়া দিল) বৌটা কাঁদে কাটে প'ড়ে থাকে—তবু স্বভাব যায় না ! কালো বেড়াল গিয়ে মাষষ্ঠীকে বল্লে "মা গেরোস্তর বৌএর এত দুঃখেও শিক্ষা হ'লনা। তুমি আবার তাকে একটি ছেলে দাও।" মাষষ্ঠী বল্লেন "তথাস্তু।" ছয় বারের বার গেরস্তর বৌ আঁতুরে ঠায় জেগে বসে রইলো,—কে এমন করে ছেলে নিয়ে যায় ধর্‌ব এবার ! তিন দিনের দিন রাত্রে আঁতুরের বাইরের লোক যেমন ঘুমিয়ে পড়েছে গেরস্তর বৌ ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, নিসুঁত রাত ঝম্‌ঝম্ কর্‌ছে, মাষষ্ঠীর ছলনায় মানুষের সাধ্য কি যে জেগে থাকে ! বসে থাকতে থাকতে যেমন তার চুল এসেছে অমনি কাল বেড়াল আঁতুরে ঢুকে নিঃশব্দে ছেলেটি মুখে করে নিয়ে বনের দিকে ছুট্‌ল। অনেক দুঃখের পর ভগবানের দয়া আপনিই আসে, গেরস্তর বৌয়েরও অমনি ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তার মনে হোল কিসে যেন তার কোল থেকে ছেলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে, গেরস্তর বৌ অমনি "আচ্ কাটিয়ে" উঠে কারুকে ডাক্‌বারও অপেক্ষা না করে বেড়ালের পেছনে পেছনে বনের মধ্যে চলল। প্রাণ যায় আর থাক্ কিসে এমন করে আমার ছেলে নেয় ধর্‌তেই হবে ! হয় ছেলে ফিরিয়ে আন্‌ব নচেৎ প্রাণই দেব আজ—"এই সঙ্কল্প করে বৌ নিসুঁতি অন্ধকার রাত্রে সেই বেড়ালের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। বিজন বন ডাল পড়ে ঢেকী হয় পাত্ পড়লে কুলো হয়, এমন যে বিজন অরণ্য তার মধ্যে পড়ে গেরস্তর বৌ আর রাস্তা খুঁজে পায় না। তখন মাষষ্ঠীর দয়ায় হাতে একগাছা সুতো ঠেক্‌লো; সুতো গাছটা ধরে একপা একপা করে এগিয়ে দেখে বেশ রাস্তা, বৌ সেই সুতো ধরেই চলতে লাগল। খানিক গিয়ে ছাখে বনের মধ্যে আলো, ছেলের জন্য সেদিন বৌ প্রাণকে পণ করেই বেরিয়েছে, নির্ভয়ে এগিয়ে ছাখে প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থর ডালে বনের মধ্যে আঁধার হ'য়ে রয়েছে—তার তলায় "হোলা শাখা গোলা সিঁদুর কঙ্কণ লাল পেড়ে সাড়ী" প'রে কে একজন মেয়ে মানুষ বসে আছেন তারই অঙ্গের ছটায় বন আলো হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কোলে পিঠে

আশে পাশে কত সুন্দর ছেলে মেয়ে খেলা কর্‌ছে ! কালো বেড়াল তাঁর পায়ের তলায় একটি ছোট ছেলে মুখ থেকে নামিয়ে দিলে, গেরস্তর বৌ দেখেই বুঝলে এইটি তার এবারের ছেলে। (এইখানে অবশিষ্ট পুতুলটিও মষ্ঠী তলায় দেওয়া হইল :) গেরস্তর বৌকে দেখে কটি ছেলে মেয়ে যেন চম্‌কে উঠল, মাষষ্ঠী হেসে বল্লেন "গেরস্তর বৌ তুমি এত রাত্রে এখানে কেন ?"—গেরস্তর বৌ গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাতে বল্‌লে "মা তুমি কে তা আমি জানিনা, কিন্তু কালো বেড়াল আমার ছেলে চুরী করে এনে তোমার পায়ের কাছে দিলে দেখছি। এমনি করে আমার আর পাঁচটি ছেলেত এনে দিয়েছে বুঝতে পার্‌ছি। মা তুমি কে ? তুমি কেন এমন করে আমার ছেলে হরণ কর ! আমার ছেলেগুলি দেবে ত দাও নইলে এইখানে আমি 'হত্যা হব !'—মাষষ্ঠী বল্‌লেন "তোর মত পাপিষ্ঠিকে কি আমি ছেলে দিই। তোকে সাজা দেবার জন্যেই বছরে বছরে তোর কোলে দিয়ে আবার আমার ছেলে আমি কেড়ে নিই !—আমি মাষষ্ঠী !—বেড়াল আমার বাহন ! তুই এত বড় "আলিক্ষি" পাপিষ্ঠি যে দেবতা বামুন মানিসনে, ঘরকন্নার সব জিনিষের "আগবেড়ে" খাস্ আর কালো বেড়ালের দোষ দিস,—বেড়ালকে মার খাওয়াস্ তুই রাক্ষুসী ! তোকে দেব ছেলে ?"—গেরস্তর বৌ গলায় কাপড় দিয়ে মার পায়ের ওপর পড়ল "মা যত অন্যায় করেছি তার ঢের সাজা হ'য়েছে, এই নাক কানে খত দিচ্চি মা ; তুমি আমার ছেলে ফিরে দাও !—না যদি দাওত আমি তোমার পায়ে "হত্যা" হব !" মাষষ্ঠী তখন বললেন "আচ্ছা ওঠ, তোর এবারের ছেলেটি ফিরিয়ে নিয়ে যা ! কিন্তু দেখিস্ ছেলের যদি কোন দোষঘাট নিস্, হতাদর করিস্ "ষাট বাঁচিয়ে না চলিস তাহলে তক্ষণি আমার ছেলে আমি কেড়ে নেব। আমি আগে থাক্‌তে তোকে বলে দিচ্চি ; ছেলে যত দামালি করবে, যত যার নষ্ট অপচয় করবে তখনি "ষাট্ ষাট্" বলে তাদের তা তিনগুণ করে পুরিয়ে দিবি, যেন লোকে ছেলেকে গাল না দিয়ে উল্টে আশীর্ব্বাদ করে—"ষাট্ ষাট্" বলে। ছেলে ভাতের সময় পিসীর কোলে গিয়ে কাপড় নষ্ট করে দেবে। পিসী মুখ ভার করবার আগেই "ষাট্‌ষাট্" বলে পিসীকে গরদ বার করে দিবি, পিসী "ষাট্ ষাট্ বলে ছেলে কোলে তুলে নেবে। পৈতের সময় নাপিতের কাণ কেটে নেবে নাপিতকে সোনার কাণ গড়িয়ে দিবি, নাপিত হেসে ষাট্ ষাট্ করবে। বিয়ে করতে যাবার সময় নৌকায় চড়ে মাঝ সুমুদ্রের মধ্যে ছেলে করম্‌চা দিয়ে সোল মাছের অম্বল খেতে চাইবে—তীর ধনুক কোল বায়না ক্ষীরের ভাঁটা নিয়ে খেলতে চাইবে তক্ষণি তা দিবি। এই রকম করে "ষাট্ বাচিয়ে" কারু মন্তি "না কুড়িয়ে—ছেলের সব দামালি স'য়ে যদি ছেলে মানুষ করে তুলতে পারিস তখন তোর সব ছেলে ফেরত দেব তোকে !"—গেরস্তর বৌ রাজী না হ'য়ে আর কি করবে, ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে মাষষ্ঠীকে নমস্কার করে বাড়ী ফিরে এল ! (সকলে একটি শিশু পুতুল গিন্নিপুতুলের নিকটে রাখিল।)

তার পরে মাষষ্ঠী যেমন করে বলে দিয়েছিলেন তেমনি করে "ষাট্‌বাঁচিয়ে" গেরস্তর বৌ ছেলে মানুষ করে তুলতে লাগল,—ছেলে লোকের হাজার নষ্ট অপচয় করলেও কেউ কিছু আর বল্‌তে পারতনা! ছেলের বিয়ের সময়ও বেচারী গেরস্তর বৌ শোল করম্‌চার অম্বল রেঁধে তীর ধনুক "কোল্ বায়না" ক্ষীরের ভাঁটা নিয়ে নৌকার খোলের ভেতর লুকিয়ে থেকে ছেলেকে মাঝ সমুদ্রে বায়না জুড়ে দিলে! ডাঙ্গায় নৌক লাগ্‌লে ছেলে ডাঙ্গায় উঠেই এক গেরস্তর বাড়ীর মাচা ভরা ফলন্ত কুমড়ো সুদ্ধ কুমড়ো গাছ কেটে নিলে, গেরস্তরা বেরিয়ে গাল দেবার আগেই মা তাদের কাছে সোনার কুমড়ো নিয়ে হাজির করলে। তারা খুসি হয়ে বল্‌লে "কে কেটেছে কুমড়ো গাছ? ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস? বেশ করেছে, বেঁচে থাকুক শতেক বছর পরমায়ু হোক্।" মাষষ্ঠী যখন দেখলে যে হ্যাঁ গেরস্তর বৌ ছেলে মানুষ কর্‌তে পার্‌বে, আর কোন অলক্ষণ হবে না তখন একে একে তার সব গুলি ফেরত দিলেন। পোয়াতির ছেলে মরে না বেড়াতে যায়। গেরস্তর বৌ এর ঘর ছেলে মেয়েতে ভরে গেল মাষষ্ঠির বরে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হয়ে গেরস্তরা ঘর ঘরকন্না কর্‌তে লাগ্‌ল—"জয় দেবী জগদানন্দ কারিণী প্রসীদ মম কল্যাণী ষষ্ঠীদেবী নমোঽস্তুতে।" ঘর সুদ্ধ লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম করিলেন। মাতাদের সভক্তি ও সভীত প্রণাম শেষ হইতে না হইতে শিশু অশ্ব দলের মুখের সংযম রশ্মি শিথিল হইয়া গেল। "আমার কোল বায়না আমার তীর ধনুক "ওমা আমার ওই টুকুটুকে আমটা" প্রভৃতি রবে মাতারা যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ মাতাদের অঞ্চল ও হস্ত ধরিয়া টানাটানি বাধাইয়া কিঞ্চিৎ তিরস্কার লাভ করিবা মাত্র তাহাদের মাতারা দিদিমা ঠাকুরমাদিগের দ্বারাও আক্রান্ত হইলেন। "এই এখুনি শুনলি বাপু তবু তোদের দুদণ্ডও তা মানতে নেই। একালের মেয়েদের এ সব কথা এ কাণ দিয়ে ঢুকে ও কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়! প্রাণে ভয় থাক্‌লে তো!"

"দেখ দেখি কি জ্বালাতন কচ্চে একটু তর্ সয় না যে ওদের!" বলিয়া নবীনা মাতারা অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন আর একটু থামো তো দাদুরা! "ষষ্ঠী যাচাই" ছাখ! তার পরে সব দেব—চুপ কর এখন একটু!"—সেই বংশ ও দুর্ব্বাগুচ্ছ সমন্বিত তালবৃন্ত খানিতে খানিক দধি ও জল দিয়া গৃহিণী মাষষ্ঠীর গাত্রে বাতাস দিতে দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—

"জ্যোষ্টি মাসে অরণ্য ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্, শ্রাবণ মাসে খণ্ড ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্, ভাদ্র মাসে চাপ্‌ড়া ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্; অঘ্রাণ মাসে মূলো ষষ্ঠী ষট্ ষাট্ ষাট্, পৌষ মাসে নোটন ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্, মাঘ মাসে শেতল ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্।

চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্।
বারো মাসে তের ষষ্ঠী ষাট্ ষাট্ ষাট্।"

তার পরে নিজ পুত্রকন্যাদের জ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নামে "আমার অমুকের ষাট্ অমুকের ষাট্; বলিয়া "ষাট্ যাচাইতে লাগিলেন। পুত্রকন্যার পরে জামাতা পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী বধূদের

নামে এবং তৎপরে "আমার ঝি চাকরের ষাট্, আমার গরু বাছুরের ষাট্, আমার রাখাল কৃষাণের ষাট্, আমার আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে সকলের ষাট্। এইরূপে সকলের 'ষাট্ বাঁচাইয়া' গৃহিণী তাহাদের গাত্রে সেই পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া আশীর্ব্বাদনির্ম্মাল্য ও ষষ্ঠীর ডোর (সেই হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্র) একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া সকলের গলায় বাঁধিয়া দিলেন। তখন "ঠাকুমা আমায় ঐ কোল বায়নাটা, ও দিদিমা আমায় ঐ গিন্নি পুতুলটা 'আমায় সন্দেশ' 'আমায় নাড়ু'—'আমায় সেই টুকটুকে আমটা'—হাঁ ঠাকুমা ষষ্ঠীর কালো বেড়াল, শোল মাছ আজ বুঝি নাড়তে নেই' এইরূপ গোল থামাইতে তাঁহাদেরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইল। ক্বচিৎ কেহ মাষষ্ঠীর কোন অনিবেদিত ভোগের প্রতি লোলুপতা প্রকাশ করিতেই মাতারা শিহরিয়া শিশুর মুখ চাপিয়া ধরায় গৃহিণী বলিলেন "তা বলেছে?—মারিসনে, মাষষ্ঠী ওদের অপরাধ নিলে কি ওরা বাঁচে! কোন ছেলে আগ তুলে নিলে ষষ্ঠী দেবী দোষ নেন না। বালকদের হাঙ্গাম থামাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র ও জামাতাদিগকে ডাকাইয়া আশীর্ব্বাদি নির্ম্মাল্য সহ মস্তকে পাখার বাতাস দিয়া তাহাদিগকে প্রসাদ ও জলযোগে বসাইয়া দিলেন মধ্যস্থলে জামাতাদিগের নির্দ্দিষ্ট আসন পড়িল, এবং বস্ত্রযুক্ত বাটার রেকাবী তাঁহাদের হস্তে স্পর্শ করাইয়া পার্শ্বে রাখা হইল। ভাগ্যবানের গৃহে সে দিন আনন্দ ভোজনের ধূম পড়িয়া যায়! পুত্র জামাতা পৌত্র দৌহিত্র ঘর ভরিয়া সারি সারি আহারে বসে এবং আনন্দ রহস্যে বঙ্গের অন্তঃপুর মুখরিত হইয়া উঠে।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সবুজ পরী

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি দুলিয়ে চাও।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী!
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি'!
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহরা তোমার হাসি,—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি' ;
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই তো পরাণ লয় নাহি' !
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী।

সবুজ হ'য়ে উঠ্‌ল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই ;
স্ব-তন্ত্র সে বহুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ মদ্যে ;
তরুণ বলেই ছায় সে ছায়া গহন ছায়া দ্যায় গো সেই !

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী !
সবুজ পাখীর বাবুই ঝাঁকে—
দেখ্‌তে আমি পাই তোমাকে—
ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি'।

সবুজে তোমার দোব্‌জাখানি—আলো ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল্ বিভ্রমে !
সবুজ শোভার সারে গামা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়্‌জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী,
মরুভূমির সবজী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয়-গাথা,
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা এবং মাষ্টারমহাশয়ের নিকট একটু ইংরাজী পড়িয়া, তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথমে St. Paul's School, তার পর Montague's Accademy তার পর হিন্দুস্কুল। এইরূপ ঘনঘন স্কুলপরিবর্ত্তনে যে ভাল ফল হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহাও তিনি জানেন না, অভিভাবকেরাই জানিতেন। বলিয়াছি, বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসনের চাপে শিক্ষার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল ; সুতরাং স্কুলেও তিনি পড়ায় তেমন মনোযোগ দিতেন না।

ছেলেবেলার একটা কথা তাঁহার মনে পড়ে, তাতে বেশ একটু মজা আছে। উপনয়নের সময় অন্তঃপুরের একটা ঘরের মধ্যে যথারীতি তিন দিন তিনি বদ্ধ হইয়া আছেন। একদিন হঠাৎ ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন "হনুমান্" "হনুমান্" ! দাসদাসীদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কিছুই নয়—একটা হনুমান্ ছাদের প্রাচীরের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। এমন একটা অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শনের লোভ অতিক্রম করা অশূদ্রস্পৃশ্য বালকব্রহ্মচারীর পক্ষেও অসাধ্য হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া নিষিদ্ধদর্শন শূদ্রদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখন অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে আরও বেশী হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাড়া খাইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেন। যে রেখা-চিত্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে ছবি শেষে এমন ঠিক হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাই লইয়া একটা খুব হাসি তামাসা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরাম-পুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপ-বাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল, ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবি এত ঠিক হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্র-বিদ্যার জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। এই তাঁর প্রথম ছবি আঁকা। তখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাহার উপর তাঁহার প্রথমচিত্র দেখিয়াই যখন সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে

বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিতেন। সে সকল চিত্র চোঁতা কাগজে অঙ্কিত হইত, এবং তাহা সযত্নে রক্ষা করাও আবশ্যক মনে করিতেন না, কাজেই সেগুলি এখন সব হারাইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি ছবি হারানোতে তিনি বিশেষ দুঃখিত—সে ছবি ব্রহ্মানন্দ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের। রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখন দুঃখ করেন।

থাক্, যাহা বলিতেছিলাম,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিল; হাত দু'টি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া আঙ্গুলগুলি মেলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতেন হাড়গিলের মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িত; তাঁহার দেহবর্ণ একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দার পর্দ্দার ভাঁজ করা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠ ত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কখন' কখন' গড়াইয়া আসিত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়া-ছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কান্‌টি বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একে একে সমস্ত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ কার্য্য কে করিয়াছে। সকলেই অস্বীকার করিল কিন্তু জ্যোতি বাবু, যে করিয়াছিল তাহার নাম বলিয়া দিলেন। এ জন্য জ্যোতিবাবুকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল! ছাত্রেরা তাঁহার বই লইয়া এরূপভাবে লুকাইয়া রাখিত যে অনেক সময় খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। পুস্তক অভাবে অনেকদিন পড়া না বলিতে পারায়, স্কুলের মাষ্টারদের নিকট তিরস্কৃত এবং এত ঘন ঘন বই হারান'র জন্য বাড়ীতেও অভিভাবকগণের নিকট ভর্ৎসিত হইতেন। এ সময়ে হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ চলিত। কারণ কিছুই নহে বালসুলভ চাপল্যমাত্র। তখনকার দিনে এ এক প্রকার ফ্যাশানের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কখন-কখন এই দুই দলের লড়াইয়ে রক্তারক্তি ও মাথা-ফাটাকাটি পর্য্যন্ত হইত। হিন্দুস্কুলের ইংরেজ হেডমাষ্টারের নিকট নালিস আসিলে তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার স্বদেশের দুর্দ্দান্ত ছাত্রদের কথা মনে পড়িত!

মধ্যে হিন্দু স্কুল একবার শ্যাম মল্লিকদের জোড়াসাঁকোর থামওয়ালা বাড়ীতে কিছু-

দিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে একদিন টিফিনের ছুটিতে জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে একটা লোককে স্কুলের হাতার ভিতর হইতে জনৈক কনেষ্টবল ধরিয়া টানা-টানি করিতেছে—থানায় লইয়া যাইবে। প্রথমোক্ত লোকটা নাকি কি একটা অপরাধ করিয়াছে তাই তাহাকে ধরিতে কনেষ্টবল স্কুলঘর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। জ্যোতি বাবু প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র প্রথমতঃ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, কিন্তু কনেষ্টবল মহাশয় যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সকলে মিলিয়া নিকটের একটা ইটের ঢিবি হইতে ইট লইয়া কনেষ্টবলের দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। শেষে পুলিশের সিপাহী মহাশয় এমনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন যে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন না করিয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন—আর এই ফাঁকে সে লোকটাও পলাইয়া গেল।

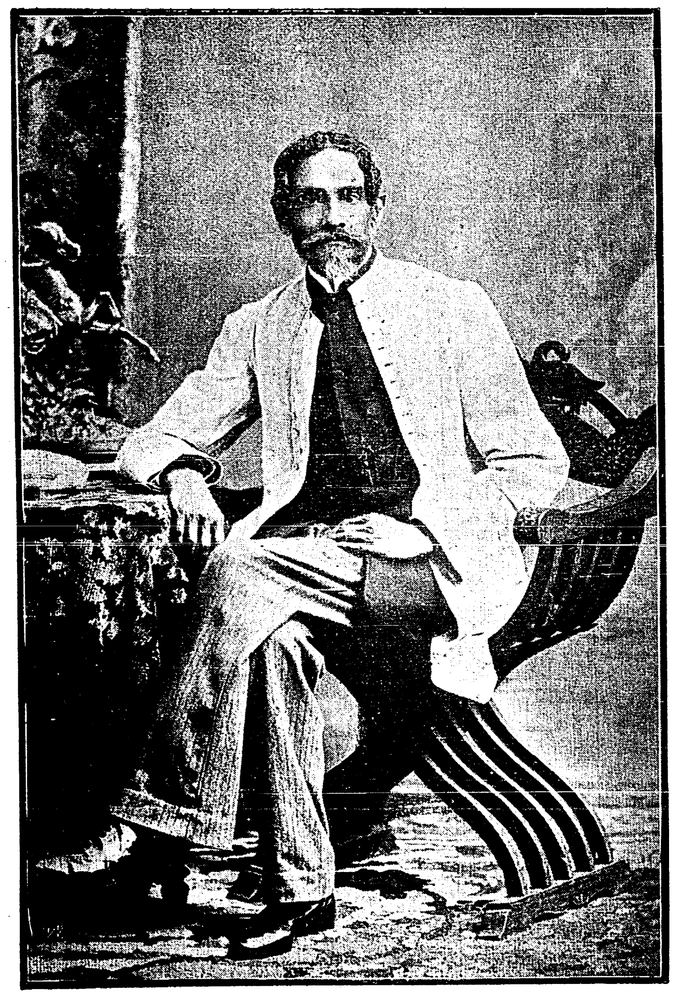

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিবাবু একবার তাঁহার মেজদাদা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেও তাঁহার একটি সুখের স্মৃতি। তখন মিষ্টার ঘোষের পিতা মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন করিতেন তাহা ভুলিবার নহে। তখন ঘোষ-পরিবারের মধ্যে অবরোধ প্রথা পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অন্তঃপুরে তাঁহাদের অবাধগতি ছিল। মিসেস্ ঘোষ তখন বালিকা বধূ। বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া তাঁহার

সঙ্গে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাস খেলিতেন। মনোমোহন বাবুর পিতা লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ রামলোচন বাবু যেরূপ গভীর কণ্ঠস্বরে এবং তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া "অ—ম—ন্—ম—হ—ন" বলিয়া ডাক দিতেন, তাহা ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয় কৃষ্ণনগরের দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ফুরফুরে সেই "গঙ্গাজলী" সন্দেশ এবং তাঁহাদের বাড়ীর চা'! সে চা'য়ে কি সুগন্ধ! এমন চা', জ্যোতিবাবু বলিলেন, আর কখনও খান নাই। আসল কথা ছেলে বেলার সকল অনুভূতিই একটু বেশী মাত্রায় তীব্র হইয়া থাকে। তিনি লালমোহন বাবুর সঙ্গে একটা বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন। একদিন তাঁহাদের বাড়ীসংলগ্ন দীর্ঘ তরুবীথির মধ্যে মনোমোহন বাবুও সত্যেন্দ্র বাবু দুইজনে পায়চারী করিতে করিতে বিলাত যাইবার মৎলব আঁটিতেছিলেন—লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "দাদা, the Steamer is ready!"

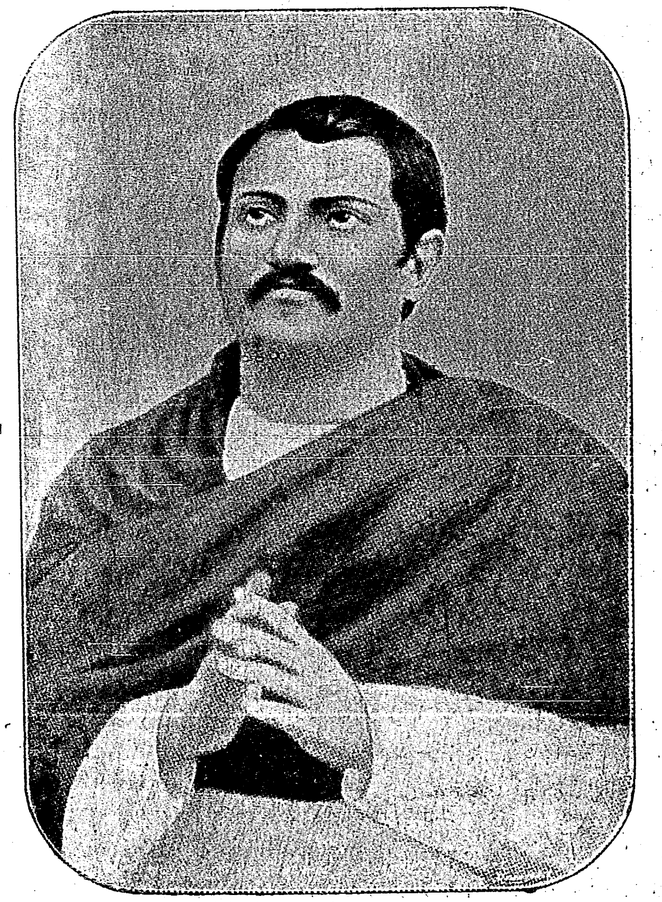

কেশবচন্দ্র সেন

তখন কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশব বাবুর সহিত খৃষ্টান পাদ্রী লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের Dyson সাহেবের সহিত খুব বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল! আজ লালবিহারী বাবু কেশব বাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দিবেন! আজ কেশববাবু আবার সেই প্রতিবাদের উত্তর দিবেন! উভয় পক্ষই বাগ্‌যুদ্ধে মজবুত। লালবিহারী দে সুন্দর ইংরাজীতে কেশববাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ প্রয়োগে কেশব বাবুও কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর বক্তৃতা লিখিত, কেশব বাবুর মৌখিক

সুতরাং সেই বক্তৃতার তোড়ে রেভারেণ্ড লাল-বিহারীর সমস্ত ঠাট্টা মস্করা ভাসিয়া যাইত। কেশব বাবুর দলই জয়লাভ করিত। তাঁহার ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে মাতিয়া উঠিতেন।

এই সময়ে ১১ই মাঘে ইঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রহ্মোৎসবের ঘটা হইত। সমস্ত বাড়ী পুষ্পমালায় ভূষিত হইত। প্রত্যূষে যখন রশুন্‌চৌকিতে প্রভাতী বাজিয়া উঠিত তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা হইয়া গেলে দলে দলে ব্রাহ্মেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। টেবিলের উপর বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমলা লেবুর পিরামিড সাজান থাকিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ, ভাই উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ বিকশিত মুখ জ্যোতিবাবুর চিত্তপটে এখনও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বৈঠকখানার ঘরে সকলে মিলিয়া গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও" "আজ আনন্দের সীমা কি" "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গান সকলে মিলিয়া গাওয়া হইত। জ্যোতিবাবু বলিলেন "তারপর হরদেব চট্টোপাধায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল" প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের সেই দুর্গপূজার আনন্দ এবং এ কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ। এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ। এ এক ছবি আর সে এক ছবি।"

এই খানে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় জ্যোতিবাবু বলিলেন। "উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে ইহাঁর জন্ম। ইনি ইংরাজী শিক্ষা পান নাই। সেকেলে রীতি-অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গলা ও একটু ফার্শী জানিতেন। কিন্তু প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইলেও ইনি খুব সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল খোলা হয়, ইনিই সর্ব্বাগ্রে সাহসপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী। ইঁহার গোঁপ-দাড়ি কামানো, মস্তক মুণ্ডিত এবং একটি শিখা ছিল। ভূতে দয়া এবং বিশ্ব-প্রেমে তাঁহার চক্ষুদুইটি যেন জ্বল্ জ্বল্ করিত। মুখটি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। পরিধানে গৈরিক বসন। একটা ঔষধের কৌটা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনি দীন দুঃখীগণকে ঔষধ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাইতেন। বাঙ্গালী-দের মধ্যে যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গান বাঁধিতেন; যথা—

"ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্ব্বলোকে কয়
কলম্বস্ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।"

ইত্যাদি।

ইঁহার রচিত গানগুলি শেষে ৺প্যারিচাঁদ মিত্র নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া দেন।" তিনি কি সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা জ্যোতিবাবু জানেন না। ইঁহার দুই কন্যার সহিত শেষে পর পর ৺ হেমেন্দ্রনাথের সহিত এবং বীরেন্দ্রনাথের (জ্যোতিবাবুর ন' দাদা) সহিত বিবাহ হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেদে ঊষা

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের অন্যতম প্রমাণ)

ঊষা বেদের অতি প্রাচীন দেবতা। বেদ রচয়িতা ঋষিগণের কবিতা ইঁহার স্তুতিতে যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে অন্য কোনও দেবতার স্তুতিতে সেরূপ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ঋষিগণ এই দেবতাতে যেরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছেন—এরূপ আর অন্য কোনও দেবতাতে দেখিতে পান নাই। রমেশ বাবু ঊষা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অনুবাদে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"ঊষা" আর্য্যদিগের বড় আদরের দেবী ছিলেন, ঋগ্বেদে ঊষা সম্বন্ধে ঋক্‌গুলি যেরূপ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও স্নেহকবিত্বপূর্ণ অন্য দেবগণের সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না।

ঊষা স্বভাবতঃই রমণীয় কাল—ইহাতে আরও কোন বিশেষ সময়ের যোগ দ্বারাই ইহার রমণীয়তা বিশিষ্টরূপে ঋষিদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের নিকট ঊষার এরূপ মহিমা। সেই বিশেষ সময় আমরা বসন্তকাল বলিয়াই মনে করি। বসন্ত ঋতু ছয় ঋতুর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া 'ঋতুরাজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বসন্ত সময়ের ঊষাকালই আবার উৎকৃষ্ট কাল। সুতরাং বেদের ঊষা বসন্তকালের প্রভাত সময়কে বুঝাইলে ইহার অতি চমৎকার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে ঋষিদিগের কবি-হৃদয় যে কবিত্বের নূতন আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিবে এবং তাহাতে তাঁহাদের কবিতায় নূতন ভাব প্রতিধ্বনিত হইবে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উত্তর মেরুমণ্ডলপ্রদেশে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গতির ছয় মাস এক ক্রমে রাত্রিকাল থাকিয়া উত্তরায়ণ গতির ছয় মাস এক ক্রমে দিবা থাকে তাহা সকলেরই বিদিত আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতেই সূর্যের উত্তর গতি আরম্ভ হইয়া সূর্য্য বিষুবরেখায় আসিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। সূর্য্য বিষুবরেখায় না আসিলে আর উত্তর মেরুমণ্ডলের নিকট উদিত দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিষুবরেখায় আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোক স্পষ্ট দৃষ্ট না হইয়া যে ঊষালোকরূপে দৃষ্ট হইবে তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মেরুমণ্ডলে সূর্য্যালোকের মাসত্রয়ব্যাপী প্রতিভাসই তথাকার ঊষাকাল।

উত্তর কুরু প্রদেশ উত্তর মেরুমণ্ডলের অতি সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহাতেও মেরুমণ্ডলেরই ন্যায় যে ঊষাকাল ও সূর্য্যোদয় হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বেদের ঊষা আমাদের নিকট প্রধানতঃ উত্তরকুরু প্রদেশের মাস- ত্রয়ব্যাপী এই ঊষাকাল বলিয়াই বোধ হয়। আশ্বিন মাসে সূর্য্য বিষুবরেখার নিম্নে গমন করিলেই উত্তর কুরু প্রদেশে প্রকৃত রাত্রি আরম্ভ হয় এবং পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই রাত্রি স্থায়ী হয় তৎপর সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইতেই উত্তর কুরুতে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোর বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই উত্তর কুরুতে ঊষার বিকাশ হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সূর্য্য চৈত্র মাসে বিষুবরেখায় আসিয়া উদিত না হয় সেই পর্য্যন্ত এই ঊষা স্থায়ী হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমস্ত ফাল্গুন ও চৈত্রমাসেরও কিছুকাল ব্যাপিয়া ঊষা বর্ত্তমান থাকায় ইহা বসন্তকালের যোগে যে সাতিশয় রমণীয়তা প্রাপ্ত হইত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; এবং বিষুবরেখা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে সূর্য্যের সমস্ত চৈত্রমাসই লাগে বলিয়া তৎকালে উত্তরকুরু প্রদেশ হইতে যে সূর্য্যকে "বালার্ক সিন্দুর ফোঁটার" ন্যায় ঊষার 'ভালে' শোভা পাইতে দেখা যাইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং উত্তরকুরু প্রদেশের ঊষা যে প্রকৃত পক্ষে বসন্তকালেরই প্রভাত তাহা আমরা পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছি। বেদের ঊষা যে বসন্তকালের প্রভাতকে কিরূপে বুঝাইতে পারে তাহার স্পষ্ট আভাসও আমরা এখানে পাইতেছি।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বেদের মধ্যে কিরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

ঊষা যে পূর্ব্বে বহুকাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান থাকিত নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌টিতে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং ব্যাবো মঘোনী॥"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

"ঊষাদেবী পূর্ব্বকালে নিত্য উদয় হইতেন, ধনবতী ঊষা এখনও এই (জগৎ) অন্ধকার বিমুক্ত করিতেছেন।"

রমেশবাবুর অনুবাদ।

Ragozin তদীয় Vedic India (বৈদিক ভারত) নামক গ্রন্থে ইহার এইরূপ ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন—

Perpetually in former days did the divine Ushas dawn; and now !to-day the radiant goddess beams upon this world.

'শশ্বৎ' ও 'পুরা' ও 'ব্যুবাস' এই কয়টি শব্দ দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে ঊষা অবিচ্ছিন্নভাবে বহুকাল স্থায়িনী হইত—সাধারণ ঊষার ন্যায় ক্ষণ-স্থায়িনী ছিল না। এই ঊষা বর্ণনার সূক্তেই আমরা ইহার সর্ব্বত্র সুমধুর আনন্দ ধ্বনির প্রবর্ত্তিকা রূপে উল্লেখ পাই যথা—

"ভাস্বতীনেত্রী সূনৃতানামচেতি চিত্রা বিদুরোন আবঃ॥"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

আমরা প্রভাসম্পন্না সূনৃত বাক্যের নেত্রী বিচিত্রা ঊষাকে জানি।"

রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এস্থলে রমেশবাবু "সূনৃত বাক্যের নেত্রী

সম্বন্ধে সায়নের টীকার অনুবাদ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

ঊষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশুপক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এইজন্য তিনি "সূনৃত বাক্যের নেত্রী।"

শীতের পর বসন্তকাল সমাগমে জীব-জগতে যে নবজীবনের নবস্ফূর্ত্তির ভাব প্রতিধ্বনিত হয় এস্থলে তাহারই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। শীত-প্রধান স্থানের প্রচণ্ড শীতে অন্ধকারময় কুজ্ঝটিকা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া নিরানন্দ জীবগণ বসন্তের প্রথম উজ্জ্বল আলোক সন্দর্শনে ও উষ্ণ বায়ু সেবনে যে অনির্ব্বচনীয় হর্ষাবেগের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তাহা কি প্রকারে সঙ্গীতে নৃত্যে ক্রীড়ায় হাবভাবে প্রকাশিত হয় তাহার একটি চিত্র শীতপ্রধান দেশের কবির তুলিকাতে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি ঃ—

"Spring, the sweet spring,
Is the year's pleasant king;
Then blooms each thing;
Then mads dance in a ring,
Cold doth not sting,
The pretty birds do sing,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, towitta-woo!
The palm and may
Make country houses gay,
Lambs frisk and play,
The shepherds pipe all day,
And we hear aye
Birds tune this merry lay,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, towitta-woo;
The fields breathe sweet,
The daisies kiss our feet,
Young lovers meet,
Old wives a sunning sit,
In every street these tunes
our ears do great,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, towitta-woo;
Spring! the sweet Spring."—*J. Nash.*

বেদে আমরা পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রণয় কাহিনীর যে উজ্জ্বল বর্ণনা প্রাপ্ত হই—তাহা উত্তর কুরুর ঊষাকালেরই বিচিত্র কাব্য-চিত্র বলিয়া আমরা মনে করি। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ ৯৫ম সূক্তে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রণয়কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। এই সূক্ত সম্বন্ধে রমেশবাবু ঋগ্বেদানুবাদে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—

এই সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরুরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরুরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন,. উর্ব্বশী এক্ষণে পুরুরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উর্ব্বশীর আদি অর্থ ঊষা, পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য উদয় হইলে ঊষা আর থাকে না।"

রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫৮৩ পৃঃ।

পুরুরবা যে সূর্য্য তাহা তাহার নামের 'রব' অংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয়—কারণ সূর্য্যবাচক রবি শব্দ ও এই 'রব' এক ধাতু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য মোক্ষমূলর এইরূপ আলোচনা করিয়াছেন ঃ—

That Pururavas is an appropriate name of a solar here hardly requires any proof. Pururavas meant.....ended with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour, *i.e*, red * * * (Sanskrit Ravi, sun). Besides Pururavas calls himself Vasishtha (১৭ ঋক্), which as we know, is a name of the Sun; and he is called Aida (১৮ ঋক্), the son of Ida, the same name is elsewhere (Rig Veda III, 29, 3) given to Agni, the fire.—Maxmuller's Selected Essays (1881), Vol. I, pp. 407, 408. রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫৮৪ পৃঃ।

পুরুরবার সহবাসে উর্ব্বশী কিছুকাল

ছিলেন রমেশবাবু লিখিয়াছেন। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যান হইতেই আমরা কতকাল পুরুরবার সহবাসে ছিলেন তাহা জানিতে পারি। যথা

"যদ্বিরূপাচরং মর্ত্তেষ্ববসং রাত্রীঃ শরাশ্চেতস্রঃ।
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডস ধৌত সূক্ত।

"আমি পরিবর্ত্তিতরূপে ভ্রমণ করিয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রি বাস করিয়াছি।"

রমেশবাবুর অনুবাদ।

রমেশবাবুর অনুবাদ আমাদের নিকট পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয় না। আচার্য্য মোক্ষমূলর যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই আমাদের নিকট স্পষ্ট ও প্রকৃতার্থক বলিয়া বোধ হয়। আচার্য্য মোক্ষমূলরের মতে

অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ॥" ইহার অনুবাদ—
"I dwelt with thee four nights of the autumn." (রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫০৬ পৃ)
"আমি শরৎকালের চারি রাত্রি তোমার সহিত বাস করিয়াছি।

দক্ষিণায়ণ গতিতে আশ্বিন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের বিষুবরেখার নিম্নে গমন হেতু অদর্শনের দ্বারা উত্তরকুরুতে যে চারি মাস ব্যাপিয়া অন্ধকার বা রাত্রিকাল বর্ত্তমান থাকে—এখানে চারি শরৎ রাত্রি তাহাই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সহিত সূর্য্যের উত্তর গতিতে উত্তর কুরুতে ঊষার বিকাশ হইতে থাকিলে তাহার পর ক্রমে সূর্য্যের প্রকাশে ঊষা যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয় তাহাই পুরুরবার সহিত উর্ব্বশীর বিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শরতের চারি মাসের সহবাসের পর বসন্তকালেই যে ঊষা বা উর্ব্বশী সূর্য্যের নিকট প্রকাশরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। শরতের চারি মাস রাত্রি থাকাতে ঊষার বিকাশ না হওয়ায় তাহা যে সূর্য্যের সহিত ঊষার রাত্রিতে সহবাস বলিয়া বর্ণিত হইবে তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। তৎপরে বসন্তকালে ঊষা সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে বালারুণের সহিত তাহার যে প্রথম সংযোগ হয় এই অরুণই পুরুরবা ও উর্ব্বশীর সহবাসোৎপন্ন পুত্র বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দাধৃক্ষোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্য্যঃ সুজাতঃ প্রোর্ব্বশী তিরত
দীর্ঘমায়ুঃ॥" ১০
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

"যে উর্ব্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল, এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্ব্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন্।"

ঊষাকে আমরা অরুণঅশ্ববাহিতরথে যে আগমন করিতে দেখি তাহাতেও অরুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়, যথা—

প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষাযাতিসুযুজা রথেন॥ ১৪
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

"(সুপ্ত প্রাণীদিগকে) জাগরিত করিয়া ঊষা অরুণ-অশ্বযুক্ত রথে আগমন করিতেছেন।

সূর্য্য এই বালারুণ অবস্থা হইতে তরুণ বা তরণি অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেই ঊষা অন্তর্হিত হয়। তাহাতেই পুত্রজন্মের পর উর্ব্বশী আর পতির নিকট থাকিবেন না বেদে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"প্রত্তত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরে হস্তং নহি মূরমাপঃ॥" ১৩
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

"আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্ব্বোধ! গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে আর পাইবে না।"

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর পৌরাণিক আখ্যানে আমরা যে শাপ বিবরণ প্রাপ্ত হই তাহার মূল আমরা এইখানেই দেখিতে পাই।

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর বৈদিক আখ্যানে আমরা যে সূর্য্য ও ঊষার প্রণয়ভাব চিত্রিত দেখিতে পাই তাহা বসন্তকালে লোকের মনে যে নব প্রেমভাব সঞ্চারিত হয় তাহা হইতেই কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাম ও তৎপত্নী রতির আদর্শ পুরুরবা ও উর্ব্বশী হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বেদের একস্থলে ইন্দ্র, ঊষার রথ ভগ্ন করিয়া দিতেছেন ও ঊষার সহিত শত্রুভাবে ব্যবহার করিতেছেন এমন কি তাহাকে বধ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

"এতদ্নোহুত বীর্য্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্।
স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুং বধীর্দুর্হিতরম্ দিবঃ॥ ৮
দিনশ্চিন্না দুহিতরং মহান্নহীয়মানাং।
ঊষাসমিন্দ্র সং পিণক্॥ ৯
অপোষা অনসঃ সরৎ সং পিষ্টাদহ বিভ্যুষী।
নিষৎসীং শিশ্নথদ্ব্যা॥ ১০
ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩০ সূক্ত।

"হে ইন্দ্র! তুমি এই প্রকার বীর্য্যশালী বল প্রদর্শন করিয়াছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিনী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিলে।"৮

"হে মহান্ ইন্দ্র! তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয় ঊষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলে।'৯

"অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) যখন ঊষার (শকট) ভগ্ন করিয়াছিলেন, তখন ঊষা ভীতা হইয়া ভগ্ন শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।১০

এখানে ইন্দ্রের দ্বারা ঊষার নিগ্রহের প্রকৃতার্থ কেবল ঊষাপ্রকৃতির মূল রহস্যের দ্বারাই পরিষ্কাররূপে ব্যাখাত হইতে পারে। ঊষা বসন্তকালের প্রভাত বা উজ্জ্বল পরিষ্কার প্রভাতের নাম হইলে তাঁহার সহিত যে মেঘ-বাহন ইন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে। বসন্ত-কালীন ঊষা অনার্দ্র ও নির্ম্মল বলিয়া মেঘ-বর্ষণকারী ইন্দ্র যে ইহাকে মেঘবর্ষণের প্রতিবন্ধিকা বলিয়া ইহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। সুতরাং বর্ষাকালের মেঘাড়ম্বরের মধ্যে ঊষার সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইলে তাহাই যে ইন্দ্র কর্ত্তৃক ঊষার নির্য্যাতন বলিয়া কথিত হইবে তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বৃষ্টির প্রাচুর্য্যদর্শন করেন। তাহা হইতেই বেদে প্রথম ইন্দ্রের কল্পনার উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে উত্তরকুরুর ন্যায় ছয়মাসী দিন না হওয়ায় বসন্তকালের ঊষাই একমাত্র ঊষা নহে। এখানে যেমন প্রতি যাইট্ দণ্ডেই একবার দিন রাত্রি হয় তদ্রূপ দৈনিক ঊষাও হইয়া থাকে। তাহাতেই বর্ষাকালের ঊষার সহিত ইন্দ্রের প্রতিদিনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্তরূপে ইন্দ্র যেমন ঊষার শত্রু তেমনই সূর্য্যেরও শত্রু। কিন্তু ইন্দ্র যে সর্ব্বদাই ঊষার শত্রু তাহা নহে কোন কোন সময়ে ইন্দ্রকে ঊষার পথ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে আলোক প্রদানে নিয়োজিত করিয়া বা উজ্জ্বলতা প্রদান করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বর্ষাকালের বর্ষণ দ্বারা ঊষার সৌন্দর্য্য

আচ্ছন্ন থাকিলেও অন্য সময়ে মেঘের উপর ঊষার অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিশেষ সৌষ্ঠবই সম্পাদিত হইত।

ঊষার প্রতি ইন্দ্রের ব্যবহার সম্বন্ধে রেগোজিন (Regozin) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করি।

"On the same principle we can understand how the Dawn herself—Ushas, the beautiful, the auspicious could be treated by Indra at times with the utmost severity; in seasons of drought, is not the herald of another cloudless day, the bringer of the blazing sun, a wicked sorceress, a foe to gods and men, to be dealt with as such by the Thunderer, when, Soma-drunk, he strives with his friends the Maruts to storm the brazen stables of the sky, and bring out the blessed milch-kine which are therein imprisoned; Indra's treatment of the hostile Dawn is as summary as his treatment of Surya though at other times he is as ready to help her, and lay out a path for her and "cause her to shine" or "light her up".

Vedic India p 220.

বেদে আমরা ঊষাকে যে "শুক্লবাসা" (১।১১৭।৭) 'রুশদ্বাসঃ' (৭।৭৭।২) রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই তাহাতে বাস শব্দটী আমাদের নিকট কিরণার্থক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ বাস শব্দের বস্ ধাতুটি আমাদের নিকট কিরণ-বাচী বলিয়াই মনে হয়। বিবস্বৎ শব্দে আমরা এই ধাতুরই যোগ দেখিতে পাই এবং ইহার অর্থও কিরণই দেখিতে পাই। কিরণ পর্য্যায় 'উস্র' শব্দটীও আমরা বস্ ধাতু হইতেই সিদ্ধ হইতে দেখি। বসন্ত শব্দে এই বস্ ধাতুরই যোগ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে ইহার প্রকৃতিগত অর্থ "কিরণোজ্জ্বল" হয়। এই প্রকারেই উজ্জ্বলতাবাচক এক বস্ ধাতু নিষ্পন্ন বাস ও বস শব্দের যোগের দ্বারা ঊষাও বসন্তের মধ্যে যোগ প্রতিপাদিত হইতে পারে।

বসন্তের সহিত ঊষার যোগের আর একটি ভাষার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ হইতে পাওয়া যায়ঃ—

"আস্নো বৃকস্য বর্ত্তিকামভীকে যুবং নরানাসত্যা মুমুক্তম্॥১
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১৬ সূক্ত।

"হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমরা বৃকের মুখ হইতে বর্ত্তিকাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে।

রমেশবাবু এস্থলে এইরূপ টীকা করিয়াছেন—

"সায়ন ঋকের এই শেষার্দ্ধের অর্থ করেন নাই। বর্ত্তিকা চড়াই পাখী (চটকা) সদৃশ পক্ষীর স্ত্রী। অরণ্যের একটি বৃক্কর (বৃক) পুরাকালে তাহা ধরিয়াছিল, অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন।" সায়ন।

কিন্তু যাস্ক ইহার অন্য অর্থ করেন। বার বার প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই "বর্ত্তিকা" অর্থাৎ ঊষা। আলোকদ্বারা জগৎকে আবরণ করে সেই বৃক অর্থাৎ সূর্য্য। সেই বৃক ঊষার পশ্চাতে আসিয়া অর্থাৎ ঊষার পর উদয় হইয়া ঊষাকে ধরেন। অশ্বিদ্বয় উহাকে ছাড়াইয়া দেন। রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ২৬৭ পৃঃ।

"আচার্য্য মোক্ষমূলর—বর্ত্তিকানামক পক্ষী বসন্তকালে আগত প্রথম পক্ষী এইরূপ মন্তব্য করিয়া তৎপর যাস্ককৃত ব্যাখ্যা অনুসরণ করতঃ ইহাকে ঊষা অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"The quail in Sanskrit is called Vartika, i.e. the returning bird, one of the first birds which return with the returning spring. The same name is given in the Veda to one of the many

beings delivered or revived by the Asvins i. e. by day and night, and I believe, the returning is again, one of the many names of the dawn. The science of Language (1882). Vol II, p 553—রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ২৬৭ পৃঃ

এস্থলে বসন্তপক্ষীবিশেষ ও ঊষা এই উভয় অর্থ হইতে বসন্ত কালের ঊষাই যে বিশেষ রূপে বর্ত্তিকা নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাই আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে আমরা ইষ্টার (Easter) নামে এক বাসন্তী দেবীর উল্লেখ পাই। ইহার সম্বন্ধে Chamber's Twentieth Century Dictionaryতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে Eastera agoddess whose festival was held at the spring equinox." এই ইষ্টার নাম গ্রীক্‌দিগের ইওস্ (Eos) নামেরই অনুরূপ। ইওস্ (Eos) গ্রীক্‌দিগের ঊষাদেবী সুতরাং ইষ্টার বসন্ত কালেরই ঊষাদেবী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামের এই সাদৃশ্য হইতে ইঁহাদের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ যে উত্তর কুরুতেই একত্রে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

মেরুমণ্ডলে সূর্য্য, যে ছয়মাস অদৃষ্ট থাকে তখন যে বিদ্যুতাত্মক জ্যোতি দ্বারা লোক দিগের জীবনব্যাপার নির্ব্বাহিত হয় তাহার সাধারণ নাম Aurorra বা মেরুজ্যোতিঃ। এই Auroa নামের মূল ইতিহাস ইংরেজী অভিধানে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে ইহার সহিত ঊষা নামের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। Chamber's Twentieth Century Dictionaryতে ইহার মূল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

According to Curtius, a reduplicated form for aurora from a root seen in Sanskrit ush, to burn cognate with greek eos dawn.

মেরুজ্যোতিঃ যেরূপ ভাবে বিস্তার প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, বেদে আমরা ঊষারও তদ্রূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হই যথা—

প্রতিকেতবঃ প্রথমা অদৃন্ন্ধ্বা অস্য অঞ্জয়ো বিশ্রয়ন্তে॥
ঊষা অর্ব্বাচা বৃহতা রথেন জ্যোতিষ্মতা বামস্মভ্যং বক্ষি।
৭ম মণ্ডল ৭৮ সূক্ত।

"প্রথম কেতুসকল দৃষ্ট হইতেছে। উহার ব্যঞ্জকরশ্মিসকল ঊর্দ্ধ্বমুখ হইয়া সর্ব্বত্র আশ্রয় করিতেছে। হে ঊষাদেবি! আমাদের অভিমুখে আগত হও, বৃহৎ জ্যোতিষ্মান্ রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর।"

এইরূপ সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা কিন্তু Aurora শব্দটী ঊর্ব্বশী শব্দেরই অধিক অনুরূপ বলিয়া মনে করি। ঊর্ব্বশীর বর্ণনায় আমরা তাঁহাকে স্পষ্টই Auroraর ন্যায় বিদ্যুতাত্মিকা রূপেই বর্ণিত দেখি যথা—

বিদ্যুন্ন যাপতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।" ১
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

যে ঊর্ব্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল।

ঊষার সহিত যে অরুণাশ্বের যোগ আমরা বেদে দেখিতে পাইয়াছি (১।১১৩।১৪) সেই অরুণ অশ্ব, অরুণ কিরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই অরুণ শব্দের সহিতও Aurora শব্দের সবিশেষ সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

এইরূপে ঊষার নাম ও বর্ণনা উভয় প্রকারেই উত্তরকুরুর সহিত ইহার প্রথম সংযোগের সুস্পষ্ট নিদর্শনই আমরা উপরে দেখিতে পাইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।



ফটোচিত্র

ক্যামেরার দ্বারা বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ

আমরা সকলেই কিছু কবি হইতে পারি না; বিধাতা এ অক্ষমতার বিধান করিয়া, অধিকাংশ লোকের উপকারই করিয়াছেন বলিতে হইবে। তবুও কবির মত মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার ব্যাকুল বাসনা, আমরা অনেকেই অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি। আকাশে আলো-ছায়ার খেলার মত, মনে কত ভাবেরই উদয় অবসান হয়; কখনো অকারণ বিষাদ, কখনো বা আনন্দের আভাসমাত্র, কখনো ভাবটি ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী;—তাহা সুখ কি দুঃখ, আশা কি আশঙ্কা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না! নির্জ্জন পল্লীপথে ভ্রমণকালে আকাশে মেঘের সমারোহ, প্রান্তর-প্রান্তে ধূপছায়া কুহেলিকা-ওড়নার লীলা, দিগ্বলয়ে বিলীয়মান গিরিমালার সুষমা দেখিয়া মন ক্রমে অপূর্ব্ব বিচিত্রভাবে ভরিয়া ওঠে। সে ভাব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া বুঝানো কঠিন, তাই কবি বলিয়াছেন,—"যে অভিনব ব্যাকুলতায় হৃদয় পরিপূর্ণ তাহাকে দুঃখ কিম্বা বেদনা বলিতে পারি না; বৃষ্টির সহিত বাষ্পের যে সাদৃশ্য আমার এই মনোভাবের সহিত দুঃখেরও তেমনি সম্বন্ধ।" মন যখন এই "সুখমিতি দুঃখমিতি"র ভাবে ভরিয়া ওঠে আমরা যাহা প্রকাশ করিতে উৎসুক অথচ অপারগ, তখন যে প্রতিভাবান কবি কাব্যের বর্ণে অনির্ব্বচনীয়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, ভাবকে ভাষায় বন্দী করিয়া রাখেন, তাহাকে ঈর্ষ্যা না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্যাকুলতার যখন অবসান হয় তখন উহা পাগলামি মনে করিয়া আবার হাসিও আসে। প্রকাশ করিতে পারি আর নাই পারি, ক্ষণিক হইয়াও এই অনুভব, আমাদের মনকে ঐশ্বর্য্যবান করিয়া দিয়া যায়। প্রকাশ যে করিতে পারিলাম না তজ্জন্য ক্ষতি বিশ্বজগতে আমার ভিন্ন আর কাহারও হইল না—কেননা অনুভবের তীব্রতা হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যছবি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যায়, সেই অপূর্ব্ব-আনন্দ মুহূর্ত্তটিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য স্মৃতির আর কোন সহায়ই থাকে না। তুষার-শুভ্র মেঘরাজি বাতাসে অমল পাল উড়াইয়া আকাশ-সাগর হইতে কখন যে অদৃশ্য হইয়া গেল;—কোন্ সুদূরের দেশে তৃষা তপ্ত কাহাকে সঞ্জীবিত, কোন্ বিরহীর নেত্রকে অভিনন্দিত করিল জানিতেও পারিলাম না। গিরিমালার মুখ হইতে গোধূলির রহস্য-আবরণখানি অপসারিত হইয়া যেমনি কঙ্কর দুর্গম পাষাণ প্রকাশ হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন হইতেও ভক্তহৃদয়ে দেবদর্শন-ব্যাকুলতার মত যে পুণ্য অনির্ব্বচনীয় ভাবরসধারা উদ্বেলিত হইতেছিল তাহাও না জানি কোথায় বিলীন হইয়া গেল!

আমাদের এই যে নিরন্তর ক্ষতি তাহা পূরণের একটি অতি সহজ উপায়,—ক্যামেরার সাহায্যে আলোক চিত্রের মধ্যে সুন্দর মনোরম দৃশ্যগুলিকে চিরস্থায়ী করিয়া লওয়া। কবির লেখনী, চিত্রকরের তুলিকার সহিত আলোকচিত্রকরের ক্ষুদ্র যন্ত্রটি ও তাহার ক্রিয়াকলাপের তুলনা করিতে সাহস হয় না; তবুও বলিব, যাহাদের



ফটোচিত্র

মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চার হইয়া থাকে, অথচ কবির মত তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহাদের এ অভাব দূর করিতে ক্যামেরার মত বন্ধু ও সহায় বড় দুর্লভ। কবি, যে প্রতিভার বলে বাক্যের বিন্যাসে ভাবকে মূর্ত্তিমান করিতে পারেন, সে শক্তি তাহাদের নাই বটে; কিন্তু তাহাদেরও দেখিবার এবং অনুভব করিবার শক্তি আছে। যাহা দেখিল, যাহা অনুভব করিল তাহা যে রমণীয়, পবিত্র ও মহিমান্বিত, তাহাও যে অনন্তেরই ক্ষণিক বিকাশ সে বোধ তাহাদের আছে। ক্যামেরা এই বোধকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও এই সৌন্দর্য্যকে বাস্তব আকারে পরিণত করে। মেঘের সৌন্দর্য্য, কুহেলিকার রহস্য, দর্শকের মনোভব নয় সত্য, ভাষায় তাহাদের বর্ণনা করিতে হইলে যে বাক্য-সম্পদে অধিকারী হওয়া আবশ্যক, অনেকেরই যে সৌভাগ্য নাই; তবুও এই মেঘ-তরঙ্গ, এই ধূসর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন পর্ব্বতব্যূহের ছবি, যাহা মন হইতে হারাইয়া যায় তাহাকে ধরিয়া রাখে। কত সুদীর্ঘ বৎসর পরে, সে মেঘ যখন কবেকার বৃষ্টিধারায় গলিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, যখন সেই কুয়াসা কত প্রভাত প্রদোষের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে —তখনও ছবিখানি সেই আনন্দ কিম্বা বিষাদ-মুহূর্ত্তের সাক্ষ্যস্বরূপে জীবিত থাকে; তাহার দৃষ্টি চিত্রকরের মনে বিস্মৃত-প্রায় অতীতকে বর্ত্তমানে জাগরূক করিয়া তোলে। বীণার মূর্চ্ছনা ঝঙ্কারের মত অন্তরকে জাতিস্মর করে;—যে সঙ্গীত একদিন তাহার অন্তরের সঙ্গোপনে বাজিয়াছিল, সে আবার তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়।

সাধারণের প্রতিপত্তিলব্ধ কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ দেখিয়া দর্শকের মনে যে ভাবোদয় হয়, চিত্রকর নিজে যখন তাহা দেখেন, তখন তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয়। তাহার কাছে সে ছবিখানি কেবলমাত্র একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য,—নদীর স্রোতধারা, কিম্বা সূর্য্যকরোজ্জ্বল সাগরের বিস্তার নয়, তাহা তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা, অন্তরে সঞ্চিত চির-সুন্দর—সুমধুর স্মৃতি, তাঁহার জীবনের পরশ-মণি,—একবার যাহার ক্ষণিক আবির্ভাবে হৃদয়ের সকল দৈন্য দূর হইয়াছে। দৃশ্যটি যে সুন্দর একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই যে-কেহ সে কথা বুঝিতে পারেন, কিন্তু চিত্রকরই একমাত্র জানেন, প্রকাশের অপেক্ষা তাহার ভাব আরো কত সুন্দর ছিল। এই জ্ঞানই তাঁহার নিজস্ব আনন্দ;—পারিলেও তিনি আর কাহারও সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই ছবিখানিই তাঁহার মনোনিহিত অব্যক্ত কবিতা, তাহার ইষ্ট সাধনার সঙ্গোপনমন্ত্র। অন্যের নিকট হয়ত বা তাহা ছন্দলালিত্যবর্জ্জিত নিতান্ত প্রাকৃত বলিয়াই মনে হইতে পারে, তাহার গঠন-পারিপাট্যে অনেক ত্রুটি প্রকাশ পাইতে পারে; তবুও সেখানি দেখিয়া রচয়িতার মনে যে অনুপম সৌন্দর্য্য ছবি, যে অপূর্ব্ব রাগিণী জাগরিত হয়, আর কোথাও তিনি তাহা খুঁজিয়া পান না।

ক্যামেরার সাহায্যে এই উপায়ে আমরা সকলেই আমাদের সীমাগত সামান্য ক্ষমতার যোগ্য কবি হইতে পারি। যদি অন্যে আমাদের মনের এই ভাব-নিমেষ



ফটোচিত্র



ফটোচিত্র

গুলি, এই চিত্র-শ্লোকগুলি বুঝিতে না পারে ক্ষতি নাই! নিমেষের সেই অতুলন মনোভাব, সেই পরিপূর্ণ আনন্দ, নিমেষের মধ্যেই পুষ্পের মত ঝরিয়া গিয়াছে, তাহার সুগন্ধ হৃদয়ে বসতি করিতেছে, চিত্রখানির সাহায্যে আবার তাহাকে যে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি তাহাই আমাদের পরম সুখ, তাহাই আমাদের সাধনার চরম সার্থকতা।

শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী।

সাফ্রেজিষ্ট প্রসঙ্গ

সমাজে রমণীজাতির যত স্বাধীনতা বাড়ে—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নিয়মে ঘরকন্না করা শিশুপালন ও গৃহস্থালি শিক্ষা বাড়ে সমাজের ততই উন্নতি হয়। ঘরকন্নার সর্ব্ববিষয়ে, (domestic life) তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে পারিলে গৃহের পক্ষে মঙ্গল যেমন অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ রাজ্যের অন্যান্য বিষয়েও রমণীদের মতামত দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলে সমাজের ও রাজ্যের অভিব্যক্তি উচ্চতর হইবারই সম্ভাবনা। আজকাল বিলাতের সাফ্রেজিষ্ট প্রসঙ্গও এই ভাবে বিচার করিতে হইবে।

স্ত্রীজাতির সমুন্নত অবস্থাই আমেরিকার দেশহিতৈষিতার প্রকৃষ্ট কারণ। এত হিতব্রত ইউরোপের কোন দেশে নাই। তাঁহাদের দেশের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী সকলেই সমাজের হিতকর কার্য্যে তৎপর। স্ত্রীজাতিসুলভ দয়া দাক্ষিণ্য গুণে "কারনিজীর ইনস্‌ষ্টিটিউটে"র কত লক্ষপতির ধনী কন্যাগণ স্বদেশের ও বিদেশের কতই না হিতকরী কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদেরই জন্য দেশের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কত রকমের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কতদিকে জ্ঞানচর্চ্চার পথ খুলিয়াছে!

কারনিজী ইনস্‌টিটিউসনে "ক্রেল নামক" এক শরীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত (Physiologist) জীবজন্তু মরিয়া গেলেও তাহাদের অনেক দিন কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। এই অবস্থায় সেই জন্তুগুলির সম্পূর্ণ সজীবতা থাকে। আর তিনি "কর্কট" cancer রোগের কোষগুলিকে লইয়া এমন কৃত্রিম উপায়ে রাখিতে পারিয়াছেন যে তাহাতে তাহারা বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এককালে মানুষকে এইরূপে অন্তত কতদিনের জন্যও বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যাইবে এবং কর্কট রোগেরও প্রতিকার সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

বিদেশের মঙ্গলের জন্য আর কোন দেশ এমন করিয়া প্রাণপাত করে না। তাঁহাদের দেশের রমণীসমিতি কত খরচ করিয়া দেশের পুরুষ ও রমণী প্রচারকগণকে বিভিন্ন দেশে পাঠাইতেছেন।

আমাদের দেশের 'পুষা' কৃষি কলেজ এক আমেরিকা রমণীর অনুষ্ঠান। স্বামীর সঙ্গে ভারতবর্ষে দেশভ্রমণে আসিয়া তিনি

এ দেশের লোক সকলকে দেখিয়া বড়ই ম্রিয়মান জাতি বলিয়া ধারণা করিলেন ও স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি করিলে ভারতবর্ষের লোকদের এমন বিমর্ষতা ঘুচে। তাঁহার স্বামী বলিলেন, ভারতবর্ষ এত উর্ব্বরা হইলেও তাহারা কৃষিকার্য্যে আধুনিক অনুষ্ঠানগুলি এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই অভাবের প্রতিকার করিলেই তাহাদের অন্নকষ্ট ঘুচিবে, চিত্ত হৃষ্ট হইবে। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া সেই রমণী তৎক্ষণাৎ ভারতের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষের জন্য বিপুল অর্থ দিলেন। সেই বিদেশের দান হইতেই পুষা কৃষিকলেজের ভিত্তিস্থাপন। এখন তাহা হইতে ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানের কত নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সার দেওয়ার প্রথা ও জমীর কি উপাদান উপকারী—ইত্যাদি ইত্যাদি। পুষা কৃষিকলেজের বাৎসরিক রিপোর্ট সব পরে পরে দেখিলে ভারতীয় কৃষি কত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির পথে যাইতেছে তাহা বুঝা যায়। এ কি "বিশ্বজনীন উদারতা।"

ইংরাজজাতিতেও উদার ভাবের অভাব নাই। বহু দেশের বীর শোণিত ইংরাজজাতিতে মিশ্রিত। জর্ম্মান, নর্সম্যান, ডেন্‌স্ স্যাক্‌সন্ প্রভৃতি ইউরোপ-ভূমিখণ্ডের বীর জাতিরা বারবার ইংলণ্ড জয় করিয়া ও এইখানে বসবাস করিয়া, বিবাহসূত্রে ক্রমশ একজাতি হইয়া পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র স্থান কিন্তু দূর দূরান্তরে ইহার রাজ্যপতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিয়াছে। বাণিজ্যে সুনিপুণ বলিয়াই তাঁহাদের শক্তি এত স্থায়ী। ইহারা সহজে কোনও পরিবর্ত্তন লইতে চান না। অনেক দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য দেশের অবস্থা দেখিয়া তবে ইঁহারা ধীরে ধীরে পা ফেলেন।

ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে কত অপকর্ম্ম পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এখন তাহার অনেক সংশোধিত হইয়াছে। একটি উদাহরণ "Slave Trade" দাস ব্যবসা। যখন ইউরোপীয় জাতিসকল আমেরিকার উর্ব্বর প্রদেশ লাভ করিবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া জমী দখল করিলেন তখন সে জমীগুলি খনন কর্ষণ ও তাহাতে শস্য উৎপাদনের জন্য আফ্রিকার সমুদ্রের ধার হইতে রাশি রাশি নিগ্রো জাতিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহারা পশুর মত তাহাদিগকে খাটাইতে লাগিলেন। এই দাস ব্যবসা ইংলণ্ডে শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। পরে ইংরাজই আবার কত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া এই ব্যবসা বন্ধ করিয়াছেন।

আবার এসিয়াতেও এইরূপ অপকর্ম্মের এখন সংশোধন চলিতেছে। আফিমের ব্যবসায়ে ১২ ক্রোড় টাকা ভারত-গবর্ণমেণ্টের লাভ ছিল। কিন্তু তথাপি এ ব্যবসায় তাঁহারা উঠাইয়া দিতেছেন। ইংরাজ জাতির ধর্ম্ম বুদ্ধি এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে চীনকে নিজেদের বাধ্য করিবার জন্য যুদ্ধ বাধে ও জয়ী হইয়া ইংরাজ হং কং দ্বীপ চীনের রাজ্য হইতে কাড়িয়া লন। সেই সময় সেখানে দুর্জ্জয় কেল্লা বানাইয়া—এই ব্যবসা এতদিন চালাইয়াছেন। এখন তাহাদের চির-বর্ত্তমান ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহা বন্ধ হইতে চলিল।

ইহা হইতেই মনে হয়,—সাফ্রেজিষ্ট

গোলমাল ক্রমে ক্রমে মিটিবে এবং তাহাদের পার্লামেণ্টে ভোট মিলিবে। অনেকের আপত্তি যে তাঁহারা "Unsexed" হইয়া পড়িবেন। অর্থাৎ সংসার-করা ছেলে-মানুষ-করা এ সকল প্রবৃত্তি তাঁহাদের চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এ আপত্তি টিকিবে না।

কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে আমাদের দেশে রাজ্যশাসনেও ভবিষ্যতে ঐরূপ অনেক পরিবর্ত্তন হইবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সমালোচনা

অন্নপূর্ণার মন্দির। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস; ইহার লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী উপন্যাস-রচনায় অতি অল্পকাল মধ্যেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। "অন্নপূর্ণার মন্দির" ১৩১৮ সালে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়,তখনই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি-গণ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' বাঙ্গালার একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, কলা-সাহিত্য-বিভাগে সম্পদস্বরূপ হইয়াছে; সেই জন্যই এ গ্রন্থ-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, নচেৎ 'ভারতী'তে প্রকাশিত উপন্যাস-সম্বন্ধে ভারতীতেই বিশদ আলোচনা করাটা ততখানি শোভন হইত না।

এ গ্রন্থখানি উপন্যাস-বিভাগে অভিনব শ্রেণীর। ইহাতে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগের এতটুকু কাহিনী নাই, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পেয়ালার ঠিন্‌ঠিনি রবটুকুও ইহার মধ্যে কোথাও ধ্বনিত হংয়া উঠে নাই অথচ এ উপন্যাসখানি পাঠ করিতে ধৈর্য্য পীড়িত হয় না, পাঠ করিয়া আনন্দ ও পরিতৃপ্তিই বরং পূর্ণমাত্রায় উপভোগ কয়া যায়। এখানি বাঙ্গালা দেশের প্রাণের কথা, বাঙ্গালীর সংসারের নিপুণ ফটো। দেশের মর্ম্ম ভেদ করিয়া দরিদ্র অভাগার কন্যাদায়ের যে কাতর ক্রন্দন ছুটিয়াছে, বক্তৃতার প্লাটফরম্ কাঁপাইয়া বহার দল আজ সহসা যে বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টির দুই-চারিটি কণা নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই কন্যাদায়টুকু ভিত্তি-স্বরূপ করিয়া দরিদ্র সংসারের এক সকরুণ কাহিনী এই গ্রন্থে প্রকৃত আর্টিষ্টের নিপুণ তুলিকাপাতে উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটির মধ্য দিয়া করুণ রসের যে একটি শান্ত ধারা বহিয়া গিয়াছে। সে ধারা সরল, সজীব। চরিত্র-চিত্রণে লেখিকার হাতে কোথাও অসঙ্গতি টান্ নাই, ভাষাকেও কোথাও অযথা ফাঁপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। লেখিকার ভাষা বেশ স্বচ্ছ, সরল, অনাবশ্যক ভাবের পীড়নে পীড়িত নহে। গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কনে লেখিকার দক্ষতা অসাধারণ। চিত্র স্বাভাবিক ও সুন্দর। গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাংশে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় গার্হস্থ্য চিত্র এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। উপন্যাসখানি ইংরাজী ও মৈথিলী ভাষায় অনূদিত হইতেছে—আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ পরিষ্কার হইয়াছে।

ভাতের জন্মকথা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এ বইখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। কি করিয়া মাটি চষিয়া তাহাতে ধান্যের বীজ বপন করা হয়, এবং ক্ষেতে মই চালাইয়া সেই বীজকে সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহা হইতে ধানের উৎপত্তি

য় এবং সেই ধান কি করিয়াই চাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পয়ার-ছন্দে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও সরল; ছন্দও লঘু, তাহাতে বেশ সহজ প্রবাহ আছে; কবিত্বেরও অপূর্ব্ব সমাবেশ করিতে লেখক ত্রুটি করেন নাই। বহিখানির ছাপা ছবি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। পাতায় পাতায় ছবি। ছবি রঙিন, ক্রমোলিথো-প্রণালীর; বাঙ্গালা বহিতে এরূপ ছবি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছবিগুলি অবান্তর নহে, বিষয়টিকে তাহারা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া রচনাটিকে সম্পূর্ণ সার্থকতাই দান করিয়াছে। গ্রন্থখানি শিশুদিগকে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিবে। রচনা-পারিপাট্যে এবং চিত্র-সৌষ্ঠবে গ্রন্থখানি সবিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

খোকার গান। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এখানিও ছেলেমেয়েদের জন্য ছন্দে রচিত বহি। এ গ্রন্থেও ছবি অসংখ্য এবং ছবিগুলি ক্রমোলিথো-প্রণালীর। ছড়ার ধরণে লিখিত কয়েকটি এবং ব্যঙ্গরসাত্মক কয়েকটি কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছবি ও ছাপা প্রভৃতির উৎকর্ষে বইখানি সুন্দর, চিত্তাকর্ষক।

নিমীলন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। চট্টগ্রাম ইম্পীরিয়ল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। এখানি কবিতা-পুস্তক; পত্নীবিয়োগে বিলাপের উচ্ছ্বাস-সমষ্টি। লেখকের ভাষা সুন্দর, উচ্ছ্বাসটুকু নিতান্তই ব্যক্তিগত হা-হুতাশ নহে, তাহাতে কবিত্ব আছে।

কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা।—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। একটা কথা অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে যে সন্তানের উপর মাতার প্রভাব বড় অল্প নহে। তাই সন্তানকে বুঝিতে হইলে মাতাকেও বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশেও দেখিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণ যে বড় হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের জননীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। নববিধান-উপাসনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের উপরও তাঁহার জননীর প্রভাব বড় অল্প ছিল না। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা ৺কৃষ্ণবিহারী সেনের কন্যা ও জামাতার অনুরোধে ও আগ্রহে কেশব-জননী স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী তাঁহাদের নিকট আপনার জীবনকাহিনী যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহারা তাহা লিখিয়া লন; এবং সেই বিবরণীই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। ইহাতে এক তেজস্বিনী নিষ্ঠাবতী নারীর সহজ সরল ঘরোয়া কথার মধ্য দিয়া সেকালের বহু তথ্য আভাসে-ইঙ্গিতে মনোজ্ঞভাবে সুশৃঙ্খল পর্য্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বক্তব্যটুকুর অন্তরালে এক করুণাময়ী নারীর শান্ত সংযত ও সশ্রদ্ধ হৃদয়ের পরিচয়ও সুস্পষ্ট রেখায় জাগিয়া উঠিয়াছে—সে হৃদয় ত্যাগে পবিত্র, ভক্তিতে সমুজ্জ্বল, বিনয়ে সুকোমল। বস্তুতঃ সুমাতারই হৃদয়। গ্রন্থখানি উপন্যাসের মতই সরস কৌতূহলোদ্দীপক; সমাজ ও ইতিহাস-রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও ইহাতে যথেষ্ট আছে।

পদ্মিনী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্। মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি চমৎকার। কয়েকখানি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে—কিন্তু রচনা কৌতূহলোদ্দীপক হয় নাই।

রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়।—শ্রীযুক্ত হরি-চরণ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, বর্দ্ধমান। কলিকাতা ভৈষজ্য ষ্টীম মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই। রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতি প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত, ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। স্বযুক্তির সমর্থনকল্পে লেখক শাস্ত্র-পুরাণাদি হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং উভয় জাতির সংস্কার ও আচার-ব্যবহারে বিস্তর সৌসাদৃশ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থাদি

হইতে লেখক প্রমাণ করিয়াছেন, রাজা মানসিংহের সহিত বিস্তর উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্য বঙ্গদেশে আগমন করে তাহাদের কয়েকজনকে বঙ্গদেশে রাখিয়া মানসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই কয়েকজন সৈনিকই বঙ্গীয়-উগ্রক্ষত্রিয়গণের আদিপুরুষ। উগ্রক্ষত্রিয়গণ আগরা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ দেশে 'আগুরি' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। গ্রন্থকারের যুক্তি সুনিপুণ এবং তাঁহার প্রমাণ-সংগ্রহও বিপুল।

রস-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম,এ অনুবাদক। শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মডেল লাইব্রেরী, ২৭।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। জয়ন্তী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা। এ গ্রন্থখানি ভানু দত্ত রচিত সংস্কৃত "রস মঞ্জরী"র বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থকার ভূমিকায় 'রস-শাস্ত্র' সম্বন্ধে সুনিপুণ আলোচনা করিয়া ভানুদত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। 'রসমঞ্জরী'তে অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণীভেদ বিবৃত হইয়াছে। সে বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্বরসে মণ্ডিত। সতীশ বাবু তাহারই অনুবাদ বাঙ্গলা ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন। 'ভূমিকা'য় তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "রসমঞ্জরীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভূমিকার কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। যে গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই কবির অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় সুপরিস্ফুট, সেই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি উদাহরণ দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" আমরা দুই-একটি মাত্র স্থল—অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। নায়িকার সখী, স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া কত রত্ন অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছে, তাহা নায়িকাকে দেখাইতে যাওয়ায়, প্রেমগর্ব্বিতা নায়িকা যে তাহার সখী অপেক্ষা অনেক সৌভাগ্যবতী, তাহাই কৌশলে প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছে,—

"স্বামী তব কলেবর রত্ন অলঙ্কারে
সাজায়েছে,—ধন্য তুমি,—কী বলিব আর?
দেখার আড়াল হবে—ভয়ে কান্ত মোরে
না দেয় পরিতে সখি! কোনো অলঙ্কার।"

ছন্দানুবাদের নিম্নে ফুটনোটে লেখক যে ব্যাখ্যা দ্বারা শ্লোকগুলি বুঝাইয়াছেন, সে ব্যাখ্যাগুলি বিশদ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে, তবে অনুবাদে ছন্দের সুরটুকু সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হয় নাই। সেজন্য স্থানে স্থানে বাঙ্গলা ছন্দ নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। এই সামান্য ত্রুটিটুকু ঘটিবার একটি কারণ, অনুবাদক শ্লোকগুলির যথাযথ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অতএব এ ত্রুটি মার্জ্জনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। যাহা হউক, 'রস শাস্ত্র' বিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন —এ শ্রম-স্বীকারের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বহিখানির ছাপা কাগজ ভালই হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



কান্তক প্রেস]

বঙ্গ

[২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভারতী

৩৮শ বর্ষ]　　আষাঢ়, ১৩২১　　[৩য় সংখ্যা

মল্লিনাথ

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকাকারগণ সর্ব্বদা সম্মানিত। তাঁহারা না থাকিলে এতদিনে শাস্ত্রমর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহাদের উদ্যম না থাকিলে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থ দূরে থাক্, সামান্য কাব্যাদির আলোচনাও আজ অতি আয়াস-সাধ্য এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠিত। সেকালে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনার সুবিধা ছিল না। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি স্মৃতিশক্তি সাহায্যেই প্রচারিত হইত। কাজেই স্বল্পাক্ষর সূত্রাকারে শিক্ষা দিবার প্রণালীই তখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই ছোট ছোট সূত্রগুলি অল্প আয়াসে কণ্ঠস্থ হইত বটে কিন্তু তাহার মহৎ দোষ ছিল অর্থের অস্পষ্টতা। গুরুর নিকট হইতে উপদেশ না পাইলে আর কেহ সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না। গুরুগৃহে অধ্যয়নই তখন জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ছিল। এই সূত্রাকারে গ্রন্থ রচনার এত প্রচার হইয়াছিল যে শেষে গ্রন্থকার বিশদ গ্রন্থ না লিখিয়া কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া নিজেই তাহার বৃত্তি রচনা করিতেন। কিন্তু লিখন প্রণালীর বহু প্রচলনে ব্যাখ্যা ও টীকারচনা সহজ হইয়া আসিল। ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজনও হইল কেন না অনেক স্থলে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পণ্ডিতগণ সূত্রগুলির বিকৃত অর্থ করিতে লাগিলেন, কোথাও বা কোনও শাস্ত্রের দুরূহতা প্রযুক্ত ব্যাখ্যার অভাবে তাহার পঠন-পাঠনও বন্ধ হইয়া গেল। তখন ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা, টীপ্পনীর যুগ আসিল। যাঁহারা স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের ন্যায় মনীষী ভারতে আর জন্মে নাই। বেদের ভাষ্য কর্ত্তা—সায়ণাচার্য্য, উপনিষদ বেদান্ত গীতার ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্য, ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা বাৎস্যায়ন। কয়জনের আর নাম করিব ?

শাস্ত্র গ্রন্থ গুলির এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে থাকিলেও কাব্যগুলি বহুদিন অনাদৃত হইয়া রহিল। বহুদিন পরে কেহ কেহ প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া দুই একখানি কাব্যের টীকা রচনার

চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকলে সফলকাম হইলেন না। কারণ প্রতিভাবান্ মনীষীগণ সাধারণতঃ এ ভার গ্রহণে অগ্রসর হইতেন না। কাব্যালোচনাকে তাঁহারা বিশেষ সমাদরের চক্ষে দেখিতেন না। কাজেই প্রকৃত ব্যাখ্যা অপেক্ষা দুর্ব্ব্যাখ্যারই আবির্ভাব হইল। মহাকাব্যগুলি এই অত্যাচারে যখন জর্জ্জরীভূত তখন দাক্ষিণাত্যবাসী এক মহা প্রতিভাবান পুরুষ "দুর্ব্ব্যাখ্যা বিষমূর্চ্ছিত" কাব্যগুলির গৌরব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম—মল্লিনাথ।

তখন চতুর্দ্দশ শতাব্দী শেষ হইয়া আসিতেছে। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির মহাকাব্যগুলি বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও বিশদ টীকার অভাবে সর্ব্বজনবোধ্য ও বহুল আদৃত ছিল না। মনীষী মল্লিনাথ একে একে এই মহাকাব্য গুলির টীকা রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রণালীতে রচিত পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরাকাষ্ঠা পূর্ণ টীকাগুলি এত সমাদৃত হইতে লাগিল যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। মল্লিনাথের টীকার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও আদর হইল যে মহাকাব্যগুলি পাঠ করিতে বসিলে মল্লিনাথ টীকা পাঠও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। সমগ্র ভারতে এই টীকার প্রচার হইয়া পড়িল। এ টীকার বিশেষত্ব এই যে টীকাকার কোথাও নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া মূল গ্রন্থ অপেক্ষা টীকাকে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলেন নাই। অথবা নিকৃষ্ট টীকাকারগণের ন্যায় দুরূহ স্থল সকলের অর্থ না দিয়া সরল অংশের বিশদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে যখন যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি ব্যাকরণ, কি ছন্দ, কি অলঙ্কার, কি হস্তিশাস্ত্র, কি দণ্ডনীতি, সকল স্থলেই মল্লিনাথ প্রামাণ্য গ্রন্থ সকল হইতে পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া কবির অভিপ্রায় স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। কাব্যের টীকা রচয়িতাদের মধ্যে মল্লিনাথ সকলের শীর্ষস্থানীয়। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাই বা কয়জনের থাকা সম্ভব? অভিধান-গ্রন্থরাজি তাঁহার নখদর্পণে, অমর, যাদব হলায়ুধ, বিশ্ব প্রভৃতির উল্লেখ পদে পদে। স্মৃতিশাস্ত্রে মনু ও পরাশর, দণ্ডনীতিতে কামন্দক ও চাণক্য, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে পালকাপ্য প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকার মধ্যেই নৈয়ায়িকসুলভ তর্কজালের অবতারণা, সাংখ্য ও বেদান্তের গূঢ়মর্ম্ম প্রকাশ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন কণাদ, অক্ষপাদ, ব্যাস প্রভৃতি রচিত গ্রন্থ ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার সমান অধিকার—

"বাণীং কাণভুজীমজীগণদবাসাসীচ্চ বৈয়াসিকী-
মন্তস্তন্ত্রমরংস্ত পন্নগ-গবী-গুহ্যেষু চাজাগরীৎ।
বাচামাচকলদ্রহস্যমখিলং যশ্চাক্ষপাদস্য রাং
লোকেঽভূদ্ যদুপজ্ঞমেব বিদুষাং সৌজন্যজন্যং যশঃ॥"

পাণিনি ব্যাকরণ তাঁহার কণ্ঠাগ্রে। প্রতি শ্লোকের ছন্দঃ ও অলঙ্কার লক্ষণসহ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোথাও দ্ব্যর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা, কোথাও অতি সংক্ষেপে শ্লোকের ভাবার্থ, কোথাও বা প্রক্ষিপ্তপাঠ নির্দ্ধারণ তাঁহার টীকাকে বহুমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। কবির ইঙ্গিত তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন।

কালিদাস যে দিঙ্‌নাগ ও নিচুলের সমসাময়িক তাহা তাঁহার টীকা হইতেই জানিতে পারা যায়। প্রতি শ্লোকের অন্তর্নিহিত পৌরাণিক বার্ত্তা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বহুবিধ গুণসন্নিবেশে মল্লিনাথের টীকা এরূপ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে যে ইহার সমতুল্য আর কোন টীকার নাম করা দুরূহ। সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ, সকল স্থলেই প্রমাণস্বরূপ বিবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হওয়াতে মূল্যবান মল্লিনাথটীকা চিরদিন কাব্যরসিকগণের চিত্তরঞ্জন করিতে থাকিবে।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থকর্ত্তৃগণের ন্যায় টীকাকার মল্লিনাথেরও জীবনচরিতের বিশদ ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। প্রবাদ বা উপকথায় মল্লিনাথের জীবনচরিতের কতকগুলি ঘটনা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে কিন্তু সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে। উপকথায় মল্লিনাথের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধারানগরীর অধীশ্বর মহারাজ ভোজ কবি-বৃন্দ-পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে সমুপবিষ্ট আছেন এমন সময় দ্বারপাল আসিয়া বলিল "মহারাজ, দ্বারে একজন কবি দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি একটি গাথা লিখিয়া সভায় প্রেরণ করিয়াছেন।" নৃপতি ভোজের চতুর্দ্দিকে তখন কালিদাস, ভবভূতি, দণ্ডী, বাণ, ময়ূর, বররুচি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ সমাসীন। রাজা তাঁহাদের সমক্ষে সেই গাথা পাঠ করিলেন—

"কাচিদ্বালা রমণবসতিং প্রেষয়ন্তী করণ্ডং
দাসীহস্তাৎ সভয়মলিখদ্ব্যালমম্ভোপরিস্থম্।
গৌরীকান্তং পবন-তনয়ং চম্পকং চাত্র ভাবং
পৃচ্ছত্যার্য্যো নিপুণতিলকো মল্লিনাথঃ কবীন্দ্রঃ॥

মল্লিনাথ-কবিপ্রেরিত এই গাথা পাঠে সমস্ত সভা বিস্মিত হইলেন। তখন কালিদাস বলিলেন "মহারাজ, মল্লিনাথকে শীঘ্র আহ্বান করুন।" তখন রাজার আদেশে দ্বারপাল মল্লিনাথকে সভার মধ্যে প্রবেশ করাইল। মল্লিনাথ "স্বস্তি" এই বলিয়া রাজার অনুরোধে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা কালিদাস ও ভবভূতি, মল্লিনাথের বহু প্রশংসা করিলেন ও রাজাজ্ঞায় মল্লিনাথকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পঞ্চ হস্তী ও দশ অশ্ব প্রদান করা হইল। তাহাতে প্রীত হইয়া মল্লিনাথ এইরূপে রাজার স্তব করিলেন—

"দেব ভোজ তব দানজলৌঘৈঃ
সোঽয়মদ্য রজনীতি বিশঙ্কে।
অন্যথা তদুদিতেষু শিলাগো—
ভূরুহেষু কথমীদৃশদানম্॥"

এই শ্লোক শুনিয়া রাজা মল্লিনাথকে আরও তিনলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দিবার আদেশ করিলেন।(১)

(১) ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্ব্বাণে শ্রীভোজে কালিদাসভবভূতি-দণ্ডী-বাণ-ময়ূর-বররুচি প্রভৃতি কবি—তিলককুলালতস্কায়াং সভায়াং দ্বারপাল এত্যাহ "দেব কশ্চিৎ কবির্দ্বারি তিষ্ঠতি, তেনেয়ং প্রেষিতা গাথাসনাথা চীঠিকা।...রাজা গৃহীত্বা তাং বাচয়তি।...তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বাপি বিদ্বৎপরিষৎ চমৎকৃতা। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ "রাজন্, মল্লিনাথঃ শীঘ্রমাকারয়িতব্যঃ।" ততো রাজাদেশাদ্দ্বারপালেন স প্রবেশিতঃ কবী রাজানং "স্বস্তি" ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়া উপবিষ্টঃ।.....ততঃ প্রীতেন রাজ্ঞা তস্মৈ দত্তং সুবর্ণানাং লক্ষম্। পঞ্চ গজাশ্চ দশ তুরগাশ্চ দত্তাঃ। ...ততো লোকোত্তরং শ্লোকং শ্রুত্বা রাজা পুনরপি তস্মৈ লক্ষত্রয়ং দদৌ।

[ভোজ প্রবন্ধঃ]

ভোজপ্রবন্ধে এই কাহিনী বর্ণিত আছে, কিন্তু ভোজপ্রবন্ধের উপাখ্যানগুলি একটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কালিদাস, ভবভূতি, বাণ, ময়ূর, দণ্ডী মল্লিনাথ প্রভৃতিকে সমসাময়িকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এই একটিমাত্র হেতু হইতেই ভোজপ্রবন্ধের উপর আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস থাকে না। তবে এই উপাখ্যানে মল্লিনাথের প্রতি কালিদাসের অনুরাগ বেশ দেখান হইয়াছে। মল্লিনাথের শ্লোকটি শুনিয়া রাজা যখন মল্লিনাথকে বলিলেন "সাধু রচিতা গাথা।" তখন কালিদাস বলিলেন "কিমুচ্যতে সাধ্বিতি? দেশান্তরগতকান্তায়াশ্চারিত্র্যবর্ণনেন শ্লাঘনীয়োঽসি। বিশিষ্য তত্তদ্ভাবপ্রতিভটবর্ণনেন।" যাক্—এ কাহিনীর আর আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে ইহা হইতে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে মল্লিনাথ যে কেবল টীকা রচনা করিতেন তাহা নয়। তাঁহার মৌলিক কাব্য লিখিবার শক্তিও ছিল, আমরা পরে দেখাইব মল্লিনাথের একখানি বিলুপ্ত প্রায় কাব্যের কিয়দংশ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আর দাক্ষিণাত্যদেশে প্রচলিত আর একটি উপকথার অনুসরণ করা যাক্। কানাড়ী ভাষায় রচিত কথাসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পেদ্দভট্টচরিতম্ নামক এক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মল্লিনাথেরই অপর নাম পেদ্দভট্ট। এই পেদ্দভট্টচরিত মল্লিনাথেরই উপকথাময় জীবনচরিত। সে কাহিনী এই—

দেবপুর গ্রামে মল্লিনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দেববর্ম্মণ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। দেববর্ম্মণ মল্লিনাথকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু মল্লিনাথ এত স্থূলবুদ্ধি যে কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মল্লিনাথ বিবাহ করিলেন। প্রথম যেদিন শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিবেন, সেদিন মল্লিনাথের পিতা উপদেশ দিলেন যে কেহ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নীরব হইয়া থাকিবে, কোনও পুস্তক সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলে বলিবে "গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে কি?" শ্বশুরালয়ে উপনীত হইলে কৌতুক করিবার জন্য একখানি সাদা পুঁথি তাঁহার হস্তে দিয়া তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করা হইল। মল্লিনাথ বলিলেন "গ্রন্থখানি কি শেষ হইয়াছে?" তাহাতে সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। মল্লিনাথ পূর্ব্ব হইতেই নিজ মূর্খতার জন্য পেদ্দভট্ট নামে কথিত হইতেন। এখন শ্বশুরালয়ে বহুবিধ বিদ্রূপ তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। পত্নীর উপদেশে মল্লিনাথ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে উপনীত হইলেন ও এক অধ্যাপকের গৃহে পাঠার্থে গমন করিলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন পথে বসিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" এই কয়েকটি কথার উপর দাগা বুলাও। মল্লিনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক নিজ পত্নীকে আদেশ দিলেন মল্লিনাথের খাদ্যে ঘৃতের পরিবর্ত্তে নিম্বতৈল দিবে। দেখ সে ঘৃতের অভাব বুঝিতে পারে কি না। এইরূপ ক্লেশ ও অবমাননা সহ্য করিতে করিতে বহুদিন কাটিয়া গেল। মল্লিনাথ ক্রমশঃ বর্ণমালা শিখিলেন। নিম্বতৈল তখন তাঁহার বিস্বাদ লাগিল। তিনি গুরুপত্নীর

নিকট এ কথা জানাইলেন। অধ্যাপক এ কথা শুনিয়া মল্লিনাথের বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বুঝিয়া মহাআনন্দে তাহাকে সমীপে আহ্বান করিলেন ও প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সদ্‌গুরুর অসীম চেষ্টায় মল্লিনাথ মহাপণ্ডিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তারপর প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের উপাখ্যান এই। ইহা কালিদাসের জীবনের অনুরূপ। কালিদাস সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে প্রথমে তিনি মূর্খ ছিলেন পরে সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞানলাভ করেন। টীকাকার মল্লিনাথ সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এখন মল্লিনাথের বিশ্বাসযোগ্য কিছু পরিচয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। মল্লিনাথ প্রায় সকল টীকাতেই নিজনাম উল্লেখ করিবার সময় লিখিয়াছেন "মহোপাধ্যায়কোলাচলমল্লিনাথসূরি।"

কোলাচল, কোলচল বা কোলচলম্ কাহারও মতে মল্লিনাথের বংশনাম কাহারও মতে মল্লিনাথের বাসস্থলের নাম। ভোজরাজ প্রণীত চম্পূরামায়ণ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। পদযোজনা নামক তাহার একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতা বেঙ্কটনারায়ণ। এ টীকা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। পুঁথির পরিচয় Hultzsch সম্পাদিত Reports on Sanskrit Mss. গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বেঙ্কটনারায়ণ মল্লিনাথের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পদযোজনার প্রারম্ভ শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে কোলচলম্ মল্লিনাথের বংশ-নাম। পদযোজনার ষষ্ঠ শ্লোকে আছে—

"কোলচলমান্বয়াকাশেন্দুম ল্লিনাথো মহাযশাঃ।"

নিজ পরিচয় দানকালে বেঙ্কট লিখিয়াছেন

"শ্রীমৎকোলচলমান্বয়দুর্ব্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন শ্রীনাগেশ্বরযজ্বসূনুনা বেঙ্কটনারায়ণেন।"

এই গ্রন্থেরই একখানি পুঁথিতে আছে,

"নারায়ণেন বিদুষা কোলচলমান্বয়েন্দুনা।"

এই সকল পংক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কোলচলম্ নামে একটি বংশ ছিল। ঐ বংশেই মল্লিনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

কে, পি, ত্রিবেদী কোলচল বা কোলাচলকে মল্লিনাথের বাসস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও মল্লিনাথের দুইজন বংশধর জীবিত আছেন। দুইজনেই বেলারি জেলার কাদাপ্পা নামক স্থলের উকীল। তাঁহাদের নাম কোলচলম্ বেঙ্কটরাও ও কোলচলম্ শ্রীনিবাস রাও। তাঁহাদের একজনের কথার উপর নির্ভর করিয়া কে, পি, ত্রিবেদী বলিয়াছেন, কোলচল বা কোলাচল একখানি গ্রামের নাম। (২) কিন্তু এই গ্রামখানি যে কোথায় এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কাজেই এ মতে আমরা ততদূর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। তবে ইহা সম্ভব হইতে পারে যে কোলচলম্ বংশ যেখানে বাস করিতেন সেই স্থানই পরে কোলচল বা কোলাচল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। আমরা পূর্ব্বোক্ত

(২) "Kolachala is the name of a village. It is also called Kola-charla."

পুঁথি দুইটির শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কোলচল নামটি মল্লিনাথের বংশনাম বলিয়াই ধরিয়া লইব।

মল্লিনাথ নামের অর্থ মহাদেব। প্রচলিত অভিধানে 'মল্লিনাথ' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মল্লিনাথের বংশধর বলেন যে মহাদেবের স্থানীয় নাম—মল্লিনাথ ও তাঁহাদের বংশে অনেকেই মল্লি ও মল্লিয়া নামে আখ্যাত হইতেন। (৩)

মল্লিনাথ মহোপাধ্যায় নামক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মাঘকাব্যের টীকার মঙ্গলাচরণে মল্লিনাথ লিখিয়াছেন।

"মল্লিনাথঃ সুধী সোঽয়ং মহোপাধ্যায়শব্দভাক্।
বিধত্তে মাঘকাব্যস্য ব্যাখ্যাং সর্ব্বঙ্কষামিমাম্॥"

এতদ্ব্যতীত প্রতি টীকার শেষে 'মহোপাধ্যায়' উপাধির উল্লেখ আছে।

মল্লিনাথের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম পেদ্দবার্য্য ও কুমারস্বামী। পেদ্দবার্য্য পিতার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কুমারস্বামী বিদ্যানাথ রচিত প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন, তাহার নাম—রত্নাপণ। প্রতাপরুদ্র কাকতীয় নৃপতি ছিলেন তাঁহার স্তুতিমূলক শ্লোক উদাহরণে প্রয়োগ করিয়া বিদ্যানাথ প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ রচনা করিয়াছিলেন। মল্লিনাথ-পুত্র কুমারস্বামী এই গ্রন্থের টীকার প্রারম্ভে নিজ পিতা ও ভ্রাতার নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"ত্রিস্কন্ধশাস্ত্রজলধিং চুলুকীকুরুতে স্ম যঃ।
তস্য শ্রীমল্লিনাথস্য তনয়োঽহং জনি তাদৃশঃ॥
কোলচলপেদ্দবার্য্যঃ প্রমাণপদবাক্য পারদৃশ্বা যঃ।
ব্যাখ্যাতনিখিলশাস্ত্রঃ প্রবন্ধকর্ত্তা চ সর্ব্ববিদ্যাসু॥
তস্যানুজন্মা তদনুগ্রহাপ্তবিদ্যানবদ্যো বিনয়াবনম্রঃ।
স্বামী বিপশ্চিদ্বিততনোতি টীকাং প্রতাপরুদ্রীয়রহস্য
—ভেত্রীম্।"

অর্থাৎ মল্লিনাথের কোলচল পেদ্দবার্য্য নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তাঁহার অনুজ কুমারস্বামী। ইনি পেদ্দবার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই কুমারস্বামী প্রতাপরুদ্রীয় বা প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

মল্লিনাথ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত এইটুকু মাত্র অবগত হইতে পারা যায়! পূর্ব্বে পদযোজনা নামক টীকারচয়িতা বেঙ্কট নারায়ণের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার পদযোজনার পুঁথির প্রারম্ভে মল্লিনাথের বংশাবলীর এক তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না তিনি মল্লিনাথের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। তিনি মল্লিনাথ বা মল্লিনাথপুত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার শোনা কথা। তা ছাড়া মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী নিজ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অধস্তন অষ্টম পুরুষ বেঙ্কটনারায়ণের উক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এরূপস্থলে মল্লিনাথপুত্র কুমারস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। পাদটীকায় আমরা বেঙ্কটনারায়ণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বেঙ্কট নারায়ণের

(৩) Mallinatha is a local name of God Siva.....some of our ancestors are Known as Malli or Malliah."

[Introduction to Ekavali.]

বলিয়াছেন বীররুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কোলচলম বংশসম্ভূত মল্লিনাথ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম কপর্দ্দী, ইনি শ্রৌতকল্পসূত্র সকলের কারিকাবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র মল্লিনাথ ও পেদ্দুভট্ট। পেদ্দুভট্ট মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ও নৈষধচরিত জ্যোতিষ প্রভৃতির ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। পেদ্দু ভট্টের পুত্র কুমারস্বামী। ইনি প্রতাপরুদ্রীয় নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। (৪) বলা বাহুল্য স্বয়ং কুমারস্বামীর উক্তির সহিত ইহার বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে! সুতরাং আমরা এ বংশপত্রিকা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

শালিবাহন শক, ১৪৫৫ অব্দে (খৃষ্টীয় ১৫৩৩) উৎকীর্ণ এক ফলক লিপিতে মল্লিনাথের নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে [Indian Antiquary Vol 5. P. 20 দ্রষ্টব্য] :—

"অন্তরায় তিমিরোপশান্তয়ে শান্তপাবনমচিন্ত্যবৈভবম্।
অং নরং বপুষি কুঞ্জরং মুখে মন্মহে কিমপি তুন্দিলং মহঃ॥"

কানাড়া লিপিতে এই ফলকটি খোদিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে অচ্যুতরাজের সেনাপতির আদেশে বাদাবির দুর্গাভ্যন্তরে কতকগুলি মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "একাবলী" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচিত হয়। মল্লিনাথ তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যেই মল্লিনাথ বর্ত্তমান ছিলেন। মল্লিনাথ বসন্তরাজীয় নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও রচনাকাল ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।

মল্লিনাথ যে সকল টীকা রচনা করিয়া-অমর হইয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা এ যাবৎ এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি। মহাকবি কালিদাসের তিনখানি কাব্যের টীকা মল্লিনাথের প্রধান কীর্ত্তি।

কালিদাসের কাব্যগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় মল্লিনাথ নিজ পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। না হইবেই বা কেন? কালিদাসকে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন রঘুবংশ টীকায় তিনি লিখিয়াছেন "সকলকবি শিরোমণিঃ কালিদাসঃ।" অন্যান্য কবিগণের বেলায় বলিয়াছেন "তত্রভবান্ মাঘকবিঃ" (শিশুপালবধ টীকা) "তত্রভবান্ ভারবি নামা কবিঃ" (কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা), একটি উদ্ভট শ্লোকও মল্লিনাথ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে "কালিদাস কবিতা...সন্তবন্তু মম জন্ম জন্মনি" জন্ম জন্ম যেন কালিদাসের কবিতা পাই। কালিদাসের প্রতি মল্লিনাথের

(৪) "কোলচলমান্বয়াব্ধীন্দুর্মল্লিনাথো মহাযশাঃ।
শতাবধান বিখ্যাতঃ বীররুদ্রাভিবর্ষিতঃ॥
মল্লিনাথাত্মজঃ শ্রীমান্ কপর্দ্দী মন্ত্রকোবিদঃ।
অখিল শ্রৌত কল্পস্য কারিকাবৃত্তিমাতনোৎ॥
কপর্দ্দিতনয়ো ধীমান্ মল্লিনাথোঽ গ্রজঃ স্মৃতঃ।
দ্বিতীয়স্তু ভ্রা ধীমান্ পেদ্দ ভট্টো মহোদয়ঃ॥
মহোপাধ্যায় আখ্যাতঃ সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বতঃ।
মাতুলেয়কৃতৌ দিব্যে সর্ব্বজ্ঞেনাভিবর্ষিতঃ॥
গণাধিপপ্রসাদেন প্রোচে মন্ত্রগণান্ বহূন্।
নৈষধজ্যোতিষাদীনাং ব্যাখ্যাতাভূজ্জগদ্গুরুঃ॥
পেদ্দু ভট্টসুতঃ শ্রীমান্ কুমারস্বামি সংজ্ঞিকঃ।
প্রতাপরুদ্রীয়াখ্যান ব্যাখ্যাতা বিদ্বদগ্রিমঃ॥"

[পুঁথি হইতে উদ্ধৃত] [পদযোজনা— মঙ্গলাচরণম্]

কতদূর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল তাহা রঘুবংশের টীকার প্রারম্ভে মল্লিনাথের নিজ রচিত শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন "অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে ইচ্ছুক হইয়া এই সেই মল্লিনাথ কবি কালিদাসের তিনখানি কাব্যের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছে। কালিদাসের রচনার মর্ম্ম স্বয়ং কালিদাস সাক্ষাৎ সরস্বতী বা ব্রহ্মাই নির্ণয় করিতে পারেন, আমার ন্যায় মানব কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবে? তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার দক্ষিণাবর্ত্তনাথ প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া আমি কালিদাসের কবিতা ব্যাখ্যা করিব। কালিদাসের কবিতা ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যারূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। আমার সঞ্জীবনী নামক টীকা অমৃতের ন্যায় সেই বিষের প্রভাব দূর করিয়া কালিদাসের কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিবে।" (৫)

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মল্লিনাথের টীকার পূর্ব্বে কালিদাসের কাব্যের অন্যান্য টীকা বিদ্যমান ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলিতে কবির যথার্থ অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হয় নাই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এই ব্যাখ্যাগুলিতে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যগুলির গৌরব হ্রাস হইবার আশঙ্কায় মল্লিনাথ প্রকৃত ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হন। দক্ষিণাবর্ত্তনাথ প্রভৃতি কয়েকজন প্রশংসনীয় টীকাকারের কথা মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ইহাঁদেরই অনুসরণে টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কাজেই বলিতে হইবে যে মহাকাব্যের টীকা রচনায় মল্লিনাথ প্রথম পথ প্রদর্শক নন। তাঁহার পূর্ব্বেও অন্যান্য টীকাকারগণ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু মল্লিনাথের যশের জ্যোতিতে তাঁহাদের গৌরবদীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

যে তিনখানি কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত। তিনখানি টীকার নামই সঞ্জীবনী।

মল্লিনাথের চতুর্থ টীকা ঘণ্টাপথ নামে বিখ্যাত। ইহা মহাকবি ভারবি-রচিত কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্যের টীকা। ভারবির দুরূহ শব্দ ও দুর্ব্বোধ রচনাপ্রণালীর ভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারা কিরাতার্জ্জুনীয় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন না, মল্লিনাথ তাঁহাদিগকে সহজে কবির মর্ম্ম অবগত করাইবার জন্য ঘণ্টাপথ টীকা রচনা করিয়াছেন (৬) ও বলিয়াছেন নারিকেল ফলের উপরে কঠিন আবরণ দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া যেমন তাহার অভ্যন্তরস্থ রস আস্বাদন করিতে হয় তেমনি ভারবির শব্দগুলি দেখিয়া ভয় করিলে চলিবে না, তাহাদের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। (৭) অর্থগৌরবই ভারবির বিশেষত্ব।

মল্লিনাথের পঞ্চমটীকা মাঘ কবিরচিত শিশুপাল বধকাব্যের সর্ব্বঙ্কষা নামক ব্যাখ্যা। গুণ, অলঙ্কার, ধ্বনি প্রভৃতির উদাহরণ অবগত হইতে হইলে, ভাবলহরী বিক্ষুব্ধ রসসমুদ্রে অবগাহন করিতে হইলে শিশুপালবধ পঠনীয়। মল্লিনাথ কাব্যরসিকগণের জন্য সর্ব্বঙ্কষা নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মাঘ কবি ধন্য, আমরাও তাহার অমৃতোপম উক্তি পাঠে কৃতার্থ হইয়াছি। (৮)

মল্লিনাথের আর একখানি টীকা মহাকবি শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধীয়চরিতের জীবাতু নামক ব্যাখ্যা। সম্প্রতি সর্ব্বপথীনা নামক মল্লিনাথকৃত ভট্টিকাব্যের টীকাও প্রচারিত হইয়াছে।

এখন দেখা গেল সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি মল্লিনাথ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধীয়চরিত ও ভট্টিকাব্য এই সমস্ত কাব্যগুলিই আজ মল্লিনাথকৃত টীকার সাহায্যে সহজ বোধ্য ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। এই সকল কাব্য পাঠার্থীর পক্ষে মূল কাব্যের সহিত মল্লিনাথ-টীকাও অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে ইহা টীকাকারের কম গৌরবের কথা নহে।

এই মহাকাব্যগুলির টীকা ব্যতীত মল্লিনাথ বিদ্যাধর বিরচিত 'একাবলী' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম তরল। একাবলী নামক অলঙ্কার-গ্রন্থখানির বহুল প্রচার ছিল না। ইহা প্রায় লুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। মল্লিনাথ তাই ইহার টীকা রচনা করিয়া ইহাকে সহজ বোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল এইরূপে ইহা বহুজন কর্ত্তৃক আলোচিত হইবে। কিন্তু কাব্য প্রকাশ, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতির ন্যায় একাবলীর সমাদর হয় নাই। (৯)

(৫) "মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়ং মন্দাত্মানুজিঘৃক্ষয়া।
ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্॥
কালিদাসগিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতী।
চতুর্ম্মুখোঽথবা সাক্ষাদ্বিদু- র্নান্যে তু মাদৃশাঃ॥
তথাপি দক্ষিণাবর্ত্তনাথাদ্যৈঃ ক্ষুণ্ণবর্ত্মসু।
বয়ং চ কালিদাসোক্তিষ্ববকাশং লভেমহি॥
ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী টীকা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥"
[রঘুবংশ—মল্লিনাথের টীকার প্রারম্ভ।

(৬) নারিকেলফল-সম্মিতং বচো
ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং
সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্॥

(৭) নানানিবন্ধ বিষমৈকপদৈর্নিতান্তং
সাধকচক্ষুরমণ খিন্নধিয়ামশঙ্কম্।
কর্ত্তুং প্রবেশমিহ ভারবিকাব্যবন্ধে
ঘণ্টাপথং কমপি নূতনমাতনিষ্যে॥
[কিরাতার্জ্জনীয় টীকার প্রারম্ভ।

(৮) যে শব্দার্থপরীক্ষণপ্রণয়িনো যে বা গুণালক্ষ্ক্রিয়া শিক্ষাকৌতুকিনীবিহর্ত্ত মনসো যে চ ধ্বনেরধ্বগাঃ।
কুভ্যাবারহরঙ্গিতে রস-সুধা-পূরে নিমজ্জন্তি যে তেষামেব কৃতে করোমি বিবৃতিং মাঘস্য সর্ব্বঙ্কষাম্॥
....
ধন্যো মাঘকবির্বয়ন্তু কৃতিনস্তৎসূক্তি সংসেবনাৎ।
[শিশুপালবধটীকার প্রারম্ভ।

(৯) মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়মেকাবল্যামলংকৃতৌ।
টীকারত্নং নিবধ্নাতি তরলং নাম নামতঃ॥
একাবলী গুণবতীয়মলক্ষ্ক্রিয়াপি
যদ্বৈশসাদজনি কোশগৃহেষু গুপ্তা।
তেনোদ্বলেন তরলেন সমেত্য ধন্যৈঃ
কণ্ঠেষু চাদ্য হৃদয়েষু চ ধার্য্যতাং সা॥
[একাবলীটীকার প্রারম্ভ।

এতদ্ব্যতীত তার্কিকরক্ষা নামক গ্রন্থের একখানি টীকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন ইহার নাম নিষ্কণ্টিকা।

এই কয়খানি গ্রন্থই অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মল্লিনাথ আরও তিনখানি টীকা ও একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মল্লিনাথ নিজেই এই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিয়া এগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এই নামে যে তাঁহার কতিপয় গ্রন্থ ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ গুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত বিশদ পরিচয় কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নামমাত্রাবশিষ্ট টীকাগুলির নিম্নলিখিত উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

মল্লিনাথ একাবলীটীকা তরলে লিখিয়াছেন "আমি তন্ত্রবার্ত্তিকটীকায় এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।" (১০)

মল্লিনাথের পুত্র কুমার স্বামীও নিজ রচিত রত্নাপণ নামক "প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ" গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন "পিতৃদেব একাবলী টীকা তরলে ও তন্ত্রবার্ত্তিক টীকা সিদ্ধাঞ্জনে লিখিয়াছেন।" (১১)

এই দুই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সিদ্ধাঞ্জন নামে তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থের একখানি টীকা মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন।

এইরূপ স্বরমঞ্জরী পরিমল নামক একখানি গ্রন্থের টীকা মল্লিনাথ কর্ত্তৃক রচিত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একাবলী-টীকা তরলে মল্লিনাথ ইহারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "আমি স্বরমঞ্জরীপরিমলটীকায় ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। (১২)

নিষ্কণ্টিকা নামক মল্লিনাথ তার্কিক রক্ষা গ্রন্থের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে "দিক্‌কাল সাধনের বিস্তৃত বর্ণনা মৎপ্রণীত প্রশস্তপাদ ভাষ্য টীকায় দ্রষ্টব্য।" (১৩) ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে প্রশস্তপাদভাষ্যের একখানি টীকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রশস্তপাদভাষ্য বৈশেষিকদর্শনের ব্যাখ্যা। মল্লিনাথ এই ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এতক্ষণ আমরা মল্লিনাথ রচিত টীকা গুলিরই তালিকা দিতেছি। তাঁহার মৌলিক কোনও রচনার পরিচয় দিই নাই। কিন্তু তাঁহার মৌলিক কবি প্রতিভাও অসাধারণ ছিল। তিনি টীকাগুলির মধ্যে মধ্যে মঙ্গলাচরণার্থ যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার কবিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রধান মৌলিক রচনা রঘুবীর-চরিত নামক কাব্য। এ গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। একাবলীটীকায় একস্থলে মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন "যথা চন্দ্রোদয় বর্ণনাকৃৎ

(১০) "তদেতৎ সম্যগ্ বিবেচিতমস্মাভিস্তন্ত্রবার্ত্তিকটীকায়াং বাজপেয়াধিকরণে।" [একাবলীটীকা]

(১১) "তদুক্তং তাতপাদৈরেকাবলীতরলে তন্ত্র বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানে সিদ্ধাঞ্জনে চ—
স্বার্থত্যাগে সমানেঽ পি সহ তেনাস্য লক্ষণা।
যত্রেয়মভজৎস্বার্থা জহৎস্বার্থা তু তংবিনা॥
[রত্নাপণ। প্রতাপরুদ্র যশোভূষণটীকা।]

(১২) "তদেতৎ সম্যক্ বিবেচিতমস্মাভিঃ স্বরমঞ্জরী পরিমলটীকায়াম্।" [একাবলীটীকা।

(১৩) "দিক্‌কালসাধন প্রপঞ্চস্তু অস্মৎ প্রণীত প্রশস্ত পাদভাষ্যটীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ।" [নিষ্কণ্টিকা।

মৎপ্রণীত শ্লোক।" (১৪) এই শ্লোকটি মল্লিনাথের অধুনা দুষ্প্রাপ্য "রঘুবীর-চরিত" নামক কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী সম্প্রতি মহাকবি ভাসের বিলুপ্ত প্রায় নাটকগুলি আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিদিত হইয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি মল্লিনাথরচিত "রঘুবীর চরিতের" কয়েক পৃষ্ঠা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এ চেষ্টা যদি সফল হয় তাহা হইলে মল্লিনাথের কবিপ্রতিভার উপযুক্ত আলোচনার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন আমাদের মল্লিনাথকৃত টীকার মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি হইতেই তাঁহার কবিত্বের ধারণা করিতে হইবে। বহুবিধ অলঙ্কারযুক্ত শ্রুতি-মধুর শ্লোকে মল্লিনাথ মঙ্গলাচরণ করিতেন। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের টীকায় অনুপ্রাস যুক্ত যে শ্লোকটিতে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তাহা অতি শ্রুতিমধুর।

আশাসু রাশীভবদঙ্গবল্লী—
ভাসৈব দাসীকৃতদুগ্ধসিন্ধুম্।
মন্দস্মিতৈর্নিন্দিত-শারদেন্দুং
বন্দেঽ রবিন্দাসনসুন্দরি ত্বাম্॥

রঘুবংশের পঞ্চম সর্গের মঙ্গলাচরণও ঠিক্ এইরূপ শ্রুতিমধুর—

ইন্দীবরদলশ্যামমিন্দিরানন্দকন্দলম্।
বন্দারুজনমন্দারং বন্দেঽ হং যদুনন্দনম্॥

শিশুপালবধের টীকাপ্রারম্ভে মল্লিনাথ এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিরোধাভাস অলঙ্কারের অনুপম উদাহরণ মল্লিনাথের নিম্নলিখিত শ্লোক—

উপাধিগম্যোঽ প্যনুপাধিগম্যঃ
সমাবলোক্যোঽ প্যসমাবলোক্যঃ।
ভবোঽপি যোঽ ভূদ্ভবঃ শিবোঽয়ং
জগত্যপায়াদপি নঃ স পায়াৎ॥
রঘুবংশ, ৩য় সর্গ টীকার মঙ্গলাচরণ

এইরূপ যমকের উদাহরণ ৪র্থ সর্গে—

শারদা শারদাম্ভোজবদনা বদনাম্বুজে
সর্ব্বদা সর্ব্বদাস্মাকং সন্নিধিং সন্নিধিং ক্রিয়াৎ॥

শিশুপালবধ টীকার মঙ্গলাচরণেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুপ্রাসবহুল আরও দুইটি শ্লোক এই—

বন্দামহে মহোদ্দণ্ডদোর্দ্দণ্ডৌ রঘুনন্দনৌ।
তেজোনির্জ্জিতমার্ত্তণ্ডমণ্ডলৌ লোকনন্দনৌ॥
[রঘুবংশ ১২শ সর্গটীকার মঙ্গলাচরণ

বৃন্দারকা যস্য ভবন্তি ভৃঙ্গা
মন্দাকিনী যন্মকরন্দবিন্দুঃ।
তবারবিন্দাক্ষ পদারবিন্দং
বন্দে চতুর্ব্বর্গচতুষ্পদং তৎ॥
[রঘুবংশ ১৬শ সর্গটীকার মঙ্গলাচরণ।

আমরা মল্লিনাথের একাবলীটীকা তরলের মঙ্গলাচরণের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব ঃ—

অধ্যারূঢ়ঃ কপর্দ্দং পিতুরমরধুনীং হেলয়া গাহমানঃ
কর্ষন্ হর্ষাতিরেকাৎ কনক-কমলিনীষণ্ডমুদ্দণ্ডবৃত্ত্যা
অন্তর্মগ্নং করাগ্রং ফণিপতিশিরসি স্বৈরমাধায় তোয়ং
মুঞ্চন্ সিঞ্চন্নধস্তাৎ প্রমথপতি শিশুর্ভাতি বালো গণেশঃ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

(১৪) যথাস্মদীয় শ্লোকে চন্দ্রোদয়বর্ণনে—
নিশাকরকরস্পর্শান্নিশয়া নির্ব্বৃতাত্মনা।
অমী স্তম্ভাদয়ো ভাবা ব্যজ্যন্তে রজ্যমানয়া॥
[একাবলীটীক

লাইকা

৭

দ্বিতীয় অংশ

রাজভবন হইতে বাহির হইয়া লাইকা গঙ্গার জলে সাঁতার দিল।—গঙ্গায় খর স্রোত, সাঁতার দেওয়া যায় না,—সে অবশ ভাবে ভাসিয়া চলিল।—আর বুঝি সেদিন তাহার বলিষ্ঠ বাহুও কেমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। কর্ম্মে এখন বিন্দু মাত্রও প্রবৃত্তি নাই,—সমস্ত অন্তর যেন অন্তরে লুকাইতে চাহিতেছিল।—সে কি করিল? যাহা করিল তাহা ভাল না মন্দ?—যাহা ত্যাগ করিল তাহা কি সুখ নয়? লাইকার চির প্রবাসী হৃদয় ঘৃণায় মুখ ফিরাইল!—গৃহবাস সুখ?—ছিঃ! কিন্তু তখনই সেই বিস্তৃতহৃদয় আকাশের এক প্রান্ত ভেদ করিয়া একটি মৃদু রক্ত রেখা—একটি ম্লান পুষ্পগন্ধ নব বিবাহের বিচিত্র স্মৃতি তাহার সম্মুখে এক অভিনব দৃশ্যের আভাষ দিয়া গেল!—সে কি?—অর্কজ্যোতিঃসিন্দূরশোভিতা ও কার মূর্ত্তি? সমস্ত জগৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন ঐ ঊষা প্রকাশের সহিত আপনার বিপুল শোভায় বিকসিত করিয়া দিবে!—এ কি সত্য?—বিরোধী অন্তর উগ্রস্বরে ডাকিয়া বলিল—না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধন!

লাইকা সেই জলমধ্যে চক্ষু মুদিল!—কেন এ চিন্তাজালে সে আপনাকে জড়াইল,—সেত বেশ ছিল—এই পাঁচ বৎসর কাল সে,—সে অনুপম সুখ কোথাও পায় নাই—আর কখনও পাইবে কি?—না না এই জাল ক্রমেই শক্ত হইতেছে—ক্রমে ইহা লৌহশৃঙ্খলে পরিণত হইবে!—না তাহা কেন হইবে! লাইকা কিছুতেই রাজপুরীর ইষ্টক বেষ্টনে বাধা পড়িবে না—ভয় কি?—ভাবিয়া সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

চাইয়া সে দেখিল,—চারিদিক যেন মৃদু বাতান্দোলনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।—আকাশে অগণ্য তারকা—জলে তাহার ছায়া জাগিতেছে। জলপ্রান্তে বিস্তৃত বাঁশবনে মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি, তটপ্রহত ঊর্ম্মীভঙ্গের সুমধুর কল্লোলে মিশিয়া এক বিভিন্ন শঙ্করাভরণ রাগিনীতে বাজিতেছে!—ইহার মধ্যে কোথায় এক বিরহ ব্যথাতুরা চক্রবাকবধূ ভগ্নস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুট চীৎকার করিতেছে।—সহসা লাইকার স্মরণ হইল - সেই স্বল্পভাষিণী মৃদু-হাসিনী বালিকা কে?—তাহার দেহ তখন অবশ হইয়া গেল—হাত পা নিশ্চল হইল, লাইকা ডুবিয়া গেল।

অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণা—দূর হইতে জল উথলিয়া পড়িতেছে। লাইকার অবশ ভাসমান দেহ সেই টান অনুভব করিল,—তাহার অর্দ্ধনিমজ্জিত শরীর সবেগে সেই দিকে আকৃষ্ট হইল!—তখন লাইকার জ্ঞান হইল। সে সবলে বাহু সঞ্চালন করিয়া প্রবল জলস্রোত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—স্রোত বড় ভয়ানক, বিশেষ সে ঘূর্ণার মুখে একগাছি

তৃণ পড়িলেও যেন শতখণ্ড হয়—জলের ভিতরের গম্ভীর কল্লোল লাইকার কানে বাজিতে লাগিল,—দেহ যেন ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হইতেছিল! সে তখন মরণ বলে ঘুরিয়া আপনাকে ফিরাইল,—শ্বাস রোধ করিয়া ডুবিয়া মাথা দিয়া জল ঠেলিয়া ঘূর্ণীর বাহিরে আসিল।—তখন হাতে পায়ে জল ঠেলিয়া সে তীরাভিমুখে চলিল।—তীরেও খর স্রোত তরঙ্গ বেগে ছুটিতেছে,—জলে সাঁতার দেওয়া লাইকার নূতন হয়—কিন্তু নিকটের সেই জলাবর্ত্তের ভয়ে সে এখানেও স্থির ভাবে ভাসিতে পারিল না—বলে জল কাটাইয়া মুহূর্ত্তে তীরে উঠিল,—কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিল না—তাহার অবশ দেহ সেই ভগ্নপ্রবণ তটে লুটাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ সে সেই ভাবেই রহিল, বনমধ্যে মহাশব্দে শৃগালের দল ডাকিয়া গেল, রাত্রি প্রহরার্দ্ধাতীত।—ধীরে ধীরে তাহার দেহে বল আসিতেছিল—এই সময় সে দেখিতে পাইল দূরে গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা চলিয়াছে—তাহাতে কয়েকজন আরোহী বসিয়া আছে, একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। লাইকা ভাবিল ইহাদিগকে ডাকি,—কিন্তু তখনই শুনিল তাহারা বলিতেছে—"এই আঁধার রাত্রি, লাইকা আসিয়াই আবার চলিয়া গেল কেন বলিতে পার?"

অপরে বলিল—জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় মহারাজ তাহাকে কোন মন্দ কথা বলিয়াছেন বা অপর কোন অপমান করিয়াছেন, শোন নাই কি রাজপুরে কাহারও তাহার নাম করিবার উপায় নাই?"

প্রথম বলিল,—তাহাই ত শুনিয়াছি তবে আবার এখন—

লাইকা আর শুনিতে পাইল না, নৌকা ভাটীর মুখে অনেক দূরে চলিয়া গেল। সে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল—স্বর মৃদু হইয়া গেল, আর শোনা যায় না,—নৌকা চলিয়া গিয়াছে। তাহার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

তখন হাসিয়া লাইকা বলিল, তুচ্ছ জীবনের এত মায়া?—হায়!—তাহার পর সে আবার একটি নিশ্বাস ফেলিল—ভাবিল এই তুচ্ছ লাইকার জন্য বিশাল রাজসংসারে এত বিশৃঙ্খলা?—না আর এ মুখ এ দেশে দেখাইতে আসিব না!—

কিন্তু সেই বালিকা!—আবার লাইকার অবশ দেহে রক্তস্রোত স্তিমিত হইল,—সে যেন মস্তকের ভিতর কি অস্বস্তি বোধ করিল, সেই সিক্ত বালুকার উপর তাহার মাথা লুটাইতে লাগিল,—সে জানে যে, সে সম্রাট-নন্দিনী, সংসারে তাহার জন্য একের পরিবর্ত্তে সহস্র স্নেহদৃষ্টি মিলিবে—কিন্তু?—এ কিন্তুর মানে কি?—এ কিন্তুর অর্থও লাইকা বুঝিল, ইহা আর কিছু নয়—এ কিন্তু এতদিন জন্মায় নাই—যখন রাজা তাহার কন্যাকে ভিখারীর সঙ্গিনী হইতে দিতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন,—তখনই ইহার জন্ম হইয়াছে!—লাইকা বুঝিল—আপনার হৃদয়ের প্রতি চাইয়া বুঝিল, আজি তাহা শূন্য!—একটি বালিকার কোমল নয়নালোক ব্যতীত তাহার সমস্ত প্রাণ সমস্ত জগৎ আজ নিবিড় অন্ধকার!

একি নিদারুণরূপে সর্ব্বনাশ!—রাজ-ভবনের নিবিড় বেষ্টন কল্পনা করিয়াও সে শিহরিল!—এখন উপায়?—অরণ্যবিহারী

সরল বিহঙ্গ একবার পিঞ্জর রাজ্যের কোমল শয্যা সুমিষ্ট পানীয় স্মরণে লুব্ধ এবং তৎক্ষণাৎ তাহার স্থূল লৌহশলাকা ও রুদ্ধদ্বার স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল!—

ভগবান্! এ বিপদের তুমিই একমাত্র কাণ্ডারী!—লাইকার রুদ্ধ চক্ষু ভেদ করিয়া জলধারা গড়াইল। জ্বরগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সে সেই কর্দ্দমের উপর পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সে ভাবিতেছিল, বিবাহের পূর্ব্বে কেন বাধা দিই নাই? কেন এত কথা ভাবি নাই;—সেই অন্তর্মুখী শশীকলার ন্যায় লাবণ্যময়ী বালিকাকে দেখিয়াই কি?—সে সময় একদিন কবে—কেমন সে মোহময় ছায়াময় মৃদুরক্ত সন্ধ্যালোকে মর্ম্মরধবল দেবালয়ের সোপানতলে সেই নীলবসনা বালিকাকে সে দেখিয়াছিল তাহা বিশদরূপে মনে পড়িল!—তাহার পর একদিন প্রভাতে গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে, প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মবনে কুঙ্কুমের তটাঙ্কলেখাঙ্কিত শ্বেতবসনা বালিকা শেফালী রাশির উপর বসিয়া জীবন্ত শেফালিকা রূপে ভ্রম জন্মাইতেছিল—সহসা মুখ তুলিবামাত্র পুষ্পচয়নপ্রয়াসী লাইকার নয়নে দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রচুর হাস্যাবেগ বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া দৌড়িয়া পলাইল—সখীজন হাসিয়া উঠিল,—সেই উচ্ছাসিত হাস্য কল্লোলের মধ্যে লাইকা পলাইবার পথ পাইল না!—পরে সেদিন আর সে কিছুই ভাবিবার অবকাশ পায় নাই,—সকল কার্য্যে সকল বিষয়ে সেই দ্রুতধ্বনিত নূপুরনাদে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত তালে তালে বাজিয়াছিল!—আজ সকল কথাই লাইকার মনে পড়িল,—কেন সে তখনই রাজভবন ত্যাগ করে নাই তাহার কারণ আজি সে বুঝিল!—

কিন্তু সে তবে ফিরিতে চায় না কেন? সে ঈপ্সিতা ত তাহারই পত্নী?—লাইকার শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল—সে শীতল সৈকতশয়নে সে কেমন একটি ঈষদুষ্ণ কোমল স্পর্শানুভব করিল,—সে সহসে নয়ন মেলিল।—চাহিয়া দেখিল, গঙ্গাবক্ষ যেন মৃদু আলোকজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাহার হৃদ্‌ রক্তের তালে তালেই যেন গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি ভাঙিয়া পড়িতেছে—লাইকা তখ ঊর্দ্ধে চাইয়া দেখিল চন্দ্রোদয় হইয়াছে!—পূর্ব্বপ্রান্তে যেখানে গঙ্গা বিস্তৃত কলেবরে পার্শ্ববর্ত্তিনী দুইটি ক্ষুদ্রা নদীকে সাদরে আলিঙ্গ করিয়া আছেন—সেইখানে বিপুল আলোক রাশির মধ্য দিয়া সপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র উদ হইয়াছেন!—

কি সুন্দর—কি সুন্দর!—লাইকা ম দুঃখ সুখ ভুলিয়া গেল—আপনার সৈকত শ ভুলিয়া গেল, আপনার শরীরের অবস্থ ভুলিয়া গেল!—চারিদিকে তাহার আ পাশে খণ্ড খণ্ড মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া প পড়িতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহার পদতলে কতকাংশ ভূমি ফাটিয়া গেল, জলে তাহা চরণ ডুবিয়া গেল—সে তাহা লক্ষ্য করিল না; কটির বসন শিথিল করি আপনার ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিল;—এ সেই নির্জ্জন বনপুষ্প, নীরব নদীতট ও লোকবিস্তৃত জলরাশি প্লাবিত করিয়া লাইকা অনুপম বংশীধ্বনি ঝিঁঝিটখাম্বাজ রাগিণী প্রতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনে লীলায়িত মূর্চ্ছনা এক অপূর্ব্ব সুধাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল।

৮

প্রভাতে বুল্‌বুল্ ডাকিতে লাগিল; সমস্ত রাত্রির ক্লান্তিতে অবশদেহ লাইকা তখন তীরে উঠিয়া এক বৃহৎকাণ্ড সজিনা বৃক্ষের তলায় শয়ন করিল। ক্রমে আলোক পরিস্ফুট হইতে লাগিল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল স্কন্ধে ধীবর রমণীরা বনপথে আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের আগমনে ভীত হইয়া কতকগুলি বক কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল—এবং সেই সঙ্গে লাইকারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সে উঠিয়াই চমকিত হইল,—এ কোথায় শুইয়া আছে?—গঙ্গায় তখন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে, জালুক রমণীগণের কলহংসধ্বনিতে তীর ঝঙ্কৃত। লাইকা আবার কূলে নামিয়া আসিল,—ঐ সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণা তাহার পাশ দিয়া খর স্রোতে ছুটিয়াছে,—তীরে রাত্রিকালে সে যেখানে শুইয়া পড়িয়াছিল সেখানকার মৃত্তিকা বসিয়া গিয়া সেখানে অগাধ জল উথলিয়া উঠিয়াছে! লাইকা তখন বড় হাসিই হাসিল! যদি সে ডুবিয়া মরিত—সে মন্দ কি হইত?—তাহার পর সেই জলযুদ্ধ সেই সাঁতার দেওয়া সব মনে পড়িল, তাই লাইকা আপন মনে বড় হাসিল। তাহার পরেই স্মরণ হইল সেই রাজপুরী—সেই সব গত কথা—আরও মনে পড়িল তাহার বর্ত্তমান চিন্তা—তখন তাহার প্রফুল্লকান্তি মুখ ম্লান হইয়া গেল!

রাজপুরী এবং রাজকথা—দুইটিই এক সঙ্গে তাহার স্মরণ হইল—কি মধুর কি সুন্দর সেই বালিকা! অহো ততোধিক কঠোর সেই চিত্রাংশুক বস্ত্র স্বর্ণশৃঙ্খলপরিশোভিত পিঞ্জর। লাইকা আর ভাবিতে পারিল না, ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল। শত ডুব দিয়া স্নান করিয়া আবার উঠিল, তাহার পর উপরে উঠিয়া বনপথ ধরিয়া চলিল।

পথে তাহার কষ্ট ছিল না, বনের ফল গঙ্গার জল তাহার পক্ষে অতি উপাদেয়;—সে ইচ্ছা করিয়াই গ্রামের পথে গেল না,—সে বুঝিয়াছিল যে এখন সম্প্রতি তাহার চিত্ত বিভ্রান্ত আছে—কিছু দিন নির্জ্জনে থাকিলেই বোধ হয় সে আরাম পাইবে!

আরামও পাইল! কিন্তু হায় সে যে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছে তাহা দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল! শ্যামল বনখণ্ডে নির্জ্জন তরুচ্ছায়ায় বসিয়া প্রিয়চিন্তায় সুখ আছে কিন্তু বিরাম নাই তৃপ্তি নাই—সে চিন্তা নদীজলের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিতা—সে চিন্তা যেন ভাবুকের সম্মুখ হইতে সমস্ত জগৎ সমস্ত অন্যান্য চিন্তাকে ভাসাইয়া লইতে চায়! সে ভাবনা যেন মুহূর্ত্ত তাহাকে বিশ্রাম দিতে চায় না—তিলমাত্র তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায় না—স্বপ্নে সে সংজ্ঞারূপিনী, জাগরিত অবস্থায় সে মোহময়ী! কি সুন্দর কি অনুপম চিন্তা! কিন্তু হায়!

তবু হায়! লাইকার এতদিনের গঠিত চিত্তবৃত্তি ধিক্কার দিয়া বলিল—হায় হায়!—তাহার চিরজীবনের শিক্ষা ঘৃণাভরে বলিল—হায় হায়! লাইকাও কাঁদিয়া বলিল—হায় এ কি হইল!

এই দিক্‌বিদিক্‌ব্যাপী ধিক্কারের মধ্যে অন্তর মেলিয়া সে বুঝিল—সেই চিন্তাসহচরী নির্জ্জনতাও তাহার কালস্বরূপ! এই

কয় দিন একা থাকিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে আরও আপনার মনোবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। এ নির্জ্জনতা এবংএ চিন্তা উভয়েই তাহার ত্যজ্য !—

পরিত্যজ্য কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি ? এ চিন্তা ব্যতীত সংসার তাহার তাহার পক্ষে অসহ—এই চিন্তা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে যেন একটা রুদ্ধ বায়ু-হীনতা আসিয়া সবলে তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছে ! জলের মৎস্যকে স্থলে আনিলে সে বোধ হয় এমনি কষ্ট বোধ করে ! —কি ভয়ানক কি দুর্ব্বিসহ এই অবস্থা !—

তখন ভাবিয়া ভাবিয়া লাইকা স্থির করিল চিন্তা অত্যজ্য কিন্তু এ নির্জ্জন বনে থাকিয়া কেন সে চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেছে ? তাহার পক্ষে এখন কর্ম্মই বাঞ্ছনীয় লোকালয়ই বাসযোগ্য। কর্ম্ম ও জনতার অন্বেষণে তখন সে নগরাভিমুখে চলিল।—

দেশের কোন স্থানই লাইকার অপরিচিত ছিল না,—সেই পথে আসিতে নিকটে একটি চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার ছাত্রগণ অধিকাংশই লাইকার বান্ধব,—প্রথমত সে সেই খানেই গেল। প্রথম দুই দিন বেশ ছিল কিন্তু তৃতীয় দিবসে বিপদ ঘটিল, বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রের দারুণ বিসূচিকা রোগ দেখা দিল। ছাত্রগণ আতঙ্কগ্রস্তভাবে প্রাণপণে সকলে তাহার সেবা চিকিৎসা করিল,লাইকাও তাহাতে যোগ দিল,—কিন্তু বালক বাঁচিল না।—সে মরিল কিন্তু আবার আর এক জনের সেই রোগ হইল,—সে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই আর একজনের হইল,—সন্ধ্যা-বেলায় দুই জনেরই মৃত্যু হইল এবং একজন শিক্ষক রোগগ্রস্ত হইলেন !

তখন সকলেই বিপদ গণিল—কিন্তু উপায় কি ? বৃদ্ধ অধ্যাপক শিশু ও বালক ছাত্রদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বয়স্কদিগকেও যাইতে আদেশ করিলেন—তাহারা সে কথা হাসিয়া উড়াইল, তাহাদের শিক্ষক মৃত্যুশয্যায় আর তাহারা ভয়ে পলাইবে ?

শিক্ষকেরও মৃত্যু হইল। তখন দেখিতে দেখিতে রোগ দাবানলের ন্যায় গ্রামে প্রবেশ করিল। এবং নির্ব্বোধ পল্লীবাসীর অচেষ্টায় তাহা ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রাম ধ্বংস করিতে লাগিল।

তখন লাইকা প্রথমে চতুষ্পাঠী পরে গ্রামে গিয়া সকলের সেবায় রত হইল। সদা মৃত্যুবিভীষিকাযুক্ত রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের সেবায় নিমগ্ন হইয়া লাইকা ভাবিল যে এইবার বুঝি বিষম রাজপুরী ও ততোধিক বিষম রাজকন্যার চিন্তা হইতে কিছু মুক্ত হইলাম।—কিন্তু সে চিন্তাজাল হইতে নিস্তার পাইল কিনা বুঝিতে না বুঝিতে সেই কঠিন রোগ আসিয়া তাহাকে ধরিল।

(৯)

তখন ঘরে ঘরে রোগ কে কার সেবা করে—কিন্তু তবুও লাইকার সেবার অভাব হইল না। তাহার প্রিয়বন্ধু মোহনলাল তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া গিয়া রাখিল। তাহার পত্নী লাইকার যথেষ্ট সেবা করিলেন। গ্রামের লোকও সর্ব্বদা তাহার সন্ধান লইত, তাহাদের সেবা করিতে গিয়াই না তাহার এই

কষ্ট ! তাহার আরোগ্য লাভের জন্য সকলেই প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

সেই প্রাণান্তিক কষ্টের সময় লাইকা ভাবিত—মরিলে ক্ষতি কি ? সকল চিন্তার সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাই !—কিন্তু তখনই মনে হইত—মরিব তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই বটে,—কিন্তু একথা ত গোপন থাকিবে না প্রকাশ হইবেই,—তখন সেই পুষ্প সুকোমল বালিকার কি হইবে ? ওহো !—সে কথা যে লাইকা ভাবিতেও পারে না ! সেও একান্ত চিত্তে আপনার আরোগ্য চাহিল।

সকলেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় লাইকা বাঁচিল। তখন মোহনলাল ও তাহার পত্নী, লাইকাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে গিয়া কিছুদিন বাস করিতে চলিলেন। সেখানে সে ক্রমেই সুস্থ হইতে ছিল এই সময় আবার সে জ্বরগ্রস্ত হইল ; প্রায় একমাস আবার শয্যাগত থাকিল। রোগশয্যায় শুইয়া কষ্টে একদিন লাইকার মনে হইয়াছিল মহারাজকে সংবাদ দিলে হয় না ?—কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক বিষম আত্মগ্লানিতে তাহার সমস্ত প্রাণ ধিক্কৃত হইয়া গেল,—ছিঃ কষ্টে পড়িয়া দারিদ্র্যের সময় - অভাবের সময়,—ধনী বন্ধু বা আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ ! ইহার তুল্য নীচতা আর কি সম্ভব ! হায় কষ্ট—তুমি মানুষের অন্তরকে এমনও হীন করিয়া তুলিতে পার ? লাইকা একথা ভাবিল কি করিয়া ? ভাবিতে ভাবিতে লাইকার হৃদয় আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়া উঠিল, সে ঐ চিন্তাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিল।—

ধীরে ধীরে সে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, সে দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারে না, লাইকা এখনও শয্যায়, কবিরাজ বলিল, স্থান পরিবর্ত্তন ভিন্ন ইহার স্বাস্থ্যলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়—শরীরে রক্ত মাত্র নাই সমস্ত পেশীই দুর্ব্বল—ইত্যাদি। লাইকা হাসিয়া বলিল, পায়ে বল না হইলে কি করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন হয় মহাশয় ?

কবিরাজ বলিলেন, "এখন কিছুদিন নৌকাবাস আপনার পক্ষে উপকারী !"

উচ্চ হাসিয়া লাইকা বলিল, "ক্ষমা করুন কবিরাজ মহাশয় ! এখন আমার বাহুতে দাঁড় টানিবার বল নাই—আর এ জন্মে যে হইবে এ ভরসাও হয় না !" বলিতে বলিতে তাহার হাসি থামিয়া গেল, মোহন লালও সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

এইভাবে কয়দিন গেল,—সেদিন বৈকালে মোহনলাল আসিয়া লাইকার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন, তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া লাইকা বলিল, "ভাল মোহন, আমাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হয় ?

মোহনলাল বলিলেন "কি বোধ হইবে লাইকা ?"

"কিছু বোধ হয় না ? একটি প্রস্তরস্তূপ বা বল্মীকপিণ্ড—অথবা—"

মোহনলাল বলিলেন,—বাধা দিয়া একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আঃ চুপ লাইকা ! তোমার এ কথাগুলি আমার ভাল লাগে না —সত্য ! তবে একটা কথা শোন এবং ইহাতে তোমার কি অভিপ্রায় তাহাও বল,—"

লাইকা বলিল—"কি?" মোহনলাল বলিলেন,—"নানকু আর বিন্দা—ছোক্‌রা দুটিকে মনে আছে ত? যাহাদের অসুখে সেবা করিয়া তুমি—"

লাইকা একটু ব্যস্তভাবে বলিল,—"হাঁ, তা কি হইয়াছে?—তাহারা ভাল আছেত?"—

"ভাল আছে এই তোমারই মত, দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারিতেছে না!—তাই কবিরাজ তাহাদেরও নৌকায় বেড়াইতে বলিয়াছেন, পরশু দিন তাহারা সপরিবারে যাত্রা করিবে—তাই বলিতেছি লাইকা, তুমি ইহাদের সহিত যাও না। আমার মুখে তোমার কথা শুনিয়া তাহাদের পিতা বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন,—যাইবে লাইকা?"

লাইকা স্তব্ধভাবে শুনিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল, "যাইব না কেন মোহন? যতদিন রোগ থাকিবে ততদিন তোমাদের স্নেহ ভিন্ন আমার আর উপায় কি আছে ভাই। তোমাদের ভালবাসাই আমাকে প্রাণ দিয়াছে—তাহা—"

ব্যস্ত ভাবে মোহন বলিল—"ছি ছি লাইকা কি বলিতেছ? লাইকা, একবার রোগে সেবা করিলাম বলিয়া এত কথা বলিতেছ—আর তুমি যখন—"

আবার লাইকা হাসিয়া কথাটা চাপা দিল। তাহার পর যথা সময়ে লাইকা নৌকায় উঠিল। মোহনলাল সঙ্গে আসিয়াছিল যাইবার সময় প্রশ্ন করিলেন, "ফিরিবে ত তুমি?" লাইকা মৃদু হাসিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল,—"অদৃষ্ট!—" কিন্তু তখনই তাহার মুখ সহসা কালিমাময় হইল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় অবসাদকম্পিত ভাবে বলিল, "ফিরিব—ফিরিব—মোহন নিশ্চয় ফিরিব!"—

নৌকা চলিতে লাগিল। সম্মুখে বসিয়া লাইকা ভাবিতেছিল একটু চলৎশক্তি পাইলেই নামিয়া যাইব,—কিন্তু সেই শক্তি সে কতদিনে পাইবে?—তাহার মুখখানি বিষাদমলিন,—এমন সময় নানকু আসিয়া বলিল, "লাইকা জি!—আপনি ওরূপ ভাবে বসিয়া আছেন কেন?—"আমার মা বলিয়া পাঠাইলেন যে আপনি একবার আপনার বাঁশী বাজান তিনি শুনিবেন!"—

লাইকা হাসিয়া বলিল এখন বাঁশী বাজাইব নন্নুয়া? আমার এখনকার বাঁশী শুনিয়া মাজি কি সুখী হইবেন? ভাল বাজাইতেছি!

লাইকার বাঁশী বাজিতে লাগিল—প্রথমতঃ অতি মৃদু করুণ—তাহার পর ঈষদুচ্চ তীক্ষ্ণ স্বর—যেন কোন বিয়োগবিধুরার ক্রন্দন-ধ্বনি! শুনিয়া নানকুর মাতার সদ্যমৃতা কন্যার কথা স্মরণ হইল,—তিনি দ্বারান্তরালে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন,—নৌকার অপরাপর আরোহীরা প্রথমত বিস্মিত পরে স্তম্ভিত ক্ষণকালেই সকলেরই নয়ন এক হৃদয়বিদীর্ণ ব্যথাময় বাষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেল!—

১০

শরৎ শেষে চারিদিক পরিষ্কার, শীতাগমে গঙ্গার জল স্রোতহীন;—সুজনরামের নৌকা নিরাপদে চলিল। প্রথমতঃ লাইকা কিছু অসুস্থ হইয়াছিল,—কয়েকদিন জ্বরে পড়িয়াছিল—ইতিমধ্যে নৌকা উজান বহিয়া কাশী পৌছিল! সে ক্রমে ধীরে ধীরে আরোগ্য

লাভ করিতেছিল—যাত্রীদল বারাণসী ত্যাগ করিল।

প্রয়াগ।—অনেকদিন পরে লাইকা সঙ্গম জলে আরোগ্য স্নান করিল। নৌকা ভাগীরথী ছাড়াইয়া যমুনায় চলিল। কালপীতে সুজনরামের ভগ্নীপতির বাটী,—সেখানে দুইদিন বিলম্ব করিয়া তারা একেবারে মথুরায় আসিল। মথুরা ও বৃন্দাবনে সপ্তাহ অতীত,—লাইকার ইচ্ছা হইতেছিল যে এইখানেই থাকিয়া যায়,—কিন্তু এই কথা শুনিয়া সুজনরামের পত্নী দুঃখ করিতে লাগিলেন—তিনি দ্বারকা যাইবেন, তাঁহার ইচ্ছা যে লাইকাও তাহাদের সঙ্গে যায়—বিশেষ লাইকার শরীর এখনও যেমন দুর্ব্বল কিছুদিন এইরূপ বিশ্রামে না থাকিলে সে আবার পীড়িত হইতে পারে! লাইকা তাহার অশ্রুপূর্ণ অভিপ্রায় বিফল করিতে পারিল না।

নৌকা ক্রমে রাজধানী দিল্লী পৌছিল। ঔজ্জ্বল্য, উৎসবসমাকুল নগর পথে কয়দিন সকলে নানা আনন্দ উপভোগ করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন,—নৌকা যমুনা ছাড়িয়া ভাটিতে সারি নদীর মুখে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্রকায়া নদী, ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল।—

অবশেষে আর জলযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠিল, রাজপুতানা মরুপ্রদেশ অনেক স্থলেই নদী অন্তঃসলিলা কোথাও বা শুষ্ক—এ অবস্থায় আর নৌকা চলে না।

সুজনরাম পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিন্তু দ্বারকাযাত্রার মত পরিবর্ত্তন করিলেন না,—এসব দেশে কি সহজে আসা হয়? যদি আসিয়াছেন শেষ না দেখিয়া কিছুতেই ফেরা হইবে না। তখন গোগাড়ী এবং দোলার ব্যবস্থা হইল। লাইকা ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু নানকুর মাতা তাহাতেও বাধা দিলেন,—এই অপরিচিত প্রদেশে সঙ্কটপূর্ণ স্থলে আসিয়া লাইকা তাঁহাদের কি পরিত্যাগ করিবেন?—

এ কথার উপর আর কথা নাই,—লাইকা মাথা হেঁট করিয়া সম্মত হইল। তখন সে পদব্রজে চলিল,—বিন্ধ্যগিরির পাশ দিয়া পথ, পথে নাকি দস্যুভয়ও আছে—অনেকগুলি ওস্‌ওয়ালি দর্শকের সহিত তাহারা চলিলেন।

মাচেরীর পথ ধরিয়া তাঁহারা অম্বর নগরে আসিলেন। বিশাল পার্ব্বত্য দুর্গ। সেই উন্নত দুর্গে ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর এখনও রাজত্ব করিতেছেন!—দুর্গশিরে স্বর্ণ সূর্য্যাঙ্কিত পঞ্চরঙ্গ পতাকা উড়িতেছে।

অন্ধকার গিরিগুহা ভেদ করিয়া তাঁহারা অজয় মেরুর পথে চলিলেন। তাহার পর বনাসের তীরবাহী যে বক্রপথ—গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে—তাহাই ধরিয়া—তাঁহারা আজমীরে আসিলেন। পার্ব্বত্য পথের কষ্টে সকলেই শ্রান্তি বোধ করিতেছিলেন, সুজনরামের স্ত্রী বলিলেন যদি কোন উপায়ে—নদীপথ পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা করা হউক!—

তখন লাইকা বলিল; যদি এই বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া পরপারে যাওয়া হয় তবে লুনী নদীর পথে নির্ব্বিঘ্নে—কচ্ছের উপকূলে যাওয়া যাইবে।—তাহাই হইল,—অতি অপরিসর পথে কষ্টে তাঁহারা জোহানির পথ ধরিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন রাঠোর রাজধানী,—অল্পদিন পূর্ব্বেই মহাত্মা বোধরাও বোধপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন—এস্থল এখন শ্রীভ্রষ্ট, তথাপি প্রাচীন বীরকীর্ত্তি স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধরিয়া মন্দর চিরদিনই মানব হৃদয়ে ভক্তিভাব উদ্রেক করিতেছে! —লাইকা দুই দিন ধরিয়া নানকু বিন্দাকে লইয়া সকল দ্রষ্টব্যগুলি দেখাইয়া বেড়াইল। —তাহার পর কয়দিনে পালীর নিকট আসিয়া তাঁহারা লুনী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

জল পথে সুচিকন সরল যাত্রা!—যাত্রীদল কয়দিনের মধ্যেই সাচোরে উপস্থিত হইল। তাহার পর এইখানে সমুদ্র মুখের বিশাল দৃশ্য!—নদীমুখ ও সমুদ্র কুলের উচ্ছ্বসিত বিরাট শোভা দেখিয়া বালকেরা আনন্দে উন্মত্ত—এবং স্ত্রীলোকেরা কিছু চিন্তাকুল হইলেন। অতি সাবধানে নৌকা রাধনপুরার অভিমুখে চলিল।

হ্রদভাগ শেষ হইল, মালিয়ার ক্ষুদ্র প্রণালী পার হইয়া নৌকা মুন্দ্রার নিকট সমুদ্রে উপস্থিত হইল। কি বিরাট নীল দৃশ্য! সুজনরামের বালকেরা লাফাইয়া তীরে আসিল,—সাগরতীর ফেনহারে সজ্জিত খেলিতেছে, সদ্য রোগমুক্ত বালকেরা মহানন্দে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া স্নান করিল।

এইখানে নৌকাপথে যাত্রা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল, সকলে নবনগরের পথ ধরিয়া পদব্রজে চলিলেন। পথে কোন কষ্ট নাই কোন ভয় নাই—নিরাপদে তাঁহারা তাঁহাদের গম্যস্থলে উপস্থিত হইলেন—সম্মুখেই সাগর-গর্ভে—দ্বারকানাথের বিশাল মন্দির—সাগর তরঙ্গে প্রতিহত হইতেছে!

তখন যাত্রীদলে মহানন্দকল্লোল উঠিল! —আহ্লাদে কেহ হাসিল কেহ কাঁদিল—দর্শনকামী ভক্তদলের হৃদয়োচ্ছাসে সাগর তীর উদ্বেল হইয়া উঠিল!

এই সময় লাইকা আসিয়া সুজনরামের পত্নীকে বলিল, "মা, এইবার ত তোমরা পথ চিনিলে—এখন সন্তান বিদায় হইতে পারে কি?"

তিনি আর বাধা দিতে পারিলেন না, —তখন সকলকে কাঁদাইয়া ও কাঁদিয়া লাইকা চলিয়া গেল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মানভূমবাসীর দিকবিদিক্ জ্ঞান

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও এপ্রকার অসংখ্য লোক আছে, যাহারা দিক্, দূরত্ব ও সময় সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিচয় দিতে পারে না। বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষায় বাঙ্গালিগণ অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জন লোক নিরক্ষর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে পরিমাণ লোক লিখিতে পড়িতে জানে তাহার হিসাব এই প্রকার:—

বঙ্গদেশে প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৭৭জন
মান্দ্রাজ বিভাগে „ „ „ ৭৫ জন
বোম্বাই „ „ „ ৬৯ জন
বিহার ও উড়িষ্যা „ „ „ ৩৮ জন

ছোটনাগপুর ডিভিসনের মধ্যে মানভূম জেলায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি হাজারে মাত্র ৪৩ জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে! কিন্তু ছোটনাগপুরের অন্যান্য বিভাগের লিখিতে পড়িতে জানা লোকের সংখ্যা আরও কম, হাজারকরা মোটে ২৮ জন মাত্র।

এই জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক দিক্, দূরত্ব বা সময়ের সঠিক পরিচয় দিতে পারে না। সাধারণতঃ বহুসংখ্যক লোক উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকের নাম পর্য্যন্ত জানে না! পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ বুঝাইতে হইলে, তাহারা যথাক্রমে "বেলা উঠা" ও "বেলা ডুবা" দিক্ বলে। "বেলা উঠা" শব্দে সূর্য্যোদয়ের দিক্ এবং "বেলা ডুবা" শব্দে সূর্য্যাস্তের দিক্ বুঝায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিক বুঝাইতে হইলে লোকে ঐ ঐ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। তদ্ব্যতীত উত্তর দক্ষিণদিক বুঝাইবার উপযুক্ত কোন ভাষার সহিত তাহারা পরিচিত নহে।

মানভূমে দিক্ বুঝাইবার জন্য অপর একটি উপায় বর্ত্তমান আছে। এখানকার ভূমি নিতান্ত অসমতল। যে কোন একটি স্থান তাহার নিকটবর্ত্তী অপর স্থান অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সেই হিসাবে লোকে "অমুক স্থানের উপরে বা নিম্নে" বলিয়া দিক নির্দ্দেশ করে। গ্রামের যেভাগ নিম্ন, "নামো পাড়া" উচ্চভাগ "উপর পাড়া" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া সহরের উত্তর পূর্ব্বাংশ সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নিম্ন এই হিসাবে, এই পল্লী, "নামো পুরুলিয়া" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। রাস্তার যে অংশ উন্নত স্থানে থাকে, তাহার নাম "উপর কুলি" (কুলি=গ্রাম্য-রাস্তা) ও অপরাংশের নাম "নামো কুলি"। "উপর কুলি"র ধারে যাহাদের বাস, তাহারা "উপর কুলির লোক," ও "নামোকুলির ধারে যাহাদের বাস, তাহারা "নামোকুলির লোক" বলিয়া পরিচিত। এই প্রকারে দিক্ নির্ণীত হইলে, তদ্দ্বারা উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিকের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যে প্রকার বিঘা কাঠার হিসাবে জমীর পরিমাণ অবধারিত হয়, মানভূমের কৃষকগণ সে প্রকার বিঘা কাঠার হিসাব জানে না। এখানে জমীতে বৎসরে যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়, অথবা জমীর বপন জন্য বৎসরে যে পরিমাণ বীজধান্যের প্রয়োজন হয়, সেই হিসাবে জমীর পরিমাণ কথিত হইয়া থাকে। এখানে সাধারণতঃ "পাঁচ পুড়া (১ পুড়া=১০ মণ) বা তিন পুড়া ধান্যের" জমী বলিয়া জমীর পরিমাণ প্রকাশিত হয়! দেশীয় ভাষায় "দু'শ ধান্যের" জমী বলিলে, যে জমীতে বৎসরে দুইশত মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে, সেই পরিমাণ জমী বুঝায়। তদ্ব্যতীত এখানে "একমণ বা পাঁচমণ ধান্য

পড়নের” জমী বলিয়াও জমীর পরিমাণ করিবার রীতি আছে। “একমণ ধান্য পড়নের” জমী বলিলে, সেই জমীতে বপন জন্য একমণ বীজধান্যের প্রয়োজন হয়, ইহাই বুঝায়। এক সময়ে একমণ ধান্য পড়নের জমীর প্রকৃত পরিমাণ ৮ বিঘা বলিয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণ স্থির করিয়াছিলেন। এদেশে জমীর পরিমাণ বুঝাইবার জন্য আর এক প্রকার হিসাব আছে। তাহাকে লোকে রেখকুলির হিসাব বলে। এই রেখকুলির হিসাব মানভূম জেলা ও বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। রেখকুলির হিসাব বুঝিবার জন্য, এই স্থানের একটি আদিম প্রথা বুঝিবার প্রয়োজন। এই সকল জঙ্গলময় স্থানে পূর্ব্বে এক একটি পরিবার একস্থানে বাস করিয়া আপনাদের পরিশ্রমে জঙ্গল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিত। বহুপুরুষ ধরিয়া সেই আদিম-পরিবারের বংশাবলী এইপ্রকারে গ্রামের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া শেষে তাহা আপনাদের ভিতর বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এইপ্রকার বিভাগ কালে গ্রামের যাবতীয় পুরাতন আবাদী জমী আট, দশ, বার, চৌদ্দ কি ষোল অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রকার এক একটি অংশের নাম এক একটি রেখ! ভাগের সুবিধার জন্য অধিকাংশ স্থলে এই রকম জমী ষোল অংশে বিভক্ত হইয়াছে। জেলার স্থানে স্থানে অদ্যাপি আট বা দশ রেখের গ্রামও দেখিতে পাওয়া যায়। এক রেখের এক চতুর্থাংশের নাম কুলি। এক রেখ বা এক কুলিতে যে কত পরিমাণ জমী হইবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোনও গ্রামের রেখে হয় ত বিশ বিঘা জমী থাকিতে পারে। আবার তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের রেখে দশ বিঘারও কম জমী থাকা অসম্ভব নহে। গ্রামের কৃষকেরা কিন্তু এই রেখ বা কুলি ব্যতীত জমীর পরিমাণসূচক অপর বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারে না। এই রেখ ও কুলি গ্রামের পুরাতন আবাদী জমীর নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ মাত্র।

কেবল আবাদী জমি সম্বন্ধেই এই প্রকার রেখ কুলি নির্দ্দিষ্ট উৎপন্ন ও পড়নের হিসাবে জমীর পরিমাণ স্থির করা হইয়া থাকে। এদেশের সর্ব্বত্র যে সকল অনুর্ব্বর পতিত ডাঙ্গা ও জঙ্গল আছে, তাহার পরিমাণ প্রকাশ করিবার ভাষা সাধারণ লোকের পরিজ্ঞাত নাই।

দূরত্ব বুঝাইবার জন্য এখানকার সাধারণ ভাষায় “কাঁড়,” “ডাক,” ও “হাঁক” শব্দ ব্যবহৃত হয়। ‘কাঁড়’ শব্দের অর্থ ‘তীর’, “এককাঁড়” দূর বলিলে, একটী কাঁড় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইলে যতদূর যায়, ততদূর বুঝায়। সেই প্রকারে ‘একডাক’ বলিলে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে যতদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, ততদূর বুঝিতে হইবে। ‘হাঁক’ বলিলে, ‘ডাক’ অপেক্ষা অধিকদূর বুঝায়। পল্লী-গ্রামের কোনও কোনও লোক ডাকাতের “হাঁক” বা চীৎকার শুনিয়া থাকিবেন। “হাঁক” শব্দে ঐ প্রকার শব্দ বুঝায়। ফলতঃ “কাঁড়”, “ডাক” বা “হাঁক” শব্দে কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব সূচিত হয় না। অনেক সময়ে “হাঁক” শব্দে এক মাইল দূরের জায়গা পর্য্যন্ত বুঝায়।

আজকাল জেলার স্থানে স্থানে পাকা রাস্তা হইয়াছে। ঐ সকল রাস্তার ধারে দূরত্বসূচক প্রস্তর (mile-stone) প্রোথিত আছে। তদ্দৃষ্টে পাকা রাস্তার নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকে মাইল পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানের লোক মাইলের পরিমাণ এখনও শিখে নাই।

দূরত্বসূচক ক্রোশের নাম অনেকে শুনিয়াছে। কিন্তু ক্রোশের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র “ডালভাঙ্গা” ক্রোশের কথা শুনা যাইত। প্রাতঃকালে কোনও বৃক্ষের ডাল বা শাখা হাতে লইয়া লোকে পথ চলিতে আরম্ভ করিত। পথ অতিক্রম করিতে করিতে যেখানে রৌদ্রে ঐ শাখার পত্র সকল শীর্ণ হইত, সেইখানে এক ক্রোশ পথ পরিসমাপ্ত হইত। ক্রোশ বলিলে এক্ষণে আর ততদূর বুঝায় না। কিন্তু তথাপি স্থানীয় লোকের হিসাবে এক ক্রোশ অনেক সময়ে দুই, তিন বা ততোধিক ক্রোশের কম হয় না।

দিক্ ও দূরত্ব বুঝিবার বা বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান এখানে যে প্রকার অল্প, সময় সম্বন্ধে ধারণাও তদ্রূপ। দিবা ভাগের সময় নির্দ্দেশের জন্য, সাধারণতঃ দুই প্রহর (বা দু' প'র), আড়াই প্রহর (বা আড়াই' প'র) কথার চলন আছে! তদ্ব্যতীত “বেশাম্ বেলা” একটী সময় বুঝাইবার বাক্য, “বেশাম্” শব্দ ‘বিশ্রাম’ শব্দের রূপান্তর। “বেশাম্ বেলা” বলিলে সাধারণতঃ প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বুঝায়। প্রাতঃকালে শ্রমসাধ্য কার্য্য আরম্ভ করিয়া যে সময়ে লোকে বিশ্রাম করে বা জলখাবার খায়, সেই সময়ের নাম “বেশাম্ বেলা।” “বেশামের” পূর্ব্ব সময়ের নাম “আধ্‌বেশাম্!” “আধ্‌বেশাম্” বলিলে সাধারণতঃ প্রাতে ৮টা বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময় বুঝায়। “বেশাম্” উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর, অর্থাৎ প্রায় ১১টার সময়কে এদেশে “খরবেশাম্ বেলা বলে।

এতদ্ব্যতীত এই স্থানে বেলা বুঝাইবার জন্য আর একটী সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। এই সঙ্কেতটী বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে পরিচিত নহে। দিবাভাগের কোনও বিশেষ সময় বুঝাইবার জন্য লোকে আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, তৎকালে যেস্থানে সূর্য্য থাকিবার কথা, সেই দিক্ দেখাইয়া বলে, “এমন বেলায়” বক্তব্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বক্তার অঙ্গুলি আকাশের যে দিকে সঞ্চালিত হইবে, দিবসের যে সময়ে ঐ স্থানে সূর্য্য থাকে, সঙ্কেতে তত বেলা বুঝিতে হইবে। দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালের বিভাগ বুঝাইবার উপযুক্ত কোনও সঙ্কেত নাই।

রাত্রিকালের শেষাংশ বুঝাইবার জন্য “কুক্‌ড়িডাক” বলিলে যে সময়ে শেষ রাত্রিতে কুক্কুট শব্দ করে সেই সময় বুঝায়। এই “কুঁক্‌ড়িডাক” ইংরাজী “Cock-crow”র বঙ্গানুবাদ নহে। এই জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে কুর্ম্মি, ভূমিজ, সাঁওতাল ও বাউরীগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪৮ জন এই চারি শ্রেণীর লোক। তাহারা যদিও সকলে বৈষ্ণব তথাপি কুক্কুট মাংস ভোজন দোষাবহ মনে করে না। প্রাতঃকালে অনেকে কুক্কুট ডাকিবার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য কার্য্যে

রত হয়! সেই জন্য "কুঁকুড়ি ডাকের" সময়ের সহিত তাহারা বিশেষভাবে পরিচিত।

এখানকার অধিকাংশ লোক নিজের বয়স বলিতে পারে না! এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নাই। সেই জন্য ৬০ বৎসর ও তদপেক্ষা অধিক বয়সের লোক অনেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার পলিত কেশ, গলিতদন্ত বহুসংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি তাহাদের বয়স 'এক কুড়ি' বা 'দেড় কুড়ি' বলিয়া শ্রোতার কৌতুক উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার অনেকে বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, "আমার ত কোষ্ঠী নাই, বয়স ত সঙ্গেই আছে দেখিয়া লও।" গল্প আছে, বঙ্গদেশের কোন স্থানে জনৈক পক্ক-শ্মশ্রু বৃদ্ধ তাহার বয়স সতের বৎসর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কৌতূহলাক্রান্ত শ্রোতা তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অত অল্প বয়সে এত বড় দাড়ী কিরূপে হইল জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরভাবে উত্তর দিয়াছিল, "এ দাড়ী বাবা তারকেশ্বরের!" বয়স সম্বন্ধে এ প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর এখানে অনেকেই দিয়া থাকে।

সম্প্রতি মেথডিষ্ঠ টাইম্‌স্ (Methodist Times) পত্রিকায় একজন ইংরাজ লেখক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক বলেন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার সময় হইতে ব্যক্তি বিশেষের জীবনের কাহিনী বিবৃতি করিবার রীতি আছে। লেখক কিছুদিন মানভূম জেলায় ছিলেন। তিনি এখানকার অনেক লোককে "গঙ্গা নারায়ণী হাঙ্গামার" সময় হইতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিতে শুনিয়াছেন।

মানভূম জেলায় বরাহভূম নামে একটি পরগণা আছে। এই পরগণার ভূস্বামী এক প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। এই বংশে বিবেক নারায়ণ নামে এক রাজা ছিলেন। বিবেকনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাধীন ছিলেন। বিবেকনারায়ণও দীর্ঘকাল ধরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বিবেকনারায়ণ পরাস্ত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন। বিবেকনারায়ণের রঘুনাথ ও লক্ষণ নামে দুই পুত্র ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ রঘুনাথ বিবেকনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত; ও কনিষ্ঠ প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত ছিলেন। ইংরাজ সরকার যুদ্ধান্তে রঘুনাথের সহিত বরাহভূম পরগণা বন্দোবস্ত করেন। কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ প্রধানা রাণীর সন্তান বলিয়া রাজ্যে দাবী করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রঘুনাথের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিয়া পরে পরাজিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজের কারাগারে লক্ষ্মণের দেহান্ত ঘটে। গঙ্গানারায়ণ লক্ষণের পুত্র।

বিবেকনারায়ণের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যে কারণে বিবাদ হইয়াছিল, রঘুনাথের দুই পুত্রের মধ্যেও যেই কারণে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মাধবসিংহ রাজ্যের জন্য প্রথমতঃ যুদ্ধ ও পরে দেওয়ানী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শেষে সর্ব্বত্র পরাজিত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ান মনোনীত

হইয়াছিলেন। মাধবসিংহ অত্যন্ত স্বার্থপর, প্রজাপীড়ক দেওয়ান ছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র গঙ্গানারায়ণের ভরণপোষণ জন্য রাজা কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মাধব সিংহ ঐ সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া গঙ্গানারায়ণকে পথের ভিখারী করিয়াছিলেন। গল্প এই প্রকার যে গঙ্গানারায়ণকে যাহাতে রাজ্যের ভিতর কেহ মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত না দেয়, তজ্জন্য মাধব সিংহ প্রজাগণের উপর কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন! শেষে উৎপীড়িত প্রজামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গানারায়ণ বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত বান্দড়ি নামক গ্রামে মাধব সিংহকে হত্যা করেন। তৎপরে গঙ্গানারায়ণ প্রজাপুঞ্জের নেতা হইয়া তাহাদের সাহায্যে বরাহভূম পরগণা ও নিকটবর্ত্তী বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। শেষে পুরুলিয়া নগরের ৮ মাইল দক্ষিণে চাকলতোড় নামক স্থানে গঙ্গানারায়ণের সহিত ইংরাজ সৈন্যের এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গঙ্গানারায়ণ পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮৩২ সালে (বাঙ্গালা ১২৩৯ সালে) গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে লোকে "গঙ্গানারায়ণীর সময় আমি এত বড় ছিলাম" কি "গঙ্গানারায়ণীর দশ বছর পরে আমার বড়ছেলে হয়" ইত্যাদি বলিয়া বহু ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিত। বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা হইতে কাল গণনা আর শুনা যায় না। তবে এদেশে এখনও "সিপাহী হাঙ্গামা বা বড় হাঙ্গামা" এবং "বড় আকাল" হইতে কালগণনার বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মানভূম অশান্তির নিলয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহীগণ পুরুলিয়ার খাজনাখানা, জেল প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিস্তর কাগজপত্র ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই জেলার সর্ব্বপ্রধান জমীদারী পঞ্চকোটে তখন রাজা নীলমণি সিংহ জমীদার ছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজা নীলমণি সিংহ বিদ্রোহীগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ মানভূমের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

ইংরাজী ১৮৬৬ সালে (বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে) এখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা অনেকের জানা আছে। মানভূম অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ এদেশে সাধারণতঃ "বড় আকাল" বা "ছিয়াত্তুরে আকাল" বলিয়া পরিচিত। ১২৭৩ সালে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তথাপি ইহাকে "ছিয়াত্তুরে আকাল" বলা হয় কেন? সন ১১৭৬ সালে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল,—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন লোকে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের কথা শুনিত। সুতরাং সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষের পুনরভিনয় দৃষ্টে তাহারা "তিয়াত্তুরে অকাল"কে "ছিয়াত্তুরে অকাল" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষও এখানকার একটী স্মরণীয় ঘটনা।

এই "বড় হাঙ্গামা" ও "বড় আকাল" হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি অনেকে বিস্তর ঘটনার কালনির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অবশ্য প্রাগুক্ত ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়াও অনেকে

সঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ "বড় আকালের সময়ে আমি এত বড় ছিলি (ছিলি=ছিলাম।)" এই বলিয়া হাত তুলিয়া তৎকালে সে মাথায় কত উচ্চ ছিল, তাহা দেখাইয়া দেয়। কেহ বলে "বড় আকালের সময়ে আমি গরু বাগালি কর্‌তি (কর্‌তি=করিতাম)। গরু বাগালি করা মানে গরু চরান। এ জেলায় 'রাখাল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বাগাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই প্রকারে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার সহিত যোগ রাখিয়া অন্যান্য ঘটনার পরিচয় দেওয়া এখানকার কৃষকদিগের রীতি।

স্মরণীয় বিশেষ ঘটনা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে "বড় আকালে"র পর, আর সেরূপ স্মরণযোগ্য ঘটনা বড় একটা ঘটে নাই। সুতরাং এখন অনেকে অন্যরূপে সময় বুঝাইবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ তাহার বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমার বড় বেটা নিম্‌জোয়ান্।" এখানে "নিমজোয়ান্" শব্দে ১৫।১৬ বৎসরের লোককে, অর্থাৎ পুরা যোয়ান্ হইতে কিছু বাকী আছে—ইহাই বুঝায়। এই প্রকার পুত্র পৌত্রের আনুমানিক বয়স হইতে লোকের বয়স স্থির করা কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রকারে দিক্, দূরত্ব ও কালনির্ণয় যে কতদূর অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। যদি কখনও এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তবেই এই প্রকার অজ্ঞতা ক্রমশঃ লোপ পাইবার আশা করা যাইতে পারে। নতুবা এই জেলার সম্বন্ধে কবিকে চিরকাল গাইতে হইবে—

"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীহরিনাথ ঘোষ।

অতিথি

১

শারদ প্রভাতে আজি গো আমার কুটীরে কে তুমি অতিথি?
জাগিয়া স্নিগ্ধ কিরণ, উষায়
ঝলকে তোমার শ্যামল ভূষায়;
জাগিছে অঙ্গে অরুণের রাগ, চোখে প্রভাতের জ্যোতিটি;
স্বাগত! প্রভাত-অতিথি!

২

ব্যথাসমুখ চেতনায় মোর উদ্ভূত একি প্রতীতি!
ভস্ম 'পরে নত চিতার ধূঁয়ায়,
মৃত্যুর গূঢ় নিভৃত গুহায়,
স্ফরিত দীপ্ত আলোক আবার, নির্ব্বাণ নাশি ঝটিতি!
এস প্রিয়তম অতিথি!

৩

সিক্ত বক্ষে ভাতে রামধনু; মধুর আলোক-সঙ্গতি!
আঁখির পাতায়, শিশির ফলকে,
পূর্ণ সপ্তবর্ণ ঝলকে!
প্রভাতে তোমার অমৃত মুক্ত আলোকে দীপ্ত প্রকৃতি!
এস সুন্দর অতিথি!

৪

কুটীর দুয়ারে লহ গো অর্ঘ্য, ওগো স্বর্গের অতিথি!
ছার জীবনের সাধনার ধন—
যৌবন পারে জরা ও মরণ,
দলিয়া চরণে লহ গো প্রাণের হীরক-মুক্তা-মোতিটি!
স্বাগত! প্রভাত-অতিথি!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মোগল-আমলে শিল্পকলা

"নবজীবনের" যুগই ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃষ্ট যুগ।

বাস্তুশিল্প।—প্রথমে প্রাচীন দিল্লির রূঢ় ধরণের কীর্ত্তিমন্দিরাদি;—বাবর ও হুমায়ুনের কীর্ত্তিকলাপ—কতকগুলি প্রস্তরময় শিবির বলিলেও হয়। একটা অলিন্দ, এই অলিন্দের উপর একটা স্থূল তলভূমি,—তাহার ধারে ধারে কতকগুলি চতুষ্ক; মধ্যস্থলে সূচাগ্র গোলাকার গম্বুজ। মুসলমান গঠনরীতি, পারসীকদিগের শিল্পকলা, তাহার সহিত মোগলদিগের রূঢ়তা;—এই রূঢ়তা মোগলদিগের নিজস্ব। যে দেশের উপর জয়লাভ করিয়াছে, এই বিজেতারা সেই দেশের লোকের কিছুই জানে না।

আকবরের আমল।—আকবরের আমলে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। তখনও বাস্তুগঠনরীতি পারসীক ও মোগল ধরণের ছিল; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহার উপর ভারতের প্রভাব প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; নবসাম্রাজ্যের কল্পনায় উহা অনুরঞ্জিত হয়; এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আপনাকে সূর্য্যসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত আগ্রার প্রাকার ও দন্তুর বুরুজবিশিষ্ট চূড়াগুলি একজন সৈনিকের কীর্ত্তি, এবং ফতেপুরের মসজিদ ও ফতেপুরের বিজয়-তোরণ বিজয়ী মুসলমানের প্রকৃত বিজয়চিহ্ন বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, ফতেপুরের প্রাসাদ, ফতেপুরের মণ্ডপগৃহাদি, ফতেপুরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ, জাহাজের গলুয়ের মত থামের মাথাল,—এই সমস্ত একজন রাজার পরিচয় দেয়—হিন্দুরাজার পরিচয় দেয়। সিকন্দ্রার সমাধিমন্দিরও ঐরূপ:—কতকগুলি অলিন্দ—যাহার উপর লোহিত প্রস্তর ও ধবল মর্ম্মর-প্রস্তর স্থাপিত; উহার বারাণ্ডা, উহার চতুষ্ক দেখিলে সমাধিমন্দির অপেক্ষা ভজনমন্দির বলিয়াই মনে হয়। শেষ অলিন্দটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা ও বালুকার দ্বারা আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে একটি অনাড়ম্বর সমাধি-প্রস্তর; সূর্য্যসম্ভব সম্রাট ইহা ভক্তের উদ্দেশে নির্ম্মাণ করাইলেও এই সমাধিমন্দিরের উপর মোগল-সম্রাটের হীরক বসাইয়াছিলেন।

আকবর ও জহাঙ্গিরের সংযত ও সুদৃঢ় গঠনরীতির পরে, শাজাহানের জমকাল অথচ সুন্দর গঠনরীতির আবির্ভাব হইল। হিন্দুর কলারুচি ও মুসলমানের কলারুচি একত্র মিশ্রিত হইল। বহুমূল্য রত্নখচিত ধবল মর্ম্মর-প্রস্তর, লোহিত প্রস্তরের স্থান অধিকার করিল। সেই সময়েই পরমাশ্চর্য্য দ্বার প্রকোষ্ঠ-সকল ও দিল্লির মোতি মসজিদ্ আবির্ভূত হইল। আগ্রার প্রাসাদে,—দর্পণ-সমাচ্ছাদিত স্নানাগার, অলিন্দ, চতুষ্ক প্রভৃতি, আকবর-নির্ম্মিত প্রাকারের মুকুটরূপে ভূষিত হইয়া যমুনা-প্রবাহের উপর দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

এই সকল চতুষ্ক হইতে,—নগরের গৃহাদি ছাড়াইয়া, উপবন-বিভক্ত মাঠময়দান ছাড়াইয়া—শাজাহানের প্রিয়তমার সমাধিমন্দির ও ভারতীয় শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা—সেই তাজমহল পরিদৃশ্যমান্। একটা সমতল ভূমি, ধবল মর্ম্মর প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত; একটা

উদ্যানের শেষপ্রান্তে নদী বহিয়া যাইতেছে, অথবা উন্নতশীর্ষ ঝাউগাছ-শোভিত দীর্ঘাকার চৌবাচ্চাসকল উপবনভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। লাল-পাথরের মসজিদের অলিন্দের পার্শ্বদেশে ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরের চতুর্দ্দিকস্থ "মিনারেটর" মাঝখানে সেই সমাধিমন্দির। অষ্টকোণাকৃতি তলভূমি :—ভগ্নধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত চারিটি দ্বার; আরও ২৪টা দুই-থাক্, ছোটছোট দ্বার-পথ; একটা অলিন্দ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজভূষিত চারিটি মণ্ডপের মধ্যে, বহুমূল্য রত্নখচিত এক বৃহৎ গম্বুজ।

ঔরংজেবের আমলের যে গঠনরীতি সে সৈনিকের গঠনরীতি, ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্তের গঠনরীতি এইরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বতন গঠনরীতির হিসাবে একটা প্রতিক্রিয়া। গঙ্গানদীর তটস্থ অগণিত হিন্দু মন্দিরের মাথা ছাড়াইয়া বারাণসীতে যে মসজিদ উঠিয়াছে, সেই মসজিদ বিজেতার বিজয়-নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পরেই তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কীর্ত্তিকলাপ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরিচয় দেয়, দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত নরপতিদিগের পরিচয় দেয়, অবনতিগ্রস্ত বিকৃত শিল্পকলার পরিচয় দেয়।

মোগল সম্রাটদিগের ন্যায় সকল মুসলমান নৃপতিই স্বকীয় স্মৃতিরক্ষার জন্য ইমারৎ নির্ম্মাণ করাইতেন :—নীল চীনে-মাটির কাজে আচ্ছাদিত গোলকন্দের সমাধি মন্দিরসমূহ; পৃথিবীর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেই বিজাপুরের গম্বুজ। গুজরাট প্রদেশস্থ আহমদাবাদে হিন্দুশিল্পকলা ও মুসলমান শিল্পকলা বেশ বেমালুমভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই, আর একটি নূতন প্রভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল—সেটি য়ুরোপীয় শিল্পকলার প্রভাব। এই প্রভাবের পরিণাম—লক্ষ্ণৌ নগরের বড় বড় প্রাসাদ, ও মসজিদাদি। মুসলমান শিল্পকলা কলুষিত হইল, অন্তর্হিত হইল। যে সকল তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমরা ষোড়শ শতাব্দী, সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি এবং ঐ প্রত্যেক যুগের রচনাকার্য্যের সহিত ঐ একই যুগের য়ুরোপীয় বাস্তুশিল্পের তুলনা করিতে পারি। য়ুরোপের ন্যায়, ভারতেও "নবজীবনের" তরুণ ও নির্ভীক শিল্পকলার আবির্ভাব হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও জ্ঞানগর্ভ ও আরও বিরাট শিল্পকলার আবির্ভাব হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতীব কৃত্রিম ও দার্শনিক ভাব-রঞ্জিত শিল্পকলার আবির্ভাব হয়।

***

চিত্রবিদ্যা।—ইসলামধর্ম্মে, মূর্ত্তিরচনা শিল্পের অনুশীলন নিষিদ্ধ; কিন্তু আকবরের আমলে এই নিষেধ কেহ বড় একটা মানিত না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন :—

"অনেকে মনে করে, পদার্থ সকল নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের একটা সাদৃশ্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা অলসভাবে সময় কাটাইবার একটা উপায় মাত্র। কিন্তু আমার মনে হয়, সুনিয়ন্ত্রিত মনের পক্ষে, এই সখ্‌টি জ্ঞানার্জ্জনের একটা দ্বার, অজ্ঞান-গরলের একটা বিষহারী মহৌষধ। যে সকল গোঁড়ারা বিধিব্যবস্থায় শুধু অক্ষর মাত্র দেখে, তাহারাই চিত্রবিদ্যাকে গর্হিত বলিয়া মনে করে; কিন্তু এক্ষণে তাহাদের চক্ষু সত্যকে দেখিতে পাইবে। একদা, সম্রাট-বাহাদুর

কতকগুলি বন্ধুকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তিনি একজনকে তাঁহার সমক্ষে ছবি আঁকিতে অনুমতি দিলেন, তাহার পর বলিলেন :—যাহারা চিত্র-বিদ্যার বিদ্বেষী, আমি তাহাদের বিদ্বেষী। চিত্র কলা কি?—না ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা প্রমাণ আত্মসমক্ষে প্রদর্শন করা। জীবন্ত লোকদিগের মূর্ত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই ঠিক করিয়া চিত্রিত কর না কেন, সেই চিত্রে কখনই প্রাণসঞ্চার করিতে পারিবে না। তবেই বলিতে হয়—ঈশ্বরই কেবল প্রাণদান করিতে পারেন।"

রং ও বার্ণিস প্রস্তুত করিবার কাজে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল আবুল-ফজল তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন :—পারস্য দেশীয় বড় চিত্রকর বিজাদের রচনার সহিত, (ষোড়শ শতাব্দীর) এবং "যাহাদের যশে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ" সেই য়ুরোপীয় চিত্রকরদিগের রচনার সহিত, ভারতীয় ওস্তাদদিগের রচনাবলী টক্কর দিতে পারে।

এই ভারতীয় ওস্তাদদিগের মধ্যে আইন-ই-আকবরীতে ৪ জনের নাম আছে :—কবি বলিয়াই যাহার বেশী খ্যাতি সেই জুদাই; উদারচিত্ত খাজা-আবদুস্‌সমদ; সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দসবন্ত—যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যা করে; বসাবন—যাহার তুলিকা সর্ব্বপ্রকার চিত্রকর্ম্মেই সুনিপুণ ছিল। কিন্তু পারস্য-চিত্রকলার দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় চিত্রকলা কেবল ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রেরই অনুশীলন করিত। এই ভারতীয় ওস্তাদেরা কতকগুলি ভাল ভাল প্রতিকৃতি এবং সুন্দর চিত্রকর্ম্মে বিভূষিত কতকগুলি কেতাব রাখিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীত।—ষোড়শ শতাব্দীর দুইজন গায়ক ভাল ভাল সুর রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের রচিত সুরগুলি এখনও খুব লোকপ্রিয় :—গোয়ালিয়রের নায়ক-বক্সু (শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে) এবং আকবরের প্রিয় গায়ক তানসেন।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন :—

"আমি সেই সঙ্গীতের আশ্চর্য্য শক্তি বর্ণনা করিতে অসমর্থ—যে সঙ্গীত বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রস্বরূপ। কখন বা গীত ও স্বরগুলি হৃদয়-অন্দরমহলের রূপসীদিগের মত হঠাৎ কণ্ঠে আসিয়া আবির্ভূত হয়; কখন বা কর-স্পৃষ্ট তন্ত্রীধ্বনি ও গম্ভীর ঐক্যধ্বনি শ্রবণবিবরে সুধা ঢালিয়া দেয়। সুরগুলি শ্রুতি-গবাক্ষ দিয়া প্রথমে প্রবেশ করে, পরে শতসহস্র উপহার লইয়া আবার স্বকীয় আবাস সেই হৃদয় মন্দিরে ফিরিয়া যায়। নিজনিজ মানসিক প্রকৃতি ও অবস্থানুসারে শ্রোতৃবর্গ দুঃখ বা আনন্দ অনুভব করে। সঙ্গীত সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীকেও গড়িয়া তুলে আবার সংসারে আসক্তা বারাঙ্গনাকেও গড়িয়া তুলে। সম্রাট্‌বাহাদুর সঙ্গীত ভালবাসেন, এবং যাহারা এই মোহিনী বিদ্যার সাধনা করে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। রাজদরবারের অসংখ্য গায়ক বাদক—পুরুষ, স্ত্রী, হিন্দু, পারসীক, তুরাণী, কাশ্মীরী; দরবারী গায়ক-বাদকের দল, সাত শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রত্যেক শ্রেণীর গায়ক-বাদক সপ্তাহে একদিন সম্রাটকে সঙ্গীত শুনায়। সম্রাট বাহাদুর হুকুম দিবামাত্রই গায়ক-বাদকেরা সঙ্গীত-মদিরা অজস্রধারে ঢালিয়া দেয়; এই মদিরায় কাহারও বা নেশা ছুটিয়া যায়, কাহারও বা নেশা জমিয়া যায়।"

আলঙ্কারিক শিল্পকলা।—দীর্ঘকাল বিকাশ লাভ করিয়া এই শিল্পকলা সপ্তদশ শতাব্দীতে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

আধুনিক যুগের বহু পূর্ব্বে, ভারতীয় শিল্প সামগ্রী আরব ও পারসীকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার সমূহের পূর্ব্বে, দিল্লির প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভের ন্যায় স্থূল লৌহখণ্ড আর কখন ঢালাই হয় নাই। হিন্দুরা বহুমূল্য-ধাতুর কাজেও খুব

উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিল; হিন্দুরা অলঙ্কার সকল মুক্তা ও বিবিধ রত্নে খচিত করিত, কার্পাসবস্ত্র বয়ন করিত, এবং কাপড়ে চিকনের কাজ করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে পুরাকালের অল্প কারুকার্য্যই আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে; কেবল গ্রীক্ বা বৈজন্তীন্ ধরণের কয়েক খণ্ড স্বর্ণালঙ্কার আমরা দেখিতে পাই। ইমারতী অলঙ্কারের জন্য, ভারতবাসী-গণ স্বীয় শিল্পকলার নক্সাদি ব্যাবিলনিয়া ও পারস্যদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতবাসীরা খুব সম্ভব তাহার অল্পস্বল্প বদলও করিয়াছিল। মনে হয়, রোমক শিল্পী ও মধ্যযুগের য়ুরোপীয় শিল্পী, হিন্দু শিল্পীদিগের নিকট হইতে চিকণ-কাজের নক্সার ভাব কতকটা গ্রহণ করে।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মহাসংকট কালের পর, দৈন্যগ্রস্ত ভারতীয় শিল্পকলা, পারসীক শিল্পকলার শাখা মাত্রে পরিণত হয়। অবশ্য ভারতবাসীরা এই ধার-করা জিনিসগুলিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। আরবী ধরণের লতা পাতার নক্সার সহিত, পুষ্প পল্লবের নক্সার সহিত, উহারা জ্যামিতিক নক্সা, জীব জন্তু, দেব, মানব প্রভৃতি মূর্ত্তির নক্সা মিশ্রিত করিয়াছিল; উহাদের বহুবর্ণবিন্যাস-পদ্ধতি রূঢ় ধরণের ছিল। উহারা উদ্‌ভিদ-জগৎ হইতে যে সকল মূল-নক্সা বাহির করিত, তাহার মধ্যে ভারতীয় বৃক্ষাদিই দৃষ্ট হয়। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, ঘটাদির জন্য, গৃহসজ্জার জন্য, উহারা পারসীক নক্সার আকারই রক্ষা করিয়াছিল এবং উহাদের নিজস্ব মূল-নক্সা প্রায়ই পারসীক নক্সার কাঠামের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। পারস্যের মধ্যবর্ত্তিতাসূত্রে ভারত, আরব ও বৈজেনসিয়া কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হয়; আবার, বাণিজ্য-সূত্রে, চীনদেশীয় আদর্শ লাভ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় প্রভাব গুজরাট্ ও দাক্ষিণাত্যের শিল্পকলাকে রূপান্তরিত করিল। এই প্রভাব দৃষ্ট হইত —কাপড়ের উপর, রত্নখচিত সামগ্রীর উপর, খোদাই করা কাঠের আস্‌বাবপত্রের উপর, সিন্দুকের উপর, আলমারীর উপর।— ইটালী দেশের নবজীবন যুগের শিল্পাদি যে সকল কারুকার্য্যে ভূষিত হইত সেই সকল কারুকার্য্যও ঐ সকল দ্রব্যে পরিলক্ষিত হইত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ভারতের সকল প্রদেশেই, ও সকল ব্যবসাতেই এই প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতের শিল্পরীতি ও য়ুরোপীয় শিল্পরীতি তখনও পরস্পরের সহিত বেশ বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

এক হিসাবে বলিতে গেলে, আলঙ্কারিক শিল্পকলার ইতিহাস, স্বয়ং ভারতেরই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :—প্রথমে জগৎ হইতে পৃথক্ থাকিয়া ভারত ধীরে ধীরে আত্মবিকাশ লাভ করিল; তাহার পর, পারস্য ও গ্রীসের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িল, পরে মুসলমানদিগের আক্রমণে রূপান্তরিত হইল, এবং সর্ব্বশেষে য়ুরোপীয়-দিগের দিগ্‌বিজয়ের পর সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ও-বাড়ির পূজো!

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারত ষড়ঙ্গ

১। রূপভেদাঃ

রূপভেদাঃ —রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্য উদ্ঘাটন,—জীবিত রূপ, নির্জ্জিত রূপ, চাক্ষুষ রূপ, মানস রূপ, সু রূপ, কু রূপ ইত্যাদি।

মায়ের কোলে সবপ্রথম চোখ খুলিয়া অবধি আমরা রূপকেই দেখিতেছি। "জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি।" গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি, রূপকে প্রকাশিত করিতেছে, আত্মার জ্যোতি, রূপকে প্রকাশিত দেখিতেছে—আলোকের ছন্দে, ভাবের ছন্দে—'বহুধা' 'বহুপ্রকারে', যথা—

জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি রূপঞ্চ বহুধাস্মৃতম্
হ্রস্বোদীর্ঘস্তথা স্থূলশ্চতুরস্রোঽনুবৃত্তবান্ ॥৩৩
শুক্লঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তঃ পীতো নীলারুণস্তথা
কঠিনশ্চিক্কণঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলো মৃদু দারুণঃ ॥৩৪ ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৪ অধ্যায়)

হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল চতুষ্কোণ ও নানা কোণ—যেমন ত্রিকোণ ষট্‌কোণ অষ্টকোণাদি এবং গোলাকৃতি অণ্ডাকৃতি; অথবা শ্বেত, কৃষ্ণ, নীলারুণ (বেগুনি) ও নানাবর্ণের মিশ্রিত রূপ; রক্ত পীতাদি এক এক স্বতন্ত্র বর্ণরূপ; কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম, কৃশ, স্নিগ্ধ, স্বল্প), পিচ্ছিল অর্থাৎ পিছল,—যেমন কাদা, যেমন জল; পিচ্ছিল যেমন ছত্রাকার ময়ূরপিচ্ছ; মৃদু যেমন শিরীষ ফুল, দারুণ যেন লোহার ভীম! ছোট বড়, রোগা মোটা, কাটাছাঁটা, গোলগাল, কালোধলো, একরঙ্গা, পাঁচরঙ্গা ইত্যাদি;—উপরের শ্লোকে যে ষোলো প্রকার রূপ কথিত হইয়াছে তাহার বিস্তার অশেষ। এই রূপের অসীমতা এক এক পদার্থে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন দেখা এবং এই অখণ্ড বিভিন্নতাকে একে সমাহিত—অসীমে প্রতিষ্ঠিত—দেখাই হচ্ছে চক্ষুর এবং আত্মার কাজ। প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে তাহার সহিত আত্মার পরিচয়—ইহাই হচ্ছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা।

চক্ষু দিয়া যখন রূপভেদ বুঝিতে চলি তখন এক রূপের সহিত আর-এক রূপের তুলনা দিয়া দুয়ের পার্থক্য দেখিতে চলি;—হ্রস্বকে দীর্ঘ দিয়া, চতুষ্কোণকে নানা কোণ কিম্বা নিষ্কোণ, কঠিনকে কোমল দিয়া, এবং এক বর্ণকে আর এক বর্ণের পাশে দাঁড় করাইয়া। এরূপে কেবল চোখের দেখার দৃশ্য বস্তুটি তোমারও কাছে যেরূপ আমারও কাছে সেইরূপ। রমণীকে তুমিও দেখিতেছ রমণী, আমিও দেখিতেছি রমণী; তুমিও তাহাকে চিত্রিত করিতেছ যেরূপে, আমিও চিত্রিত করিতেছি সেইরূপে, এবং এই ফটো-যন্ত্রটিও চিত্রিত করিতেছে সেই রূপে। সুতরাং কেবল চোখের সাহায্যে রূপটি চিত্রিত হইলে তোমার চিত্রিত, আমার চিত্রিত এবং ফটো-যন্ত্রের চিত্রিত রূপেতে, বিভিন্নতা রহে না; বড় জোর রূপটির তুমি দেখাইলে এক পাশ, আমি দেখাইলাম এক পাশ, সে দেখাইল একপাশ। হয়তো তুমি দেখাইলে এক রমণী জল তুলিতে চলিয়াছে, হয়তো আমি দেখাইলাম সেই রমণীটিই চুল বাঁধিতেছে এবং সে দেখাইল শিশুকে

স্তন্যপান করাইতেছে। অথবা আমাদের তিন জনের মধ্যেই একজন চিত্র করিয়া দেখাইলাম যে, তিন ভিন্ন ভিন্ন রমণী ঐ তিন কার্য্যে ব্যাপৃতা। কিন্তু এতটা করিয়াও কি বুঝাইতে পারিতেছি যে, এই রমণী মাতা, ইনি ঘরের বধূ ও এই ঘরের দাসী? বলিতে পার না যে, স্তন্যপ্রদান-রতাই হচ্ছেন মাতা, কেশরচনা-রতাই হচ্ছেন বধূ, এবং জল-আনয়নউদ্যতাই হচ্ছেন দাসী; কেননা ধাত্রী যে সেও স্তন্য পান করায়, মাতা যে সেও কেশ রচনা করে এবং বধূ যে সেও জল তুলিতে চলে! হয়তো, তুমি জল যে আনিতে চলিয়াছে তাহাকে একটু মলিন বেশ দিয়া, চুল যে বাঁধিতেছে তাহাকে সিন্দূরাদি দিয়া, কোনো প্রকারে বুঝাইলে যে, এই দাসী, এই বধূ! কিন্তু মাতৃরূপের বেলায় কি করিবে? সন্তানরূপের বেলায় কি করিবে? ছেলেটিকে কোলে দিয়াই তো বুঝাইতে পারিতেছ না ইনি মা, ইনি পুত্র;—ইনি ধাত্রী নহেন, পালিত পুত্রও নহেন। দুই কিশোরীকে পাশাপাশি বসাইয়া, ছবির নীচে না লিখিয়া দিয়া, বুঝাইতে পার না তো—ইঁহারা ভগিনী;—দুই প্রতিবেশী নয়। মলিন বেশ দিয়াই তো জোর করিয়া বলিতে পার না, ইনিই দাসী;—ইনি দুঃখীর ঘরের লক্ষ্মীটি নন। সুতরাং দেখিতেছ কার্য্যের ভিন্নতা, বেশের ভিন্নতা—এমন কি আকৃতির ভিন্নতা দিয়াও তুমি চিত্রিত রমণী-রূপটির সত্ত্বা—যেমন তাঁহার মাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব, দাসীত্ব ইত্যাদি—সপ্রমাণ করিতে পারিতেছ না। বলিতে পার না যে, রূপে তাহার সত্ত্বা দান অসম্ভব, যখন তোমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে—র‍্যাফেলের মাতৃরূপ, আমাদের কৃষ্ণরাধার যুগল রূপ এবং পাষাণের রেখায় প্রকাশিত তেত্রিশ কোটী দিব্য রূপ।

কাজেই কেবল দুই চোখের উপর চিত্রে রূপভেদটি দেখাইবার সম্পূর্ণ ভার দিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; কেননা চক্ষু কাজে ফাঁকি দিতে চাহিতেছে,—রূপের সত্ত্বাটি সে দেখিতে ও দেখাইতে সক্ষম নয়। কাজেই রমণী-রূপটিকে সে নটীর মত কখন মলিন, কখন উজ্জ্বল বেশে, কখন তাহার কোলে ছেলে দিয়া, কখন তাহার হাতে ঝাঁটা দিয়া বুঝাইতে চায় যে, ইনি দাসী, ইনি মাতা, ইনি রাণী, ইনি মেথরাণী! কিন্তু বিভিন্ন বেশের ভিতর দিয়া দেখা দিতেছেন সেই নটীরূপ যিনি মাতাও নহেন, রাণীও নহেন। সুতরাং দেখিতেছি চিত্রকরের পক্ষে একমাত্র চক্ষুর পথই উত্তম পথ নয়; কেননা রূপের বহিরঙ্গীণ ভিন্নতা ধরিতে ও ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের সত্ত্বাকে অর্থাৎ রূপের আসল ভেদা-ভেদটাকে ধরিতে পারে না; ধরিয়া দিতেও পারে না। রূপের এই আসল ভেদ বা রূপের মর্ম্ম, কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই আমরা ধরিতে পারি। "নন্থ জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।" (পঞ্চদশী, দ্বৈতবিবেক) এই জ্ঞানই রূপকে যথার্থ ভেদ দিতেছে—ভিন্ন ভিন্ন রূপের সত্ত্বাকে প্রকাশিত করিয়া। মাতার স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে, ভূমিষ্ঠ হইয়া বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিদিনের হাসিকান্না ইত্যাদির ভিতর দিয়া যে সকল সত্ত্বার জ্ঞান আমরা পাইয়াছি তাহাকেই রূপের ভিতরে প্রেরণ করাই হচ্ছে রূপের

মর্ম্ম দেওয়া—জীবন দেওয়া, অথবা রূপের সুরূপ বা স্বরূপ দেখানো। ইহার বিপরীতটাই হচ্ছে রূপকে নির্জিত করা বা রূপকে অরূপ করা।

আমাদের রুচি অনুসারে আমরা রূপে সু কু দুই ভিন্নতা দিই। রুচি হচ্ছে আমাদের মনের দীপ্তি বা চিরযৌবন শোভা। ইহারি দ্বারা রূপবান বস্তুমাত্রেরই রুচিরতা আমরা অনুভব করি। যাহারই মন আছে তাহারই রুচি আছে, তেমনি আকৃতিমাত্রেরই নিজের নিজের একটা রুচি বা দীপ্তি অথবা শোভা আছে; এই দুই রুচির মিলন যখনি হইতেছে তখনি দেখিতেছি সুরূপ; আর তদ্বিপরীতেই যেন দেখিতেছি রূপহীন। কথায় বলে, "যে যারে দেখতে নারে তার চলন বাঁকা!" বস্তুরূপটি আমাদের সম্মুখে পড়িবামাত্র আমাদের মনের দীপ্তি বা রুচি, লণ্ঠনের আলোর মত, বস্তুটির উপর গিয়া পড়ে এবং বস্তুর দীপ্তি বা শোভা আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। যদি বস্তুরূপের রুচি আমাদের রুচি-সঙ্গত না হয় তবে আমরা বস্তু হইতে নিজের দীপ্তি ঘুরাইয়া লই—যেন মুখই ফিরাইলাম; এবং বলি এ রূপটি কুরূপ; এবং তদ্বিপরীতে আমরা দেখি বস্তুটি সুরূপ! সুতরাং রূপ দেখিতে এবং রূপকে রেখাদির দ্বারা চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হইলে এই রুচি—মনের দীপ্তি বা চিরযৌবনশোভাই হচ্ছে চিত্রকরের একমাত্র সহায় এবং চিরসঙ্গী। সকল প্রদীপের দীপ্তি সমান হয় না; তেমনি সকল মানুষের অন্তঃকরণে এই রুচি সমভাবে উজ্জ্বল নহে। এই জন্য তোমার দেখায় এবং আমার দেখায়, আমার চিত্রিতে ও তোমার চিত্রিতে রূপের প্রভেদ ঘটে ও উত্তমাধম ভেদাভেদ থাকে। এই মনের রুচি বা দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলাই হচ্ছে রূপসাধনা। এই দীপ্তির প্রেরণা দিয়া চিত্রের রেখা দীপ্তিমতী, লিখিত আকৃতির রূপ দীপ্তিমতী করিয়া তোলাই হচ্ছে ষড়ঙ্গের প্রথম ভেদাভেদ—রূপভেদ—দখল করা। "ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যা-কারতামিয়াৎ। সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে।" (পঞ্চদশী দ্বৈতবিবেকঃ) যখন দেখি সকল বস্তুর প্রকাশক আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে তখন সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হইতেছে,—নতুবা স্বরূপ প্রকাশ হইতেছে না; তেমনি সকল বস্তুর যাথার্থ্য প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুর উপরে পড়ে তখন সেই বস্তুরই আকার প্রাপ্ত হয়;—নচেৎ তদ্বস্তুর জ্ঞান হয় কিরূপে? শুধু চোখের দীপ্তি দিয়া রূপকে দেখা নয়, দেখানো নয়, মনের দীপ্তি দিয়া তাহাকে প্রকাশিত দেখিতে হইবে এবং প্রকাশও করিতে হইবে। এই জন্যই শুক্রাচার্য্য প্রতিমার লক্ষণ লিখিবার গোড়াতেই বলিয়াছেন—"নান্যেন মার্গেন প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু।" চোখ দিয়া রূপ দেখা নয়, লেখাও নয়।

২। প্রমাণাণি

প্রমাণাণি—বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানলাভ করা, বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ; —এককথায় বস্তুর হাড়হদ্দ।

চোখ দেখিতেছে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার অথচ কয়েক-অঙ্গুলী-পরিমিত পটখানিতে

আমায় সমুদ্র দেখাইতে হইবে। সমস্ত কাগজখানিকে নীল বর্ণে ডুবাইয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এই সমুদ্র। কেননা সেখানি দেখাইতেছে একখানি চতুষ্কোণ নীল কাচ; —একেবারে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থ! অনন্তের কিছুমাত্র আভাস তাহাতে নাই। এই সময়েই আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং তট এই দুই সীমা দিয়া পরিমিতি বা প্রমিতি দিতে চলি। আমরা তটকে পটের এতখানি, আকাশকে এতখানি স্থান অধিকার করিতে দিব ও বাকি স্থানটি সমুদ্রের জন্য ছাড়িয়া দিব;—এই হইল আমাদের প্রমাতৃ চৈতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য্য। তাহার পরে প্রমা দ্বারা আমরা নিরূপণ করিতে বসি—বালুতটের সহিত সোনার-আলোয়-রঞ্জিত আকাশের পীতবর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ, দুয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও কর্কশতার ভেদ এবং তট ও আকাশ দুয়ের সহিত জলের তরঙ্গিত-রূপ ও বর্ণের ভেদ, সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত আকাশের মেঘমালার রূপভেদ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতিভেদ, বর্ণভেদ, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিস্তারাদি ভেদ;—শুধু ইহাই নয় ভাবের ভেদ পর্য্যন্ত! আকাশের নির্নিমেষ নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ঘোষ চঞ্চলতা, এমন কি তটভূমির সসহিষ্ণু নিশ্চলতাটি পর্য্যন্ত! পরিষ্কার আকাশের দীপ্তির গভীরতা, সুনীল জলের দীপ্তির গভীরতা এবং তটভূমিতে যে সন্ধ্যার আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমস্ত ছবিটির উপরে রাত্রির যে গভীরতাটুকু ঘনাইয়া আসিতেছে সেটুকু পর্য্যন্ত প্রমার দ্বারা পরিমিতি দিয়া আমরা নিরূপণ করিয়া লই। তট, সমুদ্র এবং আকাশ—ইহাদের মধ্যে দূরত্ব ও নৈকট্য ইহাও আমরা প্রমার সাহায্যে অনুমান করিয়া লই। এই প্রমা হচ্ছেন, সান্ত এবং অনন্ত উভয়কে মাপিয়া লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য, আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চর্য্য মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও মাপ দিতেছে, বৃহৎ হইতে বৃহতেরও মাপ দিতেছে, গভীর অগভীর দুয়েরই মাপ দিতেছে;—রূপেরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে।

সঙ্গীতাচার্য্য ছেলেটিকে গান শিক্ষা দিতেছেন। ছেলেটির প্রমাতৃ চৈতন্য তখনও অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে। সুতরাং সুরটি সে যতবারই আবৃত্তি করিতে চাহিতেছে ততবারই সে ভুল করিতেছে;—হয় কতকটা সুর চড়া হইতেছে, নয় তো কতকটা নরম হইতেছে; আর এদিকে বাঁধা সুরও বলিয়া চলিয়াছে ক্রমাগত—"না, না, হইল না।" ইহার পর দেখি দিনের পর দিন এই সুরকে মাপিতে মাপিতে সুরটি সম্বন্ধে ছেলের প্রমাতৃ চৈতন্য যেমনি সম্পূর্ণ জাগিয়াছে, সেই দিনই গলার সুর আর তানপুরার সুর ঠিক মিলিয়া গেছে।

শুধু যে মানুষের মধ্যে এই প্রমা জন্মাবধি কাজ করিতেছে তাহা নয়; নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও ইহার পরিচয় পাইতেছি। কোথায় একটি পাতা খুস্ করিয়া নড়িয়াছে অমনি হরিণের মধ্যে যে প্রমা তাহা দুই কান পাতিয়া শব্দটির ওজন লইতেছে,—সেটি পাতা নড়ার শব্দ, কি কোনো অজ্ঞাত শত্রুর সতর্ক পদক্ষেপ! অথবা সেটি বাঘ, সেটি মানুষ কিম্বা শশকাদির মত কোন ক্ষুদ্র জন্তু কি না

ইত্যাদি! সমস্ত শিকারী জন্তুর মধ্যে এই প্রমার প্রখরতা আমরা দেখিতে পাই। পাখিটি যেমনি গাছ হইতে ভূমিতে নামিয়াছে অমনি বিড়ালটি তাহার দিকে চলিয়াছে—পায়ে পায়ে পাখি ও নিজের মধ্যে দূরত্বটুকু প্রমার দ্বারা মাপিতে মাপিতে। শেষে বিড়াল এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায় যেখান হইতে ঠিক এক লম্ফে সে পাখিটির উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে,—এক চুল মাপের এদিক ওদিক হইবার জো নাই। ঠিক কতখানি জোরে লম্ফটি দিতে হইবে তাহাও বিড়াল প্রমার সাহায্যে এই সময় ওজন করিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হয়। এদিকে পাখিটিরও প্রমাতৃ চৈতন্য ঘুমাইয়া নাই। সে বিড়ালের প্রমার দৌড়টা মাটিতে নামিয়া অবধি গ্রহণ করিতেছে এবং শত্রুর ও নিজের মধ্যের ব্যবধানটুকু অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে—নানা পতঙ্গ শিকার করিয়া। পতঙ্গও যে পাখির প্রমার ও বিড়ালের প্রমার পদধ্বনি শুনিতেছে না এবং গর্ত্তে লুকাইতেছে না তাহাই বা কে বলিল!

প্রমা যে কেবল দূর ও নৈকট্য বোঝায় তাহা নয়। সে কোন্ জিনিসটিকে কতখানি দেখাইলে সেটি মনোহর হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করে। তাজমহলের-নির্ম্মাতা-যে-স্থপতি তাহার প্রমা পাথরের গুম্বজটিকে কি এক পরিমিতি দিয়াছে যে, ইহার মত গুম্বজ জগতে আর একটি দুর্ল্লভ। এই গুম্বজের পরিমাণ এক চুল এদিক ওদিক যদি করা যায় তবে দেখিবে সাহাজাহানের মর্ম্মরস্বপ্ন বাণবিদ্ধ রাজহংসের মত ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাজের মণিমাণিক্যের জন্য তাজ সুন্দর নয়; তাহার আশ্চর্য্য পরিমিতিই তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। ইউরোপের বিখ্যাত মিলো'র "ভিনস" মূর্ত্তির হারানো দুটি হাত এ পর্য্যন্ত কেহ মিলাইয়া দিতে পারিল না—সহস্র চেষ্টাতেও। কি আশ্চর্য্য পরিমিতিই, অজ্ঞাত শিল্পীর প্রমা, ভিনস্ মূর্ত্তটিকে দিয়া গিয়াছে।

সুতরাং দেখিতেছি "প্রমাণাণি" কেবল অঙ্কশাস্ত্রের ইঞ্চি গজ ও ফুট নয়। সে আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য;—যাহা অন্তর বাহির দুইকেই পরিমিতি দিতেছে।

'মাতুর্ম্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ
মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে।'

(পঞ্চদশী ৪ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৩০)

বস্তুরূপটি গোচরে আসিবামাত্র প্রমাতৃ-চৈতন্য হইতে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বা বস্তুরূপটিকে গিয়া অধিকার করে; তখন ঐ অন্তঃকরণ, প্রমেয় যে বস্তুরূপ তাহাতে সঙ্গত হইয়া তদাকারে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বস্তুরূপ ধারণ করে এবং বস্তুরূপ মনোময় হইয়া উঠে। সুতরাং দেখিতেছি, একদিকে আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়সকল, আর একদিকে অন্তর্বাহ্য দুই দুই বস্তুরূপ; —এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাতৃ-চৈতন্য হচ্ছেন যেন মানদণ্ড বা মেরুদণ্ড। "পূর্ব্বাপরৌতোয়নিধীব-গাহ্য।' এই মানদণ্ডটি আমরা শিশুকাল হইতেই নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগ করিতে করিতে তবে উচ্চ নীচ, দূর নিকট, সাদা কালো, জল স্থল ইত্যাদির ভেদাভেদজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই; এবং নিত্য ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে আমরা প্রখরতর করিয়া তুলি। কৃপাণকে অধিকদিন অব্যবহার্য্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে যেমন মরিচা পড়িয়া সেটি অকর্ম্মণ্য

হইয়া যায়, তেমনি প্রমাতৃচৈতন্যের দ্বারা কাজ না লইলে তাহা তীক্ষ্ণতা হারাইয়া নিষ্প্রভ হইয়া রহে। বিড়ালশিশুটি ইঁদুর ধরিতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রমা নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগের দ্বারা তখনো সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই, কাজেই সে পদে পদে ভুল করিতেছে—শিকারের দূরত্ব সম্বন্ধে এবং নিজের উল্লঙ্ঘন শক্তির ঝোঁকটুকুতে।

মানব-শিশুর চিত্রিত বস্তুগুলির মধ্যেও আমরা এই প্রমা-প্রয়োগের তারতম্য লক্ষ্য করি। যেমন—দুই বালক একটি হস্তী অঙ্কিত করিয়াছে; হস্তীর মোটামুটি আকৃতি সম্বন্ধে দুজনেরই প্রমা ঠিক আন্দাজটি লইয়াছে,—দুজনেই দেখিয়াছে শুঁড়টি, লেজটি, ঢাকের মত পেটটি। কিন্তু পায়ের বেলা কেহ দেখিয়াছে দুই, কেহ চার; দন্তদুইটির বেলাও এইরূপ; —একে দেখিয়াছে এক দাঁত, অন্যে দেখিয়াছে দুই; কেহ মোটেই দাঁত দেখে নাই! পায়ের গঠনের বেলাতেও দেখিতেছি এক শিশু বেশ একটু প্রমা প্রয়োগ করিয়া যদিও দুটি পা লিখিয়াছে কিন্তু দুটি পায়েরই স্তম্ভাকৃতি দিয়াছে; অন্যে চারি পা লিখিয়াছে —পায়ের সংখ্যার বেলায় প্রমা প্রয়োগ করিয়া—কিন্তু পায়ের গঠনের বেলায় সে একেবারে অন্ধ রহিয়া গেছে এবং চারি-খানি কাঠি লিখিয়া হাতীর পা বুঝাইতে চাহিতেছে! ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরের চিত্রেও এই প্রমাপ্রয়োগের তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রমাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখাই হচ্ছে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় সাধনা।—মাকড়সার মত চারিদিকে প্রমাজাল বিস্তার করিয়া নিজে মাঝখানটিতে বসিয়া আছি আর বস্তুগুলি নিকটস্থ হইয়া জালে পড়িবামাত্র তাহার হাড়হদ্দের সঠিক খবর আমার কাছে নিমেষের মধ্যে পৌঁছিতেছে।

৩। ভাবঃ

ভাবঃ—আকৃতির ভাবভঙ্গী, স্বভাবও মনোভাব ইত্যাদি এবং ব্যঙ্গ্য।

শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ইরিতাঃ।

শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকলের বিকার-বিধায়ক হচ্ছেন ভাব; বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তি হচ্ছেন ভাব। "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।" নির্ব্বিকার চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করেন!

চিত্ত স্বভাবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে —মাটির পাত্রে এই জলটুকুর মত। সে স্বভাবত নির্ব্বিকার; বিশাল হ্রদের মত সে স্বচ্ছ; তাহার নিজের কোনো বর্ণ নাই কিম্বা চঞ্চলতা নাই;—ভাবই তাহাকে বর্ণ দিতেছে, চঞ্চলতা দিতেছে।

কোন্ সকালে বসন্তের বাতাস বহিয়াছে, আকাশের কোন্ প্রান্তে বর্ষার গুরুগুরু মৃদঙ্গ বাজিয়াছে, কোন্‌দিন শরতের অমল ধবল মেঘ দেখা দিয়াছে, শীতের শিহরণটি উত্তরের নিশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর অমনি এই চিত্ত-হ্রদের জল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! এই ভাব উত্তমাধম নির্ব্বিচারে কেবল যে মানুষেরই চিত্তবিকার ঘটাইতেছে তাহা নয়; ভাবাবেশে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা তাবতই রোমাঞ্চিত হইতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে দেখি।

এই ভাবের কার্য্যটি আমরা চোখ দিয়া ধরিতে পারি;—যেমন আকৃতির নানা ভঙ্গীতে; —বসন্তে নূতন ফুল, কচি পাতার বর্ণের উৎকর্ষে ও তাহাদের সতেজ ভঙ্গীতে, ঝড়ের দিনে গাছের ঝুঁকিয়া-পড়া শুইয়া-পড়ার ভঙ্গীতে এবং সমুদ্রের তাণ্ডব আস্ফালনে; তোমার গালে হাত দিয়া বসায়, চোখে আঁচল দিয়া কাঁদায়, তোমার আলুথালু বেশের ভঙ্গীতে, তোমার ছুটিয়া চলায়, বসিয়া থাকায়, তোমার চোখের পাতাটি নুইয়া পড়ায়, তোমার অধরের একটু কম্পনে, ভ্রূর সামান্য কুঞ্চনে, হাতখানি হাতে দিবার গালে দিবার ভঙ্গীতে।

চোখে আমরা ভাবকে দেখি ও দেখাই ভঙ্গী দিয়া—ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শাস্ত্রছাড়া, সৃষ্টি-ছাড়া ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া অনুভব করিতে পারি। কোকিলের কণ্ঠ কি যে জানাইতেছে, শীতের কুহেলিকা কাহাকে ঢাকিয়া রহিয়াছে, শরতের মেঘের রথ কাহাকে যে বহন করিয়া চলিয়াছে, আমার মধ্যে কাহার বেদনা বাহিরের বসন্তের সমস্ত আনন্দের বর্ণে বর্ণে দুঃখের কালিমা লেপন করিতেছে, কাহার আনন্দ, অন্ধকারে আলো দিতেছে—তাহাকে দেখা চোখের সাধ্য নয়; —মনের আয়ত্তাধীন। সুতরাং কেবল চোখে ভাবের কার্য্য যে ভঙ্গীটুকু পড়িতেছে কেবল সেইটুকুমাত্রই চিত্র করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিনা; কেননা এরূপে ভাবের ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পূর্ণ বাদ পড়িতেছে। চিত্রিতের কেবল স্ফুট দিকটি অর্থাৎ ভঙ্গীর দিকটি দেখাইলে চলেনা; চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে, —ইঙ্গিতের অভাবে, ব্যঙ্গ্যের অভাবে। "শব্দ চিত্রম্ বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্ববরং স্মৃতম্"। ব্যঙ্গ্য অভাবে শব্দচিত্র, বাচ্য চিত্র, এমন কি লিখিত চিত্রও অনুত্তম হইয়া পড়ে। "ইদমুত্তমমতি-শয়িনি ব্যঙ্গে"। চিত্রমাত্রেই উত্তম হয় ব্যঙ্গ থাকিলে।

সুতরাং ভাবটি দেখিতেছি দুইমুখো সাপ! একমুখ তাহার চোখে দেখিতেছি ও দেখাইতে পারিতেছি ভঙ্গী দিয়া,—রেখার ভঙ্গী, বর্ণের ভঙ্গী, আকৃতির নানা ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু সাপের আর একমুখ দেখিতেছি ব্যঙ্গ্য ও গূঢ়তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায়, ছায়ার মায়ার মত সে দেখা দিতেছেও বটে, দেখা দিতেছেনাও বটে! কাজেই চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি তাহাও বিচার করিতে হইবে।

কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়ার উপরে আতপের প্রয়োগ করিয়া ছায়াকে তো দেখাইতে পারিনা;—সে যে আতপ পাইলেই দূরে পালায়। কাজেই দেখিতেছি, ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো এক পদার্থ আড়াল করিয়া ধরিয়া—যেমন গাছটি কিম্বা আমার হাতখানি ধরিয়া—দেখাই, এই ছায়া! তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার, আর যেটা স্ফুট তাহার মাঝে কিছু-একটা আড়াল দিয়া।

কুটীরটি আধখানি লিখিলাম, আর আধ-

খানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম; কুটীরের লেখা অংশটি কুটীরের ভঙ্গী বা কুটীরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটীরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল—কুটীরের ভিতরের ভাব, কুটীরবাসীর নানা লীলা। সে দিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি—নানা অলিখিত বস্তু।

মন কেমন কেমন করিতেছে, সুতরাং চোখে সকলি কেমন কেমন ঠেকিতেছে! এই ভারটি কবিতায় খুলিয়া বলিতে গেলে দেখি কাব্য হয় না; সেখানে কবিকে না খুলিয়াই বলিতে হইতেছে—

"স এব সুরভিঃ কালঃ সএব মলয়ানিলঃ
সৈবেয়মবলা কিন্তু মনোঽন্যদিব দৃশ্যতে।"

সেই তো বসন্তকাল, সেই মলয় বাতাস, সেই তো এই প্রেয়সী! কিন্তু মন কেমন কেমন করিতেছে—সকলি কেমন কেমন দেখিতেছি! কেমন যে দেখিতেছি তাহা খুলিয়া বলিতে পারিতেছি না।

ভাবের, ভঙ্গীর বা বাহিরের দিক, চিত্রের রেখা, বর্ণ ইত্যাদি দিয়া খুলিয়া বলা চলে কিন্তু ভাবের ব্যঙ্গ্যের দিক বা অন্তরের দিক আবছায়া দিয়া ঢাকিয়া দেখানো ছাড়া উপায় নাই।

টানে যেটা প্রকাশ হয় না, টোনে তাহা প্রকাশ করে। "বেলা গেল পারে যাবি না!" এ কথার লেখার টানে কিবা প্রকাশ হইল? কিছুই না। কিন্তু এই কথার টোনটুকুতেই লালাবাবুকে সংসারের পারে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই টোনকেই বলি ব্যঙ্গ্য।

চিত্রে ভঙ্গী দিয়া ভাব প্রকাশ করা সহজ; কিন্তু চিত্রিতের মধ্যে ব্যঙ্গ্যটি দেওয়া সহজ কার্য্য নহে। এই জলপাত্রটি যদি কাঙালের ইহা বুঝাইতে চাহি, তবে জলপাত্রটির আকৃতিমাত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না;—কেন না সেরূপ জলপাত্র দেখি বহু ধনী-গৃহেও আছে! না হয় চিত্রিত করিয়া দেখাইলাম, জলপাত্রটি মলিন ও বহু স্থানে বিদীর্ণ; কিন্তু এত করিয়াও সেটি যে কাঙালের যত্নের ধন তাহা কেমন করিয়া বুঝাই? মনে হইতেছে যে, কাঙালটিকে জলপাত্রটির পাশে বসাইয়া দিলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিয়া দেখ, দেখিবে চিত্রটি "কাঙাল" হইয়া গেছে;—"কাঙালের জলপাত্র"—এ চিত্রটি নাই! এই সময়ে কাঙালের জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত বা ব্যঙ্গ্য—যেমন তাহার ছিন্ন কন্থার একটুখানি কিম্বা ভিক্ষার ঝুলিটি দিয়া—অথবা আরও কোন সূক্ষ্মতর ইঙ্গিতের সাহায্যে জলপাত্রের শূন্যতা এবং কাঙাল-জীবনের রিক্ততা প্রকাশ করিয়া আমায় চিত্রে কাঙালের জলপাত্রের ব্যঙ্গ্যটি বুঝাইয়া দিতে হয়। এই ব্যঙ্গ্য যে-চিত্রকর যত সুচারুভাবে নিজের চিত্রে প্রকাশ করেন, ততই তাঁহার অধিক গুণপনা।

একবার এক জাপানসম্রাট চিত্রকরগণের এই ব্যঙ্গ্য-প্রয়োগ-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সকল চিত্রকরকেই একটি কবিতার এক ছত্র চিত্রিত করিতে দেওয়া হইল; যথা—"বিজয়ী বীরকে অশ্ব বহিয়া আনিয়াছে,—বসন্তের পুষ্পিত ক্ষেত্রসকলের উপর দিয়া।" কত চিত্রকর কত ভাবেই এই কবিতা চিত্রিত করিয়া দেখাইল কিন্তু সম্রাট



(কোনাইয়ুকি কর্ত্তৃক চিত্রিত পদ্মা)

কাহাকেও পুরস্কার দিলেন না, পুরস্কার পাইল সেই চিত্রকর যে ধূলায়ধূসর অশ্বটির পদচিহ্নের কাছে একটি প্রজাপতি লিখিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—অশ্বক্ষুরলগ্ন নানা পুষ্প রসের শেষ সৌরভটুকু!

ফুলের মধ্যে সৌরভটুকু যেমন, চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনাটুকু তেমনি। রূপ আছে, ভাব-ভঙ্গী আছে, প্রমাণাদি সবই আছে কিন্তু ব্যঞ্জনা নাই, সৌরভ নাই;—সে যেন গন্ধহীন পুষ্পমালা। এরূপ ব্যঞ্জনাবিহীন চিত্র যে কিছু নয় তাহা বলা যায় না; কিন্তু একথাও বলা চলেনা যে, তাহা উত্তম চিত্র; কেন না তাহা "অব্যঙ্গ্য" সুতরাং "অবর"। শুধু ভাবের ভঙ্গীটুকু দিয়া তুলি রাখিয়া দিলে দর্শকের মন যাইয়া চিত্রে মজে না। চিত্রের ভাবভঙ্গীটি হয় তো আমাদের মনকে তখনকার মত কাঁদাইয়া কিম্বা আনন্দ দিয়া ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু মনটি গিয়া চিত্রে বসিয়া নব নব ভাবরস পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যায় না। এমন কি, এরূপ চিত্র বারম্বার দেখিতে দেখিতে মনে একটা অরুচিও আসিয়া পড়া সম্ভব। ব্যঙ্গ্য এই অরুচির হাত হইতে চিত্রকে ও ভাবকে রক্ষা করে; তাহাকে পুরাতন হইতে দেয় না—সেটিকে নব নব দিক দিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়া। ভাবের কার্য্য হচ্ছে রূপকে ভঙ্গী দেওয়া। এবং রূপের আড়ালে মনোভাবের ইঙ্গিতটিকে যেন অবগুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে ব্যঙ্গ্যের কার্য্য।

৪। লাবণ্যযোজনম্

রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, —যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে তাহাকে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেন, ভাবের কার্য্যকে বা ভঙ্গীকে—অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে—উন্মত্ত অশ্বের মত অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমন কি অশোভনরূপে আপনাকে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া; লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে—নিজের মধুরকোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানকালে দুর্ব্বাসা ঋষির মত অপরিমিতরূপে হাত-পা নাড়িয়া, দাঁতমুখ খিঁচাইয়া, উদ্দণ্ড ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনি আমাদের লাবণ্য তাহার কাছে আসিয়া বলিতেছে—"স্থিরোভব! পাগল হইলে যে!"

প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন;—সুনিশ্চিত একটি সুন্দর, সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মত জোরে রাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না কিন্তু তাহার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাষ্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে; আর লাবণ্য—যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমনি ভাবে দীপ্তি দিয়া থাকে।

"মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

মুক্তার রূপের ভঙ্গী নিষ্প্রভ,—যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে। তেমনি চিত্রের রূপ এবং প্রমাণ এবং ভাব সকলি নিষ্প্রভ—যদি না এই তিনে লাবণ্য আসিয়া দীপ্তি দেয়।

চিত্রের সমস্ত ভাবভঙ্গীতে লাবণ্য একটি শীতলতা, শোভানতা দিয়া চিত্রটিকে নয়ন-স্নিগ্ধকর ও মনোহর করিয়া তোলে। লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদে ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি লাবণ্য না থাকিলে চিত্রের রসাস্বাদে ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং লাবণ্যের পরিমাণ, পাকা গৃহিণীর মত, চিত্রকরকে বুঝিয়াসুঝিয়া—এক কথার প্রমা দ্বারা পরিমিতি দিয়া—প্রয়োগ করিতে হয়। অতিরিক্ত লাবণ্যে চিত্রের ভাবভঙ্গী তিক্ত হইয়া পড়ে, অত্যল্প লাবণ্যে তাহা আস্বাদ-হীন হয়।

লাবণ্যরেখাটি হচ্ছেন সকল সময়ে শুচি এবং সংযতা। তিনি ভাবাদির সহিত যুক্তা হইতেছেন বটে কিন্তু সর্ব্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। লাবণ্য যেন কষ্টিপাথরের কোলে সোনার রেখাটি, কিম্বা পরনের সাড়িখানির কোলে সোনালি পাড়খানি!

লাবণ্য, পাথরকে নিজের সুনির্দ্দিষ্ট রেখাটি দিয়া অঙ্কিত করিতেছেন, পটখানি ঘেরিয়া আপনার দীপ্তি সুনিশ্চিত সূক্ষ্মরেখায় টানিয়া দিতেছেন;—কিন্তু বলিতেছেন যে, পাথর তুমিও থাক, আমিও থাকি—তোমার এই একটুখানি জুড়িয়া; কাপড় তুমিও থাক আমিও থাকি—তোমায় একটি ধারে একটুখানি স্থান অধিকার করিয়া। লাবণ্য, চিত্রের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কম। লাবণ্য নিত্য শুদ্ধা এবং সংযতা সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।

৫। সাদৃশ্যং

ঘরের কোণে বসিয়া বুড়ি চরকা ঘুরাইতেছে আর ছড়া কাটিতেছে:—

"চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়োরে বাঁধা হাতী।"

বুড়ির চরকাটি যে তাহার নাতি কিম্বা হাতী অথবা পুতের অনুরূপ তাহা নয়; বুড়ির এরূপ দেখিবার কারণ হচ্ছে চরকাটির সঙ্গে বুড়ির সংসার ও বুড়ির নিজের মনোভাবের—হাতি কেনা ইত্যাদির—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটুকু। সুতরাং দেখিতেছি, রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয়। "সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য।" একের ভাব যখন অন্যে উদ্রেক করিতেছে তখনি হইতেছে সাদৃশ্য। চরকাটি যদি কোনো উপায়ে নাতির রূপটিমাত্র লইয়া বুড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইত—যেমন ইতালীয় চিত্রকরের দ্রাক্ষাগুচ্ছ পাখিকে দেখা দিয়াছিল—তবে বুড়ি হয়তো ঠকিত--কিন্তু যেদিন সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিত, সেদিন চরকার একখানি কাঠিও সে আর আস্ত রাখিত না।

সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া—সোলার সাপ গড়িয়া—লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনো-এক রূপের ভাব অন্য-কোন রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। "তদ্ভিন্নত্বেসতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্"। এক বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভাব উদ্রেক করে—দুয়ের

আকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও। যদি একটি জায়গায় দুয়ের মিল থাকে, সেই জায়গাটি হচ্ছে দুয়ের স্ব স্ব ধর্ম্ম। আকৃতির মধ্যে মিল আছে সেই জন্য বেণীর সহিত সর্পের সাদৃশ্য দেওয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু বেণীর স্থানে সাপটিকে কিম্বা সাপের স্থানে বেণীটিকে যেমনি রাখিয়াছি অমনি দুয়েরই স্বধর্ম্মে আঘাত করিয়াছি এবং সাদৃশ্যও ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। সর্পের ধর্ম্ম নয় যে, মস্তক হইতে লম্বমান থাকা,—মস্তকে দংশন করাই তাহার ধর্ম্ম। কিম্বা বেণীর ধর্ম্ম নয় যে, গাছের তলায় পড়িয়া ভয় দেখানো—নির্জ্জীব সর্পের মত। আবার দেখি, চামরের ধর্ম্ম, গাত্রে লম্বিত রহা, কেশেরও ধর্ম্ম তাহাই; ইহাদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মের মিলও আছে। কাজেই একে অন্যের স্থান অধিকার করিলেও সাদৃশ্যকে অধিক ক্ষুণ্ণ করে না। চামর ও কেশের মত, আকৃতির সাদৃশ্য এবং দুয়ের স্ব স্ব ধর্ম্মেরও সাদৃশ্য তেমন সুলভ নহে; সেই জন্য সাদৃশ্য দেখাইবার বেলায় বস্তুর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি বা স্বধর্ম্মের দিক দিয়া সাদৃশ্য দেওয়াই ভাল।

কবিতা কবির মনোভাবের সাদৃশ্যকে পাঠক ও পাঠকের বা শ্রোতার মনোভাবকে তৎসদৃশ করিয়া তোলে। সুতরাং কবি নির্ভয়ে বলিতে পারেন 'মুখচন্দ্র'। চন্দ্রে এবং মুখে সেখানে আকৃতির সাদৃশ্য কবি দিতেছেন না; দিতেছেন সেখানে চন্দ্রোদয়ে নিজের মনোভাবের সহিত প্রিয়মুখদর্শনে মনোভাবের সাদৃশ্য। কাজেই বলিতে হইতেছে, সেই সাদৃশ্যই উত্তম যাহা কোনো-এক রূপের ব্যঞ্জনাটুকু অন্য-এক রূপ দিয়া ব্যক্ত করে। মনোভাবের সদৃশ হওয়াই হচ্ছে সাদৃশ্য।

"মুষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদিন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্।"
(পঞ্চদশী দ্বৈতবিবেকঃ)

মনোভাব রূপের এবং রূপ মনোভাবের ছাঁদ ছন্দ বা ছাঁচে পড়িয়া উভয়ে উভয়ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। কবি যখন কমলের সহিত চরণের সাদৃশ্য দিতেছেন তখন তিনি চরণে এবং কমলে আকৃতির সাদৃশ্যটা চূর্ণ করিয়া নিজের মনোভাবটিকেই কমলের মত লেখার ছন্দটিতে বাঁধিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন; কেননা কেবল রূপের সাদৃশ্য দিয়া লিখিতে গেলে লেখা মনোভাবের সদৃশ কিছুতেই হয় না দেখিতেছেন। চিত্রকরও দেখিতেছেন চরণকে কমলাকৃতি দিয়া তিনি, না চরণ, না কমল, দুয়ের একটিকেও বুঝাইতে পারিতেছেন; এই জন্য তিনি কমলকে চরণের কাছাকাছি পাদপীঠরূপে দেখাইয়া নিজের মনোভাবের সদৃশ করিয়া মূর্ত্তির চরণকমল গড়িতেছেন।

মনে যে সুরটি বাজিতেছে তাহারই অনুরণন্ যখন বীণায় ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনাদি দিয়া প্রকাশ করিতেছি, তখনই বাহিরের বাদনকে অন্তরের বেদনের সদৃশ করিয়া দেখাইতেছি। চিত্রেও তেমনি শতসহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি যখন মানসমূর্ত্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিতেছি তখনই যথার্থ সাদৃশ্য দিতেছি। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, ভাবের অনুরণন্ যাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য; আর কেবল আকৃতি বা রূপের অনুকরণ যাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য। অনুকৃতি বা অধম সাদৃশ্য কীট পতঙ্গাদি নানা ইতর শ্রেণীর জীবকে অবলম্বন করিতে দেখা যায়—আকৃতি গোপন করিবার

চেষ্টায়। সুতরাং এরূপ সাদৃশ্য চিত্রিতকে ফুটাইয়া তোলে না, বরং অনেক সময়ে তাহাকে লুপ্ত করিয়া দেয়।

৬। বর্ণিকাভঙ্গ

বর্ণিকাভঙ্গ—নানা বর্ণের সংমিশ্রণ ভঙ্গী ও ভাব; বর্ণবর্ত্তিকার টানটোনের ভঙ্গী, ইত্যাদি।

বর্ণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ্গ ষড়ঙ্গ-সাধনার চরম সাধনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন "বর্ণজ্ঞান যদা নাস্তি কিং তস্য জপপূজনৈ।" যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মিল, যদি বর্ণিকাভঙ্গীটি—ঐ সরুকাঠির টানটোন—দখল না হইল তবে ষড়ঙ্গে পাঁচটি সাধনাই বৃথা। সাদা কাগজ সাদাই থাকিয়া যাইবে যদি তোমার বর্ণজ্ঞান না জন্মায়; তোমার হাতের তুলিটি সাদা কাগজে নানা বর্ণের আঁচড় টানিবে অথবা ঘুণাক্ষরের মত একটা-কিছু লিখিবে—যদি বর্ণিকাভঙ্গে তোমার দখল না হয়। ষড়ঙ্গের আর পাঁচটিতে তোমার মোটামুটি দখল জন্মাইতে পারে—সাদা কাগজে একটি মাত্র আঁচড় না টানিয়া! রূপের ভেদাভেদ তুমি চোখ দিয়া, মন দিয়া বুঝিতে পার; প্রমাণকেও তুমি তুলি ব্যতিরেকে দখল করিতে পার; ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্যকেও চোখে দেখিয়া, মনে বুঝিয়া জানিতে পার; কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের বেলায় তুলি তোমাকে ধরিতেই হইবে। এই যে সাদা কাগজখানি—যাহাকে ইচ্ছা করিলেই শতখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি—তুলির ডগায় একটুখানি কালি লইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে এত ভয় পাই কেন? চিত্রিত করিবার মানসে সাদা কাগজখানিকে যখনি নিজের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়াছি, তখনই আর সেখানি সাদা কাগজ নাই, তখন সে আমার আত্মার দর্পণ। বীজের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ গাছটি নিহিত থাকে, তেমনি ঐ সাদা কাগজখানিতে, সমস্ত রূপ, সমস্ত প্রমাণ, সমস্ত ভাব লাবণ্য ও বর্ণভঙ্গী লইয়া আমার আত্মাটি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে দেখি। সেইজন্য সহসা তাহাকে তুলি দিয়া স্পর্শ করিতে ভয় হয়, হাত কাঁপিতে থাকে। পটখানির উপর এই শ্রদ্ধা এই সমিহটুকু, চিত্রকরকে চিরকাল অনুভব করা চাই; কিন্তু তুলি ধরিলেই ঐ যে হাতটি কাঁপিতেছে—ঐ ভয়টুকুকে মন হইতে দূর করা চাই। হাত একটু কাঁপিবে না, তুলি আমার অনিচ্ছায় একতিল অগ্রসর হইবে না, বা পিছাইবে না, বামে বা দক্ষিণে একটুমাত্র হেলিবে না;—বর্ণিকাভঙ্গের এই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা। কাগজের কাছে তুলিটি লইবামাত্র চুম্বকের মত কাগজ যেন তুলিকে টানিয়া লইতেছে কিছুতেই রুখিতে পারিতেছি না, হাত যেন প্রবল জ্বরে কাঁপিতেছে—বাগ মানিতেছে না। এই হাতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকেও বশে আনা হচ্ছে প্রধান কাজ। এটি হইয়া গেলে আর বাকি কাজ সহজ। "সিতো নীলশ্চ পীতশ্চ চতুর্থো রক্ত এব চ। এতে স্বভাবজাবর্ণা...সংযোগজা পুনস্তন্যে উপবর্ণা ভবন্তিহি"—শ্বেত রক্ত নীল পীত এই চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবর্ণ সৃষ্টি হয়;—এইটুকু শিখিতে, কিম্বা যেমন—

'সিতপীতসমাযোগঃ পাণ্ডুবর্ণ ইতিস্মৃতঃ।
'সিতরক্তসমাযোগঃ পদ্মবর্ণ ইতিস্মৃতঃ।

'সিতনীলসমাযোগঃ কাপোতো নাম জায়তে।
'পীতনীলসমাযোগাৎ হরিতো নাম জায়তে।
'নীলরক্তসমাযোগাৎ কাবায়ো নাম জায়তে।
'রক্তপীতসমাযোগাৎ গৌর ইত্যভিধীয়তে।
'এতে সংযোগজা বর্ণাহ্যুপবর্ণাস্তথা পরে।
'ত্রিচতুর্বর্ণসংযুক্তা বহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
'...দুর্ব্বলস্য চ ভাগৌ দ্বৌ নীলবর্ণাদৃতে ভবেৎ।
'নীলসৈকো ভবেদ্ভাগশ্চত্বারো অন্যস্য তু স্মৃতাঃ
'বর্ণস্তু বলীয়স্ত্বং নীলস্যৈব হি কীর্ত্ত্যতে।

(নাট্যশাস্ত্রম্ ২১ অধ্যায়ঃ শ্লোকা ৬০—৬৫)

সাদায় পীলায় পাণ্ডুবর্ণ, লালে সাদায় পদ্মবর্ণ, নীলায় সাদায় কাপোতবর্ণ, পীলায় নীলে হরিৎ; লালে নীলে কাবি (কাষায়), পীলায় লালে গৌর—এইটুকু শিখিতে, কিম্বা বর্ণের তিন চার সংযোগে বহুতর উপবর্ণ সৃষ্টি হয়; সবল বর্ণ, অপেক্ষাকৃত-দুর্ব্বল বর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুন বল ধরে—কেবল নীলবর্ণ অন্যবর্ণের চারিগুণ বলবান ও সকল বর্ণ অপেক্ষা বলীয়ান—এই সহজ কথাগুলো মুখস্থ করিয়া এবং কার্যত প্রয়োগ করিয়া শিখিয়া লইতে অধিক সময় যায় না। কিন্তু নিজের হাতকে নিজের বশে আনাই বিষম ব্যাপার।

যাহারা তলোয়ার খেলিতে শেখে তাহারাই জানে একটা লোহার শিক্ বা একটা হাতীর মুণ্ড কাটা সহজ কিন্তু বাতাসে একখানি রুমাল উড়াইয়া দিয়া সেটিকে দুই-টুক্‌রা করায় হস্তের ও অসিঘাতের কি আশ্চর্য্য লঘুতা ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন!

চোখের তারাটি—যাহা তিলমাত্র বিচলিত হইলে, নিটোল গালের রেখাটি—যাহা একচুল এদিক-ওদিক হইলে, লুতাতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম হাসিরেখা—যাহা একটু কাঁপিলে সব নষ্ট হইয়া যায়;—তুলির আগায় সেগুলি কাটিয়া দেখানোয়, হস্তে কি ক্ষিপ্রকারিতার, স্পর্শের কত লঘুতারই অপেক্ষা রাখে। বর্ণিকা-ভঙ্গের যে বর্ণপরিচয় তাহার প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ নাই, তাহার একটিমাত্র পাঠ—সেটি হচ্ছে লঘুপাঠ বা হস্তলাঘবতা।

হাত তুলিকে গড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, হাত তুলিকে ক্ষুরধারে কাগজ কাটিয়াই যেন চালাইয়া দিতেছে,—হাত ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় ভাবে তুলিকে কাগজের উপর দিয়া উড়াইয়া লইতেছে—ইহাই হচ্ছে আমাদের লঘুপাঠের পাঠ্য, ও বর্ণিকাভঙ্গের সারাংশ।

দপ্তরী রেখাটি টানিতেছে ঠিক সোজা ভাবে—একেবারে চুলপ্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া বলিতে পারি না যে, বর্ণিকাভঙ্গে দপ্তরী পরিপক্ক হইয়াছে কিম্বা সে যে-রেখাটি টানিয়াছে সেটি চিত্রকরের রেখার মত জীবন্ত রেখা। কেন না, দপ্তরী রেখাটি টানিতেছে প্রাণ দিয়া নয়;—হাতটি দিয়া। কলের রুলও যে কাজ করিতেছে দপ্তরীর হাতও সেই কাজ করিতেছে। দপ্তরীকে কোনো চিত্রকরের-টানা রেখাটি লিখিতে দাও দেখিবে তাহার হাত একেবারে অশক্ত। চিত্রকরের রেখায় আর দপ্তরীর রেখার প্রভেদ এই যে—একটি জীবন্ত আর একটি নির্জ্জীব! চিত্রকরের প্রাণের ছন্দ একই রেখাকে কখনো গড়াইয়া, কোথাও কাটিয়া বসাইয়া, কোথাও বা ছুঁইয়া-কি-না-ছুঁইয়া যেন উড়াইয়াই লইতেছে। কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত মুখের একপাশের রেখাটি টানিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, তুলির তিন প্রকার ভঙ্গ, ভঙ্গী

বা স্পর্শ তোমায় প্রয়োগ করিতে হইবে। কপালের অস্থি সুদৃঢ়, সেখানে তোমায় তুলিতে দৃঢ়তা দিয়া, গাল সুকোমল, সেখানে তুলিকে গড়াইয়া দিয়া—কোমলতা দিয়া, নাতিদৃঢ় চিবুকের কাছে কোমলে কঠোরে মিলাইয়া রেখাটি টানিতে হইবে। একই রেখাকে কঠোর কোমল এবং নাতি কোমল, একট টানকেই স্থির ও বিগলিত এবং স্থিরবিগলিত করিয়া দেখানো, আর বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং বর্ণবর্ত্তিকাপ্রয়োগসম্বন্ধে হস্ত লাঘবতাই হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গের সমস্ত শিক্ষাটুকু।

তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায় ঠিক কতটা রং তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলিব এবং সেই রং-সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না চাপিয়া কাগজের উপর বুলাইয়া দিব; —ইহারি সম্বন্ধে প্রমালাভ করা হচ্ছে ষড়ঙ্গের বর্ণিকাভঙ্গনামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা। চিত্রে মনের রংকে ফলাইয়া তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়া আনা, মনের আলো'কে জ্বালাইয়া দেওয়া এবং মনের ষড়ঋতুর বিচিত্রচ্ছটাকে প্রকাশিত করাই হচ্ছে বর্ণিকা ভঙ্গে বর্ণ-জ্ঞান।

বর্ণজ্ঞান শুধু অক্ষরের অথবা রেখার বা বর্ণের রূপ জানা নয়, শুধু একবর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংমিশ্রণে নানা উপবর্ণাদি সৃষ্টি করাও নহে; কিন্তু বর্ণের তত্ত্ব এবং রূপ —দুয়েরই জ্ঞান।

তন্ত্রশাস্ত্রে অক্ষর এবং রেখাসকলের একএকটি আত্মা এবং একএকটি বিশেষ বর্ণ দেওয়া হইয়াছে, যেমন—"আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ং ...ব্রহ্মাবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্র স্বয়ং।" ব্রহ্মবিষ্ণুরাত্মক এবং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময় পরমাশ্চর্য্য যে 'আ' অক্ষর তিনি স্বয়ং রুদ্র। গায়ত্রীতন্ত্রেও গায়ত্রীর এক একটি অক্ষরকে এইরূপ আত্মাবান বলা হইয়াছে যেমন—

"গায়ত্রা প্রথমং বর্ণং পীতচম্পকসন্নিভং।
অগ্নিনা পূজিতং বর্ণং আগ্নেয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।"

গায়ত্রীর প্রথম বর্ণ চম্পকের ন্যায় পীত, তিনি অগ্নির দ্বারায় অর্চ্চিত সুতরাং আগ্নেয়।

কালি দিয়া রেখাটি টানিতেছি কিন্তু মনে চিন্তা করিতেছি এই তুলির অক্ষর কেহ শ্যাম, কেহ কপিল, কেহ ইন্দ্রনীলাভ। শুধু ইহাই নয়;—কোন অক্ষর অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ কেহ নীল আকাশের ন্যায় স্নিগ্ধ ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"বর্ণানাং তু বিধিং জ্ঞাত্বা তথা প্রকৃতিমেবচ কুর্য্যাদ্দৃশ্য রচনাং।"—বর্ণের বিধি এবং প্রকৃতি অর্থাৎ কোন্ বর্ণ আকৃতিকে গোপন করে, কে তাহা ফুটাইয়া তোলে ইহার বিধি; কোন্ বর্ণ আনন্দিত করে, কে বিষাদিত করে, কে বা বৈরাগ্য বুঝায়, কে বা অনুরাগ জানায় ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃতি বুঝিয়া তবে অঙ্গ রচনা করিও।

কথায় বলে—"কালি কলম মন, লেখে তিন জন।" মন কোথায় গোপনে বসিয়া কালোর উপরে আলো, আলোর উপরে কালো টানিতেছে আর অমনি হাতসমেত তুলি সেই আলোর কম্পনে দুলিয়া উঠিতেছে, কালোর বর্ণে রাঙিয়া উঠিতেছে! চোখের বর্ণজ্ঞান হইতেছে না;—হইতেছে মনের। হাতের বর্ণিকাভঙ্গ দখল হইতেছে না;—হইতেছে মনের। বর্ণজ্ঞানসম্বন্ধে চোখকে বিশ্বাস

করিতে পারি না; কেননা অনেক চোখ নীলকে দেখে হরিৎ, লালকে দেখে পীত। এবং একটি সামান্য পাতার উপরে ষড়ঋতুতে নিমেষে নিমেষে আমাদের সুখদুঃখের আলোক-কম্পনের ভিতর দিয়া যে ভাবের রংটি ফুটিয়া উঠিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে, নূতন হইতে নূতনে তাহাকে ধরাও চোখের সাধ্য নয়। চোখ বসন্ত কালের সমস্ত পাতার মোটামুটি একটা বাসন্তী রং দেখিতে পাইতেছে—"নীলপীত সমাযোগাৎ।" কিন্তু বাস্তবিক বসন্তের রংটিতে রাঙিয়া উঠিতেছে আমাদের মন। তাছাড়া ষড়ঋতু তো শুধু বর্ণটুকু লইয়াই আমাদের কাছে আসিতেছেনা, —বর্ণ, গন্ধ, গান, স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত দিয়া সে আপনাকে আমাদের মনের নিকটে প্রকাশ করিতেছে! ইহারই বর্ণন হচ্ছে বর্ণের কাজ। বর্ণ শুধু রঞ্জিত করে না; বর্ণ চিত্রকে রণিত করে। শুধু ফুলের রংটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও; শুধু সূর্য্যকিরণের রংটুকুও নয় তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্য্যন্ত সকালে কিরূপ, সন্ধ্যায় কিরূপ, দ্বিপ্রহরে কতটা;—বর্ণ দিয়া এ সমস্তই বর্ণন করিতে শেখা চাই।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর-সভার চিত্র লিখিতেছি—পঞ্চ নলকে, দময়ন্তিকে, সকল সখী ও সকল রাজাদের লিখিয়া সমস্তটির উপরে পুষ্পচন্দন, ধূপদীপের গন্ধটি, বর্ণ দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে! চিত্রে বর্ষা বর্ণন করিতেছি—ময়ূর দিলাম, গাছ দিলাম, মেঘের আকার দিলাম, অভিসারিকা রাধাকেও দিলাম;—কেবল বর্ণ দিতে পারিলাম না;—সব ব্যর্থ হইয়া গেল! মেঘের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম না, গাছের তলায় সুরভিত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল না, ভিজা-মাটির গন্ধে চিত্রটি ভরিয়া উঠিল না;— মনের অভিসার ব্যর্থ হইা গেল!

বর্ণ মেশায় না চোখ;—বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্জ্বল অথবা ম্লান দেখিতেছে তাহারি ওজনটুকু নীলে মেশানোই হচ্ছে বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি যদি মনের রংটুকু সেই কালিতে আনিয়া মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে না; যদি মন তাহাকে রাঙায়—আপনার বর্ণে।

"কালী কি কালো দূরে তাই কালো।
চিনতে পারলে আর কালো নয়।"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ)

মন যতক্ষণ কালি হইতে পৃথক আছে, কালি ততক্ষণ কালো কালি মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালি আর কালো নাই;—সে ষড়ঙ্গের বরণডালায় আলোর শিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

রাত হয়ে এল বলেই অষ্টার লিটজের যুদ্ধের বিরাম হল। প্রথমে ২রা ডিসেম্বরের কুয়াশা-অন্ধকার সকাল বেলায়, তার পর যখন সূর্য্যোদয় হল,—যে সূর্য্যকে নেপোলিয়ান চিরকাল বল্‌তেন, অষ্টার লিটজের মহিমাময় সূর্য্য—ক্রমে আবার যখন ছায়া দীর্ঘতর হয়ে এল—সন্ধিবদ্ধ রুষ এবং অষ্ট্রীয়ান সৈন্য-শ্রেণীর পিছনে, হ্রদ দুটির উপর দিয়ে তীব্র হিমবাতাস হুহু করে বয়ে এল, তখন পর্য্যন্তও সমর হুহুঙ্কার আর রক্ত-প্লাবনের বিরাম ছিল না। ফরাসী-সাম্রাজ্যের শ্যেনাঙ্কিত পতাকা বহন-কারীকে অনুসরণ করে, জয়শ্রী ধীর নিশ্চিত পদেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। অষ্ট্রীয়ানরা প্রথমেই পালাতে আরম্ভ করেছিল, রুষ-সৈনিকেরা একাগ্র পৌরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেও যখন কিছুই কর্ত্তে পারলেন না—তখন তারা ক্রমে হ্রদ সীমানার নিম্ন জলাভূমির দিকে তাড়িত হল। তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হয়ে আসতে লাগল, তাদের মনের বল ক্ষীণ হল, চারিদিক হতে আক্রান্ত হয়ে তারাও শোচনীয় পরিণামের হাতে আত্মসমর্পণ করলে।

যুদ্ধ-বিরত রুষ-সৈন্যের এক অংশ কেবল একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি, মনের ধৈর্য্য আর কাজের নিয়ম রক্ষা করে তারা জমাট বরফের উপর দিয়ে, হ্রদ দুটির মধ্যে যেটি বড়, সেইটি পার হবার চেষ্টা করছিল।

পরাভূত শত্রুর জাতীয় গৌরব পতাকায় পা রেখে, বিজয়ী সেনাপতিপরিবৃত সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা, জয়গর্ব্বিত খর্ব্বাকৃতি কর্সিকান যখন এই দৃঢ় নিষ্ঠ বীর সকলের অসাধ্য সাধন চেষ্টা দেখলেন তখন তাঁর মন সহসা দ্বিধায় কাতর হয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্ত কালের জন্যে। যুদ্ধে দয়ার বিধান কোথা?—ধীরে দূরবীণটি নামিয়ে স্থির কণ্ঠে বল্লেন—"আমার দেহরক্ষক কামানের সৈন্যদের, হ্রদের দিকে মুখ ফিরিয়ে গোলা চালাতে বল"। আদেশ পালনের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হল না।

কামানের নলের মুখে হাল্কা সাদা ধোঁয়া দেখা দেবার পর, কালো-পোষাক-পরা দৃঢ় শ্রেণীবদ্ধ রুষ-সৈন্য-দলের মধ্যে ফাঁক দেখা দিল, যেখানে তিল ধরবার ঠাঁই ছিল না, যেন সেখানে একটি প্রসর পথ রচনা করে দিলে। একটি, আবার একটি—পথের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলল;—তার পর মনে হল উগ্র সাদা বরফের প্রান্তরের উপর হ্রদের তীর হতে কে যেন কালো কালো ঝোপ বসিয়ে দিয়ে গেছে—সে আর কিছুই নয়, ভূমিশায়ী রুষ-সৈন্য!

নেপোলিয়ান এই হত্যাদৃশ্য হতে মুখ ফিরিয়ে তাঁর পার্শ্বচর সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্ণেল আবনে প্রেভষ্ট কোথায়?

লানেস কিম্বা রেসিএর বোধ হয়, বল্লেন, গোলা চালাবার হুকুম দেবার জন্যে কর্ণেল গিয়েছিলেন, এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল কিন্তু—কথা সমাপ্ত না করেই তিনি নীরব হলেন। ভাবটা কর্ণেল জীবিত আছেন কি, না কে জানে?

নেপোলিয়ান বল্লেন, হায় আমার মনে কষ্ট হচ্ছে;—কর্ণেল স্বদেশভক্ত বীরপুরুষ ছিলেন।

সম্রাট আবার হ্রদের দিকে চেয়ে দেখলেন, আর এক দল কামানের সৈন্যকে সম্মুখে নিয়ে আসবার হুকুম দিয়ে, আপন ঘোড়ার উপর পাষাণ-মূর্ত্তির মত অটল হয়ে বসে রইলেন।

নিমেষে নিমেষে মৃত্যু যে শত শত রুষ-সৈন্য গ্রাস করছিল, তা দেখে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হননি, কিন্তু আপন সেনাপতিদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের অভাবে মনে কষ্ট বোধ করলেন! অপরের জন্যে কোনো ব্যথা কিম্বা সমব্যথায় কাতর হবার মানুষ তিনি ছিলেন না—আজ যে বেদনা মনে অনুভব করছিলেন—মৃত কর্ণেলের জন্যে নয়—জীবিত আপনার জন্যে! কর্ণেলের অভাবে তাঁর যে কত ক্ষতি হল তাই কেবলি মনে করছিলেন!

হেক্টর, মারি পিয়ের, আব্‌নে প্রেভষ্ট সেণ্ট ক্রোয়ার মার্কুইসের বয়স সবে মাত্র চল্লিশ। সম্রাটের কোনো সেনাধ্যক্ষই এ বয়সে এতটা উচ্চ পদবী পায়নি—তাঁর বংশ-গৌরবও অনন্য-সাধারণ, ফ্রান্সের প্রাচীন কোনও শ্রেষ্ঠতম অভিজাত কুলে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা যখন শুনলেন, তিনি নেপোলিয়ানের অধীনে সৈন্যপদ স্বীকার করেছেন তখন তাঁকে ত্যজ্য-পুত্র করলেন। বৃদ্ধ ডিউক তখনও অষ্টাদশ লুইএর একান্ত অনুগত ভৃত্যরূপে তাঁরি নিকটে- রুষ সম্রাজ্যাধীন মিটাও নগরে বাস করছিলেন। হেক্টরও রুষ-সেনাবিভাগে কাজ নিয়েছিলেন, তখন তিনি মস্কাওএর প্রসিদ্ধ "নোবল গার্ডস"এর কাপ্তেন। তাঁর মত অভিজাত-সন্তানের মনে নেপোলিয়ানের প্রতি যেরূপ দারুণ বিদ্বেষ থাকা সম্ভব তা তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই পোষণ করতেন। তবুও অকস্মাৎ রুষ-কাপ্তেনের পদ ত্যাগ করে গোপনে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। জনশ্রুতি তাঁর বিদায়ের কারণ, কোনও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রুষ-সম্রাটের অনভিমত।

হেক্টর পারিস নগরীতে উপস্থিত হয়ে ফরাসী সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। ঋজু, উন্নতবপু, সুশ্রী সেই যুবা পুরুষ সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অতি সপ্রতিভ ভাবে বল্লেন, রাজেন্দ্র আমার এই তরবারি ফ্রান্সের সেবায় উৎসর্গ করলাম। আজ হতে আমি, আপনার সৈন্যদলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। আমি জানি আজ হতে আমার জীবনের সম্মুখে প্রতিদিনই মৃত্যুভয় জেগে থাক্‌বে। আমার নাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের তালিকাভুক্ত। যারা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, দেশে ফিরলে যারা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে, আমি সেই নির্ব্বাসিত দিগেরই একজন। তবুও আমি ভীত নই। আমার ভাগ্য-বিধান আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করলাম।

কর্সিকান, আবেদনকারীর কথা শুন্‌লেন, মুহূর্ত্তকাল স্থির ভাবে চিন্তা কর্‌লেন। সম্রাটের সম্মান, পদবী সবে অল্পদিনমাত্র তাঁর হস্তগত হয়েছে; তাঁরি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে রাজা রাজ্যচ্যুত, দরিদ্র ঐশ্বর্য্যবান, সামান্য সৈনিক সেনাপতি পদে, গৃহস্থবধূ সাম্রাজ্ঞীর সখীত্বের গৌরবে উন্নীত হচ্ছিল, তবুও তাঁর মনে সন্তোষ ছিল না। পদগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে যদি বংশগৌরব দান করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত হত! ভদ্র সন্তান

জন্মায়;—তার বিশেষত্বটুকু মার্জ্জিত-শীলতা, কেউ কাকে দিতে পারে না। নেপোলিয়ানের রাজসভায় অনেক নূতন ডিউক, ব্যারণ, কাউণ্ট, মার্কুইসের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্তু, এই হঠাৎ-নবাবের দলে অভিজাত-সুলভ শোভন সংযত ভব্যতার বড়ই অভাব ছিল। ভদ্রাচার যেন গিলোটিনে সম্রাজ্ঞী মেরি এণ্টোনিয়েটের শিরশ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিল। এতদিনে নেপোলিয়ান বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কাছে বনিয়াদী বংশের বশ্যতাই তাঁর একান্ত বাঞ্ছার সামগ্রী! সে মনোবাঞ্ছা বুঝি আজ পূর্ণ হবারও সুযোগ হল,—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম অভিজাত-সন্তান আজ তাঁর কাছে সৈনিকের পদপ্রার্থী।

নেপোলিয়ান যে হাসিতে অধীন সকলকে বশ করে রেখেছিলেন, যে হাসির এতটুকু আলোক দেখবার জন্যে কত অগণ্য লোক স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হত—সেই সুমধুর মনোমোহন হাসিটুকু হেসে বল্লেন, "কর্ণেল প্রেভষ্ট আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফ্রান্সের মঙ্গল আপনি আপন স্বার্থ চেষ্টার চেয়েও শ্রেষ্ঠ করেছেন। আমি বীরের সম্মান রক্ষা করে থাকি, এবং সাহসী পুরুষকে চিনে নিতে আমার বিলম্ব হয় না,—এ বোধ আপনার আছে দেখে সুখী হলাম। দেশ ভক্তি আর এই অকুতোভয়তার জন্যে, আপনাকে ভবিষ্যতে কখনো অনুতাপ করতে হবে না!"

হেক্টর এসেছিলেন কাপ্তেন পদবী নিয়ে, যখন ফ্রান্সের রাজ-প্রাসাদ হতে ফিরে গেলেন তখন তিনি কর্ণেল। আশৈশব নেপোলিয়ানকে পরস্বাপহারী দস্যু, বংশ-গৌরবহীন আধুনিক বলে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তেই তিনি অভ্যস্ত, অথচ আজ তাঁরি অধীনে কর্ম্মভার স্বীকার করলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই অষ্ট্রিয়া প্রুষিয়া একত্রে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, রুষিয়াও সন্ধিবদ্ধ রাজন্যবর্গের হয়ে শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিলে। নেপোলিয়ান সৈন্যদলের নায়কতা স্বয়ং গ্রহণ করে, অষ্টার লিটজের যুদ্ধক্ষেত্রে সকল বিপক্ষকে একেবারে পেষণ করে ফেললেন। এই যুদ্ধ-দিনে হেক্টর আব্‌নে প্রেভষ্ট তাঁরি পার্শ্বচর সেনাধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ফরাসী-সম্রাট-যুদ্ধক্ষেত্র ক্ষেত্র হতে ফিরে চল্লেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে তিনি শ্রান্ত, কিছু আহার না করলে আর চলে না। সকলেই জানেন, নেপোলিয়ান বড় অভিনয় পটু ছিলেন। সন্ধি-ক্ষণের দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি কেমন করে সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল করে তুলতে হয়, তা তিনি বিশেষরূপে জান্‌তেন। কেবলমাত্র কয়েক-প্রহর পূর্ব্বেই, গত রাত্রিতে, যুগ যুগান্তের দুই রাজ বংশধর প্রবল প্রতাপশালী রুষ এবং অষ্ট্রিয়ান সম্রাটদ্বয়, মহাসমারোহে যেখানে একত্রে ভোজন সমাধা করেছেন, সেইখানেই নিতান্ত প্রাকৃত বংশজাত, বিজয়ী যোদ্ধা যদি আজ রাত্রিকার আহার সমাপন করেন, তাহলে উভয় পক্ষের মনে কিরূপ ভাবস্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তা তিনি বেশ কল্পনা করতে পার্‌ছিলেন। কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তখনই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনিনাদে সমগ্র আকাশ আর পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। ফরাসী আর্টিলারি সৈন্যের আক্রমণবেগে রুষ-সৈন্যের আশ্রয় জমাট বরফ-

প্রান্তর ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে, অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তুহিনশীতল জলরাশির মধ্যে আর্ত্ত-চীৎকার করে জলমগ্ন হচ্ছে—আসন্ন মৃত্যু বিভীষিকায় সকলেই বিহ্বল। ফরাসী-সম্রাট ক্ষণকাণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন, একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, একবার একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, তারপর আবার আপন গন্তব্য পথে চল্লেন। আজ যথার্থই তিনি বিজয়ী, সমগ্র ইউরোপখণ্ড আজ তাঁর পদানত।

অস্তগামী সূর্য্যের পাণ্ডুর পীত একটি রশ্মিরেখা, তুষারভারাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল;—সম্রাট নেপোলিয়ান দক্ষিণ হস্তে আপন তরবারি খানিকে তুলে ধরে দিবসের সেই অন্তিম মহিমা-দীপ্তিকে অভিবাদন করলেন—বল্লেন "দেখ দেখ অষ্টারলিটজের সূর্য্য বিদায় কালে আমাদের অভিবাদন করে যাচ্ছেন।"

নেপোলিয়ান অগ্রসর হতে যাচ্ছেন এমন সময় সৈন্যব্যূহ ভেদ করে, একজন সৈনিক কাতর কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে তাঁর অশ্বের সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে শুয়ে পড়ল। তার পরণে সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিকের পরিচ্ছদ, এক হাতে গুলির আঘাতে গভীর ক্ষত, সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, তরবারিখানি অর্দ্ধভগ্ন। নেপোলিয়ান ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখলেন, তিনি কখনো কোন সৈনিকের আবেদন অগ্রাহ্য করতেন না। তাঁর কাছে আপন সুখদুঃখের কথা জানাতে এসে, অতি নিম্নতম সিপাহীকেও ফিরে যেতে হত না। লোকপ্রীতি যে কি অমূল্য ধন, কত দুর্লভ, তার মর্য্যাদা কত অধিক, তা তিনি ভালই জান্‌তেন। এই জ্ঞানই তার উন্নতির নিগূঢ় কারণ। অতি আকাঙ্ক্ষার বশে, পদগৌরবের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে যখনি সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন তখনি তাঁর পতন হয়েছিল।

"ভাইয়া তুমি কি চাও?"

অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সৈনিক বল্লে, আমার নাম জ্যাক ক্লেমাঁ। আমি কর্ণেল সাহেবের অরদালি।

"কোন কর্ণেল! আমার কর্ণেল তো একটি নয়।"

"কর্ণেল মাকুইস আব্‌নে প্রেভষ্ট। আমি তাঁর পালিত ভ্রাতা। রুষ-সৈনিকের সঙ্গে তিনিও ঐ জমাট বরফের উপর ছিলেন, বরফ তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—তিনি তাহলে ডুবে মারা যাবেন। হে রাজ্যেশ্বর প্রভু! তাঁকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"

যে ব্যক্তি আপন ভৃত্যের মনে এমন প্রবল অনুরাগ, এমন একাগ্র প্রভুপরায়ণতা জাগরিত করতে পারে, সে নিশ্চয়ই জননায়ক হবার বিশেষ উপযুক্ত! কর্ণেল হেক্টর প্রেভষ্টের মৃত্যু, মস্ত বড় ক্ষতি বলেই, নেপোলিয়ানের মনকে পীড়িত কর্‌তে লাগ্‌ল।

"তোমার প্রভু কেন বরফের উপর যাবেন? তোমার নিশ্চয়ই ভুল হয়ে থাক্‌বে। ওখানে ত কেবল রুষ-সৈন্য আছে।"

"নোবল গার্ডস" রা ঐপথে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছিল,—যেখানেই "নোবল গার্ডস" রা যায় সেইখানেই আমার প্রভু তাদের অনুসরণ করে থাকেন। সারাটা

দিন তিনি তাদের পিছে পিছে ছিলেন, আমিও আমার প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলুম। রক্ষা করুন! হে অসীম প্রতাপশালী! আমার প্রভুকে রক্ষা করুন!

নেপোলিয়ান আরো নুয়ে পড়ে, সেই সৈনিকের রক্তসিক্ত স্কন্ধে হাত রেখে বল্লেন,—তাঁকে রক্ষা করা যদি আমার সাধ্যে থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই করতাম, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁকে রক্ষা করতে পারলে লাভ আমারই—কিন্তু ভাই, তিনি যে আমার সাধ্যের বাহিরে চলে গিয়েছেন।"

সৈনিক বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল—"ফরাসী-সম্রাটের সাধ্যেরও বাহিরে!"

নেপোলিয়ান ব্যথিত স্বরে উত্তর করলেন,—"হ্যাঁ ভাই, ফরাসী-সম্রাটও সেখানে শক্তি-হীন।"

অরদালি যে কথা বলেছিল, সে কথা সত্য—আব্‌নে প্রেভষ্ট সেই তুষারস্তূপের উপরেই ছিলেন।

চন্দ্রনক্ষত্রহীন সুদীর্ঘ হিমার্ত্ত রাত্রি ক্রমে অবসান হল। চারিদিকের নিবিড় নীরবতা, ক্ষণে ক্ষণে আহত কাতর স্বরে, দ্বিধাভিন্ন হয়েছিল; কিন্তু স্তম্ভিত পাষাণ-অচল অন্ধকার কোনও আহতের কোনও তৃষিতের ব্যাকুলতায় মুহূর্ত্তমাত্রও বিচলিত হয়নি। শীতের নিরুদ্যম দিন আবার ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রত্যূষে রাত্রির অন্ধকার-কালিমা ক্রমে অপগত হয়ে, যখন ধূসর কুয়াশায় প্রসর লাভ করছে—ফরাসীসৈনিকবেশধারী একজন যোদ্ধা, অন্তরে একান্ত বেদনার আঘাতে সচেতন হয়ে জান্‌লেন তিনি তখনও জীবিত আছেন। ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি উন্মীলন করলেন। প্রথমে একখানি তারপর অন্য হাতখানি তুলে দেখলেন, দুখানিই কর্ম্মাক্ষম। কপালের জমাট কেশরাশি সরিয়ে দিয়ে একবার ভাববার চেষ্টা করলেন-তিনি কোথায় আছেন।

"কি ভয়ানক! আমি এ কোথায় আছি!" আমার শীত বোধ হচ্ছে না কেন!" তাঁর চারিদিক ঘিরে ঘন কুয়াশার যবনিকা—কোথাও কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় না। যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে হাত দিয়ে দেখলেন ভয়ানক ঠাণ্ডা! ভাবলেন এ আবার কি! তিনি যে বরফের উপর পড়ে আছেন সে কথা তখনো বুঝতে পারেন নি। কত আজগুবি কথাই তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগ্‌ল। মনে হল, কুয়াশার বাধা ভেদ করে, একটি বহুপরিচিত গানের ছত্র যেন তাঁর কানে এসে প্রবেশ কর্‌ছে! সেই গান সেই সুর তাঁকে বিচলিত করলে, বার বার চক্ষু মার্জ্জনা করলেন, একি স্বপ্ন! একি মায়া!—সে গান এখানে কে গাইবে? কিন্তু আবার যখন স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেন তখন আর সংশয় রইল না, সেই সঙ্গে বহুকাল অশ্রুত, প্রিয় একটি নাম শুন্‌লেন। সেই তার নাম, যাকে তিনি বড় ভালবেসেছিলেন; কোনো রমণীর সুকুমার একটি নাম! সেই চিরপরিচিত, প্রিয় নামটির মৃদু স্পর্শে তাঁর সমস্ত চেতনা জীবন্ত জাগরিত হয়ে উঠল। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে শুন্‌তে লাগলেন; —জরাতুর উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে ডাকছে "নিকলেট",—"নিকলেট"। তারপর আবার সেই গান আরম্ভ হ'ল, যে গান সে কতবার

গেয়েছে! হেক্টর নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে রইলেন;—চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—"ভগবান হায় ভগবান, কুয়াশা উঠিয়ে নাও, দৃষ্টির এ বাধা দূর করে দাও। কে এখানে "নিকলেটকে" ডাকছে, কে এখানে তার গান গাইছে!"

তিনিও চাপাস্বরে সেই গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সুন্দরী প্রেয়সী, সুন্দর কুলটি নিকলেট। কোথায় তিনি আছেন, এ কোন্ দেশ, আবার সেই নাম কে বলে? সে গান এখানে কে গায়?"

গত দিনের ঘটনা একে একে সব তার মনে হল। যতক্ষণ তাঁর শরীরে শক্তি ছিল, বীরের বাহু তার কর্ত্তব্য ভুলে যায়নি, যতক্ষণ চরণ চলৎশক্তিরহিত হয়নি, ততক্ষণ তো ফরাসী-সেনা, অষ্ট্রিয়া রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মত্ত ছিল। এককালে বোরিসের সঙ্গে একত্রে রুষ "নোবল গার্ডস" এ কাজ করতেন। বোরিসের মত বন্ধু তাঁর ছিল না, আজ আবার তার মত শত্রুও তাঁর আর কেউ নেই। দুজনেই সেই একটি নারীকে ভালবাসতেন —তারি পরিণাম আজকের এই শত্রুতা!

প্রভাত হতে মধ্যাহ্ন, মধ্যদিন হতে ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন ধূসর আগমন কাল পর্য্যন্ত, বোরিস তাঁর অনুসরণ এড়িয়ে গিয়েছে। বোরিস সেনানায়ক হয়ে যখন বরফের আশ্রয়ের উপর দিয়ে রুষসৈন্যকে ক্রমশঃ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ফরাসী-সম্রাট তাঁদের উপর গুলি চালাবার আদেশ দেন। হেক্টর সেই আদেশ প্রচার করেন, আর সেই সময়েই রুষ-সৈন্যদের অনুসরণ করে চলেন। অধিকদূর যেতে না যেতেই তাঁর ঘোড়াটি ভূমিশায়ী হয়। কোনরূপে আপনাকে রক্ষা করে আবার পদব্রজেই তাঁদের পিছন পিছন চল্লেন, অন্ততঃ এই তাঁর বিশ্বাস—গভীরভাবে চিন্তা করেও আর কিছু মনে করতে পারলেন না। তবে তাঁর এই ধারণা কি সত্য—তিনি যে মনে করেছিলেন, তাঁর শত্রুকে দেখতে পেয়েছিলেন, চীৎকার করে, নাম ধরে তাকে ডেকেছিলেন, দাঁড়াতে বলেছিলেন, পিস্তল পর্য্যন্ত তুলে তার দিকে লক্ষ্য করছিলেন—এমন সময় নিজে বন্দুকের আঘাতে খেলার পুতুলের মত ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন—তারপর কিছুই আর জানেন না চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকার নিস্পন্দ শব্দহীনতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে সে কি ভ্রান্তি, কল্পনা, স্বপ্ন? তা তো নয়! তিনি যে স্পষ্ট তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। সবই সত্য, তিনি যে বরফের উপর কাষ্ঠখণ্ডের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন, তারি মত নিশ্চিত সত্য। কেন তিনি এমন হয়ে পড়ে আছেন? চেষ্টা-করলে উঠতে পারেন না কি? জীবের জীবন-রক্ষার চেষ্টা, প্রকৃতির আদিম সংস্কার তাঁকে আত্মরক্ষার উদ্যমে প্রণোদিত করলে, প্রথম ব্যাকুল চেষ্টার পরই বেদনাব্যঞ্জক অস্ফুটধ্বনি উচ্চারণ করে আবার শুয়ে পড়লেন! হাঁটুর কাছে যে তীব্র বেদনা বোধ করলেন তাতেই বুঝতে পারলেন, ব্যাপার সহজ নয়! কি হ'ল? অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠবার চেষ্টা করলেন, আবার প্রশ্ন করলেন 'কি হ'ল?'

আশে পাশে বরফের উপর দৃষ্টি চালনা করে কিছুই বুঝতে পারলেন না। নিজের সম্মুখে বার বার হাত বাড়িয়ে দিতে লাগলেন;—কুহেলিকার ঘন যবনিকা যেন সেই উপায়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। তারপর বল্লেন—"আমাকে একবার ভাল করে দেখতে হবে, হা অদৃষ্ট, না দেখলেই নয়!" উঠতে চেষ্টা করে তাঁর শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু যে অসহ্য বেদনায় স্পন্দিত হতে লাগল, তাতে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, নিশ্চিত কোন অঘটন ঘটেছে। শরীরের উপর হস্ত চালনা করে দেখলেন হাত দুখানি হাঁটুর নীচে আর গেল না। তারপর তাঁর শরীরের আর কিছুই ছিল না। বিহ্বল কান্না বিলাপ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আবার শুয়ে পড়তে হ'ল—সে করুণ ধ্বনি ব্যথা চেয়ে নিরাশার আকুলতায় পূর্ণ।

আবার চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে ঘিরে এল, সুদূর আকাশের অপরিসীম শূন্যতা, কেবল মাত্র একটি সুকুমার নামের বন্দনায়—নিরতিশয় সুমধুর একটি গানের মন্ত্রমোহ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হতে লাগল—"নিকলেট"—"নিকলেট, শোভন কুলটি, সুন্দরী প্রেয়সী।" (আগামী বারে সমাপ্ত)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রথম উদ্ভিদ্‌পরিচয়ের ইতিহাস

(উত্তরকুরুবাসের ভৌগোলিক প্রমাণ)

আর্য্যদিগের ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত রহিয়াছে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারি। আমাদের শাস্ত্রেই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের বিধি সন্নিবদ্ধ হইয়াছে সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক উপকরণ সকল শাস্ত্রেরই যে অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এই প্রকারে ধর্ম্মগ্রন্থরূপে আমাদের নিকট শাস্ত্রের যেরূপ মান্য হইয়াছে ইতিহাসগ্রন্থরূপেও ইহার তদ্রূপ মান্যই হওয়া উচিত। সমস্ত শাস্ত্রেরই বেদ মূলাধার, শাস্ত্রমূলক ঐতিহাসিক তত্ত্বেরও তবে বেদই মূলাধার হয়। আমরা যে পুরাতত্ত্বের উদ্ঘাটন আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে উপস্থিত করিতেছি তাহার প্রথম সূত্র আমরা বেদেই দেখিতে পাইব।

বেদে আমরা উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে খুব কম উল্লেখই প্রাপ্ত হই। বেদবর্ণিত আর্য্যদেশ যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ নহে ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। প্রকৃতির প্রিয় লীলাক্ষেত্র গ্রীষ্মমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষই যদি প্রথম আর্য্যদেশ হইত তাহা হইলে বেদে উদ্ভিদ্ রাজ্যের বর্ণনায় এরূপ দারিদ্র্য কখনও লক্ষিত হইত না। প্রত্যুত আদি আর্য্যদেশ হিমমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ছিল বলিয়াই

বেদে উদ্ভিদ্ রাজ্যের বর্ণনা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে নাই তাহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

বেদে সোমরস যজ্ঞের প্রধান উপকরণ। এই সোমরস সোমলতা হইতে নিষ্কাশিত হইত। সোমলতা ওষধি বিশেষ। বেদে আমরা ওষধির বহুল উল্লেখই দেখিতে পাই। ওষধি হইতে যেমন রস নিঃসারিত হইত তেমনই শস্যও উৎপাদিত হইত। এই প্রকারে ওষধি জাতীয় উদ্ভিদের অধিক উপযোগিতাই ইহার বহুল উল্লেখের কারণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমরা নিম্নে একটী সুপ্রচলিত বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধী র্মধুনক্তমুতোষসোঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তুনঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি
র্মধুমানস্তু সূর্য্যো মাধ্বী র্গবো ভবন্তুনঃ॥
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥"

"বায়ু নিয়ত মধুর ভাবে বহিতে থাকুক, নদী সকল মধু ক্ষরণ করুক; ওষধি সকল মধুময় হউক; রাত্রি ও উষা মধুর হউক; পৃথিবীর ধূলি মধুর হউক, আমাদের পিতৃরূপী আকাশ মধুর হউক; আমাদের বনস্পতি মধুযুক্ত হউক; সূর্য্য মধুবিশিষ্ট হউক; আমাদের গাভী সকল মধুমতী হউক।"

এখানে আমরা যেমন ওষধির উল্লেখ পাইতেছি তেমনই বনস্পতিরও উল্লেখ পাইতেছি।

বর্ত্তমান ভৌগোলিক গ্রন্থে সুমেরু সন্নিহিত প্রদেশের (Arctic Zone) উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় ঃ—

"Dwarf shrubs lichens etc" (১)

অর্থাৎ ক্ষুদ্র গুল্ম ও অপুষ্পক উদ্ভিদ্ ইত্যাদি॥

ওষধি গুল্মেরই অন্তর্গত এবং অপুষ্প বৃক্ষেরই নাম 'বনস্পতি।' সুতরাং বেদের বর্ণিত উদ্ভিদাদি যে সুমেরুর সন্নিহিত শীত-প্রধান উত্তরকুরুরই উদ্ভিদ্, তাহার প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান ভৌগোলিক বিবরণ হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি।

বেদে একদিকে আর্য্যদিগকে যেমন সোমরস দেবতাদিগের নিকট আহুতি প্রদান করিতে দেখা যায় তেমনই অপরদিকে যবচূর্ণ নির্ম্মিত পুরোডাস, অপূপ প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য-দ্রব্য উপহার দিতেও দেখা যায়। যব ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ্‌ই বটে। এই যবের যে রীতিমত চাষ আর্য্যগণ করিতেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখই বেদে রহিয়াছে যথা ঃ—

"যবংবৃকেন কর্ষথঃ"
ঋগ্বেদ ৮।২২।৬

"তোমরা লাঙ্গিল দ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ।"

ভাজাযব 'ধান' নামে অভিহিত হয় যথা "ভৃষ্টযবা পুনর্ধানা ধানাচূর্ণন্তু সক্তব" ইতি হেমচন্দ্র। ভাজা যব ধান এবং ধান বা ভাজা যবচূর্ণ ছাতু।"

এই ধানের বহুলরূপে উল্লেখই বেদে পাওয়া যায়। এই ধানই আমাদের প্রচলিত ধান্য নামের মূল। অভিধানে 'যবের' এক নাম 'দিব্য' পাওয়া যায়। দিব্য শব্দের অর্থ দিবি বা স্বর্গে জাত। আর্য্যগণ উত্তর কুরু ছাড়িয়া আসিলে উহা যখন আদিস্থান বলিয়া স্বর্গস্থানরূপে বিবেচিত হইত তখনই উহার সহিত সম্পর্কের স্মৃতি রক্ষার্থ যব 'দিব্য' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। যব ধান্য শস্যের আদি বলিয়াই 'ধান্যরাজ' নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহার 'শীতশূক' নাম হইতেও

(1) Longman's The World with fuller treatment of India. p 51.

ইহাকে শীতপ্রধান দেশে প্রথম উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ধান্‌জাতীয় শস্যের কোনটী যে প্রথম, যবের ধান নাম হইতে 'ধান্য' নামে অভিহিত হয় তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিলে 'দেব ধান্য' নামক ধান্যই 'ধান্য' নামে অভিহিত হয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত 'দেব' শব্দের যোগ হইতেই দেবকার্য্যে ইহার প্রথম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ কথায় 'দেধান' বা 'দেধানা' বলিয়া পরিচিত। ভাজা যবের বাচক ধান বা বহু বচনান্ত 'ধানাঃ' শব্দ হইতেই যে 'ধান্য' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে তৎপক্ষে এই ধান বা ধানাঃ শব্দ স্পষ্ট সাক্ষ্যই দিয়া থাকে। 'দেবধান্যের' যে 'যবনাল' একটী নাম পাওয়া যায় তাহাতেও আমরা মূলে যবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইহার অর্থ যবের ন্যায় যাহার নাল অর্থাৎ কাণ্ডভাগ।

ধান্যসকল আদিতে শীতপ্রধান স্থানের শস্য ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের দেশে হেমন্তকালে এই সমস্ত জন্মিয়া থাকে। 'হৈমন্তিক ধান্য' কথায় তাহার স্পষ্ট পরিচয়ই বিদ্যমান।

সম্ভবতঃ যবের গাছ তৃণভোজী পশুর খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই ঘাসের একনাম 'যবস' হইয়াছে!

দৈবকার্য্যে যেমন আমরা যব শস্যের ব্যবহার দেখিতে পাই তেমনই একজাতীয় তৃণেরও বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাই। এই তৃণের নাম 'কুশ'। 'দর্ভ,' 'বর্হিঃ' ইহার প্রাচীন নাম যথা "কুশোদর্ভস্তথাবর্হিঃ সূচ্যগ্রোযজ্ঞভূষণঃ।" ইহা বিশেষরূপে যজ্ঞকার্য্যের সৌষ্ঠব সম্পাদক বলিয়াই 'যজ্ঞভূষণ' নামে আখ্যাত হইয়াছে! অভিধানে ইহার এতদনুরূপ নাম 'যাজ্ঞিক'ও পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহার হেতু ইহা 'পবিত্র' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যজ্ঞে কুশের ব্যবস্থা হইতে বৈদিক পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি সমস্ত দৈবকার্য্যেই ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য রূপে পরিগণিত হইয়াছে যথা ঃ—

"পূজাকালে সর্ব্বদৈব কুশহস্তো ভবেচ্ছুচিঃ।
কুশেন রহিতা পূজা বিফলাকথিতাময়া॥

ইতি বরদাতন্ত্রে ১ম পটল

"পূজার সময় সর্ব্বদাই কুশহস্ত হইয়া শুচি থাকিয়া কুশশূন্য পূজা নিষ্ফল বলিয়া মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।"

ধর্ম্মকার্য্যে কুশ কেবল হস্তে লইবারই নিয়ম নহে, পবিত্র বলিয়া ইহার আসনে বসিবারও নিয়ম। তাহাতেই 'কুশাসন' পবিত্র আসন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞসম্পাদনে কুশের যেমন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়, ধান্য ও যবেরও তেমনই আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় যথা ঃ—

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত।" ইতি শ্রুতেঃ

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত একাদশীতত্ত্ব।

প্রাগুক্ত প্রকারে যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপে যব, ধান্য, কুশ প্রভৃতির ব্যবহার হইতে সাধারণ পূজাদ্রব্যরূপেও ইহাদের ব্যবহারের বিধান হইয়াছে যথা ঃ—

"আপঃক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পি সতণ্ডুলম্।
যবঃ সিদ্ধার্থ কশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

"জল, দুগ্ধ, কুশাগ্রভাগ, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল যব, শ্বেত সর্ষপ, এই অষ্টদ্রব্যসমন্বিত হইয়াই অর্ঘ্য অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

এতৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে দেবপূজা

আদিতে কেবল অর্ঘ্যদ্বারাই সম্পাদিত হইত। অর্ঘ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। অর্ঘ শব্দ হইতেই অর্ঘ্য শব্দ নিষ্পাদিত হয়। অর্ঘ শব্দের অর্থ পূজাবিধান যথা "মূল্যে পূজাবিধার্ঘঃ।" অর্ঘ বা পূজা বিধানের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই অর্ঘ্য বা পূজাদ্রব্য। অর্ঘ্যযোগে সূর্য্যেরই পূজা সর্ব্বপ্রথমে করা হয় বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই সমস্ত দেবপূজার আদিতেই 'সূর্য্যার্ঘ' প্রদানের বিধি প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকারে সূর্য্যের সহিত অর্ঘ্যের বিশেষ যোগের দ্বারা সূর্য্যপূজারই যে প্রথম উৎপত্তি হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য্যার্ঘ্যে আকন্দপাতা ও তৎপূজায় আমরা আকন্দপুষ্পের বিধান দেখিতে পাই। অভিধানে আকন্দের 'শীতপুষ্পক' ও 'সদাপুষ্প' নামও পাওয়া যায়। 'শীতপুষ্পক' নামের দ্বারা শীতকালে ইহার পুষ্প হয় এবং 'সদাপুষ্প' নামের দ্বারা ইহার পুষ্প কঠিনদল বলিয়া শীঘ্র শুষ্ক হয় না ইহাই বুঝিতে পারা যায়। আকন্দ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌ই বটে। এই সমস্ত দ্বারা ইহা যে আদিতে শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ্‌ ছিল তাহাই অনুমান হয়। বিশেষতঃ আকন্দের একনাম অভিধানে 'মন্দারও' দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ দেবতরুর মধ্যে আমরা এক মন্দারের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। যদিও কেহ কেহ মাঁদার গাছকেই সেই মন্দার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন আকন্দ গাছ সেই মন্দার হওয়াও অসম্ভাবিত বোধ হয় না। যাহা হউক মন্দার দেবতরু নামে আখ্যাত হওয়ায় এবং আকন্দের সহিত নামসাদৃশ্য দ্বারা যোগ থাকায় ইহাও যে আর্য্যদিগের আদি নিবাস বা স্বর্গেরই তরু তাহা আমরা মনে করিতে পারি।

পূর্ব্বে যে আমরা সুমেরু সন্নিহিত স্থানে গুল্মজাতীয় তৃণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভৌগোলিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি তদনুসারে কুশকেও আমরা উত্তর কুরুজাত বলিয়াই মনে করিতে পারি। কারণ কুশ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌ তো বটেই পরন্তু ইহার যে ফুল হয় তাহাও সাধারণ ফুলের ন্যায় নহে, উহা একপ্রকার তুলার ন্যায় এবং কখনও শুষ্ক হয় না। সুতরাং ইহাকে অপুষ্পক মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। কুশেরই তুল্য জাতীয় 'কাশতৃণ'। ইহার ফুলও বিশেষরূপেই শীতসহ ও দীর্ঘস্থায়ী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই ইহার একনাম 'অমর পুষ্প' হইয়াছে।

আমরা শাস্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা যবকে উত্তর কুরুজাত বলিয়া প্রতিপাদিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা কতদূর সমর্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারিব ঃ—

"The Zone which comprised barly and rye, but not wheat, must be sought somewhere to the north of the Alps."
"The Origin of the Aryans by Isaac Taylor p 28.

"যে ভৌগোলিক মণ্ডল যব ও ব্রীহি ধারণ করে, কিন্তু গোধূম ধারণ করে না, আল্পস্ পর্ব্বতের উত্তরে কোথাও তাহার সন্ধান লইতে হইবে।"

রাই (Rye) যে ব্রীহিরই নামান্তর তৎসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যই প্রমাণ—

"The word 'rye' is common to the Teutonic Lettic and Slavonic languages and has been identified by Grimm with the Sanskrit Vrihi, rice." Ibid p 28

"রাই শব্দ টিউটানিক. লেটিক্ ও শ্লেভনিক্ ভাষায় একই এবং গ্রিম্ ইহাকে সংস্কৃত ব্রীহির সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

উপরে 'গোধূম'কে যবের সহিত এক মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বলিয়া যে স্বীকার করা হয় নাই আমাদের শাস্ত্রেও তাহারই সমর্থন পাওয়া যায় যথা—

"ব্রীহিভির্যত্ত যবৈর্যজেত" ইতি শ্রূয়তে—যথোক্ত বস্তুসম্পত্তৌ গ্রাহ্য তদনুকারিযৎ। যবানামিম গোধূমা ব্রীহীণামিশালয়॥"

শ্রুতি আছে ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে। বিধানোক্ত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে তাহারই অনুরূপ যাহা তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন যবের অনুকল্প গোধূম, ব্রীহির অনুকল্প শালি।"

এস্থলে অনুকল্প বিধানের দ্বারা যব ও ব্রীহিই যে মুখ্য কল্প এবং গোধূমও শালি (আশুধান্য প্রভৃতি) গৌণকল্প তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যব ও ব্রীহির উৎপত্তি যে গোধূম ও শালির পূর্ব্বে তাহারই প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

যবাদির যেমন আমরা অনুকল্প দেখিতে পাই—কুশতৃণেরও তেমনই অনুকল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনুকল্প ইহারই তুল্য জাতীয় কাশতৃণ। নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কাশ ব্যতীত আরও কয়েক জাতীয় তৃণই অনুকল্প ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইহাতে সকলগুলিকেই একদর্ভ সংজ্ঞারই অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যথা :—

"হরিতা সপিঞ্জলাশ্চৈব পুষ্টাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
গোকর্ণ মাত্রাস্তু কুশাঃ সকৃচ্ছিন্না সমূলকাঃ॥
পিতৃতীর্থেন দেয়াঃ স্যুর্দূর্ব্বা শ্যামাক মেবচ।
কাশাঃ কুশ'বল্বজাশ্চতথান্যে তীক্ষ্ণরোমশাঃ।
মৌঞ্জাশ্চ শাদ্বলাশ্চৈব ষড়্দর্ভাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

সপিঞ্জলাং সাগ্রাঃ তীক্ষ্ণরোমশা ইতি বল্বজানাং বিশেষণম্। শাদ্বলা ইতি সর্ব্বেষাং বিশেষণম্। ইতি শব্দ কল্পদ্রুম।

এস্থলে দূর্ব্বা,শ্যামাক নামক তৃণ ধান্য গাছ, কাশ, শ, বল্বজ, মুঞ্জ এই ছয়টী তৃণজাতিকেই আমরা দর্ভ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে 'দূর্ব্বাকে' আমরা সামান্যার্ঘ্যের মধ্যে কুশাগ্রের পরিবর্ত্তে নিত্যই ব্যবহৃত হইতে দেখি।

যখন আর্য্যগণ উত্তরকুরু হইতে মধ্য আসিয়ার তৃণপ্রায় ভূভাগে উপস্থিত হন তখনই সম্ভবতঃ দূর্ব্বা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তৃণজাতীর উদ্ভিদ্ কুশতৃণেরই ন্যায় পূজাদ্রব্য রূপে পরিগৃহীত হয়।

মনুসংহিতায় উপবীতের বিভিন্ন উপাদানের আমরা যে উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা প্রায় সমস্তই তৃণজাতীয় উদ্ভিদেরই বিকার। এবং বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ সমস্ত তৃণজাতির অধিকাংশই আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত দর্ভ পর্য্যায়ভুক্ত যথা—

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমাশ্লক্ষ্ণা কার্য্যাবিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥ ৪২
মুঞ্জালাভেতু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তক বল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থনৈকেন ত্রিভিঃপঞ্চভিরেববা॥ ৪৩
কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্॥" ৪৪
মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়ঃ

"ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত; সুখস্পর্শ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়। ক্ষত্রিয়দিগের মুর্ব্বাময় ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়।

মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তি পক্ষে ব্রাহ্মণেরা কুশের মেখলা করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা অশ্মান্তক নামক তৃণ বিশেষের এবং বৈশ্যেরা বল্বজ তৃণের মেখলা করিবেন। ত্রিগুণা মেখলা স্ব স্ব বংশের রীত্যনুসারে এক তিন অথবা পঞ্চগ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করিবে।

ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধবৃত্রিবৃৎ কার্পাস সূত্রের উপবীত হইবে ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রের ও বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত হইবে।"

উপরে আমরা যে মুর্ব্বা নামক তৃণের উল্লেখ পাইয়াছি তাহা হইতে যেমন যজ্ঞোপবীত নির্ম্মিত হইত তেমনই ধনুর গুণও নির্ম্মিত হইত তাহাতেই ধনুর গুণের এক নাম মৌর্ব্বী হইয়াছে। ইহাতে ধনুর ব্যবহার ঐ সময় হইতে হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। মুর্ব্বার একনাম "দিব্যলতা"ও পাওয়া যায়। ইহাতে স্বর্গ বলিয়া ভারতের উত্তরবর্ত্তী আসিয়ার উত্তরভাগই যে ইহার উৎপত্তি-স্থান তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে তৃণজাতীয় অপর একটী উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য বোধ হয়, ইহা ইক্ষু। বৃহৎ তৃণবিশেষের বৈদিক কুশর নাম পাওয়া যায়। চলিত ভাষায় ইহারই অনুরূপ ইক্ষুর 'কুশারী' নাম প্রচলিত আছে। সুতরাং বৈদিক 'কুশর' ইক্ষুরই প্রাচীন নাম বলিয়া বোধ হয়।(২) কুশেরই নামানুসারে ইহার নাম হওয়ায় ইহা যে বিশেষ প্রাচীন তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। একদিকে ইক্ষুর যেরূপ কুশের সহিত যোগ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ আবার অন্যদিকে ইহার সহিত কাশেরও যোগ দেখা যায় কারণ ইক্ষুর নামানুসারেই কাশের 'ইক্ষুর' ও ইক্ষুরক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস হইতে শর্করা প্রস্তুত হইয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইক্ষুর উৎপত্তি পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"অমৃতং পিবতোবক্ত্রাৎ সূর্য্যস্যামৃতবিন্দরঃ।
নিপেতুর্যে তদুত্থামী শালিমুদ্গেক্ষবঃ স্মৃতাঃ॥
শর্করা পরমস্তস্মাদিক্ষুসারোঽমৃতাত্মকঃ।
ইষ্টারবে রতপুণ্যা শর্করা হব্যকব্যয়োঃ॥" ইতি শব্দ কল্পদ্রুমধৃত মাৎস্যে ৭২ অধ্যায়।

"সূর্য্য অমৃত পান করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে যে অমৃতবিন্দু সকল নিপতিত হয় তৎসমস্ত হইতে শালি ধান্য, মুগ ও ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই ইক্ষুর সারভুত অমৃত রস শর্করা উৎকৃষ্ট বস্তু হইয়াছে ও রবির প্রিয় হইয়াছে। এই জন্যই পিতৃঅন্ন ও দৈব্যঅন্নেও পবিত্র রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।"

এ স্থলে শর্করার সূর্য্য হইতে উৎপত্তি ও ইহা সূর্য্যের প্রিয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় মধ্য আসিয়ায় সূর্য্যপূজার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যভাষা সকলে যে শর্করা শব্দের স্পষ্ট অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও শর্করার প্রাচীনত্বের প্রমাণ হয়। সুপণ্ডিত রেগোজিন তদীয় 'বৈদিক ভারত' (Vedic India) নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য ভাষা সকলে ও প্রাচ্য আরব্য ও পারস্যভাষায় শর্করা-শব্দের অপভ্রংশ প্রদর্শন করিতে যাইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

Slightly corrupted in our European languages; Latin Saccharum, Slavic sakhar, German zucker, Italian zucchero, Spainsh azucor, French sucre, English sugar not to mention Arbic sukkar and Persian shakar p 33 footnote.

ইংরেজী sugar যে শর্করা শব্দের অপভ্রংশ তাহা

(২) ভারতী কার্ত্তিক ১৩২০ সাং 'উদ্ভিদাদির বৈদিক নাম' শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিত।

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রেগোজিন মিশ্রিবাচক sugarcandy শব্দও সংস্কৃত 'শর্করাখণ্ড'রই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভূগোলগ্রন্থে সিন্ধু হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আসিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশের (৩) যে উদ্ভিদ্‌বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতেও আমরা কার্পাস ও ইক্ষুর উল্লেখ প্রাপ্ত হই যথা—

"The Mountains are covered with the most valuable timber trees, and on the plains rice, cotton, sugarcane, and other products are cultivated while the bambo, palms, and ornamental woods flourish." fuller treatLangmans The World with ment of India. p 61.

মধ্য আসিয়ার পরেই এই ভৌগোলিক বিভাগ। সুতরাং এই সমস্ত উদ্ভিদ্ মধ্য আসিয়ার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী আর্য্যদিগের পরিচিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যগণ পূর্ব্বোল্লিখিত তৃণময় দেশের আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই প্রথম বৃক্ষাদির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সময়েই তাঁহারা পলাশ খদিরাদি বৃক্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাহাতেই মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারীর পলাশাদি দণ্ডের বিধান দৃষ্ট হয় যথা—

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপলাশৌ ক্ষত্রিয়োবাটখদিরৌ।
পৈলবোদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥" ৪৫
মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বট অথবা খদিরের দণ্ড এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী পীলু, অথবা উড় স্বরের দণ্ড ধারণ করিবে।"

উল্লিখিত বৃক্ষ সকলের প্রায় সকল গুলিরই যজ্ঞের উপযোগিতা দেখা যায়। তাহাতেই পলাশের একনাম 'যাজ্ঞিক' খদিরের একনাম 'যজ্ঞাঙ্গ', উড়ুম্বরের একনাম 'ব্রহ্ম বৃক্ষ' পাওয়া যায়। উড়ুম্বর যে যজ্ঞোড়ুম্বর বা যজ্ঞডুম্বর নামে কথিত হয় তাহাতে ইহার যজ্ঞোপযোগিতা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হয়। পীলুর একনাম আমরা 'শীতসহ' প্রাপ্ত হই। তাহাতে ইহা শীতপ্রধান দেশের বৃক্ষ বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান ভূগোলগ্রন্থের মধ্যআসিয়ার উদ্ভিদ্‌বিবরণ আমাদের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যেরই পোষকতা করিয়া থাকে যথা—

The Central Plateaux are clothed with grasses, and except on the higher mountain slopes are singularly deficient in trees. (৪)

(আসিয়ার) মধ্য সমতল ভূভাগ সকল বিবিধ জাতীয় তৃণ সমাচ্ছন্ন এবং উচ্চ পার্ব্বতীয় ঢালু প্রদেশ ব্যতীত তৎসমস্ত বিশেষরূপেই বৃক্ষহীন।"

ইহা হইতে মধ্য আশিয়ার সমতল প্রদেশে বিবিধ জাতীয় তৃণ ও পর্ব্বত প্রদেশে বৃক্ষ থাকার স্পষ্ট উল্লেখই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

এতৎপ্রসঙ্গে বৃক্ষের প্রথম নাম সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করি। আমাদের নিকট বোধ হয় 'পলাশই' বৃক্ষের প্রথম নাম ছিল। তাহাতেই যেমন বৃক্ষ বিশেষের নাম 'পলাশ' প্রাপ্ত হওয়া যায় তেমনই বৃক্ষের জাতীয় নামও 'পলাশী' পাওয়া যায়। বৃক্ষের 'পলাশী' নাম হওয়ার কারণও 'পলাশ' শব্দেই পাওয়া যাইতে পারে। একদিকে 'পলাশ' শব্দ যেমন বৃক্ষের

(৩) Longmans' the World with fnller treatment of India p 60.
(৪) Largman's the World with fuller treatment of India p 62.

সবুজ বা হরিদ্বর্ণের বাচক যথা—অমর কোষে :—

"পলাশো হরিতো হরিৎ;"

তেমনই ইহা বৃক্ষের পত্রেরও বাচক যথা—অমর কোষে—

"পত্রং পলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ পুমান্॥"

উপরে যে আমরা বটের উল্লেখ পাইয়াছি ইহার একনাম 'বনস্পতি' পাওয়া যায়। বট বিশেষ বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ। বর্ত্তমান ভূগোল গ্রন্থে আমরা উত্তরমেরুর পরবর্ত্তী যে দুইটী ভৌগোলিক মণ্ডলের নাম প্রাপ্ত হই উহাদের উদ্ভিদাদির সম্বন্ধে এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায়—

The Sub-Arctic Zone—Coniferous trees (pines, fir &c)

The Cold Temperate Znee—Deciduons trees (oak &c) (৫)"

"উত্তরমেরু সন্নিহিত মণ্ডল—দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ,
নাতিশীতোষ্ণ হিমমণ্ডল—ওক্ প্রভৃতি বৃক্ষ।

আমরা যে বটবৃক্ষের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহা ওকের ন্যায়ই বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ। বটের একনাম 'বিটপী, ও পাওয়া যায়। এই 'বিটপী' বৃক্ষেরও সাধারণ নাম। বটের বিশেষ 'বনস্পতি' ও 'বিটপী' নাম এবং তদনুসারে বৃক্ষের বিশেষ ও সাধারণ নাম কল্পিত দেখিয়া ইহা যে বৃক্ষের প্রথম আদর্শ হইয়াছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

উত্তরমেরু সন্নিহিত মণ্ডলে যে দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের 'দেবদারু' নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে এ সমস্ত যে আমাদের 'দেবদারু'র সহিতই অভিন্ন তাহা পরিষ্কারই বোধগম্য হয়। 'দেবদারু' শব্দের অর্থ দেবতার বৃক্ষ। এই দেবদারুর অপর নাম 'শক্রপাদপও পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দ্রের পূজা প্রবর্ত্তিত হইলেই এই বৃক্ষের সহিত আর্য্যদিগের পরিচয় হয়। তাহাতেই ইন্দ্রের সহিত ইহার যোগ হইয়াছে।

আইজাক্ টেলার তদীয় আর্য্যদিগের আদি নিবাস The Origin of the Aryans নামক গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক সেইশের (Sayce) যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাতেও দেবদারুকেই আর্য্যদিগের আদি নিবাসের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

* * * "but he thinks ft agrees with the conclusion of Comparative Philology, which teach us that the early Aryan home was a cold region, "Since the only two trees whose names agree in Eastern and Western Aryan are the bich and .the pine, while winter was familiar with its snow and ice." The Origin of the Aryans by Isaac Taylor.

p p 14—15

"কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে ইহা ভাষাবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সকলের সহিত মিলে। ঐ সিদ্ধান্ত সকল আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে আর্য্যদিগের আদি নিবাস শীতপ্রধান দেশ ছিল। কারণ যে দুইটী মাত্র বৃক্ষের নাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আর্য্যের মধ্যে মিলযুক্ত হয় ঐ দুইটী 'দেবদারু' ও 'ভূর্জ্জ'। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে তুষার ও হিমানী সহ শীতকালও তাঁহাদের সুপরিচিত ছিল।"

ভূর্জ্জের একনাম আমরা 'শৌলেপ্রস্থ'

(৫) Longmans' The World With fuller treatment of India p 57.

প্রাপ্ত হই। ইহাতে ইহাকে হিমালয় পর্ব্বত-জাত বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। ভূর্জ্জপত্র বা ভূর্জ্জবৃক্ষে মন্ত্রাদি লিখিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইহা হইতেই হউক বা শিবের সহিত যোগ হইতেই হউক ভূর্জ্জের একনাম, শিবও পাওয়া যায়।

পঞ্চদেবতরু বা স্বর্গতরুর নাম যে আমরা শুনিতে পাই তৎসমস্তও এই সময়েই আর্য্যগণ পরিজ্ঞাত হন বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চদেবতরুর নাম এই—

"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসিবা হরিচন্দনম্॥"

"মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন এই পাঁচটী দেবতরু। 'হরিচন্দন' শব্দটীর ইন্দ্রের সহিতই যোগ দেখা যায়। কারণ 'হরি'ইন্দ্রের একনাম। (৬) সুতরাং ইন্দ্রের চন্দন বলিয়াই হরিচন্দন নাম হইয়াছে। ইহার ইন্দ্রচন্দন যে এক নাম আছে তাহাতেও ইন্দ্রের সহিত ইহার যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম 'দিব্য' 'দিবিজ' ও আছে। তাহাতেও ইহা যে স্বর্গস্থানের বা ভারত উত্তরবর্ত্তি আসিয়ার বৃক্ষ তাহা প্রমাণিত হয়। দেবতরু সম্বন্ধে শব্দরত্নক্রমেও 'দেবভূমারেব সম্ভবাৎ দেবতরুঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত যে ভারতের স্বর্গস্থান বা উত্তর আসিয়া বা মধ্য আসিয়ারই বৃক্ষ তাহাই প্রমাণিত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বর্গসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে স্বর্গ আকাশস্থ স্থান বিশেষকে বুঝাইত না পরন্তু মর্ত্ত্যস্থ সুমেরু বা উত্তরমেরুস্থিত পর্ব্বতই স্বর্গ নামে আখ্যাত হইত। অমরকোষ অভিধানে 'সুমেরুর' বাচক শব্দ সকলের মধ্যে 'সুরালয়' শব্দ পাওয়া যায় যথা "মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রীরত্নসানুঃ সুরালয়ঃ।" শব্দকল্পদ্রুমধৃত জটাধর অভিধানে সুমেরুর বাচক 'অমরাদ্রি' ও ভূস্বর্গ' শব্দও, পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে উত্তরমেরু স্বর্গ বলিয়া সংস্কার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৬) "হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চবাজিভিঃ॥" রঘুবংশম্

স্রোতের ফুল

(৪)

কলিকাতার দর্জিপাড়ায় হরিবিহারী বাবুর একখানি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনবিহারী ও তাঁহাদের কুলপুরোহিত নন্দকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একমাত্র সন্তান নবকিশোর কলেজে পড়িত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবকিশোরকে যখন নিজের টোলে সংস্কৃত না পড়াইয়া ইংরেজি পড়িতে দিলেন, তখন তাঁহার যজমান-মহলে

বিষম আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু বলিষ্ঠ প্রকৃতির ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা উচিত মনে করিতেন তাহাই করিতেন, কাহারও ভয়ে বা খাতিরে আপনার মতের বিপরীত কার্য্য করিতেন না।

হরিবিহারী যখন তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জমিদার বাড়ীর ভাবী পুরোহিতকে ইংরেজী পড়াইতেছেন কেন, তখন ভট্টাচার্য্য হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন—আজকালকার যজমানেরা ইংরেজী শিখিতেছে, আজকালকার শাস্ত্রও অনেকটা ইংরেজী হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং শিষ্য যজমানের নিকট সম্মান পাইবার যোগ্য হইতে হইলে গুরু পুরোহিতের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষারই সকল শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার।

হরিবিহারী কুণো প্রকৃতির লোক। তিনি ভট্টাচার্য্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া ঐখানেই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন।

কিন্তু সেই গ্রামের মোড়ল নিবারণ মুখুয্যে ভট্টাচার্য্যের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধ জুড়িয়া দিল—নন্দকিশোর স্মৃতিরত্নের ছেলে—মুদি মালার ছেলেরা যা শিখছে তাই শিখবে?

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—শিখবে নাই বা কেন? জ্ঞানেরও কি জাতিভেদ আছে নাকি?

নিবারণ সোজা হইয়া জোর দিয়া বলিল—তা আবার নেই? তুমি মোছলমানকে বেদ পড়াতে পার?

ভট্টাচার্য্য তেমনি হাসিমুখে বলিলেন—কেন পারব না? খুব পারি। তেমন নিষ্ঠাবান্ ছাত্র যদি পাই আমার যত বিদ্যা আছে সব আমি পরম আনন্দে তাকে শেখাতে পারি।

নিবারণ একেবারে বজ্রাহত। সে আর কোনো যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া ভট্টাচার্য্যকে ভয় দেখাইবার ভাবে বলিল—না না না, ও-সব অনাচার ছেলেকে করিয়ো না বলছি। মেলেচ্ছ পুরুত নিয়ে আমাদের চলবে না! শেষে কি কুলপুরোহিত ত্যাগ করতে হবে নাকি?

ভট্টাচার্য্য তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন—কিচ্ছু করতে হবে না দাদা। সব ঠিক মানিয়ে যাবে। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট-ভোজী যজমান নিয়ে পুরোহিতরা যখন চলছে, তখন কেবল মাত্র ম্লেচ্ছের ভাষা মুখে উচ্চারণ করার জন্যে পুরোহিতকে ত্যাগ করতে হবে না। সেটা তেমন অনাচার নয়।

ভট্টাচার্য্যের এই কথার মধ্যে একটু শ্লেষ-ইঙ্গিত ছিল। নিবারণ মুখুয্যে আবাল্য নানাবিধ অনাচার করিয়া যৌবনে কমিসেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করে। লোকে বলে গোরাসৈনিকদিগের উচ্ছিষ্ট খানা নিবারণের রসনা পরিতৃপ্ত করিত। সেই অপবাদটা ঢাকিবার জন্য নিবারণ এখন গ্রামের হিন্দুয়ানি রক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য তাহার প্রকাশ্য হিন্দুয়ানির আড়ম্বরের আবরণ সত্ত্বেও নষ্ট লোকের রচা কথাটাকেই যখন ইঙ্গিতের খোঁচা দিয়া খুঁড়িয়া তুলিলেন, তখন নিবারণের মনের মধ্যে দ্বিতীয় রিপুটা খোঁচা-খাওয়া ভিমরুলের মতো ভন ভন করিয়া উঠিল। কিন্তু নিবারণ হুলটা যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া হতাশানম্র করুণস্বরে বলিল

—যা খুসী কর ভায়া! তোমরা হলে একে পণ্ডিত তায় রাজপুরোহিত! তোমরা আমাদের মতন গরিব মুখ্খু সুখ্খুর কথা শুনবে কেন? কিন্তু দেখো ভায়া, গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে, তখন পস্তাতে হবে!.....হরিহে মধুসূদন, তোমারই ইচ্ছা!

নিবারণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—কী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! নিবারণ মুখুয্যের কথা অগ্রাহ্যি! এর শোধ আমি তুলব, তুলব, তুলব! না তুলি ত.....

ইহার পর নবকিশোর নির্ব্বিবাদে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল। এখন সে কলিকাতায় পড়িতে যাইবে ঠিক হইয়াছে। গ্রামে আবার একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। মনুর পর এ পর্য্যন্ত কেহ কখনো কেবলমাত্র লেখাপড়া করিবার জন্য এ গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে পা দিয়াছে বলিয়া কিম্বদন্তী নাই, ইতিহাস ত এ বিষয়ে একেবারে নীরব। নবকিশোর এই সনাতন নিয়ম ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া সকলকেই বিষম চিন্তিত করিয়া তুলিল। সকলেই ভাবিল কিশোর ছোঁড়াটা এইবার একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া ঘরে ফিরিবে! নবকিশোরের এমন যে নিষ্ঠা, বাছবিচার, ছোঁয়াছুঁয়ির এত পিটপিট এ সব বুঝি আর টিকিবে না! কেবল কিশোরের কিশোরবয়স্ক বন্ধুরা তাহাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়া ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বিপিন। সে জমিদারের ছেলে বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে বাহিরের সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল; নবকিশোরই এই খাঁচার পাখীটিকে বাহিরের উদার বিপুল বিস্তারের মোহন সংবাদ আনিয়া দিত। সেই একমাত্র বন্ধুটির বিচ্ছেদ বিপিনের মনে বড় বাজিয়াছিল।

নবকিশোরও কলিকাতায় আসিয়া প্রথমটা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিল। সে দেখিল গ্রামে থাকিতে যে-সমস্ত আচার সে পালন করিত, কলিকাতায় তাহা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। মনুর আমলের নিয়মগুলি এই কলির শহরে পালন করা এক রকম অসম্ভব; কলিকাতাটা যেন মনুর ব্যবস্থা পণ্ড করিবার জন্যই কোমর কষিয়া বসিয়া আছে। প্রতি পদে পদে বাধা পাইয়া পাইয়া নবকিশোরের মন নিজের আচার অনুষ্ঠানের দিকে সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল; সে ঠেকিয়া ঠেকিয়া বুঝিতে লাগিল যে, এমন না করিয়া অমন করিলেও জীবনযাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এবং জগতের লক্ষ কোটি নরনারীর মধ্যে দুজনের আচার ব্যবহার ঠিক এক রকম হইতে দেখা যায় না। তাহার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা সকলেই অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের আচারের সহিত হিন্দুস্থানী অধ্যাপকের আচারের মিল নাই, আবার বাঙালী অধ্যাপকের আচার উহাঁদের দুইজনের আচার অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ করিয়া তাহার একজন অধ্যাপক একেবারে দেবচরিত্রের লোক; কিন্তু তিনি একেবারে বিষম অনাচারী। এই সাধু চরিত্রের অধ্যাপকটির সস্নেহ মিষ্ট ব্যবহারে নবকিশোর তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দেখিয়া শুনিয়া আচার পালন সম্বন্ধে তাহার একান্ত আগ্রহ ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া



মায়ানদী-তীরে শ্রীবৎস ও চিন্তা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

পড়িতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে করিতে ভিতরে ভিতরে তাহার যতই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ততই সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে লাগিল যে আচারটা নিতান্তই বাহিরের জিনিস, প্রয়োজন অনুসারে তাহা কখনও পালন করিতে হয়, কখনও পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কখনও বা একেবারে বর্জ্জন করা দরকার হয়; যে লোক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে না পারে সেই ব্যক্তি আচারের ও সংস্কারের নাগপাশে জড়াইয়া গিয়া জড় বা পঙ্গু হইয়া পড়ে; গোঁড়ামি ও মূর্খতা প্রায় সমার্থক!

নবকিশোরের চরিত্রের মধ্যে একটা সতেজ বলিষ্ঠতা ছিল; তাহা তাহার প্রকাণ্ড সুগৌর শরীর, দীর্ঘোন্নত নাসিকা ও বড় বড় চোখ দুটি দেখিলেই বুঝা যাইত। তাহার মধ্যে জ্ঞানের স্বচ্ছতা, মনের তেজ, চরিত্রের দৃঢ়তা, নিষ্ঠার একাগ্রতা ও হৃদয়ের সরলতা সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তাহা তাহার বাক্যে ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। তাহার ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত উচ্চ খোলা হাসিতে তাহার নির্ম্মল মুক্ত প্রাণখানি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িত। সে যাহা বলিত ও করিত তাহা সাবধানে বিচার করিয়া, কিন্তু মধ্যপথে থামিতে সে জানিত না, সে মনের প্রবল বেগে ব্যাপারটার শেষে গিয়া তবে থামিতে পারিত। এজন্য তাহাকে হঠাৎ দেখিলে নিতান্ত একগুঁয়ে মনে হইত; সে মনের মধ্যে যুক্তিতর্ক এমন জোরে বহাইয়া শীঘ্র উপসংহারের দিকে উপনীত হইতে পারিত যে লোকে মনে করিত সে কেবলমাত্র খামখেয়ালির উত্তেজনার বশেই কাজ করিয়া চলে। সুতরাং তাহার মত বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক যখন যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তখন তাহার সম্বন্ধে কোনোই দ্বিধা রাখে না।

এ রকম প্রকৃতির লোককে সকলে সম্ভ্রম দেখায়, খাতির করে, এমন কি মনে মনে একটু ভয়ও করে, কিন্তু তাহার সঙ্গ লোভনীয় মনে করে না। সুতরাং কলিকাতায় তাহার কেহ বন্ধু বা সঙ্গী ছিল না। সে মোটা থান পরে, মোটা থানের চাদর গায়ে দেয়, চটি পরে; সুতরাং সে কলিকাতার বাবুর দলে মিশ খাইত না। আবার বাহিরের সাদৃশ্যে যাহাদের সহিত মিলিতে পারিত সেই-সব সংস্কৃত কলেজের ভট্টাচার্য্য ধরণের ছাত্ররা তাহার মতের সৃষ্টিনাশা উগ্রতা দেখিয়া তাহার কাছে ভিড়িত না।

নবকিশোর যখন ত্রিশঙ্কুর মতো মধ্যপথে স্থগিত নিরবলম্ব, তখন তাহাকে বাবু ও ভট্টাচার্য্য দলের মধ্যবর্ত্তী একজন আসিয়া গেরেপ্তার করিল। সে তারক, নবকিশোরেরই সহপাঠী। তাহার চেহারাটি ভয়ানক শীর্ণ, কঙ্কালের উপর শুধু যেন একখানি পাতলা নরম চামড়া জড়ানো আছে; তাহার কোটর-প্রবিষ্ট বড় বড় গোল গোল চোখ দুটি অর্থ-হীন হাসিতে উজ্জ্বল; বড় বড় দাঁতগুলি সদাবিকশিত; তাহার গাল দুটি তোবড়ানো বলিয়া হনু ও চোয়ালের হাড় অত্যন্ত উঁচু ও চওড়া দেখায়; তাহার পরণে থান, গায়ে চায়না কোট—গ্রীষ্মে লংক্লথের, শীতে আল-পাকার—তাহার উপর কোঁচানো চাদর দড়ির মতন পাকাইয়া গলায় মালার মতন করিয়া বাঁধা থাকে, পায়ে পেনেলার জুতো, মাথার সামনে টেড়ি, পিছনে টিকি, গলায় তুলসী

কাঠের মালা জামার তলে প্রায় ঢাকা, তাহার গ্রন্থিল তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর তারের পুঁঠে-দেওয়া একটি আংটি চল্‌চল্‌ করিতেছে। তারক বাহ্য আকারে যেমন দুই প্রাচীন ও নব্য দলের সমন্বয় করিয়াছিল, ভিতরেও সে তেমনি—বচনে ভয়ানক সনাতন-ভক্ত, শাস্ত্র ও ঋষি ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই, কিন্তু সুবিধা-মত প্রাচীন ও নবীন বিধি নির্ব্বিচারে পালন করিত। সে নবকিশোরকে বেশে একেবারে প্রাচীন ও মতে অতীব নবীন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখিয়া ভাবিল নবকিশোরও হয়ত তাহারই ন্যায় দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিবার মতন বুদ্ধিমান্। কিন্তু সে নবকিশোরকে নিজের দলে টানিতে আসিয়া দেখিল যে নবকিশোর একটি আস্ত গোঁয়ার, তাহার মধ্যে মানাইয়া রফা করিয়া চলিবার ভাব এতটুকু নাই। তারকের কাছে নবকিশোর যতই দুর্ব্বোধ হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সে ততই নবকিশোরের সঙ্গ চাপিয়া ধরিতে লাগিল, নবকিশোরকে তাহার বুঝিতেই হইবে। সে এলোমেলো তর্ক করিয়া নবকিশোরকে রাগাইয়া তুলিত এবং নব-কিশোর তাহার মুখের উপর তাহাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলে মুখে সে খুব ঘটা করিয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু নবকিশোরের স্বচ্ছ তর্কযুক্তির নিকটে পদে পদে পরাস্ত হইয়া মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

তারককে অপদার্থ জানিয়াও সঙ্গীহীন নবকিশোর তাহার এই অনুরক্ত অধ্যবসায়-শীল উপদ্রবটিকে প্রশ্রয় দিত এবং সহ্যও করিত। তাহার বুদ্ধিবিচারহীন তুমুল তর্কে বিরক্ত হইয়া নবকিশোর তাহার নাম রাখিল তাড়কা রাক্ষসী। এবং তারকের এই নাম তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পরিচিত মহলে এমন রটিয়া গেল যে তাহার পিতৃদত্ত নামের বদলে নবকিশোরের দেওয়া নামটিই বাহাল হইয়া গেল।

নবকিশোর যখন সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ ও বেদান্তের উপাধি লইয়া বাহির হইল তখন সে শুদ্ধিতত্ত্ব ও সংহিতার অনুশাসন নির্ব্বিচারে স্বীকার করিবার অবস্থা একেবারে কাটাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখনো তারক তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে আস্থাবান্ করিবার আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। সে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের সন্তানকে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইত; কিন্তু মনে করিত যে-ফলটা পচে তাহার খোসাতেই আগে পচন ধরে, নবকিশোর পোষাকে পরিচ্ছদে যখন এমন সনাতনী ধারা ধরিয়া রাখিয়াছে, তখন তাহার অন্তরটা এখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই জন্য ব্যথিত ও আশান্বিত হইয়া তারক এক-একদিন তর্কের মধ্যে তাহার কপালের শিরা ও কোটরগত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোরকে খৃষ্টান, ব্রাহ্ম বলিয়া গালি দিত। নবকিশোর তাহাতে একটুও রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিত—ও ত ঠিক গাল হল না! দেশে দেশে কালে কালে যে-সব মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে সমাজে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁরা ত শুধু সেই সেই দেশের বা কালের মধ্যেই আবদ্ধ নন; তাঁদের বাণীর যতটুকু সেই দেশের ও সেই কালের সঙ্গে জড়িত ততটুকু ছাড়া

তাঁদের সত্য বাণী শাশ্বত, তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তাঁরা সব জগৎগুরু। এই হিসেবে ঈশা মহম্মদ যেমন আমাদের পূজনীয়, বুদ্ধ নানক কবীর চৈতন্য তেমনি আবার খৃষ্টান মুসলমানেরও পূজার্হ। এঁরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে-সমস্ত মহাসত্য প্রচার করেছেন, তার মূল প্রস্রবণ এক; উপনিষদ ও বাইবেল, কোরান ও ভাগবত একই উৎসের বিভিন্ন ধারা। বিশেষ বিশেষ দেশে আবির্ভূত বলে' সেগুলি বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর ও সংস্কারগত সঙ্কীর্ণ আচারের বাহ্যিক আবরণে আচ্ছন্ন; এই জন্য বুদ্ধিমান্ সচেতন মনের যে ধর্ম্ম তা সকল সামাজিক ধর্ম্ম হতে স্বতন্ত্র, সে সকল ধর্ম্মের অন্তরের জিনিস, তাকে কোনো নামের গণ্ডি টেনে সঙ্কীর্ণ করা চলে না। আমার ধর্ম্মমতকে যদি কোনো নাম দিতে চাও ত হিন্দু নামই দিও, যেহেতু আমি হিন্দুস্থানের বিশেষ অবস্থার মধ্যে জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছি।

নবকিশোরের এই কথায় তারক একেবারে খেপিয়া গিয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিত। বেগতিক দেখিলে বিপিন মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে নিরস্ত করিত।

বিপিন বড় শান্তপ্রকৃতির চুপচাপ ধরণের লোক। সে অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়, একলা কোথাও যাইতে পারে না, নিজের চেষ্টায় সে একটা কাজ করিতে পারে না। এই জন্য নবকিশোর নহিলে তাহার একদণ্ড চলে না। নবকিশোর তাহার বন্ধু ও অভিভাবক দুইই।

বিপিন এরূপ পরনির্ভর মুখচোরা হইয়াছিল অবস্থার ফেরে। সে জমিদারের ছেলে; ছেলেবেলা হইতেই সে নিষেধের জালে জড়িত হইয়া কেবল শুনিয়াছিল সকলের সহিত তাহার মিশিতে নাই, কথা কহিতে নাই, যথায় তথায় যাওয়া তাহার উচিত নয়; কেমন করিয়া পদে পদে জমিদারী কায়দা বজায় রাখিয়া মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে হইবে তাহার জন্য তাহাকে তাহার অপেক্ষা সতর্ক ও বুদ্ধিমান্ লোকদের মতের ও ইঙ্গিতের উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। রাজপুরোহিত-বংশের অকার্য্য হইলেও নবকিশোর স্কুলে পড়িতে পাইয়াছিল, কিন্তু বিপিনের সে সৌভাগ্যও হয় নাই। চৌধুরী-গোষ্ঠীর আবহমান ইতিহাসের বিশ্বাস যে কালির আঁচড় কাটিলে ধার কর্জ্জ হয়। লেখাপড়া শেখার শ্রম স্বীকার করুক তাহারা যাহাদের খাটিয়া খাইতে হইবে। পায়ের উপর পা দিয়া মা-লক্ষ্মীর পেঁচার ডানার তলে যাহারা আরামে থাকিবার দিব্য সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহাদের লেখাপড়া শেখা শুধু পণ্ডশ্রম। প্রচুর আহার নিদ্রার পরও যদি সময় না কাটে তবে বড়মানুষের ছেলের আমোদ আহ্লাদের উপকরণের অভাব ত হইবার কথা নয়।

কিন্তু বিপিনের একমাত্র বন্ধু নবকিশোর যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইল তখন বিপিনও মায়ের কাছে স্কুলে যাইবার বাহানা ধরিল। বিপিনের এ অন্যায় আবদার কিন্তু রক্ষিত হইল না; সে তাহারই প্রজাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া সকলের সমানি হইয়া পড়িবে? এ হইতেই পারে না; প্রজারা পরে তাহাকে মানিবে না যে! বিপিনের আব্দারের রফা হইল

তাহাকে গৃহেই পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। চৌধুরী-বংশের মর্য্যাদা বড়, না, ছেলের আব্দার বড়!

বিপিনের চতুর্দ্দিকে নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তাহার দৃষ্টি একেবারে রোধ করিবার আয়োজনে তাহার অভিভাবকদের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। বাহিরের খবর দিয়া মধ্যে মধ্যে যা গোল ঘটাইত নবকিশোর। এইজন্য এই খাঁচার পাখী ও বনের পাখীর মধ্যে একটি বড় ঘনিষ্ঠ যোগ জন্মিয়াছিল। নিরেট নিষেধের প্রাচীরের ছোট ছোট ঘুলঘুলি দিয়া বিপিনের মনের উপর যেটুকু বাহিরের আলো আসিয়া পড়িতেছিল তাহারই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে আপনার সমস্ত বুদ্ধিটিকে মেলিয়া ধরিতেছিল; ইহাতে তাহার মন সচেতন হইয়া তাহার আশেপাশের তুচ্ছতম ঘটনাও ত্যাগ করিত না। তাহাতে তামসিক পরিবারের মধ্যে থাকিয়া সে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল যাহা তাহার বয়সে তাহার জানা উচিত ছিল না। অথচ তাহার শান্ত প্রকৃতি ও নবকিশোরের স্বচ্ছ দৃপ্ত চরিত্র তাহাকে এজন্য সঙ্কুচিত করিয়াই তুলিত।

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে বড়মানুষের আদুরে ছেলে বিপিন বর্দ্ধিত হইয়া বড়ই ভাবপ্রবণ ও আবেগময় হইয়াছিল। প্রতি পদে পরের খেয়াল-মত চলিতে চলিতে এবং কথায় কথায় রফা মানিতে মানিতে তাহার মন পরের উপর এমন নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল যে সে নিজের চেষ্টায় কোনো কাজই করিতে পারিত না; কিন্তু কোনো গতিকে তাহার ইচ্ছাশক্তি একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাহাকে রোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নবকিশোর ছিল তাহার ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া দিবার পাণ্ডা।

বিপিন প্রাইভেটে এণ্ট্রান্স পাশ করিতেই নবকিশোর বিপিনকে কলিকাতায় যাইয়া পড়িবার পরামর্শ দিতে লাগিল। বিপিনের পিতার অনেক আপত্তি ও তাহার মাতার অজস্র অশ্রু অগ্রাহ্য করিয়া বিপিন গোঁ ধরিয়া রহিল সে কলিকাতায় পড়িতে যাইবেই।

বিপিনের পিতা হরিবিহারী হাল্কা ছিপছিপে ছোটখাটো গৌরবর্ণ লোকটি; আপনার খেয়াল-মত নেশা ভাঙ করিয়া চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেই ভাল বাসিতেন, কোনো ঝঞ্ঝাটে থাকিতে চাহিতেন না। জমিদারী দেখিত দেওয়ানজী, সংসার দেখিতেন গিন্নি, আর তাঁহাকে দেখিত তাঁহার খানসামা গোলোক, সুতরাং তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট। সুতরাং বিপিনকে দু চার বার বারণ করিয়া শেষে "তোমাদের যা খুসী কর" বলিয়া তিনি একেবারে সরিয়া গেলেন।

কিন্তু গিন্নির অশ্রু কিছুতেই বারণ মানিতেছিল না। বিপিনের মা যেদিন মারা যান সেদিন যে তিনি বিপিনকে তাঁহারই হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বিপিনকে কোলে পাইয়াই প্রথম তিনি মা হইয়াছিলেন; আজ এই আঠার বৎসর যাহাকে কোল-ছাড়া করেন নাই আজ তাহাকে একাকী বিদেশে পাঠাইতে তাঁহার মন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। বিপিনেরও মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছিল, কিন্তু বন্দীদশা হইতে

মুক্তি পাইবার আনন্দ সে বেদনাকে প্রবল হইয়া উঠিতে দিতেছিল না।

বিপিন কলিকাতায় আসিয়া বাহিরের সহিত প্রথম পরিচয়ে বাহিরকে লজ্জিতা নববধূর মতো ভালো বাসিল; কিন্তু সঙ্কোচে সে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বাহিরকে দান করিতে পারিল না। ইহা তাহার পক্ষে কল্যাণের কারণই হইল।

বিপিনকে কলিকাতায় পাইয়া নবকিশোরও বাঁচিয়া গেল। সে তারকের সঙ্গে অবিশ্রাম তর্ক করিতে করিতে যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন সে বিপিনের শান্ত স্নিগ্ধ আলাপে তৃপ্তি খুঁজিত। বিপিন নবকিশোরের ন্যায় তার্কিক নয়। সে চিরকাল পরের মতেই মত দিয়া অভ্যস্ত; তাহার একমাত্র বন্ধু নবকিশোরের মত মানিয়া লওয়া সুতরাং তাহার পক্ষে বিশেষ কঠিন বোধ হইত না। তবু যে সে মধ্যে মধ্যে এক আধবার প্রতিবাদ করিত তাহা তাহার আবাল্যের সংস্কার হইতে নবকিশোরের মত এখন একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার মত ও সংস্কার তাহার আবাল্যের পরিবেশ ছাড়াইয়া একেবারে নূতন পথে ছুটিয়াই চলিতেছিল। দুই বন্ধুতে নূতন মতের তর্কের চকমকি ঠুকিয়া মাঝে মাঝে আপনাদের চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া খেলা করিত; তাহাতে যে নিজেরই ঘরে আগুন লাগিতে পারে এমন আশঙ্কা কখনো কখনো তাহাদের মনে হইলেও ঘরের আগুনে পথ আলো করিবার মোহ তাহাদিগকে খেপাইয়া তুলিত; তাহাদের ভাবপ্রবণ তরুণ হৃদয় আগুনের ফুলকির মতনই স্বাধীন আনন্দের উজ্জ্বলতায় ক্ষণে ক্ষণে আপনাদিগকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকিত।

(৫)

মথুরাপুরের চৌধুরী-পরিবারে যখন বিপিনের খুড়িমার বোনঝি মালতীকে আশ্রয় দিবার ব্যাপার লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছিল তখন নবকিশোর ও বিপিন দুই বন্ধু কলিকাতার বাসায় পরম নিশ্চিন্ত মনে রাস্তার ধূলা ও বাতাসের ধোঁয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জন্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লইয়া পরম উৎসাহে আলোচনা করিতেছিল। এবং তাহাদের পরম অবজ্ঞাভাজন চিরসহিষ্ণু নিত্যসহচর তারক তাহার মত কেহ গ্রাহ্য করুক আর না করুক সে বিষয়ে একেবারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উভয় বন্ধুর তর্কের মাঝখানে পড়িয়া বাধা দিতে কিছুমাত্র অবহেলা করিতেছিল না।

প্রাতঃকাল। শরতের সোনালি রৌদ্র খোলা জানলা দিয়া ঘরের ফরাশে আসিয়া পড়িয়াছে; ঘরের যেখানে যেখানে দেয়াল ফরাশের উপর সেখানে সেখানে ছায়া, আর জানলার ফাঁকে ফাঁকে সোনালি রৌদ্র, তাহার বুকে আবার গরাদের ছায়ার ডোরা-কাটা; যেন একখানি রৌদ্রছায়ার ডোরা-কাটা শতরঞ্জ বিছানো রহিয়াছে। জানলার নীচেই একটি শিউলি গাছের তলায় ঝরাফুলে শারদলক্ষ্মীর শয্যা পাতা হইয়াছে; শিউলি ফুলের মধু পরিমল স্নিগ্ধ বাতাসে স্পর্শ বুলাইতেছে। ভিখারী করতাল বাজাইয়া মোটা ভাঙা গলায় গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে আগমনী গান শুনাইয়া বেড়াইতেছে, এবং ভিক্ষা পাইলেই সমের অপেক্ষা না করিয়াই

যেখানে সেখানে হঠাৎ গান থামাইয়া অন্যত্র ভিক্ষার অন্বেষণে চলিয়া যাইতেছে। রাস্তায় ফেরিওয়ালারা বিচিত্র স্বরভঙ্গী করিয়া নিজ নিজ পণ্য হাঁকিয়া ফিরিতেছে।

বিপিন একখানি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া প্রসারিত পা চটিজুতার উপর রাখিয়া শেক্সপীয়রের মার্চাণ্ট অফ ভিনিস পড়িতেছিল; অগ্রহায়ণ মাসে তাহার এম-এ পরীক্ষা। নবকিশোর পাশের ফরাশের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। অনেকক্ষণ পাঠ্য পুস্তকের টীকা ভাষ্যের খুঁটিনাটি পড়িতে পড়িতে বিপিনের বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে বলিল—ওহে কিশোর, কাগজখানা দাও ত একবার, দুনিয়ার খবরটায় চোখ বুলিয়ে নি।

নবকিশোর তাহার দিকে বক্রদৃষ্টি হানিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—না না, এখন পোর্শিয়ার খবরদারী কর; খেয়ে দেয়ে দুনিয়ার খবরদারী কোরো 'খন।

বিপিন বন্ধুকে চিনিত। তাহার বন্ধু ত শুধু নর্ম্মসহচর নয়, সে যে আবার অভিভাবকের মতন গম্ভীর হইয়া চোখও রাঙায়। নবকিশোরকে গম্ভীর হইয়া কথা কহিতে দেখিয়া বিপিন আর কাগজ চাহিতে পারিল না; অথচ পাঠ্য পুস্তক পড়িতে আর কিছুতেই ভালো লাগিতেছিল না; তাই সে হাসিয়া নবকিশোরের কথার উত্তরে বলিল—পোর্শিয়ার খবরদারী কাউকে করতে হয় না, সে-ই কত লোকের খবরদারী করে' বেড়াচ্ছে! এইজন্যে ত পোর্শিয়া-চরিত্র আমার তত ভালো লাগে না।

আর যায় কোথায়! তর্কের গন্ধ পাইয়া নবকিশোর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—কেন?

—ওকে আমার কেমন মন্দা মন্দা ঠেকে। নারীত্ব যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

—কি হলে ভালো হত? নোলক-পরা, প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে বাঙালীর ঘরের খুকী বৌটির মতন? স্বামীর বন্ধুর বিপদে উদাসীন, বড় জোর কেঁদে কেটে হাট বাধানোতে তার ক্ষমতা আর সহৃদয়তার চূড়ান্ত পরিচয়! কেমন?

বিপিন হাসিয়া বলিল—তা বলে' কি গৃহলক্ষ্মী কোমর বেঁধে মকদ্দমা করতে যাবে?

নবকিশোর জোর দিয়া বলিল—দরকার হলে যেতে হবে বৈ কি। ঝান্সীর রাণী, রাণী দুর্গাবতী, জোয়ান অফ আর্ক প্রভৃতি রমণীরা যুদ্ধ করেছিলেন বলে কি আমরা তাঁদের বেশী রকম শ্রদ্ধা করি না? কেন? না, এঁরা নিজের হাতে নিজেদের দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন! আর তার উল্টো দিকে আমাদের খুড়িমার ব্যাপারটা দেখ,—ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত যারা করলে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু প্রতিকার করতে পারা দূরে থাকুক একটু আশ্রয় আর এক মুঠো অন্নের জন্যে উল্টে তাদেরই কাছে ভিক্ষার অপমান স্বীকার করতে হল! এর চেয়ে অক্ষমতার লজ্জা আর কি হতে পারে? সমস্ত দেশটা ক্লীব হয়ে উঠেছে, তাই অপমান সহ্য করাকে মনে করে ক্ষমা; নারীদের দুর্গতিকে মনে করে গৃহলক্ষ্মীর আদর্শ! ধিক্ থাক এমন নির্জ্জীব মনের পুঁথিপড়া বড় বড় অর্থহীন কথায়!

নবকিশোরের বজ্রকণ্ঠের নির্ঘোষে ঘর গমগম করিতে লাগিল। বিপিন পিতার অন্যায় আচরণের প্রসঙ্গে লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিল। নবকিশোর উত্তেজনার ঝোঁকে একাকীই অনর্গল বক্তৃতা চালাইতে পারিত, কিন্তু দরোয়ান দুইখানি চিঠি আনিয়া বাধা জন্মাইল। বিপিন মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল।

একখানি চিঠি বিপিনের, অপরখানি নবকিশোরের; উভয়ের পিতা লিখিয়াছেন।

পত্র পড়া শেষ করিয়া নবকিশোর বিপিনের পায়ে পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—এই দেখ আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের দুর্দ্দশা!

বিপিন সেই পত্র পড়িয়া দেখিল স্মৃতিরত্ন মহাশয় নবকিশোরকে মালতীর অবস্থা ও আশ্রয়প্রার্থনার ব্যাপার আগাগোড়া খুলিয়া লিখিয়াছেন। বিপিন এক দিকে মাতার আচরণে যেমন অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইল, অন্য দিকে তেমনি নির্য্যাতিতা খুড়িমা ও তাঁহার নিরাশ্রয়া বোনঝি মালতীর প্রতি সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। বিপিন পিতা ও মাতার সমস্ত অন্যায় আচরণের কৈফিয়ৎ স্বরূপ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—খুড়িমার বোনঝিকে তোমার সঙ্গে মথুরাপুরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে বাবা আমায় এই চিঠি লিখেছেন।

নবকিশোর এ কথায় কান না দিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—দেখেছ, দেখেছ, আমাদের কাণ্ডখানা দেখেছ! আমরা আর্য্য বলে বড়াই করি, কিন্তু কার্য্য করি কশাইয়ের! এই যে মালতী আজ পরের বাড়ী দাসী হতে চলেছে, এর চেয়ে কি তার বিয়ে হওয়া ভাল নয়? তুমি আবার বল কিনা বিধবা-বিবাহ গর্হিত!

নবকিশোরের চক্ষুদুটি আবেগে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপিন তাহার উত্তেজনার সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—গর্হিত ঠিক বলিনে; আমি বলি, বিধবার স্বামীস্মৃতিকে সামনে রেখে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ আদর্শ!

—মানি বিধবার সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বিপত্নীকেরও আদর্শ সেই রকমই! কিন্তু যে কাজে অন্তর থেকে কোনো প্রেরণা আসে না, শুধু বাইরের চাপে করতে হয়, তেমন ধর্ম্মসাধনও যে ব্যর্থ! আমরা সচেতন ভাবে কি কিছু করতে জানি? ধর্ম্মবিধি, সমাজবিধি, সবই অন্ধের মতো অভ্যাসের বশে শুধু পালন করে চলেছি—কারণ এমন না করে' অমন কেউ কোনো দিন করে না, বাপ পিতামহের আমল থেকে এমনি ধারা চলে আসছে। আরে, একবার ছাই ভেবেই দেখ, কেন তাঁরা অমন না করে' এমন করতেন? ভগবান আমাদের মাথার মধ্যে মগজ বলে' এতখানি পদার্থ যে পূরে দিয়েছেন, তা কি শুধু গাধার মতো ভার বহনের জন্যে, কাজে খাটাবার জন্যে একটুও নয়? পাছে বুদ্ধি খরচ করে' দেউলিয়া হয়ে যাই, সেই ভয়ে বাপ-পিতামর সঞ্চিত ধনের সুদের ওপরই আমাদের ভরসা; তা তাতে আধপেটাই খাই আর অনাহারে মরি, নতুন ব্যাপারে খাটাতে আমাদের সাহসই হয় না!

বিপিন বলিল—তুমি কি মনে কর সমাজের সকল লোকই চিন্তা করে' কাজ

করতে পারে? যার বুদ্ধি শিক্ষা-দ্বারা মার্জ্জিত হয়নি, তার যে নিজের বুদ্ধিতে চলতে গেলে পদে পদে ভুল হবে।

—আরে ভুলই করুক! ভুল না করলে সত্যের পরিচয় পাবে কেমন করে'। অতি বিজ্ঞ সাবধানী জাত আমরা ভুলও করিনে, সত্যেরও সন্ধান পাইনে! আর শিক্ষার কথা বলছ, সে ব্যবস্থাও ত করতে হবে তোমাদেরই, তোমরা যারা শিক্ষার স্বাদ পেয়েছ; আরো বিশেষ করে' তোমাদের মতো শিক্ষিত ধনীদের; কিন্তু যতদিন তা না ঘটছে, ততদিন জড় হয়ে না বসে থেকে, নিজের অশিক্ষিত বুদ্ধিতে চলে' সচেতন ভাবে যদি ভুলও করি তাও ভালো, তাতে ভুল সংশোধন করবার মতন বুদ্ধিশক্তি আমাদের মধ্যে ক্রমশ সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। যেমন ধর, আমাদের দেশের অশিক্ষিত মেয়েরা পর্য্যন্ত জানে যে ভগবান এক দিকে অন্তর্য্যামী, আর অন্য দিকে সর্ব্ব-ব্যাপী; কিন্তু এই বোধ সচেতন নয় বলে' বিশ্বমন্দিরের বিচিত্রতা আর মনোমন্দিরের নিগূঢ়তার মধ্যে তাঁর সন্ধান না করে' আমরা মানুষের গড়া মন্দিরে মন্দিরেই শুধু তাঁকে সন্ধান করে ফিরি; বিশ্বরূপে তাঁর প্রকাশ না দেখে বিশেষ শিলায় বা বিশেষ মূর্ত্তিতেই তাঁকে দেখতে চাই। এমনি অন্ধভাব গৃহস্থালীর আচার অনুষ্ঠান শুচিতা সকল সম্বন্ধেই দেখা যায়।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—এ সব সংশোধন করবে এমন শক্তিশালী কে?

—তুমি, আমি, আর যাদের মধ্যে এই অভাব বোধ জেগেছে! এই জন্যেই ত জ্ঞানের আলোক বিস্তার করা প্রয়োজন, সকলকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা কি এক হওয়া উচিত।

—খানিকটা এক হওয়া উচিত বৈ কি। নইলে হয় কি জানো? বৃদ্ধ বিপত্নীক হলেই তাড়াতাড়ি আর একটি বিয়ে করেন, কারণ তিনি রেঁধে খেতে বা ঘরকন্নার কাজ করতে জানেন না; আবার বালিকা বিধবা হয়ে তাকে পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, সে যে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেকে সামলাতে কখনো শেখে নি। ধর যেমন মালতী। তার বহিঃসংসার দেখবার মতন কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই, সে শুধু অন্তঃপুরের শিক্ষা নিয়ে করবে কি? তার বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে হয় বাইরের সংঘাতের সঙ্গে লড়াই করবার উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হবে, নয় অপরের অন্তঃপুরে আশ্রয় নিতে হবে। অন্তঃপুরে আশ্রয় মিলতে পারে দু রকমে—এক বাড়ীর বৌ হয়ে, নয় অপর বাড়ীর দাসী হয়ে। দাসী হওয়ার চেয়ে বৌ হওয়া ঢের সম্মানের, নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। এককালে ছিল যখন বিধবা পিসি বোন ভাই ভাইপোর বাড়ীতে থাকতেন সকলকার ওপর কর্ত্রী হয়ে, কিন্তু এখন আর সেদিন নেই, সমাজের অবস্থা বদলে গেছে; তাই এখন বিধবাদের হয় স্বতন্ত্র হয়ে আপন মর্য্যাদা বজায় রাখতে হবে, নয় পরের গলগ্রহ হয়ে দাসীপনা করতে হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, হয় বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত, নয় মেয়েদেরও শিক্ষায় সাহসে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া উচিত। বিশেষ ত যারা মালতীর মতো পরাধীনের অধীন হতে যাচ্ছে।

বিপিন জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি

ত জানো কিশোর, খুড়িমার মন থেকে সমস্ত গ্লানি মুছে দেবার জন্যে আমি তাঁকে কত ভক্তি করি, যত্ন করি। মালতীও যাতে পরের গলগ্রহ বলে না মনে করে তা আমি করব। মালতীর কাছে তুমি কখন যাবে?

নবকিশোর বলিল—বিকেল বেলা যাওয়া যাবে এখন।

—খুড়িমা মালতীকে কিছু লেখেন নি, হঠাৎ তুমি তাকে আনতে গেলে সে অবিশ্বাস করতে পারে। চিঠি দুখানাই সঙ্গে নিয়ে যেয়ো, যদি দরকার বোঝো পড়তে দিয়ো; দুখানা চিঠি পড়লে আর কিছু সন্দেহ থাকবে না।

—তাই হবে। এখন নেয়ে খেয়ে নেবে চল। সকাল বেলাটা ত তর্কে কাটল। দুপুর বেলাটা পড়তে হবে তোমায়। মালতীর বাড়ী থেকে ফিরতে ত আমাদের রাত হবে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, আমি সেখানে যেতে পারব না, তুমিই একলা যেয়ো। অচেনা মেয়ে-লোকের সামনে.....

নবকিশোর হা হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—চিরকালই কি তুমি এমনি মুখচোরা থাকবে? যে অচেনা মেয়েটি তোমার বৌ হয়ে আসবে তার কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা করবে নাকি?

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, আমি যেতে পারব না, তুমি একলাই যেয়ো।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৩)

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্ম্মপাঠশালা খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে সমস্বরে পাঠ করান হইত। যেখানে এক সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলে বেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিত। তখন তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও খুব খুশী হইতেন। শীতকালে এক একদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় আসিয়া জ্যোতিবাবুকে শয্যা হইতে

উঠাইয়া লইয়া তিনি প্রত্যূষভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তখনকার কালে শীতকালেই সকলে morning walk করিত। বেশ করিয়া শীতবস্ত্র চাপাইয়া ও গলায় comforter জড়াইয়া ৩।৪টা রাত্রে বেড়াইতে বাহির হইতেন; এবং Race course প্রভৃতি ঘুরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইহারা ফিরিতেছেন, কেশব বাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক একদিন Eden's Park-এ যখন পৌঁছিতেন, তখনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার challenge করিয়া বলিত—"হুকুম্—সদর" (who comes there?)। পথে বাহির হইয়া কি করিতেন,—তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাবু বলিলেন, "বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে নানারূপ ছেলেমানুষী বাক্যালাপ ও হাস্যকৌতুক সুরু করিয়া দিতাম। তাই পথের শ্রান্তি আদৌ অনুভব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই খেলা হইল—কে আগে কয়টা গ্যাস-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব দ্রুত চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা" অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, তারই জিত হইত।



অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

"তখন শীতকালেই morning walk হইত এবং শীতকালেই আমাদের চা'য়ের বরাদ্দ ছিল। এ চা চীনদেশের চা—তখনও আসামের চা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নি। সে চা'য়ের কি সুগন্ধ! আমাদের অন্তঃপুরের রক্ষক একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ লাঠিয়াল্ সর্দ্দার ছিল। সকলের চা'য়ের পেয়ালায় যে চা'টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া সে চক্ষু মুদিয়া অতি আরামে খাইত। তখন বাহির মহলে হিন্দুস্থানী দরোয়ান্ ও অন্দর মহলে বাঙ্গালী সর্দ্দার পাহারা দিত। সর্দ্দার রাত্রে ডাকাতি হাঁকের মত যখন হাঁক দিত, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিত।"

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক

বেতনে নিযুক্ত থাকিত—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী ডাক্তার। গুরুতর রোগ না



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হইলে সাহেব ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব ডাক্তারের উপর তখন সকলের অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্প বেতনের হাতুড়ে ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অনুসারে নিজের হাতে ঔষধপত্র দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। জ্যোতিবাবুদের আমলে পীতাম্বর নামে একজন বৃদ্ধ এই ছোট ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল্প শুনিতেন। তাঁহার বগলে, কাপড়ে মোড়া খোপকাটা একটা টিনের বাক্স থাকিত। সেই সব খোপে নানা রকম রঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোঁড়া পাঁচড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্যই বোধ হয় এইরূপ নানা রঙের মলম তিনি রাখিতেন।

জ্যোতিবাবুদের সময়ে এ বাড়ীতে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং সাহেব ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত বেলি। ডাক্তারদের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মৃতি এইরূপ:—"আমাদের জ্বর হইলে দ্বারিবাবু প্রথম দিন আসিয়াই দীর্ঘচ্ছন্দে বলিতেন "তে—ল্"। অর্থাৎ Castor Oil—এই তেলের নাম শুনিলেই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইত। তাঁর চিকিৎসায় একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল; ফলে এইরূপ চিকিৎসার নিয়মেই তিন দিন বড় জোর সাত দিনের মধ্যেই আমরা খাড়া হইয়া উঠিতাম। চিকিৎসার ঔষধ যেমন তিক্ত, পথ্যও তেমনি অরুচিকর ছিল। "জল সাবু" "চিনির মুড়্কী" "এলাচ দানা" ইত্যাদি। তখন ব্রাহ্মণের দোকানের খট্‌খটে একরকম বিস্কুট হইত, কখন কখন সেই বিস্কুট। আর তৃষ্ণা পাইলে গরম জল। ৺ দ্বারিকানাথ গুপ্তের জ্বরের ঔষধই এখন "ডি, গুপ্তর মিক্‌শ্চার"—চলিত কথায় ডি, গুপ্ত ঔষধ নামে বিখ্যাত। শুনিতে পাই বেলি সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অনুসারেই দ্বারি বাবু নাকি জ্বরের এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। রাত্রে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে গেলে,

তাঁর স্ত্রী তাঁহার উপর খড়্গ-হস্ত হইতেন কিন্তু আমাদের বাড়ী হইতে কেহ গেলে, তিনি স্ত্রীর কথা শুনিতেন না; বলিতেন 'Governor তাঁর হস্তে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া শিমলা-পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কিছুতেই কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারিবেন না।' বেলি সাহেব শিশু রবীন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতেন, দেখা হইলেই তিনি রবিকে "Robin, Robin" করিয়া আদর করিতেন।"

তৎকালীন কলিকাতা সহরের এবং পানীয় জলের দুরবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মরণ আছে যে "তখন কলিকাতায় খোলা নর্দ্দমা ছিল। চারিদিকেই দুর্গন্ধ। তখন গঙ্গায় সহরের ময়লা ফেলা হইত—গঙ্গার জলে সর্ব্বদাই ময়লা ভাসিত। কিন্তু গঙ্গা স্নানের সময় সেই সব ময়লা ও তজ্জনিত দুর্গন্ধসত্ত্বেও আমাদের চির সংস্কারবশত কিছুই মনে হইত না। অভ্যাস ও সংস্কারের এমনি মাহাত্ম্য! সন্ধ্যার আরম্ভেই মশকের ঝাঁক চক্রাকারে মাথার উপর ঘুরিতে ঘুরিতে বোঁ বোঁ শব্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিত। সে মধুর সঙ্গীত এখন আর শোনা যায় না। তখন বেচারারা নিশ্চিন্ত ছিল—তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া তখনও কামান্ পাতা হয় নাই।

"তখন কলের জল ছিল না। লালদীঘি হইতে পানীয় জল আসিত। মাঘ মাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাখা হইত। তাহাতেই সম্বৎসর কায চলিয়া যাইত। তখন আমাদের বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। আমার দাদামহাশয় স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুর গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে এক থোকে কিছু টাকা দিয়া গঙ্গা হইতে আমাদের পুকুর পর্য্যন্ত একটী পাকা লহর কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই লহর দিয়া গঙ্গার জল আনা হইত। ঝর্ণার মত ঝর্ঝর্ করিয়া সেই ফেনিল শুভ্র জল যখন পুকুরে আসিয়া পড়িত তখন আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। এখনকার ম্যুনিসিপ্যালিটি কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়া দিয়া এই লহর এখন উঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একজন মালিনী ছিল সে প্রতিদিন ফুল যোগাইত। অন্তঃপুরের জন্য ফুলের মালা এবং বাবুদের গুড়্গুড়ির মুখনলের জন্য ফুলের ভূষণ সে নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইত। "হুঁকা বর্দার্" বলিয়া তামাক সাজিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত, জ্যোতিবাবু বলেন "বাস্তবিক তাহার-সাজা তামাকের ধূমোত্থিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিত।" একজন "ভবিষ্যযুক্ত" তিলক-কাটা বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী আসিতেন, তিনি অন্দরে মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতেন। গিব্রেল্ নামে একজন ইহুদী ছিল, সে আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য সরবরাহ করিত। সে এ বাড়ীর বড়ই অনুগত ছিল, সকল ক্রিয়াকর্ম্ম আমোদ উৎসবেই সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যোগ দিত। তাহাকে দেখিলেই জ্যোতিবাবু আতর চাহিতেন, সে অমনি একটু তুলায় আতর লাগাইয়া ইঁহাকে দিত। 'বাচ্চা' বলিয়া এক জন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে বেদানা পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত সে ছেলেদিগকে তার ঝুলির ভিতর ভরিয়া লইয়া

যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইত—এজন্য ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউরীতে দরোয়ান্ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের (Drawing Room) দরজায় এক একজন হরকরা থাকিত। কোনও অভ্যাগত অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি আসিলে সেই হরকরা গিয়া সংবাদ দিত। কোনও ভৃত্যকে ডাকিতে হইলেও সেই ডাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশ বিছানা, তাকিয়া, আলবোলা, গড়গড়ি, সেজওয়ালা একটা উঁচু বসিবার আসন থাকিত—তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও সোসাইটিগণ বসিত। এরূপ বিছানা এখন বিবাহ সভায় বরের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, এই সবই ছিল সেকেলে' নবাবী আমলের চা'ল ও কায়দা।

উক্তরূপ মুসল্মানী সভ্যতা এবং এখনকার ইংরাজী সভ্যতায় তখন যে এক সংঘাত চলিতেছিল, তাহার বিষয়ে জ্যোতিবাবু বলেন যে "তখন মোগলাই সভ্যতার সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চলিতেছিল—দেখা যাইতেছে জয়ী হইয়াছে ইংরাজী সভ্যতা। বৈঠকখানার সে গদীপাতা বিছানা উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে আসিয়াছে Drawing Room-এ কৌচ্ কেদারা। তখনকার aristocracyর ভাবটা গিয়া এখন (সাম্যের যুগে) democracyর spiritটাই প্রবল হয়েছে। এরূপ aristocracy যে শুধু আমাদের বাড়ীতেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে,—তখনকার সকল বড়লোকদের ঘরেই এই একই প্রথা ছিল। কিন্তু মহর্ষির কক্ষটি অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সজ্জিত ছিল—সেখানে আসনের উচ্চ নীচ কোন পার্থক্যই ছিল না। ব্রাহ্মসমাজই আমাদের পরিবারের মধ্যে democracy-র ভাবটা আনিয়াছে। পূর্ব্বে এ ভাবটা ছিল না!

"দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন আঘাত করিতেছিল আমরা সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে পোষাক ছিল চোগা, চাপকান্, কাবা, পাগড়ী; এখন হ্যাটকোট, ওয়েষ্টকোট এবং পেণ্টুলন। ভাষায় পূর্ব্বে ফারশী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী। বড়মানুষী আহার তখন ছিল কালিয়া পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রকমের, এখন ইংরাজী মতে চপ কাট্লেট্ পুডিং রোষ্ট্ হইয়াছে। গৃহসজ্জাও তদ্রূপ, আগে বলিয়াছি। কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে কোন'টিই একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সভ্যতাই আমাদের হিন্দু সভ্যতার উপর এক একটা পলি বা স্তর রাখিয়া গিয়াছে। কাযেই হিন্দু মুসলমানী এবং ইংরাজী এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে, আর যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে। এ সন্ধির ভাবটা এখন আমাদের সব কাযেই প্রকাশিত হইতেছে। যেমন হিন্দুমতে পূর্ব্বে নামের আগে "শ্রীযুক্ত" লেখা হইত; মুসলমান আমলে আসিলেন "বাবু"। যখন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপে

সম্মান দেখাইতে হইত, তখন লেখা হইত "শ্রীযুক্ত বাবু" তারপর ইংরাজী মতে আসিল "Mr." এবং "Squire"। শেষোক্ত কারণে এখন Mr. বা Esqrই প্রযুক্ত হয়। হিন্দু "শ্রীযুক্ত" এবং মুসলমান "বাবু" বেশ একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল; মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া "শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুক চন্দ্র অমুক এস্কোয়ার হইতে পারিত কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়াই "বাবু"কে অত্যন্ত অনাদর অবহেলা ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তাই "বাবু" অভিমানে এখন গা ঢাকা দিয়াছেন; বাবু অন্তর্হিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বেশ ত্র্যহস্পর্শ হইয়াছে। এখন খুব ভাল ভোজ দিতে গেলে, হিন্দুমতে শাক্ শুক্তানী, মোগলাই মতে কালিয়া পোলাও, এবং ইংরাজী মতে চপ্ কাটলেট্-এর আয়োজন করিতে হয়। পোষাকেও তাই—ধুতি চাদর, চাপকান এবং মোজা ক'লার (Collar)।"

এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ইংরাজী ফ্যাশানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দু'টি বড় বড়, চেহারাটী দোহারা। তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা' ভাঙা'। আমার মনে পড়ে একদিন তিনি তাঁর "মেঘনাদ বধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁর সেই ভাঙ্গা-গলায় পড়িয়া সারদা বাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদ বধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক রকম। প্রত্যেক কথাটী স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবী—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোনপ্রকার ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। কিন্তু তিনি অতি সহৃদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্পগুজবও বেশ করিতে পারিতেন।

"মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাযেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, কাব্যখানির উপর তিনি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাই জানিতে পারিয়া —"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copy right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্য-খানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নবাব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রীতি-ভোজ।

দ্বার-রক্ষক কার্ডখানি টেবিলে রাখিয়া কহিল, "মস্থ বার্ণার্ড জাঁস্থলে।"

সজ্জিত কক্ষে আলাপ-রত নর-নারীর দল নামটা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে জাঁস্থলের হাত ধরিয়া সস্মিত মুখে কক্ষে যখন তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন, তখন চারিধারে একটা কৌতূহলের ঢেউ ছুটিয়া গেল। জাঁস্থলে! এই সেই নবাব—টাকার যাহার অন্ত নাই! পারি সহরটাকে স্বর্ণমুদ্রায় মুড়িয়া ফেলিতে পারে, এত যাহার অর্থ! এমন লোকের

পানে কে না চাহিয়া দেখে! মাদাম জেঙ্কিন্স কহিলেন, "আজ যে আমাদের কি অনুগৃহীত করলেন—আমাদের আপনি চিরকালের জন্য কিনে রাখলেন!" গর্ব্বে জেঙ্কিন্সের বুকখানা ফুলিয়া উঠিল—দীপ্ত নেত্রে চারিধারে তিনি একবার চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ, —সারা পারি বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে যাহার পানে চাহিয়া আছ, এই দেখ, সেই জাঁসুলে—সেই নবাব! সেই নবাব আজ আমার গৃহে অতিথি! আমি তাহার কতখানি প্রীতি-বন্ধুত্বের অধিকারী! নবাবের পিছনে পল্ হে গেরি আসিয়াছিল—তাহার পানে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। গেরি আশ্বস্ত হইল। বিলাস-দর্পের সভায় আপনাকে লইয়া সে কেমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল—সকলের লোলুপ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সারা পথ ধরিয়া একটা আদর-অভ্যর্থনার সমারোহ-আশঙ্কা করিয়া সে কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন নবাবের পানেই সকলের বিহ্বল দৃষ্টি সুদৃঢ় দেখিয়া সে যেন একটা অন্তরালের আশ্রয় পাইল। সেই অন্তরাল হইতে পারির সমাজটাকে একবার দেখিয়া লইবার সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া সে জুড়াইয়া বাঁচিল।

কৌতূহলের মাত্রা কমিতে না কমিতে আবার একটা তরঙ্গ উঠিল। আর্টিষ্ট ফেলিসিয়া আসিয়াছে। ফেলিসিয়া! ডাক্তার জেঙ্কিন্স আগাইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। নবাবের সহিত ফেলিসিয়ার পরিচয় করাইয়া দিতেও তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। গেরি চাহিয়া দেখে, নবাবের সম্মুখে বসিয়া এক তরুণী। তরুণী অপূর্ব্ব সুন্দরী! শুধু লাবণ্যই অপরূপ নহে,—সে মুখে কেমন-একটা ঔজ্জ্বল্য, সে চোখে স্নিগ্ধ কি-এক দীপ্তি! তরুণীকে দেখিলেই মনে হয়, ইহার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু আছে। গেরি মুগ্ধ নেত্র সরাইতে পারিল না, ফেলিসিয়ার পানেই চাহিয়া রহিল। আশপাশের লোকগুলা জনান্তিকে যে আলোচনার স্রোত বহাইল, তাহা হইতে গেরি জানিল, তরুণী ফেলিসিয়া এখনও কুমারী। গঠন-শিল্পে অদ্ভুত তাহার প্রতিভা! রূপের খ্যাতিও তাহার সমধিক! ফেলিসিয়া নবাবের সহিত কথা কহিতেছিল—কি কথা, তাহা গেরির কানে গেল না। আশপাশের কথাবার্ত্তাগুলাই তাহার কানে ঢুকিতেছিল।

"নবাবের সঙ্গে খুব যে ভাব জমে উঠল! ডিউক যদি এসে দেখতে পায়—"

"ডিউক আসবে না কি?"

"নিশ্চয়। তার জন্যেই ত ভোজের আয়োজন। নবাবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হল আসল উদ্দেশ্য।"

"হ্যাঁহে, কথাটা ঠিক কি—?"

"কি কথা?"

"এই ডিউক আর ফেলিসিয়ার মধ্যে—"

"তুমি যে আকাশ থেকে নেমে এলে! হুঁঃ—সারা সহর এ খপর জানে—আর গেল একজিবিসনে ফেলিসিয়ার হাতে-গড়া ডিউকের মূর্ত্তিটাও কি চক্ষে দেখনি? সেই থেকেই ত আলাপের সূত্রপাত—!"

"ডচেস্ জানে—!"

"যাক্,—থাম। মাদাম জেঙ্কিন্স গান ধরেছে—শুনতে দাও।" আলোচনা

থামিল। ওদিকে কক্ষ প্লাবিত করিয়া মাদাম জেঙ্কিন্সের সুর-তরঙ্গও উছলিয়া উঠিল। গেরি আরাম পাইয়া বাঁচিল। এইমাত্র যে সকল অপ্রিয় কথাগুলা তাহার কানে গিয়াছিল, সেগুলা আগুনের মতই তাহার প্রাণটাকে তাতাইয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল, আবার নির্ম্মল চিত্তে এই সকল বন্ধুর লোকগুলা কুৎসার কাদা ছিটাইয়া দিয়াছে! এই সুন্দরী নারী,—তাহার বিরুদ্ধেও মানুষ এমন কুৎসিত অভিযোগের সৃষ্টি করিতে পারে! হারে পুরুষ!

গেরি একটু সরিয়া গিয়া অন্য চেয়ারে বসিল। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, কে জানে, আর কাহার বিরুদ্ধে এখনই আবার কি কুৎসার সৃষ্টি হইবে!

মাদাম জেঙ্কিন্স গাহিতে লাগিলেন। মধুর কণ্ঠে উত্থিত কোমল রাগিণী বসন্তের হাওয়ার মতই শ্রোতার মনটাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। নদীর স্রোতের মতই সুরের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া চলিল। চারিধারে প্রশংসার মর্ম্মর-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যখন গান থামিল, গেরির প্রাণটা তখন বেদনায় ভরিয়া উঠিল,—হায় সুন্দর, তুমি এত ক্ষণিকের! জেঙ্কিন্স-দম্পতির প্রতি গেরির একটা শ্রদ্ধার উদয় হইল! কি সুন্দর ইহারা দুইজনে! আহা, সার্থক ইহাদের মিলন! সহসা একটা কথা গেরির কানে গেল—পাশে চাপা গলায় কাহারা কথা কহিতেছিল—

"জানো ত—লোকে কি বলে—মাদাম জেঙ্কিন্স ডাক্তারের স্ত্রী নয়?"

"বল কি—! পাগল!"

"না হে—পাগল নই। জেঙ্কিন্সের স্ত্রী একজন আছে—সম্পূর্ণ আলাদা জীব! তার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা সাক্ষাৎ নেই। সে বেচারী কোথায় কোন্ দেশে পড়ে আছে—তা কেউ জানেও না। তবে ইনি আসল মাদাম নন্—।"

"প্রমাণ—?"

"প্রমাণ আবার কি! চাও? তবে শোন সব—"

কণ্ঠ মৃদুতর হইল। বাকী কথাগুলা গেরির কানে পৌঁছিল না। না পৌঁছাক—যেটুকু গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট! গেরির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মাদাম জেঙ্কিন্স—? এ কি কথা সে শুনিল! এই সুরের উৎস, রূপের রাণী—সে—! মাদাম জেঙ্কিন্স চেয়ার ছাড়িয়া ডাক্তারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার তাঁহার হাতে সুরা-পাত্র তুলিয়া দিলেন। গেরি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, মাদামের প্রতি জেঙ্কিন্সের ব্যবহারে একটু যেন কৃত্রিমতা আছে! এতক্ষণ তাহা চোখে পড়ে নাই? আশ্চর্য্য! আর মাদামের ভাবেও আশ্রিতার কৃতজ্ঞতা যেন বেশ ফুটিয়া উঠিতেছিল। তবে—তবে কি মাদাম—! গেরি আপনার মনকে চাবুক মারিয়া ফিরাইল, —শাসাইয়া কহিল, "তোমার এ সব আলোচনায় কাজ কি? ওধারে তুমি চাহিয়ো না—" কিন্তু তখনই আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের আরও দুই চারিটা টুক্‌রা তাহার কানে গেল।

"আমি ত আর চোখে কিছু দেখতে যাইনি। অপরের মুখে যা যেমন শুনেছি, তাই বললুম আর কি! বাঃ—এই যে ব্যারণেস হেমারলিঙ্—। এঃ, ডাক্তার দেখচি, সারা

পারিটাকেই আজ টেনে এনে বাড়ীতে পুরেছে।"

জেঙ্কিন্স ব্যারণেসকে আনিয়া নবাবের পার্শ্বে চেয়ার টানিয়া বসিতে দিলেন। বন্ধু হেমারলিঙের সহিত নবাবের বিরোধ মিটাইয়া দিয়া আবার যদি তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন টানিয়া দেওয়া যায়, ইহাই ছিল জেঙ্কিন্সের উদ্দেশ্য—। নবাব ও হেমারলিঙ্ উভয়েই তাঁহার ধনশালী রোগী—প্রীতির সূত্রে দুইজনকে বাঁধিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে লাভের আশাই সমধিক। এ প্রীতির বাঁধনে ধরা দিতে নবাবের অবশ্য এতটুকু অসাধ ছিল না। হেমারলিঙের প্রতি তাঁহার এতটুকু ক্রোধ বা বিদ্বেষ ছিল না। দুইজনের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই ব্যারণেসের সহিত হেমারলিঙের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই। শুধু এই নারীর জন্যই যা-কিছু বিরোধ। ব্যারণেস ছিল, ভূতপূর্ব্ব বে'র একজন প্রিয়-বাঁদী! হেমারলিঙ কিন্তু নবাবের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য এতটুকু ব্যগ্র ছিল না।

আজ ব্যারণেসের সঙ্গে আসিয়াছিল, হেমারলিঙের ম্যানেজার লি মার্কার। হেমারলিঙের শরীর সুস্থ নহে, তাই তিনি আসিতে পারেন নাই।

সস্মিত মুখে নবাব উঠিয়া ব্যারণেসকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু প্রত্যভিবাদনের পরিবর্ত্তে ব্যারণেস যে দৃষ্টিতে নবাবের পানে চাহিলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িল। সে দৃষ্টি যেমন কঠিন, তেমনি অবজ্ঞার। জাঁসুলে মর্ম্মাহত হইয়া সরিয়া আসিলেন। জেঙ্কিন্সেরও বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। গেরি দূর হইতে এ সকল লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া গেল। নবাবকে ব্যারণেস এরূপভাবে অবজ্ঞা দেখাইল কেন?

ডাক্তারের একটা সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। হেমারলিঙ নিজে আসিল না। ব্যারণেসও নবাবের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিল। যাক্, এখন ডিউক আসিলেই হয়। আসিবেন কি না, কে জানে!

এমন সময় রক্ষক আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, "ডিউক"—সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডিউককে অভিবাদন করিল। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ডাক্তার শশব্যস্তে কহিলেন, "এখন অনুমতি দিন—ডিউক বাহাদুর,—নবাব—।" মঁপাভঁ কথাটা শুনিয়া ডিউকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "ফেলিসিয়া এসেছে—"

ফেলিসিয়া! ডিউক সতৃষ্ণ নেত্রে সম্মুখে চাহিলেন। ডাক্তারের কথা তাঁহার কানেও পৌঁছিল না। ডাক্তার অপ্রতিভ হইলেন। মঁপাভঁ ডাক্তারের পানে একটা তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়া ডিউকের হাত ধরিয়া ফেলিসিয়ার পার্শ্বস্থ আসনে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। গেরি উভয়ের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! এই মাত্র যে কথা সে কানে শুনিয়াছে,—তাহা, তবে—!

ডিউক সস্মিত মুখে কহিলেন, "সেদিন তোমার ওখানে গেছলুম, ফেলিসিয়া—কিন্তু দেখা হল না—"

ফেলিসিয়া কহিল, "আমি সে শুনেছি! আপনি নাকি আমায় ষ্টুডিয়ো ঘরে অবধি গেছলেন?"

"হ্যাঁ—তোমার নতুন পুতুল দেখে এলুম।"

"নতুন পুতুল!"

"হাঁ! চমৎকার হচ্ছে। কুকুরটা পাগলের মত ছুটে চলেছে, শেয়ালটাও তেমনি চলেছে—শুধু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তুমি বলেছিলে, আমাদের দুজনের বিষয় নিয়ে গড়ছ—তা—"

ফেলিসিয়া অপ্রতিভভাবে কহিল, "আপনি অর্থ করুন না—"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "আমার ত মাথায় কোনো অর্থ আসেনা কিছু।"

ফেলিসিয়া কহিল, "না, না—ও এক গল্প থেকে ভাবটা নিয়েছি। সেই যে পুরাণো গল্পটা—ব্যাকাসের শেয়ালটা ভারী ছোটে। এমন ছোটে যে কেউ তাকে ধরতে পারে না। ওদিকে ভলকানও তার কুকুরকে এমন শক্তি দিয়েছে যে সে যার পিছনে ছুটবে, তাকে ধরবেই। সে আর না ধরে যায় না। তারপর একদিন ত দুজনের দেখা হয়ে গেল। দুজনেই ছুটতে লাগল—এ দৌড়ের আর শেষ নেই—অনন্তকাল ধরেই দুজনে ছুটচে, অথচ কুকুর শেয়ালকে ধরতে পারচে না। গল্পটা বুঝলেন, ডিউক বাহাদুর? আজ ভাগ্য আমাদেরও দুজনকে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছে—দুজনেই কিন্তু তেজী। ভগবান আপনাকে শক্তি দিয়েছেন, আপনি সমস্ত নারীর হৃদয় জয় করবেন, আর আমারও হৃদয়টাকে এমন গড়ছেন যে সে একেবারে দুর্জ্জয়—কারো হাতে ধরা পড়বে না—কারো কাছে হার মানবে না।"

হাসিতে হাসিতেই ফেলিসিয়া কথাটা বলিয়া গেল। শুনিয়া ডিউকের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। তিনিও হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু দুজনে এমন অন্ধভাবে ছুটতে থাকলে দেবতাদেরও যে তা দেখে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।"

ফেলিসিয়া কহিল, "তা হলে কি হয়। তাঁরা যেমন গড়েছেন।"

ডিউক কহিলেন "তাঁরা না হয় ভুল করে ফেলেছেন! এ ভুল কি ভাঙ্গবে না—আচ্ছা, এ দৌড়ও কি শেষ হল না?"

"কেন হবে না?"

"কি করে?"

"দেবতারা কুকুর আর শেয়াল, দুটোকেই পাষাণ করে ফেললেন।"

"এইখানে দেবতারা আর এক ভুল করলেন, ফেলিসিয়া। আমার প্রাণটিকে তাঁরা পাষাণ করতে পারচেন না—কখনও না—কিছুতেই না।" ডিউকের চক্ষু হইতে একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিককার দৃষ্টি তাঁহাদেরই উপর বিন্যস্ত। তিনি কহিলেন, "না—এ ঠিক হচ্ছে না। লোকে বলতে পারে, তোমায় আমি একচেটে করে ফেলেছি।" ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মঁপাভঁ নবাবের হাত ধরিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ডিউককে উঠিতে দেখিয়া সে কহিল, "আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি বার্ণার্ড জাঁসুলে—নবাব বাহাদুর—আর ইনিই ডিউক বাহাদুর।"

ডিউক সানন্দে নবাবের করমর্দ্দন করিলেন।

গেরি অন্তরালে বসিয়া সকলই দেখিতেছিল। নবাবের প্রতি সকলের কি লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিল। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সকলের এ কি

আগ্রহ! আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকগুলার জনান্তিকে মৃদুস্বরে টীকা-টিপ্পনী কাটিবার ঘটাই বা কি! মধুকরের গুঞ্জন-ধ্বনির মতই আলোচনা চলিয়াছে—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই!

"মঁপাভঁর কাণ্ড দেখলে? নবাবকে চারি পাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে। সেদিন পাগানেতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে,—আজ ডিউকের পালা।"

"বেচারা নবাব! তার টাকার উপর যত জোঁক এসে চেপে বসছে। নবাবকে না খেয়ে আর ছাড়বে না, দেখচি।"

"দোষ কি! নবাবও ত তুর্কিদের শাস খেয়ে এমন ফুলে উঠেছে।"

"কি রকম?"

"কি রকম আবার! ব্যারণ হেমারলিঙের মুখে শোন নি? নবাবের কথা সে সমস্তই জানে। হেমারলিঙ ছিল ওর দোসর।"

কুৎসার বৃষ্টি সুরু হইল। পনেরো বৎসর ধরিয়া এই নবাব বে'র সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। লুণ্ঠনের বিবিধ কৌশল-কাহিনীরও ধারা বহিল। দুই হাজার টাকার এক নর্ত্তকীর ছবি কিনিয়া নবাব তাহা এক লক্ষ টাকায় বে'র হস্তে গছাইয়া দিয়াছে। একখানা সিংহাসন একশত টাকায় কিনিয়া পাঁচ হাজার টাকায় বে'কে বেচিয়াছে। ছোট-খাটো খেলানাগুলা অবধি বে'র হাতে তুলিয়া দিয়া নবাব সেগুলার জন্য রীতিমত চড়া দাম আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া য়ুরোপের বাছা বাছা সুন্দরী নারীতে বের হারেম ভরিয়া দিয়া আপনার তহবিল মোটা করিতে নবাব এতটুকু অবহেলা করে নাই! মৃদুস্বরে উচ্চরিত এই সকল কুৎসার বাণীগুলা গেরির প্রাণে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল। নিরাশায় ক্ষোভে প্রাণ তাহার জ্বলিয়া উঠিল। রোষে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু নিস্ফল এ রোষ! এ রোষে কাহারও দেহে এতটুকু আঁচ লাগিবে না! তীব্র দৃষ্টিতে সকলের পানে সে একবার ফিরিয়া চাহিল! মনে হইল, লোকগুলার কাণ ধরিয়া চীৎকার করিয়া সে বলে, "তোরা মিথ্যাবাদী—যে রসনায় অলস কুৎসা ছড়াইতেছিস, সে রসনা তোদের খসিয়া যাক, —দগ্ধ হইয়া যাক্!" কিন্তু সে কথা বলিবার সাহস গেরির নাই! ভোজের আহ্বান পড়িল। সকলে সাগ্রহে উঠিয়া টেবিলের চারিধার ঘেরিয়া বসিয়া গেল।

* * *

"আকাশ পরিষ্কার আছে। চল, হেঁটেই বাড়ী যাই।" গাড়ীকে বিদায় দিয়া গেরির হাত ধরিয়া নবাব হাঁটিয়া চলিলেন।

গেরি ভাবিল, ভালই হইল! রুদ্ধ গৃহে কুৎসার মধ্যে পড়িয়া দেহ তাহার তাতিয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত বাতাসে সে শ্রান্তি তাহার ঘুচিয়া যাইবে। রাত্রির স্নিগ্ধ শীতল মৃদু বায়ু স্পর্শে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবারও চমৎকার সুযোগ মিলিল। এখানে সে সমাজ-নাটকের যে কয়টা দৃশ্যের অভিনয় দেখিল, তাহা যেমন কুৎসিৎ, তেমনই বীভৎস! ইহারই নাম পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ! আর্টিষ্ট ফেলিসিয়া,—এতখানি যাহার প্রতিভার খ্যাতি, ডিউকের হাতে সে একটা খেলার পুতুলমাত্র! আর মাদাম জেঙ্কিন্স? জেঙ্কিন্সের বিবাহিতা স্ত্রী নহে সে!

এত-বড় ডাক্তার,—এতখানি মানসম্ভ্রম যাহার, সে একটা গণিকার সংস্পর্শে সদর্পে মাথা তুলিয়া সমাজে দাঁড়াইয়া আছে! এতটুকু লজ্জা নাই! আর এই নবাব জাঁস্থলে—ঐশ্বর্য্যের যাহার সীমা নাই, সে একজন নিষ্ঠুর দস্যুমাত্র! গেরির প্রাণে যেন কতকগুলা তপ্ত লোহার শিক্ বিঁধিতেছিল। প্রাণ তাহার জ্বলিয়া খাক্ হইতেছিল। এখান হইতে ছুটিয়া দূরে—কোন্ সুদূরে পলাইতে পারিলে তবে যেন সে বাঁচিতে পারে।

ডিউকের সহিত আলাপ হইয়াছে—সেই আনন্দে আকুল-চিত্ত নবাব পথে চলিয়াছিলেন। গেরির প্রাণে যে ক্ষোভের ঝড় বহিয়াছে, তাহার এতটুকু পরিচয়ও তিনি পাইলেন না। এত সুখ নবাবের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই! এমন সম্মান—এ যে তাঁহার আশার অতীত ছিল! ফেলিসিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতে চাহিয়াছে—ডিউক তাঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নবাবের চিরদিনকার সাধ এতদিনে আজ চরম সার্থকতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

নবাবের প্রাণে আনন্দ যেন ধরিতেছে না! দুইজনে পাশাপাশি পথে চলিয়াছে! একজনের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া চলিয়াছে, আর একজন ক্ষোভে জ্বালায় একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ নবাব কহিলেন, "এ কি—এরই মধ্যে বাড়ী এসে গেলুম! এস গেরি, আরও একটু বেড়ানো যাক্!"

গেরি কহিল, "বেশ ত!"

নবাব কহিলেন, "আজকের ভোজটা ভারী জমেছিল। জেঙ্কিন্স খাসা লোক। ফেলিসিয়ার কি রূপ—কি শান্ত স্বভাবটুকু! ডিউককে বেশ দেখলুম। এতটুকু দেমাক নেই! পারি—সুন্দর পারি—কি বল, গেরি?"

গেরি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি ত বড় ঘোরাল দেখচি। আমার কেমন আতঙ্ক হয়।"

"আতঙ্ক!" নবাব হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "তা মনে হতে পারে। তুমি সবে পাড়াগাঁ থেকে আসছ কি না! থাকো—একমাস যাক্—তখন তুমিও দেখবে, পারি কেমন সুন্দর! আমারও প্রথম প্রথম তোমার মত মনে হত!"

"কিন্তু আপনি না পারিতে আগেও একবার ছিলেন?"

"আমি! না,—কখনও না। কে বললে তোমায়?"

"আমার কেমন মনে হল—"গেরি সহসা থমকিয়া থামিয়া পড়িল, পরে আবার কহিল, "ব্যারণ হেমারলিঙের সঙ্গে আপনার কোন গোল আছে কি? আপনার উপর লোকটার ভারী আক্রোশ!"

হেমারলিঙের নামে নবাবের প্রাণে যেন একটা বাধা লাগিল। আনন্দের স্রোতে কে যেন বিষাদের আবর্জ্জনা ঢালিয়া দিল। নবাব কহিলেন, "হাঁ—আক্রোশ আছে বটে! কিন্তু আমি তার কখনও কোন অনিষ্ট করিনি, বরং ভালই করেছি। যেদিন ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে বেরুই, সেদিন দুজনে আমরা পরস্পরের সঙ্গী ছিলুম—পরস্পরের বন্ধু ছিলুম। আমি তাকে অনেক সাহায্য করেছি। আমিই তাকে টিউনিসে কণ্ট্রাক্টের কাজ পাইয়ে দি—সে কাজ দশ বৎসর চলে।

সেই থেকেই ওর বরাত ফেরে—ও অগাধ টাকার মালিক হয়। তার পর একদিন হেমারলিঙ্ বে'র এক বাঁদীর প্রেমে গড়ে—জানাজানি হতে বের মা সে বাঁদীকে হারেম থেকে তাড়িয়ে দেন। বাঁদীটা সুন্দরী ছিল—তার পর ত তাকে বিয়ে করেলে। আর এই বিয়ের জন্যই হেমারলিঙকে টিউনিস ছাড়তে হয়।

"ওদের কে বলে, আমিই নাকি বে'কে বলে ওদের তাড়াবার মন্ত্রণা দিয়েছি। কথাটা কিন্তু ঠিক নয় মোটে। আমিই বরং বেকে বলে কয়ে হেমারলিঙের ছেলেকে—ওর প্রথম স্ত্রীর গর্ভের ছেলে—টিউনিসে তার বাপের কাজ-কর্ম্ম দেখবার জন্য রাখিয়ে দি। হেমারলিঙ পারিতে চলে আসে—এসে এখানে ব্যাঙ্ক খোলে! আমার সেই উপকার করার দরুণ হেমারলিঙ কিন্তু চূড়ন্ত শোধ নিয়েছে।

"তারপর আহম্মদ বে মারা গেলে তার ভাই মশুর বে হল। হেমারলিঙের সঙ্গে তার একটু ভাব ছিল—তিনি লোক মন্দ নন—আমার সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার প্রথমটা খারাপ ছিল না। শেষে হেমারলিঙের কানা-কানি-ভাঙাভাঙিতে আমার উপর তাঁর মন চটে গেল—আমি চলে এলুম। হেমারলিঙ কি এই করেই সন্তুষ্ট রইল—তার স্ত্রীকে দিয়ে যেখানে সেখানে আমার অপমান করে বেড়াত। আজই ত দেখলে,—তার স্ত্রীর ব্যবহার। আমায় কি রকম তাচ্ছল্যটা করলে! যাক্—করুকগে—আমার আর তাতে কি ক্ষতি করবে সে? তবে এ সব দেখে আমার শুধু হাসি পায়!

"এখন শোনো, গেরি—আমার কথা—আমি অনেক কাজ করতে চাই—কারবার ঢের করা গেছে—বিশ বৎসর টাকার জন্য অশ্রান্ত খাটা খেটেছি। এখন আমি যশ চাই, মান চাই, নাম চাই। দেশের ইতিহাসে নিজের নামটা যাতে চিরকালের জন্য লিখিয়ে রেখে যেতে পারি, এমন কাজ আমি করে যেতে চাই। পিছনে এত টাকা—বাধা বিশেষ দেখচি না—শুধু মাথা খাটানো—গেরি—বন্ধু আমার—" নবাবের স্বর জড়িয়ে হইয়া আসিল। গেরির হাত দুইটি সাবেগে চাপিয়া ধরিয়া নবাব কহিলেন, "গেরি, তুমি আমার পাশে থাকো—আমার সহায় হও—কখনো আমায় ছেড়ে যেয়ো না। তাহলেই আমার অভাষ্ট সিদ্ধ হবে।"

এ আবেগ-ভরা মধুর স্পর্শে গেরির শিরায় শিরায় একটা পুলকের বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। আহা, অসহায় বিপন্ন নবাব—সে আজ আশ্রয় চাহে—নির্ভর চাহে। চক্রান্তময় পারিতে নবাবের হৃদয় বুঝে, এমন লোক কেহ নাই। অর্থটাই সকলের চোখে ঠেকিতেছে—মানুষ নয়! নবাব বন্ধু চাহে—গেরি সে বন্ধুত্ব দান করিবে! সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সে তাহার সহচর থাকিবে! নবাবকে এই লুব্ধ ব্যাধগণের কঠিন পাশ হইতে রক্ষা সে করিবেই! করুণায় গেরির চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, "নবাব বাহাদুর, আমি চিরদিন আপনার পাশে থাকব—যতখানি সাধ্য, আমি আপনার সাহায্য করব।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ক্যামেরার সাহায্যে বন্যজন্তুর ছবি

মিঃ এ র‍্যাডক্লিফ ডাগমুর ক্যামেরা লইয়া আফ্রিকা মহাপ্রদেশে বৃহৎ বন্যজন্তুর ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন! আত্মরক্ষার্থে তাঁহার সহিত বন্দুকও লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জীবিত বন্যজন্তুর ছবি তোলা। সেখানে তিনি অনেকগুলি সুন্দর চিত্র তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফটো তুলিবার প্রণালী হইতে অনেক পাঠিকাগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ কার্য্য কতদূর বিপজ্জনক, ইহাতে পদে পদে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এই নূতন রকমের শিকারে একজন সাধারণ শিকারীর অপেক্ষাও বেশী সাহস, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং দক্ষতা থাকা চাই। ডাগমুর সাহেবের কথাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রায় যাঁহারাই বন্যজন্তুর বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল দেশের অপেক্ষা ব্রিটীস ইষ্ট আফ্রিকায় অধিকসংখ্যক বিভিন্নপ্রকার বন্যজন্তু পাওয়া যায়। আমিও অনেকদিন হইতে এ বিষয়ের রঞ্জিত বিবরণ শুনিয়া সেই খানে যাইতে মানস করিলাম। ক্যামেরা সঙ্গে লইয়া ১৯০৯ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী বন্ধুর সহিত মোমবাসা হইতে যাত্রা করিলাম। এবং যতই ট্রেনপথে আমরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম ততই গাড়ীর জানালা হইতেই নানারকমের জন্তু দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

প্রথম দেশভ্রমণে বাহির হইবার সময়ই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমাদের পথ-চালক হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। যথার্থই অদূরে বিশগজের মধ্যেই সমীরণে আন্দোলিত তৃণরাশির উপর একটি প্রকাণ্ড গণ্ডারের ধূসরবর্ণ পৃষ্ঠদেশ দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ ইহা দেখিতে পাইয়াই আমি তাড়াতাড়ি সব প্রস্তুত করিলাম। বন্দুকটি বারুদে ভর্ত্তি করিতে ও ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতে আমার কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র সময় লাগিল। কিন্তু সেই গণ্ডারটি অতি দ্রুত আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ একটি প্রকাণ্ড ভারী জন্তু এত দ্রুতগতিতে নড়িতে পারে ইহা চক্ষে না দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। সে আমাদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। (১নং ছবি) তাহার ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় সে আমাদের নিকট হইতে ১০ গজ দূরে ছিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই সে আমাদের দুই গজের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর দুই তিনবার বন্দুক ছুঁড়িবার পর সে পলাইয়া গেল। সেইদিন এই পর্য্যন্ত।

তারপর আমরা স্বকার্য্যে ব্রতী হইলাম। নানা বিষয় হইতে আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে এ দেশে দিনের বেলা ছবি তোলা আদৌ সুবিধাজনক নহে। অতএব রাত্রেই কার্য্য করিতে সিদ্ধান্ত করিলাম। রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোকের (flash-light)



১নং চিত্র—গণ্ডার

সাহায্যে ইহাদের ছবি তোলা বড় আমোদ-জনক। এক রকম উপায়ে জন্তুরা নিজেদের ছবি নিজেরাই তোলে, অন্যউপায়ে একজনকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হয় এবং জন্তুরা নিকটবর্ত্তী হইলেই আলোকরশ্মি ফেলিয়া স্থানটিকে আলোকিত করিতে হয়।

আমরা একটি ছোট খালের ধারে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলাম। সেখানে তাঁবু খাটাইয়া সিংহ ও চিতাবাঘের আকস্মিক আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিলাম। সেইখান হইতেই ছোট খালটি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে রাত্রিকালে বন্যজন্তুরা জল পান করিতে আসে। ইহার একটু দূরে আমরা দুইটি ক্যামেরা লুকাইয়া রাখিয়া দিলাম এবং আলোকরশ্মিরও সবিশেষ বন্দোবস্ত করিলাম।



২নং চিত্র—হরিণের দল

সমস্তই বৈদ্যুতিক বন্দোবস্তের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন। আমরা সন্ধ্যাকালে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলাম এবং রাত্রি প্রায় নটার সময় দেখিতে পাইলাম যে কতকগুলি হরিণ আসিতেছে; তাহারা অতীব সাবধানের সহিত অগ্রসর হইল। হয়ত কোন সিংহ তাহাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্য পাহাড়ের ছায়ার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে সেইজন্য গোল হইয়া দাঁড়াইয়া তাহারা ক্রমশঃ একটু একটু নিকটে আসিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার বেশী তাহারা সব বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিল। সেই সময় আমাদের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তারপর তাহারা ডোবার নিকট অগ্রসর হইয়া জলপান করিতে লাগিল। তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। কম্পিতহস্তে আমি কলটি টিপিয়া দিলাম। সমস্ত স্থানটি আলোকিত হইয়া গেল। তাহারা ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাদের ফোটোও প্লেটে অঙ্কিত হইয়া গেল। ইহাই আমাদের আলোকের সাহায্যে প্রথম চিত্র (flash-light photo)।

পরবর্ত্তী রাত্রে আমরা হায়েনার (গোবাঘা) ছবি তুলিয়াছিলাম। সেবার কতকগুলি জেব্রা আমাদের সম্মুখীন হইলেও আমরা তাহাদের ছবি তুলিতে পারি নাই। তারপর আমরা তাঁবু উঠাইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে এক স্থানে সিংহের অনেক পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া একটি শুষ্ক নদীগর্ভের নিকটেই তাঁবু ফেলিতে মনস্থ করিলাম। প্রথম রজনী, সিংহের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন শুনিয়া আমাদের খুব আমোদ হইয়াছিল। পরদিন একটি সদ্যঃনিহত জেব্রা হইতে প্রায় বারগজ দূরে দুইটি ক্যামেরা স্থাপন করিলাম। রাত্রিতে বিশেষ কিছুই ঘটিল না। পরবর্ত্তী রাত্রে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাত্রি নয়টার কিছুপরে একটা কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি হঠাৎ আমার চক্ষুর সম্মুখে উদিত হইল। কোথা হইতে ইহা আসিল তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা যথার্থই একটা প্রকাণ্ড সিংহ! সে জেব্রার পার্শ্বে পাথরের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। (৩নং ছবি)



৩ নং চিত্র—জেব্রার পার্শ্বে সিংহ

আফ্রিকার সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জন্তু এবং এই পশুরাজকে বার গজ দূর হইতে আমাদের দিকে তাকাইতে দেখিয়া ভয়ে আমাদের প্রাণ শুকাইয়া গেল। সিংহ আমাদের উপর লাফাইলে আমাদের পলায়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে আমি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কলটি টিপিয়া দিলাম। ম্যাজিকের ন্যায়, সমস্ত স্থানটি আলোকিত হইয়া গেল। এবং তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার মধ্যস্থিত প্লেটে সিংহের ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল। সিংহও পলায়ন করিল। পরে পুনর্ব্বার আলোর বন্দোবস্ত করিয়া ও প্লেট বদলাইয়া অপর সিংহের আগমনের জন্য বসিয়া রহিলাম। অন্ততঃ পাঁচটী সিংহ আমাদের আশে পাশে বিচরণ করিলেও কেহই আর নিকটে আসিল না। রাত্রিতে আর কোন বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিল না। ভোরের বেলা তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়া প্লেটগুলি হইতে ছবি তুলিয়া দেখিলাম যে ছবি বেশ স্পষ্ট উঠিয়াছে।

একদিন দিনের বেলা একটি সিংহের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। আমি তখন হরিণদের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। অদৃষ্টজোরে আমি সেই সিংহের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার গুলিতে আহত হইয়া সে ঝোপের মধ্যে চলিয়া গেল।

টানা নদীর তীরে সিন্ধুঘোটকের ছবি তুলিবার জন্য আমরা অগ্রসর হইলাম। রাত্রিতে আলোকের সাহায্যে তাহাদের ছবি তুলিতে অসমর্থ হইয়া একদিন অপরাহ্ণে দেখিতে পাইলাম যে, নদীর মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর অনেকগুলি সিন্ধুঘোটক নিদ্রিত রহিয়াছে। এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক, জলে শান্তভাবে বিশ্রাম করিতেছে। এইরূপ একটি দৃশ্য দেখিবার জন্য আমরা আটদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলাম। পরদিন বেলা দুইটার কিছু পরে আমরা পুনর্ব্বার সেই পর্ব্বতের নিকট জন্তুদের দেখিতে পাইলাম; তখন তাহারা সংখ্যাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তখন ভাবনা হইল কি রকমে তাহাদের নিকট যাওয়া যাইতে পারে। তাহারা বড়ই লাজুক জন্তু এবং তাহাদের ঘ্রাণশক্তিও খুব তীব্র। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া যাইয়া, যেখানে জন্তুরা ছিল, আমরা তাহার বিপরীত তীরে উপস্থিত হইলাম। এবং যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত আমি ক্যামেরাটিকে যথাস্থানে স্থাপন করিলাম। তাহাতে তাহারা আদৌ ভীত হইল না। তাহারা প্রায় ৮০ কিম্বা ১০০ গজ দূরে ছিল। একটি বৃদ্ধ সিন্ধুঘোটক ক্যামেরার



৪নং চিত্র—বৃদ্ধ সিন্ধুঘোটক

দেখিতে আসিল। (৪নং ছবি)। আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের নানাপ্রকার ছবি তুলিলাম। এমন সুবিধা আমাদের ভাগ্যে খুব কমই ঘটিয়াছিল। (৫নং ছবি)। ঐ জন্তুদের পিঠের উপর যে পাখীরা বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের পিঠের জোঁক ধরিয়া খায় এইরূপ অনেকের ধারণা।



৫নং চিত্র—সিন্ধুঘোটক

একদিন একটি মৃত ভুক্তাবশিষ্ট মৃগ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া মনে হইল যে গতরাত্রে সে নিহত হইয়াছে। আমরা সন্ধ্যার সময় সব ঠিকঠাক করিয়া সিংহের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। আমরা মৃত জন্তুটি হইতে দশগজ দূরে ছিলাম। ইহাপেক্ষা দূরে থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে না আসিতে আমরা অদূরে তৃণগুল্মের মধ্যে অস্ফুট পদখস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবং শীঘ্রই কৃষ্ণ সিংহের লঘু ছায়াকৃতি দেখিতে পাইলাম। তারপর অপর দিকে আর একটি সিংহ উপস্থিত হইল। এবং তারপর আর একটি। তিনটী সিংহই আমাদের নিকট হইতে ১৫গজ দূরে ছিল। আমি বৈদ্যুতিক



৬নং চিত্র—মৃতজন্তুর পার্শ্বে সিংহী

যন্ত্রের কলটি টিপিয়া দিলাম। আলোকরশ্মি দেখিয়া সিংহেরা গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আমরা তাহাদের মধ্যে একটি সিংহের ফটো তুলিয়া লইলাম। কিছুক্ষণ পরে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাইলাম যে একটি সিংহী মৃতজন্তুর পাশে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। আমি বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তাহার ফটো তুলিয়া লইলাম। (৬নং ছবি)।

আমাদের আফ্রিকা ত্যাগের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। পরে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য চিত্র তুলি নাই। কিন্তু সেই কয়মাসের স্মৃতিচিত্র চিরদিনের জন্য আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া আছে।"

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভিজিগাপত্তম

আমরা ভিজিগাপত্তমের যাত্রী। রেলের গাড়ীতে ব'সে প্রকৃতির শোভা দেখে দিনটা বেশ আরামে কেটে গেল। এই পাহাড় গাছ পালা—এই নদনদী তড়াগ; মুহূর্মুহু নবনব দৃশ্যের আবির্ভাব ও অন্তর্ধ্যান! প্রকৃতি দেবীর এই রকম লুকোচুরী খেলা দেখতে দেখতে অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় আমরা গম্যস্থানে এসে পড়লেম।

আমাদের বাড়ীটি ছোট খাট দোতলা; বারান্দার নীচেই বড় রাস্তা— রাস্তার পরেই সমুদ্র। বারাণ্ডায় বসে আমরা সমুদ্রের মাতামাতি এবং রাস্তার লোকচলাচল—এই দুই-ই দেখতে পাই।

শুনা যায় ডাচরা সর্ব্ব প্রথম এ দেশ জয় ক'রে নিয়ে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। এখন অবশ্য এ অঞ্চলও ইংরাজের অধিকার ভুক্ত। এই বাড়ীর চারি ধারেই বহু ডাচ পরিবার খোলার বাড়ীতে বাস করছে। আমরা ঘরে বসে তাদের সমুদ্র-স্নান দেখতে পাই। জ্যাৎস্নারাতে ১০টার সময়ও কোন কোন দিন তারা সমুদ্রে নামে; মেমদের মিহি গলার চীৎকারে নিস্তব্ধ রাত্রি উল্লাসে কেঁপে ওঠে। দিনের বেলা অনেক সাহেবমেম জলকেলী করেন, —কিন্তু গলার স্বর এমন শোনা যায় না।

এখানে হিন্দুতীর্থ বেশী নেই, একটি উঁচু পাহাড়ের উপর রাজা নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। অনেক সিঁড়ি পার হয়ে তবে এই পাহাড়-তীর্থে উঠতে হয়। আমাদের একটি আত্মীয় একবার সেখানে উঠতে গিয়ে ভারী বিপদে পড়েছিলেন, তাই আমি আর আমার সদ্যঃ রোগমুক্ত দুর্ব্বল আত্মীয়াটিকে নিয়ে সেখানে যেতে সাহস পেলেম না। কিন্তু তীর্থদর্শনপুণ্য যে একেবারেই অদৃষ্টে ঘটেনি তা নয়। একটি ছোট পাহাড়ের উপর মুসলমানদের একটি মসজিদ্ আছে আমরা সেখানে একদিন গিয়েছিলেম। এটি একটি পীরের আস্তানা—রেলিং ঘেরা তিন চার হাত স্থান ধূপধূনা ও ফুলগন্ধে ভরপূর। বলা বাহুল্য এখানে কোন মূর্ত্তি নেই। মুসলমানগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই শূন্য মন্দিরে এসে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করে। জানি না, একজন হিন্দুর মনে এই দৃশ্যে কি ভাবের উদয় হয়—আমার মন ত এই দৃশ্যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের প্রতি ভক্তির ভাবে

ভরে উঠেছিল। আসল কথা, ভগবান সকলের মধ্যেই বিরাজমান্, গঠিত মূর্ত্তিতে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস তাহা কেবল আশৈশব-শিক্ষা সংস্কার মাত্র।

আমরা একদিন রোমান-কাথলিকের গির্জ্জা দেখতে গিয়েছিলেম। সেদিন তাঁদের একটা উৎসব দিন।—শোভাযাত্রা ক'রে সকলে গির্জ্জায় প্রবেশ করছিলেন। আমরাও তাদের সঙ্গ গ্রহণ করলেম।

প্রথম শ্রেণীতে পোপ, তাঁর সঙ্গে বড় মাদারয়, তারপর পদমর্য্যাদা অনুসারে অন্যান্য সকলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেচে; সব শেষে দেশী খৃশ্চান মেয়ে পুরুষ সেজেগুজে ছোট ছেলেদের নিয়ে তাদের অনুবর্ত্তী। পাহাড়ের উপর গির্জ্জাটি নির্ম্মিত—উপরে মুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ—নীচে তরঙ্গায়িত সমুদ্র—বড়ই মনোরম স্থান! গির্জ্জার মধ্যে সাড়ীওড়নায় সুসজ্জিতা মেরীর প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর সম্মুখে বড় বড় মোমবাতী আর পায়ের কাছে কাপড়ের ও মোমের ফুলের স্তূপ। এত ভিড় হয়ে গেল যে আমরা ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেম না কি পড়া হচ্চিল। বাহির থেকে অল্প অল্প শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু বোঝা গেল না। আমরা প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেম; নীচের তিন দিকে সমুদ্র একদিকে পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে ছোট সহরটিকে যেন প্রকৃতি দেবী নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছেন। কত লোক বাতি হাতে করে মেরী-মাতার নিকট মানৎ করতে যাচ্ছে দেখলেম। কারও মানৎ আমার ছেলে কি স্বামী ভাল হোক্ তোমাকে জোড়া বাতী দেব, যার দুট বাতি দিতে সাধ্য নেই সে বলছে একটা বাতি দেব। রোমান কাথলিকরা ঠিক আমাদের মতই মূর্ত্তি পূজা করে এবং মেরীদেবীর নিকট মানৎ করে থাকে। তবুও আমরাই শুধু পৌত্তলিক! তফাতের মধ্যে দেখলেম—ওরা বাতি মানৎ করে; মেরীর ঘর আলোতে উজ্জ্বল করে তুলে তাঁকে আনন্দ দেয়, এবং আমাদের করালবদনা রক্তপিপাসু কালীকে বড় বড় মহিষ ছাগল বলি দিয়ে পিপাসা নিবৃত্তি করাতে হয়। নানেরা (Nun) দেখলুম দু চারজনে মিলে হাঁটু গেড়ে বসে কেউ ক্রাইষ্টের ছবির কাছে, কেউ মেরীর মূর্ত্তির কাছে বসে একমনে প্রার্থনা কচ্ছেন। ভক্তি জিনিষটায় এমনই মাহাত্ম্য— যে করুক বা যার কাছেই করুক—দেখলেই মনে ভক্তি ভাবের উদয় হয়! উৎসব শেষ হবার আগেই আমরা চলে এলেম।

এখানে বিকাল বেলাটা আমরা সমুদ্র-তীরে বেড়াতে যাই। আর দুপুর বেলাটা যত খেলানাওয়ালা বিক্রিওয়ালারা এসে আমাদের ব্যাপৃত রাখে।

চন্দন কাঠের বাক্স, কলমদানী, কচ্ছপের বড় বড় খোলা, নানান্ রকম শিং এই সব জিনিষে তারা ঘর ভরিয়ে ফেলে। মনের মতন জিনিস হলে কোন দিন আমরা কিনি; কোন দিন কিনবনা বল্লেও তারা সব সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে। সাতারজি নামে ওদের মধ্যে একজন লোক আছে সে বাবুদের বেশ বশ করে নিয়েছে। লোকটা বেশ চালাক বুদ্ধিমান, তার কাছে কিছু কিনতেই হয়!

যে ডাচদের কথা বলেছি তাদের একটি পরিবার আমাদের পাশের বাড়ীতে বাস করে। সাহেবটি একদিন আপনি এসে বাবুদের সঙ্গে ভাব করলে; আমাদের

বাঙ্গালা খাবার তার খেতে ভারি ইচ্ছে, তাই এসে আপনার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল; তাকে একদিন মাংস লুচি মালপোয়া পাঁপর ইত্যাদি অনেক রকম খাবার করে খাওয়ালেম। বেশ ত তারিফ করে খেলে; কিন্তু আসলে ভাল লাগল কি না কে জানে! তার মেমটি বড় ভালমানুষ; অনেক গুলি ছোট ছেলে মেয়ে তার;—আমাকে তারা গ্র্যানী গ্রানী করে ডাকে। কিছু খাবার দিলে ভারি খুসি হয়ে খায়।

এখানকার সূর্য্যচন্দ্রোদয় দৃশ্য কি চমৎকার! মনে হয় সমুদ্রদেবতা যেন সূর্য্যচন্দ্রকে বক্ষের মধ্য হতে বার করে হাত দিয়ে ধরে আকাশে উঠিয়ে দিচ্ছেন। সৃষ্টির যত কিছু মহীয়সী মহিমায় বিশ্ব যেন তখন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠে। আমাদের বাড়ী যাবার সময় প্রায় হয়ে এল, আনন্দই হচ্ছে, কেবল এই দৃশ্য থেকে আপনাকে ছিন্ন করতে একটা বেদনা অনুভব করছি।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্‌টুক্ তুলতুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল?
টুক্‌টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।
টুক্‌টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বস্‌রাই গুল।
ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্
ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল্
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্।

তার তন্ তার মন
ফাল্গুন্-ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।
চোখ্ তার চঞ্চল;—
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুমু-ঘুম সুখ্-সুখ্!
এই চোখ জ্বল্-জ্বল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্!
জ্যো'স্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর!

গান—তার গুন্ গুন্,
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্,
বোল্—তার ফিস্ ফিস্,
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুল্ বুল্,—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।
পায়ে তার নাই ফাঁস্
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর—এই সুখ।

প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।
তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ?
তার তুল্ কোন্ ফুল?
বিল্‌কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্‌কুল্
এল্-বস্‌রাই গুল্!
দেল্-রোশ্‌নাই ফুল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শোক সংবাদ

রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

গত ৫ই জুন, রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন;—এ সংবাদ আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি। শৌরীন্দ্র-মোহন ধনীর সন্তান হইয়া, জীবন কেবল ভোগবিলাসে কাটাইয়া যান নাই;—দেশ এবং দেশবাসীর গৌরব ও কল্যাণসূচক কর্ম্ম তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

লুপ্তপ্রায় হিন্দুসঙ্গীতকলা দেশের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাই ছিল শৌরীন্দ্র-মোহনের জীবনের একান্ত সাধনা। যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে একবার আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে হিন্দুসঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কি অসাধারণ ছিল,—সারা জীবন তিনি কি দীর্ঘ অধ্যবসায়ের সহিত ঐ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন—প্রাচীন শাস্ত্র সাগর যেন একা একহাতে মন্থন করিয়াছেন।

সঙ্গীতবিদ্যা দেশময় যাহাতে বিস্তার লাভ করে তাহার জন্য তাঁহার কি না উৎসাহ ছিল। নিজের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতবিদ্যালয় খুলিয়া তিনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন; যে সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখনকার লোকের জানা নাই এমন অনেক যন্ত্র তিনি পুনঃনির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেন—এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন; সঙ্গীতবিদ্যা যাহাতে সহজে, বিনা ওস্তাদের সাহায্যে আয়ত্তাধীন হয় তজ্জন্য তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনাও করিয়াছিলেন;—এক্ষেত্রে আমাদের দেশে তিনিই একরূপ অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব" "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" "মৃদঙ্গমঞ্জরী" "একতান" "যন্ত্রকোষ" প্রভৃতি

সঙ্গীত-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। "সঙ্গীত সার সংগ্রহ" নামে তাঁহার সংগ্রহ-পুস্তকখানি একটি অমূল্য জিনিস।

শৌরীন্দ্রমোহন দেশ-বিদেশ হইতে নানা সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি, খেতাব, খেলাত প্রভৃতির তালিকা করিতে গেলে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া পড়ে। সভ্যজগতে এমন দেশ বোধ হয় অল্পই আছে যেখান হইতে কোনো না কোনোরূপ সম্মান তিনি লাভ না করিয়াছেন। ইউরোপ আমেরিকার তো কথাই নাই; প্রাচ্য দেশের নানা স্থানের নানা উপাধি তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। পারস্য, চীন, তুর্কী প্রভৃতি স্থান হইতে উপাধিসম্ভার আসিয়াছিল। দেশদেশান্তরের সঙ্গীত-সমাজ তাঁহাকে বরমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের গৌরবস্বরূপ।



রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা সাতিশয় দুঃখিত। শৈলেশচন্দ্র বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রচার করিয়া মাসিকসাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য। নানা বিপদ ও অসুবিধার বাধা তুচ্ছ করিয়া তিনি এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গদর্শন চালাইয়া আসিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিলে শৈলেশচন্দ্র স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সে ভার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শৈলেশচন্দ্র ছোটো গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদের অবিদিত নাই। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

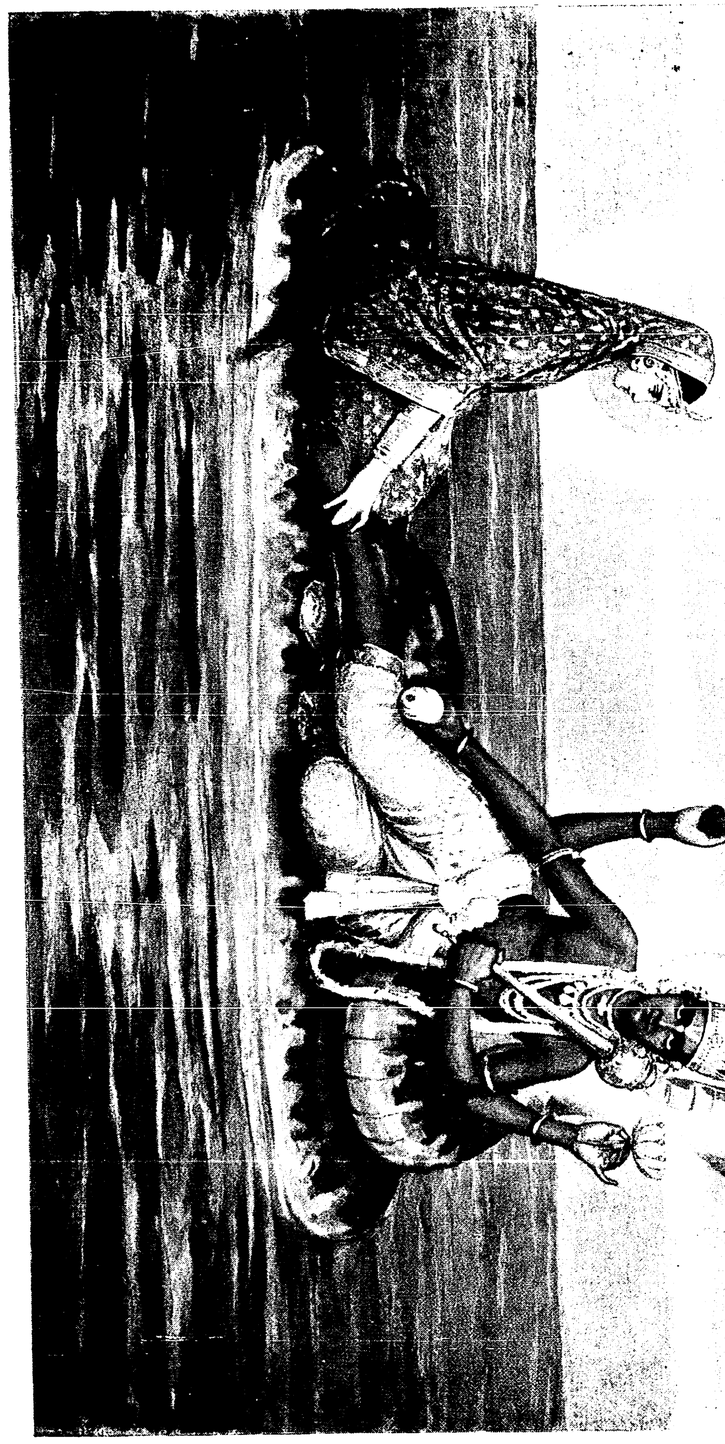

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২১ [৪র্থ সংখ্যা

ষড়ঙ্গ দর্শন

রস, ছন্দ, রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ—চিত্রের আপাদমস্তক এই অষ্টাঙ্গকে আমরা এতক্ষণ আমাদের দিক দিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; এখন এই চিত্রসম্বন্ধে আমাদের চিন্তার প্রতিধ্বনি আর কোনো প্রাচ্যশিল্পে পাই কি না দেখা কর্ত্তব্য। প্রাচ্য-শিল্পের মধ্যে জাপান-শিল্প এখন জগতের নিকট সুবিদিত এবং তাহার সমস্ত চিন্তাটুকু প্রাচীনতর চীন-শিল্পের দ্বারাই অনুপ্রাণিত সুতরাং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথমেই দেখা যাক্ রস বলিতে আমরা কি বুঝি এবং জাপানই বা কি বোঝেন। আমাদের আলঙ্কারিকগণ রসকে বলিতেছেন—'ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন্'—যেন বৃহতের আস্বাদ দিয়া তাবৎকে বড় করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে যে মহৎ আস্বাদ তাহাই রস।

জাপান এই রসকে বলিতেছেন—Ki In... that indefinable somthing which in every great work suggests elevation of sentiment, nobility of soul.

[On the Laws of Japanese Painting by Henry P Bowie. Page 83.]

কাব্য-প্রকাশ-প্রণেতা মম্মট, রসকে বলিয়াছেন "স চ ন কার্য্য নাপি জ্ঞাপ্য।" তাঁহার মতে রস আপনাকে অনুভব করায়;—"পুরইব পরিস্ফুরন্, হৃদয়মিব প্রবিশন্, সর্ব্বাঙ্গীনমিব আলিঙ্গন্ অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ।" জাপানেরও Ki In অথবা রস সম্বন্ধে Bowie সাহেব বলিতেছেন যথা—

"From the earliest times the great art-writers of China and Japan have declared that this quality...can neither be imparted nor acquired (স চ ন কার্য্য নাপি জ্ঞাপ্য) It is...akin to what the Romans meant by Divinus—Afflatus that Divine and Vital breath...which vivifies...the work and renders it immortal. (হৃদয়মিব প্রবিশন্ ইত্যাদি) (Vide Page 43. On the Laws of Japanese Painting)

ছন্দকে আমাদের অভিধানে বলা হইয়াছে

"আহ্লাদয়তি ইতি";—ইনি হ্লাদিত করেন, ইনি হ্লাদিনীশক্তি!

"সত্তত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রম্ নানাবিধং যথা॥"
(পঞ্চদশী, ভূতবিবেকঃ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শ্লোক ৫৯)

স্বভাবত বর্ণহীন-ভিত্তিতে সঙ্গত হইয়া, বর্ণসকল ভিত্তিটিকে যেমন নানারূপে চিত্রিত করিতেছে, তেমনি স্বভাবত নিষ্ক্রিয় যে সৎ তাঁহাতে সঙ্গত হইয়া শক্তি তাঁহাকে বিক্রিয়া দিতেছেন। কাজেই দেখিতেছি, হ্লাদিনী যে শক্তি তিনি,—একদিকে গতি বা মুক্তি, আর-একদিকে স্থিতি বা বন্ধন,—দুই পারের এই দুই আলিঙ্গনে সৎ যে তাঁহাকে দোলা দিয়া বিক্রিয়া দিতেছেন। "হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর।" সৎ-যে-বস্তুটি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, তিনি হ্লাদিনী-শক্তির সচেতন আলিঙ্গন পাইয়া চিৎ এবং আনন্দরূপে নন্দিত হইয়া উঠিতেছেন বা ছন্দিত হইতেছেন।

জাপানের শিল্পাচার্য্য স্বর্গগত ওকাকুরা চীনষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই ছন্দ বা হ্লাদিনী শক্তিকেই বুঝাইতেছে; যথা—

Ch'i-Yun Sheng-Tung. "The life movement of the spirit through the Rhythm of things...the great mood of the universe (সৎ) moving hither and thither amidst the harmonic laws of matter (হ্লাদিন্যা সম্বিৎ) which are Rhythm.

Spirit বা প্রাণে সঙ্গত হইয়া যে শক্তি বিক্রিয়া (movement) রচনা করে তাহাই হইতেছে ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি। এক কথায় বলিতে গেলে ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি প্রাণের (Spirit) স্পন্দন—Life movement of the spirit। এই ছন্দকে জাপানিরা কহেন Sei do (ছন্দ, ছাঁদ্)—

'...This is one of the marvellous secrets of Japanese painting handed down from the great Chinese painters (?) and based on psychological principles—matter responsive to mind,.....

এই ছন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির প্রয়োগ চিত্রে কি ভাবে করিতে হইবে যথা—

...Should he depict the sea-coast with its cliffs and moving waters, at the moment of putting the wave-bound rocks into the picture he must feel that they ary placed there to resist the fiercest movement of the Ocean, while to the waves in turn he must give an irresistible power to carry all before them; thus by this sentiment called living movement (Sei do) reality is imparted to the inanimate object.

[On the Laws of Japanese Painting by Henry. P. Bowie Page 78.]

চিত্রকরের নিকট Sei do বা ছন্দশক্তির কার্য্য এই ভাবে ধরা দিতেছে, যথা:—

অন্তরের দ্বারা বাহির,—বা মনোগত যাহা তাহার দ্বারা বস্তু-রূপটি অনুরণিত হইতেছে। পর্ব্বতটি যখন লিখিতেছি তখন পর্ব্বতের দৃঢ়তা, স্থিরতা মনে আনিয়া—এককথায় ছন্দের স্থিতির দিকটিকেই মনে ধরিয়া লিখিতেছি। আবার যখন তরঙ্গভঙ্গ লিখিতেছি তখন লিখিতেছি স্থিতির বিপরীত ছন্দের যে গতির দিক তাহাকেই মনে ধরিয়া লিখিতেছি।

'ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণীনোঽত্র জড়া অপি!
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ'॥
(পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, শ্লোক ৫)

ব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কি জীব, কি জড় উত্তমাধমভাবে যে যাহার যথাস্থান অধিকার করিয়া আছে—চিত্রপটে নানাবিধ সামগ্রী যে ভাবে সজ্জিত থাকে।"

চীন-ষড়ঙ্গের পঞ্চম অঙ্গটির যে অনুবাদ ফরাসী পণ্ডিত পেৎরুচি (Petrucci) এবং বিলাতের বিনিয়ান্ (Binyon) সাহেব দিয়াছেন তাহা পঞ্চদশীর চিত্রদীপের এই পঞ্চম শ্লোকটির অবিকল প্রতিধ্বনি যথা:—

"Dispoeser les lignes:et leur attribuer leur place hi'erarchique.

(La philosophic de la Nature daus l'art de l'extreme orient—Petrucei. page 89)

'Composition and subordination or grouping according to the hierarchy of things (L. Binyon. The flight of the Dragon. Page 12)

বেদান্তদর্শনের এই চিন্তাটি চীন-ষড়ঙ্গের মধ্যে কোন্-কালে কি-ভাবে প্রবেশ লাভ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন যে রূপের ধর্ম্মই হচ্ছে, প্রতিবিম্বিত হওয়া, কল্পিত হওয়া, ছন্দিত হওয়া এবং ছায়াতপে প্রকাশিত হওয়া, যেমন:—

'যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে,
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।"
(কঠোপনিষদ্)

আত্মাতে দর্পনস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়, পিতৃলোকে স্বপ্ন-দৃষ্টের ন্যায়, গন্ধর্ব্বলোকে যেন জলের কম্পনের উপরে এবং আমাদের এই ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আতপ এতদুভয়ের বৈষম্য দিয়া।

'যথাদর্শে তথাত্মনি' এই ভাবটির ঠিক অনুরূপ ভাবটি ব্যক্ত করিতেছে জাপানের Sha I যথা:—

They paint what they feel rather than what they see, but they first see very distinctly (আত্মাতে প্রতিবিম্বিতবৎ). It is the artistic impression (Sha I) which they strive to perpetuate in their work.

(Page 8 on the Laws of Japanese painting by Henry P Bowie)

আত্মাতে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্য্যন্ত রূপকে সম্পূর্ণ বোধ করা অথবা প্রকাশ করা অসম্ভব;—ইহা জাপানও বলিতেছেন, আমাদের ঋষিগণও বলিয়া গিয়াছেন।

'ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'—রূপ প্রকাশ পাইতেছে ছায়াতপের বৈষম্য দিয়া, যেমন—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে,
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভি-
চাকশীতি।'

দুই সুন্দর পক্ষী—শ্বেত, কৃষ্ণ,—জাগ্রত, ঘুমন্ত—যেন ছায়াতপের মত একত্র বাস করিতেছে। একটি পক্ষী ফল আস্বাদ করিতেছে, গান গাহিতেছে, অন্যটি চুপ্‌চাপ্ বসিয়া তাহা দেখিতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা, (spirit and matter) আকার নিরাকার, রূপ ও অরূপ—এই দুয়ের সমতা ও বৈষম্যতা ব্যক্ত করিতেছে ভারতের উল্লিখিত যে সনাতন চিন্তাগুলি তাহার ঠিক প্রতিধ্বনি দিতেছে জাপান-চিত্রশিল্পের In yo মন্ত্রটি, যথা:—

In yo.....requires that there should be in every painting the sentiment of active and passive, light and shade (ছায়াতপ)... The term In yo originated in the earliest doctrines of Chinese philosophy and has

always existed in the art language of the Orient. (?) It signifies darkness (In. ছায়া) and light (yo, আতপ) negative and positive, female and male (প্রকৃতি পুরুষ) passive and active (যেমন 'দ্বাদুর্পণা') lower and upper (উত্তমাধম) even and odd.....Two flying crows one with its beak closed, the other with its beak open (?).....or two dragons one ascending to the sky, the other descending to the ocean—illustrate the phases of In yo, (vide Page 48 on the Laws of Japanese painting by Henry P. Bowie)

আমাদের ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ 'প্রমাণাণি' (correct, perception, proportion measure and structure of forms) ও চীনষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ (anatomical structure) যে সাধারণভাবে মিলিতেছে তাহা নয়। চীন ও জাপান চিত্রশিল্পে এই প্রমাপ্রয়োগের পুংখানুপুংখ উপদেশগুলিও যেন প্রমাসম্বন্ধে আমাদের চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে। প্রমা অর্থে আমরা বুঝিতেছি কোনো বস্তুর ভ্রমভিন্ন-জ্ঞান—তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির পরিমাণ। জাপান শিল্পের Ichi Isho এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি দিতেছে যথা :—

Ichi and Isho.....they aim to supply and express with sobriety what is essential to the composition, proportion (Ichi) determining the just arrangement and distribution of the component parts, and design (Isho) the manner in which the same shall he handled. (Vide page 46. on the laws of Japanese painting by H. P. Bowie)

প্রমাণ বা প্রমা যে কেবল বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বোঝায় তাহা নয়, প্রমা দ্বারা আমরা বস্তুর দূরত্ব এবং নৈকট্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। চীন-শিল্পশাস্ত্রে এই দূরত্ব ও নৈকট্য বুঝাইবার নীতিটিকে বলা হইয়াছে :—

En kin.....So for as the perspective is concerned, in the great treatise of Chu Kaishu entitled the "Poppy Garden Art Conversation" a work laying down the fundamental laws of landscape painting, artists are specially warned against disregarding the principle of perspective called En Kin, meaning what is far and what is near (Vide Page 8. on the Laws of Japanese painting by Henry P Bowie)

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হইতেছে যথা—

"শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্ববরম্ স্মৃতম্"।

(কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস)

চিত্রমাত্রেই অবর,—কি শব্দচিত্র, কি বাচ্যচিত্র—যদি তাহাতে ব্যঙ্গ্য না থাকে ইঙ্গিত না থাকে। জাপানী শিল্পশাস্ত্রে বলা হইয়াছে :—Yu Kashi.....such suggestion or stimulation of the imagination is called Yu Kashi. The Japanese painter is early taught the value of suppression in design. (Vide Page 47 on the Laws of Japanese painting by Henry P. Bowie)

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমাদের বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতির গভীরতম সূক্ষ্মতম চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে চীনের ও জাপানের চিত্রসম্বন্ধে ষড়দর্শন। নানা দিক দিয়া ভারতে ও চীনে যেরূপ যোগাযোগ দেখা যায় তাহাতে আমার বোধ হয় যে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের চতুঃষষ্টিকলা ও আলেখ্যের এই ষড়ঙ্গটি চীনে নীত হইয়াছিল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ভারতের দশাবিপর্য্যয়

(Dela Mazeliereএর ফরাসী হইতে)

মোঁগল-আমলের ভারতীয় সভ্যতার স্থূল রেখাগুলি ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিরূপে এই সভ্যতার দ্রুত অধঃপতন হইল এক্ষণে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

দুইটি মূল তত্ত্বের উপর মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম, কেন্দ্রগত শাসন-প্রণালী :—ঔরংজেব দাক্ষিণাপথের সমস্ত রাজ্যগুলিকে বশীভূত করিয়া উহাদিগকে রাজধানীরূপ কেন্দ্রের শাসনাধীনে আনিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিংশতি বর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ, এই রাজ্যগুলিকে, মোগল-সাম্রাজ্যকে, এবং সেই সঙ্গে মুসলমান আধিপত্যকেও বিধ্বস্ত করিল।

দ্বিতীয়, হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে মিলন :—ঔরংজেবের উৎপীড়নে পূর্ব্ব-বিদ্বেষ পুনরুত্তেজিত হইল। যথেচ্ছাচারী ঔরংজেব, আকবরের কার্য্য বিধ্বস্ত করিলেন; তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এই রাষ্ট্রনীতির পরিণাম স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল।

কেন্দ্রগত শক্তির দুর্ব্বলতা।—উত্তরাধিকারের নিয়ম অনিশ্চিত। ইহা হইতেই ষড়যন্ত্র, বেগম মহলের বিবাদ বিসম্বাদ, হত্যাকাণ্ড, বিদ্রোহ। অনেকগুলি মোগল সম্রাট গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। তন্মধ্যে একজনের (১৭১২) প্রাণদণ্ড হয়, আর একজনের চক্ষু-উৎপাটন করা হয়, আর তাহাকে বেত্রের দ্বারা প্রহার করা হয়। প্রকৃত প্রভুত্ব সেই নির্লজ্জ ভাগ্যান্বেষী ওয়াকীলদিগের হস্তে ছিল; তাহারা স্বীয় শত্রুদিগের প্রাণবধ করিত, একই জায়গীরগুলি পুনঃ পুনঃ বিক্রয় করিত, রাজকোষ ও প্রজাদিগের ধন লুণ্ঠন করিত; প্রায়ই উহারা শিশু-সম্রাটদিগকে রাজসিংহাসনে বসাইত। এক বৎসরের মধ্যে (১৭২০) এইরূপ তিনজনকে বসাইয়াছিল।

সামন্ত শ্রেণীর শাসনকর্ত্তাদিগের ক্রমশঃ স্বাধীনতা লাভ।—দুইজন বড় বড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন—তন্মধ্যে একজন হাইদ্রাবাদের নিজাম (১৭২০—৪৮), আর একজন—অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা (১৭২২—৪৩)। বাঙ্গালার ও কার্ণাটিকের নবাবেরাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। মহীশূরের রাজাও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরাৎ হাইদর আলি নামক এক ভাগ্যান্বেষী মুসলমানের হস্তে নিপতিত হন। এই হাইদর-আলির পুত্র টিপু-সুলতান (১৮৮২—৯৯) দাক্ষিণাত্যের একজন প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি হইয়া উঠেন।

মধ্য-এসিয়া হইতে বিজয়াভিযান।—মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনে, মধ্য-এসিয়ার দস্যুরা আবার ভারত আক্রমণ করিল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারসীকেরা ক্রোড় ক্রোড় টাকা লুটিয়া লইয়া যায়। পরে ১৭৪৭ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ—ইহার মধ্যে আফগানেরা সমস্ত পশ্চিম প্রদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করে—একটি বৃক্ষ, একটি জীবজন্তু, একটি অধিবাসী মনুষ্যও রাখিয়া যায় নাই!

***

হিন্দুদিগের বিদ্রোহ।—অপরিসীম শৌর্য্য-বীর্য্য সত্ত্বেও রাজদূতগণ ঔরংজেবের কামান ও নিয়ন্ত্রিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আরও দুইবার পরাজিত হয়। শেষে সামন্তযুগের প্রায় অন্তিমদশা উপস্থিত হইল।

অশ্বারোহী যোদ্ধৃ-সঙ্ঘের পর, গণ-সঙ্ঘের আবির্ভাব হইল। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে,—পরে, মধ্য-ভারতে মারাঠারা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক, কৃষিকার্য্য শেষ করিয়াই উহারা লাঙ্গল ছাড়িয়া ঘোটক-পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিত এবং মুসলমান-দিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িত, সেকেলে পলিতা-বন্দুক হইতে গুলি ছুঁড়িত। শিবাজি নামক এক রাজপুত সেই সকল মারাঠার দলকে একত্র করিয়া তাহাদের রাজা হইয়া বসিল। কিন্তু বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করা দূরে থাকুক, শিবাজী কখন ঔরংজেবকে কখনবা দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল এবং সেই সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ, বিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইল।

শিবাজীর অক্ষম উত্তরাধিকারিগণ, স্বকীয় প্রভুত্ব ব্রাহ্মণ মন্ত্রিদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিল। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ পেশোয়া নাম ধারণ করিয়া পুণা-নগরে এক কুলানুক্রমিক রাজবংশ স্থাপন করিল। রাজা, কোন এক অপ্রধান রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন, পেশোয়া মারাঠা দলসঙ্ঘের দলপতি হইয়া দাঁড়াইল। এই মারাঠা-দলসঙ্ঘ সমস্ত মধ্য-ভারত জয় করিয়া সেখানে চারিটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিল। এই রাজবংশ নীচশ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী জনপ্রসূত।

কেননা, এই মারাঠারা কৃষক ছিল—ইতরসাধারণ লোক ছিল, এবং তাহারা বরাবর এই ইতর সাধারণের ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। এই গণতন্ত্রী লোকদিগের সৈন্যমণ্ডলীও গণমণ্ডলীর অনুরূপ ছিল।

প্রথম আরম্ভকালে এই কৃষকের দল, যে সকল ঘোড়া তাহাদের ক্ষেতের কাজে লাগিত সেই সব ঘোড়ায় চড়িত ও বাজে বল্লম ব্যবহার করিত। কিছুকাল পরে তাহাদের রীতিমত অশ্বারোহী সৈন্য হইল, নিজ নিজ দলের লোকেরা তাহার খরচা যোগাইত। ক্রমে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হইল, মাথার পাগড়ী হইল,—পাগড়ীর ঝুলান অংশ পশ্চাৎ দিকে হেলানো; খাটো কোর্ত্তা, আঁটসাট পায়জামা—তাহার দ্বারা জঙ্ঘা আচ্ছাদিত; আর পাদুকা;—ইহাই তাহাদের সৈনিক পরিচ্ছদ হইল। তাহারা দাড়ী রাখিত। প্রথমে তাহাদের শুধু ঢাল তলোয়ার ছিল, পরে বন্দুক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, য়ুরোপীয় শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক গঠিত, এই মারাঠা সৈন্য, প্রবল তোপ কামানে সুসজ্জিত হইয়াছিল। এবং যদিও পাণিপথের প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধে (১৭৬১) নব-গঠিত মারাঠা-পদাতিক সৈন্য, লৌহ বর্ম্মাবৃত দীর্ঘকায় আফগানদিগের কর্ত্তৃক

নিষ্পেষিত হয়,—তথাপি এই মারাঠা সৈন্য অচিরাৎ শত্রুদিগকে আবার আক্রমণ করিয়া সমস্ত উত্তর-ভারতকে বশীভূত করে। তাহাদের সেনাপতি সিন্ধিয়া এই সময়কার একজন বিষম দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। একজন চাষার জারজ পুত্র এই দলপতি মারাঠা, সিন্ধিয়া নামক এক শাখা-জাতির প্রভু হইয়া পড়িল। ইনিই শেষে গোয়ালিয়ারের রাজা হইলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি নির্ব্বাসিত মোগল সম্রাটকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন; আবার ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ইঁহারই হস্তে সমস্ত প্রভুত্ব ছাড়িয়া দেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহার পর দিল্লি ইংরাজের অধিকারে আইসে।

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীগণ।—পঞ্জাবে, প্রাচীন জেঠজাতির বংশধর শিখেরা, নানক ও শিখ-গুরুদিগের ভক্ত হইয়া উঠিল। দশম ও শেষ-গুরু গোবিন্দ শা (১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়) মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং খাল্‌সা বা ঈশ্বরের সৈন্যমণ্ডলী নামে এক সামরিক মিলন-সঙ্ঘ সংগঠন করেন। লাহোরের প্রথম রাজা রণজিৎ সিংহের অধীনে শিখদিগের বিভিন্ন শাখাজাতি, অবশেষে পঞ্জাব, কাশ্মীর ও সমস্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রভু হইয়া দাঁড়াইল (১৭৪০—১৮০৯)।

সেখানেও, দশ শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পর, হিন্দুরাই মুসলমানদিগের উপর জয় লাভ করে।

***

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের চিত্রটি সম্পূর্ণ করিতে হইলে, য়ুরোপীয়দিগের দিগ্‌বিজয় ও ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক; পোর্ত্তুগী, দেনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী। দুপ্লে কর্ত্তৃক দক্ষিণাত্যে, ও ক্লাইভ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কতকগুলি রাজ্য স্থাপিত হইল। জমি আবাদ করিবার জন্য, বাণিজ্য করিবার জন্য, রাজাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য, এবং তাহাদের সৈন্যপরিচালনা করিবার জন্য—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে কতকগুলি ভাগ্যান্বেষী আসিয়াছিল; তুর্ক-ফৌজ, আফগান-ফৌজ, আরব-ফৌজ, এমন কি কাফ্রি-ফৌজও ছিল। দস্যুদল ছিল, ঠগের দল ছিল;—এই ঠগেরা বণিক-দল বা যাত্রী-দলের-সহিত মিশিয়া রাত্রিকালে উহাদিগের গলায় ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিত। হসমের বর্ণনা অনুসারে—মুসলমান-নগর-গুলিতে, লোকের রীতি-নীতি সৌখীন ও মনোরম ছিল; তাহাদের সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বারাণসীর ন্যায় খাস হিন্দুনগর-গুলিতে, যাত্রীর দল বিকটাকার বিগ্রহাদির পদতলে আসিয়া সমবেত হইত, চিতাগ্নিতে সতীদাহ হইত। দুঃখ কষ্টের পরিসীমা ছিল না; রাজাদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিত; অসৎ রাজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারে প্রজারা নিপীড়িত, করভারে ভারাক্রান্ত। জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। যে সময়ে বাবর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সে সময় অপেক্ষা ভারতের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দী।—ইহার মধ্যবর্ত্তী কালের ভারতীয় ইতিহাসের স্থূল রেখাগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি। মোগলেরা সমস্ত ভারতকে বশীভূত করিয়াছিল; এই দ্বিতীয়বার ভারত স্বকীয় ঐক্যসাধন প্রত্যক্ষ করিল। কিন্তু এই ঐক্যসাধনের কার্য্যটি অতীব ক্ষণস্থায়ী; যে রাজবংশের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধ সেই রাজবংশের শাসনাধীনে, বিজিত বিজেতার মধ্যে মিলন না হইলে, সাম্রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব। তাই মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু এই মিলন স্থায়ী হইল না; সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হইল; ভারতে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল।

ভারতের ঐক্যসাধনের এই দ্বিতীয় চেষ্টার পরিণাম প্রথম-চেষ্টার পরিণাম হইতে ভিন্নপ্রকারের। অশোকের দিগ্‌বিজয়, অশোকের রাজ্যশাসন,—সমস্ত ভারতের উপর ভারতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ভারতকে নৈতিক ঐক্য প্রদান করিয়াছিল। মধ্যযুগে, মুসলমানদিগের অধিষ্ঠান, [illegible] জাতিসমূহের ও সম্প্রদায়সমূহের [illegible] —প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মনৈতিক একত্ব [illegible] করিয়া দিল। তখন হইতে হিন্দুরা [illegible] য়ুরোপীয়দিগের সভ্যতা গ্রহণ করিতে [illegible] হইল—যে য়ুরোপীয়েরা, অশোক ও আকবর যাহা পারে নাই সেই কার্য্যসাধনে সফলতা লাভ করে। এইরূপে, মধ্যযুগের শেষভাগে য়ুরোপের ন্যায় ভারতেও কেন্দ্রগত রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ইহা একটা আগন্তুক ঘটনা মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীসুলভ জ্ঞান, উৎসাহের ভাব, সপ্তদশ শতাব্দীসুলভ [illegible] আদর্শগত "ক্ল্যাসিক" ভাব, অষ্টাদশ শতাব্দী সুলভ কৌতূহলের ভাব ভারতেও পরিলক্ষিত হয়;—কিন্তু সমস্ত রূপান্তরিত আকারে শেষে রহিয়া গেল সামন্ততন্ত্রসুলভ আচার ব্যবহার, জাতিভেদ প্রণালী, হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণের আধিপত্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমাময়

তোমার মধুর কণ্ঠের গীতি
বাজিছে আমার কর্ণে,
বিশ্ব-প্রকৃতি তোমারি মুরতি
এঁকেছে সপ্ত-বর্ণে।
তোমার হৃদয়-ছায়াটী আমার
পড়েছে মানস-কক্ষে;
তোমারি উজল নয়ন-জ্যোতিটি
লেগেছে আমার চক্ষে।
তোমারি সৃজিত কুসুম আমারে
আকুল করেছে গন্ধে,
তোমাময় হ'য়ে, তাই বীণা মোর
গাহিছে তোমারি ছন্দে।

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ণেল আরে প্রেভষ্ট যখন সম্পূর্ণ চেতনা লাভ করলেন, দিন তখন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে;—দিন-সারথি সূর্য্যদেব ধূসর-নীল আকাশের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে গিয়েছেন। প্রেভষ্ট বহুক্ষণ আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন, মন তখন তাঁর পশ্চাৎ-গতি অবলম্বন ক'রে, অতীতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নিকলেট নামটি, বহুবার তারি মুখে শোনা গানটি, তিনি আবার শুনতে পেয়েছিলেন সে কথা তাঁর মনে পড়ছিল, কিন্তু সে গান এখানে আর কে জানতে পারে? সেখানে তিনি একা না আরও কেউ আছে? যা শুনেছেন মনে করছিলেন, সেটা তাঁর কল্পনা না সত্য? —সে কথা জানবার জন্যে তাঁর মন উৎসুক হয়ে উঠেছিল। বাঁদিকে মাথা সরালেন, দেখলেন—চারিদিকেই বিবর্ণ বরফে ঘেরা, ঘাড় সরাতে গিয়ে দেখলেন—তাঁর শরীরের অন্যদিক হ'তে একটী সঙ্কীর্ণ রক্তধারা প্রায় ছয় ফুট দূরে হ্রদের জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে!

এবারে তিনি বুঝতে পারলেন, ফরাসী আর্টিলারী, কামানের গোলাতে জমাট বরফ ভেঙ্গে দিয়েছিল, তারি একখণ্ডের উপর তিনি পড়ে আছেন; তিনি আহত, চলৎ-শক্তি-রহিত, ডিসেম্বর দিনের দারুণ শীতে, জলের মধ্যে ভেসে চলেছেন। আপন অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বারম্বার কেঁপে উঠতে লাগল; পাগলের মত চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন—ক্লেমাঁ আমার কাছে এস, ক্লেমাঁ কোথায় তুমি? তাঁর স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হলো, কাছে হতেই আর-একজন কে নিকলেটের নাম উচ্চারণ করে সেই প্রতিধ্বনির উত্তর করলে।

এই নামটির বারম্বার উচ্চারণ, ক্ষতস্থানে শলাকা প্রবেশের মত তাঁর পক্ষে নিতান্তই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল—তাঁর মনে হতে লাগল—এ তাঁর আসন্ন মৃত্যুকালের মানসিক ভ্রান্তি। আবার একবার মনে হ'ল—নিকলেট সত্যই বুঝি পুরাতন দিনের নিকলেটের মত চটুল গমনে, মন-পাগল-করা হাসি হেসে, এখনি তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হবে, অথচ সেই তখনকার মতই কি সে এমন কাছে কখনই আসবেন না, যে তিনি তাঁকে ধরতে ছুঁতে পারেন? দুর্লভ স্বপ্নের মত, সে কি কেবলি তাঁর আয়ত্তের অতীত হয়ে থাকবে? বুকের পকেটের কাছে একবার হাত দিয়ে বল্লেন হায়! তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, নিকলেটের ছবি খানি তাঁর হৃৎপিণ্ডের নিতান্ত সন্নিকট স্থানটুকু অধিকার করে আর নেই,—রুষ-রাজধানীর প্রধান নর্ত্তকী, সুন্দরী নিকলেট, যেদিন সহসা অন্তর্ধান হলেন, ছবিখানিও সেই দিন হতে স্থানচ্যুত হয়েছিল, সে শূন্যতা আর পূর্ণ হয়নি—তবু স্থিরনিশ্চয় হবার জন্য আর একবার তিনি বেশ মনোযোগের সঙ্গে খুঁজে দেখলেন।

ছবির পরিবর্ত্তে ব্রাণ্ডির ছোট শিশিটি তাঁর হাতে ঠেক্‌ল। সেটি আঁকড়ে ধরে, তারপর আপন অজ্ঞাতেই সেটিকে বা'র করে, মুখে সেই তীব্র মাদক-পানীয় বিন্দু কতক ঢেলে দিলেন। দেহে নূতন-বল-সঞ্চার অনুভব কর্‌লেন, কোনরূপে উঠে বস্‌লেন—এমন করে একলা, সকলের অজ্ঞাতে, মর্‌লে ত চল্‌বে না—সম্রাটের অন্ততঃ জানা আবশ্যক তাঁর এমন সেনা-নায়ক কোথা গেল—তার কি হল। আর কেউ আসুক নাই আসুক, ক্লেমাঁ নিশ্চয়ই তাঁকে একবার খুঁজতে আস্‌বেই, এ কথা ভেবে তাঁর মনে আবার আশা ফিরে এল, সাহস প্রবল হল, এতক্ষণ যা কর্‌তে তাঁর একেবারেই ভরসা হয়নি, এবারে তাই কর্‌লেন—সম্মুখে চেয়ে দেখলেন, দৃষ্টি স্থির কর্‌তে কিছুক্ষণ সময় গেল—যখন সে সামর্থ্য হ'ল তখন দেখ্‌লেন, সম্মুখের সাদা জমাট বরফ রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে গিয়েছে, ক্রমে সব কথা তাঁর বোধগম্য হ'ল—কেন যে তিনি চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে একভাবে মাটীতে প'ড়ে আছেন সে কথা বুঝতে বাকী রইল না, তাঁর পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ কামানের গোলায় উড়ে গেছে, বরফের ঐকান্তিক হিমে, ক্ষতস্থানের রক্তপাত বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতেই তিনি এখনও জীবিত আছেন—"চিরকালের মত অক্ষম খোঁড়া—হেক্টর আব্রে প্রেভষ্ট, পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল অসহায় খোঁড়া।"

ধীরে ধীরে অন্যদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, সে দিককার ভাসমান তুষারখণ্ড অধিকতর প্রশস্ত, তারি উপরে প্রায় বিশ ফুট দূরে যেন একটী কালো পোষাকের বোচকা পড়ে আছে মনে হ'ল। হেক্টর ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই নিস্পন্দ বস্তুটিকে বারবার দেখতে লাগলেন, তারপর আপন মনে বল্লেন—"আর একজন আমারি মত আহত হতভাগ্য! হায় বিধাতা, কে ও?" সেই জনশূন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরি মত আর একজনকে দেখে তাঁর ভরসা হল, হয়ত জীবনরক্ষার কোন উপায় হতে পারে। সমদুঃখীর আরো কাছে যাবার জন্যে স্বভাবতই তাঁর মনে আগ্রহ জন্মাল। যুদ্ধের সময় প্রায়ই দেখা যায় সৈনিকেরা আপন পার্শ্বচরের কাছ ঘেঁষে এয়িভাবে দাঁড়ায়। হেক্টর সরবার চেষ্টা করলেন, আহত স্থানে অসহ্য বেদনা বোধ হইতে লাগল। একটু স'রে, আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন; কেননা এই চেষ্টাতেই যে কষ্ট হয় তা'তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্বিগুণ বেড়ে গেল, সমস্ত শরীর স্বেদধারায় আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌লো। সূর্য্যের তীব্র-কিরণ তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করছিল, শ্বেতজমাট তুষারের উপর তীব্র আলোকের অভিঘাতে, চারিদিক যেরূপ অসহ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাতে চোক চেয়ে থাকা আর সম্ভবপর ছিল না। তাঁকে এম্নি নিশ্চল ভাবে পড়ে থাক্‌তে দেখে, হঠাৎ একটা শিকারী পাখী মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়্‌তে লাগ্‌ল, একবার প্রায় মুখের উপর এসে পড়্‌ল। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করতে করতে, আবার উপরে উড়ে চলে গেল। হেক্টর তার উড়ে যাওয়া একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগলেন, মনে ভাবলেন পাখীটা বুঝি কোন সক্ষম সবল পুরুষকে তাঁর সঙ্কটের খবর দিতে গেল। তারপর

আপন উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে করে হাস্‌লেন, বল্লেন—"পাগল হ'য়ে গেলাম নাকি?" আবার দূরে সেই কাপড়ের বোচকার দিকে চেয়ে দেখলেন—আশা হচ্ছিল, তার কাছে যেতে পারলে—তার সঙ্গ পেলে নিজের বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পারবেন। হঠাৎ আবার আশঙ্কা হল, বোচকাটি বোধ হয় শুধু কারো ছাড়া কাপড়ের রাশ, বস্ত্রমাত্র—জীবিত মানুষ নয়। কিন্তু কাপড়ের পুঁটলিটির আকারের ক্রমে পরিবর্ত্তন হ'ল, তখন আর সন্দেহ রইল না; যে সেটি জড়পদার্থ নয়, সজীব প্রাণী।

হেক্টর তখন চীৎকার করে ডাক্‌তে লাগলেন, বন্ধু ওগো বন্ধু! এ আহ্বানের কোনো উত্তর পেলেন না। পাঁচ মিনিট, তারপর দশ মিনিট অতীত হ'য়ে গেল, হেক্টর সেই নিশ্চল কাপড়ের রাশির উপর আপন দৃষ্টি সমাহিত করে বসে রইলেন—ক্রমে সেটি নড়্‌তে আরম্ভ করলে, একখানি হাত উপরে উঠ্‌ল, উপরকার লম্বা কোটটি সরে গিয়ে পরণের মেষ-লোমের পরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর হল—হেক্টর দেখ্‌লেন এ তাঁর বহুদিনের পরিচিত রুষ নোবল গার্ডসদের পরিচ্ছদ; তবে ত তাঁরি পুরাতন কোন সঙ্গীর সঙ্গে একত্রে তুষার ক্ষেত্রের উপর রাত্রি যাপন করেছেন! এই সঙ্গীই কি সারারাত ভ'রে নিকলেটকে নাম ধরে ডেকেছে, থেকে থেকে ব্যাকুল কণ্ঠে তারি গান গেয়েছে? হেক্টর দাঁতে দাঁতে চেপে, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন—বোঝা গেছে, এ তবে সেই! তার পর আবার ভাবলেন বোরিস ভিন্ন, তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে আরো অনেকে নিকলেটকে জান্‌ত, আডাম-ভস্কি তার গান গাইত; ক্ষুদ্র শিবরেফ তার গান জানত—সাধারণ সৈনিকেরা পর্য্যন্ত সে গান কতবার গেয়েছে। রুষ-সম্রাটের প্রকাণ্ড রাজধানী, সেই গানের মধুরধ্বনিতে কতবার প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তার কি আর ঠিক আছে? কিন্তু এ ব্যক্তি তাদের মধ্যে কোন্ জন; গলা বাড়িয়ে দিয়ে হেক্টর বারম্বার সেটা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করলেন, কেবলি ভাব্‌তে লাগলেন এ কে? কে বলে দেবে—এ কে? আরও কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল—এক নিমেষ যেন তাঁর কাছে এক একটি যুগ বলে মনে হতে লাগল, রূঢ় কণ্ঠে বল্লেন—নিকলেট, নিকলেট। আপন পায়ের দিকে চেয়ে দেখলেন—উঠে যাবার শক্তি তাঁর নেই অথচ এ সংশয় আর সহ্য হয় না, যেমন করেই হউক জানা আবশ্যক, এ নির্জ্জন দেশে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গীটি কে? অসহ্য ব্যথা সহ্য করে, নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে, তিনি গড়াতে গড়াতে মরতে মরতে, একবার শেষবার জানবার চেষ্টা করবেন যে, এ ব্যক্তি বোরিস্ কি না? এ চেষ্টার ফল যা হবে তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন, নড়্‌তে গেলেই তাঁর ক্ষত স্থানের মুখ খুলে যাবে—রক্ত বন্ধ করবার কোন উপায় করা সম্ভব হবে না—অবিলম্বে তিনি মারা যাবেন। এ কাজ করবেন কি? মৃত্যুভয় তাঁর ছিল না। তবে যে তাঁর শত্রু তার জন্যে, মৃত্যুকে বরণ করবেন কি? আবার কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে রইলেন—ব্রাণ্ডি যেটুকু খেয়েছিলেন তারি তেজে আর কোন শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভব করছিলেন না। এইবার—এতক্ষণে মাগো

সে কতক্ষণের পর, রুষসৈনিক হাত দুখানি মাথার উপর তুলে, আকাশের দিকে মুখ করে শুলেন। হেক্টর দেখতে না পেলেও, বুঝতে পারলেন, তার চোক দুটী খোলা রয়েছে এতক্ষণের পর তার সংজ্ঞা হয়েছে।

হেক্টর চীৎকার করে প্রথমে ফরাসী তার পর রুষ ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে ও কে? কে গো তুমি কে? এবারেও কোন উত্তর এল না, রুষ-সৈনিক আবার একটু নড়ে চড়ে স্থির হলেন, হেক্টর আবিষ্টভাবে তাকে দেখতে লাগলেন; তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে উঠল। যাকে দেখেছিলেন সে ক্রমে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে উঠে বস্‌ল—সেই ভাবেই স্থির হয়ে রইল;—হেক্টর তার মুখ দেখতে পেলেন না, কেন না সে তাঁর দিকে পিঠ ফিরে বসে ছিল। হেক্টর চীৎকার করে বল্লেন, আরে জন্তু, তুই যদি রাজকুমার বোরিস হ'স, তা হ'লে আমার দিকে মুখ করে ফিরে বো'স্।

যে ব্যক্তির উদ্দেশে কথাগুলি বলা হ'ল, তাঁর নীলবর্ণ বনাতে সোনালি কাজকরা পোষাক; বৃষ্টি বরফ পড়ে জমিতে কালী ধরেছে, হেক্টরের দিকে পিঠ ফিরে বসে ছিলেন; মাথা নীচু, পিঠ নুয়ে পড়েছিল, তবুও সেই আহত পৃষ্ঠখানির ব্যবধান যেন হেক্টরের চোখের সম্মুখে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত আলোক ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। ভ্রু কুঞ্চিত করে, চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চয় করে, মুখের মধ্যে গোঁফ টেনে নিয়ে, চিবতে চিবতে, হেক্টর আপন পিস্তল খুঁজতে লাগলেন—কোথায় পিস্তল,—নেই! শত্রুর দেখা পাবা মাত্রই এক গুলিতে তাকে মারতে পারলেন না, এই বড় আপশোষ হ'ল; তবুও এ কাজ যে কর্‌বেন এমন কথা পূর্ব্বে কখনো ভাবেন নি। পিস্তল গেছে, তলওয়ারখানা তখনও ছিল, ভাঙ্গা কোমরবন্ধ হতে সেখানি আস্তে আস্তে বা'র করলেন, ধার পরীক্ষা করে দেখলেন—তলওয়ারের মুখ পড়ে গেছে, চারি দিকে মরচে ধরেচে—দেখে শুনে খুব সেখানি পাশে রাখলেন। হঠাৎ আবার বাতাস আরম্ভ হল—চারিদিক্ হ'তে গুঁড়ো বরফ ঝেঁটিয়ে নিয়ে ছড়াতে লাগল, হেক্টরের চোখে মুখে সেই তুষার ধূলি প্রবেশ করে; তাকে অন্ধপ্রায় করে দিলে, সর্ব্বাঙ্গে এমি জোরে আঘাত করলে, যে, তিনি সহসা একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, আপন পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন—সম্মুখের জলস্রোত, ঊর্দ্ধে নীল আকাশের দিকে দেখলেন—তার পরে আপনার বাঁদিকে চাইলেন—সেই খানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে রইল—কতদিন কোন যুগ যুগান্তর পরে, হেক্টর আবেনে প্রেভষ্ট আর প্রিন্স বোরিস একে অপরকে দেখলেন। সে জমাট বরফক্ষেত্রে তাঁরা দুজন ভিন্ন আর কেহই হয়ত বেঁচে ছিল না। হেক্টরই প্রথম কথা কইলেন—"আমি কেবলি তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি"।

বোরিস উত্তর করলেন—"আমি ত কখনো পালিয়ে বেড়াইনি। জমাট বরফ তো ভেঙ্গে গেছে, আমরা হ্রদের জলের উপর ভাসছি"।

"তাইত দেখছি একই আশ্রয়ে তোমার আর আমার একটুখানি বিশ্রাম স্থানের এখনো অভাব হয়নি।" "হ্যাঁ এখনও কিছুক্ষণের জন্য আছে বটে।" হেক্টর চুপ করলেন, শত্রু ও তাঁর মধ্যে কতখানি

জমির ব্যবধান, তাই মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন—তারপর কি করবেন, কি বলবেন সে বিষয় তিনি মন স্থির করবার পূর্ব্বেই বোরিস জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কেমন করে আহত হলে।"

হেক্টর বল্লেন—"হাঁটুর নীচে হতে আমার পা কামানের গোলায় উড়ে গেছে, তোমার কি হয়েছে?" "আমার পা দুটোও ভেঙ্গে গেছে দেখছি।"

"ভেঙ্গে গেছে—একেবারে যায় নি ত?" "নিতা বটে, একেবারে যায়নি—ঘাগরার মত এখনও ঝুলে, লুটিয়ে আছে।"

এই কথাবার্ত্তার পর দুজনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলেন, হেক্টর ব্রাণ্ডির শিশিটি আপন মুখের কাছে তুলে ধরলেন, পান করবার আগে কিছুক্ষণ থেমে রইলেন—অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোরিসের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন; বিড় বিড় করে বললেন "কেবলি মেয়ে মানুষের কথাই ভাব্‌ছে।" আবার শিশিটী মুখের কাছে তুলে ধরলেন—সেই একই চিন্তা দ্বিতীয়বার তার পানের বাধা জন্মাল, জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কাছে ব্রাণ্ডি আছে কি?" বোরিস উত্তর করলেন—"না ভাই আমি যে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া তাত জানই, ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করা আমার কোষ্টিতে লেখেনি।"

হেক্টর শিশিটী তুলে ধরলেন—দারুণ শ্রান্তি দূর করবার ব্যাকুলতায় বোরিসের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আগ্রহ যতই হোক, তবুও প্রসন্ন মুখের ভাবটির কোন ব্যতিক্রম হ'ল না।

হেক্টর শিশিটি বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন, তাঁর কিছুতেই ইচ্ছা নয় যে সেটি হাতছাড়া করেন, কিছুক্ষণ স্থির ভাবে ভেবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন বল্লেন—"বোরিস তুমি জান, রুষসম্রাট যখন তাঁর বড় পিয়ারের পোল,-রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করতে আমায় নিষেধ করলেন, তখন সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবার জন্যেই আমি নোপোলিয়ানের অধীনে কাজ নিয়েছিলাম, সেইজন্যেই আমার রুষরাজধানী ছেড়ে আসা, —আজ সারাটা দিন আমি তোমায় খুঁজেছি, আর তুমি পালিয়ে বেড়িয়েছ।

"আমি পালাব—কখনই না—অদৃষ্ট আমাদের ভিন্ন করে রেখেছিল"। "আমি ছাড়বার পাত্র নই তা তুমি বেশ ভালই জান, তোমাকে খুঁজতেই আমি তুষারক্ষেত্রে এসেছিলাম—কামানের গোলার আঘাত পেয়ে অক্ষম অবস্থায় এখানে পড়ে আছি, যে কামানের গোলায় আমার পা দুখানি গেছে আশা করি তারি আঘাতে তুমিও খোঁড়া হয়েছো, এখনও সময় একেবারে যায়নি, তোমার আমার দুজনেরি তলওয়ার আছে, আমাদের স্ফূর্ত্তি করে দেখ্‌তে হবে,—যে হারবে, সে যেমন করে পারে অন্যের কাছে এগিয়ে আস্‌বে, যাই হোক্—যুদ্ধের কারণ যেমনি অসহ্য হোক, তবুও আমাদের বংশের কেহ কখনও ছোটলোকোমি করেনি, আমিও কর্‌বনা, সমানে সমানে লড়াই হবে। এ ব্রাণ্ডির অর্দ্ধেক আমি খেয়ে শরীরে বল পেয়েছি, শিশিটা তোমার কাছে দিচ্ছি বাকী অর্দ্ধেক তুমি খাও। হাত উঁচু করে প্রেভষ্ট ফ্লাস্কটি ছুঁড়ে দিলেন—বোরিস সেটি লুফে নিলেন। তৃষ্ণাতুর দৃষ্টিতে সেটির

দিকে একবার চেয়ে দেখে, পরমুহূর্ত্তেই আবার সেটি হেক্টরের দিকে ফেলে দিলেন, বল্লেন—'আরে প্রেভষ্ট, তুমি যখন লড়্তে চাও, তখন যতক্ষণ এ লড়াই না হয়ে যায়, ততক্ষণ তোমার দেওয়া কিছু আমি নেব না।

তখন প্রায় মধ্যদিন, সূর্য্য তীব্র উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার ক'রে, আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে সিংহাসন স্থাপন করেছিলেন, খর রৌদ্রের প্রেরণায় তুষারখণ্ডে গতিসঞ্চার হ'য়ে সে আবার ভেসে চলেছিল, হ্রদের স্রোতোবেগে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে, আর এক তুষারখণ্ডের সন্নিকটস্থ করে দিলে, উভয়ের সংঘর্ষ সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠল। আহত উভয় ব্যক্তিই এই সংঘাতের বেদনা অনুভব করলেন; কিন্তু কেবলমাত্র হেক্টরই দেখ্তে পেলেন, তুষারক্ষেত্রের বৃহৎ একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। এই ঘটনায় ভীত না হ'য়ে যা করবার জন্যে তিনি উৎসুক ছিলেন, সে বিষয়ে তাকে আরও ত্বরান্বিত করে দিলে। যে ব্যক্তিকে তিনি ঘৃণা কর্তেন তার দিকে চেয়ে—জিজ্ঞাসা করলেন "বোরিস আমার কাছে টাকা আছে তোমার কাছে আছে কি?"

পোলাণ্ডবাসী বোরিস্ উত্তর করলেন আছে বই কি—তারপর হেসে বল্লেন—এখানে এ অবস্থায় অর্থে কোন্ অর্থ সাধন কর্বে? হেক্টর বোরিসের এলঘু চেষ্টা উপেক্ষা করে বল্লেন, তা হলে আমি একটা ফরাসী আধ্লা তোমার কাছে ছুড়ে দিচ্ছি--তুমি আমায় একটা চার আনি ফেলে দাও, দুটিই আয়তনে, ভারে সমান। যদি আমার চৌআনি তোমার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে না পৌছায়, তবে আমি তোমার কাছে এগিয়ে যাব, আর যদি তোমার আধলা আমার নাগাল না পায় তা হলে তোমাকে আমার কাছে আস্তে হবে। বোরিস্ এ প্রস্তাবে রাজী হলেন।

যুদ্ধে আমি যখন তোমায় আহ্বান করছি তখন তুমিই আগে আধলা ফেলো। —হেক্টরের কথায় সম্মতি জানিয়ে বোরিস বল্লেন—তাই হবে, অধিকার তোমারই বটে।

বোরিস কোন যত্ন চেষ্টা মাত্র না করে অবহেলার সঙ্গে আধলাটি ছুঁড়ে দিলেন, মুহূর্ত্তকাল সেটি সূর্য্যালোকে ঝক্মক্ করে উঠল, তারপর সেটি ফরাসী হেক্টরের বুক বেশের বুকের বোতামের উপর পড়ে টং করে বেজে উঠ্ল। তারপর হেক্টর আরে প্রেভষ্ট আপন হাত ওঠালেন, মুদ্রাখণ্ডটি মুহূর্ত্তকালের জন্য সজোরে ধরলেন; যদি এ বাজীতে হারেন, তা হলে, তাঁকে কি কষ্টই বরণ করতে হবে তা তিনি বুঝেছিলেন—তাই তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর হাতটা একটু খানি কেঁপে উঠল। যাই হোক তাঁর চৌ আনি বোরিসের কাছ অবধি পৌছিল না —আধ পথে বরফের উপরে রৌপ্যনিক্কণে বেজে উঠ্ল। তিনি বল্লেন—তাইত আমারই তোমার কাছে যেতে হ'ল দেখ্ছি! তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনও কাতরতা ছিল না। এই চলবার চেষ্টাতেই হয় ত তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘট্বে, সে কথা মনে করে কিছুমাত্র ভীত হন নাই। উর্দ্ধে আকাশের দিকে একবার

চেয়ে দেখলেন, সে নির্ব্বিকারনীলিমা কোথাও কোন খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘের দ্বারা লেশমাত্র দ্বিধা-ভিন্ন নয়, বরং দণ্ডকয়েক পূর্ব্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা সুনীলতর। তীর ভূমি ক্রমে তাঁর দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্ল। চলন্ত তুষার ক্ষেত্র ক্রমেই হ্রদসীমানার নিকটবর্ত্তী হয়ে এল; পর্ণহীন নিঃসঙ্গ গাছটী তখনো অসম সাহসিক প্রহরীর মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সর্ব্বাঙ্গ কামানের গোলায় ক্ষত বিক্ষত, তবু সে নিরুপায় ভাবে আত্ম সমর্পণ করেনি! তুষারখণ্ডটি যেমন ভাবে ভেসে চলেছিল যদি সেই ভাবেই চলে, তবে তীরের এমন নিকট গিয়ে পৌছবে, সেখান হতে সাহায্য প্রার্থনা করে কাউকে আহ্বান করা সম্ভব হ'বে—কিন্তু তার পূর্ব্বে?

"তার পূর্ব্বে যা হবে তা আমরা জানি"! —শত্রুর দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে তিনি ছোট ছেলের মত হামাগুড়ি দিয়ে চল্বার চেষ্টা করলেন—একখানি পা তো কামানের গোলায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, অতি সামান্য নড়বার চেষ্টাতেও তাঁর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হচ্ছিল—সে যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ হ্রাস করবার জন্যে উপুড় হয়ে, কনুইএর উপর ভর দিয়ে, অতি ধীরে শরীরখানি প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্লেন—চেষ্টা সফল হল—কিন্তু সে চেষ্টায় কি মৃত্যুসমধিক বেদনা বোধ হল, তা তিনি ছাড়া আর কারো বোঝা অসাধ্য,—প্রথম রক্তবিন্দু, পরে লোহিত রেখা দেখা দিল, অবশেষে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হ'ল। হেক্টর বোরিসের যতই কাছে হতে লাগলেন শ্রান্তিতে, কষ্টে তাঁর গর্ব্বিত মস্তকটি বার বার ততই নুয়ে পড়তে লাগল—বার বার অশ্রান্ত-অধ্যবসায়ে সে মস্তক উন্নত করলেন সত্য, কিন্তু এই অসাধ্য সাধনে তাঁর মুখ মৃত্যু-পাংশুল হয়ে উঠল, নিমীলিত নেত্র দুটি অসহ্য যাতনায় নিমেষে নিমেষে স্পন্দিত হ'তে লাগল। যুবরাজ বোরিস হেক্টরের পাণ্ডুনীল মুখের দিকে চেয়ে কতকালের কত কথা মনে কর্তে লাগলেন —সেই দুজনের আজন্ম বন্ধুত্ব, কৈশোর যৌবনের কত সুমধুর স্মৃতি,—আর আজ কিনা সেই বন্ধু তাকে আপন হাতে মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্যই, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে। করুণার্দ্র সুরে বোরিস্ হেক্টরকে বল্লেন—"থাক্ আর এগিয়ে আস্বার চেষ্টা কোরনা তুমি যে আর পারছ না।"

একথার উত্তরে হেক্টর তাঁর তরবার উত্তোলন করবার চেষ্টা করলেন, কৃতকার্য্য হলেন না, অক্ষম হস্ত ছিন্ন-লতিকার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়্ল, সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে এল, মাথা ঘুরে উঠল, পৃথিবী চোখের সম্মুখ হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ অবধি এই দুর্ব্বলতার সহিত যুঝতে যুঝতে হেক্টর বল্লেন "তবে কি যুদ্ধের আগেই মৃত্যু এসে আমায় হার মানাবে! অবসন্ন শরীর মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে মৃৎপিণ্ডের মত নিশ্চল পড়ে রইল।

বোরিস্ শ্বাসরুদ্ধ করে বারম্বার বল্তে লাগলেন, "হায় হায়, একি দুর্দ্দৈব, একি বিড়ম্বনা।" যদিও পাশ ফিরতে বোরিসেরও বড় কষ্ট হচ্ছিল তবুও ফিরলেন, ব্রাণ্ডির

শিশিটিতে কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা দেখলেন, অকস্মাৎ তাঁর হাতে কি উষ্ণস্পর্শ অনুভব করে চেয়ে রেখলেন, হেক্টরের ভগ্ন পিষ্ট জানু হ'তে অজস্র ধারে রক্ত ঝরে পড়ছে। ব্যাপার কি বুঝতে বাকী রইল না। একদিন যাকে ভাইয়ের অধিক ভালবাস্‌তেন, সেই বন্ধু তাঁরি সম্মুখে, রক্তস্রাবে মারা যাচ্ছে, অথচ তিনি এমন নিরুপায় যে, একবিন্দু জল দিয়েও তাকে সাহায্য করতে পারছেন না। হেক্টর ঠিক তাঁর সম্মুখে এবং তাঁর মাথার একটু উপরের দিকেই শুয়েছিলেন—বোরিস হাত বাড়িয়ে সহজেই তাঁর ক্ষতস্থানের সন্ধান পেলেন, ছিন্ন ধমনীটি চেপে ধরবামাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, যতক্ষণ যন্ত্রণা সহ্য করে, হেক্টরের ক্ষত জানুর ছিন্ন শিরা চেপে রাখ্‌তে পারবেন, ততক্ষণই তার প্রতিপক্ষের আয়ুষ্কাল। অপর কেহ হলে এ ব্যর্থ চেষ্টায় আপনাকে পীড়িত করত না, যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং সন্নিকট তাকে বারণ করা তাঁর সাধ্যাতীত জেনে স্থির হয়ে থাক্‌ত। জন্মমৃত্যুর সেই সন্ধিস্থলে অর্দ্ধপূর্ণ সেই ব্রাণ্ডি শিশিটির লোভ সম্বরণ করা অনেকেরি পক্ষে অসম্ভব হত, কিন্তু সেই অভিজাতবংশসম্ভূত, যথার্থ বীর, মহদন্তঃকরণ বোরিস যে আদর্শে জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র কাজ নিয়মিত করতেন, তাঁর পক্ষে যা সহজ স্বেচ্ছায় মুহূর্ত্ত চিন্তা না করে করেছিলেন, সে কাজের ব্যতিক্রম করা স্বভাব-বিরুদ্ধ বলেই করতে পারেন নি। শত্রু মিত্র কারো বিপন্ন অবস্থায় সুবিধা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

সূর্য্য তখনও সমুজ্জ্বলদীপ্তিতে আকাশে বিরাজিত, তুষার ক্ষেত্র তখনও গতিশীল, একাধিক বার অল্প তুষার ক্ষেত্রের সংঘর্ষে ভগ্নপ্রায়। প্রায়শই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে—একবার সংঘর্ষ কিঞ্চিৎ সাংঘাতিক হওয়ায় একটি প্রকাণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র হয়ে ভেসে গেলে বারম্বার আঘাতে জমাট তুষারে যে ফাটল দেখা দিয়াছিল ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে ভিন্ন হয়ে গেল; বোরিস বল্লেন এর পরিণতি যে কি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি। একটু হাসলেন, যন্ত্রণায় সরল হাসিটুকু বাঁকা হয়ে গেল। তারপর আপন মনে বল্‌তে লাগলেন, দেখ্‌ ভাই বোরিস্‌ ষ্টানলুস্কিণ্টা অনর্থক সরফরাজি কচ্ছে—কি করবে তার স্বভাবই ঐ—সবাই জানে সবাই বলে ডুবে মরার চেয়ে রক্তস্রাবে মরার বোধহয় যন্ত্রণা কমই হতে পারে। তবুও বোরিস হেক্টরের বিচ্ছিন্ন ধমনী হতে হাত সরিয়ে নিলেন, জমাট তুষার সেই একভাবে গলে গলে আকারে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেল!

সূর্য্য দেবের রশ্মি সংযমন শিথিল হ'য়ে এল, তীব্র হিম বাতাসে চারিদিক হায় হায় করে উঠল, বোরিস শুন্‌লেন কে তাঁর নাম ধরে ডাকছে, ফিরে চেয়ে দেখলেন, হেক্টর আর্ত্ত প্রেভষ্টের সংজ্ঞা আবার ফিরে এসেছে—এ আহ্বান তাঁরই। বোরিস অবিলম্বে অথচ ভদ্রভাবে বল্লেন; আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই আছি কিন্তু তখনও হেক্টরের রুধির নিবারণের জন্য ক্ষত স্থান যে চেপে ধরে রেখেছিলেন সে হাত সরিয়ে নিলেন না। হেক্টর সম্পূর্ণ শয়ান অবস্থা হতে কতকটা উঠে বসলেন, পূর্ব্বে কি হয়েছিল সে কথা

স্মরণ হতে তাঁর কিছুক্ষণ গেল; মনে পড়ল, যখন তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁর ক্ষত স্থান হতে জীবন রুধিরের ধারাপাত হচ্ছিল, কিন্তু কৈ এখন তো আর একটুও রক্ত পড়ছে না? চকিতে আড় চোখে একবার আপনার আহত জানুর দিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে বুঝলেন—ঐ বিপদ দূরীকরণ দৈব-উপায়ে হয় নি, মানুষের হাতেই ঘটেছে। হেক্টর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ওকি করছ? বোরিস বল্লেন—তোমার কখন যুদ্ধ করবার সুবিধা হবে তারি অপেক্ষা করে আছি। "যুদ্ধের উপায়টি ভালই আবিষ্কার করেছ, ডানহাত খানি আবদ্ধ, যুদ্ধ হয় কি করে? বোরিস বল্লেন—যেমন করে হয় হবে, তোমার তরওয়াল বার করতো!"

"তলওয়ার বার করলেম যেন, কিন্তু তোমার ডান হাত যে জোড়া।" "তা হোক ডান হাত জোড়া আমাদের দুজনেরি বাঁহাত স্বচ্ছন্দ, কোনও আঘাত পায় নি, এ ঠিক হবে, নাও, এখন তলওয়ার খোল।" হেক্টর বল্লে "ঠিক কি করে হ'ল, তুমিই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ—তুমি যদি আমার ক্ষত স্থানের রক্তপাত বন্ধ না করে রাখতে তবে ত কখন্‌ মরে যেতাম। এ তুমি অন্যায় করেছ;—আবার তুমি আর একবার আমায় বঞ্চনা করলে! যারে আমি বড় ভাল বেসেছিলাম, প্রথম তুমি তাহতে আমায় বঞ্চিত করেছিলে; আবার এখন আমার প্রতিহিংসা হতে আমায় প্রতারিত কল্লে। যে আমার জীবন রক্ষা করেছে তার সঙ্গে যুদ্ধ অসম্ভব, তাই বলে মনে কোরো না আমি তোমার কাছে এতটুকুও কৃতজ্ঞ লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা আমার মনে নাই"। যুবরাজ বোরিস হেক্টরের সব কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু একটি মাত্র কথার উত্তর দিলেন—আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি যাকে ভালবেসেছিলে তাহতে আমি তোমায় বঞ্চিত করেছি।" হেক্টর রূঢ় কণ্ঠে বল্লেন—"করেছই ত, করনি? তুমিই ত নিকলেটকে চুরি করে নিয়েছিলে?" বোরিস্‌ বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কাকে, নিকলেটকে? হেক্টর বিকার গ্রস্তের মত বল্‌তে লাগলেন "একথা অস্বীকার করবার উপায় তোমার নেই—কাল সারা-রাত ভোর তুমিই নিকলেটের নাম ধরে ডেকেছ, তুমি বার বার তারি গাওয়া গান গেয়েছ।"

বোরিস স্থির হয়ে সব শুন্‌লেন, ক্রোধ-বিহ্বল পুরাতন বন্ধুর আরক্ত মুখের উপর হতে দৃষ্টি অন্যত্র রেখে একটু শ্রান্ত হাসি হাসিলেন। সে হাসি ত হাসি না;—আনন্দের লেশমাত্রও তার কোথায়ও ছিল না, সে হাসিতে দুরাশাগ্রস্ত অতীতের, হতাশ বর্ত্তমানের সমস্ত দুঃখ, যেন তুষারের মত পুঞ্জীভূত হয়ে উগ্র ধবলরূপ ধারণ করেছিল। তারপর শান্তভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মনে করেছিলে নিকলেটকে তোমার কাছ হতে আমি চুরি করে নিয়েছিলাম। হায় বন্ধু, আমরা দুজনেই তাকে বড় ভাল বেসেছিলাম, সে কথা কারো কাছে অবিদিত ছিল না। অধীরভাবে হেক্টর আবার প্রশ্ন ক'রলেন, তুমি কি বল্‌তে চাও, নিকলেটকে তুমি চুরি করে নাও নি?" "তুমি

কি তাই বিশ্বাস কর? আচ্ছা আমাদের মধ্যে কি ঠিক হয়নি, যে-কেউ আমাদের মধ্যে সদুপায়ে তাকে জয় করে নিতে পারবে?" "ঠিক বলেছ—সদুপায়ে জয় করবার কথা ছিল।"

"আর তুমি মনে করেছিলে আমার উপায়টা ?"

"তোমার উপায়?—তোমার উপায়টা অতি নীচ, অধম ও দুষ্প্রবৃত্তির পরিচায়ক; তুমি প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সেণ্টপিটার্সবর্গ হতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে, আমি যতদূর জানি, এখনো পর্য্যন্ত তুমি তাকে লুকিয়েই রেখেছ। সে তোমাকে ভালবাসত না, সে শুধু আমাকেই ভালবেসেছিল, কিন্তু তবু জোরজবরদস্তি তুমি তাকে অধিকার করেছিলে, রুষিয়া রাজ্যে এমন ব্যাপার তো প্রতিনিয়তই ঘট্‌ছে।" দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন—তারপর বোরিস হেক্টরের আক্রমণের কোনই প্রতিবাদ না করে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন, "বুঝতে পারছ কি? তুষারক্ষেত্র যে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে।" হেক্টর বল্লেন—"হ্যাঁ বুঝতে পারছি।"

"ভেবে দেখেছ কি, এর চেয়ে ছোট যদি হয়ে যায়, তা হলে এর উপরে আমাদের আশ্রয় আর হবে না, দুজনেই ডুবে মরব?" হেক্টর বল্লেন "হ্যাঁ তাও বাকী নেই।

এর পর বোরিস কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন—পরে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "আমি নিকলেটকে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছি এই ধারণায় তোমার বন্ধু-স্নেহ বৈরীভাবে পরিণত হয়েছে?" হেক্টর নিরুত্তর থেকে বোরিসের যে হাত খানি অক্লান্তভাবে তার ক্ষত জানুর রক্তস্রাব রোধ ক'রেছিল তারি দিকে চেয়ে রইলেন, কিছুপরে উত্তেজিত তীব্রস্বরে উত্তর করলেন—"হ্যাঁ নিকলেটকে আমি প্রাণাধিক ভাল বাসতাম, তাই আজ তোমার প্রতি আমার স্নেহ লেশমাত্র আর নাই।

দারুণ বেদনাহত সেই দুই মুমূর্ষু মানব একে অপরকে স্পর্শ করে পড়ে রইল; —সূর্য্য পশ্চিমে গড়িয়ে পড়ল, স্বল্পাবশিষ্ট তুষার-আশ্রয় ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এবং মৃত্যুও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সন্নিকট হচ্ছিল।

যুবরাজ বোরিস ষ্ট্যানহুসি আবার আপনা হইতেই জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি যে তোমাকে প্রতারণা করেছি এ কথা এমন করে কে তোমার বিশ্বাস জন্মালে?"

"নিকলেট যে চিঠি রাখিয়া যায় তাহাতেই একথা লেখা ছিল, নতুবা অপরের কথা কি আমি বিশ্বাস করি?

"আরে ভাই—সে যে আমাকেও ঐ একই কথা লিখে দিয়েছিল।"

"তোমাকেও ঐ একই কথা লিখেছিল। তোমার জন্যও পত্র রেখে গিয়েছিল? কি যে বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"তুই ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর্ আমি তো কখন মিথ্যা বলি না আর এই উভয়ের আসন্ন মৃত্যুকালে মিথ্যা বলবার আবশ্যকতাই বা কোথায়? আমরা দুজনেই নিকলেটকে ভালবেসেছিলাম দুইজনেই রুষ সম্রাটের অসন্তোষ অবহেলা করে, তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলাম। সে সুন্দরী মেয়েটি তোমাকে কি আমাকে কাউকেই ভালবাসেনি—সে কথা আমি বেশ ভাল

করেই জানি; তবুও আজ পর্য্যন্ত আমি তাকে ভুলতে পারিনি। সে কর্সিকানের প্রেরিত গুপ্তচর। চলে যাবার সময় আপনার কোন চিহ্নই রেখে যেতে ইচ্ছা করেনি। তোমার কাছ হতে রাজেন্দ্র লুই এর সংবাদ এবং আমার কাছ হতে পোলরাজ্যের নিগূঢ় অবস্থা জেনে নেবার জন্যই তার আসা। যখন তার সে উদ্দেশ্য সাধন হল, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটালে তার স্বার্থ সাধন হয় না, তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, সে ধরা পড়তে পারে, তাই আমাদের উভয়কে অনুরূপ পত্র লিখেই পরস্পরের মধ্যে বিরূপ ভাবের সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিল। এর চেয়ে সুনিশ্চিত মর্ম্মঘাতী উপায় আর সে খুঁজে বার করতে পারত না। নির্ঘাত কিসে বাজবে, সে তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আমি তো ঠাঁই ছাড়া হলাম না, দেশ আঁকড়েই পড়ে রইলাম, তুমি বিদেশে চলে গেলে, কোনও একটি আশ্চর্য্য ঘটনায় সত্য যা' তা' আমার কাছে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল। যা কথা বলছি প্রত্যয় যাচ্ছ ত?"

হেক্টর স্থির নির্ব্বাক হয়ে রইলেন, অবিশ্বাস তাঁর মনে হতে চলে গিয়েছিল, নেপোলিয়ানের গুপ্তচর চারণা সকলেরই কাছে বিদিত ছিল। বোরিসের বিবরণে অসম্ভব কিছুই ছিল না, তা ছাড়া বোরিস যা বলেছিল সে কথাও খুব ঠিক্; মৃত্যুকালে মিথ্যার প্রয়োজন আর থাকে না।

হেক্টর সাবধানে পাশ ফিরে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন ভাই—"কেন মিছে আর কষ্ট পাস্, মরতেই যখন হল আয় দুজনে আরামেই মরি—তোর হাতটা উঠিয়ে নে, আর মিছে কষ্ট করে কি কাজ?" এ কথার উত্তরে বোরিস অন্য হাত দিয়ে হেক্টরকে জড়িয়ে ধরে' বল্লে "দেখ সম্মুখে একবার দেখ।"

প্রবলপ্রতাপান্বিত ফরাসী সম্রাটের পক্ষে যে কাজ সাধ্যায়ত্ত হয়নি দরিদ্র হীনপদবী অখ্যাতনামা জ্যাক ক্লেমাঁ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল। দূরে হতে ভাসমান তুষার ক্ষেত্রের উপর একটি কালো পদার্থ দেখে মৃত্যু অবজ্ঞা করে, একখানি দীর্ঘ দণ্ড ধারণ করে একখণ্ড বরফের উপর হতে অপর খণ্ডে লাফিয়ে পড়ে, একগাছি দীর্ঘ রশির সাহায্যে সে তার প্রভুর কাছে এসে পৌঁছে ছিল—ক্লেমাঁকে দেখে হেক্টর হাত বাড়িয়ে দিলেন, বোরিস পুরাতন আবেগপূর্ণ বন্ধু স্নেহে সে হাতখানি জড়িয়ে ধরে হেসে বল্লেন—"ভাইয়া দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবার মধ্যে বাকী দেখছি মোটে ত এক খানি পা, বড় চমৎকার দৃশ্য কি বল?" তাঁর কণ্ঠস্বরে সেই চিরন্তন স্নেহের ললিত রাগিণী ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল, স্নিগ্ধ নেত্রযুগলে নবোদিত আনন্দ রশ্মি অপূর্ব্ব ঊষার সূচনা করে দিলে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্রোতের ফুল

(৬)

মালতীর বাপের বাড়ী ছিল কলিকাতার সন্নিকট বেহালা গ্রামে। বিবাহের একমাস পরেই মালতী যখন বিধবা হইল, তখন তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এই বিষকন্যা সর্ব্বনাশী চক্ষুশূল বৌকে বাড়ী হইতে দূর না করিয়া জলগ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। মাস না ফিরিতে যে রাক্ষসী তাহাদের অসুরের মতন বলবান সুস্থ ছেলেকে খাইয়া ফেলিল, সেই অপয়া মেয়েকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়া কি শেষে নূতন আর কিছু বিপদ ঘটিবে! মালতীর বয়স তখন সবে পনর বৎসর। সে শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা, আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব, আমায় পায়ে ঠেলো না!" কিন্তু শাশুড়ীর মন কিছুতেই নরম হইল না, তাঁহার শোকার্ত্ত চিত্ত হতভাগিনী বধূর মিনতি ডাইনীর মায়াকান্না বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিল। তখন অগত্যা বাপের বাড়ীতেই আশ্রয় লওয়া ছাড়া মালতীর আর কোনো উপায় রহিল না। নবীন যৌবন যখন তাহার ভাব-শতদলের পাপড়িগুলি একটির পর একটি খুলিয়া খুলিয়া আপনার চারিদিকে অশেষ উন্মাদনা সঞ্চারিত করিতেছিল, যখন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অভিনব আনন্দ তাহার চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়টিতে মালতী তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার দেনাপাওনা চুকাইয়া ম্লান মুখে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

মালতী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাহাকে তাঁহারা গভীর দুঃখে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। মালতীর পিতা ছিলেন নব্যতন্ত্রের লোক; তিনি কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ চেষ্টার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল মালতী নিজে। মালতী তখন ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল,—তাহার কাছে বিধবার বিবাহ অন্যায় ও লজ্জার কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে মায়ের কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল—"মা, বাবাকে বারণ কর, আমি আর বিয়ে করতে পারব না!" সে কাঁদিয়া কাঁদাইয়া তাহার পিতাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য মাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার পিতা তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে তাঁহারা মারা গেলে মালতী যখন একা পড়িবে, তখন তাহার উপায় কি হইবে? মালতী বুঝিল যে পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাহার অভিভাবক কেহ নাই, কিন্তু তবু বিবাহ সে কিছুতেই করিতে পারিবে না।

মালতীর পিতা দেখিলেন মালতীর যে আপত্তি তাহা হিন্দু সমাজের সংস্কারগত অপ্রবৃত্তি মাত্র; তাহা তাহার স্বামীর প্রতি প্রেম-সঞ্জাত নহে; কারণ স্বামীর সহিত তাহার ত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবার অবসরই ঘটে নাই। তখন তিনি কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন—তাহাতে মালতী একটা অবলম্বন পাইবে, এবং জ্ঞানবৃদ্ধি

পরিপক্ক হইলে তাহার মন হইতে বিধবার বিবাহে সংস্কারজনিত আপত্তি দূর হইতে পারিবে।

কিন্তু বছর না ফিরিতে মালতীর পিতার মৃত্যু হইল; এবং তাহার বিবাহের কথাও চাপা পড়িয়া গেল।

এখন সংসারে শুধু সে ও তাহার মা। দুটি বিধবার সামান্য গৃহকর্ম্মের পর উদ্বৃত্ত সময় যখন তাহাদের শোকার্ত্ত মনকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিত, তখন মালতী পুস্তকের মধ্যে আপনার সমস্ত ভয় ভাবনা ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে লেখাপড়া করা তাহার নেশা হইয়া উঠিল।

বছর দুই পরে যখন মাতারও মৃত্যু হইল, তখন সে বুঝিল যে শুধু বই লইয়া থাকা যায় না, মানুষের জীবনে মানুষের সঙ্গ ও স্নেহ মমতারও আবশ্যক আছে। তাহার পরে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা পুরুষেরা যখন অনাথা বিধবার দুঃখে অতিমাত্রায় কাতর হইয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল তখন মালতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুড়ী দাসী হরির মায়ের পরামর্শে তাহার মাসিমার কাছে আশ্রয় লওয়াই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিল। মালতী তাহার মাসিকে কখনো দেখে নাই। এই অচেনা অদেখা মাসির কাছে আশ্রয় লইতেও মালতীর মনে নানা প্রকার ভয় ভাবনা দেখা দিতেছিল। কিন্তু হরির মা তাহাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতেছিল—"মায়ের বোন মাসি, তার কাছে যেতে আর ভয় কি?"

মালতী সাতদিন হইল মাসিমাকে চিঠি লিখিয়াছে। কিন্তু কৈ আজও ত তাঁহার জবাব আসিল না। মালতী উদ্বিগ্ন হইয়া যেন দিশা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বিকাল বেলা। মালতী মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে; হরির মা তাহার চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে নীরবে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে একটা টাইম্‌পিস ঘড়ী ঘরের নিস্তব্ধতাকে টিটকারী দিতেছে।

মালতী শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল তাহার মাসিমারই কথা। মায়ের আকৃতি-প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া মাসিমাকে সে গড়িতেছিল। দুঃখিনী মালতী প্রাণপণে মাসিমার সেবা যত্ন করিয়া নিঃসন্তান তাঁহার সমস্ত বাৎসল্য পাইয়া মায়ের শোক ভুলিতে পারিবে—এ আশা তাহার হইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল—মাসিমা জমিদারের ঘরণী, তবু তিনি কখনো নিজের বোন বোনঝির খোঁজ খবর ত করেন নাই। সে শুনিয়াছিল বটে যে তাহার মাসিমা বিধবা হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া এখন তাঁহার ভাসুরের আশ্রয়ে আছেন, কিন্তু পরাধীন বলিয়া কি এতটাই পরাধীন যে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর পর্য্যন্ত লইতে পারেন না! আর যদি তিনি তেমনি পরাধীনই হন, তবে তাঁহার কাছে গিয়া তাহাকে না জানি কেমন ভাবে থাকিতে হইবে! আর যদি তেমন পরাধীন না হন তবে সে মাসির স্নেহের ভরসা না রাখাই ভালো!

মালতীর মন যখন এমনি চিন্তামগ্ন তখন সদর রাস্তায় কে একজন গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ হে, অক্ষয়বাবুর বাড়ী কোনটা?

এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র মালতী তাড়াতাড়ি

উঠিয়া জানালা ভেজাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল একজন সুগৌর দীর্ঘ বলিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য ধরণের যুবাপুরুষ তাহাদের পাড়ার নবদ্বীপ কামারকে তাহারই পিতার বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। মালতীর বুকের মধ্যে আনন্দ দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, নিশ্চয় মাসিমা ইহাঁকে পাঠাইয়াছেন।

নবদ্বীপ কামার অবাক হইয়া নবকিশোরের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—এই বাড়ী চৌধুরী মশায়ের। মশায়ের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

নবকিশোর বলিল—আমি অক্ষয়বাবুর মেয়ের মাসির দেশের লোক।

মালতী ইহা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চাপা গলায় হরির মাকে ডাকিয়া বলিল—হরির মা, যা যা ঝপ করে গিয়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে আয়। ওঠ্ ওঠ্।

মালতীর বাড়ীটি সদর রাস্তার ধারে হইলেও, তাহার প্রবেশদ্বার একটি গলির ভিতর। খেজুর কাঠের শাঁকো দিয়া নয়ানজুলি পার হইয়া নবকিশোর বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের প্রাচীরের ধারে একটা সজিনার ও জবাফুলের গাছ, এবং এখানে সেখানে গোটাকতক ক্রোটন, অতীত উদ্যানের স্মৃতির মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; এক পাশে একটা চুনের জালা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। বাহির-বাড়ীতে কোনো ঘর নাই; ভিতর বাড়ীর একটি ঘরের বাহির দিকে একটি রক ও দরজা আছে; সেই ঘরটিই দরকার মতো সদর অন্দর দু দিককারই কাজ চালাইয়া দ্যায়। হরির মা সেই ঘরের দরজা খুলিয়া নবকিশোরকে বলিল—আপনি এই ঘরে এসে বস বাবা, আমি মালতী দিদিমণিকে ডেকে দিচ্ছি।

সেই ঘরে একটা বিড়াল কুণ্ডলী পাকাইয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। তাহার সুষুপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়া আলোক ও লোকের সমাগম হওয়াতে সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল; প্রথমে সে আকৃষ্টগ্রীবা ধনুকের ন্যায় উষ্ট্রভঙ্গীতে পিঠ ফুলাইয়া আলস্য ত্যাগ করিল; তারপর পালোয়ানের ডন ফেলার মতো হাত পা ছড়াইয়া নিজেকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া কোমর টানিয়া হাই তুলিয়া সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। একটু আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, উঠানের মাঝখানে ঘাসের বনে জল থিতাইয়া ছিল; বিড়ালটি প্রতিপদক্ষেপের পর ভিজা পা তুলিয়া ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া নূতন-জুতা-পরা সৌখীন বাবুর মতো অতি সন্তর্পণে জল পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে প্রস্থান করিল।

নবকিশোর একখানি চেয়ারে বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরটিতে আসবাবের বাহুল্য নাই; যাহা আছে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিপুণা গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণ হস্তের সেবার সাক্ষী; ঘরের জানালাগুলিতে ও দরজায় নানান রঙের ছিটের, ছেঁড়া ঢাকাই কাপড়ের ঝালর-দেওয়া পর্দ্দা টানা রহিয়াছে, ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল ঘিরিয়া চারখানি চেয়ার; একপাশে একখানি তক্তপোষ, সবগুলি সূচের কাজকরা সুন্দর সুজনি দিয়া ঢাকা। দেয়ালের ধারে একটি কাঠের আনলা; দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও খানকয়েক ফটোগ্রাফ সুসজ্জিত।

হরির মা দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল—মালতী দিদিমণি এসেছে।

নবকিশোর দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী মালতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আমি তোমাকে মথুরাপুরে নিয়ে যেতে এসেছি।.....আমি অসঙ্কোচে প্রথমেই তোমায় তুমি বলছি, তাতে কিছু মনে কোরো না। তোমার যিনি মাসিমা, তিনি আমার খুড়িমা। দাদা ছোট বোনকে আপনি বললে কেমন শোনায়?

মালতী এই নবাগত আগন্তুকের অসঙ্কোচ সরল অমায়িকতা দেখিয়া প্রীত হইল। সে স্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে বলিল—এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আমাকে আপনি বললেই অন্যায় হত।...আপনি মথুরাপুর থেকে কবে এলেন? মাসিমার কোনো চিঠি না পেয়ে বড় ভাবছিলুম।

মালতী আজন্ম বাপের বাড়ীতেই পল্লীগ্রামে প্রতিপালিত বলিয়া ঘোমটাটানা সঙ্কুচিত লজ্জার সহিত তাহার কখনো পরিচয় হয় নাই; বিবাহের পরও তাহার মাথার উপর শ্বশুরবাড়ীর কোনো রকম চাপ না পড়াতে সে অসঙ্কোচ স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছিল—শাশুড়ীর শাসন, ননদের খোঁটা, তাহাকে কৃত্রিম ভব্যতায় আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে পারে নাই। অধিকন্তু তাহার পিতা আপিসে বা বিদেশে গেলে আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা সমাদর করিতে হইত তাহাকেই। ইহাতে তাহার প্রকৃতিগত নারীত্বের মাধুর্য্য অভ্যাসগত স্বাধীন অসঙ্কোচ ভাবের সহিত মিশিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব রকমে কোমল অথচ শক্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিল।

নবকিশোর এই তরুণী রমণীর অসঙ্কোচ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমি কলকাতাতেই থাকি, মথুরাপুর থেকে চিঠি পেয়ে তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

এমন অসম্পূর্ণ কথায় সন্তুষ্ট হইবার পাত্রী মালতী নহে। সেইজন্য সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—আপনাকে মাসিমা নিয়ে যেতে লিখেছেন, কিন্তু আমায় ত কোনো খবরই লেখেন নি?

নবকিশোর এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া বলিল—খুড়িমাই ঠিক চিঠি লেখেন নি। তিনি পরাধীনা, সব সময় ইচ্ছামত কাজ করে উঠতে পারেন না। খুড়িমার ভাসুর হরিবিহারী বাবু, তাঁর ছেলে বিপিনকে চিঠি লিখেছেন; বিপিন আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—আপনি বিপিন বাবু নন? আমরা তাঁর নাম শুনেছি। মাসিমা বিধবা হলে তিনিই তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। আমি মনে করেছিলাম আপনিই বিপিন বাবু। আপনি তবে বিপিনবাবুদের কে হন?

—তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো রক্তসম্বন্ধ নেই। আমার বাবা তাঁদের পুরোহিত। তোমার মাসিমা সেই সূত্রে আমাদের সকলেরই খুড়িমা—চাকর দাসী গোমস্তা পাইক সকলেই তাঁকে খুড়িমা বলেই চেনে।

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—আপনি কি চিঠি পেয়েছেন একবার দেখতে পারি কি?

নবকিশোর মালতীর অতিরিক্ত সাবধানতা

দেখিয়া ও সপ্রতিভ জেরা শুনিয়া মনে মনে প্রীত হইতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—অপরিচিতকে সনাক্ত করা দরকার হবে বুঝে চিঠি সঙ্গেই এনেছি।...এই নাও—বলিয়া নবকিশোর পকেট হইতে দুখানি চিঠি বাহির করিল এবং পাছে ভুল হয় এজন্য সতর্ক হইয়া নিজের নামের চিঠিখানি আগে পকেটে রাখিয়া দিয়া বিপিনের নামের চিঠি-খানি হরির মায়ের হাতে দিল।

কিন্তু যে-ভুল করিবে না বলিয়া সতর্ক হইতে চাহিয়াছিল, সেই ভুলই ঘটিয়া গেল। সকালে তর্কের ঝোঁকে বিপিনের নাম-লেখা খামে ভট্টাচার্য্য মহশেয়ের চিঠি এবং নব-কিশোরের নাম-লেখা খামে হরিবিহারী বাবুর চিঠি স্থান পাইয়াছিল। মালতী স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের চিঠিতে তাহার চিঠি পাওয়া হইতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার সমস্ত বিবরণ অবাক্ হইয়া পড়িতে লাগিল।

মালতীকে স্বামীবিয়োগের দুঃখের পর কয়েকদিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীর অনাদর উপেক্ষা সহ্য করিতে হইয়াছিল; তখন সে বালিকা মাত্র, তাহার পিতামাতার স্নেহপ্রলেপ তাহার সকল বেদনা শীঘ্রই উপশম করিয়া দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুর পর তাহার যে দারুণ বেদনা মাসির কাছে সান্ত্বনা পাইবার আশা করিতেছিল, সেই মাসির উদাসীন উপেক্ষা মালতীর বুকে ব্যথার উপর বড় বেশী করিয়া বাজিল। সে মনে মনে মাসির যে স্নেহকল্যাণী মূর্ত্তি গড়িয়া-ছিল তাহা এই আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তাহার মাসির কাছে তাঁহার নং গর্ব্বই যে তাহার বিপদের চেয়ে বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই অপমানের আঘাতে তাহার মনের কানায় কানায় পূর্ণ দুঃখ অভিমানের অশ্রুতে উপ্‌চিয়া পড়িতে লাগিল।

নবকিশোর মালতীকে কাঁদিতে শুনিয়া মনে করিল তাহা পিতামাতার মৃত্যুশোক। তাই সান্ত্বনা দিয়া বলিল—দুঃখ করো না। আমাদের খুড়িমা বড় স্নেহময়ী, তাঁর কাছে গেলে তুমি মাসির যত্নে মায়ের অভাব বুঝতে পারবে না.....

মালতী ক্রন্দনবিজড়িত দৃঢ়স্বরে বলিল—হ্যাঁ চিঠিতে যে রকম স্নেহের পরিচয় পাচ্ছি তাতে তাঁর স্নেহ বেশী পেতে আর প্রবৃত্তি নেই! তাঁর কাছে আমি আর যাব না।

মালতীর কথা শুনিয়া নবকিশোর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি বলিতেছে? তারপর হঠাৎ তাহার মনে হইল চিঠি দিতে সে বোধ হয় গোলমাল করিয়া বসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে অপর চিঠিখানি বাহির করিয়াই বুঝিল যে-কথা সে ঢাকিতে চাহিয়াছিল অসাবধানে তাহা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সে লজ্জিত হইল। মালতীর তেজদৃপ্ত বাক্য শুনিয়া তাহার আনন্দও হইল। একটি নিরাশ্রয়া যুবতীর মুখে অমন তেজের কথা শুনিয়া নবকিশোর সলজ্জ স্মিতমুখে বলিল—তুমি যদি যাবে না, তবে এখানে তোমার চলবে কি করে?

—কোনো মেয়ে-স্কুলে চাকরী নেব। আমি একলা মানুষ বৈ ত নয়, কোনো রকমে চলে যাবেই।

বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়ের এমন স্বাব-লম্বনের সাহস আছে, নবকিশোরের সে জ্ঞান

ছিল না। তাহার মন মালতীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিতেছিল। মালতীকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য নবকিশোর বলিল—এখানে তোমাকে দেখবে শুনবে কে?

—ভগবান, আর আমি নিজে।

নবকিশোর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি অমন ভয়ে ব্যস্ত হয়ে খুড়িমাকে চিঠি লিখেছিলে কেন?

মালতী লজ্জিত হইয়া গলার স্বর নামাইয়া থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—সংসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প বলে ভয় হয়।

—এখনো ত সে ভয়ের কারণ দূর হয়নি?

—ভগবান যখন আমাকে সংসারে একলা না ছেড়ে দিয়ে ছাড়বেন না, তখন বাধ্য হয়েই সংসারকে চিনে নিতে হবে। যতক্ষণ অপরিচয় ততক্ষণই ত ভয়...

নবকিশোর আর মালতীর কথা ভালো করিয়া শুনিতেছিল না। সে মনে মনে মালতীর সহিত তাহার চেনাশোনা মেয়েদের তুলনা করিতেছিল। মালতীর পাশে তাহা-দের ছবি হাস্যোদ্দীপক মনে হইতেছিল। নবকিশোর সঙ্কল্প করিল যেমন করিয়া হোক মালতীকে মথুরাপুরের জমিদারের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া ফেলিতে হইবে; মালতীর আদর্শ, সংসর্গ ও চেষ্টার দ্বারা সেখানকার মূর্খ পরকুৎসাপ্রিয় স্ত্রীসমাজকে ভাঙিয়া গড়িতে হইবে।

নবকিশোর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার মাসির ব্যবহারে তোমার মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার একবার তাঁর মানসিক অবস্থাটাও বিচার করে দেখা উচিত। এককালে তিনি যাদের সমকক্ষ শরিক ছিলেন, তাদের দুষ্ট চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখন তিনি তাদেরই দ্বারস্থ। তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার সময় তাঁর অভিমান একটু যদি তীক্ষ্ণ হয়েই থাকে তবে সে কি একেবারে অমার্জ্জনীয়?.....তুমি তোমার মাসিকে চেন না, আমরা কিন্তু আমাদের খুড়িমাকে খুব ভালো করেই চিনি।

মালতী একটু ভাবিয়া বলিল—তা হতে পারে। কিন্তু যেখানে এক দিকে ভিক্ষা আর অন্য দিকে উপেক্ষা, সেখানে ভিক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি করে মাসিমাকে কুণ্ঠিত অপমানিত করাও ত আমার উচিত হবে না। তাঁকে যে এমনতর ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় জানলে কখনো তাঁকে চিঠি লিখতাম না।

—এখানেও তোমার চেয়ে আমাদের জানবার সুবিধা বেশী। বিপিনের মা জমি-দারের অশিক্ষিতা গৃহিণী, তাই তিনি খাম-খেয়ালি, গর্ব্বিতা, অসহিষ্ণু; কিন্তু আসল মানুষটি বড় সাদা, বড় স্নেহশীলা, অল্পেই তাঁহাকে তুষ্ট করা যায়, রাগ তাঁর বেশীক্ষণ থাকে না। যদি তাঁর খেয়াল বুঝে চলা যায় তবে তাঁকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। খুড়িমা সেইটি পারেন না বলেই যত গণ্ডগোল বাধে। বিপিন মধ্যস্থ হয়ে দু দিক সামলায়। বিপিন বাড়ী থাকলে এত গণ্ডগোল হত না। বিপিন শিগ্‌গিরই বাড়ী যাবে, তখন আর কোনো গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকবে না। .....তোমার আর কোনো ওজর-টোজর শুনব না। এই দেখ হরিবিহারী বাবু তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি বিপিনের হয়ে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি;

তোমাকে যেতেই হবে। সে বাড়ীতে তোমার যাওয়ার দরকার আছে; তোমাকে দিয়ে আমরা ঢের কাজ করিয়ে নেব। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক কাজ করবার মতলব ঠাওরে রেখেছি, তোমায় গিয়ে তাতে সাহায্য করতে হবে। ……স্পষ্ট কথা বলতে কি তোমাকে প্রথমটা একটু বিরাগ তাচ্ছিল্য হয়ত সহ্য করতে হবে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকবে না।

মালতী নবকিশোরের সরল সবল চরিত্রের আভাস পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিল; সে চুপ করিয়া রহিল। নবকিশোর ইহাতে প্রীত হইয়া বলিল—কালকেই আমরা রওনা হব তবে, কেমন? যাত্রার দিনের জন্যে পাঁজি খুঁজতে হবে না ত?

মালতী হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—না। পাঁজির ধার ধারি নে।

নবকিশোর দরাজ গলায় জোরে হাসিয়া বলিল—তবে ত তোমাকে মথুরাপুরে আমরা না নিয়ে গিয়ে ছাড়বই না। আমাদের দুই বন্ধুর অখ্যাতি আছে যে আমরা পাঁজি পুঁথি মানি নে; তুমি গেলে আমাদের দলে আর একজন বাড়বে।……তুমি তা হলে সমস্ত গুছিয়ে ঠিক হয়ে থেকো, আমি কাল এসে নিয়ে যাব। এখন তবে আমি যাই।

নবকিশোর ছাতা চাদর লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—একটু মিষ্টিমুখ না করে' যাওয়া হবে না।

নবকিশোর সমস্ত ঘর ভরিয়া হাসিয়া বলিল—সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতন আমারও যে মিষ্টান্নের প্রতি বিষম পক্ষপাত এ কথা আমার এই প্রকাণ্ড শরীরটা কিছুতেই গোপন রাখতে দেয় না। তা দাও, আমার আপত্তি নেই।

হরির মা আসন পাতিয়া জলখাবারের ঠাঁই করিয়া দিলে নবকিশোর আসনে গিয়া বসিল। ক্ষণকাল পরেই সলজ্জ স্মিত মুখে মালতী জলখাবারের রেকাবি হাতে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। নবকিশোর এতক্ষণ মালতীকে দেখিতে পায় নাই, মালতী অন্তরালে বসিয়াই কথা বলিতেছিল। এখন তাহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নবকিশোর মুখ তুলিয়াই দেখিল তাহার কি অপরূপ রূপ! একখানি ধোয়া নরুন পেড়ে শাড়ীতেই এই নিরাভরণা তরুণীকে রাণীর মতো মহিমাময়ী দেখাইতেছিল। নবকিশোর সসম্ভ্রমে আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। মালতী তাহার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

(৭)

জেদের বশে খুড়িমা মালতীকে নিজের কাছে আনাইবার চেষ্টায় বিরত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু মন তাঁহার নিশ্চিন্ত ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন— কোন্ সেই দূর দেশে তাঁহার বোনঝি রহিয়াছে; সে এই নিষ্ঠুর সংসারে একেবারে একা। শুধু আছে তাহার পরিপূর্ণ যৌবন আর অপরূপ রূপ! কে তাহাকে এইসব শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিলমাত্র অশুচিতা যদি তাহাকে কলঙ্কিত করে তবে তাহার লজ্জা ও প্রত্যবায়ের ভাগী তিনিও। ধিক্ ধিক্ তাঁহার ক্রোধকে, কেন তিনি এমন দারুণ

শপথ করিয়া বসিলেন, এ প্রবৃত্তি তাঁহার কেন হইল? হতভাগা মেয়েটার জন্য শত্রুর কাছে মাথা হেঁট ত সেই করিতেই হইল, অথচ কোনো কাজ হইল না! মেয়েটা কি এমনি অপয়া—যেখানে পা দিয়াছে সেখানেই আগুন জ্বালিয়াছে! কি কুক্ষণেই তাহার জন্ম। পরের গলগ্রহ হওয়ার যে দৈন্য এতদিনের অভ্যাসের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল মালতীর জন্যই ত তাহা আজ তাঁহার নিজের ও পরের কাছে নূতন হইয়া উঠিয়াছে! কি লজ্জা! কি লজ্জা! মালতীর এখানে আসিয়া কাজ নাই, তাহার না আসাই ভালো! কিন্তু সে যে অনাথা! আহা সে যে ছেলেমানুষ! তাহার মুখের দিকে তাকাইতে দ্বিতীয় লোক যে আর কেহ নাই!

খুড়িমার মন এমনি ভাবে একবার মালতীর দুঃখে কাতর হইতেছিল, আবার নিজের আহত অভিমান তাঁহাকে কঠিন করিয়া তুলিতেছিল। বিরাগ ও মমতার মধ্যে তাঁহার চিত্ত দোল খাইয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে মালতীর সম্বন্ধে তিনি উদাসীনই থাকিবেন অথবা তাহার জন্য কিছু চেষ্টাই করিবেন।

এমনি অমীমাংসার মধ্যে কয়দিন অবিশ্রাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মালতীকে আনিবার জন্য হরিবিহারী বিপিনকে ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবকিশোরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা খুড়িমা জানিতেন না। হরিবিহারী একান্তবাসী মিতবাক্ মানুষ, তিনি এ কথা কাহাকেও বলা আবশ্যক মনে করেন নাই; পাছে মালতী আসিয়া পড়ার আগে তাহার আসার সংবাদ প্রকাশ পাইলে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে ভট্টাচার্য্যও সে কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি কেবল খুড়িমাকে সান্ত্বনা দিতেন—মা, ভেবো না, যেমনটি হলে ভালো হবে নারায়ণ ঠিক তেমনি করে দেবেন। আমরা কতটুকু ভাবতে পারি মা, আমাদের ভাবনা তিনিই ভাবছেন।

বাস্তবিক খুড়িমা ভাবিয়া চিন্তিয়া কূল-কিনারা পাইতেছিলেন না। তিনি বেদনা-কাতর দেহমন ঠাকুরের পায়ের কাছে লুটাইয়া দিয়া চোখের জলে নিবেদন করিতেন—হে ঠাকুর, আর পারিনে, আর পারিনে। রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা কর!

একদিন প্রভাতে খুড়িমা ঠাকুরঘরে বসিয়া অশ্রুজলে ঠাকুরের পূজা করিতেছেন, এমন সময় অন্দরের দেউড়িতে পাল্কীবেহারার ক্লান্ত কলরব শোনা গেল।

অন্দরে একটা কৌতূহলের সাড়া পড়িয়া গেল। এমন অসময়ে বিনা সংবাদে আসিল কে? গিন্নি পর্য্যন্ত যখন জানেন না, তখন ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। ছেলে মেয়ে আর দাসীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। বৌঝিরা উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ঘন ঘন দরজায় উঁকি মারিতে মারিতে সম্ভব অসম্ভব নানান রকম আন্দাজ করিতে লাগিল।

খুড়িমার কাহারও সহিত সম্পর্ক নাই। তিনি ঠাকুরঘরেই চুপ করিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। যে আসিল সে যদি মালতী হয়!—এই সম্ভাবনায় আনন্দ ও ভয়, আশা ও দুঃখ তাঁহার মন বিমথিত করিতে লাগিল, তাঁহার

বুকের ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সকলকে ঠেলিয়া রোহিণীই আগে দেউড়িতে দৌড়িয়াছিল। সে গিয়া দেখিল নবকিশোরের পশ্চাতে একটি জীবন্ত প্রতিমা অন্দরের দিকে আসিতেছে। রোহিণী সম্ভ্রমে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এত রূপ যাহার সে কি মানুষ!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—অবাক হয়ে কি দেখছ রোহিণী? এ আমাদের খুড়িমার বোনঝি।

রোহিণী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ও যে ঠাকরুণ নয়, পরী নয়, এমন কি মেমও নয়, ও খুড়িমার বোনঝি মালতী মাত্র, একজন অতি সাধারণ মেয়ে—যাহাকে লইয়া এই সেদিন এতবড় তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল এ সেই,—ইহা মনে করিয়া রোহিণী আশ্বস্ত হইল! সে একমুখ হাসিয়া বলিল—ওমা! এই খুড়িমার বোনঝি বুঝি! আমি বলি দাদাঠাকুর বুঝি শেষকালে ঘাগরাপরা মেম বিয়ে করে আনলে!

মালতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে চকিতে একবার রোহিণীকে দেখিয়া মাথা নত করিল। রোহিণীর ভাবভঙ্গী তাহার মোটেই ভালো লাগিল না।

নবকিশোর রোহিণীর দিকে এমন তীব্র ভাবে চোখ রাঙাইয়া তাকাইল যে রোহিণী দ্বিতীয় রসিকতার জন্য উদ্যত রসনা সংযত করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়া পলাইল। সে নবকিশোরকে ভালো রকমই চিনিত।

রোহিণীকে ফিরিতে দেখিয়া সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন বর্ষণ করিতে লাগিল—কে রোহিণী? কে রে? কে এসেছে?

রোহিণী তখন খুড়িমাকে খবর দিয়া জ্বালাইবার জন্য ব্যস্ত। সে ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ওগো, আমাদের খুড়িমার ঘাগরাপরা মেম বোনঝি এসেছে গো!

নবকিশোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মালতী উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছেলে মেয়েরা চারিদিক হইতে নবকিশোরকে জড়াইয়া ধরিয়া কলরব করিতেছিল। বিনোদ বলিল—দাদাঠাকুর, তুমি এলে, বড়দা এল না?···এইবার তোমায় রোজ একটা করে গপ্প বলতে হবে কিন্তু!

পাঁচু বলিল—হ্যাঁ, সেই সাত ভাই চম্পার গপ্প!

বিনোদ বাধা দিয়া বলিল—না না, ও ত পুরোণো গপ্প। সেই সোনার কাঠি রূপোর কাঠির গপ্প, সেই রাজপুত্তুরের তালপত্র খাঁড়া আর কাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়ার গপ্প বলতে হবে দাদাঠাকুর·····

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে দুই হাতে দুইটা মাথা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—হাঁ রে হাঁ, বলব রে বলব, সব বলব। এখন বাঁদররা একটু থাম দেখি, দেখছিস নে তোদের একজন নতুন দিদি এসেছে? ও ঢের গপ্প জানে। যা, ওর সঙ্গে সব ভাব করগে যা।

ছেলেরা সবিস্ময় কৌতূহলে অপরিচিতা আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৌয়েরা নবকিশোরকে দেখিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া দুই

আঙুল ঘোমটা ঈষৎ ফাঁকা করিয়া মালতীকে দেখিতেছিল। ঝিউড়িরাও নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কেহই অগ্রসর হইয়া মালতীকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল না।

রোহিণীর বিদ্রূপে মালতীর মনের মধ্যে কান্না জমিয়া উঠিয়াছিল; এখন সকলের বিরাগভরা ব্যবহারে তাহার অশ্রু রোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—এ কি এ কোথায় আসিলাম? সকলের এত তাচ্ছিল্য সহিয়া এখানে টিকিয়া থাকিব কেমন করিয়া? এমন ভাবে সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য হইয়া আর কতক্ষণ লজ্জা পাইতে হইবে? কেহ কি তাহাকে একবার ডাকিয়া তাহাদের নিজেদের মধ্যেকার একজন করিয়া লইবে না? মাসিমা, তিনিই বা কোথায়?

নবকিশোর মালতীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া করুণ সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহা লুকাইবার জন্য মালতী মাথা নত করিল। এই অপরিচিত বিরূপ নারী-মণ্ডলীর মধ্যে একা নবকিশোরকে বন্ধু দেখিয়া যতই সে তাহার প্রত্যাশা করিতেছিল ততই তাহার ভয় বাড়িতেছিল যে পরের ঘরে নবকিশোর কতক্ষণ তাহাকে আগলাইয়া থাকিবে? এই-সমস্ত বিরূপ লোকেদের বিরাগ সহ্য করিয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। মালতী এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া নিরাশ্রয়ের হতাশ দুর্ব্বলতায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইতেছিল। আর সে নিজেকে যেন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

এমন সময় বিনি তাহাকে বাঁচাইল। সে এতক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সাহস করিয়া অগ্রসর হইল, এবং মালতীর হাত ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—তুমি আমাল্ দিদি? তুমি গপ্প বলবে?

মালতী সমুদ্রে যেন কূল পাইল। সে তাড়াতাড়ি বিনিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিতেই তাহার সকল চেষ্টা ভাসিয়া গেল—প্রভাতবায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে শুভ্র সুন্দর শিউলি ফুলের মতো অশ্রু-বিন্দুগুলি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ বাড়ীর কেহ একজন তাহাকে আদর করিয়া আত্মীয় বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছে! তাহার সমস্ত লজ্জার গ্লানি এই ছোট্ট মেয়েটুকু আদর দিয়া মুছিয়া দিয়াছে!

মালতী তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচলে মুছিয়া নবকিশোরের দিকে সকরুণ প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরাইল। নবকিশোরও এতক্ষণে কিছু বলিবার অবকাশ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; সে বলিল—এ আমাদের বিনি, আর ইনি আমাদের মা.....

বিনি পাছে মালতীকে ছুঁইয়া ফেলে এই ভয়ে গিন্নি তাড়াতাড়ি বিনিকে ধরিতে আসিয়াছিলেন; তিনি ধরিবার আগেই মালতী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল; গিন্নি তাহা দেখিয়া কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মালতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই, পায়ের কাছে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া চমকাইয়া পিছু হটে তেমনি করিয়া, তিনি সরিয়া গিয়া বলিলেন—

থাক থাক, আমায় ছুঁয়ো না।.....বিনি, কোল থেকে নেমে আয় বলছি! নাচতে নাচতে গিয়ে কোলে ওঠা হল! যা রোহিণীর কাছে, ঘাগরা খুলে কাচতে দিগে যা!..... গেলি?

নবকিশোর মালতীর আগমনটা কিছুতেই সহজ করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না বলিয়া সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এখন মালতীকে খুড়িমার জিম্মায় সঁপিয়া দিতে পারিলে নিষ্কৃতি পায়। সে গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিল—মা খুড়িমাকে দেখছিনে, খুড়িমা কোথায়?

তাঁহাকে না জানাইয়া মালতীকে একেবারে আনাইয়া লওয়াটা যে ছোট বৌয়েরই কারসাজি সে বিষয়ে গিন্নির কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি রুদ্ধ রোষে দগ্ধ হইতেছিলেন। নবকিশোরের প্রশ্ন শুনিয়াই তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কে জানে তোমাদের খুড়িমা কোথায় আছেন না আছেন! তাঁরা হলেন রাণী লোক! আমাদের মতো দাসী বাঁদীদের তাঁরা কিছু বলেন, না পোঁছেন।

নবকিশোর নিরাশ্রয় ভাবে একবার চারিদিকে চাহিল। ক্ষমা বলিল—খুড়িমা ঠাকুরঘরে!

নবকিশোর মিনতির স্বরে বলিল—নিয়ে যা-না ভাই ক্ষমা, মালতীকে খুড়িমার কাছে। আমি ততক্ষণ মার সঙ্গে একটু গল্প করি..... বিপিন মাকে অনেক কথা বলতে বলেছে.....

নবকিশোর পুত্রের নামে মাতার হৃদয় জয় করিবার আশা করিতেছিল।

ক্ষমা মালতীর দিকে অবাক হইয়া একবার চাহিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না মেমকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবে, এবং মেমই বা তাহার কথা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষমা মাথার ইঙ্গিতে মালতীকে আহ্বান করিল।

গিন্নি চোখ রাঙাইয়া ক্ষমাকে বলিলেন—আ মর আজুলি ছুঁড়ি! ও ঠাকুরঘরে যাবে কি লা?

ক্ষমা ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার গিন্নির দিকে, একবার মালতীর দিকে, একবার নবকিশোরের দিকে চাহিতে লাগিল।

নবকিশোর চেষ্টা করিয়া হাসিয়া গিন্নিকে বলিল—কেন মা, ও ঠাকুরঘরে গেলেই বা?

গিন্নি বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—গেলেই বা! অজাত কুজাত সকলে অমনি ঠাকুরঘরে গেলেই হল!

—অজাত কুজাত কিসে হল? ও ত তোমারই জায়ের বোনঝি!

—হলই বা জায়ের বোনঝি! ঘাগরা পরেছে যখন তখন ত ও খিষ্টান হল!

নবকিশোর মালতীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। মালতীর মুখ তখন লজ্জায় অপমানে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

নবকিশোর গিন্নিকে বলিল—ও ত ঘাগরা নয়, ওকে বলে শেমিজ! আবরুর জন্যে আজ-কাল সহরে ও-রকম জামা সবাই পরছে। তোমরা যে কাপড় পর সেই কাপড় কেটে একটা জামা তৈরি করে পরলেই অমনি জাত গেল? জাত এমনি ঠুনকো! আর, ঘাগরা পরলেই যদি জাত যায় তবে তোমার বিনিরও ত জাত গেছে!

গিন্নি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ছেলেমানুষে আর বুড়ো মাগীতে সমান হল!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—তোমরা জাত মান জানি, তোমাদের ঠাকুররাও জাতের বিচার করেন দেখছি! তোমাদের মতন গুটিকয়েক শুচিবেয়ে লোকেরই শুধু দেবতা! তাঁরা আর কারো কেউ নন! অথচ কথায় কথায় তোমরাই বল যে দেবতা পতিত-পাবন!

গিন্নি নবকিশোরের যুক্তির কাছে পরাজিত হওয়াতে উষ্ণ হইয়া হাত ও নখ নাড়িয়া বলিলেন—পতিতপাবন বলে' কি মেলেচ্ছ এসে ঠাকুর ষজাবে! চাঁদপানা মুখ দেখে তোরা মাথায় করে নাচবি বলে' কি আমরাও জাত খোয়াব, না, ঠাকুরকে অপবিত্তর করব? তুই লেখা পড়া শিখে কি হলি বল দেখি কিশোর? শাস্তরে আছে, সেলাই করা কাপড় পরে দেবকার্য্য হয় না, তা জানিস? নইলে দরজিরা মোছলমান হলো কেন তা বল!

—না মা, ওসব শাস্তর আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমের পাণ্ডাদের দেখেছ ত? তারা দিব্যি তুলো ভরা জামা পরে পূজো করায়। তার বেলা?

—দেবতার পাণ্ডা আর আমরা এক হলাম! তোর জ্ঞান বুদ্ধি কবে হবে কিশোর? তো হতেই এত বড় ভটচায্যি গুষ্টিটার নাম ডুবলে দেখছি!

নবকিশোর দেখিল এ তর্ক মীমাংসা হইবার নয়। ওদিকে মালতী শিথিলবৃন্ত ফুলটির মতো নিরাশ্রয় দাঁড়াইয়া আছে। তাই নবকিশোর হাসিয়া বলিল—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিশোরের হবে না মা। আমার আশা ছেড়ে দাও। মালতী ছেলেমানুষ আছে, ওকে গোবর টোবর খাইয়ে যদি শুদ্ধ করে নিতে পার ত তাতে তোমার নাম-যশ আর পুণ্য দুইই হবে। ওর সমস্ত ভার ত তোমাকেই নিতে হবে। খুড়িমা ত ওকে আনাতে চাননি, ও তোমার যশ শুনেই ত তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে.....

এই কথায় গিন্নির মন খুসী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তা এসেছে যখন তখন কি আর আমি তাড়িয়ে দেবো? কিন্তু তোমায় বলে রাখছি বাছা, ওসব মেলেচ্ছপনা তোমায় ছাড়তে হবে। এ নয়, সে নয়, বিধবা মানুষের এই ধারা, ছি!.....ছোট বৌয়ের আক্কেলকে বলিহারি যাই! মেয়েটা এক পহর এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা একবার উঁকি মেরে দেখার নামটি নেই। ছোট বৌ, ও ছোট বৌ!.. ...

খুড়িমা ঠাকুরঘরে থাকিয়াই টের পাইয়াছিলেন মালতী আসিয়াছে। তিনি বিগলিত অশ্রুধারা রোধ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে রোহিণী গিয়া কর্কশ ব্যঙ্গস্বরে বলিল—ওগো খুড়িমা, তোমার ঘাগরা-পরা মেম বোনঝি এসেছে যে, দেখসে!

খুড়িমা নিশ্চল মুদ্রিত নেত্রে বসিয়াই রহিলেন, রোহিণীর কথার কোনো সাড়াই দিলেন না।

রোহিণী বিরক্ত হইয়া ফিরিতেছিল, পথে গিন্নির সহিত দেখা হইল। গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোট বৌ কোথায় রে রোহিণী।

রোহিণী খুড়িমাকে ভেঙচাইয়া বলিল—ঠাকুরঘরে চোখ বুজে ধ্যান হচ্ছে। বললাম বোনঝি এসেছে, কানে কথা তোলা হল না।

গিন্নি ঠাকুরঘরে গিয়া ডাকিলেন—ছোট বৌ!

খুড়িমা গলায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুপ্লাবিত করুণ দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের দিকে চাহিলেন।

তাহা দেখিয়া গিন্নির মন ভিজিল। তিনি নরম সুরে বলিলেন—শুধু শুধু কাঁদছিস কেন ছোট বৌ? মা-মরা মেয়েটা এসেছে, তাকে দেখ শোন। আয় আয় বেরিয়ে আয়.....

অনেক কষ্টে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিয়া খুড়িমা বলিলেন—দিদি, আমি এই ঠাকুরঘরে বলছি আমি ওকে আনাই নি, ঘুণাক্ষরে জানিও না যে ও আসবে। ও তোমারই আশ্রয়ে এসেছে; তুমিই ওর মা মাসি; তুমিই ওকে দেখবে।

গিন্নি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—হাঁ তা ত দেখবই। তবু তুই একবার এসে দেখ।..... কিন্তু বলে রাখছি ছোট বৌ, এ বাড়ীতে ওসব মেলেচ্ছ চাল চলবে না।

খুড়িম' এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গিন্নির পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই দেখিলেন নবকিশোরের পশ্চাতে একটি পরমা সুন্দরী তরুণী দাঁড়াইয়া আছে! এই অপূর্ব্ব রূপসী তাঁহার বোনঝি! এ কী রূপ! ডাগর চোখ দুটি লজ্জায় নত হইয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে; নিটোল গাল দুটিতে লজ্জার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরণে একটি শেমিজ বেড়িয়া একখানি চুল-পেড়ে ধুতি। ঘোমটায় মাথার অর্দ্ধেক ঢাকা; কালো রেশমের মতো চুলগুলি শুভ্র সুন্দর কপালখানির উপর ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে। একগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সুগোল মণিবন্ধটি আলিঙ্গন করিয়া আছে।

এ সব দেখিয়া শুনিয়া খুড়িমার মন মালতীর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। গরিবের মেয়ের এত রূপই বা কেন, আর এত সাজসজ্জাই বা কিসের জন্য? কিন্তু তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে ইহার জন্য মালতী একটুও দায়ী নহে—গরিব বাঙালী বিধবা বলিয়া বিধাতা তাহাকে রূপ যৌবন স্বাস্থ্য দিবার বেলা একটুও কৃপণতা করেন নাই, এবং মালতীর পিতামাতা তাঁহাদের একমাত্র সন্তানকে একেবারে বিধবার সর্ব্বশূন্য রিক্ত বেশ পরাইতে পারেন নাই। মালতী অভ্যাসের বশেই রূপ ও বেশ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে কাহারও বিরাগ ও কৌতূহলের কারণ হইতে পারে তাহা সে মনেও করে নাই।

নবকিশোর প্রণাম করিয়া সরিয়া গেলে মালতী অগ্রসর হইয়া তাহার মাসিমাকে প্রণাম করিল, কিন্তু এবার সে পায়ের ধুলা লইবার চেষ্টা করিল না। মেয়েটার এই ভব্যতার অভাব ও অহঙ্কার দেখিয়া খুড়িমার মন অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি শুষ্ক কঠোর স্বরে শুধু বলিলেন—এস।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৪)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন ৺ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।* গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে "গুণুদাদা ও আমি প্রায় একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় ছিলেন। আমরা



গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ বাড়ী" আর "ও বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী লইয়া আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার কিছুই ইয়ত্তা নাই; কিন্তু সে সব গল্পেই উবিয়া যাইত, কাজে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেয়ো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া তখনি তাহাকে কাযে পরিণত করিবার জন্য তৎপর হইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক।

"একদিন কথা উঠিল আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন সংবাদ "প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুত নাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। একটা গান ছিল,—

ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে

* ইঁহার তিন পুত্র ঃ—গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ।

ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাসবে লোকে, হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে !—

হাঃ হাঃ হাঃ—এ জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হা হা হা" সুরে অট্টহাস্য হইত আর ধূপধাপ্ শব্দে তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুত নাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন "বসন্ত-উৎসব" হইত। আমি বলিলাম—এসোনা আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি, গুণুদাদার কল্পনা খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোনও এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দন কাননে পরিণত হইল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীর খেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।

"আর একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—আমাদের মধ্যে Free mason এর মত একটা কিছু করিলে হয় না? এই কল্পনাটা গুণুদাদার খুব লাগিল ভাল। এ প্রস্তাবে তিনি খুব অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম—এখনি এর উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক্। দেশী masonic দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হইবে প্রথমে তাহাই স্থির করা যা'ক্। দরজী আসিল, কাপড়ের পরামর্শ বসিয়া গেল। "ও বাড়ীর" সংলগ্ন একটা ছোট বাড়ী নূতন কেনা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে আমাদের Free mason-এর আড্ডা বসিল। Free-mason সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। এ সভায় আমাদের কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহারও কিছু স্থির নাই। এই মাত্র ধারণা ছিল যে, আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একটা "প্রতিজ্ঞা পত্র" লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম্মটা এইরূপ :—এখানে আমরা যাহা শুনিব, যাহা দেখিব বা যাহা করিব, তাহার ইঙ্গিত মাত্র কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না। সে যেন হইল, কিন্তু ঘরের পরিচারক ভৃত্য বুদ্ধু বেহারার সম্বন্ধে কি করা যাইবে? স্থির হইল, আমাদের অন্যতম mason ভ্রাতা অক্ষয় বাবু (প্রসিদ্ধ "কমিক" অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার)—হিন্দি ভাষায় বুদ্ধুকে এই প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। তিনি অমনি বুদ্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন—"দেখো বুদ্ধু, হিঁয়া তোম্ যো কুছ্ দেখো গে, কভি কিসিকো নেই বোল্‌না ইত্যাদি।" বুদ্ধু একথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিয়া উঠিল—"হম্ কেন বল্‌বে মশাই?" সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলিয়াই সে ঘরের ঝাড়পোঁচ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল। ফ্রিমেশানি পালার এই-খানেই ইতি হইল। সৌভাগ্য ক্রমে

আর দেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।" এইখানে জ্যোতিবাবু, গুণেন্দ্রনাথের দয়া ও আশ্রিত বাৎসল্যের একটা গল্প বলিলেন। "আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ঋণগ্রস্ত হইয়া গুণুদাদার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানেই অবস্থিতি করিতেন। পাওনাদার তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী করিবার সুযোগ পাইত না। কোন ঘরের শত্রু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। গুণুদাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের এ বাড়ীতে আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং এই বিপদের কথা জানাইলেন। বেল্ক বদ্ধ—এত রাত্রে—অত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। আমার তখন হাটখোলায় পাটের আড়ৎ ছিল—লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে তখনি টাকা আনাইলাম—তিনি সেই টাকায় ঋণ পরিশোধ করিয়া ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলেন।"

মধ্যে একবার জোড়াসাঁকো-বাড়ীর আগাগোড়া মেরামৎ ও জীর্ণ সংস্কার করিবার প্রয়োজন হয়। সেই উপলক্ষ্যে নৈনানে শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল মহাশয়ের বাগান বাড়ী ভাড়া লইয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে সেখানে কিছুদিন বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটি খুব বড়, দোতালা, বাড়ীর হাতাও খুব বিস্তৃত। হাতার মধ্যেই খানিক দূরে রান্না বাড়ী। রান্না বাড়ীটি বড় বড় গাছে ঘেরা, তার সামনে ঘাট বাঁধান একটা পুষ্করিণী। চাকরেরা রাত্রি ১১টা ১২টার সময় রান্নাঘরের সাম্‌নে দিয়া যদি যায় অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শেষে এমন হইল যে একদিন একটা চাকর, অত্যধিক ভয়ে মরিয়াই গেল। কিন্তু নামে একজন বৃদ্ধ হর্‌করা ছিল। জ্যোতি বাবু কিনুকে ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন; সে উত্তর করিল—"দাওয়ানজীর (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়) মত চেহারা, মাথায় তাঁরই মত পাগ্‌ড়ী কে একজন রোজ রাত্রে রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া জ্যোতিবাবু ভূতের অস্তিত্ব নির্ণয়ে খুব কৌতূহলী হইলেন। বাল্যকালেও তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, এজন্য তিনি মনে মনে একটা গর্ব্বও অনুভব করিতেন। যাহাই হউক, এক্ষেত্রে তিনি ভূত আবিষ্কার ব্যাপারে নিজেই ব্রতী হইলেন। একদিন রাত্রি ১২টার পর একাকী রান্নাঘরের দিকে গেলেন। যেমন রান্নাঘরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, অম্‌নি দেখিতে পাইলেন সত্য সত্যই কে একজন পাগ্‌ড়ী মাথায় দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয় তাঁহার যথেষ্টই হইয়াছিল, কিন্তু গর্ব্ব তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। নিকটতর হইয়া যাহা দেখিলেন তাহা নিতান্তই হাস্যকর। দেওয়ালের একটা জায়গায় খানিক চুন বালি খসিয়া গিয়া স্থানে স্থানে কালো এবং সাদা সাদা রেখাপাত হইয়া সমস্তটা দূর হইতে একটা পাগড়ী-পরা মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। চাকর বাকরেরা ইহাকেই ভূত কল্পনা করিয়া এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু তখন সকলকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন;—সেই হইতে ভূতের ভয়ে আর কেহ মূর্চ্ছা যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি মজার গল্প বলিলেন। সেকালে জ্যোতিবাবুদের

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এদের বন্ধু বান্ধবগণ অথবা বন্ধুপুত্রেরা অনেকে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইহাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিক লাল পাইন্ নামে তখন একজন ছাত্র থাকিতেন। জ্যোতিবাবু স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন রসিক বাবুদের বাড়ী গিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহাদের বাড়ী ঘেঁসিয়া একটা আতা গাছ উঠিয়াছে; কখনকখনও আতা শুকাইয়া শুকাইয়া তাঁহাদের ছাদের উপর পড়ে। রসিক বাবুকে এ স্বপ্নের কথা বলায় তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জান্‌লে?" জ্যোতিবাবু একথা তাঁহার বড়দাদাকে



মনোমোহন ঘোষ

(দ্বিজেন্দ্রনাথ) বলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু আবার এই কথা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে বলেন। প্যারীবাবু তখন খুব spiritualism এর অনুশীলন করিতেছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা শরীর ছাড়িয়া বাহির হইয়া কখনকখনও অন্যত্র যায়। এ স্বপ্ন বৃত্তান্তটি তিনি তাঁহার মতের পোষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু আরও যে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন তাহা এইখানে বলি।—"আমাদের যোড়াসাঁকো বাড়ীতে তিনি যে ঘরটিতে থাকিতেন, সেই ঘর (তিনি চলিয়া গেলেও) অনেক দিন পর্য্যন্ত "মনমোহনের ঘর" বলিয়া অভিহিত হইত। সকালে দেখিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে একটা গুল্‌বাহার চাদর জড়াইয়া তিনি পাঠাভ্যাস করিতেছেন। কখন কখন দেখিতাম, বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে একজায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত করিয়া, পকেটে দুই হাত দিয়া, ভাবে ভোর হইয়া অস্ফুট স্বরে সেক্‌স্‌পিয়ার আবৃত্তি করিতেছেন। একটা আবৃত্তির দুই একটা কথা আমার এখনও মনে পড়ে—যথা—"Nor poppy nor Mandagora" ইত্যাদি। এই কথাগুলা তিনি কতকটা সংস্কৃতছন্দের টানে পড়িতেন;—"নর্" এই শব্দটির র্-কে অকারান্ত করিয়া "নর" এইরূপ পড়িতেন, এবং সমস্তই একটু টান্ দিয়া পড়িতেন যথা,—"নরপপী নরম্যান্ ডাগোরা" —আমার বেশ লাগিত। তখন হইতেই আমাদের রাষ্ট্রিক উন্নতিসাধনের দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক্ ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে

তিনি পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। এবং তিনিই তাঁর প্রথম সম্পাদক হন। তিনি তখনই বেশ ইংরাজি লিখিতে পারিতেন। এই সময়ে Captain Palmer বলিয়া একজন সুলেখক জুটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিয়া কাগজে লেখান হইত। তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। দোষের মধ্যে লোকটি মাতাল ছিলেন। তিনি যাহা কিছু পাইতেন সমস্ত মদেতেই উড়াইয়া দিতেন। আমার মনে পড়ে, পামার সাহেব মদের পয়সা সংগ্রহ করিবার জন্য খুব অল্প দামে, মাথায় দুর্ব্বিন-বসানো একটা ভাল ছড়ি সেঝদাদাকে বিক্রয় করিয়া যান।



মনোমোহন ঘোষ

নানা স্কুল পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে হিন্দু স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু কেশব বাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজে" ভর্ত্তি হয়েন। কেশব বাবুর ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, তাই Calcutta College নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক্ এ স্কুলে তখনকার সব কৃতবিদ্য মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন, যেমন আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি। কেশব বাবু নীতি উপদেশ দিতেন। বোর্ডে নানারূপ চিত্র বৃত্ত ও শাখা প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষ আঁকিয়া কর্ত্তব্যবিভাগ—ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের প্রতি, আপনার প্রতি—বুঝাইয়া দিতেন, আরও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্য নানাবিধ বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের খুব হৃদয়গ্রাহী হইত।

ক্লাস বসিবার আগে সমস্ত ছাত্রেরা একটি ঘরে সমবেত হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত Lord's Prayerটি বলাইতেন :—

Our father, which art in Heaven Hallowed be Thy name.

Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgave our debtors.

And lead us not unto temptation, but deliver us from evils; for Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

Amen.

বঙ্গানুবাদ—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হউক্। তোমার রাজ্য আসুক্। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হউক্। আমাদিগকে আজ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দাও। আর আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তেমনি তুমিও আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে প্রলোভনের দিকে লইয়া যাইও না, আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর। যেহেতু রাজ্য, পরাক্রম এবং মহিমা নিত্যকাল তোমারই। আমেন্।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় বেদোক্ত "ওঁ পিতা নোঽসি" মন্ত্রটির* সহিত এই Lord's Prayerএর একটু মিল আছে; কিন্তু আমাদের এই বেদমন্ত্র উক্ত Prayerটি হইতে কত উন্নততর এবং গভীর! উক্ত প্রার্থনায় আছে 'Daily bread দাও' আর বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছেন, "জ্ঞান-শিক্ষা দাও।" বোধহয় হিন্দুউপনিষদ্ ও বেদের উপর তাঁহাদের তত আস্থা ছিল না। অথবা অনুশীলনের অভাবের ফলেই এই সুন্দর প্রার্থনা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল।"

এই Calcutta College হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার শেষ দিনে যেদিন ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। যখন ঘণ্টা বাজিল তখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উত্তর লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Sutcliff সাহেব পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া কাগজগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখনও আরও কয়েকটী ছেলে লিখিতেছিল, ঘণ্টা বাজিয়া তখন এক মিনিটও হয় নাই, তবু তাঁহার নিকট হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া কেন যে সাহেব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বুঝিতে না পারিয়া তিনি একবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। জ্যোতি বাবু বলিলেন যে, "হিন্দুস্কুলের ছেলেদিগকে তিনি অনেক রকমে অনুগ্রহ করিতেন, আর অন্যস্কুলের ছেলেদের উপরই যত অত্যাচার। অথবা পাহারা দিয়া দিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—আমাকে সম্মুখে পাইয়া আমার উপরেই ঝালটা ঝাড়িলেন।" জ্যোতিবাবু ছিলেন Calcutta Collegeএর ছাত্র। যাহা হউক পাশ হওয়ার বিষয়ে তিনি একেবারে নিরাশ হইলেন। একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জানাইল যে তিনি পাশ হইয়াছেন। তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। শেষে জানিলেন যে সত্য সত্যই জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন, B. Sectionএ পড়িতেন বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাটগাঁয়ের ফিরিঙ্গি। তাই তাঁর ইংরাজিতেও পূর্ব্ববঙ্গের টান্ ছিল। বাস্তবিক তিনি গণিতে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁর গর্ব্বটা আরও অধিক ছিল। কোন একটা দুরূহ গণিত-সমস্যার সমাধান করিয়া বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহ করিতে পারিবে না—এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপরি ওয়ালা Sutcliff সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না—কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্য বলিতে হইবে। তাঁর বড়দাদা সেই সময়ে নূতন প্রণালীর এক জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁর হস্তে একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন "This man has brains"। তিনি মদে চুর হইয়া ক্লাসে

* "ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়ো ভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিব তরায় চ।"

বঙ্গানুবাদ :—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহপাশ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব, হে পিতা, পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখ কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমায় নমস্কার।

পড়াইতে আসিতেন। তাঁর মুখের কাছে মাছি ভন্‌ভন্ করিত, আর হাত দিয়া ক্রমাগত তাড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের ছাত্র দেখিলেই তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন কিন্তু সহুরে ছাত্রকে কিছু বলিতেন না। ৺ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু যখন পড়াইতে আসিতেন তখন ক্লাসে হট্টগোল থামিত কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু যখন আসিতেন তখন টুঁ-শব্দ হইত না,—এমনি তাঁর একটা গাম্ভীর্য্য ও চারিত্র-প্রভাব ছিল। ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা

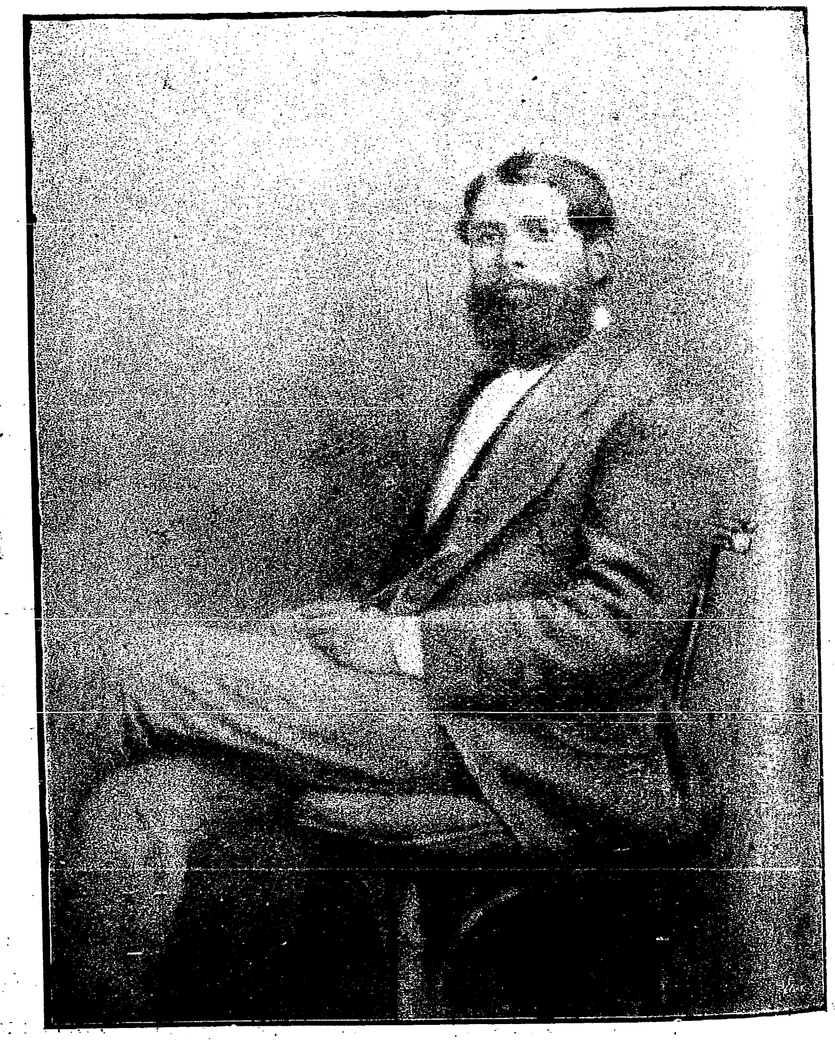

স্যর টি পালিত

না করিয়া থাকিতে পারিত না। Lt. Ives ইংরেজী পড়াইতেন। Ives সাহেবের গলা খুব উচ্চ ছিল, যখন তিনি পড়াইতেন তখন সমস্ত হল্‌খানি তাঁহার কণ্ঠস্বরে কাঁপিতে থাকিত। একদিন কি একখানি বইয়ে Mont Blanc কথা পাওয়া গেল। Ives সাহেব একে একে সমস্ত ছাত্রকে উক্ত বাক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু সকলেই বলিল, "মণ্ট্‌ব্ল্যাঙ্ক", শেষে জ্যোতিবাবুকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, "মঁ ব্লাঁ",—শুনিয়াই Ives সাহেব খুব প্রীত হইলেন—এবং জ্যোতিবাবু যে ফরাসী ভাষা জানেন, সাহেবের এ ধারণা জন্মিয়া গেল। কিন্তু জ্যোতিবাবু তখন পর্য্যন্ত ফরাশীর এক বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তবে তিনি কি করিয়া এ উচ্চারণ জানিলেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "মেজ্‌দাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) তখন নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট বিলাতের গল্প শুনিতে শুনিতে ঐ কথাটির প্রকৃত উচ্চারণ শুনিয়াছিলাম—তাহাই আমার মনে ছিল।" যাহাই হউক, জ্যোতিবাবুর ক্লাসে একটা খুব প্রতিপত্তি হইয়া গেল। Ives সাহেবেরও জ্যোতিবাবুর উপর খুব একটা ভাল ধারণা জন্মিয়া গেল। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য কত দিন তাঁহার বাড়ী যাইতে বলিয়া ছিলেন, কিন্তু যাওয়া তাঁহার হইয়া উঠে নাই।

Ives সাহেবের বাড়ী গিয়া পড়া ত দূরের কথা ক্লাসেই তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন না, যদিবা যাইতেন ত' পলাইয়া আসিতেন। তখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নীচের একটা ঘরে ইঁহাদের আড্ডা বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতেই কাটিয়া গেল। Second Year ও যায় যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকট-বর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া এই খানে ইহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিল। তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁর অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য জরার ভীষণ ভাব অবহেলা করিয়া আজিও ফরাসী ভাষা হইতে অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাশী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হইল এই কাশীপুর-উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষমহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত নাটক "সীজার" (Cæsar) তাঁহাকে পড়ান:— তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এখনও তাঁহার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতেছে:—

"Ceasar tu vas regnier"—সেজার তু ভা রেঙিয়ে; অর্থাৎ—সিজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

যাহাই হউক এইখানে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বায়ের অনেক

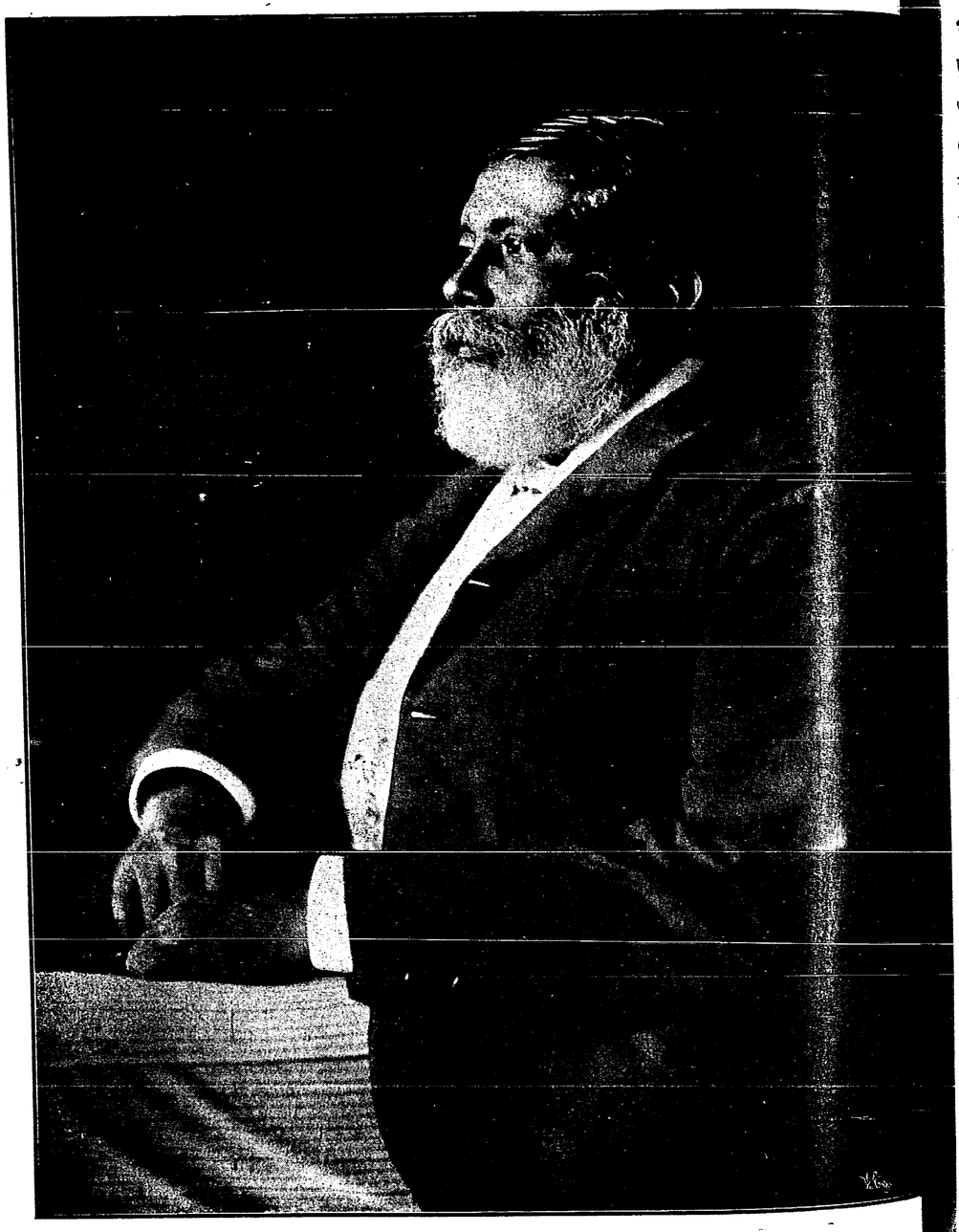

স্যর টি পালিত

গল্প শুনিতেন। বোম্বায়ের গল্প, সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে বোম্বায়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করিলেন এবং বোম্বাই যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরীক্ষা দিবেন না কাযেই ফী ও দাখিল করা হইল না। বোম্বাই যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিতমহাশয় (স্যর টি পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধরণে থান্ ধূতি ও আপাদ-লম্বিত মোটা চাদর পরিতেন। সে পরিচ্ছদের বেশ একটা শোভন গাম্ভীর্য্য ছিল। সেই পরিচ্ছদে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত রোমক সেনেটার বলিয়া মনে হইত। এইবার হয়ত পড়াশুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র জ্যোতিবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি জ্যোতিবাবুকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন,—তিনি জ্যোতিবাবুকে পরীক্ষা দিবার জন্য পীড়া-পীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফী দেওয়া হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সেজন্য কোনও চিন্তা নাই, আমি Sutcliff কে বলিয়া তোমার ফী জমা করাইয়া দিব।" জ্যোতিবাবু মহা মুস্কিলে পড়িলেন কিন্তু শেষে তাঁহারই জিত হইল। পরীক্ষা না দিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লাইকা

(১১)

তখন বন্ধনমুক্ত কুরঙ্গের ন্যায় লাইকা যথেচ্ছভাবে চলিল; বন পর্ব্বতে ভ্রূক্ষেপ নাই; —এই কয়দিন জনসমাজে বাস করিয়া সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—এইবার স্বেচ্ছাবিহারে সে যেন মুক্তবায়ুর স্পর্শ সুখানুভব করিল! গুর্জ্জরের শ্যামল বনভাগ দিয়া, নারিকেল কুঞ্জের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে লাইকা সুরাটে আসিল।

এইখানে আসিয়া তাহার স্মরণ হইল প্রায় বৎসরাতীত হইল সে আপনার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে।—কত স্মৃতিময় দেশ সে আর কতসুখময়?—কত কত কি আছে সে দেশে? লাইকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। এত মনোরম দৃশ্যপূর্ণ কত নগর জনপদ কত পল্লী—কত বিচিত্র উপত্যকারম্য পার্ব্বত্য ভূমি দেখিল—কিন্তু কোথায় সে দেশের তুল্য সুখ?—দুটি একটি স্মৃতি বা বিস্মৃত কল্পনায়—এক একটি স্থান মানুষের নিকট এত প্রিয় হয় কেন?—লাইকা মনে মনে হাসিল।—কিন্তু হায়! সে দেশে কি ফিরিবার সুখ তাহার আছে?—এই চিন্তা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,—চিন্তার হাত এড়াইবার জন্য সে সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিল।

তাহারা ক্রমে সাতপুর পর্ব্বতমালার নিম্নে উপস্থিত হইল। তাপ্তী নদীর তটভূমে নির্জ্জন বনভূমি,—দুই চারিজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী

তথায় তপস্যা করিতেন,—সন্ন্যাসীদল তাহাদের চরণ দর্শন করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু লাইকা গেল না,—সে একজন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া তাহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিল —হাসিয়া তিনি সম্মত হইলেন।

তখন সে সেইখানেই থাকিল। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি চাও বৎস?—" লাইকা বলিল "দয়া করিয়া আপনি যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাই!

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিদ্যা ত তুমি অনেক আয়ত্ত করিয়াছ দেখিতেছি—আমার নিকট তুমি কি চাও তাহাই বল!"

লাইকা অধোমুখে বলিল—"বিদ্যা? বিদ্যাও ভার প্রভু, আমি এমন কিছু চাই যাহাতে এই জগতের সমস্তই ভুলিতে পারি?"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন "জগতে কি কোন ব্যথা পাইয়াছ বৎস?—ভাল আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে চাই না,—কিন্তু আসক্তির জ্বালায় যদি সংসার ত্যাগ করিয়া থাক—তবে সে মোহবন্ধন মুক্ত হওয়া কঠিন,—তবু চেষ্টা কর অবশ্যই সফল মনোরথ হইবে।"

লাইকা থাকিল।—দুই বৎসরকাল সে সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল। কিন্তু কোথায় শান্তি?—কোথায় সে অনাসক্ত অথচ সকলেরই দুঃখে সমান ব্যথাশীল নির্ভীক প্রাণ?—এ আত্মসুখেচ্ছায় জর্জ্জর—কাতর অশ্রুবিবর্ণ প্রাণ লইয়া সে কোথায় লুকাইবে? এ পর্ব্বত গুহাও যে তাহার পক্ষে সেই রাজপুরীর ন্যায়ই ভীষণ! এ মায়াবাদী সংসারত্যাগী অশ্রুহীন সন্ন্যাসীর সঙ্গও যে লাইকার উপযোগী নয়! যাহাদের নিকট প্রেম মায়া,—স্নেহ মায়া,—ভক্তি মায়া—কোমলতা দৌর্ব্বল্য,—মাধুরী অর্থহীনতা, আর তাহার চিরপ্রিয় সঙ্গীতের নাম, স্নায়ু দুর্ব্বলকারী—অকারণ ভক্তিজনক প্রলাপ কাকুলি—; তাঁহারা কি করিয়া লাইকার হৃদয়প্রভু গুরুপদে অভিষিক্ত হইবেন?

লাইকা ভীত চিত্তে ভাবিল এ দুই বৎসর কাল সে কি করিয়া এ পাষাণের বিরাট ভার বক্ষে লইয়া বাঁচিল?—কেমন করিয়া এতদিন এ "প্রেম বিমুখের সঙ্গ" সহ্য করিল? —কি আরামের এ গিরিগুহা—কত শুষ্ক এ জীবন যাত্রা!

তখন সে বিনীত ভাবে গুরুর নিকট আপনার কর্ত্তব্যচ্যুতির কথা জানাইল। বলিল, সে বালিকা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এতদিনে সে বুঝিয়াছে এই নারীর দীর্ঘনিশ্বাসই তাহার সকল বেদনার মূল,—তাহার অশ্রু মুছাইতে না পারিলে বোধ হয় সেই পরম দয়ালের নিকট সে ক্ষমা পাইবে না। সুতরাং সে ফিরিতে চায়।"

সন্ন্যাসী আবার হাসিয়া নিঃশব্দে সম্মতি জানাইলেন। লাইকাও দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। গিরিসঙ্কটের দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়াছিল—সে বক্রমুখে গোদোয়ানার পথ ধরিল।

চারিদিকে জনকোলাহল,—কান্নাহাসি —কলহউৎসাহ—শোক ও সুখ!—কি উত্তেজনা—কি সমপ্রাণতা! এই হৃৎতন্ত্রী-সংস্পর্শী বিশ্ববীণা মুখরিত সংসার ছাড়িয়া লাইকা কোন্ মূর্চ্ছিত জগতে বাস করিতে

গিয়াছিল?—সৌন্দর্য্যের মহিমায় সেখানেও দুঃখ ছিল না,—সেই নীরব গিরিগুহার পার্শ্ব-ভূমিও বিহঙ্গ কলতানে ঝঙ্কৃত হইত, বেতস লতার বংশবনে বায়ুবেণু বাজিত, তরুমর্ম্মরে মধ্যাহ্ন সৌম্র মিশিয়া রাগ ও শব্দের উজ্জ্বল মিলনে এক জীবন্ত রাগিণীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইত!—সুন্দর সেই অশ্বত্থ পত্রের স্বচ্ছ অবসর পথে দৃশ্যমান পীত রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘখণ্ডে আসীনা সেই রাগিণী সারঙ্গিকার রূপ অতুল্য সুন্দর!—লাইকা একা সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াই জীবন শেষ করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু হায়—সেই পাষাণপ্রাণ সন্ন্যাসী যে ইহারই বিরোধী!—প্রভাতে তাপ্তীর জলে যখন প্রথম ঊষালোক জ্বলিত, তীরের প্রস্তর গুটিকামালার সহিত তাহার লহরী খেলা আরম্ভ হইত,—তীরের লতা সেই জলে নিজের পুষ্পসজ্জা ভাসাইয়া দিত, —আর তাপ্তী সলিল সেই ফুল আপনার বুকে চাপিয়া লইয়া হাসিয়া নাচিয়া ভাসিতে থাকিত,—তখন লাইকা ভাবিত, এত সব প্রতিদানময় সংসারে সে কোথাও স্থান পাইল না কেন? এ আপনাতে আপনি বিসর্জ্জন কি শ্বাসরোধকর!—নদীস্রোত বহিয়া চলিয়াছে—বায়ুস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, লতায় ফুল ফুটে কিন্তু ঝরিয়া পড়ে,—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য জ্বলে তাহাতে ধরণী হরষিতা;—সকলেরই উদ্দেশ্য আছে সকলেই একের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে—লাইকারই কি উদ্দেশ্য নাই?—সে ভগবানের চরণে আপনাকে বিকাইতে চাহিয়াছিল, বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আপনার মানসী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই চরণে আপনার জীবন মরণ অর্পণ করিতে চাহিয়াছিল—কিন্তু সন্ন্যাসী তাহা হাসিতে উড়াইলেন—বলিলেন "এতখানি বিহ্বলতার মধ্যে বন্ধনচ্ছেদ অসম্ভব?"—ইহাও বন্ধন? হোক তবে বন্ধন, ইহাই লাইকার উপজীবি-সেব্য এবং সর্ব্ব!

(১২)

লাইকা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। অসম্ভব—আর সেই মানসী প্রেয়সীর দর্শন ভিন্ন জীবন ধারণ অসম্ভব!—রাজভবনের কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছিল না—এই প্রসারিত বিশাল সংসারে এমন বিপুল ধরণীতে লাইকার জন্য স্থান নাই! সমস্তই গিরিগুহার ন্যায় অন্ধকার—পাষাণ বেষ্টনীর ন্যায় দুর্ভেদ্য অলঙ্ঘ্য! দুই বৎসর কাল পর্ব্বতে বাস করিয়া দারুণ নির্জ্জনতায় লাইকার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল,—সে এতদিন আত্মার স্বরূপ খুঁজিতে গিয়া আপনার জীবনরাগিণীকে খুঁজিয়াছে—আজ তাহারই মূর্ত্তিতে আত্মার রাগ ভাসিয়া উঠিয়াছে—আজ সেই তাহার সব—সেই তাহার আত্মা সেই তাহার জগৎ—সেই তাহার ওঙ্কারস্বরূপা ব্রহ্মমূর্ত্তি!—সে কাহাকে খুঁজিতে এ কাহাকে পাইল!

আহা এত সুন্দর সে?—অন্ধকারে সূর্য্যালোকের ন্যায়—সাগর নিমগ্নের সম্মুখের তটরেখার ন্যায় সে কি প্রার্থনীয়া!—কোথায় সে?—এই দুই বৎসরের তপঃক্লিষ্ট পাষাণপীড়িত লাইকা কতক্ষণে তাহাকে দেখিয়া এ কষ্টের অবসান করিবে?—

লাইকা চলিল। সে ভাবিতেছিল এ ভালই

হইয়াছে; বিবাহের পরই যদি তাহাকে পত্নী ভাবে পাইতাম তবে বুঝি সে এমন অপরূপ মূর্ত্তিতে মনোনয়নে প্রতিভাত হইত না; সাধারণ মানবের ন্যায় মানবীর আকারে সে তাহার স্ত্রীরূপে সহধর্ম্মিণী ভাবে জীবন যাপন করিত। কিন্তু একি অপরূপ মূর্ত্তি?—এ কি অভিনব অনুভব?—লাইকা তখন মানস নয়নে দেখিতেছিল—যেন, পূর্ব্বাকাশ প্রান্তে এক অপূর্ব্ব শীতল জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যোদয় হইয়াছে—! সাগরবেষ্টিতা নদীমালিনী, শ্যাম কাননাঞ্চলা তুষারগিরিকিরীটিনী ধরণী তাহার চরণতলে আবেশনতা।—চারিধারে নীল আকাশ যেন তাহাকে স্পর্শআশায় অন্তরে অন্তরে শিহরিতেছে।—ঘন পুঞ্জিত মেঘরাশি ললাটে রামধনুর সপ্তবর্ণ রেখা আঁকিয়া তাহার চরণ তলে লুণ্ঠিত।—কিন্তু সেই ধরণী সেই আকাশের, সেই মেঘের, সেই প্রার্থনার অনুভবের এবং স্পর্শের, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন—বহুদূরে অতি উর্দ্ধে সেই আলোক কেন্দ্র! কেহ তাহার নিকটে নাই—একা ভক্ত হৃদয় মাত্রে প্রতিভাষিত সে নবারুণ—অতি উর্দ্ধে জ্বলিতেছে! তাহারই মধ্যে ও কে?—কে ও?—উদ্যৎ প্রদ্যোতন শতরুচি" ও কে পুরুষ না নারী?—"সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী" ও কে দেবী?—

সে তখন বিন্ধ্যতনয়া নর্ম্মদার বিরাট প্রপাতের নিকট দাঁড়াইয়াছিল! যেন সদ্যঃ প্রভাত দৃশ্য, তাহার উর্দ্ধে নিম্নে পার্শ্বে—, সর্ব্বত্র তখন মর্ম্মর পাষাণ দেহে নবোদিত সূর্য্যালোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আর প্রবল ভৈরব জলোচ্ছ্বাস রব জগতের সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া দিয়াছে—; লাইকা সেই প্রপাত প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। বিগলিত হৃদয়ের অশ্রু নয়ন বহিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণে সে চেতনা পাইল, তখন শত শত নর নারী বালকবালিকা সেই নদী স্রোতে স্নানে আসিয়াছে। চারিদিকে হাস্য কলরব। সে উঠিয়া বসিল; জলে উজ্জ্বল রৌদ্র জ্যোতিঃ খেলিতেছে। সহসা লাইকা যেন দেখিল হাস্য জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা আপনার বাহু ক্রীড়ায় চঞ্চলা!—সে কে?—ও হো কি আনন্দ! সে যে তাহারই পত্নী,—তাহার এই রক্তমাংসময় হস্তেই ত সেই পুষ্পকমনীয় হস্তখানি অর্পিত হইয়াছিল!

আবার মহোৎসাহে সে চলিতে লাগিল। পথে অজস্র বাধা—সে সকলে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সে আপনার বাঞ্ছনীয় পথে চলিল। কিন্তু একটি গুরুতর বাধায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, পথিমধ্যে দেখিল তাহার কয়জন সন্ন্যাসী মিত্র চলিয়াছে—তাঁহারা তাহাকে ধরিলেন; হরিদ্বারে মেলা আরম্ভের মাত্র দুইমাস বিলম্ব, তাঁহারা যাইতেছেন লাইকাকেও যাইতে হইবে! তখন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাঁহাদের উপরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিল না,—তাঁহাদের সহিত শিবালিকের অভিমুখে চলিল!—গোমুখী ক্ষেত্রে বিরাট জ্ঞানধর্ম্মসঙ্ঘ,—দেখিয়া লাইকা মুগ্ধ হইল। সেস্থানে আসিয়াছিল বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল!—কিছুদিন সেই উৎসাহেই কাটিল।

শীতের অবসান, বসন্ত পঞ্চমী চলিয়া গেল।—আনন্দোৎফুল্ল লাইকা ভাবিল যদিই বা দোল পূর্ণিমায় তথায় উপস্থিত হইতে না পারি তবু মধু পূর্ণিমায় নিশ্চয়—! আর বিলম্ব করিব না। মধুঋতু সমাগমে প্রফুল্ল

কোকিলের ন্যায় উন্মাদ গীত গাহিতে গাহিতে লাইকা চলিল।—সে গীতের কি সুর—কি মূর্চ্ছনা—কি আবেগ!—পথের পথিক শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। নগরে নগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া পল্লীতে পল্লীতে নবীননবীনার হৃদয়ে উল্লাস তরঙ্গ তুলিয়া গাহিতে গাহিতে সে চলিল।

(১৩)

পথে বহুদিন কাটিয়া গেল, সাতপুরা হইতে বাহির হইয়া এতদূর আসিতে প্রায় বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। পথিমধ্যে হরিদ্বারেও প্রায় তিনমাস গিয়াছে!—যখন লাইকা আপনার জন্মভূমিতে আসিল তখন পরিপূর্ণ বসন্ত।—বর্ষ শেষ প্রায়।—এইখানে আসিয়া তাহার শরীর অবসন্ন হইল,—চরণ যেন আর উঠিতে চাহে না! হায় কি করিয়া সে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিবে?—দীন হীন ভিক্ষুক, কি বলিয়া সে মহারাজাধিরাজের—আর সে প্রশ্ন ত এখন নয়—, একবার যেখানে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে সেখানে কি বলিয়া প্রবেশ করিবে?—

ভাবিতে ভাবিতে লাইকা হাসিল।—নিজেকে হীন বলিয়া সে লজ্জা পায় কেন?—সে ত জগতে কাহারও পূজা চায় না ভক্তি চায় না,—কাহারো চক্ষে নিজেকে উচ্চ দেখাইতে চায় না,—তবে নিজের দীনতাকে কেন লজ্জার চক্ষে দেখিতেছে?—জীবনধারণ একান্তই কর্ত্তব্য এই জন্য ভিক্ষা করে—লোকে তাহাকে ভিক্ষুক নাম দেয়,—দিক্!—তাহাতে লজ্জা কি?—যদি সে নামও লোপ পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি?—লোকে তাহাকে অকর্ম্মা অপদার্থ ভাবে—! হায় কর্ম্ম! তোমার নামেও অন্তরে আত্মগরিমা পোষণ করিতে হইবে?—লোকে কি বলে—কেন বলে—সব কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তোমার উদ্দেশ্যে প্রাণ দিতে হইবে? আগে তোমার মূল্য নির্দ্ধারণ না করিয়া আপনার আত্মত্বের মূল্য দিতে হইবে?—

সে তুচ্ছ লাইকা?—আর কত তুচ্ছানু-তুচ্ছ তাহার জীবন মরণব্যাপী সর্ব্বস্ব?—তাহার মাণ পরিমাণ—দীর্ঘ প্রস্থ—উচ্চ নীচের কেন এত বাদ বিবাদ?—কেন এত প্রশ্ন মীমাংসা?—পায়ের ধূলা পথে পড়িয়া থাকে, শত শত ধূলিকঙ্কররাশির সহিত দীর্ঘ পথরেখার অতি সূক্ষ্মতন অংশে সে পড়িয়া থাকে—পরে তাহার উপর দিয়া যদি এক দিনের জন্যও আরাধ্যতম তাঁহার রক্তচরণ স্পর্শ দিয়া যান—মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে ধূলার বুকে বাঞ্ছিতের পদরেখা অঙ্কিত হয়—সেই কি তাহার জীবন ব্যাপী তপস্যার চরম সার্থকতা নয়?—তিনি যদি তাহার পূজার ফুলের গন্ধ নাই পান—সে যে তাঁহারই আশায় জন্মগ্রহণ করিয়া—তাঁহারই চরণে দলিত মৃত্যু লাভ করিল এ সংবাদ যদি তাঁহার অজ্ঞাতেই থাকিয়া যায়—তবে ক্ষতি কি?—ধূলি তাহার সার্থকতা হইতে ত একটু ভ্রষ্ট হইল না—সে ত পরশমণির স্পর্শে স্বর্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে তবে এই লজ্জা এই ধিক্কার কেন?—

মাতঃ বসুন্ধরে!—অগণিত সন্তান প্রস-বিনী জননি!—অতি অক্ষম অতি দীন সন্তান এই লাইকা,—যদি তোমার কোন উপকারে ইহার জীবন শেষ না হয় মা!—সন্তানকে কি ক্ষমা করিবে না?—বিধাতৃ সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় অপূর্ব্ব উদ্যম রাগিণী তুমি,—শত

সুগন্ধ পুষ্পে তোমার বক্ষ সুগন্ধিময়—সহস্র উজ্জ্বল পুষ্পে তুমি বিচিত্র মাধুর্য্যময়ী—, মা গো যদি এই সামান্য বৃক্ষে সামান্য সূর্য্যমুখী ফুল তাহার চিরবল্লভের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র কার্য্যে জীবন শেষ করিয়া সন্ধ্যার মৌন অন্ধকারে তোমার বুকে ঝরিয়া পড়ে—তবে কি তুমি তাহাকে তোমার শীতল ক্রোড়ে স্থান দিবে না?

লাইকা কাঁদিতে লাগিল।—সম্মুখে প্রসারিত শস্য ক্ষেত্র—গোধূম ক্ষেত্রের দীর্ঘ শার্ষ ক্রমে নুইয়া পড়িতেছে,—পাশ দিয়া ক্ষুদ্র পথরেখা বহিয়া পল্লীবধূ গাগরী মাথায় জল লইয়া ফিরিতেছে; সূর্য্য কখন অস্ত গিয়াছে সে তাহা জানিতেও পারে নাই—সহসা চক্ষু তুলিয়া দেখিল অন্ধকার; সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে!

অশ্রু মুছিয়া লাইকা উঠিল; হায় বাঞ্ছিতে! হায় প্রেয়সী—ভক্তজনের নিকট তুমি এত দুর্ল্লভ কেন?—যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ তাহারই নিকট হইতে তুমি দূরে উচ্চে বাস কর কেন?—দয়াময় ভগবান!—তোমার সেবকের নয়নেই সাগর জল আসিয়া বাস করে কেন?—কাতরের অশ্রুজল কি তোমার প্রিয়—প্রিয়তম?—যে তোমায় ভাল বাসে তাহাকে কাঁদাইতে কি তোমার ভাল লাগে?—তবে তাই হোক—তবে আয় রে অশ্রু! তুই আমার সর্ব্বস্বের প্রিয়—সুতরাং আমারও প্রাণাধিক প্রিয়!—

লাইকা এবার বসিয়া পড়িল—; গদগদ কণ্ঠে কি গাহিতে লাগিল—চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিমাঞ্চলে ঢলিয়া পড়িতেছে, পার্শ্বে মোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী রোহিণী!—

মৃদু হাসিয়া লাইকা বলিল—"তুমি রাজাধিরাজতনয়া আর আমি দরিদ্র, তুমি উচ্চে স্বর্ণচূড় প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর আমি এই নগণ্য পল্লীর অজ্ঞাতনাম সামান্য দীন—তবু তুমি আমার, একান্ত আমার! তুমি আমার পত্নী এ গর্ব্ব রাখি না দেবি,—শুধু তোমায় ভালবাসি—তোমারে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি তোমার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত বিকাইতে পারিয়াছি—এই আনন্দে তুমি আমার!—জীবনে মরণে আমি একান্তই তোমার এই অখণ্ডবিশ্বাসে তুমি আমার! আমার আমিত্ব কেবল তোমার তত্ত্বে লীন হইয়া গিয়াছে আমি বলিতে কেবল তোমাকেই বুঝায়—আর তুমি বলিতে বুঝি আমি; আপনার জীবনরাগিণী তোমাকেই অনুভব করি, তাই—তাই—আমার ধ্যান জ্ঞান অনুভব—, আমার জীবন মরণ স্মরণ, আমার তারক তৃপ্তি তর্পণ!—আমার সর্ব্বস্বরূপে তুমি আমার!—আত্মার দুইদিনের ক্রীড়াভূমি দেহকে যদি আমার দেহ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি—দুইদিনের বাসভূমি পৃথিবীকে আমার আবাস বলিয়া স্বীকার করি—তবে হে আমার আত্মার চিরনিলয়রূপিনী দেবি! তুমিও আমার—এ কথা বলিব না কেন?

সর্ব্বত্রব্যাপী কি এক প্রসন্নতার অনুভবে লাইকা শিহরিয়া উঠিল! এ সত্য যথার্থই, এ সম্পূর্ণ সত্য?—এ জগতে কিসের অভাবে কিসের বেদনা? সংসারে এত হায় হায় কেন? নিজের আত্মার স্বানুভবে এত প্রীতি এত শান্তি এত শক্তি সত্বেও মানুষ এত অভাব দুঃখ সৃষ্টি করে কেন?

কিন্তু, লাইকা এইখানে অন্তরের মুক্তদ্বারের সম্মুখে সহসা নীরব হইল; এ প্রসন্নতা কি শুধু তাহার হৃদয়ের প্রবণতায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে অথবা—এ কি?—তাহার অন্ধ চক্ষুতে যে সহসা এই বিপুল জ্যোৎস্না উদিত হইয়াছে এ আলোকের কারণ নির্ণয়ে অশক্ত হইয়া সে নীরব হইল।

সম্মুখে বিরাট অসীম আকাশ—কত বৃহৎ তারা কত তারকাপুঞ্জ—কত নীহারিকা মণ্ডলী! কত দূরে—কোন অসীমে ইহারা জ্বলিতেছে?—আবার তাহার উপর?—কোথায় এ অসীমের সীমা?—লাইকা চক্ষু মুদিল,—সম্মুখে সীমাহীন হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব আবেগে ফেনিল তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় দিগন্তরেখায়—বা চিন্তার অতীত ক্ষেত্রে লীন!—এ সর্ব্বত্রময়ী অসীমার মধ্যে কোথায় এ আলোক কেন্দ্র!

ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় সে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিল—যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। ক্ষীরোদ সাগরের চূর্ণমুক্তামালায় সজ্জিত ধবল বক্ষে উচ্চ পর্ব্বত স্থাপিত, কৃষ্ণ পাষাণ গাত্রে দুগ্ধউর্ম্মি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—পর্ব্বতের কটিদেশে শ্বেতমাল্যের ন্যায় বৃহৎ সর্প—পুরাণকথিত ভূধারণশক্তিশালী বাসুকী। তাহাকে ধরিয়া দুই পাশে দেবাসুরের শক্তির ও শান্তির অদম্য চেষ্টা যে সেই অসীম পারাপার মন্থন করিয়া জগতের শ্রী ও আলোকের মূর্ত্ত প্রতিমাদ্বয়কে উদ্ধৃত করিবে! আরও লইবে মৃতসঞ্জীবনী—চির মরণশীল জগতে মৃত সঞ্জীবনী সুধা? অদম্য চেষ্টা, মিলনমন্ত্রে আজ বল ও সমতা একত্র, উভয়ে প্রাণপণ বলে সেই বিশাল ভূধরকে আন্দোলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে বিপুল শক্তি নাগরাজও মরণ বলে সেই সাধনা মন্ত্রকে জড়াইয়া আছে—কিন্তু সাধ্য অচল, পর্ব্বত অটল!

হায় শক্তি—হায় সাধনা! কার বলে এ মহোদধি সঞ্চালন করিবে? পুরুষকার একা পুরুষকার এ অসাধ্য সাধন করিবে? অসম্ভব! ইহা যে অসম্ভব তাহা দেবাসুরও বুঝিল, এই নৈরাশ্যের বেগে আকুলতার দৈন্যে তাহারা অদৃষ্ট দৈবনিয়ন্তাকে স্মরণ করিল—"হে নীলভূধরকান্তি, শতসূর্য্য সমুজ্জ্বল!—এস, তুমি হৃদয়ে শক্তি ও বাহিরে মূর্ত্তিরূপে উদয় হও প্রভু!—"

তখন সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও লাইকা দেখিল,—অপূর্ব্ব শোভা। আকাশ ব্যাপিয়া এক স্নিগ্ধচ্ছায়া নামিয়া আসিতেছে, ধবল দুগ্ধ সাগর সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত, মন্দারের উচ্চশিরে সেই নীলছায়া যেন ঘনীভূত,—দেখিতে দেখিতে গিরিচূড়ায় যেন নবপ্রভাতের পূর্ব্বরাগ দেখা দিল,—তাহার পর সেই ঊষারাগরঞ্জিত বর্ণচ্ছটা মধ্যে তরুণ অরুণ উদয় হইল—ছায়া নিয়ে আলোক,—তাহার মধ্যে ও কে? কে ও সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী—সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট?" কে ও অভয় বরদহস্ত—প্রীতিহাস্য কুশলী?—

দেখিতে দেখিতে তখন সেই বিপুল দেবাসুর মিলনসমষ্টি ভক্তিনত হইল। সকলেই চিনিল ইনি সেই জীবমঙ্গল নিদান কল্যাণমূর্ত্তি, সকল গর্ব্বের অবসানে একমাত্র শিব-চৈতন্য? আপনার শক্তিতে হতাশ হইয়া জীব যখন জগৎ ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় জগতে দৃষ্টিপাত করে তখন হৃদয় মাত্রে যাহার অনুভব পায়—ইনিই

তিনি।—তখন কোন অদ্ভুত শক্তিতে সেই পর্ব্বত দুলিয়া উঠিল। প্রবল উৎসাহে দেব দানব সকলে নাগরজ্জু আকর্ষণ করিবামাত্র সাগরবক্ষ ফেনিল করিয়া তরঙ্গ উঠিল।

তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, মানব হৃদয়ে ভাবের পর ভাবলহরীর বিচিত্র উদ্ভব!—মন্থন চলিতে লাগিল, দৈবভক্তিতে অনুপ্রাণিত জীবশক্তি অসীমার মধ্যে ধ্যান যোগে কর্ম্ম যোগে শত শত রত্নরাজির সৃষ্টি করিল, ধন শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ উঠিল,—দেবাসন, উচ্চৈঃশ্রবা—ঐরাবত উঠিল, বিলাসের অপূর্ব্ব উপচারণ পারিজাত উঠিল,—অবশেষে মানব হিতের চরম উপাদান সুধাভাণ্ডকর ধন্বন্তরী চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল মন্ত্র লইয়া উত্থান করিলেন,—জগতে বিপুল হর্ষোচ্ছাস উঠিল,—আনন্দ হলুহলায় সাগরগর্জ্জন লোপ হইল!

সবই ত পাইল তবু প্রাণ কি চায়?—ধন জন সুখ আরোগ্য—ইহার পরও মানব কি চায়?—

লাইকা আপন অন্তরে চাহিল,—আছে, অভাব আছে, হৃদয়গুহা অন্ধকারাচ্ছন্ন—আলোক চাই—ঔজ্জ্বল্য চাই!

আবার মন্থন চলিল; ঊর্দ্ধে গিরিশিরে যে আলোক কেন্দ্র জ্বলিতেছে তেমনি মধুর তেমনি সুন্দর আলোক চাই!—হাঁ অমনি সুন্দর! ঐ সাদৃশ্য ছাড়া বুঝি জগতে আর আলোকের আদর্শ নাই।

আছে কি জীব হৃদয়ে ঐ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ কণা? উঠিবে কি তাহা এই মন্থন আলোড়নে? দয়া কর দেব, দয়া কর! তোমার দয়ামাত্রেই সে আলোকের উদ্ভব সম্ভব—নতুবা নহে!

আঘাতে আঘাতে সাগরহৃদয় মথিত চূর্ণীকৃত হইতেছিল—আর বুঝি সেই বিন্দু ফেনাশ্রু ঊর্দ্ধে সেই অরুণ চরণদ্বয়ের স্পর্শও পাইয়াছিল! দেবাসুর শ্রান্ত কাতর,—আবার সকলে গিরিচূড়াসীন বিপদহারী মধুসূদনকে স্মরণ করিল।

এস এস হে সকল শ্রমহারী সুশীতল জ্যোতির্ম্ময়! তোমার চিত্ত-নয়ন-নন্দন কোমল রাগ সকলকে দেখাও!—তোমার শক্তি ধন্য তোমার স্নেহ ধন্য—সকলই পাইলাম—, এইবার এসহে কমনীয় কোমল কান্তিধর—হৃদয় মাঝারে সুশীতল প্রেম! প্রাণের প্রীতিতে জীবন মরণ উজ্জল করিয়া দাও!—

মেঘাচ্ছন্ন লাইকা যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল!—আহা কি অপূর্ব্ব আলোক!—শুভ্র সাগর মধ্যে—দ্বিধাহীন হৃদয় মধ্যে কি বিপুল জ্যোৎস্না ভাসিয়া উঠিল!—

সে আলোক দর্শন মাত্র সিন্ধু যেন উছলিয়া উঠিল। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ চূর্ণসলিলে সেই শুভ্র আলোক জ্বলিতে লাগিল। জল উজ্জ্বল, স্থল উজ্জ্বল—চরাচর যেন ঐ এক আলোকে হাসিয়া উঠিল! নিদ্রাতুর লাইকা স্বপ্নেই দুই বাহু তুলিয়া প্রণাম করিল। হাঁ ইহাই জীবহৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি প্রীতি!—সর্ব্ব স্থানে অবাধ প্রসারিত শিব জ্যোতিঃ!

আলোক কেন্দ্র ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। সাগর মহাতরঙ্গে বাহু তুলিতেছিল,—যেন ছাড়িতে যায় না! দেব অসুরবৃন্দ মুগ্ধ চক্রে সেই শোভা দেখিতেছিল, মন্দার অচল। সকলে তখন ঊর্দ্ধে চাহিল।—

কোথায় দেবতা? সেই গিরিচূড়াসীন ভগবান কোথায়?—দেবাসুর মুহূর্ত্তে শিহরিয়া

উঠিল,—একি ভ্রান্তি একি অভাব সকলকে আচ্ছন্ন করিতেছে আবার?—লাইকা বুঝিল যে আলোকে তাহার হৃদয় মন উজ্জ্বল হইয়া ছিল তাহা এই আলোকেরই কণা—কিন্তু—আবার কিন্তু?—অনন্ত বীর্য্যশালীর দয়ায় যাহা হৃদয়সাগর ভেদ করিয়া প্রাণ আলোকিত করিয়াছে—তাহার মধ্যেও একি শূন্যতা?—প্রাণ আরও কি চাহে?—তখন মনেরও অজ্ঞাতসারে প্রাণ ডাকিল,—দয়াময়—দয়াময়!—

বিচিত্র চন্দ্রোদয়!—প্রকাণ্ড মণ্ডল ধীরে ধীরে আকাশ গাত্রে উত্থিত হইতেছে। ক্রমে নগরাজের চূড়ার সম্মুখে আসিয়া তাহা যেন স্থির হইল।—প্রকাণ্ড পর্ব্বতের প্রত্যেক গুহাও আলোকিত—আলোকিত সমুদ্র যেন গলিত রজতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে!—

ঐ যে ভগবান—হাঁ ঐ আবার সেই ভক্ত নয়নানন্দ মূর্ত্তি!—দুটি বাহু প্রসারিত—যেন একান্ত আগ্রহ ভরে ভাবুক হৃদয়ের সেই চরম বিকাশ প্রীতিবৃত্তিকে আলিঙ্গন প্রয়াসী!—

আর ও কে?—চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে সহসা প্রকাশিত চিন্তাতীত রাগিণী, সৌন্দর্য্যপ্রতিমা,—শরীরিণী শ্রী?—কেগো ঐ হাস্যপুলকিতা দেবী?—কে কে—কে ও?—যাহাকে গাইবার জন্য স্বয়ং ভগবানও লালায়িত তৃষাতুর!—লাইকা নিজের হৃদয়ে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল।

কে এ?—জীবনপ্রতিমা চিরবাঞ্ছিতা কে ও জ্যোতির্ম্ময়ী? ও মূর্ত্তি লাইকার পরিচিতা—কিন্তু কে?—

সুধাংশুহৃদয়বাসিনী দেবী ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে সেই চন্দ্র বিশ্বমন্দার চূড়ার নিকটে আসিল। জগতের একমাত্র অধীশ্বর—মানব দেহের জীবরূপী পরমাত্মা যেখানে বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সেইখানে সেই পূর্ণ শশধর আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য আনিয়া ধরিয়া দিল।

তাহার পর? সেই অমৃতরূপিণী দেবী সেই মহামহিমাময়ের হৃদয়ে লীনা হইলেন? আকাশে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, জলে তাহার বিশাল লীলা,—জগৎ যেন এক বিরাট আলো রাশিতে ডুবিয়া গেল;—আকাশে সাগরে যেন আর কোন পার্থক্য নাই কেবল জলকল্লোলের ছলছল কলকল ধ্বনি সমস্ত পৃথিবীর মহানন্দ কল্লোলের ন্যায় উছলিয়া উঠিতেছিল!

কি আনন্দ! কি উল্লাস! অনুভবাতীত অনুভব!

লাইকা আত্মহারা হইয়া দেখিতেছিল। মানবহৃদয়সাগরে কি এই জ্যোতির্ম্ময়ী বাস করেন? এও কি সম্ভব?—হাঁ সম্ভব! লাইকা তৎক্ষণাৎ চিনিল,—তাহার চির আরাধ্যা জীবনদেবতার মূর্ত্তিতে বিলীনপ্রায় ওই দেবী তাহারই প্রেমপ্রতিমা রাজকুমারী বারি!—

সেই মুহূর্ত্তেই তাহার তন্দ্রা মূর্চ্ছায় পরিণত হইল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

স্বেচ্ছাবিবাহ

আমাদের দেশে স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা য়ুরোপীয় প্রথা। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া যাওয়ার ন্যায় ভারতবর্ষের সভ্যতা পশ্চিমে গিয়া অস্তমিত হইয়াছে। এই মহাবিধান জড়জগৎ ও মনোজগৎ উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রভাবান্বিত। একদিন ভারতবর্ষ যে গরিমায় মহিমান্বিত ছিল, আজ পশ্চিমদেশ সেই গৌরবে গৌরবময় অবনত মস্তকে একথা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু মনীষীগণ ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন, পূর্ব্বের উদয়াচল আবার রক্তিমাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বদেশের অন্ধকার শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে। ভগবান্ করুন্ তাহাই হউক।

এই স্বেচ্ছা-বিবাহ য়ুরোপীয় সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ, সমস্ত সভ্য য়ুরোপ এই প্রথাটিকে নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া চলে। বিবাহের ক্ষেত্রে কোনও অভিভাবক সন্তানের মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। অনেক বিপ্লবাগ্নি সমাজকে ছারখার করিয়া এই প্রথা য়ুরোপে স্থায়ী ভাবে পাট্টা লইয়া বসিয়াছে। যদিও প্রায় সকল বিবাহেই পিতামাতার অনুমতি লওয়া হয় কিন্তু তাহা একটা রীতি, অথবা বিবাহ করিবার একটা কায়দা মাত্র। আমাদেরও বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবার অনতিপূর্ব্বে কনকাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বরের মাতা বিবাহে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয় অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করার রীতিও ঠিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। য়ুরোপে পিতামাতাগণ সন্তানের বিবাহ দেন না, তাঁহারা সন্তানদের বিবাহ দর্শন করেন।

ভারতীয় সভ্যতার মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যখন সমগ্র পৃথিবীতে কিরণ বিস্তার করিতেছিল, তখন ভারতবর্ষীয় সমাজেও স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা অতি উচ্চ অঙ্গের বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। আমাদের পুরাকালীয় প্রায় সকল গ্রন্থগুলিতেই এই শ্রেণীর বিবাহের উল্লেখ আছে। হিন্দুস্থানের স্বয়ম্বর প্রথা যদিও আজ হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ইহা হিন্দুস্থানেরই সভ্যতার নিদর্শন ছিল।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষ যখন উন্নতির শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল, তখন এই প্রকার বিবাহই ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া গৃহীত হইত। মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থপাঠে, এমন কি মনুসংহিতাতেও এই বিবাহের হীনত্ব সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবাহের নাম প্রজাপতি বিবাহ। ক্ষত্রিয় জীবনে ইহা একটি অতীব অগৌরব বলিয়া পরিত্যাজ্য ছিল। গান্ধর্ব্ব, আসুর, এমন কি রাক্ষস বিবাহও ইহাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল। এবং সেই সময়ই ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির বাসভূমি ছিল। আজ সকলে বিচার করিয়া দেখুন, তখন যাহা শ্লাঘ্য ছিল আজ তাহার এত লাঞ্ছনা কেন, এবং আজ যাহা পরম শ্লাঘ্য তখন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ছিল কিসের জন্য?

আর্য্যসভ্যতার এই একটি পূর্ব্বগৌরবকে অবহেলা করিয়া আমরা সত্যই লাভবান্ হইয়াছি না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি? ইহা বিচার করিতে হইলে অতীতের মহাপুরুষ ও রমণীকুলরত্নদিগকে আদর্শস্বরূপ চক্ষের সম্মুখে ধরিতে হয়।

রামায়ণে স্বয়ম্বর বিবাহের বিশেষ উল্লেখ নাই। বীরত্বের পরিবর্ত্তে কন্যাদান রীতিই রামায়ণের ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত। রাক্ষসগণ ও অসভ্য জাতিগণ প্রায় জোর করিয়াই বিবাহ করিত। মহাভারতে স্বেচ্ছাবিবাহের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের ললনাকুল মহিমা সাবিত্রীকে তাঁহার পিতা ইচ্ছানুরূপ পতি মনোনীত করিবার জন্য দেশ পর্য্যটনে পাঠাইয়াছিলেন। দময়ন্তী আপনার ইচ্ছানুসারে পতিলাভ করিয়াছিলেন; রুক্মিণী, সুভদ্রা, আরও কত শত কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিবাহমাত্রেই প্রায় স্বেচ্ছা-বিবাহ বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি যাহাতে ভারতীয় নারীকুলের মহিমা, স্বেচ্ছা-মিলন তাহার অন্যতম বিকাশ মাত্র। সে দিনও রাজপুতানায় এইরূপ মিলনের জন্য এক একটা রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, এক একটি রমণীরত্ন পৃথিবীর ইতিহাসে চির অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এ সকল ইতিহাস ত আর্য্য সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস, ভারতবর্ষ তখন হীন দাসত্বের বোঝা বহিয়া কলঙ্কিত হয় নাই। আজ স্বেচ্ছা-বিবাহকে য়ুরোপীয় প্রথা বলিয়া, যদি আমরা অবহেলা করি সেটা আমাদের পক্ষে একটি বিষম ভ্রম বলিয়া পরিগণিত হইবে না কি?

কতদিন ভারতবর্ষ হইতে স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা লুপ্ত হইয়াছে জানি না। তবে একভাবে অবরোধপ্রথাকে ইহার মৌলিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দুগণ অবরোধ প্রথাকে যদি বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে স্বেচ্ছা-বিবাহের মূলোৎপাটন তাহারই আনুসঙ্গিক। এবং তাহা হইলে এই ঘটনা অধিক পুরাতন নহে। আর যদি অবরোধপ্রথা স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের ক্ষমতার অপব্যবহার জনিত হয়, তাহা হইলেও স্বেচ্ছা বিবাহের লোপ বেশী দিন পূর্ব্বে ঘটে নাই। হিন্দুজাতির অধঃপতনের পূর্ব্বে যে এই সকল সামাজিক দুর্লক্ষণ দেখা দিয়া ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। সে দিনকার রাজপুত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ পুরুষের সহযোগে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন, স্বামীপুত্রকে সহস্তে রণসজ্জা পরাইয়া দিয়াছেন। এ সকল কোনও ক্রমে অবরোধ প্রথার লক্ষণ নহে। যে দিন হইতে সমাজ দূষিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের জাতীয় অধঃপতনেরও সেই দিন হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে।

আমি বিবাহ সমস্যা নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা জাতীয়তার পক্ষে সহায়কর। পৃথিবীর মহাবীর, গুণী জ্ঞানীগণ এই মিলনের ফলস্বরূপ! ইহার সমর্থন কল্পে দু'একটি উদাহরণও উপস্থিত করিয়াছিলাম। অনেকে ইহা স্বীকার করিয়াও অন্যান্য কয়েকটি তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রথম তর্কের বিষয় এই যে, স্বেচ্ছা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে

অনেক মেয়েকে অবিবাহিতা থাকিতে হইবে, এবং তন্নিমিত্ত সমাজ কুৎসিতাকার ধারণ করিবে।

আমার ধারণাটা অনেকাংশে ইহাঁদের ধারণার বিপরীত। আপনারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই, সংসারে যে ছেলেটার উপর শাসনদণ্ড দিবারাত্রি উত্তোলিত থাকে, কালক্রমে সেই ছেলেটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিকৃত হইয়া যায়? এই প্রকার শাসনের ফলে একটা অচিন্ত্য-পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতা দিনে দিনে জন্ম পরিগ্রহ করিতে থাকে। ইহা একটি চিরন্তন সত্য। বিবাহ সম্বন্ধেও আমরা যে স্বাধীন মতামতকে চাপিয়া রাখিতে উৎসাহিত, তাহার ফলও তদ্রূপ। শত প্রকারের গাঢ় অধীনতার পেষণনিম্নে মৃতপ্রায় না থাকিলে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত অভিব্যক্তি আমাদের সামাজিক জীবনেও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত!

আর স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা বিদ্যমান থাকিলে কুৎসিৎ মেয়েদের যদি অবিবাহিতা থাকিতেই হয়,তবে অনেক কুৎসিৎ ছেলেকেও অবিবাহিত থাকিতে হইবে। ইচ্ছাটা ত এক পক্ষীয় নহে। স্বেচ্ছা বিবাহের মানে বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতি ক্রমে বিবাহ! সুন্দরী মেয়ে কুৎসিৎ ছেলেকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবে কেন? আমি বলি, এ সকল তর্ক, অথবা আশঙ্কার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। সৌন্দর্য্যের উপরে আর একটা জিনিষ সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হইয়া থাকে। চরিত্রের মধুরতা, বুদ্ধির প্রখরতা, সচ্চরিত্রতা, সাধুতা, সৌন্দর্য্যকে চিরকাল পরাভূত করিয়া আসিয়াছে। স্বেচ্ছা বিবাহ ইহাদের উপরেই ভর করিয়া চিরদিন জয়যুক্ত হইয়াছে। গুণহীন সৌন্দর্য্য শিমুল ফুলের ন্যায় স্পর্শমাত্রে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া ফেলে। য়ুরোপে এবং আমাদের দেশে যে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদ ঘটে না তাহা নহে। কিন্তু ইহাদ্বারা যতখানি উপকার সংগঠিত হয়, তাহার তুলনায় ঐ প্রকার দু'চারিটা কুফল উল্লেখযোগ্য নহে! য়ুরোপে প্রতিকার স্বরূপ অন্যান্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া য়ুরোপে অনেকেই বিবাহ করে না, কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের চাকচিক্য এই অগ্নি পরীক্ষায় টিঁকিতে পারে না। বরং আমাদের দেশে স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা বিদ্যমান না থাকার দরুণ মোহাকৃষ্ট হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহার জন্য মানুষ অনুতাপ করিয়া জীবন যাপন করে।

তারপর, যদি অনেক মেয়ের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তাহারা সমাজকে অত্যন্ত কদর্য্য করিয়া তুলিবে, স্বেচ্ছাবিবাহের বিরুদ্ধে এই যে একটা যুক্তি ইহা কতদূর সঙ্গত দেখা যাউক।

প্রথমতঃ এ যুক্তির গোড়াতেই গলদ। কারণ ইহা সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলে বিধবার চিরবৈধব্য প্রথা টিঁকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলি বিধবাদের বেলা সে যুক্তি গ্রাহ্যকর নহে, তবে এস্থলেই বা তাহা অগ্রাহ্য না হইবে কেন?

আমার মতে কিন্তু এই প্রকার কোনও শঙ্কার কারণ নাই। য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক মেয়েকে অবিবাহিতা

থাকিতে হয় সত্য, তাহার কারণ এই সকল দেশে মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী, এবং বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে! স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা বিদ্যমান থাকার দরুণ মেয়েদের অবিবাহিতা থাকিতে হয় না। আমাদের দেশেও যদি বহুবিবাহ প্রথা না থাকিত, বিধবার বিবাহ হইত, তাহা হইলে এখানেও অনেক যুবতীকে অবিবাহিতা থাকিতে হইত। ইহা ছাড়া আরও কতক গুলি জঘন্য প্রথা বর্ত্তমান থাকাতে আমাদের সমাজে মেয়েদের অবিবাহিতা থাকিবার কোনই আশঙ্কা এত দিন বর্ত্তমান ছিল না। ধরুন্ আমাদের বিবাহের বয়সের হিসাবটি। ছেলের বয়স দশ কি আট হইতে সত্তর, আর মেয়ের বিবাহের বয়স সাধারণতঃ আট হইতে চৌদ্দ। ছেলের অভাব আমাদের দেশে এত দিন এরই জন্য হয় নাই। এবং আমরা ইহাকে লইয়াই গৌরব করি। আমাদের বরের বহুরূপ, কনের একরূপ। বর কোনও ক্ষেত্রে বালক, কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধ; কোনও ক্ষেত্রে কুমার, কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রী-বেষ্টিত অথবা বিগত-পত্নী। আর কনে আমাদের দেশে চিরদিনই কুমারী।

কিন্তু কি ঘোর পাশবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা এই গৌরবকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তাহা কি বিচার করিয়া দেখার বস্তু নহে? দেশে কতক গুলি মেয়ে অবিবাহিতা থাকা তাহার চেয়ে কি বহু পরিমাণে প্রার্থনীয় নহে?

আরও একটি কথা আছে। কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপে বিবাহের এই প্রকার স্বাধীনতা থাকার দরুণ, স্বামীস্ত্রী-ত্যাগ (divorce) প্রভৃতি কতক গুলি দুর্নীতি য়ুরোপীয় সভ্যতার কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছা বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকার দরুণ য়ুরোপে স্বামী স্ত্রী-ত্যাগের সৃষ্টি হয় নাই। খৃষ্টানদের শাস্ত্র সম্মত বলিয়াই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমানগণের মধ্যে স্বেচ্ছাবিবাহ প্রচলিত নাই,তবে তাহাদের ভিতরে ডাইভোর্স প্রচলিত কেন? ইহারা যে কথায় কথায় স্ত্রী-ত্যাগ করিয়া থাকে! তারপর আমাদের ভিতরে স্বামীত্যাগ নাই বটে কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেও কি স্ত্রী-ত্যাগের বিধি নাই? আমার ত মনে হয়, আমরা যে ভাবে স্ত্রী-ত্যাগ করি, সেই ভাবে ত্যাগ করা আরও জঘন্য ব্যাপার। আমরা যে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকি, সেটা কি একটা পাশবিক হৃদয়-শূন্যতার পরিচায়ক নহে! হিন্দুর শাস্ত্রে ত স্ত্রী-মহিমার জলন্ত ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিণী, জীবন সঙ্গিনী ইত্যাদি। আমরা কিন্তু এই মহাবাণী বিস্মৃত হইয়া স্ত্রী জাতির প্রতি লাঞ্ছনার কি এক শেষ করিনা? আমরা আমাদের স্ত্রী-দিগকে এমন জঘন্য ভাবে ত্যাগ করি, যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের চক্ষে সে চিরলাঞ্ছিতা ও ঘৃণিতা হইয়া থাকে। আমরা স্ত্রী-ত্যাগ করি, অর্থাৎ নিরুপায় সম্বল-হীনাদিগকে বিশ্বের অবহেলার ভিতরে ছাড়িয়া দিই। এর চেয়ে সমাজের পক্ষে একটা লজ্জাস্কর ব্যবহার আর কি থাকিতে পারে? আপনাকে স্বরূপ ভাবে চিনিয়া লইতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে আমাদের এ জাতির মুক্তির পথও তত দূরে অবস্থিত থাকিবে।

আমরা কপট উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রূরভাবে ব্যভিচারের বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য সাধন করি য়ুরোপীয় সমাজ ধর্ম্মাধিকরণে না গিয়া সে কার্য্য সাধন করে না, এই জন্যই কি য়ুরোপের নামে আজ এমন কলঙ্ক ডঙ্কা আমরা বাজাইয়া থাকি ?

স্বেচ্ছা বিবাহের ফলাফল অন্যান্য সকল প্রকার বিবাহ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? যে স্থানে মনে মনে মিলন ঘটাইতে হইবে, সে স্থানে মনেব প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতা দান করার চেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি কোনকোনও সম্প্রদায় ইহাকে অবলম্বন করিতেছেন। এবং ইহা একটি সুদৃঢ় সত্য যে, যে সকল স্থানে ইহার একটিমাত্র বীজও উপ্ত হইয়াছে ভারতবর্ষের গৌরব পদ্মটি ঠিক সেই সেই স্থানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম সমাজ এবং এবং "নামকাটা সেপাইয়ের" দল ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাংলাদেশ আজ যাঁহাকে লইয়াই গৌরব করিতে যাউক না কেন ইহাদের মধ্যেই তাহার লীলাভূমি। নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ইহাঁদিগকে যে স্থানেই স্থাপন করিনা কেন, ইহাঁরাই দেশের গৌরব স্বরূপ।

কিন্তু হিন্দুসমাজের বুদ্ধিটা যেন বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিলাত হইতে গুণীজ্ঞানী হইয়া আসিবেন, তাঁহারা হিন্দু নহেন, যাঁহারা কুসংস্কারে লোকাচারকে মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের বাহিরের। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ হইতে একে একে সকলেই বহিষ্কৃত হইতেছেন। এমন করিলে আর হিন্দুসমাজে থাকিবে কে! অমুক তর্ক পঞ্চানন আর অমুক বিদ্যাবাগীশই কি হিন্দুসমাজ ? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের চরণ ধুলা লইতে সকলেই প্রস্তুত, তাঁহাদের অনুশাসনের নিম্নে বাস করিতে সকলেই বাধ্য, কিন্তু যদি ঠাকুরগণ অবহেলা করিয়া সকল উন্নতিতেই বাধা দেন তাহা হইলে শেষে তাঁহাদের পদধূলি লইবার লোকই পাইবেন কোথা ? নিজের মান নিজের হাতে একথা একটি সহজ সরল সত্য! যদি তাঁহারা ক্রমাগতই উন্নতির পথে বাঁধ দেন তবে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক সে বাঁধ যে ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। ইহা যে প্রাকৃতিক নিয়ম। এরূপ বাধায় ইংরেজীশিক্ষিত যুবকবৃন্দমাত্রেই অহিন্দুর তালিকা ভুক্ত হইবেন নাকি !

আজ যে সকল "অহিন্দু"এত উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা প্রচলিত সমাজের নিকটে তজ্জন্য তাঁহারা অনেক পরিমাণে ঋণী। সমাজ যে ব্যক্তির স্রষ্টা এ কথায় যদি কাহারও সংশয় না থাকে, তবে এ কথা নির্ব্বিচারে সকলেই গ্রহণ করিবেন যে দাম্পত্যসুখ এবং স্বেচ্ছা-মিলনোদ্ভূত সন্তানগণের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ এই উন্নতির মৌলিক উপদান। ইহাঁদের সমাজে নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদান করা হয়; নারীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকে। ইহারই দরুণ স্ত্রী-শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি পাইয়া আপন গরিমায় পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। কাজেই তাঁহাদের ভিতরে সর্ব্বতোমুখীন্ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতীয়তার পুষ্টিসাধনের সঙ্গেসঙ্গে

আমাদের মধ্যেও স্ত্রী-শক্তির উন্মেষণ আমরা কিছু কিছু লক্ষ্য করিতেছি সত্য ; কিন্তু যত দিন ইহা সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হইয়া না উঠিবে ততদিনে জাতীয় উন্নতির আশা স্বপ্নের অপেক্ষাও অমূলক।

কত দিনে কিভাবে স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবে জানি না। হিন্দুগণ এই প্রথাকে আশ্রয় দান করিতে নিতান্ত বিমুখ, ইহাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব লয় পাইবে এমন আশঙ্কা অনেকেই করিবেন। কিন্তু এইপ্রকার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হিন্দুর হিন্দুত্বের সঙ্গে সামাজিক দু'চারিটা সংস্কারের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। হিন্দুজাতি এবং হিন্দুস্থান জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এই আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্তই। হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া একটা পথ করিয়া চলিলে যেমন হিমালয় টুটিয়া ফাটিয়া যায় না, দুই একটা সংস্কারের পথ সমাজের উপর দিয়া বহাইয়া দিলেও হিন্দু-সমাজের বিন্দুমাত্রও অঙ্গহানি হইবে না। উন্নত আচার সংস্কারে হিন্দুসমাজের উন্নতিই হইবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। স্বেচ্ছাবিবাহের উপকারিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্র-সম্মত মতামত গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। শাস্ত্রও মানুষের বুদ্ধির বাহিরের বিষয় নহে, চিরন্তনও নহে, সময়োপযোগী। নত মস্তকে নির্ব্বিকারে তাহাকে মান্য করিলে নিজেকে খর্ব্ব করা হয়। ভুল ভ্রমের ভিতর দিয়া চলিয়া শিক্ষা লাভ করা—শাস্ত্র মানিয়া প্রতিপদক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া চলার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়ঃ। কেননা তাহাতে উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আজ আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া আমাদের অভিভাবকবৃন্দ যদি অশ্বপতির ন্যায় বলেন, "বৎসে ও বৎস আপনার মনোমত পতি পত্নী বাছিয়া লও" তাহাতে ভারতের কল্যাণই হইবে।

অবরোধ ইত্যাদি প্রথা যে ভাবে শিথিল হইয়া আসিতেছে, দেশ ব্যাপিয়া দিন দিন যে ভাবে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, কন্যাগণেরও অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, কাজেই এই প্রকার বিবাহ পদ্ধতিও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে ; আজ যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহারা সমাজের কল্যাণপথ রুদ্ধ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অবশেষে বক্তব্য এই, কেহ যেন না মনে করেন পিতামাতার নির্ব্বাচনপদ্ধতি আমি একবারেই উঠাইয়া দিতে বলিতেছি। আমাদের সমাজে যখন স্ত্রীপুরুষের মিলনক্ষেত্র অবারিত নহে তখন পিতামাতার পাত্রনির্ব্বাচন কতক পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী এবং অনভিজ্ঞ বরকন্যার পক্ষে বহু সময় অভিজ্ঞ পিতামাতা কর্ত্তৃক পাত্রনির্ব্বাচন সুফলপ্রদ তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতামাতা নির্ব্বাচন করিলেও বরকন্যার ইচ্ছার উপরই প্রধান ভাবে বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রার্থনীয়, এবং তাহাই সমাজের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

নবাব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুজ্-পরিবার।

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। নিত্যকার মত সেদিন প্রভাতেও পারির নিভৃত প্রান্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একখানি গৃহ হাস্য আনন্দ-কলরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

"বাবা, আমার বাজনা আনতে ভুলো না।"

"আর আমার পশম!"

"আজ কিন্তু আমার বোনবার কাঁটা আনা চাইই, বাবা—"সেই সঙ্গে পিতার কণ্ঠও শুনা গেল। পিতা বলিল, "ইয়া, আমার ব্যাগটা দিয়ে যাও ত, মা—"

"বাবা, বাবা, রোজ তুমি ব্যাগ ভুলে যাবে! মাগো,—আর পারিও না আমি!"

ইয়া ব্যাগ লইয়া আসিলে বৃদ্ধ জুজ্ কন্যাগুলিকে যথেষ্ট ভরসা দিয়া বিদায় লইল। মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। জানালা দিয়া পথ দেখা যায়। সেই পথে জুজ যাইবে। তখনও মেয়েদের চোখের পাতে নিদ্রার জড়তা মাখানো ছিল, আলু-থালু কেশ—বেশ একটি সহজ সরলতায় মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। চারিটি মেয়ে আসিয়া খড়খড়ির উপর বুক দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধ পিতাকে সস্নেহভাবে বিদায়-সম্ভাষণ করিল! বৃদ্ধ পথে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া ফিরিয়া চাহিল।

জুজ অফিসে চলিয়াছে। মেয়েরা ছুটিয়া চারতলার ছাদে উঠিয়া আলিশায় ভর দিয়া বাপের পানে চাহিয়া রহিল—যতক্ষণ বাপকে দেখা যায়! দূর হইতে বৃদ্ধ ছাদের পানে চাহিয়া দেখিলেন, দূর হইতেই উভয় পক্ষে চুম্বন-বিনিময় হইল। জুজ মোড় বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাসা হইতে হাঁটিয়া চলিয়া হেমারলিঙ এণ্ড সন্‌সের অফিসে পৌঁছিতে জুজের ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগিত। পথটুকুও দীর্ঘ নহে, তবে জুজের গতি মৃদু ছিল। বেগে চলিলে বাতাস লাগিয়া গলায় সুন্দর বাঁধা বো-টি পাছে ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়, এই আশঙ্কায় জুজ কখনও বেগে চলিত না। এ বো মেয়েরা কত যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে!

কয়েক বৎসর হইল, জুজের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। শোকের উপর পাষাণ চাপা দিয়া এ কয় বৎসর মেয়েদের জন্যই শুধু জুজ প্রাণ ধরিয়া আছে। মেয়ে ধ্যান, মেয়ে জ্ঞান, মেয়েগুলিকেই নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদের সহিত সহস্র আদর-আব্দার করিয়াই বৃদ্ধ আপনাকে কোনমতে খাড়া রাখিয়াছিল। কল্পনা কিন্তু জুজের প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িতনা। অফিসের পথটুকু চলাফেরা করিবার সময় কল্পনা তাহার সম্মুখে আপনার মায়াজাল বিস্তার করিয়া ধরিত! বৈদ্যুতিক পাখা যেমন ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরিতে থাকে, জুজের মাথার মধ্যে কল্পনাও তেমনি বেগে ঘুরিতে থাকিত। অফিসের একাউণ্টাণ্ট জুজ যখন অফিসের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিত কল্পনা তখন সভয়ে দূরে

সরিয়া থাকিত। তখন জুজকে দেখিলে এ কথা কেহ বলিতে পারিত না, ঘাড় গুঁজিয়া এই যে লোকটি অঙ্কের পর অঙ্ক কষিয়া চলিয়াছে, ইহার সহিত ঐ মায়াময়ী চটুল কল্পনার কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল বা আছে! কিন্তু একবার অফিসের বাহিরে পা দুইটি বাড়াইলে হয়! দুরন্ত শোকের মত কল্পনা যেন প্রচুর আক্রোশে জুজকে আক্রমণ করিত! মাথায় তাহার ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যাইত—কত চিন্তা, কত কথা তরঙ্গের মত নাচিয়া ছুটিত! সে সকলের সন্ধান রাখিলে দশজন লেখক তরিয়া যাইতে পারিত।"

সেদিন সকালেও মেয়েদের চোখের আড়ালে আসিতেই জুজের মাথার মধ্যে কল্পনা এক বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া ধরিল। বৎসর শেষ হইতে চলিল—বড়দিন আসন্ন। কন্যাদের জন্য বিবিধ সওগাত কিনিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসে হেমারলিঙ এণ্ড সন্‌সের কর্ম্মচারী মাত্রেই অতিরিক্ত এক মাসের মাহিনা ভাতা পাইয়া থাকে। সওগাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাতার কথাও জুজের মনে পড়িল। ছোট-খাট পরিবারে এই ভাতা অনেকখানি আনন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারই উপর পুত্রকন্যার হাসিমুখ নির্ভর করে। দুঃখ-দৈন্যের দিনের জন্য সামান্য সঞ্চয়ের আয়োজনও এই ভাতার সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। কর্ম্মচারীর দল ইহার জন্য মনিবের জয়-গান গাহিতে কখনও কার্পণ্য করে না।

আসল কথা জুজের অবস্থা বেশ সচ্ছল নহে। তাহার স্ত্রী এক বনিয়াদি ঘরের কন্যা ছিল—পয়সার সাচ্ছল্য না থাকিলেও বনিয়াদি ঘরের মেয়ের পক্ষে চাল কমানো সহজ ব্যাপার নহে। জুজও এ বিষয়ে স্ত্রীকে কোনদিন একটা কথা বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেয় নাই। সেই স্ত্রী আজ তিন বৎসর হইল সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি পাছে অসম্মান প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় জুজ স্ত্রীর জীবিত-কালীন ব্যবস্থাদিতে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেয় নাই। স্ত্রীর স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা বন্ মামান্ এখন গৃহিণী—তাহারই হাতে জুজ টাকা-কড়ি তুলিয়া দেয়—গুছাইয়া ব্যয় করিবার ভার বন্ মামানের উপর! এ কাজ বন্ মামান্ এমন নিপুণতার সহিত চালাইয়া আসিতেছে যে সংসারের কোন কোণ হইতে কোন দিন এতটুকু অনুযোগের সুর উত্থিত হয় নাই।

এ বৎসর ভাতাটা কিছু মোটা রকমের হইবে বলিয়া জুজ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। স্থির করিবার কারণও ছিল। টিউনিস্ লোনে কোম্পানি এবার সমধিক লাভবান্ হইয়াছে। জুজ তাহার সহকারিবৃন্দকে এ কয়দিন ধরিয়া আশ্বাস দিয়া এই কথাই বলিয়া আসিতেছে, "হেমারলিঙ এণ্ড সন্ এবার লক্ষ্মীকে একবারে মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছে!"

চলিতে চলিতে জুজ ভাবিল, ভাতা অন্য বৎসরের অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে, নিশ্চয়! এত লাভ! কল্পনা-নেত্রে সে যেন স্পষ্ট দেখিল, হেমারলিঙের ঘরে তাহার ডাক পড়িয়াছে! হেমারলিঙ প্রসন্ন মুখে জুজকে ডাকিয়া অনেক টাকার চেক্ কাটিয়া দিতেছে! ধন্যবাদ দিয়া জুজ যেমন চলিয়া যাইবে,

হেমারলিঙ তাহাকে ডাকিল, কহিল, "জুজ, তোমার কটি মেয়ে?"

জুজ উত্তর দিল, "তিনটি—না, না, চারটি—আমার ঐ ভারী ভুল হয়ে যায়। বড়টি একেবারে পাকা গিন্নি কি না!"

মনিব কহিল, "বয়স তাদের কত?"

"আলিনের বয়স কত—কুড়ি হবে—হ্যাঁ, কুড়ি। সে-ই বড়। তারপর এলিস্, এবার সে পাশ দেবে, বয়স হল আঠারো। হেনরিটা চোদ্দয় পড়েছে আর জাজা তাকে ইয়া বলে ডাকি, সে এই সবে বারোয় পা দিয়াছে।

তার পর ব্যারণ হেমারলিঙ সংসারের সচ্ছলতার কথা তুলিলেন, একান্ত সঙ্কোচে জুজ বলিল, "এই আমার মাইনেই যা ভরসা, ব্যারণ সাহেব। কিছু টাকা জমিয়েছিলুম, তা স্ত্রীর ব্যামোতে আর মেয়েদের লেখাপড়ার—"

মনিব বলিলেন, "বুজেছি জুজু, এ মাইনেতে তোমার কুলোয় না। মাসে হাজার ফ্রাঙ্ক বাড়িয়ে দিলুম—তাতে হবে ত?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! ওঃ, এ যে ঢের।"

আনন্দের বিহ্বলতায় শেষ কথা কয়টা জুজ এমন সজোরে উচ্চারণ করিল যে দুই চারিজন পথিকও তাহা শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জুজের সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তখন মাহিনা বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল! মেয়েদের লইয়া থিয়েটারে যাইবে—একটা বক্স লইবে—হ্যাঁ বক্স! বক্স আলো করিয়া বসিয়া মেয়েরা থিয়েটার দেখিবে,—সম্ভ্রান্ত দর্শকের প্রশংসমান দৃষ্টির বিদ্যুৎ তাহাদের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইবে এবং পরদিনই দুই মেয়ের জন্য দুই পাত্র আসিয়া—জুজের কল্পনা এইখানে বাধা পাইল। সে আসিয়া অফিসে পৌঁছিল। মোটা খাতা খুলিয়া নিত্যকার মত কলম লইয়া বসিয়া মৃদু হাসিয়া জুজ ভাবিল, কি যে সব বাজে কথা মনে আসে!

কিয়ৎক্ষণ পরেই সংবাদ আসিল, বড় সাহেবের কাছে জুজের ডাক পড়িয়াছে। হেমারলিঙ! জুজের বুকের মধ্য দিয়া একটা পুলকতাড়িৎ ছুটিয়া গেল! এ কি, এখনও সে স্বপ্ন-দেখা চলিয়াছে!—না! তবে! তবে কি তাহা সত্য হইয়া ফলিবে? আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে মনিবের ঘরে উপস্থিত হইল। মনিব জুজকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; জুজ নিকটে আসিলে, "জুজ্ তোমার কটি মেয়ে?" এ কথার পরিবর্ত্তে মনিব কহিলেন, "জুজ টিউনিস্ লোনের কথা নিয়ে সমস্ত আফিস একেবারে তোলাপাড়া করে তুলেছ—তুমি যা বলেছ, তার সমস্তই আমার কানে গেছে। এ সব আমি মোটে পছন্দ করি না। তা ছাড়া তোমার এই রকম বলে বেড়ানোর দরুণ আমাদের ক্ষতিও কিছু হয়েছে—এ-সব কারণে আমি তোমায় নোটিস দিচ্ছি—আসছে মাস থেকে তোমার আমার অফিসে কাজ করা পোষাবে না!"

ইস্তফা! এ কি কথা! জুজের কাণের কাছে সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু বহিতেছিল, মাথার মধ্যে রক্ত-স্রোত ঝড়ের ঢেউয়ের মত আতালি-পাতালি করিতেছিল। তাহার মেয়েরা!—বেচারী মেয়েরা! তাহাদের দশা কি হইবে? এ সময়ে সস্তায় বাড়ীও সংগ্রহ করাও যে বিষম কঠিন ব্যাপার!

জুজের চোখের সম্মুখে দায়িত্বের একটা বীভৎস কঙ্কাল-মূর্ত্তি খট্ খট্ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিল। একবার তাহার মনে হইল, মনিবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া সে আপনার দুর্দ্দশার কাহিনী খুলিয়া বলে! কিন্তু না, তাহাতে কোন ফল হইবে না। পাথরের মত কঠিন হেমারলিঙের প্রাণ! বেদনার আক্ষেপ তাহাতে এতটুকু ক্ষীণ রেখাও পাত করিতে পারিবে না! সে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেদিন গৃহে ফিরিয়া মেয়েদের কাছে জুজ কোন কথা বলিল না। বলিবার সাহসও ছিল না। আসন্ন উৎসবের আয়োজন কল্পনায় মেয়েরা বিভোর হইয়া রহিয়াছে! এ সময় তাহাদের সে আনন্দে আঘাত দিবার সাহস জুজের ছিল না। এ কথা শুনিলে চোখ তাহাদের জলে ভরিয়া উঠিবে! তাহা ছাড়া এত তাড়াই বা কেন! কাল বলিলেও চলিতে পারে! এমন করিয়াই নভেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল। প্রতি দিনই তাহার মনে আশা জাগিত, আজ হয় ত হেমারলিঙ ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু সে আশা নিত্যই নিষ্ফল হইত। তাহার পর ডিসেম্বর মাসে মাহিনা আনিতে গিয়া জুজ যখন এক মাসের মাহিনা অতিরিক্ত পাইল, তখন ভাবিল, এবার বুঝি চাকুরিটিতেও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়—কিন্তু তাহা ঘটিল না। জুজ দেখিল, তাহারই আসনে বসিয়া আর একজন লোক নিবিষ্ট চিত্তে হিসাব লিখিতেছে।

বাড়ীর সহিত জুজ বরাবর চাতুরী খেলিয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বকার মত অফিসে বাহির হইবার সময় নিত্যই সে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়—মেয়েরা পশম পুতুল প্রভৃতির জন্য আব্দার করে। ইচ্ছা করিয়াই মেয়েদের সে ফরমাস্ মিটাইতে সে ভুলিয়া যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করিলে ঢোঁক গিলিয়া মৃদু হাসিয়া জুজ উত্তর দেয়, "আজ বড় খাটুনি গেছে মা,—ভুলে গেছি।"

সারাদিন জুজের পথে পথে ঘুরিয়াই কাটিয়া যায় কখনও বা লোকের মুখে আশা পাইয়া কোন্ অফিসে চাকুরির চেষ্টায় প্রবেশ করে—কিন্তু সর্ব্বত্রই উত্তর প্রায় একই রূপ—সকলেই অল্প বয়সের লোক চায়—টাকা দিয়া পুরা দমে যাহাকে খাটাইয়া লওয়া যাইবে, এমন লোক,—বৃদ্ধের দেহে আর কতই বা বল! কেহ বা সহানুভূতি জানাইয়া বলে, "এ্যাঁ—হেমারলিঙ এণ্ড সনের ওখানে তুমি আর নেই? সে কি!" কেহ বা আশ্বাস দেয়, "জানুয়ারি মাস পড়লে, বছরের গোড়ার দিকে এস। দেখা যাবে।" জুজ বেচারা একেই নিরীহ, তাহার উপর নিজের দুর্ভাগ্যে সে যেন মরিয়া আছে। লোকের কাছে সে দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে মাথা তাহার কাটা যায়। তাই সে কোথায়ও আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ না করিয়া আশ্বস্তভাবেই ফিরিয়া আসে।

বৃষ্টি ও তুষার-পাতের মধ্যে এমনই ভাবে নিষ্ফল ভ্রমণ করিয়া জুজের দিন কাটিয়া যায়। চাকুরি নাই চাকুরি খুঁজিতেছে! এ যে বড় লজ্জার কথা! তাই শেষে এমন

ঘটিল যে, চাকুরির কথা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার কেমন সঙ্কোচ ঘটিতে লাগিল। বলিয়াও যখন এত দিনে পাওয়া গেল না, তখন আর সে কথা বলিয়া ফল কি! কিন্তু বাড়ীর অবস্থা আরও শোচনীয় দাঁড়াইল মেয়েরা হেমারলিঙের কথা জিজ্ঞাসা করে! কবে সে মাহিনা বাড়াইয়া দিবে! কত বাড়াইবে! জুজ কি বলিবে! হেমারলিঙের নির্ম্মমতায় তাহার পাঁজরার হাড় কয়খানা যেন ফাটিয়া গিয়াছিল। সে আজ দশ বৎসর ধরিয়া হেমারলিঙের অফিসে কাজ করিয়া আসিয়াছে। আজ বার্দ্ধক্য যখন তাহার শিরাগুলাকে লোল করিয়া দিয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াইবার সামর্থ্যটুকুও হরিয়া লইয়াছে, এমন দুর্দ্দিনে বিনাদোষে মনিব হেমারলিঙ তুচ্ছ একটা খেয়ালে শুধু তাহাকে সাফ জবাব দিয়া দিল! হেমারলিঙের প্রশংসায় মেয়েদের কাছে কে সে বড় গলা বাহির করিত! আজ সেই হেমারলিঙের নিষ্ঠুরতার কথা বলিতে গিয়া তাহার যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকিল—নিজের কানেই তাহা কেমন মিথ্যা শুনাইতেছিল। অপরকে সে তাহা বলিতে পারিল না। তাই সে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া এমনই ভাবে অভিনয় সারিয়া চলিল। মেয়েরা একটা বিষয় বড় স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেও তাহারা ভুলে নাই। মেয়েরা বলিয়াছিল, "বাবার শরীর একটু ভাল যাচ্ছে বোধ হয়। আগে বাবার এমন খিদে হত না ত। এখন কিন্তু অফিস থেকে ফিরে বাবা খেতে পারে ভাল!" এ ইঙ্গিত তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত জুজের মর্ম্মের মধ্যে বিঁধিত।

দিন কাটিতে লাগিল। জুজের চাকুরী মিলিল না। হাতের পুঁজিও কমিয়া আসিতেছিল। জুজ যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। আর বুঝি মিথ্যা বলিয়া ব্যাপারটাকে চাপিয়া রাখা যায় না। সওগাতের জন্য জাজা উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে বন মামান কাল সওগাতের কথা তুলিয়াছিল—কাহার জন্য কি চাই, কাহাকে কি জিনিস উপহার দিলে শোভন হয়, বন মামান তাহাও বলিয়া ছিল—সে মুহূর্ত্তে জুজের যেন দারুণ অগ্নিপরীক্ষা চলিল। মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিতে পারে নাই। তাহার অকপট সরল দৃষ্টির সম্মুখে জুজের ভিতরকার সমস্ত গোপন রহস্য যদি ঈষৎ আভাষেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে! যে সকল কয়েদীর দল কয়েদ খালাস হইয়াও হাকিমের অনুজ্ঞামতে পুলিশের তদারক-বন্দী হইয়া থাকে, তাহারা যেমন চলিতে ফিরিতে একটা বিশ্রী রকমের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, জুজের অবস্থাও ইদানীং ঠিক তাহাদেরই সমতুল হইয়া পড়িয়াছিল। কে জানে, এ ভাবে এখনও কতদিন কাটাইতে হইবে! বুঝি বা জীবনের বাকী কয়টা দিনই এমন ভাবে কাটাইয়া দিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পুরাতন বন্ধু পাসাজোঁ একদিন বলিয়াছিল "নবাবের কারবারে কাজ করবে। বেশী মাহিনা মিলবে।" তখন জুজ হেমারলিঙের চাকরী ত্যাগ করে নাই। সে বলিয়াছিল, "বিনাদোষে মনিব ছাড়ব! শুধু পয়সার লোভে? ছিঃ!"

আজ মনিব তাহার নির্লোভ অন্তর না বুঝিয়া অকারণে তাহাকে বিদায় করিয়া

দিল! শুধু বিদায়—এ যে একরূপ পথে বসানো! আজ সেই পাসাজোঁর কাছে গিয়া মুখ তুলিয়া নবাবের কাছে চাকরীর কথা তুলিতেও সে লজ্জা বোধ করিল।

হায়, কেন সে টিউনিস্ লোন্ লইয়া এতখানি মাথা ঘামাইতে গিয়াছিল! এ দুর্ব্বুদ্ধি তাহার কেন হইয়াছিল! জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইতে সেই দুর্দ্দিনের কথাটা রবার ঘষিয়া পেন্সিলের দাগের মতই যদি তুলিয়া ফেলা যাইত! কিন্তু না, তাহা হয় না—হয় না! কবিরা মিথ্যা উপমার ভাবে মানুষকে মজাইয়া গিয়াছেন। কে বলিল, জীবন গ্রন্থ-স্বরূপ! গ্রন্থের একটা পাতা ছিঁড়িয়া সে-স্থলে আর একটা পাতা জুড়িয়া কোনমতে তাহার সংস্থান-যোগটুকুকে খাড়া রাখা যায়, কিন্তু জীবন বড় কঠিন ব্যাপার! সেখানে কোথাও এতটুকু গোঁজামিল চলে না—জোড়া-তাড়া খাটে না। এ এক নির্ম্মম প্রহেলিকার মত চলিয়াছে—চলিয়াছে! একটি ভুল করিলে যতই ছোট সে ভুল হোক—তাহা আর ফিরাইবার উপায় নাই! পথ নাই। অকরুণ কঠিন এ বিধান সন্দেহ নাই!

কাল বড়দিনের অধিবাস-সন্ধ্যা। কাল সকালে সওগত আনা চাইই—নহিলে মেয়েদের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো যাইবে না। এই যে জাজা আজ হইতে বায়না লইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। সেজ মেয়েটিও ম্লান নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ছিল—এলিসও কি বলিতে আসিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া কি জানি কি ভাবিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না—আর বন মামান্—সে বুঝি পিতার হৃদয়ের গূঢ় রহস্যের একটু আভাস পাইয়াছিল! বুঝি কিছু সন্দেহ করিয়াছিল—তাই আর তাগাদা করে নাই! জুজের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কাল সে কি করিবে—কি করিয়া সওগাত আনিয়া মেয়েদের মুখে হাসির দীপ্তি ফুটাইবে। সারা পারি উৎসবের আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়ে নরনারী সকলেই উল্লাসে বিভোর—আর—সে এত দীন, এমন লক্ষ্মীছাড়া যে—

জুজের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল।

বাহিরে দ্বারে কে করাঘাত করিল। কে আসিল? হেমারলিঙের ওখান হইতে কেহ আসিল না কি! এলিস যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক অপরিচিত তরুণ যুবা কক্ষে প্রবেশ করিল। মেয়েরা চকিতে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল। জুজ জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। যুবা অভিবাদন করিয়াই কন্যাদের সহিত বৃদ্ধের এ মধুর অবসর-উপভোগে বাধা দেওয়ার জন্য প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিল, পরে বলিল, জুজের পুরাতন বন্ধু পাশাজোঁর কাছেই তাঁহার কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাইয়া সে আজ তাঁহার দ্বারে বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়া হাজির হইয়াছে। যদি জুজ কয়েক মাস—সপ্তাহে তিন চারি ঘণ্টার মত অবসর করিয়া লইয়া ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ রাখা তাহাকে কিছু শিখাইয়া দেন!

যুবার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুজ কম্পিত স্বরে কহিল, "বলেন কি! তা আর সুবিধে হবে না? খুব হবে—বিশেষ এখন ত আর আমার অন্য কোন কাজ-কর্ম্ম নেই!

তা আপনার কখন্ সুবিধে হবে, বলুন, কোথায় আমার যেতে হবে--?"

যুবা বলিল, "হাঁ—ভাল কথা। আমি লুকিয়ে এ কাজ শিখতে চাই। আপনার যদি কোন রকম অসুবিধে না, হয় আর যদি অনুমতি করেন ত এইখানে এসেই শিখি। তবে একটা কথা, আজ আমি বিপ্লবের মত আসার দরুণ কাঁরা যেমন ছুটে পালিয়ে গেলেন, যদি বারে বারে তেমনি ঘটে, তাহলে কিন্তু আমার পক্ষে আসা দায় হতে পারে।"

জুজ হাসিয়া কহিলেন, "ও আমার মেয়েরা। ওরা আমার কাছে রাত্রে বসে একটু-আধটু গল্প-স্বল্প করে কি না! তা ছাড়া ওরা বেশী রাতও জাগে না ত!"

স্থির হইল, সারাদিন ও সন্ধ্যায় বসিয়া শিক্ষা দেওয়ায় কোন অসুবিধা ঘটিবে না।

যুবা কহিল, "কিছু মনে করবেন না—আপনি যে এতখানি পরিশ্রম করবেন, তার কিছু পারিশ্রমিক—"

জুজের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া কহিল, "না, না, আপনি শিখবেন, —এতে আর আমার মেহনতই বা কি! বসে আছি বৈ ত না। আপনাকে না হয় একটু শেখালুম—"

যুবা কহিল, "না, না। সে কি হয়? তবে আপনার যোগ্য দিতে পারি—এমন কি সামর্থ্য আছে! তবে—"

জুজের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে পারিল না। ইহাই ভগবানের করুণা! কালিকার ভাবনায় সে যখন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল—ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না, তখন কোন্ স্বর্গ হইতে এ কি করুণা ঝরিয়া পড়িল! যুবা কহিল, "এই এক মাসের জন্য আগাম নিন্—"

জুজের হাতের মধ্যে যুবা নোট্ গুঁজিয়া দিল। জুজ চমকিয়া উঠিল, "এ কি—এত!"

"এত আর কি! সামান্যই!"

জুজ কিছু বলিল না; করুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যুবার পানে চাহিয়া রহিল! যুবা কহিল, "তাহলে বুধবার থেকে আসব—কি বলেন, মস্যঁ জুজ?"

"বুধবারেই তাহলে--আচ্ছা—ও মেঁ মস্যঁ—

"ওহো—আমার নামটাই বলা হয় নি এখনও। আমার নাম হ্যে গেরি—পল্ হ্যে গেরি—"

গেরি বিদায় লইল—দুই জনেই বিস্মিত পুলকিত হইয়া গিয়াছে। জুজ ভাবিল, এ আমার ভগবান—এ আসিয়া আমায় আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিল। কৃতজ্ঞতায় অন্তর তাহার লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। গেরি বিস্মিত হইল—এই নির্লোভ-চিত্ত নিরীহ বৃদ্ধকে দেখিয়া। এও পারির লোক! এমন লোক পারিতে থাকিতে পারে, ইহা সে ভাবেও নাই। কেতাবে এমন লোকের কথা কেহ ত লিখে না—পারির সম্ভ্রান্তসমাজে এমন লোকের দেখাও মিলে না। জুজকে দেখিয়া গেরির আজ আবার নূতন করিয়া তাহার পল্লীর কথা মনে পড়িল—পারির বিপুল হৃদয়-হীনতার মধ্যে শান্তিময় একটি হৃদয়ের সন্ধান পাইয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পিপীলিকা

বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন প্রাণী জগতে পিপীলিকা বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় গুণে আদর্শ স্থানীয়। বাস্তবিক পিপীলিকার কার্য্য কলাপের বিষয় ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষতঃ যখন আমরা ইহাদের আয়তনের কথা মনে করি তখন ত বুঝিতেই পারি না যে এত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর কি করিয়া এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সঞ্চিত হইল। এতটুকু জীব কিরূপ ভাবে এত পরিশ্রম সংসাধন করে। প্রাণী জগতে একমাত্র মনুষ্যেরই সহিত ইহাদের বুদ্ধি ও কার্য্য কলাপের তুলনা হইতে পারে। ইহাদের সামাজিক শৃঙ্খলা, জাতিবিভাগ, ইহাদের সুনির্ম্মিত বাসগৃহ এবং রাস্তা ঘাট, গৃহ-পালিত দাস দাসী ইত্যাদির কথা ভাবিলে মনুষ্যের ন্যায় ইহাদেরও যে হৃদয় বলিয়া একটী বৃত্তি আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার আচরণ ও কার্য্যকলাপ বিশেষ ভাবে বিভিন্ন। এক জাতীয় পিপীলিকার ভিতরেও সকলের আচরণ একরূপ দেখা যায় না। এমন কি একই পিপীলিকাকে স্থান ও সময় ভেদে বিভিন্ন রূপ আচরণ করিতে দেখা গিয়াছে।

পিপীলিকাজীবন প্রধানতঃ দুই স্তরে বিভক্ত। ডিম্ব জীবন ও সম্পূর্ণ-দেহ-প্রাপ্ত পিপীলিকা। ইহার মধ্যবর্ত্তী দুইটী অবস্থা আছে (larva ও pupa)। ডিম্ব গুলি সাদা এবং হরিদ্রা রঙের এবং কতকটা লম্বাকৃতি। ডিম্ব প্রসবের প্রায় পনেরো দিবস পর সাধারণতঃ সেগুলি ফুটিয়া থাকে; অনেক সময় একমাস বা ততোধিক সময়ও অতিবাহিত হইয়া থাকে। তখন এ গুলিকে বোল্‌তার টোপের মত দেখায় তবে তদপেক্ষা অনেক ছোট। এই অবস্থায় ইহাকে larva বলে। বোলতার টোপ অনেকে দেখিয়াছেন; স্থানবিশেষে এগুলি বড়শিতে গাঁথিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই (larva) গুলি অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত লালিত পালিত হয়। ইহাদিগকে শ্রামিক পিপীলিকারা পিঠে করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া যায়। বয়স ও আয়তন অনুসারে ইহাদিগকে পিপালিকা বিবরে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়। ঠিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগের মত পিপালিকা শিশুগুলি এই অবস্থায় কোনকোনও ক্ষেত্রে একমাস হইতে ৬।৭ সপ্তাহের ভিতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া জীবনের তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। কখনও বা অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ও অতিবাহিত হয় ইহাকেই পিউপা (pupa) অবস্থা বলে।

এই সময়ে অর্থাৎ পিউপা অবস্থাতে ইহাদের পিপীলিকার ন্যায় আকৃতি লাভ হয়। পা হুল ইত্যাদি বাহির হওয়ার পরই ইহারা জীবনের তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় অল্প কয়েকদিন অতি-বাহিত হইবার পরই ইহাদের কোমলদেহ

কঠিন হইতে থাকে এবং কয়েক দিনের ভিতরই ইহারা পূর্ণাবয়ব পিপীলিকা দেহ লাভ করে।

এইরূপে তিন শ্রেণীর পিপীলিকা জন্ম গ্রহণ করে—(১) স্ত্রী বা রাণী পিপীলিকা (২) পুরুষ পিপীলিকা ও (৩) শ্রামিক পিপীলিকা —ইহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীও না সম্পূর্ণ পুরুষও না। ইহাদের ভিতর স্ত্রী হৃদয়ের কোমলতা এবং পুরুষের ন্যায় শ্রমসহিষ্ণুতা দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষোচিত অনেকগুলি গুণের সামঞ্জস্যীভূত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকা-গৃহের যাবতীয় কার্য্য ইহারাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাণী নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া ডিম্ব প্রসব করেন আর শ্রামিক পিপীলিকারা সেগুলি প্রতিপালন ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত রাণীর সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করা, এবং গৃহ নির্ম্মাণ খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি যাহা কিছু কাজ সমস্তই এই দাস পিপীলিকারা সম্পন্ন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের সন্তানাদি হয় না কেন না ইন্দ্রিয় হিসাবে ইহাদের দেহ অসম্পূর্ণ তবে কখনকখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেও দেখা গিয়াছে। ইহাদের কালেভদ্রে দুএকটি সন্তানসন্ততি হইলেও সেগুলি প্রায়ই বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন হইয়া থাকে।

রাণী পিপীলিকার ডিম্ব হইতে যে সকল পিপীলিকার জন্ম হয়, তাহাদের ভিতর শ্রামিক পিপীলিকারই সংখ্যা অধিক; পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকা অতি অল্পই জন্মায়। পুরুষগুলি বিবাহ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিবাহের দিবসে উহাদের পাখা উঠে এবং সেই শুভদিনেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে—বাসর শয্যা তাহাদের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়। বিবাহ দিবসে রাণী-পিপীলিকাদেরও পাখা ওঠে, তবে তাহারা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। মাতা হইয়া ইহারা অসংখ্য পিপীলিকাকে জন্ম দান করে। ইহাদের জীবনকাল সাধারণতঃ এক বৎসর। লবকের (Lubbock) রক্ষিত ২।৩টি রাণী-পিপীলিকা ৮।১০ বৎসরও বাঁচিয়া ছিল।

শ্রামিক পিপীলিকারা দেশ ও জাতি ভেদে নানা আয়তনবিশিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ (Ægodoma cephaloters) এক জাতীয় পিপীলিকার উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের ভিতর তিন শ্রেণীর শ্রামিক পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। (১) সাধারণ ছোট আকারের শ্রামিক, (২) বৃহদায়তন শ্রামিক, ইহাদের মস্তক বড় বড় লোমে আচ্ছাদিত, (৩) ভিন্নপ্রকার বৃহদায়তন শ্রামিক, ইহাদের মস্তক লোমশূন্য।

পিপীলিকার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) মস্তক (২) বক্ষ (thorax) (৩) নিম্নোদর (abdomen)। মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিবেশ স্থল মস্তক। পাগুলি (thorax) বক্ষ সংলগ্ন এবং এ স্থানেই ইহাদের পক্ষোদ্গম হইয়া থাকে। তলপেটে পাকস্থলি আছে। হুলও ইহারই ভিতর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

উহাদের বক্ষে (thorax) ছোট ছোট তিনটি ছিদ্র থাকে ইহাদেরই ভিতর দিয়া পিপীলিকাদের শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

বিবাহের পর নবীনা পিপীলিকারাণী কখনও পূর্ব্বগৃহে ফিরিয়া আসে—কখনও

বা কতকগুলি শ্রামিক পিপীলিকার সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে এক নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নূতন সংসার পাতে, আবার সময় সময় নিজে একাকীই একটি গৃহের সংস্থান করিয়া লয়। কিন্তু একাকী সংসার পাতিয়া কোনও পিপীলিকাকেই সফল মনোরথ হইতে দেখা যায় না। এমনও অবশ্য দেখা গিয়াছে যে পিপীলিকারাণী বিবাহের পর নিজের পাখা নিজে ছেদন করিয়া নিজের পরিশ্রমে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ডিম্ব প্রসব করিয়া সেগুলি তা' দিয়া ফুটাইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী (larva) অবস্থায় সেগুলির উপযুক্তরূপ যত্ন নিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তোলা কখনই একটি পিপীলিকার কর্ম্ম নহে। এরূপ স্থলে শ্রামিক পিপীলিকাদের সাহায্য না লইলেই নয়।

এক একটা পিপীলিকাপরিবার দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া থাকে। তাই তাহাদের মধ্যে মধ্যে নূতন রাণীর আবশ্যক হয়। কিন্তু অন্য পরিবারের কোনও নূতন রাণী আসিয়া যে সহজে তাহাদের গৃহে আমল পাইবে তাহার জো নাই। লবক কখনও রাণীশূন্য পরিবারে নূতন 'রাণী' ভর্ত্তি করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। মেককুক একবার একটি রাণীকে অন্য নূতন পরিবারে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 'রাণী'টিকে এরূপ ভাবে ঐ পরিবারে কিছুদিন আবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন যে তাহাদের ভিতর দৃষ্টি বিনিময় হইতে পারিত। তারপর ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে ভালবাসা জন্মে। বিশেষ ভাবে পরিচয় হইয়া যায়। ঠিক আমরা নূতন পায়রাতে পায়রাতে জোড়া বাঁধিতে হইলে যাহা করিয়া থাকি। কিংবা একদল হাঁসের ভিতর নূতন একটিকে আনিয়া ভর্ত্তি করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করি।

নানা প্রকার কীট পোকা পিপীলিকার খাদ্য। এ সকল কীট পোকাকে অধিকাংশ স্থলে ইহারা নিজেরাই সংহার করিয়া থাকে। মৃত অবস্থায় পাইলে ত তাহাদের বিশেষ সুবিধাই হয়। কীট পোকা ছাড়া মধু এবং ফল খাইতেও উহারা বেশ ভালবাসে। আর এমন কোন মিষ্টদ্রব্য কিংবা প্রাণীদেহ নাই যাহার খোঁজ পাইলেই পিপীলিকার সারি আসিয়া উপস্থিত না হয়। এতদ্ব্যতীত পিপীলিকার দুগ্ধপানের লোভও বেশ প্রবল।

পিপীলিকার দৈনিক জীবন বড় চমৎকার। সে সম্বন্ধে আমরা একজন বৈজ্ঞানিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সেদিন সূর্য্য উঠিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কয়েকটী শ্রামিক পিপীলিকা বিবরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী পিপীলিকার কার্য্য কলাপই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি এবং উহাকে আমরা উহার জাতীয় নাম অনুসারে ফরমিকা (formica) বলিয়াই অভিহিত করিব। আজ ফরমিকা বড় ব্যস্ত। রোজই অবশ্য তাকে এইরূপ ব্যস্ত দেখা যায়। বাস-গৃহের প্রয়োজনীয় সংবর্দ্ধনের জন্য রাস্তাঘাট সুরঙ্গ ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইবে—খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে—শিশুদের তত্ত্ব লইতে হইবে, গাভী দোহাইতে হইবে।—এ ছাড়াও কত অসংখ্য কাজ যে তাহার ও তাহার শত সহস্র

সঙ্গীকে সম্পাদন করিতে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। ব্যস্ত থাকিবার কথা নহে কি ?

ফরমিকাদের গৃহেরও একটু বর্ণনা করি। উহাদের গৃহকে যদি চিড়িয়া দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—তবে আমরা দেখিতে পাইব—ভূগর্ভে উহা প্রায় একফুট গভীর এবং এদিকে ওদিকে আঁকা বাঁকা ভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া এক গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া খিলান করা ছাদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। বিস্তৃত একটী প্রকোষ্ঠে রাণীমা থাকেন। দেহরক্ষী এবং সেবাকারী শতশত পিপীলিকা রাণীর সুখসাধনে ব্যস্ত। রাণীর প্রতি তাহাদের সম্মান ও ভক্তি অতুলনীয়। রাণীর দিকে 'পাছ ফিরিয়াও' কখনও তারা দাঁড়ায় না। অন্যান্য প্রকোষ্ঠের ভিতর কোনটা ভাণ্ডার ঘর কোনটা বা শিশুদের ঘর (nursery)। এখানে শিশুদের খাওয়াইয়া শোয়াইয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করা হয়। কোন প্রকোষ্ঠে ডিম্ব কোথাও larva কোথাও বা pupa সযত্নে রক্ষিত আছে।

এদিকে সেদিকে ঘাসের পাতার উপর পিপীলিকা-গাভীগুলি চড়িতেছে। ইহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পিপীলিকা রাখালদের খুবই সতর্ক থাকিতে হয়। পিপীলিকাগৃহে নানাস্থানে—গোবরে পোকার মত কতকগুলি পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমাদের কুকুর বিড়াল যেমন এ পোকা গুলিও তেমনি পিপীলিকা-প্রতিপালিত। পিপীলিকাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য এই কুকুর বিড়াল গুলির ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

পিপীলিকার কোনও শাসনকর্ত্তা নাই কোনও পুলিশ কর্ম্মচারীও নাই; প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্র বা এরূপ কোনও তন্ত্রের শাসন প্রণালীও নাই সকলেই স্বাধীন তবুও এ রাজ্যে একটু বিশৃঙ্খলা একটু বিপদ বিসম্বাদ বা শান্তিভঙ্গ নাই। অতি পরিপাটী ভাবে লক্ষাধিক পিপীলিকা আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছে, অবস্থা বুঝিয়া নিজেরাই নিজেদের কাজ বাছিয়া লইতেছে।

ফরমিকা প্রাতে ছয়টায় শয্যাত্যাগ করিয়াছে কেহ তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া দেয় নাই। উঠিয়া পায়ের সাহায্যে সে প্রাতঃকালীন প্রসাধন কার্য্য সারিয়া লইয়া অতি যত্ন সহকারে পাগুলি টানিয়া পরিষ্কার করিয়া লইল। বিবরের প্রবেশ দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়ার পর শত শত পিপীলিকার সহিত ফরমিকাও বাহিরে আসিল। তাহাদের প্রথম কাজ বাহিরে খাদ্য সংগ্রহ।

পথে যাইতে যাইতে ফরমিকা দেখিল তাহার সহযাত্রী একটী পিপীলিকার গায়ে কতকটা কাদা লাগিয়া আছে সে অতি যত্নের সহিত সে কাদা পরিষ্কার করিয়া দিল। তারপর দুজনে দৌড়াইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইল। তাহারা সকলেই এখন বিবরের অনেকটা দূরে উন্মুক্ত আকাশ তলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ফরমিকা ঘাসের উপরে নীচে এদিক সেদিক খাদ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। নিজে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যতটুকু সময় ও সুবিধা পাওয়া যায় অন্যের খাওয়ারও ত সংস্থান করিতে হইবে।

যাহা হউক ফরমিকার কপালটা ভাল বলিতে হইবে। বেশীদূর ঘোরাফিরা করিবার পূর্ব্বেই সে দেখিতে পাইল—একটী মৃত মৌমাছি পড়িয়া রহিয়াছে! বেশ লোভনীয় খাদ্যটী! তখনও মৌমাছিটীর উদরে মধু ভরা রহিয়াছে —মৃত্যুর পূর্ব্বে সংগৃহীত শেষ পুষ্প সুষমাটুকু তখনও ব্যয়িত হয় নাই; মিষ্ট মধু আমাদের ছেলে মেয়েদের নিকট যেমন লোভনীয় পিপীলিকাদের নিকটও সেইরূপ। ফরমিকা বেশ পেট ভরিয়া মধু পান করিল আর দেহটা তাহাদের পরিবারের অন্যান্য পিপীলিকার জন্য বহন করিয়া লইয়া চলিল। নিজের দেহের তুলনায় মৌমাছিটীর দেহ কিন্তু অনেকগুণ ভারী ছিল তথাপি ফরমিকা তাহা অনায়াসেই পিঠে করিয়া লইয়া চলিল। নিজের দেহের যতগুণ ভারী জিনিস সে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে আমরা কিন্তু আমাদের দেহের ততগুণ ভারী জিনিস তুলিতেই পারি না। অন্য কোন প্রাণীও পারে কিনা সন্দেহ। একটা কুকুরের পিঠে যদি একটা মৃত ঘোড়া চাপাইয়া দেওয়া যায় তবে কেমন হয় তার অবস্থাটা! কিন্তু পিপীলিকার আশ্চর্য্য ভারবহনশক্তি! তাহারা নিজ দেহের তিন শতগুণ ভারী জিনিস একপায় তুলিয়া ধরিতে পারে।

এতক্ষণ একটু বেলা হইয়াছে; বিবর হইতে বাহির হইবার জন্য সমস্ত গর্ত্তের মুখই খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য পিপীলিকা ব্যস্তভাবে বাহিরে কাজে লাগিয়া গিয়াছে! কেহ গৃহ নির্ম্মাণ জন্য তৃণখণ্ড ও ছিন্ন পত্রাদি একত্র করিয়া রাখিতেছে। কেহ ঘাসের গোড়া কাটিয়া কাটিয়া—গৃহের বড়গা ইত্যাদির সংস্থান করিতেছে, আবার কেহ বা নানাপ্রকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

ফরমিকা সংগৃহীত খাদ্য ভাণ্ডারে রাখিয়াই রাণীর প্রকোষ্ঠে গমন করিল। সেখানে অসংখ্য শ্রামিক পিপীলিকা রাণীর সদ্যপ্রসূত সহস্র সহস্র ডিম্বের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। প্রসূতির ডিম্বগুলির কোনও সংবাদ নিতে হয় না। সে গুলি পর মুহূর্ত্ত হইতে শ্রামিক পিপীলিকাদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রামিক পিপীলিকারা রাণীর প্রকোষ্ঠ হইতে এক একটি করিয়া ডিম্ব বহন করিয়া অন্য প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। এই কাজে প্রায় দুইঘণ্টা ব্যাপৃত থাকিয়া সকলেই শিশুগৃহে (nursery) চলিয়া গেল। সেখান হইতে (larva) টোপগুলিকে পিপীলিকা বিবরের উচ্চাংশে বিমল সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ সেস্থানে রাখিয়াই তাহাদিগকে পুনবার শয়ন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া যত্নের সহিত তাহাদের গা চাটিয়া চাটিয়া প্রসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাহাদিগকে "ঘুমপাড়াইবার" পূর্ব্বে প্রত্যেককে যত্নের সহিত 'খাওয়ান' হইল।

ইহার পর 'পিউপা'দের প্রতি মনোযোগ। ইহাদিগকেও সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত করা হইল। সেখানে 'খোলস' ভাঙ্গিয়া কত pupaই না নূতন পিপীলিকা জীবন প্রাপ্ত হইল। এইগুলিকে শ্রামিক পিপীলিকারা যত্নের সহিত চাটিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্যে কোনটী নিজ 'খোলস' ভাঙ্গিয়া বাহির

হইবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিলেই অতি সতর্কতার সহিত সেই 'খোলসের' কোমল পর্দ্দা ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দেয়। এবং পিউপাদের গুটান' হাত পাগুলি টানিয়া সোজা করিয়া দেয়। নবজাত পিপীলিকাদের মধ্যে যেগুলি 'রাজ কুমারী' হইয়া জন্মগ্রহণ করে সে গুলি তখনই বিশেষ বিশেষ প্রকোষ্ঠে নীত হয়। বিবাহ বয়সের পূর্ব্বে কোনও 'যুবরাজ' পিপীলিকার সহিতই ইহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না। প্রতিদিন যে অসংখ্য পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে তাহাদের প্রায় সমস্তই শ্রামিক। 'রাজকুমার' বা 'রাজকুমারী' পিপীলিকা অতি অল্পই জন্মায়।

এখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ফরমিকা এতক্ষণ পরে একটু অবসর পাইয়া শ্রান্তি অপনোদনার্থ বিবরের প্রান্তদেশে ছুটিয়া চলিল। সেখানে শত শত পিপীলিকাগাভী বৃক্ষের উপর 'চলিয়া বেড়াইতেছিল।' বৃক্ষের পাতা হইতে ইহারা রস চুষিয়া খাইতেছিল। ইহাই পিপীলিকা-গাভীর খাদ্য। ফরমিকা বৃক্ষারোহণ করিয়া একটী গাভীর পশ্চাৎ দেশে হুল দ্বারা ধীরে ধীরে আঘাত করায় উহাদের দেহ হইতে এক প্রকার মিষ্ট রস নির্গত হইতে লাগিল। ইহাই পিপীলিকা গাভীর দুগ্ধ। তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ত্তি করিয়া ফরমিকা তাহা চুষিয়া খাইল। শত শত পিপীলিকা তাহাদের পালিত শত শত গাভী এইরূপ ভাবে দোহন করিয়া লইতেছিল।

অনেক পিপীলিকা আবার প্রচুর অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ নিজ নিজ উদরে ভরিয়া লইতেছিল। অনবসর প্রাপ্ত অথচ দুগ্ধপানাকাঙ্ক্ষী অন্য পিপীলিকার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই সঞ্চিত অতিরিক্ত দুগ্ধ ইহারা তাহাদিগকে খাইতে দিবে; আশ্চর্য্য ইহাদের সময়ের মূল্য জ্ঞান।

দুগ্ধ পান করিয়া কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এমন সময় ফরমিকা দেখিতে পাইল বৃক্ষোপরি একটী পিপীলিকা-গাভী এমন স্থানে অবস্থান করিতেছে যেখানে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার খুব সম্ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নীচ হইতে মুখ ভরিয়া কতকগুলি মাটী লইয়া বৃক্ষারোহণ করিল। কিছুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া নানা উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া গাভীটীর উপর একটী ক্ষুদ্র 'চালঘর' তুলিয়া দিল।

শ্রামিক পিপীলিকারা তখন দুগ্ধপান সমাপনান্তে গৃহে ফিরিতেছিল। পথে তাহাদের সহিত একদল বিবাহ যাত্রীর দেখা হইল অসংখ্য রাজকুমার ও রাজকুমারী উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। এইরূপ অবস্থায় উহাদের বিবাহ হইবে এবং রাজকুমারীগণ রাণী হইয়া নূতন সংসার পাতিবে। আর তাদের স্বামীরা পাখা হারাইয়া চলৎশক্তি হীন অবস্থায় পথে পড়িয়া মরিবে।

ফরমিকা এ বিবাহ উৎসব দেখিবার জন্য সময় নষ্ট করিল না—উৎসব দেখিবার জন্য সে একটু দাঁড়াইল না। রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়া তাহার একটুও আপশোষ হইল না কিম্বা রাণীর স্বামীদের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিবারও একটু অবসর পাইল না।

এতক্ষণ সে তাহার সহস্র ভগিনীর সহিত

বিবরে একটি নূতন ভাণ্ডার-গৃহ নির্ম্মাণে লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত ইতিমধ্যে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

একটা দুরন্ত ভেড়া রাখালের তাড়া খাইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে ঠিক ফরমিকাদের বিবরের উপর দিয়াই চলিয়া গেল। কয়েকটি শিশুগৃহ উহার পায়ের চাপে একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। শত শত শিশু, ডিম্ব ইত্যাদি আহত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বিপদ একা আসে না। সেই সময় আবার কোথা হইতে একটা পাখী আসিয়া পিপীলিকা-শিশু ও ডিম্বগুলির উপর বেশ 'ফলার' জমাইয়া তুলিল।

মাত্র দুই এক শত পিপীলিকা সে গৃহে তখন পিপীলিকাশিশুদের তত্ত্বাববধান করিতেছিল। তাহারা এই আকস্মিক বিপদে ধৈর্য্য হারাইল না বা চীৎকার করিয়া সমস্ত বিবরের শান্তিভঙ্গ করিল না—তাহারা একএকটি শিশুকে পৃষ্ঠে লইয়া অতি সত্বর আশ্রয় সন্ধানে ছুটিয়া চলিল। অনেকে তখনই পাখীর উদরে স্থান লাভ করিল—কিন্তু ইহা দেখিয়া অন্যান্য পিপীলিকারা কার্য্যবিরত হইল না। যে কয়েকটি পিপীলিকা নিরাপদ স্থানে পৌছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ বিপদের বার্ত্তা সকলকে জানাইয়া পুনরায় দুর্ঘটনার স্থলে ফিরিয়া আসিল।

এতক্ষণ সারাগৃহে মস্ত একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা উত্তেজিত ভাবে সেস্থানে দৌড়িয়া আসিল। এবং শিশুদের রক্ষার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। ততক্ষণ একটী পাখীর স্থানে অনেকগুলি পাখী আসিয়া জুটিয়াছিল। তাই লক্ষ লক্ষ শিশু ও ডিম্বের ভিতর মাত্র কয়েক শত রক্ষা পাইল, সহস্র সহস্র পিপীলিকা এই কয়টী শিশুর রক্ষা কল্পে জীবন বলিদান করিল!

কিন্তু দুঃখ করিবার, শোক করিবার কাহারও অবসর নাই। তাহারা কার্য্য করিতে আসিয়াছে—কার্য্য করিয়াই মরিবে অন্য কোনও চিন্তা তাহাদের নাই—একমাত্র চিন্তা—কার্য্য ও শ্রম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। লার্ভা এবং পিউপা-গুলিকে উপরের শীতল প্রকোষ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সকলে সেই কার্য্যেই মনোনিবেশ করিল।

এতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার—চারিদিকে কালোপর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এইবার পিপীলিকাদের বিশ্রামের সময় হইয়াছে। কাষ্ঠখণ্ড ও বৃক্ষপত্রের সাহায্যে বিবরের সমস্ত দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ফরমিকা ও তাহার সহচরীরা বিশ্রামের জোগাড় করিতে চলিল।"

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

দুর্দ্দৈব

আরো আলো, আরো প্রেম, এই অনিবার
একান্ত কামনা শুধু প্রাণের আমার,
তবু দেখা দেয় মেঘ ঘেরিয়া আকাশ,
লুপ্ত করি চন্দ্রতারা, তপন-প্রকাশ!
তবু নামে বৃষ্টিধারা দুরন্ত দুর্ব্বার
রুদ্ধ শ্বাসে মগ্ন করি পুষ্প সুকুমার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা দেশের কোনো অখ্যাত গ্রাম থেকে কোনো নিরক্ষর লোক কল্‌কাতায় পৌঁছলে তার কাছে এখানকার ট্র্যাম্ বৈদ্যুতিক আলো, রাস্তাঘাট, গাড়ীঘোড়া, সুবৃহৎ অট্টালিকা সমস্তই অতীব আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। তার কাছে এ সমস্তই এক কল্পনাতীত রাজ্য,—সে স্বপ্নেও এত বড় বিরাট ব্যাপারের সম্ভাবনা মনে করতে পারে নাই। নিউইয়র্ক বন্দরে পৌঁছে Custom house কর্ত্তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রাজপথে এসে বিদেশীকে উক্ত গ্রামবাসীর মতনই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে উচ্ছ্বসিত জনতার স্রোত লক্ষ্য করতে হয়।

সহরের যে দিকেই চলি, রাজপথের দু ধার দিয়ে সারি সারি দোকান—তার সাজসরঞ্জাম বা চাকচিক্য দেখে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। রেল ষ্টেশনে যাই, শুনি এত বড় বৃহৎ ষ্টেশন পৃথিবীতে আর একটি নাই; সিকাগো থেকে গাড়ী এল, শুনি বিংশশতাব্দীর লিমিটেট এই ট্রেন হচ্ছে সব চেয়ে দ্রুত রেল গাড়ী; বৈদ্যুতিক কারখানা দেখি—সেখানে খবর পাই, এত বড় বিপুল কারখানা পৃথিবীতে আর নাই! এমনি করেই লক্ষ্মী তাঁর ভক্ত সেবকগণের প্রাঙ্গণে আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে রেখেছেন।

সহরের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যের বিস্তার এক বিরাট সাধনের ফল। সমস্ত উন্নতির পশ্চাতে এক মহান্ সাধন ক্ষেত্র বিদ্যমান—এবং এ ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্ত্তেই মহাশক্তি কাজ করচে। এখানে দেশের সহস্র সহস্র যুবক বুকভরা আশা ও স্বদেশপ্রেম নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হচ্চে; এবং এখান থেকেই সমস্ত দেশে নবজীবনের সঞ্চার হতে থাকে।

স্বদেশের অন্তর্প্রকৃতি পরিপূর্ণতা লাভের জন্য যখন যা দাবী করেছে, যখন যার অভাব ঘটেছে, সে সমস্ত সমস্যা য়ুনিভার্সিটি থেকে মীমাংসা করবার চেষ্টা হয়েছে। য়ুনিভার্সিটি হচ্চে দেশের হৃদ্‌পিণ্ড—এখান থেকেই রক্ত দেশের সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—University town নামে তাকে অভিহিত করা হয়। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও বাগানের মাঝে মাঝে এক একটি সুরম্য বিশ্ববিদ্যালয় অট্টালিকা স্থাপিত। বাগানের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা চলেছে; নানাপ্রকার লতাগুল্ম বৃক্ষে বাগানটি শোভিত—অসংখ্যক কাঠবিড়ালী নিঃসঙ্কোচে বাগানে বিচরণ করচে। চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের নিবিড় আনন্দ প্রকাশ পাচ্চে যে এই রমণীয় স্থানটি সরস্বতী বন্দনারই উপযুক্ত। এই রমণীয় স্থানে শিল্পমন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত।

য়ুনিভার্সিটি-প্রাঙ্গণের চারিধারে ক্লাব, হোটেল, ছাত্রাবাস; খাবার দোকান, ও গির্জ্জা। দূরে কৃষিবিদ্যালয় ও ইহার অন্তর্গত সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্র; কোথাও দুগ্ধবতী গাভীগুলি বিচরণ করচে, কোথাও ছাত্রগণ অধ্যাপকগণের

সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করচে, কোথাও শিক্ষকপরিবৃত হয়ে যুবকগণ ব্যাধিগ্রস্ত পশুর চিকিৎসায় নিযুক্ত রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণ সকলেই যেন কি একটা মন্ত্র শুনতে পেয়েছে—নিশ্চল হয়ে বসে থাকা কারও পক্ষে অসাধ্য।

আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তুম তার মন্ত্রটি হচ্চে "Learning and Labor;" এ মন্ত্রটি কেবল মাত্র একটি সখের জিনিষ নয়; শিক্ষার্থীদের চিত্তে এটি ছাপিয়ে দেয়, কেবলমাত্র ডিপ্লোমা-পত্রেই এটি মুদ্রিত থাকে না।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে বড় বাড়ী হচ্চে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার মন্দিরটি; এর আশে পাশে ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, আইন, রসায়নাগার, পাঠাগার প্রভৃতি বহুসংখ্যক বিভাগীয় বিদ্যালয় স্থাপিত। প্রত্যেক বিভাগের এক একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ আছে; ইহার অধীনে শিক্ষকগণ ও সহকারী শিক্ষকগণ। প্রত্যেক অধ্যাপক ও শিক্ষকের এক একটি স্বতন্ত্র ঘর আছে; এবং যারা বিজ্ঞান কিংবা ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের অন্তর্গত তাদের সকলেরই এক এক বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত পরীক্ষাগার আছে। কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ছেলে ক'টি পড়িয়েই এদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না, এরা নিজেরাও ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করচে—এবং যখন অবসর পাচ্চে, কোনো একটি তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নিশিদিন এক আশ্চর্য্য সাধনায় নিযুক্ত থাকচে। রসায়নাগার কিংবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাগারে গভীর রাত্রিতেও গুটি কয়েক ছাত্র সঙ্গে করে অধ্যাপক কাজ করেন; পাশের একটি ছোট্ট ঘরে তাঁর জন্যে একটি বিছানা রয়েছে—নিতান্ত ক্লান্ত বোধ করলে সেখানে তিনি শয়ন করতে পারেন। যেখানে ছাত্রগণ এমনি সাধনা ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত দেখ্‌চে, সেখানে ছাত্রগণের চিত্তও যে জ্ঞানলাভের জন্য পিপাসিত হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? একবার তুলনা করুন্ আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে। আমাদের দেশে যে দু একটি অধ্যাপক বিজ্ঞানের মন্দিরে শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসন অধিকার করতে পেরেছেন, তাঁদের সহিত তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধ কতটুক? আশা করি আমাদের দেশে শিক্ষোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ আবার সহজ ও সরল হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন দেখেছি আমাদের কাছে তা কল্পনাতীত। মনে আছে যখন ছেলেবেলায় এদেশে রসায়ন শাস্ত্র পড়তুম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রকৃতি গ্যাসের স্বরূপ ও গুণ মুখস্থ করতে প্রাণান্ত হ'ত। সল্‌ফার ও হাইড্রোজেন মিল্‌লে Sulphurated Hydrogen হয় এবং তার গন্ধ পচা ডিমের ন্যায় এ কল্পনা করে আয়ত্ত করা ভিন্ন উপায় ছিল না। অবশ্য, এখন আমাদের কালেজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। আমাদের দেশের ধনীগণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুব্যবস্থার অভাব অনুভব করে অভাব মোচনের জন্য সচেষ্ট হচ্চেন। স্যর তারকনাথ ও ডাক্তার ঘোষের দান দেশে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তারের পথ খুলে দিয়েছে তা শিক্ষিত মাত্রেই স্বীকার করবেন। যাহোক আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র কিংবা পদার্থ

বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় হাতে কলমে না শিখিয়ে কেবল মুখস্থ করিয়ে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে ভারগ্রস্ত করে তোলা হয় না। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে ছোটখাট এক একটি বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জাম দিয়ে তাকে খাটিয়ে নেওয়া হয়; সে নিজ হাতে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে আরম্ভ করে।

বিজ্ঞানের এক একটি বিভাগের জন্য যেমন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, তেমনি এক একটি লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীর ঘর সর্ব্বদা ছেলেদের জন্য উন্মুক্ত; কাজ করতে করতে কোথায় একটা খট্‌কা বাধল, ছুটে এসে card index দেখে তার জ্ঞাতব্য বিষয়টী জেনে গেল। লাইব্রেরীর বিধিব্যবস্থা সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! সমস্ত লাইব্রেরীকে এমন করে সাজান হয়েছে যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অতি অল্প সময় মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

এতক্ষণ বিজ্ঞানশিক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা গেল। এবারে শুনুন কৃষি বিভাগে কি বিরাট আয়োজন। সাধে কি যুক্তরাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! কৃষিজীবির পুত্রকন্যাকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাজ-সরঞ্জামে অর্থব্যয় করতে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ত্রুটি করেন নি। প্রায় হাজার বিঘা জমী নিয়ে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত, গোপালন অশ্ব, শূকর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণের উন্নতি বিধানের জন্য বৈজ্ঞানিক আয়োজন, দুধ হইতে মাখন, পণির প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি কৃষিঅন্তর্গত যাবতীয় বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে; এখানে ছাত্রগণ অধ্যাপকের সহযোগে কৃষিবিষয়ক নব নব তথ্যাবিষ্কারের জন্য এক মহা সাধনায় নিযুক্ত। যে সকল কৃষিসমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন, এখানে সে সকল বিষয়েই চর্চ্চা হয়,—এবং গবেষণার ফল দেশের প্রত্যেক কৃষিজীবির ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার জন্য পুস্তিকা প্রণয়ণ, বক্তৃতা, ও আলোকচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে উভয়েরই পড়বার ব্যবস্থা আছে। যাতে মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করতে পারেন, যাতে মেয়েরা স্বামীকে তার কাজেও অল্পবিস্তর পরিমাণে সহায়তা করতে পারেন, যাতে মেয়েরা আবশ্যক হ'লে নিজেরা আপনার জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা পাওয়াটা তাঁরা একটা 'ফ্যাসান' বলে মনে করেন না। যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে মেয়েরা গৃহের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে পালন করতে পারেন, সে দিকেই এদের দৃষ্টি। একটু ইংরেজি শিখে দুটো ইংরেজি নভেল পড়ে, একটু পিয়ানো টুং টাং করে, সৌখিন রকমের সেলাই শিখে যাঁরা মনে করেন 'স্ত্রীশিক্ষার' উচ্চাদর্শ লাভ হচ্চে, তাঁদের এ সংস্কার ভাঙ্গবার জন্যে এক একবার ইচ্ছা করে আমেরিকা ও য়ুরোপের কোনো কোনো নারী-বিদ্যালয়ের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত তাঁদের পরিচয় করিয়ে দি। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করেছিলেন; আজ যদি স্ত্রীশিক্ষাবিধানে সংস্কার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে,

তাহলে আবার নূতন উদ্যমে তাঁদের কাজ করতে হবে।

মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় মোটামুটি যে বিধিব্যবস্থা করেছেন সংক্ষেপে তা বিবৃত করলুম। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত চেষ্টায় মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছেন, এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান কৃষি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য এক একটি সমিতি (club) গঠিত হয়েছে। আবার সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের মধ্যে—যাঁরা ধরুন Emerson কিংবা whitman পড়বার জন্য উৎসুক, তারা একত্রিত হ'য়ে এক একটি শাখা সমিতি গঠন করে। এ সকল সমিতিতে কেবলই যে গম্ভীর ভাবে এক একটী বিষয়ের আলোচনা হয় তা নয়; নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ, হাসিতামাসা ও কখনকখনও চড়ুইভাতেরও (Picnic) আয়োজন করা হয়। এর ফলে ছাত্র মহলে বেশ একটা সদ্ভাব স্থাপিত হ'তে থাকে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি গুলিকে কখনকখনও আহ্বান করে ভাববিনিময়, আলোচনা, তর্কবিতর্ক, ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হয়। এমনি করে সমগ্র যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীগণের মধ্যে একটা জমাট ভাব ফুটে উঠ্‌তে থাকে। তাঁরা অনুভব করেন "এক দেশ, এক প্রাণ, এক ভগবান্।" হায় ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীগণ যদি এম্‌নি করে মিল্‌তে পারত!

যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের তরুণ যুবকগণকে মানুষ করে তুল্‌বার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সে যে তাদের শারীরিক উৎকর্ষ বিধানের নিমিত্ত কোনো একটা আয়োজন না করে ক্ষান্ত থাকবে তা হ'তেই পারে না। এজন্যে প্রত্যেক যুবককে দুই বৎসর কাল রীতিমত সপ্তাহে দুইবার করে শারীরিক ব্যায়ামের ক্লাশে উপস্থিত হ'তে হয়। ব্যায়ামের জন্য বিশেষ এক বস্ত্র প'রে একজন অধ্যাপকের অধীনে ও ইঙ্গিতে ব্যায়াম শিক্ষা করতে হয়। এ ছাড়া সপ্তাহে দু'বার করে ড্রিল করবার নিয়ম আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে যুবকগণকে যে ধরণের ড্রিল শেখাবার আদেশ আছে তা থেকে এ ড্রিলের আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হলে শিক্ষক থেকে হাজার হাজার যুবক যদি বন্দুক হাতে নিয়ে সমরক্ষেত্রে ছুটে যেতে না পারে, তা হলে এ ড্রিলের কোন সার্থকতা হয় না। যে সকল বিদ্যালয় গর্ভমেণ্টের সাহায্য পায়, তাহাদের প্রত্যেককে একটি সৈন্যবিভাগ রাখতে হয় ও প্রত্যেক ছাত্রকে সৈনিকের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে বন্দুক হাতে করে ড্রিল করতে হয়।

ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কেই করতে হয়। শুধু ব্যবস্থা নয়, যার কর্ত্তৃত্বে এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, যিনি খেলার কৌশল শিক্ষা দেন তাঁর বেতন বিদ্যালয়ের প্রায় প্রধান অধ্যক্ষের সমান। খেলার সম্বন্ধে যুবকদের কি উন্মত্ততা! যখন আমাদের দেশের নির্জ্জীব, হীনবীর্য্য ও নিষ্পেষিত যুবকদের দেখি, তখন আমেরিকার যুবকদের কথা মনে হয়। সেখানেই যথার্থভাবে

যৌবন তার হাস্যপুলকিতমুখে বিরাজ করচে, সেখানে যৌবনের সংস্পর্শে সমস্ত জাতীয় জীর্ণতা লোপ প্রাপ্ত হচ্ছে। আর আমাদের দেশে জীবন ফুটতে না ফুটতেই শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। এখানকার বসন্ত আর ফুলকে জাগিয়ে তোলে না—ভরা যৌবনের সঙ্গীত নীলাকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে দেশে নব-জীবনের বার্ত্তা প্রচার করেনা! কতবার পাখী ডেকে গেল, আমাদের সচেতন করবার জন্য কতবার ঊষা প্রদীপ জেলে সমগ্র বিশ্বকে জাগিয়ে তুল্‌লে—কিন্তু কই আমরা ত জাগলুম না। যদি জাগতুম তবে দেশের যুবকগণের মধ্যে যৌবনের প্রকাশ দেখতে পেতুম; যে সকল অকল্যাণকর সংস্কার এখনও আমাদের সমাজকে বদ্ধ করে রেখেছে, তা মুহূর্ত্তে লোপ পেত।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক বল্‌বার আছে। এত বড় বিপুল আয়োজনের বর্ণনা অল্পকাল মধ্যে সম্ভব নয়; এর অন্তর্গত বহু বিভাগ রয়েছে—তার প্রত্যেকটি নিয়ে এক একটি অবলম্বন করে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। আমি এতক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভাব মাত্র সামান্যভাবে আলোচনা করেছি।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের ঋষিগণ আশ্রম রচনা করে শিক্ষার্থীর শরীর মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের যেমন আয়োজন করেছিলেন আধুনিক যুগে আমেরিকা ও য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের আকৃতি দেখে তারই যেন একটা নতুন ছবি মনে পড়ে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনার জন্যে কি অপূর্ব্ব ক্ষেত্রই না এঁরা রচনা করেচেন! এখানে কর্ম্ম সৃষ্টির আনন্দে যুবা বৃদ্ধ একেবারে নিমগ্ন। জ্ঞানের শিখরে উঠে এঁরা জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করে দেখতে পাচ্চেন! তাই কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে এঁরা মান্‌তেই চান্‌ না। এঁদের শিক্ষা এদের ভিক্ষুক করে না; এঁদের সবল, সক্ষম আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। এরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার হয় জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে। জ্ঞানার্জ্জনের পিপাসা জাগিয়ে দেওয়া কর্ম্মের নেশা ধরিয়ে দেওয়াই ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য। তারপর পিপাসা মেটাবার জন্যে, কর্ম্মের নেশার তাগিদে তাকে ছুট্‌তেই হয়! যতই সে খাটে শক্তি তার ততই বৃদ্ধি পায়। এম্‌নি করেই সে সার্থকতার পথে যাত্রা করতে থাকে।

এই যে প্রভেদ আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর—এর কারণ কি? কেন সেখানকার বিদ্যালয়ে মানুষ তৈরী হচ্চে, আর আমাদের শিক্ষাযন্ত্রে আরো যেন আমাদের চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়চে, এমন কি বুদ্ধিটাও নিষ্প্রভ হয়ে উঠছে এ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। এ দুর্দ্দশার কারণ যে আমাদের সমাজ—কে আছেন একথা অস্বীকার করবেন? আমাদের দেশের কোন্‌ বিদ্যার্ণব তর্কচূড়ামণি সভায় দাঁড়িয়ে একথা বলতে সাহসী হবেন যে, আমাদের সমাজ মানুষকে অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাবার পথকে নানা জালজঞ্জালে রুদ্ধ করে দেয়নি? একবার বিচার করুন্‌ আমাদের সমাজ আমাদের

কাছে কি দাবী করচে! সে কি একথা বল্‌চে, ওগো তরুণ যুবকসম্প্রদায় দেখ, যুগের জরত্বের বোঝা ক্রমশই আমার দেহকে শীর্ণ করে তুল্‌চে; যাদের হাতে আমার জীবন সমর্পণ করা হয়েছিল, তারা আমাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে; যেখানকার যতকিছু আবর্জ্জনা তা কুড়িয়ে এনে এ কারাগারের দরজায় স্থাপন করে রেখেছে; আমাকে এ কারাগার থেকে মুক্ত করে এই নবযুগের প্রভাতে একবার মুক্তাকাশতলে দাঁড়াতে দেও।

কই আমাদের প্রাণ থেকে ত এমন বাণী এখনও শোনা যাচ্চে না। যখনই কারাগারের প্রাচীর ভেদ করে সমাজের ক্রন্দন ধ্বনি বাইরে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে, তখনই দ্বাররক্ষকগণ কাল ঘণ্টার কলরবে সব ঢেকে দিতে চেষ্টা করেচে! থামিয়ে দিন্‌ কাল ঘণ্টার অবিশ্রাম কলরব। যে সমাজে মানুষ নেই যে সমাজে প্রাণ নেই, তার আবার কিসের পূজা! যে সমাজ মানুষ দেখলেই বলে, "ওগো তুমি কোন্‌ বংশে জন্মেছ? তোমার গোত্র কি? তুমি এটা পূজা কর কিনা ওটা মান কিনা, অমুকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাও কিনা? যে সমাজ তুমি কার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিলে, কত বয়সে মেয়ে বিয়ে দিলে, সমুদ্রের উপরে ছেলে পাঠিয়ে আবার প্রায়শ্চিত্ত করালে কিনা, এই কৈফিয়তই চাচ্চে, সে সঙ্কীর্ণ সমাজপ্রাচীরের সীমায় বদ্ধ থেকে মানুষ জন্মাবে এত বড় দুরাশা কে করবে? যে গাছের গোড়ায় কীটেরা দুর্গ নির্ম্মাণ করেছে—সে গাছে জল দিলে কি হবে? এই জন্যই ত শিক্ষা আমাদের জীবনকে বড় করে তুলছেনা, আমাদের আশার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আস্‌ছে শক্তির মূল আশারসে সিক্ত না হয়ে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্চে। ভূ-শিকড় নষ্ট হয়েছে বলে না পারছি দেশের মাটি থেকে রস কর্ষণ করতে না পারছি বাহির থেকে কিছু সংগ্রহ করতে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলে আমরা দুঃখ করে থাকি,—আমার বিশ্বাস যোগ্যতার অভাব বশতঃই আমরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সুতরাং সেজন্য অনুশোচনা না করে আমাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের মত কাজ,—এবং সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। বিচার করে দেখতে গেলে শারীরিক দাসত্ব অপেক্ষা মানসিক দাসত্ব আরো ভয়ঙ্কর। যতদিন আমাদের মনুষ্যত্ব না জন্মে ততদিন সর্ব্বপ্রকার অধীনতা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র। কোনো জাতিই শক্তির ক্ষেত্র একেবারে নিষ্কণ্টক পায়নি। ক'রে কর্ম্মে ভেঙ্গে গড়ে নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে সবাইকেই পথ চল্‌তে হয়েছে। সার্কাসের ঘোড়া যেমন যত ধাক্কা পায় ততই তার উৎসাহ ও বেগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি যে জাতি শক্তিকে সীমাবদ্ধ দেখে পেছিয়ে যায়নি বরং দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে নির্ভয়ে ছুটেছে "সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা", সে জাতিই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের যদি এ জড়ত্ব থেকে একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয় তবে যেটুকু সুযোগ সুবিধা সহায় আছে তারই সামনে পথ কেটে চল্‌তে হবে।

পথ চল্‌তেই শক্তি আপনি আসবে—প্রাণ সঞ্চারিত হবে। যখন একটু শক্তি জাগ্‌বে, তখন সমাজ আর এমনি করে মানুষকে নির্জ্জীব হয়ে থাকতে দেবে না। প্রভাতের আলো যেমন আপনিই সমস্ত বিশ্বচরাচরকে সুপ্তি থেকে জাগায় তেমনি আমাদের এ বিপুল সমাজপ্রাঙ্গণে একবার বিশ্বালোকের আলো এসে পড়লেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন আপনা আপনি শিথিল হয়ে পড়বে। যতদিন না সমাজের স্বাস্থ্য তার হয় যতদিন না আমাদের জীবনের সম্মুখে একটি লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততদিন শিক্ষার সার্থকতা হবে না, শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার সময় এ কথাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

জনগণমনঅধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের আগমন

(Ella Wheeler Wilcox হইতে অনূদিত)

ভেবেছিল নারী প্রেম সে আসিবে
বিজয়ী বীরের ন্যায়,
তুরী ও ভেরীর গভীর মন্দ্রে
অস্ত্র ঝঞ্ঝনায়;
তা না হ'য়ে কোথা অন্তরে আসি
পশিল চোরের মত,
আগমন তার রমণী কিছুতে
হইল না অবগত!

ভেবেছিল রাজ-কুমারের মত
বধূ বরিবার তরে,
আসিবে গো প্রেম—বর্ম্ম তাহার
ঝকিবে সূর্য্য করে;
তা না হ'য়ে তারে দিবা অবসানে
দেখিল পার্শ্বে তার,
যবে ধীরে রাজে ম্লান ও মধুর
মৃদু আলো সন্ধ্যার!

সোনার স্বপন বিরচি রমণী
ভেবেছিল প্রাণে তায়,
প্রেমের নয়ন করিবে সহসা
নব জ্যোতি সঞ্চার;
তা না হ'য়ে মুখে দেখিল তাহার
মোহন মধুর ভাতি,
জীবনে সে যারে ভেবেছে বন্ধু
চির পরিচিত সাথী।

ভেবেছিল সেগো বাত্যা-আকুল
সিন্ধু-নীরের মত,
আগমন তার, হৃদয় তাহার
আলোড়িবে অবিরত;
তা না হ'য়ে কোন সুখ স্বর্গের
শান্তি পিয়ূষ আনি
সার্থক তার করিল জীবন
ধন্য করিল প্রাণী!

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।



শ্রাবণ-ধারা

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

মহালয়া

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ)

"মহালয়া" হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্ব। আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষ "মহালয়" বলিয়া খ্যাত (১)। তিথিতত্ত্বে ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—"মহালয়ে কন্যায়াঃ পরপক্ষে।" এই পরপক্ষে হিন্দুসাধারণেরই পক্ষে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধতর্পণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া এই পক্ষকে বিশেষভাবে 'প্রেতপক্ষ' বা 'পিতৃপক্ষ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই পক্ষের অমাবস্যা বিশেষরূপে (মহালয়া) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; এবং এই অমাবস্যায় কৃত শ্রাদ্ধ বিশেষভাবে "মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ" নামে সর্ব্বত্র সুবিদিত। "মহালয়া" এইরূপে হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত হইলেও ইহার অর্থ তেমন সুগম নহে। সুতরাং ইহার অর্থের বিচারেই আমরা প্রথম প্রবৃত্ত হইব। 'মহালয়া' একটি সমাস বদ্ধ শব্দ। ইহা দুই প্রকারে গঠিত হইতে পারে। 'মহৎ' শব্দের সহিত 'আলয়' শব্দের যোগে একপ্রকারে এবং 'মহৎ' শব্দের সহিত 'লয়' শব্দের যোগে অন্য প্রকারে। এক্ষণে কোন্ প্রকারের যোগ গ্রহণ করিলে অর্থের সুসঙ্গতি হইবে তাহাই বিশেষরূপে আমাদের বিবেচ্য। প্রথম প্রকারের যোগের সমর্থনে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই না, কিন্তু শেষোক্ত যোগের সমর্থনে আমরা সবিশেষ প্রমাণই প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমরা শেষোক্ত যোগই গ্রহণ করিব। শেষোক্ত যোগ গ্রহণ করিলে অর্থ এই হয় যে "মহান্ লয় অর্থাৎ বিলয় হয় যাহাতে (২)।" কৃষ্ণপক্ষ যখন "মহালয়" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অমাবস্যাতে যখন মহালয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কৃত হইয়া থাকে, তখন "চন্দ্রের সম্পূর্ণ লয় হয় যাহাতে" পূর্ব্বোক্ত সমাসবাক্যের এইরূপ এক তাৎপর্য্য সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য বা প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ "চন্দ্রের লয় হয়" বলিয়াই যদি মহালয় নাম হইবে—তবে প্রত্যেক 'কৃষ্ণপক্ষ' ও প্রত্যেক 'অমাবস্যা'ই 'মহালয়া' নাম পাইতে পারে কেবল আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ ও অমাবস্যাই বিশেষ করিয়া এই নাম পাইতে যায় কেন? এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি "সূর্য্যের মহান্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ 'লয়' অর্থাৎ অস্ত হয় যাহাতে" ইহাই "মহালয়া" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। সূর্য্যের সম্পূর্ণ অস্ত কিরূপে হয় এক্ষণে আমরা তাহাই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এখানে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে আষাঢ় মাস হইতেই সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গতি আরম্ভ হইয়া সূর্য্য উত্তর হইতে আশ্বিনমাসে আসিয়া বিষুবরেখার উপর অবস্থিত

(১) "সৌরাশ্বিনীয় কৃষ্ণপক্ষঃ।" শব্দকল্পদ্রুম।

(২) বাচস্পত্য অভিধানেও এইরূপ ব্যুৎপত্তিই প্রদত্ত হইয়াছে যথা—"মহান্ আত্যন্তিকো লয়ো যত্র।"

হয়। তাহাতেই দিন রাত্রি সমান হইয়া থাকে।

সূর্য্য যেকাল পর্য্যন্ত বিষুবরেখার নিম্নে দক্ষিণদিকে ক্রমাগত গমন করিতে থাকে—সেকাল পর্য্যন্ত উত্তরকুরু হইতে তাহা দৃষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণে যখন সূর্য্যের উত্তরদিক হইতে গতি আরম্ভ হয় তখনই আবার তাহার দেখা পাইবার সম্ভাবনা হয়। সুতরাং এই অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল উত্তরমেরুর নিকট সূর্য্য অস্তমিতই থাকে। ইহাই সূর্য্যের "মহালয়" অর্থাৎ মহান্ত।

এক্ষণে সূর্য্যের মহান্ত বা মহালয়ের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত "মহালয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধের" কি সম্পর্ক তাহাই আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। আমরা জানি যে রাত্রিভাগে সাধারণ দৈব বা পৈত্র্যকার্য্য করিবার নিয়ম নাই। উত্তরকুরু হইতে সূর্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে কয়েক মাসের জন্য অস্তমিত হইলে তথায় সেই কয়েক মাস কেবল রাত্রিই বিরাজ করিতে থাকে। সুতরাং তৎকালে শ্রাদ্ধাদি পৈত্র্যকার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই আর্য্যগণ সূর্য্যাস্তকালের জন্য পিতৃগণের পিণ্ডোদকের সঞ্চয় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপিয়া তর্পণশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় আশ্বিন কার্ত্তিক মাস শ্রাদ্ধের কাল বলিয়া তখন যমালয় শূন্য হইয়া পড়ে যথা—

"যাবচ্চকন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
তাবৎ শ্রাদ্ধস্যকালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেত পুরং তথা।"
ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষই মহালয়া, প্রেতপক্ষ বা পিতৃপক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ গণনায় এরূপ হইলেও মলমাস স্থলে কার্ত্তিকেও মহালয়া বা পিতৃপক্ষ হইতে পারে যথা—

"নভাবাখ্য নভস্যোবা মলমাসোযদা ভবেৎ।
সপ্তমঃ পিতৃপক্ষঃস্যাদন্যত্রৈবচপঞ্চমঃ।"

এখানে সপ্তম দ্বারা আষাঢ় হইতে সপ্তম পক্ষ ও পঞ্চম দ্বারা আষাঢ় হইতে পঞ্চম পক্ষ বুঝিতে হইবে।(৩) প্রাগ্বর্ণিত কালের পর উত্তর কুরুতে যে কয়েকমাস নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে পিণ্ডোদক প্রদত্ত হইবে না বলিয়া ব্যগ্র হইয়াই পিতৃগণ যমালয় পরিত্যাগ করিয়া পিণ্ডোদক সংগ্রহার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, ইহাই আমরা "প্রেতপুর শূন্য" হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষুবরেখার উত্তরদিক্ ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ করে বলিয়া রাত্রিকালে শ্রাদ্ধান্নপানীয় প্রদত্ত হইবে না মনে করিয়াই যে পিতৃগণ আশঙ্কান্বিত হইয়া এই সময়ে বিশেষভাবে শ্রাদ্ধীয় ভোজনের জন্য লালায়িত হন তাহার আরও বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা দীপান্বিতার উল্কাদানের বিসর্জ্জন মন্ত্রে প্রাপ্ত হই যথা—

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতো যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তুতে॥"

* আষাঢ্যাঃ পঞ্চমেপক্ষে কন্যা সংস্থে দিবাকরে।
যোবৈশ্রাদ্ধং নরঃ কুর্য্যাদেকস্মিন্নপি বাসরে।
তস্যাঃ সংবৎসরং যাবৎ তৃপ্তাঃ স্যুঃ পিতরোয় ক্রবেম্॥"

"যাঁহারা যমলোক পরিত্যাগ করিয়া মহালয়ের সময় আসিয়া সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা এই উল্কার উজ্জ্বল জ্যোতি দ্বারা পথ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাউন্।"

নিমন্ত্রিত পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোজন সমাপন করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তর হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে বলিয়াই উল্কা ধরিয়া তাঁহাদের গমনমার্গ প্রদর্শন করিবার কথা লিখিত হইয়াছে। সংক্রান্তি হইতে আকাশপ্রদীপদান ও কার্ত্তিকে যমদীপদান এবং দীপান্বিতায় দীপাবলী প্রদানেরও মর্ম্ম উল্কাদানের অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়।

উপনয়ন চূড়াকরণ প্রভৃতি বৈদিক সংস্কার যে দক্ষিণায়নের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং বিবাহ যে দক্ষিণায়ন অপেক্ষা উত্তরায়ণেই প্রশস্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাও ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুতে আদিবাসের অন্যতর প্রবল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ দক্ষিণায়নে উত্তরকুরুতে রাত্রিকাল থাকিত বলিয়া এবং এই সমস্তের সহিত পিতৃকার্য্যের যোগ থাকায় তখন পৈত্র্যকার্য্য হইতে পারিত না বলিয়াই উত্তরকুরুতে দক্ষিণায়নে এই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত না থাকায় এখনও সেই পূর্ব্ব নিয়মই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতীয় আর্য্যগণ দক্ষিণায়নে মৃত্যুকামনা না করিয়া যে উত্তরায়ণে মৃত্যুকামনা করেন—তাহারও গূঢ় রহস্য আমরা পূর্ব্বোক্ত আলোচনাতেই প্রাপ্ত হইতে পারি।

ভারতীয় আর্য্যগণ যখন উত্তরকুরুতে বাস করিতেছিলেন; তখন দক্ষিণায়নের সময় তাঁহাদের রাত্রিকাল থাকিত বলিয়া সেই সময়ে কেহ মরিলে রাত্রিকাল বলিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে পারিত না। সুতরাং ইহাতে তাঁহার আত্মার সদ্গতি হইতে না পারায় আত্মাকে কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধকার্য্যের কোন বাধা না থাকায় আত্মাকে পূর্ব্বোক্তরূপে কোন কষ্ট পাইতে হইত না। ইহাতেই দক্ষিণায়নে মৃত্যু দুরদৃষ্ট এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু শুভাদৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

উত্তরায়ণের সহিত অন্ধকারের সম্বন্ধের মূল আমরা উপনিষদেই দেখিতে পাই। উপনিষদে মৃতের জন্য অর্চ্চিরাদিমার্গ ও ধূমাদিমার্গ এই দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহাদের বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় থাকে তাঁহাদেরই উত্তরায়ণে মৃত্যু হয় এবং তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে দেবলোকে গমন করেন, আর যাহাদের তেমন পুণ্যসঞ্চয় না থাকে তাহাদেরই দক্ষিণায়নে মৃত্যু হয় এবং তাহারা ধূমাদিমার্গে পিতৃলোকে গমন করে। এখানে আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"তে য এবমেতদ্বিদুর্যেচামী অরণ্যে শ্রদ্ধাসত্যমুপাসতে
হর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি॥" ৬।২।১৫

"যাঁহারা উক্ত প্রকার পঞ্চাগ্নিদর্শন বিদিত হয়েন (অর্থাৎ জ্ঞানী) সেই সকল গৃহস্থ অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হয়েন।"

"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি॥" ৬।২।১৬

"আর যাঁহারা কেবল কর্ম্মী তাঁহারা ধূমাদিমার্গ প্রাপিত হয়েন।"

"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়নাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণমাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্ পিতৃলোকাচ্চন্দ্রম্ ইত্যাদি।" ৬।২।১৬

"আর যাঁহারা কেবল কর্ম্মী তাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা, যজ্ঞস্থানে দান দ্বারা, ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা লোকসকলকে জয় করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা ও দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা দ্বারা পিতৃলোক ও পরিশেষে চন্দ্রলোক প্রাপিত হয়েন।"

"তেষ এবমেতদ্বিদুর্যেচামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্য-মুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষ অপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্‌যান্ ষণ্মাসান্নুদঙ্‌ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যোদেবলোকং দেবলোকাদাদিত্য ইত্যাদি।" ৬।২।১৫

"আর যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন তাঁহারাও ঐ অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্চ্চিরাদি মার্গের প্রথম অর্চ্চিরভি-মানিনী দেবতা, দ্বিতীয় অহরভিমানিনী দেবতা, তৃতীয় শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, চতুর্থ উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, পঞ্চম দেবলোকাভিমানিনী দেবতা, ষষ্ঠ আদিত্যাভিমানিনী দেবতা ইত্যাদি।"

গীতাতেও উপর্য্যুক্ত উপনিষদ্ মর্ম্মই এইরূপে অবিকল সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লষমন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্রপ্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥ ৮।২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্রচন্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ৮।২৫
শুক্লকৃষ্ণেগতী হেহৈতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়াযাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥" ৮।২৬

উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউশন্ সম্পাদিত গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী যে অনুবাদ প্রদান করা হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত উপনিষদ্ বাক্য সকলের তুলনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতি-পাদিত হইবে ;—

অগ্নির্জ্যোতিঃ (প্রত্যুক্তা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভি-মানিনী দেবতা) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণং (উত্তরায়ণরূপাঃ ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) [এতাসাং দেবতানাং যোমার্গঃ] তত্রপ্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্মগচ্ছন্তি]॥

ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্রাভি-মানিনী দেবতা), কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা।) [এতাভিঃ উপলক্ষিতো। [যোমার্গঃ] তত্র (প্রযাতঃ) যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য) [তত্র বহুফলং ভুক্ত্বা] নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)। ২৫।

"জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে [শুক্লা অর্চ্চিরাদি গতির প্রকাশ ময়ত্বাৎ কৃষ্ণা ধূমাদি গতিঃ তমোময়ত্বাৎ] এতে হ্যে (মার্গৌ) শাশ্বতে অনাদীমতে (সংজ্ঞিতে) [সংসারস্য অনাদিত্বাৎ] [তয়োঃ] একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিং (সোক্ষং) যাতি, তনয়া কৃষ্ণয়া পুনরাবর্ত্ততে। ২৬

অগ্নি এবং জ্যোতিঃ (তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল), অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্ল পক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণাধি ষ্ঠাত্রী দেবতা) ঐ ঐ দেবতাগণের যে মার্গ (পথ) তাহাতে (মৃত্যুর পর) গমনশীল ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে পান।" ২৪

কর্ম্মযোগিগণ, (মরণান্তে) ধূম, রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ষণ্মাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং ভোগাবসানে তথা হইতে সংসারে পুনরায় আগমন করেন। ২৫

প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি শুক্লাগতি এবং তমোময়ী ধূমাদি কৃষ্ণাগতি জগতের এই দুই মার্গই অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে, এই দুয়ের মধ্যে একটী দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অপরটী দ্বারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ২৬

উপনিষদে আমরা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ভেদে মৃত্যুর পর যে দুই প্রকারের গতির উল্লেখ পাই বেদেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।

আমরা উপরে যে অর্চ্চিরাদি মার্গের কথা বলিয়াছি, উপনিষদে তাহা 'দেবযান' নামেও

আখ্যাত হইয়াছে এবং "ধূমাদিমার্গ" 'পিতৃযান' আখ্যাত প্রাপ্ত হইয়াছে। উপনিষদে যেমন আদিত্য অর্চ্চিরাদি মার্গের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ঋগ্বেদেও আমরা আদিত্যাত্মক যমকে স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাতারূপে স্তুত হইতে দেখি যথা—

আদিত্যাভিমানিনী দেবতা ইত্যাদি।"

"পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরণু বহুভ্যঃ পথামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য॥"
১০।১৪।১

"হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে।" রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ।

যমসম্বন্ধে রমেশবাবু টীকা করিয়াছেন—"আমরা আরও বলিয়াছি যে যমের আদি অর্থ সূর্য্য বা দিবস।"

ঋগ্বেদের অন্যত্র মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়াদেব-কার্য্যের পথ ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছে যথা—

"পরং মৃত্যো অনুপরেহি পংথাং যস্তে স্ব ইতরো
দেবযানাৎ॥" ১০।১৮।১

"হে মৃত্যু! তুমি আর একপথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যপথে যাও।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

উপনিষদে যেমন কর্ম্মবিশেষের দ্বারা ধূমাদিমার্গ প্রাপ্তির কথা পাওয়া যায় বেদেও তেমন অনুষ্ঠান বিশেষের দ্বারা হীনগতি প্রাপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"সংগচ্ছস্ব পিতৃভি সংযমেনেষ্টা পূর্ত্তেন পরমেব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বাসুবর্চ্চাঃ॥"
ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮

"ইষ্টাপূর্ত্তের সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা আকাশে পিতৃলোক দিগের সহিত মিলিত হও।" পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।" রমেশবাবুর অনুবাদ (শেষাংশ)।

এখানে অস্ত যদি আমরা দক্ষিণায়নে সূর্য্যের মহাস্ত বা মহালয় অর্থে গ্রহণ করি—তবে ইহার দক্ষিণায়নে পিতৃলোক প্রাপ্তিরূপ গতি বুঝাইতে বাধা থাকে না।

এখানে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—বেদের পূর্ব্বোক্ত আভাস তাহাতে কিরূপ বৈশদ্য ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইরাছে আমরা দেখিতে পাইব।

"যেচেমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষ-মভিসম্ভবন্তি। অর্চ্চিষোঽহঃ। অহ্ন আপূর্ব্যমাণ পক্ষম্। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুঙাদিত্য মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্। সংবৎসরাদাদিত্যং আদিত্যাচ্চন্দ্র মসং। চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তৎপুরুষো অমানবঃ সএতান্ ব্রহ্মগময়তি। এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি॥"

যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করে, তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ অর্চ্চির-ধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থান হইতে কোন এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া মৃত জীবকে ব্রহ্মলোক প্রাপন করে।

"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিম্। রাত্রেরপর পক্ষম্। অপর পক্ষাৎযান্ ষড় দক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্। নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকাদাকাশম্। আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। ইতি॥"

"যাহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদিপূর্ত্ত অর্থাৎ জলাশয় মার্গাদি ও দানাদি কর্ম্ম করে, তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে উত্তরোত্তর রাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ দেবতা, এবং পরিশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।" আর্য্যমিশন্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ সম্পাদিত গীতায় উদ্ধৃত ও অনূদিত।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চন্দ্ররশ্মি*

বর্ত্তমানে অষ্ট্রীয়ায় এক মহা আবিষ্কার প্রক্রিয়ার ধূম পড়িয়াছে; কিয়ৎকাল অবধি তত্রত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে সুগভীর গবেষণা চলিতেছে। মিঃ ব্রায়ার এ সম্বন্ধে অগ্রণী। তাঁহার এক বন্ধু মেরু প্রদেশের অনেক স্থান পরিভ্রমণের পর তাঁহাকে বলেন যে চন্দ্রের কিরণ সম্বন্ধে তাঁহার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ তিনি যখন উত্তর মেরুর কেন্দ্রে গিয়া পড়িলেন তখন এক রজনীতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। প্রায় মাসাধিক কাল সেই শীতপ্রবল দেশে থাকিয়াও নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটে নাই! একদিন সন্ধ্যার ঈষৎ ম্লান ছায়ায় যখন শিকারের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তিনি কোন পর্ব্বতের বাহুদেশে দাঁড়াইলেন, তখন সুনিবিড় মেঘপুঞ্জ ভেদ করিয়া সহসা নির্ম্মুক্ত কৌমুদীধারা সমগ্র আকাশ পরিপ্লাবিত করিতেছিল! নিম্নে ভূখণ্ড নীহারাচ্ছন্ন থাকায় সেই শুভ্র রজত কিরণধারা উহাতে প্রতিহত হইল। তুষারখণ্ডের উপর অনেক-ক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহার দেহ যেন অসাড় হইয়া গেল আর সর্ব্বাঙ্গ এরূপ বেদনা পরিপ্লুত হইল যে মাথা তুলিবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না। পাঁচদিনে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। তখন তাঁহার আশ্চর্য্য ঠেকিল এই, কত প্রমোদ রজনীতে—কত যৌবনপ্রবাহের উদ্দাম স্রোতে এইরূপ চন্দ্ররশ্মি ত স্বদেহে উপভোগ করিয়াছেন কিন্তু এমন শক্তিহীনতা ত কখনই অনুভব করেন নাই! চন্দ্রের প্রতি বন্ধুর এই সুদীর্ঘ অভিযোগ মিঃ ব্রায়ারের নিকট বড়ই কৌতূহলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ এই রহস্যের সন্তোষ-জনক উত্তরদান করিতে পারিলেন না। পরে সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মিঃ ব্রায়ার এই অভিনব রহস্য উদ্ঘাটনে চারি পাঁচজন বন্ধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ বিকিরণের (radiation) মধ্যে তারতম্য নির্ণীত হয়। সূর্য্যের কিরণ অনলপ্রভ ও সঞ্চরণশীল কিন্তু চন্দ্রের কিরণ শৈত্যময় ও সঙ্কোচশীল। সূর্য্যের কিরণ ঊর্দ্ধে গমনপথ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর আপ্রান্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলে, প্রবেশপথ না পাইলেও উত্তাপ সঙ্কোচশীল স্থানেও বিকীর্ণ হয় এবং সমস্ত পদার্থে তাপ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু চন্দ্রকিরণ শুভ্রতায় নীলিমার আস্তরণ ঢাকিয়া পৃথিবীর বক্ষে শীতলতা বর্ষণ করিতে থাকে, বারিবর্ষণের ন্যায় চন্দ্ররশ্মিপাতও শতসহস্র যোজন হইতে নামিয়া যেখানে আর্দ্র স্থান পায় তাহাতে প্রহত হইতে থাকে, আর তাহার অভাবে

* প্রবন্ধান্তর্গত উপাদানের অধিকাংশই 'The literary digest' এবং The lancet' ও 'The Chemical News' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—লেখক

বরাবর আকাশপথ হইতে সঞ্চারিত হইয়া নিম্নস্থ ভূখণ্ডেই সেই আর্দ্রতার ধারা পুঞ্জীকৃত ও গাঢ় হইতে থাকে অথচ সূর্য্যকিরণবৎ চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চারিত হইবার জন্য ইহার কিছুমাত্র প্রয়াস দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যরশ্মিতে যে বস্তু-নিচয়ের সমবায় আছে উহাতে সজীবতার অংশই অধিক কিন্তু চন্দ্রকিরণে যে তরল বস্তু-ভাগ আছে উহা স্বতঃই চন্দ্ররশ্মিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে এবং সেই জলীয় অংশহেতুই চন্দ্রের রশ্মি বিকিরিত হইয়া নিম্নভূভাগে আশ্রয় লইয়া পুঞ্জীকৃত হইতে আরম্ভ হয়। এখন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এই চন্দ্ররশ্মিতে যে পরি-মাণ তরল পদার্থ আছে তাহা দ্বারা এইরূপ প্রতীত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কিরণে সজীবতার লেশমাত্রও নাই কিন্তু উদ্ভিদাদির বর্দ্ধনশীল উপকরণ রহিয়াছে।

এমন অনেক গাছ দেখা যায় কৃষ্ণপক্ষে বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যায় কিন্তু শুক্লপক্ষের আগমেই উহাদের নষ্ট কান্তি ফিরিয়া আসে। ইহা হইতে চন্দ্রের কিরণে উদ্ভিদাদির হিতকর জিনিস আছে বলিয়া সাধারণতঃ বুঝা যায়। সেইরূপ সূর্য্যের কিরণেও কোন গাছ বা দৃশ্যতঃ বিশুষ্ক গাছ যেমন কদলী প্রভৃতি সজীব দেখায়।

এখন কথা হইতেছে যে, সূর্য্যকিরণ যেমন আমরা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারি চাঁদের আলোকেও সেরূপ আপন করিয়া লইতে পারি কিনা! এই সমস্যায় পড়িয়া বৈজ্ঞানিক ব্রায়ার কিছুকাল হাবুডুবু খাইয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে একটি উত্তম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। ব্রায়ার বলেন, চন্দ্ররশ্মি জীবন-নাশক সাংঘাতিক উপায় স্বরূপ। তাঁহার এই মন্তব্যে দুই দল হইয়া পড়িয়াছে। আর একদল দল মুক্তকণ্ঠে প্রাচীন বিশ্বাস অনুসরণ করিয়া কহিতেছেন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই, বরঞ্চ চন্দ্রালোকে জীবনী শক্তির স্ফূর্ত্তিলাভ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। কিন্তু এই মতের প্রামাণ্য ভিত্তি নাই তাই তাহাদের প্রতিবাদ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। অষ্ট্রীয়ার বৈজ্ঞানিক আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে কহিতেছেন চন্দ্রের প্রাথমিক উত্তেজনাই জীব প্রকৃতির বিকৃতিসাধন করে; সেই জন্য চন্দ্রলোকদীপ্ত প্রান্তরে মাথা পাতিয়া থাকিলে উহার আকর্ষণ প্রভাব প্রথমেই সম্মোহন জন্মাইয়া দেয় তারপর মস্তিষ্ক বিকার ঘটাইতে আরম্ভ করে। ইংরাজীতে 'লুনেসি' (Lunacy) শব্দটীরও ব্যুৎপত্তি এইরূপ বিশ্বাসমূলক। ব্রায়ার বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন চন্দ্ররশ্মি যে ধ্বংসকারী তাহা উহার আলোকতরঙ্গের ভঙ্গীভেদ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কিন্তু ভঙ্গীভেদ কি তাহাই জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক অবশেষে ইহারও সরলার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন কোনও তাড়িতযন্ত্রে উত্তাপ দৃঢ়ীভূত হইয়া ইষ্টক দেওয়াল ভেদ করিয়াও অদূরবর্ত্তী সজ্জিত কামানে অগ্নি সংযুক্ত হয় এবং তন্মুহূর্ত্তেই কৃত্রিম প্রণালী অনুসৃত কামানে বহ্নিশলাকা প্রদানের ন্যায় ধূমোদ্গীরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া অগ্নি গোলা ধাবমান হয়, যেমন ভিন্ন দুই স্থানের তাড়িত যন্ত্রে সঞ্চিত সম সরঞ্জামের ফলে তারহীন টেলিগ্রাফের কার্য্য আরব্ধ

হয়; সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা চন্দ্রের দীপ্তি-মণ্ডলে জীবননাশক পদার্থ নিচয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অতি উত্তম প্রমাণ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে।

ফুল্লজ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে ছাদের উপর শয্যা আস্তৃত করিয়া চন্দ্রদেবকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, উন্মত্ততার সঞ্চার হয়। যাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অধিক তাহার মস্তিষ্ক বিকার হওয়া খুব সাধারণ ও সম্ভবপর আর যাহার মাংসপেশী সবল, শরীর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, তাহারও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা ক্ষতিজনক, ইহাতে কিন্তু সে পাগল হইয়া পড়ে না। চন্দ্র-রশ্মির প্রধান দোষ হইতেছে এই যে, ইহাতে দৃষ্টিহীনতা জন্মে। কেহ কেহ বা একেবারে অন্ধও হইয়া যায় তবে তাহা ক্বচিৎ। একজন জর্ম্মান্ জ্যোৎস্নানিশীথে এয়ারোপ্লেনে বার্লিন প্রাসাদ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন সঙ্গে তাপমানের পারদ নিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যালোচনা; কিন্তু দেড়শো গজ ঊর্দ্ধে উঠিতেই তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার রক্তের নির্গমন কতকটা অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি বাহিরের ডেকে দাঁড়াইয়াছিলেন, চন্দ্ররশ্মি তাঁহার উপরে সম্পূর্ণরূপে বিকীর্ণ হইয়া চুম্বকের ন্যায় তাঁহাকে যেন আকৃষ্ট করিতেছিল। তিনি অনুভব করিলেন যেন তাঁহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া শোণিতস্রোত হিমানী-শীতল হইয়া পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ কেবিনে ফিরিয়া গেলেন। সে যাত্রা আর নক্ষত্র-পর্য্যালোচনা হইল না, অসুস্থ শরীরে গতি ফিরাইয়া নামিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন শরীরের উত্তাপ নিয়া দেখিয়াছিলেন যে দেড়ছটাক রক্ত আন্দাজ শুখিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে চন্দ্রের কিরণে পূর্ব্বে যে প্রকার জিনিস ছিল, উহার কিছু বিলোপ হইয়াছে, তাই তাহার ভাবেরও (odor) কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আর একটা শোচনীয় ঘটনার কথা শুনা যায়।

কোনও এক ভাবুক গায়ক আপন গানে বিভোর হইয়া ছাদের উপর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে গান করিতেছিল, নিজের গানে সে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িল যে তাহার আর বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহাকে আর গান করিতে শুনা গেল না! যখন লোক গিয়া সেখানে পৌঁছিল তখন তাহার কোন সাড়া শব্দ নাই! তাহারা দেখিল গায়ক তেমনিভাবে বসিয়া রহিয়াছে হাতে তেমনই রবাব, আর মুখেও তেমনি তৃপ্তির হাসিটুকু লাগিয়াই রহিয়াছে, কিন্তু বক্ষে হাত দিয়া দেখিল উহা যেন তুষার শীতল, শরীরে রক্তের চলাচল বন্ধ মুখে যেন রক্তহীন প্রতিকৃতির চাপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। লোকটা গানে এরূপ মজগুল হইয়া পড়িয়াছিল যে রশ্মিধারা রাক্ষসী যে তাহার প্রতি শোণিতবিন্দু শোষিয়া লইতেছে তাহা কিছুমাত্র সে টের পায় নাই; তন্ময় ভাবে সে গাহিয়াই চলিয়াছিল। যখন দেহে হঠাৎ রক্তাভাব হইল, তখনই সারা দেহে সাড়া পড়িয়া গেল, হৃদয়যন্ত্র শেষ ঝঙ্কার দিয়া চির-দিনের তরেই থামিয়া গেল।

বৈজ্ঞানিক ব্রায়ার এই সমুদয় খণ্ডদৃষ্টান্ত দ্বারা চন্দ্রের নৃশংশতা সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর

হইতে পারিয়াছেন সত্য কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রমাণ সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ ব্রায়েণ্ট নামক জনৈক সুশিক্ষিত ইংরাজ লেখক 'Chemical News' নামক ম্যাগাজিনে ইহার সহিত একমত হইয়া একটি সুলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, চন্দ্ররশ্মি যে স্বাস্থ্যহানিকর মৎস্যের দ্বারা পরীক্ষায় তাহা সহজেই প্রমাণী-কৃত হয়। আমরা জানি অনেক মাছ নদীর চড়ায় লাগিয়া থাকিতে বা জ্যোৎস্না রাতে ঢেউয়ের মাথায় ভাসিয়া থাকিতে ভাল বাসে! জল শীতল তাই চন্দ্রকিরণ তথায় গাঢ় হইয়া জমিতে কিছুমাত্র বাধা পায় না। এখন সেই মৎস্যগুলি সারারাত কিরণস্নাত হইয়া কোনট বা মরিয়া যায় আর কতকগুলি বা শেষরাত্রে জেলের শীকার হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে সেই মাছ খাইবামাত্র গাত্রজ্বালা হয় বা অপর কোন উপসর্গ আসিয়া জুটে। বেশী পরিমাণ খাইলে মস্তিষ্কবিকার বা সহসা মৃত্যুও হইয়া থাকে। মৎস্যের ন্যায় চন্দ্ররশ্মিপিপাসী অন্য নরভোজ্য প্রাণীও আমাদের উদরস্থ হইলে কুফল ফলিয়া থাকে।

চন্দ্রের কিরণ যখন আকাশপথ হইতে ক্রমশঃ অধোগামী হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন উহার কোন প্রকারের অঘটন্ ঘটাই-বার ক্ষমতা থাকে না—ঐ সঞ্চরণমান্ রশ্মি শুধুই শৈত্যপরিপূর্ণ তাই উহার প্রাথমিক আক্রমণ কিছুমাত্র কুফল উৎপাদন করিতে পারে না। জ্যোৎস্নারাতে ছুটাছুটি করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা অতি অল্প কিন্তু স্থির হইয়া উহার নিম্নে মাথা পাতিলেই সর্ব্বনাশ! চন্দ্ররশ্মি জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ থাকায় উহা ঊর্দ্ধদেশ হইতে অনবরত একস্থানেই পতিত হইতে থাকে আর কোথাও ছড়াইয়া পড়ে না, বাদলধারারন্যায় শুধু স্থানবিশেষে প্রহত হইতে থাকে, উহাকেই ইংরাজীতে 'Polarization' কহে। কিন্তু সূর্য্যের সাধারণতঃ এইরূপ কোন Polarization নাই তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই দেখা যায় চন্দ্র-কিরণ দুই আকারে জীবজগতে বিকীর্ণ হইতেছে তন্মধ্যে Polarizationই স্থায়ী আর সঞ্চরণমান চন্দ্ররশ্মি ক্ষণিকের। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে,—দ্বিতীয় প্রকার রশ্মিতে যদি অনিষ্টকারী কিছু না রহিল তবে প্রথমটীতে আসিল কি করিয়া! তাহার উত্তর এই হইবে যে যাবৎ চন্দ্ররশ্মি Polarized না হয় তাবৎ উহার দ্রব্যগুণ বিকশিত হয় না, —তাই যখন উহা গাঢ় হইয়া জমিতে আরম্ভ করে তখনই উহাতে বায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়া বিষাক্তদ্রব্যের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয় এবং তখনই কৌমুদীরাশি বিষে পরিণত হইয়া পড়ে। সেইস্থানে উপবেশন করিলে যত সহজে আমাদের মোহ ও বিকারগ্রস্ততার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় জ্যোৎস্নায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলে তাহা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমশঃ উন্মুক্ত কৌমুদীধারা মস্তক প্লাবিত করিয়া সেখানেও Polarized হইবার চেষ্টা পায়—যদি সম্পূর্ণরূপে Polarized হইয়া পড়ে তাহার ফল মৃত্যু বা উৎকট-উন্মত্ততা! Pola-rized হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিষাক্ত পদার্থ মস্তিষ্কে ঢুকিতে আরম্ভ করে এবং সমগ্র ধমনী দিয়া আর্দ্রতা বহিয়া রক্তের তেজ মন্দীভূত করিয়া দেয়।

এই Polarized চন্দ্ররশ্মিতে কি কি পদার্থ রহিয়াছে বৈজ্ঞানিক ব্রায়ার তাহার নির্দ্ধারণ করিলেও এখনও এ বিষয় চাপা রাখিয়াছেন। তবে তিনি এই Polarization-এর কুফলের যে সকল চমৎকার প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহাতে ইহার ক্ষতিকারিতা ক্রমশঃ সকলে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন।

অষ্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সমাজে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ইহার প্রথম পরীক্ষা হয়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দ্বিপ্রহর সমাগত হইলে যখন চন্দ্রধারায় সমগ্র প্রান্তর পরিস্নাত হইল, তখন ব্রায়ার পূর্ব্বরক্ষিত এক খণ্ড স্পঞ্জের নিকট একটী পেয়ালায় একটুক্‌রা মাছ রাখিয়া দিলেন, আর দেওয়াল সংলগ্ন তারে ফিতায় আঁটিয়া আর এক টুক্‌রা মাছ ঝুলাইয়া দিলেন। দর্শকবৃন্দ অধীর প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেয়ালা আনিয়া দেখিলেন এই সময়ের মধ্যে সেই পেয়ালার মাছ একেবারে পচিয়া গিয়াছে। তারে ঝুলানো মৎস্যখণ্ডটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন উহা ঠিক অবিকৃত রহিয়াছে। পেয়ালার মৎস্যখণ্ডটী পচিবার কারণ বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্পঞ্জটী প্রায় ক্রমাগত আট ঘণ্টা কাল Polarized হইয়া ছিল আর তাহারই সন্নিকটে পেয়ালার মৎস্যখণ্ডটী থাকায় বিষাক্ত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়মৎস্য সঞ্চরণশীল (direct light) আলোকে থাকায় কোন প্রকারের দোষসংস্পর্শে না আসিয়া অবিকৃত রহিয়া গিয়াছিল। সেই পাত্রে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইলেন যে direct light polarized light অপেক্ষা অনেক উত্তাপশীল এবং অপেক্ষাকৃত হীন উত্তাপই যত অনর্থের কারণ। এই ঘটনার পর য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে;—যাঁহারা এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন যে এতদিন পরে আর একটা নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সদ্যঃ বিকাশে জীবজগতে গুরুতর ভ্রমের অপনোদন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিক এই খানেই নিরস্ত হন নাই। যাহাতে চন্দ্ররশ্মির বিষাক্ত সংস্পর্শটুকু পৃথিবীতে আর বিষম দুর্ঘটনার চিহ্নমাত্র আঁকিতে না পারে তাহারই জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বপ্ন শিশু

তোমারে করিয়া কোলে ঘুম ভা'ঙে মোর,
তোমারে জাগাই আমি আঁখির সোহাগে,
লইয়া বুকের পাশে স্নেহ-সুখে ভোর
কাটে রাত্রি স্বপ্ন আর সুপ্তি অনুরাগে!

এ নিদাঘে সারাদিন তুলি বারে বারে
জীবন-অমিয়া মোর তোমারে পিয়াই,
তৃপ্ত করি শান্ত করি, ওগো একেবারে
তোমারে অমর আমি করিবারে চাই!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গড়ের মাঠ

আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে যদি সামান্য কোনো একটী গ্রামেও যাই তা'হলে সে জায়গায় কোথায় কি আছে না আছে আমরা ভাল করেই তা দেখি। সেখানে কোথায় একটী ছোট নদী বালুর ভিতর দিয়ে তর তর করে বয়ে যাচ্ছে—কোথায় তার তীরে কুঁড়ে ঘরগুলি সুন্দর ছবির মত সাজান রয়েছে—কোন্ জায়গায় সুন্দর একটী নারিকেল বাগান, —কোথাও বা বড় প্রকাণ্ড একটা গাছে নানা রকম লতা জড়িয়ে উঠেছে; কখন্ ঘাটে এসে একটী কুলবধূ কলসীকাঁখে কেমন সুললিত গতিতে জল তুলে নিয়ে গেল, এ সমস্তই আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু এই কল্‌কাতা সহর এত বিশাল যে এর অভ্যন্তরে বাস করেও আমরা তার কোথায় কি দ্রষ্টব্য জিনিস রয়েছে তার কিছুই প্রায় জানি না। এমন কি আমাদের ঠিক চোখের সামনে এমন যে এক বিস্তৃত গড়ের মাঠ পড়ে আছে যার পাশ দিয়ে আমরা প্রতিদিনই আনাগোনা করি তার ভিতরে যে কত দেখ্‌বার জিনিস রয়েছে তাও আমরা ভাল ক'রে জানিনে। এই যে অক্টারলনি মনুমেণ্ট বোধ হয় কল্‌কাতার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এর উপর উঠে সমস্ত সহরের দৃশ্য দেখাটা ইজিপ্টের পিরামিডের উপর ওঠার মতই একটা কল্পনার বিষয়।

ইডেন গার্ডেন এই মহানগরীর এক অতি রমণীয় উদ্যান। বোধ হয় সকলেই কোনো না কোনো দিন এর সৌন্দর্য্য দেখে তৃপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এই উদ্যান ও ময়দানে কত যে ছবি ও মূর্ত্তি রয়েছে তার ভিতর যে কত কীর্ত্তিকাহিনী নিহিত তা অনেকেরই নিকট অবিদিত। আমরা যদি এখানে এই মূর্ত্তিগুলি উদ্ধৃত করে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করি তা'হলে বোধ হয় তা পাঠকদের নিকট নিতান্তই পুরাতন কথা বলে মনে হবে না।

রেড রোডের ধারে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি। আমাদের রাজারাণীদের মধ্যে কেবলমাত্র ইহার মূর্ত্তি গড়ের মাঠে সংস্থাপিত হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতের শাসনদণ্ড হস্তে ধারণ করেন। মূর্ত্তিটীতে ভিক্টোরিয়ার উদারতার ভাবটুকু বেশ ফুটে উঠেছে।

রেড রোড হইতে ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে উদ্যানের অতি সন্নিকটে প্রথমেই যোদ্ধৃবেশে অশ্বোপরি লর্ড হার্ডিং। ইনি একজন সুবিখ্যাত বীরপুরুষ। ডিউক অব ওয়েলেসলি ইঁহারই হাতে নেপোলিয়ানের তরবারি সমর্পণ করেছিলেন। ইঁহারই কালে প্রথম শিখ্‌যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। সে সময় ইঁহার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।—বীরের উপযুক্ত বেশেই বীরের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। ইনি কিছুকাল ভারতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ইনি আমাদের বর্ত্তমান লাট সাহেবের পিতামহ।

এই উদ্যান থেকে ডেলহেউসি স্কোয়ারে যেতে স্যার এস্‌লি ইডেনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৭৭—৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি

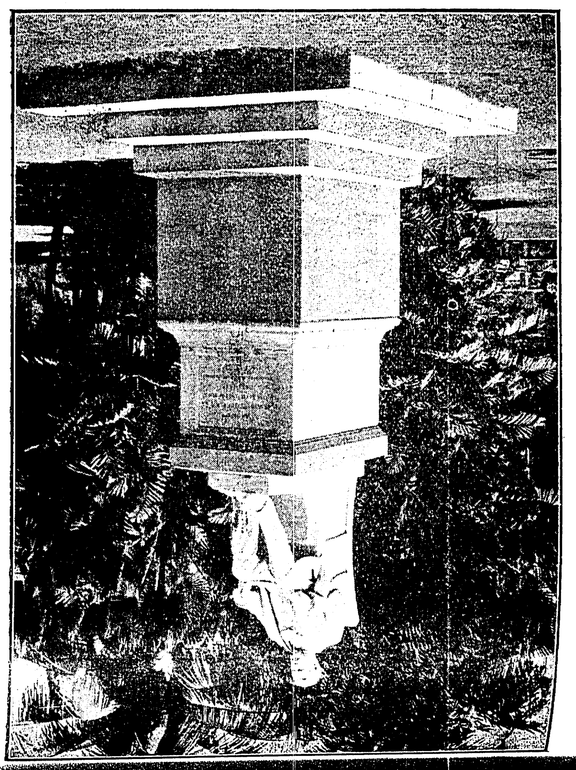

স্যর এমিলি হেডেন

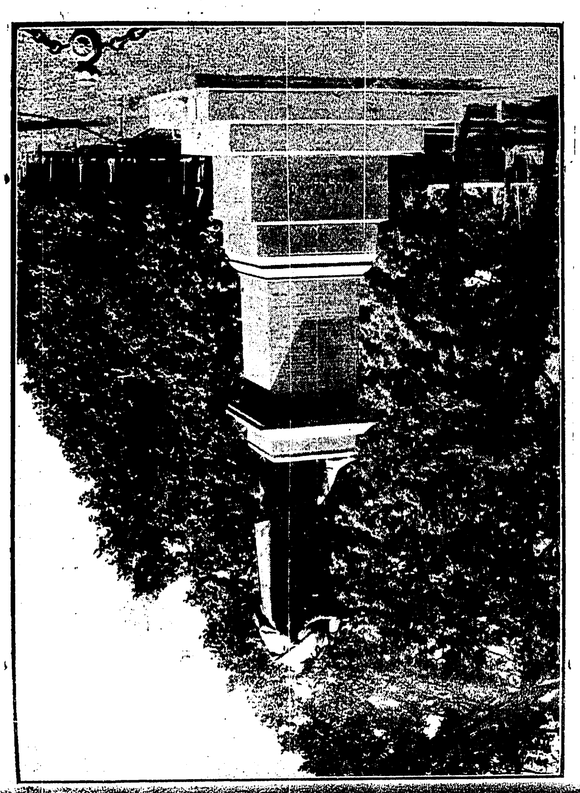

লর্ড কর্কল্যাণ্ড



সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া



লর্ড হার্ডিং

বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। ইনি এদেশবাসীর বিশেষ প্রীতি-ভাজন হয়েছিলেন —তাই সাধারণের টাকায় এঁর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। এঁর নামেই ইডেন উদ্যান স্থাপিত।

মিসেস্ ইডেন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভগিনী। এই উদ্যানের পাশেই উত্তর দিকে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইনি একজন গবর্ণর জেনারাল।

এই উদ্যানে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারে প্রতিমূর্ত্তিটী নূতন সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ই বাংলার শেষ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরেরই ঠি পূর্ব্ববর্ত্তী।

ইনি ও স্যর ইডেন মাত্র এই দুই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রতিমূর্ত্তি গড়ের মা স্থাপিত দেখা যায়। বাকী অধিকাংশই গবর্ণ জেনেরাল ও সেনাপতিদের। ইহাদের ঠি আমরা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

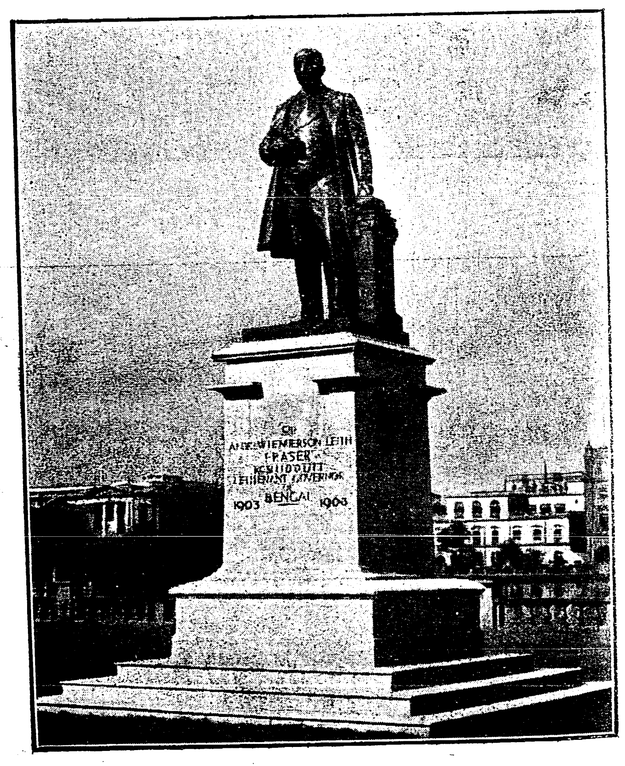

স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার

সমালোচনা

হিন্দোলা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বি এ, ৯০ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি কবিতা-পুস্তক। কবি এই কবিতা-ক্ষেত্রে নূতন, অপরিচিত। কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলিতে ভাবৈশ্বর্য্য আছে, মৌলিকতা আছে। কবিতাগুলি শুধু ছন্দে-গাঁথা কথার উচ্ছ্বাস-মাত্র নহে—তাহাতে রস আছে, প্রাণ আছে। অধিকাংশ কবিতাতে পরিণত হাতের ছাপ থাকিলেও এই নবীন কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

শক্তি। শ্রীমতী অমলা দেবী প্রণীত। ১।১ নং কলেজ স্কোয়ার মডার্ণ পাবলিসিং কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। এখানি নাটক। প্রসিদ্ধ লেখক উইলসন ক্যারেট প্রণীত Sign of the Cross নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। রামানুজের ধর্ম্ম-প্রচারকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া লেখিকা নাটক-খানিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। Sign of the Cross-এর খ্রীষ্টিয়ান Mercus এর আদর্শে সেনাপতি শঙ্কর রাও এবং Merciaর আদর্শে শক্তিচরিত্র গঠিত হইয়াছে। নাটকের আখ্যানটি খুব যে সমঞ্জস হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না এবং তাহারই ফলে মোটের উপর নাটকখানির গ্রন্থি স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে। এ ত্রুটিসত্ত্বেও নাটকের ভাষা বেশ সহজ ও সরল, গানগুলিও সুমধুর হইয়াছে। সুতরাং এ সকল ছোটখাট ত্রুটিসত্ত্বেও নাটকখানি যে সুখপাঠ্য হইয়াছে, সে কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

সঙ্গীত কুসুম। শ্রীমতী নীরদা মিত্র প্রণীত। বিবিধ পুষ্প-বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সঙ্গীতের সমালোচনা বড় কঠিন ব্যাপার। সুর-সংযোগে গীত না হইলে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ঠিক উপভোগ করা যায় না। তবে এ সঙ্গীতগুলিতে বিশেষত্ব বা কবিত্ব কিছু দেখিলাম না। মূল্য লিখিত নাই।

অমিয় সঙ্গীত। শ্রীমতী নীরদা মিত্র দ্বারা প্রকাশিত। হুগলি, চক্ রোড, ভবানী প্রেসে মুদ্রিত। এগুলিও দেব দেবী ও সমাজ-বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। 'সঙ্গীত কুসুম' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এ গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এ গ্রন্থেরও মূল্য লিখিত দেখিলাম না।

মন্দিরা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২।৫ চৌরঙ্গি, মানসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই দশ আনা মাত্র। এখানি কবিতা পুস্তক। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য। নূতন লেখক হইলেও বইখানিতে কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেকগুলি কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক কবিগণের ভাবের ছায়া-পাত হইয়াছে।

পল্লী। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী দেবশর্ম্মা প্রণীত। ঢাকা উয়ারী, ভারত মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারি, বেলতলি আট পাড়া, ঢাকা। মূল্য সাধারণ বারোআনা, বাঁধাই এক টাকা। এখানিও কবিতা-পুস্তক। গ্রন্থের মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এক নিবেদন আঁটিয়া দিয়াছেন—সেখানি নামে নিবেদন হইলেও কার্য্যে অনুজ্ঞার মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে আপনা হইতে পড়িয়া কবিতাগুলির সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে না দিয়া নিজ-হইতে গ্রন্থের সার্টিফিকেট আঁটার সম্বন্ধে কোন দিনই আমাদের সহানুভূতি নাই। পাঠককে ধোঁকা দেওয়াই এই সকল সার্টিফিকেটের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের ধারণা। 'নিবেদন'-লেখকের ধৃষ্টতা দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। নিজে একটি উচ্চমঞ্চ

তৈয়ার করিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার এই নবীন লেখকটিকে সাধারণ্যে পরিচিত করিয়া দিতেছেন। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "নিজে কবিতা লিখিতে পারি বলিয়া একটু কবিত্বাভিমান ছিল, দিন দিনই তাহা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।" ইহাই কি সার্টিফিকেটের মূল্য ধরিতে হইবে? আমাদের দুর্ভাগ্য, নিবেদন-লেখকের কোনও কবিতা পাঠ করিবার সুযোগ আমাদিগের ঘটে নাই। এই সকল নাম ও পরিচয়-হীন নিবেদন-লেখকের আশ্রিত-বাৎসল্য প্রহসনের পক্ষে সুন্দর উপাদান হইতে পারে! 'পল্লীর' কবিতাগুলি পাঠ করিলাম। কবিতাগুলিতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ কবি করুণানিধানের ভাবের ছায়া যে যে অংশে পড়িয়াছে, সেই সেই অংশই শুধু রস মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে; অপরাংশে কোন বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, পল্লী-কবির ভাষা সরল, মিষ্ট এবং বাহুল্য-বর্জ্জিত। তিনি এই ঢক্কা-নিনাদীর ভূমিকাদি ও অপরের ভাবানুসরণের মোহ কাটাইয়া যদি সাধনা করেন, তবে কালে কবিতা-রচনায় তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।

পুষ্পবাণ-বিলাসম্। [মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্] শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার কৃত পদ্যানুবাদ সমেতম্। শ্রীগণপতি সরকারেণ প্রকাশিতম্। কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। মহাকবি কালিদাস-রচিত "পুষ্পবাণ-বিলাসম্" সংস্কৃত ভাষায় একখানি আদি-রসাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য। এখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ; অনুবাদ ছন্দে গ্রথিত, তবে বিশেষত্ব-হীন।

শরীর-পালন-বিধি। শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর কর প্রণীত। ৪৭-১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। শরীর-পালন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাথমিক সহজ বিধি এই গ্রন্থে পয়ার ছন্দে রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থে কবিত্বের সন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, [illegible] নাই। তবে এরূপ বিষয় সমধিক চিত্তাকর্ষক [illegible] ছন্দে গড়িতে হইলে ছন্দোবন্ধে লেখকের [illegible] শক্তি থাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমান গ্রন্থ-লেখকের [illegible] শক্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। তবে গ্রন্থ [illegible] স্কুলপাঠ্য হইবার পক্ষে যে একেবারে অযোগ্য হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না।

ওমর-গীতি। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। প্রসিদ্ধ পারস্য [illegible] ওমর খৈয়ম-রচিত 'রুবায়াতে'র ফিট্‌জেরাল্ড [illegible] ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে। এখানি ছন্দে রচিত। লেখকের ভাষা ভাল; অনুবাদও চলনসই হইয়াছে। [illegible] বাঁধাই ভাল।

গীতা-বিন্দু। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষাল প্রণীত। সাথী প্রেস ও মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি গীতার বঙ্গানুবাদ। মূলের সহিত মিল বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের বাম পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মূল বঙ্গীয় অক্ষরে এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় তাহার বঙ্গানুবাদ পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে মূলের অনুবাদে মূলের কথা বাদেও দুই একটি কথা [illegible] খাটিয়ে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে মূলের [illegible] কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাই আনন্দের বিষয়। অনুবাদে লেখক সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পদ্যানুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও তেজ উভয়ই সংরক্ষিত হইয়াছে। গীতা-গ্রন্থের যে কয়েকখানি পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের আকার ছোট—পকেটে রাখা যায়। ছাপা বড় অক্ষরে। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে; সেগুলি মন্দ হয় নাই।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



লক্ষ্মী-নারায়ণ

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২১ [৫ম সংখ্যা

স্রোতের ফুল

(৮)

মালতী খুড়িমার ঘরে গিয়াই বলিল—মাসিমা, আমায় একখানা কাপড় দাও ত।

—এখন কাপড় কি করবি? নাইবি নে?

—নাইব ত। নাইবার ঘর কোন্‌দিকে?

—এ কি তোর কলকেতা যে ঘরের মধ্যে জলের কল আছে? পুকুর ধরবার মতো ঘর ত হয় না।

মালতী এ বাড়ীতে আসিয়া এতক্ষণে হাসিল। সে হাসি চাপিয়া বলিল—পুকুর নাইবা ধরল; পুকুরজলের ঘড়া ধরবার মতন ঘর ত আছে।

—তোলাজলে নাইবি কি? চ পুকুর দেখিয়ে দিয়ে আসি?

—না মাসিমা, আমি চাকর-বাকরদের সামনে পুকুরে নাইতে পারব না।

—পুকুরে নাইবি নে ত তোকে জল তুলে দেবে কে? তোর মাসির চোদ্দটা চাকরদাসী আছে কিনা?

—আমাকে পুকুর দেখিয়ে দেবে চল, আমি জল তুলে আনছি।

খুড়িমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুই জল তুলবি কি বলিস্?

—তুললামই বা। আমাদের যখন চাকর-দাসী নেই, তখন নিজের কাজ নিজে করলামই বা?

খুড়িমা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—না না, ওসব ছোটলোকপনা এখানে খাটবে না। এ জমীদারের বাড়ী, এখানকার আদবকায়দা মেনে তোকে চলতে হবে। এম্‌নিই ত তোর জন্যে যতদূর মাথা হেঁট হবার তা হয়েছে.....

মালতী হাসিয়া বলিল—এ ত ভারি চমৎকার জমিদারী আদবকায়দা দেখছি। পুরুষের সামনে নাইতে লজ্জা নেই, আবরুর জন্যে জল তুললেই মর্য্যাদা নষ্ট!

মালতীর হাসি ও পণ্ডিতপনা দেখিয়া খুড়িমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। রুক্ষ স্বরে বলিলেন—এক দণ্ডেই তুই যে জ্বালাতন করে'

তুললি দেখছি। বারো মাস ত্রিশ দিন তোকে নিয়ে আমার কেমন করে' চলবে?

আবার সেই হাড়জ্বালানো হাসি হাসিয়া মালতী বলিল—তা কিছু ভেবো না মাসিমা। দুদিন একত্তরে থাকলেই আমার চালচলন তোমাদের সয়ে যাবে, আর তোমাদের আদবকায়দাও আমার অভ্যাস হয়ে আসবে।

এই কথায় খুড়িমা অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া গনগন করিতে লাগিলেন, মালতীকে কি যে বলিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। মালতী বুঝিল যে তিনি রাগিয়াছেন। তখন সে বলিল—তবে মাসিমা, একখানা আমায় কাপড় দাও; ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে আমি কিছুতেই আসতে পারব না।

এই রফায় কথঞ্চিৎ নরম হইয়া খুড়িমা বলিলেন—বাক্সের চাবি দে, কাপড় বা'র করে' দি।

—আমার বাক্সয় সব পেড়ে কাপড়। পেড়ে কাপড় আর পরব না। তোমার একখানা থান কাপড় দাও মাসিমা।

খুড়িমা খুসী হইয়া কাপড় আনিতে গেলেন। মালতী হাতের চুড়ি খুলিয়া বাক্সে রাখিল।

বিধবার বেশে মালতীর নূতনতর শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্নানাহার নিষ্পন্ন হইয়া গেলে খুড়িমা মালতীকে বলিলেন—যা, রাণীদিদির কাছে গিয়ে বস্ গে। সদাসর্ব্বদা তাঁরই কাছে থাকবি, মন জুগিয়ে সেবা যত্ন করবি, বুঝলি?

গিন্নির প্রসাদ অর্জ্জনের আশায় মালতী যাত্রা করিল।

গিন্নি আহারান্তে শয়ন করিয়া আছেন। রোহিণী ও হাবার মা পদসেবা করিতেছে। বিছানার একপাশে বসিয়া বিনোদ ও ঝিনি ইকড়িমিকড়ি খেলিতেছে। গিন্নি স্নিগ্ধমুখে পুত্রকন্যার অর্থহীন খেলা দেখিতেছিলেন। সহসা দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হইল মালতী। গিন্নির মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইয়া চক্ষু নত করিয়া রহিলেন।

মালতী এই উপেক্ষা সহ্য করিয়াও গিন্নির পদসেবার ভাগ লইবার জন্য রোহিণীর পাশে বিছানায় বসিতে যাইতেছিল। গিন্নি একেবারে—হাঁ হাঁ হাঁ, কর কি—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। মালতী থতমত খাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গিন্নি বলিলেন—ও কাপড়ে বিছানা ছুঁয়ো না বাছা।

মালতী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—এ কাপড় ত ভালো মাসিমা; আমি নেয়ে মাসিমার কাচা কাপড় পরেছি।

—কাচা কাপড় হলে কি হয়, ঘাগরা ত পরেছ! ঘাগরা পরে' তুমি আমাদের কোনো জিনিষপত্তর ছুঁয়ো না বাছা, বলে রাখছি!

মালতীর যেন মাথা কাটা যাইতেছিল। থাকা ও যাওয়া দুইই তখন তাহার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। মালতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গিন্নি আর একটি কথাও তাহাকে বলিলেন না। রোহিণী মজার গন্ধ পাইয়া মালতীর অনুসরণ করিল।

এক ঘরে ক্ষমা, মোক্ষদা, পাঁচুর মা,

জয়া প্রভৃতি কয়েকটি পুরস্ত্রী একখানি গালিচা বিছাইয়া দশপঁচিশ খেলিতেছিল। ইহারা জমিদার-পরিবারভুক্ত আশ্রিত; কাহারো সহিত সামান্য সম্পর্ক আছে, কেহ কেহ বা একেবারে নিঃসম্পর্ক। সকলেই সধবা; বিধবা কেবল জয়া। অনাথা বিধবা দেখিয়া হরিবিহারী যখন তাহাকে নিজের অন্তঃপুরে আশ্রয় দেন তখন গিন্নি অনেক আপত্তি ও অশ্রুজল বৃথা ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এখন তাঁহার সহিয়া গিয়াছে; কিন্তু বিপিন তাহাকে এখনো দেখিতে পারে না। অপর রমণীরা কেহ গিন্নির বাপের বাড়ীর গ্রামসম্পর্কে আত্মীয়, কেহবা শ্বশুরবাড়ীর সুবাদে আত্মীয়; তাহাদের স্বামীরা জমিদার-সরকারে গোমস্তাগিরি ও নেশাভাঙ করে, এবং ইহারা সমস্ত দিন অকাজে গুলতান করিয়া কাটায়।

মালতী সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষমা বলিল—জয়া পিসি, ঐ মালতী ছুঁড়ি যাচ্ছে, ওকে ডাক ডাক।

জয়া ডাকিল—ওগো ও মালতী, এই দিকে একবার পায়ের ধূলো না হয় পড়লই।

মালতী শান্তশীতল চন্দ্রকিরণের মতন আপনার চারিদিকে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া নিঃশব্দ ললিত গতিতে ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বধূরা তাড়াতাড়ি একগলা ঘোমটা টানিয়া হাতের দানের কড়ি ফেলিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিল; ঝিউড়িরা অবাক হইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজেদের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে মাছের চোখের মতন ভাবহীন দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছে দেখিয়া মালতীর অত্যন্ত হাসি আসিল। কেহই কিছু বলে না দেখিয়া সে বলিল—তোমরা খেল না ভাই। আমায় দেখে অত লজ্জা করলে চলবে কেন? আমি ত এখন তোমাদেরই একজন।

কাহারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল জয়া বলিল—বস।

মালতী মাটিতে বসিল। জয়া বলিল—ওখানে কেন, ওখানে কেন? গালচের ওপর উঠে বস না ভাই।

মালতী হাসিয়া বলিল—না, আমি বেশ আছি। আমি ম্লেচ্ছ মানুষ, তোমাদের আবার ছুত টুত হবে।

লোককে ম্লেচ্ছ বলিয়া নাক সিঁটকানো যায়, কিন্তু সে যখন সেই নিন্দা গায়ে পাতিয়া লয় তখন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। মনুষ্যধর্ম্ম তখন সমাজধর্ম্মের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়ই। জয়া মালতীর কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, গালচের আসনে দোষ নেই—শান্তরেই আছে বৃহৎকাণ্ডে গজপৃষ্ঠে দোষ নাস্তি।

মালতী হাসিয়া বলিল—শান্তরের কি মতিগতি ঠিক আছে? বিধানও দেয়, বারণও করে। কোনটা মানা যাবে? কাজ কি ভাই গণ্ডগোলে, আমি তফাতেই থাকি। তোমরা খেল, আমি দেখি।

ক্ষমা বলিল—তুমিও খেলবে এস না।

—আমি খেলতে জানি নে।

—কেবল পড়তেই জান?

—হ্যাঁ ঐটেই যে শুধু শিখেছি। তোমরা শেখালে খেলতেও পারব।

পাঁচুর মা দুই আঙুলে ঘোমটা ফাঁক

করিয়া মোক্ষদার কানের কাছে মালতী শুনিতে পায় এমনতর স্পষ্ট অথচ চাপা গলায় বলিল—ওমা! কি ঘেন্না! কি লজ্জা! মেয়েমানুষ পড়তে পারে তা আবার বড় গলা করে' বলা হচ্ছে! এই জন্যেই ত বিধবা হয়েছে, লক্ষ্মী ছায়া মাড়াচ্ছেন না, পরের দুয়োরে মাঙতে আসতে হয়েছে! মেয়েমানুষের কি এত অনাচার সয় গা?.....আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর না ভাই, ও গান গাইতে পারে?

মালতী হাসিয়া বলিল—তুমিই জিজ্ঞাসা কর না কেন। আমি তোমাদের সমবয়সী, আমার সঙ্গে কথা বলতে এত লজ্জা।

পাঁচুর মা মুখ ঘুরাইয়া জনান্তিকে বলিল—আ মরণ! ওঁর মতন ত আমি বেহায়া নই!

মোক্ষদা এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—তুমি গান করতে পার ভাই?

মালতীর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। বলিল—একটু একটু পারি।

ক্ষমা গালে হাত দিয়া চোক পাকাইয়া বলিল—ওমা! তুমি দেখছি একেবারে খিষ্টান!

—কেন খৃষ্টান কিসে হলাম? তোমরা কি বাসরঘরে গিয়ে গাও না?

ক্ষমা গাল ফুলাইয়া বলিল—সে বাসরঘর এক, আর সাধে সুখে গান গাওয়া আর। দুটো কি সমান হল?.....আচ্ছা, তোমরা পুরুষের গলা ধরে' নাচ?

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মালতী ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মালতী ঘরের চৌকাঠ পার হইতেই হইতে সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল, যে এমন কৌতুককর জীব জন্মে তাহারা দেখে নাই।

পাঁচুর মা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঃ আচ্ছা মেয়ে যা হোক্! কি দেমাক্!

ক্ষমা বলিল—রূপের দেমাক রে রূপের দেমাক্! পাছে রূপ ঢাকা পড়ে তাই মুখের ওপর এক রত্তিও ঘোমটা টানা হয় না। রূপ যেন আর কারো হয় না!

জয়া বিজ্ঞ ভাবে বলিল—রূপ দেখিয়েই ত ওসব লোকের পশার!

মোক্ষদা এতক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মতো নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তোলে। মালতীর অপরূপ রূপ এই-সব রূপহীনাদের মনের মধ্যে বড় বেশী রকম জাঁকাইয়া বসিয়াছিল, নিজেদের পরাভব অত্যন্ত তীব্রভাবে লজ্জা দিতেছিল বলিয়াই, সেই অপরাজিত রূপকে মুখে অস্বীকার করিবার জন্য ইহাদের এত আগ্রহ। মোক্ষদা উহারি মধ্যে দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। তাই সে মালতীর রূপ একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না। বলিল—তা যা বলিস ভাই, দেখবার মতন রূপ বটে! মেয়ে ত নয়, যেন একখানি ছাঁচ! এমন দুধে-আলতার মতন রং কখনো দেখিনি! গালে টুসকি মারলে বোধহয় রক্ত ফেটে পড়ে!

পাঁচুর মা অবজ্ঞাভরে বলিল—দূর! তুই যেমন ন্যাকা! গালে রং মেখেছে!

.....সেই দেখিস নি সেবার বিনির ভাতের সময় ব্যাঙ্গল থেটার এসেছিল, যে মাগী রাধিকে সেজেছিল তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। দিনের বেলা যখন অন্দরে বেড়াতে এল দেখি ওমা সে কী কালো, কী কুচ্ছিত, পঞ্চাশ বছরের বুড়ি! সে যে সে, তা মনেই হয় না!.....

পাঁচুর মাকে বাধা দিয়া মোক্ষদা বলিল—তা যা বল বউ, রঙে কৃত্রিম করতে পারে, গড়নে ত আর কৃত্রিম চলে না। কী নিখুঁত গড়ন!

পাঁচুর মা ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল—ছাই গড়ন! অমন সেজেগুজে থাকলে আমাদেরও সুন্দর দেখায়।

জয়া বলিল—হাঁ লা মোক্ষদা, ছিরিটা দেখলি তুই কোনখানে। চোখ দুটো তো গরুর চোখের মতন ড্যাবড্যাব করছে, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে.....

ক্ষমা বলিল—নাকটা ত সূর্পণখার মতন আধ হাত লম্বা.....

পাঁচুর মা হাসিয়া মোক্ষদার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা!

মালতী যে অতি কুৎসিত, ঠকাইয়া সে আপনাকে সুন্দর বলিয়া চালাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। তখন মোক্ষদা সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল—একদিন মালতীর গান শুনতে হবে।

পাঁচুর মা বলিল—তার আবার কি? ও ত গান গাইবার জন্যে মুখিয়েই আছে। কথায় বলে—ওরে ক্ষ্যাপা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়? ....ক্ষ্যামা ঠাকুরঝি, যা না ভাই মালতীকে ধরে আন না।

—সে কি ডাকলে এখন আসবে? তার চেয়ে চ আমরাই তার কাছে যাই।

—সেখানে যদি খুড়িমা থাকেন?

—এখন খুড়িমা কোথায়? তিনি এখনো ঠাকুরঘরে, নয়ত হবিষ্যি চড়িয়েছেন।

তখন সকলে মিলিয়া মালতীর সন্ধানে যাত্রা করিল।

মালতী আপনার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া যাহাদের আচরণের কথা ভাবিতেছিল তাহাদেরই আবির্ভাবে বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সে তাহাদের দিকে চাহিতে বা কোনো কথা বলিতে পারিল না।

ক্ষমা বলিল—তুমি ভাই আমাদের ওপর রাগ করে' চলে এলে, তাই আমরা তোমার কাছে ঘাট মানতে এলাম।

মালতী কুণ্ঠিত দৃষ্টি তাহাদের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—ওকি কথা ভাই, আমার কাছে ঘাট মানবে কি? আমি রাগ করিনি।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, রাগ করনি বুঝব যদি তুমি একটা গান কর।

মালতী মুস্কিলে পড়িল। ইহাদের নিকট গান করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না, গান না করিলেও তাহার রাগ করা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। একটু ভাবিয়া মালতী বলিল—আমার গান তোমাদের ভালো লাগবে না, শেষকালে তোমরা আমায় ঠাট্টা করবে।

ক্ষমা বলিল—না না, ঠাট্টা করব কেন? তোমায় একটি গাইতেই হবে।

মালতী লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—গান গাওয়া থাক ভাই, ওঘরে রাণী-মাসিমা

আছেন, মাসিমা এখুনি আসবেন, ওঁরা শুনতে পেলে কি বলবেন ?.....

ক্ষমা বলিল—না না, তোমার বাজে ওজর আমরা শুনব না! খুড়িমা কোথায় তার ঠিক নেই, তাঁর ওপরে আসতে সেই যার নাম তিনটে। রাণী-মাসিমা এতক্ষণ ঘুমুচ্ছেন, আর আমরা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি...

মালতী আজই সবে এ বাড়ীতে আসিয়াছে। এ বাড়ীর যাহারা পুরাতন বাসিন্দা তাহারা যে তাহাকে অভ্যর্থনা করে নাই, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নাই, একটা মামুলি ভদ্রতার কথা পর্য্যন্ত বলে নাই, এবং তাহারাই যে এখন তাহাকে অপরিচয় সত্ত্বেও বিনা ভূমিকায় গান করিবার জন্য জেদ করিতেছে, তাহারা যে তাহাকে একটি কৌতুককর জীব মনে করিতেছে, ইহাতে মালতীর মন অত্যন্ত বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। গান গাহিবার প্রবৃত্তি তাহার কিছুতেই হইতেছিল না।

মালতী অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমরা জেদ করছ তাই একটা গাচ্ছি। কিন্তু আর গাইতে বলো না।

জয়া বলিল—আগে একটা গাওই ত, তারপর আর বলব কি না সে বোঝা যাবে।

মালতী মাথা নত করিয়া মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—

"আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন স্বরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।"

মালতীর সমস্ত অন্তরের প্রার্থনা যেন এই গানে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। তাহার মধুর বিকম্পিত করুণস্বরের অনুরণনে ঘর-খানি ভরিয়া গেল! এক দণ্ড সকলে মুগ্ধ স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া মোক্ষদা বলিল—বাঃ! কি গলা তোমার ভাই!

তখন একে একে সকলের মুখ খুলিল। ক্ষমা বলিল—হ্যাঁ, গলাটি মন্দ নয়, কিন্তু গানটা ছাই, শুধু কথার হেঁয়ালি। নিধু বাবু কি গোপালে উড়ের টপ্পা জানো না তুমি? একটা কি ছাই গান যে গাইলে! একটা বেশ ভালো দেখে টপ্পা গাও।

পাঁচুর মা বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐটি গাওনা, ঐ যে কি ভালো মনে আসছে না—মনে করে দে-না ভাই ঠাকুরঝি, সেই যে সেই খেমটাওলিরা সেবার গেয়েছিল.....

ক্ষমা বলিল—কোন্‌টা? সেই

"ভাঙা বাগান যোগান দেওয়া ভার,
ফুলে নেই বাহার!"

সেইটে?

পাঁচুর মা চোখ মটকাইয়া মুচকি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটি গাওনা ভাই।

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি ওসব গান জানিনে।

মোক্ষদা বলিল—না না, ভাই, তুমি যা জানো তাই আর একটি গাও।

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—আমি ত আগেই বলে রেখেছি, আর আমি গাইব না।

জয়া বলিল—তোমার যে একেবারে ধনুকভাঙা পণ দেখছি গো!

ক্ষমা বলিল—কেন গো, গরব হল না কি?

পাঁচুর মা বলিল—সেই সেবার কলকেতা থেকে খেমটাওলিরা এসেছিল, তাদের যত গান ফরমাস করতাম ততই ত গাইত। বল্লে না পেত্যয় যাবে ভাই, তাদের একজন ঠিক তোমার মতন ছিল দেখতে, হুবহু, গালের ঐ তিলটি পর্য্যন্ত। কেমন ঠাকুরঝি, সত্যি কি না?.....

অপমানে মালতীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার সমস্ত দেহমন যেন অশুচি স্থানে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল! মালতী উঠিয়া দৃঢ় পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষমা, পাঁচুর মা কত ডাকিল, মালতী একবার ফিরিয়াও চাহিল না। পাঁচুর মা নাক সিঁটকাইয়া বলিল—ছুঁড়ির ঠ্যাকার দেখেছিস্ একবার? তবু যদি নিজের চাল চুলো কিছু থাকত!

জয়া বলিল—নষ্ট লোকের মুখ টন্‌কো—কথাতেই বলে। দেখিসনি ছোটতরফের কালীতারাকে? বিধবা মাগী ছোটবাবুর কাছে এসে বেশ আছেন, কিন্তু কেউ একটু কিছু বললেই অমনি তাঁর মানে ঘা পড়ে!

পাঁচুর মা বলিল—হ্যাঁ জয়া মাসি, কালীতারার নাকি ছেলে হবে? ওমা কি ঘেন্না!

ক্ষমা বলিল—উনি বলছিলেন যে নিবারণ মুখুয্যে আর কালীতারার ভাসুর রঘুনাথ দেওয়ান চুপচাপ সব ঢেকে ফেলতে ছোটবাবুকে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু কালীতারা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

মোক্ষদা দয়ার্দ্র স্বরে বলিল—অমন নিষ্ঠুর কাজে রাজি কি হওয়া যায় দিদি! এখনো ত পেটে ধরনি; যখন ধরবে তখন জানবে ছেলের কি দরদ।

এই কথা শুনিয়া সকলের মনই একটি স্নেহার্দ্র বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া নিজেদের নারীত্ব উপলব্ধি করিল। অল্পক্ষণ কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না।

পাঁচুর মা হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—তা যেন হল, কিন্তু অত বড় মানী লোকটা ছোটবাবু, তার ত মান বাঁচাতে হবে!

জয়া বলিল—সেই জন্যে ত ছোটবাবু বলেছে যে কালীতারা তার কথা না শুনলে তাকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

মোক্ষদা ব্যথিত হইয়া বলিল—আহা বেচারি, তা হলে কোথায় দাঁড়াবে? ওর ভাসুর দেওয়ানি পাবার জন্যে ওকে ছোটবাবুর কাছে এনে দিয়েছে। বিধবা হয়ে অবধি ভাসুর আর জায়ে ওর কি কম খোয়ারটা করেছে। ঘরকন্নায় দাসীর মতন খাটিয়ে এক মুঠো খেতে দিত না, মারত পর্য্যন্ত। এখন ছোটবাবু তাড়িয়ে দিলে ওরা কি আর ঘরে ঠাঁই দেবে?

জয়া বলিল—তা ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হবে।

মোক্ষদা ব্যথিত স্বরে বলিল—না না, অমন কথা বলো না জয়া পিসি। ও কি অমনি ছোটবাবুর কাছে এসেছিল? ছোটবাবু বিদ্যাসাগরের মতে বিয়ে করবে স্বীকার করাতে তবে এসেছিল। আহা ও ছোটবাবুকে কী ভালোটাই না বাসে!

ছোটবাবু চলে যায়, ওর মনে হয় বুঝি পায়ে বাজছে, পায়ের তলায় বুক পেতে দিতে পারলে তবে যেন ওর মনের খেদ মেটে। সেবার ছোটবাবুর ব্যামো হতে আহার নিদ্রে ছেড়ে কি সেবাটাই করলে—ছোটরাণী-বৌ তার সিকিও করেনি। কালীতারা ত ছোট-বাবুকে নিজের সোয়ামী বলেই জানে। পুরুতে দুটো মন্তর পড়ালেই কি শুধু বিয়ে হয়? সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আমাদের সোয়ামীকে অমন করে ভালবাসতে পারিনি। তবু আমরা সতী, আর কালীতারা অসতী!

জয়া মুখ নাড়িয়া বলিল—ও সব ঢং লো ঢং! নষ্ট মেয়েদের ঐ রকম লোক-দেখানি ভালোবাসা, নইলে ওদের চলবে কেন?

জয়ার কথা শুনিয়া মোক্ষদা চটিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল—হাঁ তা হবে, নষ্ট মেয়েদের স্বভাব কেমন তা আমরা কেমন করে' জানব, তোমার জানা থাকা সম্ভব।

—কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মোক্ষদা পোড়ারমুখীকে আমি আজ দেখে নেব, এই চল্লাম আমি রাণীবৌয়ের কাছে।—বলিয়া জয়া ফরফর করিয়া চলিয়া গেল! রোহিণী নূতন মজার সন্ধানে জয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

মোক্ষদা ভয়ে মুখ মলিন করিয়া বলিল—কি হবে ভাই? দিদি, যা না ভাই ওকে ফিরিয়ে আন।

ক্ষমা হাসিয়া বলিল—তুই ক্ষেপেছিস! ও মুখেই আস্ফালন করে' গেল, কাউকে কিছু বলবে না! ওর কি বলবার মুখ আছে, না, রাণীমাসি ওর কথা জানে না। তবু, চ দেখিগে……

সকলে জয়াকে শান্ত করিতে ছুটিল।

(৯)

মালতী বিরক্ত হইয়া পুরস্ত্রীদের কদর্য্য আলোচনা পরিহার করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু রোহিণীর কৃপায় তাহাদের বাকি আলাপটুকু শুনিতে বাকি রহিল না। কালীতারার কাহিনী শুনিয়া একদিকে কালী-তারার প্রতি করুণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে সমস্ত জমিদার-পরিবারটির স্ত্রী পুরুষ সকলেরই চরিত্রে এমন একটা অভদ্র ছাপের পরিচয় সে পাইতেছিল যে সকলের প্রতি ভয় অবিশ্বাস ও ঘৃণায় তাহার মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। এখন সে বিপিনের গৃহে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনাকেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। সে ভয়ে ভয়ে আপনাকে সকলের সংস্রব হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে রাখিতে লাগিল।

মালতী যে এই বাড়ীর দশজনের একজন হইয়া মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না, সে যে স্বতন্ত্র থাকিয়া সকলের মনের সামনে স্পষ্ট হইয়া থাকিতেছে, ইহার জন্য খুড়িমা তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলেন। একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মালতীর আগমনে জমিদার-পরিবারের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালীতে যে একটু বিপরীত বেসুর বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার জন্য মালতীর সঙ্গে সঙ্গে খুড়িমাও বিশেষ করিয়া সকলের আলোচনার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে খুড়িমা কিছুতেই মালতীর প্রতি আপনার মনটিকে প্রসন্ন

বাধামুক্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না; মালতীও সর্ব্বদা তাঁহার কাছে খোঁচা খাইয়া খাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে মাসিকে ভক্তিশ্রদ্ধায় আপনার জন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। মাসিমাকে তাহার যেন জেলখানার প্রহরীর মতন মনে হইতে লাগিল; এবং এই-সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে সে তাহার মাসিমাকেই দায়ী করিতে লাগিল, যেন তিনিই তাহাকে জোর করিয়া বা ঠকাইয়া এই বাড়ীতে আনিয়া বন্দিনী করিয়াছেন।

মালতীর অভিমানী তেজস্বী প্রকৃতি সকলের নিকট অনাদর ও আঘাত পাইতে পাইতে বিদ্রোহে উদ্যত বজ্রের মতন কঠিন একগুঁয়ে হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করাও আর আবশ্যক মনে করিল না; সে নিজের খেয়াল-মত পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনভাবেই চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার এই উদ্ধত বিদ্রোহ লোককে যতই তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল, তাহার রোকও ততই বাড়িয়া চলিল।

বিদ্রোহী হইয়া সর্ব্বদা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাইয়া হঠাইয়া রাখা চলে, কিন্তু তাহাতে নিজেরও নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম করিবার উপায় থাকে না। চৌধুরী-পরিবারের ঘরকন্নার কর্ম্মের বাহিরে পড়িয়া মালতী একাকী নিজেকে লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে নিজের বাড়ীতে থাকিতে সমস্ত দিন পিতামাতার সেবা করিয়া, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইয়া, বৌঝিদের শিল্প সেলাই শিখাইয়া, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাকে আপনি বোধ করিবার অবসরই পাইত না। এখানে আপনার কাছে আপনি সে বড় স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার অন্তরে যে সেবাপরায়ণা কল্যাণী নারীপ্রকৃতি ছিল তাহা অবলম্বনের অভাবে অহরহ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মনের সব ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া মারিতে মারিতে তাহার মনও বোবা হইয়া উঠিতেছিল, সে নিজের মনের মধ্যে আনন্দের তৃপ্তির অভয়ের তেমন অসঙ্কোচ সাড়া আর পাইতেছিল না। তখন তাহার সেই আপনার নিরুপদ্রব নির্জ্জন গৃহখানির স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া হায় হায় করিয়া উঠিতে লাগিল। সেখানে তাহার কেহ সহচরী ছিল না; তা না থাকুক, সেখানে পুস্তকের সাহচর্য্য ত কেহ নিবারণ করিতে আসিত না। এখানে এই বাণীর সপত্নীমন্দিরে তাঁহার আসন-শতদলের পাপড়ি ত একটিও খসিয়া পড়িতে পারে না; যদি বা কখনো পড়ে লক্ষ্মীর অসংখ্য বাহনের তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুর প্রহারে তাহা অধিকক্ষণ টিকিতে পারে না। মালতীর জেদ হইল অসাধ্যসাধন করিতে হইবে—লক্ষ্মীর মন্দিরে বসিয়া লক্ষ্মীর বাহনদের দেখাইয়া দেখাইয়া বাণীর আসন-শতদল এখানেই বিছাইতে হইবে!

মালতীর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। একদিন সে দেখিল বিপিনের ঘরে সারি সারি আলমারিতে অসংখ্য বই সাজানো আছে।

কিন্তু বিপিন ত বাড়ীতে নাই। সে কাহার নিকট হইতে এই আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবে? নবকিশোর ত বিপিনের বন্ধু, সে কি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারে না? বিপিনের লাইব্রেরীতে পাঠের অধিকার যদি সে দিতে না-ই পারে, সে নিজে ত আপাতত কিছু বই সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। মালতী নবকিশোরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মালতীকে আনিয়া অবধি নবকিশোর অন্দরে কদাচিৎ আসে; আসিলেও মালতীর সঙ্গে দেখা করে না। মালতীকে লইয়া জমিদারের অন্তঃপুরে যে বিষম আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার যথেষ্ট আভাস নবকিশোর বাড়ীতে বসিয়াই পাইতেছিল; তাহাতে সে মালতীর জন্য ক্লেশ অনুভব করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সাধ্য ছিল না যে সে কোনো প্রকার সাহায্য করিয়া মালতীকে রক্ষা করিতে পারে। সে কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা করিলে মালতীর চারিদিকে যে কুৎসার কালি ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে মালতীকে আরো ক্লেশ দেওয়াই হইবে। মালতীর নির্য্যাতনের সংবাদে সে নিজেই নিজের মনের মধ্যে উদ্ভিদ্যমান আগ্নেয়-গিরির মতো জ্বলিতেছিল, ফাটিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিতে শুধু বিপিনের আসার অপেক্ষা। বিপিন আসিলে তাহাকে মালতীর রক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে স্থির করিয়া বিপিনের প্রতীক্ষায় নবকিশোর ছটফট করিতেছিল। বিপিন ঘরের ছেলে; এক বাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বদাই মালতীর তত্ত্ব লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন বা অশোভন হইবে না; তাহাতে তাহারও নিন্দার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু ভরসা শুধু এই যে সহজে কেহ মুখ ফুটিয়া বিপিনের নামে কুৎসা রটনা করিতে পারিবে না।

মালতী কিন্তু বিপিনকে চেনে না। তাহার আগমনে বই পড়িতে পারিবার সুবিধার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার অনুমতি লইবার জন্য নবকিশোরকেই দরকার হইবে। তাই নবকিশোরকে সংবাদ দিতে ইচ্ছা করিয়া একদিন সে তাহার মাসিমাকে বলিল—"মাসিমা, তোমরা ত কোন কাজকর্ম আমায় ছুঁতে দাও না। সমস্ত দিন চোরের মতন এমন একলাটি মুখ বুজে কেমন করে বসে থাকি বল ত!

খুড়িমা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তা আমি কেমন করে জানব দিন তোমার কেমন করে' কাট্‌বে? তুমি কি আমার বশে চলছ, যে আমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছ? ঠ্যাকারে কারো সঙ্গে কথা কওয়া হয় না, কারো ত্রিসীমানায় যাওয়া হয় না। ইচ্ছে সুখে একলা থাকবি, তার আমি কি করব?

মালতী বলিল—তা মাসিমা, তোমাদের বাড়ীর লোকগুলি যে রকমের, তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা আমার কম্ম নয়।

খুড়িমা তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু তোর জন্যে যে আমার সুদ্ধু খোয়ার হচ্ছে। উঠতে বসতে সবাই আমায় ব্যঙ্গ করে বলে—মালতীর মাসি, মালতীর মাসি; আবার তোর কথা বলতে হলে তখন আর তোর নামটা কারো মনে পড়ে না, বলে—খুড়িমার বোনঝি।

মালতী ব্যথিত হইয়া বলিল—এর সমস্ত দোষই কি আমার মাসিমা? আমায় তবে বেহালায় পাঠিয়ে দাও। এখানে এসে অবধি ত আমারও সোয়াস্তি নেই, তোমাদেরও সোয়াস্তি নেই!

খুড়িমা গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আমি ত তোমায় এখানে আনতে পাঠাই নি। তুমি ধিঙ্গি মেয়ে, আপনি নাচতে নাচতে এসেছ, আপনি আপনার মতে চলছ। যা খুসি তাই কর গে। আমি এসবের কিছু জানি নে।

খুড়িমার এই অভিমান মালতী বুঝিতে পারিল না। সে একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিয়া উঠিল—তুমিও যেমন আমায় আনতে পাঠাও নি, আমিও তেমনি আপনি ব্যস্ত হয়ে তোমাদের এই নরকের জেলখানায় আসি নি। আমাকে নিয়ে এসেছেন নবকিশোর বাবু। তাঁকে ডাকিয়ে দাও, আমি তাঁর সঙ্গেই বোঝাপড়া করব।

খুড়িমা তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমর পোড়ারমুখী! এততেও তোর হায়া নেই? ধন্যি মেয়ে জন্মেছিলি তুই? উড়ে বদতে পুড়ে যায়—এমন শতেকখোয়ারী তুই! কোথায় লজ্জায় মরে থাকবে, না আবার চোপা করা হচ্ছে!

মালতী কি বলিতে যাইতেছিল। উচ্ছ্বসিত চোখের জল দমন করিতে গিয়া সে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না। এক বুক উচ্ছ্বসিত অশ্রুর মুখে সমস্ত শক্তি চাপা দিয়া সে পাষাণের মতো বসিয়া রহিল। তাহার একগুঁয়ে অভিমানী স্বভাব কেবল বাধার পর বাধা পাইয়া পাইয়া প্রবল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; এখন সে যুদ্ধোন্মুখ, এখন তাহার কান্না শোভা পায় না। সে স্থির করিয়া লইল এখানে সে কাহারো কেহ নহে, তাহার যাহা করিবার আছে তাহা তাহাকে একলাই করিয়া তুলিতে হইবে। সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার সঙ্কল্প নীরবে মনের মধ্যে দৃঢ় করিয়া তুলিতে লাগিল।

খুড়িমা যদি একটু নরম হইয়া ভালো মন্দের বিচার তাহারই উপর ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে মালতী কখনো কাহারো অপ্রীতিকর আচরণ করিতে পারিত না। কিন্তু খুড়িমা আবাল্য জমিদারের গৃহিণী, স্বামীর সোহাগিনী ছিলেন; শাশুড়ী ননদের অধীনে কোনো দিন তাঁহাকে থাকিতে হয় নাই; তিনি হুকুম করিতেই অভ্যস্ত; তারপর অবস্থার ফেরে পড়িয়া পরাধীনতার দুঃখের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইতেছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি এমন একজন লোককে পাইয়াছিলেন যে শুধুই তাঁহার বোনঝি নয়, তাঁহার আশ্রিতও বটে। হুকুম করিয়া অধীনে দাবাইয়া রাখিবার মধ্যে যে একটি বিলাসিতার আনন্দ আছে, তাহার প্রলোভন খুড়িমা মালতীকে পাইয়া কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

এ দিকে মালতীও কখনো কাহারো অধীনে থাকিয়া হুকুম মানিয়া চলে নাই। সমবেদনায় করুণহৃদয় পিতামাতার স্নেহযত্নের শীতল ছায়ায় সে অবিরোধ স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করিয়াছে। আজ অকস্মাৎ অচেনা অপ্রীতিকর পরিবেষ্টনের মধ্যে আটক পড়িয়া

পদে পদে প্রতিরোধ সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না।

এইরূপে দুই দিক হইতেই বিরোধের ঝড় উদ্যত হইয়া একদিন ভীষণ সংঘাতে প্রলয় তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাসায়নিক গবেষণার ফল *

রাসায়নিক গবেষণা বর্ত্তমান যুগে জাতীয় উন্নতির কতদূর সাহায্য করিতেছে তাহা এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যথাযথ ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। রসায়নের সাহায্যে অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিস কিরূপ অবশ্য ব্যবহার্য্য পদার্থে পরিণত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এবং এই ব্যবহারিক রসায়নের উন্নতির কোন স্তরে আমাদের ভারতবাসীর অথবা বঙ্গবাসীর স্থান,—তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

আলকাতরা

আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের কথাই প্রথমতঃ বলিতে হয়; আনুসঙ্গিক ভাবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কথাও উল্লেখ করিব। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, গ্রীস্ ইটালি প্রভৃতি দেশে নানাবিধ রং রপ্তানি হইত, নীলের বিষয় আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার রংই উদ্ভিদ্‌জাত—গাছগাছরা হইতে প্রস্তুত। কিন্তু রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল উদ্ভিদ্‌জাত রঙের (Vegetable dyes) মূল উপাদানীভূত গঠনরহস্য (Constitution) পরিজ্ঞাত হইয়া পাশ্চাত্য রসায়নজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই সকল জিনিস উৎকৃষ্ট প্রণালীতে এবং স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা (special reactions) শত শত নূতন রং আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন এই সকল রং মাত্র একটি দেখিতে বিশ্রী, দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস আল্‌কাতরা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী, হল্‌দে ইত্যাদি যে কোন রং আমাদের কাপড়ের পাড়ে ও মনোহারী ছিট্ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই সবই আল্‌কাতরা হইতে প্রাপ্ত জিনিস হইতে রসায়ন গবেষণার ফলে রসায়নজ্ঞের সৃষ্টি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সকল দেশের লোকই আলকাতরাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; ক্যানিস্‌টারের টিন রং করা ভিন্ন তাহা এ দেশে বিশেষ কোন কার্য্যে আসিত না, কিন্তু ফ্যারাডে, গ্রিস্, হফমান্, পার্কিন প্রমুখ রসায়নজ্ঞগণের পৌরোহিত্যে ইহার প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে। এখন ইহাকে পতিত কে বলে? অপ্রীতিকর গন্ধময় ও কালোরূপীই বা কে বলে? এখন ইহা রূপান্তরিত হইয়া প্রতি দেশের ঘরে ঘরে বহুরূপী ভাবে সসম্মানে বিরাজ করিতেছে!

একদিকে আল্‌কাতরা হইতে যেমন নানাবিধ মনোমুগ্ধকারী রঙের আবিষ্কার, অপর দিকে সেইরূপ আল্‌কাতরা হইতে তির্য্যকপাতন দ্বারা যে সকল জিনিস পাওয়া যায় তাহার একটি পদার্থ হইতে স্যাকারিন্ (Saccharine) নামে এক অদ্ভুত মিষ্ট পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মিষ্টতা চিনি অপেক্ষা চারিশত পাঁচশত গুণ অধিক। কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে রাসায়নিক গবেষণার ফলে আল্‌কাতরা হইতে স্যাকারিনের মত মিষ্ট পদার্থ প্রস্তুত হইবে।

সোরা

বঙ্গদেশ নীলের জন্মস্থান; নীল ও সোরা বঙ্গদেশ হইতে ইউরোপে জাহাজ ভরিয়া চলিয়া যাইত। বিহারেও নীলের চাষ ও সোরা সংগ্রহ হইত, কিন্তু বাংলাতে সমধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এমন কি যাহারা গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সোরা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত, তাহারা "নুনিয়া" নামে আজও অভিহিত হইয়া থাকে; পরিষ্কৃত সোরাকে ইউরোপে "বাংলা সোরা" (Bengal Saltpetre) বলিত। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত চিলি দেশে প্রকৃতির লীলায় সমুদ্ভূত সোরাস্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় বঙ্গদেশের "নুনিয়ার" কার্য্য লোপ পাইয়াছে। এই চিলি দেশস্থ সোরাস্তরও (sodium nitrate) ডাক্তার এম্, ভার্‌গারার গণনায় ইংরাজি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নিঃশেষ হইবে। ভবিষ্যতে সোরা প্রস্তুত সহজে স্বল্পব্যয়ে কি উপায়ে করা যায় তজ্জন্য পাশ্চাত্য রসায়নজ্ঞগণ বহুদিন গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা দ্রব তীক্ষ্ণ ক্ষার (Caustic Alkali Solution) এবং বৈদ্যুতিক শক্তিবলে বায়ুমণ্ডলস্থ নেত্রজন* (Nitrogen) ও অক্ষজনের (১) (Oxygen) যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তৎসাহায্যে নর্‌ওয়ে দেশে ও জার্ম্মাণিতে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সোরা প্রস্তুত করিতেছেন। বিস্ফোরক পদার্থ এবং নাইট্রিক অম্ল প্রস্তুতার্থে ও ক্ষেত্রে সার দিবার জন্য সোরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং তাহা বিক্রয় করিয়া ঐ সকল দেশে প্রভূত অর্থাগম হইবে, সন্দেহ নাই।

নীল

বঙ্গদেশে নীল চাষের কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই; নীলের লীলা এখন ইতিহাসের গাথা—অতীতের কাহিনী। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের নীল, রেশম প্রভৃতি পারস্য, গ্রীস্, ইটালিতে রপ্তানি হইত। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতে নৌকুশলতার ইতিহাস" নামক মূল্যবান ইংরাজি গ্রন্থ আমাদিগকে অনেক বিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেছে।

* পাবনা উত্তর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

(১) জাতীয় শিক্ষা সমিতির রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিভাষা।

বোধ হয় ইংরাজি ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃকই নীল, রেশম প্রভৃতি সমধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু একটী কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের মত—যেমন আছি তেমনি অবস্থায় থাকিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তাহারা কতক সময় পরমুখাপেক্ষী হইলেও, নিজেদের অভাবের কথা তাহাদের মনে জাগরূক থাকে এবং তাহামোচনের নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তাহারা কাল বিলম্ব করেনা। বায়ার্, হয়মান্, হীমান্ প্রভৃতি মণীষিগণের গবেষণার ফলে আজ জার্ম্মানি নীলের একচ্ছত্র রাজা। বর্ত্তমান সময়ে আল্‌কাত্‌রা হইতে তির্য্যকপাতন প্রণালীতে (Distillation) প্রাপ্ত প্রদার্থ হইতে নীল প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির নীল প্রথমে বাজারে বাহির হয়; এই কয়েক বৎসর মধ্যেই বঙ্গদেশের নীল (Bengal Indigo) পূর্ব্ব হিসাবের অনুপাতে শত করা মাত্র চল্লিশ ভাগ উৎপন্ন হইতেছে; মূল্যও জার্ম্মানির কৃত্রিম রাসায়নিক নীল প্রচলনের পর পূর্ব্বমূল্যের এক তৃতীয়াংশ হইয়াছে। বাংলার উদ্ভিদজাত নীল আর প্রতিদ্বন্দিতায় পারিয়া উঠিতেছে না।

কর্পূর

পাশ্চাত্য জগৎ রসায়নের সাহায্যে যতটা সম্ভব, অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। কর্পূর জাপানের এক-চেটে সম্পত্তি ছিল বলিলেই চলে; সম্প্রতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রসায়নাগারে কর্পূর প্রস্তুত আরম্ভ হইতেছে; সুতরাং কর্পূর-বাণিজ্যে জাপানের একাধিপত্য বোধ হয় আর অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।

কৃষিকার্য্য

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মাটিতে যাহা জন্মে না, অন্য উপায় উদ্ভাবনে তাহারা সে অভাব মোচন করিয়া থাকে; কেবল তাহাই নহে নিজেদের অভাব পূরণ করিয়া তদ্বারা বিদেশ হইতে অর্থাগমেরও সংস্থান করে। আর আমরা মাটির উপর জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন মাটিই হইয়া যাইতেছি! কৃষিকার্য্যের প্রতি আমরা উদাসীন; আমাদের শিক্ষিত জনের বিবেচনায় যে, ওটা একটী নীচ কাজ, এবং ভাবনার বিষয় নহে—একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

রেশম

রেশমের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে; রেশমের চাষ রক্ষার জন্য রাজসাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু রেশম চাষ যে পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা আশা করা যায় না। সম্প্রতি কার্ডুনেট্, ক্রস্ এবং বীভান্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৃক্ষত্বক্ হইতে প্রাপ্ত পদার্থ কোষাত্মক্ (celulose) হইতে কৃত্রিম রেশম-সূত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদিও এখন তাহা বাজারে উপস্থিত হয় নাই, তথাপি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে জার্ম্মানির শর্করার ন্যায় এই

কৃত্রিম রেশম বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় প্রকৃত রেশমের সপিণ্ডকরণ সাধন করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিবে।

রবার ও চা

আর দুই একটী জিনিসের মাত্র উল্লেখ করিব, রবার ও চা। রবার ও চা বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইতেছে। প্রায় দিশ বৎসর হইল রসায়নাগারে রবার প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছিল। বিগত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে, পার্কিন ও ম্যাথিয়ুজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রবার প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; লণ্ডন সহরে যে রবার প্রস্তুত মানসে একটী যৌথ কারবার খোলা হইয়াছে সে সংবাদ আপনারা সংবাদ পত্র হইতে অবগত আছেন। সময় সাপেক্ষ হইলেও সুদূর সমুদ্রপার হইতে রাসায়নিক রবার বর্ত্তমান সময় হইতেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাবধান করিয়া দিতেছে—"এই আমি আসিতেছি।"

চা সম্বন্ধেও এইরূপ। পাশ্চাত্য দেশে বাঙ্গালা, আসাম ও সিংহল দ্বীপের চা অধিক মূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ লাভ অধিক দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চা-র মধ্যে কেফিন্, ট্যানিন্ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ যে পরিমাণে আছে, তাহার রসায়নিক সংমিশ্রণে কৃত্রিম চা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তবে আপাতত ইঙ্গিতে ভীত হইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

বঙ্গদেশ

জাতীয় উন্নতির সহিত ব্যবহারিক রসায়নের এবং রাসায়নিক গবেষণার কত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলাম। এখন বঙ্গদেশের উন্নত রাসায়নিক গবেষণা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ব্যবহারিক রসায়নে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রভৃত অভাব মোচন করিতেছে; এবং আপনারা সকলেই অবগত আছেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য। আয়ুর্ব্বেদ ও নব্যরসায়ন সম্বন্ধে কিছু দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, ও রাজসাহীতে রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন এরূপ রসায়নিক গবেষণার সার্থকতা কি? এ সাধনার সিদ্ধিই বা কোথায়?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার "বৈজ্ঞানিক জীবনীতে" মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণাকে উপলক্ষ্য করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "অনেকের বিশ্বাস যে বিশুদ্ধ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা ঘটি, বাটি, ছাতা, জুতা, কাচ, কাগজ প্রভৃতি প্রয়োজনীয়" দ্রব্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেন ছেলে মানুষ করিয়া

কি লাভ?" যাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিশুদ্ধ রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার উন্নতি না হইলে এই সকল "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কারের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীর কোনও কাজে আসিবে কি না—এ চিন্তা করিবার অবসর বৈজ্ঞানিকের নাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিকের গবেষণার উপর পৃথিবীর তাবৎ "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের উৎপত্তি নির্ভর করিতেছে। ফ্যারাডে যখন এতটুকু তরল ফ্লোরেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তী কালে তাঁহার প্রস্তুত তরল ফ্লোরেন শত সহস্র বোতল স্বর্ণের খনিতে ব্যবহৃত হইবে? ফ্যারাডের দূরদৃষ্টি কখনও দেখিতে পায় নাই যে তাঁহার আবিষ্কৃত বেঞ্জিন হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বিচিত্র বর্ণের শত শত প্রকার রং প্রস্তুত করিবে। ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক গবেষণার ফলস্বরূপ আজ বিশ্বে বিদ্যুৎ একটি পরমা শক্তি রূপে বিরাজ করিবে?" কে বলিবে বঙ্গদেশের রাসায়নিকগণের গবেষণা কালে বিবিধ "প্রয়োজনীয়" দ্রব্য প্রস্তুত কল্পেও সহায়তা করিবে না?

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী এম্, এ

নবজন্ম

দুখানি সুন্দর হাত কোমল করুণ,
বার বার স্পর্শ করি জাগাল অরুণ,
পাণ্ডুর কপোল 'পরে, আনিল প্রভাত,
সযতনে রজনীর মুছি অশ্রুপাত
মুদ্রিত কোরকপুটে মধু সঞ্চারিয়া
কুহক-গুঞ্জনে দিল নিখিল ভরিয়া!

দুটি আঁখি, দীপ্তি যার ছায়ায় কোমল,
শারদ-প্রভাত-সম স্নিগ্ধ সুবিমল
নীলিমার নিঃশেষ প্রসার, রশ্মি তারি
অভিষিক্ত প্রান্তরের অন্তর বিদারি
অযুত অঙ্কুরে দিল জন্ম অভিনব,
জাগে বিশ্বে শ্যামলের লীলার বিভব!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।



লীলা-তরঙ্গ

জন্মাষ্টমী

বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,
বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্নভিন্ন মেঘে ;
অন্ধ-করা অন্ধকারে বদ্ধ দৃষ্টি, যামিনী গহন,
বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আছাড়িছে বেগে।

লুপ্ত যত গতিপথ ভরা বরষার অশ্রুধারে,
জাগে উপবাসী চিত্ত বিশ্বাসের বিত্ত বুকে করি',—
গতিহীন মুক্তিহীন প্রব্যথিত শৃঙ্খলের ভারে,—
আনন্দের নাহি লেশ, জাগি' তবু যামিছে শর্ব্বরী।

এলে কি এলে কি ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর ?
মধু-দৈত্য অধিকারে মোহ-ঘেরা মধুরা নগরে ?
প্রাচীরের হের ফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,—
তা' সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ ক'রে ?

এলে কি আনন্দরূপ ! পুলকিয়া সুপ্ত নীপবন
ফণীফণা-ছত্রশিরে শান্ত শিশু আনন্দে-নির্ভয় !
রাখালেরে কোল দিতে আচারীর নাশিতে পারণ
এস তুমি দর্পহারী ! এস প্রেমী ! এস সর্ব্বজয় !

এস আলো-করা কালো ! এস ফিরে কালিন্দীর কূলে,
বাজাও মুরলী তব,—যমুনা উজান যাহে বয়,—
এস রাস-নৃত্যে ফিরে দোলে দুলে ঝুলনায় ঝুলে
এস তুমি হে কিশোর ! রিক্ত শাখে এস কিশলয় !

এস ইন্দ্র-অর্ঘ্য-হারী ! নব বেদ কর উচ্চারণ !
নিয়ম-দারুণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয় ;
ভয়-পাণ্ডু পাণ্ডবের এস বন্ধু ! এস জনার্দ্দন !
এস পাঞ্চজন্যধারী কংসের বংশের চিরভয়।

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে জাগে দেশ তব প্রতীক্ষায়,
তব জন্মতিথি-দিনে কীর্ত্তনি' তোমার কীর্ত্তিকথা ;
এলে কি বিচিত্রকর্ম্মা! পুনরায় এলে কি ধরায় ?
জরাভরা ভারতের চিত্তবাসী চির-তরুণতা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্যোতিঃহারা

(গল্প)

সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির ম্লান আলোটুকু সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে তখনও নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই। রমানাথ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়াই পীড়িতা স্ত্রীর বিছানার উপর বসিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল, "শুন্‌চ, আজ একটা ভাল খপর আছে।" রোগী দ্বারের দিকে পিছন করিয়া শুইয়াছিল; স্বামীর সাগ্রহ আহ্বানে মুহূর্ত্তে পাশ ফিরিয়া কহিল, "থিয়েটারে বইখানা নিলে বুঝি ?"

তখন বর্ষা কাটিয়া শীত সবে-মাত্র পড়ি' পড়ি' করিতেছিল। লেপ না সহিলেও গায়ে কাপড় রাখিতে হয়। পথে চলিতে সাদা কালো সবুজ রাঙ্গা ডুরে চেক্ নানা রঙ্গের নানা আকারের গরম কাপড় দৃষ্ট হয়। রমানাথের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে চুলগুলা জড়াইয়া গিয়াছিল। আরক্ত মুখ ও উদ্বেলিত বক্ষের দ্রুত স্পন্দন তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। পত্নীর ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতখানি আপনার কম্পিত হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, "নিয়েচে ত বটেই। তা-ছাড়া জান, ইলা, তারা বলেছে, এই হপ্তা থেকেই রিহার্সাল সুরু হবে। তিন হপ্তার মধ্যেই অভিনয়।" ক্ষয় রোগের নিষ্ঠুর চিহ্ন-অঙ্কিত পত্নীর পাণ্ডু মুখ ও দীপ্ত চক্ষুর পানে সুগভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া রমানাথ পুনরায় কহিল, "তারা কি দেবে, জান ? নগদ দু'শ টাকা! যে রাত্রে প্লে হবে, সেই রাত্রেই টাকা পাওয়া যাবে। আর তার পরদিনই সকালের গাড়ীতে তোমায় নিয়ে মধুপুর চলে যাব।—শুনেচ ত, ডাক্তার বলেচেন, একটু বলকারক পথ্য আর ভালো হাওয়া,—এই পেলেই তুমি সেরে উঠ্‌বে। দু'শ টাকায় এখানকার সমস্ত দেনা মিটিয়ে দিলেও আমাদের হাতে যথেষ্ট কিছু থাক্‌বে।"

স্বামীর স্নেহাবনত দৃষ্টির সহিত আপনার আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টি মিলাইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ইলা কহিল, "কি বললে তারা? খুব ভাল হয়েচে, বললে ত? আমি ত বলেইছিলুম,দেখ্‌লে নিশ্চয় নেবে—অমন লেখা নেবে না, আবার ?" গর্ব্বে ইলার অধর-ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছিল। ঈষৎ নত হইয়া রমানাথ স্ত্রীর জ্বর-তপ্ত ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "লোকের চোখ যে তোমার চোখ নয়—ইলা, তাই না ভয় পাই, সাহস করে এগুতে পারি না—পাছে লোকে মনে করে, এই ত লেখা,—বের করাই ধৃষ্টতা ! এরও আবার দাম চায় !—আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে, ভরসা হচ্ছে, ইলা, আবার তোমায় ভাল করে তুল্‌তে পার্‌ব।" ইলার নেত্র-পল্লবে যে জলের রেখা দেখা দিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য সে কথা সে ফিরাইল, কহিল, "পাওনাদার কি এলে বলো, এবার তাদের টাকা তুমি বাগিয়েই শুধে দেবে !"

রমানাথ কহিল, "ঠিক বলেছ, ইলা।"

আজই প্রত্যূষে আসিয়া পাওনাদারের দল বাড়ী-চড়াও হইয়া রমানাথকে যখন কঠিন কথার বাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছিল, এবং রমানাথ স্বপক্ষে বলিবার একটি কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ছল-ছল ম্লান নেত্রে নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়াছিল—ইলা তখন কোন মতে দেওয়াল ধরিয়া আসিয়া উপরের দালানে জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিয়াছিল ! নিরুপায় স্বামীর সে বিবর্ণ পাণ্ডু মুখে বেদনার যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ইলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কি সে দুর্ভাগিনী ! স্বামীর কষ্টের এতটুকু লাঘব করিবার সামর্থ্য তাহার নাই, শুধুই রোগের পশরা লইয়া অনর্থক স্বামীর পায়ে শৃঙ্খল হইয়া সে আঁটিয়া রহিয়াছে ! তাহার প্রাণ দিলেও যদি পাওনাদারের ঋণ শোধ হয়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে আপনার এই প্রাণখানাকে বলি দিয়া স্বামীকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দিয়া জুড়াইয়া যাচে !

ইলার বুকে বেদনাটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল—মুখে তাহার কোন কথা ফুটিল না। ইলার সে ভাব রমানাথ লক্ষ্য করিল।

তাড়াতাড়ি সে কোটের পকেট হইতে একশিশি ঔষধ ও একটি ডালিম বাহির করিল। ইলার চক্ষু বাধা মানিল না—জলে ভরিয়া উঠিল। হতভাগিনী সে! তাহারই জন্য স্বামীর অর্থ এবং চাকুরী সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বামী নিজে পেটে না খাইয়া গায়ের আলোয়ানখানি এমন কি ঘটী-বাটিপর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্ত্রীর রোগের ঔষধ-পথ্য ও ডাক্তারের ভিজিট সমানে যোগাইয়া আসিতেছেন। সে কথা তিনি কোন দিন মুখে আনেন নাই, বটে! কিন্তু সে ত সব জানে! স্বামীর কোন উপকারেই সে লাগিল না—কেবল তাঁহাকে দুঃখ দিবার জন্যই যেন তাহার জন্ম হইয়াছিল!

২

চিরদিন কখনও সমান যায় না, এই প্রবাদ-বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, রমানাথ। তাহার পিতা কৃষ্ণধনের তিনচারিখানি কাপড়ের দোকান, লোহার কারবার—সহরে যথেষ্ট নাম। শৈশবের আট বৎসর পরম সুখে কাটাইয়া রমানাথ মাতৃহীন হইল এবং মাসখানেকের মধ্যেই এক অপরিচিতা বালিকা তাহার মাতার শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দপ্তমুণ্ডেরও কর্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া বসিল। বিমাতার বয়স অল্প; রমানাথের চেয়ে তিন চারি বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায় সপত্নী-পুত্রকে সে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া ছিল। বাপ-মায়ের

আদুরে ছেলে রমানাথ শরীরের যত্ন করিতে জানিত না, কাজ কর্ম্ম কিছুই শিখে নাই—বিমাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহার এই সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষালন করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। পড়া-শুনায় রমানাথের মন ছিল না, পাঠ্য পুস্তকের অস্তিত্বে প্রায়ই তাহাকে সন্দিহান থাকিতে হইত। অর্থের এরূপ অযথা অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যান—এরূপ অমিতব্যয়িতার প্রশ্রয় দিয়া পুত্রের মস্তক-ভক্ষণরূপ শত্রুতা সাধন ত আর তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে! অগত্যা লেখাপড়ার দায় এড়াইয়া রমানাথ পথে পথে ডাণ্ডাগুলি খেলিয়া বেড়াইতে সুরু করিল। ব্যবসায়ী লোক কৃষ্ণধন ছেলের সামান্য জমাখরচ বোধ হইলেই খুসী হইতেন, যখন শুনিলেন, ছেলের পড়ায় আদৌ মন নাই, সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ছেলেটা মানুষ হলো না! আমি চোখ বুজলেই দেখ্‌ছি এত বড় কারবারটা মাটি হয়ে যাবে—হরি হে দয়াময়!" কৃষ্ণধনের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক নিকুঞ্জবিহারী দিদির নিকটে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেছিল; এবং কৃষ্ণধনের অবর্ত্তমানে কারবারটা যে মাটি হইয়া যাইবে না, ভগিনী ও ভগিনী-পতির মনে এমন ভরসাও উদ্রেক করিয়া তুলিতে সে ত্রুটি রাখে নাই।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—রমানাথেরও দিন কাটিতে ছিল—তাহার অনেকগুলি ছোট ছোট ভাই-ভগিনী হইয়াছিল। রমানাথ তাহাদের কোলে পিঠে করিয়া বেড়ায়—অবসরমত নিকুঞ্জের পরিত্যক্ত বইগুলা নাড়িয়া দেখে। বয়সের সহিত পাঠেও তাহার অনুরাগ জন্মিতেছিল—ক্রমে সে দেখিল, পাঠে আনন্দ আছে! কালির আঁচড়গুলা দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মত একান্তই অলঙ্ঘনীয় নহে, প্রবেশ ও নির্গমের সুন্দর বর্ত্ম ও বিদ্যমান আছে। নূতন লেখার অনেকগুলা বাঙ্গলা নভেল সে পড়িয়া ফেলিল—আর এই নভেল-সংগ্রহের সূত্রে তাহার এক কবি বন্ধুও জুটিয়া গেল। তাহারই সংসর্গে পড়িয়া রমানাথের কবি ও লেখক হইবার সাধ হইল। লুকাইয়া সে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ লবঙ্গলতার চক্ষে একখানা কবিতার কাগজ একদিন পড়িয়া গেল। লবঙ্গ লেখা-পড়া জানিত—সে পড়িয়া দেখিল, কবিতাটা প্রণয়িনীর উদ্দেশে লিখিত—

প্রথম যেদিন দেখা তোমায়-আমায়,—
মনে পড়ে সে দিনের কথা।
কি আলোক, কি পুলক ভ'রে ছিল বুকে,
কত আকুলতা!
মনে পড়ে, বসন্তের জ্যোৎস্না যামিনী,
ঢেলেছিল কি মধু কিরণ!
মনে পড়ে, বাতাসের কত আনাগোনা,
লুটি ফুল-বন!
আজ আছে জ্যোৎস্না-নিশি, আজও সে বাতাস
পরশিয়া বহিছে তেমনি!
আজও আছি তুমি-আমি, শুধু মাঝে নাই,
সেদিনের সেই প্রাণখানি!

কবিতা পড়িয়া লবঙ্গ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া রহিল। এত-বড় ব্যাপারটা গোপন রাখিয়া ছেলের সর্ব্বনাশের পথ সুগম করিয়া দেওয়া কিছু মায়ের কর্ত্তব্য নহে, কাজেই কথাটা কর্ত্তার কানে উঠিল। ব্যাপার শুনিয়া কৃষ্ণধন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন—পুত্রকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়া অচিরে এক দরিদ্রা বিধবার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। পিতার তিরস্কারের অর্থ সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও রমানাথ বুঝিল, নভেল বা কবিতা লেখা তাঁহার মনঃপূত নহে। রমানাথ লেখা ছাড়িল না; সতর্ক হইল মাত্র।

৩

এই সময় কৃষ্ণধন আবার পীড়ায় ভুগিতেছিল। অনেক চিকিৎসা হইল, কিন্তু ফল কিছু হইল না। ইহলোকের সহিত একদিন সকল সম্পর্ক তিনি চুকাইয়া বসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রমানাথ শুনিল, তিনি বিষয়-সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যান নাই, বাড়ীখানা লবঙ্গলতার নামে উইল হইয়াছে—কারবার ফেল হইতেছিল; নিকুঞ্জ নিজ-অর্থ দিয়া তাহা খরিদ করিয়াছে। বিমাতা অচিরেই বাড়ী ভাড়া দিয়া পুত্র-কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। অগত্যা রমানাথকে বলিতে হইল, তুমি আপনার পথ দেখ।

রমানাথ আপত্তি করিল না। রমানাথের স্ত্রী ইলার মায়ের কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছিল। সংসারে তাহারও আর কেহ নাই! সম-বেদনাতুর দুইটি চিত্ত তাই অতি-সহজে এক হইয়া গেল। কৃষ্ণধনের এক বন্ধু রমানাথকে কলিকাতায় এক সওদাগরি অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া দিলেন। রমানাথ ইলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। প্রথম দুই বৎসর বড় সুখেই কাটিয়াছিল। এমন সুখ রমানাথের জীবনে তাহার মাতৃবিয়োগের পর আর কখনও ঘটে নাই।

রমানাথ খাটিয়া পয়সা আনে, ইলা প্রাণপণে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা করে। অনেক সময় অবসর পাইলেই রমানাথ নাটক লেখে, ইলা অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে শতমুখে তাহার প্রশংসা করে। ছাপার পয়সার অভাব, তাই বই ছাপান হয় না—নতুবা ইলার বিশ্বাস ছিল, যে এ-সব বই যদি ছাপা হইয়া একবার দোকানে প্রবেশাধিকার পায়, তাহা হইলে দুই দিনেই সমস্ত বই নিঃশেষ হইয়া যায়; তখন যোগান দেওয়াই দায় হইয়া উঠিবে।

তারপর হঠাৎ একদিন ইলার শরীরে ক্ষয় রোগ দেখা দিল। অল্প আয়, গরিবের অত কেন—ভাবিয়া প্রথম প্রথম সে রোগ গোপন করিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিত। ফলে রোগ বাড়িয়া গেল, রমানাথ জানিতে পারিল। সে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা সুরু করিল। শেষে এমন হইল, কামাইয়ের জন্য তাহার চাকুরীটি খোয়া গেল। ঘরের জিনিষ পত্র বেচিয়া কিছুদিন কাটিল। ইলা কহিল, "তোমার দু-একখানা নাটক থিয়েটারে দাও—ওরা খুব পছন্দ করবে।" রমানাথ হাসিল। লিখিত যে শুধু আত্ম-তৃপ্তির জন্য, সাধারণে প্রকাশ করিবার সাহস তাহার ছিল না। ইলার উৎসাহে অনেক হাঁটাহাঁটির পর, শেষ ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে দুইশত টাকায় "জ্যোতিঃহারা" নাটকখানি তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। রমানাথ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইলা আনন্দে মধুপুর যাইবার দিন গণিতে লাগিল।

নাটকের রিহার্সাল দেখিবার জন্য ম্যানেজার-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রমানাথকে

কিছুদিন হইতে থিয়েটারে যাইতে হইতেছিল। নাটকখানা ম্যানেজারের ভারি পছন্দ হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও বেশ দক্ষতার সহিত রিহার্সাল দিতেছে। কয় দিনেই রমানাথের সেখানে বেশ একটু খাতির জমিয়া গিয়াছিল। ম্যানেজার প্রায়ই তাঁহাকে থিয়েটার দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। ইচ্ছা থাকিলেও রমানাথ সে কথা রাখিতে সাহস করে না। বাসায় ইলা একা। তাহার জ্বরটাও কয়দিন হইতে আবার বাড়ের মুখে চলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই সে কেমন আচ্ছন্ন-মত থাকে। রমানাথের মনে হয়, তাহার "জ্যোতিঃহারা" নাটকের অভিনয়ের ঈপ্সিত রাত্রির মধ্যকার এই দিন কয়টাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া যদি সরাইয়া ফেলা যাইত! স্বামী-স্ত্রীতে অনেক সময় এই কথারই আলোচনা হয়। টাকাটা হাতে পাইলেই এখানকার দেনাপত্র মিটাইয়া দিয়া সেই দিনই তাহারা কাশী যাইবে। ইলা কহিল, "মধুপুরের বাংলার ভাড়া বড় বেশী। তা ছাড়া সেখানে কিই বা দেখবার শোন্‌বার আছে? তার চেয়ে কাশী ভাল। বাড়ীও সস্তা, ঠাকুর-দেবতাও আছেন। আর যদি মর্‌তেই হয়, কাশীতে মলে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে স্থান পাব। তারকব্রহ্ম-নামে শিব স্বয়ং যেখানে মুক্তিদাতা—সেস্থান ছেড়ে পাহাড়ে অগঙ্গা দেশে না যাওয়াই ভাল।"

রমানাথ তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া কথা থামাইয়া দুই সজল ভৎর্সনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল, "ইলা, ফের ঐ সব কথা কইচ! তুমি জান, তুমি না বাঁচ্‌লে আমিও বাঁচ্‌ব না। বাঁচ্‌তে পারব না!" গভীর সুখে ইলার ক্ষুদ্র হাতখানি কূলে-কূলে ভরিয়া উপছিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সজল চোখে সপ্রেম দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া সে কহিল, "তোমায় ছেড়ে স্বর্গে যেতেও আমার ইচ্ছা করে, না। মনে হয় আমি না থাকলে তোমার কত কষ্ট হবে, তবু তোমার কোন উপকারে কোন সেবাতেই লাগলুম না। আমার জন্যই তোমার যত কষ্ট—" বাধা দিয়া রমানাথ তাহাকে আদর করিয়া ভুলাইবার অন্য কথা পাড়িল।

কাশীতে ইলার এক মাসিমা আছেন। তিনি বিধবা কাশী-বাসিনী। বিবাহের পূর্ব্বে ইলা একবার মায়ের সহিত তাঁহার কাছে গিয়াছিল—তাই কাশীর বিষয়ে তাহার অনেকখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। ইলা কহিল, "মাসিমাকে লিখে দাও, তিনি আমাদের জন্যে ছোট-খাট দেখে বাড়ী কি ঘর ভাড়া করে রাখ্‌বেন। বাঙ্গালীটোলা বড় ঘেঞ্জি আর নোংরা। অসির দিকেই ভাল। ওদিকের গঙ্গার জল যেন কাঁচের মত। চক্‌চকে, নীল জল! কি চমৎকার দেখতে! কত সাধু সন্ন্যাসী ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করে পথে চলেন! কেমন সব গঙ্গায় স্নান করে স্তব পাঠ করেন,—কত ভালই লাগত! তেমন করে আর কি চলে বেড়াতে পারব, না, গঙ্গায় নাইতে পারব—" তাহার করুণ কণ্ঠে বিষাদের ঝঙ্কার হাসির মধ্যে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

রমানাথ তাহার তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলায় সস্নেহভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, "পার্‌বে বই কি,—নিশ্চয় পার্‌বে—ডাক্তার বলেছেন, হাওয়া বদলালে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাবে। জ্যোতিঃহারার টাকা ক'টা পেলেই তোমায় আমি খাড়া করে তুল্‌ব, ইলা। এ ক'টা দিন কোন মতে চোখ বুজে কাটিয়ে দাও।"

নূতন স্বাস্থ্যলাভে ইলার শীর্ণ দেহখানি বর্ষা কালের ভরা নদীর ন্যায় কেমন কূলে কূলে পূর্ণতায় ভরিয়া উঠিবে, নব বসন্তাগমে শীতজীর্ণা লতিকার দেহ আবার কেমন করিয়া নবমুঞ্জরিত পত্র-পুষ্পে শোভা সম্পদে উদ্ভাসিত হইবে, কল্পনা-নেত্রে কবি রমানাথ তাহারই একটা মোহিনী ছবি আঁকিয়া তুলিতেছিল। তাহার ভাব-প্রবণ তরুণ হৃদয় সহজে নিরাশ হইতে চাহে না—অমঙ্গলকে অন্ধকারে সরাইয়া মঙ্গলের উজ্জ্বল মূর্ত্তিকেই সে পূর্ণ বিশ্বাসের বলে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছিল। ইলাকে ভাল হইতে হইবে—নহিলে যে তাহার পক্ষে জীবন-ধারণ একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে!

৪

একটানা জীবন-স্রোতে নূতনত্বের সম্ভাবনায় কিছুদিন হইতে ইলার শরীর একটু ভাল মনে হইতেছিল—কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না।

জ্বর প্রত্যহই হইতেছিল। ক্ষীণ দেহ ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া বিছানায় মিলাইয়া আসিতেছে! রমানাথ তাহা লক্ষ্য করিতেছিল—তবু সে আশা ছাড়িতে পারে নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন, "বায়ু পরিবর্ত্তনই ঔষধ।" স্নেহান্ধ স্বামী সে কথার অর্থ বোধ করিতে পারিল না। রোগ যে এখন চিকিৎসার অতীত হইয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে! জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, অবশেষে শেষ সুখটুকু, তাহার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র অবলম্বন, ইলা! সেই ইলাও যদি ঝটকাচ্যুত নীড়টুকুর ন্যায় একদিন ঝোড়ো বাতাসে খসিয়া পড়ে, তবে তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে! তাহারই মুখ চাহিয়া যে সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তৈলাভাবে গ্যাস পোষ্টের নীচে বসিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া নাটক লেখে; আর তাহারই উৎসাহ-বাক্যে, তাহারই মিষ্ট হাসিতে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, বাঁচিয়া মানুষ হইবার তাহার সাধ জন্মায়! এই নাটক-প্রকাশেরই জন্য প্রত্যেক থিয়েটারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত লাঞ্ছনা, কত অপমান তাহাকে সহিতে হইয়াছে! শুধু ইলার মুখ চাহিয়াই সে-সব সে সহ্য করিয়াছে। অবশেষে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের ম্যানেজারের চোখে তাহার জ্যোতিঃহারার আদর হইয়াছে। টাকা অগ্রিম দিবার কথা ছিল না। সে কথা তুলিলে ম্যানেজার পাছে বই ফেরত দেন, সেও তাই সাহস করিয়া সে কথা কহিতে পারে নাই। এমন দিন ছিল, যখন পুস্তকের প্রকাশ ও প্রশংসা-লাভই তাহার কাম্য ছিল, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই! পুস্তকের সুখ্যাতি বা নিন্দায় কিছুই যায় আসে না! প্রকাশেও কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই! এখন চাই শুধু পয়সা,—যে পয়সার অভাবে তাহার ইলা-বিনা চিকিৎসায় চলিয়া যাইতেছে, আগে সেই পয়সা চাই! তাই রমানাথ কোন সর্ত্তে প্রতিবাদ করিল না।

৫

ইলা কহিল,"থিয়েটারে যাবে না! সে কি হয়? যেতে হবে তোমায়—বাঃ, কত কষ্ট করে লিখ্‌লে, সবাই দেখ্‌বে, খালি তুমিই দেখ্‌বে না! না,—সে হবে না!"

সারা কলিকাতা নগরী যে নূতন নাটক "জ্যোতিঃহারা"-প্রণেতা রমানাথের নামাঙ্কিত প্লাকার্ড মালা বক্ষে ধরিয়া সহর বাসীর-চিত্তকে কৌতূহলে রঙ্গালয়ের পানে আকর্ষণ করিতে ছিল—সেই রমানাথের নিজের মনে যে সেই ঈপ্সিত রজনীর ঈপ্সিত দৃশ্যাবলীর প্রতি কোনই আকর্ষণ ছিল না, তাহা নহে। তবু সে ইলাকে একা রাখিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা মনে আনিতেও সাহস করিল না। সে কহিল, না, সে যাইবে না।

ইলা শীর্ণ ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা ফুটাইয়া কহিল, "বাঃ—তা কি হয়! আমি দেখব না, তুমি দেখ্‌বে না, সে হবে না। তোমায় দেখতেই হবে। তোমার চোখে আমি দেখব। যেতে তোমায় হবেই।" আনন্দ ও উদ্বেগে ইলার স্বর কাঁপিতেছিল। স্বামীর বিজয়গর্ব্বে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে ব্যর্থতার এতটুকুও স্থান ছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম আকাশের শেষ রক্তআভা জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষুর শেষ হাসিটুকুর মতই একবার উজ্জ্বল হইয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। রমানাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

শনিবার। সেদিন সন্ধ্যায় মেঘেও বিস্তৃত আয়োজন। বাতাস বেগে বহিতেছিল। ঘনপুঞ্জ মেঘরাশির মধ্য দিয়া ম্লান জ্যোৎস্না ইলার ঘরে অর্দ্ধমুক্ত গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিতেছিল। প্রদীপ জ্বালা হয় নাই, তৈলাভাব। রমানাথ ঘরে ঢুকিয়াই মৃদু স্বরে কহিল, "ইলা, ঘুমুচ্চ!"

ইলা ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল, কহিল, "না, কৈ তোমার কোট দেখি।"

রমানাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া কহিল, "পথে যেতে যেতে ভেবে দেখ্‌লুম, কোটের দরকার হবে না। ঘড়া বেচে কোট গায়ে দেব? ছিঃ! আর তা-ছাড়া লোকে দেখ্‌তে আস্‌বে, জ্যোতিঃহারার নায়ক-নায়িকাদের। তাদের আমি কোন দারিদ্র্য বা অভাবের দুঃখ এতটুকু জান্‌তে দিই নি, ইলা। খুব জমকালো পোষাকই তারা পর্‌বে। গ্রন্থকারের জামা থাক্ বা না থাক্, তার জন্য থিয়েটারে দর্শকদের কোন ক্ষতি হবে না। তার পর জামা কিনলে ছেঁড়া জুতোটা, ময়লা কাপড় খানা, তালি-লাগান র‍্যাপারটা—সবাই মিলে তাদের দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি আর চেপে রাখ্‌তে পারবে না। তার চেয়ে ওদের না ঘাঁটানোই ভাল মনে করে সেই টাকাটায় দু'শিশি গ্রেপজুস্ কিনে আন্‌লুম। কাল সকালেই আমরা কাশী যাব। পথে তোমার দরকার হবে।"

ঘরে আলো ছিল না। মেঘান্তরালে ম্লান জ্যোৎস্না ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। রমানাথের হাতের উপর দুই ফোঁটা তপ্ত জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিতভাবে সে কহিল, "ইলা, কাঁদ্‌চ! আমি কি কষ্ট দিলুম!"

হাত দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিয়া

স্বামীর হাতখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ইলা কহিল, "না, না, কষ্ট বলো না। বড় আনন্দ পাই। তোমার ভালবাসা আমায় সেখানে গিয়েও শান্তি দেবে। দুঃখ এই, এত স্নেহের কোন দিনই আমি যোগ্য হলুম না।"

"ইলা, ফের ঐ কথা! তুমি আমায় করতে চাও কি—?" রমানাথের গম্ভীর কণ্ঠে ব্যথিত ভর্ৎসনা ফুটিয়া উঠিল। ইলা হাসিল—অন্ধকারে রমানাথ সে হাসি দেখিতে পাইল না, দেখিলে ভয় পাইত। কত করুণ, কত নৈরাশ্যময় সে ম্লান হাসিটুকু! ইলা কহিল, "আচ্ছা, আর কখনও বল্‌ব না—বল, আমার সব দোষ, সব অপরাধ আজ ক্ষমা কর্‌লে!" রমানাথ নত হইয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে মৃদু চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "তাই বললে যদি তুমি সুখী হও, তবে বলছি,—করলুম! কিন্তু অপরাধ তোমার কি, ইলা?

অদূরে ঘোষালদের বাড়ীর বড় ঘড়িটায় আট্‌টার ঘা বাজিয়া গেল। ইলা তাড়া দিয়া কহিল, "যাও, দেরি করো না। আরম্ভ হয়ে যাবে যে।"

এত দিনের এত সাধের জ্যোতিঃহারার অভিনয়, তবু উঠিতে রমানাথের মোটেই মন সরিতে ছিলনা। যশঃ-প্রার্থী লেখকের নৈরাশ্যের আশঙ্কা-জনিত এ কুণ্ঠা নহে, অতিরিক্ত আনন্দের অবসাদও তাহাকে বিচলিত করে নাই—সে যেন কোন্ অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা অনুভব করিতেছিল। অলস কণ্ঠে সে কহিল, "থাক্ ইলা। আজ আমার একটুও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অন্যদিন তখন যাব।"

ইলা সকৌতুক হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই বই কি—আমি একলা থাক্‌ব, তাই ছুতো হচ্চে! ওগো, না গো, না, ভয় করো না। সত্যি তোমাকে যেতে হবে। দেখে এসে আমায় সব বলো।"

অনেক বাদানুবাদের পর ইলার কথাই রহিল—সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক চিত্তে মৃদু গতিতে সহস্রবার ইলাকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া রমানাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে মহা-সমারোহে সে রাত্রে "জ্যোতিঃহারা" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। দর্শকের দল অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে থিয়েটার দেখিতেছিল। মুখে মুখে এই অশ্রুতনামা নূতন নাট্যকারের প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি বক্সে উপবিষ্ট রমানাথের কানে ভাসিয়া আসিয়া তাহার উদ্বেলিত চিত্তে দোলা দিয়া যাইতেও বিরত ছিল না। মেঘমুক্ত রবিরশ্মির ন্যায় তাহার যশঃরশ্মি বুঝি এইবার উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! নাটক লিখিয়া সে নাম কিনিবে, বিমুখ ভাগ্য-লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবে! সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ, বিধাতা-লিখিত নাটকে মানব-ভাগ্যের ইহাই চিরন্তন বিধান! চক্রনেমির চক্র বুঝি এবার ঘুরিয়া চলিয়াছে! রমানাথের প্রস্তরাচ্ছাদিত ললাট-তলের শিলাখণ্ডও বুঝি এবার খসিয়া পড়ে! অদৃষ্টাকাশের কালো মেঘগুলা অনুকূল বাতাসে

উড়িয়া গিয়া বুঝি-বা আবার নীল-নির্ম্মল আকাশ প্রকাশ পায়! ইলাকে বাঁচাইবার উপায় হইয়াছে! রাত্রি-প্রভাতেই তাহারা কাশী চলিয়া যাইবে। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাবলীর পানে রমানাথ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন সেখানে ছিল না। সে দেখিতেছিল, সেই অন্ধকার কক্ষে রুগ্ন-শয্যাশায়িনী ইলাকে! সহসা তাহার চোখের সম্মুখে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! রমানাথ দেখিল, সম্মুখে নদী—নদীতে চন্দ্রচ্ছায়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! নদীতীরে ধূ-ধূ বালু—সে বালুরাশির শেষ নাই! নদীরও পারাপার নাই! গাছ-পালা নাই! নদীতে বালুতে আকাশে মিশিয়া সব এক হইয়া গিয়াছে! রমানাথ সেই নদীতীরে বালুকা-সৈকতে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে—আর ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় আলোক-গোলকের মধ্যে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ইলা। ইলা বলিতেছে, "এই দেখ, আমি আরাম হইয়া গিয়াছি—রোগের যন্ত্রণা দারিদ্র্যের দুখ আর আমায় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—এখানে স্নেহ প্রেম ভালবাসা সকলই আছে! শুধু কামনা নাই, নিরাশা নাই, প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সন্দেহ নাই, চাঞ্চল্য নাই! স্বচ্ছসলিলা তটিনীর মতই এ প্রেম পরিপূর্ণ! তুমি আসিবে কি?"

রমানাথের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া সে দেখিল, গভীর কোলাহলে "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" শব্দের সহিত পতিত ড্রপ্‌সিন্ খানা আবার শূন্যে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমানাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতে ছিল। ম্যানেজার আসিয়া তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিলেন, কহিলেন, "অনেকগুলি বড়লোক আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান্। বই-খানার একরাত্রেই আশ্চর্য্য নাম হয়ে গেল, মশায়—এমন মণিকে কি না খনির গর্ভে লুকিয়ে রেখেছিলেন?" রমানাথের ব্যাকুল চিত্ত সেই অন্ধকার কক্ষে একখানি রুগ্ন মুখের কাছে তখন ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল! তবু শিষ্টতা-রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া দুই পাঁচ জনের সহিত দুই একটা কথা কহিতে হইল। কহিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

অন্ধকার কক্ষে দাঁড়াইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে সে ডাকিল, "ইলা!" কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রোগীর ঘুম ভাঙ্গানো যে অনুচিত, সে কথা উদ্বেগে যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। ইলার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে সে অগ্রসর হইল। কেহ উত্তর দিল না। রমানাথ সহসা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আনন্দে আশায় ভয়ের কোন কথাই তাহার মনে হয় নাই—ইলা ত এমন গাঢ় ঘুম কখনও ঘুমায় না। যখন ভাল ছিল, তখনও নয়।

কাছে গিয়া ইলার গায়ে মাথায় হাত দিয়া রমানাথ দেখিল, কপাল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে। তাহারও কপাল বহিয়া ঘাম ঝরিতেছিল, হাত পা ঠাণ্ডা অবশ হইয়া আসিতেছিল। তাড়াতাড়ি জানালাটা সে খুলিয়া ফেলিল। ভোরের আলো ইলার বিবর্ণ ম্লান মুখে, মুদ্রিত চোখে, শীর্ণ অধরে ছড়াইয়া পড়িল। শুকতারা নিষ্প্রভ হইয়া ঊষার আরক্ত আলোক-আস্তরণের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভোরের

পাখীগুলা জাগিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ইলার মৃদু নিশ্বাসের ন্যায়ই তাহাকে ঘেরিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল। রমানাথ বিছানায় বসিয়া দুই বাহুর দৃঢ়-নিবিড় বেষ্টনে ইলাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার হিম-শীতল কপোল-তলে কপোল রাখিয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্যের ন্যায় ডাকিল, "ইলা—ইলা।" তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতায় সে ইলার ঘুম ভাঙাইতে, অথবা তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চাহিতেছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না।

শ্রীসুরূপা দেবী।

মধ্যযুগের ভারত

(Mazeliere-এর ফরাসী হইতে)

শেষ কথা

নবম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে, ভারতে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহার ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে সংসাধিত হয় নাই, পরন্তু য়ুরোপের মত দ্রুতভাবেই সংসাধিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ভারতবাসীর মধ্যে পঞ্চমাংশ মুসলমান; এবং হিন্দু-ধর্ম্ম, দুই বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম, ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রভাব। ভারতবর্ষ তখন আর বিশ্বব্রহ্মবাদী নহে। কতকগুলি পণ্ডিত ছাড়া কোন হিন্দু, জীবের সহিত জীবের স্রষ্টাকে একীভূত করে না। এবং ভারত তখন আর প্রকৃতভাবে পৌত্তলিকও নহে। ব্রাহ্মণেরা, শিক্ষিত লোকেরা, দেবমূর্ত্তিগুলিকে সাংকেতিক রূপ বলিয়া—বিগ্রহ বলিয়া মনে করে। জনসাধারণও, ভগবান ও ভগবানের মূর্ত্তি—এই দুয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং ভারত তখন আর ততটা বহুদেববাদীও নহে। অনেকে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করে, এবং আরও অনেকে, বিভিন্ন দেবতাকে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে, এবং সকলেই, এক দেবতা অন্য সমস্ত দেবতার উপরে অধিষ্ঠিত এইরূপ বিশ্বাস করে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব আরও স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত "দেবপ্রসাদের" (grace) মতবাদটিতে ঐ প্রভাবের কার্য্য বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। ভারতীয় দেবতারা ক্রুদ্ধ দেবতা ছিলেন। পরিশেষে এক দয়াময় দেবতা আবির্ভূত হইলেন, তিনি অভিসম্পাত না করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; এবং আরাধনার পরিবর্ত্তে তিনি ভক্তদিগের নিকট হইতে প্রেম চাহিলেন।

সমগ্র ভারত একটি রাষ্ট্র। এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার

মধ্যেও, এই একতার ভাবটি অন্তর্হিত হয় নাই। রাজকর্ম্মচারীগণ যখন রাজা হইল তখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-উপাধি "নিজাম" ও "নবাব" বজায় রাখিল। মরাঠারা নূতন সাম্রাজ্যগঠনের চেষ্টা করে নাই, পরন্তু তাহারা মোগল-সম্রাটের নামেই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকল রাষ্ট্রেরই শাসনপদ্ধতির মূলনীতি একই প্রকার ছিল;—সেই সমস্ত শাসননীতি গোড়ায় চীন, পারস্য ও কালিফ্-রাজ্য হইতে গৃহীত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার ভাবটি সকল রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও,—বিভিন্ন জাতির আবির্ভাবে, বিভিন্ন ভাষার সংগঠনে ভারতের নৈতিক একতা উচ্ছিন্ন হইল। প্রাচীন ভারতে, সকল লেখকই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং সকলেরই মানসিক ভাবভঙ্গী একই ধাঁচার ছিল; এই বিষয়ে এতটা সমতা ছিল যে, কোন গ্রন্থের লিখনভঙ্গী ও ভাব দেখিয়া সেই গ্রন্থকারের দেশনির্ণয় করা কঠিন হইত। কিন্তু তাহার পর, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় স্বতন্ত্র মৌলিক সাহিত্য উৎপন্ন হইল;—সে মৌলিকতা শুধু প্রকারগত নহে, পরন্তু বস্তুগত।

সামন্ততন্ত্র ও মোগলদিগের কেন্দ্রগত শাসনের প্রভাববশত সমাজও নূতন করিয়া গঠিত হইল। পূর্ব্বে কেবল বর্ণ-ভেদমূলক উচ্চনীচতাই ছিল; জাইগীরদার ও কৃষক-প্রজার মধ্যে স্বত্ববটিত সেরূপ তীব্র পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া ব্রাহ্মণেরা সমস্ত আইনসম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। কি মুসলমান, কি হিন্দু—একজন নি সৈনিকের ক্ষমতা ব্রাহ্মণের ক্ষমতা অ অধিক হইল।

এসিয়া হইতে, য়ুরোপ হইতে—ভা যেমন নূতন ধরণের শিল্পকলা ও মা শিক্ষা করিল, সেইরূপ নূতন নূতন বিজ্ঞা শিক্ষা করিল। ভারতের বাণিজ্য ভারত সমস্ত পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ করি ভারতের শ্রমশিল্প রূপান্তরিত হইল। মোগ আমলে বড় বড় পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান আ হইল। এমন কি, দেশের বহির্ভাবটা প একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। বিভিন্ন প্রকা চাষ আরম্ভ হইল, বড় বড় পথ দিয়া স্বার্থবা চলিতে লাগিল, প্রাসাদসমন্বিত বৃহৎ নগর সমুত্থিত হইল, ভিন্ন ধরণের গৃহসকল নি হইতে লাগিল। লোকের পরিচ্ছদ মুসলমান প্রভাব পরিলক্ষিত হইল। রাজা সৈনিকেরা, ধনশালী ব্যক্তিরা বেশী ক বেশবিন্যাস করিতে লাগিল;—অবশ্য সভ্যতার উন্নতি-নিদর্শন বলিতে হইবে আমীর ওমরাওদিগের পত্নীরা অবরোধে বদ্ধ হইয়া থাকিত; প্রায় বাহির হইত —নিতান্তপক্ষে অবগুণ্ঠিত হইয়া বাহির হইত

শেষ-চারি শতাব্দীর মধ্যে সভ্যতা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দৃঢ়ভা বলা যাইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থ মধ্যযুগে, সামন্ততন্ত্র ও বৈদেশিকদিগে বিজয়াভিযান। অশ্বারোহী সৈনিকদ রাজায় রাজায় লড়াই; অস্ত্রসজ্জার মধ্যে বল্লম ও ধনুর্ব্বাণ; সাহিত্য—নিতান্ত সাদাসিধা ও গুহ্যধর্ম্মরঞ্জিত; কৃষকেরা মজুরে পরিণত নগরগুলি সংকীর্ণ ও জনতাপূর্ণ; শ্রমশিল্প—

ষ্ট। ষোড়শ শতাব্দীতে,—"নবজাগরণের" বেগ, কেন্দ্রীভূত রাজ্যশাসন, হিন্দুস্থানে স্তি, ভারতের প্রান্তসীমায় যুদ্ধবিগ্রহ, ও ানের ব্যবহার; পদাতিক সৈন্য তখনও ষ্ট, এবং অশ্বারোহী-সৈন্য মধ্যযুগের অস্ত্র-সুসজ্জিত; দর্শনশাস্ত্র, কবিতা, ইতিহাস, ান, কৌতূহল, ও মানসিক সাহসের াশ। সম্রাটের খাসমহলের প্রজাদিগের শিকভাবে স্বাধীনতা লাভ, নগরগুলা জার; সমস্ত পৃথিবীর সহিত বাণিজ্য তে থাকায় শ্রমশিল্প নবীকৃত হইল। দশ শতাব্দীতে,—স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্র, ৃঙ্খলা, শান্তি; অশ্বারোহীর দল শিক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল এবং জায়গীর-রেরা রাজদরবারের আমীরওমরাওর পদে ভিষিক্ত হইল। তখনকার পরিচ্ছদ টা সামরিক ধরণের নহে; সাধুভাষায় ত সাহিত্য; মন বেশী সংযত, ততটা তূহলপ্রবণ নহে; বর্দ্ধনোন্মুখ সমৃদ্ধি; যে জাতি অভ্যুদয়ের চরমশিখরে উঠিয়াছে ারই মত সমস্ত লক্ষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধঃপতন, ভোগসুখে মগ্ন হইয়া রাজারা র্য্য; চারিদিকে বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ; ীর ও শাসনকর্ত্তারা আপনাদিগকে স্বাধীন াজা ঘোষণা করিতে লাগিল; অপেক্ষাকৃত ধুনিক ধরণের বন্দুক-ধারী সৈন্যমণ্ডলী; হিত্য—মার্জ্জিত, যুক্তিযুক্ত, বাগ্মীসুলভ; ন্তু তাহাতে না-আছে কল্পনাশক্তি, না-ছে তীব্র অনুভূতি; কারিগর ও কৃষকেরা ভারে আক্রান্ত ও দৈন্যগ্রস্ত; আমীর-দিগের গৃহে,—ধনশালী দোকানদার, ও সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যসেবকের গতিবিধি; সুকুমার ধরণের ভোগবিলাস এবং এমন একটা সূক্ষ্মরুচি শিষ্টতার ভাব যাহা ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে লোকদের স্থূলরুচির আচরণে ও কথাবার্ত্তায় যেন মর্ম্মাহত হয়।

হিন্দুদিগের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহ ও ইসলামধর্ম্মের মর্ম্মভাব, অপেক্ষাকৃত রূঢ়প্রকৃতি জাতিদিগের মধ্যে কতকগুলি সামরিকগুণ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—সে সব গুণ এ পর্য্যন্ত ভারতে অজ্ঞাত ছিল।(১) রাজপুত, শিখ্, তামূল ও মহারাঠাদিগের ন্যায় প্রাচীন ভারতের কোন জাতিই এই সকল গুণের পরিচয় দেয় নাই। প্রত্যুত ইতরসাধারণ লোকেরা আজও পর্য্যন্ত মৃদুপ্রকৃতি ও ভীরু-স্বভাব। বিজেতা প্রভুর প্রতি চাটুবাদ ও দাসবৎ ব্যবহার; বিজিত প্রভুর প্রতি উদাসীনতা, কখন-কখন বিশ্বাসঘাতকতা, কখন বা নিষ্ঠুরাচরণ—সচরাচর ইহাই তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। যাহাই হউক সকলেরই মধ্যে যে একটা সৌহার্দ্দবন্ধনের বাসনা ছিল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানাদি সেই বাসনা পূর্ণ করিল।

বহু শতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীর দুঃখকষ্টের মধ্যে সকল মনুষ্যই যে সমান এই ভাবটা বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা ইসলামধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আরোপ করাই অধিক সঙ্গত। যে সামাজিক ভেদাভেদ হিন্দুর এত প্রিয়,—মুসলমান

(১) গ্রন্থকার কি আমাদের মহাভারত পাঠ করিয়াছেন? বোধ হয় করেন নাই—তাহা হইলে রূপ মত প্রকাশ করিতেন না—শ্রীজ্যো—

সে ভেদাভেদ মানেনা। যে কেহ রাজপুত নহে, রাজপুত তাহাকেই অবজ্ঞা করিত, এবং লুণ্ঠনকারী মারাঠা, যে খান হইতেই পায়, নিজের জন্য ধন হরণ করিয়া আনিত। তাহার পর হইতে, যে বিদ্বেষবুদ্ধি লোক-দিগকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিল সেই বিদ্বেষবুদ্ধি অনেকটা কমিল। ডোম, সাঁওতাল, চর্ম্মকার, ঝারুবর্দ্দার, জলবাহক আর ততটা নীচ বলিয়া পরিগণিত হয় না, এবং তাহাদের সান্নিধ্য মাত্রই আর অশুচিতা উৎপাদন করে না। কেবল কতকগুলি ব্রাহ্মণ এখনও পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দূর হইতে বর্জ্জন করে। পল্লীগ্রামে, সকল ব্যবসায়ের লোকেরাই পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহে, মেশামেশি করে,—কেবল তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ের একচেটিয়া ভাবটি খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করে এবং আবহমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল নিষেধ চলিয়া আসিতেছে সেই সকল নিষেধ মানিয়া চলে।

সর্ব্বশেষে হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণাটা জাগিয়া উঠিল যে, সমাজ স্বভাবতই রূপান্তরিত হইয়া থাকে, এবং আরও রূপান্তরিত হউক এইরূপ একটা বাসনারও উদ্রেক হইল। যাহারা অতীব দরিদ্র, যাহারা অবজ্ঞার পাত্র—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যপ্রচারিত এই কথা-গুলি বলিতে লাগিল যে, ভগবানের নিকট—পদের কোন উচ্চনীচতা নাই; আবার কেহ কেহ—যেমন শিখ, মারাঠা ও তামুল—বন্দুক ধরিল, এবং যুদ্ধ করিয়া পদ-মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইবার জন্য প্রয়াসী হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে, ভারতে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে তাহারই যেন একটা পূর্ব্বাভাস মনে হয়। সকলেই অনুভব করিতে লাগিল।

(২)

বৈদেশিকের প্রভাবাধীনে ভারত নবীন হইয়াছিল, কিন্তু ভারত তাহার নিজস্ব ভাব ত্যাগ করে নাই; তাহার যে সামাজিক গঠন অর্থাৎ বর্ণভেদপ্রথা বজায় রাখিয়াছিল। কোন্ তত্ত্বগুলি বর্ণভেদপ্রণালীর বিরোধী ছিল, কি কি কারণে বর্ণভেদ প্রণালী জয়ী হইল, এবং সেই প্রণালীর তত্ত্ব, বর্ণভেদপ্রণালীর উপর কি পরিবর্ত্তন আনিল, এই সমস্ত অনুধাবন করা আবশ্যক।

*
* *

দুইটি তত্ত্ব বর্ণভেদপ্রণালীর সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল:—সামন্ততন্ত্র ও ইস্‌লাম। বর্ণভেদ প্রণালীতে সামন্ততন্ত্রের পূর্ণতা ছিল বলিয়া অভিজাতবর্গ বর্ণভেদপ্রণালীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাজপুতানা ছাড়া আর কোথাও সফলতা লাভ করে নাই। (২) অন্যসর্ব্বত্র বর্ণভেদপ্রণালী বনিয়াদের উপর সামন্ততন্ত্র সংস্থাপিত এবং কালক্রমে সামন্ততন্ত্র, বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনেও ঈষৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। সামন্ততন্ত্র, ১/৩ অংশ লোককে মজুর-অবস্থায় পরিণত করিয়া, সমাজকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করে।

(২) রাজপুতানায় আজও বর্ণভেদ প্রণালী আছে বটে কিন্তু রাজপুত জাতের বাহিরে অন্য জাতের পদমর্য্যাদার উচ্চনীচতা তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত নহে।

ইস্‌লাম-তত্ত্ব অন্য প্রকারে স্বীয় শক্তি প্রকটিত করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মও সাম্য ঘোষণা করিল। আর সে কি-বিরাট সাম্যবাদ! বৌদ্ধধর্ম্ম লোকদিগকে শুধু একজনের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভিক্ষু-জীবনের অধিকার প্রদান করিল; বৌদ্ধধর্ম্ম বলিল, বর্ণভেদ প্রথা ত্যাগ করিবার জন্য, আর কিছুই আবশ্যক নাই, শুধু ব্রহ্মচর্য্য, সংঘের আজ্ঞাপালন ও দরিদ্রের ব্রত গ্রহণই যথেষ্ট। ইস্‌লাম, হিন্দুকে আমীর করিতে চাহিল, সৈনিক করিতে চাহিল; ইস্‌লাম হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মোচন করিল, হিন্দুর পদমর্য্যাদার পথ উদ্‌ঘাটন করিল; আরও অধিক —ইস্‌লাম হিন্দুকে বিজেতার মণ্ডলীভুক্ত করিল, পূর্ব্বতন প্রভুদের উপর তাহার প্রভুত্ব দিল। অথচ মুসলমানেরা সংখ্যায়, ভারতবাসী লোকের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ছিল। এবং তন্মধ্যে অনেকেই গোড়ায় বৈদেশিক, অনেকেই বলপূর্ব্বক-মুসলমান-ধর্ম্মে-দীক্ষিত হিন্দুর বংশধর। তবেই দেখা যাইতেছে, বর্ণভেদের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই হিন্দু ইস্‌লামকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। কেন বর্ণভেদের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য হিন্দুর এতটা আসক্তি? তাহার কারণ, হিন্দু জানিত, বর্ণভেদ প্রথাই তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উপায়।

উহা তাহার মূল-জাতিত্ব রক্ষা করিবারও উপায়। কেননা, মধ্যযুগের অরাজকতায় মধ্যে, এবং ব্রাহ্মণ্যিক সভ্যতার অধঃপতনের পর, ভারতের, শক বা মোগল হইয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

উহা হিন্দুর ধর্ম্মেরও রক্ষাকবচ। রামানুজ, কবীর, নানক, ইহারা ইস্‌লামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুফীদের ধর্ম্মমত অপেক্ষাও তাঁহাদের ধর্ম্মমত মুসলমান-ধর্ম্মমত হইতে কম তফাৎ। যদি বর্ণভেদপ্রথা না থাকিত তাহা হইলে, ভারত খুব সম্ভব মুসলমান হইয়া যাইত।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থাসম্বন্ধেও বর্ণভেদ প্রণালী একটা রক্ষার পথ। কারণ জাতিভেদপ্রণালী, সামন্ততন্ত্রকে প্রতিরোধ করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল, মজুরত্ব হইতে পদক্রমানুসারে লোকদিগকে মুক্তিদানে সমর্থ ছিল; কারণ, জাতিভেদ প্রণালী না থাকিলে পারস্য ও তুর্কের ন্যায় ভারত একজন স্বেচ্ছাচারী রাজার ক্রীড়নক হইয়া পড়িত; উক্ত দুই দেশে যে সকল সমাজশ্রেণী, বিজয়ী প্রভুর অপ্রতিহত শক্তিকে বাধা দিত, ইসলাম-প্রচারিত সাম্যবাদ ঐ সমস্ত শ্রেণীকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

তাছাড়া বর্ণভেদ প্রণালী, আর্থিক হিসাবেও হিন্দু জাতির একটা রক্ষার উপায়। আধুনিক য়ুরোপের শ্রমশিল্পমূলক ও গণতন্ত্র মূলক সভ্যতার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যই ধনবৃদ্ধির প্রধান হেতু। পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌গামী। অবশ্য ইসলামের যে অবনতি হইয়াছে তাহার অনেকগুলি কারণ আছে; এই অবনতি, কোরাণের উপদিষ্ট অদৃষ্টবাদের উপর, সুফীদিগের নিশ্চেষ্টতাবাদের উপর আরোপ করা যাইতে পারে; এরূপও বলা যাইতে পারে যে,

কৃষিকর্ম্মে ও শ্রমশিল্পে সেমিটিক জাতির বড় একটা রুচি ছিল না, দৈহিক শ্রমের প্রতি তাহাদের বিরাগ ছিল; এরূপ বলা যাইতেও পারে,—অচলিষ্ণু জীবন, শান্তি, সর্ব্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানাদি, এবং সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুশীলন—এই সমস্ত যে-সভ্যতার প্রধান লক্ষণ,—তাহার সহিত, যাযাবর ও যোদ্ধৃজাতির উপযোগী মুসলমান-ধর্ম্ম কখনই খাপ খায় না। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি, বাগ্‌দাদে, স্পেনদেশে, ইজিপ্টে, আকবরের ভারতে, সুলিমানের তুর্কিস্থানে এই ইসলাম ধর্ম্ম কিরূপ দীপ্তিময়ী সভ্যতা আনয়ন করিয়াছিল, তখন এই সকল তর্কের মূল্য অনেকটা কমিয়া যায়। সকল মুসলমান-দেশেরই আর্থিক উন্নতি, রাজার যথেচ্ছাচার শাসনে স্থগিত হইয়া যায়। ইস্‌লাম,—যথেচ্ছাচারিতার সম্মুখে, ব্যক্তিচেষ্টাকে অসহায় করিয়া রাখিয়াছিল; এবং য়ুরোপের ন্যায়, এসিয়ামাইনরের ন্যায়, আফ্রিকার ন্যায় যখন ভারতেও ইস্‌লামধর্ম্ম অপ্রতিবিধেয় অবনতি আনয়ন করিল, তখন একমাত্র বর্ণভেদপ্রণালীই বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধক হইয়া দাঁড়াইল। তখন না-ছিল দেওয়াণী আইন, না-ছিল ফৌজদারী আইন; জোর-দখলীকার, ভাগ্যান্বেষী, দস্যুর দল, এসিয়া ও য়ুরোপের সমস্ত জাতি—শিকার-জন্তুর মত ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বর্ণভেদপ্রণালী রহিয়া গেল;—উহার নিয়ম ব্যবস্থা হিন্দু মাত্রই পালন করিতে লাগিল; উহার (passive resistance) সহিষ্ণুতামূলক প্রতিরোধিতা, বৈদেশিকদিগের আক্রমণকে চূর্ণ করিয়া দিল।

*
* *

তথাচ বর্ণভেদ-প্রণালী রূপান্তরিত হইল। বর্ণসংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই বৃদ্ধি নানা কারণে ঘটিল। প্রথমত প্রাচীন সমাজের অবনতি এবং তদুৎপন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলা। প্রাচীন রাজবংশ-সমূহের পতন, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির উপায়াভাব, মুক্তিলাভের বাসনা, মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরদিগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষণের আবশ্যকতা, ভাগ্যান্বেষী ও দস্যুদলের আবির্ভাব—এই সমস্ত কারণে প্রণোদিত হইয়া দেশের প্রধানেরা নিজ নিজ দুর্গে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদিগকে দেশাধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেইরূপ,—যে কারণে য়ুরোপের জনসাধারণ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, কতকটা সেই কারণেই, একই অঞ্চলের কতকগুলি ভূম্যধিকারী, একই ব্যবসায়ের কতকগুলি কারিগর, পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য এক একটা দল বাঁধিল। কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণ অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, আর হিন্দুরা অচলিষ্ণুতা, মৃদুতা, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই প্রথম কারণটীর সহিত আরও কতকগুলি কারণের সংযোগ হইল যথা:—জাতিবিশেষের সংগঠন, লোক-ভাষার পরিপুষ্টি, ক্রমাগত নূতন নূতন রাজ্যের সংস্থাপন, নূতন নূতন সামন্ত-রাষ্ট্রের পত্তন। তাছাড়া, সভ্যতার উন্নতি, বৈদেশিকদিগের জনহিতকর প্রভাব,—যাহা হইতে নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। পরিশেষে,

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলন হইতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি হইল, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত এতটা তীব্র হইয়া উঠিল যে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একেবারে পৃথক হইয়া পড়িল। এবং এই সকল বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ায়, সমস্ত বর্ণভেদ-প্রণালীটাই সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইল। একটা নূতন পত্তনভূমি স্থাপিত হইল। সামাজিক পদমর্য্যাদা ও প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তে, ব্যবসায় ও বাসস্থানই মূলজাতিগত উৎপত্তির পত্তনভূমি হইয়া দাঁড়াইল। সকল নামগুলিই নূতন এবং মূল শব্দার্থ হইতে একটু ভিন্ন। যথা:—কায়স্থ, বৈদ্য, কামার, সোনার ইত্যাদি (৩)

আইনী-আকবরীতে আবুল-ফজল মনুর চারি শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাছাড়া ম্লেচ্ছ নামক আর এক পঞ্চম শ্রেণীরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরও এই কথা বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত:—প্রথম তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ন্যূনাধিক নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্যিক কর্ত্তব্য সকল পালন করিয়া থাকে; অন্য শ্রেণীগুলি, ক্ষত্রিয়বৃত্তি, বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করে; সপ্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষু এবং অষ্টম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কতকগুলি পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদিগের নীচে, তাহাদিগের আচরণ ম্লেচ্ছ ও চণ্ডালের ন্যায়।

আবুল-ফজল বলেন, ক্ষত্রিয় মাত্রই হয় চন্দ্রবংশীয়, নয় সূর্য্যবংশীয়;—রাজপুতদিগের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত।

তাহার পর তিনি আরও বলিয়াছেন:—ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ৫০০ শাখা আছে; তন্মধ্যে ৫২টী শাখা উচ্চ পদবীর এবং ১২টী শাখা সম্মান-যোগ্য। কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রিয় এখন আর কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয়-বংশধরদিগের মধ্যে অধিকাংশই অস্ত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু তাহারাও ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর কতকগুলি ক্ষত্রিয় অস্ত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; তাহারা রাজপুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারা শত সহস্র গোত্রে বিভক্ত।

বৈশ্য ও শূদ্রেরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত। বৈশ্য-শাখার অন্তর্ভূত বেণিয়া-নামক এক শ্রেণীর মধ্যেই ৮৪ বিভাগ বিদ্যমান।

*
* *

যেমন বর্ণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল সেই সঙ্গে নিয়মের কঠোরতাও বাড়িতে লাগিল।

বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিই এই কঠোরতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আমি মুসলমান নহি—ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতি আমার কোন ঝোঁক নাই—এই কথা দৃঢ়রূপে বলিবার জন্যই যেন হিন্দুরা পুরাতন প্রথাগুলি খুব আঁকড়াইয়া ধরিল। এই ধর্ম্মোৎসাহ হইতেই ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরও

(৩) ঐরূপ তেলী, কস্তার, তাঁতী, নাপিত ইত্যাদি। ইহার অনেকগুলি (যাহার নাম প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না) মুসলমান-অভিযানের পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল।

অত্যাচার আরম্ভ হয়, আবার এই কারণেই হিন্দুরাও মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইস্‌লাম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিবার জন্য নানক শিখসম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। নানক সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের প্রতিবাদী হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে, শিখদিগের এই একটি সঙ্কল্প সর্ব্বপ্রধান হইল ঃ—মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা। তাহারা তখন দুর্গার পূজা আরম্ভ করিল, দুর্গার নিকট নরবলি দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন গুরু আপনার পুত্রকে বলি দিল। পৌত্তলিকতাদ্বেষী মুসলমানের সূক্ষ্ম মর্ম্মে আঘাত দিবার জন্য তাহারা গো-পূজাও আরম্ভ করিল। এমন কি, হিন্দুদের মধ্যে খাদ্যের বাছ-বিচার, পরিচ্ছদের বাছ-বিচার, দৈনিক স্নান, গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি, এবং প্রাচীন-প্রথানুবর্ত্তিতাও দেশানুরাগের প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইল।

নিয়মের কঠোরতার কারণ আর এক দিক দিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

যদি কঠোর নিয়ম স্থাপন করিয়া ব্যবসায়গুলির একচেটিয়া ভাব বজায় রাখা না যায়, তাহা হইলে, এই অসংখ্য বর্ণবিভাগগুলি অচিরে বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ তাহারা আশঙ্কা করিয়াছিল। আর, বর্ণগুলি বংশানুক্রমিক হওয়ায়, ভিন্ন বর্ণের সহিত বিবাহও এইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া পড়িল।

সাধারণ লোকের আচরণের উপর ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বাবধান ও খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল —উহাই নিয়মের কঠোরতার প্রধান হেতু বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের অতি শোচনীয় অধঃপতন হইল। অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি, ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্ট সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শনেরও অবনতি হইল। আবার অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদিগের নিকট হইতেও কিছু শিখিতে সম্মত হইল না।

যে বিদ্যাশিক্ষায় একমাত্র ব্রাহ্মণদিগের অধিকার ছিল—লোক-সাহিত্যের বিকাশে, তাহাও তাহাদের হস্তচ্যুত হইল। মুসলমানের আক্রমণে তাহাদের মন্দির, তাহাদের মঠ, তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়, সমস্তই বিধ্বস্ত হইল। সংস্কৃতের অনুশীলন গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। রাজাদিগের অনুগ্রহেই বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন সংরক্ষিত হইয়াছিল।

তারপর, সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি মুসলমানের হস্তগত হইল। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শেষ-রাজাগুলি ছিলেন,—হয় রাজপুত, নয় দ্রাবিড়ী ; উহাদের অধিকাংশই অনক্ষর। বিজয় নগরের পতনের পর, কোন রাজারই তেমন বেশী রাজস্ব ছিল না। বড় লোকের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকায়, সবল ব্রাহ্মণই, এমন কি উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরাও ভিক্ষার দ্বারা উপজীবিকা লাভ করিতে বাধ্য হইল। কোন এক রূঢ় জাতির প্রভাব এবং কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতির প্রভাব, ব্রাহ্মণদিগের চরিত্রকে কলুষিত করিল। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মতে হিন্দুধর্ম্ম, কতকগুলি কবিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে, অথবা সূক্ষ্মতত্ত্বসকল সাধারণ লোকের বোধগম্য

করাইবার জন্য, কতকগুলি সাংকেতিক মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। মধ্যযুগে, ব্রাহ্মণেরা যাহাদের সহিত একত্র বাস করিত সেই শকজাতীয় বর্ব্বরদিগের ন্যায়, সেই বঙ্গদেশীয় অসভ্যদিগের ন্যায়, তাহারাও পৌত্তলিক হইয়া উঠিল, কুসংস্কারপরায়ণ হইয়া উঠিল, কাষ্ঠপ্রস্তর-পূজক হইয়া উঠিল। আবার কুসংস্কারের সহিত স্বার্থ আসিয়া মিলিত হইল। তখন তাহারা এমন সকল অনুষ্ঠানের উদ্‌ভাবনা করিল, যাহা ব্রাহ্মণের দক্ষিণা-সহকৃত সাহায্য ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যবস্থাপত্র বিক্রয় করিবার জন্য তাহারা ব্যবস্থার সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল।

গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটি কার্য্যের উপরেও তাহাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সর্ব্বত্রই তাহাদের গুপ্তচর থাকিত, তাহারাই অনুক্ষণ খবর আনিয়া দিত। কোন কৃষকের কোন গরু যদি পীড়িত হইত, অমনি তাহাকে নদীতে লইয়া যাইতে হইত। যদি ঐ গরু গৃহে মরিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে প্রভূত পরিমাণে অর্থদান করিতে হইত, তাছাড়া প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইত। Travernier একজন কৃষককে হামাগুড়ি দিয়া পথ চলিতে দেখিয়াছিলেন।

আইনী আকবরীতে এক জায়গায় একটা কৌতূহলজনক ব্যাপারের বর্ণনা আছে ঃ—

যখন কোন ব্যক্তি মরণাপন্ন হয়, হিন্দুরা তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া মাটিতে রাখিয়া দেয়, তাহার মাথা মুড়াইয়া দেয় (কেবল বিবাহিতা রমণীদের মস্তকমুণ্ডন হয় না) তাহার পর তাহার সমস্ত শরীর ধৌত করা হয়। ব্রাহ্মণেরা মুমূর্ষুর সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করে ও ভিক্ষাস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। গোবর ও তৃণে মাটী ঢাকিয়া দেওয়া হয়; মাথা উত্তরে পা দক্ষিণে—এইভাবে মুমূর্ষুকে চীৎ করিয়া শুয়াইয়া দেওয়া হয়। যদি কাছাকাছি কোন নদী কিম্বা পুষ্করিণী থাকে, তাহার জলে আকটি পর্য্যন্ত তাহাকে দাঁড় করিয়া রাখা হয়। মরিবার পর যখন পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আত্মীয়েরা তাহার মুখে গঙ্গাজল ঢালিয়া দেয়; সোনা, পান্না, হীরা, মুক্তা মুখের ভিতর পুরিয়া দেয়—তাহার পর গো-দান করে, বক্ষের উপর তুলসীপাতা স্থাপন করে, এবং যে-দেশের যে-সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, সেই তিলক প্রভৃতি চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত করে।

মৃত দেহ লইয়া আসিবামাত্রই, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য বন্ধুবান্ধব তাহাদের মাথা ও দাড়ী কামাইয়া ফেলে, (অন্যেরা দশদিনের জন্য অপেক্ষা করে) শবকে একটা নূতন ধুতি পরাইয়া দেয় এবং একটা মোটা চাদরে তাহাকে আচ্ছাদিত করে। বিবাহিতা রমণীর দেহে তাহার দৈনিক পরিচ্ছদটাই পরানো থাকে। কোন নদীর ধারে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, এবং উহা পলাশ কাঠের চিতাশয্যার উপর স্থাপিত হয়। মন্ত্র পাঠান্তে মুখের মধ্যে একটু ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হয়, চোখের উপর, নাকের উপর, কানের উপর এবং অন্যান্য রন্ধ্রস্থানে কতকগুলি সোনার দানা রাখা হয়। তাহার পর মুখাগ্নি করা পুত্রের কাজ; তাহার অবিদ্যমানে, সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং তাহার অবিদ্যমানে, জ্যেষ্ঠকে এই কাজ করিতে হয়। মৃতের পত্নীগুলি হাতধরাধরি করিয়া মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে, তাহার সহিত চিতায় পুড়িয়া মরে।

আবুল-ফজল বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিরা চিতায় উঠিতে রমণীদিগকে নিষেধ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরেই আবার তিনি বলিতেছেন, হিন্দুবিধবাদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—স্বামী মরিয়াছেন শুনিয়াই যাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হয়; যাহারা শোকে

অভিভূত হইয়া চিতার আগুনে পুড়িয়া মরে; যাহারা লোক-লজ্জার খাতিরে সহমৃতা হয়; যাহারা চিরপ্রথা মানিয়া-চলিবার জন্য সহমৃতা হয়; যাহারা চিতাগ্নিতে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হয়।

তাই বলিতেছি, এই সময়ে বর্ণভেদ প্রথার নিয়ম ও ব্রাহ্মণের অত্যাচার যার-পর-নাই কঠোর ছিল। সে যাই হোক্, এই কঠোরতাই অপ্রতিবিধেয় অধঃপতনের প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

প্রথমত ব্রাহ্মণদের অত্যাচার। তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নিয়মব্যবস্থা হইতেই প্রকাশ পায় যে, প্রাচীন প্রথার সকল নিয়ম পরিপালিত হইত না। যেমন বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণেরা হিন্দুদের স্কন্ধে আর্য্যদের প্রথা সকল চাপাইয়া দিয়াছিল, তেমনি আবার তাহারা হিন্দুদের প্রথা সেই সকল নব্যজাতির উপর চাপাইয়া দিল যাহারা বর্ব্বরদিগের আক্রমণের পরে গড়িয়া উঠে। কিন্তু যে সকল অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে কতকগুলি ছিল প্রাচীন, কতকগুলি খুব আধুনিক, কতকগুলি মহৎভাবসূচক ও সুনীতিমূলক, এবং অধিকাংশ হাস্যজনক, জঘন্য, এমন-কি পাপাবহ; এবং এই বৈচিত্র্য হইতেই সংশয়বাদ উৎপন্ন হইল; অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সংশয়বাদ শিক্ষিত ও ধনশালী ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ ছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইল।

পক্ষান্তরে, বর্ণগুলি ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত হওয়ায় সমস্ত বর্ণভেদপ্রণালীরই অবনতির পথ প্রস্তুত হইল। যে সকল প্রাচীন বর্ণ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং যে সকল বর্ণের অনুরূপ সামাজিক শ্রেণীভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—রাষ্ট্রবিপ্লবে ও বৈদেশিক প্রভাবে, খণ্ডাংশে বিভক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

কিন্তু মধ্যযুগের অরাজকতায়, অসংখ্য নূতন বর্ণের উদ্ভব হইল; তাহাদের মধ্যে না-ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম—না-ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার; তাহারা যেন হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়াছিল। আজিকার দিনেও এমন অনেক বর্ণ আছে—যাহার অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যা খুবই কম; তন্মধ্যে অনেকগুলি শীঘ্রই লোপ পাইবে; এবং কতকগুলি পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে। প্রধান বর্ণগুলিও এইরূপ বিভক্ত হইয়া এই প্রকারেই বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকারভুক্ত। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, মধ্যযুগ হইতেই বর্ণভেদপ্রণালীতে 'ভাঙ্গন' ধরিয়াছে। এই বিষয় সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার দরুণ, মধ্যযুগের কার্য্যটা ভাল করিয়া কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু এই বিশৃঙ্খলাই মধ্যযুগের কার্য্যসিদ্ধ করিয়াছে। আরও কিছুকাল পরে, আমরা দেখিতে পাইব, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ রূপান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু এই প্রভাবের ফল সমাজের উপর প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই বর্ণগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের পরিণাম—বৈদেশিকের আক্রমণ, নূতন নূতন জাতির,—নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব,

মন্ত্রতন্ত্র, ইসলাম, ও মোগল-শাসনের আবির্ভাব।

***

এক্ষণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে একটা তুলনা গ্রহণ করা যাক্; তাহা হইলে আমরা ভারতীয় মধ্যযুগের বিশেষ লক্ষণটি আরও ভাল করিয়া ধরিতে পারিব। উহার মধ্যে সমান্তরাল-ধারায় দুইটি ক্রিয়ার কার্য্য কি উপলব্ধি করা যায় না?—একটি 'গড়ন' আর একটি 'ভাঙ্গন'? যেমন একদিকে বর্ণগুলির খণ্ডবিভাগে প্রাচীন সমাজের বিনাশ সূচিত হইতেছে, তেমনি আর একদিকে, একতার দিকে প্রবণতা, ও ভারতীয় একজাতি-সংগঠন, নবসমাজের বিকাশ সূচিত করিতেছে। তা ছাড়া, মধ্যযুগে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে, গঠনোযোগী সমস্ত উপাদানই বিদ্যমান ছিল, এবং ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণতা সম্পাদনের পক্ষে যে একটি প্রধান উপাদানের অভাব ছিল—য়ুরোপীয় সভ্যতাই সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য উদ্যত।

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন সমাজের ভাঙ্গনের কাজ এত ধীরে ধীরে সাধিত হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে সেই দেহগঠনের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি,—যে সকল জীবদেহ পৃথক্‌কৃত কোষাণুর দ্বারা গঠিত নহে, পরন্তু এরূপ সদৃশ কোষাণুর দ্বারা গঠিত যাহারা আপনাদিগকে খণ্ডিত করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু উৎকৃষ্ট দেহগঠনের জরা ও মৃত্যু, সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষীকৃত কোষাণুদিগের অন্তর্ধানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে কতকগুলি নিকৃষ্ট দেহ-গঠনে, জরা অজ্ঞাত এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা ব্যতীত তাহার মৃত্যু হয় না। সেইরূপ ভারতীয় বর্ণভেদ প্রণালীর ন্যায় আদিম ধরণের একটি সমাজিক দেহ-গঠনও, বহুশতাব্দীর অবনতির পর, বিভিন্ন অসংখ্য হেতুর প্রভাব ব্যতীত কখনই সহসা অন্তর্হিত হইতে পারে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চড়ক বা নীলপূজার মূলতত্ত্ব

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ)

মহাবিষুবসংক্রান্তিতে 'চড়কপূজা' হওয়ার কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। একসময় এই চড়ক পূজায় বিশেষ ধূমধামই হইত। দুর্গাপূজার সময় যেমন ঢাকের বাদ্যে পল্লীগ্রাম সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে চড়কপূজার সময়ও তদ্রূপ পল্লীগ্রাম সকল ঢাকের বাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইত এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হরগৌরী নৃত্যে ও সঙ্গীতে প্রমোদোন্মাদিত হইত। চড়কপূজার এই আভাসমাত্র শুনিয়া হরগৌরীর সহিতই যে চরকপূজার প্রধান যোগ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার মূল ইতিহাস উদ্ধার

তেমন সহজসাধ্য নহে। বহু প্রাচীন কালের উৎসব বলিয়া কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহাতে বিচিত্র রূপান্তর সঙ্ঘটিত হওয়ায় ইহা এরূপই জটিলাকার ধারণ করিয়াছে যে বৃদ্ধের রূপ দেখিয়া তাহার শৈশব রূপের অনুমান করা যেরূপ দুঃসাধ্য ইহার বর্ত্তমান রূপ দেখিয়া আদিরূপের কল্পনাও সেরূপই দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা চড়ক উৎসবের আদিরূপের সন্ধান করিতেই ব্যাপৃত হইব।

উৎসবটী যদিও 'চড়কোৎসব' নামে প্রসিদ্ধ—শাস্ত্রে কিন্তু 'চড়ক' বলিয়া কোন উৎসবের নাম পাওয়া যায় না বা ইহার কোন বিধানও দৃষ্ট হয় না। মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা নীল লোহিত নামক দেবতার পূজার বিধানই মাত্র প্রাপ্ত হই। এস্থলে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

চৈত্রেমাসি তস্য ব্রতবিধানং যথা ঃ—
"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যান্নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নাত্বাত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌচ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাংব্রতমেতৎ সমর্পয়েৎ॥"
ইতিমাসকৃত্যে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্।

চৈত্রমাসে নীললোহিতের ব্রতের বিধান আছে যথা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে—"সংযতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ও রাত্রিতে স্নানকরতঃ নৃত্য গীত ও বিশেষ আমোদের দ্বারা চৈত্রমাসে শিবের উৎসব করিবে। ভগবান্ নীললোহিত প্রসন্ন হইলে কি লাভ না হয়? সংক্রান্তিতে উপবাসী থাকিয়া যজ্ঞ সম্পাদনকরতঃ ব্রতের উদ্যাপন করিতে হয়।"

এখানে 'নীললোহিত' যে শিবকে বুঝাইতেছে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। অভিধানেও আমরা শিবপর্য্যায়ে 'নীললোহিত' নাম প্রাপ্ত হই। এই নীললোহিত দেবতার নাম হইতেই যে চড়কপূজার 'নীল-পূজা' নাম হইয়াছে তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

চড়ক পূজার যে বিধান উপরে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যেমন নৃত্যগীতাদির প্রকরণ দেখা যায়—তেমনই সবিশেষ নিষ্ঠাও যজ্ঞের প্রকরণও দেখা যায়। ইহাতে চড়কপূজা যে মূলে বৈদিক ক্রিয়া ছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই পূজার অনুষ্ঠান চৈত্রমাস ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকায় ইহা যে কেবল বিষুব-সংক্রান্তিরই উৎসব নহে পরন্তু বসন্তঋতুর উৎসব তাহাই আমাদের নিকট প্রতীতি হয়। চৈত্রমাস যে বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। শব্দকল্পদ্রুমে 'চৈত্র বৈশাখৌ বসন্তঃ' বলিয়া চৈত্রমাসকে বসন্তঋতুর প্রথমমাস রূপেই গণনা করা হইয়াছে।

আমরা নীললোহিতদেবতার উপরি উদ্ধৃত পূজা বিধানে যে হোমের উল্লেখ পাইয়াছি তাহা হইতেই নীললোহিতরূপ-বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতে পারি। বসন্তকালে চতুর্দ্দিকে সুনীল আকাশ যখন শোভা পাইত তখন উন্মুক্ত স্থানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে চতুর্দ্দিকের নীলবর্ণ আকাশ ও মধ্যস্থিত রক্তবর্ণ অগ্নি এই উভয়ের যোগে যে নীললোহিতরূপ প্রকটিত হইত তাহাই নীললোহিত দেবতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র অগ্নিরই বিকাশ শিব আবার রুদ্রের বিকাশ। এই প্রকারে শিবও অগ্নিরই বিকাশ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নীললোহিতহোমাগ্নি শিব হইয়াছেন। বেদে

রুদ্র বজ্রাগ্নিরই নাম। বজ্র মেঘ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং মেঘের নীলবর্ণ ও বজ্রাগ্নির রক্তবর্ণ হইতেও, রুদ্র বা শিবের নীললোহিত নাম উৎপন্ন হইতে পারে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ইহার শিখা হইতে যখন ধূম নির্গত হয় তখন ধূমের কৃষ্ণবর্ণবশতঃ ইহার যোগে বেদে অগ্নি 'নীলকণ্ঠ' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অগ্নি রক্তবর্ণ বলিয়া তাহার নীলকণ্ঠ যোগে "নীল-লোহিত" নাম বিশেষরূপেই খাটে। অগ্নির ধূম্রময় রূপ হইতে শিব যেমন 'নীলকণ্ঠ' হইয়াছেন তেমনই তাঁহার রক্তবর্ণ রূপ হইতেও শিব 'নীললোহিত' হইয়াছেন। এই প্রকারে যেরূপেই হউক অগ্নির বিকাশ বলিয়াই যে শিবের নাম 'নীললোহিত' হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। নীললোহিত পূজা বসন্তকালে বিহিত হওয়ায় বসন্তের নীল আকাশের সহিত রক্তবর্ণ অগ্নির যোগে শিবের নীললোহিত নামটী যে এই বিশেষ স্থলে বিশেষরূপেই উপযোগী হইয়াছে তাহাও আমরা পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

বসন্ত সমাগমে প্রকৃতিরূপে যেমন নব-জীবনের সঞ্চার হয় জীব রাজ্যে তেমনই নব-জীবনের সঞ্চার হয়। নৃত্যগীতাদি ইহারই ফল। নীললোহিত-পূজার নৃত্যগীতোৎসবে এই নবজীবনের ভাবই আমরা প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বসন্তের সহিত এই প্রকারে কেবল যে নৃত্যগীতোৎসবেরই যোগ দেখা যায় তাহা নহে কিন্তু ইহাতে দোলা বা দোলন উৎসবের যোগও দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে বসন্তে বর্ণনীয়ানি যথা ঃ—

"স্বয়ম্ভো দোলা কোকিল মারুত সূর্য্যগতি
তরুদলোদ্ভিদাঃ।
জাতীতর পুষ্পচয়াম্র মঞ্জরী ভ্রমর ঝঙ্কারাঃ॥"
ইতিশব্দকল্পদ্রুম ধৃত কল্পলতায়াং প্রথমস্তবকঃ।

বসন্ত ঋতুর বর্ণনীয় বিষয় যথা—"বসন্তকালে দোলা কোকিল সূর্য্যগতি (উত্তরায়ণ গতি), বৃক্ষের নবপত্র বিকাশ, জাতি ভিন্ন পুষ্প সকল, আম্রমুকুল, ভ্রমরঝঙ্কার (বর্ণনীয়)।"

পুরাণে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গের যে আখ্যান পাওয়া যায় তাহাতে আমরা বসন্ত ঋতুরই বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাই যথা ঃ—

"শম্ভুং সমাসাদ্য বিবিক্তরূপী।
তস্থৌ বসন্তং বিনিযোজ্য শশ্বৎ॥"
কালিকাপুরাণ ৯ম অধ্যায়।

"অনন্তর মদন শিবসমীপে গমনপূর্ব্বক বসন্তকে সতত নিযুক্ত রাখিয়া প্রচ্ছন্ন রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

বসন্তের কামোত্তেজনা দ্বারা শিবের আসঙ্গ স্পৃহা বলবতী হইলে তিনি দক্ষকন্যা সতীর সহিত পরিণীতা হন। সতীর বর্ণ পুরাণে "মসৃণ নীলাঞ্জন শ্যাম" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন শ্যাম শোভয়া শোভসে হর।
দাক্ষায়ণ্যাযথাচাহং প্রাতিলোম্যেন পদ্ময়া॥"
কালিকাপুরাণ ১১শ অধ্যায়।

"মহেশ্বর! বর্ণবৈপরীত্যে আমি যেমন কমলা যোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও সেই স্নিগ্ধ নীলাঞ্জনশ্যামলা দাক্ষায়ণীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ।"

দক্ষ একজন প্রজাপতি। তাঁহার নাম বেদেও পাওয়া যায়। সুতরাং শিবের দক্ষ কন্যা বিবাহ আখ্যানটী যে বহু প্রাচীন তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

এক্ষণে শিবের দক্ষকন্যা বিবাহটী প্রকৃত কি ব্যাপার তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ইহা আমাদের নিকট উত্তরকুরুতে

শীতকালের ছয়মাস অস্তমিত থাকার পর বসন্তকালে প্রথম সূর্য্যোদয়ের রূপক বলিয়াই বোধ হয়। শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণায়ন গতিতে বিষুবরেখার নিম্নগামী হইয়া উত্তরকুরুতে সম্পূর্ণ অস্ত প্রাপ্ত হইলে আকাশ ভাগ হিমানী দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্র অন্ধকার পরিব্যাপ্ত থাকিত বলিয়া তথন তথায় ইহার প্রকৃত বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না। সূর্য্যের পুনর্ব্বার উত্তরায়ণ গতির সঙ্গে সঙ্গে যখন শীতের পর বসন্তকালের আবির্ভাব হইতে থাকে তখন আকাশ হইতে নীহারজাল অন্তর্হিত হইয়া আকাশ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় ও স্বাভাবিক গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। চৈত্র মাসে আকাশ নিরন্তর এইরূপই পরিচ্ছন্ন থাকে যে এমন কি রাত্রিতেও চন্দ্রকে নীহারাচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন ঃ—

"কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীৎ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥"

এই সময়ে সূর্য্য উত্তরায়ণ গতিতে বিষুবরেখায় আসিয়া উপস্থিত হইলে উত্তরকুরুতে তাহাকে শীতকালের ছয় মাসের পর প্রথম উদিত দেখা যাইত। বসন্তের সুনির্ম্মল নীলাকাশে অরুণোদয় ইহাই শিবের সহিত সতীর পরিণয়। নীলবর্ণ আকাশ ও রক্তবর্ণ প্রভাত সূর্য্যের যে যুগল মিলন তাহাই "নীললোহিত" রূপ। এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের দ্বারা পৌরাণিক শিবসতী পরিণয়ের ব্যাখ্যা করিলে আমরা অতি সুন্দর ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত হইব। উত্তরকুরুতে শীতকালের অস্তমিত সূর্য্যই ধ্যানস্তিমিত শিব। বসন্ত কালের সুনীল আকাশই সতী। বসন্ত সমাগমে আকাশের যে নির্ম্মলতা হইতে থাকে তাহাই সতীর জন্ম ও বৃদ্ধি। বসন্তের প্রাদুর্ভাবে সূর্য্য যে ক্রমে বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন তাহাই বসন্তের প্রভাবে শিবের ধ্যানভঙ্গ ও তাঁহার সতী পরিণয়ের ব্যগ্রতা। তৎপর বিষুবরেখায় সূর্য্য উপস্থিত হইয়া যে সুনীল গগনে রক্তবর্ণে প্রথম প্রকাশিত হন তাহাই সতীর পরিণয় এবং উভয়ের একত্র যোগই 'নীললোহিত' মূর্ত্তি। এখানে নীললোহিতের আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি পুরাণেও যে এতদনুরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় তাহা নিম্নোদ্ধৃতস্থল পুরাণের 'নীললোহিত' নামের নির্ব্বচন পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে ঃ—

"নীলং যেন মমাঙ্গস্ত রসাক্তং লোহিতং হিয়া।
নীললোহিত ইত্যেব ততোঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
বোম্বে মুদ্রিত ভানুজি দীক্ষিত টীকাসমন্বিত
অমরকোষটীপ্পনীধৃত মুকুটটীকা।

"যেহেতু আমার নীল অঙ্গ প্রভাদ্বারা লোহিতবর্ণ রঞ্জিত হইতেই আমি "নীললোহিত" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছি।"

এস্থলে নীলবর্ণ আকাশ প্রথমোদিত লোহিতবর্ণ সূর্য্য কিরণের দ্বারা রক্তিমাভ হইলে যেরূপ হয়—সেই প্রকার রূপেরই যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার সহিত পুরাণের সতীশিব সংযোগের বর্ণনা মিলাইলে অতি সুন্দর সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে ঃ—

"হরস্য পুরতোরেজে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনপ্রভা।
চন্দ্রাভ্যাসেহঙ্কলেখেব স্ফটিকোজ্জ্বল বর্ম্মণঃ॥" ১৮
কালিকাপুরাণ ১০ম অধ্যায়।

"স্ফটিকোজ্জ্বল মহাদেবের সমীপে সেই স্নিগ্ধ

ঘলিতাঞ্জনসমপ্রভা দাক্ষায়ণী চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

দক্ষকন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহের বিবরণ যেমন আমরা পুরাণে প্রাপ্ত হই ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যুর সহিত সূর্য্যের বিবাহের বৃত্তান্তও আমরা তেমনই বেদে দেখিতে পাই যথা ঃ—

"ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীদং বিশ্বং ভুবনং
সমেতি॥" ১
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল—১৭ সূক্ত।

"ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল।"

ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে পৌরাণিক শিবের দক্ষকন্যা সতীর বিবাহ আখ্যায়িকা বৈদিক সূর্য্যের ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যুর বিবাহ আখ্যায়িকারই অনুকরণে কল্পিত কিন্তু অনুকরণ বলিলে ঠিক হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। এক বৈদিক আখ্যায়িকাই সূর্য্য স্থলে শিব ও সরণ্যু স্থলে সতী নামের পরিবর্ত্তন দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে বলিলেই ঠিক হয় বলিয়া আমরা মনে করি। এই নাম পরিবর্ত্তনও যে কেবল কল্পনা বলে হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু স্বাভাবিক বিকাশসূত্রেই হইয়াছে। বস্তুতঃ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সূর্য্যই যে ক্রমে শিবে পরিণত হইয়াছেন তাহা পরিষ্কার রূপেই উপলব্ধি করা যায়। রুদ্রই শিবের বৈদিক আদিরূপ। একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমরা 'বৈবস্বত' ও 'সবিতা' নামে সূর্য্যকে অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। শিব 'অষ্টমূর্ত্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সূর্য্যকে তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তিরূপে পরিগণিত দেখিতে পাওয়া যায় যথা ঃ—

"পৃথিবী সলিলং তেজোবায়ুরাকাশমেবচ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমরাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥"
"পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, ও যজমান এই অষ্টমূর্ত্তি॥"

এই অষ্ট মূর্ত্তির বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শিব যখন প্রাধান্য লাভ করিলেন তখন তিনি সমস্ত দেবতাকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন। এইরূপেই তিনি 'মহাদেব' ও 'মহেশ্বর' হইয়াছেন। অপর দেবতার সঙ্গে তিনি যেমন সূর্য্যকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন তেমনই সূর্য্যের দক্ষকন্যা বিবাহের রূপকটীও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

সতীর দেহত্যাগের পর শিবের হিমালয় কন্যা পার্ব্বতীর পরিণয় ব্যাপারে শিবের পৌরাণিক রূপ পরিহার পূর্ব্বক তান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহণেরই যেন ইতিহাসসূত্র ধরিতে পাওয়া যায়।

সতীতে আমরা বৈদিকধর্ম্মেরই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তিনি যে দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করেন, তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারেরই আভাস পাওয়া যায়। জটিল যজ্ঞ পদ্ধতির স্থলে সরল পূজাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন ইহাই সেই সংস্কার। এই প্রকারে সতীকে আমরা বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের সন্ধিস্থলরূপিনী দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং শিব সতী রূপে যে আমরা বৈদিক সূর্য্যাকাশ রূপই প্রতিভাত দেখিব তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা বিষ্ণুর যে 'নীলমাধব' নাম

প্রাপ্ত হই তাহাও উত্তর কুরুবাসী আর্য্যদিগের নিকট বসন্তকালের সূর্য্যোজ্জ্বল আকাশ দৃশ্যের ইতিহাসই আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। মাধব শব্দ মধু শব্দ হইতে উৎপন্ন। মধু শব্দের অর্থ বসন্ত বা চৈত্রমাস। সুতরাং মাধব শব্দের অর্থ বসন্তকালের বা চৈত্রমাসের দেবতা। ইহার 'নীল' বিশেষণের দ্বারা ইনি যে নীলবর্ণ আকাশের দেবতা তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই "নীলাকাশ দেবতা" আমরা বসন্তকালে বা চৈত্রমাসে নীলাকাশে লক্ষিত সূর্য্য বলিয়াই বুঝি। সূর্য্য ও বিষ্ণু যে অভিন্ন তাহা "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—"জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর সেই পরম স্থান আকাশে বিজ্ঞ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন," এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্র হইতেই প্রমাণিত হয়।

'নীললোহিত,' ও 'নীলমাধব' শিবও বিষ্ণুবাচী হইলেও এই প্রকারে বসন্তকালীন সূর্য্যেরই নামান্তর হইতেছেন। এই তত্ত্বটী স্মরণ রাখিলে আমরা যেমন নীলপূজার প্রকৃত রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইব—তেমনই দোলোৎসব প্রভৃতি অপর উৎসবের রহস্যোদ্ভেদেও সমর্থ হইব।

নীলপূজা সাধারণতঃ চড়ক নামেই প্রচলিত। একটী গাছের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে কাষ্ঠখণ্ড জুড়িয়া ঘুরান হয় তাহাকেই 'চড়ক' বলে বা চড়ক ঘুরান বা গাছ ঘুরানও বলে। পূর্ব্বোক্ত চড়কে ঝুলিয়া যেমন গাছের চারিদিকে ঘুরা হয় তেমনই মাটীতে থাকিয়াও গাছের চারিদিকে নৃত্যগীত বাদ্যাদি করিয়া ঘুরা হয়। এই চড়কোৎসবটী যে বহু প্রাচীন বসন্তোৎসবেরই লুপ্তাবশেষ; শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের May Pole বা বসন্তযূপ নামক সুপরিচিত বসন্তোৎসবের বর্ণনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা ইংরেজী হইতে May Poleএর একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"According to Bourne, the after part of May-day, was chiefly spent in dancing round a tall pole, which is called a May-Pole, which being placed in a convinient part of the village, stands there as it were consecrated to the goddess of flower without the least violation offered to it in the whole circle of the year."

Ref. Hone's Everyday Book-Beeton's Dictionary of Universal Information.

"বৌরণের বর্ণনানুসারে বসন্তোৎসবান্বিবসের শেষার্দ্ধে "বসন্তযূপ' নামক উচ্চযূপের চতুর্দ্দিকে নৃত্য অতিবাহিত হইত। এই যূপ গ্রামের সুবিধাজনক অংশে স্থাপিত হইয়া তথায় বসন্তদেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত হইয়াই যেন দণ্ডায়মান থাকে। সমগ্র বৎসরাবর্ত্তনের মধ্যে ইহার পবিত্রতা অণুমাত্রও লঙ্ঘিত হয় না।"

পাশ্চাত্য পূর্ব্বোক্ত May Pole উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইংরেজীতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

The celebration of Mayday probaly had its origin in the worship of Flora, who was supposed to be the goddess of flower, and whose rites were solemnized at that season by the ancients. The earliest notice of the celebration of Mayday in this country was by the Druids, who used, light large fires on the summits of hills in honour of the return of spring" Ibid.

"বসন্তদিবসের উৎসব সম্ভবতঃ ফ্লোরা নামক পুষ্পদেবীর পূজা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহার পূজাবিধান সকল প্রাচীন লোকেরা এই ঋতুতেই (পুষ্পঋতুতে) সম্পাদন করিতেন। ইংলণ্ডে বসন্তদিবস উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান ড্রুইডদিগের দ্বারাই করা হইত। ইঁহারা বসন্তের প্রত্যাবর্ত্তনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য পাহাড়ের উপরে বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন।"

পাশ্চাত্য বসন্তযূপোৎসবের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে বসন্তযূপই যে চড়কের আদি রূপ তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসন্তকালে বিষুবরেখায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর সূর্য্য দর্শনের অত্যুৎকট আনন্দ হইতেই যে এই উৎসবের উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই অনুমিত হয়। আমরা নীল পূজায় যে যজ্ঞবিধির উল্লেখ পাইয়াছি ড্রুইডদিগের বহ্ন্যুৎসব তাহার নিদর্শন বলিয়াই যেন মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা May Pole উৎসবের যূপটীকে যে পবিত্র বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছি তাহাতে চড়ক গাছটী যে যজ্ঞীয় যূপেরই রূপান্তর তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। ড্রুইড্‌গণ যেরূপ ভীমরূপী পুরোহিত শ্রেণী ছিলেন—সেইরূপ পুরোহিত যোগেই চড়ক পূজায় সন্ন্যাসী সংগ্রহ হওয়া অসম্ভাবিত নয়।

চড়ক উৎসবে আমরা বেত্রহস্তে নর্ত্তনের উল্লেখ শাস্ত্রে পাই যথা:—

"চৈত্রমাস্যথমাঘেবা যোহর্চ্চয়েৎ শঙ্করং ব্রতী।
করোতিনর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্র পাণিদ্দিবানিশম্॥
মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশসপ্তদিনানিবা।
দিনমানং যুগং সোঽপি শিব লোকে মহীয়তে॥
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডম্।

"যে ব্রতপালনকারী চৈত্র অথবা মাঘমাসে ভক্তির সহিত শঙ্করের পূজা করে ও বেত্রহস্ত হইয়া একমাস, অর্দ্ধমাস, দশ বা সপ্তদিন, দিবারাত্র নর্ত্তন করে তিনি দিনসংখ্যক যুগকাল শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকেন॥"

বর্ত্তমান চড়কোৎসবেও বেত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বসন্তোৎসবেও আমরা তদ্রূপ বৃক্ষশাখা লইয়া নর্ত্তনের বিবরণ প্রাপ্ত হই যথা:—

Many of the rites, such as pulling off branches adorning them with nosegays and crowns of flowers, dancing rouud a Pole decked with garlands had no doubt their origin in the heathen observance practised in this season in honour of Flora, the goddess of flowers."

National Encyclopwdia.

"বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া উহাদিগকে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতকরতঃ যূপের চতুর্দ্দিকে নর্ত্তন প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠানেরই মূল যে এই ঋতুতে পুষ্পদেবী ফ্লোরার পূজার জন্য অনুষ্ঠিত পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়াকলাপে নিহিত রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।"

এখানে বসন্ত যূপোৎসবটীকে পৌত্তলিক ধর্ম্মমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ইহার বহু প্রাচীনত্বই সংসূচিত হইতেছে; এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয়দিগের মধ্যে এই উৎসবের সবিশেষ সৌসাদৃশ্য সন্দর্শনে ইহা যে আর্য্যদিগের উত্তরকুরুতে একত্রাবস্থানের সময়ই পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহাও সংসূচিত হইতেছে।

চড়কোৎসবে আমরা যে চড়ক ঘুরিতে দেখি ইহাকে আমরা চক্রেরই রূপান্তর বলিয়া মনে করি। কারণ চড়ক শব্দ আমাদের নিকট 'চক্র' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। সূতাকাটার যন্ত্র চর্‌কাও এই চক্র শব্দেরই অপভ্রংশ। সংস্কৃত ব্যাকরণে

বর্ণ বিপর্য্যয়ের যে নিয়ম আমরা দেখিতে পাই—তাহার দ্বারাও এরূপ অপভ্রংশ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। চড়ক শব্দও চর্‌কা শব্দেরই ন্যায় চক্র শব্দেরই অপভ্রংশ। চড়ক শব্দটীকে আমরা বরঞ্চ চর্‌কা শব্দ অপেক্ষা চক্র শব্দের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়াই মনে করি। চর্‌কা শব্দে একটী আকার বেশী কিন্তু চড়ক শব্দে যেরূপ কোন আকার বেশী নাই তবে 'র'স্থানে 'ড়'হইয়াছে ইহাই যা বৈষম্য। অপভ্রংশস্থলে এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। পাশ্চাত্যভাষায় চক্রের অর্থযাচক যে সার্কল্ (circle) শব্দ পাওয়া যায়, হইাকে 'চক্র'শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করা যাইতে পারে। 'চক্রশব্দের' রকারটীর স্থান এস্থলে 'ক'কারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াই এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহা হইতে 'চক্র' শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে কিপ্রকারে অপভ্রংশ 'চড়ক' ও 'চর্‌কা' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে তাহার স্পষ্ট নিয়মই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

এই চড়ক বা চক্রকে আমরা সূর্য্যেরই রূপক বলিয়া মনে করি, কারণ সূর্য্য মণ্ডলাকার বলিয়া ইহা 'চক্রাকার' বা 'চক্ররূপ' বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিষুবরেখায় সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন তখন সেই সূর্য্যমণ্ডল যে উত্তর কুরুতে উদিতরূপে দৃষ্ট হইত এবং অস্তমিত না হইয়া আকাশে পূর্ব্ব পশ্চিম ও পশ্চিমপূর্ব্বে ভ্রাম্যমান বলিয়া বোধ হইত। চড়ক তাহারই রূপক। 'চক্র' সূর্য্যের রূপান্তর হইয়াই ইহার নামান্তর বিষ্ণুরও রূপক হইয়াছে। তাহাতেই 'সুদর্শনচক্র' বিষ্ণুর অস্ত্র হইয়াছে এবং শালগ্রামচক্র বিষ্ণুর বিগ্রহ হইয়াছে।

সূর্য্যকে শীতকালের ছয় মাসের পর প্রথম দর্শন করিতেন বলিয়াই আর্য্যগণ একমাস পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রমোদোৎসব করিতেন চড়কোৎসব তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে কল্পিত হইয়াছে।

কেবল চড়কোৎসব নহে, পরন্তু দোলোৎসব ও রাসোৎসবও আমরা এই প্রকারে প্রাগুক্তরূপ সূর্য্যোৎসবের প্রতিচ্ছায়ারূপেই কল্পিত দেখিতে পাই। উত্তরকুরুতে বসন্ত সমাগমে সূর্য্য তথাকার আকাশে দোলায়মানরূপে পরিদৃষ্ট হইলে যে উৎসব প্রবর্ত্তিত হইত তাহা বিষ্ণুর দোলযাত্রায় পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রে দোলযাত্রার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে চড়কোৎসবের সহিত ইহার একইকাল দেখা যায় যথা :—

"চৈত্রেমাসি শীতেপক্ষে তৃতীয়ায়াঃরমাপতিম্।
দোলারূঢ়ং তমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত হরিভক্তিবিলাস।

"চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে দোলারূঢ় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া কলিতে একমাস তাঁহাকে দোলাইবে।"

চড়কোৎসবও এইরূপে আমরা সমগ্র চৈত্রমাসব্যাপী বলিয়াই বিধান দেখিয়াছি।

আমরা প্রথমেই যে বসন্তকালের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দোলার উল্লেখ পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য বসন্তোৎসবেও আমরা দোলার উল্লেখ পাই।(১) এই দোল

(১) "And one would dance as one would spring,
Or bob or bow with leaving smiles,
"And one would swing, or sit and sing &c,"—W. Barnes.

পাওয়া বসন্তকালের একটী আমোদ। বসন্তকালের এই আমোদ হইতেই দেবতারও দোলোৎসব কল্পিত হইয়াছে ইহাই সম্ভবপর।

রাসোৎসবও যে পূর্ব্বে বসন্তকালে হইত তাহার উল্লেখ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।(২) রাসোৎসব মণ্ডলাকারে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে গোপিকাদিগের নৃত্য। এই মণ্ডলের নাম রাসমণ্ডল বা রাসচক্র। কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে সূর্য্যের রূপান্তর বলিয়া বুঝিয়া এই মণ্ডল বা চক্র যে সূর্য্যেরই রূপক তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসন্তকালে বিষুবরেখায় আসিয়া সূর্য্য উত্তরকুরুতে প্রথম উদিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া যে মণ্ডলাকারে নৃত্যের প্রমোদোৎসব উত্তরকুরুবাসীদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইত তাহাই রাসনৃত্যের মূল। পূর্ব্বোদ্ধৃত পাশ্চাত্য May Pole বা May day উৎসবের সহিত ইহারও বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। বর্ত্তমানের রাসোৎসব কিন্তু বসন্তকালে না হইয়া শরৎকালে হইয়া থাকে। বোধ হয় বসন্তকালে ইহার অনুরূপ দোলোৎসব হয় বলিয়া একসময়ে একরূপের দুইটী উৎসব না হইয়া দুইটী দুই ভিন্নকালে ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষতঃ বসন্তকালে যেমন মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে শরৎকালেও তেমনই মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বসন্তকাল যেমন বিশেষ উৎসবের উপযোগী সময়, শরৎকালও তেমনই বিশেষ উৎসবের উপযোগী সময়।

বৌদ্ধধর্ম্মেও চড়কের ন্যায় উৎসবের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই উৎসবের নাম বৌদ্ধদিগের মধ্যে চোড়গ বা চোড়। বিশ্বকোষে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (Devil dance) কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। প্রধানতঃ এই উৎসব বৎসরের শেষদিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিমিস্, লদাক্, সিকিম, ভোটান প্রভৃতি সকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। এই উৎসব কোথায় লো-সি স্কু-রিং আবার কোথাও চোড় বা চোড়গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়গ উৎসব বর্ষশেষে তিন চারি দিন থাকিতে আরম্ভ হয়। আরম্ভের পূর্ব্বে বহুদূরস্থিত গ্রাম হইতে জনসাধারণ দলে দলে আসিয়া উৎসব স্থানে সম্মিলিত হন। কোন বৃহৎ মঠের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উৎসব মণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এই চোড় বা চোড়গ উৎসবই বাঙ্গলায় চড়ক নামে সর্ব্বজন বিদিত। এই চড়ক উৎসবের ব্যাপার হিন্দুশাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধকাণ্ড। ইহা বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এদেশীয় শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন। তৎকালে বৌদ্ধরাজা হইতে আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রজাসাধারণে মহোৎসাহে এই উৎসব দেখিতেন। শ্রমণেরা নানা সাজে সাজিয়া তিব্বতীয় লামাগণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা সমারোহে, ধর্ম্মরাজ ও মহাকালের পূজা হইত। তিব্বতে এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও অন্যান্য ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র জাগরূক।"

বিশ্বকোষকার 'চোড়গ' হইতেই 'চড়ক' নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা

(২) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ২৮ অধ্যায়।

বরঞ্চ হিন্দুদিগের 'চড়ক' হইতেই বৌদ্ধদিগের 'চোড়গ' নাম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বুদ্ধ বিষ্ণুঅবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ইহাতে বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য তাঁহাতে আরোপিত হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক! বিষ্ণুকে আমরা সূর্য্যেরই রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই 'বিষ্ণু' নামে আমরা সূর্য্যের 'বিবস্বৎ' নামের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তেজের অর্থই প্রকাশিত দেখি। বুদ্ধের 'অমিতাভ' নামটীতেও আমরা এইরূপ বিশ্বপ্রকাশ প্রভার অর্থই প্রকাশিত দেখিতে পাই। বুদ্ধের 'ধর্ম্মচক্র' আমাদের নিকট সূর্য্যের চক্ররূপের অনুকরণেই কল্পিত বলিয়া বোধহয়। সেই ধর্ম্মচক্রেরই রূপক স্বরূপে চড়ক পূজার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া আমরা মনে করি। বিশ্বকোষে চোড়গে 'ধর্ম্মরাজ' পূজার যে উল্লেখ আছে—সেই ধর্ম্মরাজও ধর্ম্মচক্রেরই রূপক বলিয়া বোধ হয়। 'ধর্ম্মরাজের' সহিত মহাকালের পূজার যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এই মহাকাল আমাদের নিকট মহাদেবেরই রূপ বলিয়া মনে হয়। এই প্রকারে চোড়গে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় দেবতারই সংমিশ্রণ হইয়াছে।

আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে জগন্নাথের রথোৎসবের ন্যায় রথোৎসব দেখিতে পাই—তাহাও সূর্য্য বা বিষ্ণুর চক্রেরই অনুকরণে কল্পিত।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা সকল হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে নীল বা চড়ক পূজায় বৈদিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম মতেরই সংমিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু এবংবিধ সংমিশ্রণের মধ্যেও বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে পূজার মূলতত্ত্বটীকে আমরা পরিষ্কার রূপেই প্রতিভাত দেখিতে পাই।

ছয় মাস অদর্শনের পর উত্তরায়ণ গমনে সূর্য্য বসন্তকালে বিষুবরেখায় আসিয়া উত্তরকুরুতে প্রথম উদিত হইলে সেই নীলাকাশে তাঁহার তরুণঅরুণচ্ছবি দর্শন করিয়া উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণ তাঁহার "জবাকুসুম সঙ্কাশ" রূপকে অভিনন্দন ও অর্চ্চনা করিবার জন্য হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন তখন নীল আকাশের উপর রক্তবর্ণ সূর্য্যে যেমন নীললোহিত দেবরূপ প্রকটিত হইত তেমনই নীল আকাশের তলে রক্তবর্ণ হোমাগ্নিতেও নীললোহিত দেবরূপ প্রকটিত হইত। তখন যূপকাষ্ঠের উপর আকাশের একদিকে চক্রাকার সূর্য্য বিরাজিত হইতেন। —অন্যদিকে যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে যজ্ঞস্থলে অগ্নিরূপী শিব বিরাজিত হইতেন।

এই প্রকারে উত্তরকুরুবাসী আর্য্যদিগের নিকট শীতকালে ছয়মাস অস্তমিত থাকার পর বসন্তকালে সূর্য্যের প্রথম উদয়ে তাঁহার অভিনন্দনের জন্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মোৎসব হইত চড়ক ও নীল পূজায় যে তাহারই নিদর্শন স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুরা সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

লাইকা

(১৪)

উষার শীতল বায়ু স্পর্শে লাইকার মূর্চ্ছা বা নিদ্রা ভাঙ্গিল। সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার স্মরণ হইল যে সে সমস্ত রাত্রি এই মাঠেই কাটাইয়াছে। এজন্য তাহার কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার প্রিয় বন্ধু দেবীপ্রসাদের মাতা তাহার অদর্শনে হয়ত অযথা চিন্তিত হইবেন এই আশঙ্কায় সে কিছু উদ্বিগ্ন হইল।

আলস্য ত্যাগ করিয়া লাইকা উঠিল। পূর্ব্বাকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ মৃদু রক্তাভাষ রঞ্জিত, মধ্যভাগে দিগ্বলয় রেখা যেন নিম্নস্থ কোন মহাজ্যোতির উজ্জ্বলতায় গভীর রক্তোজ্জ্বল। সেই দৃশ্য দেখিয়া লাইকার গত রাত্রির স্বপ্ন স্মরণ হইল।

সে প্রথমত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল, কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! সে কি দেখিল? যাহা দেখিল তাহাই বা কি?—

পরক্ষণেই তাহার পথশ্রান্ত ক্লান্তিবিবর্ণ মুখশ্রী আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল! সে দুই হাত তুলিয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যরশ্মিকে প্রণাম করিয়া সেই মৃৎপ্রস্তর স্তূপ হইতে নামিয়া গেল।

পথে দেখিল দেবীপ্রসাদ আসিতেছে লাইকাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে? আমি তোমাকেই ডাকিতে যাইতেছিলাম। কাল বাড়ীতে রাখালের নিকট শুনিলাম তুমি চিলার উপর বসিয়া গান করিতেছিলে, সেই জন্য আর তোমায় বিরক্ত করিতে আসি নাই, ভাল আছ ত লাইকা?

"ভাল থাকিব না ত কি হইয়াছে আমার"? —উচ্চ হাসিয়া লাইকা বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল। দেবীপ্রসাদের এই স্নায়বিক পীড়াটি অত্যন্ত প্রবল ছিল,—সে সহসা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া মহা বিব্রত হইল, এবং বন্ধুর এই হাস্যপ্রবণতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়কাতর ভাবে বলিল,—"ছাড়িয়া দাও,—ও লাইকা তোমার আজ কি হইয়াছে ভাই, সকাল বেলায় এত হাসিতেছ কেন—সমস্ত দিন এই রকমে কাটাইবে নাকি?—ছাড় ছাড়—তোমার পায়ে পড়ি ভাই,—"

লাইকা তাহাকে দুই হাতে উপরে তুলিয়া মাথা টপ্‌কাইয়া উল্টাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল—পরে বিস্ময় বিমূঢ় দেবীপ্রসাদ উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

সেদিন মহানন্দে লাইকা দেবীপ্রসাদের মাতৃদত্ত অন্নাদি ভোজন করিল। বন্ধুর বালক বালিকা গুলিকে লইয়া খেলা করিল এবং বন্ধুপত্নীর নিকট গিয়া দেবীর নামে দুই একটা মিথ্যাকথা বলিয়া দুইজনে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ খুব হাসিল। পরে শোনা গিয়াছিল পত্নীর এই মান ভাঙ্গিতে দেবীপ্রসাদকে দশ মুদ্রা ব্যয়ে একখানি

উৎকৃষ্ট রেশমী সাড়ী ক্রয় করিতে হইয়াছিল কারণ লাইকা নাকি বলিয়াছিল ঠিক্ ওইরূপ সাটীই সে বন্ধুকে কয়দিন পূর্ব্বে পাটনার বাজারে ক্রয় করিতে দেখিয়াছে!

রাত্রির আহারান্তে সকলে যখন শয়নে যাইতেছেন—তখন লাইকা দেবীকে বলিল অদ্যই ঊষাকালে সে অন্যত্র যাইবে! দেবী একটু ক্ষুব্ধ হইল, বলিল,—"সে কি লাইকা এই দুই দিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবে?—কেন—আমি কি অপরাধ করিলাম?—"

"অপরাধ কি রে পাগল! ও কথা কেন বল ভাই!—তবে দেখি"—বলিতে বলিতে লাইকার মুখভঙ্গী কেমন সুকোমল হইয়া উঠিল, চক্ষুতে যেন গাঢ়ভাব দেখা গেল—সে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বনে উদ্যত হইল।

সলজ্জে দেবীপ্রসাদ তাহার বেষ্টন মুক্ত করিয়া বলিল—"তোমাকে আমি পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর! কিন্তু জানিও লাইকা, এত দিন পরে আসিয়া"—

"চুপ্ চুপ্—বাধা দিস্‌নে—বাধা দিস্‌নে! ওরে দেবী তুই জানিস্ না!" দেবী বলিল "কি জানিনা বল!"

লাইকা বলিল, "জানিস না এই যে লাড়লী এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার মাতারও বড় নিদ্রা আসিতেছে—আর তিনি মনে মনে লাইকাকে গালি দিতেছেন! চল্ তুই জানিস্ না কিছু।"

দেবীপ্রসাদকে ঠেলিয়া লইয়া লাইকা তাহার শয়ন গৃহে দিয়া আসিল, বধূর তখনও আহার শেষ হয় নাই ঘরে একা দুইটি শিশু শয়ন করিয়া আছে,—দেখিয়া লাইকা বলিল, এ কি বধূ ঠাকুরাণী কোথায়? এখনও তাহার রাগ ভাঙ্গিস নাই দেবী?

দেবী কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লাইকা বলিল,—"চুপ্ চুপ্! তোকে আর বলিতে হইবে না, আমি জানি তুই তিন দিনের গর্দ্দভ! বধূ ঠাকুরাণী! বধূ ঠাকুরাণী! —বধূ ঠাকুরাণী কোথায় গেলে?"—

দেবী আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ চুপ লাইকা! তোমার পায়ে পড়ি।"

(১৫)

প্রভাতে লাইকা চলিল। পরিচিত গ্রামপথ, সকলেই তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিতে চায়, ধরিয়া রাখিতে চায়,—হাসিয়া হাসিয়া লাইকা তাহাদের মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া দু এক দিনের ভিতরই ফিরিয়া আসিবে আশ্বাস দিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল। একদিন পথে গেল, পরদিন প্রায় সন্ধ্যায় সে রাজগৃহের নিকটস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সহসা পরিচয় দিতে সাহস নাই, সে গ্রামপ্রান্তে এক অজ্ঞাতনাম দেবালয়ে আসিয়া থাকিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজগৃহে গমন করিবে।

গভীর রাত্রে লাইকার ঘুম ভাঙ্গিল, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, কি বলিবে ইত্যাদি নানা চিন্তায় তাহার মন বিহ্বল হইতেছিল; দূর হইতে যে সুখের মূর্ত্তি তাহার চক্ষে অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বোধ হইতেছিল সেই বাঞ্ছিত বস্তুর সান্নিধ্যে তাহাকে যথেষ্ট মেঘাবৃত দেখিল!

সকল চিন্তার নাশের উপায় আছে,

একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শনই সকল আঘাতের ঔষধ—কিন্তু!—

একটি প্রকাণ্ড কিন্তু লাইকার হৃদয়ে উদিত হইল। যদি সেই যত্নলালিতা রাজকন্যা —গরবিনী ভূপালনন্দিনী এই নামে মাত্র স্বামী—যে একরূপ ঘৃণাভরেই এতদিন তাহাকে ভুলিয়া আছে সেই নিষ্ঠুর স্বামী—অক্ষম দরিদ্র দীনহীন লাইকাকে দেখিয়া ঘৃণা করেন?—একমাত্র অন্তর্য্যামীই তাহার অন্তরের সীমাহীন সাগর তুল্য ভালবাসা দেখিতেছেন,—মানুষের চক্ষু তাহা যদি না দেখে?—

এই পঙ্কিল চিন্তায় লাইকা মরমে মরিয়া গেল! সে যাহাকে দেবী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই আঁধার ভাবনা তাহাকে কষাঘাত করিল—অতঃপর তাহার নিজের আকাঙ্ক্ষিতার ও আপনার মধ্যের এই পার্থক্য তাহাকে পীড়িত করিল, স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ঘরে সে আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে বায়ুর মৃদু স্পর্শ,—বৃক্ষ পাতার তরুণ মর্ম্মর,—সুকোমল সহানুভূতির ন্যায় তাহাকে আসিয়া ঘিরিল, বাহিরে আসিয়া সে অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

তখন ভাবিয়া ভাবিয়া লাইকা স্থির করিল,—না এভাবে যাওয়া হইবে না, প্রথমত ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহার পর রাজবাটীর রাজকন্যার সমস্ত বার্ত্তা লইয়া তবে সেখানে যাইতে হইবে।—ইহাও ভাবিল যে সন্ন্যাসী বেশই সর্ব্বাংশে নিরাপদ।

সন্ন্যাসীর বেশ তাহার সঙ্গেই ছিল, মধ্যে কয়দিন দেবীর নিকটে সে বেশ ত্যাগ করিয়াছিল মাত্র। সেই রাত্রিতেই সে আবার গৈরিক ভস্মাদি গ্রহণ করিল,—যথাসাধ্য আকারেও ছদ্মভাব ধরিতে চেষ্টা করিল। প্রভাতে পথে বাহির হইয়া লাইকা দেখিল অতি পরিচিত ব্যক্তিরাও আর তাহার প্রতি ফিরিয়া দেখে না—তখন সে বুঝিল তাহার ছদ্মবেশ ঠিক্ হইয়াছে! তখন নিশ্চিন্ত মনে রাজধানীর পথ ধরিয়া চলিল!

বেলা দুই প্রহরের সময় সে নগরে প্রবেশ করিল। রাজপথ লোকারণ্য, চারিদিকে অসংখ্য প্রাসাদশ্রেণী দৃষ্টিরোধ করিয়া দাড়াইয়া আছে,—লাইকা প্রথম বিচলিত হইল, সে কোথায় চলিয়াছে? কোথায় গিয়া প্রথম দাঁড়াইবে?—সেই নগরী সেই পথ, যেখানে লাইকা পূর্ব্বে অবাধ গতিতে ভ্রমণ করিয়াছে,—আজ কিন্তু সেইখানেই তাহার মুহুর্মুহু পথভ্রান্তি হইতে লাগিল,—সে কোথায় যাইবে?—কেন যাইতেছে?—যে আশায় চলিয়াছে তাহা পূর্ণ হইবে কি না?—হায় সংসার! তোমার কোথাও কি নিশ্চিন্ততা নাই?—এত দুর্ভাবনা এত অনিশ্চয় সংশয় লইয়া পৃথিবীর মানুষ কেমন করিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করিতেছে?—

ভাবিতে ভাবিতে লাইকা নিজের প্রাণের দুর্ব্বলতায় মনে মনে হাসিল! যথার্থ,—সে সংসারের পক্ষে এমনি অকর্ম্মণ্যই বটে! তবে ভগবানই বা এ অপদার্থকে সৃজন করিয়াছেন কেন? আর জননী ধরিত্রী দেবী—যে দীন সন্তান তাহার কোন উপকারে

আসিল না তাহার সকল ভার কেন বহন করেন ?

হে সর্ব্বশক্তিমান্! অহেতুক দয়াশীল! তোমার শক্তির জয় হউক! তোমার নাম ধন্য হৌক! অধম লাইকা যেন তোমার দয়ায় অবিশ্বাসী না হয়,—কে বলে সংসার দুঃখের ?

প্রফুল্ল চিত্তে সে তখন নগর চত্তরের পার্শ্বে এক বিশাল দীর্ঘিকার সোপানে আসিয়া বসিল। অনেক পথিক অনেক সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া আছে,—কেহবা ইটের চুল্লী জ্বালাইয়া খিচুড়ী পাকাইতেছে। জলে বালক বালিকাগণ ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া স্নান করিতেছে, গ্রামবৃদ্ধেরা কেহ জলে কেহ সোপানে বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে মাঝে মাঝে বালকদিগের প্রতি সঙ্কোচ দৃষ্টি করিতেছেন।

ইহারই মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া একজন প্রসন্নমূর্ত্তি নাগরিকের নিকট লাইকা বসিল। তিনি বাজার করিয়া এক প্রকাণ্ড পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছেন,—সম্প্রতি কিছু শ্রান্তি দূর করিবার মানসে এখানে আসিয়া বসিয়াছেন! তাঁহার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আলাপ ইচ্ছার ব্যগ্রভাব দেখিয়া সে বুঝিল ইহারই নিকটে তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবার আশা আছে।—

লাইকাকে কাছে দেখিয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—"কি সাধু বাবা,—কোথা হইতে আগমন হইল, কোথায় যাইবেন ?" ইত্যাদি কথায় তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে লাইকাও তাহার কথায় ব্যগ্রভাবে যোগ দিল, মনের মত মানুষ পাইয়া গল্পপ্রিয় লোকটি গৃহগমনের কথা ভুলিয়া গেল। তিনিও যে সম্প্রতি প্রয়াগধাম গিয়াছিলেন, সেখানকার পাণ্ডাদীয়া কিরূপ প্রচণ্ডা, গঙ্গায় জল কত অল্প—ইত্যাদি নানা বিবরণ দিলেন। তাঁহার পিতামহী যে অতিদূর ও দুর্গম তীর্থ শ্রীজগন্নাথ জী দেখিতে গিয়াছিলেন তাহাও বলিতে ভুলিলেন না; পরে যখন শুনিলেন লাইকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও বদ্রিনারায়ণ দর্শন করিয়াছে তখন ত সাধুর প্রতি তাঁহার এমন অগাধ ভক্তি জন্মাইল যে বাড়ীতে যদি বৃদ্ধা মাতা না থাকিতেন ত বগড়াই বধূর মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চয় বাবাজির চেলা হইয়া তাহার সহিত তীর্থে তীর্থে বেড়াইতেন।

অবশেষে নগরের কথা, হাট বাজারের কথা—সরিসার দর চড়িয়া যাওয়ায় তেল কত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে সে কথা হইতে হইতে লাইকা ধীরে ধীরে রাজবাটির কথা পাড়িল।

রাজবাটির কথায় হঠাৎ সেই বাচাল প্রৌঢ়টির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল,—কিন্তু প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়া দিয়া বলিলেন, আহা হা রাজার কথা বলিবেন না।—সেই দারুণ শোকের পর আর তাঁহার নাকি মুখে হাসি নাই—, সে দিন শুনিলাম—

লাইকা বিস্মিত ভাবে বাধা দিয়া বলিল,—শোক? কোন শোক? সম্প্রতি রাজবাটীতে কি কাহারও কিছু হইয়াছে?—

"জানেন না আপনি?" আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি ইহাও—জানেন না! রাজকুমারী—আমাদের রাজকন্যা সে ৺কাশীধাম করিয়াছেন!—হাঁ বাবাজি কাশীতে পুরুষ মরিয়া ত শিব হয় স্ত্রীলোক মরিয়া কি ভগবতী হয় না কি?—"

লাইকা বোধ হয় কথা গুলি শুনে নাই, বিস্ফারিত চক্ষে প্রজ্বলিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল— "রাজকন্যা—! কোন রাজকন্যা?—"

"আঃ তাহাও জানেন না?—আপনি কি কখনো এদেশে আসেন নাই? আমাদের রাজার ত আর সন্তান নাই—ঐ একমাত্র কন্যা ছিলেন বারি দেবী!"

লাইকা বাহিরে পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল কিন্তু প্রাণ তাহার হৃদয়ের মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একবার সে দৃষ্টি তুলিল—একি নূতন দৃশ্য? এই কি সেই পৃথিবী?—রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটাদি অপসৃত হইলে তাহার যেরূপ কঙ্কালসার মূর্ত্তি বাহির হয় তেমনি করিয়া ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত বর্ণ সকল আলোক সরাইয়া দিল? একি কর্কশ দৃশ্য? কি ভীষণ মূর্ত্তি—?

বচনপটু নাগরিক বলিয়া যাইতেছিলেন—"হাঁ সেই বারি দেবীর বিবাহ হইয়াছিল লাইকাজির সহিত,—তাহাকে জানেন বাবাজি?"

রুদ্ধ স্বরে লাইকা বলিল "জানি—তারপর?"

তারপর কিন্তু তিনি স্বামীর আর দেখা পান নাই! লাইকা নাকি সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার ত বিবাহ করিবার মোটে অভিপ্রায় ছিল না মহারাজাই জোর করিয়া

বিবাহ দেন, কিন্তু ফল আর কি ভাল হইল বলুন, লাইকাজিও দেশত্যাগী হইলেন। রাজকুমারীও স্বামী হারাইয়া প্রাণে বাঁচিলেন না!"

মৃদু স্বরে লাইকা জিজ্ঞাসা করিল "তাঁহার কি পীড়া হইয়াছিল জানেন?—"

"না কৈ তাহাত শুনি নাই! এখানে ত তাঁহার মৃত্যু হয় নাই যে জানিব! তবে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল ছিল শুনিতাম, কখনোত সাধ করিয়া কিছু খাইতেন না বা পরিতেন না,—রাণী মা নাকি সেজন্য কত দুঃখ করিতেন!"

তিনি আরও কত কি বলিতেছিলেন, লাইকা তাহা শুনিতেছিলনা—সে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, "এততেও লোকের হৃদয় আমার প্রতি অনুকুল?—এমন ঘৃণিত জীবকে এখনও সংসারের লোক ভালবাসে?—ছি ছি!" এই ভালবাসাই তখন লাইকার অসহ্য বোধ হইল,—যাহাকে দেবতারা ঘৃণা করেন—যাহাকে তাহার প্রাণাধিকা বারি ক্ষমা করে নাই তাহাকে অপরে কেন ক্ষমা করিবে—কেন ভাল বাসিবে? মৃত্যু যাহাকে ঘৃণায় স্পর্শ করে নাই—সে আবার জগতের প্রীতির স্পর্শ পাইবে কেন?—যে সর্ব্বস্বহারা প্রাণ কেন এখনও তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে?—

তাহার শুষ্ক মুখে চক্ষে বেদনার দাহন নাগরিকও লক্ষ্য করিলেন,—শশব্যস্তে বলিলেন, "হাঁ বাবাজি! বড় দুঃখের কথাই বটে—আপনি কি বড় কষ্ট বোধ করিলেন এ কথায়?—

লাইকা কি বলিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন,—"এই সন্ন্যাসী সাচ্চা লোক বটে নতুবা পরের দুঃখে পরে এত ব্যথা পাইবে কেন?"—অতপর আর, গল্প জমিতেছে না দেখিয়া সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া পোটলা লইয়া লোকটি চলিয়া গেলেন। চারিদিকে তেমনি কোলাহল উত্তেজনা উৎসাহ,—কিন্তু লাইকার অন্তঃকরণ তখন নীরব হইয়া গিয়াছিল। দুপ্রহরের তীক্ষ্ণ রৌদ্র মাথার উপর আসিল,—ক্রমে গড়াইয়া মুখে পড়িল, পথিকেরা তখন সকলেই ছায়ায় গিয়া বসিয়াছে কিন্তু লাইকা উঠিল না, ক্বচিৎ দু একটি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "বাবাজি রৌদ্রে বসিয়া কেন?" কিন্তু উত্তর না পাইয়া মীমাংসা করিয়া লইল যে সাধু হয়ত সমাধিতে আছেন।

বেলা শেষ; আবার সোপানতলে জনতা দেখা দিল, তখন লাইকা উঠিল। কাহাকেও কোন কথা না গঙ্গাভিমুখে চলিল। গঙ্গাতীরও জনশূন্য নয়—বসন্ত প্রদোষে কত নরনারী জলে নামিয়া সমস্ত দিনের—শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল করিতেছে। খেয়াঘাটে ছোট ছোট নৌকাগুলি জনপূর্ণ, নগরের কাজ শেষ করিয়া—দোকান বাজার করিয়া সকলেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। লাইকা সে দিক দিয়া গেল না,—কম্পিত দ্রুত চরণে সে এ সকল দৃশ্য এড়াইয়া শ্মশান ঘাটে নামিল।—

"মা পতিতোদ্ধারিনি! এ অধম সন্তানকে তুমি ক্ষমা করিবে না?—এত যে এত ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি সে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় চায় তুই কি তাহা দিবি না মা জননি?—"

লাইকা একেবারে জলের নিকট আসিয়া শুইয়া পড়িল;—বড় যে কান্না পায়! মাথার সব চুল যে এক একটি করিয়া ছিঁড়িতে ইচ্ছা করে—আর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যে বুকের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত রক্ত এই গঙ্গার জলে ঢালিয়া দেয়!—

তীরের শ্মশান দৃশ্য ক্রমে অস্পষ্ট হইতেছিল,—সন্ধ্যার অন্ধকার প্রগাঢ়;—কতক্ষণ সে এইভাবে পড়িয়া থাকিল! দূরে দূরে মন্দির দেবালয়ে আরতির বাদ্য উঠিয়াছিল,—"শান্তি শান্তি পরিপূর্ণ কল্যাণ!"—কিন্তু লাইকার জীবন কি অশান্ত! কি অমঙ্গলময়?—প্রভু! হরি দীনবন্ধু! উপায় দাও—লাইকাকে এ আত্মহত্যার ভীষণ সংকল্প হইতে বাঁচাও!—"

তখন শোকবিদগ্ধ লাইকার শুষ্ক ওষ্ঠ ভেদ করিয়া অতি করুণ স্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল,—

"ভয় বিহ্বল চিত কতহুঁ ন পরতিত
কবহুঁ ন মিলন আশা,—
চির করম হীন হীন ভজন দীন
কাঁহা মেরা মিলে বিশোয়াসা?"

ক্রমে অশ্রুজলে সে শোকসঙ্গীতও ডুবিয়া গেল,—এতক্ষণে লাইকা কাঁদিল, শোক যেখানে আসিয়া দারুণ পাষাণের মত চাপিয়াছিল তাহা যেন কিছু মুক্তি পাইল

তাই সে সেইখানে দৃষ্টি করিয়া কি একটা গূঢ় অভিমানের ভাবে নীরব অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। কেন? সে কি এত অপরাধ করিয়াছিল যে সে আর ক্ষমা পাইল না? —কে তাহার নাম "দীনদয়াল" রাখিয়াছিল? পাষাণ—পাষাণ নিষ্ঠুর!—তুমি যে স্বয়ং রাধিকার নয়নে জল দেখিয়াছিলে! লাইকা ত অতি হীন!

ক্রমে সে শ্রান্ত নয়ন মুদিল, চক্ষুপ্রান্ত দিয়া ধীরে ধীরে জলধারা গড়াইতেছিল,—হাসিও আসিতেছিল,—আশা? এখনও সে কোন আশা করে নাকি? ভগবান! তুমিই জান সে এখন কি চায়!

সহসা অতি দূরে মৃদুকরুণ গুঞ্জনবৎ সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সে সুর সে রাগিনী লাইকার অপরিচিত নয়—শুনিবামাত্র সে উৎকর্ণ হইল। তীর বহিয়া কে গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, সুমিষ্ট কণ্ঠে কে এ গান গায়? লাইকার প্রাণ যেন সেই সুরে আকণ্ঠ ডুবিয়া গেল—ক্ষণকালের জন্য সে সকল ভুলিয়া গান শুনিতে লাগিল। এত মধুর? এই পৃথিবীতে এই মানুষের কণ্ঠেই কি সুধার আবাস?—লাইকার শিরায় শিরায় সেই সুধাস্রোত বহিয়া গেল।

গীতধ্বনি ক্রমে নিকটস্থ হইতেছিল, ক্রমে প্রত্যেক শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। লাইকা কান পাতিয়া শুনিল।—

"শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম!
শুন সখি শুন শুন অমৃত সমান
মধুর মধুর শ্যাম নাম!
শ্যাম নাম কি গুণ হাম মুরখ নারী
কভু নাহি বরণনে শঁকে,
নাম জপ কারণ শিব পঞ্চানন
দশ নয়নে জমু লঁখে!
শুন সখি শুন মেরো ভাষা!
কাহে লো স্বজনি ত্যজবি পরাণি
কাহে ত্যজবি সব আশা!
শ্যাম সরব তেরা শ্যাম গরব তেরা
শ্যাম লাগি সব দেহ দান,
তহুঁ নাম মধুর কভু নহি ছোড়বি
গাহ সখি গাহ শ্যাম নাম!
জগত পরতর শ্যাম সুন্দর
তহুঁ পরতর তহুঁ নাম!
অব সদয় বিধি নাম মিলল যদি
জানহ মিলব শ্যাম!"

গায়ক ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে লাইকার নিকটবর্ত্তী উচ্চ পাড় দিয়া চলিয়া আবার ক্রমে ক্রমে দূরে অতিদূরে চলিয়া গেল।—লাইকার তাহার প্রতি লক্ষ্যও করিল না কেবলমাত্র সঙ্গীত স্রোতেই তাহার প্রাণ ভাসিয়া গিয়াছিল—সংসারে তাহার চিত্ত ছিল না। গীত শেষ হইল কিন্তু বাতাস যেন এখনও তাহার গুঞ্জনধ্বনিতে, গঙ্গার জল যেন তাহার কলনাদে তাহারই প্রতিধ্বনি গাহিতেছে!

লাইকা উঠিয়া দাড়াইল;—দেখিল এ কী পরিবর্ত্তন আবার? সেই পৃথিবী! সেই পরমাসুন্দরী, রূপ রসে সুগন্ধময়ী—মোহময়ী ধরণী! যাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার চক্ষে একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল! আবার তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত।

কোন্ ঐন্দ্রজালিক মায়াদণ্ড স্পর্শে তাহার মোহ দূর করিল? আছে—আছে—এখনও তাহার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে;—

বারি মরিয়াছে কিন্তু তাহার চিন্তা আছে—স্মৃতি আছে! তাহাই লইয়া ত সে অনায়াসে জীবন ক্ষেপ করিতে পারে!

"শ্যাম! শ্যাম—শ্যাম শ্যাম শ্যাম—শ্যাম!"

হরি তুমি সত্যই দীনদয়াল!

কর্ম্মহীন লাইকার কাতর প্রার্থনাও তোমার কাছে বিফল হয় নাই। বড় দুঃখে সে তোমায় ডাকিয়াছিল, ডাকিব বলিয়া ডাকে নাই, শুধু বেদনার আবেগে ডাকিয়াছিল, তবু তুমি আসিয়াছ প্রভু! তবু এ অধমকে দেখা দিয়াছ বিশ্বমূর্ত্তি?—ওগো, কেমন তুমি—প্রিয়তম! কত দয়া তোমার? কেন তোমায় বোঝা যায় না? তুমি এত মধুর তবু সময় সময় তোমায় পাষাণের মত কর্কশ দেখায় কেন? কেন? ওগো কেন?

পার্শ্বের বালুকাস্তূপে ভর দিয়া বসিয়া লাইকা ভাবিতেছিল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার এলায়িত দেহ ঢলিয়া পড়িল, রুদ্ধকণ্ঠে অতি মৃদু সঙ্গীতগুঞ্জন শ্রুত হইল, অতি ক্ষীণ হাসির ছায়ায় তাহার সমস্ত মুখখানি উজ্জল—অন্যের অশ্রাব্য স্বরে আপনার সুকণ্ঠে আপনি মুগ্ধ কাননকোকিলের স্বরে সে গাহিতেছিল,—

অবহুঁ নহি সমঝে শ্যাম কোত চতুরালি রে!
বন্‌শী ফুকারী বোলাসে মোর
কাঁহা কাঁহা ঘুমাই রে!
যব খোঁজয়ি সাহারা ঢুঁড়য়ি বন
নাহি মিলে তেরি দরশ রে,
নয়ন লোর বহত ঘোর, আশ টুটি' যাই রে!

ফিরিনু নিরাশে ঘরমে হাম
মরণ কাম মাঙ্গিরে।
অব দেখি মেরা মদন মোহন দুয়ারি আইরে।
হসত মধুর নয়ন চতুর করত নাগরাই রে!"

শোকতাপ ভুলিয়া লাইকা আনন্দে গীত গাহিতে লাগিল। রাত্রি গভীর,—কতক্ষণ যে সে এভাবে কাটাইল তাহার স্থির নাই,—অবশেষে গাহিতে গাহিতেই সে উঠিল। চারিদিকে অন্ধকার—দূরে নগর হর্ম্ম্যশিরে আলোক জ্বলিতেছে, অস্ফুট জনকোলাহল শোনা যায়,—সেইদিকে চাহিয়া লাইকা একবার কাঁপিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার?

কিন্তু তখন তাহার হৃদয় সঙ্গীতে পূর্ণ ছিল—সেই বেদনা—সেই পুনরুত্থিত শোকের সবলে সরাইয়া অন্তর গাহিল।

শ্যাম গরব তেরা শ্যাম সরব তেরা
শ্যাম লাগি সব দেহ দান
শ্যাম মধুর নাম কভু নহি ছোড়বি
গাহ সখি গাহ শ্যাম নাম!

আবার লাইকার প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল—সে দ্রুত চরণে ঊর্দ্ধে উঠিল! গীত সুস্বর! ইহার নিকট কি শোক তাপ দাঁড়াইতে পারে? জগৎ একদিকে আর সঙ্গীত এক দিকে! হৃদয়বীণার মধুর মূর্চ্ছনায় যেন সমস্ত আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে লাইকাও উঠিল। ধীর পদে অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে সেই নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

গড়ের মাঠ

(২)

ময়দানে কেবল একটি মাত্র দেশীয় লোকের প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি দারভাঙ্গার মহারাজার। তাঁহার দানশীলতায় এদেশবাসীর অনেক উপকার হয়েছে।

ইডেন গার্ডেনে ফেরবার পথে হাইকোর্টের ঠিক সামনেই লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি! ইনি যে সময়ে এদেশের শাসনকর্ত্তা সে সময় ইংলণ্ডে সুবিখ্যাত মেকলে সাহেব সুপ্রিম কাউন্সিলের আইনসদস্য ছিলেন। বেন্টিঙ্কের মূর্ত্তিবেদির উপর যে কথাগুলি লিখিত তাহা মেকেলে সাহেবেরই রচনা। *

এদেশবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য লর্ড বেন্টিংক্ যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। সতীদাহ ইত্যাদি অনেক নিষ্ঠুর প্রথারও তিনিই মূলোৎপাটন করেন।

তার পর উদ্যানের অন্যদিকে গঙ্গার ধারে যখন আমরা নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করবার জন্য গিয়ে দাঁড়াই তখন ষ্ট্রাণ্ডের অবিরাম জনস্রোত ও গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে স্যার উইলিয়ম পিলের শ্বেতমূর্ত্তিটী চোখের সামনে ফুটে উঠে। ইনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় নৌ-সেনাপতি হয়ে এদেশে এসেছিলেন। কল্‌কাতায় কেবলমাত্র এই একজন নৌসেনা-পতির মূর্ত্তিই দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌর যুদ্ধে ইনি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলেন।

ষ্ট্রাণ্ড থেকে নদীর ধারে ধারে কিছুদূরে প্রিন্সেপ ঘাট পর্য্যন্ত গেলে সেখানে অশ্বোপরি উপবিষ্ট যে একজন যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর নাম রবার্ট ফর্ণেলিস (First Baran Napier of Magdala)। ইনি ১৬ বৎসর বয়সে এদেশে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বার বৎসর পরে দার্জ্জিলিং Hill station প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার জীবনী নানা তথ্যে পূর্ণ। মিউটিনীর সময় অনেক সাংঘাতিক যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ইনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ভীল দস্যু তাণ্ডিয়া টোপী ও তাহার প্রায় ১২ হাজার দস্যু অনুচরকে ইনি মাত্র সাত শত সৈন্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই জন্য তাঁকে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Knight Commander উপাধি ভূষণে ভূষিত করা হয়। লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পর অন্য একজন রাজপ্রতিনিধি এদেশে আসা পর্য্যন্ত ইনি কয়েকদিন এদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এবিসিনিয়া দেশে এক অভিযান নিয়ে যান। এবং ৬ মাসের মধ্যে যুদ্ধ কৌশলে সেখানে ইংরেজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে নানা সম্মান ও

* "He abolished 'cruel rites', and effaced humiliating distinctions ; he gave liberty to the exprssion of pubiic opinion ; his constant study it was to elevate the intellectual and moral Character of the nations commited to his charge."

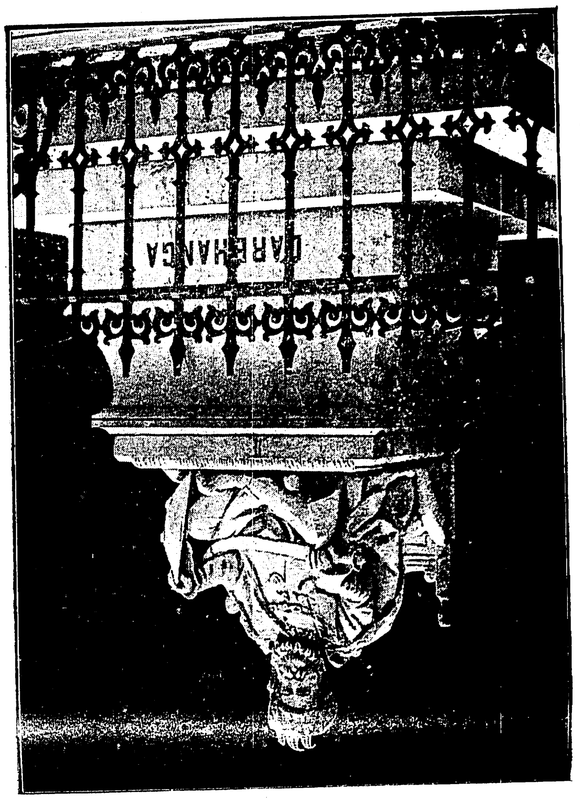

সেনাপতি ব্যারণ নেপিয়র অফ্ ম্যাগ্দালা



স্যর উইলিয়ম্ পিল্

বারভাঙ্গার মহারাজা

লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক

উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি পরে কিছুদিন ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে বিলাতের ছোট বড় সকলেই গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। সেণ্টপল গির্জ্জায় ইহাকে রাজসম্মানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কল্‌কাতার এই মূর্ত্তিটীর ন্যায় তাঁহার আর একটী প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডন সহরে ওয়াটারলু প্লেসে স্থাপিত আছে।

স্থান-মাহাত্ম্য

অধুনা শিক্ষিত জগতে স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া একটা জিনিষের অস্তিত্ব খুব কম লোকই স্বীকার করিবে। কিন্তু অনেক সময় স্থান বিশেষে এমন সব ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় যে পার্থিব বিজ্ঞান তাহার কোনো মীমাংসা করিয়া দিতে পারে না, অথচ তাহা অবিশ্বাস করিবারও জো নাই।

এই স্থান-মাহাত্ম্য আমাদের দেশে চিরকালই লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে এবং এজন্য প্রতিবৎসর যাত্রীর সংখ্যাও কিছু কম হয় না। তারকেশ্বর এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য স্থান।

অনেকেই হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে ইংরেজদের ভিতরও এ বিশ্বাসের অভাব নাই। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে কোন কোন স্থানে রোগ-শান্তির জন্য রুগ্ন-যাত্রীদের সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের ভিতর সেইণ্ট উইনফ্রাইডের কূপ (Well of St. Winefride) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কূপ সম্বন্ধে লণ্ডন ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকদিগকে ইহার কিছু বিবরণ সংকলন করিয়া দিতেছি।

গত বারো শত বৎসর ধরিয়া এই কূপ অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়া আসিতেছে এবং এখনো করিতেছে। ইহার খ্যাতি পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক বাড়িয়াছে বই কমে নাই; কারণ গত কয়েক বৎসর যাবৎ আরোগ্যের সংখ্যা আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশিষ্ট ডাক্তারগণ ইহা দেখিতেছেন কিন্তু এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোনো কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না।

ইহা ওয়েলস্ প্রদেশের একটি পর্ব্বতোপরি হালি-ওয়েল সহরের পাদদেশে অবস্থিত। অধুনা এই কূপের উপর যে একটি বৃহৎ গির্জ্জা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

একটি ঝরণা হইতে এই কূপে সর্ব্বদা জল আসিতেছে। ঠিক আমাদের চন্দ্রনাথের সীতা-কুণ্ডের মতন। তবে সীতাকুণ্ডের মত সেখানে আগুন জ্বলিয়া উঠে না। ইহার জল অতি স্বচ্ছ এবং শীতকালেও তাহা জমিয়া যায় না।

কূপের পাশেই অতি সুন্দর কারুকার্য্য নির্ম্মিত সেণ্ট্ উইনফ্রাইডের একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত। পিউরিটানরা যখন বিদ্রোহী হয় তখন ইহার প্রাচীন মূর্ত্তিটি উহারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই মূর্ত্তিটির কাছেই সেণ্ট বিয়োনোর প্রস্তর। যাত্রীরা কূপের জলে স্নান করিয়া আসিয়া সেখানে হাঁটু-গাড়িয়া প্রার্থনা করে। চারিদিকের খিলান ইত্যাদিতে কানাখোঁড়া প্রভৃতি রোগীর বহু যষ্টি ঝোলান রহিয়াছে, ইহারা নীরবে এই কূপের আশ্চর্য্য ক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে; যাত্রীরা আরোগ্য হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এগুলি সেখানে রাখিয়া গিয়াছে।

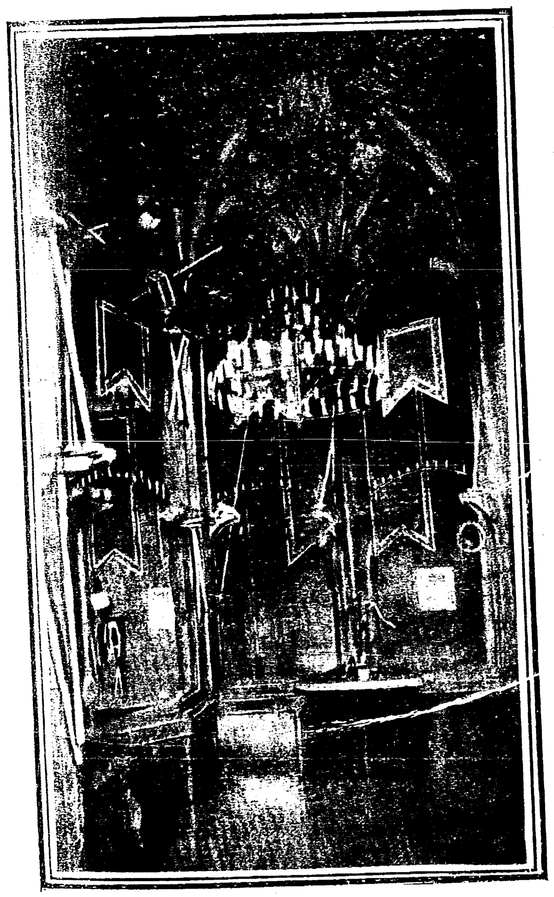

কূপমধ্যে রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পরিত্যক্ত যষ্টি

কূপের খুব নিকটেই যাত্রীদের স্নান করিবার জন্য একটি বাঁধানো পুকুর আছে এবং উহার পাশে কাপড় ছাড়িবার জন্য ছোট ছোট অনেকগুলি কুঠরী রহিয়াছে। এখানে ঈষ্টারে রবিবার হইতে নবেম্বরের তেরো দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুপুরে উপাসনা হইয়া থাকে।

সারা বছরই ইহা যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে কিন্তু জুন ও নবেম্বর মাসেই যাত্রীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হয়। যাত্রীরা এখানে রোজই প্রাতঃকাল ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত স্নান করিতে পারে। কিন্তু প্রাতে নয়টা হইতে বারোটা ও বিকালে আড়াইটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত শুধু রমণীদের জন্য এবং বাকি সময়টা পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

কতকগুলি বিশেষ দিনে সন্ধ্যাবেলা নিকটস্থ গির্জ্জা হইতে ভক্ত যাত্রীগণ মশাল ও পতাকা হস্তে একটি মিছিল বাহির করিয়া কূপ পর্য্যন্ত যায়। সেখানে সকলে সমবেত হইয়া এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করে—"হে উজ্জ্বল নক্ষত্র, হে বৃটিশজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্প, হে বিপদাপন্ন যাত্রীদের আশা ও ভরসা স্থল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করেন; হে পবিত্র কুমারি আমাদের জন্য প্রার্থনা করে।"

উহার নিকটে একটু উচ্চভূমিতে দরিদ্র যাত্রীদলের থাকিবার জন্য একটি আবাস আছে। দৈনিক এক শিলিং মাত্র মূল্যে এখানে তাহাদিগকে আহার্য্য ও বাসস্থান দেওয়া হয়। যাহারা খুবই দরিদ্র তাহাদিগকে কিছুই দিতে হয় না। এই বাড়ীটি পরসেবায় নিযুক্ত কয়েকটি 'ভগিনীর' তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁহারা এই গরীব যাত্রীদিগকে সকল রকমে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করেন। প্রতিদিন অন্ধ খোঁড়া যাত্রীদিগকে কূপে স্নান করাইবার জন্য লইয়া যান।

লাঠিতে ভর করিয়া দলে দলে তাহারা যাইতেছে, রোগমূর্ত্তির আশায় সেই বেদনা-বিধুর মুখগুলি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; তারপর ফিরিয়া আসিবার সময় কাহারো বা রোগ-মুক্তির জন্য মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস আর কাহারো বা স্বভাবতঃ ম্লান বিরস বদন —রোগ শান্তি হয় নাই বলিয়া অধিকতর ম্লান ও বিরস হইয়া উঠিয়াছে—এই মর্ম্মস্পর্শী

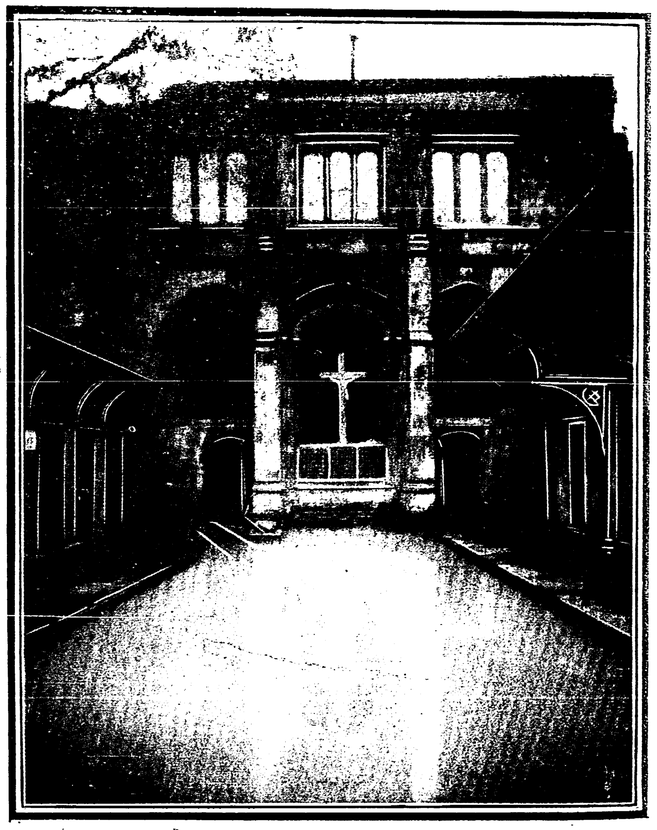

যাত্রীদের স্নানের স্থান

দৃশ্য সর্ব্বদাই সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন এই অত্যাশ্চর্য্য কূপের ইতিহাসটা এইরূপ:— খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিয়োনো নামে একজন ধর্ম্মাত্মা সেখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি থিউত নামে একজন দলাধিপতির অনুমতি লইয়া সেখানে একটি গির্জ্জা প্রস্তুত করিলেন। এই থিউতের উইনফ্রাইড বলিয়া একটী কন্যা ছিল। তাঁহার জন্ম সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। থিউত তাঁহার কন্যার শিক্ষার ভার বিয়োনোর উপর অর্পণ করিলেন।

একদিন রবিবারে উইনফ্রাইডের শরীর ভাল না থাকায় তাঁহার মাতাপিতা সকলেই উপাসনার জন্য গির্জ্জায় গেলেন, কিন্তু অসুস্থ বলিয়া তিনি একা বাড়ীতে রহিলেন। এমন সময় রাজা এলেনের পুত্র কারাদক আসিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পাপমতি কারাদক তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু উইনফ্রাইড কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে কারাদক ভয়ানক চটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া উইনফ্রাইড তাঁহার পিতার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু কারাদক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

১১৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রুজবেরির এবট রবার্ট এই কূপের যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডের 'বড্‌লিয়ান' লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে যে উইনফ্রাইডের মস্তক যেখানে পড়িল সেই স্থানের মাটি ফুঁড়িয়া একটি জলধারা বাহির হইল এবং তাহাই আজও পর্য্যন্ত বহিয়া যাইতেছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন, "তাঁহার দেহ হইতে যে-রক্ত ধারা বাহির হইল তাহা পর্ব্বত বাহিয়া নীচে পতিত হইতে লাগিল ও পর্ব্বতের সেই সকল পাথর লালে-লাল হইয়া উঠিল। সেই সকল রক্তবর্ণ পাথর দেখিয়া মনে হয় যেন ঠিকই রক্ত মাখা। পাথরগুলি হইতে লাল দাগ কিছুতেই উঠানো যায় না। ঐ সকল পাথরে যে-সকল শৈবাল জন্মে তাহাতে ধূপ ধুনার গন্ধ পাওয়া যায়।"

এই সকল পাথর আজো বর্ত্তমান আছে। অনেক সময় লালদাগ গুলি ঠিক রক্তের দাগ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন আবিষ্কার হইয়াছে উহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল হইতে সৃষ্ট। নর্থ-ওয়েল্‌সে এই রকম শৈবাল মাঝে মাঝে অনেক দেখা যায়।

কিম্বদন্তী এই যে বিয়োনোর আকুল প্রার্থনায় উইনফ্রাইড আবার জীবন লাভ করিয়া ৯৬৬০ খৃষ্টাব্দে কুমারী অবস্থায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। শ্রুজবেরিতে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু অষ্টম হেন্‌রি যখন ইংলণ্ডের ধর্ম্মকে পোপের কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন তখন তিনি ছোট বড় অনেক মঠ ধ্বংস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার দেহ তাঁহার গোরস্থান হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অধুনা তাঁহার শুধু একটি অঙ্গুলি মাত্র এই কূপ-মঠে রক্ষিত আছে বলিয়া কল্পিত। সেখানে তাঁহার শবাধারের একটি কাষ্ঠখণ্ডও রহিয়াছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে সেণ্ট উইন-

ফ্রাইডের কূপে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে সেগুলি সবই লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। শুধু যে মূর্খ দরিদ্ররাই সেখানে যায় তাহা নয়, প্রাচীন কাল হইতেই দেশের গণ্যমান্য রাজা মহারাজা সকলেই সেখানে অতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গমন করিতেছেন, এবং সেই কূপের রোগ শান্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। এ সব দেখিয়া কোনো বিচারশক্তিশীল ব্যক্তিই ব্যাপারটা এইবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না।

এই কূপের দুই মাইল দূরে বেসিদার্কে একটি গির্জ্জা ছিল। আজো উহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। একাদশ খৃষ্টাব্দে সেখানকার এক পুরোহিত উইনফ্রাইডের যে জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি সেখানকার যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছেন তাহাও লিখিত আছে।

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তাঁহার সেই পুস্তকে রহিয়াছে। একদিন এক দরিদ্র রমণী তাহার পুত্রকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। পুত্র জন্মাবধি বোবা। পুত্রকে আনিয়া সেখানে স্নান করানো হইল এবং তাহার মুখেও খানিকটা জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরই তাহার মূকত্ব ঘুচিয়া গিয়া মুখে কথা ফুটিল।

আরেক দিন এক জন্মান্ধ বালিকাকে সেখানে আনা হইল। তাহাকে স্নান করানোর পর তাহার ঘুম পাইল। ঘুম হইতে যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন সে দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়াছে।

আর একটি অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা; একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন লোক তাহার মৃত কন্যাকে গোর দিবার জন্য উইনফ্রাইডের গির্জ্জাতে লইয়া আসিল। গির্জ্জার বেদীর সম্মুখে মৃত বালিকাকে শোয়াইয়া রাখিল। সেদিন আর গোর দেওয়া হইল না। পরদিন প্রভাতে যখন গির্জ্জার দরজা খোলা হইল তখন সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিল যে, মেয়েটি বাঁচিয়া উঠিয়াছে এবং খাবার চাহিতেছে।

হাজারো রকম রোগের সেখানে শান্তি হইয়াছে, এই প্রকার খবর প্রাচীন লেখা ও জনরব হইতে জানিতে পারা যায়।

১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেভারেণ্ড ফিলিপ লেটম এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষীভূত যথেষ্ট প্রমাণ-যোগ্য অনেক ঘটনা তিনি একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য গির্জ্জা ও কূপ ইত্যাদিতে ক্যাথালিকদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু লেটন সাহেবের পুস্তক হইতে দেখা যায় যে প্রটেষ্টাণ্ড ধর্ম্মের বন্যা যখন ইংলণ্ড তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল তখনো এই কূপের সুনাম ও ক্ষমতার প্রতি কেহ ভক্তিহীন হয় নাই।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যর রোজার বোডেনহাম কে, সি, বি, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। অনেক বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা তাঁহার কিছু করিতে পারিলেন না এবং সে রোগ চিকিৎসার অতীত বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি অন্যের পরামর্শানুসারে এই কূপে স্নান করিবার জন্য আগমন করিলেন। শুনা যায় স্নান করিয়া যখন উঠিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সেই অবধি আর কখনো তাঁহার সে ব্যারাম হয় নাই!

সেই সময়কার আরেকটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, তখনকার বৃটিশ নৌসৈন্যের খাদাঞ্চির স্ত্রী মিসেস্ জেরি নিউমেন বাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং তাহাতে তাঁহার হাত পা বাঁকিয়া যায়। রাজ্যের অনেক গণ্য মান্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। ইংলণ্ডের রাজডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু কোনোই ফল হইল না। তখন তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই কূপে আসিয়া স্নান গ্রহণ করিলেন কিন্তু প্রথমবার স্নানে বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তিনি পুনরায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তিনি এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন যে অন্যের সাহায্য লইয়াও আঠার বৎসর যাবৎ তাঁহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এবার আসিয়া কয়েকবার স্নান করাতে তাঁহার রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গেল। যাঁহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারাই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আজকাল এই বিজ্ঞানের দিনে লোকে সহজেই মনে করিবে যে সম্ভবতঃ কূপের জলে এমন সব রাসায়ানিক পদার্থ মিশ্রিত আছে যাহাতে রোগ সারিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই কূপের জল লইয়া বহু রাসায়ানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিন্তু প্রতি গ্যালন জলে মাত্র চৌদ্দ গ্রেণ খড়ি মাটি ও চার গ্রেণ কেলসিয়াম সালফেট্ ভিন্ন আর কিছু পান নাই। কাজেই তাঁহারা মত দিয়াছেন যে ঐ জলে রোগ শান্তি হইবার মত কোনো গুণ নাই।

আর এক কথা, বিগত দুই শতাব্দি যাবৎ যাঁহারা সেখানে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই প্রটেষ্টাণ্ড অর্থাৎ তাঁহাদের উইনফ্রাইডের অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস নাই। তথাপি কেন যে এই কূপোদকে দুশ্চিকিৎস্য-মহারোগও সারিয়া যায় তাহা বুদ্ধি বিচারের বহির্ভূত; বিজ্ঞানও এখনও পর্য্যন্ত ইহার কোনো কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছে না।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

নবাব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেলিসিয়া

কক্ষে ফেলিসিয়া, নবাব ও ডাক্তার জেঙ্কিন্স বসিয়াছিলেন।

মৃত্তিকা লইয়া নবাবের মূর্ত্তি গড়িতে গড়িতে ফেলিসিয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সের পানে চাহিয়া কহিল, "আপনার ছেলের খপর কি, ডাক্তার জেঙ্কিন্স? তাকে আর

আপনার বাড়ীতে দেখতে পাই না যে! বেশ লোকটি! কোথায় গেল?"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "কোথায় গেল! সে খপর তুমি যেমন জানো, আমিও তেমনি জানি। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ও বাড়ীতে তাঁর পোষাচ্ছিল না। স্বাধীনতার হাওয়া পেয়েছেন—"

হাতের তুলিটা টেবিলের উপর ফেলিয়া ফেলিসিয়া ঘুরিয়া বসিল, ডাক্তারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ঐ খানটায় মাপ করবেন, ডাক্তার সাহেব। এই স্বাধীনতার হাওয়া কথাটিকে নিয়ে আপনারা আজকাল ভারী তাচ্ছল্য সুরু করেছেন—যেন সেটা ভারী বিদ্রূপ, ভারী অপরাধের ব্যাপার! দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে যে ব্যাচারারা চেপে পিষে সারা হচ্ছে, তারা যদি আপনাদের খেয়ালমত আপনাদের খানার টেবিলের চতুর্দ্দিকে খোসামুদের মত বসে থেকে আপনাদের ছোট তুচ্ছ বাজে কথায় সায় দিয়ে তার তারিফ করতে না পারে, মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা পায়, অমনি তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের এই বিদ্রূপ-বাণ কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়বে! আপনারা চান্, তারা আপনাদের জুতোর তলা চেটে পাতে-পড়া দু'টুকরো ছেঁড়া রুটি আর মাংসর হাড় মুখে পুরে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করবে! সেইটি যারা না করে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা পাবে, তাদের একেবারে মস্ত অপরাধ, না? স্বাধীন হাওয়া,—সেটা ঠাট্টার কথা নয়। তাদের স্বাধীন হাওয়া যে দেশে বয়ে যায়, সে দেশ ধন্য হয়! যে স্বাধীন হাওয়া দোষের, যে হাওয়ায় আপনারা ঘুরে বেড়ান, সে হাওয়া আপনাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশে আছে! আপনাদের মানে আপনি, ডিউক, মর্গার্ড, বোয়াল্যান্দ্রঁ, এদের;—যারা সমাজে বিনা দ্বিধায় উচ্ছৃঙ্খলতা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যাদের ধর্ম্ম নেই, ইজ্জৎ নেই, দুনিয়াটাকে খালি ভোগের জায়গা বলে যারা জেনে রেখেছে—নিজের বিলাসের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ করতে যাদের চোখের পাতা এতটুকু পড়তে জানে না, স্বাধীন হাওয়া দোষের তাদের—"

ফেলিসিয়ার মাথার শিরাগুলা উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে আজ ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতই ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তার জেঙ্কিন্স বাধা দিয়া কহিলেন, "ফেলিসিয়া, স্থির হও।"

ফেলিসিয়া কহিল, "না, আপনিই বলুন, আমার কথা ঠিক কি না! আপনাদের জীবনের লক্ষ্য কি! শুধু পয়সা—তা সে পরের মাথায় হাত বুলিয়েই হোক, আর তাদের চোখে ধুলো দিয়েই হোক। আপনারা চান্ শুধু পয়সা আর বিলাস, ভোগ! কোন ভাল জিনিষে আপনাদের রুচি আছে! সাহিত্যের দিকে ঝোঁক সে শুধু নামের জন্য—ছবির তারিফ করেন নামের জন্য—নাম কিনতে চান্ শুধু আপনারা—কাজ চান না।"

জেঙ্কিন্স উপায়ান্তর না দেখিয়া মৃদু হাসিল, হাতের দস্তানাটা খুলিতে খুলিতে

বলিল, "হুঁঃ—ছেলেমানুষ! তোমার সঙ্গে তর্ক করব কি!"

নবাব এতক্ষণ স্থিরভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন। এখন তিনি কহিলেন, "কিন্তু উনি ঠিক কথাই বলেছেন, ডাক্তার! আমরা জীবনে করলুম কি—করছিই বা কি! পয়সার জন্য প্রথম বয়সটা পাগলের মত কাটিয়ে দিয়েছি—আর এখন নাম বাজাবার দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য! যে করে এ টাকা হয়েছে, তাকে না জানে! কিন্তু আমার 'পোজ্‌টা ভেঙ্গে গেল, বোধ হয়, মাদামোসেল—"

ফেলিসিয়া কহিল, "থাক, আর গড়ব না। আর এক দিন হবে'খন।"

অদ্ভুত বালিকা, এই ফেলিসিয়া। সে একজন আর্টিষ্টের কন্যা। পিতা সিবাস্তিয়ন নিজেই একজন প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট ছিল। শৈশবেই ফেলিসিয়ার মাতার মৃত্যু হয়—মাকে সে কখনও চক্ষে দেখে নাই। স্ত্রী ছিল, সিবাস্তিয়নের চোখের মণি। স্ত্রীকে হারাইয়া এই মেয়েটিকে বুকে ধরিয়াই সিবাস্তিয়ন কোন মতে খাড়া ছিল। শৈশব হইতে পিতার কলাগৃহটির মধ্যেই ফেলিসিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার জগৎ এই ক্ষুদ্র ঘরটিকে লইয়াই। কাদা লইয়া সে পুতুল গড়িত, কোনটা দুই দিন থাকিত, কোনটাকে বা গড়িয়াই সে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। অল্প বয়স হইতেই এ কাজে তাহার কেমন একটু অশিক্ষিত-পটুত্ব জন্মিয়াছিল। পিতা সিবাস্তিয়ন কন্যার ভুল শুধরাইয়া দিত, শিল্পের সূক্ষ্ম কৌশলগুলাও বুঝাইয়া শিখাইতে ছাড়িত না।

এমনই করিয়া গঠন-শিল্পে যখন ফেলিসিয়া ধীরে ধীরে আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইতেছিল, তখন সহসা একদিন সিবাস্তিয়ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে অক্ষম ও অপটু হইয়া পড়িল। তাহার গৃহে শিল্প-নৈপুণ্যের তারিফ করিতে যে সকল লোক আসিত, ডাক্তার জেঙ্কিন্স তন্মধ্যে একজন। জেঙ্কিন্সের সহিত সিবাস্তিয়নের কতকটা সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তাহার উপর এই পীড়া উপলক্ষ করিয়া সেই সৌহার্দ্দ্য রীতিমত পাকিয়া উঠিল।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স নিত্য তাহাকে দেখিতে আসিতেন। বন্ধুকে কত আশ্বাসের কথা বলিয়া ভুলাইতেন; ফেলিসিয়াকেও উৎসাহ দিতে ভুলিতেন না। বন্ধুর গৃহে এখন তিনি একরূপ অভিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সব সন্ধান রাখা, খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিষটির তদ্বির করা, এ সকলের কোনটাতে একদিনের জন্যও কখনও তাঁহার এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নাই।

ফেলিসিয়ার দিনগুলা নিতান্তই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনভাবে কাটিতেছে। এ নির্জ্জনতা-ভঙ্গ-কল্পে ডাক্তার প্রায় প্রত্যহই ফেলিসিয়াকে মাদাম জেঙ্কিন্সের নিকট লইয়া আসিতেন; সারা দিন মাদামের সাহচর্য্যে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আবার ফেলিসিয়াকে নিজেই সঙ্গে করিয়া তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতেন। কন্যায় প্রতি ডাক্তারের এতখানি স্নেহ-মমতা দেখিয়া রোগ-শয্যা-শায়িত অক্ষম সিবাস্তিয়ন কতকটা আরাম বোধ করিতেন।

ফেলিসিয়া রাত্রে পিতার শয্যার পার্শ্বে

বসিয়া শিল্প-সম্বন্ধে নানা আলোচনার কথা পাড়িত, পিতা প্রসন্ন চিত্তে তাহাকে সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিত। কোনদিন-বা ফেলিসিয়া বসিয়া বই পড়িত, সিবাস্তিয়ন বিছানায় শুইয়া শুনিয়া যাইত! ফেলিসিয়া মূর্ত্তি গড়িত, সিবাস্তিয়ন মুগ্ধ নেত্রে কন্যার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিত—আশার আনন্দে প্রাণ তাহার ভরিয়া উঠিত।

এদিকে কিন্তু শরীর তাহার ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। নিজে সে স্পষ্টই বুঝিতেছিল,এ দেহ প্রাণখানাকে বহিবার পক্ষে ক্রমেই যেন অধিকতর অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে—মৃত্যু যেন ক্রমেই তাহার অলক্ষ্য কর বাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে। মেয়ের দশা কি হইবে ভাবিতে গিয়া নিশ্বাস তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিত—বুকের মধ্যে অব্যক্ত একটা বেদনা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। ফেলিসিয়া পাছে সে বেদনার এতটুকু আভাষ পায়, এই আশঙ্কায় প্রায়ই তাহাকে সে চোখের আড়ে রাখিবার চেষ্টা করিত। ডাক্তার আসিলেই স্নেহান্ধ পিতা ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে জানাইত—ফেলিসিয়া অনেকক্ষণ এই বদ্ধ গৃহে পড়িয়া আছে, তাহাকে বাহিরের মুক্ত বায়ুতে একটু বেড়াইয়া আনো। বন্ধুর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে ডাক্তার কোনদিন এতটুকু অবহেলা করেন নাই, ফেলিসিয়াও অনেকখানি বহির্জগৎকে চকিতে দেখিয়া লইবার অবকাশ পাইয়া তাহা ছাড়িতে চাহিত না।

এমন সময় সহসা এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সরলা কিশোরীর উন্মুখ চিত্ত প্রচণ্ড বাধা পাইল; অবিশ্বাসে ভয়ে ঘৃণায় একান্ত সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অন্যদিনের মত জেঙ্কিন্সের সহিত ফেলিসিয়া সেদিনও তাঁহার গৃহে গিয়াছিল। মাদাম জেঙ্কিন্স গৃহে ছিলেন না—দুই দিনের জন্য কোথায় তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ফেলিসিয়া এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ডাক্তারের বয়স ও পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের পরিমাণ—ভাবিয়া ডাক্তারের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পঞ্চদশ-বর্ষীয়া কিশোরী ফেলিসিয়াকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে ডাক্তারও দ্বিধা বোধ করেন নাই। বয়সে পঞ্চদশ হইলে কি হয়, সরলতায় ফেলিসিয়া সপ্তমবর্ষীয়া বালিকারই অনুরূপ ছিল।

সন্ধ্যার সময় জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়াকে লইয়া বাগানে আসিয়া বসিলেন। মাথার উপর অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল—কুঞ্জে বসিয়া দুই চারিটা পাখীও বড় মিঠা গাহিতেছিল। সিবাস্তিয়নের বিষয়েই উভয়ের কথা হইতেছিল—সহসা ফেলিসিয়া একটা কঠিন বাহু পাশে আপনাকে বদ্ধ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তখনই সে বাহুপাশ সবলে ঠেলিয়া অগ্নিময় দৃষ্টিতে সে ডাক্তারের পানে চাহিল। মাথার উপর তখন দুই চারিটামাত্র নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে ক্ষীণ চাঁদের মৃদু আলোক-কণা জাগিয়া দেখা দিয়াছে—ফেলিসিয়া সম্মুখেই দেখিল, ডাক্তারের অধরের কোণে বক্র একটা হাসির রেখা! তাহার মনে হইল, কঠিন আঘাতে ঐ হাসিটাকে সে চূর্ণ করিয়া দেয়! সে দৃষ্টি, সে বাহু-বন্ধনের অর্থ কি,

তাহা বুঝিতে ফেলিসিয়ার বিলম্ব ঘটিল না—সে নভেল পড়িয়াছিল, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও দেখিয়াছিল—ঘৃণায় তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ঘন-কম্পিত দীর্ঘ-শ্বাসে ডাক্তারের দুরভিসন্ধি মেঘের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার আপনার অবস্থা বুঝিয়া তখনই জানু পাতিয়া ফেলিসিয়ার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। এ শুধু ক্ষণিক মোহ মাত্র! ভ্রান্তি,—দুর্ব্বল ভ্রান্তি শুধু! এমন স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, মধুর বাতাস,—আর সম্মুখে অপূর্ব্ব-রূপিনী তরুণী,—মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চিত্তে বিকার ঘটিয়াছিল! সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল! ক্ষমা,ক্ষমা কর, ফেলিসিয়া! যদি সে জানিত, ডাক্তার তাহাকে কতখানি ভালবাসেন! আপনার প্রাণের অধিক, জগতে তাঁহার যাহা-কিছু আছে, সেই সর্ব্বস্বেরও অধিক ভালবাসেন! দৃষ্টিতে অবজ্ঞা হানিয়া ফেলিসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—নির্লজ্জ কাপুরুষ, এ কথা কোন্ মুখে বলিতেছ, তুমি! তুমি না পিতার বন্ধু—চলিয়া যাও—এখনই আমাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।

যন্ত্র-চালিতের মত জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়াকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল—গাড়ীতে সে উঠিয়া বসিলে, গাড়ীর মধ্যে মুখ পুরিয়া ক্ষমা চাহিয়া মৃদু স্বরে ডাক্তার কহিল, "এ সম্বন্ধে আর একটি কথা না। তোমার বাপের কাণে গেলে এখনই সে বেচারা মারা যাবে।"

এমনই করিয়া পুরুষ ফাঁদ পাতে,—সরলা নারী না জানিয়া সে ফাঁদে ধরা দেয়! ফেলিসিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তখনও কাঁপিতেছিল। সে কোন কথা কহিল না।

ফেলিসিয়ার প্রকৃতি ডাক্তারের জানা ছিল। তাই সে পাষণ্ড পরদিন—যে-মুখে পূর্ব্বদিন বন্ধু-কন্যাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল, সেই মুখেই হাসি ফুটাইয়া সিবাস্তিয়নের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সিবাস্তিয়ন সহজভাবে অন্য দিনের মতই কথা পাড়িল; ফেলিসিয়া কথাটা তবে সত্যই তাহাকে বলে নাই! জেঙ্কিন্সের প্রাণ জুড়াইয়া বাঁচিল।

পিতাকে ফেলিসিয়া সে কথা বলে নাই, সত্য। নাই বলুক, সেই দিন হইতে কিন্তু তাহার চিত্তে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। পুরুষকে সে ঘৃণা করিতে শিখিল, অবিশ্বাস করিতে শিখিল! পিতার উপর রাগ হইতে লাগিল, কেন তিনি তাহাকে সম্মান-রক্ষার উপযোগী শিক্ষা দান করেন নাই! এতদূর দুঃসাহস একটা বৃদ্ধ বর্ব্বরের, যে তাহার অঙ্গে সে হাত দেয়!

কন্যার এ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া পিতা ডাক্তারকে কহিল, "দেখ ত ডাক্তার,—ফেলিসিয়ার মেজাজটা ক'দিন ভাল দেখছি না, ওর কোন অসুখ-বিসুখ হল না ত!" নির্লজ্জ ডাক্তার অচপল কণ্ঠে জবাব দিল, "একটু হজমের গোলমাল হয়েছে—ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, ব্যস্ত হয়ো না।" ব্যস্ত হইবার প্রয়োজনও ছিল না।

সিবাস্তিয়নের জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল—দুই-এক দিনের মধ্যেই সে ইহলোকের সহিত সকল দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিল। মৃত্যুর সময় ডাক্তারকে ডাকাইয়া কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ

করিয়া সিবাস্তিয়ন বলিল, "ডাক্তার, ফেলিসিয়াকে তোমারই হাতে দিয়ে গেলুম। ওকে দেখো—ওর আর কেউ নেই!"

ফেলিসিয়া কাঠের মত নিশ্চল ভাবে বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—এ কথায় এতটুকু সে বিচলিত হইল না। ডাক্তারের কানে কথাটা কঠিন বিদ্রূপের মতই তীব্র ঠেকিল; তবু তিনি গাঢ় স্বরে কহিলেন, "দেখব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

ফেলিসিয়ার যেন কোন জ্ঞান ছিল না। দুঃখটা এত প্রচণ্ডভাবে তাহাকে আঘাত করিল, যে, তাহার কাঁদিবারও শক্তিও লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, মুহূর্ত্তে যেন পৃথিবীখানা মরুভূমির মতই বিশাল ও অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিপদের রাত্রি অজগরের মতই যেন চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই আলোকহীন বিশাল মরু-প্রান্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে দীর্ঘ জীবন কাটাইয়া যাইতে হইবে! কোথায় আশ্রয়, কোথায় অবলম্বন! কেহ নাই, কিছু নাই! তাহার উপর সিবাস্তিয়ন এক পয়সা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে নাই। ফেলিসিয়ার স্কন্ধে সংসারটা প্রচণ্ড ভারের মতই চাপিয়া বসিল। সিবাস্তিয়নের আর্টিষ্ট বন্ধুরা আসিয়া পরামর্শ দিল, সব বেচিয়া ফেল। বেচিয়া দেনা শোধ কর! এই ঘর, এই আসবাব-পত্র পিতার স্মৃতিতে ভরপূর রহিয়াছে,—প্রাণ ধরিয়া সেগুলাকে বিক্রয় করা ফেলিসিয়ার শক্তিতে কুলাইল না। চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, "পরামর্শ দিয়ো না গো—তোমরা। এ দেনা-শোধের উপায়, যেমন করে হোক, আমি করবই। কিছু বিক্রী করব না।" বন্ধুর দল ফেলিসিয়ার একগুঁয়েমি দেখিয়া বিরক্ত চিত্তে প্রস্থান করিল।

রাত্রে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফেলিসিয়া একটা উপায় স্থির করিল। সে তাহার ধর্ম্ম-মা ক্রেনমিজকে বিপদের কথা জানাইয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিল। ক্রেনমিজ উত্তর দিল, "ওদের কথা তুমি শুনো না, মা। তুমি কিছু বিক্রী করো না! যতদিন আমি আছি, তোমার ভাবনা কি? আমার বার্ষিক আয়, পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক—সে ত তোমাকেই দিয়ে যাব। তুমি ছাড়া আমারও আর কেউ নেই। সে টাকা তোমারই। আমি এখানকার বাস চুকিয়ে বুকিয়ে ওখানে যাচ্ছি। দুটি মায়ে ঝীয়ে আমরা একসঙ্গে থাকব। বুড়ো বয়সে আমাকেও ত একজনের দেখা চাই। তুমি আমায় দেখবে। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থেকো, আমি সংসার দেখবো। সিবাস্তিয়ন গেছে, দুঃখের কথা,—কিন্তু আমি যখন এখনও রয়েছি, তখন তুমি একেবারেই নিরাশ্রয় হওনি।"

চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে প্রচুর স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ফেলিসিয়া চিঠি পড়িয়া সুস্থ হইল। তাহার চোখে জল আসিল। চিঠিখানাকে বুকে চাপিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে সে কহিল, "তুমি এসো মা—তুমি এসো। এ জনহীন পৃথিবীতে আর আমি একলা থাকতে পারি না। ভয়ে আমার গা শিউরে উঠছে—চারিধারে পাপ আর ভণ্ডামি দেখে মাথা আমি তুলতে পারছি না, মা।"

ক্রেনমিজ আসিল। আপনার গৃহ ছাড়িয়া, বাস ছাড়িয়া ক্রেনমিজ ফেলিসিয়াকে আপনার

স্নেহের নীড়ে আশ্রয় দিল; আসন্ন বিপদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। ফেলিসিয়া সান্ত্বনা পাইল। তাহার মূর্ত্তি-গঠন আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিল। এই কলা-চর্চ্চাই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র অবলম্বন। একদিন জেঙ্কিন্স আসিয়া ফেলি-সিয়াকে সাহায্য-দানে অগ্রসর হইলে রুক্ষ স্বরে ফেলিসিয়া সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিল। ডাক্তার ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, ক্রেনমিজ মৃদু স্বরে ফেলিসিয়াকে কহিল, "বেচারা ডাক্তার তোমার বাপের বন্ধু ছিল, ফেলি। তাকে অমন কড়া কথায় বিদেয় করাটা তোমার ভাল হয়নি—একজন পুরুষ অভিভাবক থাকাটা মঙ্গলের কথা! হাজার হোক, তোমার বাবার বন্ধু ত।"

"বন্ধু! হাঁ, বন্ধুই বটে! একটা ভণ্ড বদমায়েস—"

ফেলিসিয়া সহসা আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিল। তাহার মনের মধ্যে রোষের যে আগুন জ্বলিতেছিল, সে তাহাকে জোর করিয়া নিবাইয়া দিল।

ইহার পর হইতে ডাক্তার এ গৃহে আসা একেবারে রহিত করিলেন না। মাঝে মাঝে বন্ধু-কন্যার তদ্বির করিতে আসিতেন। শিষ্টাচারের অনুরোধে ফেলিসিয়া তাঁহার প্রতি রোষটাকে আর উচ্ছ্বসিত হইতে দিল না—সহজভাবেই সে কথাবার্ত্তা কহিবে, স্থির করিল। ডাক্তারের মনের উপর যে পাষাণখানা চাপিয়া বসিয়াছিল, এ ব্যাপারে সেখানা অল্পে অল্পে সরিয়া গেল।

একদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, ফেলিসিয়ার ষ্টুডিওর পার্শ্বের ঘরে ক্রেনমিজ বসিয়া আছে। ডাক্তার তাহাকে অভিবাদন করিয়া ফেলিসিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় ক্রেনমিজ বাধা দিয়া কহিল, "যেয়ো না, ডাক্তার। ও ঘরে কেউ না যায়,—ফেলি মানা করে দিয়েছে। আমি তাই চৌকি দিচ্ছি!"

"তার মানে?"

"মানে, ফেলি কাজ করছে। কেউ যেন এখন তাকে বিরক্ত না করে!"

ডাক্তার নিষেধ না মানিয়া এক পা অগ্রসর হইলেন। ক্রেনমিজ কহিল, "না, না, যেয়ো না। আমায় তাহলে ভারী বকবে, ফেলি।"

"ও ত একলাই আছে?"

"না। নবাব আছেন। নবাবের মূর্ত্তি গড়া হচ্ছে।"

"আশ্চর্য্য! মূর্ত্তি গড়ছে ত আমার যেতে কি—" ডাক্তার গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার বুকে যেন একটা খোঁচা ফুটিল। ফেলিসিয়ার বয়স হইয়াছে, সে ত আর এখন কচি খুকীটি নহে, একটা পুরুষের সহিত নির্জ্জন ঘরে সে একেলা! তিনি সবলে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ক্রেনমিজও শশব্যস্তে তাঁহার অনুসরণ করিল।

দ্বার খোলার শব্দে চকিত হইয়া ফেলিসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, তীব্র স্বরে কহিল, "এর মানে কি, ডাক্তার? মা—"

ক্রেনমিজ কহিল, "আমি ঢের মানা করেছি মা—তা না শুনে ডাক্তার জোর করে ঘরে ঢুকলেন।"

ফেলিসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "ডাক্তার—"

সে স্বরে যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শুনিয়া নবাবও শিহরিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার কোন কথা বলিতে না পারিয়া ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টানিবার চেষ্টা করিলেন। ফেলিসিয়া কহিল, "যান, যান আপনি—এখনই এ ঘর থেকে চলে যান। কার হুকুমে আপনি—"

ডাক্তার কহিলেন, "কিন্তু শোন ফেলিসিয়া, আমি কি বলি—"

ফেলিসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, "না, কোন কথা শুনতে চাইনে আমি। চলে যান! না হলে এ বেয়াদপির শাস্তি পাবেন—একজন মহিলার ঘরে তার বিনা অনুমতিতে—" সহসা থামিয়া গিয়া ফেলিসিয়া নবাবের দিকে চাহিল, কহিল, "আপনাকে তাহলে আর আটকে রাখব না, নবাব বাহাদুর। বাকীটুকু এখন আপনাকে না পেলেও আমি শেষ করতে পারব। আপনি তাহলে আসুন—"

নবাব কোন কথা না বলিয়া সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। ক্রেনমিজ সঙ্গে আসিয়া দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল।

নবাব চলিয়া গেলে ডাক্তার কথা কহিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি কহিলেন, "ফেলিসিয়া, তুমি পাগল হয়েছ—এ কি তোমার ব্যবহার—!"

"কি ব্যবহার, ডাক্তার?"

"এই লোকটার সঙ্গে একলা তুমি ঘরের মধ্যে বসে আলাপ কর—"

"চুপ কর, ডাক্তার, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার নেই!"

"অধিকার আছে, ফেলিসিয়া—আমি তোমার বাপের বন্ধু। তুমি না মানো, তবুও তোমার ভাল-মন্দর জন্য দায়ী আমি—"

ফেলিসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসির প্রতি কণা যেন তীরের মতই জেঙ্কিন্সের প্রাণে বিঁধিল, তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। ফেলিসিয়া কহিল, "তুমি দায়ী! চুপ কর ডাক্তার—আমি—আমি যে সব পুরোনো কথা ভুলে গেছি। তা আবার নতুন করে মনে পাড়িয়ে দিও না। যাও, না হলে ভাল হবে না।"

"তবু এর আমি কৈফিয়ৎ চাই, ফেলিসিয়া। এই বুনো জানোয়ারটার মধ্যে এত কি তোমার কাজের কথা ছিল—?"

"জানোয়ার! কাকে জানোয়ার বলছ?"

"এই নবাব—না, বাজে কথায় ভুলিয়ে দিয়ো না। ফেলিসিয়া, তুমি কে, তা একবার ভেবে দেখো। তোমার জন্য ডিউক—সে ত মরে—যত ব্যারণ, ডিউক, তোমার কাছে পাত্তা পায় না—ঐ ছোঁড়া ছে গেরিটা অবধি যে তোমাকে দুই চোখ দিয়ে গিলে ফেলতে চায়—অথচ ছোঁড়ার অত রূপ, অমন চেহারা—কিন্তু তাকেও তুমি আমোল দাও না—আর এই নবাব, তার উপর তোমার এত টান কেন,—এ আমি জানতে চাই।"

"কেন—শুনবে? তবে শোন, ডাক্তার—নবাবকে আমি বিয়ে করবো।" ফেলিসিয়ার স্বর স্থির, অচপল!

জেঙ্কিন্স চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন পাথর ছুড়িয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া তিনি কহিলেন, "কিন্তু তুমি জানো তাকে, তার এক স্ত্রী আছে—আর সেই স্ত্রী এখনও অনেক দিন বাঁচবার আশা রাখে। শরীর তার খুবই মজবুত আছে। দু দিন হল, পঙ্গপালের মত একদল ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে নবাবের কাছে এসেছে। তারা সব নবাবেরই ছেলে-মেয়ে—"

ফেলিসিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না।

সম্মুখে তাহার নবাবের মূর্ত্তিটা চীৎকার করিয়া যেন কত-কি বলিতেছিল—বিদ্রূপের হাসি জেঙ্কিন্সের চোখের কোণে জড়ো হইতেছিল—ফেলিসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চৈতন্য হারাইল। সবেগে মূর্ত্তিটার কাছে সে সরিয়া আসিল—আক্রোশে সেটাকে ধরিয়া নাড়া দিয়া চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কাদার মূর্ত্তি কাদা হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৫)

বোম্বাই গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক গ্রন্থ কিনিয়া ফেলিলেন, এবং অধিকাংশ সময়েই ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। এখানে অবস্থান কালে তিনি আরও একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সে সেতার বাদ্য। এক গুজরাটী মুসলমান তাঁহাকে সেতার শিখাইত। ক্রমশঃ ওস্তাদের জানা সমস্ত গৎই অভ্যাস করিয়া গুরুর পুঁজি-পাটা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। যাহাই হউক এই ওস্তাদের কাছে তিনি সেতারে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেতার শুনিয়া বাড়ীর সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বিশেষতঃ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় তাঁহার সেতার শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। গুণেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে (ostrich) সাম্রোক্ পক্ষীর ডিমের তুম্বে একটি সুন্দর সেতার তৈরি করাইয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু এ সেতারটিকে তাঁহাদের বাড়ীর একটা আল্‌মারির উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন, কি করিয়া পড়িয়া সেটি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বলিলেন, অভ্যাসের অভাবে এক্ষণে তাঁহার সেতারের হাত আদপেই নাই।

নিম্নে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্র শিক্ষা করিতেন। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী

ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের জটলা হইল। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি বেশ ধ্রুপদও গায়িতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্র বাবুর পুরাণো কোন-রকমে কায-চলা একটা পিয়ানো ছিল; দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁর ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানো বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতে চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনি করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া পিয়ানোতেও তাঁর একটু হাত হইয়াছিল।



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল, অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাকরেদী চালাইতেন। এমনি করিয়া হার্ম্মোনিয়মেও তাঁর বেশ একটু জ্ঞান জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল, তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সেই যন্ত্র বাজাইতেন। পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু যখন ছাড়িয়া দিলেন তখন এই যন্ত্রটি বাজান জ্যোতিবাবুর একটা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন কবীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতি বাবু ইহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়াম্ বাজাইতেন। এইরূপে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মের হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই ইহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জ্যোতি বাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়ম-বাদক বলিয়া আমার খুব একটা নাম-ডাক ছিল। কিন্তু এখন কত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাদক হইয়াছে যাহার কাছে আমি কলিকা পাই না।"

ব্রাহ্ম সমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান' এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতি বাবু বলিলেন যে,

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু

লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি নোট্‌বুক্ থাকিত, যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত তাহাই সেই নোট্ বুকে টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের অপরিসীম জ্ঞান পিপাসা ছিল। পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া রাখিলেন। তাঁর "good day," "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের এখানে আসিতেন, এক পেয়ালা চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে যখন তিনি আসিতেন তখনই দেখিতাম, সেদিন তাঁর "bad day"। তবু এমনি তাঁর জ্ঞান-পিপাসা, জ্বরে কাতরাইতে কাতরাইতেও, নূতন কিছু দেখিলেই প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না, এবং যাহা কিছু জ্ঞান-লাভ করিতেন তখনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিতেন। তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন, বাড়ীর ছেলে-মেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া গল্প যুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে যখনই দেখা হইত, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ৺ দ্বারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজ স্থাপনের জন্য কত যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical College এর Record খোঁজ করিলে জানিতে পারিবে।"

হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সমাজে বিষ্ণু বাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হার্ম্মোনিয়ম আসিলে সারঙ্গ উঠিয়া গেল। জ্যোতিবাবু বলিলেন; "ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগরাগিণী ঠিকমত বাজান একরূপ অসম্ভব।"

মান্নার একটা অদ্ভুত শখ্ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্ব্বদা মহাদেবের মত সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপই ছিল। সাপগুলিকে গায়ে জড়াইবার আগে সে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সাপের দংশনেই অবশেষে তাহার মৃত্যু হয়।

মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের আমল হইতেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই সমাজের গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে জ্যোতি বাবু কখনও দেখেন নাই—তাঁহাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গান করার একটা বিশেষত্বও ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীকে তান-অলঙ্কারে ছেয়ে ফেলে, তাহাতে রূপের চেয়ে অলঙ্কারেরই প্রাধান্য হয়, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প-স্বল্প তান দিতেন বটে কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটীও পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং পদ দুইই বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ অপেক্ষা খেয়ালই বেশী গাইতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দি গান ভাঙ্গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা

করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্র নাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার রচনায় এমনি একটা সহজ সুন্দর কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাখামাখি ছিল যে তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্ দাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষিদেব তাঁহাদের খুব উৎসাহ দিতেন।

তখন বড়বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে বেশ স্পষ্ট মনে আছে:—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত' ছিলেনই, তার উপর তিনি নিজেও অনেক গান রচনা করিতেন। সে সমস্ত গান এখন আমাদের দেশে সুপরিচিত। তাঁর গানের শেষে "রমাপতি ভণে" বলিয়া ভণিতা থাকিত। যদু ভট্টও নিজে হিন্দি গান রচনা করিতেন। তাঁহার গানের সুর-বিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা এবং মৌলিকতা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি পাখোয়াজের নূতন নূতন অনেক উৎকৃষ্ট বোলও রচনা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিতেন, "আমি দেখিয়াছি কলিকাতার তখন কোন কোন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী তাঁহার নিকট বোল আদায় করিবার জন্য বাস্তবিকই তাঁহার পায়ে তৈল মর্দ্দন করিত। ইঁহাদের গান ভাঙ্গিয়া তখন আমি এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) আমরা অনেক ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলে, সেইটি টুকিয়া লইয়া আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্ম সঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে। এর পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্ম সঙ্গীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল ব্রহ্মসঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁর বীণা এখনও নীরব হয় নাই।"



হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার ঝোঁক্ ছিল। এবিষয়ে তাঁহার ওঁ

দারও খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দুজনে মিলিয়া বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটকনির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। সমিতির গৃহ হইল, তাঁহাদেরই "ও-বাড়ী"তে। সমিতির নাম হইল Committee of five। কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচ জনে এই নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন।

কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। জ্যোতিবাবু পূর্ব্বে যখন কেশববাবুদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, তখন হইতেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপপরিচয়।

"কৃষ্ণবিহারী বাবু ইতিপূর্ব্বে "বিধবা বিবাহ" নাটকে পড়ুয়ার পাঠ গ্রহণ করেন। তাই এই বিষয়ে তাঁহার একটু অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া আমরা মানিতাম। তিনিই আমাদের অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন।"

প্রথমে মহাকবি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনীত হইল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল। সকলেই অভিনেতা ও অভিনয় পারিপাট্যের খুব প্রশংসা করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

নীচের ঘরে অহোরাত্রই—হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় "পঞ্চজনে"র নাট্য-সমিতিতে বাদানুবাদ কিছু না কিছুর একটা গোলমাল চলিতই। বাড়ীখানি সারাদিন হাস্যকলরবে ও গানবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া একজন যাত্রাদলের ছোক্‌রা আসিয়া নাচগানে তাঁহাদের আমোদ বর্দ্ধন করিত। তাঁহাদের একটা "Eating Club"ও ছিল। সে ক্লবে পালা করিয়া এক একজনের খাওয়াইতে হইত। সে ভোজের বেশী আড়ম্বর ছিল না। লুচি কচুরী সন্দেশাদি খাইয়াই সকলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ক্রমশঃ একতলার ঘরে, এইরূপ আমোদ ও রিহার্শ্যালের মাত্রা এত অধিক চড়িয়া উঠিল যে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দোতালাবাসী অভিভাবকগণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ফলে রিহার্শ্যালের মাত্রা কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু ভিতরের উদ্দীপনা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পরে মধুসূদনের আরও একখানি নাটক "একেই কি বলে সভ্যতা"র অভিনয় হইয়া গেল। জ্যোতিবাবু সার্জ্জন সাজিয়া ছিলেন। এ সব অভিনয়ে প্রধান শ্রোতার দল—তাঁহাদেরই বাড়ীর লোক, কখনকখনও দুই একজন বন্ধুবান্ধবও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন।

বাড়ীর লোকে বরাবরই এ সমস্ত ছেলেখেলা ভাবিতেন। কিন্তু এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে এই ছেলেখেলার ভিতর দিয়া কেমন নীরবে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা দেখিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটক মাত্র দুই তিনখানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন' জিনিষই নাই। আমোদের পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া

যাহাতে শিক্ষার হয়, তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইলেন। তৎক্ষণাৎ Committee of five ইঁহাদের পূর্ব্বকথিত "স্যার" গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ঈশ্বরবাবু ঠিক করিয়া দিলেন—বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়। বিষয় যেমন স্থির হইল, অমনি কাগজে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে যিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপর একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন, এবং যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্য বিচারক নিযুক্ত হইলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কৃষ্ণবিহারী বাবুর ছোট কথা পছন্দ হইত না বলিয়া তিনি বিচারকের ইংরাজীতে নাম দিলেন "Adjudicator !"

অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া Committee of five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের উপর ভার অর্পণ করাই সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এ সময়ে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন :—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজি জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের National dramatist বলা যাইতে পারে।"

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন আর যাহাতে ছেলেমানুষী অথবা কোনরূপ "খাপ্টামো" না হয়, সেজন্য তাঁহারাই এ কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতি-বাবুরা যেমন নিষ্কৃতি পাইলেন তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন।

নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম ছিল "নবনাটক"। যেদিন এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয় সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা সাজাইয়া রাখা হইল এবং সভাস্থলে নাটক খানি আগাগোড়া পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচ শত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" একটু বিদেশী আদর্শের গন্ধ আছে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই ; তিনি ইংরাজি

শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।

"এখন "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইতে লাগিল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া Scene আঁকিতে লাগিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যো-ল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি) সাজিলেন নট, আমার নিজের এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ "চিত্ততোষ"



নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়



সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

আর এক ভগিনীপতি ৺সারদা প্রসাদ গঙ্গো-পাধ্যায় হইলেন গবেশ বাবুর বড় স্ত্রী। এবং আমাদের অন্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য অন্যান্য পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না। বাহির হইতেও অভিনেতার আমদানী করিতে হইল। ক্রমে আফিসের কর্ম্মচারী কতকগুলি ভদ্রলোক অভিনয়ে যোগ দিলেন। শেষে অভিনয়ে যোগ দিবার জন্য অনেক উমেদার আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন পরীক্ষা করিয়া করিয়া অভিনেতা নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। তারপর সমস্ত ভূমিকা স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে রিহার্সাল বসিয়া গেল। প্রথমে শুধু পাঠ চলিতে লাগিল। দুই একজন সমজদার লোক উপস্থিত

থাকিতেন। তাহারা পাঠভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ও ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন। তারপর ক্রমে অঙ্গভঙ্গীর শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপ ছয় মাস কাল যাবৎ রিহার্সাল চলিল। আবার রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্‌সার্টের মহলা বসিত। আমি কন্‌সার্টে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতাম।

এইরূপে অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজনে কিছুকাল আমাদের খুব আমোদে কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে সেই দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক্ পূর্ব্বেই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে সাজ-ঘরে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে, আমাদের বাড়ীর ডাক্তার দ্বারিবাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়া করিয়া তুলিলেন। অন্য সকলেই, যথাসময়ে ষ্টেজে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করিতে লাগিল। কেবল স্ত্রীবেশে-সজ্জিত আমার কবি-বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহূর্ত্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (Scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিবার জন্যও অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল। বনদৃশ্যের সিন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যকার বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইত।

অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কখন বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত, কখন বা



ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত

অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত। যখন গবেশবাবুর ছোট গিন্নি ও বড় গিন্নি, গবেশবাবুর এক এক পা দখল করিয়া তৈল মর্দ্দন করিবার জন্য পা লইয়া টানাটানি করিত—ঝগড়া করিত,—মর্ম্মিত—"এটা আমার পা, তুই আমার পা'টায় কেন তেল মাখাচ্ছিস" ইত্যাদি, এবং তখন গবেশবাবুর যেরূপ অবস্থা ও মুখভঙ্গী হইত তাহা দেখিয়া দর্শকেরা হাসিয়া খুন হইত। বড় স্ত্রী গবেশবাবুকে বশ করিবার জন্য "ঔষধ করায়" গবেশবাবুর উদরটা ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল। গবেশবাবু যখন তাহার লম্বোদরটি আরও ফুলাইয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে বসিতেন, তখন সেই দৃশ্যই সকলের হাস্যোদ্রেক করিত; আবার ডাক্তার দ্বারিবাবু কিংবা ডাক্তার বেলি সাহেব দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত থাকিলে, তিনি রোগের যন্ত্রণায় কাত্‌রাইতে কাত্‌রাইতে ক্ষীণকণ্ঠে যখন বলিতেন, "একবার দ্বারিবাবুকে ডেকে আন," "বেলি সাহেবকে ডেকে আন"—তখন ডাক্তারেরা খুব খুসী হইতেন, এবং দর্শকমণ্ডলীর মধ্যেও একটা হাসির রোল পড়িয়া যাইত। অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল, তিনি বই ছাড়া অনেক কথা উপস্থিত মত নূতন বানাইয়া বলিতেন। আমরা তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম —"অত লোকের সাম্‌নে বেহায়াপি করিতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় না?" তিনি বলিলেন:—"আমার একটা মন্ত্র আছে, আমি তখন দর্শকদিগকে বানর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি।" আমার ভগিনীপতি ৺যদুনাথও খুব একজন ভাল Comic Actor ছিলেন—তিনিও উপস্থিত মত মন-গড়া অনেক কথা বলিয়া দর্শকদিগকে হাসাইতেন। গবেশবাবুর পারিষদ "চিত্ত-তোষের" পাঠে তিনি প্রতিপদে গবেশবাবুর বাক্য "জল উঁচু-নীচু"-ধরণে সমর্থন করিয়া লোকের হাস্যোদ্রেক করিতেন। আর একবার হাস্যের তরঙ্গ উঠিত যখন চ্যাপটা-নাক, রং-ফরসা "রসময়ী" গোয়ালিনী দুধের কেঁড়ে কাঁকে প্রবেশ করিয়া "কৌতুকের" সহিত রসালাপ করিত,। শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী এই "কৌতুকে"র পাঠ লইয়াছিলেন। তিনিও একজন Comic Actor। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র তিনিই এখনও স্বশরীরে বর্ত্তমান। আমার এক শ্যালক ৺অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গিন্নির ভূমিকায় যখন আর্শির সম্মুখে বসিয়া, প্রসাধন করিতেন ও যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা রূপসীর হাব-ভাব প্রকাশ করিতেন, তখন সে অভিনয়েও দর্শকেরা খুব আমোদ পাইত। আর দুইজন tragic Actor ছিলেন। ৺ বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃত লালের জ্যেষ্ঠ) যখন সুবোধের ভূমিকায় সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া নৈশ অন্ধকারে বন-বাদাড় দিয়া চলিয়াছেন এবং যখন ৺সারদাপ্রসাদ বড় স্ত্রীর ভূমিকায়, সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপোক্তি করিতেন, তখন দর্শকবৃন্দ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে, "অমলা" "কমলা" "চন্দ্রকলা" প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়াকান্না যুড়িয়া দিত

যে পাড়ার লোকদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রাম নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া "যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে এখানে এসে একবার দেখে যাক্", সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন।"

এ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম তাহা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেননা "নবনাটক" তখন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নটীর বেশ পরিয়াই সাজঘরে (Green room) কন্‌সার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত Seton Car সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কন্‌সার্ট শুনিবার জন্য এবং কি কি যন্ত্রে কন্‌সার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য কন্‌সার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জেনানা কেহই ছিলেন না, যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি স্ত্রী-সাজে-সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

নটীবেশে জ্যোতিবাবুকে সংস্কৃত রচিত একটি বসন্তবর্ণনার গান গাহিতে হইত। তাহার প্রথম লাইন ছিল—

"মলয়ানিল পরিহার পুরঃসর" ইত্যাদি।

তখন কন্‌সার্ট পদবাচ্য ভাল কন্‌সার্ট ছিল না বলিলেই হয়। এক ছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে; তার পর "নব নাটক" উপলক্ষ্যে এ বাড়ীতে আর এক দল হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবু তখন এই কন্‌সার্টের গৎ তৈরি করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কনসার্ট। তখনকার হইতে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লেডি হার্ডিং

গত ১১ই জুলাই বিলাতের কোন শুশ্রূষাগৃহে (Nursing Home) বড় লাট পত্নী লেডি হার্ডিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা কতদূর দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। আমরা প্রকৃতই যেন আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে লেডি হার্ডিং ভারতবাসীর কতখানি হৃদয় যে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা এই দুর্ঘটনা জনিত অসংখ্য সভাসমিতিতে এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ নানাপ্রকার আয়োজনে প্রতীয়মান হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর বোম্বাইয়ের "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" লিখিয়াছে—"Lady Hardinge was essentially a womanly woman" —একথাটি যে কতদূর সত্য তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী—বিশেষত ভারতীয় নারীরা—মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আরও বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, নারীমঙ্গল যে সকল কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, লেডি হার্ডিং জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিংএর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সহিত পারস্য, সেণ্ট-পিটার্সবর্গ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন।

ভারতে আসিয়া তিনি কেবল মাত্র



লেডি হার্ডিং

সভাসমিতিতে যোগদান, বিদেশে ভ্রমণ, কিম্বা পরিতোষিক বিতরণ করিয়াই সময়ক্ষেপ করেন নাই। লর্ড হার্ডিং যেমন সর্ব্বদা রাজকার্য্যে নিযুক্ত তিনিও সেইরূপ নারী ও শিশুদিগকে সুস্থ ও সবল করিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিম্ন লিখিত সৎকার্যের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং এই সৎকার্য্য গুলির জন্যই তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ের এত খানি স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(১) অশিক্ষিত "দাই" ও "নার্স" দিগকে সেবাকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যালয় স্থাপন।

(২) যে সকল নারীর সাধারণ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে তাহাদের জন্য গৃহে গৃহে চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত।

(৩) বিভিন্ন প্রদেশে নারী চিকিৎসালয় স্থাপন।

(৪) লেডি হার্ডিংএর প্রধান কীর্ত্তি, দিল্লীতে সমগ্র ভারতের জন্য "নারী-চিকিৎসালয়"—স্থাপন। এই চিকিৎসালয়ের ভিত্তি তিনি নিজেই স্থাপন করিয়া যান এবং এই জন্য ১৪ লক্ষ টাকাও সংগ্রহ করেন।

(৫) দিল্লিতে প্রবেশ কালে যেদিন লর্ড হার্ডিং মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান সে দিন স্মরণীয় করিবার জন্য লেডি হার্ডিং লর্ড হার্ডিংএর জন্মদিনে "শিশুরদিন" ("children's day") উৎসব অনুষ্ঠিত করেন। এই দিনে বিভিন্ন সহরে ও

গ্রামে স্কুলের ছেলেরা একত্র হইয়া আনন্দ ও উৎসবে নিযুক্ত থাকে।

উপরে সংক্ষেপে লেডি হার্ডিংএর সৎকার্য্যগুলির তালিকা দেওয়া গেল। এই সকল সৎকার্য্যগুলি যে ভারতের পক্ষে কত উপকারী তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দিল্লিতে প্রবেশকালে যখন লর্ড হার্ডিং হঠাৎ আহত হন তখন তিনি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়াও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিচলিত না হইয়া স্বামীর সেবা ও শুশ্রূষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই সাহসে মুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয় নারীগণ তাঁহাকে একটি 'casket' প্রদান করেন।

গত ২১এ মার্চ্চ লর্ড হার্ডিং তাঁহার পত্নীকে বোম্বায়ে বিদায় দিয়া আসেন। এত শীঘ্রই যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবে কেহই জানিত না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসরও পার হয় নাই।

তাঁহার নাম ও সৎকার্য্যগুলি স্মরণীয় করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন হইতেছে, কলিকাতায় তাঁহার একটি তৈলচিত্র স্থাপন হইবে এইরূপ ঠিক হইয়াছে। আমাদের মতে তাঁহার প্রস্তাবিত দিল্লির "নারী-চিকিৎসালয়"টি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা হইবে। ইহার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ ২০ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই কয়েক লক্ষ টাকা কি সমগ্র ভারত হইতে সংগৃহীত হইবে না?

ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু

আজ কাল সংবাদপত্র খুলিলে প্রায়ই দেখা যায় যে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানসমাজে প্রচার করিয়া ইউরোপীয় সুধীবৃন্দকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেছেন। এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নহে, সমকক্ষ ভাবে নহে, গুরু ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল—ইহা যে কত বড় আশার কথা তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, তাঁহার এই আবিষ্কার গুলি কিরূপ ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাই বলিব। বিলাতের "রয়াল সোসাইটির" নাম বোধ হয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন; এই বিজ্ঞান সভা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানালোচনার প্রধান স্থান। এই বিজ্ঞান-সভার সম্মুখে বক্তৃতা করা কেবল মাত্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দিগের ভাগ্যে ঘটে। এই রয়েল সোসাইটিতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় বিলাত গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি একবার এই সভায় বক্তৃতা করেন।

তাঁহার বক্তৃতা দিনের (Friday Evening discourse) সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir James Dewer.

উদ্ভিদের যে আমাদের মত প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে এই সভার সম্মুখে তিনি সেদিন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। কোন গাছ লাজুক ও অলাজুক, কোন গাছ অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া দেয়, আর যখন মৃত্যু আসিয়া গাছকে পরাভূত করে তখন কি করিয়া হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়—এই সকল সাড়ার প্রণালী তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের দ্বারা সকলকে দেখাইয়াছেন। সকালবেলা উদ্ভিদেরা যে আমাদের মত অসাড় এবং দ্বিপ্রহরের গরমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ঝড় কিম্বা দৈব দুর্য্যোগের সময় মৌনভাব অবলম্বন করে—স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা দূর হয়—ক্লোরোফরমে ডুবাইয়া রাখিলে গাছের সংজ্ঞা লোপ পায়—গাছের এই সব যে স্বতঃ স্পন্দন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের নাম তরুলিপি যন্ত্র। এই যন্ত্রের সূক্ষ্মতা ও আশ্চর্য্যরূপ প্রস্তুতপ্রণালী দেখিয়া ইউরোপের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই যে ইহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত।

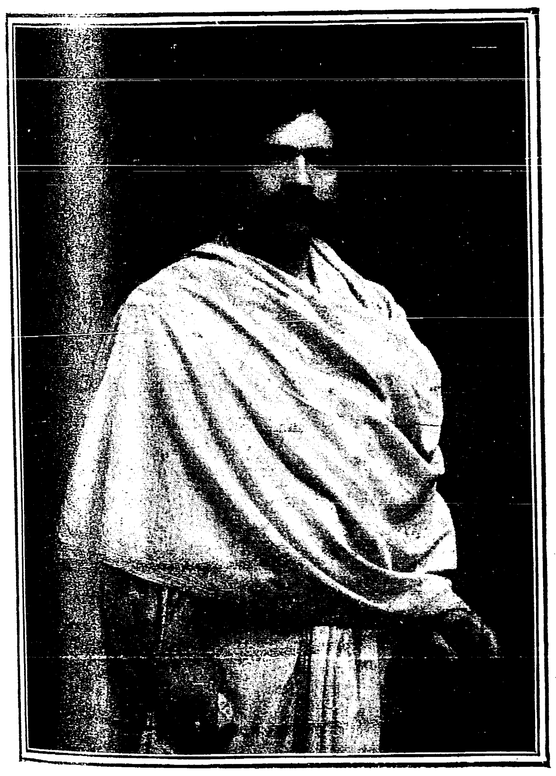

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু

তাঁহার লণ্ডনের আবাস "Maida vale" বৈজ্ঞানিক-দিগের তীর্থ স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক আর্থার ব্যালফুর তাঁহার গৃহে আসিয়া এই তরু-লিপি যন্ত্রে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতের বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Starling এবং Oliver স্বীকার করিয়াছেন যে আচার্য্য বসুর এই নূতন তত্ত্বগুলি অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া উদ্ভিদ জগতের অনেক উপকার সাধিত করিবে। "MetaPhysics of nature" পুস্তকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এমন নূতন আবিষ্কার আর হয় নাই।

আচার্য্য বসুর সম্বর্দ্ধনা কেবল মাত্র ইংলণ্ডেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি পৃথিবীর সুধীবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত ২৭শে জুন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়ানাতে গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি Imperial Universityর সম্মুখে নিজের আবিষ্কারগুলি প্রমাণদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টার অধ্যাপক Rolisch আচার্য্য বসুকে ধন্যবাদ দিবার সময় বলিয়াছেন যে এই আবিষ্কারগুলির জন্য সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকটে ঋণী। ভিয়েনার কয়েকজন বিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ আচার্য্যবসুর এই নূতন তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদিন পরে আচার্য্যবসু জড় ও জীবের মধ্যে ঐক্য সাধন করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিলেন। ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষি বাক্য "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এতদিনে ইয়োরোপে প্রচারিত হইল। তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তায় বঙ্গজননী ধন্য হইলেন! তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা সফলতা লাভ করুক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ইউরোপে যুদ্ধ

অনেকদিন হইতে রাজনৈতিকেরা পৃথিবীতে একটা সুখের রাজ্য (Utopia) স্থাপনের আশা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই কাল্পনিক রাজ্য কেবল কল্পনায় শেষ না হইয়া অনেকবার সঙ্কল্পে পরিণত হইয়াও উদ্যোগীগণের চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ করিয়াছে। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার একবার এইরূপ এক বিশ্বরাজ্য (World State) স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; পবিত্র রোমরাজ্যও (Holy Roman Empire) এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। তারপর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এইরূপ একটা উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হন। এই তিন চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে হেগ-শান্তিসভা, আন্তর্জাতিক সালিসী সভা প্রভৃতি সভা-সমিতিগুলি পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনে প্রবৃত্ত আছে। মহামতি কার্ণেগীও এই জন্য অকাতর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সকলেরি আশা ছিল পৃথিবীর সমস্ত জাতি আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে এই কাল্পনিক সুখরাজ্যকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিয়া চিরকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। দার্শনিক ও রাজনৈতিকের এই সুখ-স্বপ্ন এতদিনে আকাশ কুসুমে পরিণত হইল। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হউক—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। কিন্তু এই শান্তি-স্থাপনের আশা যে সুদূর-পরাহত তাহা একান্ত শান্তি প্রয়াসীকেও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথমেই বল্কান যুদ্ধ এই শান্তি-স্থাপন-প্রয়াসকে বাধা দিয়াছে। অন্যান্য কারণ যাহাই থাকুক, বল্কান রাজ্য সমূহের প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কীদিগকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করা।

তারপর এই বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ।—এই যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত একদিকে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া, সার্ভিয়া ও বেলজিয়াম; অপর দিকে জর্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া। পুরাকালের সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ইয়োরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ ব্যতীত বোধ হয় পৃথিবীতে এত-বড় যুদ্ধ আর কখনও হয় নাই।

এখন কথা উঠিতেছে—এই বিরাট যুদ্ধ ব্যাপারের কারণ কি? এই যুদ্ধের কারণ বুঝিতে হইলে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। এই যুদ্ধের কারণ কেবল মাত্র অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের মৃত্যু বলিলে চলিবে না। অনেক দিন হইতে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলি পরস্পরের প্রাধান্য ও শক্তি-স্থাপনের জন্য প্রতি বৎসর যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ ও সৈন্য বৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত আছে। এই প্রাধান্য-স্থাপন-চেষ্টাই জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব উৎপাদিত করিবার প্রধান কারণ। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য জার্ম্মানী ১৪ বৎসরের মধ্যে ৫টী আইন (German Navy Acts) পাশ করিয়াছেন। ১৯১২ সালে এইজন্য খরচ হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ—২২৬০৯০০০ পাউণ্ড এবং ১৯১৭সালে খরচ হইবে ২২৬৫১০০০ পাউণ্ড। এই সকল অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য জার্ম্মানীতে প্রায় প্রতি বৎসর নূতন ট্যাক্স বসিতেছে। এই ট্যাক্স দিতে জার্ম্মানীর সাধারণ লোকদিগের কি অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এদিকে ঠিক হইয়া গেল যে ইংলণ্ড দশটী জাহাজ নির্ম্মাণ করিলে জার্ম্মাণী নির্ম্মাণ করিবে ছয়টি! এই দৃষ্টান্তে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যই সৈন্য ও জাহাজ বৃদ্ধির দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উত্তর—Preparation for war is the best security for Peace—ইউরোপ-ব্যাপী এই যে যুদ্ধ ইহারও উদ্দেশ্য অবশ্য শান্তি তাহা কে অস্বীকার করিবে—!!

এখন বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করা যাক। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া—হাঙ্গেরী বস্‌নিয়া ও হার্জগভিনা নামক প্রদেশগুলি দখল করিয়া বসেন; সেই সময় হইতেই এই যুদ্ধ কলহের সূত্রপাত; Declaration of London (1871) অনুসারে অন্যান্য রাজ্যের আদেশ গ্রহণ না করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করায় অষ্ট্রিয়া আইন ভঙ্গ করে। এই নব অধিকৃত প্রদেশে, সার্ভিয়া ও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয় শ্লাভ জাতির অধিবাস অত্যন্ত বেশী; রুষিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে শ্লাভ জাতির আধিপত্যই অধিক! অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ এই শ্লাভ জাতি স্বভাবতঃই সার্ভিয়ার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, এইরূপ অবস্থায় সার্ভিয়ার উপর অষ্ট্রিয়ার প্রবল প্রাধান্য না থাকিলে শ্লাভ প্রজাদিগকে বশে রাখা বড়ই কষ্টসাধ্য।

এদিকে অনেক দিন হইতে ইউরোপে "Pan-Slavism" নামক একটা নূতন তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীন শ্লাভজাতিকে মুক্ত করিয়া এক বিরাট শ্লাভ রাজ্য স্থাপন করা। এই Pan-Slavismএর স্রোত

বোহেমিয়াবাসী Slovak Johannkollar সৃষ্টি করেন। প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য ছিল, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শ্লাভদিগকে একত্র করা; এখন রুষিয়া অস্ট্রিয়া বুলগেরীয়া ও সার্ভিয়ার শ্লাভদিগকে একত্র করা এই Pan-Slavism এর এক মাত্র উদ্দেশ্য। অস্ট্রিয়ার শ্লাভজাতি রুষিয়ার সহিত যোগদান করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, কারণ রুষিয়ান গভর্ণমেণ্ট শ্লাভ দিগকে অত্যন্ত সহানুভূতির চক্ষে দেখেন এবং অস্ট্রিয়া অপেক্ষা তাহারা তথায় অধিকতর সুখে আছে! এই জন্য রুষিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার মনোমালিন্য উপস্থিত! অস্ট্রিয়ার এই "পান-সার্ভিয়ান" দল অস্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে! তাহাদের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করিয়া সার্ভিয়ার সহিত মিলিত হওয়া। কোন উপায়ে অস্ট্রিয়া এই দলটীকে খর্ব্ব করিয়া সার্ভিয়াকে জব্দ করিয়ার পন্থা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এদিকে আর একটী ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড বসনিয়ার সারাজেভো সহরে বেড়াইতে আসিয়া একজন সার্ভিয়ান কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এই হত্যাকারী এই Pan-Slavism এর সহযোগী।

আর্চডিউকের মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে, এই হত্যা ব্যাপারে সার্ভিয়ার হাত সম্পূর্ণ রূপেই আছে। সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য অস্ট্রিয়ায় একটী বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইল! সার্ভিয়াকে খর্ব্ব করিবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না; তাই অস্ট্রিয়া ১৪ই জুলাই সার্ভিয়াকে এক চরম প্রস্তাব Ultimatum প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে "সার্ভিয়ার মধ্যে যে আন্দোলন চলিয়াছে—সার্ভিয়াকে তাহা দমন করিতে হইবে; স্কুল-সমূহে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বিনাশ করিতে হইবে; অস্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে কতকগুলি সার্ভিয়ান রাজকর্ম্মচারীকে কার্য্যচ্যুত করিতে হইবে। সারাজেভোয় আর্চডিউকের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান ও দণ্ড বিধানের জন্য একটী কমিটী গঠন করিতে হইবে এবং এই কমিটিতে অস্ট্রিয়ার কয়েকজন সদস্য থাকিবে। আর সারাজেভোর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট সার্ভিয়ান মেজর ও অপর রাজকর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে!

সার্ভিয়া একেবারে বর্ণে বর্ণে অস্ট্রিয়ার প্রস্তাব-মত কাজ করিতে অস্বীকার করিল,—হত্যাকাণ্ডের তদন্তকমিটিতে অস্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারিবে না; সার্ভিয়ান কর্ম্মচারীদিগকে বিচার না করিয়া পদচ্যুত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। সার্ভিয়ার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া অস্ট্রিয়া ২৮শে জুলাই যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এদিকে বল্কান প্রদেশে অস্ট্রিয়া যাহাতে কোন মতে আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারে, তজ্জন্য রুষিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। রুষিয়া এই সময় ঘোষণা করিল, শ্লাভজাতি যাহাতে অস্ট্রিয়ার অত্যাচারে বিনষ্ট হইয়া না যায়, তজ্জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই জন্য রুষিয়া সৈন্য

সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। এবং রুষিয়ার চারিদিকে সার্ভিয়াকে সাহায্য করিবার ধুম পড়িয়া গেল।

অনেক দিন হইল জার্ম্মানী অস্ট্রিয়া ও ইটালি Tripple Alliance সূত্রে গ্রথিত। এই Alliance অনুসারে তিন জাতি পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য; বিশেষতঃ অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী উভয়েই হাপসবার্গ-বংশ সম্ভূত। অস্ট্রিয়াকে দমন করিবার জন্য যখন রুষিয়া প্রস্তুত হইতেছে, তখন জার্ম্মানী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জার্ম্মানী রুষিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, রুষিয়ার সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য সঞ্চালনের কারণ কি? রুষিয়া ইহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে না পারায় জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল—জার্ম্মানী স্থির থাকিতে না পারিয়া ফ্রান্সকেও তাহার সৈন্য-সঞ্চালনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না। সুতরাং ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা হইল। এদিকে ইতালি জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে যোগদান করে নাই, সে জন্য জার্ম্মানী ইতালিকে বার বার অনুরোধ করিতেছে—বোধ হয় এই জন্য শীঘ্রই জার্ম্মানী ইতালির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।

ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানী বেলজিয়ামের নিরপক্ষতা অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ামের লীজ সহরে প্রবেশের চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড এতদিন কোন পক্ষই গ্রহণ করে নাই। যাহাতে পুনরায় শান্তি স্থাপনা হয়, সেই জন্য ইংলণ্ড বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। এদিকে ইংলণ্ড সৈন্য সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুই বুঝা গেল না।

কিন্তু যখন জার্ম্মানী বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করিতে সচেষ্ট হইল এবং উত্তর সমুদ্রে (North Sea) বিরাট নৌবাহিনী প্রেরণ করিল, তখন ইংরাজ মন্ত্রী Sir Edward Grey পার্লামেণ্টে বলিলেন, জার্ম্মানী যদি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা স্বীকার করে ও সমুদ্র-পথে ফ্রান্সের উত্তর দিক আক্রমণ না করে, তবে ইংলণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর আর কোন বিবাদ থাকিবে না। বেলজিয়াম ইংলণ্ডের বন্ধু বলিয়া ইংলণ্ড এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে বাধ্য এবং জার্ম্মাণ-নৌবাহিনী যদি ফ্রান্সের উত্তরে উপস্থিত হয়, তবে ইংলণ্ডে আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় লাগিবে। এইজন্য ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে বেলজিয়াম আক্রমণ করিতে নিষেধ করিল এবং সমুদ্র পথে ফ্রান্সের উত্তর প্রদেশে না আসিতে অনুরোধ করিল; জার্ম্মানী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না; তখন অগত্যা ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল! এইরূপে এই বিরাট যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে। এই যুদ্ধের ফল এখন সুদূর-পরাহত, কিন্তু এই যুদ্ধ যদি বেশী দিন ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দেশের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই যুদ্ধের সময়ে একবার আমাদের

অবস্থা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের কলোনিগুলি—দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা ইহারা সকলেই ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে তৎপর—তাহাদের সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংলণ্ডের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আজ যদি ভারতবাসী যুদ্ধ করিবার অনুমতি পাইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ একাই সমস্ত শত্রুসৈন্য অপেক্ষা অধিক সৈন্য দান করিতে সমর্থ হইত। ইংলণ্ড যুদ্ধে জয় লাভ করুক,—ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা! কেননা ভাগ্যসূত্রে আমরা ইংলণ্ডের সহিত জড়িত—ইংলণ্ডের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। ইংলণ্ডে যেমন এ-সময় ঘরাও বিবাদ দূর হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের কারণ যতই থাকুক—এসময় আমরা একান্ত-পক্ষে ইংলণ্ডের সহিত এক। ইংরাজ যদি প্রত্যেক ভারত-বাসীকে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে দেখিবেন তাহারা ইংলণ্ডের জন্য অকুতোভয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে কি না! আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার পক্ষে ইংলণ্ডের ইহাই উত্তম অবসর।

সমালোচকের পত্র

শ্রীমতী "গুচ্ছ"-প্রণেত্রী
অপরিচিতাসু

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার "গুচ্ছ" আমাকে উপহার দিয়া, এবং সে সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহিয়া, আমাকে সুখী ও সম্মানিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে আপনার কোনপ্রকার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিব কি না সন্দেহ। কারণ প্রকৃত সমালোচকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—ভূয়োপঠন, বিশ্লেষণ, বিচারশক্তি, সাহিত্যের আইনকানুন জ্ঞান এবং স্বাভাবিক রসবোধ,—ইহার প্রায় কোন গুণই আমাতে নাই। লেখা-পড়া যৎকিঞ্চিৎ জানিলেই কিছু সমালোচক হওয়া যায় না, বরং নিজের ত্রুটিগুলি বেশী অনুভব করা যায় মাত্র।

তবে পরোক্ষে যখন শুনিতেছি লেখিকা বিশেষ করিয়া আমারই মত চাহিয়াছেন, তখন তিনি যে রীতিমত জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রত্যাশা করেন না, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। সুতরাং মেয়েলীভাবে কথাপ্রসঙ্গে যাহা মনে আসে তাহাই নির্ভয়ে বলিয়া যাইতে সাহসী হইলাম।

আপনি ত "গুচ্ছ"টি সমাদরে হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাই কথামালার শৃগালের ন্যায় আস্বাদন না করিয়াই "টক" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার পথ রাখেন নাই। "গল্পগুলি ছাই হইয়াছে!" এই শৃগাল-জাতীয় সমালোচনার আর যে দোষ থাকুক্ না কেন, ইহাতে অতি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কথামালার পশুগণ মানুষের অনুকরণ করিলেও মানুষের পক্ষে তাহাদের অনুকরণ করা সাজে না,—এখানেই ত তফাৎ এবং মুস্কিল!

আর-এক শ্রেণীর সমালোচনাকে "ফুলুলো আর মর্‌লো" জাতীয় বলা যাইতে পারে,—শুষ্ক, সংক্ষেপ এবং ব্যাগারঠেলা। যথা:—"আপন'র পুস্তকখানি পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এবং গল্পগুলি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ইতি।"—কিন্তু স্ত্রীলোকের দ্বারা এত সংক্ষেপে কাজ বা কথা সারা কোনকালে সম্ভব হয় নাই, আমার দ্বারাও হইবে না।

তৃতীয় এক শ্রেণীর সমালোচনাকে সম্পাদকীয় বলা যাইতে পারে, কারণ সম্পাদকজাতীয় জীবগণকেই তাহার প্রচুর ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তাহাতে সরসতার চেষ্টা আছে, কিন্তু বারম্বার আবৃত্তির ফলে

দৈববাণীও চর্ব্বিতচর্ব্বণে পরিণত হয়। তাহার নমুনা এইরূপ:—"আপনার "গুচ্ছ" প্রকৃত আঙ্গুর গুচ্ছের ন্যায় সরস ও সুমিষ্ট, পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত, রমণীর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের ন্যায় রমণীয় ও কমনীয়। যিনি সংসার মরুর তাপে উত্তপ্ত এবং উত্ত্যক্ত, তিনি এই বিকচ গুচ্ছের শীতল ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি হরণ করুন, ইহার অমৃত রসপানে পিপাসা দূর করুন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ অমৃতে আমার অরুচি হইয়া গিয়াছে, আপনারও বোধ করি ইহাতে অভিরুচি নাই।

যাহা হউক আর বৃথা ভূমিকায় সময় নষ্ট করা উচিত হয় না। এতক্ষণ যে করিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কাজের কথার চেয়ে বাজে কথা বলা মেয়েদের পক্ষে বেশী সহজ। কেন ভাল লাগে বা মন্দ লাগে, তাহা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া কেন যে এত শক্ত তাহা বোঝা ভার। "কেন ভালবাসি?" উত্তরে কবি বলিয়াছেন "আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি।" কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ আমি কবি নই,—তাই পরের কিম্বা নিজের কোন প্রশ্নেরই যেমন সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ উত্তর প্রদানে একান্ত অক্ষম। অতএব নিতান্ত চলিত-ভাষায় শাদা কথা শুনিয়াই আপনার সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

নিজে যাহা করিতে পারি না তাহা অপরে অনায়াসে করিতেছে দেখিলেই তাহাকে বাহবা দিতে ইচ্ছা যায়। আপনি যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহা আমি কখনোই লিখিতে পারিতাম না। সুতরাং প্রথমেই সেই হিসাবে আপনি আমার অভিনন্দনের পাত্রী।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী মেয়ের অতীত ও বর্ত্তমান বিবেচনা করিয়া দেখিলে—(ভবিষ্যৎ,—কালের অন্ধকার গর্ভে নিহিত)—সে যে মাতৃভাষায় গল্প লিখিবার মত ভাষাজ্ঞান এবং চিন্তা ও কল্পনাশক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বাহাদুরীর বিষয় মনে হয়। আমিও ত কতক পরিমাণে জানি মেয়েদের পক্ষে বাস্তবের অধিকার ছাড়াইয়া কল্পনারাজ্যে জাল বুনিবার সুযোগ কত কম, বাধা কত বেশী। এই হিসাবেও বঙ্গলেখিকার উদ্যমমাত্রেই প্রশংসনীয়।

কিন্তু আমরা পুরাদস্তুর সফরাজেট হই, না হই, অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা লাভের প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। সুতরাং শুধু মেয়ের লেখা বলিয়া কাহারও লেখা ভাল বলিলে, তিনি সে প্রশংসাকে ব্যঙ্গনিন্দা মনে করিতে পারেন, এমন আশঙ্কা আছে। সে ভ্রম যথাসম্ভব দূর করিবার নিমিত্ত আমি নিরপেক্ষভাবেই বলিতেছি যে, আপনার ভাষা সরল, সুমার্জ্জিত ও সুসঙ্গত—তাহাতে কাঁচা হাতের কোন চিহ্ন নাই। পক্ষান্তরে কোন প্রকার রচনানৈপুণ্য বা শব্দচাতুর্য্যেরও চেষ্টা নাই। আমি বলি সে চেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যে লিখনভঙ্গী স্বভাবতঃ আসে না, তাহা হৃদয়গ্রাহীও হয় না।

গল্পের ভাষার ন্যায় গল্পের কাঠামও কষ্টকল্পিত নহে,—এক ঘেয়েও নহে। বারোটি গল্পের আখ্যানবস্তু প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। অধিকাংশই পল্লীজীবনের চিত্র। বাঙ্গালী-জীবনে বাস্তবিক না ঘটিতে পারে এমন কোন আজগুবি বা বিদেশী ঘটনাচক্রের সাহায্য লইবার চেষ্টামাত্র করা হয় নাই। আমাদের দস্তুরবাঁধা ঘটনাবিহীন জীবনে সামান্য গল্পের উপযোগী খোরাকও খুঁজিয়া বাহির করিতে সম্ভবতঃ অনেকখানি কল্পনা-শক্তির দরকার। "সম্ভবতঃ" বলিতেছি এই জন্য, যে আমি এ বিষয়ের ব্যবসায়ী নহি। সুতরাং কারিগরীর পারিশ্রমিক আন্দাজে দিতে হইতেছে। অব্যবসায়ী হইলেও দুই একটি মন্তব্য সসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

একটি এই যে, বাস্তবজীবনে ঘটনাগুলির স্বাভাবিক পরিণতি যতটা সময়সাপেক্ষ, দুই এক স্থানে যেন তাহাপেক্ষা সে গুলিকে বেশী তাড়াতাড়ি অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে;—যেমন ঘড়ি বন্ধ হইলে, দম দিবার সময় তাহাকে যথা সময়ে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কাঁটা ইচ্ছামত ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে শেষ হওয়াই ছোট গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। সচল ঘড়ি যেমন স্বল্প-পরিসরে চব্বিশ ঘণ্টার সত্যসাক্ষ্য দেয় বলিয়াই তাহার যাহা কিছু মূল্য, কল্পনাও তেমনি বাস্তবের সুর তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে তবেই

তাহা সার্থক সাহিত্য নামের যোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশেষ করিয়া "পরিবর্ত্তন"এর শেষ অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেখানে বড়-বউকে—সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বিধবা, বিলাতফেরৎ ঘরের সৌখীন মহিলা, ও গরীব ব্রাহ্মণপাচিকার ভূমিকা ত্রয়ের মধ্য দিয়া যেন ঘোড়দৌড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাকে হাঁফ ছাড়িবার, বা পাঠককে চক্ষের পাতা ফেলিবার অবসরমাত্র দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি এই যে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর "সবুজ পত্রের" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "বাঙ্গালা ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে যেমন বাঙ্গলা শব্দের সমতল ভূমিতে যুক্তাক্ষর রোপন করিয়া বৈচিত্র্য সাধনের উপদেশ দিয়াছেন,—সেইরূপ আমার মনে হয় গল্প মাত্রেরই সমতল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে একটু কথোপ-কথনের ঢেউ খেলাইয়া না দিলে নিতান্ত একঘেয়ে লাগিবার সম্ভাবনা। ছেলেবেলায় কোন নূতন গল্পের বই পড়িবার আগে মনে আছে তাহার পাতা উল্টাইয়া যাচাইয়া লইতাম; এবং যেখানিতে স্থানে স্থানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইনে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে দেখিতাম, সেই খানিই মনে হইত ভাল লাগিবে! গল্প শুনিবার লোভ ছেলেবুড়ার প্রায় সমান ও প্রায় একই মনোভাব হইতে উৎপন্ন। তফাতের মধ্যে ছেলেরা ঠাকুরদাদার গল্পের মৃদু গুঞ্জনের ফাঁকতালে 'হুঁ' দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িলে কেহ দোষ দেয় না, বরং গল্পকে ধামাচাপা দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! কিন্তু বুড়াদের ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে গল্প বলা হয় না। তাই বলিতেছি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহাতে সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তাহার একটি প্রকৃষ্ট উপায় আমার মনে হয় কথোপকথনের অবতারণা। মুখের গল্পে বিবিধ মুখের ভাব ও গলার স্বরে সহজেই যে বৈচিত্র্য সাধন করিতে পারা যায়, লিখিত গল্পে আমরা সেই দুই প্রধান সহায়ে বঞ্চিত, তাহা ভুলিলে চলিবে না। সব সময়ে একটি অদৃশ্য বক্তার প্রতি পাঠককে তাহার মনোযোগ আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য না করিয়া গল্পের চরিত্রগুলিকে নিজের মুখে কথাবার্ত্তা কহিতে দিলে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ দেওয়া হয়, এবং তাহাদের অপেক্ষাকৃত জীবন্ত করিয়া তুলিবার সাহায্য করা হয়। শেষ গল্প "বশীকরণ"এ এই প্রাণ-সঞ্চারের একটু চেষ্টা আছে।

গল্প কয়টির মধ্যে "প্রতীক্ষায়" কল্পনাটিও নূতন, বিষয়টিও ভাল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রবাবুর "ক্ষুধিত পাষাণের" ছায়া উহাতে পড়িয়াছে বলিয়া যেন মনে হয়। আমি ত জানি সেই গল্পই ভাল, যাহার বর্ণনার চোখের সামনে ছবি ফুটিয়া উঠে; এবং সেই লেখকই তত ক্ষমতাপন্ন যাহার কাল্পনিক চরিত্র গুলি যত বেশী দিন পর্য্যন্ত মাথায় ঘোরে। যাঁহার রচিত চরিত্রগুলি কখনোই মন হইতে মুছিয়া যায় না তিনিই পাঠকলোকে অমর হইয়া থাকেন। কিন্তু তেমন সৌভাগ্যশালী কয়জন,—তবে কালোহয়ং নিরবধি!

"অভাগিনীর কাহিনী" একটি বৃদ্ধ আফিংখোরের মুখে দিবার কল্পনাটি ভাল;—বুড়ার ছবিটিও মন্দ আঁকা হয় নাই। "বিজয়া" পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলাম, এবং "মেলো-ড্রামা" ধরণের বোধ হইলেও, ভালই লাগিয়াছিল। স্থানে স্থানে বর্ণনায় বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে। সব গল্পগুলিরই একটি প্রধান গুণ এই যে, কোথায়ও ভাবের আতিশয্য বা বর্ণনার আড়ম্বর নাই। আজকাল আর সাহিত্যে সময়-অসময়ে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা কথায় কথায় সফেন বক্তৃতার স্থান নাই,—বিশেষতঃ ছোট গল্পে।

আর কত লিখিব? পুঁথি ক্রমশঃই বাড়িতে চলিল। পত্রদ্বারা সমালোচনা করিলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

নিবেদিকা
জনৈক পাঠিকা।

পিপীলিকা

(২)

বংশবৃদ্ধি এবং বংশরক্ষা করাই পিপীলিকা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন উহাদের নিকট মহত্তর বা উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই। পিপীলিকা-শিশুকে জন্মগ্রহণের পর হইতেই এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে পিপীলিকা-শিশু স্বজাতীয়দের প্রতি তাহার কি কি কর্ত্তব্য আছে সে জ্ঞান লাভ করে এরূপ নহে, ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। অতি প্রথমে ইহারা কেবলমাত্র ডিম্ব গুটী (larva) এবং কীট (pupa) গুলির তত্ত্বাবধান করিতে ও যত্ন লইতে শিক্ষা লাভ করে। ক্রমে বয়স ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পিপীলিকা-পরিবারের প্রত্যেকেই যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া থাকে কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে সেই সমরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহারা যুদ্ধের সময় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিবে এরূপ নহে। যে সময় বাহিরে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে সৈনিক পিপীলিকারা শত শত প্রাণ আহুতি প্রদান করে গৃহের ভিতরে তখন অতি সুশৃঙ্খলার সহিত পিপীলিকা-শিশুরা নানা কার্য্যের তত্ত্বাবধান তৎপর হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর পিপীলিকা-শিশুকে শত্রু মিত্র চিনিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। পিপীলিকা-শিশুরা যে জাতীয় শত্রুকে স্বভাবতঃই চিনিতে পারে না নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

একটা আয়নার বাক্সে মিষ্টার ফোরেল বিভিন্ন জাতীয় তিন প্রকার পিপীলিকা-শিশু আবদ্ধ করিয়া তাহাদের নিকটে অন্য ছয় জাতীয় পিপীলিকার গুটী রক্ষা করিলেন। এই বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা কিন্তু পরস্পরের জাতীয় শত্রু। পিপীলিকা-শিশুরা পরস্পর কলহ বিবাদ না করিয়া একসঙ্গে গুটিগুলিকে পোষণ করিয়াছিল। শেষে গুটিগুলি ফুটিয়া উঠিলে শত্রুজাতীয় অনেক প্রকার পিপীলিকার একত্র সমাবেশ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের মনে কোনরূপ শত্রুতার কথা উদিত হয় নাই এবং ইহারা একত্রে সুখী পরিবারের ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটাইয়াছিল। এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিয়াও যে তাহাদের চিরন্তন শত্রুতার কথা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও হৃদয় জাগরূক হয় নাই—ইহাই তাহার প্রমাণ। শত্রু-চেনা, পিপীলিকাদের শিক্ষার একটী অঙ্গ। শিক্ষা না পাইলে এই 'শত্রুতা' বিদ্যা তাহাদের আয়ত্ত হয় না।

পিপীলিকাদের পরিণয়-ব্যাপার অতি বিচিত্র পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে যুবক ও যুবতী পিপীলিকারা একদিন আকাশে উড্ডীন হয়

এবং সেই অবস্থায় পরস্পরের নির্দ্দেশক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিণীত হয়। হয়ত দেখা যাইবে কোনও এক উজ্জ্বল অপরাহ্ণে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখাসংযুক্ত যুবক ও যুবতী পিপীলিকারা বিবরের বাহিরে আসিতেছে এবং একসঙ্গে শূন্যে উড়িয়া উড়িয়া 'শোভাযাত্রা' বাহির করিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রামিক পিপীলিকারা গৃহের বহির্গমন পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং আবশ্যকমত নূতন পথও প্রস্তুত করিয়া থাকে। অসংখ্য পিপীলিকা এইরূপে অনেকদূর পর্য্যন্ত শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়। এইরূপে কয়েকঘণ্টা অতিক্রম করিলে পিপীলিকা রমণীদের গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে।

অতঃপর উহারা শূন্য হইতে ভূমিতে অবতরণ করে। এই সময়ের ভিতর তাহাদের পাখাগুলি ঝরিয়া পড়ে। পুরুষগুলি প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশাল দেহ লইয়া নড়িতে চড়িতে না পারায় সহজেই উহারা পাখী টিকটিকী ইত্যাদির উদর মধ্যে স্থান লাভ করে। যে কয়টা কোনও প্রকারে উহাদের কবল হইতে রক্ষা পায় তাহারাও খাদ্যাভাবে শীঘ্রই মৃতুকে বরণ করিয়া লয়। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের শ্রামিক পিপীলিকারাও এ অবস্থায় উহাদের প্রতি ফিরিয়া চায় না। বিবাহ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের প্রতি শ্রামিকদের সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইয়া যায়। কেবল এই দিনের প্রতীক্ষাতেই তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

গর্ভবতী পিপীলিকা-রমণীদেরও অনেকেই পুরুষদেরই ন্যায় মৃত্যু লাভ করে। যে কয়েকটী কোনও প্রকারে কোন গর্ত্ত বা অন্য কোনও প্রকার নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া প্রাণে বাঁচে তাহারা কেহ বা কোনও পরিত্যক্ত গৃহে ডিম্ব প্রসব করিয়া নিজেরাই এক একটি পৃথক পিপীলিকা সম্প্রদায় সৃজন করে কেহবা পুনরায় নিজেদের পূর্ব্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেখানে একদিন সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেখানে এবার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া লয়।

মিষ্টার ফোরেল কিন্তু বলেন বিবাহ যাত্রার পর কোন রমণী-পিপীলিকাই নিজ গৃহে পুনঃ প্রবেশ করে না। তিনি বলেন বিবাহ যাত্রার পূর্ব্বে গর্ভ সঞ্চার হয় এমন কতকগুলি পিপীলিকা-রমণীকে শ্রামিকেরা রাণী করিয়া দেয়। অন্য রমণী-পিপীলিকার প্রতি তাহারা কোনও যত্নই লয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত কিন্তু ভিন্নরূপ।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

পুরাতন স্মৃতি

(১)

ঠাকুরমা, সেই ছেলেবেলায়, ঘুম-পাড়াবার ফন্দিতে,
এক-যে-রাজার মজার গল্পের হুঁ-হুঁ জোড়া সন্ধিতে
এমনি করে ঢেলে দিতেন নিদ্রালসের আবল্লি,
নেতিয়ে পড়তে হতই ঘুমে, রাজা রাণী যা বল্লেই।
শুনিনাই ত আগাগোড়া ভাবছি তবু কল্পনায়
এ সংসারে রসোপুষ্ট এমন মিষ্ট গল্প নাই।
নানা উপন্যাসের গ্রন্থে ভরা এমন আলমারি;
রুদ্ধ তাহে কেবল শুদ্ধ বাতাসটুকু জানালার-ই।
কথায়, ভাবে, সুরে, তালে, মিলিয়ে বাঁধা রচনায়,
হাঁপিয়ে উঠি, মাথা কুটি গতদিনের শোচনায়!
পাইনা ফিরে, তবুও ঘুরে বেড়াই তাহার সন্ধানেই;
আয়রে প্রাচীন ঘুম-পাড়ানি! আজ যে চোখে তন্দ্রা নেই।

নেইক তাজা শাঁসাল প্রাণ! গল্পে এখন শানায় কই?
পরীর রাজ্যে ওড়ার মত শক্তি আমার ডানায় কই?
হারানো সে পরাণ কোথা কৌতূহলে কাণ-খাড়া?
মিইয়ে আছি বাসি মুড়ি, কিংবা চিটে ধান ঝাড়া!
গুঁড়িয়ে গেছে স্বপ্ন আমার, খুঁড়িয়ে চলে প্রান্তরে।
ওরে রে সেকালের সাথী, সবাই তোরা শ্রান্ত রে!

(২)

গেছে স্বপ্ন, গেছে খেয়াল; যাক্‌গে তাহে ভাবনা কি?
শিশুর বিশ্বে আছে স্বপ্ন; করব তাকে আপনার-ই।
তন্দ্রাশূন্য চোখে বসে ঘুম পাড়াব শিশুকে;
আশীর্ব্বাদের হাত বুলাব তাদের অসুখ-বিসুখে।
তাদের হাসে প্রফুল্লতায়, হেসে হব আটখানা;
মুখরিয়ে উঠবে আবার এই যে শুষ্ক কাঠখানা।
বলব রাজার মজার কথা তাদের প্রাণে প্রাণ গেঁথে;
শুনবে সবে কৌতূহলে তোতার মত কান পেতে;
কোথায়,গেল রাজার ছেলে, রাগের মাথায় ভুলচুকে,
একটি রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার-মুলুকে।
দেখলে কোথায় একলা ছাতে মালা গাঁথে ফুল তুলি,
কুঁচের বরণ রাজার মেয়ে;—মেঘের বরণ চুলগুলি।

আয়রে কচি কোমল বিশ্ব, আমার বুকে ঝাঁপ দিয়ে!
বাড়াই তোদের পরমায়ু মৃত্যুটাকে শাঁপ দিয়ে।
হাওয়ায় চড়ে ছাওয়ায় ছাওয়ায় সবুজ বনের কোল দিয়ে,
আয় রে নেমে পরীর ছানা সোনার ডানায় দোল দিয়ে।
আমার দেহের দীর্ঘ জীবন ঢেলে দিব,—মূল্য তার!
আয় রে আস্য হাস্য ভরা, বিশ্বজোড়া-ফুল্লতার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমালোচনা

বুদ্ধের জীবন ও বাণী—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস। কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের সাধনার ইতিহাস ও তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর স্থূল মর্ম্ম এই গ্রন্থে যথেষ্ট নিপুণতার সহিত সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে। কেবলই ভাবের দোহাই দিয়া গ্রন্থকার বুদ্ধদেবের মহত্ব খাড়া করিবার প্রয়াস পান নাই, রীতিমত যুক্তির সমাবেশে আপনার বক্তব্যকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুদক্ষ সমালোচকের ন্যায় তিনি বুদ্ধদেবের জীবনী ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়াছি, সেগুলির সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রভেদ এইটুকু, সেগুলিতে সেণ্টিমেণ্টের প্রাবল্য বড় অধিক, এ গ্রন্থখানি কিন্তু intellectual study। এ গ্রন্থপ্রণয়নে লেখক কয়েকখানি বৌদ্ধ-শাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে সকল দিক দিয়া তিনি তথ্যগুলির আলোচনা করিতে পারিয়াছেন এবং সে আলোচনাও নিপুণ যুক্তির বলে একেবারে প্রাণে আসিয়া আঘাত করে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম এ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। একস্থলে তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন,—

"ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধসাধকদের কাছে আর এক রূপ, সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন, একেবারে বুদ্ধেরই তপস্যা করেন। এই দুই রূপের সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য করা কি কঠিন! সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি-সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া। * * * সেই সামঞ্জস্যের জন্য গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। * * * এই গ্রন্থে বুদ্ধের ঐতিহাসিক শুষ্ক মূর্ত্তিও নাই, আবার তিনি একেবারে দেবতা হইয়া অতিপ্রাকৃত হইয়াও উঠেন নাই। এখানে তাঁহার সাধক বেশ। যে বেশে তিনি নিজে সাধনা করিয়াছেন, সেই বেশেই সকল দেশের সকল যুগের ও সকল সম্প্রদায়ের সাধকের হৃদয়ে অসাধারণ সেবা-রস ও অপূর্ব্ব সাধন-রস সঞ্চার করিতেন। তাই এই গ্রন্থে তিনি অতিপ্রাকৃত নন।"

ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব, এবং ইহার জন্যই এ গ্রন্থের সার্থকতা। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি সুন্দর।

উত্তররামচরিত—(মহাকবি ভবভূতি প্রণীত) শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনূদিত। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, উইলকিন্স মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। "নিবেদনে" লেখিকা বলিতেছেন, "মহামতি ভবভূতি তাঁহার এই গ্রন্থে সীতা দেবী, ঋষি-কন্যা আত্রেয়ী, বনদেবতা বাসন্তী, ভগবতী বসুন্ধরা এবং ভাগীরথী অরুন্ধতী প্রভৃতির অবতারণা করিয়া উন্নত নারী-চরিত্রের উদারতা, সৌজন্য, আত্মসম্ভ্রম, ও বিনয়ের যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ অভাস দেওয়াই এই গ্রন্থ অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। * * * এইরূপে যতই এ দেব-ভাষার চর্চ্চা অন্তঃপুরে বিস্তার লাভ করিবে, ততই বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ আপনা হইতেই এই সকল আদর্শানুযায়ী স্ত্রী-চরিত্রের অনুসরণ করিতে অভিলাষী হইবেন।" লেখিকার এই সাধু উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি যে কালধর্ম্মের প্রভাবে বিদেশী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কিম্বা বিশেষত্বহীন তৃতীয় শ্রেণীর রোমান্স অনুবাদের মায়া কাটাইয়া সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নচয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—দ্বিতীয় খণ্ড। মেরুতত্ত্ব অর্থাৎ মেরু, সুমেরু মহামেরু তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা, বাঁধাই সাতসিকা মাত্র। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকার-রচিত পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়াছিলাম। তখনই আমরা গ্রন্থকারের বিপুল অধ্যবসায়, অনুশীলনী-শক্তি ও তথ্য-সংগ্রহের ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এই গ্রন্থ পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের যে যথেষ্ট গৌরব বাড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় সহযোগে তিনি যুগযুগান্তকালের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য দেশ হইলে আজ গ্রন্থকারের নামে জয়জয়কার পড়িয়া যাইত। গ্রন্থখানি এমনই কৌতূহলোদ্দীপক, রচনা-প্রণালী এমনই সরল যে, সম্পূর্ণ অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হইবেন, এক অজ্ঞাত সাম্রাজ্যের আলোক পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। গ্রন্থকারের আলোচনার মূল্য বিশেষজ্ঞেরা বিচার করুন, কিন্তু আমরা অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া অনেক কথা জানিয়াছি, শিখিয়াছি। গ্রন্থকারের ভূমিকা পাঠ করিয়া আমরা কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড) তিন বৎসরে ৩০০ খানিমাত্র বিক্রয় হইয়াছে। * * * প্রথম খণ্ড ঋণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবারে দ্বিতীয় খণ্ডও ঋণ করিয়াই প্রকাশ করিলাম। বাসগৃহাদি বন্ধক দিতে পড়িল। ইতিহাস অধিক বিক্রয় হয় না। মাতৃভাষার সেবার জন্য ঋণ করিলাম, যদি শোধ করিতে না পারি, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ তাহা শোধ করিবেন।" বাঙ্গালীর পক্ষে ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে?

পুষ্পহার—শ্রীমতি উর্ম্মিলা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা পাঁচসিকা, কাগজের মলাট একটাকা মাত্র। বইখানি সাতটি গল্পের সমষ্টি। "কয়েকটি গল্প ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত; কোনটি বহুপূর্ব্বে পঠিত বিদেশী গল্পের ছায়ার উপর রং-ফলাইয়া সম্পূর্ণ নিজের ভাবে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বাকী কয়টি মৌলিক। কোনটিই অনুবাদ নহে।" গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে, তাহার একখানি রঙিন। ছাপা বাঁধাই ভালো। গল্পগুলি অপূর্ব্ব না হউক—পড়িতে ভাল লাগে। ভাষার লালিত্য আছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



"চলতহিঁ পেখনু নয়ন পসারি"

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

কান্তিক প্রেস] [২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী

ভারতী

লাইকা

(তৃতীয় অংশ)

(১৬)

সন্ন্যাসিনীর সহিত বারির সাক্ষাতের পরের কথা !

পিতা মাতা সম্মানহানির ভয়ে—লজ্জায় তাহার মৃত্যু সংবাদ রটাইলেও সে যে এখনও জীবিতা ! এখনও সে স্বামী দর্শনাশায়—পিতামাতার ক্রোড়, রাজসুখভোগ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী জীবনের মহাদুঃখ বরণ করিয়াছে !

প্রথম প্রথম সন্ন্যাসিনী ভাবিয়াছিলেন রাজকন্যা এ পথশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ ? যদিও তাঁহার সাহস ছিল যে হিন্দুকন্যা স্বামীর নামে সকল অসাধ্যই সাধন করিতে পারে—তথাপি তাহার কমনীয় শরীর রৌদ্রজলের সকল অত্যাচার গ্রহণ করিতে পারিবে ত ?

বারি কিন্তু পারিল ! বনে বনে পথে পথে ঘুরিয়াও তাহার অম্লান দেহকান্তি যেমনি জ্যোতির্ম্ময় ছিল। শরীর শীর্ণ মুখশ্রী বিষণ্ণ—কিন্তু তপস্যানিষ্ঠ হৃদয়ের দিব্যালোকে পদ্মনেত্র দুটি যেন সর্ব্বদাই জ্বলিত ! তাহার রক্তহীন সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে এমন একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইত যাহাতে তাহার সেই বালিকার ন্যায় ক্ষুদ্র মুখেও স্থিরবুদ্ধি নারীর মহিমা প্রকাশিত হইত !

প্রথমে সাবিত্রী তাহাকে বয়ঃকনিষ্ঠা দেখিয়া যাহা মনে করিয়াছিল ক্রমে বুঝিল তাহা ভুল,—এই স্বল্পকায়া নারীর কোন শিক্ষাই অসম্পূর্ণ নহে—হৃদয়ের পরিণতি প্রায় পুরুষের ন্যায় বিস্তৃত ও সরল—তাহাতে কোন ক্ষুদ্রতা বা অসামঞ্জস্যের স্থান নাই,—সে আপনার জ্ঞানে আপনি বলিষ্ঠ,—সহজ কার্য্যে সে কাহারও মুখাপেক্ষা করে না,—তাহার কার্য্যও সুচারু নির্দ্দোষ ও অনন্যসাধারণ !—সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য তাহার এই চরিত্র মহিমা কিছুতেই প্রকাশিত নাই ! আকৃতি কোমল—মুখ নির্ব্বাক্, কার্য্য গোপন,—বহুদিন ধরিয়া তাহার সাহচর্য্য না করিলে তাহাকে সহসা বোঝা যায় না !—

পরে দেখা গেল বারি সাবিত্রীর সন্ন্যাস-চরিতের বিন্দুমাত্রও অনুকরণ করিতেছে না —বরং সাবিত্রীই বারির স্তব্ধ হৃদয়ের অনুসরণ করিতেছে,—সেই তাহার স্বভাবে মুগ্ধ।—ক্রমে সাবিত্রী ইহাও ভাবিত—যদি লাইকা আসে,—বারি চলিয়া যায়—তবে সে থাকিবে কেমন করিয়া? ঘুম ভাঙ্গিয়া যদি বারির জাগ্রৎ স্থির চক্ষু দুটি দেখিতে না পায় তবে সে দিন তাহার কাটিবে কেমন করিয়া?—আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, বারির পিতামাতা এই কন্যাকে হারাইয়া আজও বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া?

সন্ন্যাসিনী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন,—তখনকার দিনে সন্ন্যাসী ফকিরের ভিক্ষার কোন দুঃখ ছিল না, সম্পন্ন গৃহস্থ অতিথি সন্ন্যাসী যোগী পাইলে কৃতার্থ হইতেন —ভিক্ষাও মুষ্টিমেয় ছিল না,—এক জনের ভিক্ষায় তিন জনের যথেষ্ট হইত—তাহার পর দুই বালিকা-সন্ন্যাসিনীতে রন্ধনের পালা পড়িত!—

বারি বলিত "দিদি তুমি কাঠ জোগাড় কর আমি ততক্ষণ স্নান করিয়া চাল ডাল গুলি ধুইয়া রাখি!"...

প্রথম প্রথম সাবিত্রী হাসিত—রাজার একমাত্র দুহিতা বারি—সে আবার রন্ধনের কি জানে?—শত শত সূপকার যাহার আজ্ঞাধীন সে আবার পাথরের চুলা কাটিয়া কাঠে ফুঁপাড়িয়া রান্না করিবে?—সে বলিত —"তা ভাল, আমি কাঠ আনিতেছি কিন্তু তুমি আর আগুনের জ্বালে আসিও না বারি!—বরং ছাথ আমি কেমন করিয়া রান্না করিতেছি! শুধু ডাল আর আলু সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাইতে তোমার বড় কষ্ট হবে না ভাই?—"

বারি একটু হাসিল উত্তর দিল না। কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী দেখিল বারির স্নান হইয়া গিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ডাল পাতা লইয়া চুলা জ্বালিয়া তাহাতে ভস্‌লা চাপাইয়াছে।

"ও কি চড়াইলে?"—বলিয়া সে নিকটস্থ হইল, দেখিল ডাল চাল ঘৃত আলু একসঙ্গে দিয়া তাহাই নাড়িতেছে!—তখন সাবিত্রী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল "ও দিদি, কি করিলে ভাই! আজ কি তুমি চাল ডাল ভাজা খাইয়া থাকিবে না কি? অমন করিয়া কি চাল ডাল শুধু চড়াইতে আছে?—যদি আগে জল দিতে তবু বা খিচুড়ী হইত!"—

বারি বলিল, "আঃ থামনা দিদি! তা একদিন কি আর চাল ভাজা খাইয়া থাকিতে পারিবে না? এক কাজ কর এখন, ঐ ছাথ চারটি চাল রাখিয়াছি দোকান হইতে হইতে দুটি জিরালঙ্কা আর একটু হলুদ লইয়া এস!"

"কেন? অততে দরকার কি?"

হাসিয়া বারি বলিল, "দরকার নাই বা কিসে? এত ঘি আলুরই বা দরকার কি? তোমরা কি মোহনভোগ করিয়া খাওনা? এখন যাও শীঘ্র ফিরিও!

সাবিত্রী শীঘ্রই ফিরিল তখন বারি আবার ফরমাস করিল—"জ্বালটার উপর নজর রাখ আমি হলুদটা পিষিয়া লই!"—সাবিত্রী বলিল কেন আমিই পিষি না। আর পিষিবেই বা কিসে? আমরা ত শিল বহিয়া বেড়াই না!"

বারি তাহার পিঠে এক কীল বসাইয়া বলিল—তোর মাথায় এখনি আমি একটা শিল চাপাইয়া দিব—এত পাথর পড়িয়া আছে আর তুমি শিল খুঁজিয়া পাও না? তাইত বলিলাম,—তুই বস্, আমি হলুদ আর মরিচটুকু গুঁড়াইয়া আনি!—"

তখন হাঁড়ীর মধ্যে দৃষ্টি করিয়া সাবিত্রী বলিল "এই যে জল দিয়াছিস ভাই!—" ভাজা চাল কি সিদ্ধ হইবে? আর ও কিরে বারি! আলুগুলা অত কুচাইয়া দিয়াছিস কেন?—গলিয়া যাইবে না?—তুলিবই বা কেমন করিয়া—আর ঐ টুকু ত আলু সিদ্ধ, তার জন্য অত মরিচ গুঁড়া কেন করিতেছিস্ ভাই—থাক্ তোর হাত লাল হইয়া গেল!"—

বারি নিপুণ হস্তে রন্ধন করিতে লাগিল,—রন্ধনের গন্ধে ও বর্ণে সাবিত্রী বুঝিল ইহা তাহাদের নিত্য আহার্য্য খিচুড়ীরই রূপান্তর—কিন্তু রাজকুমারীর হস্ত স্পর্শে তাহা নূতন ও লোভনীয় হইয়া উঠিতেছে! আরও বুঝিল যে রন্ধন ব্যাপারেও বারির কিছুই শিখিবার নাই, জ্বাল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়ী নামানো চড়ানো পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মেই তাহার নৈপুণ্য ও অভ্যস্ত ভাব প্রকাশ পায়—প্রস্তুতপ্রণালীও নূতন ও সুদৃশ্য! সাবিত্রী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল!

রন্ধন শেষে হাঁড়ী ঢাকা দিয়া বারি বলিল, না কখন আসিবেন জান?

সাবিত্রী বলিল—"তিনি পূজায় বসিয়াছেন —শীঘ্রই আসিবেন, ততক্ষণ তুমি একটু শ্রম দূর কর ভাই! আমি না হয় আলু কটা সাঁলিয়া রাখিতেছি!—"

হাসিয়া বারি বলিল, "এই একটু খিচুড়ী করিতে আমার আবার শ্রম হইল কোথায়? আর আলুও তুলিতে হইবে না,—বরং—"

বলিতে বলিতে বারি আবার হাসিয়া ফেলিল! সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হাসিলে যে?"—

হাসিতে হাসিতে তাহার কাঁধে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বারি বলিল,—"তুই গাছে চড়িতে জানিস্ দিদি?"—

সাবিত্রীও হাসিয়া উঠিল,—"কেন বল্ দেখি? জানি বলিয়াইত বোধ হয়!"—

"এই তেঁতুল গাছটায় চড়িতে পারিবি কি?"—

"কেন? জিবে জল সরিতেছে নাকি? কিন্তু তেঁতুল যে কাঁচা ভাই—?"

"আঃ কাঁচা কি আমিই দেখি নাই?—তুই পাড়িতে পারিবি কি না তাই বল?"—

সাবিত্রী তখন গাছে উঠিল।—গোটাকত ফল ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আর চাই কি?"—

কুড়াইতে কুড়াইতে বারি বলিল,—আর না রক্ষা কর!"

তাহার পর সেই অম্লফলকে মৃদুতাপে পোড়াইয়া—খোলা বীচি ফেলিয়া লবণ গুড় সংযোগে বারি চাট্‌নী প্রস্তুত করিল। সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া সে বলিল; 'আমাদের দ্বারায় এত হয় না ভাই, পোড়া পেটের জন্য কে এত করে বল?"

"এত আর কি করিলাম? ভাত ত তুমিও রাঁধিতে,—ডাল আলু এ সকল

লইয়া একটা কিছু করিতেও,—আমি আর অধিক কি করিলাম?"—

সাবিত্রী বলিল, "বটে?—ওই সব ঝাল-মস্‌লা-- তেঁতুল গুড় লইয়াই যদি আমরা এতটা সময় নষ্ট করি, তবে কি করিয়া চলে?"

বারি এইবার মুখ নীচু করিল। খানিকক্ষণ পরে অতিমৃদু হাসিয়া বলিল,—"কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—এই রান্নার ব্যাপার শেষ হইবার পর মার আসা পর্য্যন্ত আমরা কি করিতাম দিদি?—এখন আর আমাদের কি কায আছে বল?"

সাবিত্রীও হাসিল, বলিল, "না কায কিছুই নাই, তবে যাহা করিতেছিলাম তাহাই বা এমন কি গুরুতর কায ভাই!"

"চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষাও কি গুরুতর নয়?"

"অনর্থক! দুই সমান অনর্থক!—"

ব্যস্তস্বরে বারি বলিয়া উঠিল,—"অনর্থক? দিদি ইহা অনর্থক?"

হাসিয়া সাবিত্রী উত্তর করিল, "আঃ তুই ব্যস্ত হস্ কেন ভাই? নিজের আহারের চিন্তা আমাদের মত সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে খুব অনর্থক।"

বারি নতমুখে আপনার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিল,—সাবিত্রীর উত্তরের কিছু পরে মৃদু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আমিত ইহা নিজের জন্য করি নাই—আমার পক্ষে কেন অনর্থক. অসার্থক হইবে ভাই?—যতটুকু সময় আমি বসিয়া বা অযথা চিন্তা করিয়া কাটাইতাম—সে সময় টুকুতে কিছু কায করিয়া বা নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যদি একটুও তৃপ্তি আনিতে পারি, তবে আমার ঐ ব্যয়িত সময় টুকুর জন্য কি এত ক্ষতি হইবে?"

সাবিত্রী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "উঃ উঃ! ভারি লোকের জন্য ত রাঁধিয়াছ! এদের আবার তৃপ্তি আর অতৃপ্তি!--"

সাবিত্রী আরও কি বলিতেছিল এমন সময় দেখিল, বারির মুখখানি যেন ঈষদারক্ত,—চোখ দুটি এত নীচু যে তাহাতে বিশেষ সন্দেহ হয় যেন তাহা আর প্রকৃতিস্থ নাই!—দৌড়িয়া তাহার নিকটে আসিয়া সে হাত ধরিল,—"ওকি, ওকি, বারি!—পাগল নাকি? বাহা-বাহারে মেয়ে! রাগ করিয়া বসিলি যে! আমি যে তোকে ক্ষেপাইতে-ছিলাম তাহা আর বুঝিলি না ভাই? কিন্তু সত্য বলিতেছি আমার মনে হইতেছে যে কতক্ষণে মা আসেন যে তোর হাতের ওই মিষ্টি রান্না খাইয়া বাঁচি! সত্য—আমি প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলাম ভাই!"—

বারি হাসিয়া তাহার কাঁধে মাথা দিল, চোখে সত্যই জল! মুছাইতে মুছাইতে সাবিত্রী বলিল,—"ইস্ রাগ দেখেত বাঁচিনে তোর! ফের যদি এমন চোখে জল এনেছিস্ তবে দেখিস্—"

বারি তাহার বাহুতে একটি চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—"তবে বল!"

"কি বলিব?"

"আমাকে প্রত্যহ রাঁধিতে দিবে!"

"প্রত্যহ!—আচ্ছা তাহা না হয় হইবে,—কিন্তু তাহা এত যাচাইয়া লইতেছিস্ কেন বল্ দেখি?"

"অতি মৃদুস্বরে বারি বলিল, "বড় ভাল লাগে ভাই! মানুষকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে আমাকে বড় ভাল লাগে! আমার রান্না খাইয়া যদি কেহ সুখ্যাতি করেন আমার মনে হয় এই আমার স্বর্গসুখ!—দিদি! আমি প্রত্যহ রাঁধিব বুঝি খাইয়া প্রশংসা করিও কেমন?"

"আর যদি বিশ্রী রান্না হয়? তবু প্রশংসা করিতে হইবে না কি?"—

বারি হাসিয়া নিরুত্তরে থাকিল। সাবিত্রী বলিল, "ও ভাই তবে শোন! এই শুধু ভাত কি মোটারুটি খাইতে খাইতে আমার কত দিন যে কান্না পায় তা আর তোকে কি বলিব! মাকে লুকাইয়া—সত্য বলিতেছি তুই হাসিস্ কেন?—মাকে লুকাইয়া বাজার হইতে দুটা মিষ্টি কিনিয়া খাই। কোন মহাজন কি সাধুর নিমন্ত্রণ পাইলে যে আমার কত খুসি হা বারি—তা—সত্যই বলিতেছি, তুই অবিশ্বাস করিস্ না, মনে যা হয় তাই বলিতেছি, তবে সন্ন্যাসের সংযম?—সে যথাসাধ্য পালন করিতেছি! কিন্তু মনের কথা ত মনের অগোচর নাই!"—

বারি হাসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল—সাবিত্রী আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিল। বলিল, "হাঁ, তাহাই বলিতেছি! তুই প্রত্যহ ভাল করিয়া ভাত রুটি করিয়া দিস্ আমি আহ্লাদ করিয়া খাইব!"

বারি তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "সত্য বলিতেছ?"—

"সত্য! তোর গা ছুঁইয়া বলিতেছি!"

তখন দুইজনে সেই ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সাবিত্রী বুঝিতেছিল যে তখন বারির রুদ্ধ হৃদয় ঠেলিয়া কি একটা আঁধার মেঘ উঠিবার চেষ্টা করিতেছে আর প্রবল চেষ্টায় সে তাহা রোধ করিতেছে!—সেও তেমনি হৃদয়ভেদী স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত তাহাকে বুকে চাপিয়া থাকিল,—বারি তাহা বুঝিল!—

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিলে সন্ন্যাসিনী আসিলেন। তখন দুইজনেই তাহার সেবায় ব্যস্ত হইয়া গেল।—

(১৭)

সন্ন্যাসিনী কিছু বিস্মিত হইলেন, বারিকে ত কৈ কেহ অন্বেষণ করিল না?—তিনি প্রথমত তাহাকে যথাসাধ্য লুকাইয়া রাখিতেন কখনো ছদ্মবেশও দিতেন ক্রমে দেখিলেন কোথাও সে কথার আভাস-মাত্র নাই, কেহ একবার ভ্রমেও কোন কথা উচ্চারণ করে না; বারির প্রসঙ্গ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।—

তাঁহারা আবার কাশী আসিলেন, আসিয়াই জনরব শুনিলেন—রাজনন্দিনীর মৃত্যু হইয়াছে!—শুনিয়াই তিনি সমস্ত বুঝিলেন,—বারি মৃদু হাসিল। তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না, অতি সাবধানে একবার রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ঐ একই কথা, 'রাজার একমাত্র কন্যা সম্প্রতি ৺কাশীলাভ করিয়াছেন!'

সকলেই এক বাক্যে সেই কথাই বলে—কেহ কোন সন্দেহ মাত্র করে না!

দেশে আসিয়া বারি অত্যন্ত অনমনস্ক ভাবে ছিল—সে কোন কথা কহিল না,—সন্ন্যাসিনী প্রসন্ন অথবা দুঃখিত কিছুই হইলেন না বরং যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কাঁদাইয়া ভাসাইল!—এত বড় কুকথা কেমন করিয়া রটনা হইল? পিতামাতায় কি বলিয়া প্রচার করিল?

বারি বিরক্ত ভাবে বলিল, "তবে কি বলিবে যে আমার গুণবতী কন্যা গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন?"

সাবিত্রী তাহা মানিল না, "মা গো মা! এমন বিশ্রী কথাও কি উচ্চারণ করিতে আছে? বলিল না কেন যে সে মথুরা বা হরিদ্বারে গিয়াছে! যদি লাইকার দেখা পাওয়া যায় আর পাইবেই বা না কেন? বারি এমন কি পাপ করিয়াছে যে চিরজীবন তাহাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!—তখন? তখন কি বলিয়া রাজা কন্যাজামাতাকে আবার ঘরে লইবেন?

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে বারি বিরক্ত হইল—"কি ছেলেমানুষী কর দিদি?" বলিয়া উঠিয়া গেল,—তথাপি সাবিত্রীর বকুনী থামিল না। আর লাইকাই বা কেমন মানুষ? এমন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এমন সুন্দর এমন মধুর এমন স্ত্রীকে কাঁদাইয়া পলাইয়াছে? শুধু কি কান্না?—আজ তাহারই জন্য শত আদরের আদরিণী—সলিল সোহাগের জল-নলিনী মরুভূমে আসিয়া পড়িয়াছে! এত পথের কষ্ট, শুইবার কষ্ট, খাইবার কষ্ট সর্ব্বোপরি মনের শতমুখী অগ্নিশিখার জ্বালা এ কার জন্য সে সহ্য করিতেছে?—লাইকার জন্যই ত?—আহা—হা! অভাগা লাইকা জানিত না যে একজন দেবী তাহার জন্য এমন কঠিন তপস্যা করিতেছে!—সে জানে না যে ভগবান তাহার জন্য যে মন্দাকিনী ধারা মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছেন তাহা কেমন স্বাদু—কেমন অমৃতময় কেমন পবিত্র! ওরে পাষাণ একবার ফিরিয়া আয়! একবার ত্যাখ—তোরও জীবন সার্থক হোক্ আর এই অভাগিনী দুঃখিনীরও কষ্ট মোচন হোক্!

জানে না, দুর্ভাগ্য লাইকা কিছুই জানে না যে তাহার বারি কেমন! জানিলে ফিরিত! নিশ্চয় ফিরিত—স্বয়ং ভগবান এমন অকপট ত্যাগের এমন সমর্পণময় ভালবাসায় বাঁধা পড়েন লাইকা মানুষ বৈ ত না!

আর হতভাগ্য রাজারাণী! তাঁহাদের বড় দোষ নাই—এ মেয়েকে হারাইয়া তাঁহারা যে সুখে আছেন তাহা নয়—তাহা কখনই নয়! অনেকটা দুঃখেই তাঁহারা এ জনরব প্রকাশ করিয়াছেন!—ভাবিলেই বেশ বোঝা যায় যে কত ব্যথা বুকে চাপিয়া তবে একথা তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন!

ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করে! তিনি এখন কি অবস্থায় আছেন দেখিয়া আসে! কিন্তু সাহসে কুলাইল না,—সন্ন্যাসিনীকে কিছুতেই বলিতে পারিল না। তখন লাইকাকে লইয়া পড়িল! সন্ন্যাসিনী আসিতেই প্রশ্ন করিল,—

"হাঁ মা! লাইকাকে তুমি দেখিয়াছ?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"কেন বল দেখি?"—বলিয়াই তিনি বারির প্রতি চাহিলেন,—সে লজ্জিত হইল সাবিত্রীর উপর রাগ করিল কিন্তু প্রসঙ্গটা ত্যাগ করিয়া উঠিতেও পারিল না। সন্ন্যাসিনীও তাহা বুঝিলেন।

সাবিত্রী আবার বলিল,—"বল না মা, তিনি কেমন?"—

"কেমন কি রে পাগলি!—মানুষ আবার কেমন হইবে?"—

সাবিত্রী বলিল—"শুধু মানুষের মত মানুষ?—তবে সংসারে এত লোক থাকিতে রাজা তাঁর একমাত্র কন্যাকে সেই সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন কেন? অমিত বুঝিতেই পারি না মা,—যে এমন কাণ্ডটা কি করিয়া ঘটিল? কেন যে রাজা—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কেন?—কেন তাহা যে লাইকাকে না দেখিয়াছে সে বুঝিবে না মা! তোমরা কখনো তাহাকে দেখ নাই, তাহার মুখের কথা শোন নাই তাই তাহার বিরুদ্ধে চিন্তা করিতে পারিতেছ! রাজা তাহাকে ঠিক্ চিনিয়াছিলেন—তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছিলেন—কিন্তু সেত পৃথিবীর বাঁধনে বাঁধা পড়িবার জীব নয়। সে সোনার পাখী যে কোন উদয় অস্তাচলের শিরে উড়িয়া বেড়ায় তাহা কে জানে?

সন্ন্যাসিনী বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন। বারি অধোমুখে কি ভাবিতেছিল,—সাবিত্রী একটু হাসিয়া বলিল,—"সে না হয় শুনিলাম, কিন্তু লোকটি কেমন তাহা ত বুঝিলাম না মা? তাঁহার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে কাণ ভারি হইয়া আছে—কিন্তু তবু আমার অনুমান তাঁহাকে বুঝিতে পারে না! তিনি বিবাহই বা কেন করিলেন—আর যদি করিলেন তবে স্ত্রীকে ত্যাগই বা করিলেন কেন?"

ঈষৎ বিরক্ত ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "শোন নাই কি যে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাহার বিবাহ হইয়াছিল—" বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন—বারির প্রতি চাহিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—তাহার মুখ কি ম্লান!—কপালে নীল শিরা উঠিতেছে! সাবিত্রীও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল তাড়াতাড়ি বলিল, "চুপ কর মা, চুপ কর! তোমার লাইকা খুব ভাল তাহা জানি, এমন লক্ষ্মীকে যে চোখের জলে ভাসাইয়া রাখিয়াছে সে আবার—'(পরে একটু ঢোক গিলিয়া) হাঁ দেখিও মা বারির এত কষ্ট বিফলে যাইবে না, আমি বলিতেছি দেখিও, লাইকা যদি নিজে আসিয়া ইহার পায়ে না ধরে আমার নামই মিথ্যা!"

বারির চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। সে সাবিত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "থাম দিদি! তোমার পায়ে পড়ি ভাই! আমি জানি যে আমার এই কষ্ট তাঁহার সাধনায় হয়ত বাধা দিবে,—তবু মন কেন বশ করিতে পারি না—কেন এ চিন্তা ভুলিতে পারি না তাহা ভগবানই জানেন!—তবে সেই অন্তর্যামীই বুঝেন যে আমি কায়মনে কেবল তাঁহার কুশলই প্রার্থনা করি,—দীনবন্ধু যদি দয়াময় হন তবে ত আমার আশা বিফল হবে না ভাই!"

সন্ন্যাসিনী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—'না না, বারি? তুমি ঠিক্ বোঝ নাই,—লাইকার স্বভাব তাহা নয়! সে যে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সুখে

আছে বা অন্য কোন চিন্তায় তোমাকে ভুলিয়াছে ইহা মনে করিও না। তবে অনেক সময় আমিও বুঝিতে পারি না যে সে কেন মাঝে মাঝে তোমায় দেখা দিয়া যায় না বা কোন সংবাদ দেয় না! তাহার কোমল হৃদয়ের কথা বা ভাব ত তোমরা জান না—কাহাকেও কোন কষ্ট দেওয়া তাহার জীবনের ইতিহাস ছিল না।"

তখন সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "যেমন ছিল না তেমনি খুব ভাল করিয়া হইল!"

ক্ষুব্ধ ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "না মা, তাহাও ঠিক নয়, আমি বুঝিতে পারিতেছি না সে শারীরিক সুস্থ কি না? কৈ এদানী ত আর তাহার কোন সংবাদ পইতেছি না!—ওকি মা বারি তুমি কাঁপিয়া উঠিলে কেন?—"

ধীর স্বরে বারি বলিল, "কিছু না মা! তবে আমি ঠিক জানি যে আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে! আপনি তাহার কি করিবেন?—"

তাহার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন "আঃ পাগল মেয়ে!—কি দুর্ভাবনা কর মা?—না, আমি তাহা বলি নাই,—তবে ইহাও সত্য যে এখন লাইকা কোথাও পড়িয়া আছে,—নতুবা প্রায় ত তাহার সংবাদ পাইতাম!"

খানিকক্ষণ পরে বারি প্রশ্ন করিল, "কতদিন সংবাদ পান নাই মা?"

সন্ন্যাসিনীর ললাটে একটি চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছিল,—অন্যমনস্ক ভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—"বেশী দিন নয়!"—

বারি তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিল—দেখিল, কিন্তু আর প্রশ্ন করিল না, সাবিত্রীর চোখে স্পষ্ট জলের রেখা—কিন্তু তখনই নিঃশব্দে সে উঠিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিল—দূরে কোন্ গ্রামে আরতির কাঁসর শব্দ বাজিতেছিল! তখন সেই নীরব আঁধার ভেদ করিয়া স্পষ্টস্বরে বারি বলিল—"সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয় তুমি আহ্নিক করিবে না মা?"

সন্ন্যাসিনী যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হাঁ।"

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৬)

জ্যোতিবাবু বলেন যে "আমাদের অন্তঃপুরে আগে সেই "ভব্যিযুক্ত" বৈষ্ণবীটি বাঙ্গালা পড়াইত। তার পর কিছুদিন একজন খৃষ্টান্ মিশ্‌নরী মেম আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইত। ইহার পর অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদ বধ" প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তার পর

মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয় মনের ঔদার্য্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা বেশ উপভোগ করিতেন। এর অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (বর্ত্তমান্ ভারতী সম্পাদিকা) কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেগুলি শুনাইতেন, আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

বিবাহের পর তিনি "দীপ নির্ব্বাণ" নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। "দীপনির্ব্বাণ" প্রকাশিত হইলে পর সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। "পৃথিবী" নামে ইনি একখানি গভীর গবেষণা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পুস্তকও প্রকাশিত করিয়াছেন—সেখানিও সর্ব্বজন প্রশংসিত। (১)

তাহার পর ক্রমশ তাঁহার উপন্যাসের

(১) বঙ্গাব্দ ১১৮৩ (ইংরাজী ১৮৭৭) সালে স্বর্ণকুমারীর দীপনির্ব্বাণ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার "ছিন্নমুকুল" নামে আর একখানি উপন্যাস এবং "বসন্ত উৎসব" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" প্রকাশিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে গীতিনাট্য ও গাথা রচনা করেন। গাথা ও গীতিনাট্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন। এই সময়ে স্বর্ণকুমারী নিয়মিতরূপে ভারতীতে লিখিতেন। ১২৮৮ সালে তাঁহার "মালতী" নামে আর একখানি ছোট উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার ষষ্ঠ গ্রন্থ "পৃথিবী" ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ। বাঙ্গলা দেশে এবং বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী সর্ব্বপ্রথম মহিলা-ঔপন্যাসিক। ইঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনও বঙ্গমহিলা বঙ্গভাষায় উপন্যাস, গীতিনাট্য, অথবা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তৎকালে Calcutta Review (Jany. 1881) সাধারণী, Indian Mirror, Brahmo Public Opinion, নববিভাকর, Sunday mirror (Sept II, 1889), Hindoo Patriot. বান্ধব (পৌষ ১২৮৫) প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রাদিতে সুদীর্ঘ সুখ্যাতিপূর্ণ সমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। যাহাই হউক, স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যখ্যাতিতে তখন দেশবাসীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষার একটি অতি পবিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ শুভঙ্করী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নিম্নে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর পুস্তকাবলী ও তাহাদের প্রথম প্রকাশের তারিখও লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম—দীপনির্ব্বাণ (১২৮৩, ইং ১৮৭৭), ছিন্নমুকুল (১২৮৫), বসন্ত উৎসব (১২৮৬), গাথা (১২৮৭) মালতী (১২৮৮) পৃথিবী (১২৮৯) নবকাহিনী (১২৮৩), শিবাররাজ (১২৯৬) বিদ্রোহ (১২৯৭) স্নেহলতা (১২৯৯), ফুলের মালা (১৩০১), কবিতা ও গান (১৩০২) কাহাকে (১৩০৫) ইমামবাড়ী (১৩০৮ ইং ১৯০১) কৌতুক নাট্য (১৩০৮, ইং ১৯০১) দেবকৌতুক (১৩১২) কনে বদল (১৩১৩) পাকচক্র (১৩১৯) রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্য বিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা ভারতীতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল—এখনও সেগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ১৭ই শ্রাবণ ১৩২১। শ্রীবসন্ত।

উপর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধ প্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দরোয়ান যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার জলে পাল্কী শুদ্ধ চুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু মেজদাদা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদকল্পে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমশ ফলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশ আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হয় তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট বিছানা ছাড়া অন্য কোনও তেমন আস্‌বাব পত্র থাকিত না; কিন্তু জানকী বাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন তাঁহার অনুকরণে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিল। মোটকথা অন্তঃপুরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইল এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নূতন জিনিষের প্রবর্ত্তন করেন। সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।



জানকীনাথ ঘোষাল

"অক্রুর চন্দ্র দত্তের বাড়ীর রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতায় তখন সুবিখ্যাত amateur হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক। তিনিই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথি তন্ত্রে দীক্ষিত করেন। জানকী তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসেন। রাজেন্দ্র বাবু এক রকম নূতন রান্না আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "রাজভোগ।" তাঁহার নবাবিষ্কৃত এই রান্নাটি খাইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে তাহার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। চাল ও ডাল চড়াইয়া, আমাদিগকে বলিলেন "এইবার তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, ইহাতে নিক্ষেপ কর"। এ কথায় আমরা কেউ আমসত্ত্ব, কেউ তেঁতুল, কেউ মাছ, কেউ গুড়, কেউ লঙ্কা, কেউ রসগোল্লা প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই দিলাম। আহা, সে যে কি উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আর কহতব্য নয়! তাঁহার সহিত আমরাও সারি বন্দি হইয়া "রাজভোগ" ভোজনে বসিয়া গেলাম,

কিন্তু মুখে দিবা মাত্রই মাতৃদুগ্ধ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

"এই সময়ে সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) একবার খুব পীড়িত হইয়াছিলেন। আমাদের গৃহ চিকিৎসক বেলি সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। আবার তলে তলে রাজেন্দ্র বাবুর হোমিওপ্যাথিও চলিতেছিল। একদিন রাজেন্দ্রবাবু রোগীর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন এমন সময় বেলিসাহেব রোগীকে দেখিতে আসেন। দুয়ারেই দুইজনের চারি চক্ষের মিলন। রাজেন্দ্র বাবুকে যেমন দেখা, বেলি সাহেব একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে টুপি ফেলিয়াই একছুটে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন "মার্চ্চেণ্ট্ আবার ডাক্তার?" এই বিপদে গণেন্ দাদা সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন।

"গণেন্ দাদা একজন লেখক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি বিক্রম উর্ব্বশী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাও করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি ইতিহাস খুব ভাল বাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রকাশিত রচনা এখনও থাকিতে পারে। তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান্।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। এ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এ উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত। নবগোপাল বাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভারতবিষয়ক উত্তেজনাপূর্ণ একটা কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময় কবিতা লিখিতেন না, বা এর পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা (২) লিখিলেন। কবিতা রচিত হইলে, নবগোপাল বাবু গণেন্দ্র বাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতি বাবু সেখানে কবিতা পাঠ করিলে, তিনি (গণেন্দ্র বাবু) "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়তে হবে" বলিয়া ইহাকে উৎসাহিত করিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (এখন শাস্ত্রী) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিন জনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়।

(২) ১৩১৩ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতী"তে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীবসন্ত।

জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া ৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কোনপ্রকার বাড়াবাড়ি না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য বন্ধুভাবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

✓জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয় পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী



গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখিয়া লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া ও ৺নবগোপাল মিত্র তাহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া এই স্বদেশী ভাবের প্রবাহে খুব একটা ঢেউ তুলিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজই স্বদেশী ভাবের কেন্দ্র ছিল। যখন কেশব বাবু ও তাঁহার দলবল আদি ব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপাল বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের পতাকা গ্রহণ করিয়া, সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া ও মৌখিক বক্তৃতা করিয়া আদিসমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ✓স্বদেশীভাব প্রচার করিবার জন্য পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে National paper নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক বাহির হইল। ✓কতকগুলা "গড়া খেগো" ঘোড়া লইয়া তিনিই প্রথম বাঙ্গলী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে Bose circus এর কৃতিত্ব দেখা যায় উহা তাহারই পরিণতি। তিনি এত করিলেন, এখন তাঁহার কেহ নামও করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহার একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা খুবই আবশ্যক।"

এই সময়ে ক্যাথরাঁ (Cathrin) নামে একজন ফরাশী ৺হেমেন্দ্রনাথের নিকট কোনও একটি কায কর্ম্মের জন্য আসিয়াছিল। হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে ত্রিশটাকা বেতনে পাচক নিযুক্ত করিলেন। সে পাকও করিবে ফরাশীও পড়াইবে। একবার হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে বোলপুর গিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

"প্রতিভা (এখন Mrs. Asutosh Chaudhuri) তখন দুই বৎসরের শিশু। ক্যাথরাঁকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গলা মতে আমাদের ব্রাহ্মণ যাহা রাঁধিত—ক্যাথরাঁও তাহাই খাইত। তাহাতে সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট ছিল না—তবে ভাতের পরিমাণটা তার অনেক বেশী ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ফরাশীতেই কথা বলিত, ফরাশীতেই গল্প করিত। তাহার কারণ সে ফরাশী ভিন্ন আর কোন ভাষাই জানিত না। আমাদের বিলাতী খানা খাইবার ইচ্ছা হইলে সেই রাঁধিত। সে অল্প খরচে নানাবিধ ডিস্ প্রস্তুত করিতে পারিত। সে আবার অবসরমত প্রতিভাকে দোলও দিত। তাহার জন্য গাছে সে একটা দোল্‌না টাঙ্গাইয়াছিল। দোল্ দিতে দিতে সে "হাপ্‌লা—হাপ্‌লা—" করিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিত। সে আবার সেজদাদাকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌ও শিখাইত। ক্যাথরাঁ বোলপুরে থাকিতে থাকিতে সেখানকার খোঁয়াড় হইতে কতকগুলি স্ফটিক-পাথর জমা করিয়াছিল। তারপর এক একটা কাঠি বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ঐ সব পাথরগুলি ফলার মত করিয়া বসাইয়া একরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিল। কলিকাতার King Hamilton কোম্পানিরা তাহার প্রত্যেকটী ষোল টাকা হিসাবে কিনিয়া লইল। এই সব পাথর আমরা কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার দ্বারা যে কোনও কায হইতে পারে, এ আমাদের মাথায় কখনও আসে নাই। কিন্তু সে একজন সামান্য অল্পশিক্ষিত ইয়ুরোপীয়,—পাথর-গুলিকে কেমন কাযে লাগাইল! শুধু কাযে

লাগাইল না, তার দ্বারা দুপয়সা রোজগারও করিল। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে এই প্রভেদ!"

তখন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ডিনার দেওয়া হইত। ক্যাথরাঁই ডিনার প্রস্তুত করিত। একদিনকার ডিনারে তৎকালীন্ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। আর একবার বঙ্কিমবাবুকে খাওয়ান হইয়াছিল।

ক্যাথরাঁর রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ছিল। ফরাশীরা অবশ্য রান্নার জন্য বিখ্যাত। ইয়ুরোপের সমস্ত বড় বড় লোকের ঘরে ফরাশী পাচকই থাকে। ফরাশীদের রান্না অনেকটা আমাদেরই মত। ইংরাজদের যেমন এক একটা গোটা জানোয়ার টেবিলে ধরিয়া দেওয়া হয়, ফরাশীদের রীতি সেরূপ নয়। তাহারা মাংস বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, তাহাতে নানারূপ আনাজ ও মশলা দিয়া বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করিয়া পাক করে। সে শাক্‌সব্‌জী প্রভৃতি নিরামিষ ডিশও অতি সুন্দর মুখরোচক করিয়া রাঁধিতে পারিত। আমাদের যেমন শাকের ঘণ্ট, শুক্তো প্রভৃতি আছে, সেও Sauce ও মশলা দিয়া সেই ধরণের এক একটা জিনিষ প্রস্তুত করিত। জ্যোতিবাবুদের সে "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা সেলাই" পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই করিত—সে হিসাবে তাহার বেতন খুবই অল্প বলিতে হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ইহাদের নিকট ছিল, তারপর একবার ছুটি লইয়া বাড়ী যায়। সেখান হইতে সে পত্রাদি লিখিত; কিন্তু ফরাশি জর্ম্মান্ (Franco-German) যুদ্ধ বাধার পর হইতে, আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় বেচারা সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে,—অন্ততঃ জ্যোতিবাবুর ধারণা এইরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পিপীলিকা

(৩)

মানুষ যেমন দুগ্ধবতী গাভী পালন করিয়া থাকে পিপীলিকারাও তেমনি সেই উদ্দেশ্যেই কতকগুলি পোকা পুষিয়া থাকে। এই পোকাগুলি একপ্রকার মিষ্ট রস প্রদান করে সেই রস পিপীলিকারা পরিতৃপ্তির সহিত পান করিয়া থাকে। হুবার সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই পিপীলিকা গাভীর (Aphides) অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন তাহারা এই গাভী-পোকার কতকগুলি ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে ঠিক নিজেদের ডিম্বের ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সেগুলি "ফুটিয়া" গাভী-শিশুর জন্ম হইল। এই

শিশুগুলি অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। পিপীলিকারাই ইহাদের আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। প্রতিদিনময়ে পিপীলিকারা উহাদের গাত্র হইতে উত্তম সুমিষ্ট রস দোহন করিয়া লইত। উহাদের দোহন প্রণালী এইরূপ :—

পিপীলিকারা তাহাদের পালিত গাভীর উদরের নিম্নদেশে ধীরে ধীরে শুঁড় দ্বারা আঘাত করিতে থাকে—এবং কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে আঘাত করিবার পরই উহাদের শরীরের উক্ত স্থান হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। এই রস পিপীলিকারা দুধের ন্যায় তৃপ্তিসহকারে পান করে।

এ সম্বন্ধে ডারুইন বলেন—"প্রাণীজগতে সম্পূর্ণরূপে নিস্বার্থভাবে অপরের উপকারের জন্য কোন কাজ করার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পিপীলিকাদের এই গাভী জাতি (Aphides)। তাহারা যে স্বেচ্ছায় এই দুগ্ধ বা রস প্রদান করে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

"একটি বৃক্ষের উপরিস্থিত প্রায় ১২টি পিপীলিকা-গাভীর নিকট হইতে আমি সমস্ত-পিপীলিকাকে স্থানান্তরিত করিলাম এবং কয়েকঘণ্টার জন্য উহাদের গাভীর নিকটে আসা স্থগিত রাখিলাম। এই সময়ের ভিতর পিপীলিকা-গাভীগুলি দুগ্ধ নিষ্ক্রমণের জন্য নিশ্চয়ই যে ব্যগ্র হইবে আমি সে বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আমি একটি অণুবীক্ষণ সাহায্যে উহাদিগের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহাদের কাহাকেও আপনা আপনি রস নির্গত করিতে দেখিলাম না। অতঃপর আমি উহাদের উদরের নিম্নদেশে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলাম। এইরূপে পিপীলিকাদের দোহন প্রণালী অবলম্বন করিয়াও কোনও রস নিঃসৃত হইল না। আমি তখন একটি পিপীলিকাকে সেখানে প্রবিষ্ট করাইলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম প্রচুর দুগ্ধবতী এই গাভীগুলিকে লক্ষ্য করিয়া পিপীলিকাটি আনন্দে অধীর হইয়াছে। একবার এ গাভী একবার ও গাভী এইপ্রকার করিয়া সমস্ত গাভীগুলিরই নিম্নোদরে উহার শুঁড় দ্বারা ধীরে ধীরে আঘাত করিবামাত্র এক এক ফোঁটা রস নিঃসৃত হইতে লাগিল। পিপীলিকাটি অতি আহ্লাদসহকারে তৃপ্তির সহিত সে রস পান করিল। অতি অল্পবয়স্ক গাভীগুলিও এইপ্রকার ব্যবহার করিল।" ইহাতেই বুঝা যায় এই দুগ্ধপ্রদান অভ্যাসটী ইহাদের প্রকৃতিগত। হুবারের পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তান্তে দেখা যায় পিপীলিকাদিগকে উহাদের গাভীরা নিতান্ত অপছন্দ করে না। (১) কারণ এই রস নিজ নিজ দেহ হইতে নিঃসৃত হওয়া উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যকীয়। অতএব উহারা পিপীলিকার সাহায্যে ইহা সম্পাদিত করিয়া লয়। যদিও এমন কোনও প্রমাণ নাই যে এক জাতীয় প্রাণী নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রাণীর কোন উপকার করে তবুও প্রত্যেকেই অন্যের প্রকৃতিগত অভ্যাসটুকু হইতে কোনও

(১) Origin of Species, Darwin Edition of John Murray Page 193-94.

উপকার প্রাপ্ত হইবার সুযোগ ছাড়ে না।

পিপীলিকাদের এই 'গাভী' রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় দুইজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের পরীক্ষিত দুইটী বৃত্তান্তের এস্থানে ভাবানুবাদ করিয়া দিতেছি।

স্যার জন লবক্ (২) বলেন, "আমার সংগৃহীত পিপীলিকাগাভীর ডিমগুলি যখন ফুটিল তখন ভাবিলাম ইহারা Lasius flavus জাতীয় পিপীলিকা। দেখিলাম ছোট থাকিতেই ইহারা গৃহের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

"মধ্যে মধ্যে সাধারণ পিপীলিকারাও এগুলিকে বাহিরে নিয়া আসিত। আমি ইহাদিগকে ঘাসের মূল খাইতে দিলাম কিন্তু তাহা বৃথা হইল। কয়েক দিন পরেই সেগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমি পুনরায় ডিম্ব সংগ্রহ করিলাম, পুনরায় সেগুলি ফুটিল। কিন্তু এবারও আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তবে এবার পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেকটা ফল লাভ করিয়াছিলাম। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চের প্রথম ভাগে ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ করে। আমার প্রস্তুত L. Flavus জাতীয় পিপীলিকাগৃহের নিকট একটা কাচের বাক্সে কতকগুলি নানাজাতীয় সজীব উদ্ভিদ রক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্ভিদ সাধারণত পিপীলিকা বিবরের আশে পাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিপীলিকারা কতকগুলি শিশু গাভীকে এই উদ্ভিদগুলির নিকট আনয়ন করিল। কিছুকাল পরেই একটি ডেইজি (daisy) গাছের পাতার উপর কতকগুলি পিপীলিকাগাভী দেখিতে পাইলাম। পিপীলিকারা সেই উদ্ভিদের চারিদিক বিরিয়া মাটীর প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া সেগুলিকে সুরক্ষিত করিল। এইরূপে গ্রীষ্মকাল অতীত হইল। ৯ই অক্টোবর তারিখে দেখিতে পাইলাম গাভীগুলি অনেক ডিম্ব প্রসব করিয়াছে। ডেইজি গাছটি লক্ষ করিয়া দেখিলাম তাহাতে অনেক নূতন গাভী রহিয়াছে। একই প্রকার ডিম্বও অনেকগুলি সেখানে দেখিতে পাইলাম।"

পিপীলিকারা যখন নিজ গৃহে গাভী প্রতিপালন করে তখন সেগুলি যে সেখানে ডিম্ব প্রসব করিবে তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে এই গাভীজাতীয় প্রাণীরা ঠিক্ পিপীলিকা গৃহে বাস করে না; পিপীলিকা-গৃহের সন্নিকটে ইহাদের খাদ্য-উদ্ভিদের মূলে ইহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্থানেই ইহারা ডিম্ব প্রসব করে এবং এই ডিম্বগুলিকে পিপীলিকারা নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সেখানে যত্নসহকারে সেগুলিকে উদ্ভিদের মূলে রাখিয়া দিয়া যায়।

বুকনীর (৩) বলিতেছেন:

"আমার বাগানে রোপিত দুইটি ash বৃক্ষের চারার মধ্যে একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতর পূর্ণায়তন লাভ করিল; কিন্তু অন্যটি প্রতি বৎসর মুকুলিত হইবার সময়ে লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা-গাভী কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত

(২) Ants Bees & Wasps.
(৩) Geistes leben der Thiere

হইয়া যাইত। এগুলি কচি কচি পাতা এবং কুঁড়িগুলিকে বিনষ্ট করিয়া বৃক্ষটির বৃদ্ধির পথে সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। যখন বুঝিতে পারিলাম এইপ্রকার বিঘ্নের একমাত্র কারণ ঐ পিপীলিকা-গাভী তখন সেগুলিকে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইলাম। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে আমি পিচকারির সাহায্যে বৃক্ষটিকে উত্তমরূপে ধৌত করিলাম—ফলে মে মাস পর্য্যন্ত বৃক্ষটি উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। নূতন পাতা ও ফুলে বৃক্ষটী লক্ লক্ করিতে লাগিল! দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইল; কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। একদিন প্রভাতে দেখিতে পাইলাম, যথেষ্ট পরিমাণ পিপীলিকা বৃক্ষটীর গোড়ায় দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম পিপীলিকারা এক একটী গাভী সঙ্গে করিয়া লইয়া সেগুলিকে বৃক্ষের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত করিতেছে। শীঘ্রই বৃক্ষের নিম্নদেশের পাতাগুলি উহারা একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! তারপর কয়েক সপ্তাহের ভিতর পুনরায় বৃক্ষটী পূর্ব্বের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি বৃক্ষস্থ সমস্ত পিপীলিকা-গাভীকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই আমার বাগানের পিপালিকারা দূর প্রদেশ হইতে নূতন গাভী ধরিয়া আনিয়া পুনরায় সে বৃক্ষে স্থাপিত করিয়াছে দেখিলাম।"

পূর্ব্বে একস্থানে বলা হইয়াছে যে, অনেক পিপীলিকা নিজ আবশ্যক অপেক্ষা অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিয়া সেই অতিরিক্ত পরিমাণ দুগ্ধ অন্য পিপীলিকাদের পান করিতে দেয়। এই প্রণালীতেই রাণীপিপীলিকাদিগকেও দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে।

(৪)

সাধারণতঃ তিন জাতীয় পিপীলিকার ভিতর দাসদাসী রাখিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহের দাসদাসী বৃদ্ধি করা ইহাদের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উহারা সুযোগ ও সুবিধামত অন্য পিপালিকাগৃহ আক্রমণ ও তল্লাস করে। এবং প্রায়ই এইরূপে বিপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর বিজেতাদল বিজিত পিপীলিকাগৃহের যাবতীয় গুটি (larva) লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এই লুণ্ঠিত গুটিগুলিকে উহারা উপযুক্ত যত্নসহকারে প্রতিপালন করে এবং তাহা হইতে অসংখ্য পিপীলিকা শিশু দাস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর উহাদিগকে নানাপ্রকার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা জীবন অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় উহারা প্রভু দিগের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিয়া যায়। তাহাতে একটুও শৈথিল্য করে না। প্রভুদের গৃহকে উহারা নিজ গৃহের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। F, Sanguinea—জাতীয় পিপীলিকা সংখ্যায় অতি অল্প দাস রাখে। কিন্তু F. Rufescenes-দের আবার দাস বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছাটা বেজায় প্রবল।

F, Sauguineaদের দাস কম বলিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য ইহারা নিজেরাই সম্পন্ন করে। মাত্র গৃহাভ্যন্তরের খুঁটিনাটি কাজই দাস দাসীর উপর ন্যস্ত হয়। উহাদের দাসগুলি কখনও বিবরের বাহিরে

আসিবার অনুমতি পায় না—বাহিরে আসিবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। প্রভুরা ইহাদের বিশ্বস্ততার উপর অতি অল্পই নির্ভর করে। এবং সেই জন্যই ইহাদের পলায়ন আশঙ্কা করিয়াই—গৃহের বাহিরে আসিতে দেয় না। যদি কোনও কারণে গৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহাহইলে প্রভুরা তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যায়।

F. Rufescenceদের যেমন অসংখ্য দাস তেমনি তাহাদের যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যই দাস দাসীর উপর ন্যস্ত। পুরুষ বা রাণী পিপীলিকারা ত কোন কাজই করে করে না—এমন কি শ্রমিক পিপীলিকাদেরও দাস জুটাইবার জন্য উৎসাহ ও পরিশ্রম যতটা দেখা যায়—অন্য কোনো প্রকারের কার্য্যে তাহাদের শ্রমপ্রিয়তার নিদর্শন মোটেই পাওয়া যায় না। কাজেই একমাত্র ভৃত্যদের উপর সমস্ত পরিবার নির্ভর করিয়া থাকে। প্রভুরা গুটি এবং কীটগুলির ভরণ পোষণ বা যত্ন তত্ত্ব লওয়ার নামটী করেন না। অতি সামান্য গৃহকর্ম্ম হইতে গৃহ পরিবর্ত্তন ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য পর্য্যন্ত ভৃত্যদের উপর ন্যস্ত হয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী

মাতৃত্ব

মাতৃসৃষ্টি জগতের কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। মাতৃত্ব উদ্ভিদ্ ও জীবরাজ্যের একটা সার্ব্বজনীন ও অতি প্রয়োজনীয় নীতি। ক্ষুদ্রতম পুষ্পকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর উদ্ভিদ্ ও জীবশ্রেণীর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উচ্চতম স্তন্যপায়ী জীবে ইহার পূর্ণ পরিণতি। মাতৃত্ব জীবাভিব্যক্তির একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

জীবরাজ্যে প্রকৃতির নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে মাতৃ সৃষ্টি একটা প্রধান সম্পাদন কার্য্য। প্রণিধান করিয়া দেখা যায় যে, এই মাতৃত্ব অতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকৃতির নিম্নস্তরে বর্ত্তমান্। ইহার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রকৃতির স্তরে স্তরে একটা চেষ্টা চলিতেছে, পুরাতন ভাব পরিত্যক্ত হইতেছে এবং নিয়ত আদর্শের আবির্ভাব হইতেছে। উচ্চতম স্তরে একটী সম্পূর্ণ মাতৃত্বের নির্ম্মাণ হইতেছে।

একটী পরিবারের সংগঠনই গোড়া হইতে প্রকৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য। পরার্থচেষ্টা জীবনের প্রথম বিকাশের সময়েই অসম্পূর্ণ আকারে স্বভাব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। উদ্ভিদ্ জগতে পুষ্পোৎপাদক বৃক্ষে আমরা মাতৃত্বের ভবিষ্যৎ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। এই মাতৃত্ব বৃক্ষবীজে এক একটী জীবনাঙ্কুরের চতুষ্পার্শে আবরণের উপর আবরণের রচনার দ্বারা উহাকে সুরক্ষিত করে এবং ঐ আবরণ মধ্যে উক্ত জীবনের প্রথম বিকাশের নিঃসহায় মুহূর্ত্তের জন্য আহার্য্যের আয়োজন করিয়া দেয়। একটা বৃক্ষের জীবনেতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এই ফল-পুষ্পোদ্গম রূপ পরার্থপরতাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

সেই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ পুষ্পোৎপাদক বৃক্ষকেই বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন।

জীবরাজ্যের প্রারম্ভে মাতৃত্বের অভাব। সমস্ত মৌলিক জীব মাতৃহীন। তাহাদের কোন বিশেষ আশ্রয়ও নাই এবং তাহাদের জন্য যত্ন করিবারও কেহ নাই। জননী বসুন্ধরাই তাহাদের একমাত্র মাতৃস্থানীয়া। কিন্তু আমরা যতই জীবসৌধের শিখর সন্নিকটে উপস্থিত হইতে থাকি, ততই রক্ষণকারী মাতৃত্বের সত্তা আমাদের নিকট অনুভূত হইতে থাকে। ঠিক কোন্ স্থান হইতে মাতৃত্বের আরম্ভ, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা যে একটা সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! সাধারণতঃ বলা যায় যে, বাৎসল্য প্রকৃতির একটা বিশেষ স্বভাব। কিন্তু প্রকৃতির অর্দ্ধাংশ মেরুদণ্ডহীন জীবচরিত্রে এই বৃত্তি আছে কিনা সন্দেহ। যদি থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত অল্পমাত্রায় বিদ্যমান্। মেরুদণ্ডশালী জীবের চরিত্রে এই বৃত্তি বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান্। আদিম অবস্থায় প্রকৃতি জীবকে এরূপভাবে গঠিত করিয়াছিল যে, তাহাদের মাতার প্রয়োজন ছিল না। জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই তাহারা নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং তাহারা ঐ কর্ম্মে সক্ষমও ছিল। সেদিন জগতে জননী বর্ত্তমান্ ছিল কিন্তু মাতা ছিল না। সন্তান উৎপাদন করাই তাহার কার্য্য ছিল সন্তানের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। সেই অযুতযুগব্যাপী আদিম অবস্থায় জগৎ প্রেমহীন ও নীরস ছিল। ইহা মাতৃহীনের রাজ্য ছিল।

প্রকৃতির নিয়ন্তরে অদ্যাপি সেই বিধানের পরিবর্ত্তন হয় নাই। লক্ষ লক্ষ প্রকার জীবের জন্মকালেই মাতৃবিয়োগ হয়। উদাহরণ স্বরূপ কর্কটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে এই বিধানের প্রাধান্য থাকিলেও মাতৃত্বের ঈষৎ অস্পষ্ট আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপের স্থলকর্কট বৎসরের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দল বাঁধিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে এবং সমুদ্র তরঙ্গে তাহাদের অণ্ড প্রসব করিয়া ফিরিয়া যায়। যে বৃক্ষপত্র তাহার পূর্ব্বপুরুষ গুটীপোকার প্রিয় এবং ভক্ষ্য, প্রজাপতি সেই পত্রে অণ্ড প্রসব করে। অণ্ড সংরক্ষণের নিমিত্ত পত্রের পশ্চাদ্দিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সে ঐ অণ্ড স্থাপিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবচরিত্রে—ঐ অণ্ডাসক্তিতে—অণ্ডকে যথাসময়ে যথাস্থানে স্থাপিত করা, জল বায়ু এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং খাদ্যের আয়োজন প্রভৃতি কর্ম্মে—মাতৃত্বের প্রথম আভাষ দেখা যায়। কিন্তু ডিম্বের প্রতি যত্ন ও সন্তান বাৎসল্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একটা চরিত্রগত যন্ত্রচালিত সংস্কার, অপরটা বুদ্ধিবিবেক প্রণোদিত কার্য্য। অণ্ড হইতে সন্তানোৎপত্তির সময় যদি ঐ প্রজাপতি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও সে ঐ অণ্ডপ্রসূত গুটীপোকার প্রতি যত্নবান্ হইতে পারিত না। কারণ, ঐ বায়ুবিহারী বিচিত্রপক্ষধারী পতঙ্গ-জননীর সহিত এই মৃত্তিকাচারী কীটের কোন শরীরগত সাদৃশ্য নাই। এই কীটের ক্ষুধাতৃষ্ণা বিপদাদির সময়ে তাহাকে সাহায্য

করিবার জন্য প্রজাপতির কোনই ক্ষমতা নাই! ঐ পতঙ্গকে গুটীপোকার মাতৃ-স্থানীয় করিবার জন্য প্রসূতির উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া অণ্ডপ্রসব করিয়াই উহার মৃত্যু হয়।

নিম্নশ্রেণীর জীবমধ্যে মাতৃস্নেহের অভাবের একটা বিশেষ কারণ আছে! এই শ্রেণীস্থ জীবেরা একসঙ্গে বহুসংখ্যক সন্তানের উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই জন্য ঐ সকল সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত মাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয় না অথবা এ ক্ষেত্রে মাতৃ-স্নেহ সম্ভব নহে। মোটামুটি দেখিতে গেলে এক একটী সন্তান উৎপন্ন করিয়া তাহার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা অপেক্ষা এক সঙ্গে বহুসংখ্যকের সৃষ্টি করিয়া নিয়তির হস্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া, বোধ হয় প্রকৃতির পক্ষে উৎকৃষ্টতর এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব্যাপার হইত। কিন্তু এরূপ বিধানের কিছুমাত্র নৈতিক ফল নাই। এই প্রকার সন্তান হইলে মাতৃভাবের বিকাশ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এরূপ অবস্থায় ভাল বাসিবার, সময়, সুযোগ এবং পাত্র কিছুই থাকে না।

নিম্ন শ্রেণীর জীবের এই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ সহজ সন্তানবাৎসল্য হইতে উচ্চতম মাতৃ-প্রেমের বিকাশ সাধন করিবার পূর্ব্বে, প্রেমকে জগতের নিকট একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী করিয়া, অণ্ডের সীমার বাহিরে অণ্ডপ্রসূত সন্তানের উপর ইহার বিস্তার সাধন জন্য প্রকৃতিকে তাহার কতকগুলি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমতঃ এক সঙ্গে অল্প সংখ্যক সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ জননীর সহিত প্রসূত সন্তানের এরূপ সাদৃশ্য থাকিবে, যেন জননী উহাদিগকে চিনিতে পারে। তৃতীয়তঃ জন্মের সময় সন্তানগণের দৈহিক অবস্থা এরূপ অসম্পূর্ণ করিতে হইবে, যেন তাহারা তখন নিজেই জীবন যাত্রা আরম্ভ করিতে অক্ষম হয় এবং জননীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। চতুর্থতঃ জননীকে বাৎসল্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে হইবে। প্রকৃতি বাস্তবিক এই সকল সুন্দর নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছে। ঐ চতুর্ব্বিধ বর্ণের সাহায্যে প্রকৃতি মাতৃত্বের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, অতি ক্ষুদ্র জীব এক সঙ্গে শত, সহস্র এমন কি লক্ষ সন্তানও প্রসব করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে মাতৃ-যত্ন অসম্ভব এবং মাতৃত্ব বিকাশের ঘোর অসুবিধা। সেই জন্য জীব যতই উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছে তাহার সন্তান-সংখ্যা ততই কমিয়া আসিয়াছে। মৎস এবং ভেক একসঙ্গে হাজার ডিম্ব প্রসব করে। উচ্চতর জীব সরীসৃপের উচ্চতর সন্তান-সংখ্যা একশত। আর একটু উচ্চে পক্ষি-শ্রেণির মধ্যে সন্তানের উচ্চতম সংখ্যা দশ। উচ্চতম জীব মানবের সন্তানসংখ্যা এক। একটা বিস্তৃত যত্নকে একের উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রেমের পরিণতি সাধন এই সংখ্যা-হ্রাসের উদ্দেশ্য।

এইবার জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্যের কথা। যেমন এক সঙ্গে হাজারকে ভালবাসা কঠিন, তেমনই ভ্রূণকেও ভালবাসা

সহজ নহে। নিম্নশ্রেণীতে জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্য খুব কম। জননীর চিনিবার শক্তি যদিও খুব বেশী হয়, তাহা হইলেও সে তাহার সন্তানকে চিনিতে পারে না। প্রবাদ আছে কোকিল তাহার প্রসূত অণ্ড কাকের নীড়ে স্থাপিত করিয়া কাককে প্রতারিত করে। এইজন্য কোকিলের নাম পরভৃৎ। নানাবিধ রেশমকীট ও প্রজাপতির মধ্যে পতঙ্গজননীর সহিত গুটীপোকার কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু দেখা যায়, জীব যতই উন্নত হইয়াছে, ততই এই সাদৃশ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এজন্য প্রকৃতি হঠাৎ ভ্রূণের কোন বাহ্যিক পরিবর্ত্তন করে নাই। সে কেবল ঐ ভ্রূণের একটু আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। কেবলমাত্র সে অণ্ডগত জীবকে আদেশ করিয়াছে যে, "যত দিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার জননী-সাদৃশ্য লাভ করিতে না পার, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে ঐ অণ্ডাবরণের মধ্যে বাস করিতে হইবে। ফলে তোমার অণ্ড-জীবন কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর হইবে"। অণ্ডজ-জীব যতই উন্নত হইতে থাকে, তাহার অণ্ডজীবন ততই দীর্ঘতর হয়। প্রকৃতি তাহার অঙ্কিত চিত্র একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করে না। কেবল তুলিকার সাহায্যে কয়েকটা নূতন রেখা টানিয়া সে ঐ চিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করে মাত্র। প্রকৃতি নিজের কার্য্যের একটা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। সে কোন কৃতকর্ম্ম আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে চাহে না, কেবল আবশ্যক হইলে উহা সংস্কৃত করে মাত্র।

উন্নত জীবরাজ্যে জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্য যদিও সম্পূর্ণ নহে, তথাপি উহা যথেষ্ট। হংসশিশুকে দেখিলে কখন পারাবত-শিশু বলিয়া মনে হয় না; কুক্কুরছানাকে কেহ ছাগ অথবা মেষশাবক বলিয়া ভুল করে না বা বিড়ালশাবককে কেহ শশকশিশু বলে না।

মাতৃত্বের অভিব্যক্তির তৃতীয় প্রণালীটি উল্লিখিত দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই সন্তানটী যদি সক্ষম বীর হইত, তাহা হইলে জননী এবং সন্তানের মধ্যে পরিচয় স্থাপন অনাবশ্যক হইয়া পড়িত এবং ঐ কার্য্যের জন্য কোন কৌশল উদ্ভাবনেরও প্রয়োজন হইত না। সন্তানের সহিত মাতার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি একটী সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে। জীব যতই উন্নত শ্রেণীতে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের শৈশব-দুর্ব্বলতা ততই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ব্বলতার সময় আত্মরক্ষার জন্য সন্তান জননীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর জীবশিশু জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই জীবন-যাত্রায় সক্ষম। জননীর সাহায্য প্রার্থনা করা দূরের কথা, জননীর সহিত পরিচিত হইবারও তাহার প্রয়োজন নাই। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের জীব পক্ষি শিশু তাহার শৈশবাবস্থায় রক্ষণা-বেক্ষণ, ভরণ-পোষণ প্রভৃতির জন্য জননীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহার আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শৈশবান্তে যখন সে স্বতন্ত্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে

সমর্থ হয়, তখন সে চিরদিনের জন্য জননী-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করে। ভবিষ্যতে সন্তান ও জননীর মধ্যে কেহ কাহাকে চিনিতেও পারে না। স্তন্যপায়ী জীব সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জন্তু। ইহাদের শৈশব দুর্ব্বলতার পরিমাণ ও কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আবার দেখা যায়, এই একই শ্রেণীর অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যে ক্রমশঃ উন্নত স্তরে জননীর অঙ্কাশ্রয়ের জন্য আগ্রহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যশিশু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল এবং ঐ দুর্ব্বলতা অধিককাল স্থায়ী। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া হয়ত কেহ বলিবেন, অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটা সুদীর্ঘ শৈশব-দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করিয়া জীবকে পরমুখাপেক্ষী করা অপেক্ষা জন্মমুহূর্ত্তেই তাহাকে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত করাই ত অধিকতর নিপুণতা। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রকৃতির এ বিপরীত ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবকে জীবনসংগ্রামে সক্ষম করাই যদি প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থা সমীচীন হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃতির চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক। স্বজীবনার্থে সংগ্রাম এই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির একটা সহযোগী প্রণালী মাত্র। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে প্রকৃতির উদ্দেশ্য নৈতিক পরিণতি ও জীবদেহের নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিণতি সাধন। নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে স্নেহের স্থাপন এবং আশ্রয়, প্রেম ও মাতৃত্বের অবতারণা করা। এই সুচিন্তিত সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীর সাহায্যে প্রকৃতি ধীরে ধীরে বল্গাকর্ষণের দ্বারা উদ্ধত হৃদয়হীন শিশুগণকে শান্ত করিয়া গৃহাশ্রয়ী করিয়াছে এবং জননীর বিশুষ্ক অন্তঃকরণে স্নেহ মমতার সুমিষ্ট নির্ঝরের সৃষ্টি সহকারে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করিয়া, জীব-চরিত্র সংযত করিয়াছে।

প্রকৃতির চতুর্থ প্রণালীটী—যাহার দ্বারা জননী বাৎসল্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে—তাহা শারীরিক হিসাবে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চার, আর নৈতিক হিসাবে উহা বাৎসল্য প্রেম। এই চতুর্ব্বিধ প্রণালী-সংস্কৃত জীবনবিধি পূর্ব্বতন জীবনবিধি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। শৈশবাবস্থায় জীব পরিণতবয়স্ক জীব অপেক্ষা দৈহিক ও মানসিক উভয় বিষয়ে হীন। সুতরাং শৈশবে জীবের বিপদ সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অতএব যে সকল শ্রেণীর জীবকে শৈশব হইতে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হয়, তাহাদের জীবনাতিবাহন অত্যন্ত কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল। পরন্তু যদি এই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই তাহাকে যথেষ্ট বলিষ্ঠ, সক্ষম সাহসী করিয়া গঠিত করা যায়, তাহা হইলে সেই জীবন প্রণালী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। উন্নত শ্রেণীর জীবনে প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপ শারীরিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অভিব্যক্তিও সংসাধিত হইয়াছে। যৌনত্ব এবং তৎসহযোগী স্ত্রীলোকের শান্ত সহিষ্ণুতা সৃষ্টির সহিত সামাজিক ও সুন্দর পারিবারিক সম্পর্কের সূচনা হইয়াছে। এই সম্পর্ক স্থাপন জীবের ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় প্রকার জীবনেরই অনুকূল।

যে দিন প্রথম মানব সন্তানটী জন্মগ্রহণ করার পর প্রকৃতির অঙ্কে শায়িত হইয়াছিল,

সেই দিনটী অভিব্যক্তির ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। কারণ, মনুষ্যের অভ্যুন্নতির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে এবং জগতে স্নেহের প্রচার করিতে যেন সেই ক্ষুদ্র শিশুটী জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। জননী সন্তানকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু সন্তানই জননীর শিক্ষক, ইহাও একটী পূর্ণতর সত্য। কারণ, ইতিপূর্ব্বে যখন সন্তান জননীর শিক্ষক ছিল না, তখন জগতে কোটী কোটী জননীর আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু উচ্চ স্নেহ তখন জন্মগ্রহণ করে নাই। কোমলতা, সাধুতা, পরার্থপরতা, ভালবাসা, যত্ন, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গুণসকল তখন কোরকস্থ ছিল। তখন জনয়িত্রী ছিল, কিন্তু মাতৃত্ব ছিল না। প্রকৃত মাতৃত্বের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মানব শিশুর সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগতে দুইটী নৈতিক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটী সন্তানকে তাহার জননীর প্রতি আগ্রহশালী করিবার জন্য শিক্ষিত করিয়াছিল, অপরটী জননীকে সন্তানবাৎসল্য শিক্ষা দিয়াছিল। এক্ষণে এই বিদ্যালয়-জীবন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া স্নেহের বিকাশ সাধনের সুযোগ স্থাপিত করা অভিব্যক্তির পঞ্চম চেষ্টা।

অধিকাংশ জীব এই বিদ্যালয়ে কেবল কয়েক দিবস বা সপ্তাহের জন্য অবস্থান করে। কেবল মানবশিশুর শিক্ষাকাল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। মনে কর একটী মনুষ্য ও বানর একই দিনে এবং একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। কয়েক সপ্তাহ মধ্যে দেখা যাইবে যে, ঐ বানর শিশু বৃক্ষারোহণ, তাহার জননীর ন্যায় শব্দ করণ, এবং আহার প্রভৃতি জীবনোপযোগী কার্য্যে সক্ষম হইয়াছে। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হওয়ায় সে তাহার মাতৃপার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই উভয়কাল এবং আরও কতকটা সময় ব্যাপিয়াও ঐ মানব শিশুটী ভক্ষণ, আবরণ, আত্মসংরক্ষণ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই সক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার এখনও যেন অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থা। ইহার শরীরের অস্থি, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ ঐ বানর শিশুর সমান, কিন্তু অক্ষম। ঐ মানবশিশুর চক্ষু আছে, তথাপি সে যেন দেখে না; কর্ণ আছে, তথাপি সে যেন শ্রবণ করে না এবং হস্তপদাদি আছে, তবুও সে চলিতে অক্ষম। দেখিলে যেন বোধ হয়, শরীর গঠনে প্রকৃতির চেষ্টা এখানে ব্যর্থ।

এই বিলম্বের দুইটী কারণ আছে। প্রথমটী নৈতিক। নৈতিক শিক্ষার জন্য মানবশিশুকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মাতৃপার্শ্বে অবস্থান করিতে হয়। দ্বিতীয়টী শারীরিক। বানরশিশুর মস্তিষ্কের গঠনের সহিত মানব শিশুর মস্তিষ্কের পার্থক্য অনেক। বানরের সহিত তুলনায় মানব মস্তিষ্ক যেন একটা অতিরিক্ত অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। বানরের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র এবং উহা একটা ইতর প্রাণীর জীবনকার্য্যোপযোগী বলিয়া সরল ভাবে সুতরাং অল্পকাল মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মানবজীবন কার্য্যসক্ষম করিবার জন্য মানব মস্তিষ্ককে কোমল এবং যথেষ্ট জটিল ভাবে নির্ম্মিত করিতে হইয়াছে। সেই জন্য উহার নির্ম্মাণ কিছু দীর্ঘতর সময়সাপেক্ষ।

এই স্থান হইতে যথার্থ মানসিক অভিব্যক্তির আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের নৈতিক অভ্যুন্নতির সাহায্য হইয়াছে।

একটী ইতর জীবনের চালনার উপযোগী যন্ত্র প্রকৃতির শিল্পশালায় একদিনেই নির্ম্মিত হইতে পারে। কারণ, ইহার চক্রের সংখ্যা অল্প, ইহা সরলভাবেই নির্ম্মিত এবং ইহার বিভিন্ন অংশের সংযোগপ্রণালী অত্যন্ত সূক্ষ্ম নহে। জন্মগ্রহণ করার পর একটী ইতর প্রাণী তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যাহা করিবে, সে কার্য্য তাহার পিতৃপিতামহাদির দ্বারা লক্ষ লক্ষ বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী ক্ষমতাসকল ঐ জাতীয় জীবের বংশগত এবং মজ্জাগত স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন একটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ঐরূপে একটা বাঁধা যন্ত্রের সাহায্যে বাঁধা নিয়মে চলিবার নহে। সে নূতন কার্য্য করিবে, নূতন বিষয় চিন্তা করিবে, এবং জীবনের নূতন পন্থা সমূহের সৃষ্টি করিবে। মনুষ্যজীবনের অর্দ্ধাংশের নিমিত্ত বংশগত স্বভাবের কোন ক্ষমতা নাই। মনুষ্যের প্রত্যেক বংশধর এই বিঘ্ন-বহুল সংসারে আপনাপন অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পন্থা নির্ম্মিত করিয়া এবং প্রকৃতির সহস্র পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্য দিয়া আপনাকে সযত্নে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই সমস্ত সক্ষমতার জন্য আয়োজন বড়ই জটিল। বানর শিশুর দেহের মধ্যে কেবল মাত্র তাহার পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত কার্য্যবলীর পুনরানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কতকগুলা ছাঁচে ঢালা যন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে সহজ সংস্কারগত কার্য্যের নিমিত্ত সে গুলির স্থাপনা ত করিতে হয়ই, তদ্ব্যতীত তাহার মস্তিষ্কে খানিকটা স্বাধীন বুদ্ধিরও আয়োজন করিয়া দিতে হয়। এই শক্তির বলে সে নূতন কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নূতন পন্থার আবিষ্কার করে এবং উচ্চতর আদর্শের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আমাদের শ্বাস যন্ত্র, যখন আমরা উহার কথা ভুলিয়া যাই, তখনও স্বকার্য্য সাধিত করিতে থাকে। আমরা থামাইতে চেষ্টা করিলেও আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালিত করিতে থাকে। আশঙ্কা উপস্থিত হইলে আমাদের নেত্রপল্লব স্বতই নিমীলিত হয়। এই জাতীয় অঙ্গসমূহ অগণিতবার ঐ একই কার্য্য সম্পাদিত করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য ঐ সকল শক্তি তাহাদের এক একটী স্বভাবগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং উহাদের নির্ম্মাণে অধুনা প্রকৃতিকে অধিক সময় নষ্ট করিতে হয় না। কিন্তু এই উচ্চতম অঙ্গ মস্তিষ্ক একটী সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। ইহার কর্ত্তব্যের পরিধি এবং নিত্য নূতন কর্ত্তব্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহা এক্ষণে এমন কার্য্য করিতেছে, যাহা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ করিতে শিখে নাই। মস্তিষ্কের পুরাতন অংশটা শৈশবের প্রথম অংশেই নির্ম্মিত হইয়া যায়। কিন্তু নূতন অংশটার নির্ম্মাণ এবং যথাযথরূপে সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। একখানা পালচালিত নৌকার খোল এবং পাল প্রস্তুত হইলেই উহাকে জলে ভাসাইতে পারা যায়। কিন্তু একখানি ষ্টীমারের জন্য এঞ্জিন কলের আবশ্যক। এই এঞ্জিন কল নির্ম্মাণের জন্য যে অধিকতর সময়টুকু ব্যয়িত

হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ ঐ ষ্টিমারের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত গতি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা, ঝড়তুফানের সময় ইহার নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলীর দ্বারা হইয়া থাকে। সেই জন্য দীর্ঘ শৈশববিশিষ্ট মানবজীবন অন্যান্য জীবন অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ এবং সক্ষম।

উচ্চতর মস্তিষ্ক সৃষ্টির পূর্ব্বে নৈতিক হিসাবে প্রত্যেক বস্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অচিরস্থায়ী ছিল। জীবসকল জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত এবং শিশুগণ স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত ছিল। তখন নিঃসহায়ের জন্য কেহ দুঃখিত হইত না, বেদনার উপশম করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং শান্তি ও যত্নের নিমিত্ত একটী মুহূর্ত্তও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সেকালে সন্তানের ক্ষুদ্র দেহস্থ জীবনের স্ফুলিঙ্গটী নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম করিলেও জননীর অন্তঃকরণে কোন চঞ্চলতা উপস্থিত হইত না। জনক জননীর দ্বারা সন্তানের কোন ঐহিক অথবা সন্তানের দ্বারা জনক জননীর কোন নৈতিক উপকার সংসাধিত হইত না। তখন শিশুরা শৈশব চাহিত না এবং বৃদ্ধেরও কোন সহানুভূতি ছিল না। এমনকি স্তন্যপায়ী জীবেরও বাৎসল্যের পরিধি অতীব সঙ্কীর্ণ ছিল। যে সিংহী আজ তাহার শিশুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, সে হয়ত কাল সেই শিশুর সহিত মৃত্যু পর্য্যন্ত যুদ্ধে নিযুক্ত। মেষ শাবক যতক্ষণ মেষশাবক থাকে, ততক্ষণই সে তাহার জননীর যত্নের সামগ্রী, কিন্তু বড় হইলেই জননী আর তাহাকে চিনিতেও সক্ষম নহে। এই সকল স্থলে স্নেহ, যতক্ষণ উহা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ খুব প্রগাঢ়; কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ স্নেহের কোন স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত আর তাহাদের মস্তিষ্কে থাকে না। মাংসাশী জীবের মধ্যে দেখা যায়, যে শৈশবে সন্তান কিছুকাল মাতৃস্নেহ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সময় পিতৃস্নেহ লাভ করা দূরে থাক্ সে পিতৃহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই ধন্য হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবেরা (উদাহরণ স্বরূপ বিড়ালের উল্লেখ করা যাইতে পারে) পিতৃ আয়ত্তের বাহিরে গোপনে জননী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত মাতৃজননীর আবির্ভাব হয় নাই, সে পর্য্যন্ত প্রেমের অভিব্যক্তির কোনই সুযোগ ছিল না।

পুরুষ জাতির তুলনায় স্ত্রী জাতি একটু নিশ্চেষ্ট স্বভাব। এই নিশ্চেষ্ট স্বভাবের দ্বারা সে কিছুকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে সক্ষম। ইহা ধৈর্য্যের অঙ্কুর। অনুশীলনের দ্বারা এই অঙ্কুরটীকে শাখাপ্রশাখাশালী করিয়া অক্ষুণ্ণ মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছে। সে মাতৃ অঙ্কে দুর্ব্বল শিশুটীকে শায়িত করিয়া মাতাকে আদেশ করিয়াছে, "ইহারই সাহায্যে ধৈর্য্যশীলতার অনুশীলন কর। ইহার লালন পালনের প্রত্যেক কার্য্যে তোমার ধৈর্য্যশীলতার আবশ্যক হইবে।" শিশুর দেহে কোনরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে মাতা তাহার মুখে এবং প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে সেই যন্ত্রণাচিহ্নের উপলব্ধি করিয়া থাকে, এই ক্ষমতা ধৈর্য্যানুশীলন জাত। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সন্তানের বেদনা জননী অনুভব করিতে সক্ষম হয়। এই বেদনাবোধজনিত দ্বিতীয় গুণ—সহানুভূতি। সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া মাতা আর্ত্ত শিশুর বেদনা লাঘবের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়া থাকে এবং

যত্নপরতা গুণ জননীর চরিত্র গত হইয়া যায়। এই রূপে ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও যত্নপরতা এই গুণত্রয় মানবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই প্রকারে সন্তান পালনের সময় হয়ত কতিপয় জননীর ক্রোড়স্থিত শিশুর সম্মুখে একটা আকস্মিক বিপদ, আহারাভাব, পীড়া ইত্যাদি—উপস্থিত হইল। হয়ত এই নূতন বিপদ হইতে সন্তান রক্ষণ সেই জননীর ক্ষমতা বা ধৈর্য্যের সীমাবহির্ভূত, হয়ত সেই জননী আজ পর্য্যন্ত সন্তান রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার অধিক আর সে কিছু কবিতে পারে না। এরূপ স্থলে ঐ নিঃসহায় শিশু একাকী বিপদের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং ঐ অনুপযুক্তা জননীর বংশ-সূত্র এই স্থানে ছিন্ন হইয়া পড়িল। এইখানে সন্তানের মৃত্যুতে জননীরও মৃত্যু। পক্ষান্তরে হয়ত অপর এক জননী অনুরূপ অবস্থায় তাহার আত্মদেহ পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত করিয়া সন্তানকে রক্ষা করিল। সেই জন্য এই উপযুক্তা জননীর বংশসূত্র অচ্ছিন্ন রহিল। এই স্থানে আত্মত্যাগ জগতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য চরিত্রে রোপিত হইল। এইরূপে প্রাচীন কাল হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সাহায্যে অনুপযুক্তা জননী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে এবং যোগ্যতরা তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ অপরিণত মাতৃত্ব দিনে দিনে সম্পূর্ণ এবং পরিণত হইতেছে।

সেই আদিম অসভ্য মানবজননী এবং তাহার শিশুটী জগতের কি মহৎ উপকার সাধিত করিয়াছে, উপরোক্ত উদাহরণ হইতে তাহা অনুমান করা যায়! যে দিন সেই প্রথম নিঃসহায় দুর্ব্বল শিশুটীর সাহায্যপ্রার্থনাসূচক প্রথম আর্ত্তস্বর সেই প্রথমা জননীর হৃদয়খানি কোমলতা এবং বাৎসল্য প্রেমের ধারায় পরিপ্লুত করিয়াছিল, যে দিন সেই জননী একটী মুহূর্ত্তেরও জন্য সেই শিশুটীর দুর্ব্বলতা অথবা যন্ত্রণার প্রতি মনোযোগিনী হইয়াছিল, যে দিন সে সহানুভূতির কোন্ অননুভূত কার্য্য অথবা ইঙ্গিতের দ্বারা মাতৃত্বের অনির্ব্বচনীয় আভাষ টুকুর বিকাশ করিয়াছিল, সেই শুভলগ্নে প্রকৃতির শিল্পালয়ে এক নূতন শিল্পী এক নূতন কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই আদিম শৈশব যতই ক্ষণস্থায়ী হউক উহা প্রকৃতির উরসে যে অমৃতময় নরবরের সৃজন করিয়াছে, তাহার ধারা দীর্ঘতর বিস্তৃতির সহিত জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কেন্দ্রসমূহ পর্য্যন্ত পরিপ্লুত করিয়া সনাতন কাল প্রবহমান্ থাকিবে। ইহার কুলবাসী মানবগণ সেই অমৃত সলিল পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। একটী ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অকিঞ্চিৎকর বটে। কিন্তু ইহারই মধ্যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ আশা বিরাজ করিতেছে। অক্ষম শৈশবাবস্থা ব্যতিরেকে আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে আমরা জীব জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইতে পারিতাম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! কিন্তু তাহা হইলে আত্মোৎসর্গ গুণ মানব চরিত্রে প্রবেশ লাভ করিত না, সামাজিকতা জগতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইত না এবং তৎসঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম জগতে স্থান লাভ করিতে পারিত না।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

বন্ধু

ইংরাজী হইতে

তাহারা দুই বন্ধু। দুই জনে ভারী ভাব, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, বেড়ানো, খাওয়া, পরা, সমস্ত কাজ দুইজনে একসঙ্গে করে। কিছু পাইলে দুইজনে ভাগ করিয়া লয়, একজনকার কিছু হারাইয়া গেলে দুইজনে একসঙ্গে তাহার খোঁজ করে। একজন হাসিলে অপরে হাসে, একজন কাঁদিলে অপরে কাঁদে। দুটী শরীর হইলেও তাহাদের প্রাণ যেন একটি।

তাহা হইলে কি হয়, একদিন হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া একজনকে লইয়া গেল। অপরজন তাহাকে বাঁচাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার মৃত্যুর পর অনেকদিন অবধি সে শোকচিহ্ন ধারণ করিল, অনেক কাঁদিল। শেষে ক্রমে ক্রমে বন্ধুর স্মৃতি তাহার কাছে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। সে আবার হাসিল, আবার সংসারের কাজে নূতন করিয়া যোগ দিল।

কয়েক বছর কাটিয়া গিয়াছে; আজ তাহার বিবাহ; এক কলওয়ালার মেয়েকে সে বিবাহ করিবে। উৎসবের মধ্যেও সে বন্ধুকে ভুলে নাই। তাড়াতাড়ি বন্ধুর সমাধির নিকট ছুটিয়া গিয়া সে ডাকিল,

"বন্ধু, বন্ধু!"

কোনো সাড়া নাই। দূরে ঝোপের আড়ালে চাঁদ উঠিল।

"বন্ধু, ও বন্ধু, বন্ধু" বলিয়া সে দুই তিনবার সমাধির উপর হাত চাপড়াইল। তবু উত্তর নাই।

"বন্ধু—"

এতক্ষণে বন্ধু সাড়া দিল। সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বন্ধু পাশে দাঁড়াইয়া। বন্ধু কহিল,

"কিহে, খবর কি; আজ যে হঠাৎ—"

"হঠাৎ নয় ভাই, আজ আমার বিয়ে।"

"বিয়ে! বল কি! এঃ, এ খবরটা আগে দিতে হয়। তা আমাকে কি করতে হবে বল?"

"বাঃ, তুমি যে এরি মধ্যে সব ভুলে গেলে। তুমি নিতবর হবে বলেছিলে যে?"

"ওহো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা একটু দাঁড়াও; আমি জামা কাপড়টা পরে আসি।" বলিয়া সে অন্তর্হিত হইল; একটু পরেই আবার আসিল। তখন তাহার আর আগেকার বেশ নাই—সে দিব্য বাবু সাজিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেল। বর কনেকে লইয়া বাড়ী ফিরিল।

বন্ধু কহিল, "ভাই আমি চলি"

"সে কি, এরি মধ্যে? একটু কিছু মিষ্টিমুখ করে গেলেনা?"

"না ভাই—"

"বেশ, চল; আমি তোমাকে পৌঁছে দিইগে।"

দুইজনে আবার সমাধির কাছে আসিল। সে কহিল, "বন্ধু!"

"কি ভাই!"

"তোমার দেশটাত আমাকে দেখালে না। চল না, আজ একটু ঘুরে আসি"

"কি যে বল তুমি! বাড়ীতে লোকজন রয়েচেন; তুমি যদি এ সময় তাঁদের না বলে কয়ে, হঠাৎ চলে আসো, তো তাঁরা কি ভাববেন বল দিকিন? আর বন্ধুনীই বা কি ভাববেন!"

"না, তা হোক। তারা তো চিরকাল থাকবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা ত আর রোজ রোজ হবে না। "চল, চল।"

"বেশ" বলিয়া বন্ধু সমাধি পার্শ্ব হইতে একটা ঘাসের চাপড়া তুলিয়া ফেলিল।

নীচে একটা সুড়ঙ্গ; ভিতরে তেমন আলো নাই। দুজনে নামিল। খানিকক্ষণ চলিয়া দেখিল, তাহারা একটা মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঠটী নানা শস্যে ভরা; চারিদিকে অসংখ্য গো মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ গৃহপালিত জন্তু চরিতেছে।

"বন্ধু, এ কি রকম?

"কি?"

"এখানে এত ধান, ঘাস, জল রয়েচে, অথচ গরুগুলো এত রোগা যে?"

"ওদের কি গরু ভেবেচ নাকি? ওরা পৃথিবীরই মানুষ। যখন বেঁচেছিল, তখন কাউকে এক পয়সা দেয়নি, আপনিও ভোগ করেনি; তাই এখানে এই অবস্থা।"

ঘুরিতে ঘুরিতে দুইজনে আর একটা যায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে বেশী গাছ পালা নাই; অথচ গরু বাছুরগুলা বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

"বাঃ, এযে দেখচি, ঠিক উল্টো! কি রকম হল, বল দিকিন?"

"ওরা ছিল অল্পসন্তুষ্ট লোক। যা পেত সে সমস্তই উপভোগ করত; যা দরকার তার বেশী চাইত না। তাই ওরা পৃথিবীতে সুখী ছিল, এখানেও তাই।"

দুইজনে আবার চলিল। কিছুদূর গিয়া বন্ধু কহিল, "ওহে!"

"কি!"

"একটু এখানে দাঁড়াবে? এখানে আমার একটু কাজ আছে। চট্‌পট্ সেরে আসব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে। দেখো, তুমি অন্য যায়গায় চলে যেওনা যেন"

"বেশ"।

বন্ধু চলিয়া গেল। তাহার ঘুম পাইতেছিল; ঢুলিতে ঢুলিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। যখন উঠিল, তখন দেখিল বন্ধু তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার গা ঠেলিতেছে।

"ওহে, ওঠ, ওঠ"

"উঃ—"

"ওঠ।"

ধরমড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল। বন্ধু কহিল, "চল ফেরা যাক; প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়াটার দেরি হল।"

"চল।"

দুজনে হুহু শব্দে উপরে উঠিয়া আসিল। যখন বাহিরে আসিল, তখন সে দেখিল, এরি মধ্যে চন্দ্র অস্তোন্মুখ; সে একটা

ঝাঁটাঝোপের মধ্যে বসিয়া আছে। অনেক কষ্টে বাহির হইয়া সে কহিল,

"বন্ধু, তবে চলি?"

"এসো, কি আর বলব।"

সমাধিক্ষেত্র হইতে সে যখন বাহির হইল, তখন ভোর হইয়াছে। রাস্তায় দুচার জন লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! লোক গুলাকে ত তাহার অচেনা বোধ হইতেছে! সম্মুখের পথ তুষারাবৃত! বাঃ, পৃথিবীটা এরি মধ্যে বদলাইয়া গেল নাকি! এই সন্ধ্যা বেলায় বরযাত্রীর দল 'বরফ বরফ' করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তাগুলা ঘর বাড়িগুলাও যে অন্যরকম দেখাইতেছে! চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল নাকি! নিজের বাড়ী সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক ঘুরিয়াও নিজের বাড়ির সন্ধান না পাইয়া, সে রাস্তায় একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, অমুক লোকের বাড়িটা কোথায়?"

"জানি না, মশায়; ও নামে ত এখানে কেউ নেই; অন্য গাঁয়ে হবে বোধ হয়।"

রাগে তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। লোকটা বলে কি! সে এমন জলজ্যান্ত রহিয়াছে, অথচ লোকটা বলে কিনা, এগাঁয়ে ও নামে কোন লোক নাই! এরা পাগল হইল না কি!

নাঃ—লোকটা বোধ হয় এগাঁয়েরই নয়। সে আরো দুই তিন জন ভদ্রলোককে আপনার বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কেহই তাহার ঠিক উত্তর দিতে পারিল না। একজন বলিল, "আ মোলো, বেটা পাগল নাকি! দাওত পুলিশে ধরিয়ে। এমন যোয়ান চেহারা, আবার ন্যাকামি করা হচ্চে!"

পাগল! পুলিশ! ন্যাকামি! এর অর্থ কি! সে আশ্চর্য্য হইয়া অর্দ্ধোন্মত্তের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আঃ, এতক্ষণে সে একটা—চেনা বাড়ি পাইয়াছে। এই ত তাহাদের গির্জ্জা! এক ছুটে সে—একেবারে পুরোহিতের কাছে গিয়া উপস্থিত!

"মশাই—"

একি, এও যে—অন্য লোক! যাই হোক্ এ মিথ্যা বলিবে না।

"মশায়—, আমার বাড়ি কোথা বলুন্ ত! কাল সবে বিয়ে করেচি! আমার নাম শ্রীঅমুক, শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েচে।"

"কাল বিয়ে! উঁহুঃ, কাল তো কোনো বিয়ে হয়নি। দেখি, খাতা দেখি।"

খাতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এক রাত্রির মধ্যে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, অথচ সে টেরও পায় নাই! সে যে—খাতার গোড়ায় নাম সই—করিয়াছিল। পুরোহিতকে এত পাতা—উল্টাইতে দেখিয়া তাহার ভারি হাসি পাইল।

"ওখানে নয়, মশায়, গোড়ার দিকে; ৪৩এর—পাতায়। আমার ঠিক মনে আছে।"

পুরোহিত অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন; পরে ৪৩এর পৃষ্ঠা খুলিয়া কহিলেন,

"হ্যাঁ, ও নামের একজন লোক আছে দেখচি! সেত আজ তিনশ ছিয়াশি বছরের কথা! ৯০৭ সালে!

পুরোহিতও গাগল হইয়াছে নাকি !

সে আবার ছুটিয়া বন্ধুর সমাধিপার্শ্বে গিয়া ডাকিল, "বন্ধু, বন্ধু !"

"কি ?"

"এ কি হল, বন্ধু ? এযে সব বদলে গেছে। লোকগুলা সব বদ্ধপাগল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়ে তোমার দেশ ভাল।"

"তবে এসো আমার সঙ্গে।"

দুই বন্ধুতে আবার বহুদিন পূর্ব্বেকার মত হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল।

... ...

পরদিন প্রাতে গ্রামের লোকেরা দেখিল, সমাধিক্ষেত্রে একটা বহু পুরাতন সমাধির উপর কল্যকার উন্মাদ যুবকের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীরত্নাবলী দেবী

ইতরপ্রাণীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ

আমরা কুকুর বিড়ালের কলহ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। হস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পুরুষ জন্তুই স্ত্রীলাভের জন্য এইরূপ মারামারি করে। কিন্তু বহুসময়ে ইতর-প্রাণীদিগের মধ্যে কেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড ঘটে তাহার কোন প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কুকুরে ইদুঁর মারে কিন্তু খায় না। খেঁকশেয়ালী তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া সত্ত্বেও অকারণ বন্যপক্ষী হত্যা করিয়া সেইখানেই ফেলিয়া যায়। খাইবার জন্য বোধ হয় দু একটি পাখী লইয়া যায়।

ষাঁড়দের মধ্যে দলের নেতৃত্ব লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ষাঁড়ই দলের নেতা হয় কিন্তু অল্পবয়স্ক উচ্চাভিলাষী প্রতিদ্বন্দ্বীরা সর্ব্বদাই

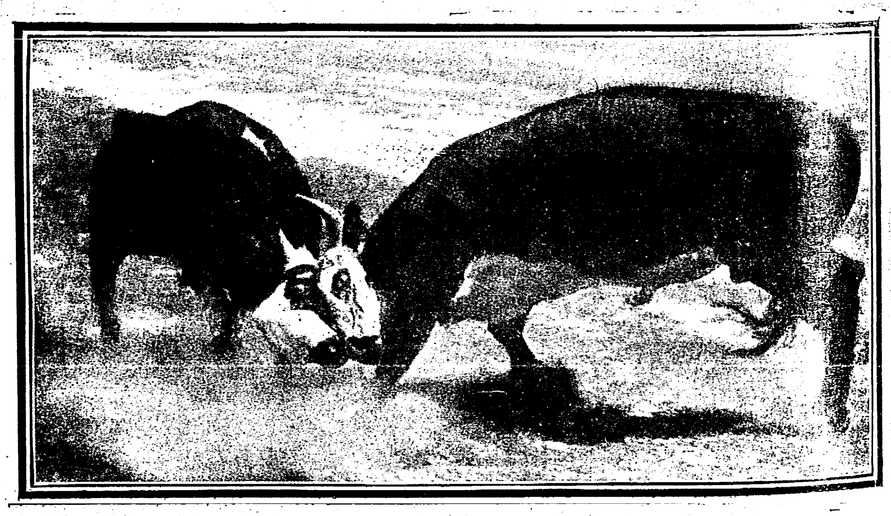

ষাঁড়ের যুদ্ধ

এই অভিপ্রায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে যে জয়ী হয়, সেই দলের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হয়। মধ্যে মধ্যে শান্তপ্রকৃতি গাভীরাও প্রভুদের অনুকরণে শিঙ্ নত করিয়া অপর গাভীকে আক্রমণ করে।

লোকেরা প্রায়ই দ্বন্দ্বপ্রিয় প্রাণীদের লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসে। মোরগদিগের মধ্যে যুদ্ধ যদিও এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; তথাপি এক সময় উহা ইংরাজ-দিগের জাতীয় ক্রীড়াকৌতুক ছিল। আজকাল যেমন ঘোঁড়দৌড়ে লোক বাজি রাখে, সেই রকম পূর্ব্বে মোরগদিগের যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তাহারা বাজি রাখিত। এবং বোধ হয় ইহাও সম্ভব যে, যুদ্ধের সময় মানবদর্শকগণের ন্যায় মোরগরাও সমান কৌতুক উপভোগ করিত।

চীনদেশীয় লোকেরা বহুদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল যে ঝিল্লী (crickat) পতঙ্গগণ অত্যন্ত যুযুৎসু। তাহাদিগকে যত্ন-সহকারে শিক্ষিত করিতে পারিলে, ভাল

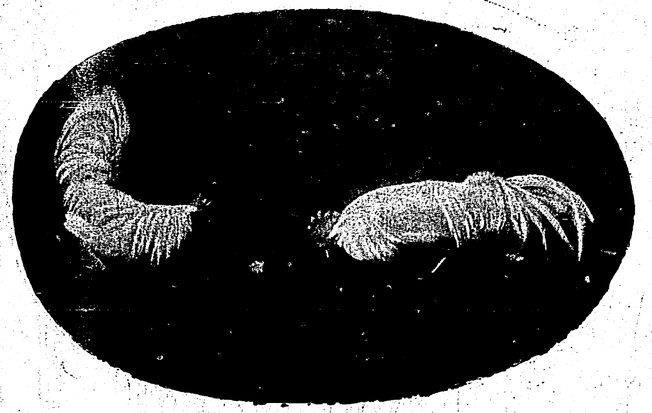

মোরগের যুদ্ধ

দ্বন্দ্বপ্রিয় পতঙ্গের দল সৃষ্ট হইতে পারে। এখন চীনদেশের ছোট বড় সকল গ্রামেই "crickat-club" স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পতঙ্গগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখা হয়। তাহারা খাঁচার ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করে। তার পর রক্ত যখন গরম হইয়া উঠে, তখন তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

হরিণদের মধ্যেও এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অরণ্য ভ্রমণকারীরা প্রায় জঙ্গলের ভিতর দুটি হরিণের অস্থিচর্ম্ম দেখিতে পান। হরিণদের শিঙ্গুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। তখন বুঝিতে পারা যায় যে এই শোচনীয় পরিণামের উৎপত্তির কারণ হরিণদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

কখনকখন দুটি হরিণ পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিলে, তাহাদের শিঙ্ সংলগ্ন হইয়া যায়। তখন আর তাহারা আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে না। এবং নিরুপায় হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে অনাহার ও ক্লান্তি তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়।

ময়ূরগণ সাধারণতঃ তাহাদের বিস্তৃত বিচিত্র লেজের জন্যই বিখ্যাত।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই লেজের জন্যই তাহাদের এত গর্ব্ব! সাধারণত জাঁকজমকপ্রিয় পরিচ্ছদগর্ব্বিত নিস্তেজ লোককেই ময়ূরের সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ময়ূরও তেজহীন নহে পুচ্ছ নাড়া দিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে না। ময়ূরও সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় বীরদর্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে দুইটি ছবি প্রদত্ত হইল।

প্রথম ছবিতে দুটি ময়ূর অপমান সূচক গর্জ্জন করিয়া দম্ভের সহিত তাহাদের লেজ বিস্তার করিতেছে। ২নং ছবিতে একটি

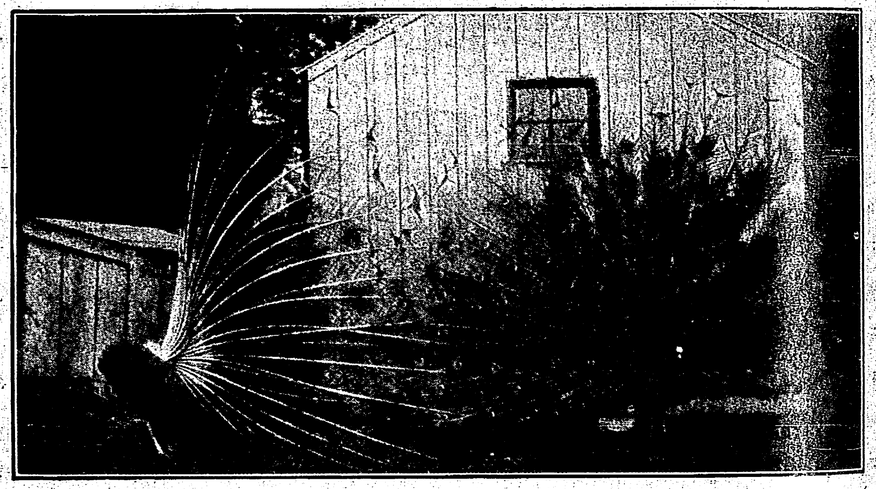

একটি ময়ূর অন্যটির ঘাড়ে পড়িতেছে

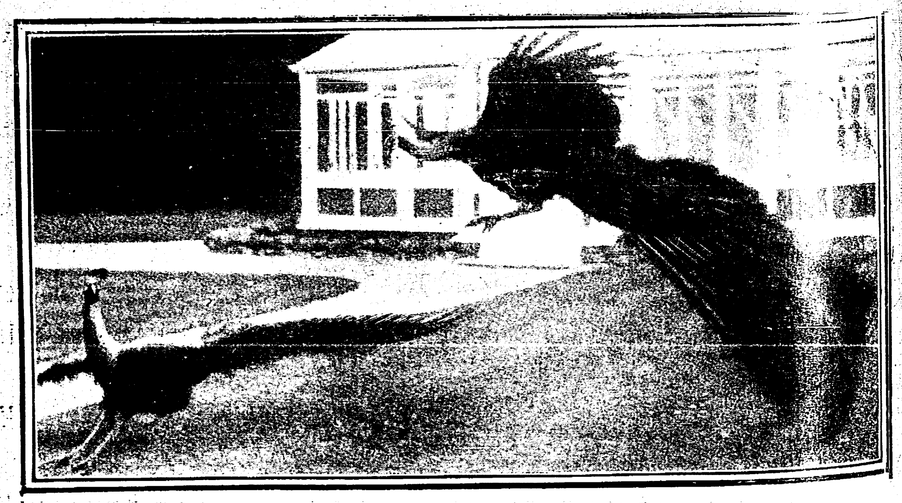

দুটি ময়ূর দম্ভের সহিত লেজ বিস্তার করিতেছে

ময়ূর তাহার শত্রুর ঘাড়ে প্রচণ্ডভাবে হঠাৎ লাফাইয়া পড়িতেছে। অনেক সময় এইরূপ যুদ্ধে ময়ূরেরা পালাইবার ভাণ করে। এই কৌশলকে ইংরাজ সেনাপতিরা "strategic movement" বলিয়া থাকে। কখন কখন যুদ্ধপ্রবৃত্ত ময়ূরেরা শূন্যে উঠিতে থাকে এবং তাহা দ্বারা কে বেশী বলবান্ তাহা স্থির করে। তাহারা সে সময় তাহাদের লেজের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

মানুষদের সম্বন্ধেও যেমন, পশু পক্ষীদের মধ্যেও সেইরূপ যে বেশী বলবান্ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই নিয়ম খাটে না। নিম্নলিখিত কৌতুকজনক ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার একজন আবিষ্কারকের দ্বারা ইহা বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার ভাষাতেই শুনুন,—

"একদিন বনের গভীর প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে তীব্র চীৎকার শুনিতে পাইলাম। মাথা তুলিয়া গাছের দিকে তাকাইয়া দেখি যে, জমী হইতে ৬।৭ গজ উচ্চে একটি ভয়ঙ্কর বিয়োগান্ত নাটিকার অভিনয় হইতেছে। একটি শিকারী বাজ জাতীয় পক্ষী ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মক্ষীভুক পক্ষীদের বাসা আক্রমণ করিতে আসিতেছে, বাসাটিতে সদ্যঃপ্রসূত ডিম্ব আছে।

এবার বাজপক্ষীকে এক অসন্তোষজনক শিক্ষা লাভ করিতে হইল। বিহগদম্পতি তীরের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র ডানার দ্বারা শত্রুকে তাড়া করিল, তাহার গাত্রে তাহাদের ছুঁচের ন্যায় ধারাল ঠোঁটের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিল; অথচ শত্রুর করাল কবল হইতে অতীব দক্ষতার সহিত আপনাদের রক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে বাজপক্ষী রণে ভঙ্গ দিল। তখনও বিহগবিহগী তাহার অনুসরণ করিল এবং তাহাকে ঘৃণ্য উপহারে রঞ্জিত করিয়া বিদায় দিল। এই অসমান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জয়ীদের প্রশংসা

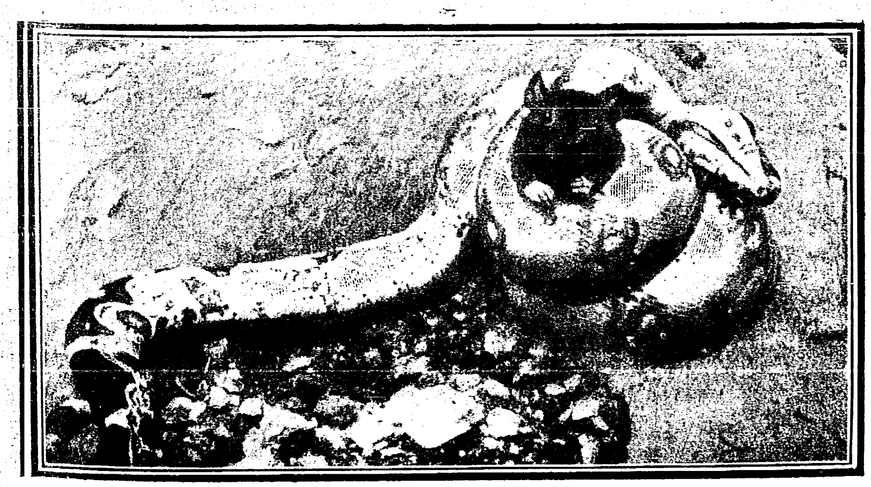

সাপের শিকার-কৌশল

করিয়া হাততালি না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না।”

ইহা যথার্থই সত্য যে প্রাণীজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আবিষ্কারকগণ বলেন যে, আটিক সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র হাঙ্গর আছে, তাহাদের ইংরাজীতে "dog-fish বলে! তাহারা একত্র মিলিত হইয়া তিমি মৎসকেও আক্রমণ করে।

তিমি মৎস একবার লেজ নাড়া দিলেই এইরূপ শত শত ক্ষুদ্র জীব মারা যায়। কিন্তু তাহারাও খুব চতুর, সময় বুঝিয়া আক্রমণ করে। যতক্ষণ না তিমি সমুদ্রের উপর ঘুমাইয়া পড়ে ততক্ষণ তাহারা অপেক্ষা করে। তার পর ঘুমাইলেই ঐ মাছের ঝাঁক এক সঙ্গে তাহার দেহের উপর উঠিয়া পড়ে এবং সকলে একত্র মিলিয়া তাহাকে কামড়ায়। যতক্ষণ না তিমি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসে ততক্ষণ তাহারা এই কৌশল প্রয়োগ করিতে থাকে। পরে যথার্থই তাহারা এই নিরুপায় ভীষণ জন্তুটিকে জীবন্ত অবস্থাতেই খাইয়া ফেলে!

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্রোতের ফুল

(১০)

নবকিশোর মালতীকে এক রকম জেদ করিয়া এখানে আনিয়া এই লাঞ্ছনার আবর্ত্তে ফেলিয়াছে; তাহার উপর আসিয়া অবধি তাহার একবারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, মালতী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গেছে সে খবরটা পর্য্যন্ত না লইয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছে; ইহা মালতীর কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে নবকিশোরের নিশ্চিন্ত শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এখন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতে হইলে কোনো দাসীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ত উপায় দেখা যায় না। দাসীর সর্দ্দারণী রোহিণীকে কোনো অনুরোধ করিতে মালতীর প্রবৃত্তি হইল না। হাবার মা বলিয়া হাবার মা ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব; এই মনে করিয়া মালতী তাহাকে একদিন নির্জ্জনে পাইয়া মিনতির স্বরে বলিল—হাবার-মা আমার একটু উপকার করতে পারবে?

হাবার-মা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি দিদিমণি?

—তুমি যদি একটু দয়া করে নবকিশোর বাবুকে ডেকে দাও।

—এ আর বড় কথা কি দিদিমণি? এখুনি ডেকে আনছি।—বলিয়া প্রস্থান করিল।

পথে রোহিণীর সঙ্গে দেখা। রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁলা হন হন করে' কোথায় চলেছিস?

—কোথায় আবার যাব? এই মালতী দিদিমণি একবার দাদাঠাকুরকে ডেকে দিতে বল্লে তাই একবার ভট্টচায্যি-বাড়ী যাচ্ছি।

—ও! দূতী হয়েছিস!

হাবার-মা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—তুই দূতী হ গে-যা! তোর সাতগুষ্টি দূতী হোক গে! পোড়ারমুখীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!···যাই দেখিন রাণীমাকে বলে দেই গে·····

হাবার-মা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল রোহিণী চটিল না; মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—যা না, রাণীমাকে বলে দেখ গে না, রাণীমা পুজো করবেন 'খন। মালতী ছুঁড়ি একজন পুরুষ মানুষকে ডাকতে বল্লে আর তুই ডাকতে ছুটলি—রাণীমা টের পেলে যে তোর চাকরী যাবে। ভাগ্যিস তোর আমার সঙ্গে দেখা হল?

হাবার-মা ভীত হইয়া বলিল—সত্যিই ত! ভাগ্যিস তুই ডেকে জিজ্ঞেস করলি! যাই বলিগে যে দিদিমণি, আমা দিয়ে এ কাজ হবে না।

রোহিণী বলিল—দূর নেকী। তাতে আর তোর বিপদ কাটল কৈ? রাণীমা যদি টের পায় যে হাবার-মাকে মালতী এই কথা বলেছিল কিন্তু হাবার-মা আমাকে কিছু জানায় নি, তখন রাণীমার কাছে কোন্ মুখে কি জবাব দিবি? তার চেয়ে এখনি রাণীমাকে সব কথা বলগে যা—তোর ওপর কেনো ঝুঁকিই পড়বে না।

হাবার-মা রোহিণীর বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—ঠিক বলেছিস! তাই বলিগে তবে।

হাবার-মাকে গিন্নির কাছে নালিশ করিতে পাঠাইয়া দিয়া রোহিণী এক ছুটে মালতীর কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দিদিমণি, করেছ কি, অ্যাঁ! এমন অল্প বুদ্ধি তোমার!

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন, কি করেছি?

রোহিণী পরম ব্যথিত ভাবে কপালে চড় মারিয়া বলিল—করেছ আমার মাথা আর আমার মুণ্ড! দাদাঠাকুরকে ডাকতে চাও তা আমায় বললে হত। আমায় ত তুমি দুচক্ষে দেখতে পার না! তোমার বিশ্বাসের লোক হল কিনা হাবার মা! সে ওদিকে রাণীমার কাছে গিয়ে সব বলে দিয়েছে।

মালতী বিরক্ত হইয়া বলিল—তা বল্লেই বা! এর মধ্যে লুকোবার কি আছে?

রোহিণী গালে হাত দিয়া পরম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—অবাক করলে দিদিমণি! পুরুষ মানুষকে ডেকে পাঠাবে কি গাঁয়ে ঢেঁচরা পিটিয়ে! আমাদেরও এককালে সোমত্থ বয়েস ছিল বটে, কিন্তু এমন বুকের পাটা ছিল না বাপু!

মালতী ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া বলিল—দূর হ তুই আমার সাম্‌নে থেকে!

রোহিণী মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—ইস্ বাপরে! রাণী আর কি! ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকোবো নাকি? এখনি রাণীমা এসে কাকে দূর করেন দেখা যাবে!

মালতী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে লজ্জায় অপমানে আসন্ন লাঞ্ছনার সম্ভাবনায় অভিভূত হইয়া মালতী আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। সে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

খুড়িমা মেঝেয় বসিয়া মালা জপ করিতে-

ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন অসময়ে গিয়ে শুলি যে?

মালতী কি উত্তর দিবে? সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

খুড়িমা বকিতে লাগিলেন—সকল অনাছিষ্টি! সকল কুলক্ষণ! গুরুজনকে একেবারে অগ্রাহ্যি!...

মালতী প্রতিক্ষণে গিন্নির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাহারো পদশব্দ হইলেই সে চমকিয়া উঠিয়া মনে করিতেছিল এইবার লাঞ্ছনার ঝড় তাহার মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে। কেহ কথা বলিতেছে শুনিলে তাহার মনে হইতেছিল তাহারই কুৎসা আলোচনা হইতেছে। সে এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া ঘোঁট করা মেয়েমহলে একটা প্রধান বিলাসিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাবার-মা যে হাবার-মা সেও যে তাহাকে অপমান করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না ইহাই মালতীর মনে বড় বেশি বাজিয়াছিল।

হঠাৎ গিন্নি প্রচণ্ড ক্রোধে দ্রুত গমনের চেষ্টায় মেঝে কাঁপাইয়া খুড়িমার ঘরে আসিয়াই তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বলি ছোটবৌ, বোনঝির কীর্ত্তি শুনেছ?

খুড়িমা অবাক হইয়া একবার গিন্নির আর বার মালতীর মুখের দিকে চাহিলেন। মালতী বালিশে মুখ গুঁজিয়া আড়ষ্ট মড়ার মতো পড়িয়া আছে।

গিন্নি যেরূপ সালঙ্কারে মালতীর নূতন কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিলেন তাহাতে মালতীর অসময়ে শয়নের কারণ খুড়িমার নিকট ভয়ানক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গিন্নির কথার প্রতিবাদ করিয়া মালতীর মন চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—মিথ্যা মিথ্যা সব আগাগোড়া মিথ্যা!—কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে একটি কথাও আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতে পারিল না।

গিন্নি ঘর হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন—এমন মেয়ের ঠাঁই আমার ঘরে হবে না, এ আমি পষ্ট বলে দিচ্ছি ছোট বৌ। তুমি বোনঝির জন্যে অন্য জায়গা দেখ। আর রসবতী বোনঝিকে ছেড়ে থাকতে না পার তুমি সুদ্ধ ঠাঁই দেখ। এই আমার শেষ কথা।

ঘর নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা খুড়িমা ও মালতীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতন চাপিয়া বসিয়া শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। খুড়িমার ইচ্ছা হইতেছিল মালতী তাঁহাকে বলুক—মাসিমা, এ সমস্ত মিথ্যা কথা, আমি নির্দ্দোষী। আর মালতীর মনে হইতেছিল খুড়িমা তাহাকে প্রশ্ন করুন, তিরস্কার করুন, লাঞ্ছনা করুন; এমন নির্ব্বাক্ স্বীকারের দ্বারা তাহাকে অপরাধী করিয়া বসিয়া থাকা একেবারে অসহ্য।

খুড়িমা কিছুতেই কথা বলেন না দেখিয়া মালতী উঠিয়া বসিয়া আপনাকে খুড়িমার দৃষ্টির সামনে প্রকাশ করিয়া ধরিতে চাহিল। তথাপি খুড়িমা তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না দেখিয়া মালতী অভিমানদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মাসিমা, আমাকে তুমি বেহালায় পাঠিয়ে দাও। আমি এ বাড়ীতে আর এক দণ্ড থাকব না বলেই নবকিশোর বাবুকে ডাকতে বলেছিলাম।

এত বড় কাণ্ডের পর মালতীর কণ্ঠে

এতটুকু সঙ্কোচ নাই, বাক্যে এতটুকু কুণ্ঠা নাই, যে জন্য দিকে দিকে ধিক্কার ছি ছি করিয়া ফিরিতেছে সেই কথা জোর করিয়া বলিতে লজ্জা নাই, দেখিয়া খুড়িমা একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সন্দেহের অন্ধকার-জালে জড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন এই জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সত্যের আলোকে বাহির হইয়া পড়িবেন কি না; অন্ধের মতো হাতড়াইয়া মরার চেয়ে চোখ মেলিয়া পুড়িয়া মরা ভালো কিনা। এমন সময় হঠাৎ মালতী কথার আঘাতে তাঁহার সন্দেহ-জালের মধ্যে যে একটি বড় রকম ছিদ্র করিয়া দিল, তাহার মধ্য দিয়া লাফাইয়া বাহির হইতে গিয়া খুড়িমার প্রতিকূল মন একেবারে জালে জঞ্জালে জড়াইয়া জট পাকাইয়া গেল। তিনি আর প্রশ্ন মাত্র না করিয়া অজস্র তিরস্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন—পোড়ারমুখী শতেকখোয়ারী হাড়জ্বালানী! দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা!

মালতী আর একটি কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

(১১)

মালতীর এই নূতন লাঞ্ছনার খবর নবকিশোরের অগোচর রহিল না। সে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতন নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া এই অসহায়া অবলাকে রক্ষা করিতে পারিলে সে করিত, কিন্তু তাহার কেবলই মনে হইতেছিল উপায় নাই, উপায় নাই। মালতীকে রক্ষা করিবার সামান্য চেষ্টাও তাহার প্রতিকূলেই যাইবে।

নবকিশোর হাতের উপর মাথা রাখিয়া মালতীকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দেখিয়া নবকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—বাবা কিশোর, তুমি একবার অন্দরে যাও, শুনতে পাচ্ছি মালতী নাকি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।

নবকিশোর মাথা নত করিয়া বলিল—এত কাণ্ডের পর আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

—এত কাণ্ড হয়েছে বলেই ত তোমার যাওয়া আরো বেশি দরকার। প্রথমতঃ নিশ্চয় কোনো অভাব জানাবার জন্যেই মালতী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। তারপর তাকে যে রকম অন্যায় ভাবে উৎপীড়ন করা হচ্ছে তাতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়াও ত দরকার।

—কিন্তু আমি গেলে মালতীর কি অধিকতর লজ্জার কারণ হবে না?

—না বাবা, তুমি গেলেই তার লজ্জাটা সহজ আর সহনীয় হয়ে যাবে।

নবকিশোর একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তবে আমি এখনি যাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—হ্যাঁ যাও বাবা।

নবকিশোরের চালচলন স্বভাবতই দৃপ্ত। আজ সে আরো মাথা সোজা করিয়া, পদক্ষেপ আরো দৃঢ় করিয়া, মুখভাবে আরো অসঙ্কোচ ফুটাইয়া যেন সমস্ত নিন্দা, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত অপমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার

জন্যই জমিদারের অন্তঃপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

নবকিশোর অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইতেই চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই এই বেহায়ার অতিসাহস দেখিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া বিদ্রূপের হাসি ও অব্যক্ত টিটকারি চালাচালি করিতে লাগিল। নবীনারা মুচকি হাসিয়া বলাবলি করিল—মাথায় যেন টনক নড়েছে! রূপসী বিদ্বেষরীর ডাক! হাওয়ার মুখে ছুটে চলে! স্থির কি আর থাকা যায়!

নবকিশোরের তীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টি হইতে এসকলের কিছুই এড়াইল না। তথাপি সে সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া সপ্রতিভ ভাবে বড় গলা করিয়া ডাকিল—মা!

নবকিশোরের বজ্রগম্ভীর আহ্বান সকল কোলাহল নিরস্ত করিয়া দিয়া কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হইল। আজ এত কাণ্ডের পর তাহার আহ্বানের উত্তরে গিন্নি তাঁহার অভ্যস্ত প্রসন্ন সরলতায় "কেন রে কিশোর?" বলিয়া সাড়া দিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে রোহিণী উপরের দালান হইতে উঠানে দণ্ডায়মান নবকিশোরকে বলিল—দাদাঠাকুর, রাণীমা এই এ ঘরে আছেন।

নবকিশোর প্রসন্ন স্মিতমুখে অসঙ্কোচ সহজ পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গিন্নির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। গিন্নি তখন একখানি খয়ের রঙের শাল গায়ে জড়াইয়া শাদা ধবধবে পুরু বিছানার উপর বড় একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন; নবকিশোর গিয়া তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া বলিল—বিপিন নেই বলে মা একবার আমার খোঁজও কর না। মা যখন ডাকে না, তখন ছেলেই মাকে দেখতে এল। বিপিনের এগজামিনের আর বেশি দেরি নেই।

নবকিশোর কথা বলিয়া বুঝিতে পারিল তাহার কথাগুলো ভারি খাপছাড়া রকমের হইল, সে কিছুতেই যেমন করিয়া বলিলে ভালো হইত তেমন করিয়া কথা বলিতে পারিল না। সে তখন আনমনে গিন্নির পায়ের আঙুলের আংটি খুঁটিতে মনোনিবেশ করিল।

গিন্নিও নবকিশোরের কথার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলি মনে হইতেছিল এ বাড়ীতে সেই দজ্জাল মেয়েটা আছে যে এই কতক্ষণ আগে নিজে উপযাচিকা হইয়া এই তরুণ যুবাকে ডাকিতে চাহিয়াছিল। এবং সেই জন্যই আজ নবকিশোরের আগমনটা তাঁহার নিকট তেমন সাধারণ বা সহজ ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছিল না।

নবকিশোর গিন্নির সহিত কেনোরূপ আলাপ জমাইতে না পারিয়া হঠাৎ যেন চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল, যাই একবার খুড়িমা আর মালতীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

এ কথায় গিন্নির মন ভীত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নবকিশোরকে নিষেধ করিতেও পারিলেন না। তাহার রকম দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নবকিশোর বিদ্রোহীর ভাবে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিবার জন্য উদ্ধত ও প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। নবকিশোর যখন দেখিল যে গিন্নি তাহাকে তিরস্কার বা নিষেধ কিছুই করিলেন না, তখন সে একটু

অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত ভাবে খুড়িমার কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

নবকিশোর অদৃশ্য হইয়া গেলে গিন্নি চুপি চুপি বলিলেন—যা ত রোহিণী, আড়ি পেতে শুনগে ত কি কথা হয়।

রোহিণীর মন আপনা হইতেই ছটফট করিতেছিল; এখন হুকুম পাইয়া সে মহানন্দে গুপ্তচরের কার্য্যে ছুটিয়া গেল।

নবকিশোরের কণ্ঠ ও পদশব্দ ভুল করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। তাহার সাড়া পাইয়া খুড়িমা লজ্জায় ও আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ ও সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালের হুক হইতে মালা নামাইয়া জপ করিতে বসিলেন, আর মালতীর এতক্ষণকার রুদ্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া চোখের জলে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

নবকিশোর দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

খুড়িমা উত্তর দিলেন না; ঘন ঘন মালা চালনা করিতে লাগিলেন, যেন জপে ব্যাপৃত থাকাতেই কথা বলিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া মালতী মুখ ফিরাইল।

নবকিশোর খুড়িমার সাড়া না পাইয়া ডাকিল—মালতী।

মালতী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আসুন।

নবকিশোর খুড়িমার সাড়া না পাইলে বাহির হইতেই হয়ত ফিরিয়া যাইত। কিন্তু মালতী বেহায়ার মতো তাহাকে ডাকিয়া বসিল। খুড়িমার নিকট ইহা ভীষণ ধৃষ্টতা ও তাঁহারই প্রতিকূলতা বলিয়া মনে হইল। তিনি দৃষ্টিতে নিজের মনের সমস্তখানি ক্রোধের উত্তাপ পুঞ্জীভূত করিয়া মালতীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন।

খুড়িমার কোনো সাড়া না পাইয়া কেবল মাত্র মালতীর আহ্বানে এই আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে মালতীর ঘরে প্রবেশ করিতে নবকিশোরের এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তেই সে ভাবিল নিশ্চয় খুড়িমা ঘরে আছেন, নতুবা মালতী এমন অসঙ্কোচে তাহাকে আহ্বান করিত না, নবকিশোর ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে গিয়া দেখিল খুড়িমা দেয়াল ঠেস দিয়া হাঁটু উঁচু করিয়া বসিয়া বেগে মালা ঘুরাইতেছেন এবং মালতী এক পাশে দৃপ্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মালতীর মুখখানি তখন শ্রাবণ পূর্ণিমার মতো জলে মেঘে আলোতে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর দেখাইতেছিল।

নবকিশোর মুগ্ধ নেত্রে মালতীর দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া খুড়িমা মালতীর দিকে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও বেহায়া মেয়েটা নবকিশোরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। তখন খুড়িমা জপ শেষ হওয়ার ভান করিয়া তাড়াতাড়ি মালা মাথায় ঠেকাইয়া মালতীকে বলিলেন—মালতী, যা না, কাপড়গুলো সন্ধ্যে ডিঙোবে, তুলগে না।

মালতী তাহার মাসিমাকে সংক্ষিপ্ত একটি 'যাচ্ছি' বলিয়া নবকিশোরকে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই বলিল—আমি আপনাকে একবার ডেকে পাঠাব কতদিন থেকে ভাবছি, কিন্তু আপনাকে একবার ডেকে দেবে এতটুকু উপকারও এ বাড়ীর লোকের কাছ থেকে

পাবার জো নেই। আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, আমায় স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন……

মালতীর এই দুঃসাহস দেখিয়া খুড়িমা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মালতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহার মধ্যে তখন বিদ্রোহ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। সে বুঝিতেছিল এ বিদ্রোহ তাহারই বিনাশ ও দুঃখের হেতু; কিন্তু পদে পদে অপমানে মাথা নত করার চেয়ে সেও শ্লাঘ্য, সেও শ্রেয়।

নবকিশোর বলিল—তুমি বাড়ী চলে যেতে চাচ্ছ কেন? মার কাছে ছিলে, মাসির কাছে এসেছ…এখানে তোমার কি দুঃখ?

মালতী প্রত্যেক কথা ঘৃণার সহিত জোর দিয়া দিয়া বলিল—এখানে আমার কি সুখ তাই জিজ্ঞেস করুন। মাসির অতিরিক্ত স্নেহে আর অন্য সকলের যত্নে এখানে তিষ্ঠানো আমার দায় হয়ে উঠেছে। এমনি যত্ন যে কেউ আমাকে একটি কাজ ছুঁতে দেন না, কাছে ঘেঁসতে দেন না, রাত্রিদিন মিষ্টি কথায় কান জুড়িয়ে রেখেছেন, কারণ আমি একটা শেমিজ পরি, আমি মালা হাতে করে দুনিয়ার লোকের কুৎসা করি নে, আমি মনের মধ্যে নরক পুষে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে সাধু হতে জানিনে, তাই আমি ম্লেচ্ছ, আমি খৃষ্টান, আমি অস্পৃশ্য! এ বাড়ীর শুদ্ধশীলাদের সঙ্গে আমার বনবে না। আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, আপনিই আমাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে রেখে আসুন। আমি এখানে আর একদিনও থাকব না।

খুড়িমা মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তা থাকবে কেন? বলি, যাবি কোন চুলোয় পোড়ারমুখী! একবার বলবেন নিয়ে চল, আবার বলবেন রেখে এস…কে তোর বাবার চাকর আছে শতেকখোয়ারী!

মালতী এই তিরস্কারে দৃকপাতও না করিয়া নবকিশোরকে বলিল—আমার এই-সব লাঞ্ছনা অপমানের জন্যে আপনি দায়ী। আমি ত আসতে চাইনি। আপনি আমাকে জোর করে এনেছেন। এখন আপনি আমায় রেখে আসতে বাধ্য!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আমি যে-জন্যে তোমায় এনেছি সে কাজ ত এখনো সম্পন্ন হয়নি; এই সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। বিপিন না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, সহ্য করতে হবে।

—কিন্তু এ বাড়ীর সকল লোকেরই মন এমন সন্দিগ্ধ আর কুৎসিত যে এ সংসর্গে ভদ্রলোক থাকতে পারে না।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—এই রকম হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। যারা রক্তসম্বন্ধ ছাড়া স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক শুধু স্বামীস্ত্রীরূপেই জানে, আর কোনো রকম সম্পর্ক যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থাকা সম্ভব এ যারা কখনো দেখেনি বা কখনো কল্পনাও করে না, তাদের মন ত ওরকম হবেই। তাদের ভদ্র করে' তুলতে হবে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের। যখন এরা দেখবে যে রক্তসম্পর্কশূন্য হয়েও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকতে পারে তখন এদের মনও পবিত্র হয়ে উঠবে, তখন অসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষের ঘনিষ্ঠতা আর অন্যায় অসঙ্গত বলে মনে হবে না।

—কিন্তু ততদিনে যে আমি ক্ষেপে উঠব।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—না, তুমি ক্ষেপে উঠতে পাবে না। আমাদের কাজে সাহায্য করতেই ভগবান তোমায় আমাদের মধ্যে এনে ফেলেছেন।

মালতী ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—তবে আমাকে খানকতক বই পাঠিয়ে দেবেন; আমার দিন আর কাটে না।

নবকিশোর বলিল—এখন আপাতত বইটইয়েরও দরকার নেই। এ বাড়ীতে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল বইয়ের প্রবেশ নিষেধ। এখন যে আন্দোলনটা উদ্যত হয়ে উঠেছে এইটেই আগে সহ্য কর, এর ওপর বইয়ের খোঁচা পেলে এই আন্দোলন যে মূর্ত্তি ধারণ করবে তা কিছুতেই সহনীয় হবে না। আর অল্প ক'টা দিন চুপচাপ করে সয়ে থাক। বিপিনের আসতে আর বেশি দেরি নেই, সে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মালতী মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল—বিপিন আসিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে? এই জমিদার-সংসারে তাহাকে একটু আরাম শান্তি দিতে সক্ষম কেউ যদি থাকে তবে সে কি একমাত্র বিপিন? সেই বিপিন তাহাকে এই-সমস্ত কুৎসিত উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিবে কি না, পারিবে কি না, তাহা ভবিতব্যই জানে। তবু মালতী আশা করিয়া সকল উৎকণ্ঠা দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল, বিপিনকে ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা বন্ধু বলিয়া মনে মনে তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিল। আগ্রহে তাহার আগমন অভিনন্দন করিতে লাগিল।

মালতীর মৌন, সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া নবকিশোর খুড়িমার দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল—দেখ খুড়িমা, তোমার ক্ষেপা মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলাম।…সন্ধ্যে হল, এখন তবে আসি।

খুড়িমা নিরুত্তরে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নবকিশোর তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল।

খুড়িমা নবকিশোর ও বিপিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু মালতীকে লইয়া বিক্ষোভের যে আঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইতেছিল তাহার জন্য মনে মনে তিনি নবকিশোরকেই গৌণভাবে দায়ী করিয়া আসিতেছিলেন। সে যদি মালতীকে আনিয়া উপস্থিত না করিত, তবে এত জ্বালা তাঁহাকে পোহাইতে হইত না। তাহার পর নব-কিশোরের আজিকার কথা শুনিয়া খুড়িমার মনে সন্দেহ হইতেছিল মালতী ও বিপিনকে লইয়া নবকিশোর কি জানি কি একটা অনাসৃষ্টি ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি নবকিশোরের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এজন্য তাঁহার মন নবকিশোরের এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের প্রতিও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের দৃষ্টি ও সংসর্গ হইতে মালতীকে দূরে রাখা খুড়িমা একটা মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

(১২)

নবকিশোর চলিয়া গেলে সকলেরই জানিবার কৌতূহল হইতেছিল সে মালতীর সহিত কি পরামর্শ করিয়া গেল। কিন্তু খুড়িমার ভয়ে কেহ মালতীর কাছে ভিড়িতে সাহস করিতেছিল না।

রোহিণী ফিরিয়া আসিয়া গিন্নিকে বলিল —রাণীমা গো রাণীমা, বল্লে না পেত্যয় যাবে, দাদাঠাকুরের সাড়া পেয়েই মালতী তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এসে আপনি দাদাঠাকুরকে ডেকে হাত ধরে' ঘরে নিয়ে গেল! একটু সরম হল না, একটু ডর হল না! মেয়েমানষের বুকের পাটা দেখে ডরে আমার বুকটা এখনো ঢিপঢিপ করে কাঁপতে নেগেছে! বাপরে বাপ! এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি!

এই বলিয়া রোহিণী একবার গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল; তার পরেই বুকে হাত দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল। বাস্তবিকই রোহিণীর বুক ভয়ে কাঁপিতেছিল; কিন্তু তাহা মালতীর বুকের পাটা দেখিয়া নহে; আর একটু হইলে তাহার আড়ি পাতা নবকিশোরের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত; এবং নবকিশোরের মেজাজ কাহারও অজানা ছিল না।

গিন্নি রোহিণীর অভিনয়ে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তারপর? তারপর? ছোটগিন্নি কোথায় ছিলেন? কি পরামর্শ হল?

—খুড়িমা ঐ ঘরেই ছিল। মালা জপ করছিল; দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলে না। মালতী বাড়ী চলে যাবে বলে দাদাঠাকুরের কাছে বায়না ধরলে। খুড়িমা তাতে কত রাগ করতে লাগল; দাদাঠাকুর কত কি বলে বোঝাতে লাগল—তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না, আমরা কি ছাই ইংরিজি ফার্সী জানি। শেষকালে দাদাঠাকুর বল্লে দাদাবাবু বাড়ী আসুক তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না.....

গিন্নি মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন—আমার বিপিনের অমন স্বভাব নয়। কিশোর ছোঁড়াকেও ত ভাল বলে জানতাম। কলিকালের ছেলে মেয়েদের চেনবার জো নেই! যা ত একবার ছোটবৌকে ডেকে আনগে ত।

রোহিণীর মুখে গিন্নির তলব শুনিয়া খুড়িমার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—দিদি কেন ডাকছেন রোহিণী?

রোহিণী পরম নিরীহ মানুষটির মতন বলিল—তা আমি কেমন করে জানব খুড়িমা?—কিন্তু তাহার ছোট ছোট গোল গোল চোখ দুটো সয়তানী কৌতুকচ্ছটায় মিটমিট করিতে লাগিল।

খুড়িমা রোষকষায়িত লোচনে একবার মালতীর দিকে চাহিয়া রোহিণীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

খুড়িমা গিন্নির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দিদি ডাকছ?

গিন্নি মুখ ভার করিয়া বলিলেন—ভাসুরপোর সঙ্গে কি পরামর্শ হল?

গিন্নির কথার ভঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া খুড়িমা বলিলেন—কি আর পরামর্শ হবে দিদি? মালতী কিশোরকে বলছিল কলকাতায় রেখে আসতে।

গিন্নি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন—তারপর? কবে যাওয়া ঠিক হল?

—কিশোর এখন নিয়ে যেতে চাইলে না।

রোহিণী অমনি মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল —কেন, তুমিও ত যেতে দিতে চাইলে না, কত বকলে!

খুড়িমা বুঝিলেন রোহিণী আড়ি পাতিয়া সব কথা শুনিয়া আসিয়া আগে ভাগেই গিন্নিকে সব জানাইয়া রাখিয়াছে। এখন কিছু গোপন করিবার প্রয়াস বৃথা। তখন তিনি রোহিণীর কথা যেন শুনিতেই পান নাই এমনি ভাবে নিজের কথার ধারাবাহ রূপেই বলিতে লাগিলেন—আমিও মালতীকে বল্লাম, এমন জায়গাতেই তুই শাসন মানছিস নে, নিজে স্বাধীন হলে ত রক্ষে রাখবিনে। ভালো হিল্লেয় ভাগ্যক্রমে যদি এসে পড়েছিস তবে হাতের লক্ষ্মী সাধ করে পায়ে ঠেলতে চাচ্ছিস কেন?

—না ছোট বৌ, অমন জাঁহাবাজ মেয়ের ঠাঁই আমার এ বাড়ীতে আর হবে না। তুমি ওকে সামলে রাখতে পারবে না। শেষে কি তোমার বোনঝির জন্যে আমাদের সুদ্ধ, মাথা হেঁট হবে? এর মধ্যেই ত তোমার বোনঝির গুণের কথায় গাঁময় ঢি ঢি পড়ে গেছে। আজ ত সন্ধ্যে হল, কালকে কিশোরকে ডেকে আমি বলব ওকে রেখে আসুক গে। আমি এত পরের ঝক্কি সইতে পারব না! এমন সব ম্লেচ্ছপনা দেখতে পারব না!

খুড়িমা মিনতির স্বরে বলিলেন—দিদি, বড় গাছেই ঝড় লাগে; বট অশথ গাছেই পাখীরা বাসা বাঁধে, অপবিত্র করে; কিন্তু তাতে গাছের গৌরবই বাড়ে, বট অশথ মানুষের কাছে দেবতার পূজো পায়। তোমার বড় হিল্লেয় কত লোক শান্তিতে আশ্রয় পেয়েছে। মেয়েটাকে যদি পায়ে একটু স্থান দিয়েছ তবে ওকে একেবারে রসাতলে ফেলে দিয়ো না। তুমি ওকে ত্যাগ করলে ওর সর্ব্বনাশ হবে।

খুড়িমার কথায় গিন্নির বিরাগ হ্রস্ববেগ হইয়া গেল। প্রসন্ন অনুকম্পার সহিত বলিলেন—তা ত বুঝছি ছোট বৌ, কিন্তু ও মেয়ে কি শোধরাবার? নুয়ে ডুব দেয় না, ডিঙি মেরে চলে, একেবারে ধিঙ্গি! ভয় হয় পাছে ওর দেখাদেখি অন্য বৌঝিগুলো পর্য্যন্ত বিগড়ে যায়।

খুড়িমা চোখ মুছিয়া বলিলেন—দিদি, তুমি সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানি; তুমি আশীর্ব্বাদ কর ওর মতিগতি ফিরবে। এখানে এসে হাত শুধু করে' থান ত পরেছে। অন্য সব বদখেয়ালও ক্রমে ক্রমে ছাড়বে।

গিন্নি বলিলেন—তবে আগে ওর ঐ ঘাগরাটা ছাড়াও ছোট বৌ! ঐ ঘাগরাটাই যত নষ্টের গোড়া!

খুড়িমার সহিত যখন গিন্নির কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেই অবকাশে ক্ষমা, মোক্ষদা, জয়া, পাঁচুরমা প্রভৃতি এক দঙ্গল নবীনা ও প্রবীণা গিয়া মালতীকে আক্রমণ করিয়াছিল। ক্ষমা ডাকিল—ওলো ভাই মালতী, কি কচ্ছিস লো?

আজ এই গায়ে পড়িয়া সাধিয়া ভাব করিতে আসার উদ্দেশ্য মালতী বেশ বুঝিতে পারিল। সে কোন উত্তর না দিয়া একমনে প্রদীপের কাছে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া সুপারি কাটিতে লাগিল।

মালতীর উত্তর না পাইয়া ক্ষমা জনান্তিকে বলিল—উঃ! গুমর দেখলে হয়ে আসে!—মালতীকে বলিল—কথা কচ্ছিসনে কেন ভাই? কিসের জন্যে এত রাগ?

পাঁচুর মা ক্ষমার কানে কানে অথচ

মালতী শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল—রাগ নয়ক অনুরাগ!

মালতীকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া ক্ষমার অক্ষমা ক্রোধে উদগ্র হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আজ শীঘ্র মালতীর সহিত ঝগড়া করার ইচ্ছা তাহার ছিল না; নবকিশোরের সহিত মালতীর আলাপটা জানিয়া লইবার আগ্রহ তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতেছিল। বারবার তিনবার চেষ্টা করিয়া দেখা শাস্ত্র-সঙ্গত; এজন্য পুনরায় কপট হাসি হাসিয়া ক্ষমা যাত্রার সুরে বলিল—ওলো ধনী মানিনী রাই, তোমার মানের গোড়ায় ছাই, আমি মান ভিক্ষে চাই, পড়ি তোমার পায়!—বলিয়া মালতীর পা ধরিতে গেল।

মালতী শ্লেষকটুস্বরে বলিল—ছি! ওকি! তোমরা সব পুণ্যাত্মা মানুষ! মেলেচ্ছ খৃষ্টানের পায়ে হাত দিতে আছে!

মালতীকে কথা বলিতে শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া সকলে তাহার সম্মুখে কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। ক্ষমা বলিল—নে ভাই, তোর ঠাট্টা রাখ। আমরা আবার ধর্ম্মিষ্টি কিসে? তুই ভাই, অমন করে মুখ গোমড়া করে থাকিস কেন? তোর এখানকার কিছুই পছন্দই হয় না।

পাঁচুর মা চুপি চুপি অথচ মালতী শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল—কেবল কিশোর ঠাকুরপো ছাড়া।

মালতী তাহার ডাগর আঁখি দুটি ঘৃণা ভৎর্সনায় ভরিয়া পাঁচুর মার দিকে চাহিতেই সে মাথা নীচু করিল।

ক্ষমা এসব যেন লক্ষ্যও করে নাই এমনি নিরীহ ভাবে বলিল—তুমি নাকি চলে যেতে চাচ্ছ? তা কিশোরদাদা কি বললে?

মালতী বিরক্তির স্বরে বলিল—তোমাদের কিশোরদাদা বললেন, তুমি যাবজ্জীবন এই নরকযন্ত্রণা ভোগ কর।

ক্ষমা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তুই অত রেগে রেগে কথা কইছিস কেন ভাই?

পাঁচুর মা বলিল—তা ভাই, রাগ ত হতেই পারে। হাজার হোক মেয়েমানুষ, নিজে থেকে মুখ ফুটে একটা কথা বল্লে, অথচ কিশোর ঠাকুরপোর কি যে আক্কেল, স্বীকার হল না। এতে না রাগ হয় কার? আমরা হলে লজ্জায় ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতাম!

মালতী এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে যাইতেছিল—তোমরা আমার ঘর থেকে দূর হও।—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এ ঘরে তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। অগত্যা সে-ই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহাদের এই-সব নিষ্ঠুর নিগূঢ় সরব নীরব ঘাতপ্রতিঘাত তাহার ধৈর্য্যের উপর অত্যন্ত বেশি অত্যাচার করিতেছিল।

মালতী চলিয়া গেলে ইহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। পাঁচুর মা হাসিয়া বলিল—ইস! দেমাক দেখে বাঁচিনে! তবু যদি নিজের চালচুলো থাকত!

পাঁচুর মা এমন ভাবে কথাটা বলিল যেন তাহাদের সকলেরই চালচুলো যথেষ্টই আছে।

ক্ষমা বলিল—চ চ, দেখি ছুঁড়ি কোথায় গেল। ওকে সহজে ছাড়া হবে না।

মালতীকে কোন্ কোন্ বাক্যবাণে অতঃপর বিদ্ধ করিতে হইবে তাহারই পরামর্শ করিতে করিতে সকলে মালতীর সন্ধানে নির্গত হইল। মালতী যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে নির্লিপ্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাই এই-সকল নিষ্কর্ম্মা কুৎসাপ্রিয় পুরাঙ্গনাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতেছিল। ইহারা এই নিরুপায়া দাম্ভিকাকে কাছে কাছে ধরিয়া রাখিয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না বলিয়াই মালতীর উপেক্ষায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। পলাতক শিকারের পশ্চাতে ব্যাধের মতো ইহারা মালতীকে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে তাড়াইয়া লইয়া ফিরিতে লাগিল।

মালতী কোনো ঘরের কোণের অন্ধকারে লুকাইয়া নিজের আহত হৃদয়টিকে যে এক দণ্ড শুশ্রূষা করিবে এমন একটু অবকাশ পাওয়া তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল—যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতুক-দৃষ্টি আসিয়া তাহার ক্ষতস্থানটিই উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া নির্ম্মম আঘাত করিতে থাকে। এখানে স্বাধীন ভাবে প্রাণ ভরিয়া বেদনা ভোগ করিবার মতনও একটু নিরালা জায়গা নাই, কৌতূহলদৃষ্টির কণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত বাড়ীটা তাহার একলার পক্ষেও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বোধ হইতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ আহত পাখীর মতো তাহার উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা শুধু তাহার নূতন আঘাতেরই কারণ হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্মেনী-দেশের উপকথা

অজাগর

(ফরাসী হইতে)

বহুপুরাকালে,—আর্মেনী-দেশের ধারে ধারে যে সকল পর্ব্বত আছে সেই সকল পর্ব্বতের ও-পারে এক রাজা ছিলেন।

এই রাজা খুব ধনশালী ও পরাক্রান্ত। ইঁহার অগণ্য-পরিমাণ সোনা ও রূপা ছিল, অনেক বড় বড় নগর ছিল, আর অসংখ্য সৈন্য ছিল। কিন্তু তাঁহার কোন সন্তান ছিল না; তাই এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার মনে সুখ ছিল না। তিনি বলিতেন:—"আমার পরে, আমার বংশ রক্ষা করে এমন কেহই থাকিবে না। রাজা হয়ে কি-লাভ?"

তাঁহার জীবনে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে করিয়া তিনি সুখী হইতে পারেন।

একদিন, তাঁহার উদ্যানে একাকী বিষণ্ণ ভাবে বিচরণ করিতেছিলেন,—হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দর সাপ, ছানা-পোনা লইয়া রদ্দুর পোহাইতেছে। একটি ছানা,

খেলার ভাবে, তার মায়ের গলা জড়াইয়া আছে। আর একটি, সু-সুযার করিয়া তাহার মায়ের পেটের নীচে যাইতেছে; তৃতীয়টি তার মায়ের হাঁ-করা মুখের ভিতর তার মাথাটা ঢুকাইয়া দিয়াছে। চতুর্থটি তার ত্রিশূলের মত ছোট জিভটি দিয়া তাহার মায়ের গা চাটিতেছে।

একটা ঝোপের পিছনে লুকাইয়া রাজা অনেকক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পরে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, বলিয়া উঠিলেন:—

"নিজের বাচ্চাদের উপর একটা সাপেরও ভালবাসা আছে। ওদের আদর করে' ওর কত সুখ হচ্চে। কিন্তু হতভাগ্য আমি, আমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ, অথচ সন্তানের ভালবাসা হতে আমি একেবারে বঞ্চিত। অন্তত ভালবাসিবার জন্য যদি একটি ছোট সাপও পাই, তাহা হলে কতকটা আমার সান্ত্বনা হয়!"

কোন বিবেচনা না করিয়াই রাজা এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন; তার পর, একথা আর মনেও আনেন নাই। কিন্তু এক বৎসর অতীত না হইতে-হইতেই, তাঁহার পত্নী একটি ছোট সর্পশিশু প্রসব করিলেন। জন্মিবামাত্রই সর্পটি বাড়িতে লাগিল—খুব শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিল। ক্ষণকালের মধ্যেই রীতিমত একটা অজাগর সাপ হইয়া উঠিল। রাণী ও তাঁর আশ-পাশে যে সব লোক ছিল—সবাই ভয়ে পলাইয়া গেল। নবজাত শিশু একলা পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে কি-ভয়ানক কান্নার শব্দ, সে কি-চীৎকার। সেই চীৎকারে রাজবাড়ীর সমস্ত লোক থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কেহই রাজাকে সাহস করিয়া জানাইতে পারে না যে রাণী একটি সর্প-শিশু প্রসব করিয়াছেন। কিন্তু সেই শিশুর ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি যখন রাজার কানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন লোকেরা আসল কথাটা তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য হইল।

পূর্ব্বে রাজা যে অবিবেচনার কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি নিজের আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর ভৃত্য-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"এই সাপটা কত বড়? একটা মানুষের মত-কি বড়?"

—"মহারাজ! এখনও মানুষের মত বড় হয় নি, কিন্তু এমন শীঘ্র শীঘ্র বেড়ে উঠ্‌চে যে শীঘ্রই মানুষকেও ছাড়িয়ে উঠবে।"

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন:—"এখন কি-করা যায়? যা হবার তা ত হয়েছে। সাপই হোক, অজাগরই হোক্,—এখন ত এই আমার সন্তান। এখন একে রক্ষা করতে হবে, খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

সাপটার জন্য নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী আনা হল। কিন্তু সাপ সে-সব কিছুই খাইল না, আর পূর্ব্বেকার মতই ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল।

রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিতদিগকে রাজা ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন; "সাপকে কি-খাওয়াইতে হইবে? ক্ষুধায় জ্বালায় মরিয়া যাইবে ইহা

আমার ইচ্ছা নহে। উহার মধ্যে একজন পণ্ডিত উত্তর করিলেন:—

"আমাদের পঠিত গ্রন্থাদিতে আছে, এই প্রকারের সর্প অল্পবয়স্কা বালিকা ছাড়া আর কিছুই আহার করে না।"

অন্য পণ্ডিতেরাও এই কথায় সায় দিলেন।

তাঁহার সর্পশিশু অনশনে মরিবে ইহা যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে আহার যোগান—ইহাও ন্যায্য ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি পণ্ডিতগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন:—

"ভাল, তোমাদের পরামর্শ অনুসারেই আমি কাজ করিব। যে পণ্ডিত প্রথমে আমাকে এই পরামর্শ দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কন্যাকেই আহারার্থ সর্পশিশুকে দেওয়া যাইবে; তাহার পর, তোমরা এই কথা সমর্থন করিয়াছ, পালা করিয়া তোমাদের কন্যা-দিগকেও দিতে হইবে।"

তখন পণ্ডিতদিগের বড়ই ভাবনা হইল, তাঁহারা রাজাকে বলিলেন:—"মহারাজ! আপনার সর্পশিশুর প্রাণরক্ষার্থ আমাদের কন্যা-দিগের জীবন উৎসর্গ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; কিন্তু সর্প আমাদের কন্যাদিগকে যদি ভক্ষণ করে, তখন আপনি কি-করিবেন? একথা বিশ্বাস করিবেন না যে, আপনার প্রজাদিগের মধ্যে সকলেই সমান রাজভক্ত ও কথার বাধ্য। যখন আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে তাহাদের কন্যা চাহিবেন, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। তাহাতে আপনার সিংহাসন ও জীবন পর্য্যন্ত সংকটা-পন্ন হইতে পারে। বরং এক কাজ করুন, কন্যা আনিবার জন্য অন্য বিদেশী রাজ্যে দূত পাঠাইয়া দিন।"

রাজা এই পরামর্শ অনুমোদন করিলেন না। অথচ তাঁহার সর্পশিশু অনাহারে মরে ইহাও তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল না। এ ক্ষেত্রে কি-করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন রাত্রি হওয়ায়, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, এবং অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিদ্রাবস্থায় এক বৃদ্ধা রমণী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। বৃদ্ধা হইলেও, সে সুশ্রী, তার মুখের ভাবটি বড়ই মধুর। তার রূপালী চুলগুলা যেন দ্রব ধাতুর মত কিরণ ছড়াইতেছে, এবং তার মুখমণ্ডল হইতে যেন কেমন একটা দীপ্তি বাহির হইতেছে। তার মুখে বার্দ্ধক্যের রেখা পড়ে নাই। কেবল তার সাদা চুল দেখিয়াই তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া জানা যায়। তার দৃষ্টিতে কেমন একটা বিষণ্ণভাব,—মনে হয় যেন সে অনেক দেখিয়াছে, বহুকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহ হইতে যেন দয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সে যেন মূর্ত্তিমতী দয়া। সে রাজাকে বলিল:—"ছোট ছোট বালিকার বলিদানে যে তুমি সম্মত হও নি, সে ভালই করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি, কাহারও অনিষ্ট না করিয়াও তুমি পণ্ডিত-দিগের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে পার। দূর-দেশ হইতে যে সকল কন্যাকে আনা হইবে, তাহাদিগকে আমি তাহাদের

আত্মীয়দিগের নিকট আবার ফিরাইয়া দিব—কেবল একটিমাত্র কন্যাকে রাখিয়া দিব ; আমিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" রাজা উত্তর করিলেন :—

"তুমি যে এই আশ্বাসের কথা আমাকে বলিতেছ—তুমি কে বল দেখি ?"

—আমি সূর্য্যের জননী—অভ্রময়ী। (১) এই কথা বলিবার পরেই তাহার দেহ হইতে একটা কিরণচ্ছটা উদ্ভাসিত হইল—সেই আলোয় রাজার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। তাহার পরেই সেই রমণী অন্তর্হিত হইল ; রাজার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয় আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, পণ্ডিতদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে এখন তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁহার রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী গিরি-মালার পর-পারে তিনি দূত পাঠাইলেন। আর বলিয়া দিলেন, যতশীঘ্র সম্ভব তাহারা যেন ১০০টি কন্যা আর্ম্মেনী দেশ হইতে আনয়ন করে।

রাজা দূতদিগের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে কিছুদিন ধরিয়া হতভাগিনী রাণী আহার ত্যাগ করিয়াছে, সেই সর্পশিশুও কিছুই আহার করে না। সাপটা কখনবা ভীষণ আর্ত্তধ্বনি করিয়া ঘরের মধ্যে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে ; কখন বা গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইতেছে, আবার নিদ্রা হইতে উঠিয়াই সেইরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে রাজা রাণী ও সর্পশিশু এই তিনজনে রাজবাড়িতে কষ্টের সহিত জীবনযাপন করিতে লাগিলেন—চাকর-বাকর সকলেই দুঃখিত ও ভয়ে কম্পমান।

ইতিমধ্যে, দূতেরা পর্ব্বত পার হইয়া একটা আর্ম্মেনী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই গ্রামের কথা এখন বলি শোন।

এই গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে তার স্ত্রী ও দুই কন্যার সহিত সেইখানে বাস করিত। সে দুইবার বিবাহ করিয়াছিল।

প্রথম বিবাহে জ্যেষ্ঠ কন্যাটির জন্ম হয় ; অনেক দিন হইল তাহার মার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার দ্বিতীয় বিবাহে, কনিষ্ঠা কন্যাটির জন্ম হয়। ঐ লোকটি তার প্রথম কন্যাটিকে খুব ভালবাসিত। দ্বিতীয় কন্যাটীর প্রতিও যে তাহার স্নেহ ছিল না এরূপ নহে। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় পত্নী বড়ই হিংসুটে ও দুষ্ট ছিল ; তার নিজের মেয়েকেই ভালবাসিত, আর তার স্বামীর পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাত মেয়েটিকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। জ্যেষ্ঠা কন্যা অভ্রবতী (২) পরমা সুন্দরী ; কনিষ্ঠা কন্যাটি কুচফলের মত কালো কুচকুচে। তার নাম মৌঞ্জী (৩)

অভ্রবতী সুন্দরী বলিয়া মৌঞ্জীর মা তাকে আদপে দেখিতে পারিত না, কিসে মৌঞ্জীর মত দেখিতে কুৎসিত হয়, ইহাই তাহার চেষ্টা ছিল। সে সমস্ত দিন অভ্রবতীকে খাটাইত ; তাকে দিয়া ভাত রাঁধাইত, বাসন মাজাইত, গরুর দুধ দোয়াইত, ঘাসের ভারী বোঝা বহাইয়া আনিত। সে মনে করিত এইরূপে অভ্রবতীর সাদা মুখ কালো হইয়া যাইবে, তার হাতে কড়া পড়িবে, তার সোজা শরীর বাঁকিয়া যাইবে, তার বল ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে, এবং অল্প বয়সেই হতভাগিনীর সমস্ত লাবণ্য ক্ষয় হইয়া যাইবে। কিন্তু অভ্রবতী ইহার বিপরীতে, দিন দিন বলিষ্ঠ হইতে লাগিল, সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে মৌঞ্জী নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকায় দিন দিন আরও শীর্ণকায় ও কদাকার হইয়া উঠিল।

অভ্রবতী কাজ করিতে ভয় পাইত না ; সে খুব মন দিয়া কাজ করিত, পারতপক্ষে কাজ না করিয়া সে বসিয়া থাকিত না। যাহা পুরুষের কাজ সেই সকল কষ্টকর কাজগুলা শেষ করিয়া অভ্রবতী সূতা কাটিত, পশম ও সূতার জাল বুনিত। গৃহে রেশমের সূতা তৈয়ারী করিত। যদি উৎস হইতে জল আনিবার জন্য দূরে যাইতে হইত, তবে যে হাতের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া লইয়া আসিত। অথবা অন্যের সহিত বাজে গল্প না করিয়া "টাকু" ঘুরাইতে বসিত।

অভ্রবতী সকল বিষয়েই নিপুণা ছিল। সে চাষ করিতে জানিত, কূপ খনন করিতে জানিত, কাপড় বুনিতে জানিত, কাপড় কাটিতে ও সেলাই করিতে জানিত, রাঁধিতে জানিত, মাথন উঠাইতে পারিত, সকল জিনিসই বেশ গুছাইয়া রাখিতে পারিত। এক কথায় অমন মেয়ের জুড়ী মেলা ভার। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এমন এক বিমাতার হাতে পড়িয়াছিল যে, অভ্রবতী যাহা কিছু করিত, তাহার চোখে খারাপ বলিয়া মনে হইত, এবং একটা কিছু ছুতা করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিত, লাথি মারিত, তার চুল ছিঁড়িয়া দিত, নাকে মুখে রক্ত পাড়াইয়া দিত।

সব চেয়ে তার কষ্টের কারণ এই হইয়াছিল যে, তার সৎমা তার পিতাকে বুঝাইয়াছিল যে, সে বড় একগুঁয়ে ও দুষ্ট। সে কৈফিয়ৎ দিয়া আপনাকে সাফাই করিতে পারিত না ; সে বলিবার চেষ্টা করিত কিন্তু যখন সে দেখিত, তার পিতা বিমাতার কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন বুকটা কান্নায় এমন ফুঁপাইয়া উঠিত যে দম আটকাইয়া যাইত।

যখনই তার পিতা তাকে ধমকাইতেন তখনই সে গ্রামের শ্মশানে চলিয়া যাইত। সে তার মাতার সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিত ; চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িত, তার পর তার মনটা একটু ঠাণ্ডা হইত। কখন কখন সমাধিস্তম্ভের পাথরের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িত ; তার মাকে স্বপ্ন দেখিত, স্বপ্নে তার মার গলা জড়াইয়া ধরিত, এইরূপ ক্ষণকালের জন্য মাতৃস্নেহের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিত। তার মা তাকে সান্ত্বনা দিত, তাকে বলিত, "বাছা! সর্ব্বদা ভাল থাক্‌বে, সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে! এক সময়ে নিশ্চয়ই দুঃখ কষ্টের অবসান হবে।" তখন অভ্রবতী হৃদয়ের মধ্যে একটা নূতন বল পাইত ; শান্তি অনুভব করিত, দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইত, আবার গোলাপটির মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

অভ্রবতী এরূপ প্রসন্নভাবে দীনদরিদ্র দিগকে ভিক্ষা দিত যে খুব যৎসামান্য হইলেও, তাহারা বেশী মূল্যের জিনিস অপেক্ষাও,

(১) মূলে—Arevamair.
(২) মূলে—Arevahate.
(৩) মূলে—Monchi.

আনন্দিত হইত এবং তাহার সুখ সৌভাগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিত। নিরীহ ইতর জীব মাত্রই তাহাকে দেখিয়া খুসী হইত। পক্ষান্তরে ঘরের জীবজন্তুরা, তাহার বিমাতাকে দেখিলেই তাহাদের আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ করিত। কুকুর ভেউ ভেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিত, বিড়াল তাহাকে আঁচড়াইবার চেষ্টা করিত, সে দুধ দুইতে গেলে গরু তাহাকে দুধ দুহিতে দিত না। ষাঁড় তাকে আড়চখে-আড়চখে দেখিত, ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠিত, ছাগল ও ভেড়া পলাইয়া যাইত। কিন্তু ঐ সব জীব-জন্তুই অভ্রবতীকে দেখিলে, তখনই তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, তাহাকে আদর করিত, তাহার হাত চাটিত, তার কাছে আসিবার জন্য আপনাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিত। গরু আপনা হতেই এমন ভাবে দাঁড়াইত যে অভ্রবতী সহজে দুধ দুহিতে পারে। যখন সে জল আনিতে যাইত, আবশ্যক হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে এই মনে করিয়া কুকুর তাহার পিছনে পিছনে যাইত; এবং তাহার হুকুম শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

কিন্তু এই সময় একটা জনরব উঠিয়াছিল যে, ঐ গ্রামে কিংবা গ্রামের আশপাশের মাঠ ময়দানে কোন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক গেলে, সে আর ফিরিয়া আসে না; সেখানে একটা অজাগর আছে, সেই অজাগর তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। অভ্রবতী প্রায়ই একলা থাকিত, এ বিপদের কথা জানিত না; কিন্তু তাহার বিমাতা এ খবর জানিত, তাই সে মনে মনে খুসী হইয়াছিল। সেই দুষ্টা রমণী মনে মনে ভাবিল,—আমি যদি উহাকে গরু চরাইতে মাঠে পাঠাই, তাহা হইলে সে অজাগরের কবলে পড়িবে।" তাই একদিন, সে অভ্রবতীর নিকট একটা গরু ও একটা ভেড়া আনিয়া আদেশ করিল—"ইহাদিগকে তুমি মাঠে চরাইতে লইয়া যাও।" আরও বলিল—"সমস্ত দিনের আহারের জন্য এই রুটি লইয়া যাও, আর সুতা কাটিবার এই টেকোটা লইয়া যাও। টেকোয় সমস্ত সুতা জড়ান হইলে তবে রাত্রে ফিরিয়া আসিবে।" যেখানে খুব লম্বা লম্বা ও ঘননিবিড় ঘাস ছিল, বালিকা গরু ও ভেড়াদিগকে তাড়াইয়া সেইখানে লইয়া গেল। উহারা চরিতে লাগিল, আর অভ্রবতী মাটিতে বসিয়া সুতা কটিতে আরম্ভ করিল। কুকুর পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সেও অভ্রবতীর কাছে আসিয়া বসিল।

সূর্য্য অস্তের একটু পূর্ব্বে তাহার টেকোতে সুতা জড়ান শেষ হইয়াছিল। গরু ও ভেড়াকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য সে উঠিল; উঠিবামাত্রই হঠাৎ তাহার সম্মুখে এক সুন্দরী ও মধুরদর্শনা বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল। অজাগরের পিতা রাজাকে যে রমণী স্বপ্নে দেখা দিয়াছিল এ সেই বৃদ্ধা। পাছে তাহার কুকুর বৃদ্ধাকে দংশন করে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি কুকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই বৃদ্ধা রমণী হাসিমুখে এইরূপ বলিল:—

"অভ্রবতি, ভয় পাইও না, কুকুর আমাকে কামড়াইবে না। ও বেশ বুঝতে পারিয়াছে, আমি একজন বন্ধু। দেখ্‌ছনা, ও কেমন খুসী হয়ে লেজ নাড়চে?" অভ্রবতী বলিল,—"কিন্তু তুমি কে? মা তোমাকে আমি ত কখন দেখি নি; তুমি কি আমাদের গ্রামের লোক নও?" বৃদ্ধা উত্তর করিল:—আমি কোন গ্রামেরই নই, আমি এই পৃথিবীরই লোক নই। আমি সূর্য্যের জননী;—আমার নাম অভ্রময়ী। তোমার দুঃখে আমার মন বিচলিত হয়েছে। তোমার নির্দ্দোষ চরিত্র ও তোমার দয়া আমার বড় ভাল লেগেছে। তুমি আমার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বোসো—আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

এই কথায় বিস্মিত হইয়া অভ্রবতী আরও মনোযোগের সঙ্গে বৃদ্ধাকে দেখিতে লাগিল; দেখিল এ পৃথিবীর কোন জীবের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নাই। তার চোখ দিয়া সূর্য্য-কিরণের মত কিরণ বাহির হইতেছে—অথচ সেই কিরণের তেজে চোখ ঝলসাইতেছে না। তার কথা কহিবার ধরণটি এমন মধুর, তার কণ্ঠস্বর এমন মিষ্ট, যেন তার নিজের মায়ের মুখের কথা শুনিতে পাইতেছে। অভ্রময়ীর পরিচ্ছদ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল; যেন সেই কাপড়, গলানো সোনা, সেলাই করা কাপড়-নহে।

অভ্রবতী সূর্য্যজননীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। মাথা নীচু করিয়া তাঁর পরিচ্ছদ প্রান্তে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই দয়াময়ী বৃদ্ধা বালিকার মাথা তুলিয়া ধরিয়া এবং তাহার উপর হাত বাড়াইয়া দিয়া এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিল:—"তোমার পদক্ষেপে যেন চামেলী ফুটিয়া উঠে; তোমার হাসিটি যেন গোলাপের মত হয়! তোমার অশ্রুবিন্দু যেন মুক্তার মত দেখিতে হয়! বৃশ্চিক বা সর্প যেন তোমাকে দংশন করিতে না পারে! তোমার মাথায় আমি যেন রাণীর মুকুট দেখিতে পাই! রজত-কাঞ্চনময় প্রাচীর ও রত্নখচিত কুট্টিমবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদে যেন তুমি বাস কর! বাছা আমি আশীর্ব্বাদ করি, দুঃখকষ্ট যেন তোকে স্পর্শ করতে না পারে, তোর মাথার এক গাছি চুলও যেন নষ্ট না হয়।"

এই কথা বলিয়া অভ্রময়ী বালিকাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া চুম্বন করিলেন। এবং তাকে বলিলেন:—

"এই চুম্বনে তোর রূপলাবণ্য আরও যেন বৃদ্ধি পায়।"

পরে তাকে একটি ছোট গাঁট্‌রি দিলেন, সেই গাঁট্‌রির মধ্যে একটি পরিচ্ছদ ছিল। কিন্তু সে কি-পরিচ্ছদ! সে পরিচ্ছদ তারকার মত উজ্জ্বল রত্নখচিত, আর এমন সূক্ষ্ম যে কার্পাস বা রেশমের বলিয়া মনে হয় না,—মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণে তৈরী। অভ্রময়ী বলিলেন:—

"যতদিন না বিবাহ হয়, এই পরিচ্ছদ তোমার বক্ষের উপর রাখবে; আর বিবাহের দিন, এই পরিচ্ছদ পরিধান করবে। শুদ্ধচিত্ত ও সতীসাধ্বী হয়ে থাকবে। আমি এখন যাই, আমার পুত্র আমার জন্য অপেক্ষা করচে।"

এই কথা বলিয়া অভ্রময়ী সোনার মেঘের মত দিগন্তের অভিমুখে নিঃশব্দে ও অবাধ গতিতে চলিয়া গেলেন। তাহার পুত্র সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহার সঙ্গে অন্তর্হিত হইলেন। অভ্রবতী এই মূর্ত্তির আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে

ভাবিতে লাগিল,—একি স্বপ্ন? কিন্তু তখনই দেখিল, তাহার বক্ষের উপর সেই বৃদ্ধা-প্রদত্ত পরমাশ্চর্য্য পরিচ্ছদটি রহিয়াছে। তখন সে মনে করিল,—"এ স্বপ্ন নয়"; তাহার বিষাদ আনন্দে পরিণত হইল; তাহার হৃদয় উল্লসিত হইল, তার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে উল্লাসভরে কুকুরের সহিত কথা কহিতে লাগিল, গরু ও ভেড়াকে আদর করিতে লাগিল এবং এইরূপে উহাদিগকে নিজ আনন্দের একটু অংশ দিয়া উহাদের লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। চলিয়াছে ত চলিয়াছে—পথ আর ফুরায় না—হঠাৎ দেখিল একদল অস্ত্রধারী অশ্বারোহী তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে তাহাদের বর্ম্ম ঝক্‌মক্ করিতেছে। কুকুরটা অশান্ত হইয়া তাহার প্রভুর চারি ধারে ঘুরিতেছে, আর তাহার মুখের দিকে তাকাইতেছে; সেও অনুমান করিল—এরা সৎ লোক নহে। কিন্তু ওরা যদি ধরিতে আসে, ওদের হাত এড়াইয়া কি করিয়া পলায়ন করিবে? সে লোকের মুখে শুনিয়াছে, দস্যুরা কখন কখন অল্প বয়স্ক বালক বা বালিকাদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে দাসরূপে বাজারে বিক্রয় করে। ভাল মাল হইলে—অর্থাৎ দেখিতে বলিষ্ঠ ও সুশ্রী হইলে—বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পায়। দস্যুরা যাহাতে সুশ্রী বলিয়া মনে না করে, এই ভাবিয়া অভ্রবতী, রাস্তার কাদামাটি মুখে মাখিল; তাহার পর মাথা হেঁট করিয়া গরুর দিকে চালতে লাগিল।

হায়! সে সতর্কতা বৃথা হইল। অশ্বারোহীরা অগ্রসর হইয়া একজন কুৎসিত বালিকাকে দেখিতে পাইল; কিন্তু আপনাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল:—

"কুৎসিত হউক, সুন্দরী হউক, তাহাতে কি-আসিয়া-যায়! অজাগরের উদরে যেতে ত কোন বাধা হবে না।"

তাহার পর, উহার মধ্যে একজন খুব উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল:—

"ওরে মাইয়া, পালাবার চেষ্টা করিস্ না! আমাদের মধ্যে একজন ঘোড়সওয়ারের পিছনে তোর বসতে হবে—তোকে আমরা উঠিয়ে নিয়ে যাব!"

অভ্রবতী থামিল। এখন কি করা যায়? যুঝাযুঝি করা অসম্ভব; আর তার পর, যদি দূর দেশে নিয়ে যায়, বিমাতার গৃহে থাকার চেয়েও কি বেশী দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে? সে কুকুরের নিকট বিদায় লইল, তাহাকে চুম্বন করিল, গরু ও ভেড়ার কপালে চুম্বন করিল। তাহার পর দস্যুদের একটা ঘোড়ার পিছন দিকে চাপিয়া বসিল। তাহাদের প্রভু যতই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই গরু হম্বারব করিতে লাগিল—ভেড়া ততই উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল। কুকুর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। যখন চলিতে চলিতে বেদম হইয়া পড়িল তখন থামিল। ঘোড়ারা সমান ছুটিতে লাগিল। তখন বালিকা কুকুরটিকে হস্তের ইঙ্গিতে শেষবিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া দিল।

তিনটি পশু অতীব বিষণ্ণ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দস্যুরা একটা বড় শৈলের নিকট আসিয়া পৌঁছিল; অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িল এবং একটা সরু পথ দিয়া অভ্রবতীকে একটা প্রশস্ত গুহার মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে আরও ২৪ জন মেয়ে ছিল। এইরূপে তাহাদিগকেও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ইতিপূর্ব্বে হরণ করিয়া আনা হয়। অল্প কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ তাহাদিগের উপর পাহারা দিতে ছিল। হতভাগিনীরা কাঁদিতেছিল—তাহাদের ক্রন্দন শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু তবু তাহারা গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে সাহস করিতেছিল না;—তাহারা ঘুমরিয়া ঘুমরিয়া কাঁদিতেছিল ও খুব মৃদুগুঞ্জনে নিরাশার কথা বলিতেছিল। অভ্রবতী তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। যদি তাহারা উহাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে বিক্রয় করে, তবে কি উহারা দস্যুদের চোখ এড়াইয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারে না? কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই জানিত, অজাগরের খাদ্য যোগাইবার জন্যই উহাদিগকে আনা হইয়াছে—কেননা, এই সংবাদ সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। অভ্রবতী ইহার কিছুই জানিত না, সে সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিল। যদি মরিতেই হয়, সে সাহসের সহিত মরিবে। সে সেই সদাশয়া বৃদ্ধার বাক্য বিস্মৃত হয় নাই, তাই মৃত্যুর হস্ত হইতে পার পাইবে বলিয়া তাহার আশাও ছিল।

আর কতকগুলি বালিকাকেও গুহার ভিতর আনিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহাদের সকলকে বাহির করা হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে পথ-গুলি আলোকিত। উপত্যকার গিরিপথ দিয়া বন্দিনীদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যাভিমুখে আনা হইল—প্রত্যেকেই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, পশ্চাতে এক একজন অশ্বারোহী। উহারা সমস্ত রাত্রি ও পরদিনের দিবাভাগের একাংশ কাল ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে অজাগরের জনক সেই রাজার রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল।

নগরে সমস্ত অধিবাসী উহাদিগকে দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সকল আর্মেনি বালিকাই সুন্দরী। উহারা সকলেই অজাগরের কবলে পতিত হইবে, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

কেবল অভ্রবতীকে কুৎসিত বলিয়া মনে হইল—তাহার সমস্ত মুখে কাদা মাখা।

এখন রাজার আদেশ দিবার সময় উপস্থিত হইল।

এখন সর্পশিশুটি প্রকাণ্ড বড় হইয়া উঠিয়াছে—ক্ষুধিত হইয়াছে, উহার সহিত একটি ছোট মেয়ে একাকী থাকিবে, এই কথা ভাবিয়া রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারও সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়ামূর্ত্তির কথার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি সেই মেয়েগুলিকে প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর গৃহে রাখিয়া তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে বলিলেন এবং উহার মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া সর্পের নিকট আনিতে আদেশ করিলেন।

রক্ষকেরা, যুক্তিতে যার নাম প্রথম উঠিবে তাহাকেই প্রথমে সর্পের নিকট আনিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া, অভ্রবতীকে কুৎসিত ও নির্ভয় দেখিয়া, তাহাকেই সর্পের আহারের জন্য বাছিয়া লইল।

তাহারা বলিল :—প্রথমে উহাকেই লইয়া যাওয়া যাক্, কেননা ঐ মেয়েটি অবাধে আমাদের সঙ্গে আসিবে এবং তাহা হইলে উহার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও সাহস পাইবে।

তাই তাহারা অভ্রবতীর হস্ত ধারণ করিয়া অজাগরের নিকট লইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে উহারা তাহাকে বলিল :—"তোমার বিবাহ দিবার জন্য তোমাকে লইয়া যাইতেছি; রাজপুত্র—তোমার বর; তুমি রাণী হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতে উহারা সর্প-পুরের সংলগ্ন একটি বাগানে আসিয়া পৌঁছিল। এই উদ্যানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ জলের একটা চৌবাচ্চা ছিল। রক্ষকেরা সর্প-পুরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে উদ্যত হইলে, মেয়েটি উহাদিগকে বলিল :—"যে হেতু তোমরা রাজপুত্রের নিকট আমাকে লইয়া যাইতেছ, আমাকে একটু একলা থাকিতে দেও, আমি মুখ ধুইয়া লই, আমার কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লই। আমাকে এই অবস্থায় তাঁহার নিকট লইয়া গেলে আমি বড়ই লজ্জিত হইব।"

উহারা তাহাতে সম্মত হইল, যে রক্ষকেরা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেল।

অভ্রবতী একাকী থাকিয়া এক্ষণে মুখ হাত ধুইল, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিল, আর সেই বৃদ্ধাপ্রদত্ত পোষাক পরিধান করিল।

মুহূর্ত্ত পরে, তাহার রক্ষকেরা ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির এইরূপ বেশভূষা দেখিয়া উহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। উহাদের মনে হইল যেন দিবালোকের মধ্যে ঊষার আবির্ভাব হইয়াছে। কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না, উহারা যে মেয়েটিকে আনিয়াছিল সে এই মেয়ে, কিংবা এ পৃথিবীর জীব। উহারা ভাবিল, দরিদ্রা বালিকার বেশে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেব-বালা বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া, এক্ষণে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অভ্রবতী উহাদিগকে বলিল :—"হাঁ-করিয়া অবাক্‌ভাবে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছ কেন? যেখানে আমার যাইতে হইবে সেখানে আমাকে লইয়া যাও না।"

যে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা মনে করিয়া উহারা ভীত হইল এবং তাহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। উহারা তাহাকে বলিল :—"আমাদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমরা বিবাহ দিতে তোমাকে এখানে আনি নাই, এই পুরবাসী অজাগরের মুখে তোমাকে সমর্পণ করিবার জন্য আনিয়াছিলাম। এই অজাগর সর্পই রাজার পুত্র। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর; তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমাকে আমরা বাঁচাইয়া দিব, তার জন্য আমাদের ফাঁসি হয় সেও স্বীকার।

অভ্রবতী আদৌ ভয়ে বিচলিত হয় নাই। সে মনেমনে ভাবিল, তাহার সম্বন্ধে তাহার রক্ষাকর্ত্রীর একটা কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তিনি কখনই তাহাকে ছাড়িয়া পলাইবেন না। তাই সে আবার দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল :—

"তোমাদিগকে আমি মৃত্যুর আশঙ্কায় রাখিতে চাহি না। পুরদ্বারের চাবিটা আমাকে দিয়া তোমরা চলিয়া যাও। আমি অজাগরকে ভয় করি না।"

সে উহাদিগের নিকট হইতে চাবিটা লইয়া দ্বার খুলিল, একটা খালি ঘর-দালান

পার হইয়া, একটা বড় দালান-ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটা প্রকাণ্ড অজাগর, একটা পালঙ্কের উপর প্রসারিত। প্রথমে ভয়বিহ্বল হইয়া কথা বলিতে পারিতেছিল না, পরে তাহার পূর্ব্ব-সাহস ফিরিয়া আসিল, এবং একটু দূরে দাঁড়াইয়া সর্পকে এই কথা বলিল :—

"রাজকুমার! তোমাকে আমি অভিবাদন করি। সূর্য্য-জননী অভ্রময়ীর তরফ হইতে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তিনি তোমার সুখস্বচ্ছন্দতা ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন।"

অজাগর মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার জ্বলন্ত দুই চক্ষু দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মেয়েটি শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তাহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল; কিন্তু তবু সে পিছু হটিল না, এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিপাতে মেয়েটি ভীত হইয়াছে দেখিয়া, সাপ মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! পরে আবার তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে থাকায় সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আবার তাহার মনে পড়িল, অভ্রময়ী আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তখন সে বলিল :—"রাজকুমার কেন তুমি আমাকে এইরূপ যন্ত্রণা দিতেছ; আর বিলম্ব না করিয়া আমাকে গ্রাস কর,—যদি আমাকে ভক্ষণ করিবার তোমার এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তোমার এই সর্প-শরীরের মধ্যে মানব-আত্মা অধিষ্ঠিত থাকে, তবে আমি অভ্রময়ীর নামে তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তোমার খোলস্ হইতে বাহির হও।" এই কথা বলিবামাত্র, সর্প কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল এবং চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর, সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার শরীর বাঁকিয়া যাইতে লাগিল এবং হঠাৎ এরূপ একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে সমস্ত প্রাসাদ কম্পিত হইল; রাজা লাফ দিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

কি হইয়াছে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে ভৃত্যেরা আসিয়া পড়িল! আসিয়া কি-দেখিল?—দেখিল, সাপের খোলসটা মাটিতে পড়িয়া আছে—ঠিক্ যেন একটা গঠনহীন আবরণ হইতে একটা প্রজাপতি সদ্যঃ বাহির হইয়া আসিয়াছে। দেখিল শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত একটি উদার দর্শন সুন্দর যুবক; তাহার পার্শ্বে, কাঞ্চন ও আলোর রশ্মির দ্বারা খচিত রেশমীপরিচ্ছদ পরিহিত, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এক তরুণী অবস্থিতা। দুজনেই সস্মিত মুখে পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের সমাচার পাইয়া রাজা ও রাণী আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, দৌড়িয়া আসিলেন এবং যুবকের ও অভ্রবতীর মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তাহার পর খুব ঘটা করিয়া তাহাদের বিবাহ দিলেন। ৬ দিন ৬ রাত্রি ধরিয়া বিবাহের উৎসব চলিতে লাগিল। আর্মেনী দেশের তাবৎ তরুণীবৃন্দ বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর উপহারের বিপুল ভার সঙ্গে লইয়া, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা প্রণালী

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চৌধুরী (Mr. W. Chowdhury) বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা-প্রণালীর বিষয়ে একখানি ইংরাজী ভাষায় অতি সারগর্ভ পুস্তক * লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি সহজ, সুবোধ্য, চিন্তাশীলতা ও গবেষণার পরিচায়ক।

গ্রন্থকার একটী বিখ্যাত জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি, এচ, ডি উপাধিধারী। তিনি শিক্ষার্থে পাঁচ বৎসর কাল জার্ম্মাণ দেশে বাস করিয়া, তথাকার শিক্ষা-প্রণালী বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাঁহার গবেষণার ফল উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভিতর সজীবতা আছে, উহা কতকগুলি অর্থহীন নীরস কথার সমষ্টি নহে। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন, বিদেশী জাতিকে বুঝিতে পারা ততোধিক কঠিন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিদেশী জাতির অন্তর্নিহিত ভাব অভিব্যক্ত করা। গ্রন্থকার জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়া, জার্ম্মাণ দেশে ভ্রমণ ও বাস করিয়া, জার্ম্মাণ ভাবে নিমগ্ন হইয়া, জার্ম্মাণ জাতির জ্ঞান-পিপাসা ও শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় অতি সুচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার করিবার নানারূপ প্রস্তাব হইতেছে। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষা বিস্তার সম্যকরূপে হইতে পারে আমাদের চর্চ্চা করা আবশ্যক; সেজন্য কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন দেশে কতদূর শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত।

ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মাণীতে শিক্ষা-বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কেন হইল, ও কি প্রকারে হইল; বর্ত্তমান অবস্থায় সে বিষয় আলোচনা করিলে সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে।

শিক্ষা-বিস্তারে জাতীয় মনোগঠনের সহায়তা করে। হাম্‌বোল্ট, বেবর প্রভৃতি মনীষীগণ ভারতবাসীর সহিত জার্ম্মাণ জাতির মনো-গঠনের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পান; এবং সেই জন্য মনে হয়—আমরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জার্ম্মাণ শিক্ষা-প্রথার উন্নতির মূল কারণ অনুসন্ধান করি, আমাদের বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা।

প্রকৃতির সহিত জীবের অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে মানবকে তাহার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। জ্ঞানই মনুষ্যের শক্তি। মনুষ্যের শ্রীবৃদ্ধির মূলে জ্ঞান। মানব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথায় জ্ঞান দেবীর আরাধনা করিতেছে; ও তাহার আরাধনার বলে প্রকৃতির অপূর্ব্ব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত শক্তিনিচয় নিজ ব্যবহারে লাগাইয়া, শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রচার করিতেছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে জাতি জ্ঞান দেবীর আরাধনায় প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, সেই জাতি ধরাবক্ষে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রতীচ্য জাতির উন্নতির মূলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। কি প্রকারে প্রতীচ্য জাতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে জানিতে পারিলে, প্রাচ্য জাতির উৎকর্ষ লাভ ঘটিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত জাপান।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শিক্ষা-প্রণালীতে তিনটী স্তর বা ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—নিম্নশিক্ষা, মধ্যমশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা; এবং প্রতি স্তরে দুইটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—সাধারণ ও শিল্পবিদ্যা বিষয়ক।

---

* The Present Educational System in Germany by W. Chowdhury, Ph. D, Printed and Published by K. P. Mookerjee & Co. at 20 Mangoe Lone. Price Rs 1-8-0.

নিম্নশিক্ষা

জার্ম্মাণ দেশে প্রত্যেক বালকবালিকাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে হয়। জার্ম্মাণ রাজ্যে প্রতি বালক ও বালিকাকে প্রাথমিক শিক্ষা না দেওয়া অপরাধ ও আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। ১৬১৯ খ্রীঃ অঃ হইতে জার্ম্মাণীতে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মাণ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য মানব জীবনে অহরহঃ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যক সেই সকল বিষয়ে, নীতি ও ধর্ম্ম অনুসারে শিক্ষা দিয়া স্বদেশ-প্রেমিক বালক চরিত্র গঠন করা। জার্ম্মাণ প্রাথমিক শিক্ষায় এখনও ধর্ম্ম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম ব্যতীত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ ভাষা, অঙ্ক, জ্যামিতি, জার্ম্মাণ দেশের ইতিহাস ও ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্ম্মাণ দেশে লোয়ার প্রাইমারি স্কুলেও শিক্ষা যথেষ্ট দেওয়া হয়—প্রায় আমাদের দেশে হাই স্কুলে যতদূর শিক্ষা দেওয়া হয় ততদূর! কিন্তু বই মুখস্থ করান হয় না, হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্ম্মাণদেশ হইতে "কিণ্ডার-গার্টেন" শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভূত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বালক বালিকারা স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করে। জার্ম্মাণেরা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বালক ও বালিকার মধ্যে প্রভেদ পছন্দ করেন না; তাঁহাদের ধারণা গৃহের মত বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগের বাল্যশিক্ষা একত্রে হওয়া উচিত, মহিলে শিক্ষা একদর্শী হইবার সম্ভাবনা। জার্ম্মাণেরা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী; এবং কি প্রকারে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে সতত যত্নশীল; এমন কি. কোন্ বিষয়ের শিক্ষা কোন্ বালকের মস্তিষ্ক ও শরীরের পক্ষে অধিকতর সুফলপ্রদ তাহাও স্থির করিতে প্রস্তুত; এবং সেইরূপ বিচার করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সাঁতার শিখাইবার ব্যবস্থা আছে ও ছাত্রদিগকে লইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করান হয়। দুর্ব্বল ও অসুস্থ বালকদিগের জন্য ফাঁকা জায়গায় "পার্ক স্কুলের" ব্যবস্থা আছে; মূক, বধির ও অন্ধের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয় আছে; স্বল্প দৃষ্টি, স্বল্প বধির, মৃগি ও অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্ত বালকদিগের জন্য সরকারী স্কুল (helping School) আছে। দরিদ্র বালকদিগকে পঠন কালে সরকারী খরচে আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। বহুস্থানে বালকদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপন করা হইয়াছে; এবং সর্ব্বস্থানে ছাত্রাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়; বালকগণ পরিভ্রমণ কালে সেই সকল স্থানে বিনা মূল্যে বা অতি অল্প মূল্যে রাত্রি কাটায় এবং প্রাতরাশ পায়। "Association for summer Nursing"এর ব্যয়ে ছাত্রদিগকে গ্রীষ্মকালে স্কুলের ছুটী হইলে উপনিবেশ বাসে (holiday colonies) পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের বেতন সামান্য। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, জার্ম্মাণিতে গড়পড়তা নিম্নলিখিত মাসিক বেতন হার ছিল

	নগরে	পল্লীগ্রামে
শিক্ষক—	১৩৮ টাকা	৯০ টাকা
শিক্ষয়ত্রী	৯৬ „	৭৮

জার্ম্মাণ প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন এতদ্দেশীয় ইংরাজ সার্জ্জেণ্টের বেতনের তুল্য। ইদানীন্তন জার্ম্মাণ প্রাথমিক শিক্ষকদিগের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও বেতন হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষকদিগের পেনসনের সুব্যবস্থা আছে; ও শিক্ষক-দিগের বিধবা-পত্নী ও নাবালক পুত্রকন্যাগণকে রাজকোষ হইতে সাহায্য করিবার, জার্ম্মাণ আইন অনুসারে, সুনিয়ম আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অধিকাংশ স্থানে স্থানীয় স্কুল পরিদর্শকগণ স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। সর্ব্বত্র স্কুল শিক্ষার জন্য "স্কুল কমিটি" আছে।

জার্ম্মাণ দেশে প্রায় ৭০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়

উহার ছাত্র সংখ্যা ১০,০০০০০০; শিক্ষক সংখ্যা ১৬৭০০০। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গড়পড়তা প্রতি বালককে শিক্ষা দিবাব বার্ষিক খরচ পড়িয়াছিল ৩৩ টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে শতকরা ২৯ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে বক্রী শতকরা ৭০ টাকা লওয়া হইয়াছিল।

ইউরোপে প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত ৮৫,০০০০০০ পাউণ্ড বার্ষিক ব্যয় করা হয়; এই ব্যয়ের ১/৯ অংশ জার্ম্মাণ, ১/৯ অংশ ফ্রান্স, ১/৯ অংশ ইংলণ্ড, ২/৯ অংশ রুসিয়া বহন করে। ইহার ফলে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা জার্ম্মণিতে শতকরা ০,০০৫, গ্রেট ব্রিটনে ১০৫, ফ্রান্সে ৪০০, রুসিয়ার ৬১০৭।

জার্ম্মাণ আইন অনুসারে জার্ম্মণেরা ৬ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতে বাধ্য। যে সকল বালক বালিকা অর্থাভাবে, ১৪ বৎসর বয়সের পর, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দোকানে, কারখানায়, বা হোটেলে কর্ম্ম গ্রহণ করে, কিংবা পাচিকা বা ধাত্রীর উপজীবিকা গ্রহণ করে, তাহাদেরও শিক্ষার স্কুল আছে। এতদ্ব্যতীত বালক বালিকাদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য, ও বিবিধ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবারও ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কলেজ আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণিতে প্রত্যেক কারখানার (Factory) ডাইরেক্টর তাহার অধীনস্থ অল্পবয়স্ক কারিকরদিগের শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য; তাহাদিগকে উপযুক্ত সুযোগ দিতে ও তাহারা স্কুলে যাইয়া শিক্ষালাভ করে ইহা দেখিতে বাধ্য; এবং কারিকরগণ ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য।

মধ্যম শিক্ষা।

মধ্যম শিক্ষা দুই প্রকার। একের উদ্দেশ্য শিল্প শিক্ষা দেওয়া, অপরের উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করা।

বালকদিগের জন্য Gymnasiumes, Real Gymnasiumes এবং upper Real Schools আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে জিমনেসিয়মের ছাত্রেরা লাটিন ও গ্রীক পড়িত ও তাহাদিগেরই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজাজ্ঞায় উপরি উক্ত তিন শ্রেণীর স্কুলগুলিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের নয়টী শ্রেণী বিভাগ আছে।

Gymnasium-এ লাটিন ও গ্রীকের প্রাধান্য। Real Cymnasium-এ ইংরাজী, ফরাসী, গণিত, বিজ্ঞান ও অল্প পরিমাণে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষা দেওয়া হয়; Upper Real School সমূহে লাটিন গ্রীকের সম্পর্কও নাই, ইংরাজী, ফরাসী, গণিত, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। Upper School সমূহের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Sc, শ্রেণীর মত শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষা হাতে কলমে দেওয়া হয়; প্রতি ছাত্রকে ল্যাবোরেটারীতে কাজ করিতে হয়; ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্-তত্ত্ব শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে ভ্রমণ করিতে হয়; ছাত্রদিগকে গবেষণা করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়—এমন কি, গবেষণা করিবার জন্য আবশ্যক হইলে সপ্তাহে ২।৩ দিন ছাত্রদিগকে ছুটী দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়। অনেক বিদ্যালয়ে Sexual Ethics এবং স্বাস্থ্য নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাত্রেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী। ৫ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, একটী সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ২।১ বৎসর কাল সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবার পর তবে শিক্ষকের পদ পাওয়া যায়। এতদ্দেশের মত যে সে লোক শিক্ষক হইতে পারে না।

জার্ম্মাণ দেশে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বালকদিগের জন্য ১২২৫টী হাইস্কুল ছিল; তাহার ছাত্রসংখ্যা ৩৭২৪৬১৩, শিক্ষক সংখ্যা ১৭,৬৪৩।

জার্ম্মাণিতে মাধ্যমিক শিক্ষার নিমিত্ত ১২০০ বালিকা বিদ্যালয় আছে। স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। বালিকাদিগকে বালকদিগের মত ৯ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়; বালিকারা বালকদিগের মত একই বিষয় পাঠ করে; কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের নিমিত্ত বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। বালিকাদিগকে বিশেষরূপে ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার ফলে জার্ম্মাণ স্ত্রীলোকেরা পরিমিত ব্যয়ে ও সুখস্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্য জীবন কাটায়। কিন্তু জার্ম্মাণ স্ত্রী-শিক্ষার একটী দোষ হইতেছে, যে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে নারী স্বভাব সম্যকরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না; আর একটী দোষ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীলোকের কোনরূপ অধিকার নাই। পুরুষ স্ত্রী-শিক্ষা পরিচালনা করিতেছে; ফলে জার্ম্মাণি এ বিষয়ে ফ্রান্সের নিকট পরাজিত।

Mechanical, Electrical, chemical ও civil Engineering শিক্ষা দিবার জন্য জার্ম্মাণীতে ৩০টী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ১৩টী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক সাড়ে তিন বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২৫টী কৃষি বিদ্যালয় আছে। সমগ্র জার্ম্মাণীতে প্রায় ১২৫টী Middle Department Schools আছে। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য Training School-এর ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষকদিগের জন্য ২৫৯৩, শিক্ষয়িত্রীদিগের জন্য ১৫০ স্কুল আছে।

উচ্চ-শিক্ষা

উচ্চ-শিক্ষার দুই ভাগ। একের উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষা, অপরের উদ্দেশ্য শিল্প শিক্ষা; একের অঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়, অপরের অঙ্গ "Technical universeties."

জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রভেদ। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ন্যায় উহাতে কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না। যদিও জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত, তথাপি তাহাদিগের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করে না। প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয় নিজ নিজ Rector, Dean; professor প্রভৃতি নির্ব্বাচন করে। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা সরকারী বেতনভোগী হইলেও স্বাধীন। জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য জ্ঞান বৃদ্ধি; সেজন্য অধ্যাপকেরা অতি স্বাধীন ভাবে জ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক মতামতের জন্য অধ্যাপকের পদস্খলিত হয় না।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) অধ্যাপক বা প্রোফেসর (২) প্রাইভেট ভোকেণ্ট। অধ্যাপক বেতনভোগী, প্রাইভেট ভোকেণ্ট বিনা বেতনভোগী; অধ্যাপক একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দান করে, প্রাইভেট ভোকেণ্টের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যবস্থা নাই। এতদ্ব্যতীত লেকচারার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি লেকচার সাধারণের জন্য ও কতকগুলি বিশেষ লোকের জন্য। সাধারণ লেকচরে কোনরূপ "ফি" দিতে হয়, কিন্তু private lecture-এর জন্য পাঁচ মার্ক (৩৸০ মাত্র) দিতে হয়।

অধ্যাপকদিগের আয় দুইটী সূত্র হইতে হইয়া থাকে—একটী সরকারী বেতন, দ্বিতীয় ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন। প্রসিয়ায় extra ordinary professor-এর গড়পড়তা বার্ষিক বেতন ৩২১০ মার্ক; এবং সাধারণ প্রোফেসরের (professor in ordinary) গড়পড়তা বার্ষিক বেতন ৫৫০০ মার্ক। এতদ্ব্যতীত সাধারণ অধ্যাপকেরা একটী ভাতা পান ও বাটি ভাড়া পান; তাহাতে তাঁহাদের বার্ষিক আয় প্রায় গড়পড়তা ১২০০০ মার্ক অর্থাৎ মাসিক ২৭৫ টাকা আন্দাজ পড়ে। অধ্যাপকগণ শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের পূর্ণ বেতন পেন্সন পান ও তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ সাহায্য প্রাপ্ত হন। জার্ম্মাণ দেশে অধ্যাপক সংখ্যা অতি অল্প এবং অধ্যাপকের আয় অতি অল্প।

জার্ম্মাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে পরিমাণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণ ছাত্রেরা নিজ নিজ অধ্যাপক বাছিয়া লয় ও তাহাদিগের যে বিষয়ে পড়িবার ইচ্ছা হয় সে বিষয়ে পড়ে; কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা-

বিরুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে তাড়না করে না। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা যে বিষয়ে ইচ্ছা শিক্ষা দান করিতে ও জার্ম্মাণ ছাত্রেরা যে বিষয়ে ইচ্ছা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। জার্ম্মাণ অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন—কেহ কাহাকেও কাহারও কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয় না। ডাক্তার চৌধুরী লিখিয়াছেন ঃ—

"He selects the subjects which he will study, enters his nams for these studies, and introduce himself to his professors who are ever ready to help him in his work."

আমাদের দেশে এক্ষণে "ছাত্র নিবাস" স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। জার্ম্মাণিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য কোনরূপ বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহারা ভদ্র পরিবারে বাস করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করে। ডাক্তার চৌধুরী লিখিয়াছেন ঃ—

"There is no boarding house for the University student; he lodges usually with a private family of the University town. There is no residential University In Germany. The Germans do not like the residential system and are of opinion that it prevents the full and spontanious evoluition of the charecter of the student, for which, constant and unrestrained contact with the outer world is necessary. Those who want to take students as lodgers, send in their names to the Beadle of the University and a student can find very easily accomodations in a good family"

অর্থাৎ জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ছাত্র-নিবাস নাই, তাহারা ভদ্র পরিবারের মধ্যে বাস করে; জার্ম্মাণদিগের ধারণা ছাত্রদিগকে বোর্ডিংএ রাখিলে তাহাদিগের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না। যে সকল ভদ্রলোকেরা ছাত্রদিগকে নিজ আবাসে স্থান দিতে প্রস্তুত তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান ও ছাত্রেরা অতি সহজে সেই সকল ভদ্রপরিবারে স্থান পায়।

জার্ম্মাণ দেশে ছাত্রেরা পীড়া কিংবা আকস্মিক বিপদপাতের নিমিত্ত জীবন বীমা করিয়া রাখে। বৎসরে ২।০র বেশী দিতে হয় না, তৎপরিবর্ত্তে পীড়া হইলে ঔষধ, পথ্য ও সুচিকিৎসা পাওয়া যায়। দুর্ঘটনা ঘটিয়া বিকলাঙ্গ হইলে ১০০০০ মার্ক, মৃত্যু হইলে ১০০০ ক্ষতি পূরণ স্বরূপ পাওয়া যায়।

জার্ম্মাণ দেশে সুশিক্ষার ফলে ছাত্রের শরীর সুস্থ সবল এবং মন উল্লাসিত থাকে; জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ও হৃদয় প্রশস্ত হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১, ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫১৭০০ এবং শিক্ষক-সংখ্যা ছিল ৩৪০৩। শিক্ষকদিগের মধ্যে দর্শন বিভাগে ৬৭০; সাধারণ অধ্যাপক ৩৮৯, প্রাইভেট ভোকেণ্ট ৪৯৩, লেকচরার ১০১ ছিল, চিকিৎসা বিভাগে ২৯১ সাধারণ অধ্যাপক, ২৫৪ অসাধারণ অধ্যাপক, ৫০৪ প্রাইভেট ভোকেণ্ট ও ১১ লেকচারের ছিল, আইন ও রাজনীতি বিভাগে ১৯৪ সাধারণ অধ্যাপক, ৪৭ অসাধারণ অধ্যাপক, ৫১ প্রাইভেট ভোকেণ্ট, ৮ লেকচরের ছিল; শাস্ত্র বিভাগে ১৯৩ সাধারণ অধ্যাপক, ৪৯ প্রাইভেট ভোকেণ্ট ও ৯ লেকচারার ছিল। এতদ্ব্যতীত নৃত্য, গীত, ব্যায়াম প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ৮৪ শিক্ষক ছিল। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচও যথেষ্ট হয়। কেবল প্রসিয়ায় বিশ্ব-বিদ্যালয় বাবত বার্ষিক ২ কোটী মার্ক ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের শতকরা ৭৪ ভাগ গবর্ণমেণ্ট বহন করে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দুই প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় একটী "সরকারী পরীক্ষা" (State Examination), অপরটী "ডাক্তার" উপাধির জন্য পরীক্ষা। সরকারী কার্য্যের জন্য "সরকারী পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। বিদেশীয় ছাত্রগণ যাহারা জার্ম্মাণ দেশে কর্ম্ম গ্রহণ করিবে না তাহাদিগকে "সরকারী পরীক্ষা" পাশ না

করিলেও "ডাক্তারী পরীক্ষা" দিবার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু জার্ম্মাণ ছাত্রদিগকে "সরকারী পরীক্ষা" পাশ না করিলে "ডাক্তারী পরীক্ষা" দিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া ৫ বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে পর, সরকারী পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরীক্ষার কিয়দংশ মৌখিক ও কিয়দংশ লিখিয়া দিতে হয়। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা নিজ নিজ ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাহারা ছাত্রদিগের দোষগুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত থাকেন এবং কতকগুলি প্রশ্নের নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে উত্তর দেওয়ার উপর ছাত্রদিগের পাশ কিম্বা ফেল নির্ভর করে না। যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় কোন বিষয়ে ফেল হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই বিষয়ে ছয় মাস পরে পুনর্পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু এই ছয় মাস কাল সে ইচ্ছা করিলে উচ্চতর পরীক্ষার জন্য পাঠ করিতে পারে। ছাত্রেরা হাতে-কলমে কতদূর শিক্ষা করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে ২ ঘণ্টা কিংবা ৩ ঘণ্টার মধ্যে একটা practical work করিতে হয় না; তাহাদিগকে কোন বিষয়ে গবেষণা করিতে দেওয়া হয়, সময়ের কোন নির্দ্দেশ থাকে না; যাহার যতক্ষণ প্রয়োজন হয় সে ততক্ষণ ধরিয়া গবেষণা করিয়া তাহার ফল জানাইয়া হাতে-কলমে পরীক্ষা দেয়। হাতে-কলমে পরীক্ষা পাশ করিলে তবে মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারা যায়। অধ্যাপকগণ ছাত্রেরা ল্যাবোরেটরীতে কিরূপ কার্য্য করে তাহা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদিগের সম্বৎসরের কার্য্যকলাপের পরিচয় গ্রহণ করেন।

Doctor of philisophy উপাধি লাভ করিবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অন্যূন তিন বৎসর যে কোন জার্ম্মাণ বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। পরীক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; ছাত্র ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিতে পারে; কিন্তু আবেদনের সহিত এমন একটী রচনা পাঠাইতে হয় যাহাতে তাহার যে কোন বিষয়ে হউক গবেষণা করিবার শক্তি আছে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যদি রচনা মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাধারণ্যে পরীক্ষা করিবার জন্য দিন ধার্য্য হয়; এবং সে যে বিষয়ে রচনা লিখিয়াছে তদ্ব্যতীত অপর দুইটী বিষয়ে পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষা মৌখিক ও সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে গ্রহণ করা হয়। চারিজন অধ্যাপক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পরে সাধারণের সহিত তর্ক করিবার জন্য দিন ধার্য্য হয় এবং সে সময়ে অধ্যাপকগণের উপস্থিতিতে সাধারণের সহিত তর্ক বিতণ্ডা করিতে হয়। এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, একটী কন্‌ভোকেশন আহূত হয় এবং তথায় তাহাকে একটী বক্তৃতা করিতে হয় এবং তৎপরে তাহাকে "ডাক্তার" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ডাক্তারি পরীক্ষার "ফি" ৩০০ হইতে ৩৫০ মার্ক পর্য্যন্ত। যদ্যপি কোন ছাত্র পরীক্ষায় বিফল হয় তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধেক "ফি" ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণ দেশে উচ্চশিক্ষার ইতিহাস অতি চমৎকার। ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ চার্লস প্রাগ সহরে প্রথম জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তখন এস্থানে কেবল লাটিন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। তৎপরে ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায়, ১৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হেডেলবার্গে, ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলোনে, এবং ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে এরফ্রাটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্থান ছিল না; এবং কি প্রকারে জ্ঞান রাজ্যের পরিধি বিস্তার করা যাইতে পারে তাহারও চেষ্টা হইত না। ন্যায়ের কচকচি, দর্শনের বিতণ্ডা ও বক্তৃতার লহরী তৎকালীন বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ মুখরিত করিয়া রাখিত। এতদ্ পরে উরসবার্গ, লিপজিক, রসটক, গ্রীফস্‌ওয়াল্‌ড প্রভৃতি স্থানে এবং তাহারও পরে ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রিবার্গে, ১৪৬৩ খৃঃ অব্দে ইনগলসট্যাডে, ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে টিউবিলজেলে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে classics-এর চর্চ্চা হইত। Reformation-এর পর হইতে জার্ম্মাণীতে জ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; নূতন নূতন প্রায় ২২টী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়; শিক্ষকদিগের মাসিক বেতন বন্দোবস্ত হয়;

নগণ্য জার্ম্মাণ ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা জার্ম্মাণ ভাষাকে হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন; লাটিন ভাষায় শিক্ষার আদান প্রদান চলিত; ফলতঃ মাতৃভাষার প্রতি জার্ম্মাণদিগের বীতরাগ বশতঃ উন্নতির স্রোতও প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু যেদিন হইতে লায়েবিনিজ টোমাসিয়ান প্রভৃতি ধীমান ব্যক্তিগণ জার্ম্মাণ ভাষায় জার্ম্মাণদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, সেই সময় হইতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত চর্চ্চা আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জার্ম্মাণিতে শিক্ষার আদান প্রদান সম্পূর্ণ স্বাধীন; গবর্ণমেণ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না। লেকচারার কিংবা প্রাইভেট ভোকেণ্ট নিযুক্ত করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয় না; যদিও অধ্যাপকেরা সরকারী বেতনভোগী তথাপি তাহাদিগের নিয়োগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সেনেটের মতামতের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক শিক্ষাদান বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনি কোন বিষয়ে ও কি প্রকারে শিক্ষা দিবেন তাহা কেহ তাহাকে উপদেশ দেন না। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা নাই। ছাত্রেরা অধ্যাপকের লেকচারের উপর নির্ভর করে।

এতদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা তাহাদের বেতন হার অতি অল্প বলিয়া Public service commission-এর নিকট যথেষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণীতে সাধারণ অধ্যাপকেরা (professor in ordinary) গড়পড়তা মাসিক ৪৫০ মার্ক (৩৩৮ টাকা) পান; অসাধারণ অধ্যাপকের বেতন ২৫৩ মার্ক (১৮৮ টাকা); প্রাইভেট ভোকেণ্ট কোন বেতন পান না।

এতদ্দেশে যে সে "অধ্যাপক" বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়; জার্ম্মানিতে তাহা সম্ভব নহে। বহুকাল ধরিয়া প্রাইভেট ভোকেণ্টের কার্য্য করিয়া গবেষণার বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলে অধ্যাপক পদ পাইবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার চৌধুরী বলেন:—

বাহ্য চাকচিক্য কিম্বা ছাত্র-সংখ্যার উপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব নির্ভর করে না; অধ্যাপক ও ছাত্রের জ্ঞানদেবীর আরাধনার উপর যশঃ নির্ভর করে। পরীক্ষার যশ ও উপাধির উপর কাহারও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় নির্ভর করে না; কোন্ গুরুর নিকট কোন্ ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার উপর তাহার কতদূর বিদ্যালাভ হইয়াছে আভাষ পাওয়া যায়। উপাধি গ্রহণ না করিয়াও, পরীক্ষা না দিয়াও অতি উচ্চ শিক্ষা জার্ম্মাণ দেশে পাওয়া যাইতে পারে।

জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালকদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। School Final পরীক্ষায় সার্টিফিকেটের সহিত দুরবস্থার পরিচায়ক সার্টিফিকেট দিতে হয়। দরিদ্র বালকদিগের জন্য "ছাত্র-নিবাস" আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত জার্ম্মাণিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

পৃথিবীর শিল্পবিষয়ক বিদ্যালয় মধ্যে জার্ম্মানির "Tachnische Hochschulen" সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক একটী Hochschulen এক একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়। শিল্পবিদ্যার শিক্ষা যেরূপ জার্ম্মাণিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে ব্যবসাবাণিজ্যতেও তদ্রূপ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিল্প বিদ্যালয়গুলি Doctor of Engineering উপাধি দিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

জার্ম্মাণির শিল্প, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির একমাত্র কারণ উক্ত শিল্পবিষয়ক বিদ্যালয়গুলি। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা যতদূর সম্ভব হাতে-কলমে দেওয়া হয়; শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ইহার ফলে সেমলিজ, নরেমবার্গ এসেন, লিপজিক, জেনা, বার্লিন প্রভৃতি জার্ম্মাণ নগরগুলি পৃথিবীর মধ্যে এক একটি বাণিজ্যের সুবৃহৎ কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

জার্ম্মাণিতে শিল্প শিক্ষা বিষয়ে স্কুল ও কারখানার মধ্যে যথেষ্ট আদান প্রদান আছে; পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি আছে। কারখানা হইতে ছাত্রগণ যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন; যদি কোন দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে কোন ছাত্র পরীক্ষা করিতে চান তাহা হইলে

কোন কারখানায় আবেদন করিলে তিনি অচিরে সেই সাহায্য প্রাপ্ত হন। যদি কোন কারখানার অধ্যক্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত ল্যাবোরেটারী স্থাপন করিতে চান, তাহা হইলে সরকারের নিকট আবেদন করিলে সরকারের সাহায্যে অনায়াসে একটী অতি উত্তম ল্যাবোরেটারী স্থাপন করিতে পারেন।

জার্ম্মাণিতে শিল্প শিক্ষার দ্বার অবারিত; যে কেহ ইচ্ছা করিলে জার্ম্মান ল্যাবোরেটারীতে শিক্ষা করিতে পারে; কোনরূপ বাধা বিপত্তি নাই। অধ্যাপক লেবিক এই অবাধ শিক্ষা প্রথার প্রবর্ত্তক। এই অবাধ শিক্ষার ফলে জার্ম্মাণ দেশে শত শত উত্তম বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত ও শত শত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে শিল্পবিদ্যালয়ে দুই প্রকার পরীক্ষা আছে; দুই বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষা লওয়া হয় এবং চার বৎসর বিদ্যালয়ে ও এক বৎসর কোন কারখানায় শিক্ষার পর অন্য উচ্চতর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এক্ষণে জার্ম্মাণিতে বিদেশীয়গণকে শিল্পশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে; এবং কতক শিল্প বিদ্যালয়ে বিদেশীয়দিগের প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

জার্ম্মাণীতে ১১টী টেকনিকাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১০০০ অধ্যাপক ও ১৩৫০০ ছাত্র আছে; এবং এই ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় ৩০৯০ বিদেশীয়।

শিল্পবিষয়ক অধ্যাপকদিগের সহিত অনেক কারখানার সম্পর্ক থাকে এবং তজ্জন্য ছাত্রদিগকে চাকরীর জন্য উমেদারী করিতে হয় না; শিক্ষালাভ শেষ হইলে অধ্যাপকগণ কোন না কোন কারখানায় নিজ নিজ ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করিয়া দেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় আর্য্যদিগের স্বর্গ-রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান

(উত্তরকুরুবাসের শেষ প্রমাণ)

স্বর্গরাজ্য আকাশস্থিত পরমধাম ইহাই স্বর্গসম্বন্ধে শাস্ত্র বর্ণনার মূলমর্ম্ম। আমাদের প্রচলিত সংস্কার এই মর্ম্মের দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। এই আকাশধাম আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর নহে বলিয়া কেবল কল্পনারই বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কল্পনার বিষয় হইলেও ইহাকে আমরা সম্পূর্ণ অমূলক মনে করিতে পারি না। কারণ প্রকৃত বিষয়কে ভিত্তি করিয়াই কল্পনা আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বর্গ-কল্পনার মূলে কোন্ প্রকৃত বিষয় বর্ত্তমান্ তাহারই অনুসন্ধানে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইব।

স্বর্গ যে আদিতে আকাশস্থিত স্থান বিশেষ ছিল না পরন্তু মর্ত্ত্যেরই ভৌগোলিক স্থান বিশেষ ছিল ইহাই আমাদের মত। ইহার প্রমাণের জন্য প্রথমে আমরা কৈলাসের সম্বন্ধেই বিবেচনা করিব। কৈলাস শিবলোকের নাম। সুতরাং ইহা যে স্বর্গস্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈলাসের শাস্ত্র বর্ণনা পাঠ করিলে ইহাকে হিমালয়েরই শিখর বিশেষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"সব্যে হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।" ১

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৫১ অধ্যায়।

'সূত বলিলেন, হিমালয় শৈলের বাম পার্শ্বে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত।'

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভৌগোলিক আধুনিক কৈলাসের অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই কৈলাস কেন যে স্বর্গলোক রূপে কল্পিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এখানে আমরা সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"In picturesque beauty, says H. Strachey, Kailas far surpasses the big Gurla or any other of the Indian Himalaya that I have seen it is full of majesty,—a King of mountains."

The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India.

"বৃহৎ গুর্লা বা অন্য কোন ভারতীয় হিমালয় প্রদেশ যাহা আমি দর্শন করিয়াছি কৈলাস পর্ব্বত বিচিত্র সৌন্দর্য্য বিষয়ে ইহাদিগকে অতিমাত্রায়ই অতিক্রম করে। ইহা মহিমাময়—ইহা পর্ব্বত সকলের রাজা।"

এই বর্ণনা আমাদিগকে ভারতচন্দ্রের বর্ণনাই স্মরণ করাইয়া দেয় :—

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।

কৈলাসের বর্ত্তমান কিউন্‌লান্ (Kiun-lun) নাম কৈলাস নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

পার্ব্বতী হিমালয়ের কন্যা, শিব হিমালয়ের জামাতা। সুতরাং হিমালয়ের সহিত কেবল শিবলোকেরই যে সম্বন্ধ তাহা নহে প্রত্যুত শিবলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শিবদুর্গারও সম্বন্ধ। গৌরীশঙ্কর শিখর নামে হিমালয়ে যে শিবদুর্গার প্রধান অধিষ্ঠান ছিল তাহার স্পষ্ট নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে স্বর্গ ও স্বর্গাধিষ্ঠাতৃ দেবতার আমরা মর্ত্ত্যের সহিত যোগেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি।

মহাভারতের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণের জন্য মহাপ্রস্থান করিয়া হিমালয়ের উত্তরেই স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শিব ও দুর্গা তান্ত্রিক দেবতা বলিয়া ইহাদের বিকাশ সর্ব্বশেষ হওয়াতে ইহাদের অধিষ্ঠান স্থানরূপ শিবলোকের কল্পনাও সর্ব্বশেষে হইয়াছে। তাহাতেই ইহার মধ্যে ভৌগোলিক নিদর্শন যেরূপ স্পষ্টতর লক্ষিত অপর কোন দেবলোকের ভৌগোলিক নিদর্শন তেমন স্পষ্টতর লক্ষিত নহে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তির আমরা এই যে ক্রম প্রাপ্ত হই, ইহা তাঁহাদের বিকাশের ক্রম বলিয়াও বুঝিতে হইবে। অতএব বিষ্ণুর বিকাশ যেরূপ শিবের পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্রূপ বিষ্ণুলোকও যে শিবলোকেরই সন্নিকটবর্ত্তী তাহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়।

"কৈলাস" যেমন "শিবলোক" তৎসন্নিহিত কাশ্মীরও যে তদ্রূপ বিষ্ণুলোক তাহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 'কৈলাস' নামের লস-ধাতু যেমন শোভার অর্থ প্রকাশ করে—'কাশ্মীর' নামের কাশ-ধাতুও তেমনই শোভার অর্থই প্রকাশ করে। অতুলনীয় অশেষ শোভার আধার বলিয়াই ইহাদের এইরূপ সৌন্দর্য্যপ্রকাশক নাম হইয়াছে। কাশ্মীর যে, ভূ স্বর্গনামে পরিচিত তাহাতেও ইহাকে স্বর্গরূপে কল্পিত দেখা যায়।

সম্ভবতঃ এখানে আসিয়াই আর্য্যগণ প্রথম সুদৃঢ়রূপে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হন। এখানে আসিয়া শত্রুভয় হইতে নিশ্চিন্ত হন বলিয়াই ইহাকে তাঁহারা 'বৈকুণ্ঠ' নামে আখ্যাত করেন। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের যোগার্থ 'বিগতা কুণ্ঠা উৎকণ্ঠা অত্র'। উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ বিগত হয় এইখানে। কাশ্মীরের রাজধানীর বিষ্ণু পত্নী লক্ষ্মীর "শ্রীনামে" যে 'শ্রীনগর' নাম পাওয়া যায় তাহাতেও ইহা বিষ্ণুলোকের পুরী বলিয়াই প্রমাণিত হয়। বিষ্ণুলোকের অপর এক নাম "গোলোক ধাম।" সম্ভবতঃ কাশ্মীরেই আর্য্যগণ বিশেষরূপে গোপালন করিতে আরম্ভ করেন। পুরাণে সুরভিকেই গোজাতির আদি জননীরূপে বর্ণিত দেখা যায় এবং গোলোকেই ইহার জন্মের কথা পাওয়া যায়, যথা :—

"গবামধিষ্ঠাতৃদেবী গবামাদ্যা গবাং প্রসূঃ।
গবাং প্রধানা সুরভী গোলোকে সা সমুদ্ভবা॥"
শব্দকল্পদ্রুমধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সুরভ্যুখ্যান ৪৪ অধ্যায়।

কাশ্মীরের নিকটে যে চমরী নামক বিশেষ জাতীয় গাভী দৃষ্ট হয় সুরভি সেই বিশেষ গাভী জাতিকেই বুঝায় বলিয়া বোধ হয়। ইহার বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইতে ইহা যে স্বর্গীয় গাভীরূপে বিবেচিত হইবে, তাহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর।

বৈকুণ্ঠের নৈঋতে সারস্বত লোকের উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়, যথা :—

"প্রাচ্যাং বৈকুণ্ঠলোকস্য বাসুদেবস্য মন্দিরম্।
আগ্নেয্যাং লক্ষ্মীলোকস্তু যাম্যাং সঙ্কর্ষণালয়ঃ॥
সারস্বতস্তু নৈঋত্যাং প্রাদ্যুম্নঃ পশ্চিমে তথা।"
শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণম্।

বৈদিক গ্রন্থ হইতে সরস্বতী নদী কাশ্মীর দেশে প্রবাহিত বলিয়া জানা যায়। ইহাতেও কাশ্মীর দেশই যে বিষ্ণুলোকের স্থান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর বিকাশ ইন্দ্রের বিকাশের পর হয়। সুতরাং বিষ্ণুলোকের ঊর্দ্ধদেশেই যে ইন্দ্রলোকের স্থান হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই ইন্দ্রলোকের স্থান আমাদিগের নিকট বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থান বলিয়াই মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ক্যানিংহাম (Cunningham) আফ্‌গানি স্থানের প্রধান নগর কাবুলের প্রাচীন নাম যে "ঊর্দ্ধস্থান" আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমানকেই সপ্রমাণ করে। ইন্দ্রলোকের মধ্যে নন্দনকাননই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ স্থান। আফ্‌গানিস্থানে যে সমস্ত সুমিষ্ট ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোথায়ও সেরূপ সুমিষ্ট ফলের গাছ নাই। সুতরাং এই সমস্ত অপূর্ব্ব ফলের গাছই যে আফ্‌গানিস্থানকে স্বর্গকাননে পরিণত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? আফ্‌গানিস্থানের প্রধান দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) ফল যে "অমৃত ফল" নামে অভিহিত হয়, তাহাতেও ইহাকে স্বর্গের ফল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন ভূগোলে আমরা 'উদ্যান' বলিয়া একটী স্থানের নাম প্রাপ্ত হই। ইহার সংস্থান এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে :—

"Udyan was situated to the North of Peshwar on the Swat river but it is probable that it covered the whole hill-region South of the Hindukush and the

Dard country from Chitral to Indus." The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by Nandolal Dey p. 96.

উপরি উক্ত বর্ণনায় 'উদ্যান' পেশোয়ারের উত্তর হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ইহাতে 'উদ্যান' ইন্দ্রোদ্যান নন্দনকাননেরই নামান্তর বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

আর্য্যজাতির ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতের আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পরিত্যাগের পরই তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্র উপাসনার উৎপত্তি হয়। সুতরাং হিন্দুকুশের দক্ষিণ দেশই যে বিশেষরূপে ইন্দ্রের অধিষ্ঠিত স্থান হইবে তাহা আনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পুরাণে আমরা যে হরিবর্ষের নাম প্রাপ্ত হই তাহা হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ পূর্ব্বোক্ত দেশ বলিয়াই বোধ হয়। হরি শব্দের এক অর্থ ইন্দ্র। কালিদাস রঘুবংশে এই অর্থে হরি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যথা—

"হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ॥"

৪৩—য়ক্‌বংশম্—৩য় সর্গঃ।

"কপিলবর্ণ অশ্বের দ্বারা তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়া।"

হরিবর্ষ সুতরাং আমাদের নিকট হরি বা ইন্দ্রের বর্ষ বা স্থান বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুকুশের দক্ষিণেই আফ্‌গানি স্থান অবস্থিত বলিয়া এই আফ্‌গানিস্থানকেই হরিবর্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রের নন্দনকাননের প্রধান পাঁচটী বৃক্ষই পঞ্চ দেবতরু বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা :—

"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃকল্প বৃক্ষশ্চ পুংসিবা হরিচন্দনম্॥"

পঞ্চ দেবতরুর মধ্যে ইন্দ্রের হরিনামানুসারেই 'হরিচন্দন" নাম হইয়াছে এই জন্যই ইহার অপর নাম ইন্দ্রচন্দনও পাওয়া যায়।

বল্‌খ বা বাহ্লিক আফ্‌গানিস্থানেরই অন্তর্গত। বাহ্লিক এক সময়ে উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা হইতেই অশ্বোত্তম উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের বাহন হইয়া থাকিবে। অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা যেমন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত গজও তেমনি তাঁহার বাহন। সম্ভবতঃ অশ্বের ন্যায় গজও এই সময়ে আর্য্যদিগের দ্বারা পালিত হইত। আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত গজনি নামক স্থানে গজ রক্ষিত হইত বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রের পুরী "অমরাবতী" নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে জালালাবাদের প্রাচীন নাম অমরাবতী পাওয়া যায়। "প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভৌগলিক অভিধান" নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান জালালাবাদের প্রাচীন নাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

'Jalalabad.....Nagarhara, at the confluence of the Surkha or Surkhund and Kabul rivers. It is also called Amaravati in one of the Jatakas,"

The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India (by Nandalal Dey of the Bengal Judicial Service) Appendix p. 36.

আফ্‌গানিস্থানকে যে আমরা ইন্দ্রের হরিনামানুসারে "হরিবর্ষ" বলিয়া অনুমান করিয়াছি ইহার অন্তর্গত হিরাট্ নামক স্থানে সেই হরিনামেরই নিদর্শন বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়।

"পুরাণে হরিবর্ষের" যেরূপ বর্ণনা পাওয়া

যায় তাহাতে ইহাকে দেবস্থান বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় ; যথা—

"অতঃপরং কিম্পুরুষাদ্ধরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
মহারজত সঙ্কাশা জায়ন্তে তত্রমানবাঃ॥ ৮
দেবলোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্॥" ৯

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫০ অধ্যায়।

"ইহার পর আমি হরিবর্ষের কথা কহিতেছি। এই হরিবর্ষে রজতসম প্রভাবিশিষ্ট মনুষ্যগণ জন্মিয়া থাকে। এখানকার সকল মনুষ্যই দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট দেবাকৃতি ও দেবসম দীপ্তিমান্। ইহারা সকলেই ইক্ষুরস পান করে।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

এখানে হরিবর্ষের লোকদিগকে যে দেবলোক হইতে চ্যুত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে হিন্দুকুশ হইতে ভারতাভিমুখে অগ্রসর আর্য্যগণই যে লক্ষিত হইতেছে তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। হরিবর্ষের লোক সকল রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় ইহারা যে উত্তরকুরুবাসী প্রকৃত আর্য্যজাতি তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রতীয়মান হয়। ইহাদের ইক্ষুরস পানের কথায় আফ্‌গানিস্থানের সুস্বাদু ফল সকলের সুমিষ্ট রসপানের আভাসই আমরা পাইতেছি।

ইন্দ্রলোকের উপরে ব্রহ্মলোকের স্থান। ইন্দ্রলোক যখন হরিবর্ষ বা আফগানিস্থান বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে—তখন হরিবর্ষের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষের যে বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায় তাহাই ব্রহ্মলোক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। এস্থলে আমরা ইলাবৃত বর্ষের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মধ্যমং সন্নয়া প্রোক্তং নাম্নাবর্ষমিলাবৃতম্। ১১
ন তত্র সূর্য্য স্তপতি নচজীর্য্যন্তি মানবাঃ।
চন্দ্র সূর্য্যা সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে॥ ১২
পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপ্রভাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্র সুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ১৩
জম্বুফলরসাহারা হ্যনিষ্যন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
মনস্বিনোভুক্তভোগাঃ সৎকর্ম্মফলভোগিনঃ॥ ১৪
দেবলোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ।
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণান্তে নরোত্তমাঃ॥ ১৫
আয়ুঃ প্রমাণং জীবন্তি তেতুবর্ষেত্বিলাবৃতে।
মেরোঃ প্রতিদিশং যচ্চ নবসহস্র বিস্তৃতে॥ ১৬

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫০ অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে যে, সকলের মধ্যবর্ত্তী বর্ষের কথা কহিয়াছি, তাহা "ইলাবৃত" নামে খ্যাত। এখানে সূর্য্যের তাপ নাই ; চন্দ্র, সূর্য্য বা নক্ষত্র কখনও উদিত হয় না। এখনকার মনুষ্যেরা সকলেই পদ্মপলাশবৎ অক্ষি বিশিষ্ট, পদ্মবর্ণ, পদ্মবৎ সুগন্ধবিশিষ্ট ও উদারচিত্ত। ইহারা সকলেই সৎকর্ম্ম বলে জম্বুফলরস পান করিয়া নানা সুখভোগ করিয়া থাকে। দেবলোক হইতে বিচ্যুত শ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরা এখানে জন্ম লইয়া অজীর্ণ কলেবর ও জরামরণ বিহীন হইয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এই বর্ষ মেরুশৈলের চারি দিকে বিরাজমান। মেরুর প্রত্যেক দিকে ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। —বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

উদ্ধৃতবর্ণনা হইতে ইলাবৃত যে মেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বর্ষ তাহাই জানিতে পারা যায়। এই বর্ষে সূর্য্যোদয় হয় না বা সূর্য্যের উত্তাপ অনুভূত হয় না ইত্যাদি বৃত্তান্ত হইতে বর্ত্তমান মেরু-প্রদেশে যেরূপ ছয় মাস সূর্য্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে এবং অপর ছয় মাস সূর্য্য উদিত হইলেও বহুদূরবর্ত্তী থাকায় ইহার প্রখরতা অনুভূত হয় না—ইলাবৃত বর্ষেও যে তদ্রূপই হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। উত্তরকুরু, মেরু সন্নিহিত বলিয়া ইহা যে ইলাবৃতেরই অন্তর্গত ছিল তাহাই সম্পূর্ণ

সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যগণ আদি মেরুস্থান হইতে নূতন বাসস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়াতেই যে তাঁহারা ইলাবৃতের স্বর্গভ্রষ্ট অধিবাসীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। ইলাবৃতের লোক সকল অজয় অমররূপে উল্লিখিত হওয়ায় ইহাদিগের মধ্যে যে দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে, ইহাও সহজ বোধ্য।

মেরুর দক্ষিণবর্ত্তী ইলাবৃত বা উত্তরকুরুই যে ব্রহ্মলোক এক্ষণে আমরা তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইব। প্রথমেই আমরা "ইলাবৃত" শব্দের মূলার্থ নিরূপণের চেষ্টা করিব। "ইলাবৃত" শব্দ ইলা ও বৃত এই দুই শব্দযোগে নিষ্পন্ন। ইলা শব্দের অর্থ 'বাক্য,' বৃত শব্দের অর্থ 'বেষ্টিত'। সুতরাং ইলাবৃত শব্দের অর্থ বাক্য দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু দেশ, বাক্যদ্বারা বেষ্টিত হওয়ার অর্থ পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হয় না। ইলা শব্দের যে দুইটী রূপান্তর আছে তাহাদের সহিত যোগ করিয়া ইলাবৃতের ব্যাখা করিলে ইহার সদর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

"রলয়োরভেদঃ"—'র' ও 'ল' অভিন্ন এই ন্যায়ে যেমন ইলা শব্দের রূপান্তর ইরা পাওয়া যায়—তেমনই 'ড়লয়োরভেদঃ' এই ন্যায়ে ইলা শব্দের রূপান্তর 'ইড়াও' পাওয়া যায়। ইলা শব্দের ন্যায় ইরা শব্দের অর্থ ও বাক্য এবং ইড়া শব্দেরও অর্থ বাক্যেরই অনুরূপ 'স্তুতি।' ইরা শব্দের এক অর্থ 'সরস্বতী'ও দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী আমরা বৈদিক এক নদীর নামও প্রাপ্ত হই। ইরা শব্দের যে এক অর্থ জল আছে, (১) যাহা ইরাবতী শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেও নদী অর্থ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ইলাবৃত আমাদের নিকট সরস্বতী বেষ্টিত দেশ বলিয়াই বোধ হয়। সরস্বতীর তীরে আর্য্যগণ স্তুতি করিয়া দেবতাদিগের উপাসনা করিতেন। ইড়া বা ইলা শব্দে এই দেবস্তুতির অর্থই পাওয়া যায়। বেদে স্তুতি বুঝাইতে 'ব্রহ্ম' শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং "ইলাবৃত" স্তুতি বা ব্রহ্মবহুল দেশই হয়। স্তুতিবাচক ব্রহ্ম হইতেই দেবরূপ 'ব্রহ্মা' ও ব্রহ্মের বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইলাবৃত ব্রহ্ম বা স্তুতির দেশ হইতে যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম দেবতার দেশ হইবে তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়। মনুসংহিতায় আমরা আর্য্যদিগের প্রথম অধিষ্ঠানের যে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নাম প্রাপ্ত হই তাহা আমাদিগের নিকট 'ইলাবৃত' বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তের সংস্থান মনুসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

"সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থলের দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।"

ইলাবৃত যেরূপ স্বর্গভ্রষ্ট লোকদিগের বাসস্থান বলিয়া স্বর্গতুল্যরূপে পুরাণে উক্ত হইয়াছে এস্থলে ব্রহ্মাবর্ত্তকে দেবনির্ম্মিত দেশ বলাতে তাহাও তদ্রূপ স্বর্গস্থ স্থানই হইতেছে। সরস্বতী নদী মেরু সন্নিহিত প্রদেশে প্রবাহিত বলিয়াই পুরাতত্ত্ব বিদ্‌দিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। (২)

(১) "ইরা ভূবাক্ সুরাপ্স স্যাৎ।"

(২) বিশ্বকোষ।

সুতরাং সরস্বতী নদী বেষ্টিত স্থানই ইলাবৃত বা ব্রহ্মাবর্ত্ত তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

"ব্রহ্মাবর্ত্ত" যেরূপ 'দেবনির্ম্মিত দেশ' রূপে বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে ইহা যে "ব্রহ্মলোক" বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে অসম্ভাবনা কিছুই নাই। ব্রহ্মকুণ্ড বা ব্রহ্মার হস্তমুক্ত হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গঙ্গার প্রকৃত উৎপত্তিস্থান মধ্য আসিয়ার বর্ত্তমান সরীকূলহ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার পৌরাণিক নাম বিন্দু-সরোবর। ইহাতে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মলোক যে এক সময়ে মেরু হইতে মধ্য আসিয়ার বিন্দু-সরোবর বা সরীকূল হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মার সহিত সরস্বতীর যে যোগ দেখা যায় ব্রহ্মাবর্ত্তের সহিত সরস্বতী নদীর যোগে তাহার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

ইলাবৃতের পরই মেরু। এই মেরুদেশ সুমেরু পর্ব্বতের উপর অবস্থিত বলিয়া 'সুমেরু' নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। এই মেরু আর্য্যদিগের মূলস্থান বলিয়া ইহা 'সুরালয়' বা স্বর্গ নামে বিদিত হইয়াছে যথা—

"মেরুঃ সুমেরুর্হমাদ্রী রত্নসানুঃ সুরালয়ঃ॥"
অমরকোষ।

বেদের দেবগণের প্রথম বিকাশও উপাসনা এই সুমেরুতেই হয় বলিয়া ইহা প্রথম দেবস্থানরূপেই সুরালয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া সুমেরুতেই যে স্বর্গের প্রথম কল্পনা হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ক্রমে আর্য্যগণ সুমেরু হইতে যতই দক্ষিণে সরিয়া আসিয়াছেন ততই স্বর্গস্থান দক্ষিণে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে কৈলাসে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যদিগের বিশাল স্বর্গরাজ্য যে সুমেরু হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত প্রসারিত তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই বিশাল ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক প্রদেশই ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক প্রভৃতি দেবলোকরূপে বিভক্ত হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির বিকাশ হইতে এই প্রধান তিন দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়াই স্বর্গরাজ্যের এক নাম "ত্রিদিব" হইয়াছে।

শিবলোকই স্বর্গের শেষলোক বলিয়া হিমালয়ে ইহার ভৌগোলিক সংস্থান সুস্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হয়। হিমালয়ের এক অংশের নাম "রুদ্র-হিমালয়" পাওয়া যায়। ইহার পাঁচটি শিখরের নাম রুদ্র-হিমালয়, ব্রহ্মপুরী, বিষ্ণুপুরী, উদ্গোরীকান্ত, ও স্বর্গারোহিণী।—

The Rudra-Himalaya has five principal peaks called Rudra-Himalaya (the eastern peak), Burram-poori, Bissen-poori, Oodguri-kanta, and Swarga-rohini (the western and nearest peak). These form a sort of semicircular hollow of very considerable extent filled with eternal snow, from the gradual dissolution of the lower parts of which the principl part of the stream is generated. (Frazer's Himalaya Mountains) The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by Nundolal Dey.

এখানের বর্ণনায় জানিতে পারা যায়

যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি শিখর বিশাল অর্দ্ধবৃত্তাকার ও চিরতুষারাচ্ছন্ন এবং ইহাদের নিম্নদেশের বরফ গলিয়াই গঙ্গার প্রধান স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গা নদী শিবের জটা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে এখানেই আমরা তাহার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছি।

রুদ্র-হিমালয়ের পঞ্চশিখরের নাম হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিবলোক শেষ স্বর্গলোক বলিয়া এবং হিমালয়ে ইহার অবস্থিতি বলিয়া হিমালয়েই রুদ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক এবং স্বর্গলোক, সমস্ত লোকেরই একত্র সমাবেশ হইয়া ইহাকেই সংক্ষিপ্ত স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছে। এমন কি সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত হিমালয়েই কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রুদ্রহিমালয়ের গঙ্গাবতরণস্থানেরই আমরা 'সুমেরু পর্ব্বত' বলিয়া নাম করণ দেখিতে পাই। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভৌগোলিক অভিধান" গ্রন্থে সুমেরু পর্ব্বত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

Sumeru Parvata—The Rudra Himalaya where the river Ganges has got its source.

এই প্রকারে যে মেরু বা সুমেরুকে আমরা প্রথম স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছি—তাহা অবশেষে হিমালয়েই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উত্তর দিকের সহিত আর্য্যদিগের সংস্রবরহিত হওয়াতেই পরিশেষে তাঁহারা সমগ্র স্বর্গরাজ্য হিমালয়েই কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে হিমালয়ে যেমন আমরা শিবলোকের প্রকৃত ভৌগোলিক সংস্থানের প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি তেমনই ইহাতে অপর স্বর্গলোকের ভৌগোলিক সংস্থানের প্রকৃত সন্ধানও প্রাপ্ত হইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গড়ের মাঠ

(৩)

ফোর্ট উইলিয়মের প্লাসি গেটের ধারে লর্ড ডফেরিনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১৮৮৪—৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে ইনি মার্কুইস্ উপাধি লাভ করেন। ভারতের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সাহায্য কল্পে যে একটি ফণ্ড্ বর্ত্তমান আছে তাহার প্রতিষ্ঠাতা লেডি ডফেরিন। লর্ড ডফেরিনের শেষ জীবন সুখে কাটে নাই। তাঁর বড় ছেলে আর্ল অফ্ আভা (Earl of Ava) দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন;—এ ছাড়া তিনি লণ্ডন এবং গ্লোব ফাইন্যান্স কর্পোরেসনের (London & Glove Finance Corporation) সভাপতি হওয়ার অল্পদিন পরেই এ সভার অস্তিত্ব লোপ পাওয়ায় তাঁকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছিল।

রেড রোড দিয়ে, সেখান হতে ফেরবার পথে অশ্বোপরি ফিল্ড মার্শেল আর্ল

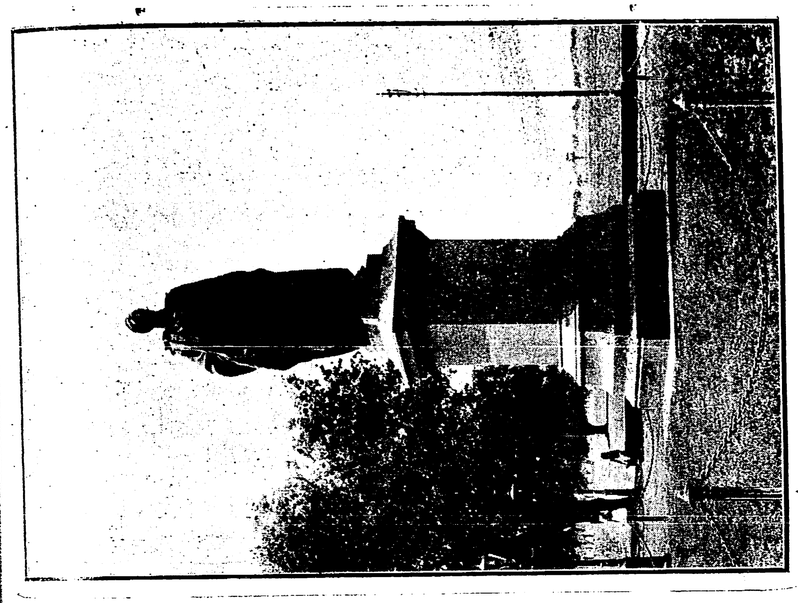

মার্কুইস্ অফ্ ডফেরিন

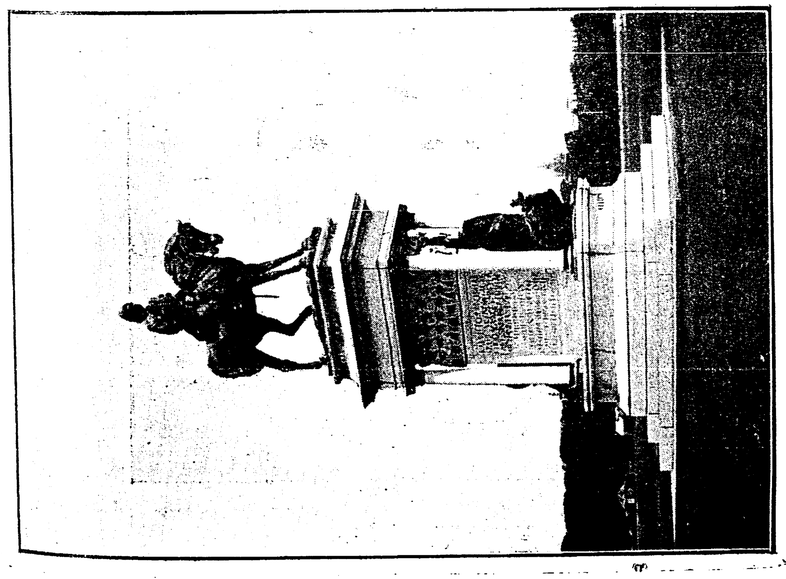

আর্ল রবার্টস্
(ফিল্ড মার্শেল)

রবার্টস্ এবং মা ইস্ অফ ল্যান্সডাউনের প্রস্তর মূর্ত্তি মুখোমুখি সংস্থাপিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর্ল রবার্টস্ ভারতের সেনানায়ক ছিলেন। ভারত-সাম্রাজ্যকে ইনি নূতন রাজ্য ও নূতন সম্মানে ভূষিত করেন। ইহার একমাত্র পুত্র স্বদেশের কাজের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন।—ইনি বর্ত্তমান কালে একজন স্বনামখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরেই এঁর পুত্রের সঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেব লর্ড মিণ্টোর কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে।

তার পর আর্ল অফ্ মেয়ো। Earl of Mayo ১৮৬৯-৭২ খৃষ্টাব্দে এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এঁর রাজত্বকালে দেশে কোনও রূপ যুদ্ধ বিগ্রহ বা অশান্তি ছিল না। সহসা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, ৮ই ফেব্রুয়ারী গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে স্যর জেম্‌স আউট্‌রামের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি একজন বীরপুরুষ ও মহাপুরুষ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌনগরীতে বিপক্ষের অগ্নিবর্ষণের



স্যর জেম্‌স্ আউটরাম

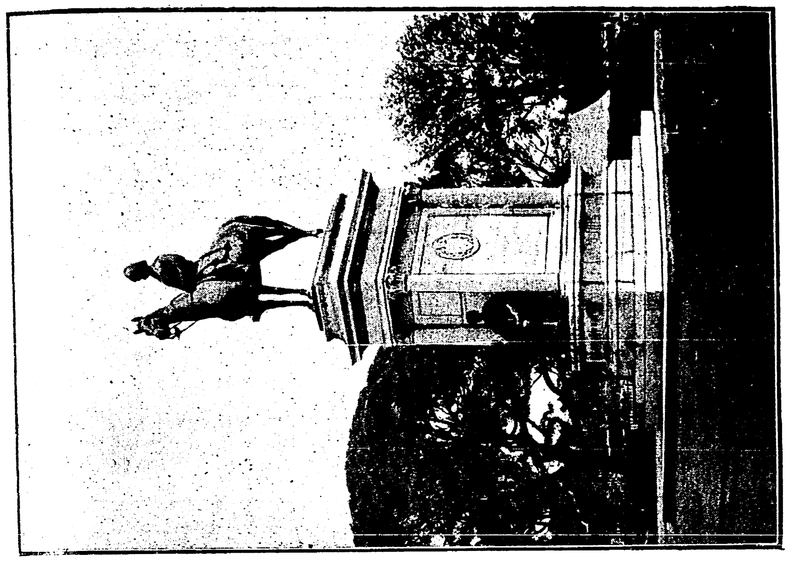

মার্কুইস্ অফ্ ল্যান্সডাউন

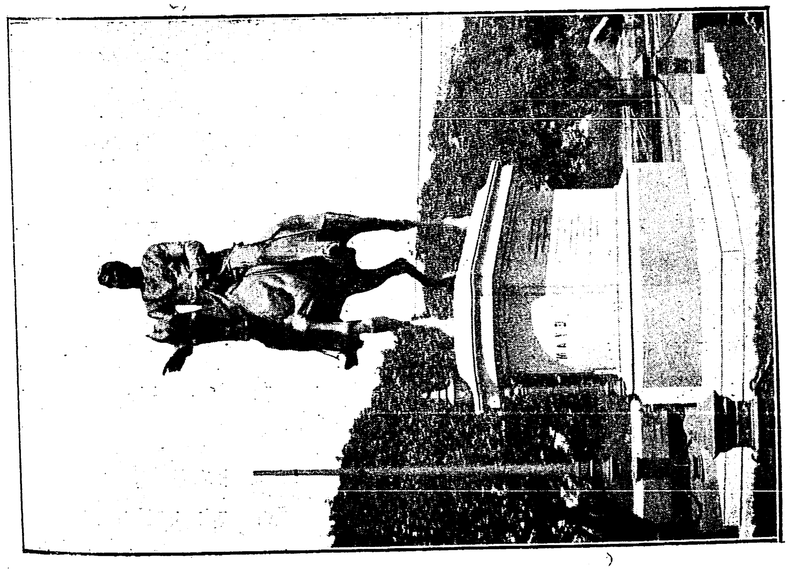

আর্ল অফ্ মেয়ো

ভিতর দিয়ে তিনি যেরূপ অসম সাহসে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে সৈনিকদের বিশেষ লোভনীয় অতি উচ্চ সম্মান প্রদান করবার প্রস্তাব করা হয়। সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করে ইনি বিশেষ মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়ে গেছেন।

গড়ের মাঠের এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে দুএকটি মূর্ত্তির অভাব আমাদিগকে বড়ই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেলদের মধ্যে লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড রিপণের মূর্ত্তি এখানে নাই, অথচ তাঁরা দুই জনেই কিরূপ সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন তা সকলেই জানেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যদি লর্ড ক্যানিং শাসনকর্ত্তা না থাকতেন তবে পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। লর্ড রিপণের মহানুভবতা ও সাম্যনীতি ভারতবাসীর হৃদয় এখনো ভক্তি পূর্ণ ক'রে রেখেছে। অথচ এই দুই জনেরই স্মৃতিচিহ্ন গড়ের মাঠে নাই। ইহা কি ন্যায়ধর্ম্মবাদী গুণগ্রাহী ব্রিটিসরাজের পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়। আশাকরি এমন এক দিন আসবে যখন তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই দুই মহাপুরুষের সম্মান করবেন।

নবাব

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাদাম জাঁসুলে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে নবাবের বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর কথা পারির বন্ধুমহলে নবাব একদিনও প্রকাশ করেন নাই। তাহার কারণ ছিল। সমাজে-মজলিসে কুলমহিলার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করাটা প্রাচ্যজাতির স্বভাব নহে। নারী ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের অধীশ্বরী। বাহিরে তাহার কথা লইয়া হাস্য কৌতুক করাটা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়াই তাহাদের ধারণা। বহুকাল প্রাচ্যজাতির সংসর্গে থাকিয়া প্রাচ্যজাতির এই বিশেষত্বটুকু নবাবেরও প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই মাদাম জাঁসুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পারির বন্ধুমণ্ডলী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

তাই যখন সহসা একদিন তাহারা শুনিল, মাদাম জাঁসুলে আসিতেছেন, তখন বিস্ময়-কৌতূহলে পরস্পরের চোখে-চোখে একটা চাওয়া-চাওয়ি হইয়া গেল। গৃহেও একটা নূতন সম্ভাবনার সাড়া উঠিল। ঘর দ্বার সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা, চাকর-দাসীর সংখ্যা বাড়ানো, আসবাব-পত্রের নব-আবির্ভাবে গৃহলক্ষ্মীর অভিনন্দনের সূচনা দেখা গেল। একদিন সকলে শুনিল মার্শেল হইতে স্পেশাল ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত; গাড়ী ও লোকজন ষ্টেশনে ছুটিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নবাবের গৃহ নব-কলরোলে মুখর হইয়া উঠিল।

সঙ্গে নিগ্রো দাস-দাসী, অঙ্গে অলঙ্কারের বিপুলতা লইয়া স্থূল-দেহা মাদাম জাঁসুলে নবাবের সজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

ট্রেণের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় মাদামের অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইয়াছিল। ক্লান্ত স্থূল দেহ-খানাকে টানিয়া সোপান অতিক্রম করিয়া ত্রিতলে অধিরোহণ করা মাদামের শক্তিতে কুলাইল না। দুইজন নিগ্রো বান্দা চেয়ার ধরিল; মাদাম তাহাতে উপবেশন করিলে বান্দারা সেই চেয়ারে করিয়া মাদামকে উপরে লইয়া গেল। মাদামের স্থূল দেহ দেখিয়া তাঁহার বয়স নির্ণয় করা সুকঠিন—পঁচিশ হইতে চল্লিশ অবধি যে কোন বছরই খাটিতে পারে। মুখশ্রী ভালো, চোখ টানা হইলেও তাহাতে ভাবের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। পোষাক ও অলঙ্কারের বাহুল্যের মাত্রা এমনই অতিরিক্ত যে প্রথম দর্শনেই দর্শকের তাক্ লাগিয়া যায়। এত ঐশ্বর্য্য বহিয়া বেড়ায় —এ যেন একটা সিন্দুকের মত—যেমন প্রকাণ্ড তেমনই সসার!

মাদাম এক ধনী বেলজিয়ানের কন্যা। টিউনিসে মাদামের পিতার কোরালের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। জাঁসুলে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া এখানে কয়েক মাস চাকুরি করিয়াছিলেন, মাদামোসেল আফ্‌সিন্—মাদামের কুমারী নাম—তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। বর্ণে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য, মাথায় কেশের রাশি, সমস্ত অবয়বে স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ ছায়া লইয়া মাদামোসেল আফ্‌সিন্ প্রকাণ্ড ব্রুহামে চড়িয়া প্রতি সন্ধ্যায় পিতার অফিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন অফিসের ছুটীর সময়। ভাগ্যান্বেষী জাঁসুলে সারাদিনের পরিশ্রমের পর অফিস হইতে বাহির হইবার সময় প্রত্যহই এই দশমবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাটি কৌতূহলী নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেন। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, বালিকার কমনীয় গৌর কান্তি তরুণ জাঁসুলের মনের উপর ধীরে ধীরে আপনার প্রভাবটুকু বিস্তার করিতেছিল। ক্রমে এমন হইল, অফিসে কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় জাঁসুলে অধীর ভাবে সন্ধ্যার এই মধুর ক্ষণটুকুর প্রত্যাশা করিত! কখন্ সন্ধ্যা আসিবে, অফিসের ছুটী হইবে এবং অফিসের ফটকের সম্মুখে ব্রুহামে উপবিষ্টা এই বালিকাকে জাঁসুলে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবে।

এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল। চক্ষু প্রত্যহই এই রূপ-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়; মনের শ্রান্তি ঘুচাইয়া দেয়। জাঁসুলে শুধু সেইটুকু পাইয়াই আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করে। এদিকে বালিকার বয়স যে বাড়িয়া উঠিতেছিল, যৌবন সযত্নে তাহার তুলিকা বুলাইয়া এক অপরূপ মাধুরীতে বালিকার অঙ্গ নিখুঁত ভাবে ভরিয়া তুলিতেছিল, মুগ্ধ জাঁসুলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন পারিল।

সেদিন সারা আকাশ এক অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় সাজিয়া উঠিয়াছিল। নব বসন্তের স্নিগ্ধ সমীর উতলা বহিতেছিল। অফিসের দেওয়াল-গাত্রে সংলগ্ন লতার ফাঁকে গোলাপী ফুলের গুচ্ছে রঙীন্ ঢেউ ছুটিয়াছিল। কিশোরী আফ্‌সিনের প্রাণেও প্রকৃতি বুঝি সেদিন একটা দোলা দিয়া গিয়াছিল। আফ্‌সিন ঐ গোলাপী ফুলের একটা গুচ্ছ-সংগ্রহের জন্য গাড়ীতে বসিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। জাঁসুলে আসিয়া তাহার পানে

চাহিতেই আফ্‌সিন্ তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। জাঁসুলের প্রাণ সহসা যেন এক সোনালি নেশায় ভরিয়া উঠিল। তাহার শিরাগুলার রক্ত তালে তালে নাচিয়া ছুটিল। পা তাহার কাঁপিতেছিল। সে নিকটে দাঁড়াইলে আফ্‌সিন্ আর কথা কহিতে পারিল না—শুধু ফুলগুলার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া একটা ইঙ্গিত করিল। জাঁসুলে বুঝিল। সে ক্ষিপ্র হস্তে একটা গুচ্ছ ছিঁড়িয়া লইয়া আফ্‌সিনের হাতে ধরিল। আফ্‌সিন্ ফুল লইয়া মৃদু হাসিল। ঐ হাসি! অনঙ্গ এই মধুর ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।—সে তাহার ধনুর ছিলায় টান দিল। জাঁসুলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোনমতে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, এ যেন কোন্ নন্দনের অপ্সরী সুধার পাত্রখানি হাতে ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত! জাঁসুলে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। চারিদিকে চাহিয়া অতিসন্তর্পণে আফ্‌সিনের হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে মৃদু চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিল। তাহার মনে হইল, স্বর্গ যেন আজ কোন্ সুদূর লোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে! আফ্‌সিনেরও দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল—জাঁসুলের দিকে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

তাহার পর শুধুই আলো, শুধুই হাসি, শুধুই আনন্দ! এ আনন্দ চরম সার্থকতা লাভ করিল সেইদিন, যেদিন আফ্‌সিনের সহিত মহাসমারোহে জাঁসুলের জীবন-গ্রন্থি বাঁধা পড়িল। এই বিবাহ আশ্রয় করিয়াই জাঁসুলে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা-আহরণে সক্ষম হইল।

তাহার পর ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে নবাব পারিতে আসিলেন। মাদাম কিন্তু টিউনিসেই রহিলেন। দুই জনের মনের এই মিলটুকু চিরদিনই ছিন্ন রহিয়া গেল। পারিতে না থাকিলে নবাবের চলে না—অতুল ধনের অধিকারী হইয়া নির্ব্বাসিতের মত দিন কাটাইয়া তৃপ্তি নাই। যশ চাই, কীর্ত্তি চাই। দশজনকে দেখিয়া দেখাইয়া তবেই না ধনের গৌরব! নবাব পারিতে আসিলেন। মাদামের এ সব ভালো লাগে না। ব্যস্ত পারির উত্তাল কোলাহল-কল্লোলে এই ধরণীর নিভৃত কোণ-অধিবাসিনীর সহ্য হয় না! নিরালা টিউনিসের মাটিই তাহার আরামের। মাদামের কাজেই আসা ঘটিল না। পুত্র কন্যা লইয়া তিনি টিউনিসে রহিয়া গেলেন। নবাব একেলা ভৃত্য-পরিজন লইয়া পারিতে আসিলেন।

পারিতে আসিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া নবাবের প্রাণে দারুণ অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। এখানে নিত্য মিলন মজলিস। স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে মিলিয়া আমোদ উল্লাসের পূর্ণ পাত্র উপভোগ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষে অবাধ মিলন! আর তিনি নিতান্তই নিঃসঙ্গ, একা! এখানে স্বামীর সকল কাজে স্ত্রীর কোমল হাত দুইটি কাঠিন্যের মধ্যেও অপরূপ লালিত্যের সৃষ্টি করিতেছে। স্বামীর সকল কাজে স্ত্রীর কি সাগ্রহ সহানুভূতি, সহজ সহায়তা—তাহা যেমন অনায়াস, তেমনই রমণীয়! কঠিনে কোমলে অপরূপ সামঞ্জস্য! আর তিনি একা—একা—তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমে স্ত্রীর সহানুভূতি-পাত দূরের কথা! স্ত্রী

তাহার অর্থও গ্রহণ করিতে চাহে না তাহার সন্ধান রাখিবার জন্য স্ত্রীর চেষ্টা নাই, বুঝি সামর্থ্যও নাই! স্ত্রী সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! কি দুর্ভাগা তিনি!

কিন্তু না,—চেষ্টা চাই। চেষ্টা করিয়া স্ত্রীর মনকে নোয়াইতেই হইবে। তিনি স্থির করিলেন, মাদামকে পারিতে আনাইবেন।

ঘটনা-চক্রেরও আবর্ত্তন ঘটিল। টিউনিসের টাঁকশালের ভার জাঁসুলের হাত হইতে স্খলিত হইয়া প্রতিদ্বন্দী হেমারলিঙের হাতে পড়িল। ইহার জন্য কতখানি মান, কতখানি প্রতিপত্তি ছিল। নিমেষে ছায়াবাজীর মত তাহা উবিয়া গেল। এ গৌরব হারাইয়া টিউনিসে আসর রাখিবার আর কোনই প্রয়োজন নাই! মাদামকে এ সকল বুঝাইয়া নবাব তাহাকে পারিতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। বারবার অনুরোধ উপরোধের তরঙ্গে মাদামের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, আর পারাও যায় না! নিত্য অনুরোধ, উপরোধ—দূর হোক—তাহার চেয়ে পারিতে গেলে এ-সকল দায়ের হাত এড়ানো যাইবে! মাদাম পারিতে আসিতে স্বীকৃত হইলেন।

তখন নবাবের আর কতকগুলা কাজ বাড়িয়া গেল। মাদামকে আদব-কায়দা শিখাইবার জন্য একজন গভর্ণেস রাখা হইল। মাদাম মনে মনে চটিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া ছিল। কেন এ সব অকারণ জঞ্জালের সৃষ্টি করা। গভর্ণেস নিয়োগের পূর্ব্বে এই ব্যাপার লইয়া স্বামী বিস্তর তর্কাতর্কি করিয়াছে—কিন্তু মাদাম কিছুতেই বুঝিলেন না, তাঁহার চলা-ফেরা বসা দাঁড়ানোর ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপের কি অধিকার আছে—তাহার প্রয়োজনই বা কি! নবাব নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়িলেন না! কারণ যেমন করিয়া হোক, বাড়ীতে পার্টি প্রভৃতির আয়োজন করিলে মাদামকেই ত অতিথি-জনের অভ্যর্থনার ভার লইতে হইবে! কোথাও যাইতে হইলেও ত একটা আদব-কায়দার প্রয়োজন আছে—মাদাম বিরক্ত হোক—গভর্ণেসের সাহায্যেও কতকগুলা চাল অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে! ইহা ভাবিয়াই নবাব গভর্ণেস-নিয়োগে মাদামের কাছ হইতে বাধা পাইয়াও দমিলেন না। ছেলের জন্যও বেশ মোটা মাহিনার শিক্ষক নিযুক্ত হইল—লেখাপড়ার জ্ঞান যত হোক না হোক, বড় লোকের ছেলের চালটাই যে স্বতন্ত্র এবং তাহা শেখার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, নবাব তাহা বুঝিয়াছিলেন। শিক্ষক বাছিয়া দিবার ভার লইলেন, ডাক্তার জেঙ্কিন্স! এমন সুহৃদ নবাবের আর কে আছে!

এইবার নিজের পালা। আজ অমুক সভায় মোটা চাঁদা দিয়া, কাল পিকচার-গ্যালারির নামে চেক্ কাটিয়া পরশু আর্ত্ত আর্টিষ্টকে সাহায্য দান করিয়া নবাব পারির হৃদয়-জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তার জেঙ্কিন্স পরামর্শ দিয়াছিলেন, কৌন্সিলে ঢুকিতে হইলে কিম্বা ডেপুটি হইতে হইলে এগুলার প্রয়োজন। এইগুলাই উপযুক্ত চার! নবাব এখন অহর্নিশি কাজের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নিজে হইতে আহরণ করা যায় না—

যেটুকু অবসর হইত, তাহা গে গেরির সাহায্যে!

দে গেরি দুই একবার বুঝাইয়াছিল, এসব বাজে কাজে এত টাকা দিবার প্রয়োজন কি! ইহাদের সামর্থ্য কোথায়! নবাব হাসিয়া বলিতেন, "দাঁড়াও না, গেরি, এসব দু-একটা বাজে কাজ চাই বই কি! তারপর যেদিন—জমকানো যাবে—" গে গেরি নবাবের এ স্বপ্ন ভাঙ্গিতে চাহিত না। নবাব বলিতেন, "পাগানেতি বলেছে, কর্সিকার ডেপুটি রোগে পঙ্গু হয়ে রয়েছে। শীগ্‌গির কাজ ছেড়ে দেবে—তখন আমার পালা। আমার জন্যে সব উঠে পড়ে লাগচে। মেসেঞ্জার কাগজে কি বেরিয়েচে, দেখেচ—ও কাগজখানার ভারী পশার আজকাল। বড় জোর কলম—তারপরে ঐ বেবলিহাম আতুর —আশ্রমের ব্যাপার! ঐ একটা কাজ ফ্যালাও করে তুলতে পারলেই,—ব্যস্!

কৌন্সিলে ঢোকবার সুবিধা হবে! তুমি ছেলে মানুষ, এ-সব বোঝ না। শুধু দেখে যাও—আমি চাই, দেশের মধ্যে একজন হতে—তার জন্যে খরচ করা কিছু চাই বই কি। তারপর এটা হলে—কতখানি লাভ, কতখানি ভাব দেখি!"

গেরি চুপ করিয়া থাকিত! সে ভাবিত, হায়, পারির সমাজ, রক্ত-পিপাসু জল্লাদের মতই তোমরা খরধার খাঁড়া উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছ! এই নিরীহ মির নবাবকে মারো, তাহাতে দুঃখ নাই—তবে তাহাকে বৃথা আশ্বাসে ভুলাইয়া মারিও না! তাহাকে মারিতেই যদি চাও, মারো, কিন্তু বলিয়া মারো যে, নবাব, আমরা তোমার রক্ত চাই! তোমার অর্থ চাই! অলস মরীচিকার মায়ায় ভুলাইয়া বন্ধু সাজিয়া তাহাকে হত্যা করিয়ো না! দোহাই তোমাদের! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শারদীয়া

শরতসমীর আজি বনানীর তন্ত্রীরাজি
টানিয়া বেঁধেছে প্রাণপণে,
করুণ বিলাপ সুরে নিখিল উঠেছে পূরে
চৌদিকে ছড়ায় জীর্ণ পত্রাবলি সনে!
প্রতি মূর্চ্ছনায় তার বেজে ওঠে হাহাকার,
শূন্যতা বাড়ায় শূন্য মনে,
বিরহ-বেদনা-মাঝে যে বাসনা নিত্য বাজে
কে পূরাবে আশা তার এ মর্ত্ত্য ভুবনে?

বসন্ত গিয়েছে চলে, শৈল অন্তরালে
একটি অশোক তবু সংখ্যাতীত কুসুমের জালে
লুকায়ে আপন-বুকে হোমানল জ্বালে।

বনলক্ষ্মী পায়ে ধরি দোহাই তোমার
দুরন্ত পবনে যেন বোলনাক তার সমাচার,
এখনি নাশিবে দীপ্তি করি ছারখার।

শরৎ প্রান্তর আজ পরেছে কিঙ্খাব সাজ
সোনালী, সুনীল, রাঙা ফুলের বাহার,
এত বর্ণ কোথা হ'তে এল ধরণীর পথে
যখন ফাটিক স্বচ্ছ ঝরিছে নীহার?

চেয়ে আছি শরতের চন্দ্রমার পানে,
পরাণ বিমানচারী তারি রশ্মি টানে,
কাশগুচ্ছ হেলাইয়া ধবল উত্তরী
যেওনা যেওনা বলে ডাকে বারে বারে,
মিনতি না মানি হায় শরৎ-সুন্দরী
হেমন্তে রাখিয়া যায় তারে তুষিবারে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সকল ভাবনা মোর কিরণের জালে
জড়ায়ে, ছড়ায়ে গেছ আকাশে পাতালে,
স্বপ্নে যায় আন্‌মনে কোন অজানায়—
ময় তার টানিল কি একেলা আমায়?

মুক্তি

আমি একটি সামান্য জীবনের ছেঁড়া-একটুকরা ইতিহাস বলিতে বসিয়াছি। হয় ত গল্পের আসর ইহাতে জমিবে না।

মুক্তি গৃহস্থ-ঘরের বৌ হইয়া যে-দিন কলিকাতা-সহরের সদর রাস্তায় পানের খিলি বেচিতে বসিল সে দিন তার সঙ্কোচ যতটা না হইয়াছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া আসিয়া, মুক্তি স্বামীর সহিত কলিকাতার একটা সাঁৎসেঁতে গলির মধ্যে সেই যে প্রবেশ করিয়াছিল তার পর এই ছয়-বৎসরের মধ্যে আর সেখান হইতে সে বাহির হইতে পায় নাই। সেই ছোট্ট অন্ধকার ঝুপ্‌সী ঘরটির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তার এমনি ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে জগতের কোথাও যে আলো আছে, বাতাস আছে তা তার মনেই পড়িত না। আজ হঠাৎ একেবারে এতটা আলোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল—তার অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখ সে আলোর পানে ভালো করিয়া মেলিতেই পারিতেছিল না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহস্থ-ঘরের অন্তঃপুরিকা হইয়া মুক্তির পক্ষে বাজারের পানওয়ালি হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইল। অনেকে কথাটাকে হয় ত আজগুবি মনে করিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, ব্যাপারটি সত্য। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আমি সাক্ষী ডাকিতে রাজি আছি—মুক্তিকে কলিকাতা-সহরের অনেকেই পান বেচিতে দেখিয়াছে।

অত্যন্ত অনাদরে ও অবহেলায় মুক্তি মানুষ হইয়াছিল। একে গরীবের ঘরের মেয়ে, তার উপরে সে যখন খুব কচি তখন তার মা মারা যায়—কাজেই আদর তার ভাগ্যে জোটে নাই।

কচি মেয়ের দোহাই দিয়া মুক্তির বাপ আবার বিবাহ করিয়াছিল বটে কিন্তু মেয়ের তাতে বিশেষ-কিছু সুবিধা হয় নাই। কারণ সতীনের মেয়েকে ভালো বাসিতে পারে এতটা উদারতা মুক্তির সৎ-মায়ের ছিল না।

মুক্তি ভয়ে ভয়েই দিন কাটাইত,—যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিয়া চলিত—কারণ যেখানে যতটুকু সে সৎ-মায়ের চোখে পড়িত সেইখানেই তার

শাসন ছিল, আদর ছিল না। এই নিজেকে গোপন করিয়া চলাটা মুক্তির এমন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে স্বামীর কাছেও নিজের হৃদয়টিকে সে মেলিয়া ধরিতে পারে নাই। স্বামীও তাহাকে পাইবার জন্য কোনো দিন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে জিনিষটা তার ধাতেই ছিল না।

মুক্তির স্বামী কলিকাতার কোন্ আপিসে অল্প-মাহিনায় সামান্য চাকরি করিত। সে এ-সংসারে বেশি-কিছু চাহিত না, অল্পেতেই খুসি ছিল এবং সেই অল্পটুকুও না পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠিবার মতো তেজ তার ভিতরে ছিল না। সে ছিল নিরীহ ভালোমানুষ। তার এই নিরীহতা এতটা বিরাট ছিল যে কোনোরূপ উত্তেজনাই তাহাকে তেমন করিয়া চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিত না। তার উপরে সে ছিল নকলচাঁদ বাবাজীর শিষ্য। এমন গুরুভক্ত শিষ্য কলিকালে দুর্লভ। সে চিত্ত স্থির করিবার জন্য গুরুর উপদেশে প্রতিদিন গঞ্জিকা সেবন করিত। তার গাঁজার মাত্রা ক্রমেই এমন বাড়িয়া উঠিতেছিল যে লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল কোন্ দিন বা সে চিত্ত-স্থির-রাখা বিষয়ে অতবড় মহাত্মা নকলচাঁদ বাবাজীকেই ছাড়াইয়া উঠে।

নকলচাঁদ বাবাজী চক্ষু-মুদিয়া উপদেশ দিতেন—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ বড় ভয়ঙ্কর মোহ! মাছ যেমন জালে আটকায় এবং তাহাতেই মরে; মানুষ তেমনি করিয়া এই কামিনী-কাঞ্চনের মায়াজালে পড়িয়া নরকে ডুবিয়া মরিতেছে!

মুক্তির স্বামী গুরুর এই অমূল্য উপদেশ গদগদচিত্তে জোড়হাত করিয়া বসিয়া শুনিত এবং তাহা পালন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিত। কাঞ্চনসম্বন্ধে সে এক-রূপ নিশ্চিন্ত ছিল, তার দায় বড় ছিল না, কারণ সে জিনিষটা আসিবার পথেই ফিরিয়া যাইত এবং অধিকাংশ সময়ই তার আসিবার বালাই থাকিত না। কিন্তু কামিনীটি তো তেমন নয়—সে যে দিন-রাত্রি চোখের সামনে জাজ্বল্য হইয়া আছে। সেই জন্য মুক্তির স্বামী যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত চিত্ত-স্থির-রাখিবার মহৌষধ ভক্তিভরে সেবন করিত। সে মনে মনে তারিফ করিত—কি আশ্চর্য্য দ্রব্যগুণ! মানুষের এত বড় শত্রু যে কামিনী তাও এই দ্রব্যগুণে একমুহূর্ত্তে চোখের সামনে হইতে সাফ্ পরিষ্কার হইয়া যায়,—তার চিহ্নমাত্রও থাকে না! এমন জিনিষ থাকিতে মানুষ কেন সংসারের পাঁকে ডুবিয়া মরে সে ভাবিয়া পাইত না। এ কি সামান্য জিনিষ! যোগ-সাধনের চরম অবস্থা যে সমাধি তাও এই দ্রব্যগুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে করায়ত্ত হয়। কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই—এত বড় জগৎখানাই কোথায় তলাইয়া যায়। ভাগ্যে সে নকলচাঁদ বাবাজীকে পাইয়াছিল তাই তো এ-যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। সে ভাবিত মানুষগুলো কি বোকা। এমন সাধু মহাত্মা জলজ্যান্ত থাকিতে লোকে কিনা হা অন্ন, হা বস্ত্র করিয়া কাঁদিয়া মরে?

নকলচাঁদ বাবাজীর পায়ে আসিয়া পড়িলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তার মন যখন বিশ্বসংসারের সমস্ত মানবের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া উঠিত তখন সে দূর হোক্ গে-ছাই বলিয়া আবার চিত্ত স্থির করিবার আয়োজনে বসিয়া যাইত।

এমনিতর ছায়ার মানুষ লইয়া মুক্তিকে ঘর করিতে হইত। স্বামীর যে একটা অস্তিত্ব আছে তাহা সে অনুভব করিবারই সুযোগ পাইত না। স্বামীর আদর তো ছিলই না, অত্যাচারটাও যদি থাকিত তা হইলেও না হয় সেই অত্যাচারের আঘাতে স্বামীর একটা ছাপ তার উপরে পড়িতে পাইত। কিন্তু যেখানে কেবল অবহেলা সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্বন্ধই জমিয়া উঠিতে পায় না। তা ছাড়া মুক্তি ছিল একলা-ঘরের একলা মানুষ। আর-পাঁচ জনকে লইয়া যে তার হৃদয়ের ছন্দ উঠিবে পড়িবে তারও জো ছিল না। কাজেই সে আপনার মধ্যে আপনি এত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া থাকিত যে তার দুঃখী-ঘরের আসবাবহীন ফাঁকা জায়গাও সে বেশি-করিয়া জুড়িতে পারিত না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত, প্রতিদিনের কর্ত্তব্যগুলি সে একটির পর একটি করিয়া সারিয়া রাখিত, তাহাতে তার আনন্দও ছিল না, দুঃখ ছিল না। কলের পুতুল যেমন করিয়া চলে ফেরে তেমনি করিয়া সে চলিত ফিরিত।

কেবল একজায়গায় সে মানুষকে একটুখানি পাইয়াছিল। সে বামার মা। সে ছিল ঠিকা দাসী। যে দুঃখী-পাড়ায় মুক্তিরা থাকিত এই বামার মা ছিল সেই পাড়ার একমাত্র দাসী। সে সকাল বিকাল দু বেলা সদর রাস্তার ধারে বসিয়া পান বেচিত, দুপুর বেলা ঝড়ের মতো পাড়ার মধ্যে আসিয়া ঘরে ঘরে নির্দ্দিষ্ট-মতো কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কেউ যদি এতটুকু অতিরিক্ত ফরমাস করিত তো অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিত। তার সেই মারমূর্ত্তি দেখিয়া কেউ আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস করিত না।

বামার মার সঙ্গে পাড়ার কারুরই আর-কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল কাজের সম্পর্কই ছিল। কাজ সারা হইলেই সে ছুটিয়া পালাইত, কাহারো পানে ফিরিয়া তাকাইত না—দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবসর তার ছিল না। কাজেই বহুদিন পর্য্যন্ত মুক্তির নিঃসঙ্গ জীবনের উপর বামার মা নিজের ছায়াটুকুপর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

মুক্তির জ্বর হইয়াছিল। সে একলাটি পড়িয়াছিল। সেদিন তার স্বামীর ছুটির দিন, কিন্তু গুরুজীর আড্ডায় আজ ভারি এক মোচ্ছব, কাজেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, মুক্তির দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় হইল না। তার পর দুইদিন একেবারে অদৃশ্য। উৎসবের উল্লাসে বাবাজীর শিষ্যেরা এতটা চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া আশপাশের লোকদের চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইয়াছিল;—দুদিন

মাটিয়া ছাড়িয়া উঠিবার কাহারো সামর্থ্য ছিল না।

মুক্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে মলিন বিছানায় একা চুপটি করিয়া পড়িয়াছিল। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া জল খাইবে এমন শক্তি ছিল না। সে নীরবে, শুষ্ক কণ্ঠ ও শুষ্ক আঁখি-পল্লব তুলিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া ছিল।

বামার মা কাজ করিতে আসিয়া অনেক ডাকাডাকির পর যখন সাড়া পাইল না তখন সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মুক্তি তাহাকে দেখিল, কিন্তু জল-দিবার ফরমাসটুকু করিতে সাহস করিল না। নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাহারো নিকট কিছু চাহিবার অধিকার যে তার আছে এমন কথাও সে ভাবিতে পারিত না। সে হয় ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জল না চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু বামার মার একটি ব্যবহারে সে যেন সাহস পাইল।

বামার মা মুক্তির শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ও মা অসুখ করেছে বুঝি!" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নিজের ভিজে হাতখানা থপ্ করিয়া আঁচলে মুছিয়া মুক্তির কপালের উপর পাতিয়া দিল।

মুক্তির বোধ হইল সেই স্পর্শটিতে তার সমস্ত দেহ যেন জুড়াইয়া গেল। কি স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ! মুক্তি চোখ বুজিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই স্পর্শের মধ্য দিয়া সে এমন একটি জিনিষ পাইল যার স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। বামার মা হাত তুলিয়া লইবার পরও অনেকক্ষণ মুক্তির কপালের উপর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু লেপিয়া রহিল।

মুক্তি এতক্ষণে বামার মার কাছে জল চাহিল; কিন্তু কণ্ঠ এত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল যে কথা বাহির হইল না,—শুধু ঠোঁটের একটি আকুল কম্পন সেই শীর্ণ মুখখানির উপর দিয়া বহিয়া গেল।

বামার মা বুঝিতে পারিল, বলিল—"জল খাবে বাছা?"

মুক্তি একটু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বামার মা তাড়াতাড়ি জল গড়াইয়া আনিল। তার হাত হইতে ঘটি লইবার যেন মুক্তির তর-সহিতে ছিল না,—সে এমনিভাবে উঠিয়া বসিল। এবং একনিশ্বাসে সমস্ত জল পান করিয়া শুইয়া পড়িল। বামার মা একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—"বাছারে আমার! মুখে একটু জল-দেবার কেউ নেই গা!"

সেই দিন হইতে আর বামার মা মুক্তির বাড়ির কাজ সারা হইলেই ছুটিয়া পালাইতে পারিত না। কাজের পর দু দণ্ড সময়ের বৃথা অপব্যয় তার নিত্যই ঘটিতে লাগিল।

বামার সঙ্গে মুক্তির চেহারার কোনো সাদৃশ্যই ছিলনা কিন্তু তবুও বামার মার কেমন মনে হইতে লাগিল যেন মুক্তি ঠিক বামারই মতো। ভারি আশ্চর্য্য মিল! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা,—সেই সব! আজ কয়েক বছর হইতে বামার মা প্রতিদিনই মুক্তিকে দেখিতেছে, তার বামা বহুকাল হইল তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেছে, তার

চেহারা তার ভালো-করিয়া মনেই পড়েনা, কিন্তু এতদিন তো এটা চোখে পড়ে নাই যে মুক্তি তার বামারই মতো! হঠাৎ সেই অসুখের দিন হইতে এইটে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যতই দিন যাইতেছে পরস্পরের চেহারার মধ্যে যে একটু-আধটু অনৈক্যের রেখা ছিল তাহাও মুছিয়া যাইতেছে। মুক্তিকে যতই দেখিত বামার মার কেবলই মনে হইত—বামা তো আমার এত বড়টাই গো! এমনিই! এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বামা যে তার নাই একথা বামার মা ভুলিয়া যাইতে বসিল।

বামার মাকে পাইয়া মুক্তি যেন একটা আশ্রয় পাইল। সেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তার হৃদয়-কুঁড়িটি একটু একটু করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারই সৌরভ তার দেহের সমস্ত অলিগলির ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার সমস্তটাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বামার মার কাছে মুক্তির আর কোনো সঙ্কোচ নাই—সে যা-খুসি-তাই আবদার করে, কাজের সময় বহিয়া গেলেও বামার মার আঁচল টানিয়া বসাইয়া রাখে, দেরী করিয়া আসিলে রাগ করে এবং চলিয়া যাইতে চাহিলে অভিমান করে।

বামার মাও মুক্তির কাছে একেবারে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যে মুক্তিকে লইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পাইত না। তার কেবলই ইচ্ছা হইত মুক্তিকে তার বুকের ভিতর করিয়া রাখে। তার নিজের সেই সামান্য সমস্তটুকু মুক্তিকে উবুড়-করিয়া দিয়াও তার তৃপ্তি হইতেছিল না। সে আরো দিতে চাহিত, আরো দিতে চাহিত। যে কথাটি কানে শুনিত মুক্তিকে না বলিলে তার প্রাণ ঠাণ্ডা হইত না; যে জিনিষটি চোখে লাগিত সেটি মুক্তির জন্য না নিতে পারিলে ভারি দুঃখ থাকিয়া যাইত।

হারানো ধন ফিরিয়া পাইলে তার যত্ন বাড়ে। বামার জন্য যতটা না করিতে পারিয়াছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সে মুক্তির জন্য করিতে লাগিল। মুক্তির কাছে বেশিক্ষণ থাকিতে পায় না বলিয়া সে দু-এক ঘরের কাজ ছাড়িয়া দিল এবং যে কয়েক ঘরের কাজ রহিল তাহাতেও শৈথিল্য পড়িয়া গেল। মুক্তির উপরই তার মন পড়িয়া থাকিত। যখনই সময় পাইত একবার মুক্তিকে না দেখিয়া গেলে তার চলিত না এবং যাই-যাই-করিয়া উঠিতে উঠিতে এতটা কাজের সময় বহিয়া যাইত যে তার জন্য তাহাকে মনিবের কাছে তিরস্কার সহিতে হইত। বিকাল-বেলা তার অনেক কাজ ছিল; তবু সে যেমন করিয়া পারে একটু সময় করিয়া মুক্তির চুলটা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। এবং পানের দোকানে যখন খরিদ্দার থাকিত না তখন পায়ের বুড়া-আঙুলে একটা দড়ি বাঁধিয়া মুক্তির জন্য চুলের গুছি তৈরি করিত;—তাহাতে এমন তন্ময় হইয়া থাকিত যে অনেক সময় খরিদ্দার হাঁকাহাঁকি করিলে তবে চমক ভাঙিত।

মুক্তির উপর বামার মার ভালো বাসার অত্যাচারও ছিল। সে চুল বাঁধিবার সময় মুক্তির মাথা লইয়া এতটা তেল-জ্যাব-জেবে করিয়া দিত, এতটা নীচে অবধি পেটো পাড়িয়া দিত, চুলের গোড়া এতটা শক্ত করিয়া বাঁধিত যে ইহার কোনোটাই সুখের

ছিল না। কিন্তু এইগুলাই মুক্তির বিশেষ করিয়া ভালো লাগিত। চুল ভালো থাকিবে বলিয়া বামার মা যখন চুলের গোড়া কড়্‌কড়ে করিয়া বাঁধিয়া দিত, তখন মুক্তির সমস্ত মাথাটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইটাতেই সে আনন্দ বোধ করিত। এবং এইরূপ আনন্দের প্রতি একটা লোভ মুক্তির মনে মনে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলাটি ভারি চমৎকার কাটিত। বামার মা অনেক রূপকথা জানিত, মুক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বামার মার কাছে বসিয়া সেই সকল রূপকথা শুনিত। স্বপ্নপুরীর সেই সব কাহিনী সন্ধ্যার আবছায়ার উপরে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিত। সেখানকার ভয়-ভাবনা, আশা-ভালোবাসা মুক্তির হৃদয়টাকে লইয়া দোলের পর দোল দিতে থাকিত। নানা বিপদের পর, পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করিয়া, রাজকুমার তার প্রিয়তমা রাজকুমারীকে লইয়া পালাইতেছে—পক্ষিরাজের উদ্দাম গতিতে ভীত রাজকুমারী দুই বাহু দিয়া রাজপুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে—এই সব কথা যখন শুনিত তখন মুক্তির মনে হইত যেন সে নিজেই সেই রাজকুমারী। তার কল্পনার রাজকুমারের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতে তার বুক দুর্‌দুর্‌ করিতে থাকিত। আবার রাজকুমারী যখন রাজকুমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে তখন সেই রাজকুমারীর কান্না মুক্তির বুকের ভিতর হইতে আপনি গুমরিয়া উঠিত। তার পর সব-শেষে, মিলনের দিনে রাজপুত্র রথে করিয়া আসিয়া যখন বলিত—রাজকুমারী চল! তখন মুক্তির হৃদয় আগেভাগে সেই রাজপুত্রের রথের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিত। মুক্তি যখন একলাটি থাকিত সে এই সমস্ত কাহিনী মনের পৃষ্ঠা হইতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বার বার করিয়া পড়িত—এর নূতনত্ব সে শেষ করিতে পারিত না।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে মুক্তির দিন একরকম কাটিতেছিল কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে সব ওলট-পালট হইয়া গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—এই প্রবাদটা যখন নকলচাঁদ বাবাজীকেও বাদ দিল না তখন বাবাজীর বড় মুস্কিল হইল। প্রতিদিন তার আয় কমিতেছিল। শেষে এমন হইল যে যে-সব ভক্তেরা রোজ তার প্রসাদটুকু পাইয়া শুধু কৃতার্থ হইবার জন্য আসিত তাদেরও গাঁজার বরাদ্দের উপর টান পড়িল। চিত্ত আর তেমন স্থির হইতেছেনা, ভজন সাধনের ব্যাঘাত হইতেছে—এই বলিয়া ভক্তেরা দলে দলে অন্য মহাপুরুষের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। নূতন খরিদ্দারও জোটে না, পুরাতন খরিদ্দারও ভাঙিয়া যাইতেছে এমন করিয়া আর ক' দিন চলে? কাজেই নকলচাঁদ বাবাজী জাল-গুড়াইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুক্তির স্বামী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছিল,—সে বাবাজীর পা কিছুতেই ছাড়ে নাই। চিত্তস্থির হইবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে বলিয়া তারও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিত বটে কিন্তু বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে তার মন সরিত

না। ইহকাল তো কিছুই নয়—পরকালের জন্যই তো ভাবনা, সেইজন্য এই পরকালের গতিসম্বন্ধে তার ভারি একটা লোভ ছিল। সে ভাবিত, বাবাজীর কৃপায় যখন স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে;—বাবাজীকে ছাড়া নয়।

বাবাজীরও তাহাকে না হইলে চলিত না। সে বাজার হইতে ঘি আটা আনিয়া দেয়, ধুনীর আগুন জ্বালে, ফাইফরমাসটা খাটে, সকাল সন্ধ্যা পদসেবাটাও বেশ করে—এই সব আরাম বাবাজী অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, চট করিয়া তাহা ত্যাগ করা বাবাজীর পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই চেলাটি যাহাতে হাতছাড়া না হয় সে দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সে একদিন এই ভক্তটির কাঁধের উপর বার দুই তিন থাবড় দিয়া বলিল—"বাচ্ছা, আমি দেখচি তোরই ভিতর খাঁটি চিজ আছে; ভণ্ড যারা তারা সব ভেগেছে। এখন চল, তোর উপায় করে দি।"

মুক্তির স্বামী গুরুজীর এই কথায় একেবারে গদগদ হইয়া উঠিল। সে তো আগে হইতেই জানিত যে মহাপুরুষেরা কঠোর পরীক্ষার পর তবে স্বর্গে যাইবার পথের খবরটা ফাঁস করেন; সেই জন্যই তো সে এমন-করিয়া এতদিন বাবাজীর পা ধরিয়া পড়িয়াছিল। এখন এই মহা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে মনে করিয়া তার গর্ব্ব হইতেছিল। গুরুজীর কৃপা হইয়াছে—এই আনন্দে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া দুই হাত দিয়া গুরুজীর পা জড়াইয়া রহিল।

তার পর একদিন গা-ময় ভস্ম মাখিয়া গুরুদেবের তল্পিতল্পা ঘাড়ে করিয়া সে গুরুজীর পিছন পিছন কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মুক্তির কথাটা হঠাৎ একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে যে তার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক—মোক্ষলাভের অন্তরায়! এই জন্য সে তৎক্ষণাৎ মুক্তির কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল এবং তখনই গাঁজার কলিকায় কষিয়া একটা দম দিতে বসিয়া গেল। পাছে এই খবর নিজে মুক্তির কাছে দিতে গেলে কোনো ফ্যাসাদে জড়াইয়া পড়ে সেই ভয়ে সে যাইবার সময় মুক্তির সহিত দেখা করিতে গেল না;— একটা উড়ো-লোক দিয়া খবরটা পাঠাইয়া দিল।

মুক্তির স্বামী যে আছে বামার মা শুধু এইটুকুই জানিত; তার সহিত কোনো পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে। সে যখন মুক্তির কাছে আসিত তখন প্রায়ই তার স্বামী বাড়ি থাকিত না; যদি দৈবাৎ কখনো চোখে পড়িত, পাশ-কাটাইয়া চলিয়া যাইত। কাজেই মুক্তির স্বামী যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এ সন্দেহটি পর্য্যন্ত বামার মার মনে আসিতে পারে নাই।

মুক্তিও কিছু বলে নাই—বলিবার কোনো তাগিদ যেন তার মন হইতে উঠে নাই। তার মনটি এমনি ভীরু ছিল যে সকল-রকম অবস্থাকে নিঃশব্দে মানিয়া লওয়াটাই তার ধর্ম্ম ছিল। দুঃখ যখন

তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সে জড়সড় হইয়া তার পানে শুধু চাহিয়া থাকিত;—এবং সেই দুঃখটা তার মাথার ঝুঁটি ধরিয়া যখন নাড়া দিতে থাকিত তখনও সে এমনি ভয়ে ভয়ে থাকিত যে আর্ত্তনাদও করিতে পারিত না। সমস্ত দুঃখকে সে বুকের মধ্যে চাপিয়া কাঠ হইয়া থাকিত।

স্বামী যে তার একটা সহায় এমনভাবে স্বামীকে দেখিবার অবকাশ মুক্তির কখনো হয় নাই, কাজেই স্বামী যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন সে নিজেকে যে খুব নিঃসহায় মনে করিল তা নয়; বামার মার সঙ্গে তার যেমন দিন কাটিতেছিল তেমনি দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু একজায়গায় একটু বাধিল। স্বামী চলিয়া যাইবার দিন-দুই পরে বামার মা বাজারের পয়সা চাহিলে মুক্তি বলিল—"বাজার করবার দরকার নেই।"

বামার মা অবাক্ হইয়া মুক্তির পানে চাহিয়া রহিল।

মুক্তি আর কথাটি কহিল না। তার বলিবার কথা সমস্ত যেন ঐ-খানেই শেষ হইয়া গেছে। পয়সা নাই তাই বাজার হইবেনা—এর আগে কিম্বা এর পরে যে কোনো কথা আছে তাহা তার মন ভাবিতেই ছিল না।

বামার মা কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিল না—সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আসল কথাটা বাহির করিয়া লইল।

বামার মা কিন্তু কথাটা ঠিক মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সে কেবলই মুক্তিকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—"বলনা মা, কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে বুঝি?"

মুক্তি যতই বলে—"না।" বামার মা কিছুতেই সে কথা কানে তুলিতে চাহে না। সে কেবলই চাহিতেছিল মুক্তি বলুক—"হাঁ।" নইলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না।

তারপর দিনের পর দিন চলিয়া গেলে বামার মার আপনা-হইতেই যখন দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে মানুষ ঝগড়া করিয়া এতদিন কখনো ঘর ছাড়িয়া থাকে না তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তির পাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তার নিজের জীবনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে যে ভুক্তভোগী! তার বামাকে বুকে ধরিয়া সে যে-দিন একা নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেদিনকার কথা তার মনে পড়িতে লাগিল—কী ভীষণ অসহায়তা!—কোনো দিকে কোনো কূল পাওয়া যায় না! আজ মুক্তিরও সেই অবস্থা মনে করিয়া তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা মিথ্যা সন্দেহে তার স্বামী যখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল তখন স্বামীর উপর সে তেমন করিয়া রাগ করিতে পারে নাই—হাজার-হউক স্বামী তো বটে! সে দিন সে স্বামীকে ধিক্কার দেয় নাই, নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছিল। কিন্তু আজ মুক্তির এই অবস্থা দেখিয়া সে পৃথিবীর সমস্ত স্বামীর উপর হাড়ে চটিয়া গেল এবং তাহাদের সকলকার মুখাগ্নি করিয়া দিল।

বিবাহ হইবার পর মুক্তির বাপের বাড়ি হইতে কেউ আর মুক্তির কোনো খবর লয়

নাই। মুক্তির সৎমা নূতন সংসার বেশ করিয়া জমাইয়া লইয়াছিল। তার ছেলে-মেয়েদের লইয়া সে নিজে সংসারটা এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল যে মুক্তির জন্য এতটুকু স্থান পড়িয়া থাকে নাই। তার উপর অনাটনের সংসার! যাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখা যায় এমন লোককে ডাকিয়া নিজের ভাতের ভাগ দিতে পারে এতটা উদারতা সাধু-সমাজেই দুর্ল্লভ—তা মুক্তির সৎমা তো কোন্ ছার।

বাপের বাড়ির দিকে মুক্তিরও কোনো টান ছিল না। সেখানে তার এমন-কিছুই ছিল না যাহাকে সে আপনার বলিতে পারে। সেই জন্য বামার মা যখন বাপের বাড়ির কথা তুলিল তখন মুক্তি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিল—"সেখানে আমার কেউ নেই বামার মা!"

পৃথিবীতে বামার মার মতো আপনার লোক মুক্তি কাহাকেও জানিত না। বাপের বাড়ির কথা উঠিতেই মুক্তির ব্যাকুল হাতখানা বামার মার আঁচলটা জোর-মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

মুক্তির ঘরে সঞ্চয়ও ছিল না, গায়ে অলঙ্কারও ছিল না—এয়োতি-নাম রক্ষা করিবার জন্য হাতে দুগাছি পিতলের চুড়ি ছিল মাত্র। বামার মারও যে আয় ছিল তাতে তার একলার পেটটি কষ্টে চলিত। তার উপর ইদানি মুক্তির জন্য তাহাকে আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কাজেই তার একার উপর নির্ভর করিয়া দুজনের দিন চলা দায় হইয়া উঠিল। বামার মা মনে মনে বলিত, আমি তো অনেক উপবাস করিয়াছি—উপবাস আমার গা-সহা। এই বলিয়া সে নানা অছিলায় মাঝে মাঝে উপবাস দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ-কিছু সুবিধা হইল না। মুক্তি ভারি আপত্তি করিত। সে বলিত—"তুমি অমন করে উপোস কর কেন? তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে উপোস করব।"

বামার মা বলিত— "আমার যে উপোস করা দরকার মা। তাতে শরীর ভালো থাকে। বুড়ো-মানুষ বেশী খেলে গতর মাটি হবে যে।"

বামার মার অন্ন খাইতে হইতেছে বলিয়া পাছে মুক্তি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় সেই জন্য বামার মা মুক্তিকে শুনাইয়া রাখিত যে, সে যাহা দিতেছে তাহা ধার বলিয়াই দিতেছে—জামাই যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সুদসুদ্ধ আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙিন্ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু পেটের অন্ন লইয়া যদি কথা হইত তাহা হইলে না হয় এক-রকম-করিয়া চলিয়া যাইত—কিন্তু তা তো নয়, অভাব যে চারিদিকে। মুক্তির পরণের কাপড় সেলাই করিয়া, তালি দিয়া, নানা রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছেঁড়া বাঁচাইয়া কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ হইতেছিল, শেষে তাও আর চলে না; ঘরের ভাড়ার জন্য তাগাদার পর তাগাদা আসিতেছে; মুক্তির স্বামীর আমলে মুদির দোকানে যে দেনা ছিল তার জন্য মুদি আসিয়া মুক্তিকে যাচ্ছেতাই শোনাইয়া যায়; কলের জল অশুচি বলিয়া তার স্বামী গঙ্গা-জল খাইত, তার ধার আছে বলিয়া এক-

দিন একটা উড়ে ভারী ঘর হইতে জলের ঘড়াটা জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এমনি কতদিকে যে কত উৎপাৎ তার ঠিক নাই, নিরুপায় বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না। মুক্তি মুখট বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিত!

শেষে আর উপায় না দেখিয়া বামার মা একদিন মুক্তিকে বলিল—"মা, এক কাজ করবি, আমার সঙ্গে পান-বেচতে যাবি?"

সকালে আপিসের সময় বামার মার পানের দোকানে ভারি ভিড় হইত। সে একলা সকলকে পান জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। তাড়াতাড়ির সময়, বাবুরা যে দুদণ্ড দাঁড়াইয়া পান লইবে তা হইত না, অনেক খরিদ্দার ফিরিয়া যাইত। সেই জন্য বামার মার মনে হইতেছিল যদি এই সময়ে মুক্তি আসিয়া একটু সাহায্য করে তো অনেকটা সুসর হয়।

নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন কুটাকে আশ্রয় করে মুক্তি পান-বেচিবার প্রস্তাবটা তেমনি করিয়া গ্রহণ করিল।

বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির গায়ে ছোট্ট একটু রক—তারই এক কোণে ছিল বামার মার পানের দোকান। দোকানের সরঞ্জাম বিশেষ-কিছু ছিল না;—একটি দড়ি দিয়া বাঁধা ভাঙা টিনের বাক্স এবং তার ভিতর কয়েকটি গোল গোল টিনের কৌটা। বামার মার পাশে একটুখানি জায়গা করিয়া মুক্তি সেই দোকানে আসিয়া বসিল। মুক্তির ছিন্ন মলিন বস্ত্র, কপাল অবধি ঘোমটাটুকু টানা, তার সেই শুষ্ক করুণ মুখখানির উপরে টানা-টানা দুইটি চোখ স্থির হইয়া ভাসিতেছে—শুধু এইটুকু দেখা যাইতেছিল।

মুক্তি স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তার মনটা চারি দিককার নূতন জিনিস দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখ মনের সেই ঔৎসুক্য নিজের মধ্যে কিছুতেই জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না;—তার চোখ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। এবং তার দৃষ্টির সেই করুণ নীরবতার উপরে তার বোবা-হৃদয়টির আভাস থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল।

মুক্তি এমন জড়সড় হইয়া ছোট্টটি হইয়া বসিয়াছিল যে রাজ-পথের চারিদিকার চঞ্চলতা ও বিরাটতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কিন্তু তবুও তার আবির্ভাবে আশেপাশে চারিদিকে একটা চঞ্চলতার ঢেউ বহিয়া গেল। অনেকের উৎসুক দৃষ্টি তার উপরে বারে বারে পড়িতে লাগিল। আপিসের বাবুরা দোকানের ধারে এমন করিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল যে সেই ভিড় দেখিবার জন্যই লোকের ভিড় জমিয়া গেল। মুক্তির হাত হইতে পান লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সে দিন বাবুদের আপিস যাইবার তাড়াতেও একটু শৈথিল্য দেখা গেল, পান না লইয়া কেহ নড়িল না, এবং পান হাতে লইয়াও বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি এই অছিলায় অনেকে দাঁড়াইয়া রহিল। এমনও হইল যে অপেক্ষা করিতে করিতে তাহাদের হাতের পান ফুরাইয়া গেল, এবং আবার পান

লইতে হইল। তাহাতে সময়ের এবং অর্থের যে অপব্যয় হইল তার জন্য তাহারা একটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করিল না।

মুক্তি এত জনসমাগমে একটু থত খত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে ঘূণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতেছিল না যে তারই জন্য এইটে ঘটিতেছে—সে ভাবিতেছিল বুঝি এমনি ধারাই রোজ হয়।

দোকানের সমুখে দাঁড়াইয়া খরিদ্দাররা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল, মুক্তির কানে তার গুঞ্জন-ধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। সে মুখ নীচু করিয়া পান সাজিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের হাসি বা কথায় সে চমকিয়া উঠিয়া তার সেই টানাটানা অস্ফুট চোখ তুলিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেছিল। তার সেই দৃষ্টিটুকুকে সকলে এমনিভাবে গ্রহণ করিতেছিল যেন সেটি তাদের পরম আরাধনার ধন!

মুক্তির হাতে যখন কাজ রহিল না সে অলস দৃষ্টিতে রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি মানুষের পিছনে যতদূর পারে সে তার দৃষ্টিটিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তার পর সে মানুষটি অদৃশ্য হইয়া গেলে আবার নূতন মানুষের পিছনে দৃষ্টিকে বাঁধিয়া দিতেছিল। এমনি করিয়া সে মানুষের পর মানুষই কেবল দেখিয়া যাইতেছিল। তার পর সে-রাত্রে সে যখন নিদ্রা গেল তখন তার মাথার ভিতরে কেবল মানুষের মুখ বিজ্‌বিজ্ করিতেছে।

পথের লোক যে তার পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া যায় এটা অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তির নিকট ধরা পড়িল। যে দিন এই খবরটি একটি মানুষের চোখ দিয়া তার মনের মধ্যে প্রথম পৌঁছিল সেই দিন হইতে দেখিল তার দিকে লোকের চাহিবার যেন আর অন্ত নাই! সে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু যে-লোকটির দ্বারা এই খবর সে প্রথম পাইল, কি জানি কেন, তার মনটি তাহাকেই বিশেষ চিহ্নিত করিয়া রাখিল। আর বাকি-লোকের চাহনি অসংখ্য চাহনির মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল।

সে লোকটির সঙ্গে মুক্তির যখন প্রথম চোখের মিলন হয় তখন ঠিক্-দুপুর বেলা। রাস্তার গোলমাল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে, দু-একটিমাত্র লোক চলাচল করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড অলসতা রাস্তার এধার-ওধার-জুড়িয়া গা-মেলিবার আয়োজন করিতেছে। মুক্তির মনের ভিতরও একটা অলসতা ধোঁয়ার মতো উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সে আপনার মনে বসিয়া ধীরে ধীরে পান সাজিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখে একটি অনিমেষ দৃষ্টি তার মুখের উপর পড়িয়া আছে। মুক্তি প্রথমে কোনো খেয়াল করিল না, সে চোখ নামাইয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে তার চোখ যখন অন্যমনস্ক-ভাবে আবার সেই দিকে গিয়া পড়িল তখনও দেখিল সেই দৃষ্টি সেইভাবেই রহিয়াছে। কতক্ষণ যে সেই চাহনিটি তেমনি করিয়া চোখের সামনে ভাসিতেছিল তাহা মুক্তি মনে রাখিতে পারিল না; কিন্তু তার মনে হইতে লাগিল এই দৃষ্টিটি

যেন কতদিন ধরিয়া তারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আজ এইমাত্র তার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মুক্তির মনের ভিতর কেবলই সেই চাহনিটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আপিসের বাবুরা যখন পানের দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত তখন মুক্তি চোখ তুলিবার বড় অবসর পাইত না;—যেটুকু উপর দিকে চাহিত তাহাতে শুধু ভিড়টাই চোখে পড়িত—আলাদা-করিয়া মানুষ চোখে পড়িত না। কিন্তু দুপুর বেলার সমস্ত অলসতা ও নির্জ্জনতার উপরে সেই যে দৃষ্টিটি ভাসিয়া উঠিত সেইটিই বিশেষ করিয়া মুক্তির মনে ছাপ মারিয়া দিত। রাস্তায় সে এত লোক দেখিত যে কাহাকেও তার মনে রাখা সম্ভব হইত না—কিন্তু এই-যে-লোকটি সমস্ত মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া একলা দাঁড়াইত তাহাকেই বিশেষ করিয়া মনে রাখার সুযোগ বারম্বার ঘটিয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই মুক্তি মন হইতে তাহাকে মুছিয়া ফেলিবার অবসর পাইল না।

মুক্তির যে দুবেলা দু মুঠা জুটিতেছে, পরণের কাপড় মিলিয়াছে, ইহাতে বামার-মা খুসী ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুক্তিকে দেখিয়া তার ভাবনা হইত—এমনি করিয়াই কি মেয়েটা ঘরছাড়া ছন্দছাড়া হইয়া থাকিবে। একএকসময় তার মনে অনুশোচনা হইত—হয়ত বা তারই অদৃষ্টে মেয়েটার এমন দশা হইল। সে হতভাগিনী যেখানে গিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে অনুতাপ করিয়া বলিত—"কেন মরতে মুক্তির কাছে গেলুম। চাল নেই চুলো নেই এই আবাগীর সঙ্গে পড়ে বাছাকেও আমার ঘর-ছাড়া হতে হল!" মুক্তির কথা ভাবিয়া তার চোখে জল আসিত।

বামার মা চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে গোপনে মুক্তির স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। নকলচাঁদ বাবাজীর যে-সব শিষ্য ছিল তাহাদের বাড়ি হাঁটাহাটি করিয়া অনেকবার বিফলমনোরথের পর সে নকলচাঁদ বাবাজীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিল; এবং আধা-লেখাপড়া-জানা একটা লোককে ধরিয়া অনেক খোসামোদ করিয়া মুক্তির স্বামীকে একখানা চিঠি লেখাইয়া সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল।

মুক্তির সেই মনের মানুষটি মনের মধ্যেই থাকিয়া যাইত। সে যে কোনো দিন আসিয়া মুক্তির সামনে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে তাহা মুক্তি কল্পনাও করিতে পারে নাই।

একদিন দুপুরবেলা বামার মা বাজারে পান আনিতে না কি করিতে গিয়াছিল, মুক্তি একলাটি বসিয়া ছিল। কোথা হইতে হঠাৎ সে আসিয়া বলিল—"মুক্তি এস!"

"মুক্তি এস!"—এই কথাটা মুক্তির হৃদয়ের উপর সজোরে একটা ঘা দিল। সে যেন শুনিল রূপকথার রাজপুত্রের মুখের সেই কথা—"রাজকুমারী এস!" অনেক দিনের বিরহের পর, অনেক দুঃখের

পর রাজপুত্র তো এমনি করিয়াই আসিয়া অভাগিনী রাজকন্যাকে ডাক দিয়াছিল। রাজকন্যা তখন তার প্রিয়তমেরই পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। মুক্তির চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল সেই রাজপুত্র—সেই রাজপুত্রের রথ!—সে আর বিলম্ব সহিতে পারিল না, দুরুদুরু হৃদয়ে রাজপুত্রের রথের উপর গিয়া উঠিয়া বসিল।

তার পর বৈকালে যখন সে চৌ-রাস্তার মাথায় একলা দাঁড়াইয়া চারিদিকে আকুল হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল তখন কোথায় তার সেই রাজপুত্র, কোথায় বা তার রথ! তার চোখের উপর পৃথিবীর আলো ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত্রের রূপ ধরিয়া এ কোন্ রাক্ষস তাহাকে ভুলাইয়া গেল। তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

তার পর যখন বামার মার দোকানে আসিয়া পৌঁছিল তখন বাণবিদ্ধ পাখীর মতো সে লুটাইতেছে।

বামার মা একলাটি দোকানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। আজ সে মুক্তির স্বামীর চিঠি পাইয়াছে, সে লিখিয়াছে তীর্থধর্ম্ম-করা তার আর পোষাইতেছে না, বাড়ি ফিরিবার মন আছে, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, ভিক্ষা করিয়া করিয়া পথ-খরচের জোগাড় করিতেছে, টিকিটের দামটা জমিলেই সে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে। বামার মা ভাবিতেছিল টিকিটের দামটা কত? এবং কষ্টেসৃষ্টে কোনো-রকমে সেটা এখান হইতে পাঠানো যায় কি না। এমন সময় মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বামার মা তার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গিয়েছিলি মা?"

মুক্তি তার সেই বড়-বড় চোখ-দুটা হইতে আগুন-ঠিকরাইয়া বলিয়া উঠিল—"যমের বাড়ি!"

বামার মা হতভম্ব হইয়া মুক্তির সেই জ্বলন্ত চোখের পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তির স্বামীর চিঠি তার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময় একজন খরিদ্দার জোর-গলায় হাঁকিল—"এক পয়সায় পান।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনা

গত ৫ই ভাদ্র আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয়ের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইল বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সেদিন তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছেন। ইহাতে দেশের সকলেই আনন্দিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আজ যে উন্নতির অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার মূলে রামেন্দ্রসুন্দরের একান্ত যত্ন, কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁহার সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি জড়িত হইয়া আছে।

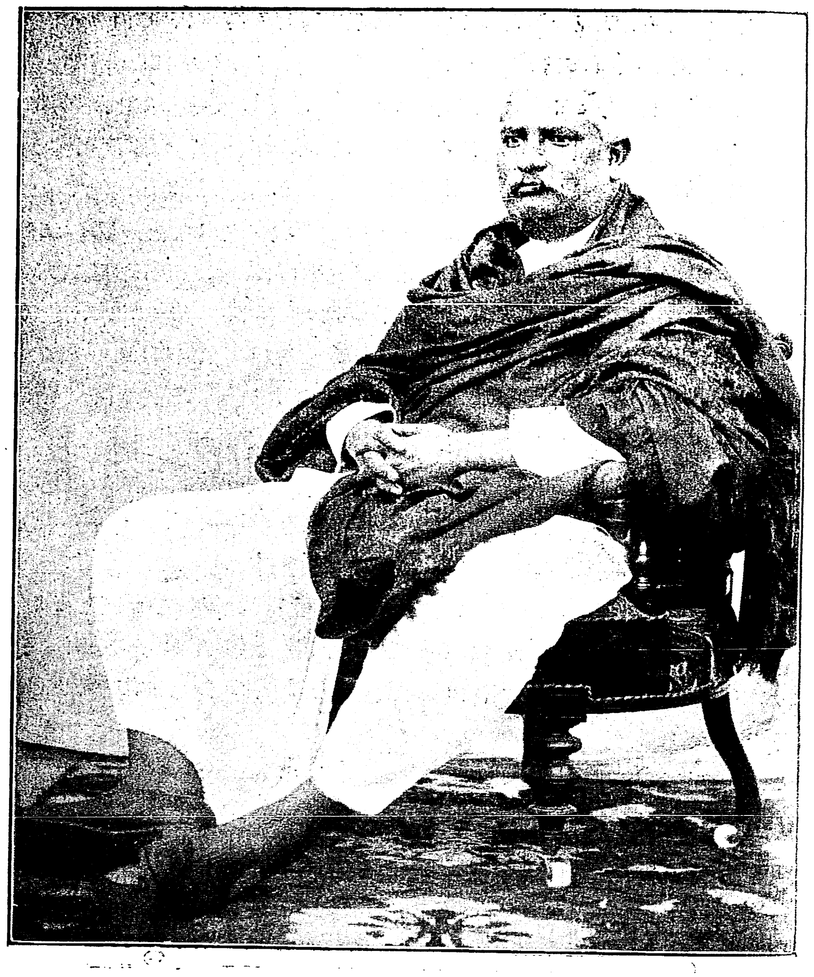

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এই সাহিত্য পরিষদকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাসাহিত্যের তিনি যে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি বিবিধ রত্ন দান করিয়াছেন; এবং তাঁহার দ্বারা বিজ্ঞানের যে অমর ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে তাহা শাখা-প্রশাখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চিরদিন তাঁহার জয় গান করিবে।

সেদিনকার সাহিত্য পরিষদের সভা বিদ্বজ্জন সমাগমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা-দেশের সকল-শ্রেণীর সাহিত্যিক সে দিন রামেন্দ্রসুন্দরকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিনন্দন করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ও একটি অভিনন্দন ছিল তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এই অভিনন্দনটি কবিবর স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন।

"সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দরী ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্রমুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নব প্রভাতে উদ্বোধনসঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমা দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ, এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।"

এই সভায় অনেকগুলি সময়োচিত কবিতা পঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।"

আচার্য্য ত্রিবেদী

প্রাচ্যের প্রাচীন বেদ—ত্রয়ী যার নাম—
সে তিনে আত্মস্থ করি' মনীষা তোমার
হে মনস্বী! নহে তৃপ্ত; অন্তর-ক্ষুধার
খাদ্য লাগি' অন্বেষণ তব অবিশ্রাম।
প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-বেদ—নব-জ্ঞান-ধাম—
শিখিলে শিখালে তুমি গূঢ় মর্ম্ম তার,
হে জ্ঞানী! ধ্বনিছে তব কণ্ঠে অনিবার
বিজ্ঞানের মহাযজুঃ প্রজ্ঞানের সাম।
দুর্গমে সুগম করে তোমার প্রতিভা,—
জিজ্ঞাসা-মশাল জ্বালি' চল তুমি আগে;
শিশু জিনি' চিত্ত চির-কৌতূহলী কিবা!
জ্ঞান-যজ্ঞ-শেষ-টীকা ভালে তবু জাগে!
অমূর্ত্ত বাণীর লাগি' গড় মূর্ত্ত বেদী
বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানে ধ্যানে বরেণ্য ত্রিবেদী!

জবাব

(জাপানি গল্প অবলম্বনে)

তার নাম কোয়াঞ্জি। সে ছিল নট;—নৃত্য করা তার ব্যবসা। রাজারাজড়ার সভা ছাড়া সে কোথাও নাচত না; তার নাচ দেখবার জন্যে লোকে যেন পাগল হয়ে থাকত, এমনি চমৎকার তার নাচ!

পুরাণের গল্প নিয়ে সে তার নৃত্য রচনা করত। সেই জন্য দেবদেবীর মতো তাকে সাজসজ্জা তরতে হত—তাঁদের মুখের মতো মুখস পরতে হত।

সেই সময় আর একজন লোক ছিল তার নাম জেঙ্গোরা। মুখস তৈরি করা তার ব্যবসা। তার মতন এমন চমৎকার মুখস দেশের মধ্যে কেউ তৈরি করতে পারত না!

কোয়াঞ্জির যখন যে মুখসের দরকার হত এই কারিগরের কাছ থেকে তৈরি করিয়ে নিত। জেঙ্গোরার হাতের মুখস পরে সে যখন নৃত্য-সভায় এসে দাঁড়াত—তখন লোকে অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে থাকৃত। ঠিক মনে হত যেন সেই পুরাণের গল্প থেকে মরা-লোক উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জেঙ্গোরার মুখসের বাহাদুরিতে তার নাচ আরো জমে উঠত।

জেঙ্গোরা কারিগর ভালো ছিল বটে কিন্তু তার একটা দোষ ছিল—সে ভয়ঙ্কর মাতাল! মদ পেলে সে আর কিছু চাইত না—হাতের কাজ তার মাটিতে গড়াগড়ি যেত।

কেউ কিছু কাজ দিতে এলে সে প্রায়ই হাঁকিয়ে দিত—কিন্তু কোয়াঞ্জির উপর তার একটু মনের টান ছিল। কোয়াঞ্জির নাচ সে দেখেচে। সে মনে মনে বল্‌ত—হাঁ কোয়াঞ্জি একটা লোকের মত লোক;—কারিগর বটে! সেই জন্য কোয়াঞ্জি কোনো একটা মুখস তৈরি করতে দিলে সে কোনো-রকমে মদের নেশা ঠেলে ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসত;—কোয়াঞ্জির জন্য মুখস তৈরি করতে করতে মদের নেশার মতোই একটা মৌতাত তার লেগে যেত।

কিন্তু একবার একটা উৎসবের সময় ভারি গোল বাধল;—মদের নেশা জেঙ্গোরাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। উৎসবে একটা নতুন রকম নাচ নাচবে বলে কোয়াঞ্জি একটা মুখস তৈরি করতে দিয়েছিল, কিন্তু সেবার কি-যে হল জেঙ্গোরার কাজের প্রতি কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

দিনে পর দিন যায়, উৎসব ক্রমেই ঘনিয়ে আসচে, তবুও জেঙ্গোরা অচল। তার স্ত্রীপুত্র সবাই মিলে তাকে বলতে লাগল, কিন্তু সে যেমন নেশায় ভোর হয়ে ছিল তেমনি ভোর হয়ে রইল। শেষে যখন উৎসবের আর দুদিন মাত্র বাকি তখন কোয়াঞ্জি নিজে এসে সাধ্য-সাধনা করতে লাগল।

কোয়াঞ্জিকে দেখে জেঙ্গোরা উঠে বসল বটে কিন্তু তার হাত তখনও নেশায় কাঁপচে। সে ভালো করে বাটালি ধরতেই পারলে না। যাই হোক্, দুদিনের মধ্যে কোনো-রকমে সে মুখসটা তৈরি করে ফেল্লে।

উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা, জেঙ্গোরা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, মুখসটা হাতে করে কোয়াঞ্জির বাড়ি গেল। কোয়াঞ্জি তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে মুখসটা নিয়ে নিজের মুখে একবার পরে দেখলে।

কিন্তু মুখসটা বড় হয়ে গেছে—এত বড় হয়ে গেছে যে মুখে থাকে না, ঢল্‌ঢল্ করে খুলে পড়ে।

আর সময় নেই। আজ রাত্রেই সেই নাচ;—মুখস না হলে সে নাচ হবে না। জেঙ্গোরার জন্যে সব মাটি! কোয়াঞ্জি ভয়ঙ্কর রেগে উঠল;—সে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে জেঙ্গোরার পিঠের উপর সজোরে এক লাথি মারলে। জেঙ্গোরা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তার ছেলে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে। বাপের এই অপমান দেখে তার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল। কিন্তু সে কি করবে? সে ছেলেমানুষ! কোয়াঞ্জির অসীম প্রতাপ! সে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ফুলতে লাগল।

নেশা করে করে জেঙ্গোরার শরীর ক্ষয় হয়ে এসেছিল—এই আঘাত সে কাটিয়ে উঠতে পারলে না, তাতেই তার মৃত্যু হল।

* * *

অনেক দিন কেটে গেছে। জেঙ্গোরার নাম তখন লোকে একরকম ভুলে গেছে; আর-একজন নতুন কারিগরের নাম তখন বাজারে জেগে উঠচে। সে নাকি চমৎকার মুখস তৈরি করে।

কোয়াঞ্জি অনেকদিন ধরে একজন ভালো কারিগরের সন্ধান করছিল। সেইই উৎসবের সময় ঠিকমতো মুখস তৈরি হয়নি বলে তার আর এপর্য্যন্ত সেই নূতন নাচটা নাচা হয়নি,—সেই জন্যে তার মনে ভারি ক্ষোভ ছিল। এই কারিগরের সন্ধান পেয়ে তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সে তখনই তাকে ডেকে পাঠালে।

কারিগর যখন এল তখন কোয়াঞ্জি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলে কেমন-ধারা মুখোস তৈরি করতে হবে। কারিগর মন দিয়ে সব শুনলে, সাবধানের সঙ্গে মাপজোক সব ঠিক করে নিলে।

তারপর যখন মুখোস তৈরি হয়ে এল তখন কোয়াঞ্জি একেবারে অবাক—এ যেন ঠিক জেঙ্গোরার হাতের কাজ! এমনটা সে আশা করেনি।

সেই মুখস পরে সে নাচতে গেল; সেদিনকার নাচ অনেক দিন পরে আবার খুব জমে উঠলো। কোয়াঞ্জি মনের আনন্দে ঘুরে-ফিরে সেই নাচ বার বার করে নাচলে;—চারিদিকে বাহবা পড়ে গেল।

তার পর সেই রাত্রে সে যখন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল তখন মুখ থেকে মুখস খুলতে গিয়ে দেখে মুখস আর খোলে না। টানাটানি করতে করতে মুখ যতই ফুলে উঠল—কাঠের মুখসটা ততই এঁটে বসে যেতে লাগল। প্রাণ যায়!

কোয়াঞ্জি হুকুম দিলে—কারিগরকে ডেকে নিয়ে আয়—সে এসে মুখস খুলুক।

কারিগর এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

কোয়াঞ্জি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"মুখস যে খোলে না!"

কারিগর গম্ভীরভাবে বল্লে—"কি করব হুজুর! সেবার আমার বাবার হাতের মুখস আপনার মুখথেকে খুলে পড়েছিল বলে আপনি তাঁর প্রাণবধ করেছিলেন—সেইজন্য আমি সাবধান হয়েছি—যাতে মুখ থেকে আর মুখস না খোলে! এতদিন ধরে আমি এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার সাধনাই করিছলুম।"

এই কথা বলে সে হেসে উঠল।

কোয়াঞ্জি জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ইউরোপের সমর-অভিনেতৃ রাজাগণ



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ



রুসিয়ার সম্রাট নিকোলাস



ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট—পয়েন্‌কার



সার্ভিয়ার রাজা



জর্ম্মান সম্রাট—কাইসার



অষ্ট্রীয়ার সম্রাট

পূজার তত্ত্ব

কর্ত্তা হাঁকিলেন—"কোথা গো গিন্নি! এই পূজোর তত্ত্বের কাপড়চোপড় সব বুঝে নাও। উঃ কদিন থেকে কি হেঙ্গামাটাই লাগিয়েছিল! ভিতর-বাড়ীর চৌকাট ত ডিঙ্গানই দায়;—বার-বাড়ীতে দুচারজন বন্ধুবান্ধবে মিলে যে নিশ্চিন্ত মনে দুদণ্ড বসে কাটাব তারও যো ছিল না। সেখানেও পঞ্চাশ বার লোক পাঠিয়ে তাগাদা!—এসগো এস, আমার কি আর কোন কাজ-কর্ম্ম নেই নাকি?"

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস যে মস্ত-একটা কাজের লোক একথা তাঁহার একজন মহাশত্রুকেও স্বীকার করিতে হইত। এমন কি তাঁহার কাজের দায়ে তাঁহার চাকরবাকরদের পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। তিনি দিনের বেলাটা যেরূপ অবিশ্রাম ধূম-সেবনে এবং রাত্রিবেলাটা ধান্যেশ্বরী-পূজায় কাটাইতেন তাহাতে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিও তাঁহাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিত না।

গিন্নি ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন;—স্বামীর ডাকে বঁটি, তরকারী ফেলিয়া সোৎসুকে

দালানের দিকে ছুটিলেন। ভবি দাসী এমন সুযোগটা ছাড়ে ত সে ভবিই নয়; বিড়ালের ভাগ্যে কিছু সবদিন শিকা ছেঁড়ে না। অনেক দিন হইতে তাহার বড়ি-চিংড়ির অম্বল—আর পুঁই-চড়চড়ি ও কলাই-দাল-পোড়া ঠিক দেশের মত করিয়া রাঁধিয়া খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। যথাসম্ভব শীঘ্র ইহার উপকরণসমূহ তাহার কোঁচড়ে আবদ্ধ হইল। বাড়তি ভাগ, কিছু চালও সে সংগ্রহ করিল; ভাতটার অবশ্য তাহার কোন দিন অভাব হয় নাই তবে এ চাল গুলির বদলে একদিনকার মুড়িমুড়কির যোগাড়টা হইয়া রহিল। তখনও গৃহিণী ফিরিলেন না দেখিয়া সহসা গুড়-তেঁতুলের কথাটা মনে পড়িয়া তাহার রসনা লোলুপ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হাঁড়িটা ছিল—সর্ব্বোচ্চ স্তরে, পাড়া একটু কঠিন, বিশেষ যদি সে সময় কেহ আসিয়া পড়ে—হাতের গুড়ের দাগটা সামলান দায় হইবে। লোভ ও যুক্তি যখন এইরূপে তাহার মনের মধ্যে যুদ্ধ-নিরত তখন সহসা কর্ত্তা-গিন্নির বাদানুবাদ শুনিয়া সে দ্বার-দেশে আসিয়া দালানের দিকে উঁকি মারিল।

কর্ত্তা দালানের একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া কাপড়গুলা ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন—গিন্নি নিকটে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকখানি হাতে লইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া দেখিতেছিলেন।

গৃহিণীর সাজসজ্জার আড়ম্বর বিশেষ-কিছু ছিল না—তাঁহার পরণে একখানি লালপেড়ে সাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার বালা আর গলায় একগাছি সরু হার। কিন্তু মুখশ্রী এমন উজ্জ্বল সুন্দর যে এই সামান্য সাজেই তাঁহাকে সুসজ্জিত দেখাইতেছিল। সিঁথির সিঁদুরটুকু সত্যই যেন তাঁহার রূপে হাসিতেছিল। আর যে দেবতার আশীর্ব্বাদ এই সিন্দুর-রেখা—সেই স্বামীদেবতা তাঁহার স্থূলদেহ, বিরক্তি-বিকৃত মুখশ্রী এবং মদ্যগন্ধমুখর কথাবার্ত্তা লইয়া পত্নীর পার্শ্বে বেশ-একটু বেমানান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গৃহিণী মেয়ে-জামাইয়ের কাপড় দেখিয়া বলিলেন—"এখন কত-রকম বারাণসী শাড়ী হয়েছে—দেখতে কত ভাল, আর দামও তেমন বেশী নয়, তাই কোন্ একখানা মেয়ের জন্য দিলে? ঐ এক বই ত আর দশটা মেয়ে নেই তোমার। আর জামাইয়ের উড়ানীখানা অন্ততঃ রেশমী দিলে ভাল হোত। জান ত গেল-বারের তত্ত্বে কত কথা শুনতে হয়েছিল। জামাই ত সেজন্য এ-মুখো হোল না—এবারও দেখছি আসবে না।"

"আবার প্যানপ্যানানি। স্যামি ত আর পেরে উঠিনে! তাদের পছন্দ না হয়—তত্ত্ব পাঠিয়ো না—।"

"জগৎসুদ্ধ লোক তত্ত্ব পাঠাবে,—আর আমরা পাঠাব না, কি করে যে একথা তুমি বল। তোমার তত্ত্বের জন্য ত তারা বসে নেই, পেলে বড়-মানুষও হবে না, তবে মেয়েটার তাতে নানা কথা শুনতে হবে—সেইজন্যই আমার বার বার বলা।"

"মেয়েকে ত ঢের দিয়েছি। বিয়ের সময় ত জামাই ছেড়ে কথা কয়নি। যদি চিরকালই ওদের মন যোগাব তবে আমার ছেলেদের কি হবে? তাদেরও ত লেখা-পড়া চাই, অন্নসংস্থান চাই।"

"হায়রে আমার কপাল! তাদের জন্য যদি

ভাবতে তাহলেও ত দুঃখ ছিল না। তোমার মদের সংস্থান ত আগে হোক্।"

আর কি রক্ষা আছে! কর্ত্তা রাগিয়া কাপড়গুলা তক্তা হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তবে থাক, আর কিছু পাঠাতে হবে না, কোথায়রে হরে—কাপড়গুলো নিয়ে যা ত।—আমি গরীব মানুষ তোমার খাঁই মেটাতে পারব না। তোমার লক্ষপতি বাপকে বলো, তিনি কিংখাপ বেণারসী যোগাবেন এখন।—ওসব আমার কর্ম্ম না।"

কর্ত্তা ত রাগিয়া চলিয়া গেলেন। গিন্নি চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাপড়গুলা তুলিতে লাগিলেন। ভবি তখন তাহার রসনা পরিতৃপ্তির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সেও অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া গৃহিণীর সাহায্যে তৎপর হইল।

লক্ষ্মীমণি সত্যই লক্ষ্মী। যাহা পাইলেন তাহা লইলেন, যাহা পাইলেন না, তাহা কষ্টসঞ্চিত সামান্য অর্থ হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিলেন। সুতী চাদরের পরিবর্ত্তে একখানা রেশমী চাদরও আনাইয়া লইলেন। অবশেষে ঘরে নানারকম মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া জামাই-বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইয়া দিলেন। গতবারে পিতার নিকট কিছু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবার আর চাহিলেন না;—কেন না—জামাতার মতিগতি দেখিয়া বড় ছেলেটার শিক্ষার ভার পিতাই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতা বড়-মানুষ নহেন। স্বামীর আয় তাঁহাপেক্ষা অনেক অধিক।

তত্ত্ব দেখিয়া শ্বশুর-বাড়ীর সকলে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—সে সকল কথা যে কন্যা সুশীলার শ্রবণ-সুখকর হইল না—তাহা বলা বাহুল্য। সুশীলা নীরবে শুনিল, নীরবে অশ্রুপাত করিয়া মনে মনে বলিল, বাবা কি সত্যি এর চেয়ে একটু ভাল তত্ত্ব পাঠাতে পারতেন না? বোঝেন না কি যে এজন্য আমায় কত সহ্য করতে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে মাকে স্মরণ করিল—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার জন্য তাঁহাকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হয়। মাতার কষ্টের স্মৃতির মধ্যে তাহার নিজের কষ্ট চাপা পড়িয়া গেল।

২

গতবারে সুশীলার স্বামী পূজার সময় শ্বশুর-বাড়ী যান নাই বলিয়া মা বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। এবারও সুশীলাকে লিখিয়াছিলেন—তাহারা দুজনে জোড়ে তাঁহার কাছে না আসিলে তাঁর বড়ই দুঃখ হইবে।

সুশীলা জানিত স্বামীকে রাজি করা সহজ হইবে না; শ্বশুরের প্রতি জামাতার অনুরাগের উচ্ছ্বাস ত ছিলই না—ইহার উপর অন্য পাঁচ জনে অনবরত এই বিরাগ-অনলে আহুতি দান করিতে ছাড়িত না।

রাত্রিকালে দেখা হইবামাত্র সুশীলা স্বামীকে বলিল—

"এবারে যাবে ত?"

"কোথা?"

"কেন কাল যে সপ্তমী পূজো। আরবারে তুমি গেলে না—মা কত দুঃখ করেছিলেন, চিঠিখানা পড়না—দেখনা কি লিখেছেন?"

সুশীলা কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বামী বলিল—"না আর চিঠি দেখাবার দরকার নেই। আমি যাচ্ছিনে। আদর ত খুব। তত্ত্ব দেখলুম—যা পাঠিয়েছেন—তা চাষা ভুষোরাও অমন তত্ত্ব পাঠায় না।"

"বাবার যে টাকার টানাটানি!"

"টানাটানি? কিপটে, কঞ্জুষ, মাতাল!"

সুশীলা ভাবিয়াছিল আজ আর স্বামীর কোন কথায় সে রাগিবে না, শান্ত সংযত ভাবে তাহাকে সাধিয়া অনুনয় করিয়া—যেমন করিয়া পারে কাল সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিন্তু আর বুঝি সে সংকল্প সে রক্ষা করিতে পারে না। তবু চোখের জল কষ্টে চোখে বাঁধিয়া শান্ত স্বরে বলিল—"ধুতীখানা যেমনই হোক, চাদরখানা ত রেশমী দিয়েছেন—আর আর—সেণ্ট—চিরুণী—বুরুস—রুমাল—এসবই দিয়েছেন।"

"হায় হায়! রেশমী চাদর—তার চেয়ে একখানা সুতী দিলে তবু পরার মত হোত। আঃ ছোঃ! এ সেই মার্কামারা সস্তা বিজ্ঞাপন দেওয়া চাদর! তোমার বাপ এ তত্ত্ব পাঠালে কি করে! এমন ছোটলোকের ঘরেও বিয়ে করেছিলুম।"

সুশীলার আর ধৈর্য্য রহিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন একলাই বাপের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহর। পিতা বাড়ীর ভিতর আহারে বসিতেছিলেন। স্ত্রীর সৌভাগ্যবশতঃ দিনের মধ্যে এইসময়টা একবার তিনি ভিতরে আসিয়া দেখা দিতেন। কন্যা আসিয়া মাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"মথুরা এলনা?"

পিতা বলিলেন—"জামাই আসেনি? তা না এলেই ভাল। তার ত আমাদের সঙ্গে কেবল পয়সার সম্পর্ক। এমন জামাই এর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।"

মা স্বামীকে চোখ টিপিলেন—কিন্তু কর্ত্তার কি না সেদিকে লক্ষ্য! বলিলেন—"সব সমান; যেমন বাপ তেমনি বেটা! টাকাটাই সংসারে চিনেছেন—এমন যক্ষির হাতেও মেয়ে দিয়েছিলুম।"

সুশীলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিজে স্বামীর সহিত ঝগড়া করুন,—কিন্তু অন্যের মুখে স্বামীর নিন্দা অসহ্য। যদি সতীর মত যদি এ নিন্দা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত!

কিন্তু পশুপতি সতীর প্রাণত্যাগে উন্মত্ত হইয়া প্রলয়-উৎপাদন করিয়াছিলেন। আর তাহার পতি? হয়ত পত্নীর মৃত্যুতে সে মঙ্গলই জ্ঞান করিবে!

* * *

"মা, মা!"

"বাছা আমার, ধন আমার!"

"আর পারিনে।"

"না পারলে চলবে কেন মা? আমরা যে মা কষ্ট সইতেই এসেছি।"

"এত কষ্টের জীবনে দরকার কি মা?"

"দরকার আছে বই কি? ভগবান তোমাকে জীবন দিয়েছেন কর্ত্তব্য পালনের জন্য।"

"এমন দুঃখের জীবন নিয়ে কি মা, কর্ত্তব্য পালন করা যায়?"

"যায় বই কি?"

"তাত দেখছি মা; কি কষ্ট সয়েই তুমি আমাদের মানুষ করেছ।"

"মানুষ কি করেছি মা? তা যদি করে থাকি—তবে আর মৃত্যুর কথা মনেও এন না। সহ্য করে কর্ত্তব্যপালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ ক'রে—প্রকৃত মানুষ করে তুলবে—তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।"

"মা আশীর্ব্বাদ কর—চরণ-ধূলি দাও, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করতে পারি। কত সৌভাগ্য যে তোমার মত মা পেয়েছি, সকল মা তোমার মত হোক্—এই প্রার্থনা করি।"

সুশীলা মাতার বক্ষে তাহার তপ্ত মস্তক রক্ষা করিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সমালোচনা

ধ্রুবের সাধনোপ্যাখ্যান—শ্রীযুক্ত অনঙ্গ চন্দ্র দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম ইম্পিরিয়েল প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্য। ধ্রুবের কাহিনী ছন্দে রচিত। লেখকের বাল্য-রচনা। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন,—"লেখাগুলি নিতান্তই কাঁচা।"

জ্যোতিষ দর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বি, এ, এফ, আর, মেট, এস্‌প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত। ইউনিভার্সিটি প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে—এক টাকা; সাধারণের পক্ষে—পাঁচ সিকা মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই; প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও আমাদিগের চোখে পড়ে নাই। গণিতের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এ গ্রন্থে জ্যোতিষশিক্ষায় প্রথম সোপান রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সরল, রচনা প্রণালীও সহজ, কাজেই যে উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। এগ্রন্থে অকাশ-মণ্ডল, 'সূর্য্য', 'সৌরজগৎ', 'পৃথিবী', 'চন্দ্র' প্রভৃতি গ্রহাদির স্থান ও কাল নির্ণয়, এবং তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ সম্যক পরিপূর্ণভাবেই সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মতের সহিত পাশ্চাত্য মতাদির সমন্বয় গ্রন্থকার বেশ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেখকের জ্ঞান গবেষণা ও অধ্যবসায়ের প্রচুর প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। রচনার গুণে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা পাঠে প্রচুর শিক্ষালাভ করিবেন।

নীরব সাধনা। স্বর্গগতা সুবোধবালা দেবী প্রণীত। আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলির অধিকাংশই লেখিকার বিবাহের পূর্ব্বে রচিত। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকার জীবন ও হৃদয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখিকারদুই খানি চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মরণ

চাঁদের আলোকে ধোয়া প্রকৃতির বুকে
অশান্ত হৃদয় যেন লুটাইতে চায়;
—ওরই মত সুধাঝরা, সাদা হাসি-রাশি-ভরা
অনন্তের পরিপূর্ণ সুখে,
আকাশের দিগন্ত সীমায়।

চাঁদের আলোর মত অমনি সে সাদা
আবরণ টেনে দিই জীবনের পরে;
ঢাকা রবে ভাঙা বুক, শতকোটি ভুলচুক,
জীবনের শত হাসি কাঁদা—
ঢাকা রবে মরণের ঘরে!

দিবসের আলোমাখা পশ্চিমের কোণে
লালে-লাল লালে-লাল আবিরের ধূলি
তাহারি সীমার শেষে, অনন্ত শান্তির দেশে
মরণের বিশ্রাম শয়নে
—সাধ যায় এ বেদনা ভুলি!

নিশার কালিমা-হরা চাঁদেরই মতন
জীবনের অন্ধকার করিবে সে দূর,
নামাইয়া সব বোঝা, করিবে সরল সোজা,
পরিপূর্ণ সৌরভে মগন
অমনি সে সুন্দর মধুর!

অপূর্ব্ব এ জ্যোতি-জ্বালা সাঁঝের আলোকে
সবুজ পাথারে যেন ডুবে যায় আঁখি
থেমেছে থেমেছে সব, জীবন কল্লোল রব
মরণের ঘুম আসে চোখে;
—সাধ যায় ডুবে ভুলে থাকি!

বেদনা-কাতর হৃদি শান্তি নাহি মানে,
কোথা তুমি বন্ধু বলে ডাকে অবিরাম
কোথা তুমি মিতা মোর, কোথা তুমি দুঃখচোর,
চিরাশ্রয় আছ কোনখানে
—ব্যথিতের অনন্ত আরাম!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(১৩২১ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

ভারতী কার্য্যালয়,

৩ সানি পার্ক (3, Sunny Park) ওল্ড বালিগঞ্জ রোড—কলিকাতা।

সন ১৩২১ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অকাল সমাধি (গল্প)	...	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ ... ১০৭৬
অর্ঘ্য (কবিতা)	...	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী ... ১১৪২
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বর্গীয় ডাক্তার)		শ্রীমতী অনুপমা দেবী ... ১০৫০
অভাগা (গল্প)	...	শ্রীদানীশচন্দ্র সরকার ... ১০৪৭
অভিসারে (কবিতা)	...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ... ৭৬১
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ... ১০৮০
আধুনিক ভারত	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৩৮, ৯৭৫, ১১০৮
আধুনিক ভারতের সভ্যতা	...	ঐ ৬৭৮, ৭৬৯
আর্য্যভট্ট	...	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, ... ৮৪০
আর্য্যদিগের বিচ্ছেদ স্থানের নির্দ্দেশ	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ৮৮৪
আরবের অজ্ঞান যুগ	...	শ্রীমোহম্মদ কে, চাঁদ ... ১০৪২
এক ঢিলে দুই পাখী (গল্প)	...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ৭৫৬
এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সভ্যতা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৮৬৩
কিশোরীমোহন	...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ ... ৯৫৯
কোকিল (সচিত্র)	...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ১০৬০
কোথায় (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, ... ১০৪৯
গোপালকৃষ্ণ গোখেল (সচিত্র)	...	শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ... ১১৩৮
ঘুমের পরী (কবিতা)	...	শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ... ৭৯২
চন্দন-মধু (গল্প)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ... ৮২৭
জন্মভূমি (কবিতা)	...	শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী ... ১০২৬
জ্যোৎস্না-নিশীথে (কবিতা)	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ... ১০২৬
জল্লেশ্বরে শিবরাত্রি	...	শ্রীমতী অনুজা ঘোষ ... ১০৯৯
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি	...	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৬৬৩
		৭৬২, ৮৬৮, ৯৬০, ১০০৮
জোন্ অব্ আর্কের চরিত্রের একদিক	...	শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত ... ৮৫৬
তন্দ্রাতীরে (কবিতা)	...	শ্রীসুধারকুমার চৌধুরী ... ৮৬২
তাতৈল	...	শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত ... ৮০৪
তারকনাথ পালিত (মহাত্মা)	...	... ... ৭২৩
তীর্থ দর্শন	...	শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ... ১০১৫
তীর্থ-স্মৃতি (কবিতা)	...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ... ১০০৭
দশকর্ম্মের ভাষা	...	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী বি-এ ... ১০২৭
দান (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ, ... ১০৫৬
দামিন-ই-কো (সচিত্র)	...	শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত ... ৬২৭
দুঃখী (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৭০০
নবাব (উপন্যাস)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, ৬৮৮, ৭৯৩, ৮০৭, ৯৩২, ১০২০, ১০৬৬

পশ্চিম আসিয়ার শৈববর্ম্ম প্রচারের নিদর্শন		শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ... ১০৬৪
প্যারিসের পুলিস (সচিত্র)	...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ১১০৪
পিপীলিকা	...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ... ৬৫৯
পিপীলিকাদিগের যুদ্ধপ্রণালী	...	ঐ ৭৭৬, ৯০৭
পিপীলিকার সমাধিযাত্রা	...	ঐ ... ১০৫০
পুরুলিয়ার কুষ্ঠাশ্রম (সচিত্র)	...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ... ৯৭৯
পুরাতত্ত্বে ভৃগুর শীর্ষদিগের স্থান	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ১০৩৩
প্রতারণা (কবিতা)	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ... ৮০৮
প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ	...	শ্রীবিনোদবিহারী রায় ... ৭৮২
প্রাচীন সভ্যতার উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব		শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ... ৯৬৫
প্রাচীন ভারতে লৌহ (সচিত্র)	...	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু বি-এল ... ১১৩৪
বর্ষবিদায় (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল ... ১০৫৭
বসন্তের কথা	...	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ... ১০৫৮
বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু (সচিত্র)	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১১২০
বঙ্গে অকাল বার্দ্ধক্য	...	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ ... ৭৯৭
বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর	...	অধ্যাপক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ৮৯৩
বীরবন্দনা (কবিতা)	...	শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী ... ৮০৮
বৈজ্ঞানিক জীবনী (সচিত্র)	...	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, ... ৬৪৬
ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কাহারা নাবালক ?	...	শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ... ৬৫২
ভুঁই-কুমীর (সচিত্র)	...	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী ... ৯৯৯
মরণের রং (কবিতা)	...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ... ১০৪১
মৃত্যু-স্বপ্নবরা (গল্প)	...	শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ১১১৮
মার্কটোয়েন (সচিত্র)	...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ... ৬৩৯
যমালয় ও নরকসম্বন্ধে ভৌগলিক তত্ত্ব	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, ... ৭৪৭
যুদ্ধে ব্যোমযান (সচিত্র)	...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ৯২১, ১০৩৬
যোগীত্রয় (গল্প)	...	শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯০০
রবার্ট ব্রাউনিং	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৭১৯
লাইকা (কাহিনী)	...	শ্রীমতী হেমনলিনা দেবী ৬৩১, ৭২৯, ৮১১, ৯১১
লিসু	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাহিন্তা ... ৮২২
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা ৭২৫, ৯৭২, ১০৫২
ঐ	...	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ৮০৫
ঐ	...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি-এল, ... ৮৮৯
সমুদ্র-বক্ষে (গল্প)	...	শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০০২
সাময়িকপ্রসঙ্গ (সচিত্র)	...	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ, প্রভৃতি ৯৬৮
সাঙ্কেতিক ভাষা	...	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল ... ১০৩২
স্রোতের ফুল (উপন্যাস)	...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ৭০৬, ৭৮৩, ৮৫১, ৯৪৫, ৯৮৪, ১০৮১
হায় (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ১০৭২
য়ুরোপে প্রলয় (কবিতা)	...	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন ৯৫৮

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার)	১০৫১
অষ্ট্রীয়ার প্রধান মন্ত্রী ...	৭১৮
অষ্ট্রীয়ার সমর-সচিব ...	৭১৮
আরাইল মন্দির হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দৃশ্য ...	৮৫০
কালীপ্রসাদ হোম করিতেছে (বহুবর্ণ)	৯৭৪
কিশোরীমোহন রায় ...	৯৫৯
কুষ্ঠরোগীগণের আমোদপ্রমোদ ...	৯৮০
কুষ্ঠাশ্রমের অধিবাসী ...	৯৮১
কোকিলের দেশান্তরে গমন ...	১০৬৩
কোকিল-ছানার আহার ...	১০৬২
কোকিল-ছানার উড়িবার অবস্থা ...	১০৬৩
কৃষ্ণবিহারী সেন ...	১০০৯
গোপালকৃষ্ণ গোখেল ...	১১৪১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ...	৬৭০
ট্রেণের কামরায় ...	৭৫৭
ডারুইন ...	৬৪৭
তারকনাথ পালিত ...	৭২৫
দীনবন্ধু মিত্র ...	১১২৫
নিরুপমা — শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত ...	১০৯৭
পঞ্চানন নিয়োগী ...	১১৩৬
প্রথম মানব ও মানবী আদম ও ঈভ	৮২৭
প্লাট-ফর্ম্মে ...	৭৫৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১১২৪
বর্ষশেষ (বহুবর্ণ) ...	১০৫৬
বাউল (বহুবর্ণ) ...	৮১০
বাচ্ছা-কোকিল ডিম ফেলিয়া দিতেছে	১০৬১
বিদ্যাসাগর ...	৭৬৭
ব্যোম-বাহিনী ...	৯২৭
ভুঁই-কুমীর ...	১০০০
ভূপেন্দ্রনাথ বসু ...	৯৬৮
মহাশ্বেতা ...	৭২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মন্মথনাথ মিত্র (কুমার) ...	৯৬৪
মার্কটোয়েন ...	৬৪০
মার্কটোয়েন এবং হেলেনের সমুদ্র স্নান	৬৪০
মার্কটোয়েনের বার্ম্মদায় অবস্থানকালে শেষ চিত্র	৬৫২
ঐ শেষ সমুদ্রযাত্রাকালীন ছবি	৬৪৪
মুসলমান-প্রভাব-শূন্য হিন্দু মন্দির—এলাহাবাদ ...	৮৪৭
যীশুর শবরক্ষা (বহুবর্ণ) ...	৬৩০
রাজকৃষ্ণ রায় ...	৬৭২
রাজনারায়ণ বসু ...	৭৬৪
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ...	৭৬৮
রাসিয়ার প্রধান সমর-সচিব ...	৭০৭
রাসিয়ার ফরেন মিনিষ্টার ...	৭১৭
লেপ্টনাণ্ট ভন হিড্‌সেন (এরোপ্লেনে শূন্যমার্গে প্যারীতে ব্যোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিতেছে) ...	১০৩৭
শান্তিধাম ...	১০১০
শান্তিধামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ...	১০১১
শূন্য যুদ্ধ, (এরোপ্লেন হইতে "জেপলিন" আক্রমণ) ...	১০৩৬
সভাস্থলে ...	৭৬০
সরস্বতী ...	৮৯২
সা আজমলের নিবাসস্থান—এলাহাবাদ	৮৪৯
সাওতাল বালক ও স্ত্রীলোকগণ ...	৬২৬
সাঁওতালদিগের নাচ ...	৬৯৮
সার্ভিয়ার প্রধান মন্ত্রী ...	৭১৮
সার্ভিয়ার প্রধান সমরসচিব ...	৭১৮
সুবীর ও তাহার ভগিনীদ্বয় ...	১০১৪
সুলতান ...	১১০৭
সুলতান জলমগ্ন মূর্ত্তির দিকে যাইতেছে ...	১১০৭
সোমেশ্বর মন্দির—আরাইল ...	৮৫৮
হাইড্রো এরোপ্লেন ...	৯৩০

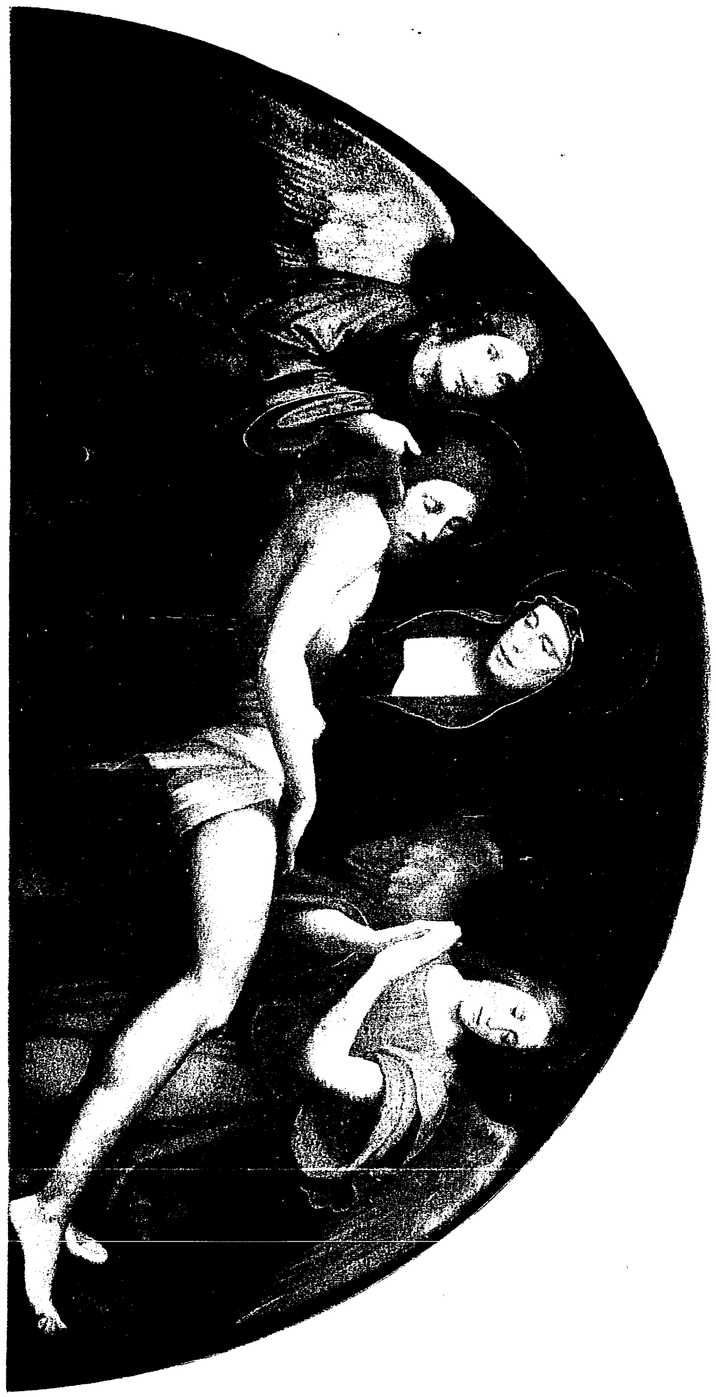

মহাত্মা বিশুর শবরক্ষা

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২১ [৭ম সংখ্যা

লাইকা

(১৮)

পথে পথেই দিন কাটিতেছিল, ক্রমে বর্ষা আসিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন "তোমরা এইবার কোন অতিথিশালায় থাক সাবিত্রি! এখন আর বারিকে লইয়া পথে ঘুরাইব না।"

সাবিত্রী বলিল, "ক্ষতি কি! কিন্তু তোমরা বলিলে কেন মা? তুমি কি থাকিবে না?"

"থাকিব, কিন্তু এখন কয়দিন নয়; কাশী হইতে আমার ডাক আসিয়াছে, গুরুদেব আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি দিনকতক থাকিব না,—তাহার পরই আসিব।"

বারির মুখেও ভীতিচিহ্ন দেখা গেল কিন্তু সে কিছু বলিল না, সাবিত্রী দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "না না না? তুমি আমাদের একলা ফেলিয়া যাইও না! না হয় সেবারের মত পার্ব্বতী মাসীর নিকট চল আমরা সেইখানেই থাকিব —কিন্তু এক্‌লা কোথায় যাইও না।"

সাদরে তাহার গায়ে হাত দিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কি বলিতেছ মা! একা কি তোদের কোথায় রাখিয়া যাইতে পারি? উপযুক্ত স্থান ছাড়া কি আমার বারিকে রাখিয়া যাইতে পারি? পঞ্চানন দ্বিবেদীর বিধবা রাণীদেবীকে ত তুমি চেন,—তাঁহাকেই তোমাদের কথা বলিয়াছি, তিনি আগ্রহ সহকারে তোমাদের নিজের গৃহে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাই বলিতেছিলাম কালই তোমরা সেই খানে চল,—পূর্ণিমার দিন আমার সেখানে প্রয়োজন—কাজ শেষ হইলেই আমি চলিয়া আসিব—ফিরিতে বড় জোর দেড় কি দুই মাস হইবে।"

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না, সন্ন্যাসিনী বারিকে বলিলেন, "চুপ করিয়া কেন বারি? তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

বারি শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।" সন্ন্যাসিনী একদৃষ্টে তাহার মুখভাব

লক্ষ্য করিতেছিলেন,—চক্ষু অত্যন্ত স্থির-তাহা হইতে কিছু উপলব্ধ হয় না, কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তের মৌন দৃঢ়তা ভেদ করিয়াও একটি শান্ত বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার মুখেও সে ম্লান রেখার ছায়া পড়িল—অতি স্নিগ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন,—

"না মা, কিছু লুকাইও না আমাকে বল—তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে আমায় বল, আমি যাইব না।"

ঈষৎ ভীতিপূর্ণ চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাবিত্রী এই সব কথা শুনিতেছিল,—তাহার প্রতি একবার মৃদু হাস্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বারি বলিল, "না মা লুকাইব কেন? একটু ভয় হয় বৈ কি! কিন্তু তাই বলিয়া আপনি যেখানে বিশ্বাস করিয়া রাখিতে পারেন আমরা সেখানে থাকিতে পারিব না কেন? কি বল দিদি?"

মুখ ফিরাইয়া সাবিত্রী বলিল "কি জানি ভাই! কেবল তোমার জন্যই আমার ভয় হইতেছে! নতুবা আমি—"

বাধা দিয়া দ্রুতকণ্ঠে বারি বলিল, "আমার জন্য?—না না দিদি, তুমি আমার জন্য কিছু ভাবিও না,—" পরে সন্ন্যাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল— "দেখুন মা! সত্যই আপনি যাইবেন শুনিয়া প্রথমটা আমার বেশ একটু ভয় হইয়াছিল কিন্তু এখন আর কিছু ভয় নাই জানিবেন, আমি দিদিকে লইয়া বেশ থাকিব।"

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসিনী তাহার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন—"জানি জানি! আমি তোমাকে প্রথম দেখিয়াই চিনিয়াছি রাজকুমারি! তুমি—"

বারি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—'ওকি ও কি মা! তুমি জ্ঞান হারাইয়াছ? পথে ঘাটে কাকে কি বল?"

বলিতে বলিতে বারি হাসিয়া উঠিল, দেখাদেখি সাবিত্রীও হাসিল।

(১৯)

রাণী দেবীর বাটীর সংলগ্ন অথচ বহির্মুখী একখানি ক্ষুদ্র গৃহে তাহারা রহিল; সমস্ত দিনমান রাণীর পুত্রবধূ কন্যা প্রভৃতির সঙ্গে কাটাইয়া রাত্রিতে সেই ঘরে দুইজনে শয়ন করিত। কোন অভাব ছিল না, ভয় ছিল না,—সাবিত্রী বেশ প্রফুল্ল থাকিত—বারিও ভালই ছিল কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেন বিষণ্ণ হইত,—রাণীর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বলিত "ছোট মায়ি! তোমার বিবাহ করিয়া ঘর করা উচিত।—কেন তোমাদের সন্ন্যাসিদের কি বর মেলে না?

সাবিত্রী বলিত—"না, নহিলে আমরা এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

তোমার বরটি উহাকে দাও ত ভাল হয়! সতীন সহ্য করিতে পারিবে ত?"

মীরা বলিতেছিল যে "অমন সতীন—" কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ হইল না বারি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—বলিল,—"ছি ছি মীরা! তুমি যে আমায় মা বল! ও কথা কি উচ্চারণ করিতে আছে! আর দিদি তুমিই বা কি বেহায়া মানুষ ভাই!"

সাবিত্রী হী হী করিয়া হাসিতে লাগিল, মীরা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"না

মায়ি, আমি তোমার কথা বলি নাই, মোটের উপর একটা কথা বলিতে ছিলাম মাত্র! বড় মাটী বড় ঠাট্টা করিতে পারেন!"

তখন মীরার ভ্রাতৃবধূ ললিতা বলিল, "আমি কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলি নাই—বল দেখি মায়ী, সত্যই কি তোমাদের এইরূপ যৌবন এমনি ছাই মাখিয়া কাটাইবার জন্যই হইয়াছিল?"

উচ্চ হাসিয়া সাবিত্রী বলিল "কেন আমার ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝি জান না?"

ললিতা বলিল "সত্য নাকি! হাঁ ছোট মায়ি!"

বারি একটু হাসিল, তাহার মুখ বিষণ্ণ একটু ভীতভাব যুক্ত।

মীরা বলিল, "তুমি কি শুনিতেছ ভাই,—বড় মায়ী কেবলি হাসি করেন!"

সাবিত্রী বলিল, "না সত্যই মীরা, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বারি ত তা জানে না!"

মীরা বলিল, "বিবাহ হইয়াছে ত বরের ঘর কেন করেন না?"

"করিব, শীঘ্রই যাইব, আমি ত এক্ষণই যাইতে চাই,—তাহারা ডাকে কৈ?"

মীরা পুলকিত হইয়া বলিল,—সত্য নাকি? কোথায় বিবাহ হইয়াছে মাইজি!"

"দক্ষিণে!"

"দক্ষিণে!" কোথায়? বর কেমন?"

একটু চাপা হাসি হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "আঃ ওই কথা শুধাসনে ভাই!

ওই জ্বালাতেই ত মরিয়া আছি! বর বড় কালো!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "আর আমাদের ছোট মায়িরও তবে বিবাহ হইয়াছে?"

অম্লানমুখে সাবিত্রী বলিল "না, এখনও উহার বর পাওয়া যায় নাই—মা ত উহার বর খুঁজিতেই গিয়াছেন!"

"সত্য?" সকলেই বারির প্রতি চাহিল। বারি সাবিত্রীকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "তুই কি মিথ্যাবাদী!—না মীরা, আমারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে!

বারির ঈষৎ ক্রুদ্ধ সলজ্জ মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সাবিত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল—মীরা একটু অপ্রভিত ভাবে বলিল, "তা ত আমি জানি. উনি কেবলি ঠাট্টা করেন! কিন্তু তুমি আপনার স্বামীর কাছে থাক না কেন মা! না সন্ন্যাসীদের স্ত্রী লইয়া বেড়াইতে নাই?"

"তা জানি না; আমার স্বামী এখন নিরুদ্দিষ্ট,—তাই—

"বারি থামিয়া গেল,—সাবিত্রী একটু একটু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—

"বটে। তাত জানিতাম না ভাই! তোর বরের উদ্দেশ নাই! তা তুই ঘাট বাট মাঠ পথ যমুনা কিনারি" খুঁজিয়া ফিরিস না কেন! নিশ্চয় সে চোরকে মিলিবে!"

বারি ভ্রূকুঞ্চিত করিল, সাবিত্রী তাহা দেখিয়াও দেখিল না—বলিতে লাগিল,—"বড় সুন্দর সময় বারি! শাওন মেঘের কালো রঙে আজ রাতি কত আঁধার দেখিয়াছিস? চল, আমরা দুজনে তোর শ্যামকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়ি!"

এমন সময় মীরা বলিল, "চুপ কর বড় মায়ি! দেখিতেছ না ইনি এসকল কথায় কত ব্যথা পাইতেছেন?"

সবেগে সাবিত্রী বলিল—"হাঁ জানি খুব জানি—ইনি বরের কথায় খালি ব্যথাই পান! কেন! কেন তা হবে? যে জিনিস্‌টা হাতের কাছে না পাইলাম তাহার স্মৃতিটিকে শুধু যে চোকের জলে দিনরাত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কি কথা?"

ব্যাকুলভাবে বারি বলিল "দিদি! দিদি! তুমি—"

সাবিত্রী বলিল,—"হাঁ, আমিত ওই কথাই বুঝি ভাই! যে হৃদয়ে তোমার স্বামী দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ তাহা দীপ জ্বালিয়া দিনরাত আঁধার করিয়া রাখা বা তাঁর চরণে কেবল ঝরা ফুলেরই অর্ঘ্য দেওয়া কতদূর ভাল বা মন্দ তা আমি জানি না! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দকে খাটো করিয়া নিজের বেদনাকে এত বড় করিয়া রাখা—আমিত বুঝিনা বারি যে ইহাতে কাহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়!—আমার মনে হয় ইহা ভগবানের উপর বিদ্রোহ—মানুষের সঙ্গে ঝগড়া আর নিজের আত্মাকে একটা জন্মের কায হইতে বঞ্চিত করা মাত্র!"

বারি কাতর ভাবে বলিল,—"বিদ্রোহ? দিদি! ভগবানের উপর বিদ্রোহ? কেন একথা বলিলে?—তোমরা বুঝিবেনা কিন্তু আমার অন্তর্যামীও কি বুঝিবেন না যে কত কষ্ট কত ব্যথা আমি পাইতেছি? মনে করি যে এ কথা আর ভাবিব না—ভাবিয়া দুঃখ পাইব না, একমাত্র ভগবান্‌কে ভাবিয়াই দিন কাটাইব। কিন্তু পারি না কেন ভাই? তোমাদের মত নিশ্চিন্ত হইতে পারিনা কেন দিদি?—আমি কি করিলে ভাল হয় তুমিই বল না?"

সাবিত্রী চমকিত হইয়া উঠিল। কথাগুলি বলা অন্যায় হইয়াছে বুঝিল। সহসা ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সহাস্যে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"ঘটে! রাগ করিলি যে—বারি?—আমি বুঝি সেই কথা বলিলাম?—ভাব্‌ না কেন তাকে—বারণ করি নাই ত। তবে আমিই কি বাণে ভাসিয়া আসিয়াছি না কি?—আমার কথা একবারও ভাবিনি না?"

বারিও হাসিল,—বলিল, "তুমি?—তোমার কথা আর বিশেষ করিয়া কি ভাবিব দিদি!—তুমি যে আমার নিশ্বাস বায়ু, তুমি যে আমার শরীরের রক্ত,—ভাবি বা নাভাবি তোমাকে হারাইলে কি এতদিন আমি বাঁচিতাম?—"

প্রফুল্ল বিদ্রূপে সাবিত্রী বলিল, "সত্য নাকি? বারি,—আমি কি বাতাসের মত লঘু? —তবে ত হঠাৎ উড়িয়াও যাইতে পারি!"—

বারি বলিল,—"সেই ভয়েই ত মরিয়া থাকি ভাই,—আমার কপাল যে বড় মন্দ!"

তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কপট রাগে সাবিত্রী দূরে গিয়া বলিল,—"তুই যা! তোর জ্বালায় আমি পারিব না! সব তাতেই নাকীসুর?—"

হাসিয়া বারি বলিল,—"কেন? নাকীসুরটা কি এত মন্দ নাকি?"—

'না খুব ভাল! ঠিক্ যেন ভূঁতল্ কেঁমেঁলা!"—

বারি হাসিতে লাগিল, বলিল "না দিদি! তা নয় ভাই,—নাকীসুরটা বড় মিষ্টি সুর, —বড় করুণ বড় মধুর! আমায় বড় ভাল লাগে।—"

সাবিত্রী বলিল "ইস্ দেখিস! ঢলিয়া পড়িলি যে! ভূতের আওয়াজ তোকে এত ভাল লাগে—তা ত জানিতাম না!"—

তাহার পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বারি বলিল, "দূর পাজি!—ভূতের সুর কে বলিল?—তবে ঐ যে সুরকে লক্ষ্য করিয়া তুমি প্রথমত কথা তুলিয়াছ সেই সুরের কথা বলিতেছি! সে যে বুকের কথা প্রাণের কথা!—নাকের ভিতর দিয়া সর্ব্বদা বুকের ভিতরের হাওয়া আসা যাওয়া করিতেছে—তাই বোধ হয় সে প্রাণের সব সংবাদ জানে!—মুখ কথা কয় নিজের—আর নাক বুঝি সেই মরণের ভাষাটিই গেয়ে যায়! জিভ কয় কথা—নাক গায় গান; কোনটা মিষ্টি দিদি?"—

সাবিত্রী বিস্মিত পুলকে তাহার কথা শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"ওরে আমার ভূতের রাণী—নাকীসুরের পেত্নি!—তোমার ও সুর তোমাতেই থাক্! আমি গান-শুনিতে চাহিনা!—মিষ্টি যতই মিষ্টি হোক্ দিন কত তাহা খাওয়া যায়? মাঝে মাঝে টক্ চাই!"

হাসিয়া বারি বলিল, "তা তোমার এখন কি চাই তাই বল না! দেখি যদি জোগাড় করিতে পারি!"

"চাই যে তুই একটু আমার সঙ্গে ঝগড়া কর!"

বারি বলিল,—"গায়ে পড়িয়া না কি?"

অলস ভঙ্গীতে দেয়ালে গা হেলাইয়া সাবিত্রী বলিল,—

"আরে তাইত সাধ যায় বোন্! কিন্তু করে কে? আহা হা থাকিত যদি সতীন্ তবেই না মনের সব সাধ মিটিত!"

সকলে তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল,—ললিতা বলিল, "সে সাধও হয় আপনার?"

'খুব হয় রে খুব হয়! কিন্তু বারিটা এমন নির্ব্বোধ যে কিছুতেই আমার বরকে বিবাহ করিতে চায় না!"

বারি হাসিয়া বলিল,—"তোর কালো কুৎসিৎ বরকে লোকে বিবাহ করিবে কেন?"

চোখ ভুরু নাচাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া সাবিত্রী বলিল,—"করিতেই হইবে! এখন ইচ্ছায় করিতিস ত ভাল ছিল, না হয় ত দেখিস্ একদিন জোর করিয়া মাথায় সিঁদুর দিয়া বিবাহ করিবে!"—

উচ্চ হাসিয়া বারি বলিল, "সত্য নাকি? তবে ত তুই আমার হবু সতীন! তবে গায় পড়িয়া ঝগড়াটা বাকী কেন থাকে—আগে হোক!" বলিয়া বারি সাবিত্রীর প্রসারিত ক্রোড়ে শুইয়া পড়িল। তখন সাবিত্রী তাহাকে আরও টানিয়া লইয়া বলিল,—"অহ হ!—ঘুম পাইয়াছে আমার 'খুকীর বড় ঘুম পাইয়াছে,"—পরে সুর করিয়া বলিল, "আব আব রে নিদাঁ হামারা ঘর; শুতল দুলালীয়া পালঙ্গা পর!"—

সে আরও কি বলিতেছিল—কিন্তু

সবেগে বারি উঠিয়া বসিল; বলিল, "ইহারই নাম বুঝি ঝগড়া?—"

সাবিত্রী বলিল, "নিশ্চয়! না হইলে তুই এত রাগিলি কেন?"

রাত্রি অধিক হইয়াছিল,—মীরা বলিল, "বহু! তুমি যাও, ভাইএর আসিবার সময়—হইয়াছে!" ললিতা হাসিয়া বলিল, "সময় হইয়াছে ত আমার কি? তুমি উঠনা!

মীরা বলিল, "তুমি আগে গিয়া জল ও আসন রাখ গিয়া আমি পরিবেশন করিব। আর হাঁ মায়ীদের জন্য যে খাবারটা আমি তুলিয়া রাখিয়াছি তাহা এখনই আনিয়া দাও!"

সাবিত্রী বলিল, "আমাদের জন্য আবার কি খাবার করিয়াছ ললিতা—? আমরাত খাইয়াছি!—"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল,—"সেদিন ছোট মায়ি যে সন্দেশ করিতে শিখাইয়াছেন তাহাই করিয়াছি,—ভাল হয় নাই, তবু আপনারা একটু খাইবেন না কি?"—

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"খাইব বৈ কি!—কি বলিস্ বারি?—কিন্তু—"

বারি বলিল,—"খাইবেই যদি তবে আর কিন্তু কি?—তবে হাঁ, বহু মা?—এখন আর আমাদের প্রয়োজন নাই কাল সকালে দিও।"—

ললিতা তাহাতে সম্মত হইল।—

(২০)

তাহারা উঠিয়া গেলে সাবিত্রী শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিল।—বারি দ্বারে অর্গল দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া তাহার পাশে আসিল। সাবিত্রী বলিল, "আমি আজ কি হইয়াছি তা জানিস্ বারি?"

বারি হাসিয়া বলিল—"না, তুমি আবার হইবে কি?"—

স্বর ভারি করিয়া সাবিত্রী বলিল,—"বলিতেছি। কিন্তু দেখ দেখি বাহিরে কি বড় মেঘ? বিজুলী জ্বলিতেছে?"

বারি বলিল, "নিশ্চয়! মেঘের ডাক্ শুনিতে পাইতেছ না?"

"কিন্তু কৈ মৌলসরীর গন্ধ ত পাইতেছি না?"—

বারি বলিল—"সে কি? এখন দুয়ার দিলাম তাই নতুবা এতক্ষণ ত ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল! কেন বল দেখি—আজ এমন সুগন্ধের তলব করিতেছ?"—

"প্রয়োজন ছিল,—বারি!"

"কেন!"

"কাছে সরিয়া আয়—আরো, আরো আরো কাছে!"

তাহার ঘন আলিঙ্গনে বিব্রত হইয়া বারি বলিল,—"দিদি তোমার কি হইয়াছে বল না!"

মৃদু গদ্‌গদ ভাবে সাবিত্রী বলিল, "বারি! আজ আমি তোর লাইকা—তুই আমার রাজকুমারী বলিয়া গান ধরিল,—

আজু মাহ ভাদর, গরজত মেঘবর মিলল শয়ন পর রাজ কুমারী!"—সহসা তাহার গান থামিয়া গেল,—বারির শিথিল দেহ তাহার বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে!—বিকল ভাবে সাবিত্রী ডাকিল,—"বারি! বারি! ওভাই অমন করিলি কেন?"

বারির স্বর রুদ্ধপ্রায়, সে ক্ষীণ হাসির

সহিত বলিল,—"কিছু না ভাই! কিজানি কেন বুকের ভিতর যেন সব চুপ হইয়া গিয়াছিল! ভয় নাই।"

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না, সে বুঝিল কথা কহিতে বারির কষ্ট হইতেছে। কপাল ঘর্ম্মাক্ত,—আঁচল দিয়া দিয়া মুছাইয়া সে তাহাকে বাতাস দিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে বারিই কথা কহিল,—"দিদি, তুই ভয় পাইয়াছিলি না?"

সাবিত্রী বলিল,—"হাঁ, কিন্তু তুই এখন থাম্, কথা কহিস না।"

বারি বলিল, "তবে তুই পাখা রাখ, শুইয়া পড়।" সাবিত্রী নীরবে তাহার পাশে শুইল।

রাণীর অন্তঃপুরের সকল কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। গৃহপালিত কুকুর মাঝে মাঝে বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিতেছে। প্রবল ঝিল্লী রবের মিলিত একতানে বর্ষা রজনীর অকাল প্রগাঢ়তা সূচিত!

আপনার শীতল হস্তখানি বারির ললাটে রাখিয়া অতি মৃদুস্বরে সাবিত্রী ডাকিল—"বারি!"

বারিও বুঝি এই ডাকটুকুরই অপেক্ষা করিতেছিল! সাদরে সাগ্রহে বলিল,—"কি বহিন্!"

বারি আর উত্তর পাইল না, কিন্তু মাথার উপর সাবিত্রীর শ্বাসকম্পিত ওষ্ঠ চিবুকের স্পর্শ অনুভব করিল। অন্ধকার ঘর, নীরব শয্যামধ্যে পরস্পরের মনোভাব দুজনেই বুঝিতেছিল! সংসার ত অভাবময় কিন্তু সহসা কোথা হইতে কেমন করিয়া একটি কথা একটু আদর অথবা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখা দিয়া হৃদয়ের সকল ব্যথা সকল জ্বালা দূর করিয়া দেয়!

দুইজনে অনেক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের হাতে হাতে একটি নিবিড় বেষ্টন, নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশিতেছে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রাত্রি আরও গভীর হইয়া উঠিল। তখন সাবিত্রী প্রশ্ন করিল,—"বল্ বারি! হাসির ছলে আমি আজ তোকে কত কষ্ট দিয়াছি! বল্ তুই কি ভাবিতেছিস্?"

বাহুতে ভর দিয়া বারি একটু উঁচু হইয়া বসিল। বলিল,—"কষ্ট? কৈ কি কষ্ট দিলে ভাই! কিছু না, বিশ্বাস কর দিদি, কিছু কষ্ট পাই নাই! আর কি ভাবিতেছি? সে কথাও কি বলিতে হইবে তোকে?"

সাবিত্রী বিস্ময়ে মুখ তুলিল—বারি কি বলিতেছে? তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে?—ধীর স্বরে বলিল, "কষ্ট পাস্ নাই ভাই?—সত্য বল বারি!—আমি বড় ব্যথা পাইতেছি! তোর—"

বাধা দিয়া বারি বলিল—! "তুমি কিছু ক্ষোভ করিও না দিদি!—বোধ হয় কষ্টে আমি তেমন হই নাই।"

ব্যগ্রভাবে সাবিত্রী বলিল,—"কষ্টে নয়! তবে কিসে! লাইকার নাম করিয়া ঠাট্টা করা অন্যায় জানিয়াও আমি তোকে সেই কথা বলিলাম—"

সাবিত্রী থামিয়া গেল,—এবং তৎক্ষণাৎ বারি বলিয়া উঠিল,—"অন্যায়! কে বলিল অন্যায়! সে নাম সে প্রসঙ্গ জীবনে আমি কবার শুনিয়াছি যে ঠাট্টা হোক তামাসা

হোক্ তাহাতে কষ্ট পাইব? সুখে,—বড় আহ্লাদের আবেশেই আমার দেহ অবশ হইয়াছিল দিদি! তুমি বুঝিবে না আজ আমার জীবনের অন্ধকারের মধ্যে যেন সূর্য্যালোকের স্বপ্ন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি!"

স্তম্ভিত ভাবে সাবিত্রী তাহার কথা শুনিতেছিল। হাত বাড়াইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া সে বলিল,—"না সত্যই বুঝিলাম না, এত সুখের কথাই বা কি হইল ইহাতে?"

বারি কিছুক্ষণ উত্তর করিলনা,—পরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল,—"বুঝিবে না তাহা বুঝিয়াছি! কেহই বুঝে নাই! দিদি, কেন জানি না যে ওই নামটি—শুধু ওই নামটি মাত্র শুনিবার জন্য আমার প্রাণে কতখানি তৃষ্ণা জাগিয়া থাকে। কিছু জানি না,—স্বামী কেমন সে কথা ত বড় দূরের, দিনান্তে মাসান্তে কেহ একবার সে নামও করিত না! আমি যে কত কষ্টে ঘর ছাড়িয়াছি—তুই তাহা বোঝ দিদি!

বারি চুপ করিল। স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে তাহার শ্বাসের দ্রুত শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"বারি! ভগিনি! তুই কি বলিতেছিস্ ভাই! কেন অমন সুরে কথা বলিস্ বল? আমার সহ্য হয় না—তোর কথা ভাবিলে আমার মন এত খারাপ হইয়া উঠে—তাই আমি ভাবিতে পারি না!"

তাহার হাত লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বারি বলিল,—'কেন দিদি! কেন ভাবিতে পারিবে না! ভাবিও।—আমার বড় ইচ্ছা করে কেউ আমার কথা ভাবুক অর্থাৎ কাউকে আমি আমার সব কথা মন খুলিয়া বলি—প্রাণের কথা প্রাণে রাখিয়া আমার বুক যেন লোহার মত শক্ত হইয়া গেছে ভাই!"

এতক্ষণে বারি বুঝিল সাবিত্রী কাঁদিতেছে, তাহার চোখের জল বড় বড় ফোঁটায় তাহার হাতে পড়িতে লাগিল। ঘন শ্বাসের পরিস্ফুট কাতরতা ঘরখানিকে যেন বেদনা পূর্ণ করিয়া দিল! বারি তাহার রোদন দেখিয়া প্রথমত স্তম্ভিত হইয়া ছিল,—তাহার পর বুঝিল যে করুণহৃদয়া রমণীর প্রাণে তাহার বেদনা যে সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অন্য মূর্ত্তি নাই ভাষা নাই,—বিগলিত অশ্রুজলেই তাহার আকৃতি প্রতিফলিত—রোদনরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠগুঞ্জনই তাহার একমাত্র বাক্য!

বারি নীরবে সাবিত্রীর অশ্রুজল উপভোগ করিতে লাগিল! সংসারে সে পিতামাতার একমাত্র স্নেহাধার ছিল,—তাহার কষ্টে ক্লান্তিতে সেবা করিবার শত শত সখী ও দাসী ছিল, কিন্তু হৃদয় দিয়া হৃদয় অনুভব করিবার লোক ছিল কি? তাহার প্রাণের অশ্রু তাহার চোখে আসিবার পূর্ব্বেই অন্যের নয়নে তাহা প্রবাহিত হয়, এমন দিব্য বন্ধুতা সে আর কোথাও পাইয়াছে কি?

বারির রুদ্ধ অশ্রু নয়নকোণে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু হৃদয় তাহাকে অশ্রু বলিয়া স্বীকার করিতেছিল না;—তাহা ব্যথা,—কিন্তু তখন প্রাণ যেন সাগ্রহে তাহাকেই

বরণ করিয়া লইতেছিল। সে বুঝিল না যে ইহা সুখ না দুঃখ।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। তাহার পর কখন বারির আকর্ষণে সাবিত্রী শয্যায় শুইয়াছিল ঠিক নাই—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝিল তাহার বাহুতে মাথা রাখিয়া সাবিত্রী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বারি আর নড়িল না,—নিজের হাতখানি তেমনি এলায়িত করিয়াই অতি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মার্কটোয়েন

আমেরিকার মার্কটোয়েন একজন বিখ্যাত লেখক; তাঁহার কৌতুক রচনা পাঠকদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসের সৃষ্টি করে। ইনি কেবল রচনাতে নয় কথা বার্ত্তাতেও সকলের মনোমুগ্ধ করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনভঙ্গিতে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। সকলের কথা মিষ্ট লাগে না; যাহাদের চিত্তহরণ ক্ষমতা আছে তাহাদের সামান্য কথাটীও বলিবার ভঙ্গিতে অতি উপভোগ্য হইয়া ওঠে। মার্কটোয়েন এই স্বাভাবিক শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন। ইহার উপর তাঁহার স্বভাবও সাতিশয় মধুময় ছিল!

কোনও বিষয় পড়িবার সময় তার ভিতরকার ভাল কথাগুলিতে দাগ দেওয়া মার্কটোয়েনের একটা অভ্যাস ছিল। একখানি পত্রিকায় এই কথা গুলির নীচে তিনি দাগ দিয়াছিলেন।

"It has been said that a man's last will and testament best expresses his character. Does it? Do we not know a man best from the simple act, look or speech of daily life, when the consciousness is unaware?"

মার্কটোয়েনের ছোট বড় সকল কাজে ও কথা বার্ত্তায় তাঁহার চরিত্রের মধুরতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। জীবনের শেষ কয়েক মাস তিনি বার্ম্মদার (Bermuda) কোন এক ভদ্র মহিলার আতিথ্যে যাপন করিয়া ছিলেন। ইনি মার্কটোয়েনের এই সময়কার কার্য্যকলাপ কথাবার্ত্তা একত্র গ্রথিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মার্কটোয়েন ছোট মেয়েদের বড় ভাল বাসিতেন। এই ভদ্রমহিলার হেলেন নামে একটি মেয়ে ছিল। মার্কটোয়েন এই মেয়েটীর স্নেহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই বার্ম্মদাতে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সংসারে কেবল ছোট মেয়েদেরই অস্তিত্ব থাকা উচিত। ছেলেরা যেপর্য্যন্ত মানুষ না হয় সে পর্য্যন্ত সংসারের পক্ষে তারা অশোভন। তিনি সব জিনিসই নবীন চাহিতেন। তিনি বলিতেন অল্পবয়স্ক গুবড়ে পোকা হওয়াও বৃদ্ধ নন্দনপক্ষীর চেয়ে ভাল। (১)

তিনি সাধারণতঃ প্রাতঃকালটা বই লইয়া

(১) "It is better to be a young beetle than a bird of paradise."



মার্কটোয়েন
"Innocence At Home"



মার্কটোয়েন এবং হেলেনের সমুদ্র স্নান

কাটাইতেন। বই ও সিগার (cigar) তাঁহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিত। তাঁর বিছানার পুঁথি রাশি, হাতের লেখা কাগজ এবং লিখিবার সরঞ্জাম বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকিত।

কি দিনে কি রাত্রিতে অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত তিনি পড়িয়া কাটাইতেন। কোথাও যাইতে হইলেও প্রায়ই তিনি কোন একটা বই সঙ্গে রাখিতেন। কার্লাইলের ফরাসী বিদ্রোহ, পেপির ডায়ারি, কিপলিঙের গ্রন্থাবলী এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি সর্ব্বদাই হাতের কাছে রাখিতেন। এছাড়া সমসাময়িক কত রকম পুস্তকই প্রতিনিয়ত ডাকে যে তাঁহার নিকট আসিত।

বাড়ীতে মার্কটোয়েনের শেষ দিনগুলি যে সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁর ছিল বন্ধুরাও এইখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন।

একবার তিনি কোনও মহিলাক্লাবে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া সেক্রেটারী মহাশয়ের উপকারার্থ "Rules of Etiquete in reaching heaven" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেক্রেটারী মিষ্টার পেন যদি গাইড্ ছাড়া একা স্বর্গে উপস্থিত হন তবে সে বিপদ হইতে ইহার সাহায্যে তিনি উদ্ধার লাভ করিবেন।

বৈকালে সাগরতীরে গিয়া চা পান করিতে তিনি বেশ আমোদ অনুভব করিতেন। সে সময় তিনি গল্পগুজব করিয়া বা ছেলে মেয়েদের সহিত খেলায় যোগ দিয়া কাটাইতেন। একদিন এই অপরাহ্ণিক বিশ্রাম কালে তিনি একটী গল্প বলিয়াছিলেন তাহা এই।

তখন তিনি স্যান্ট্রানলিয়েজের সংবাদদাতা। একটা নৌকাদৌড়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁকে অনেক দূরে যাইতে হইয়াছিল। বাচ খেলার আগের দিন রাত্রিকালে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি সহরে পৌছিলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে শুনিতে পাইলেন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। তাই তিনি আবার নিশ্চিন্ত মনে শয্যা গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন সেদিন আর বাচ খেলা হইবে না। বৈকালে অনেক বিলম্বে ঘুম হইতে উঠিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তখন ত একেবারে অবাক্। দেখিলেন পরিষ্কার ফুটফুটে দিন। বৃষ্টির নাম গন্ধও নাই। বাচ খেলা বেশ নির্ব্বিঘ্নে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে বৃষ্টির শব্দ তিনি শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁর জানালার অদূরস্থিত একটী ঝরণার জল পড়ার শব্দ।

কি ঔৎসুক্যের সঙ্গেই না এই সামান্য গল্পটী সকলে উপভোগ করিতেছিল! অন্যের মুখে এ গল্প গল্পই নয়, কিন্তু মার্কটোয়েন যখনই কোন গল্প বলিতেন তাহা নিতান্ত সামান্য বা পুরাতন হইলেও লোকের চিত্ত বিমোহিত করিত। নহিলে আর তিনি মার্কটোয়েন কেন!

একবার সেখানকার বায়োস্কোপ কোম্পানী তাঁহার চিত্র দেখাইতেছিল। মার্কটোয়েন সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁর অবিকল একটি চিত্র বসিয়া ধূমপান করিতেছে। তিনি সাতিশয় প্রমোদিতভাবে বলিলেন, এ চিত্র এতদূর অবিকল যে,

তাঁহার মনে হইতেছে তিনি যেন আরসিতে মুখ দেখিতেছেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী এবং স্বরও রেকর্ডে ঠিক উঠিয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দৈবাৎ সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।



মার্কটোয়েন বার্ম্মদায় অবস্থানকালে শেষ চিত্র

বর্ম্মদায় হেলেনকে তিনি পড়াইতেন। শিক্ষা দেওয়ার তাঁর একটী প্রণালী ছিল এই, শিক্ষার্থিণীকে তাহার প্রত্যেক ভুলগুলি ৫০ বার করিয়া সংশোধন করিতে হইত। তাঁর লেখার খাতার অনেক পাতাই এইরূপ সংশোধন করা শব্দ এবং ফরাসী তর্জ্জমায় পূর্ণ।

তিনি সুন্দর সুন্দর শব্দ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার করিতে বড় ভাল বাসিতেন।—একটি শ্রবণসুখকর কোনও শব্দ পাইলে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত সেটীকে সযত্নে রক্ষা করিতেন। কোন লেখায় সে শব্দটী উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কেবল কৌতুক-কথার রচয়িতা ছিলেন তাহা নহে, ভাব ও চিন্তাসম্পদেও তাঁর সমস্ত লেখাই সম্পদশালী।

সন্ধ্যা বেলা তিনি তাস খেলিতেন। রাত্রির পর রাত্রি তাস খেলায় বসিয়া বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করিতেন না। Heart খেলা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহার প্রধান কারণ এ খেলাটীতে তিনি নিপুণ ছিলেন। প্রথম প্রথম অনবরত তিনি জিতিতেন। কিন্তু যখন আর সকলেও

তাঁর মত খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিল তখনো কিন্তু তাঁর খেলার উৎসাহ একটুও কমে নাই। যদিও খেলায় হারিতে তাঁর বড়ই খারাপ লাগিত। তিনি একবার Bridge খেলা শিখিতে আরম্ভ করেন—কিন্তু এতগুলি গোলমেলে নিয়ম শিখিবার ধৈর্য্য তাঁর নাই, এই বলিয়া সে শিক্ষা ত্যাগ করেন।

বৃষ্টির দিন গুলি তিনি বড়ই উপভোগ করিতেন। একবার Bermuda অবস্থান কালে তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিয়াছিল। মার্কটোয়েনের তখনকার আনন্দ দেখে কে? বাড়ীর সকলে তাঁর ঘরে মজলিস্ জমাইয়া বসিতেন। আর তিনি কত রকম গল্পই করিতেন। Suffragette প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন "যত দেরীই হউক যত সময়ই লাগুক এই দাবী তাহারা লাভ করিবেই,—যদিও তাঁহার বিশ্বাস অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের দাবী গ্রাহ্য হইবে।"

স্বর্গ এবং পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার মত ও বিশ্বাস, মার্কটোয়েনের চিহ্নিত একটী পুস্তকের নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।—

"স্বর্গ এমন কোনও উজ্জ্বল স্থান যে সেখানে সোনার রাস্তা ও মুক্তার প্রাচীর বিরাজিত এমন আমি মনে করিনা। বরং সে স্থান কোনও নির্জ্জন বনদেশ যেখানে তৃণরাজি সবুজ এবং ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সারাটী দিন কুলু কুলু গীতে বহিয়া যায়। আমি স্বর্গকে এইরূপ ভাবে ভাবিয়াছি যে, যাহারা পরস্পর ভালবাসে সেখানে তারা মিলিত হইবে এবং বিচ্ছেদের ভাবনা তাহাদের থাকিবে না। (২)

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুইটী ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে ছেলে দুটী তাঁহার সঙ্গে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল তাই আলাপ ভাল রকম জমিতেছিল না। মার্কটোয়েন সহজ সুন্দর ভাবে গল্প বলিয়া অবিলম্বে তাহাদের সে সঙ্কোচ দূর করিলেন।...তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী ছেলে স্বাভাবিক ভাবে একটী গল্প আরম্ভ করিল।

গল্পের অনেকটা বলা শেষ হইলে ছেলেটী মার্কটোয়েনের চোখে এমন একটী ভাব লক্ষ্য করিল যাহাতে তাহার মনে হইল তিনি গল্পটী জানেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি গল্পটী আগে শুনেছেন?" তিনি বলিলেন "না।" সে গল্প বলিতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই অর্থপূর্ণ চোখের ভাবটী প্রকাশ পাওয়ায় সে পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল—কিন্তু উত্তর সেই একই "না"। পরে গল্প বলা শেষ হইলে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যই মার্কটোয়েন কি গল্পটী আগে শুনেন্ নাই?" এবার মার্ক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া স্বীকার করিলেন, গল্পটী তাঁর

(২) "I do not think of heaven as a glittering place with streets of gold & walls of pearl but more like the quiet woods where the grass is green & the little brook sings all day. I have thought of heaven as a place where those who love shall be together, free from all thought of parting,

নিজেরই রচনা। ছেলেটী বলিল—"তবে যে দু'বার বলিলেন, শোনেন্‌নি ?"

"তুমি ত মাত্র দুবার জিজ্ঞাসা করেছ,—তা বিনয়ের খাতিরে দুবার নির্ব্বিঘ্নে মিথ্যা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন সত্য কথা বল্‌তেই হ'ল।"—

শ্রোতারা এই ঘটনার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলেন।—কোনও বিষয়ে তিনি কাহাকেও অপ্রস্তুত করিতে চাহেন এরূপ



শেষ বক্তৃতা-যাত্রাকালীন—ছবি। হাঁটিতে অসমর্থ তাই চেয়ারে স্থানান্তরিত হইতেছেন।

সন্দেহ হইলে সকলেই তাঁকে তিনবার প্রশ্ন করিতেন!

একদিন রবিবারে (৩রা এপ্রিল) এইরূপ একটী টেলিগ্রাম আসিল !—

"To,—Mark Twain
Hamilton, Barmuda"

"The clowns of Barnum & Bailey's circus, recognising you as the worlds greatest laugh-maker, will consider it an honour if you will be their guest at Madison Sq Garden Sunday afternoon, April 3rd, at two. Will you please answer collect—Barnum & Balley.

("A reply of fifty words has been prepaid on this message.")

তিনি পড়িয়া খুব হাসিলেন, তার পর আমাদের পড়িতে দিলেন।—বলিলেন "এখনি আমায় উত্তর দিতে হবে, তাদের উৎকণ্ঠায় রাখ্‌বনা।" উত্তর লিখিলেন—

"I am very, very sorry, but all last weeks dates are full. I will come week before last, if that will answer.—Mark Twain "Twenty five collect."

Widrow Wilson তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মার্কটোয়েন তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতেন আর বলিতেন—তাঁর সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। Mr. Wilson সে সময় Princeton Universityর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।—

সে সময় ক্রিকেট খেলার সময়। সকলেরই মুখে ও চিন্তায় ক্রিকেট খেলার কথা। মার্কটোয়েন তখনও ভাল করিয়া এ খেলা বুঝিতেন না তবু বলিতেন—যখন সমস্ত জাতটা এ খেলায় মেতে গেছে তখন নিশ্চয়ই এ ভাল খেলা হবে।"

ক্রমে এমনি হইল যে তিনিও ক্রিকেট খেলার একজন দৈনিক ও মনোযোগী দর্শক হইয়া পড়িলেন। প্রথম দিন খেলা দেখার পর তিনি স্থির করিলেন, দর্শকদের ভদ্রতা রক্ষা-কল্পে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করা আবশ্যক।

"নির্ব্বোধ দর্শকের পক্ষে তাহার বুদ্ধিমান্ পার্শ্ববর্ত্তীকে ক্রমাগতই খেলার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ভাল নয়।—

"জিজ্ঞাসা করিতে হইলেও ২।১ মিনিট পর পর প্রশ্ন করা উচিত। না হইলে পার্শ্ববর্ত্তীর বিরক্ত হইয়া যাওয়ার কথা।

"সাধারণতঃ যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ও যেরূপ উত্তর দেওয়া হয় তাহা নিম্নলিখিত রূপ। খুব ভালরূপে এগুলি পড়িয়া দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত।

নির্ব্বোধ দর্শক। "ওখানে ওই জিনিসগুলি কি ?"

বুদ্ধিমান পার্শ্ববর্ত্তী। "উইকেট্।"

নিঃ।—"ওগুলি কিসের জন্য ?"

বুঃ।—"পরিশ্রান্ত হইলে এর উপর বসিবার জন্য।"

উপরে যাহা লিখিলাম তাহা তাঁর শেষ বয়সের কথা। এই ঘটনাগুলির অতি অল্প দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় তিনি যে ভদ্রমহিলার অতিথি ছিলেন তিনি মার্কটোয়েনের কতকগুলি ছবি তুলিয়াছিলেন। তাহার দু একখানি প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ডারুইন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল একহিসাবে ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা সারা-জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটাইয়াছেন, ফলও যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি তাদৃশ কার্য্যকরী নহে। আবার এরূপ অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে যাহা স্বল্পায়াসে সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার ফল বহুদূরগামী। ডারুইনের বৈজ্ঞানিক সাধনা একদিকে যেমন বহুআয়াসসাধ্য অপর দিকে তাঁহার আবিষ্কারগুলির প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বহুশাস্ত্র তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার ফলে নূতন নূতন আলোক লাভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কাহারও আবিষ্ক্রিয়া এত অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়া ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে অবিসম্বাদীরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চার্লস রবার্ট ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী স্রুবেরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রবার্ট ওয়ারিং ডারুইন। তিনি একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ইরাসমাস ডারুইন। ইনিও একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ডারুইনের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এখন হইতে তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার তাঁহার বড় ভগিনীগণের উপর পড়ে। ডারুইনের ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন পাঁচজন, তিনি সকলের কনিষ্ঠ। ডারুইন পিতাকে খুব ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কথা অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৮ সালে তিনি স্রুবেরী স্কুলে প্রেরিত হন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার বাটলার; ইনি পরে লিচফিল্ডের বিশপ হন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে ডারুইন তাঁহার মত চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। সেইজন্য ১৮২৫ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু এইখানে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্যের প্রথম সূচনা আরম্ভ করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার গ্রাণ্টের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে ডারুইন সমুদ্রতীরস্থ জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করিতে যাইতেন। এইরূপে ১৮২৬ সালে তিনি প্লিনিয়ান সোসাইটিতে দুইটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবন্ধে "চার্লস

ডারুইন কর্ত্তৃক ধৃত" এই কথাগুলিতে যে তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়।

দুইবৎসর এডিনবরাতে থাকার পর তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তাহার পর ধর্ম্মযাজকের কার্য্য তাঁহার জন্য অবধারিত হয়। সেই জন্য তিনি ১৮২৭ সালে বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেন্সলোর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে পরিচালিত হইয়া যায়। অধ্যাপক হেন্সলো প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ পরে খনিজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ছাত্রদিগের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিতেন। সেইজন্য ছাত্রদিগের মনের উপর তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। ডারুইন হেন্সলোর খুব প্রিয় পাত্র হইলেন, এমন কি বেড়াইতে যাইবার সময়ও হেন্সলো তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। সেইজন্য ডারুইনের সহপাঠীরা তাঁহাকে "হেন্সলোর সহচর" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। ডারুইনের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ জন্মাইয়া দিবার জন্য অধ্যাপক হেন্সলোর নিকট সমস্ত জগৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহার সংসর্গ না পাইলে ডারুইন ডাইরুন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। ১৮৩১ সালে হেন্সলোর পরামর্শে ডারুইন ভূবিদ্যা পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ভূবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে হেন্সলোর সহিত ওয়েলস্ প্রদেশে যাত্রা করেন। এই ভূবিদ্যা বিষয়ক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

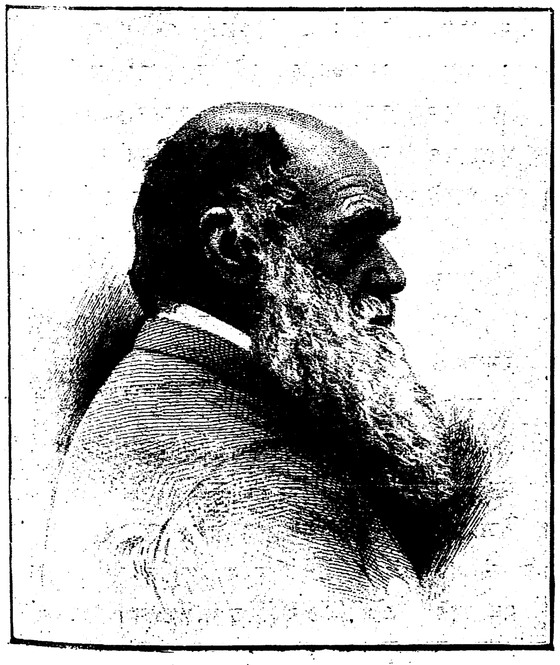

ডারুইন

"বিগল্"এ সমুদ্র যাত্রা

তিনি শিকার বড় ভাল বাসিতেন। একদিন শিকার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপক হেন্সলোর একখানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে অধ্যাপক হেন্সলো তাঁহাকে

লিখিয়াছিলেন যে "বিগ্‌ল্‌" নামক জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা সার্ভে করিতে যাইতেছে এবং জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ফিজরয় সঙ্গে লইবার জন্য একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি ডারুইনকে এই কার্য্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন এবং ডারুইনকে এই পদ গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। ডারুইন এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণের এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, এই সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের ধর্ম্মযাজকের পদোপযুক্ত পাঠের বিঘ্ন উপস্থিত করিবে। অবশেষে তাঁহার খুল্লতাতের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহার পিতা সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হন। পিতার সম্মতি পাইয়া ডারুইন ১৮৩১ সালে ২২এ ডিসেম্বর তারিখে বিগ্‌ল জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেন। তাঁহার মাহিনার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, কাপ্তেন সাহেবের ঘরেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা ও সাধনার প্রধান সহায়ক হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হম্‌বোল্ট সাহেবের "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়া দেশ ভ্রমণে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। পৃথিবী ভ্রমণের এই সুবিধাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাঁহার সমধিক বর্দ্ধিত হইল। এই সময়কার তাঁহার চিঠি পত্রে জানা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন, নানা দেশের পশুপক্ষী তরু বৃক্ষরাজি, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এতই আনন্দ লাভ করিতেন যে সময় সময় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাই হইত না। তিনি "বিগ্‌ল্‌" এ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর পরে যখন দেশে ফিরিলেন তখন তিনি ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ও উদ্ভিদবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী। দক্ষিণ আমেরিকার বিবিধ জীবকঙ্কাল (fossils), গ্যালাপেগো দ্বীপের বিবিধ পক্ষী, সমুদ্রের মধ্যস্থিত প্রবালস্তূপ (coralreep) প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন ও পরীক্ষার পর তাঁহার মনে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (theory of evolution) ক্রমশঃ সুস্পষ্টাকারে প্রতীয়মান হইতেছিল। ১৮৩৬ সালে ৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিবার কল্পনা স্বতই ত্যক্ত হইল। আমেরিকা হইতে তিনি নানা প্রাণীর এবং খনিজ কঙ্কাল প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, এখন এইগুলি শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সরকারি তহবিল হইতে এক হাজার পাউণ্ড (পনের হাজার টাকা) প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় গত সমুদ্রযাত্রার ফলস্বরূপ আহৃত প্রাণিবিদ্যা ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তিনি "জিওলজিকাল

সোসাইটির" সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূবিদ্যা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হইয়াছিল।

১৮৩৯ সালে ২৯এ জানুয়ারী তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ করিয়া প্রায় তিন বৎসর লণ্ডন সহরে বাস করিয়াছিলেন, তাহার পর লণ্ডন হইতে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী ডাউন নামক একটি নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করিতে যান। এই স্থানেই তিনি বরাবর ছিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় গবেষণা এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ডারুইনের সকল গবেষণার পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে; কয়েকটি স্থূল বিষয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ

ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ দার্শনিক অনুমানরূপে প্রাচীন গ্রীস দেশে ও ভারতে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই, তবে মনে হয় যে প্রাচীন ভারতে এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ দুইটি অনুমানে বেশ সুস্পষ্ট—প্রথম দশাবতার বাদ, দ্বিতীয় আত্মার পরাবর্ত্তনবাদ (transmigration of soul)। এই দশাবতারবাদের মধ্যে ক্রমবিবর্ত্তনের একটা দিক আছে, তাহা অনেকে বড় একটা লক্ষ্য করেন না। এই দশাবতারবাদে বলা হইতেছে যে ভগবান মানবরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে মৎস্য (জলজ) পরে কূর্ম্ম, (জলজ ও ভূচর) বরাহ, (পশু) নরসিংহ (অর্দ্ধমানব), ক্রমশঃ বামন (ক্ষুদ্রাকার মানব) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বামনাকার ছাড়িয়া পরশুরাম অর্থাৎ যুদ্ধোপজীবী আদিম মানুষে (primitive man) পরিণত হন। পূর্ণ মানবধর্ম্মাবলম্বী হইতেছেন রামচন্দ্র। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ স্বীকার না করিলে এই দশাবতারবাদের প্রচলন ভারতে আদৌ সম্ভবপর হইত না।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ—আত্মার পরিভ্রমণ বা জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদ যোনিভ্রমণবাদে পরিণত হইয়াছিল। এই যোনিভ্রমণবাদে দেখিতে পাই যে আত্মা মানবদেহে অধিষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াছে। বহু পুরাণে এই যোনিভ্রমণবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে আছে :—

স্থাবরং বিংশতেলক্ষং জলজং নবলক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং য পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং য বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য তত কর্ম্মানি সাধয়েৎ॥

মানবজন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে স্থাবর (বৃক্ষাদি), পরে ক্রমশঃ জলজ (মৎস্যাদি), কূর্ম্ম (জলচর ও স্থলচর), পক্ষী ও পশু জন্মলাভ করিতে হয়। তৎপরে বানরজন্ম এবং বানরজন্মের পরই মানবজন্ম। এই যোনিভ্রমণ বাদে প্রথমে বৃক্ষ, ক্রমশঃ জলজ, উভজ, পক্ষী, পশু, বানর ও সর্ব্বশেষে মানবের উৎপত্তির বিষয় লক্ষ্য করিয়া কেহই প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে "বানরজাতি মানবজাতির অব্যবহিত আদিপুরুষ" এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য বহু প্রাচীন কালে ভারতে দার্শনিক

অনুমানরূপে বিদ্যমান ছিল। শুধু ইহাই নহে—আধুনিক ভূবিদ্যাবিশারদেরা পরীক্ষার দ্বারা জীবকঙ্কালের (fossil) ক্রমবিবর্ত্তনের যে বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার পৌর্য্যাপৌর্য্য উল্লিখিত যোনিভ্রমণবাদের পৌর্য্যাপৌর্য্যের সহিত অবিকল মিলে। ভূবিদ্যাবিদেরা দেখিতে পাইয়াছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন যুগের পর্ব্বত সমূহে কেবল মাত্র জলজ জন্তুরই কঙ্কাল (যথা মৎস্যের কাঁটা) দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকার উন্নত জীবের অস্তিত্ব তথায় মিলে না। ইহা অপেক্ষা আধুনিক যুগের পর্ব্বতসমূহে মৎস্যের সঙ্গে বেঙ কুম্ভীরের মত উভচর (জলচর ও ভূচর) জন্তুর কঙ্কালও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বত সমূহে পাখাবিশিষ্ট জন্তু ও ক্রমশঃ পক্ষীর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আধুনিক কালের মৃত্তিকার স্তরে ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু, ক্রমশঃ বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুর দেহাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল চতুষ্পদ জন্তু আধুনিক অশ্ব, গণ্ডার প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু হইতে বহু পরিমাণে ভিন্ন। সমকালীন মৃত্তিকাস্তরের ভিতর বানরের হাড় প্রথম পাওয়া গিয়াছে। ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের এই পরীক্ষামুলক আবিষ্কার ভারতের যোনিভ্রমণবাদের পৌর্য্যাপৌর্য্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।

ক্রমবিবর্ত্তনের সমর্থক পরীক্ষামূলক তথ্য নিরূপণ

ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রচারের পূর্ব্বে অনেক পরীক্ষামূলক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ডারুইন তাঁহার মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের জীবকঙ্কাল আবিষ্কার ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রচারকল্পে সহায়ক হইয়াছিল। এমন অনেক জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সে সকল জন্তু এককালে জীবিত ছিল কিন্তু এখন পৃথিবীতে নাই। এক প্রকার "পক্ষী-সরীসৃপ" আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার আকৃতি পক্ষীর মত কিন্তু সরীসৃপের মত দাঁত ও মাড়ি আছে। আমেরিকায় এক প্রকার অশ্বকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে—ইহার খুর বিভক্ত, আর এক প্রকার অশ্বের খুর কেবল অবিভক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনকার অশ্বের খুর সম্পূর্ণরূপে অবিভক্ত। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে আধুনিক অশ্ব এই সকল মৃত জন্তু হইতে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়াছে। ফ্রান্সদেশে একপ্রকার প্রকাণ্ড হস্তী ও ও গণ্ডারের দেহাবশেষ মৃত্তিকাতলে পাওয়া গিয়াছে—এই সকল জন্তু আধুনিক হস্তী ও গণ্ডার হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। এই সকল কঙ্কাল হইতে স্বতই প্রশ্ন উঠে কিরূপে আধুনিককালের জন্তুরা পূর্ব্ববর্ত্তীকালের জন্তুগণের বংশধর হইতে সক্ষম হইয়াছে?

জন হণ্টার ও সেণ্ট-হিলেয়ার প্রভৃতি প্রাণিবিদ্যাবিদেরা দেখান যে সমজাতীয় জন্তুদের হাড়ের মধ্যে অদ্ভুত ঐক্য আছে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদিগের (vertebrates) ক্ষুদ্রতম হাড়ের মধ্যেও ঐক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে বাদুড়ের ডানা,

শুশুকের পাখনা, ঘোড়ার সামনের পা ও মানুষের হাতের গঠনপ্রণালী একইরূপ, কেবল বিভিন্নকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য কাহারও হাড় ছোট, কাহারও বৃহৎ, কাহারও ছড়ান, কাহারও বা গুটান। এইরূপ ঐক্য বশতঃ একই শ্রেণী হইতে ক্রমান্বয়ে এই সকল জন্তুর সৃষ্টি সপ্রমাণিত হইতেছে।

আবার অনেক জন্তুর এমন অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যাহা তাহার কোনও কাজে লাগে না। মানবদেহের প্লীহার উপযোগিতা চিকিৎসকেরা এখনও দেখিতে পান না। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের (mamalia) মত তিমি মাছের দাঁত আছে বটে, কিন্তু সে দাঁতগুলি কোন কাজে আসে না, কারণ তাহা মাড়ির ভিতর ফুঁড়িয়া যায় নাই। একপ্রকার সরীসৃপ আছে—তাহার চামড়ার ভিতর হইতে পিছনদিকে দুইটি পা দেখা যায়, কিন্তু সে পা মাটিতে ঠেকিতে পারে না, সুতরাং কাজে লাগে না। এইরূপ অব্যবহার্য্য ইন্দ্রিয়গুলি অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের নিকট উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

জন বায়ার নামক একজন বৈজ্ঞানিক আর একটা আশ্চর্য্য তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চতুষ্পদ (quadrupeds) প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবের ভ্রূণাকৃতি পুষ্ট হইবার আগে মৎস্য সরীসৃপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীয় জীবের অপুষ্ট ভ্রূণের আকৃতির তুল্য। যদি প্রত্যেক জীব আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইত তাহা হইলে কুকুর প্রথমে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষীর আকৃতি পাইবে কেন এবং কেনই বা অপ্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় বা অংশগুলি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিবে? এমন কি পুষ্ট হইবার আগে মানবের ভ্রূণ ও কুকুরের ভ্রূণ প্রায় আকৃতিতে একইরূপ।

উদ্ভিদরাজ্যেও এইরূপ ঐক্য ও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এক গণভুক্ত বিভিন্ন উপগণের (species) পার্থক্য এরূপ মিলাইয়া গিয়াছে যে ধরা কঠিন। ডারুইন দেখাইয়া দিলেন যে এই পার্থক্য এত অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রকার (varieties) এবং উপগণের (species) মধ্যগত পার্থক্য ধরা যায় না। বিভিন্ন গোলাপগাছ একজন সতের উপগণে বিভক্ত করিয়াছেন, আর একজন তাহাদের মধ্যে পাঁচটির বেশী উপগণ খুঁজিয়া পান নাই। আবার একশ্রেণীর উদ্ভিদ জন্তুর মত ব্যবহার করে। ইহারা কীটভোজী, কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। তাহাদের পাতার উপর কীটপতঙ্গ বসিলেই পাতাগুলি আপনি মুড়িয়া যায় এবং যেমন ভোজনের সময় ও পরে প্রাণীদেহে পাকরস বহির্গত হয়, কীটভোজী উদ্ভিদ হইতেও যেই প্রকারের রস বহির্গত হওয়াতে কীটগুলিকে উদ্ভিদ শীঘ্রই হজম করিয়া ফেলে। এই সকল উদ্ভিদ প্রাণীরাজ্য ও উদ্ভিদ-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তীভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

ডারুইন এই সকল তথ্য প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কত অসংখ্য পুস্তক, সাময়িক পত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে এই সময়ে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নিজেই ডারুইন পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন যে, কেমন করিয়া তিনি এত পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন

বিভিন্ন জাতীয় পায়রা পুষিয়া গাছ পালা পুঁতিয়া বিস্তর পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি ক্রমশঃ ক্রমপরিবর্ত্তন বাদের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ করেন। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ১৮৪৮ সালে তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ সার চার্লস লায়েলের অনুরোধে তিনি তাঁহার পরীক্ষার ফল ও সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪৪ সালে তাঁহার অভিমত একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহাও প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখিলেন যে তাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণার ফল এত জমিয়া গিয়াছে যে তাহা একখানি পুস্তকে বাহির করা অসম্ভব; সেইজন্য তিনি তাঁহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে মানস করিলেন!

এই সময়ে ১৮৫৮ সালে ১৮ই জুন তারিখে তিনি ওয়ালেস নামক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। ওয়ালেস মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহার স্বকীয় গবেষণার দ্বারা তিনিও ডারুইনের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন—এমনকি দুইজনের লেখাতে স্থানে স্থানে ভাষারও মিল ছিল। বলা বাহুল্য ওয়ালেস ডারুইনের কার্য্যাবলীর কোনও সংবাদ জানিতেন না। ডারুইন এই পাণ্ডুলিপিগুলি লায়েল, হুকার প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুদিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা ঠিক করেন যে ওয়ালেস ও ডারুইন এই দুইজনের প্রবন্ধই একসঙ্গে পঠিত ও মুদ্রিত হইবে, উভয় প্রবন্ধই ১৮৫৮ সালে ১লা জুলাই তারিখে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত এবং ঐ সভায় প্রক্রিয়ার বিবরণে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটি বিজ্ঞান জগতের পক্ষে শুভ হইয়াছিল, কারণ এ ঘটনাটি না ঘটিলে ডারুইনের অভিমত কোনও কালে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহস্থল। এমন কি ১৮০০ সালে তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর ৪০০ বা ৫০০ পাউণ্ড দিয়া একজন পুস্তক প্রকাশকের দ্বারা এই প্রবন্ধ যেন প্রকাশ করা হয়।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

ভাষাতত্ত্ববিষয়ে কাহারা নাবালক?

মনীষী মোক্ষমূলর তদীয় Ancient Sanskrit Literature বা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস-নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে,

And yet Indian philology is still its infancy. P. 2.

অর্থাৎ এখনপর্য্যন্তও ভারতীয় ফাইলোলোজী বা ভাষাতত্ত্ববিষয়কবিদ্যা বাল্যাবস্থাতেই আছে, উহার কোনও উন্নতিই হয় নাই।"

কিন্তু মোক্ষমূলরের এ কথা যে সম্পূর্ণই অলীক ও অমূলক, তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ করিয়াছি, এই প্রবন্ধেও

দেখাইব যে তাঁহারাই ভাষাতত্ত্ববিদ্যারূপ মহার্ণবের বেলাভূমিতে উপলখণ্ডসংগ্রহকারী বালক ভিন্ন কিশোরবয়াও নহেন। মূলার তাঁহার উক্ত গ্রন্থের স্থলান্তরে বলিয়াছেন যে—

The distinction of the Genders is the only point on which the Greeks may claim a priority to the Hindus. It was known in Greece to protagoras; whearas in India the pratisakhyas seem to have passed it over, and it appears first in panini, P. 83.

অর্থাৎ পুং, স্ত্রী, ক্লীব, এই তিন লিঙ্গের প্রয়োগগত প্রভেদবিষয়েও গ্রীকেরা আপনাদিগকে হিন্দুদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া দাবী করিতে পারেন। ইহা গ্রীসদেশে পিথাগোরাসের সময়ে জ্ঞাত হইয়াছিল কিন্তু প্রাতিশাখ্যপাঠে জানা যায় উহাতে লিঙ্গভেদের কোনও প্রসঙ্গই নাই, পাণিনিতেই সর্ব্বপ্রথম লিঙ্গগত ভেদের প্রসঙ্গ দেখা যায়।

মোক্ষমূলরের এই কথাগুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের কথামালার বাঘ ও মেষশাবকের গল্প মনে পড়িয়া গেল। যবন গ্রীকজাতির গ্রীকজাতিতে ও তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস মিশরদেশ স্থলে পরিণত হইবারও বহু সহস্র এমন কি প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদে হিন্দুরা লিঙ্গগত ভেদ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কি প্রকারে নাবালক গ্রীকের পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা হইতে পারে? বেদ, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, গণিত খগোল, ভূগোল, ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীনতম পুরাণ ও প্রাচীনতম তন্ত্র সকল লিখিয়া হিন্দুরা যখন জ্ঞান-রাজ্য হইতে জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, যখন তাঁহাদের মহাপতন আসিয়া দেখা দিয়াছিল, তখন ভারতীয়-তুর্ব্বসন্তান যবনগণের নেদিষ্ঠ অনন্তরবংশ্য গ্রীকগণ জগতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এহেন অপরিণত বয়াঃ গ্রীকগণ লিঙ্গজ্ঞানবিষয়ে কি প্রকারে জ্যেষ্ঠতাতেরও অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ হিন্দুগণের অগ্রগামী হইতে পারেন? হিন্দুরা এহেন গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ ও কলা বিদ্যা শিখিয়া মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন ইহাও কি ষোল আনা মিথ্যা কথা নহে?

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

২০—২অ—মনু।

ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে পৃথিবীর সকল লোক এই ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে স্ব স্ব চরিত্র অর্থাৎ আচার ব্যবহার ও জ্ঞানবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতেন।

সুতরাং এহেন জগদ্বন্দ্য জগদ্‌গুরু ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্রবালক গ্রীকের নিকট "দেহি" বলিয়া হাত পাতিয়া ছিলেন, লিঙ্গজ্ঞান বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? পাণিনিব্যাকরণের আবির্ভাবও কি গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই হইয়াছিল? মহামান্য মুইর বলিতেছেন যে—

The poems of Homer which form the oldest relic of the extensive literature of ancient Greece, are supposed to have been written about 2700 years ago.

S. Tex. Vol. II. P. 225.

এইরূপ অনুমান যে গ্রীকের অতীব প্রাচীনতম পদ্যগ্রন্থ, যাহা গ্রীকসাহিত্যের পরিণত অবস্থায়

লিখিত হোমরকৃত সেই ইলিয়ড (যাহা রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুকরণ) বর্ত্তমান সময়ের ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

ইহা স্বদেশ ও স্বদেশের prestige রক্ষণতৎপর সাহেবদিগের নিজের অনুমান, তাঁহারা এখানে ফাঁক না রাখিয়া বা ঠকিয়া অনুমান করেন নাই, তথাপি আমরা আরও ৫০০ বৎসর বাড়াইয়া দিয়া মনে করিয়া লইলাম যে হোমরের ইলিয়ড বা গ্রীক-সাহিত্যের পরিপক্কতার বয়স ৩০০০ বৎসর। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বলিতে হইবে না যে মহাভারত, পাণিনি ও অধিকাংশ পুরাণ লিখিয়া জগদ্‌গুরু ভারত মহাপতনের দিকে হেলিয়া পড়িলে তবে গ্রীক-জাতির অভ্যুত্থান সমারব্ধ হয়? মহাভারতের বয়স হিন্দু মতে ৫০২৫ বৎসর বৈলাতিক মতেও ৩১০০ বৎসর (বিলাত গন্ধি বি-এ বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ নির্দ্দেশ করেন); পাণিনি ও প্রাচীনতম পুরাণসমূহও ৪০০০ বৎসরের এদিকের নহে। সুতরাং যে জাতির শেষ আর্ষ ব্যাকরণ গ্রীক জাতির মানুষে পরিণত হইবারও বহুকালপূর্ব্বে লিঙ্গের খবর লইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই হিন্দুজাতি কি প্রকারে লিঙ্গগত ভেদজ্ঞানবিষয়ে অর্ব্বাচীনতম গ্রীকের অবরজবয়াঃ হইতে পারে?

আর পিথাগোরাস্ কোনও গ্রীশ দেশবাসী বা গ্রীকসন্তান নহেন। মহামতি পোকক তাঁহার Indian in Greece নামক গ্রন্থের শেষে বিশদাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে একজন বৌদ্ধ গুরু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার জন্য গ্রীশদেশে গমন করিয়া তথায়ই উপরত হয়েন। সেই "বৌদ্ধ-গুরু" কথাটীই অপভ্রষ্ট হইয়া putha Goras (পুথা গোরাস) শব্দে পরিণত হইয়া শেষে Pytha goras হইয়াছিল। কেহ কি গ্রীকদিগের কোনও কুল-পঞ্জিকাহইতে পিথা গোরাসের একটি বংশাবলী বাহির করিয়া দিতে পারিবেন? কেহ কি এপর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে পারিয়াছেন যে পোথা-গোরাসের পিতার নাম অমুক ও মাতার নাম তমুক? ফলতঃ ভারতীয় একজন বৌদ্ধ গুরুই গ্রীশে যাইয়া লিঙ্গজ্ঞান বিষয়ে গ্রীকগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যভীরু হারবাস সাহেবও এ কথা অম্লান বদনেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং মোক্ষ মূলরও লিখিতেছেন যে—

Hervas was likewise aware of the great grammatical, similarity between Sanskrit and Greek * * *. He even pointed out that the terminations of the three jender in Greek, as, e, on, are the same as the Sanskrit, as, a, am. But believing, as he did that the Greeks derived their philosophy and mythology from India, he supposed, that they have likewise borrowed from the Hindus some of their words and even the art of distinguishing the gender of words.

S. L. Vol. I. P. 157.

হারবাস ঐরূপ সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে একটা গুরুতর সমতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ইহাও অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন যে গ্রীকদিগের os, e, on (ওস্ এ এবং ওন্) হিন্দুদিগের পুং-অস্, স্ত্রীং আ ও ক্লীবলিঙ্গের অম্ ভিন্ন আর কিছুই নহে—

বীরস্—Heros
গুহা—Gupe
দানম্—Doron

দেখিলেই মনে হইবে যে সংস্কৃত পদের বিকারে গ্রীক পদ সকল গঠিত হইয়াছে। হারবাস ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে গ্রীকেরা হিন্দু-দিগের নিকট হইতেই দর্শন-শাস্ত্র ও পৌরাণিক গল্প গ্রহণ করিয়াছেন। হারবাস ইহাও অনুমান করেন যে গ্রীকেরা তাঁহাদের বহুশব্দ সংস্কৃতহইতে ধার করিয়াছেন এবং লিঙ্গগতপ্রভেদজ্ঞান ও উহার প্রয়োগবিধিও তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট হইতেই ধার করিয়া নিয়াছিলেন।

হারবাসের একথাগুলি অতি প্রামাণ্য ও সত্যগন্ধি। ফলতঃ তিনি যদি জানিতেন যে গ্রীকেরা ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, ভারতীয় সংস্কৃতের বিকারেই গ্রীক ও লাটিনপ্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, যদি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে হারবাসের প্রকৃত দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনার কথাগুলি ঠিক এ ভাবে না বলিয়া আমাদের ন্যায়ই বলিতেন।

আর আশ্চর্য্য এই যে মূলার প্রাতিশাখ্যে লিঙ্গ-প্রকরণ না দেখিয়া হিন্দুগণকে এ বিষয়ে অর্ব্বাচীন বলিয়া ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু প্রাতিশাখ্যগুলি কি ব্যাকরণ? ঐ সকল গ্রন্থ কি ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র-প্রযুক্ত পদের ব্যুৎপত্তি বা নির্ব্বচন লইয়া প্রণীত নহে? লিঙ্গবিধি ব্যাকরণে থাকে—এবং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী গালব, স্ফোটায়ন, চান্দ্র, মাহেশ, ঐন্দ্র, আপিশলি, শাকল্য, ও শাকটায়ন প্রভৃতি সমগ্র ব্যাকরণেই উহা রহিয়াছে। আর সাহিত্যেই লিঙ্গগত ভেদের প্রয়োগ থাকে—তাহাও সাম, ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদ এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন এবং অপ্রাচীন (অবশ্য এ সকলই অর্ব্বাচীন গ্রীকের পূর্ব্ববর্ত্তী) সকল ভারতীয় সাহিত্যেই রহিয়াছে। মূলার—চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ঘাটিয়াও কেন যে ঐরূপ প্রলাপোক্তির উদ্গমন করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

যাহা হউক আমরা সমস্ত বৈদিক সাহিত্য হইতে লিঙ্গগত ভেদের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া মূলারের উক্তির অসারতা প্রতি পন্ন করিব।

সামবেদ ১। ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা,
বিশ্বেষাং হিতঃ।২—১ পৃ।

হে অগ্নি তুমি যজ্ঞের হোতা ও পৃথিবীর সকলের হিতকারী।

জীবানন্দী সংস্করণের সামবেদের এই বাক্যদ্বয়ে পুংলিঙ্গ পদের প্রয়োগ রহিয়াছে। অগ্নি শব্দ পুংলিঙ্গ, এইজন্য উহার বিশেষণ হোতা ও হিত পুংলিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। তথাহি—

২। অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ।৪ | ৩পৃ
অগ্নি র্হব্যানি অক্রমীৎ।
দধৎ রত্নানি দাশুষে।১০—১৫পৃ

অগ্নিদেব বৃত্রাসুরের সৈন্যগণকে নিহত করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব যজ্ঞের হবি সকলে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং তিনি হবিঃপ্রদাতা যজমানকে রত্ন সকল প্রদান করিয়া থাকেন।

সৈন্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, একারণ উহার বিশেষণ বৃত্রাণি পদও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। হব্য ও রত্ন শব্দও ক্লীবলিঙ্গান্ত বলিয়া উহাদের প্রয়োগও ক্লীবলিঙ্গে হইয়াছিল।

৩। পাহি নো অগ্নে একয়া পাহি উত দ্বিতীয়য়া
পাহি গীর্ভিঃ তিসৃভিঃ উর্জাং পতে পাহি চতসৃভিঃ
বসো ॥২—১৮পৃ।

হে অন্নপতি বসু অগ্নিদেব! তুমি আমাদিগকে এক দুই তিন বা চারিটী বাক্যদ্বারা রক্ষা কর।

এখানে গির্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উহার বিশেষণ একয়া, দ্বিতীয়য়া; তিসৃভিঃ ও চত সৃভিঃ প্রভৃতি হইয়াছিল। সুতরাং জানা গেল যে যখন জগতের আদিগ্রন্থ সামবেদ বিরচিত হয়, হিন্দুজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা তখনই লিঙ্গগত প্রয়োগভেদ সম্যক্ অবগত ছিলেন। সামবেদের বয়ঃক্রম এক লক্ষ বৎসরের ন্যূন হইবে না। মোক্ষ মূলর কি বলিতে চাহেন যে সামবেদ বয়সে গ্রীক জাতি হইতে অবরজ?

অনেকের বিশ্বাস যে ঋগ্‌বেদই সকল বেদের আদি, ইহা ফলতঃ সম্পূর্ণই প্রমাদ। পরমার্থতঃ সামবেদ জগতের আদি গ্রন্থ ও বিশ্বদেবনিষিৎসমূহ আদি পদ্য। যাহা হউক আমরা সেই ঋগ্‌বেদহইতেও লিঙ্গগত প্রয়োগভেদের উদাহরণ সমাহৃত করিব।

ঋগ্‌বেদ ১। মহৎ ধনং জয়েম।
৯—৫৭সূ—৮ম
স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ
১৭—৩৩সূ—৮ম
ত্রীণি এক উরুগায়ো বিচক্রমে।
৭—২৯সূ—৮ম।

আমরা মহৎ ধন জয় করিব। স্ত্রীলোকের মন শাসনের অযোগ্য। বহুদেশ ভ্রমণকারী একক বিষ্ণু ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন ভুবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

বেশ দেখা যাইতেছে যে ঋগ্‌বেদের ঋষিরা ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগভেদবিষয়ে পূর্ণাভিজ্ঞ ছিলেন।

২। সুতা ইমে (সোমাসঃ)।
৪—৩সূ—১ম
স কেতুরগ্নিঃ। ৪—১০—৩ম
তস্মৈ ইন্দ্রায় গায়ত।
১০—৪সূ—১ম
সদা সুগঃ পিতুমান্ অস্তু পন্থাঃ।
২১—৫৪সূ—৩ম

এই সোমরস সকল অভিযুত বা প্রস্তুত হইয়া আছে। সেই ইন্দ্রের গুণ গান কর। পথ সর্ব্বদা সুগম ও খাদ্যযুক্ত হউক (পিতু—food) সোম ইন্দ্র, অগ্নি ও পথিন্ শব্দ পুলিঙ্গ, এজন্য উহাদের বিশেষণ ইমে, তস্মৈ, সঃ, ও পিতুমান্ এবং পন্থ পুংলিঙ্গান্ত হইয়াছে।

৩। ইমা ধানা ঘৃতস্নুবঃ।
২—১৩ সূ—১ম
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং
সরস্বতী। ১১ | ৩ সূ—১ম
অগ্নে সা তে সুমতিঃ।
৭—১৫ সূ—৩ম

সেই ঘৃতনিষ্যন্দিনী ধানা (ভৃষ্ট যব) সকল। সরস্বতী সূনৃতের প্রেরণকারিণী। হে অগ্নি সেই তোমার সুমতি।

এখানে ধানা, সরস্বতী ও সুমতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গান্ত, এজন্য উহাদের বিশেষণও যথাক্রমে ইমাঃ, চোদয়িত্রী ও সা, স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অতএব বুঝা গেল যে ঋগ্‌বেদের যুগের লোকেরাও লিঙ্গগতপ্রভেদ ও তৎপ্রয়োগ বিষয়ে পূর্ণাভিজ্ঞই ছিলেন।

শুক্ল যজুঃ...১। অস্মাৎ অন্নাৎ
অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ।
৬৯ পৃ।

অয়ং গৌঃ প্রয়ন্ স্বঃ।
৮০ পৃ।

কাস্মিৎ আসীৎ পূর্বচিত্তিঃ।
৯৭৯ পৃ।

কঃ স্বিৎ একাকী চরতি,
৯৭৮ পৃ।

কিংস্বিৎ আসীৎ বৃহদ্বয়ঃ।
৩৯ পৃ।

এখানহইতে (স্বর্গহইতে) অন্নের জন্য।
এই বাসস্থানের (প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত)।
এই সূর্য্যদেব স্বর্লোকে গমন করিতেছেন।
আমাদের পূর্ব্বনিবাস কি? কে একক ভ্রমণ-কারে? বৃহৎ কূপ কোন্‌টী?

বেশে দেখা যাইতেছে যে ঋষিগণ ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ অস্মাৎ (অস্মাৎ) করিয়াছেন, আবার স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে অস্যৈ (প্রতিষ্ঠা শব্দ) করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। গৌঃ পুংলিঙ্গ এজন্য অয়ং ও প্রয়ন্ বিশেষণও পুংলিঙ্গান্ত। পূর্ব্বচিত্তি, কঃ ও বৃহদ্বয়ঃ; ক্রমে স্ত্রী, ও ক্লীব লিঙ্গের শব্দ উহাদের বিশেষণও ঠিক কা—একাকী (কঃ) ও কিং হইয়াছে।

অথর্ববেদ———
মমো নো গাতুং প্রথমো বিবেৎ
নৈষা গব্যূতিঃ।
১৮ কাণ্ড—৭৬।

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা
ঐ—১২৮ পৃ

অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং
ঐ—১৩১ পৃ

যানি নক্ষত্রাণি দিবি।
১৯ কাণ্ড—২৮৮ পৃ।

যম আমাদের গমনপথ সকলের পূর্ব্বেই জানেন। ইহা (এষা) গব্যূতি (ক্রোশদ্বয়) না। এই রমণী পতিলোক বরণ করিতেছে। যুবতীকে নীয়মানা দেখিলাম। আকাশে যে সকল নক্ষত্র।

এখানেও দেখা যাইতেছে যে ঋষিরা লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে পূর্ণাভিজ্ঞই ছিলেন। বেদ চারিখানি জগতের সকল সভ্য জাতির সকল গ্রন্থের বিশেষতঃ গ্রীক ও পাণিনি অপেক্ষা যে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বোধ হয় সত্যভীরু সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং হিন্দুরা পাণিনিব্যাকরণ ও গ্রীকজাতির পূর্ব্বে লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না, এ বিষয়ে গ্রীকগণই প্রথম অভিজ্ঞ, এ কথা মিথ্যা হইতেছে?

ইহা গেল বৈদিক সাহিত্যের কথা। অতঃপর আমরা ব্যাকরণের কথা বলিব। কেননা, লিঙ্গগত ভেদবিধয়ে ব্যাকরণই প্রমাণস্থল, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য-বশতঃ ঐন্দ্র, চান্দ্র, মাহেশ, গালব, স্কোটায়ন ও শাকল্যপ্রভৃতি প্রাচীনতম ব্যাকরণ সকল এখন আর নাই। অতএব আমরা যথাসম্ভব একমাত্র শাকটায়ন ব্যাকরণহইতে লৈঙ্গিক ভেদজ্ঞান ও তৎপ্রয়োগবিষয়ে প্রমাণ-প্রদর্শন করিব।

অবশ্য তোমরা ছাড়িবেনা, বলিবে শাকটায়ন যে পাণিনি অপেক্ষা বর্ষীয়ান্, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? প্রমাণ ঐ বষীয়ান্ পাণিনি ও তদ্‌বর্ষীয়ান্ মহর্ষি যাস্কদেব। পাণিনি বলিতেছেন যে—

যস্কাদিভ্যো গোত্রে।

গোত্র বা অপত্য বুঝাইতে যস্কপ্রভৃতি শব্দের উত্তর অণ্‌প্রত্যয় হয়। তৎপর—ভট্টজি দীক্ষিত, যস্কস্য অপত্যং পুমান্ (যাস্কঃ) এই পদ সাধিয়াছেন।

সুতরাং পাণিনি অপেক্ষা যাস্ক পূর্ব্বকালীন? সেই পাণিনি ও যাস্কই বলিতেছেন যে—

১। ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য।
৮।৪।৫০। পা।

১। তত্র—ভট্টজিঃ...ত্র্যাদিষু বর্ণেষু সংযুক্তেষু বা ন দ্বিত্বম্।

এইটী শাকটায়নের মত যে স্বর বর্ণের পরবর্ত্তী শব্দে তিন কি ততোঽধিক ব্যঞ্জন সংযুক্ত থাকিলে তথায় নকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা—ইন্দ্র;—ইন্দ্র; রাষ্ট্র—রাষ্ট্র। কিন্তু "হ্নুতে" এই নকারের দ্বিত্ব হইবে না, কেন না ইহা স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী নহে।

২। উপসর্গা অর্থান্নিরাহুঃ।

ইতি শাকটায়নঃ। ৪৪১ পৃ যাস্ক।

২। তত্র দুর্গাচার্য্যঃ—"ন নিরর্থকা উপসর্গা; অর্থান্ নিরাহুঃ"—শাকটায়নঃ। নেতি প্রতিষেধে নিষ্কৃষ্য নামাখ্যাতমধ্যাৎ পদবাক্যরূপেণ বিরচিতাঃ সন্তঃ কে পুন স্তে? উপসর্গাঃ। আখ্যাত মুপগৃহ্য অর্থবিশেষম্ ইমে তস্যৈব সৃজন্তি ইতি উপসর্গাঃ।

অর্থাৎ যাহারা আখ্যাতের পূর্ব্বে বসিয়া অর্থ বিশেষের সৃষ্টি করে, তাহারাই উপসর্গ।

অতএব জানা গেল যে যাস্ক পাণিনি হইতে বর্ষীয়ান্ ও শাকটায়ন আবার পাণিনি যাস্ক এই উভয় ঋষি হইতেও বর্ষিষ্ঠ। কিন্তু সেই বৃদ্ধতম শাকটায়ন ব্যাকরণেই আছে—

১। নান্তঃ পুংসঃ।১।১।৭৯

পুংলিঙ্গস্য অকঃ সাচো নান্তো দীর্ঘো ভবতি।

২। না স্ত্রীটঃ—১।২।৪৭

ঘিসংজ্ঞকাৎ পরস্য টঃ—"না"

ইত্যাদেশো ভবতি'।

৩। পুংসি ইদঃ অয়্।১।২।২১০

ইদমঃ ইদ্রূপস্য অয়্ ভবতি

পুংলিঙ্গীয়ে।

৪। অথ অজন্তাঃ স্ত্রীলিঙ্গা।উচ্যন্তে।

৫। স্ত্রিয়া।বাট্।১।২।২৯

স্ত্রীলিঙ্গাৎ ইকারান্তাৎ

উকারান্তাচ্চ পরস্য ঙিতঃ

সুপঃ আঙ্ বা ভবতি।

৬। ত্রি চতুরঃ স্ত্রিয়াং তিস্র চতস্র।১।২।২০

স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিচতুরোঃ তিস্র চতস্র

ইতি ক্রমেণ আদেশৌ ভবতঃ সুপি পরে।

৭। অথ অজন্তা নপুংসকলিঙ্গা উচ্যন্তে।

৮। অথ হলন্তাঃ পুলিঙ্গাঃ উচ্যন্তে।

৯। অথ হলন্তাঃ স্ত্রীলিঙ্গা উচ্যন্তে।

১০। অথ স্ত্রীপ্রত্যয়া উচ্যন্তে।

১১। পাণিগৃহীতী ইতি পত্নী।১।৩।২৫

আমরা এই যে সকল শাকটায়ন সূত্রের সমাহার করিলাম, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি কেহ আর এ কথা মুখেও আনয়ন করিবেন যে—হিন্দুরা পাণিনির পূর্ব্বে লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না? মোক্ষমূলর শাকটায়ন ব্যাকরণও দেখিতে পারেন, কিন্তু তিনিই ত বেদের বৈলাতিক বেদব্যাস? তবে বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গের এত ছড়াছড়ি দেখিয়াও কেন তিনি যাহা তাহা বলিয়া ফেলিলেন। আমি এই জন্যই পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকি যে, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা ত্বগ্‌দর্শী সাহেব ও চতুষ্পাঠীর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের কোনও কথা সহসা গ্রহণ করিও না।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

পিপীলিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হুবার একবার রুফেসিন জাতীয় (F. Rufescene) কয়েকটী পিপীলিকাকে একস্থানে আবদ্ধ করিয়া—কতকগুলি গুটী কীট, (larva, pupa) এবং প্রচুর খাদ্য সেস্থানে রাখিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুটী ও কীটগুলির তত্ত্বাবধান করা দূরের কথা, নিজেদেরই খাদ্য মুখে তুলিয়া খাইতে না পারায় অনেকগুলি পিপীলিকা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অতঃপর তিনি কতকগুলি দাস-পিপীলিকা সে স্থানে ছাড়িয়া দিলেন; উহারা তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় প্রভুদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিল এবং গুটী ও কীটগুলির প্রতিপালনের প্রতি মনোনিবেশ করিল। মাটী খুঁড়িয়া উহাদের জন্য কয়েকটী প্রকোষ্ঠও নির্ম্মাণ করিল।

অন্য একজন বৈজ্ঞানিক (১) এই জাতীয় একটী পিপীলিকাগৃহের নিকট একটুকরা শর্করা রাখিয়া দেন; শীঘ্রই এই সুমিষ্ট খাদ্য একটী দাস-পিপীলিকার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সে তাহার রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আরও কয়েকটী দাসপিপীলিকা সন্ধান পাইয়া সেখানে আসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। অতঃপর কয়েকজন প্রভু আসিয়া ভৃত্যদের পা টানিয়া তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন, যে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছে। তিরস্কৃত ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের কার্য্যে লজ্জিত হইয়াই যেন, প্রভুদিগকে খাদ্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। এই পরীক্ষার সত্যতা ফোরেলও সমর্থন করিয়াছেন।

F. Sanguinea-জাতীয়েরা সাধারণতঃ F. Fusca-জাতীয় পিপীলিকাকেই দাস করিতে চাহে। কারণ ইহারা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ; সহজেই ইহারা ধরা দেয় ও পরাধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু F. Flavaদের ধৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়—অতি কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত উহাদের পরাস্ত করা যায় না। তাই ইহাদের কাছে F. Sanguineara সহজে ঘেঁসে না। কীট দেখিয়া এই বিপরীত জাতীয় পিপীলিকার পার্থক্য ইহারা নির্ণয় করিতে পারে কি না ডারুইন তাহা পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিলেন, F. fusca দের কীট ইহারা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল, কিন্তু F. Flavaর কীট দেখিতে পাইয়া সশঙ্কিত হইয়া দূরে সরিয়া পালাইল।

---

(1) Les Pes.

ইহারা যে কেবল পিপীলিকাকেই দাসত্বে নিয়োজিত করে এরূপ নহে। ব্রেজিল দেশের জঙ্গলে একপ্রকার কীট (leaf bugs) আছে, তাহারা পিপীলিকার ভারবাহী দাস। দূর প্রদেশ হইতে সঞ্চিত খাদ্য বা অন্য জিনিস গৃহে আনিতে হইলে ইহাদিগকে ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। দুই দুইটী করিয়া সারি বাঁধিয়া ইহারা পথে চলে, যাহাতে বিপথে না যাইতে পারে কিম্বা পলায়ন না করে, শ্রেণীভঙ্গ না করে সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি শাস্ত্রী-পিপীলিকা ইহাদিগকে দুইদিকে পাহারা দেয়। কার্য্য সমাপনান্তে ইহাদিগকে অতি সামান্য আহার প্রদানে অল্পপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। (১)

(৫)

গুবরে ও অন্যান্য কয়েক জাতীয় পোকা পিপীলিকা-গৃহে অতিথিরূপে বাস করে। সাধারণতঃ কোনও কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না—মনের সাধে ইহারা চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলিয়া বেড়ায়। দিন ভাল থাকিলে বাহিরে আসিয়া ক্রীড়ায় রত হয়—আবার বর্ষার দিনে কিছুতেই গৃহের বহির্ভাগে আসে না। Romanes বলেন, পিপীলিকারা তাহাদের এই পোষা পোকাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে এবং গৃহপরিবর্ত্তনের সময় ইহাদিগকে পিঠে বহন করিয়া লইয়া যায়। (২) কেহ কেহ অনুমান করেন—এগুলিকে পিপীলিকারা সখ করিয়াই পুষিয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, পিপীলিকারা এই পোষা প্রাণীদের নিকট হইতে কোন-না-কোনও রূপ সাহায্য বা সুবিধা নিশ্চয় লাভ করিয়া থাকে—নতুবা, কেবল খেয়াল ও সন্তোষের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা যে কতকগুলি প্রাণীর জন্য অনর্থক পরিশ্রম করিতে যাইবে এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু পিপীলিকারা ইহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য লাভ করিয়া থাকে তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

(৬)

পিপীলিকারা কেবল পরিশ্রম করিতেই ভালবাসে শুনিয়াছি; বিশ্রামের কোনও চিন্তা বা ইচ্ছা তাহাদের মনে উদিত হইতে পারে এরূপ শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন—ইহারা মধ্যে মধ্যে (অন্ততঃ কোনও কোনও জাতি) বিশ্রাম এবং ক্রীড়াকৌতুকও উপভোগ করিতে ভাল বাসে। এমন কি সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর নিদ্রার মনোরম ক্রোড়ে মধ্যে মধ্যে ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে নিম্নে আমরা কয়েকজন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদের পর্য্যবেক্ষণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সেদিন দিনটি বেশ পরিষ্কার ছিল। হুবার দেখিতে পাইলেন কতকগুলি পিপীলিকা (Pratensis) তাহাদের গৃহের বাহিরে "ময়দানে" একত্র হইয়া এরূপভাবে ব্যবহার করিতেছে যাহা দেখিয়া তাঁহার স্বতঃই মনে হইল—ইহারা নিশ্চয় কোনও

(1) See "Intellectual life of animals" by Parcy (2nd Ed. p. 309)
(2) See "Animal Intelligence"—Romanes (8th Ed. p. 84.)

প্রকার উৎসবের ক্রীড়া কৌতুকে রত হইয়াছে। পিছনের পায়ে ভর দিয়া কেহ কেহ উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় সম্মুখের পায়ের সাহায্যে পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতেছিল, এবং শুঁড় (Antennae) কিম্বা অন্য পায়ের সাহায্যে একে অন্যকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া যেন কুস্তি লড়িতেছে, এই ভাবে খেলা করিতেছিল। এ খেলার মধ্যে শত্রুতার ভাব কিম্বা রাগারাগি ছিল না। তারপর কুস্তি ছাড়িয়া দিয়া একটী পিপীলিকার পশ্চাতে অন্য পিপীলিকারা দৌড়াইতে লাগিল এবং এইরূপে লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হইল।

বুক্‌নার বলেন—(৪) হুবারের এই বৃত্তান্ত অনেক গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে—কিন্তু ইহার পরিষ্কার বর্ণনা সত্ত্বেও জনসাধারণ একথা একেবারেই বিশ্বাস করিতে নারাজ। ফোরেল লিখিয়াছেন—"হুবারের পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তান্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই—যতদিন না আমি নিজেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তিনি একদল pratensisকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন—খেলোয়াড়রা পরস্পরকে পা এবং হাতের সাহায্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া মাটীতে গড়াইতেছে। কাহাকেও বা টানিয়া গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট করাইতেছে, এবং পরক্ষণেই পুনরায় দৌড়িতে দৌড়িতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। এইরূপ ক্রীড়ায় রত হইয়াও উহারা পরস্পরের প্রতি সখ্যতা ভুলিয়া যায় নাই। ফোরেল আরও বলেন—"আমি বুঝিতে পারি—যাঁহারা স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যাশ্চার্য্য বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষতঃ আমরা যখন জানি যে ইহার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের প্রণয়াকর্ষণ সম্বন্ধে কোনও কথাই উঠিতে পারে না।"

মেক্‌কুক্ লিখিয়াছেন—একস্থানে একই সঙ্গে প্রায় ৬।৭ জন রাজকুমারী গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অবস্থিত একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর আরোহণ করিতে লাগিল। বাতাসের বিপরীত দিকে তাহারা আরোহণ করিতেছিল। কয়েকজন একই সঙ্গে প্রস্তরের উপর আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়ায়—তাহাদের মধ্যে বেশ ছোটখাট একটী প্রীতি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সকলেই চেষ্টা করিতেছি কে আগে সুবিধামত স্থানটী অধিকার করিতে পারে। একজন ভাল স্থানে উপস্থিত হইলে—অন্য একজন আসিয়া তাহাকে সেস্থান হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিল।

রাজকুমারীরা কিন্তু শ্রামিকদের সহিত কোনোরূপ কলহ করিল না। শ্রামিকেরা রাজকুমারীদের দেহরক্ষীরূপেই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা রাজকুমারীদিগকে শুঁড় নাড়িয়া শুধু অভিবাদন এবং অন্যান্য উপায়ে সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিল; এই ক্রীড়াকৌতুকে যোগ দিল না!

পিপীলিকার বিশ্রাম সম্বন্ধে বেট্‌স

(4) Geistesleben der Thiere (p. 163.)

(Bates) লিখিয়াছেন :—পিপীলিকার জীবন যে কেবলি কর্ম্মময় এরূপ মনে হয় না, কেননা আমি প্রায়ই এ সিটন (citon) জাতীয় পিপীলিকাদিগকে এরূপ ভাবে সময় কাটাইতে দেখিয়াছি যাহাতে মনে হইয়াছে ইহারা বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে।

নিভৃত বনপ্রদেশে সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ স্থানে, ইহারা দলে দলে আসিয়া মিলিত হয়। খাদ্য ও শিকার অন্বেষণে তখন আর তাহারা এদিক ওদিকে ছুটিয়া বেড়ায় না। দেখিলে মনে হয় অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন এই নিত্যকর্ম্মী পিপীলিকাদের মনে গভীর আলস্যের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের কেহবা মৃদুপদক্ষেপে হাঁটিয়া বেড়ায়, কেহবা পদসাহায্যে নিজ নিজ দেহ পরিষ্কৃত করিতে থাকে আবার কেহ কেহ একে অন্যের গা চাটিয়া দিয়া পরস্পরের প্রসাধন কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয় যেন উহারা আলস্যের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

(৭)

শ্রমের পর বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা সকলেরই পক্ষে স্বাভাবিক তাই পিপীলিকারা যদি হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর অবকাশ মত একটু বিশ্রাম প্রত্যাশী হইয়া নিদ্রার ক্রোড়শায়ী হয় তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না। বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যবেক্ষণের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে পিপীলিকারাও নিদ্রিত হয়।

কেক্‌কুক্ এক জাতীয় পিপীলিকার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"আটটার সময় আমি এক ঝাঁক পিপীলিকার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রি যখন প্রায় ১১টা তখন দেখিলাম সে ঝাঁকের প্রায় সমস্ত পিপীলিকাই অন্তর্হিত হইয়াছে—কেবল এখানে সেখানে দুই একটী নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাদের নিদ্রার গভীরতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার কলমের কোমল পালকের দিকটা অতি মৃদু ভাবে একটী নিদ্রিত পিপীলিকার গাত্রে স্পর্শ করাইলাম। পাগুলি গুটাইয়া জড়সড় হইয়া আমার বাতিটার দিকে মুখ করিয়া পিপীলিকাটী শুইয়াছিল। আমি ধীরে ধীরে তাহার শরীরের উপর দিয়া পালকের সূক্ষ্মাগ্রভাগটী 'বুলাইয়া' নিলাম কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নাই। বার বার আমি এই উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম—ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরে পালকের আঘাত করিতে লাগিলাম কিন্তু তাহার গভীর নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হইল না। উহার মাথার দিকে আঘাত করিয়াও কোনও ফল হইল না। অবশেষে কয়েকমিনিট চেষ্টার পর হঠাৎ পিপীলিকাটি জাগরিত হইল। জাগরিত হইয়া মাথাটী বাড়াইয়া পাগুলি প্রসারিত করিয়া ঝাড়িয়া বাতিটীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং উক্তরূপ প্রসাধন কার্য্যে রত হইল। নিদ্রার পর এইরূপ প্রসাধন ব্যাপার পিপীলিকাদের নির্দ্ধারিত কার্য্য।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৭)

এতদিনে জ্যোতিবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামক একখানি প্রহসন তাঁহার প্রথম রচনা। তিনি বলিলেন যে "এ সময়ে আমি পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian mirrorএ আমার উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ চলিয়াছে। আক্রমণকারীদের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি-করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত। এই বই লইয়া—নব্যপন্থীদলে—খুব একটা চৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সমালোচনার জন্য "বঙ্গদর্শনে" এক কাপি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালই বলিয়াছিলেন। সেই সংখ্যা বঙ্গদর্শনেই "কিঞ্চিৎ জল যোগ" প্রহসনের এবং স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের এক প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হয়। Christion Herald বলিয়াছিলেন "এই প্রহসনে তুষ্য কিছুই নাই।" এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিলাত হইতে দেশে ফিরেন। আমি যখন Calcutta Collegeএ পড়িতাম তখন হইতেই তিনি আমায় একজন খুব নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু আমার রচিত প্রহসনে খুব একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া তিনি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" খানি পড়িতে চাহিলেন। পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এতে দোষের কথা ত আমি কিছুই দেখিতেছিনা। পালিত মহাশয়ের মত শুনিয়া আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। আবার ইহার মধ্যেই National Theatreএ বইখানির অভিনয়ও হইয়া গিয়াছিল।

"এর কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। তখন স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়াছিলাম, বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। "কিঞ্চিৎ জলযোগের" দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই। স্ত্রীস্বাধীনতার সম্বন্ধে শেষে আমি এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, আমি যখন গঙ্গার ধারের কোন বাগান

বাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার স্ত্রীকে আমি ঘোড়ায় চড়া শিখাইতাম। তারপর জোড়াসাঁকো আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত রোজ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে দুইজনে ঘোড়া ছুটাইতাম। এই রূপে অন্তঃপুরের পর্দ্দা ত উঠাইলামই সেই সঙ্গে আমার চোখের পর্দ্দাটিও একবারে উঠিয়া গেল! দরোয়ানেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার লোকেরা কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। আমার ভ্রুক্ষেপ নাই। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় মাতোয়ারা!

এর পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়িল। পিতৃদেব স্বহস্তে আমাকে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক কাযকর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণুদাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতেই আমার মনে হইয়াছিল—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে বোধহয় কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই "পুরু বিক্রম"নাটক রচনা করিলাম। লিখিয়াই গুণুদাদাকে আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাঁহার নাটকখানি খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি ছাপাইতে বলিলেন। "পুরু বিক্রম" প্রকাশিত হইল বটে কিন্তু প্রথম সংস্করণে আমি নাম গোপন করিলাম। পুরু বিক্রমের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "পুরুবিক্রম বীররসের খতীয়ান্!" সেই সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "এই রকম লোক যদি নাটক লেখেন, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইতে পারে।" তাঁহার এরূপ মন্তব্য প্রকাশের একটা কারণ ছিল। তখন যে সব নাটক বাহির হইত—তাহার অধিকাংশই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, কিন্তু পুরু বিক্রমে সেরূপ কিছুই ছিল না।

"পুরুবিক্রম শেষে গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হয়। ইয়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজরাটী সাহিত্যের সমালোচনায় পুরুবিক্রমের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এখানি যে আমারই পুরুবিক্রমের অনুবাদ, তাহা তিনি জানিতেন না।"

"পুরু বিক্রম প্রকাশিত হইবার পর একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জল মুখমণ্ডলে প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুরু বিক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এ গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন,—সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গানটির বেশ একটা জোরাল সুর ইহাঁরা দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।

তার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবুদের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়াছিলেন। শরৎ বাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি উন্মুক্ত অসি হস্তে অল্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালনপূর্ব্বক ঘোরা-ফেরা করিতেন এবং সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমন সায়েস্তা যে নীচে ফুট লাইট (foot light), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলো, দর্শকগণের ঘনঘন করতালি ধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীর রসের অতি চমৎকার অবতারণা করা হইত।

ইতিপূর্ব্ব হইতে বড় লোকদের ভিতরে ঘোড়ায় চড়ার একটা খুব সখ্ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শরৎবাবু, ঠাকুরদাস মাড়, অম্বু গুহ প্রভৃতি অনেকে মিলিয়া কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঠিক করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ও দুই একবার হইয়াছিল। তারপর রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের পুত্র ঘোড়া হইতে পড়িয়া যেমন মারা গেলেন অমনি সকলের ঘোড়াচড়ার বাতিকও ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু আর একটি কথা বলিলেন। "Lord Mayor মৃত্যুরপর তাঁহার ভাল ভাল সব ঘোড়াগুলি নীলামে বিক্রীত হইতেছিল। সেই নীলামে আমিও Iron grey রঙের একটা খুব বড় জাঁকালো ঘোড়া কিনিয়া ফেলিলাম। ঘোড়াটি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে কোনরূপ দোষ ইহার নাই, বিশেষ যখন লাটসাহেবের ঘোড়া। পরে দেখা গেল যে সামান্য কিছু একটা দেখিলেই সে চমকাইত। একদিন বৈকালে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাই। তখন Eden's Park-এর ভিতর Band বাজিতেছিল। দেখিলাম অনেক সাহেবও Bandstand-এর নিকট পর্য্যন্ত ঘোড়া লইয়া গিয়া Band শুনিতেছে, আমিও তবে না যাইব কেন? যেমন Bandএর শব্দ তাহার কানে গেল, অমনি সে প্রবল বেগে লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে রাশ্ রেকাব ছিঁড়িয়া গিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। ঘোড়াও ঊর্দ্ধ শ্বাসে ছুটিল। আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া কয়েক জন সহৃদয় ইংরাজও আমার সাহায্যে আসিলেন। তখন আমরা খানিক দূর ছুটিয়া গিয়া দেখি যে ঘোড়াটি একটা ঘাসের জমিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাইতেছে। আমি সঙ্গে একজন সহিষও আনিয়াছিলাম। দেখিলাম কিয়দ্দূরে একজন সহিষ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে আমার সহিষ মনে করিয়া—খুব এক চোট ভৎর্সনা করিয়া ঘোড়া ধরিয়া আনিতে বলিলাম। সে বেচারা ধমক শুনিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন করিল। তারপর যখন

সে নিকটে আসিল, তখন দেখিলাম যে সে আমার সহিষ নয়! তখন হইতেই আমি Short sighted. এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আবার সেই Band-এর ধার দিয়া আমাকে ফিরিতে হইবে! সৌভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণের জন্য Band তখন থামিয়াছিল। কোনও প্রকারে সেই ছিন্নাবশিষ্ট রা'শটুকু ধরিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী ঘোড়ার ভীড়ের মধ্য দিয়া লালবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আসিলাম। কিন্তু চিৎপুরের ভিড় ঠেলিয়া যাইতে আর সাহস হইল না! তাই একটা মুটের হাতে ঘোড়া দিয়া সেই খান হইতে পাল্কী চ'ড়য়া বাড়ী ফিরিলাম। আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বাড়ী শুদ্ধ সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে ঘোড়ায় চড়িয়া আর একবার আমি খুব বিপদে পড়িয়াছিলাম। ঘোড়া ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে খাদের নীচে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। তখন আমি ইচ্ছা করিয়া—পড়িয়া গিয়া রক্ষা পাইলাম। গায়ে একটু আধটু রক্তপাত হইয়াছিল কিন্তু একটা খুব বড় পাগ্‌ড়ি ছিল বলিয়া মাথায় আঘাত লাগে নাই।"

তার পর কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া—জ্যোতিবাবু "সরোজিনী" রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। জ্যোতিবাবু ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবি-বাবুর পড়ার ঘরে বসিয়াই "সরোজিনীর" প্রুফ্ সংশোধন করিতেন। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবিবাবু শুনিতেন ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয় এমনি মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে জ্যোতিবাবুর একটা গদ্য রচনা ছিল, কিন্তু রবিবাবু তাহার স্থানে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" কবিতাটি রচনা করিয়া সেই গদ্যটার স্থানে বসাইতে বলেন। জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে এই কবিতাটিই সেখানে সুপ্রযুজ্য, তাই তিনি গদ্যের পরিবর্ত্তে এই কবিতাটিতে সুরসংযোগ করিয়া সেইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

"সরোজিনী" প্রকাশিত হইবা মাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গেল। পুরুবিক্রম ও সরোজিনী দুইখানিই জনসমাজে খুব প্রশংসিত হইতে লাগিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার নামে খ্যাতিও বাড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ সরোজিনীঅভিনয়ের পর বাঙ্গলাদেশে আনন্দের একটা বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অমৃত আস্বাদনের তৃপ্তিসুখে বিভোর হইয়া গেল। এক কথায় সরোজিনী তখন বাঙ্গলা নাটকে এক নব যুগের সৃষ্টি করিয়া দিল।

কলিকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাকচী মহাশয় সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেব দেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছিল। যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল।

সরোজিনী যাত্রা একবার জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতেও হইয়াছিল। সরোজিনীর গান তখন সভায়, মজ্‌লিশে, বৈঠকে সর্ব্বত্র গীত হইত।

একবার হাওড়ার একটা থিয়েটারে সরোজিনীর অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্যে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক সরোজিনীর উদ্ধার সাধিত হয় সেই দৃশ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমগ্র রঙ্গালয় ঘনঘন মুখরিত করিয়া দর্শকগণ উচ্চ্বসিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিল, "Thanks, thanks to the young author".

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে আমাদের দলে প্রোমোশন্ দিয়া উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চ্চাতে আমরা তিনজন হইলাম—আমি অক্ষয় (চৌধুরী), ও রবি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী এখনকার ভারতী সম্পাদিকা আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্য চর্চ্চায় তাঁহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

ভারতী প্রকাশের ইতিহাস এইরূপ। একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতালার ঘরে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইজনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা অমনি কায। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এ কথা জানাইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুও এ প্রস্তাবে মত দিলেন। এখন এ পত্রের নাম কি হইবে, এই সমস্যার সমাধানে সকলে যত্নবান্ হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু নাম বলিলেন "সুপ্রভাত" কিন্তু এ নাম জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্দ্ধার ভাব আছে, অর্থাৎ এতদিনে যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"।

সেই ভারতী আজও পর্য্যন্ত তাঁহার ভগিনীদেবীর যত্নে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের বাল্যস্মৃতি-রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "ভারতী" প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের আর একজন বন্ধু লাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন "ভারতী"র জন্য লেখা আদায় করিতে আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম, তিনিও আমাদের বাড়ী ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—একজন খাঁটি কবি। সর্ব্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একটা ডাবা হুঁকা টানিতে টানিতে তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। যখন কোনও সাহিত্য আলোচনা হইত অথবা কোনও বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে টানিতে চক্ষু দুইটি বুজিয়া তিনি ভাবে ভোর হইয়া যাইতেন। আমাদের বাড়ী যখনই

আসিতেন তখনই তিনি আমায় বেহালা বাজাইতে বলিতেন। তন্ময় ভাবে বেহালা শুনিতেন।"

ভারতীর প্রথব বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' "গঞ্জিকা" নামে একটা ভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এইভাগে দ্বিজেন্দ্রবাবুই প্রায় সব লিখিতেন। জ্যোতিবাবু "ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড্" নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু তখন অনেক বিষয়েই লিখিতেন। প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবিবাবু ও অক্ষয়বাবুর লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারতী"তে রবিবাবুর "মেঘনাদবধ" কাব্যের সমালোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয়বাবু তখন বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?" ইত্যাদি। লোকের এসব খুবই ভাল লাগিত।

ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবীর রচনায় পত্রিকার অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। ছিন্নমুকুল মালতী গাথা এবং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রবন্ধ ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অক্ষয়বাবুর কথায় জ্যোতিবাবু বলিলেন "অক্ষয় M. A. B. L. পাশ করিয়া Attorney হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি! তাঁহার মত শিশুর ন্যায় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভাবুক এবং আসল কবি মানুষ কি কখনও সংসারকার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে? তিনি Shakespear-এর বড় ভক্ত ছিলেন; বাড়ীর কয়েকটি ছেলেকে তিনি Shakespeare পড়াইতেন, কিন্তু পড়াইতে পড়াইতে নিজেরই চক্ষুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি যেখানে বসিতেন, সে জায়গাটা চুরুটের ভুক্তাবশেষ ছাই এবং দেশলাইয়ের কাঠিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কোনও কল্পনা যদি কখনও তাঁহার মাথায় একবার ঢুকিত, তবে সেটা বাহির হওয়া বড়ই মুস্কিল হইত। তাঁহাকে অতি সহজেই April fool করা যাইত। একবার রবি গোঁপ দাড়ি পরিয়া একজন পার্শী সাজিয়া তাঁহাকে বড় ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম—বোম্বাই হইতে একজন পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। রবি ছদ্মবেশী পার্শী হইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাহিত্যআলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত, কিন্তু ঐ যে পার্শী বলিয়া তাঁর ধারণা হইয়াছে সে ত শীঘ্র যাইবার নয়! অক্ষয় বাবু Byron, shelly প্রভৃতি আওড়াইয়া খুব গম্ভীর ভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ চলিতেছিল, আমরা হাস্য সংবরণ আর করিতে পারি না, এমন সময় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি "এ কে?—রবি?" বলিয়া রবির মাথায় যেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ সব খসিয়া গেল! তখন অক্ষয়বাবু কিছুক্ষণ বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন;

তখনও কল্পনার নেশাটা তাঁহার মাথা হইতে যেন সম্পূর্ণ ছুটে নাই!

আরও দুই একবার তাঁহাকে এপ্রিল ফুল করিবার মৎলব করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার ঘরের চতুর মন্ত্রীটি সব ভণ্ডুল করিয়া দিতেন।"

"উদাসিনী" নামে একটি কবিতা তিনি প্রথম রচনা করেন। ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার খুব প্রশংসাও তখন হইয়াছিল। তারপর "ভারত গাথা" নামে কবিতায় তিনি একখানি ইতিহাস লেখেন। ইহাতে আর্য্যদের ভারতে আগমন হইতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে কবিতায় বর্ণিত ছিল। এখানি তখন কোন কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক রূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু বাঁয়া বাজাইতেও বড় ভালবাসিতেন। আসল যন্ত্রের অভাবে তিনি অনেক সময় টেবিলেই কায সারিয়া লইতেন। অনেক সময় জ্যোতিবাবু বেহালা বাজাইতেন, আর অক্ষয়বাবু বাঁয়ায় সঙ্গত করিতেন। অক্ষয়বাবু প্রেমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সফর্দা—মধ্যমান

নিতান্ত না রইতে পেরে
দেখিতে এলাম আপনি
দেখ আর না দেখ আমায়
দেখিব ও-মুখখানি।
মনে করি আসিব না
এ মুখ আর দেখাব না
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে
কেন যে তাহা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা
তুলিব না কোন কথা
সাধিব না, কাঁদিব না
রব অমনি।
যেথা আছ সেথাই থাক
আর কাছে যাব না কো
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু
দেখেই যাব এখনি॥

বেহাগ্—মধ্যমান্

কেনইবা ভুলিব তোমায়
কে ভোলে হৃদয়-ধনে।
শূন্য হৃদয় লয়ে
কি সুখ বাঁচিয়ে প্রাণে।
আশাতে নিরাশা বলে'
তোমারে কি যাব ভুলে
সে ত নয় রে ভাল বাসা
—সুখ আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা
চাহিব না ভাল বাসা
ভাল বেসেই সুখী রব
মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি
দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে
পূজিব অতি যতনে॥

এক সময় জ্যোতিবাবু পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতেন। জ্যোতিবাবুর দুই পার্শ্বে অক্ষয়বাবু ও

রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। জ্যোতিবাবু যেমন একটি সুর রচনা করিলেন অমনি ইঁহারা সেই সুরের ভাবের সঙ্গে কথা বসাইয়া গান রচনা করিতেন। একটি সুর তৈরি হওয়ার পর জ্যোতিবাবু আরও কয়েক বার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতেন। সে সময় অক্ষয়বাবু চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্র ভাবে ধূম প্রবাহ বহিত তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি চুরুটের টুক্‌রাটি পিয়ানোর উপরেই রাখিয়া দিয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিয়া লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবিবাবু কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই রচনা করিতেন। অক্ষয় বাবুর যত শীঘ্র হইত, রবিবাবুর



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

তেমন হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু ইঁহাদের এক উল্টা পদ্ধতি ছিল। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবীও অনেকসময় তাঁহার সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁহাদের তেতালার মহলের আবহাওয়া তখন পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবিবাবুর প্রথম গীতিনাট্য "কালমৃগয়া এবং পরবর্ত্তী গীতিনাট্য "বাল্মীকি প্রতিভা"তেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।

একদিন জ্যোতিবাবুরা ষ্টীমারে চন্দন নগর যাইতেছিলেন। পথে খুব ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু তার সঙ্গে গান বাঁধিতেছিলেন। ইঁহারা গান রচনায় একবারে তন্ময় হইয়া ছিলেন। এই দিনকার রচিত গানগুলি হইতে শেষে "মানভঙ্গ" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়া গেল। "মানভঙ্গ" প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়, তার অনেক দিন পরে শেষে যখন "ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ" স্থাপিত হয়, তখন জ্যোতিবাবু এই "মানভঙ্গে"র আখ্যান বস্তু লইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "পুনর্বসন্ত" নামে আর একখানি গীতিনাট্য প্রকাশ করেন। "পুনর্বসন্ত" সঙ্গীতসমাজে অনেকবার অভিনীত হইয়াছিল। লোকেরও এখানি খুব ভাল লাগিয়াছিল।

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জ্যোতিবাবুরা প্রতি বৎসর একটি "সম্মিলনী" আহ্বান করিতেন। উদ্দেশ্য—সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়। মহর্ষি যে চারিজন ছাত্রকে বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, এই সম্মিলনের নামকরণ করিয়াছিলেন—"বিদ্বজ্জনসমাগম।" এ 'সমাগমে' তখন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত। এই উপলক্ষ্যে রচনা, কবিতাদি পঠিত হইত, গীত বাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং শেষে সকলের একত্রে প্রীতিভোজ হইয়া শেষ হইত।

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্বন্ধে জ্যোতি বাবু এই মজার গল্পটি বলিলেন।

"রাজকৃষ্ণ বাবু যখন 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান্ কবি। সবে মাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার এক ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে একটা কি ষ্টেশনে রোগা ময়লা-কাপড়-পরণে, খালি-পা' একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে কিছুই পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া

আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই। যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক বলিল, "হাঁ পারি।" যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন "তা বেশ বেশ, দেখ এই কেদার আমার প্রেয়সী তারার নিকট হইতে আমায় ছিনাইয়া লইয়া চলিতেছে,—আর এমনি করিয়া আমায় দুঃখ দিতেছে। তুমি এই বিষয়ে একটা কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি!" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চৌতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তার প্রথম দুই ছত্র আমার এখনও মনে আছে

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।"

ইত্যাদি।



রাজকৃষ্ণ রায়

এই বালকই তখনকার উদীয়মান্ কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।"

ইঁহাদের বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে রবিবাবু অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি প্রতিভা"য় জ্যোতিবাবু কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্‌সার্টের ভার ছিল। অক্ষয় মজুমদার "বাল্মীকি প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দ্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অক্ষয় বাবুর ন্যায় হাস্যরসের অভিনেতা তখন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশ তিনি গ্রহণ করিতেন।

ইহার কিছু দিন পরে তদানীন্তন লাট সাহেবের পত্নী লেডী ল্যান্সডাউন (Lasndowne) ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয় দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও (এখন স্যর) ছিলেন। রবিবাবু নিজে বাল্মীকি এবং বালিকা প্রতিভাদেবী (এখন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) সরস্বতী সাজিয়াছিলেন, ও বাড়ীর অন্যান্য বালিকারা বনদেবী সাজিয়াছিলেন। অভিনয় পারিপাট্যে ও গানে সকলেই প্রীত হইয়া ছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—সত্য সত্যই ঝর্ ঝর্ করিয়া যখন জল-ধারা পড়িতে লাগিল তখন অনেকের তাহা প্রকৃত বৃষ্টিধারা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। লেডী ল্যান্সডাউন্ অভিনয় দর্শন করিতে করিতে অক্ষয় মজুমদারকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "He is my man" এই কথা শুনিয়া অক্ষয় বাবু পরে মনে মনে খুব গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় রহস্য করিয়া বলিতেন "লেডী ল্যান্সডাউন্ আমাকে my man বলিয়াছেন।"

প্রথম যখন তাঁহাদের বাড়ীতে বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় হয় তখন জ্যোতিবাবু নূতন শীকারী; বন্দুক চালনা, প্রভৃতিতে তখন তাঁর একান্ত ঝোঁক; অভিনয় উপলক্ষে তিনি নিজেই শীকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকার একটা পাখী অভিনয়ে দেখাইবেন এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে সারা দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু একটা পাখীও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক্ লইয়া যাইতেছে। তাহার নিকট হইতে তিনি দুইটি বক ক্রয় করিয়া মারিয়া আনেন—তাহাই অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সকলেই জানে যে সেই ক্রৌঞ্চমিথুন জ্যোতিবাবু শীকার করিয়াই আনিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর এ সময়ে শীকারের ঝোঁকটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে সদলবলে তিনি শীকারে

বাহির হইতেন। এই দলে মেট্রোপলিটান্ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেক লোক ছিলেন। বাটি হইতে প্রচুরপরিমাণ খাবার লইয়া ইহারা বহির্গত হইতেন। শীকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ।

একদিন শীকার হইতে ফিরিতে ফিরিতে পথে একটা কাহার বাগানে দেখিতে পাইলেন বেশ সুন্দর সুন্দর ডাব রহিয়াছে—ডাব খাইতে হইবে। ব্রজবাবু বাগানে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ওরে মালি, মামা কই ?" মালি ভাবিল ইনি তবে বুঝি মালিকেরই ভাগিনেয়। সে বলিল, "তিনি ত' আসেন নাই।" তখন ব্রজবাবু তাহাকে কতকগুলি ডাব আনিতে বলিলেন। মালী শশব্যস্তে সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিল।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য জ্যোতিবাবু এই বন্দুক ছোঁড়া ও শীকারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কবি অক্ষয়চন্দ্রকে কিন্তু কিছুতেই ইহার মধ্যে ভিড়াইতে পারেন নাই। একদিন জ্যোতিবাবু অক্ষয়বাবুকে ধরিয়া বলিলেন, তোমাকে বন্দুক ছুঁড়িতেই হইবে। অক্ষয়বাবু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু জ্যোতিবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন—অক্ষয়বাবু প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, উপায় নাই! শেষে তিনি চক্ষু বুজিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইলেন, আর জ্যোতি বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বন্দুকের ঘোড়াটি টিপাইলেন। অনেকের ভয় এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়াছিল, অনেকে কিছু কিছু শিখিয়াও ছিল, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ভয়ের আর ক্ষয় হইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারতের সভ্যতা

(Mazeliereএর ফরাসী হইতে)

উপক্রমণিকা

এসিয়া ও ভারতের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব।

সংশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারাই বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশ চলিতে থাকে। এই সংশ্লেষণক্রিয়া খুব সাধারণ ধরণের ও খুব জটিল। কতকগুলি পরিবারের সম্মিলনে গোত্র, গোত্র-সমূহের সম্মিলনে শাখাজাতি, শাখাজাতি-দিগের সম্মিলনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হয়; এবং এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ বড় বড় সাম্রাজ্যে বিলীন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, সামরিক অভিযান ও বাণিজ্য-সম্বন্ধ হইতে কতকগুলি জাতি, সভ্যতার কতকগুলি প্রধান মূলসূত্র লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতা, এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতা,

সাধারণ সমস্ত সভ্যতাই, সমস্ত পৃথিবীময় অধুনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল জাতি স্বকীয় ভৌগোলিক সংস্থানের প্রভাবে একটি সমগ্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলে, একতায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেকগুলি যুগ অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমে তাহারা একটি সাধারণ সভ্যতা লাভ করে, পরে মৈত্রীবন্ধনের দ্বারা, অথবা দিগ্বিজয় দ্বারা তাহারা একটি রাষ্ট্রজাতিতে (nation) পরিণত হয়। পরিশেষে, এই রাষ্ট্রজাতির মধ্যে মূলবংশগত উপাদান ও বিচিত্র সামাজিক উপাদান সকল উত্তরোত্তর সংমিশ্রিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি রাষ্ট্রজাতি হইতে গেলে, প্রাদেশিক বাক্-রীতি, প্রথা, বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রকৃতি কাল সহকারে অন্তর্হিত হওয়া আবশ্যক; এবং তাহার স্থানে এক ভাষা, এক বিধিব্যবস্থা, এক জাতীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তখন আইন, সামাজিক শ্রেণীদিগের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য আর স্বীকার করিবে না, এবং রীতিনীতির মধ্যেও এই বৈষম্য ক্রমশ বিলুপ্ত হইবে। অতএব গণতন্ত্রের কেন্দ্রিকতা ভিন্ন কোন জাতি সম্যকরূপে এই একতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই কেন্দ্রিকতা হইতে যে শাসনতন্ত্র উৎপন্ন হয় তাহা অতীব জটিল। প্রদেশগুলিতে নূতন কিছু আরম্ভ করিবার শক্তি থাকে না, কোন প্রকার মৌলিকতাও থাকে না, গ্রামপল্লী লোকশূন্য হইয়া, কতকগুলি বিশেষ কেন্দ্র কিম্বা একটি নাগরিক কেন্দ্র সেই সকল লোকের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। গণতন্ত্র হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উৎপন্ন হয় এবং এই অপরিপক্ক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণামে স্বদেশানুরাগ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, একস্বার্থমূলক জমাটভাবের অভাব হয়। দৈহিক গঠন-বিধানের ন্যায় সামাজিক গঠন-বিধানেও, উন্নতির একটা প্রথম যুগ পরিলক্ষিত হয়;—তাহার পর উন্নতির চরম যুগ, তাহার পর অবনতির যুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তখনও ভারতবাসীদের সেই সভ্যতা ছিল যে-সভ্যতা তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে, অশোকের সাম্রাজ্য হইতে, হিন্দুধর্ম্ম হইতে, এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে, পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হয়। ইসলামধর্ম্মের প্রচারে, সামন্ততন্ত্রের সংস্থাপনে,—রাষ্ট্রজাতি সমূহ, ভাষাসমূহ ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়সমূহ গঠিত হইয়াছিল। পরে এই সভ্যতার সম্পূর্ণ অবনতি হইল; কিন্তু মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেও, একতার ভাবটি রহিয়া গেল এবং বর্ণভেদ পদ্ধতির মূলবর্ণগুলি উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া সামাজিক উপাদানগুলি যাহাতে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, তাহার পথ প্রস্তুত করিল।

যাহাতে ভারতীয় সভ্যতা পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে, স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ অবাধে অনুসরণ করিতে পারে, তাহার জন্য উন্নতির ত্রিধারা আবশ্যক; ভৌমিক একতা লাভ; ক্রমশ বর্ণভেদের অন্তর্ধান; জরাজীর্ণ উপাদানগুলির বিলোপ-সাধন করিয়া, সবল সুস্থ উপাদানগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া, এবং কোন একটি নূতন মূলসূত্রের তত্ত্বের দ্বারা এই সকল বিচিত্র উপাদানকে

সংশ্লিষ্ট করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য একটি সাধারণ সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

স্বয়ং ভারত এই কার্য্যটি সাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল।

ভারতীয় কোন রাষ্ট্রজাতিই দীর্ঘকালের জন্য একাধিপত্য কখনই রক্ষা করিতে পারিত না।

একতা অর্জ্জন করিবার জন্য অনেক দেশের লোক, একই বংশের কতকগুলি লোকের প্রধান্য স্বীকার করিয়া থাকে; সেই সব লোক সভ্যতার হিসাবে নিকৃষ্ট হইলেও চরিত্রের হিসাবে অপেক্ষাকৃত সমুন্নত। এইরূপে গ্রীশ, ম্যাসিডোনিয়া কর্ত্তৃক বশীভূত হয়; ইতালী রোমকর্ত্তৃক বশীভূত হয়; জর্ম্মাণী প্রুসিয়া কর্ত্তৃক বশীভূত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে, মূলজাতিগত ভেদাভেদ বড়ই সুনির্দ্দিষ্ট, আবার মুসলমানের অধিষ্ঠান, এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তা ছাড়া যাহারা সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই, সেই মরাঠারা সৈনিক ও দস্যু মাত্র ছিল, তাহাদের এমন কোন গুণ ছিল না যাহার বলে তাহারা বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে।

এমন কোন সামাজিক শ্রেণীও ছিল না যে ভারতে একটা মহাবিপ্লব আনয়ন করিতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্তর্হিত হইয়াছিল, ইতরসাধারণ লোক ভূস্বত্বাধিকার-বর্জ্জিত কৃষিমজুরে পরিণত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা বৈরভাবাপন্ন কতকগুলি উপবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-শাসনতন্ত্র তিরোহিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের অবনতি হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই গুরুর আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া সামান্য গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের আর শাসনকর্ত্তৃত্ব ছিল না। সামরিক শ্রেণীর মধ্যে—সকল বংশের, সকল রাষ্ট্রের, সকল ধর্ম্মের লোকই ছিল। তাহাদের বিভিন্ন মতিগতি, বিভিন্ন ব্যবসায়। তাহাদের মধ্যে রাজা ছিল, মনসবদার ছিল, রাজস্বের ইজারদার ছিল, সামান্য কৃষকও ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা অশ্বারোহী সৈনিক, কেহ বা দস্যু, কেহ বা আমীর ওমরাও। সকলেই স্বার্থপর, উন্নত-নীতিবর্জ্জিত, ভ্রষ্টচরিত্র এবং সকলেই দলে দলে বিভক্ত এবং সকলেই—নিম্ন অবজ্ঞাত বেণিয়া কি প্রপীড়িত রায়ৎ—উভয়েরই নিকট ঘৃণিত।

যাহাতে ভারতের একতার কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে তজ্জন্য ভারত কি কোন এসিয়িক রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল? না, এই সকল রাষ্ট্র তখন অবনতিগ্রস্ত; পরে যেসকল প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রকৃতির উপযোগী ঐ সকল প্রতিষ্ঠান, বরং সেই সকল রাষ্ট্র ভারতের নিকট হইতেই ধার করিয়াছিল। অতএব ভারতের ক্রমবিকাশের জন্য য়ুরোপীয় প্রভাবের বশবর্ত্তী হওয়া ভারতের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

(১)

ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, এসিয়িক সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ কতকটা সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিল। এই ক্রমবিকাশের মুখ্য অভিব্যক্তিগুলি এই:—সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে বড় বড়

রাষ্ট্রস্থাপন; মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক এই সকল রাষ্ট্রের উচ্ছেদসাধন; বর্ব্বর জাতিসমূহ ও প্রাচীন জাতিসমূহের সম্মিলনে নূতন জাতির সংগঠন; সামন্ত তন্ত্র; কেন্দ্রীভূত বড় বড় রাজ্যের সংস্থাপন; তাহা হইতে আভ্যন্তরিক শান্তি, অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত বিধিব্যবস্থা, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি

তাছাড়া, ঐ উভয় সভ্যতার মধ্যেই, ঐতিহ্য ও প্রথানুবর্ত্তিতার প্রাদুর্ভাব ছিল। যে সকল গুণ অধুনা প্রাচ্য মানসপ্রকৃতির নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার অধিকাংশই মধ্যযুগের অথবা পুরাকালের য়ুরোপীয় লোকের মধ্যেও পরিলক্ষিত হইত। এই গুণগুলি, তাবৎ মানবসমাজের ক্রমবিকাশেরই একটা সাময়িক অবস্থা।

তাহার পর, আবার যদি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এসিয়া য়ুরোপের মধ্যে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে এসিয়ার নিকৃষ্টতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না।

আক্‌বরের শাসনাধীনে ভারতের, Mangsদিগের শাসনাধীনে চীনের, To Kugovaদিগের শাসনাধীনে জাপানের একটা শাসনতন্ত্র ছিল, একটা রাজস্বসংগ্রহ পদ্ধতি ছিল, সৈন্যমণ্ডলী ছিল, রাস্তা ছিল, ডাকের ব্যবস্থাও ছিল; এবং এই রাস্তা ও ডাক য়ুরোপীয় রাষ্ট্রদিগের সমতুল্যই ছিল। য়ুরোপ অপেক্ষা ঐ সকল দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কম ধনশালী ও কম শিক্ষিত ছিল সত্য; কিন্তু, ঐ সকল দেশের ইতরসাধারণের দুঃখ কষ্ট কম ছিল। সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলনে উহারা সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল, শ্রমশিল্প পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সামুদ্রিক প্রদেশ হইতে অভিযান হইত, উপনিবেশের বিস্তার হইত। (১)

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই তুলনা এসিয়ার পক্ষে ততটা অনুকূল নহে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই দুই মহাদেশের সভ্যতার ক্রম-বিকাশ হইতে সদৃশ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে।

শা-জাহান ও ঔরংজেব ভারতে, এবং য়েমিৎসু জাপানে, স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মঞ্চুদিগের বিজয়াভিযানে, চীনের স্বাভাবিক উন্নতি কিয়ৎকালের জন্য অবরুদ্ধ হইলেও ঔরংজেব ও য়েমিৎসুর রাজত্বের সহিত কাং-হীর রাজত্বের তুলনা হইতে পারে। এই সমস্ত রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুশাসিত ছিল। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যে অনুকরণের ভাব, শাসন কার্য্যে বাঁধা-নিয়মের অনুসরণপ্রবৃত্তি, আসন্ন অবনতি বিজ্ঞাপিত করিল। যদিও রাজকরের আদায়ের পরিমাণ বেশী হইল, কিন্তু দেশ সমৃদ্ধ হইল না, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প অবসাদগ্রস্ত হইল। আর সে সামরিক খ্যাতি প্রতিপত্তি রহিল না; উপনিবেশের বিস্তারও রহিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বৈসদৃশ্য আরও বেশী করিয়া চখে পড়ে। ভারত অরাজকতার মধ্যে নিমগ্ন, জাপান বহির্জগৎ হইতে

(১) একটি মাত্র জাতির উপনিবেশ বিস্তার বাস্তবিকই কৌতূহলজনক। ষোড়শ শতাব্দীতে জাপানীরা শ্যামে ও ফরমোজায় উপনিবেশ স্থাপন করে।

বিচ্ছিন্ন, চিরবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যা সত্ত্বেও চীন আর তত সমৃদ্ধ নহে। যখন য়ুরোপ সমস্ত বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছিল, তখন এসিয়ায় একজনও বৈজ্ঞানিক ছিল না। যে সময়ে য়ুরোপ—দর্শন, রাজ্যশাসন ও অর্থশাস্ত্রের সমস্ত সমস্যা নূতন করিয়া সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন এসিয়ার একটিও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত, একটিও রাজনীতিকুশল রাষ্ট্রপরিচালক ছিল না। যে সময়ে য়ুরোপ অতীব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক সমস্ত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখন এসিয়ার অতীব দৈন্যদশা, তখন সেখানে কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয় নাই।

* *
*

যে দুই সভ্যতা, কত শতাব্দী ধরিয়া একত্র পাশাপাশি চলিয়াছিল, কি কারণে তাহারা হঠাৎ ভিন্ন পথ ধরিল?

সমন্তরালগামী উন্নতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও, কতকগুলি দূরবর্ত্তী হেতু, হঠাৎ উন্নতি প্রতিরোধের আয়োজন করিল। এই সকল হেতু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও এসিয়িক সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্থূল রেখাগুলির পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এক দিকে যেমন মধ্য-মালভূমির বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র, এসিয়িক লোকসঙ্ঘের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে ব্যাঘাত জন্মাইল, অন্য দিকে সেইরূপ ভূমধ্যসাগর,—দক্ষিণ য়ুরোপ, এসিয়া-মাইনর এবং আফ্রিকার উত্তরাংশের লোকদিগকে একত্র সম্মিলিত করিল। এই সকল লোক সকল জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল—ইহারা তিন মহাদেশের অধিবাসী; এবং এই তিন মহাদেশের মৃত্তিকার প্রকৃতি, ভৌগোলিক সংগঠন, আব-হওয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিয়া মাইনরের, গ্রীসের ও দক্ষিণ ইতালীর বিকর্ত্তিত উপকূল, স্বাধীন রাষ্ট্রজাতির গঠনের অনুকূল। তাই তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজস্ব শিল্পকলা, নিজস্ব রাষ্ট্রীক ও সামাজিক পদ্ধতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; জর্ম্মাণী ও রুশে আরও বিলম্বে সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি সেখানকার বড় বড় নদী সহজেই অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগর যেরূপ দক্ষিণের অধিবাসীদিগকে সম্মিলিত করিয়াছিল, সেইরূপ ইংলণ্ডের নর্থ-খাড়ী ও বলটিক্-সাগর উভয় প্রদেশের লোকদিগকে সম্মিলিত করিয়াছিল।

যেমনি একজাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে অমনি আর এক তরুণ জাতি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এবং সেই তরুণ জাতি স্বকীয় বীর্য্য ও সরলতা হইতে পরিভ্রষ্ট না হইয়া, একটা প্রবল সভ্যতার অধিকারী হয়। তবে, তত্রত্য প্রাচীন জাতিরা এই নবীন জাতিদিগের অতিরিক্ত তেজ একটু সংযত করে, অথবা কমাইয়া দেয়। গল্, আইরিশ জর্ম্মাণ ইহারা সকলেই মিসরবাসীদিগের, আসিরীয়দিগের, হিব্রুদিগের, ফিনিসীয়দিগের, গ্রীকদিগের ও রোমকদিগের আবিষ্কারাদির কথা অবগত ছিল। শ্লাভ, হঙ্গারীয়, ফিনলণ্ডীয়,—ইহাদের এই সকল কথা জানিবার জন্য আরও কম প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। এইরূপে সমস্ত য়ুরোপ একই

সভ্যতার অধিকারী হইয়াছিল। এবং অন্য মনীষীরা, অন্য চরিত্রবান লোকেরা, সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া এই সভ্যতাকে ক্রমাগত নূতনভাবে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছিল।

এই সম্মিলনের প্রথম পরিণাম ধর্ম্মের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। গ্রীক্-নগরগুলির দেবতারা বিলীন হইয়া একমাত্র জিহোভায়, একমাত্র হীরায়, একমাত্র হিরাক্লিসে পরিণত হইল। এই সকল দেবতা, রোমকদিগের সহিত, পরে ইজিপ্সীয় ও প্রাচ্যখণ্ডের দেবতাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছিল; পরে, সকল দেবতাই জুপিতর দেবের অধীনে আসিয়াছিল—আবার এই জুপিতরও ইজিপ্সীয়দিগের "আমন-রা-র মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

সেই সঙ্গে পৌরাণিক উপকথাগুলি, সাংকেতিক বিগ্রহে পরিণত হইল। চারিত্রনীতিও পরিশোধিত হইল। নিজ নিজ ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক দেশের লোকই অসভ্য অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইল। মনুষ্য,—পিতা পুত্র, পতি বন্ধু ও পৌরজন প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা উচ্চতম আদর্শের ধারণা করিল। এবং বিভিন্ন দেশের অধিবাসীর সহিত বাণিজ্য চলিতে থাকায়, এমন একটা বিশ্বজনীন চরিত্রনীতির উদ্ভব হইল, যাহাতে সকলেরই শ্রেষ্ঠগুণগুলি মিলিয়া মিলিয়া একটা সমন্বয় সাধন করিল। হিব্রুদিগের ঈশ্বরভক্তি ও সাম্য ভাব, রোমকদিগের রাষ্ট্রীক ও সামরিক গুণরাশি, ইজিপ্টের গুহ্য যোগধর্ম্ম, ভারতের তপশ্চর্য্যা, গ্রীক্দিগের দৈহিক ও নৈতিক সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম—এই সমস্ত একত্র মিশিল।

এইরূপে, একটা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সমন্বয়াত্মক রূপ গড়িয়া উঠিবার জন্য পথ প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সমন্বয়ের মূলসূত্রগুলি গোড়ায় খৃষ্টধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত করে। খৃষ্টধর্ম্মই স্বাধীন নির্ব্বাচনের শিক্ষা দিল। কোন প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র তৎপূর্ব্বে, অদৃষ্টবাদ একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই, ঈশ্বর খামখেয়ালিভাবে যাহা-তাহা করিতে পারেন—এই যে বিশ্বাস, ইহা কোন প্রাচীন ধর্ম্মই একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের যে নীতি তাহা প্রকৃতভাবে মানবনীতি। কোন বিদ্বেষপূর্ণ ঈর্ষাপরায়ণ দেবতা মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করেন না, পরন্তু পাপের জন্য প্রথম-মনুষ্য নিজেই অপরাধী। এই বৈজিক পাপপ্রবণতা জয় করিবার জন্য একটা অতিপ্রাকৃতিক প্রসাদ (grace) লাভ করা আবশ্যক; কিন্তু এই প্রসাদ মানব দেহধারী ঈশ্বরপুত্র হইতেই মানুষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাছাড়া, কি গোড়ার পাপ, কি মুক্তিদাতার প্রসাদ—ইহার কোনটাই স্বাধীন নির্ব্বাচনের বিরোধী নহে। খৃষ্টধর্ম্মের নীতি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিনিষ্ঠ নীতি ছিল। এই নীতি কুল-গত ধর্ম্ম ও স্বদেশীয় ধর্ম্মকে রহিত করিয়া দেয়। নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মানুষ স্বকীয় সামাজিক কর্ত্তব্যসকল লঙ্ঘন করিতে পারে,—ইহাই এই নীতি মানুষকে শিক্ষা দেয়। (২)

(২) বৌদ্ধধর্ম্মও একটি ব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু ইহা কেবল ভিক্ষুদের জন্যই।

এসিয়ায়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, কংচুফু-ধর্ম্ম, তাও-ধর্ম্ম, শিন্তো-ধর্ম্ম, জেন্দাবেস্তার ধর্ম্ম—এই সমস্ত স্বদেশনিষ্ঠ ধর্ম্ম—পৌরাণিক উপকথা ও কিংবদন্তী হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিতে পারে নাই। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার মধ্যে যে একটা যুঝাযুঝি অবিরাম চলিতে থাকে, উক্ত কোন ধর্ম্ম হইতেই এই যুঝামুঝির ভাব উৎপন্ন হয় না—এবং এই যুঝাযুঝির ভাব হইতেই সুগভীর তত্ত্বকথা ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের উদ্‌ভব হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইসলামধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, কিন্তু যে-অর্থে খৃষ্টধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, ইহারা সে-অর্থে সার্ব্বভৌমিক নহে। খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসমূহের এই সার্ব্বভৌমত্বের বিশেষ-অর্থটি বিলুপ্ত করে এবং য়ুরোপ, এই অর্থের পরিবর্ত্তে এমন একটি অর্থ বসাইয়া দেয় যে, সেই ধর্ম্মগুলি অন্তর্হিত হইতে আর বেশী বিলম্ব হইল না। পক্ষান্তরে, যে ধর্ম্ম গোড়ায় হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুই রহিয়া গেল। এবং যে ধর্ম্ম আরবদেশে উৎপন্ন তাহা আরবই রহিয়া গেল।

বৌদ্ধধর্ম্ম, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম-সমূহকে রূপান্তরিত করিলেও এবং তাহাদের দ্বারা নিজেও রূপান্তরিত হইলেও,—তাহাদিগকে বিনষ্ট করে নাই, কিংবা তাহাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় নাই। সামরিকভাবাপন্ন ইসলাম—বিজয়ীদিগেরই ধর্ম্ম, কিন্তু বিজিত-দিগের ধর্ম্ম, ইস্‌লাম-প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইয়াও বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ইসলাম ধর্ম্মও আপনাকে অন্য ধর্ম্মের বেশী প্রভাবাধীনে আসিতে দেয় নাই।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও এই একই কথা। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ভিক্ষুদিগকেই মুক্তির আশ্বাস দেয়। বিধর্ম্মিদিগের প্রতি ইসলামের কোন দয়া নাই; তাহাদিগকে দীক্ষিত করিবার যে-একমাত্র উপায় ইসলামধর্ম্ম অবগত আছে—তাহা বাহুবল। উক্ত দুই ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক নীতিউপদেশ প্রচার করিয়াছে বটে কিন্তু "স্বাধীন নির্ব্বাচন"-রূপ কোন ফলগর্ভ মতবাদ স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করে নাই। ইসলাম অদৃষ্টবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যোনিভ্রমণের মতবাদটি বজায় রাখিয়াছে। ভিক্ষাসম্বন্ধে উক্ত তিন ধর্ম্মের মূল্য উপলব্ধি করিতে হইলে, কার্য্যতঃ উহারা কি করিয়া থাকে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। মুসলমানেরা বলে:—

"কি মুক্তি, কি নরকভোগ,—ইহার জন্য মানুষের অদৃষ্ট ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বহইতেই নির্দ্দিষ্ট। যেহেতু ইসলামই মুক্তির একমাত্র নিশ্চিত প্রতিভূ, অতএব তৎবর্জ্জনই স্বর্গলাভের একমাত্র অন্তরায়।" বৌদ্ধেরা বলে:—পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য জন্মের পরিণামস্বরূপ আমার এই যে বর্ত্তমান জন্ম, এই জন্ম হইতে আরও অসংখ্য জন্মের উৎপত্তি হইবে। অবশ্য, মুক্তিলাভের জন্য আমার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই চেষ্টার পরিণাম কি হইবে? অসংখ্য জন্মের পর (এবং প্রত্যেক জন্মেই, মুহূর্ত্তের পদস্খলনে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে) হয় ত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যাইবে।" পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা বলেন:—"এই কার্য্য" আমি করিতেও পারি, না করিতেও পারি—এই বিষয়ে

আমার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে। এই কার্য্য করিয়া আমি মৃত্যুর কবলেও পতিত হইতে পারি। ধার্ম্মিকের জন্য অনন্ত স্বর্গ, পাপীর জন্য অনন্ত নরক।" যাহারা এই প্রকার মতবাদ অবলম্বন করে, সেই য়ুরোপীয়দের চরিত্র এসিয়িকদিগের চরিত্র অপেক্ষা কম পাপাসক্ত,—এই মতবাদ (৩) য়ুরোপীয়দিগের চরিত্রকে ধর্ম্মপথে আরও দৃঢ় রাখিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম, মূলে সার্ব্বভৌমিক হওয়ায়, উহার ক্রমবিকাশেও খৃষ্টধর্ম্ম এই তত্ত্বটিকে স্থির রাখিয়াছে। অবশ্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য খ্রীষ্ট সমাজের মধ্যে শীঘ্রই একটা পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপি সমস্ত খ্রীষ্টান মণ্ডলী, আপনাদিগকে একস্বার্থাধীন বলিয়াই বিবেচনা করিত। মধ্যযুগে পোপতন্ত্র য়ুরোপের নৈতিক একতা রক্ষা করিয়াছিল। এমন কি প্রসিদ্ধ "খৃষ্টধর্ম্মসংস্কার," এক রাজ্যের প্রজাদিগের মধ্যে ভেদ প্রবর্ত্তিত করিলেও সেই সঙ্গে, শত্রুরাজ্যের প্রজাদিগকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল, বিভিন্ন য়ুরোপীয় দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে নৈকট্য স্থাপনের পক্ষে সাহায্য করিয়াছিল।

পক্ষান্তরে, য়ুরোপের, ইজিপ্টের, পূর্ব্ববর্ত্তী এসিয়ার সমস্ত ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে বিলুপ্ত হইল; ঐ সকল অঞ্চলে, যে সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—তৎসমস্তই রোমক-সাম্রাজ্যে পর্য্যবসিত হইল; বিভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র শাসনপদ্ধতি,—রোমকশাসন তন্ত্রের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। উহার অনেকগুলি শাসন-নীতি এসিয়া ও য়ুরোপের যুগল সভ্যতার অন্তর্ভূত; এইরূপে কেন্দ্রগত অনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র প্রথম ইজিপ্টে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, উহাই পারসীকেরা প্রণালীবদ্ধ করে এবং পরে গ্রীক ও রোমকদিগের নিকট সংক্রামিত হয়। কিন্তু য়ুরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে যে তত্ত্বটী সর্ব্বাপেক্ষা ফলগর্ভ, তাহা এসিয়ার কোথাও ছিল না। সেটি (city) পৌরতন্ত্র। এই পৌরতন্ত্র গোড়ায় গ্রীস ও ইতালীতে উৎপন্ন হয়, এবং অনেক পরে উহা গল ও জর্ম্মান দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌর শাসনের ভিত্তিমূলে আমরা পারিবারিক গঠনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু তথাপি, যেহেতু পিতৃশাসনতন্ত্রই এসিয়িকদিগের নিজস্ব শাসনপদ্ধতি এবং এসিয়ার বড় বড় নগর, পৌরতন্ত্র কস্মিনকালেও অবগত ছিল না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, য়ুরোপীয় কৌলিক ক্রমবিকাশের উপর বিদেশীয় শাসননীতির প্রভাব মুদ্রিত হওয়ায়, এই কৌলিক ক্রমবিকাশের গতি একটা বিশেষ দিক্ লইয়াছিল। এই সকল তত্ত্ব-গুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব—ভূস্বত্বাধিকার। কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন লোকদিগেরই এই বিষয় সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কেননা, তাহাদের উজ্জ্বল বুদ্ধি ছিল ও রূপ-প্রদায়িনী কল্পনা ছিল; এই গুণই তাহাদিকে পৌত্তলিক করিয়া তুলিয়াছিল। ভূস্বত্বাধিকার মানুষকে ভূমির প্রতি আসক্ত করে। আপন জমির মালিক,—ক্ষুদ্রতম ভূম্যধিকারীও অধীন প্রজা নহে--সে একজন স্বাধীন নাগরিক (citizen) বলিয়া পরিগণিত।

ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিবার জন্য, যুদ্ধ ও

(৩) কি-ধর্ম্মান্ধতা!—শ্রীজ্যো—

শান্তির কথা স্থির করিবার জন্য পৌরজনেরা একত্র সম্মিলিত হয়। রাজস্ব-বিভাগ ও পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, বিচারপতি, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সচিব প্রভৃতি এই পৌরজনমণ্ডলী হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এবং যখন রোম একটা সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিল, এই নির্ব্বাচিত পৌরজনেরাই তখন ঐতিহাসিক রাজবংশ সমূহের রাজ্য শাসন করিত। এই সকল ব্যবস্থাপদ্ধতিই য়ুরোপীয়দিগের চরিত্র গঠন করিয়াছিল। এসিয়িকদিগের কিংবা মান্দারিনদিগের ব্যবস্থাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অনুকূল।(৪)

মনে হইতে পারে, বর্ব্বরদিগের আক্রমণে বুঝি সমস্ত প্রাচীন সমাজই বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সমাজের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলি রহিয়া গিয়াছে। যেমন এক দিকে বৈজেনসিয়া ও প্রাচ্যখণ্ড,—রোমের প্রথাদি অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না; অপর দিকে, গথ্, লম্বার্ড, ও মেরোভিজিয়েনেরা, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিল। charlemagne এই সাম্রাজ্য স্থাপনে সফল হইলেন। তাঁহার পরেও, জার্ম্মান সম্রাটগণ, অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ, চতুর্দ্দশ লুই, নেপোলিয়ান, তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। এই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য-কল্পনার বিরুদ্ধে—যোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় শক্তি-সামঞ্জস্যের কল্পনা আসিয়া খাড়া হইল। ইহা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য কল্পনার একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপমাত্র; কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিকদিগের নীতিকৌশল,—য়ুরোপের বিজয়লব্ধ একতার স্থলে, মৈত্রীবদ্ধ য়ুরোপের বাস্তব একতা স্থাপনে সমুৎসুক হইল। এমন কি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রোমক ঐতিহ্যও আবার দেখা দিল। রোমক ব্যবস্থাভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন এরূপ আর কেহ করে নাই।

ভূস্বত্বভোগের নিয়মটি পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তাহার সহিত আশ্রয়-আশ্রিতের নীতিটি মিশিয়া সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি করিল। এই সামন্ততন্ত্র য়ুরোপীয় চরিত্রে আর একটি নূতন গুণ সংযোজিত করিল—সেটি আত্মসম্মান-বোধ। গ্রীশীয় city-র ভাব বজায় রাখিয়া এবং তাহার সহিত জার্ম্মান প্রতিষ্ঠানাদি সম্মিলিত করিয়া, এই সামন্ততন্ত্রের মূলনীতিই মধ্যযুগের সাধারণ-মণ্ডলীর (commune) সৃষ্টি করিল। পৌর-স্বায়ত্ত-তন্ত্র ও পঞ্চায়ৎ-তন্ত্রই য়ুরোপীয় মধ্যপদবী পৌর-জনশ্রেণীগঠনে সাহায্য করিয়াছিল। এই পৌর জন-শ্রেণীকে ("বুর্জোয়া") বাদ দিলে,--দোকানদারও থাকে না, শ্রমশিল্পীও থাকে না, মহাজন কুঠিওয়ালাও থাকে না, চিকিৎসকও থাকে না, বৈজ্ঞানিকও থাকে না, কারিগরও থাকে না, সাহিত্যিকও থাকে না।

এসিয়ার লোকের মধ্যে এমন কোন

(৪) কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, হিন্দুদিগের পৌরতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রীক—রোমক পৌরতন্ত্রের অনুরূপ। সে যাহাই হউক, ভারতের এই পৌরতন্ত্র কখনই রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায় নাই। মানব সভ্যতা একই জিনিস, কিন্তু তাহার ক্রমবিকাশের গতি অদৃষ্টাধীন; বিভিন্ন দেশে এই সভ্যতা বিশেষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীস ও রোমে পিতৃকুলতন্ত্রের বিকাশ-পরিণাম—পৌরতন্ত্র; এবং ভারতে উহার বিকাশ-পরিণাম—বর্ণভেদ প্রণালী।

রাষ্ট্রীয় মতবাদ নাই যাহা সকলেরই মধ্যে সাধারণ। অশোকের শাসনকালে, ও মুসলমান রাজবংশের শাসনকালে, পারসীকদিগের প্রথাদি ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠনে চীনের হাত প্রায় কিছুই ছিল না, এবং চীনের প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠনে ভারতেরও কোন হাত ছিল না। ভূস্বত্বের নিয়মটা এসিয়া কোনকালেই স্পষ্টরূপে বুঝে নাই। জাপান ও রাজপুতনার বাহিরে, সামন্ততন্ত্র কোথাও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের নিকট "City" অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং য়ুরোপের নাগরিক শ্রেণীও ছিল না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল না। তাহা হইতেই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অনুদ্ভাব ঘটিয়াছে।

যাতায়াতের সুবিধা, ধর্ম্মের একতা, রোমীয় কিংবদন্তী এই সমস্ত—এসিয়ার সভ্যতা অপেক্ষা য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে অধিকতর গভীরতা ও সমজাতীয়তা আনিয়াছিল। ভারতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ, চীনীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতে স্বতন্ত্র, এবং এসিয়ায় বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একই প্রকার সাহিত্যিক ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয় না।

পক্ষান্তরে, কোন বিজ্ঞানকে বা দর্শনকে,—ইংরাজি, জার্ম্মান বা ফরাসী দর্শন বিজ্ঞান বলা চলে না, সমস্তকেই য়ুরোপীয় বিজ্ঞান বা দর্শন বলিতে হয়। যে সকল তত্ত্ববীজ গ্রীস রোপণ করিয়া গিয়াছিল,—আলেকজান্দ্রিয়ায়, রোমে, বৈজন্-শিয়ায় তাহাই অঙ্কুরিত ও বিকসিত হইয়াছে। ঐ সকল বীজ আরবেরা ফ্রান্স ও ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রামিত করিয়াছিল। প্রাচীন ও রোমের বিদ্যা অনুশীলন করিয়া, বেকন্ ও দেকার্ত্ত নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিলেন; এবং ইহুদী-ওলন্দাজ স্পিনোজা, ও জর্ম্মন লাইবনিজ—ইহাঁরাই দেকার্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র; আবার ইংরাজদিগের মতবাদগুলা—একদিকে ফরাসী কন্দিয়াকের ঐন্দ্রিয়িক দর্শনে পর্য্যবসিত হইল, অপরদিকে জর্ম্মান কান্ত ও সোপেনহেয়রের অতীন্দ্রিয় দর্শনে পর্য্যবসিত হইল। এই প্রকার বিজ্ঞানেও। কেপলার, গালিলিও, নিউটন্, প্যাসকাল, লাপলাষ, লাভোয়াসিয়ে ফ্যারাডে, ডার্ব্বিন, হেল্‌মহোল্‌জ—এই সকল বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোক—বিজ্ঞানের কার্য্য অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল—সম্পূর্ণ করিতে লাগিল। সাহিত্যেও এই প্রকার। ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালী, পরে স্পেন্ সাহিত্যে একটা নূতন সুর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল; কিন্তু সকল দেশেই সেই একই প্রকার বাগ্মিতার অগ্নি-উচ্ছ্বাস, সেই একই প্রকার কাব্যসুলভ কৃত্রিম রীতি-রুচি। সপ্তদশ শতাব্দীতে, ফ্রান্স, ক্লাসিক রীতি স্থাপন করিল। এমন কেহ ছিল না যে তাহার অনুকরণ করিত না; ইংলণ্ডের সাহিত্য-গুরুগণ যে সকল গুণের প্রশংসা করিতেন, ফরাসী সাহিত্য-গুরুগণও সেই সকল গুণের প্রশংসা করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমস্ত য়ুরোপই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিল, কৃত্রিম হইয়া উঠিল—পরে দার্শনিক, তাহার পর ভাবুকতাপ্রবণ, অবশেষে বৈপ্লবিক হইয়া উঠিল। উনবিংশতি শতাব্দীতে, এক সময়েই

সকল দেশে ঔপন্যাসিকতা, উদারতা, ও স্বাভাবিকতার আবির্ভাব হইল। রুসো, ম্যাক্‌ফর্সন ও গত্তের সহিত পরিচিত না হইলে, কেমন করিয়া শাতোব্রিয়াঁকে বুঝিবে? বায়রণের রচনাবলী ব্যতীত, পুচকিন্ ও লের্‌মণ্টের রচনা কি হৃদয়ঙ্গম করা যায়?

* *
*

কেবল ষোড়শ শতাব্দীর পরে, য়ুরোপীয় ও এসিয়িক চরিত্রের এই বৈসদৃশ্য কেন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ সাধারণ উন্নতির বৃদ্ধি হইতে থাকিলে তাহার পরেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়।

ফলতঃ, যাহারা এই সভ্যতার বশ্যতা স্বীকার না করে তাহারা জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে না—তাহারা ক্রমশ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। যাহারা আপনাদিগকে এই সভ্যতার উপযোগী করিয়া লয়, অভ্যাসের দ্বারা ঐদিকে তাহাদের প্রবৃত্তি ও রুচিও বলবতী হইয়া উঠে। এইরূপেই ধীরে ধীরে জাতিবিশেষের মন ও প্রকৃতি গড়িয়া উঠে। তখন ঐ সকল জাতির লোক যাহা উৎপাদন করা আবশ্যক তাহা শীঘ্রই উৎপাদন করে। কোন সাহিত্যিক ভাষার পুষ্টিসাধনে যতটা সময় লাগে, কোন' 'ভাষা'কে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করিতে আরও অধিক সময় লাগে। এবং বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলির কার্য্যফল নির্ণয় করিবার জন্য বুদ্ধিশক্তির যতটা প্রযত্ন আবশ্যক, ঐ প্রাথমিক তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিবার জন্য তদপেক্ষা আরও অধিক প্রযত্ন আবশ্যক।

ষোড়শ শতাব্দীতেই, য়ুরোপীয় চরিত্র দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে হৃদয়ভাবের তীব্রতা হইতে এই দৃঢ়তা উৎপন্ন হয়। এই তীব্রতাই য়ুরোপীয় চরিত্রকে এসিয়াবাসীর চরিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে। আকবর ও jeyasu দুজনেই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রপরিচালক, কিন্তু machiavel-এর লেখায়, William of Orange-এর কার্য্যে, যেরূপ যথার্থতা এবং সঙ্কল্পের নিশ্চিততা লক্ষিত হয়, সেরূপ উক্ত দুইজনের চরিত্রে লক্ষিত হয় না। পোর্টুগী নবদেশান্বেষীদিগের সহিত তুর্ক পোতাধ্যক্ষ ও জাপানী নবদেশান্বেষীদিগের তুলনা করা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে কেহই দুঃসাহস ও প্রতিভায়, কলম্বসের সমকক্ষ নহে। যদিও আবুল-ফজলের মতামত কতকটা geordano brunoকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও তাঁহার মানসিক বহুদিকদর্শিতা কতকটা montaigne এর সমতুল্য,—কিন্তু কোন এসিয়িক গ্রন্থকার সেক্‌সপিয়ারের মত' মানব-হৃদয় কি অবগত ছিল? মোগল ও শোগুনদিগের গৃহসন্নিবেশকেরা, (architect) চীন ও জাপানের চিত্রকরেরা, বেশ নিপুণ ওস্তাদ বটে—তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও শ্রমশীলতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহ কি র‍্যাফেলের ভাবব্যঞ্জকতা ও মাইকেল আঞ্জেলোর দুঃখময় গভীর দৃশ্য সমূহের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারিত—রচনা ত দূরের কথা।

ধর্ম্মে, এসিয়িক ও য়ুরোপীয় মর্ম্মভাবের বৈসদৃশ্য আরও বেশী। জাপানে, চীনদেশে,—সংশয়বাদ। হিন্দুদের মধ্যে যোগবাদী কতকগুলি ধর্ম্মসংস্কারের আবির্ভাব দেখা যায়। একে ত হিন্দুরা ইচ্ছাশক্তিবিবর্জ্জিত, তাহাতে আবার ঐ সকল মতবাদ উহাদিগকে আরও নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সুফীরা নিশ্চেষ্টতাবাদের অনুরাগী, সুন্নি-সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়া, ইসমাএল সম্প্রদায় পৌত্তলিক। কেবল "মিলেনিয়ম-" বাদী মুসলমানদিগের প্রকৃত ধর্ম্মোৎসাহ আছে, কিন্তু এই উৎসাহ হইতে অদৃষ্টবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। য়ুরোপে,—ধর্ম্মোৎসাহ হইতে, মত বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইতে, ধর্ম্মসংস্কারের সংগ্রাম উৎপন্ন হইল। একটা নিজের মতামত পোষণ করিতে মানুষ বাধ্য হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত:—যথা, জলসেচন-দীক্ষা, খৃষ্টরক্তমাংস-আত্মসাৎকরণ দীক্ষা, পদনিয়োগ-দীক্ষা, বিশপ-শাসন, পোপের একাধিপত্য তুমি স্বীকার কর, না অস্বীকার কর? রাষ্ট্রীয়জনের (citizen) কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত:—যে রাজা "খৃষ্টপ্রসাদ" হইতে বঞ্চিত, সে রাজার আদেশ পালন করা উচিত কি না? পিতা, পুত্র পতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত:—ব্যভিচারিণী ও বন্ধ্যা পত্নীকে তুমি ত্যাগ করিতে পার কি না?—পুরোহিত বিবাহ করিতে পারে কি না?—তাহার বিবাহ করা উচিত কি না? এবং এই-মতামত অনুসারে কার্য্য করিলে হয়ত ইহ লোকেই তুমি কষ্ট পাইবে—তুমি বলিস্থানীয় হইবে, হয়ত পরলোকে অনন্ত নরক ভোগ করিবে। মধ্যযুগের মতবিশ্বাস, সামন্ততন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত রাজার একাধিপত্য, যে মানুষকে গড়িয়া ভুলিয়াছিল, সেই মানুষ নরকের ভয় ব্যতীত, প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব সেই ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রবিপ্লব কি ঘটাইতে পারিত? বৈজ্ঞানিক মর্ম্মভাব:—কেবল ব্যাপ্তিগ্রহের দ্বারা (induction) পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়মাবলী স্থাপিত হয়; ব্যাপ্তিগ্রহ—অর্থাৎ কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব তত্ত্বের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য সর্ব্বজনগৃহীত মত অস্বীকার করিবার দুঃসাহস; এবং পরীক্ষা পদ্ধতি—অর্থাৎ ঘটনা সকলের ধৈর্য্যসহকৃত যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ। দেকার্ত্ত, সমস্ত মত বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করিয়া, "অলিখিত পূর্ব্ব সাদা কাগজের" উপর স্বীয় দার্শনিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভারতবাসীদের দার্শনিক চিন্তা দেকার্ত্ত অপেক্ষা অধিকতর মৌলিক ছিল; তাহাদের কল্পনা অন্য প্রকারে নির্ভীক ছিল, কিন্তু তাহাদের চরিত্র সেরূপ ছিল না; এবং তাহাদের যে সকল চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসী, তাহা ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দেকার্ত্তের "সাদা" কাগজে কেবলি প্রত্যাহার প্রক্রিয়া, সামান্যীকরণ ও বিশ্লেষণ। কোন প্রকার সাদৃশ্য বা প্রতিবিম্বের দ্বারা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না দিয়া, প্রথমে একটি বিষয়ের উপর, তাহার পর আর একটি বিষয়ের উপর সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। অতএব বৈজ্ঞানিক মনোভাবটি—বিশেষরূপে চরিত্রেরই পরিণাম ফল। কয়েক বৎসর হইল, একজন জাপানী গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন,—"জাপানী

দের রীতিমত বিজ্ঞান যে ছিল না, অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র তাহার কারণ নহে, স্মৃতিশক্তির অভাবও তাহার কারণ নহে, পরন্তু বিচারের অসামর্থ্যই তাহার হেতু।"

শ্রমশিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি —বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত অনুস্যূত। অভিযানের জন্য, উপনিবেশবিস্তারের জন্য, ব্যাঙ্কের জন্য, বড় বড় শ্রমশিল্পের জন্য, কাজের লোক হওয়া আবশ্যক; এবং ঐ সমস্ত ব্যাপার কাজের লোককে আরও বেশী কাজের লোক করিয়া তুলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে বৈজ্ঞানিক মনোগতি, শ্রমশিল্পঘটিত মনোগতির সহিত মিলিত হইয়া জটিল যন্ত্রজালের সৃষ্টি করিল। এই সকল যন্ত্রের আরও উৎকর্ষবিধান করিবার জন্য, উহাদের পরিচালনার জন্য, উহাদের সংরক্ষণের জন্য অবিরাম মনোযোগ আবশ্যক। তাই, দৈহিক শ্রম যতই কষ্টকর হউক না, তাহা অপেক্ষা এই মানসিক শ্রম, শ্রমশিল্পীকে আরও বেশী অবসন্ন করিয়া ফেলে। এসিয়িক বরাবর শিশুই রহিয়া গিয়াছে, এরূপ উদ্যমের কার্য্যে সে অসমর্থ; চীনের লোক ও য়্যানাম দেশের লোক "এন্‌জিন' চালাইতে পারে না। (৫)

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, এসিয়ার ন্যায় য়ুরোপেও অল্প লোকই প্রকৃতরূপে সভ্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে—জটিলতর সভ্যতার প্রয়োজনে, বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলন আবশ্যক হইল। সুশিক্ষিত লোক ভিন্ন—ব্যাঙ্ক, উপনিবেশ কোম্পানী, নূতন ব্যবসায়াদির বিষয় কেহই বুঝিতে পারিত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যন্ত্রাদির ব্যবহারপ্রয়োগের প্রয়োজনে, সমস্ত শ্রমজীবিদিগকে, পরে সমস্ত কৃষকদিগকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইল। এবং এইরূপে কালক্রমে লোকের ক্রমশঃ ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং এই ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের অভাবও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, জ্ঞানশিক্ষার স্পৃহাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

শিক্ষিত হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, সৈনিক-কার্য্য স্বীকার করিয়া, লোকেরা স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা লাভ করিল। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার বিস্তার হইলে, গণতন্ত্র ভিন্ন আর কোনও শাসনতন্ত্র সম্ভব হয় না।

কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতা, সামাজিক একতা, মতবিশ্বাসের স্বাধীনতা, সমস্ত প্রাচীন স্মৃতির বিলোপ, স্ত্রীস্বাধীনতা, অত্যাচার হইতে শিশুর মুক্তি—এই সমস্ত আসিয়া পড়ে।

আমাদের মূলতত্ত্বসমূহ হইতে যে সকল কার্য্যফল প্রসূত হয়, অনেক সময় প্রাচ্যদেশ-বাসীরা সেই কার্য্যফলগুলা ধরিতে পারিয়াছে দেখা যায়,—যদিও তাহারা বাস্তব-জীবনের প্রয়োজনের দ্বারা তাহা পরিশোধিত করিয়া লইতে পারে নাই।

য়ুরোপীয়েরা যে স্বাধীনতা-তত্ত্বের পক্ষপাতী একজন জাপানী অভিনেতা সেই তত্ত্বটির এইরূপ মর্ম্মগ্রহ করিয়াছে:—

"যে স্বাধীনতা পিতা সম্ভোগ করে, পিতার ন্যায় পুত্রও সেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। যে স্বাধীনতা প্রভু সম্ভোগ করে, প্রভুর ন্যায় ভৃত্যও সেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। যে স্বাধীনতা পতি সম্ভোগ করে, পতির ন্যায় পত্নীও সেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। সকলেরই স্বাধীনতা লাভ করা চাই।"

(৫) হিন্দুরা আজকাল কোন কোন কল চালাইতেছে—উহারা বাষ্পপোতও চালাইয়া থাকে।

শিক্ষা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, চরিত্রবল এই সমস্তের পরিণাম—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কি এসিয়িক, কি য়ুরোপীয় সমস্ত জনসমাজই পরিবারের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধুনা, ব্যক্তির স্বত্বাধিকার ছাড়া য়ুরোপীয় আইন আরকোন স্বত্বাধিকার স্বীকার করে না। বয়ঃ-প্রাপ্ত পুত্রের উপর পিতা কোন প্রকার প্রভুত্ব চালনা করিতে পারেন না। পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের প্রভু নহেন, তিনি তাহার অভিভাবক মাত্র। অভিভাবকের হস্ত হইতে পুত্রকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা আদালতের আছে, এবং সেই ক্ষমতা অনুসারে আদালত কাজও করিয়া থাকেন।

অবশেষে বক্তব্য, য়ুরোপীয় সভ্যতায় শেষ লক্ষণ—উন্নতিতে বিশ্বাস। ঐকান্তিক উন্নতি ও ঐকান্তিক অবনতি বিজ্ঞান স্বীকার করে না। দেহযন্ত্রের ন্যায় সমাজ যন্ত্রাদির সম্বন্ধেও দেখা যায়, এক অংশের অতিমাত্র উন্নতিতে আর এক অংশের ক্ষতি হইয়া থাকে। তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, মানুষ তৃতীয় বৎসরের কাছাকাছি, একটা সুলক্ষিত উপচয় লাভ করে; এবং পঞ্চমবর্ষ হইতে তাহার স্পষ্টলক্ষিত অপচয় আরম্ভ হয়। কোন এক জাতির সম্বন্ধেও এই কথা বুঝা যাইতে পারে। আন্‌টনিয়সের সময় হইতে রোম উন্নতির পথে চলিয়াছিল, কন্‌ষ্টানটাইনের মৃত্যুর পরে রোমের অবনতি আরম্ভ হয়। বিশ্বমানবের সম্বন্ধেও এই কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিশ্বমানব ক্রমাগত উন্নতি পথে চলিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও মানুষের কতক গুলি মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে। আদিম মনুষ্যের ন্যায় আর তাহার সেরূপ দৈহিক বল নাই, সেরূপ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র নাই; মহাকাব্যের যুগ শেষ হইয়াছে। গ্রীসে যেরূপ মূর্ত্তিশিল্প ও বাস্তুশিল্পের উৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা আর কোনকালে হইবে না। ইতালীর "নবজীবন"সময়কার চিত্রকর্ম্মের সহিত তুলনা হইতে পারে এরূপ ওস্তাদি হাতের চিত্রকর্ম্ম আর কখন হইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে, একটা পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, উৎকর্ষের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিবার জন্য যুবকদিগের মধ্যে একটা আগ্রহ হইয়াছিল। যে সকল জনসমাজ পিতৃতন্ত্র ও চিরাগত প্রাচীন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল সমাজে পিতৃগণের নিকট পুত্রেরা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এবং তাহারা বিশ্বমানবের অবনতি স্বীকার করে। যে সকল জনসমাজ দ্রুতভাবে রূপান্তরিত হয়, সেই সকল সমাজে পুত্রগণ পিতৃগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে, এবং তাহারা, উন্নতির সীমা নাই এইরূপ বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে, কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করিত; অধুনা, নবীনেরা মনে করে, যে তাহারা খ্যাতনামা লোকদিগের অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ—শুধু এই কারণে যে তাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক। চিত্রকর্ম্মে তাহারা যে "ধারণা-লব্ধ চিত্র"Impressionism ও "বিভূষণী" (Decoratum) রচনানীতিই শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ বলিয়া প্রদর্শন করে—তাহার একমাত্র কারণ উহাই সর্ব্ব-শেষে অবির্ভূত হইয়াছে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রাষ্ট্রীক ও সামাজিক বিজ্ঞানেও এইরূপ। তথাপি পূর্ব্বকালে অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকারধারী ব্যক্তিরা যত শীঘ্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিত, গণতন্ত্রের আমলে, প্রতিযোগিতার বহুলতা হেতু অত শীঘ্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবাব

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আতুর-আশ্রম।

বেথলিহাম! নামটি গালভরা হইলেও স্থানটি বড় রমণীয় নহে। রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি,—মধ্যে মধ্যে বড় ডোবা শৈবালে সমাচ্ছন্ন; তাহা হইতে পঙ্ক-দুষ্ট একটা গন্ধ রৌদ্র-তপ্ত হাওয়ায় ভাসিয়া ফিরিতেছে। ডোবার পশ্চাতে ঘন বৃক্ষশ্রেণী, অধিকাংশই বন্য—সেই বৃক্ষ-শ্রেণীর পিছনে কয়েককটা বড় চিমনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এগুলা হাড়ের কল।

ষ্টেশনের নাম রুয়েল। ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র। ষ্টেশন হইতে একটা সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বরাবর গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়। পথের চারিদিকে অস্বাস্থ্য-কর ডোবা ও জলা প্রভৃতি দেখিয়া চোখ এমনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে এই অট্টালিকার শিল্পচাতুর্য্যে সে যেন আর বসিতেই চাহে না। না বসুক, তথাপি এ অট্টালিকা-খানি নির্ম্মাণ করিতে যে অজস্র অর্থ ও মস্তিষ্ক-ঘৃত ব্যয়িত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। এই অট্টালিকা-খানিই বেথলিহাম আতুর-আশ্রম; নবাবের ব্যয়শালিতার চিহ্ন এবং তাঁহার উপর জেঙ্কিন্সের প্রভাবেরও অকাট্য পরিচয়! ফটকের দুই ধারে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মুক্ত প্রান্তর—তথায় বড় বড় কয়েকটা ছাগী শষ্পাহারে নিযুক্ত। মানুষ দেখিলে তাহাদের পানে যে দৃষ্টিতে মূর্খ পশুগুলা মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহে, তাহা যেমন করুণ, তেমনই ম্লান!

সত্য কথা বলিতে কি, এই আতুর আশ্রমটি তাহার বিরাট নির্জ্জনতায় আগন্তুকের প্রাণে যেন পাষাণ চাপিয়া ধরে।

দরিদ্র অভিভাবকদিগকে নানা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া যে কয়টি ছেলেকে এখানে আনা হইয়াছিল, তাহারা এ বিরাট পুরীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াই রোগে পড়িল; কয়েকজন প্রাণ দিল, এবং যাহাদের অভিভাবকের দল পাড়ার সংবাদ পাইয়া ত্বরিতে আসিয়া আশ্রম হইতে ছেলেদের সরাইয়া লইল, তাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—এ-যাত্রা তাহারাই বাঁচিয়া গেল!

মৃত্যুর করাল ছায়ায় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। সে আশ্রমে প্রসন্নতার চিহ্ন কি করিয়া দেখা যাইবে! জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্কের তারিফ আছে, নবাবের অর্থও প্রচুর ব্যয় হইয়াছে, তথাপি গোড়াতেই এমন গলদ ঘটিলে মানুষ দমিয়া যায়। কিন্তু জেঙ্কিন্স দমিলেন না। এত বড় অনুষ্ঠানটাকে খাড়া করিয়া তুলিতে গেলে দুই-চারিটা বিঘ্ন ঘটিবেই—এ তুচ্ছ ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে! বিশেষতঃ যে ছেলেগুলা মরিয়াছে, তাহারা যখন দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে, তখন ললাটে মৃত্যুর টীকা আঁকিয়াই ত তাহারা আসিয়াছিল। গৃহে থাকিলেও সে অভাগারা না খাইতে পাইয়া মরিত; তবে দুইদিন পূর্ব্বে না মরিয়া আশ্রমে পা দিয়া মরিয়াছে! এই না প্রভেদ!

পারি হাঁসপাতালের ছাত্র এম, পদিভেঁকে আনাইয়া তাহার উপর আতুর-আশ্রমের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল—পদিভেঁই প্রধান চিকিৎসক। মাদাম পুল ধাত্রীদিগের নেত্রী। এ দুই জনকে বেশ মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আরও বিস্তর লোকজন ছিল, ভৃত্য, রজক, ধাত্রী প্রভৃতি। আশ্রমের জন্য একখানি ওমনিবাস গাড়ীও ছিল, কোচম্যান-সহিসের তকমা-আঁটা পোষাক-পরিচ্ছদ। প্রত্যহ ট্রেনের সময় রুয়েল ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছুটিত, আতুর শিশুকে আশ্রমে বহিয়া আনিবার জন্য। আশ্রমের ছাগগুলা ছিল তিব্বতী—দুগ্ধবতী; গায়ে রেশমের ঝালরের মত কেশের রাশি, দেখিতে যেমন পুষ্ট তেমনি সুন্দর! অর্থাৎ আশ্রমে আয়োজনের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। শুধু এক জায়গায় একটু যাহা ভুল ঘটিয়াছিল, তাহা এই রুগ্ন শিশু-গুলাকে কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থায়। এ ব্যবস্থাটা কোনমতেই তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এতটুকু অনুকূল হয় নাই।

মৃত্যুর হার দেখিয়া ম্যানেজার প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। পদিভেঁ লোক মন্দ ছিল না। সে যখন দেখিল, তিব্বতীয় দুগ্ধ কচি ছেলেগুলার আদৌ রুচিতেছে না, তখন আপনা হইতেই সে কয়েকজন সুস্থ সবল-দেহা সদ্যঃ-প্রসূতা গ্রাম্য নারী আনাইল। ইহাতে কয়েকটা অভাগা শিশু প্রাণ পাইল বটে, কিন্তু পদিভেঁর চাকুরিটি খোয়া যাইবার উপক্রম হইল।

সপ্তাহান্তে জেঙ্কিন্স আসিয়া এই নারীদের দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। "বেথলিহামে এই সব ছোট লোকের মেয়েদের দিয়ে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে! তুমি পাগল হয়েছ, পদিভেঁ! এত টাকা খরচ করে তিব্বত থেকে ছাগল আনালুম, তাদের চরে বেড়াবার জন্য এমন মাঠ করে দিলুম—এ সব কি অনর্থক! আমার বৈজ্ঞানিক চেষ্টাটাই শুধু তুমি নিষ্ফল করে

দেবার উদ্যোগ করছ, তা নয়, আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা নবাব বাহাদুরের টাকাটারও এতে অপব্যয় হচ্ছে!"

পদিভেঁ মাথা নত করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিল, "কিন্তু দেখুন, এ ছাগলের দুধ তাদের সহ্য হচ্ছে না—কতগুলো মরে হেজেও গেল যখন—"

"মরুক—যাদের মুখে না রুচবে, তারা উপোস করে থাকুক, তবু এখানকার ধারা পাল্টানো হবে না। এখনি ও মাগীগুলোকে বিদেয় করে দাও। আর সাবধান, ভবিষ্যতে এমন হলে তোমার সঙ্গে একত্রে কাজ করবারও সম্ভাবনা থাকবে না—"

পদিভেঁ নিরুত্তর রহিল। জেঙ্কিন্স আরও কহিলেন, "বিজ্ঞানের রাজ্যে এ একটা মস্ত 'এক্সপেরিমেণ্ট' চল্‌ছে—বুঝচ না—কত বড় বিষয়ে আমরা হাত দিয়েছি—আর কত টাকা আমার এ 'আইডিয়া'কে সাহায্য করছে। কতকগুলো মরে যদি, মরুক। কোন্ বড় কাজে ত্যাগ-স্বীকার নেই! এ মরণ মাথা পেতে আমাদের নিতে হবে।"

পদিভেঁ আর কথা কহিল না। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে একটা চাকুরি সংগ্রহ করা কি কঠিন—বিশেষ এমন চাকুরি!—সে তাহা জানিত। সে স্ত্রীলোকগুলাকে তখনই বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এবং মহাসমারোহে নিরীহ শিশুমেধযজ্ঞ চলিতে লাগিল। মৃতের সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিল, ষ্টেশন হইতে ওমনিবাস গাড়ীও তেমন শূন্য ফিরিতে লাগিল। কে আর ছেলেকে মরিতে পাঠাইবে! মরে যদি, না খাইয়া তাহারা মা-বাপের কোলের কাছেই পড়িয়া মরুক, প্রাসাদের ঊর্দ্ধ কক্ষে সোনার পালঙ্কে শুইয়া মরিলে মা-বাপের শোকের মাত্রা এতটুকু কমিবে না ত! সুতরাং চিত্রগুপ্তের জিম্মায়,—গ্রামের লোক পদিভেঁকে খেতাব দিয়াছিল, চিত্রগুপ্ত—ছেলে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

ছেলেদের শীর্ণ মুখগুলি দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। তাহাদের মৌন দৃষ্টি গভীর অর্থপূর্ণ—যেন মৃত্যুর পদধ্বনি তাহারা শুনিয়া ফেলিয়াছে—প্রতিমুহূর্ত্তেই এখন যেন তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া আছে—ঐ বুঝি আসিয়া মৃত্যু ডাকিল, এস, আমার কাছে এস।

সেদিন আহারাদির পর পদিভেঁ বসিয়া মাদাম পুলকে এই কথাটাই বুঝাইতেছিল, এমন সময় ওমনিবাসের চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শুনা গেল। শব্দটা অন্য দিনের মত নহে। পদিভেঁ কহিল, "গাড়ী আজ খালি আসছে বলে ত মনে হচ্ছে না!"

সত্যই গাড়ী আজ ষ্টেশন হইতে একেবারে খালি ফিরে নাই। ভিতরে একজন লোক ছিল—সে জেঙ্কিন্সের কাছ হইতে সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। সংবাদ,—ডাক্তার জেঙ্কিন্স, নবাব ও অপর একজন লোককে সঙ্গে লইয়া এখনই দুই ঘণ্টা পরে আশ্রম-পরিদর্শনে আসিতেছেন! ডাক্তার জেঙ্কিন্স বলিয়া পাঠাইয়াছেন, উঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত থাকে! এত শীঘ্র এ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পদিভেঁকে যথোচিত অবসর দিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি ডাক্তার জেঙ্কিন্স আশা রাখেন, পদিভেঁ যথাসাধ্য আয়োজন করিবেন।

যথাসাধ্য! পদিভেঁ বিরক্ত হইয়া

ভাবিল, যথাসাধ্য! একটু চিন্তারও কারণ ছিল। আশ্রমের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। জেঙ্কিন্সের 'ধারা' একেবারেই ব্যর্থ প্রমাণ করিয়া ছেলেরা অনেকেই মরিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে—যে কয়টা অবশিষ্ট আছে, সে কয়টাকে জীবিত বলিয়া লোকের সম্মুখে বাহির করিতেও লজ্জা হয়। তাহাদের অস্থি-চর্ম্মসার দেহের আবরণে প্রাণবায়ুটুকু কোন মতে যেন ধুক ধুক করিতেছে!

পদিভেঁ কহিল, "মাদাম পুল, উপায় ত দেখি, একটি আছে। এই ছেলেগুলোকে আশ্রম থেকে বার করে সেই ওধারকার আস্তাবলের পাশের ঘরে আজকের মত রাখা যাক—! কতক্ষণের জন্যই বা! এতে আর বিশেষ কি খারাপ হবার ভয় আছে? তারপর বেছে-গুছে এর মধ্য থেকে দু-চারটে ছেলেকে ভালো পোষাক পরিয়ে মাঠের ধারে ক্রিকেট খেলতে পাঠিয়ে দি। ছুটোছুটি করতে মানা করে দেব। বলে দেব, নেহাৎ নিরীহর মত যেন খেলে! আর ছুটোছুটি করবার মত বলই বা ওদের কার আছে! তবু এতে একটু ভালো দেখাতে পারে।"

মাদাম পুলও একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল,—সেটা চাকুরির মায়ায়। সে কহিল, "তা ছাড়া আর কি সুব্যবস্থা করা যেতে পারে?"

তখনই ঘণ্টায় ঘা পড়িল। চারিদিকে ব্যস্ততার ধূম পড়িয়া গেল। হাঁক-ডাক চীৎকারে নিদ্রিত নির্জ্জন পুরীর অসাড় ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। ওধারে ঝাঁটার ধূলা উড়িতেছে, পাইপে জল ছুটিয়াছে—ধোয়া-মোছা—সে এক বিরাট ধুম বাধিয়া গেল। সহসা-ব্যস্ত লোকজনকে দেখিয়া মনে হয় যেন, বেথলিহামে আগুন লাগিয়াছে। সকলের মুখে-চোখে তেমনই চাঞ্চল্য, তেমনই উৎকণ্ঠার চিহ্ন!

দুই ঘণ্টার মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। আগাগোড়া মাজা-ঘষা আশ্রম অতিথি-অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য-পরিজন যে যাহার জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িল। গরু ছাগলগুলাকে ছবির মত সাজাইয়া মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—ম্যানেজার পদিভেঁ শুভ্র পরিচ্ছদে দেহ সজ্জিত করিয়া অফিস কামরায় আসিয়া বসিল—কর্ত্তৃপক্ষ এখনই পরিদর্শনে আসিবেন!

ঐ যে তাঁহারা আসিয়াছেন। পদিভেঁ শশব্যস্তে আগাইয়া যাইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিল। নবাবের প্রকাণ্ড সজ্জিত গাড়ী হইতে ডাক্তার জেঙ্কিন্স, নবাব ও কৌন্সিলের এক জন সদস্য অবতরণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

অভিবাদন, কর-কম্পন প্রভৃতিতে অভ্যর্থনার ঘটা পড়িয়া গেল। জেঙ্কিন্সের প্রাণটা ঈষৎ সশঙ্ক ছিল। কি জানি, দুই ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমের সজ্জা অতিথিগণের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কি না! কিন্তু চারিদিকে শৃঙ্খলা দেখিয়া একটা সবিস্ময় পুলকে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। এঘর ওঘর ঘুরিয়া পরিদর্শন শেষ করিয়া জেঙ্কিন্স নবাব ও সদস্যকে লইয়া গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখস্থ ছোট বাগানটিতে আসিয়া বসিলেন। চা আসিল, বিস্কুট আসিল—মদিরার পাত্র ফেনিলোচ্ছল গোলাপী তরল পদার্থে পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিল। সদস্যবর পূর্ণপাত্র মুখের কাছে ধরিয়া 'বেথলিহামের স্বাস্থ্য'—বলিয়া সাগ্রহে তাহা শূন্য করিলেন। জেঙ্কিন্সের সুখ্যাতিতে সদস্য পঞ্চমুখ হইলেন। নবাবের নাম ভুলিয়াও কেহ উচ্চারণ করিল না। তিনিও একটু অপ্রতিভভাবে ডাক্তারের সুখ্যাতি করিলেন। ডাক্তার তাহাতে বাধা ত দিলেনই না, যাঁহার অর্থে এ আইডিয়া প্রাণ পাইয়াছে, তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়াও ভদ্রতার খাতিরে উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। তারপর বিদায়-সম্ভাষণান্তে ধীরে ধীরে সকলে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। চারিধারকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নবাবের প্রকাণ্ড গাড়ী গ্রামের রাস্তা ধরিয়া সহরের দিকে ছুটিয়া চলিল। মোড় বাঁকিবার সময় সকলে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিলেন—প্রকাণ্ড আঁধার পুরীর ত্রিতলের এক কক্ষ হইতে শুধু মৃদু-কম্পিত আলোক-কণা, অন্ধকার আকাশের গায় ক্ষুদ্র একটা নক্ষত্র-বিন্দুর মতই ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। ব্যস্ত পরিদর্শন-রত নবাব বা সদস্য কেহই বুঝিলেন না, এ আলোক কিসের আভাষ! জেঙ্কিন্স শুধু ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি নিমেষে বুঝিলেন, আর এক অভাগা শিশু আপনার ক্ষুদ্র জীবনের অভিনয় অসমাপ্ত রাখিয়া চিরবিদায় লইয়া চলিয়াছে—এ আলোটুকু তাহারই সে অনির্দ্দেশ্য পথে মৃদু কিরণের সঞ্চার করিতেছে!

* * *

১৬ তারিখের "জর্ণাল অফিসিয়াল" কাগজ খানার একটা পৃষ্ঠা হইতে নবাবের চক্ষু যেন আর সরিতে চাহিতেছিল না। সে জায়গাটায় লেখা ছিল,—

"১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখের ডিক্রি কর্ত্তৃক রাজ্য পরিচালক সমিতির উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, সেই ক্ষমতার বলে মন্ত্রীসভা সানন্দ চিত্তে, বেথলিহাম আতুর-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সর্ব্বজনপ্রিয় বিচক্ষণ ডাক্তার জেঙ্কিন্স মহোদয়কে 'নাইট' উপাধিতে আজ ভূষিত করিলেন। ডাক্তার মহোদয়ের বিরাট বিশ্ব-প্রেমের কথঞ্চিৎ সমাদর করিতে পারিয়া সভা প্রকৃত পক্ষে আপনাকে আজ কৃতার্থ বোধ করেন।"

নবাব এ সংবাদ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহাও সম্ভব! জেঙ্কিন্সের সমাদর—জেঙ্কিন্সের উপাধি-লাভ! তাঁহার নহে! অথচ এই আতুর-আশ্রম—কাহার টাকায়—! আশ্চর্য্য!

তিনি দুইবার তিনবার এ ছত্রকয়টি পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, পায়ের তলায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যে সবেগে দুলিয়া উঠিয়াছে! অক্ষরগুলা তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন অট্টহাস্য করিয়া নাচিতেছিল। তিনি যে ঐখানটিতে নিজের নাম আশা করিয়া বসিয়াছিলেন। আতুর আশ্রম-পরিদর্শনান্তে জেঙ্কিন্সও সেদিন আসিয়া নবাবকে দৃঢ় স্বরে বলিয়া গিয়াছিল, "নব ঠিক—নবাব বাহাদুর। এবার আপনি 'নাইট' হচ্ছেন, সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।" তাহার পর, এ কি! কাগজখানা ভুল সংবাদ ছাপিল না ত! না! এ যে গভর্ণমেণ্টেরই মুখপত্র। ভুল হইবার জো কি!

জে গেরি কক্ষে প্রবেশ করিলে, নবাব তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, "গেরি, আজকের কাগজ দেখেচ? ডাক্তার 'নাইট' হয়েছে,—আমি নই!"

নবাব হাসিবার চেষ্টা করিলেন—হাসি বাহির হইল না। মুখ তাঁহার লাল হইয়া উঠিয়াছিল—চোখে জল আসিয়াছিল। কোন মতে মনটাকে তিনি দাবিয়া রাখিয়া সনিশ্বাসে কহিলেন, "আমার মনে একটু লেগেছে! এটা আমি আশাই করিনি।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার জেঙ্কিন্স ব্যস্ত-সমস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা কাগজ, চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা আগুনের মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কাগজখানা সশব্দে তিনি টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া বিরক্তির সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অবিচার! দারুণ অবিচার! এ হতে পারে না, পারেই না। হতে আমি দেব না।"

কথাগুলা যেন বিদ্যুতের মত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর ডাক্তার পকেট হইতে একখানা বড় খাম ও ছোট একটা বাক্স বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "এই আমার ক্রশ—এই আমার সদন! এতে আমার কোন অধিকার নেই—নবাব বাহাদুর। এ আপনার—আপনি নিন—আমি এ রাখতে পারি না—"

কথাগুলা শুনিতে গভীর হইলেও কাজে নেহাৎ ফাঁকা। নবাব যদি এই ক্রশ ধারণ করেন, তাহা হইলে বে-আইনী কাজ করার অপরাধে নিঃসন্দেহ শাস্তি বহন করিতে হইবে। এ কথা ডাক্তারও বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু অভিনয়,—হোক বন্ধুত্বের অভিনয়,—কখনও আইন-কানুন মানিয়া চলে না। ডাক্তারের অভিনয়টিও চমৎকার হইয়াছিল। তাঁহার বাক্-ভঙ্গীটি আশ্চর্য্য নিপুণতার পরিচয় দিতেছিল। সরল-চিত্ত নবাব এ অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি শান্তভাবে কহিলেন, "না, না, অমন কথা বলো না, ডাক্তার। এ উপাধি আমার হল না, তাতে কেন দুঃখ করছ! হয়ত আর বছর গভর্ণমেণ্ট আমার কথা মনে করবেন—"

ডাক্তার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হয় ত কি—নিশ্চয়—মনে করাব আমি! এ আমি শপথ করছি—"

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল। চা পান করিয়া ডাক্তার গাত্রোত্থান করিলেন।

নবাবের চিত্তে আর-কোন চপলতা দেখা গেল না। ভোজনে বসিয়া নিত্যকার মতই তিনি হাস্য-পরিহাস করিলেন। সারাদিনের মধ্যেও তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সন্ধ্যার সময় নবাব আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া একখানা পুরানো খাতা খুলিলেন। এ পাতা ও পাতা উল্টাইয়া অজস্র অস্পষ্ট অক্ষর বাছিয়া একখানা সাদা কাগজে তিনি আঁক পাড়িতে লাগিলেন। হিসাবের মধ্যে যখন তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, গেরি তখন কক্ষে প্রবেশ করিল। সে নবাবকে অন্ধকারে কাগজ-পত্রের মধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অতিশয় বিস্ময়ে সে নবাবের পানে চাহিয়া রহিল।

নবাব মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আমি কি করছি, জানো পল?"

"না।"

"হিসেব করছি—" তাহার পর হাসিয়া খাতা মুড়িয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া নবাব কহিলেন, "হিসেব করে কি দেখলুম, জানো? ঐ হতভাগা জেঙ্কিন্সটাকে 'নাইট' করবার জন্য এত কাল ধরে আমি চার লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করেছি।"

চার লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক! কিন্তু হায়, এইখানেই ইহার শেষ নহে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"দামিন্-ই-কো"

"দামিন্-ই-কো" পারসিক শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রকৃত অর্থ পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমি অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ। ইহা গভর্ণমেণ্টের খাসমহল। সাঁওতাল পরগণার (১) দেওঘর (২) জামতাড়া (৩) রাজমহল (৪) পাকুড় (৫) গড্ডা ও (৬) সদর এই ছয়টি মহাকুমার মধ্যে ১ম ও ২য় ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি জেলায় যে অসমতল, বনাকীর্ণ, গিরি ও নদনদী বেষ্টিত উচ্চ উপত্যকাভূমি দেখা যায় তাহাকেই দামিন-ই-কো বা সংক্ষেপে "দামিন্" বলে।

সেই আদিম তামস যুগে যখনও ভারত গগন আর্য্য সভ্যতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, যখনও পূত বৈদিক সঙ্গীত ভারতের কানন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করে নাই, যখনও অতি ভীম আর্য্যবীর্য্যে জগৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয় নাই, সেই স্মৃতির অতীত কাল হইতে শত্রুর দুরধিগম্য শ্বাপদসঙ্কুল গিরিকানন পরিবৃত এই প্রাকৃতিক দুর্গগুলি ভারতের আদিম অধিবাসী 'পাহাড়িয়া এবং সাঁওতাল দ্বারা অধিকৃত হইয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্যতর যুগে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ণ ক্ষমতা, গৌরব ও গর্ব্বের দিনেও এই অসভ্য পাহাড়িয়াগণ প্রায় উলঙ্গ বেশে পর্ব্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাহারা সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করে না। পাহাড়ের ঢালুদেশে তাহারা প্রচুর পরিমাণে, মাড়ুয়া, গুঁধলি, জনার প্রভৃতি চাষ করে এবং তাহারই উপর সমস্ত বৎসর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। ঝরণার বারি এবং বন্য বৃক্ষের ফলমূল তাহাদের অনেক সময়েই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমাদের চক্ষে ইহারা হীন অসভ্য বর্ব্বর হইলেও ইহাদের হৃদয়ে এখনও যে স্বাধীনতার দীপ্ত বহ্নি জাগরূক আছে, একতার যে অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। একবার কোনও এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের আমিনগণ এই সকল পাহাড় জরীপ করিতে আসিয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা

কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট এই সংবাদ প্রেরণে বাধ্য হইলেন। ভাগলপুরের তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার সাহেব স্বয়ং কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনিও প্রথমে পাহাড়ে উঠিতে পারেন নাই; কারণ পাহাড়িয়াগণ বলিল, যে এ সকল পাহাড় ত তাহাদের নিজস্ব, তবে কেন উহারা তাহা জরীপ করিবে?

সাঁওতাল এবং পাহাড়িয়াগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট এই অংশকে সাধারণ দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্য ভাবে শাসন করিয়া থাকেন। ইহার নিয়ম কানুন আইন আদালত সবই স্বতন্ত্র—সবই ইহার অধিবাসীবর্গের উপযোগী। সাধারণ পুলিসের এলাকার মধ্যে এস্থান গণ্য নহে। ইহাদের প্রত্যেক গ্রামে নিজেদের পঞ্চায়েৎ, মস্তাগির, চৌকিদার, চাকলাদার এবং সর্ব্বোপরি একজন পরগণায়েৎ Headman স্বরূপ অনেকগুলি মৌজার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। মহাকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কোনও লোকের এই প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। বাস্তবিক, ইহারা অতি স্বাধীন, উদ্বেগশূন্য, উদ্দেশ্যহীন, স্বাস্থ্যপূর্ণ, সহজ, সুন্দর জীবন অতিবাহিত করে।

নিসর্গ সুন্দরীর প্রিয়তম নিকেতনে যাহারা আজীবন বর্দ্ধিত, প্রকৃতির চির নূতন চির সুন্দর দৃশ্যে যাহাদের চক্ষু সূতিকাগার হইতে অভ্যস্ত, স্বচ্ছ স্বাধীন পার্ব্বত্য সমীরণ যাহাদের জীবন হর্ম্ম্যের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করিতেছে, উপলভরা কল্লোলময়ী গিরিনদী সর্ব্বদাই যাহাদের তৃষ্ণা দূর করিতেছে, প্রভাত সন্ধ্যায় বনবিহঙ্গের সুমধুর কাকলিধ্বনি যাহাদের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, প্রিয়দর্শন বৃত্তাকার গিরিপাদশোভী শ্যামল গহনবনরেখা যাহাদের অফুরন্ত শীতল সমীরণের ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে—সে দেশের দুঃখ কি?

যে দেশের অধিবাসীরা কৃত্রিমতা জানে না, যাহাদের হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনলে দগ্ধ হয় না, যাহাদের শরীর ও মন বিলাস লালসায় কলুষিত হয় নাই সে দেশের প্রজাদের দুঃখ কি?

যাহারা সারাদিন মাঠে মাঠে গোধন চরাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া পরিতৃপ্ত হয়, যাহারা স্ত্রী পুরুষে সম্বৎসর কৃষি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে, যাহারা দীর্ঘ দিবসের কর্ম্মাবসানে গোধূলি আলোকে, সারি বাঁধিয়া সমতাল বিক্ষেপে "ঝুমুর" গাহিতে গাহিতে নিজেদের কোলাহলবিরল শান্তিময় পার্ব্বত্যগ্রামে প্রত্যাগমন করে, সেই চির প্রফুল্ল, চিরসুখী, চির উৎসাহী জাতির দুঃখ কি?

যে জাতির শরীরে ব্যাধি নাই, মনে অশান্তি নাই, হৃদয়ে উদ্বেগ নাই, কর্ম্মে আলস্য নাই; দুর্দ্দিনের বর্ষা,—দুঃখের অন্ধকার কুহেলিকা তাহাদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। বাস্তবিক এই সাঁওতালদিগের শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের প্রফুল্লতা দেখিলে যথেষ্ট আনন্দিত হইতে হয়। হাট বারে যখন ইহারা বহুদূর হইতে নিজেদের ক্ষেত্রশষ্য বেচাকেনা করিতে

আসে এবং হাট শেষে যখন ইহারা নিঃশঙ্কচিত্তে স্ত্রী পুরুষে গলা ধরাধরি করিয়া দল বাঁধিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাঁশী বাজাইয়া গান করিতে করিতে স্বস্থানে ফিরিয়া যায় সে দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী। বিদায়ের বহুপরেও সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের উচ্চ হাস্য ধ্বনি এবং বিচিত্র বাঁশরীর করুণ কোমল রাগিণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নৈশবায়ু সংযোগে ভাসিয়া আসিতে শুনা যায়।

সাঁওতাল রমণীদিগের ফুল অতি প্রিয় বস্তু। মাথার খোপায় অনেক সময় ফুলের ডালি সাজাইয়া রাখে। পিত্তলের, পুঁথির এবং কখনও বা রৌপ্যের দু'একখানি গহনা ব্যতীত ইহাদের গহনা বলিতে আর কিছুই নাই। ইহাদের গৃহগুলি সমস্তই মাটির তৈয়ারী এবং উপরের 'চাল' খড় দিয়া ছাওয়া। কিন্তু পাথরের দেশের মাটি বলিয়া প্রায়ই ইটের সমান মজবুৎ হয়। দেওয়াল গুলি সমস্তই গোময়লিপ্ত; তাহার উপর শাদা মাটির 'পালিস্তারায়' নানারূপ পশুপক্ষী উদ্ভিদ ফুলের চিত্র অঙ্কিত। উঠান ঘর প্রভৃতি সমস্তই উত্তমরূপে গোময় দ্বারা মার্জ্জিত। ইহাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ভেড়া, কুক্কুট এবং শূকরই প্রধান। ইহারা খাদ্যাখাদ্যের কিছুই বিচার রাখে না। কুক্কুট এবং শূকরই ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। ভেক সর্পও ইহাদের অখাদ্য নহে।

বলিতে দুঃখ এবং লজ্জা হয় যে এই অসভ্য বর্ব্বর জাতির বিবাহ প্রথা আমাদিগের বর্ত্তমান সভ্য সমাজের বর বিক্রয় অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ, সহস্র গুণে উদার। ইহাদের



সাঁওতাল বালক ও স্ত্রীলোকগণ শস্যক্ষেত্রে কাজ করিতেছে।

বিবাহে কন্যার পিতাকে বাঙ্গালীর কন্যার পিতার ন্যায় সর্ব্বস্বান্ত এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবন্তে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সাঁওতালদিগের বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কোর্টসিপ' করিয়া হয়। হাটই উহাদের সাধের মিলন স্থান। বিবাহার্থী যুবক যুবতীরা সেদিন বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া আসে। যুবতীদের মাথার খোঁপায় সে সময় ফুলের বাগান বসিয়া যায়। বর এবং ক'নে উভয়েই যুবক এবং যুবতী এবং উভয়েরই বয়স প্রায় সমান থাকা চাই। পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত এবং বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে পর বরের পক্ষ হইতে একজন ঘটক স্বরূপ এই সুসংবাদ কন্যার পিতার নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। সাধারণ লোক ১০৲ হইতে ১৫৲ এবং কেহ কেহ বেশী পণ কন্যার পিতাকে দিয়া শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়া লয়। ইহাদের বিবাহে বরকে কনের বাড়ী যাইতে হয়। যাহাতে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ হয় এবং যাহাতে সকলেই দেখিতে পায় এই জন্য বিবাহ কার্য্য দিনেই সম্পন্ন হয়। বিবাহ ভিন্ন গ্রামে হইলে, বিবাহের দিন প্রাতঃকালে বরমহাশয় পিতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য বরযাত্রী সহ বাজনাবাদ্য করিয়া, পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, নদী নালা ক্ষেত বন অতিক্রম করিয়া কুক্কুট, ছাগল, এবং হাঁড়ি হাঁড়ি হাঁড়িয়া (১) সহ কন্যা পক্ষের গৃহে উপস্থিত হন। প্রাঙ্গণে বিকট দামামা, মাদল এবং অন্যান্য শ্রুতিভীষণ বাদ্য যন্ত্রাদি বাজিতে থাকে। এবং দুর্গন্ধময় (অবশ্য আমাদের পক্ষে) হাঁড়িয়ার স্রোত চলিতে থাকে। সেই মদ্য স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে পান করিয়া দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া বাজনার তালে তালে "ঝুমুর" নাচিতে থাকে। গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহরে অনাবৃত স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহা সমারোহে এইরূপ নৃত্য গীত চলে। এদিকে বরমহাশয় সুখে তাহার ভাবী শ্যালকের স্কন্ধে—উপযুক্ত শ্যালক অভাবে কোনও জ্ঞাতির স্কন্ধে,—আরোহণ করিয়া বিবাহ আসরে উপস্থিত হন। এবং একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ির মধ্যে আসীনা হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড পরিহিতা কন্যা ভাবী উপযুক্ত দেবর প্রভৃতিগণ দ্বারা বাহিত হইয়া পাত্রের সম্মুখীন হয়েন। পাত্র তখন বধূর ললাটে সিন্দূর লেপন করিয়া দিলে চতুর্দ্দিকে হর্ষধ্বনি উঠে এবং দামামা বিকট বোলে বাজিয়া উঠিয়া শুভকার্য্য সমাপ্ত এই কথা গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দেয়। তাহার পরে কুক্কুট, ছাগ মাংস এবং হাঁড়িয়া সকলে পরিতৃপ্ত ভাবে সেবন করিয়া স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে। অবশ্য বর পক্ষীয়েরা সেদিন কন্যার গৃহেই যাপন করে। পরদিন আবার সেইরূপ বিকট বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে বর এবং বধূ "বরিয়াৎ" সহ আপন আলয়ে উপস্থিত হয়। বিদায়ের দিন নববধূ আপন স্বামী সহ নিজ সখী, জ্ঞাতি প্রভৃতির নিকট সাশ্রু নয়নে বিদায় ভিক্ষা করে। তাহারা নব দম্পতিকে গুড় এবং

(১) চাউল হইতে উৎপন্ন একপ্রকার মদ যাহাকে বাংলায়—"পচাই মদ" বলে।

জল খাইতে দিয়া আপ্যায়িত করে এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধ প্রভৃতি মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া ধীরে ধীরে বিদায় দেয়। দুই দিন স্বীয় গৃহে অবস্থানের পর নব জামাতা বধূসহ পুনরায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আইসে।

ইহাদের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহও দেখা যায়। সাঁওতালী সমাজে Divorce (বিচ্ছেদ) প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ক্ষমতা সমান। যদি স্বামী তাহার স্ত্রীকে বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ স্ত্রীকে বারো টাকা দিয়া তাহা করিতে পারে। আর যদি কোনও স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে বিবাহের পণস্বরূপ যে অর্থ তাহার পিতা লাভ করিয়াছিল সে অর্থ সমস্তই ফেরৎ দিতে হয়।

সাঁওতালেরা তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধ ওঝাকেই ধন্বন্তরির মহামান্য পদে বরণ করিয়া রাখিয়াছে। কাহারও কোনরূপ পীড়া বা জটিল ব্যাধি হইলেই তাহারা ওঝা মহাশয়ের শরণাগত হয়! তাঁহার দর্শনী ১৲ হইতে ২৲ এবং একখানি কাপড়। কঠিন বা দুরারোগ্য রোগে অবশ্যই বেশী। তবে সৌভাগ্যের বিষয় দক্ষিণাটা ব্যায়ারাম আরোগ্য হইয়া গেলেই দিতে হয়। তিনি ঔষধের অনুসন্ধানে পাহাড়ে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া উদ্ভিদের শিকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দেন। ব্যাধি মুক্তির পর রোগীর গৃহে একদিন মহা ধুমধামের সহিত ছাগল, কুক্কুট এবং হাঁড়িয়ার ভোজ হয়। রোগীর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই সে দিন নিমন্ত্রিত হন। ওঝামহাশয়ই অবশ্য সে দিন শ্রেষ্ঠ অতিথি।



সাঁওতালদিগের নাচ

সাঁওতালদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস কিন্তু অদ্ভুত রকমের। পৌষ মাসে "সোহরাই" (বান্ধনা) পূজা এবং ফাল্গুন মাসে "সাল সেই" বা বন দেবতা এবং "বোভা বুভি" (ভূত পেত্নী) প্রভৃতি অপদেবতার পূজাই প্রধান।

"সোহরাই" পূজা অর্থে শূকর এবং মুরগীর পূজাই বুঝিতে হইবে। পূজার দিন প্রাতঃকালে প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ গোশালা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া একটি কুমারী শূকরীকে তথায় বাঁধিয়া রাখে এবং তাহাকে অতি পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিতে দেয়। তাহার পরে সকলে মিলিয়া তাহার নিকট গৃহ পালিত পশু পক্ষী এবং সাধারণ মানব প্রভৃতির স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বাহিরের আঙ্গিনায় লইয়া যায় এবং অবশেষে শাণিত কুঠারের একটি মাত্র আঘাতেই তাহাকে হত্যা করে। তাহার পর সমস্ত গৃহস্থ এবং তাহার আত্মীয় কুটুম্ব সকলে মিলিয়া অতি হৃষ্ট চিত্তে সেই বরাহ মাংস এবং হাঁড়িয়া সেবন করিয়া থাকে। বৎসরান্তে একটি মহাপূজা এইরূপেই সম্পন্ন হয়। মুরগী পূজাও ঠিক এইরূপে হইয়া থাকে।

অসভ্যতার কত সুগভীর অন্ধকার গর্ভে এখনও উহারা নিমগ্ন তাহা উহাদের কুসংস্কারের সামান্য মাত্র উদাহরণ হইতেই বুঝা যায়। যদি কোন গ্রামে কখনও কোনও সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামের প্রধান প্রধান মাতব্বর ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া একটি সভা আহ্বান করে। এবং সেই গ্রামের মধ্যে কোনও বৃদ্ধা ডাইনি (witch) হইয়াছে এইরূপ স্থির মীমাংসা করিয়া লয়। কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ডাইনি ব্যতীত কখনও কোনও সংক্রামক পীড়ার সূচনা হইতে পারে না। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে-নির্ব্বাচিতা সেই হতভাগিনা ডাইনির প্রতি গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাকে অশেষবিধ দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণা দিয়া গ্রাম হইতে একেবারে বহিস্কৃত করিয়া দেয়; সময়ে সময়ে তাহাকে একেবারে জীবনের খেয়া পার করিয়া সেই অজানিত দেশের অজানিত গ্রামে পহুঁছিয়া দিতেও ত্রুটি করে না।

ইহাদের সরলতা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষ্যে যখন আমি বাইসিকলে চড়িয়া ইহাদের গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে থাকি তখন গ্রামশুদ্ধ লোক নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া বাহির হয় এবং ভীত, পুলকিত, বিস্মিত এবং কৌতূহলান্বিত ভাবে, উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। কখনও কখনও সেই বিচিত্র দল বহুদূর পর্য্যন্ত বাইসিকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে।

একবার একটী বাঙালী ভদ্রলোক তথায় বাঙালীর খাদ্যোপযোগী তরকারীর বড়ই অভাব অনুভব করিয়া এক সাঁওতাল মালীকে দু'চারিটী সীম জোগাড় করিয়া আনিতে বলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চারিটি বড় বড় মুরগী (সাঁওতালী ভাষায় সীম অর্থে মুরগী) আনিয়া বাবুর সম্মুখে হাজির।

খৃষ্টান পাদরিগণের চেষ্টায়, কৃপায় এবং প্রলোভনে আজকাল অনেক সাঁওতাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে এবং অন্ততঃ পোষাক পরিচ্ছদে বেশ 'সভ্য' হইতেছে। সেদিন মফস্বলে জনৈক সাঁওতাল খৃষ্টান নিম্নপ্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আমার সহিত আলাপ করিতে আসিলেন। তিনি হিন্দি এবং বাংলা একরূপ বলিতে পারেন এবং যৎসামান্য ইংরাজীও জানেন। তিনি কোন্ চার্চ্চভুক্ত এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর করিলেন যে তালপাহাড়ী চার্চ্চ। তালপাহাড়ী সন্নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। তথায় খৃষ্টান মিশনরিদিগের একটি গির্জ্জা ঘর এবং 'আড্ডা' আছে।

সাঁওতাল দিগের মৃতদেহ দাহ এবং প্রোথিত করা,—এই উভয়বিধ রীতিই প্রচলিত আছে। তবে অসমর্থ পক্ষেরাই সমাধি দিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির হাড় তাহারা অতি যত্নসহকারে রাখিয়া দেয়—এবং সুবিধা পাইলেই গ্রামের কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া সেগুলি পবিত্র দামোদরের জলে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

দুঃখী

রাস্তার ধারেই আমার বসিবার ঘর। আমি সকালবেলা আপনার মনে খবরের কাগজ পড়িতেছি একটা জোয়ান চেহারার লোক সটান্ আমার ঘর-চড়াও হইয়া আমার মুখের সামনে আসিয়া ধমক দিয়া বলিল—"বাবু, বখশিস দাও!"

কোথাও কিছু নাই, একটা অচেনা লোক খাম্‌কা বখশিস চায় দেখিয়া আমি বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিলাম।

সে জোর-গলায় আবার বলিল—"বখশিস চাই!"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"বখশিস কিসের!"

সে আমার বিরক্তিতে এতটুকু দমিল না। বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আমাকে যেন হুকুম করিতেছে এমনি ভাবে বলিল—"দুদিন খাওয়া জোটেনি; কিছু দিতে হবে!"

লোকটার ভাবগতিক আমার বড় মজার লাগিল। আমি বলিলাম—"খেতে পাওনি তো ভিক্ষে চাচ্চ না কেন? বখশিস চাও কিসের জন্য!"

ভিক্ষার কথা শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—ভিক্ষে চাইব কেন? আমি কি ভিখিরী!"

আমি বলিলাম—"তবে তুমি কি?"

সে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে লইয়া শূন্যের উপর সজোরে একটা ঘা দিয়া বলিল—"গায়ের জোরে আদায় করি;—ভিক্ষে চাইব কেন?"

বলিয়া লোকটা আমার সামনে স্ফীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখভাবে বোধ হইল যেন ভিক্ষা করার উপর তাহার আন্তরিক ঘৃণা আছে।

আমি বলিলাম—"এমন করলে তোমায় জেলে যেতে হবে জানো!"

সে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—"জেল থেকেই তো কাল ফিরিচি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জেল হল কেমন করে?"

সে চোখ দুটা পাকাইয়া বলিল—"দশ ব্যাটায় মিলে আমায় জোর করে নিয়ে গেল। হাতে পায়ে লোহার বেড়ি দিয়েছিল; —নইলে কি দুঃখীকে ধরে কার সাধ্যি!"

এমন সময় একটা গোলমাল শোনা গেল। আমি উঁকি মারিয়া রাস্তার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, একটা লোককে একজন পাহারাওয়ালা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে।

দুঃখীও উদ্‌গ্রীব হইয়া উঁকি মারিল। উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখুন বাবু, গরীব লোকটাকে ধরেচে—এখনি ওকে জেলে পুরবে!"

এই বলিয়া সে একেবারে ঝড়ের মতো গিয়া রাস্তায় পড়িল। চোখের নিমেষে পাহারাওয়ালার হাতের দড়িটা সে এক-ঝটকায় ছিনাইয়া লইল। বন্দী লোকটা মুক্তি পাইয়া তখনি ছুট্ দিল—মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য। রাস্তার লোক অবাক।

পাহারাওয়ালা আসিয়া দুঃখীর হাত ধরিল।

দুঃখী আহত সিংহের মতো গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া এমন জোরে এক ঠেলা দিল যে মুহূর্ত্তের মধ্যে পাহারাওয়ালা ভূমিসাৎ।

দুঃখী ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইল।

আমি বলিলাম—"এ কি করলি দুঃখী! আবার যে তোকে জেলে যেতে হবে!"

আমার কথা শুনিয়া দুঃখী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে একবার চাহিল; তার পর কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ওরা গরীব লোকগুলোকে ধরে ধরে জেলে পুরবে কেউ কিছু বলবে না।"

পাহারাওয়ালা আসিয়া আসামীকে চাহিল।

আমি বলিলাম—"দুঃখী, ধরা দে।"

দুঃখী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"সে কি বাবু! তুমিও ওদের দলে!"

আমি বলিলাম—"তুই যে অপরাধ করেছিস দুঃখী! তোকে ধরা দিতেই হবে।"

দুঃখী গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"কখ্খনো না! ধরুক দেখি আমাকে! কার বাপের সাধ্যি ধরে!"

এই বলিয়া সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া পাহারাওয়ালা আর অগ্রসর হইবার সাহস করিল না;—সে জড়সড় হইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

আমি দুঃখীকে বলিলাম—"তুই যদি ধরা না দিস তো আমায় ফ্যাসাদে পড়তে হবে।"

দুঃখী চোখ দুটা বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"কেন?"

আমি বলিলাম—"তুই যে আমার ঘরে

লুকিয়েছিস—এখন তোর জন্যে যে আমি দায়ী। তুই ধরা না দিলে আমায় ধরবে।"

দুঃখীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে আমার কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। সে শুধু বলিল—"সত্যি বলচ বাবু! আমি না ধরা দিলে তোমায় ধরবে?"

আমি বলিলাম—"হাঁ দুঃখী! সত্যি বলচি।"

দুঃখী তার সেই সরল চোখ দুটি আমার আশঙ্কা-পীড়িত মুখের উপর একবার বুলাইয়া লইল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"আচ্ছা বাবু, ধরা দিলুম।" বলিয়া সে পাহারা-ওয়ালার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—'চল্, কোথা যেতে হবে চল্।"

এতক্ষণ দুঃখীকে আমার তেমন করিয়া দেখা হয় নাই। সে যখন আত্মসমর্পণ করিল, তার সেই ঔদ্ধত্যের রেখাগুলা যখন একটা নৈরাশ্যের পীড়নে মুহূর্ত্তের জন্য ভাঙিয়াচুরিয়া নুইয়া পড়িল তখন তাহার সমস্ত দেহের উপর এমন একটি সরল বিষাদ ফুটিয়া উঠিল যাহার মধ্যে তার সমস্ত জীবনের একটি করুণ ছবি আমি একনিমেষে দেখিতে পাইলাম।

আমি চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"দুঃখী তুই যে বল্লি তোর দুদিন খাওয়া হয়নি, কিছু খাবি?"

আমার কথা শুনিয়া দুঃখী আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে শুধু একবার চাহিল;—কোনো উত্তর করিল না।

আমি চাকরকে ডাকিয়া দুঃখীর জন্য খাবার আনিতে বলিলাম। দুঃখী চুপ করিয়া বসিয়া সমস্ত খাবারগুলা শেষ করিল; তার পর আমার দিকে ফিরিয়া উদাসভাবে বলিল—"চল্লুম বাবু!"

পাহারাওয়ালা তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

(২)

অনেক দিন চলিয়া গেছে, ঠিক কতদিন আমার মনে নাই। সে দিন দুপুরবেলা আমার বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছি এমন সময় দুঃখী আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম—"কি রে দুঃখী! খবর কি? কোত্থেকে এলি?"

সে বলিল—"বাবু, জেল থেকে!"

আমি বলিলাম—"কেমন ছিলি?"

সে বলিল—"ছিলুম বাবু, ভাল না!"

আমি বলিলাম—"জেলে তোর কষ্ট হতনা?"

সে বলিল—"কষ্ট আর কি?"

—"পাথর ভাঙতে হত না? ঘানী টানতে হত না?"

দুঃখী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—"সে আর বেশি কষ্ট কি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তাহ'লে তুই জেলে থাকিস ভালো বল।"

সে বলিল—"বাবু! ঘানী টানতে পাথর ভাঙতে আমার গায়ে লাগে না। ঐ যে দিনরাত আটকে রাখে—বেরুতে দেয় না—ঐতেই বুকের ভিতরটা কেমন হুহু করতে থাকে।"

আমি এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই; দুঃখীর পিছনটিতে জড়সড় হইয়া লুকাইয়া একটি ছেলে তার পা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ দুঃখী একটু নড়িতেই সেই ছেলেটার শীর্ণ মুখের উপর ছোটো ছোটো দুটি, চোখের চকিত দৃষ্টি, দুঃখীর দেহের আড়াল হইতে একবার একটু বাহির হইয়াই আবার লুকাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—"ও কে রে দুঃখী?"

দুঃখী ছেলেটাকে পিছন হইতে টানিয়া আনিয়া বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—"এ আমার ভাই-পো গো বাবু!" বলিয়া সে ছেলেটাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিল—"গড় কর্, বাবুকে গড় কর!"

ছেলেটা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া একবার আমার মুখের দিকে আর-একবার মাটির দিকে কেবল তাকাইতে লাগিল।

"গড় কর্না"—বলিয়া দুঃখী তার ঘাড়টা ধরিয়া সজোরে মাটিতে নোয়াইয়া দিল।

আমি বলিলাম—"দুঃখী এ তো তোর ভাই-পো! বাড়িতে আর তোর কে আছে?"

দুঃখী বলিল—"কেউ নেই বাবু! এ ছোঁড়াটাও ছিল না, আজ একে আবার পেয়েছি! ওটাকে বড় ভালোবাসতুম গো! ওর মা মরে যাবার পর থেকে আমিই ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আজ ওটাকে পেয়ে আমার বুক যেন দশহাত হয়ে উঠেছে!"

বলিয়া দুঃখী ছেলেটাকে বুকের মধ্যে পুরিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। সেই চাপুনিতে ছেলেটার মাছের মতো ছোটো ছোটো দুটা চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিল। ছেলেটা তাহাতে কোনো কাতরোক্তি করিল না;—দুঃখীর বুকের ভিতর সে ক্রমেই জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"একে আজ কোথায় খুঁজে পেলি?"

দুঃখী বলিল—খুঁজতে হয়নি বাবু! আপনিই পেয়েছি। ওর বাপের যে জেল হয়ে গেছে! জেলে যাবার সময় ছেলেটার জন্যে ওর বাপ নাকি ভারি কেঁদেছিল, বলেছিল ওর আর কেউ নেই, ওকে সুদ্ধ তার সঙ্গে জেলে পাঠাতে! কিন্তু জজসাহেব সে কথায় কান দেয় নি। ছেলেটা অনাথ হল দেখে আমাদের সব ভাই-ব্রাদারিয়া ওকে আড্ডায় নিয়ে এসেছে—আমি আজ ফিরে এসে পেলুম।"

বলিয়া দুঃখী ছেলেটাকে আর-একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

আমি বলিলাম—"ওর বাপ এদ্দিন ছিল কোথায়?"

দুঃখী বলিল—"কি জানি বাবু! তার তো কোনো খবরই জানতুম না—একেবারে জেলের খবর শুনলুম। ওর বাপটা শয়তান। সেই তো ছেলেটাকে আমার কাছথেকে চুরি করে নিয়ে যায়!"

আমি বলিলাম—"চুরি করে? সে কি রকম?"

দুঃখী বলিল—"তবে শোনো বাবু। দেশে আমাদের সব মরে হেজে যেতে দাদা একদিন বল্লে—দুঃখী, চল কলকেতায় যাই, এখানে তো আর দিন চলে না,

সেখানে গেলে তবু রোজগার হবে। আমি বল্লুম—বেশ তো দাদা, চল না। দাদা জিনিষপত্র মাথায় নিলে, ছেলেটাকে আমি কাঁধে নিলুম,—দু-ভায়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমার আর সম্বল কিছু ছিল না,—কেবল তিনটি টাকা ছিল। এই টাকা তিনটি বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম। তিনি মারা যাবার সময় তাঁর অনেক-দিনের জমানো ছ'টি টাকা আমাদের দুই ভাইকে ভাগ করে দিয়ে যান। পথে যেতে যেতে দাদা বল্লে—দেখ দুঃখী, তুই ছেলেমানুষ, পথে চোরডাকাতের ভয়, তোর টাকা আমার কাছে দে, আমি রেখে দি। আমি বল্লুম তা বই কি! এ টাকা আমি কাউকে ছুঁতে দেব না। দাদা রেগে বল্লে—তবে মরগে যা! আমি তোর কিছু জানি না। বলে দাদা মুখ ভার করে চলতে লাগল, আমিও আপনার মনে চলতে লাগলুম। সমস্ত দিন পথ চলেচি—সঙ্গে যা মুড়িমুড়কি ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে গেছে—কেবল আমার কাপড়ের খুঁটে তখনও চারটি বাঁধা আছে; —ছেলেটা ক্ষিধেয় চেঁচাবে বলে তার জন্যে সেই ক'টি রেখে দিয়েছিলুম। খানিকদুর গিয়ে দাদা বল্লে দুঃখী তোর কাপড়ে মুড়ি আছে বার কর্। আমি বল্লুম—এ মুড়ি কেউ পাবে না, এ আমার খোকা খাবে। দাদা চটে উঠে বল্লে—যা তোর খোকাকে নিয়ে তুই মরগে যা! আমি এইখানে বসলুম। বলে দাদা একটা গাছতলায় বসে পড়ল। আমি আর দাদার দিকে না চেয়ে রেগে হন্‌হন্ করে চলে গেলুম। খানিকদুর গিয়ে রাগটা যখন পড়ে এল তখন দাদার জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল। ভাবলুম দাদা রাগী মানুষ —যাই ঘাট মেনে তাকে নিয়ে আসিগে। এই ভেবে আবার ফিরলুম। ফিরে দেখিলা দাদা গাছতলায় বসে এক নুকোনো পুটুলি থেকে মুড়ি বার করে দিব্যি চিবুচ্চে। দাদা প্রথমে আমায় দেখতে পায়নি;—দেখেই চমকে উঠল। আমি বল্লুম—দাদা, এই যে বল্লি মুড়ি নেই, এখন মুড়ি কোথায় পেলি! দাদা বল্লে—যেখান থেকে পাই না তোর তাতে কি! আমি বল্লুম—দে আমায় মুড়ি, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। দাদা বল্লে—দিলুম আর কি! তুই আমায় দিয়েছিলি? আমি বল্লুম—দিই নি তো কি? সমস্ত পথ তো আমার মুড়িতে ভাগ বসিয়ে এসেছিস। দাদা বল্লে—আমার খুসি আমি দেব না। আমি বল্লুম—চাইনে তোর মুড়ি, যা। বলে আমি ছেলেটাকে নামিয়ে সেইখানে বসে পড়লুম। বল্লুম—নে তোর ছেলে! তোর ছেলের বোঝা আমি বইতে পারব না। দাদা বল্লে—দে আমার ছেলে! বলে ছেলেটার নড়া ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার কান্না আর থামে না। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সে কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল। আমি আর পারলুম না;—জোর করে দাদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসলুম।

"সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, রাতের অন্ধকারে আর পথ চলা যাবে না, ছেলেটাও ঘুমে

একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। আমি তাকে সেইখানে শুইয়ে দিয়ে নিজে পাহারা দিতে লাগলুম। তারপর বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—কিছু জানি না। যখন চোখ চাইলুম তখন অনেকখানি বেলা হয়েছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। এ পাশে দেখি, ও পাশে দেখি,—দাদাও নেই, ছেলেও নেই, কোমরে হাত দিয়ে দেখলুম টাকার গেঁজেও নেই। দাদাটা কী শয়তান! মায়ের পেটের ভাই হয়ে চুরি করলে গো!

"টাকার জন্যে দুঃখ হল না—টাকা ঢের রোজগার হবে—কিন্তু ছেলেটা যে গেল; তাকে তো আর পাব না—তার জন্যে প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল। নিজের হাতে মানুষ করলুম!—আমার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল গা!

"ছেলেটার জন্য কাপড়ে মুড়ি বেঁধে রেখেছিলুম—সে মুড়ি আর ছুঁতে পারলুম না—সেইখানেই ছড়িয়ে ফেলে দিলুম। তার দোলাইখানা আমার কোমরে জড়ানো ছিল, সেখানা দেখি আর চোখে জল আসে। সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ছুটে পালিয়ে গেলুম। তারপর কত খোঁজ করেচি দাদাকেও পাইনি, ছেলেকেও পাইনি। আজ সেই হারানো ধন ফিরে পেলুম গো। কেবল দাদাটার সঙ্গে দেখা হল না।"

বলিয়া দুঃখী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

দুঃখী কথা শেষ করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুঃখী, আজ কি মনে করে আমার কাছে এসেচিস বলত?"

দুঃখী বলিল—"কিছু মনে করে আসিনি বাবু! আমার ছেলেটাকে তোমায় শুধু দেখাতে আনলুম।"

আমি একটা সিকি বাহির করিয়া বলিলাম—"এই নে দুঃখী, তোর ছেলেকে খাবার কিনে দিস্।"

দুঃখী আমার মুখের দিকে একবার চাহিল, একটু ইতস্তত করিল, তার পর আস্তে আস্তে হাত পাতিয়া সিকিটা গ্রহণ করিল।

(৩)

ইহার দুই-এক দিন পরেই এক বৈকালে ছেলেটাকে বুকে লইয়া দুঃখী আসিয়া হাজির। মুখখানা তার শুষ্ক মলিন।

আমি বলিলাম—"কি হয়েছে রে দুঃখী!"

দুঃখী বলিল—"বাবু, ভাই-ব্রাদারিরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।"

আমি বলিলাম—"কেন?"

সে বলিল—"তারা বলে আমি মেয়ে-মানুষেরও অধম! আমি তাদের আড্ডায় থাকবার যোগ্য নই! ছেলে বুকে করে দিন-রাত থাকি—রোজগারে বেরুতে পারিনে! আমার দিন চলে কেমন করে?"

আমি বলিলাম—"তুই রোজগারে বেরুস না কেন?"

দুঃখী বলিল—"বাবু! ছেলেটা বুঝি যাদু জানে গো! ওর মুখের দিকে চাই আর আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে আসে। বুকে বল পাইনা, সাহস পাইনা, তা রোজগার করতে বেরুব কি? জেলের ভয় তো এদ্দিন আমায় ছিল না বাবু! এখন যে ভয়ে ভয়ে সারা

হয়ে গেলুম। জেলে গেলে ছেলেটাকে যে ছেড়ে যেতে হবে।—সে তো আমি পারবনা বাবু! ওকে ছেড়ে যে আমি কোথাও থাকতে পারিনা!" বলিয়া দুঃখী অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম—"তবে এক কাজ কর—"

দুঃখী আমার প্রস্তাব শুনিবার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"বাবু, আজকের মতো তুমি আমায় রক্ষে কর। ছেলেটার মুখে আজ সমস্ত দিন কিছু দিতে পারিনি—বাছা আমার ক্ষিধেয় সারা হয়ে গেল!"

বলিতে বলিতে দুঃখী থামিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিল; তারপর মাথা নীচু করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"বাবু, আজ কিছু ভিক্ষে দাও।"

আমি দুঃখীর হাতে একটি টাকা দিলাম।

দুঃখী সেটি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিল। মনে হইল, সেই টাকাটার স্পর্শে তার সেই উদ্ধত হৃদয়টি যেন সঙ্কোচে নুইয়া পড়িল; সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ছেলেটা আমায় ভিখিরী করলে গো!"

ছেলেটা তখন দুঃখীর বুকের উপর তার অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দুঃখী তার মুখের দিকে একবার চাহিল; তারপর সেই ঘুমন্ত শিশুটিকে তার সমস্ত বুকখানা দিয়া বহন করিয়া বাহিরের কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

স্রোতের ফুল

(১৩)

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবকিশোরকে রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ভাবে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে একটি ছোট বাগানের সম্মুখে একখানি লাল বনাত গায়ে জড়াইয়া মহিম-স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে পায়চারি করিতেছিলেন। স্তোত্রের তালে তালে তাঁহার পায়ের খড়ম চট্‌চট্ শব্দ করিতেছিল। রাজবাড়ীতে আরতি করিতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু নবকিশোরের নিকট সমস্ত না শুনিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি অধৈর্য্যের সহিত ঘন ঘন পথপানে তাকাইতেছিলেন। ক্রমে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিল। গোয়ালঘর হইতে সাঁজালের ধোঁয়া সন্ধ্যার কুয়াসায় মিশিয়া হিমঘন বাতাসকে ধূসর করিয়া তুলিল। এমন সময় নবকিশোর বাড়ী ফিরিল।

ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন—বাবা কিশোর।

—আজ্ঞে।—বলিয়া নবকিশোর পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—মালতী কেন ডেকেছিল?

—সে এখান থেকে চলে যেতে চায়

তার ওপর অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। সে জামা পরে বলে কেউ তাকে ছোঁয় না, কাছে বসতে দেয় না, কোনো কাজ করতে দেয় না। তা ছাড়া সকলে তাকে নানা রকম অকথা কুকথা বলে' অপমান করছে।

—ছোট বৌ কি করছেন, নিজের বোনঝিকে তিনি সামলাতে পারেন না?

—খুড়িমাও দেখলাম সকলের ওপর রাগ করে' মালতীকেই নির্য্যাতন করছেন।

—তুমি মালতীকে কি বলে এলে? নিয়ে যেতে স্বীকৃত হয়েছ?

—না বাবা, তাকে কোথায় নিয়ে যাব? সেখানে তাকে কে দেখবে? আমি বললাম, বিপিন আসা পর্য্যন্ত সহ্য করে থাকুক, সে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কেমন করে?

—বিপিন সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যেই থাকবে, তখন তার ভয়ে মালতীর ওপর কেউ কিছু উৎপাত করতে সাহস করবে না। আর মালতীও বিপিনের সঙ্গ পেয়ে নিতান্ত একলা বোধ করবে না।

—কিন্তু এটা ত রোগ প্রতিরোধ হল, রোগের প্রতিকার ত হল না। বিপিন একদিন বাড়ী থেকে অন্যত্র সরে গেলেই সকলের রুদ্ধ আক্রোশ যে একদিনেই সমস্ত শোধটা তুলে নেবার জন্যে প্রচণ্ড হয়ে উঠবে; যদিই বা না ওঠে, তবু মালতী ত কারো কাছে একটু স্নেহ যত্ন সহানুভূতি পাবে না। সকলের বিরাগভাজন হয়ে থাকা কি সহজ? এর প্রতিকারের কি উপায় ঠাওরেছ?

—এর প্রতিকার ত সহজ নয়। স্ত্রীশিক্ষা যতদিন না স্ত্রীলোকের চিন্তাকে প্রসারিত করে তাদের সামনে মহৎ আদর্শের পথ খুলে দিচ্ছে ততদিন ত তারা ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্যাগ করে' ভিন্ন মতের লোককে ক্ষমার উদার চক্ষে দেখতে পারবে না।

—তবে সেই স্ত্রীশিক্ষারই ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা যদি রোগ বুঝেও প্রতিকারের চেষ্টা না কর তাহলে তোমাদের শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—কিন্তু এই অসাধ্যসাধন কি আমার একলাকে দিয়ে হবে? আমি ত ঠিক করেছি গ্রামে গ্রামে টোল করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে বেড়াব। তারপর আমার ছাত্রেরা আলাদা টোল করে শিক্ষা দেবে। কিন্তু জমিদারের বাড়ীর বিলাস-দম্ভে-পুষ্টা লেখা-পড়ার বিরুদ্ধবাদিনী বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা দেবার ভার কে নেবে?

—বিপিনের নিজের বাড়ীর ভার বিপিনকে নিতে হবে। ভগবান সে পক্ষে অনেকটা সুবিধেও করে এনেছেন—সুশিক্ষিতা মালতীকে তিনি যখন এই ক্ষেত্রে এনে ফেলেছেন তখন তাঁর কল্যাণ হস্তের মঙ্গল সঙ্কেত ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

—কিন্তু মালতী বিপিনের সঙ্গে কাজ করবার অবসর পাবে কি? পুরস্ত্রীরা শিক্ষিতা হয়ে তার কদর বোঝবার আগেই হয়ত মালতীর ভিতরকার সমস্ত কল্যাণভাব তারা অত্যাচার করে' নষ্ট করে' ফেলবে।

ভট্টাচার্য্য নীরবে দুবার পায়চারি করিয়া বলিলেন—আচ্ছা বলত, তুমি যতখানি দেখেছ শুনেছ তাতে মালতীর স্বভাব চরিত্র কেমন বোধ হয়?

নবকিশোর উৎসাহিত হইয়া বলিল—খুব

ভালো। মালতী বড় চমৎকার লক্ষ্মী মেয়ে। বিনয় আর তেজ, বশ্যতা আর স্বাতন্ত্র্য তার স্বভাবে চমৎকার মিশ খেয়েছে। গৃহকর্ম্মেও খুব পটু। একখানি নিখুঁত কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমা!

ভট্টাচার্য্য আবার নীরবে দুবার পায়চারি করিয়া বলিলেন—মালতীকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় আমার মনে হয় মালতীর বিবাহ। তুমি কি মনে কর?

—আমিও এই কথা অনেক দিন ভেবেছি। কিন্তু বিধবার বিবাহের কথা সাহস করে তুলতে পারিনি।

—কেন বাবা, বিধবার বিয়ে ত অশাস্ত্রীয় নয়; দেশাচারে দিনকতক বন্ধ হয়ে গেছে। যা যুক্তি আর শুভবুদ্ধির প্রতিকূল নয় সে কথা স্বীকার করতে বা প্রকাশ করতে ভয় করলে চলবে কেন?

—কিন্তু মালতীর উপযুক্ত পাত্র কৈ?

ভট্টাচার্য্য নবকিশোরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—আমি ঠিক করেছি মালতীকে আমারই পুত্রবধূ করব।

নবকিশোর কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—না বাবা, আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তাতে আমার বিয়ে করা সুবিধে হবে না।

—তুমি কি মালতীকে বিবাহ করতে আপত্তি করছ?

—না, তা নয়। যদি আমি বিয়ে করি তবে মালতীকে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। কিন্তু আমার আপত্তি বিবাহের সম্বন্ধেই। আমার মুক্ত শক্তি আর বিপিনের অর্থ দেশে শিক্ষা প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করতে হবে। বিপিন যে রকম পরনির্ভর দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, তারই সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত পাত্রী মালতী।

—কিন্তু তোমার বাপ মা স্বেচ্ছায় বিধবাকে বধূরূপে বরণ করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বিপিনের বেলা যে মহা বিরোধ উপস্থিত হবে?

—সেই জন্যেই ত তার সফলতার মূল্যও বেশি হবে।.....বিপিনের পরীক্ষা শিগ্‌গির শেষ হয়ে যাবে। আমি একবার কলকেতা গিয়ে তাকে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতন করে তৈরি করে আনব।

—কিন্তু এখন তাকে মালতীর সঙ্গে বিবাহের কথা কিছু বোলো না। তাদের উভয়ের দেখাসাক্ষাতের পর উভয়ের মনের ভাব বুঝে তবে যা হয় করতে হবে। হঠাৎ কিছু করলে তা শুভ হবে না।.....আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও, আমি আরতি করে আসি, তারপর এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা যাবে।.....ওরে মুরলী, আমার একটা লণ্ঠন আর লাঠি গাছটা এনে দে ত।

নবকিশোর মালতীর বিবাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল মালতীর রূপ, মালতীর শিক্ষা, মালতীর গুণপণা, মালতীর তেজস্বী মধুর প্রকৃতি—যাহা কিছু পুরুষ কামনা করিতে পারে মালতীতে সে সব প্রচুর মাত্রায় আছে। একটি ছোট্ট "হাঁ" বলিলেই এমন মালতী তাহার হইতে পারে; মালতীও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আনন্দে তাহাকে বরণ করিতে স্বীকার করিবে। সুখের পথ তাহার সম্মুখে এমন প্রমুক্ত,

এমন সরল; সুখ তাহাকে সাধিয়া ফিরিতেছে সে হাত বাড়াইয়া শুধু তুলিয়া লইলেই হয়। কিন্তু না। বড় প্রলোভন মনে হইতেছিল বলিয়াই নবকিশোর জোর করিয়া মালতীর দিক হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া ভাবিল কোনো প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সঙ্কল্প পণ্ড করিবার মতন দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহার নহে; যেমন করিয়াই হোক বিপিনের সহিতই মালতীর বিবাহ ঘটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলে মালতী স্নেহশীল উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয়ও পাইবে এবং বিপিনের মতন একজন জমিদারকে সংস্কারের কাজে চিরদিনের জন্য পাওয়া যাইবে—যৌবনের আবেগ হ্রাস হইলে পুরাতন গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পথ তাহার একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। মালতীকে দিয়াই বিপিনের দ্বিধার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে।.....কিন্তু মালতী বড় সুন্দর! বারবার করিয়া কেন মনে হইতেছে মালতী বড় সুন্দর! রূপে গুণে সুন্দর! অনির্ব্বচনীয় সুন্দর! অপরূপ সুন্দর! বড় লোভনীয়!.....হোক সুন্দর! হোক লোভনীয়! কল্যাণের সঙ্গেই এই সুন্দরকে যুক্ত করিতে হইবে, নিজের লালসার সঙ্গে নহে! নিজের চিরপোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহাকে এই ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে!.....মালতী তাহার হইলে হইতে পারিত কিন্তু তাহাকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতেছে এই আনন্দবোধের দ্বারা নবকিশোর মালতীর চিন্তা চাপা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বায়ুহিল্লোলে সলিল-নিমজ্জিত পদ্মের মতো মালতীর মুখচ্ছবি নবকিশোরের আলোড়িত মনে থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, কিছুতেই তাহাকে একেবারে ডুবাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

(১৪)

বিপিনের শেষ পরীক্ষার দিন দুপ্রহরকালে নবকিশোর কলিকাতার বাসায় গিয়া পৌঁছিল। পঞ্চা খানসামার যত্নে তাহার স্নানাহারের কোনো অসুবিধা ঘটিতে পারিল না।

আহারান্তে মসলা চিবাইতে চিবাইতে নবকিশোর বৃদ্ধ খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিল —পঞ্চাদা, বিপিন বাড়ী যাবে কবে কিছু শুনেছ?

—এঁজ্ঞে, তা ত আমি কিছু জানিনা ভাই। দাদাবাবু ত পড়া নিয়েই ব্যস্ত, বাড়ীঘরের কথা একবার না ভাবে, না চিন্তয়, তুমি ত এখন এসেছেন, এখন ওকে বলে কয়ে একবার দেশঘরে নিয়ে চল। সারা জীবনটাই যদি পড়বে তবে সুখ ভোগ করবে কবে?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—সুখ না থাকলে কি কেউ কোন কাজ করে পঞ্চাদা? পড়াতেই আমরা সব চেয়ে বেশি সুখ পাই।

পঞ্চা একটু চটা মেজাজে রুক্ষ স্বরে বলিল—তুমিই ত নাটের গুরু, তুমিই ত বিপিনের স্বভাব চরিত্তির সব বিগড়ে দিলে। ও জমিদার! রাজার ছেলে! ও যে এই আহার নিদ্রে ছেড়ে সুখ সোয়াস্তি ভুলে ভুতের বেগার খেটে মরছে, সে কিসের জন্যে? ওর কি চাকরি করে খেতে হবে, না তোমার মতন টোল করে পোড়ো

পড়াতে হবে? লেখাপড়া করা ওর ত শুধু ভোগান্তি!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—বিপিনের ভোগান্তি আর একটু বড়াবার চেষ্টা করছি পঞ্চাদা।

পঞ্চা তাহার গোল গোল, গাঁজার ধূমে লোহিতায়মান চোখ দুটো পাকাইয়া বলিল—সে কি কথা?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—তোমার দাদাবাবুর বিয়ের চেষ্টা দেখছি।

এই শুভ সংবাদে পঞ্চা পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বিয়ের কি ঠিক হয়ে গেছে দাদাঠাকুর? কবে দিন ঠিক হল? কনেটি কোথাকার, কেমনতর, কত বড়টি?

পঞ্চা নবকিশোরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—মহারাজের বিয়ে হয়েছিল যখন বারো বচ্ছর বয়েস আর বড় রাণীমার বয়েস তখন পাঁচ বচ্ছর। বড় রাণীমা আমাদের সোণার লক্ষ্মী ছিলেন; বিপিন হল আর তিনি স্বর্গে চলে গেল।

পঞ্চা কাঁধের গামোছায় চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিল—সেই বছর আমার কেষ্ট বলে ছেলেটাও মারা যায়; সে বচ্ছর দেশে খুব বান হয়েছিল; সে হল গিয়ে এককুড়ি তিন বচ্ছরের কথা। আমিই ত বিপিনকে হাতে করে মানুষ করে এত বড়টি, করেছি, আমার কাছে ত আর ওর কোনো কথা ছাপা নেই, এখন পঞ্চাদাদা বুড়ো হয়েছে বলে তার কথা শোনা হয় না। বিয়ে-থার কথা বল্লে বলে কিনা—হবে হবে পঞ্চাদা, বিয়ের বয়েস ত পালায়নি!.....শোন দেখি একবার কথা! আমি বলি বিয়ের বয়েস পালাচ্ছে না ত কি দাঁড়িয়ে আছে?.....তা শুনে শুধু হাসে। ছোট রাণীমা, সৎমা এমন হবে না, অনেক পুণ্যি করে বিপিন এমন সৎমা পেয়েছিল, তিনি কত রাগ করে, মহারাজ রাগ করে! তা দাদাবাবু ত কারু কথা শোনে না। এক শোনে শুধু তোমার কথা। তা তোমরা ত চোরে চোরে মাসতুত ভাই! তুমি ত তাকে কিছু বলবে না।...এবার দেখছি তোমার কি সুমতি হয়েছে যে দাদাবাবুর বিয়ের কথা বলছ। কনে ঠিক হয়েছে? দেখেছ? কত বড়টি?

নবকিশোর বৃদ্ধ ভৃত্যের এই তিরস্কার-মিশ্র স্নেহের অনুযোগ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—হ্যাঁ পঞ্চাদা, বিয়ে ত একরকম ঠিক। কনে যেন পরী। বয়েস এই আঠারো উনিশ।

পঞ্চা দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ।

নবকিশোর গম্ভীর হইয়া বলিল—পরিহাস নয় পঞ্চাদা। তোমার দাদাবাবুর বয়েস হয়েছে, এখন ন বছরের একটি খুকির সঙ্গে দিয়ে দেওয়া কি মানায়? তাই ন দুগুণে আঠারো বছরের কনে ঠিক করা যাচ্ছে।

পঞ্চা বিস্মিত হইয়া বলিল—তা বলে কি একটা ধেড়ে মাগীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানাবে? এত বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ত শাস্তরে দোষ লিখছে—এতে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়।

—পুরোণো শাস্তরের পুরোণো বিধান আমরা সব বদলে দিয়ে এখন নতুন শাস্তর চালাব—ছোট মেয়ের বিয়ে দিলেই চোদ্দপুরুষ কেন ছাপ্পান্ন পুরুষ নরকস্থ হবে, আমাদের নতুন শাস্তরের এই বিধান!

—ছিছি! এমন খিষ্টানি কথা বোলো না ভাই। তোমরা হলে বামুনপণ্ডিত মানুষ, তোমার এমন কথাটা বলা উচিত হয় না।

—আমরাই ত বলব পঞ্চাদা। শাস্তর তৈরি করে ছিল যারা তারাও ত আমাদেরই মতন বামুনপণ্ডিত ছিল। তারা যেখানে যেখানে ভুল করে' গেছে, কিংবা সেকালের বিধান এখালে ঠিক সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না, সেসব বিধান ত আমরাই শুধরে তুলব।

পঞ্চা জিভ কাটিয়া বলিল—ছিছি! অমন কথা বলতে নেই! তোমরা ছেলে মানুষ, রক্ত গরম বলে কাউকে ত মানো না! ওতে যে পাপ হয়! দেবতায় শাস্তর করেছে, সেই দেবতার অপমান হয়!

—দেবতারা কালিকলম নিয়ে মানুষের জন্যে শাস্তর লেখেনি। দেবতার যে শাস্তর সে সত্যিকারের শাস্তর, সব মানুষের মনের মধ্যে জ্ঞানের অক্ষরে বুদ্ধির ওপর সে শাস্তর লেখা। সেই শাস্তর যাঁরা ভালো করে পড়তে পারেন তাঁদেরকে আমাদের দেশে মুনিঋষি বলে। তাঁরাও এই আমাদের মতনই মানুষ। তাঁদের ভুল হবে না? জাননা, কথায় বলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।" ঘরের বেরাল বনে গেলেই বনবেরাল হয় পঞ্চাদা। আমরাও যদি হাজার বছর আগে জন্মাতাম তবে আমরাও তোমাদের কাছে একটা কেষ্টবেষ্ট কিছু হতাম। চাই কি তোমরা মন্দিরে মন্দিরে আমাদের প্রতিমা গড়ে' সিঁদুর চন্দন লেপতে।

—রামঃ রামঃ! তোমাদের সঙ্গে কে পারবে ভাই? ভটচায্যির ছেলে যখন ইংরিজি পড়েছ তখন আর জাতধর্ম্ম কি থাকল? গোরুখোরের বাক্যি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে কি আর ধম্মে মতি থাকে?

নবকিশোর ঘর ভরিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমিও ত গোরুখোরের বাক্যি উচ্চারণ কর পঞ্চাদা! রেলগাড়ী, ইষ্টিসান, ইষ্টিমার, গেলাস, চেয়ার, টেবিল, টেলিগ্রাফ কত কি কথা বল। তার ওপরে আবার মোছলমানের তৈরি বরফ সোডার জল খাও। তোমার ঠিক জাত গেছে। এবার বাড়ী গিয়ে তোমার জাতেদের বলে দেবো, তিন চার কুড়ি টাকা খরচ হয়ে যাবে তোমার জাতে উঠতে।

গতিক ভালো নয় দেখিয়া পঞ্চা বলিল—যা ভালো বুঝিস কর্ ভাই, আমরা হলাম মুরুখ্খু সুরুখ্খু মানুষ, তাতে আবার বুড়ো হাব্ড়া হয়েছি, আমাদের এখন মলেই হয়।

পঞ্চা আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। নবকিশোর স্মিতমুখে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের সমন্বয়সমস্যা চিন্তা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিপিন তারককে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিয়া নবকিশোরকে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—বাহব্বা!

কিশোর যে! একেবারে surprise visit! কখন এলে? খবর সব ভালো ত?

তারক তাহার শীর্ণ মুখের মধ্য হইতে বড় বড় শাদা শাদা দাঁত সবগুলি বাহির করিয়া বলিল—কিহে ভটচায্ ভালো ত?

নবকিশোর স্মিতমুখে বলিব—সব ভালো!···

তারপর বিপিন, কেমন এগজামিন দিলে?

—মন্দ নয়। পাশ হব। তবে ফার্ষ্ট ক্লাশ হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিনে। এংলো স্যাক্সন ফাইললজির পেপারটা একটু খারাপ হয়ে গেছে; আর প্রোজ পেপারটাও তেমন মনের মতন হয় নি।

—অন্য পেপারগুলো সব ভালো হয়েছে ত? তবে ভয় নেই, ফার্ষ্ট ক্লাশ হয়ে যাবে।··· তারপর বাড়ী যাচ্ছ কবে?

—এই ত তুমি এসেছ, যেদিন বলবে।

—যাবার আগে অনেক কাজের পরামর্শ করে' মতলব এঁটে বাড়ী যেতে হবে।

—কি পরামর্শ?

সে অনেক কথা। এখন তাড়াতাড়ি হবে না। হাত মুখ ধোওগে। সন্ধ্যার পর পরামর্শ হবে এখন। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ তাড়কার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ জুড়ে দি।

তারক দাঁত বাহির করিয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া বলিল—বেশ! এহেহি যুদ্ধং দেহি!.....কোন্ বিষয়ে যুদ্ধ হবে? বিধবা-বিবাহ, না জাতিভেদ, না সমুদ্রযাত্রা, না কি?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আরে ছ্যাঃ! ঐ একঘেয়ে বকেয়া বকুনি কি আর ভালো লাগে। ঐ সব পুরোণো মতের আলোচনার চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তোমরা নব্য হিন্দুর দল, নতুন রকম একটা সমস্যা খাড়া কর তবে ত!

তারক গম্ভীর হইয়া বলিল—যথা?

নবকিশোরও খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—এই মনে কর, তোমরা বিধান দেবে যে মেয়েদের দ্রৌপদীর মতন একেবারে পঞ্চস্বামী হবে, তা হলে তারা সতীকে সতী থাকবে অথচ পঞ্চ আপৎস্থ পাঁচমোহাড়া আগলানো থাকাতে বিধবাবিবাহের পাপের আশঙ্কা থাকবে না; কিংবা ধর, মেয়ে জন্মাবামাত্র তাদের চক্ষু উৎপাটন আর জিহ্বা ছেদনের ব্যবস্থা দেবে, তা হলে আর স্ত্রীশিক্ষার কথা কেউ তুলবেও না। কিংবা এই বিধান দেবে যে সকলকেই স্বপাক খেতে হবে, নইলে জাত যাবে, অধর্ম্ম হবে, সাড়ে সাতান্ন পুরুষ রৌরব নরকে বাসার লক্ষ বৎসর ডুবে থাকবে;—কারণ, জোর করে ত বলা যায় না যে স্ত্রী-কন্যারাও ঠিক আমাদের স্বজাত!···এগুলো নমুনা মাত্র। এই রকম ধরণের বিশেষ গবেষণাত্মক নতুন নতুন ব্যবস্থা দাও। তখন তার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে যে আলোচনা চলবে তা মৌলিক এবং নতুন রকমের হবে বটে। মনুর আমলের মতগুলো যেমন পুরোণো, তার আলোচনাও তেমনি পুরোণো হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান লোকের এখন ওসব বিষয়ে আলোচনা না করলেই বুদ্ধির মর্য্যাদা রক্ষা হয়।

তারক নবকিশোরের কথা শুনিয়া বুঝিল যে নবকিশোরের এখন তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই, সে তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে। তারকের বেশ জানা ছিল যে নবকিশোরের

বিদ্রূপের ঝাল কি রকম উগ্র। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিল—ওহো! একটা বিশেষ কাজ মনে পড়ে গেল, আমি চট করে' ঘুরে আসছি।

নবকিশোর বলিল—তবে এখন ঝগড়া থামা চাপা থাক। অন্য দিন মীমাংসা হবে। কিন্তু কাজটা কি জরুরি?

—উঃ বড্ড।

—কিন্তু অভয় যদি দি যে তর্ক দ্বন্দ্ব এখন মুল্কিতে বন্ধ থাকবে, তা হলে?

—কেন, আমি কি তর্ককে ডরাই নাকি। আচ্ছা, আমি ঝাঁ করে ফিরে আসছি।

তারক ধাঁ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে বিপিন আসিয়া নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করিল—তাড়কা গেল কোথায়?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আমার নতুন শাস্ত্রবিধানের আভাস পেয়ে ভেগেছে। ফিরে আসবে বলে গেছে বটে, কিন্তু আজ আর সে ফিরছে না।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—চল আমরা বারান্দায় গিয়ে বসিগে।

দুই বন্ধু রাস্তার ধারে বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া মোটা মলিদার চাদর গায়ে জড়াইয়া বসিল। কলিকাতার ধোঁয়া ও ধূলার চাদর গায়ে জড়াইয়া শীতকালের ভারি বাতাস আড়ষ্ট হইয়া আছে। ধূলিধূমের কুজটিকা ভেদ করিয়া পথপ্রান্তের গ্যাসের আলো ঝাপসা হইয়া মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল —যেন দূর আকাশের অস্পষ্ট নীহারিকা। তাহার ধূসর আলোকে সমস্ত কলিকাতা কেমন যেন তন্দ্রাতুরের মতন দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাড়ী কাঁপাইয়া, সহিসের চীৎকারে গলি ভরিয়া, মাতালের চোখের মতন ঘোলা আলো চমকাইয়া ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়া যাইতেছিল। দুই বন্ধু রাজপথের বিচিত্র জনপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে গল্প করিতেছিল। নবকিশোর বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিপিন, তোমার চৌদ্দপুরুষে ত লেখা পড়া কেউ করেন নি। তুমি এই অনভ্যস্ত বিদ্যার-বোঝা নিয়ে কি করবে? জমিদারীর জমাখরচের খাতার মধ্যেই কি এর হিসেব তোলা থাকবে?

বিপিন হাসিয়া বলিল—"ঘরের কোণে বুড়ো থাকুন।

পয়সা কড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র
করুন মামলা মোকদ্দমা।"

আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাব্য আলোচনা করব। কাব্য আলোচনার সুখ এমনি মিঠে যেন প্রেয়সীর প্রথম চুম্বন—তেমনি এক অবুঝ আনন্দভরা, আধো গুপ্ত আধো ব্যক্ত ভাবের, কী চমৎকার! সে সুখ ছেড়ে জমাওয়াশীল বাকী, আর কোর্ফা মোকররবি? রামঃ!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—কবি, তোমার প্রেয়সীর প্রথম চুম্বন আর বেশি দিন কেবলমাত্র কল্পনার সামগ্রী হয়ে থাকছে না; শীঘ্রই সে সুখের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। তখন যেন সেই শরীরিণী কবিতা পুঁথিগত সরস্বতীকে বিদূরিত না করে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—না হে না, সে শুভদিন যদি আসে তবে তখনই

ত আরো বেশি করে' বাণীর দরকার হবে নিজের অব্যক্ত ভাবকে আকার দেবার জন্যে। "লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে, কবি লুকাইয়া কবে তাহারে।"

এমন সময় তারক আসিয়া সেইখানে উপবেশন করিল। বিপিন বলিল—শুনছ তাড়কা, কিশোর আমার প্রেয়সী-সম্মিলনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; কিন্তু আমি এমন স্বার্থপর কেমন করে' হই বল ত? একযাত্রায় দুইবন্ধুর পৃথক ফল ত হতে পারে না। কিশোর, তোমাকেই ভাই বিশেষ করে' দেখবার শোনবার একটি অভিভাবকের দরকার। তুমি ত রাতদিন পরের ভাবনা ভাবতেই এত ব্যস্ত যে তোমার নিজের ভাবনা ভাববার অবসরই হয় না তোমার। তা ছাড়া তুমি দার্শনিক লোক; দর্শন নিয়েই মেতে থাক, নিজের দিকে ত দর্শন করবার অবসর থাকে না। তুমি যখন তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল বিচার করতে বসে যাবে, তখন কড়ির তেলটুকু যাতে তৈলাধার পাত্রেই থাকে, তোমার বুদ্ধির সঙ্গে মাটিতে ঢেউ খেলিয়ে না বয়ে যায়, তা দেখবার জন্যে একজন পোক্ত অভিভাবকের বিশেষ দরকার। সেটিকে কবে বরণ করে ঘরে তুলছ বল দেখি।

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল—তোমরা বড়লোক তোমাদের সময় বাজে খরচ করাটা মানায়; আমরা গরীব মানুষ সময়টাকে কাজে না খাটালে চলে না। সেই জন্যে কবিত্বের সমস্ত আনুষঙ্গিক উপসর্গ বহন করবার ভার তোমারই থাক; আমরা কড়া ধাতের লোক কঠিন কর্ম্মেই আমাদের আনন্দ। তোমাকেও তা বলে' একেবারে ছাড়ব না; তোমাকেও প্রেয়সীর আঁচল থেকে টেনে টেনে মাঝে মাঝে বা'র করব—এতখানি মূলধন সুদে না খাটিয়ে অমনি পড়ে থাকতে দেবো তা মনেও কোরো না।

তারক গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি চিরকুমার হয়ে কি সংসার ত্যাগ করবে?

নবকিশোর বলিল—কেন কি দুঃখে সংসার ত্যাগ করব?

—সংসারে থাকবে অথচ বিয়ে করবে না, সে কি রকম? না সন্ন্যাসী না গৃহী!

--কেন, সন্ন্যাসী হলেই কি সংসার ত্যাগ করতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি? তারাই ত প্রকৃত সন্ন্যাসী যারা সংসারে থেকে দেশের দশের হিত করে। নিজের যতটুকু জ্ঞানের পুঁজি তাই সকলের মধ্যে বেঁটে দিয়ে ধন্য হওয়াই ত সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণের কাজ। লেখাপড়া শিখে শিক্ষার আনন্দ নিজে স্বার্থপর হয়ে ভোগ করা ব্রাহ্মণের ত কাজ নয়। মা সরস্বতীর বীণার তারে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দরাগিনী বাজে তা যতটুকু তুমি শুনতে পেয়েছ সেই টুকুরই সংবাদ পাঁচজনকে দিলে তবে তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হবে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা ত এই জন্যেই পূজ্য, গুরুর সম্মান পেয়ে আসছেন। এখন প্রত্যেক শিক্ষিত লোক যিনি শিক্ষা প্রচার না করছেন তিনিই এই মহৎ কর্ত্তব্য অবহেলা করে ব্রাহ্মণের সম্মান খর্ব্ব করে তুলছে। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সমাজে একটা গু

দায়িত্ব আছে—শিক্ষিত ধনীর দায়িত্ব আরো বেশি।

বিপিন নবকিশোরের কথার গূঢ় অর্থ বুঝিয়া বলিল—আমার যথাসাধ্য আমি করব। কিন্তু জান ত আমি কি রকম অলসপ্রকৃতির লোক, নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছু করে তুলতে পারি নে। তুমি একটা জোগাড়যন্ত্র খাড়া করে আমার একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ো। আমাকে খাটিয়ে নেবার ভার তোমাকেই নিতে হবে।

নবকিশোর বলিল—আমি একটা মতলব ঠাওরেছি।—প্রথমত পাশাপাশি কতকগুলি গ্রাম ঠিক করে একএকটি মণ্ডল নির্দ্দিষ্ট করতে হবে; প্রত্যেক মণ্ডলে এক একটি পাঠশালা হবে; সেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একত্র পড়বে। পাঠ্যরূপে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকবে না বল্লেই হয়—শিক্ষক মুখে মুখে ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি দেখিয়ে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করবেন; স্কুলের বেতনও হবে নামমাত্র; এতে গরিব লোকেও ছেলে-মেয়ে স্কুলে পাঠাতে অসুবিধা বোধ করবে না। স্কুলে যেমন আয় থাকবে না তেমনি ব্যয়ও করা চলবে না—স্কুল-ঘর, চেয়ার, টেবিল কিছুরই জাঁকজমক থাকবে না। কোনো শুকনো উঁচু ডাঙায় গাছের ছায়ায় স্কুল বসবে—সেকালের মতন মেঘ ডাকলেই অনধ্যায়। শিক্ষকের বাসাতেই একটু স্থান করে স্কুলের বই ম্যাপ প্রভৃতি সরঞ্জাম রাখতে হবে। শিক্ষকও আমাদেরই তৈরি করে নিতে হবে। তুমি মথুরাপুরে বসে রশদ জোগাবে, আর আমি মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন করে বেড়াব। একটু শিক্ষার প্রসার হলে তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ছোট ছোট লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে এবং মথুরাপুরে একটি বৃহৎ কেন্দ্র লাইব্রেরী করে তার বাছা বাছা বই এক একবার সকল লাইব্রেরীকে ধার দিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। দেশের যেখানে যেখানে মাইনর কি ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে সেই গুলিকে পুষ্ট করবে আমাদের প্রাথমিক পাঠশালাগুলি। ছেলেদের মতন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে স্থানে স্থানে পৃথক ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর মেয়ে স্কুলও স্থাপন করতে হবে। লোকে শিক্ষার মর্য্যাদা একটু বুঝলে তখন সমবেত চেষ্টায় চাইকি স্থানে স্থানে এণ্ট্রান্স স্কুলের সমকক্ষ পাঠশালা আমরা স্থাপন করতে পারব। এই কাজটাকে গ'ড়ে তুলতে পারলে তোমার অর্থ ও শিক্ষা ধন্য হবে।

তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল, থিওরি আর প্র্যাক্‌টিসে যথেষ্ট প্রভেদ আছে হে ভায়া! কবিত্বের স্বপ্ন দেখা সোজা, কিন্তু কাজের ল্যাঠা বড় ভারি বোঝা!

নবকিশোর বলিল—নিশ্চয়ই; সেই জন্যেই ত কাজের মূল্য বেশি।

বিপিন তারকের কথা লক্ষ্য না করিয়াই নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করিল—এখন আমরা কাজটা সুরু করে দেবার মতো টাকা কোথায় পাব? বাবা ত এসবের উপকারিতা বুঝবেন না।

নবকিশোর বলিল—তুমি তিনবার পাশ করে' তিনটে তালুক যৌতুক পেয়েছ; এবারে একটা পাবে। এইগুলির স্বত্ব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

বিপিন বলিল—কিন্তু গভর্মেণ্ট কি

তাঁদের-সম্পর্কশূন্য এই শিক্ষাবিস্তার নেক নজরে দেখবেন? আর সরকারী-সম্পর্কের হ্যাঁপা সামলাবার মতন সামর্থ্য ত আমাদের নেই।

নবকিশোর বলিল—না, বড়লোকের ল্যাঠাও বড়, তাদের সম্পর্কে থাকা আমাদের পোষাবে না। আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে হবে। গভর্মেণ্ট জ্ঞান আর শিক্ষা বিস্তারকে একটু ভয়ের চক্ষে দেখে থাকেন। কারণ তাঁরা খৃষ্টান, খৃষ্টানরা জ্ঞানবৃক্ষের ফলকে আদিম মানব আদমের আমল থেকে ভয় করে' আসছেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝতে চান না যে অজ্ঞানের অন্ধকারেই সয়তান লুকিয়ে থাকে! জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষকে সমান করে' তোলে বটে, কিন্তু শত্রু করে না। এই ধর তোমার নিজের বাড়ীতেই অজ্ঞান কি অকল্যাণটাকেই না পোষণ করছে। মালতী জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ করে সে বাড়ীতে ঢুকেছে বলে একেবারে হুলুস্থুল বেধে গেছে।

বিপিন উৎসুক হইয়া বলিল—কেন কি হয়েছে?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—প্রথম কারণ, মালতী বিধবা হয়েও একগাছি চুড়ি আর নরুণ পেড়ে কাপড় পড়ে গিছল। সে কিন্তু গিয়েই সে সব ছেড়েছে—এ ত্যাগ তার সেই অচেনা স্বামীর স্মৃতির সম্মানে নয়, নিজের মনের বৈরাগ্য হতেও নয়, এ ত্যাগ সমাজের জবরদস্তি জুলুমের জন্যে।

তারক আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—যে লোক সমাজে থেকে সমাজের আদর্শ অবহেলা করবে তার ওপর জুলুম করবার অধিকার সমাজের একশ বার আছে...

নবকিশোর তারকের আস্ফালন লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল—দ্বিতীয় কারণ, মালতী শেমিজ পরে; সেটা সে কিছুতেই ছাড়তে পারেনি। তৃতীয় কারণ, সে স্বীকার করেছে যে সে লেখাপড়া জানে। চতুর্থ কারণ, সে তুচ্ছ বিষয়ের আলাপে যোগ দিতে পারে না। পঞ্চম কারণ, সে পুরুষকে দেখে ব্যাঘ্রভল্লুকের পলায়ন করাটাকেই অধিক লজ্জার কারণ মনে করে। এইসব তুচ্ছ কারণে সবাই মিলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে; নির্য্যাতনের অবধি নেই—কেউ তাকে একটি ভালো কথা বলে না; কোনো কাজ ছুঁতে দেয় না; সে অত লোকের মধ্যে একলা পড়ে কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে। বাড়ী গিয়ে তোমার প্রথম কাজ হবে মালতীকে রক্ষা করা। তার পর পরিবারগত কুসংস্কার দূর করে' পুরস্ত্রীদের শিক্ষায় আদর্শে উন্নত করে তোলা। মালতীকে তুমি দোসর করে নিতে পারলে তোমার শ্রম অনেক লাঘব হয়ে যাবে।

তারক বলিয়া উঠিল—খবরদার অমন কর্ম্ম কখনো কোরো না, কোরো না, তোমাদের খৃষ্টানি আদর্শ আমাদের শান্ত অন্তঃপুরে খাড়া করে' আগুন জ্বালিয়ে তুলো না বলছি। তোমরা যা করছ পুরুষেরাই তাতে জ্বলুক, আমাদের কুললক্ষ্মীদের শান্তি নষ্ট করলে তোমাদেরও কল্যাণ হবে না।

বিপিন অসহায়া মালতীর প্রতি নিজের

পরিবারগত অত্যাচার নিজকৃত অপরাধ মনে করিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল,—অকল্যাণের আবর্জ্জনা দূর করতে আগুন যদি জ্বালতে হয় ত জ্বালব; আর অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতে পারি তবে সে আগুনে নিজেরাই পুড়ে মরব—পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়ব।

ভাবপ্রবণ বিপিনকে উত্তেজিত দেখিয়া নবকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—সম্পর্ক ছাড়লে চলবে কেন? মা বোন ত ছাড়বার নয়; তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই পরিবারের মধ্যে নূতন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেত হবে।

বিপিন অল্পক্ষণই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা কিশোর, মালতীর বিয়ে দিলে হয় না?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—পাত্র?

বিপিন হাসিয়া বলিল—তুমি।

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল—আগে মালতীকে একবার দেখ, তারপর পার যদি পরের নাম কোরো।

বিপিন হাসিতে লাগিল। তারক চোখমুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল—এ্যাঁ! তোমরা কি এমনই অধঃপাতে গেছ যে ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে নিয়ে রহস্য! জেনো তোমরা—হিন্দুসমাজ এখনো মরে নি। সেই বিপুল প্রকাণ্ড শক্তিকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে' তুলো না, এতে কল্যাণ হবে না, হবে না, হবে না, এ আমি বলে রাখছি।

তারক আবেগের তাড়নায় বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নবকিশোর ও বিপিনের উচ্চ হাস্য তাহার পশ্চাতে তাড়া করিয়া ছুটিতে লাগিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপের সমর-অভিনেতৃগণ



রাসিয়ার প্রধান সমর-সচিব
(General Soukhomlinoff)

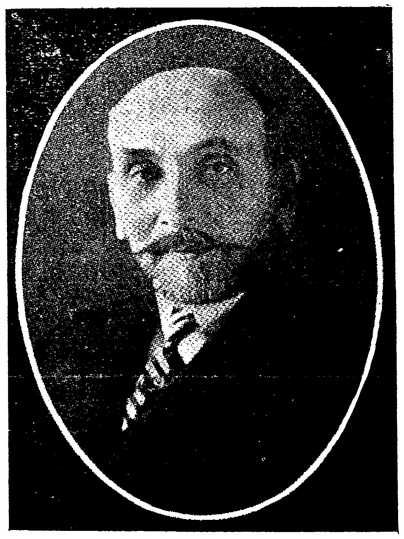

রাসিয়ার বৈদেশিক মিনিষ্টার
(M. Sazonoff)

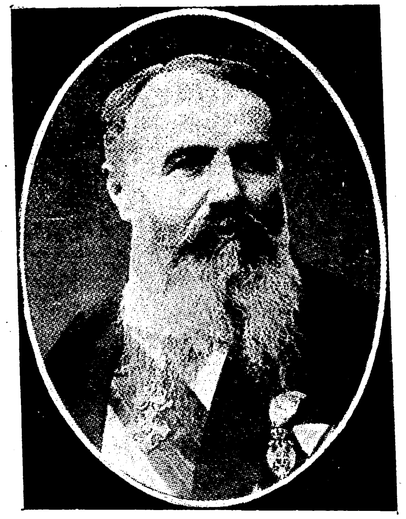

সার্ভিয়ার প্রধান-মন্ত্রী
(M. Pashitch)

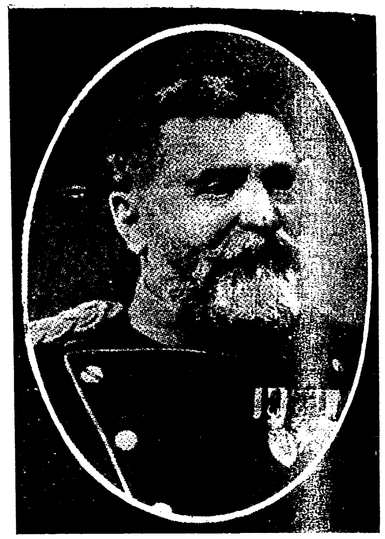

সার্ভিয়ার প্রধান সমর-সচিব
(General Putnik)

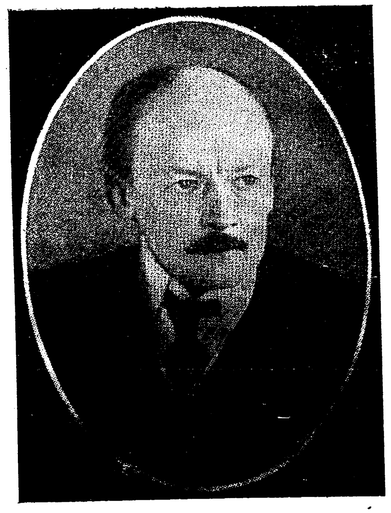

অষ্ট্রীয়ার প্রধান-মন্ত্রী
(Count Berchtold)



অষ্ট্রীয়ার সমর-সচিব
(General Hotzendorf)

রবার্ট ব্রাউনিং

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের একজন ব্যাঙ্ক-কেরাণীর গৃহে রবার্ট ব্রাউনিং জন্ম গ্রহণ করেন। এই ছেলেটি ভবিষ্যতে কিরূপ বিখ্যাত ও বিশ্ববিদিত হইবে তাহা গোড়া হইতে কেহ বলিতে না পারিলেও, ইহার শৈশবের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে ইনি যে ঠিক সাধারণ ছেলে নহেন তাহা বেশ বোঝা গিয়াছিল।

ব্রাউনিংয়ের মাতা ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া গীতবাদ্যে নিযুক্ত হইলে ইনি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া "আরো গাও, আরো গাও!" শব্দে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইঁহার যে শিক্ষালাভ তাহা তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতেই হইয়াছিল। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্য হইতেই তাঁহার হৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক বলা যায় না, কিন্তু মনে হয় যে, স্কুলের বাঁধা-ধরা নিয়ম অপেক্ষা ব্রাউনিংয়ের পক্ষে গৃহশিক্ষাই বেশী উপযোগী হইয়াছিল। ব্রাউনিং তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে কেবল যে উপদেশ ও শিক্ষা পাইতেন তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত আদরও পাইতেন। তিনি পিতামাতার বড় আদরের ছেলে ছিলেন। কিন্তু সে আদরে ব্রাউনিংয়ের কোন ক্ষতি করা দূরে থাকুক, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাউনিং জননীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহার মাতাকে "স্বর্গরাজ্যের রমণী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাউনিংয়ের মাতা যখন বাগানে যাইতেন তখন প্রজাপতিগুলি উড়িয়া আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বসিত; বাড়ীর পোষা পাখী এবং অন্যান্য প্রাণীরা তাঁহাকে তাদের মায়ের মতনই ভালবাসিত। তিনি তাঁহার বাগানের বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীগুলিকে জননী-স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। যখন ফ্লোরেন্সে ব্রাউনিংয়ের নিকট তাঁহার মাতার মৃত্যুসংবাদ যায়—তখন মাতার যত্নপালিত এই উদ্যানের স্মৃতিই ব্রাউনিংয়ের মনকে বিশেষভাবে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল; —এই বাগানে তাঁহার মায়ের সমগ্র স্নেহটুকু যেন জড়ানো ছিল। তাঁহার অভাবে সে বাগানের এখন কি দশা! ব্রাউনিংয়ের পত্নী তাঁহার কোন বন্ধুর কাছে লিখিয়াছিলেন,—"তিনি মাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন ভালবাসা আমি কোথাও দেখি নাই। মাতার মৃত্যুতে শোকে তিনি শিশুর ন্যায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও কোন সময়ে অল্পক্ষণের জন্য আমি বাহিরে গেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। আমি প্রায়ই তাঁহাকে স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য বলি—কিন্তু তিনি বলেন কোথায় যাই? ইংলণ্ড এখন তাঁহার নিকট দুঃসহ বোধ হয়। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে গেলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে, তাঁহার মাতার উদ্যানের সেই সুন্দর গোলাপ ফুলগুলি তিনি চক্ষে দেখিতে পারিবেন না।"

এলিজাবেথ ব্যারেট এবং রবার্ট ব্রাউনিং-

এর প্রেমকাহিনী অনেকেই জানেন। তাঁহাদের প্রথম পরিচয় কাব্যে;—দু'জনেই দুজনের লেখা পড়িয়া মোহিত হন। পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। এলিজাবেথ ব্যারেট তখন রোগে শয্যাগত—শরীর ক্ষীণ দুর্ব্বল, বিবাহের চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় কোনই সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু ব্রাউনিং তাঁহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভবিষ্যৎ পত্নীরূপে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহার হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হন নাই।

এলিজাবেথ ব্যারেট তাঁহার সুন্দর কবিতায় "Sonnets from the Portuguese" —এই প্রেমিকের স্তুতি এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

একখানা চিঠিতে ব্রাউনিং লিখিয়াছেন—"তোমাকে পেয়ে আমার জীবনের সব আশা পূর্ণ হয়েছে! ভগবান করুন—জীবনে যেন তোমার সঙ্গেই থাকতে পাই—মরণে যেন দুজনে এক সঙ্গেই যাই।"

ব্যারেটের পিতা যদিও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন তথাপি তিনি এটা ইচ্ছা করিতেন না যে তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেহ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করে। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল ব্রাউনিংএর প্রতি তাঁহার কন্যার এই প্রেম একটা খেয়াল মাত্র; —কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া যে প্রেম তাহা স্থায়ী হইবে না। সেই জন্য তিনি এই বিবাহে ঘোর আপত্তি করিলেন। কন্যা পিতাকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন; শেষে গত্যন্তর নাই দেখিয়া—পিতার বিনা অনুমতিতেই বিবাহ স্থির করিলেন। তাঁহার পিতার একটা ভুল ধারণার জন্য চিরজীবন দুঃখ ভোগ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ১৮৪৬ খৃঃ ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাদের বিবাহ হয়।

বিবাহের কিছুদিন পরে ব্যারেট তাঁহার বন্ধু মিস্ মিটকোর্ডের কাছে এইভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—"তিনি আমার জন্য সমস্তই করেছেন। আমায় তিনি এত ভালবাসেন কেন এর কারণ আমি নিজেই খুঁজে পাই না। তিনি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এমন করে আমায় ঘিরে আছেন যে মনে হয় আমার জীবন তাঁরই জীবন;—আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। তাঁর অপরাপর গুণের তুলনায়—প্রতিভা, বুদ্ধি নাই বলিলেই হয়—অথচ বিশ্বের লোক তাঁকে ওর জন্যই এত আদর করে। সখি, ভেবে দেখ আমি কত সুখী! এত সুখ যে, মনে হয় এ বুঝি সত্য নয়।—সময় সময় আমি চোখ বুজে ভাবি এ সবই স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন।"

বিবাহের পরে ব্রাউনিং-পত্নীর স্বাস্থ্য দিন দিন আশাতীত উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। একখানা চিঠিতে তাঁহাদের তখনকার ভ্রমণবৃত্তান্ত এইরূপ:—"এমন চমৎকার দৃশ্য, এমন সুন্দর পাহাড়, এমন সুন্দর বন—অনৈসর্গিক নিস্তব্ধতা! দূরে মসীবর্ণের ভূমি। এখানে ঈগল পাখী আছে। রাস্তা নাই বলিলেই চলে। রবার্ট ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত—আমি ও আমার ঝি শাদা বলদের গাড়িতে চড়িয়া যাইতাম। একটু ভয় ভয় করিত অথচ মনে কি এক অপার আনন্দ!"

ব্রাউনিং-পত্নী বলিতেছেন "যদি আমার স্বামীর কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকে তো সে আমার সম্বন্ধে কথায়; আমার কথা উঠিলেই তিনি উৎসাহের সহিত অমনি বলিতে থাকেন আমি তাঁর সঙ্গে কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়াছি, কতটুকু রাস্তা হাঁটিয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি—যেন আমার পায়ে হাঁটিয়া চলাটা জগতের এক মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

ব্রাউনিংয়ের মন সব সময়ই তাঁর পত্নীর জন্য চিন্তিত থাকিত;—তিনি মনে করিতেন হঠাৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সামান্য একটু অসুখ হইলেই তাঁহার ভাবনা হইত এই বুঝি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। যে ১৫ বৎসর তাঁহারা একত্রে কাটাইয়াছেন সে সময় ব্রাউনিং-পত্নী সদাই অধ্যয়ন, খেলা, ভ্রমণ, সন্তান-রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং ইটালীর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা গভীর মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৮৬১ খৃঃ ৬ই জুন ইটালীর প্রধান মন্ত্রী ক্যাভাতুর (Cavour) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রাউনিংপত্নী তাঁহার শেষ চিঠিতে লেখেন—"ইটালীর স্রষ্টা মহাপুরুষ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। যদি অশ্রু ও শোণিত তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত তবে তিনি আমাদেরই থাকিতেন।"

ইহার কিছু দিন পরেই তিনি হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার স্বামী তাঁহার শেষমুহূর্ত্তের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড় মর্ম্মস্পর্শী! "সমস্ত রাত্রি সে এপাশ ওপাশ করিল, তারপর উঠিয়া ঔষধ খাইল—আমার নিকট কত কথা বলিল, তার পর ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি চারি ঘটিকার সময় অবস্থা বড় খারাপ বোধ হইলে আমি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলাম। তার পরের কথা বলিতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, বালিকার ন্যায় সরল মুখে হাসিতে হাসিতে তার মাথা আমার মুখের উপর রাখিয়া সে সুখে ঘুমাইয়া পড়িল।—কোনো কষ্ট, কোনো যন্ত্রণা—কিছু সে পায় নাই। যেমন ছোট্ট শিশুটিকে আঁধার হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া যায়—তেমনি ভাবে ভগবান তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন—ধন্য ভগবান।"

কবির বিবাহিত জীবন ১৫ বৎসর মাত্র; কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যে আমরা কবির সমস্ত জীবনকাব্য দেখিতে পাই। মিস্ ব্যারেটকে না দেখা পর্য্যন্ত অন্যান্য বহু আনন্দের মধ্যে কবি প্রেমকেই উচ্চ স্থান দিয়া আসিয়াছেন। তার পর পত্নী পাইয়া প্রেমই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য হইয়া ওঠে। এই কবি দম্পতীর কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা কর্ম্ম ও প্রেমকে যেন প্রণয়-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন;—কর্ম্ম প্রেমকে মধুর করে, উজ্জ্বল করে, প্রেমের মহিমায় কর্ম্ম মহিমান্বিত, এবং কর্ম্ম না থাকিলে প্রেমও নির্জ্জীব, তাহার প্রাণও নাই মাধুর্য্যও নাই।

মিসেস্ ব্রাউনিং তাঁহার "Aurora Leigh" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন!—

"Beloved, let us love so well.
Our work shall still be better for our love,
And still our love be sweeter for our work."

"Oh! world as God has made it
all is beauty,
And knowing this is love, and
love is duty—
What further may be sought for or
declared!"

পত্নীবিয়োগে ব্রাউনিং দারুণ শোক পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই শোককে তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম দৃঢ়বিশ্বাসে এমনি সবল ছিল যে মৃত্যুও তাঁহার প্রেমকে বিচ্ছেদ-রেখায় খণ্ডিত করিতে পারে নাই। একথা কবির নানা কবিতার মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা একটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম :—

মরণে কি ভয়?

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ যবে, নয়নেতে নামে ছায়া
কুহেলিকাময়,
"পরপার সন্নিকট," জানায় তুষাররাশি
ঘোর ঝঞ্ঝাচয়,
যামিনী ভীষণা, বহে তুমুল ঝটিকা, দূরে
মূর্ত্ত সয়তান
যদিও সম্মুখে রহে, ডরে কি তাহারে বীর?
হয় আগুয়ান।

পথ হয়ে আসে শেষ, বাধা বিঘ্ন চূর্ণ হয়;
আগে রণজয়,
পরিশেষে পুরস্কার. বীরের সকল শ্রম
সফলতাময়।
চিরদিন যুঝিয়াছি, সংসারের ঘোর রণে,
আর একবার
রণমাঝে পশি আজ, সর্ব্বশেষ এই রণ—
শ্রেষ্ঠ সবাকার।
পশিব না লুকাইয়া ভয়ে দৃষ্টি রুদ্ধ করি
মৃত্যুর মন্দিরে,
মহান্ বীরের মত ভেটিব যা নারাশি
সম্মুখ সমরে।
ঘোর রণসন্ধি ক্লেশ সহিয়া, চাহি না দিব
জীবন-সঞ্চয়—
যাতনা আঁধার-রাশি হতাশ, উৎসাহ গত
হয়ে যাবে ক্ষয়।
বীরের মম্মুখে আসি থমকি, ভয়ত
হইবে মঙ্গল,
ফুরাইবে অমানিশা, থেমে যাবে প্রকৃতির
তরঙ্গ চঞ্চল।
উন্মত্ত পিশাচবাণী হয়ে ক্ষীণ ক্ষীণতর
মিশাইবে ধীরে,
আসিবে যাতনা মাঝে শান্তি, আলোকের রাশি
ফুটিবে তিমিরে।
তারপর? তারপর আবার দেখিব, হৃদে
ধরিব তোমায়।
জীবনের অবসানে পরমেশ পদে শান্তি
লভির অক্ষয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাত্মা তারকনাথ পালিত

স্বর্গারোহণ

১

আজি রোগ যাতনার ভয় ভাবনার শেষ,
তাই সম্মুখে তব নব-জীবনের দেশ।
নরলোকে যবে সাঙ্গ কার্য্য
পরলোকে ডাকে তোমা,
কর্ম্মবীরের ক্লান্তি হরিতে
রস আনন্দ ভূমা!

তব বিপুল বিত্তে চিত্তটি অমলিন
ছিল দুখীদের তাহে অধিকার চিরদিন;
সম্মানে হ'য়ে অদ্বিতীয়
ছিলনা দম্ভ তবু,—
তুমি যে রসিক জ্ঞানী পণ্ডিত
করনি প্রচার কভু!

ওগো সখ্যে আছিলে সরল অকৈতব,
চির বিপন্ন পাশে সার্থক নাম তব;
স্নেহ দয়া প্রেমে মহা মহীয়ান্
ওগো ও গোপন দাতা—
তোমার বিয়োগ-দুঃখে এ তাই
মুগ্ধ কবির গাথা!

তুমি বাণী-মন্দিরে স্থাপিলে যে, দানরথ,
এই বিজ্ঞান তৃষা-সলিলের সদাব্রত
পিয়ে তা' গাহিবে হাজার ছাত্র
তব জয় যুগে যুগে,—
রচি' তব তরে অমর স্বর্গ
মনে প্রাণে বুকে বুকে!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২

হে বরেণ্য, পুণ্যকাম, মহাচিত্তবান্,
ব্রহ্মা পাঠাইলা তোমা, সাধিতে কল্যাণ।
স্বর্গভ্রষ্ট কর্ণ পুনঃ জনমিলে তুমি,
কৃতার্থ ভারতকুল, শুদ্ধ মাতৃভূমি।
তেজস্বী, গুণজ্ঞ, গুণী, ন্যায় অবতার,
যুঝিলে অন্যায় সাথে, অশ্রান্ত অবার।
প্রীতি-প্রদ্দীপিত মূর্ত্তি, প্রফুল্ল প্রসন্ন,
যে লভেছে তব সখ্য ধন্য মহাধন্য।
দেশসেবা-মহাব্রত করিয়া গ্রহণ,
সর্ব্ব উপচারে তাহা করি উদ্‌যাপন;
"বাড়ী যাব" বলি যবে হইলে কাতর,
লক্ষ্মী তুলিলেন কোলে প্রসারিয়া কর।
পূর্ণ চন্দ্র ঢালে রশ্মি আনন্দে বিহ্বল—
চলিলে বৈকুণ্ঠে; মর্ত্ত্যে জ্বলে শোকানল।

শ্রী—

মহাত্মা তারকনাথ পালিত তাঁহার পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সমাপন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ক্রমাগত হৃদয়বিদারক আকুলতার সহিত বলিতেন "বাড়ী যাব,—আমি যে বাড়ী হতে এসেছি সেই বাড়ী যাব। এ আমার বাড়ী নয়। বাড়ী যাব—বাড়ী যাব, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।" যে তাঁহার এই নিরতিশয় আকুল প্রার্থনা শুনিত তাহার পক্ষে অশ্রুজল সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

আশ্চর্য্য এই, অন্য অনেক বিষয়ে তাঁহার

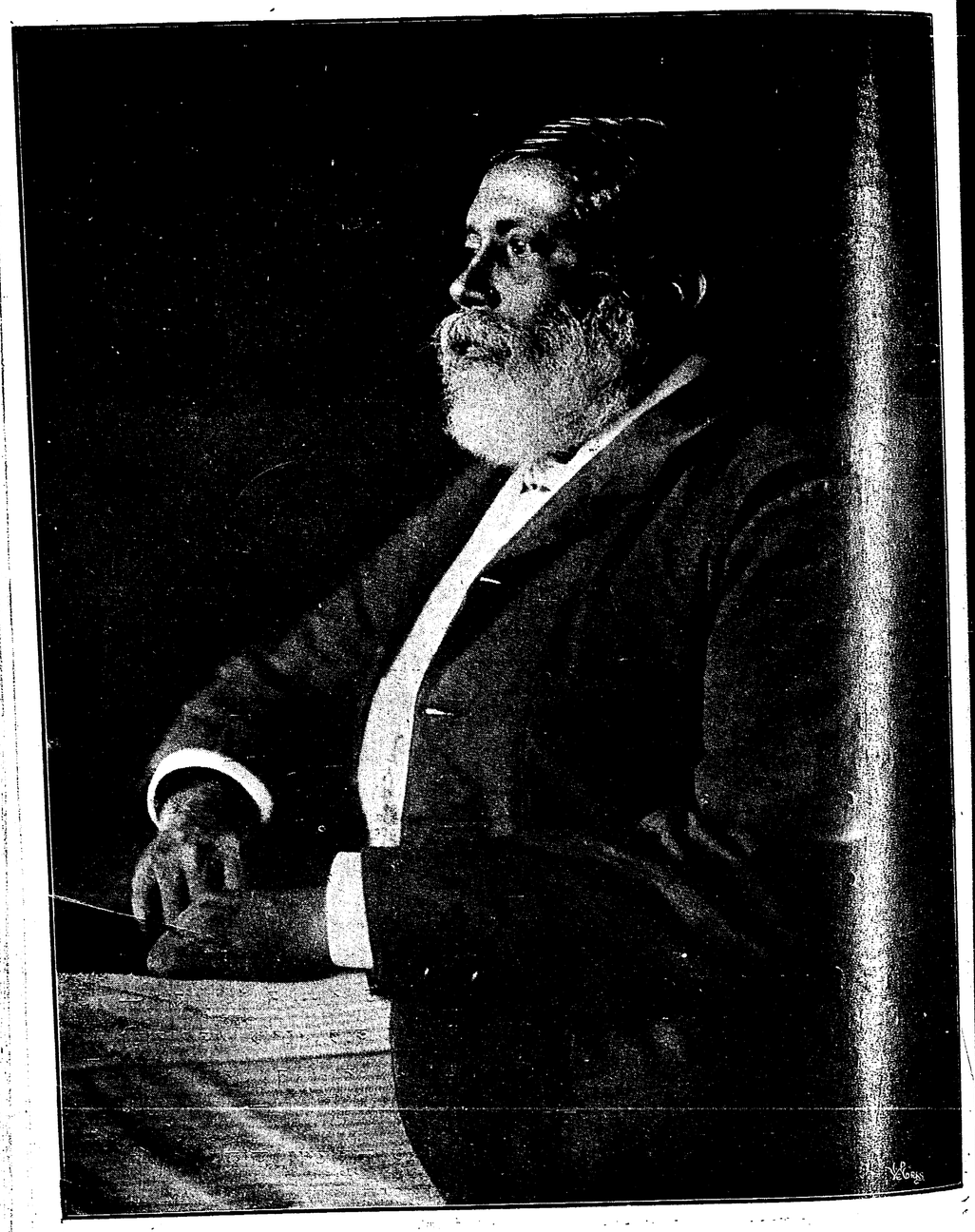

মহাত্মা তারকনাথ পালিত

জ্ঞান ছিল, প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হন নাই।

প্রায় দেখা যায়, বড় লোকের মৃত্যুও যে-সে ক্ষণে হয় না। মৃত্যুদেব যেন ইঁহাকে লইবার জন্য একটি শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। যিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন—তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র,—তাই বিগত পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার দিন স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

২৫ অক্টোবরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ৩রা অক্টোবরে দেহ ত্যাগ করিলেন। আর ২২ দিন থাকিলে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৩ পূর্ণ হইত।

শ্রী—

সমালোচনা

রবিন্ হুড্। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায় প্রণীত। কলিকাতা, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। ইংরাজীতে বীর রবিন্ হুডের কাহিনী অবলম্বনে যে গ্রন্থ আছে, এখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা বেশ সহজ ও সরল; সরসতাটুকুও দক্ষতার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। একবার বহিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, গ্রন্থখানি এমনই কৌতূহলোদ্দীপক। কাহিনীটি যে শিশুহৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিবে, সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় নাই। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে; চিত্রগুলি সুন্দর। ছাপা কাগজও চমৎকার।

ভারতীয় সাধক। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে বুদ্ধ, রামানন্দ, কবীর, নানক, রামমোহন প্রভৃতি সাধকবর্গের কর্ম্মজীবনী, উপদেশ-বাণীসমূহ, এবং ধর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ সরল, আলোচনার পদ্ধতিও যুক্তির সমাবেশে সুনিপুণ। আলোচনায় কোথায়ও একটু গোঁড়ামি নাই,—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এই গ্রন্থে বুদ্ধ, নানক, কবীর ও রামমোহনের চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভালো।

রামায়ণ। (গদ্য-পদ্য) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা, ৮৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে সেন ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য আট আনা মাত্র। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "বঙ্গের অমর কবি কৃত্তিবাস বিরচিত সুললিত রামায়ণ গ্রন্থ অবলম্বনে সুকুমারমতি বিদ্যার্থী বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। কবির রচিত রামায়ণের শ্রেষ্ঠাংশ বাছিয়া ও উহার সহিত সংলগ্ন করতঃ অবশিষ্টভাগ গদ্যে প্রকাশিত হইল।" মূল রামায়ণের সহিত মিল করিয়াই এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে,—শিশুদিগের জন্য রচিত বলিয়া লেখক নেহাৎ অসার ও আজগুবি গল্প ইহার মধ্যে পুরিয়া দিয়া ফাঁকি চালান নাই, ইহাই এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থখানির বিশেষত্ব। গদ্যাংশের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ; তাহার সহিত কৃত্তিবাসের পদ্যাংশ সংযোজিত করায় শিশুদিগের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থের শেষে একটি 'পরিশিষ্ট' প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে পৌরাণিক ও ভৌগোলিক

নামাদির বর্ণানুক্রমিক পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কয়েকখানি ছবিও আছে। ছাপা কাগজ ভাল।

মায়ার শৃঙ্খল। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। ৬, ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, অবসর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি উপন্যাস। বাঙ্গালীর সমাজে কন্যাদায়ের ভিত্তির উপরই উপন্যাস-খানি প্রতিষ্ঠিত। উপাখ্যানে আড়ম্বর নাই, জটিলতা নাই—ঘটনাটি খুবই সাধারণ, তবে বহিখানিতে লেখকের বিকাশোন্মুখ বিশ্লেষণ শক্তির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা মোটের উপর উপভোগ্য। ত্রুটিও আছে—নায়ক মহিমের চরিত্রটুকু ছাড়া অপর চরিত্র-গুলি সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। প্রিয়বালার চরিত্র কতকটা হেঁয়ালির মত রহিয়া গিয়াছে; মায়ালতার চরিত্রে গোড়ার দিকে বেশ খানিকটা দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতেছিল কিন্তু পরিণাম চরিত্রানুরূপ হয় নাই। ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ আছে। তদ্ভিন্ন অনেক স্থলে টানিয়া-বুনিয়া শ্লেষ ও করুণ রস প্রভৃতির অবতারণা করিতে গিয়া রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। এ সকল ত্রুটিসত্ত্বেও বহিখানি আমরা একাসনে বসিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে শুধু ঘটনার কাঠামো বা মুরুব্বিয়ানার নীরস বুলি নাই—লেখক ইহার মধ্যে গোড়া হইতেই বেশ একটু প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী আশাপ্রদ; অনাবশ্যক বক্তৃতা বা বাহুল্য দোষ হইতে তাহা মুক্ত। চর্চ্চা রাখিলে লেখকের পাকা-হাতের লেখা উপন্যাস সুন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এবং সেই আশা করা যায় বলিয়াই কয়েকটি অপ্রিয় কথাও এ গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম। ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

আগুনের ফুল্‌কি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রস্পার মেরিমে প্রণীত 'কলোবা' নামক উপন্যাসের মূল ফরাশী হইতে অনূদিত। গত বর্ষের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বাহির হইল। 'কলোবা' উপন্যাসখানি ফরাশী সাহিত্যে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন। চারুবাবু তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার কলাসাহিত্য বিভাগটিকেই শুধু উজ্জ্বল করিলেন না, বাঙ্গলা উপন্যাসের রাজ্যে অভিনব বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি করিলেন। বহিখানি আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, উপাখ্যানের অভিনয়ত্বে, বর্ণনার মাধুর্য্যে ও অনুবাদের কৃতিত্বে 'আগুনের ফুল্‌কি' এমনই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, বিদেশীয় পাত্রপাত্রী বলিয়া আমাদের চিত্তে কোথাও একটা বাধা লাগে না—দেশকালপাত্র নির্ব্বিশেষে মানবচিত্ত সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন, উপন্যাসখানি পাঠ করিতে বসিয়া এই সরল সত্য সম্যক ভাবে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এ গ্রন্থপাঠ করিয়া উপন্যাস কি, উপন্যাসের বিশেষত্ব কোথায় তাহা যদি বাঙ্গালী পাঠক বুঝিতে পারেন, তবেই বুঝিব চারুবাবুর এ অনুবাদ-পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ চমৎকার—আকারও দীর্ঘ—সে হিসাবে মূল্য সামান্যই হইয়াছে।

অকল্পিতা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—সেগুলি ভাবে পবিত্র, ভাষায় উজ্জ্বল, আন্তরিক সৌন্দর্য্যে ঝলমল। কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও তাহাতে পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই—সেগুলি বেশ স্বচ্ছ সরল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

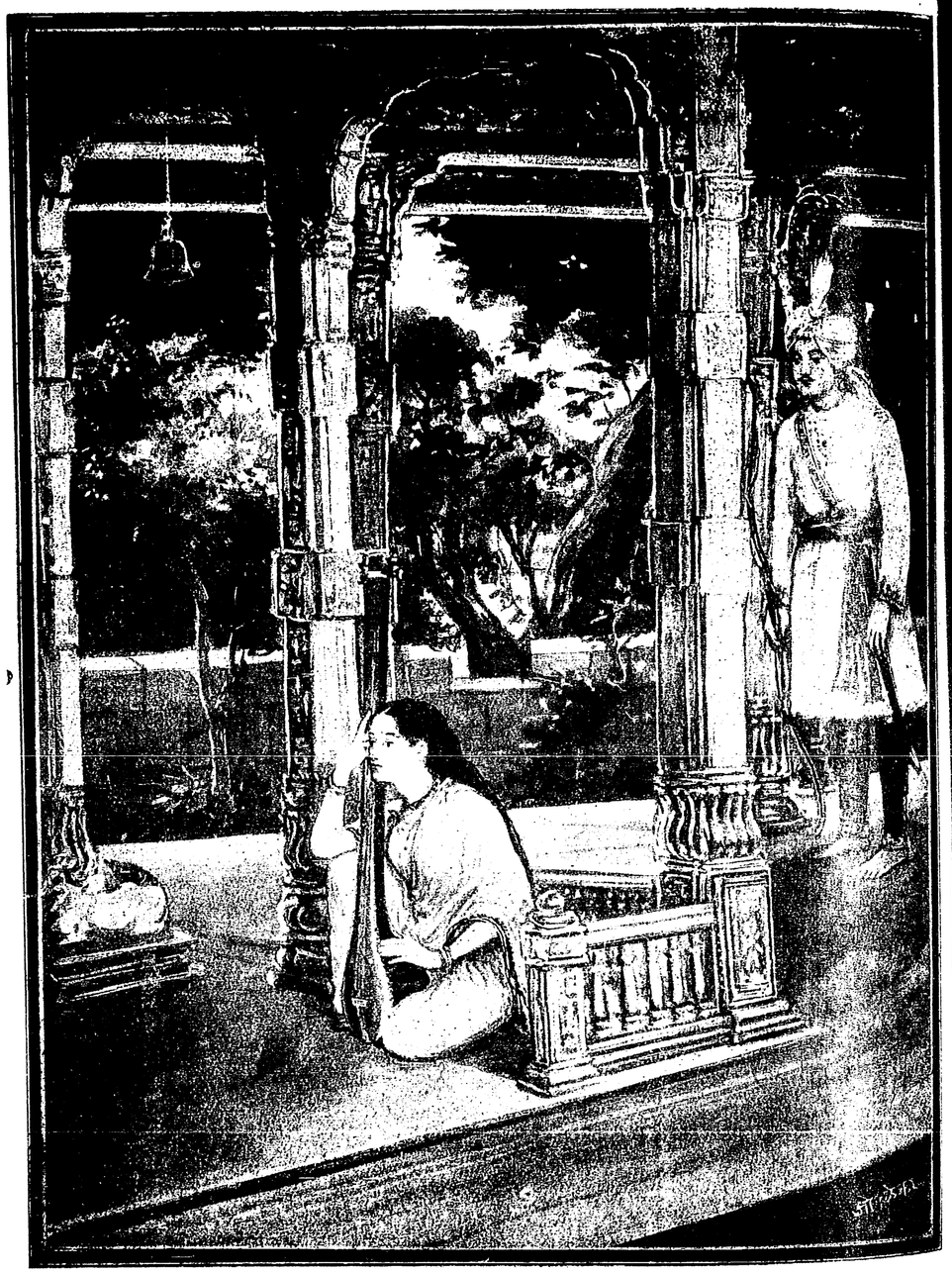

Manoranjan Press, Bombay.

মহাশ্বেতা

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২১ [৮ম সংখ্যা

লাইকা

(২১)

যখন বর্ষণক্ষান্ত উষার মৃদু আলোক দ্বার ভেদ করিয়া গৃহপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল সেই সময় বারির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সাবিত্রী তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল!—পাশের বটগাছে কোন কোন নীড়ে পাখীরা তখন জাগরিত হইয়াছে,—ময়না শিশু কিচিমিচি বাধাইবার উপক্রম করিতেছে,—কাকের বাসার আলস্যক্ষীণ কাকা শব্দও শোনা যায়। অনতিদূরে গ্রাম্যপথে দুই একটি পথিকের যাত্রাজনিত ব্যগ্রকণ্ঠ ও পদধ্বনি শুনিয়া বারি উঠিবার চেষ্টা করিল, নদীতীর জনপূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদিগের স্নানাদি অভ্যাস ছিল।

সে মৃদু মৃদু ডাকিতেছিল,—"দুর্গা দুর্গা! মাগো, দুর্গতিহারিণি!"—এমন সময় দ্বারে আঘাত পড়িল!—সাবিত্রি!—সাবিত্রি! এখনও ঘুমাইতেছ?"

একি! এ যে সন্ন্যাসিনীর স্বর! সাবিত্রীকে ঠেলিয়া দিয়া বারি উঠিয়া পড়িল। সানন্দে দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"একি মা!—এত শীঘ্র?—"এত শীঘ্র তুমি ফিরিলে?"—

তিনি একটু হাসিলেন,—"হাঁ মা প্রয়োজন আছে! সাবিত্রী কৈ?"—

"এই যে।" বলিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন—

"যাও শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য শেষ কর—আহারাদি করিয়াই তোমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে।" সাবিত্রী প্রশ্ন করিল,—"কোথায়? বারাণসী?"—

উত্তর হইল,—"না, পরে জানাইতেছি! এখন সত্বর রন্ধনাদির ব্যবস্থা কর!"

তাহাদের সহসা প্রস্থানের কথায় রাণী ঠাকুরাণী দুঃখিত হইলেন,—আর মীরা ললিতা দয়া লক্ষ্মী প্রভৃতি যুবতীরা মহা হুলুস্থুল বাধাইল! এত শীঘ্র লইয়া যাইবার যদি ইচ্ছা ছিল তবে কেন তিনি তাহাদিগকে এখানে আনিয়াছিলেন! —আবার ক'দিনে ফিরিবেন,—ফিরিবার সময় তাহাদের বাটীতে ক'দিন থাকিবেন ইত্যাদি প্রশ্নে সন্ন্যাসিনীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সাবিত্রী বারিও যেন ম্লান হইয়া পড়িল।

দুই দিন পথে কাটিল। প্রথম প্রথম সাবিত্রী একটু উৎসুক ছিল তাহার পর আর গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে সে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিল না। তাহারা ত চিরদিনই এমনি পথে পথে ঘুরিয়াই বেড়ায় —তাহাদের আবার স্থান অস্থান নাম ধামের প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দীন সন্ধ্যায় এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে তাহারা বসিয়াছিল। সন্ন্যাসিনী ঈষৎ চিন্তাক্লিষ্ট হাসির সহিত বলিলেন—"সাবিত্রী! আমরা কোথায় আসিলাম জান?"

হাসিয়া সাবিত্রী বলিল "না মা! এগ্রামের নাম ত আমি জানি না! দূরে যে ঐ বড় বড় বাড়ী দেখা যায়—উহা কি কোন নগর?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ ওখানে একজন ধনবান সদাগর বাস করেন! আর ওই নগরেই এখন লাইকাও আছে! আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমাদের আনিতে গিয়াছিলাম!"

সাবিত্রী চমকিত উচ্চস্বরে বলিল—"লাইকা?—মা! সত্যই লাইকা!"

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ,"—

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল,—"আছেন ত এখনও?"

"হাঁ আছে। থাকিবে বলিয়াই ত দৌড়িয়া গিয়াছিলাম, নতুবা অন্য উপায় করিতাম। কিন্তু তোমরা ব্যস্ত হইও না, এইখানে কোথাও থাক, আমি দেখিয়া আসি সে আছে কিনা!"

ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রী বলিল, "তবে যে বলিলে নিশ্চয় আছে!"

"আছে বৈকি। তবু একবার দেখিয়া আসিব। তোমরা সাবধানে থাকিও।"

তিনি চলিয়া গেলে সাবিত্রী ডাকিল,—"বারি!"

বারি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল। তাহার উত্তর না পাইয়া সাবিত্রী নিকটে আসিল। আবার ডাকিল "বারি-বহিন্?"—

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না, উত্তর না পাইয়া ভীত ভাবে সাবিত্রী তাহার হাত ধরিল,—হাত অবশ শীতল! মাথায় কপালে দারুণ উত্তাপের সহিত দরদর ঘর্ম্ম ঝরিতেছে! একটু নাড়া পাইয়াই অবসন্ন ভাবে সে শুইয়া পড়িল!

একি হইল? কাতর কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল, "ও বারি! বারি!—একি করিলি দিদি? তুই এমন হইলি কেন?" পরে দেখিয়া দেখিয়া সে বুঝিল বারি মূর্চ্ছিত—তখন তাহার লুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(২২)

সন্ন্যাসিনীর ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইল না,—ততক্ষণে বারিরও চৈতন্য হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকাতরে সাবিত্রী বলিল, "ও মা! তুমি ত চলিয়া গেলে,—কিন্তু আমি যে তোমার বারিকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম!—"

বলিয়া বারির কথা সমস্ত বলিতে লাগিল।

শুনিয়া সন্ন্যাসিনীর মুখও বিষণ্ণ হইল,—ক্লান্তদেহা শায়িতা বারির মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"কেন মা! আজ এমন কাতর হইলে কেন? তোমাকে ত আমি

চিরদিনই বলিষ্ঠা সহিষ্ণু স্ত্রীলোক বলিয়াই জানি!"

ধীরে ধীরে বারি বলিল, "জানি না ত মা! কেন এমন হইল তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না? বোধ হয় খুব বেশি চলিয়াছি —কিম্বা কি যে হইল!"—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই বারি নীরব হইল,—তখন সাবিত্রী আপন মনে বলিতে লাগিল,—"হইবে না কেন? শরীরের অপরাধ কি? সে কি কখন এত কষ্ট সহিয়াছিল? এমন খাইবার ক্লেশ শুইবার ক্লেশ—এত পথশ্রম সহ্য করা কি এই দুর্ব্বল শরীরের কায?"

ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, —"ভয় নাই, চিন্তিত হইও না; কিন্তু বারি! কাল কি তুমি লাইকার কাছে যাইতে পারিবে?"

বারি কিছু বলিল না,—তখন সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন,—তাহাকেও অসুস্থই দেখিলাম,—এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে আর সে লাইকা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না! এদিকে বারির এই অবস্থা,—কি করিয়া যে দুজনকে একা রাখিয়া যাইব তাহাই ভাবিতেছি!"

বারির নিশ্বাসের শব্দ যেন থামিয়া গেল! সাবিত্রী বলিল, "লাইকার আবার কি অসুখ হইয়াছে?

সন্ন্যাসিনী বলিলেন "তাহা এমন বিশেষ কিছু নয়; বারি, তুমি ভাবিও না। যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে তাঁহার মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শরীরও সেই জন্য ভাঙ্গিয়াছে। খুব সম্ভব এতদিনে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারের জন্য কিছু ব্যথা পাইতেছে, আমি ত তোমাদিগকে জানাইয়াছিলাম যে সে কাহাকেও কষ্ট দিতে পারে না! সম্ভবত এ দেশের এত নিকটে যখন আছে—তখন বারির মৃত্যুর জনরবটাও শুনিতে পারে!"

সাবিত্রী এইবার হাসিল,—বলিল, "তার পর? এখন কি করিতেছেন তিনি?"

"এখন ত তাহাকে সন্ন্যাসীর বেশেই দেখিলাম, কিন্তু আচার ব্যবহার ঠিক্ সন্ন্যাসীর মত নয়,—আহা সাবিত্রি! হাসিস্ না মা! দেখিলাম সেই বালকের মত সরল কোমল স্বভাবই আছে—কিন্তু সে আনন্দ উৎসাহ বা চঞ্চলতা নাই! পরের দুঃখে তেমনি কাতর—কিন্তু সে শক্তি বা সাহস নাই! সেই নব দেবদারুর মত সুন্দর শরীর এই যৌবনেই যেন জরাগ্রস্ত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে! যে জন্যই হোক, যে অতিবড় পাষাণ,—লাইকাকে দেখিয়া তাহার চক্ষেও জল আসিবে!"

তখন তাড়াতাড়ি সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, —"তাহাত হইবে! কিন্তু বারি,—এখন হইতেই তুই চোখে জল আসাটা কিছু সম্বরণ কর দেখি! এই দেখ ত মা! তোমার সহিষ্ণু বারি কাঁদিয়া আমার কাপড় ভিজাইয়া দিল।"

সন্ন্যাসিনী সস্নেহে বারির হাত ধরিয়া বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! তোমার কোন ভয় নাই, কোন আশঙ্কা নাই! তোমার এই কঠোর তপস্যার পুণ্যেই তোমার সকল অমঙ্গল দূর হইবে! কিন্তু এইবার আবার তোমার শক্তির সাহসের পরিচয় দিবার দিন আসিয়াছে,—যে সাহসে একদিন তুমি

রাজপুরী ছাড়িয়া স্বামী অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলে আজ আবার সেই বলে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কাতর স্বামীর অনুগামী হইতে হইবে!"

বারির নয়নের জল শুখাইয়াছিল।—তাহার চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে সাবিত্রী বলিল, "আমিত সেই ভাবিয়া মরিতেছি যে তুমি কি বলিয়া বারিকে লাইকার নিকট লইয়া যাইবে ও কি বলিবে গিয়া—যে "ওগো! এই লও তোমার স্ত্রী লও!"

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন, বলিলেন, "পাগল! তাও কি হয়? সে সকল কথা পরে হইবে, এখন তুমি বারিকে কিছু খাওয়াইবার উপায় দেখ দেখি!

সাবিত্রী বলিল,—"ঠিক্ বলিয়াছ! খানিকক্ষণ আগে একজন গোয়ালিনী আমাকে দুধ দিয়া গেল,—তুমি বুঝি পাঠাইয়াছিলে?"

"হাঁ, আমি বুঝিয়াছিলাম যে বারি যেমন ক্লান্ত ও কাতর হইয়াছে, তাহাকে কিছু বলকারক খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন, তুমি উঠ সাবিত্রী শীঘ্র সেই দুধ আনিয়া বারিকে দাও।"

সাবিত্রী উঠিয়া গেলে ধীরে ধীরে বারি বলিল, "তাঁহার কি কোন বেশি অসুখ দেখিলে মা?"

প্রসন্ন চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"না না,—অসুখ ত কিছুই দেখিলাম না! কেন তুমি উদ্বিগ্ন হও? পীড়া দেখিলাম না কিছু শরীর ভগ্ন, সে দিব্য হাসিতেছে, কথা কহিতেছে—তবে বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে সে হাসিতে প্রাণ নাই, কথায় উদ্দীপনা নাই। তাহাতেই ভাবিলাম ইহা কোন গুপ্ত মানসিক ব্যথা!"

বারি আর কিছু বলিল না। সাবিত্রীর দত্ত দুগ্ধ পান করিয়া নীরবে শয়ন করিল। সাবিত্রী হাসিয়া বলিল—"হইয়াছে ভাল! তুই লাইকার সেবা করিবি না, সে-ই তোর জ্বালায় মরিবে! মা! তুমি কেমন করিয়া বল যে কালই বারিকে লইয়া যাইবে—এখন একলা পড়িলে কি এ বাঁচিবে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন। তাহার পর সকলে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিতেই সাবিত্রী দেখিল সন্ন্যাসিনী তখনও ঘুমাইতেছেন কিন্তু বারি উঠিয়া বসিয়া আছে। মুখখানিতে যথেষ্ট উদ্বেগের চিহ্ন, বৃক্ষকাণ্ডে ভর দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। সাবিত্রী যে চাহিল তাহা তাহার চক্ষে পড়িল না, দৃশ্যমান আকাশ বা বৃক্ষশিরেও যে তাহার হৃদয় যুক্ত এমনও বোধ হয় না!

তাহার চিন্তার গাঢ়তা ও বিষাদপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া সাবিত্রী অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। আহা, কি আশা নিরাশায় তাহার হৃদয় এখন উদ্বেলিত! কতখানি লজ্জা ও অনুরাগ এখন যুগপৎ তাহাকে পীড়িত করিতেছে? চোখের কোলে কালি, মুখে স্পষ্ট বেদনার ক্লান্তি, তথাপি একটা উৎকণ্ঠার, অধৈর্য্যের চাঞ্চল্যে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন অধীর হইয়া আছে! একবার চকিতে সাবিত্রী ইহাও ভাবিল যে—"যদি লাইকা ইহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়! সঙ্গে রাখিতে বিরক্ত হয়—তখন বারির চিত্ত—"

কিন্তু এ কথাটাকে সে মনে স্থান দিতে পারিল না;—মনের ব্যথা চাপিয়া কৌতুক হাস্যে বলিল,—"ভাল ভাল! রাত্রিতে ঘুম হইয়াছিল? আর একটু পরেই ত সব মায়া কাটাইয়া বরের কাছে যাইবি—এখন না হয় একবার এদিকে ফিরিয়াই তাখ না ভাই!"

লজ্জিত ভাবে ফিরিয়া বারি বলিল;—"তাই বুঝি। আমি ঘুম ভাঙ্গিয়া তোমায় নাড়িলাম তুমি উঠিলে না,—তখন আমি আর কি করিব? জানত আমি থামোথা শুইয়া থাকিতে পারি না! উঠিলে কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ! যখন তুই 'লাইকা লাইকা' করিয়া নাম জপ করিতেছিলি!"

তাহার অঙ্গ পীড়ন করিয়া বারি বলিল,—"কি মিথ্যাকথাই বলিতে পার তুমি! নাম আবার জপ করিলাম কখন?"—

"জপিস্ নাই? সেই যে—"

আর বলা হইল না সন্ন্যাসিনীও জাগরিতা হইলেন। দুর্গা স্মরণ করিয়া বলিলেন,—"বারি কেমন আছ বল দেখি? শরীরে এখন কোন গ্লানি আছে কি?"

মুখ নীচু করিয়া বারি বলিল, "বুঝিতে ত পারি না মা!"

অতি মৃদুকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল,—"তা কেন বুঝিতে পারিবে?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "শীঘ্র স্নানে যাও, আমি আজ আর একবার লাইকাকে দেখিয়া আসিয়া তাহার পর তোমার ব্যবস্থা করিব।"

সাবিত্রী পূর্ব্বের ন্যায়ই বলিল,—"কেন আবার মুখ শুখাইল কেন? একটু বিলম্বও কি সহ্য হয় না?" সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দূরে বসিয়া ঝোলার ভিতর হইতে বস্ত্রাদি বাহির করিতেছিলেন,—তখন অতি মৃদু তর্জ্জন ভাবে বারি বলিল, "তোর কি সব সময়ই পরিহাস দিদি।"—অন্যের অশ্রাব্যস্বরে সাবিত্রী বলল—"সময়? সময় আর কৈ ভাই? কতটুকু আর তুই আমার কাছে আছিস? আর সত্য কথা বলি, পরিহাসেরই বা এমন দিন কটা মেলে বল্?"

বারি সাবিত্রীর পরিহাস এবং কথার ভিতরের গুপ্ত শিশিরকণার আভাষ বুঝিল। সাবিত্রীর প্রতি চাহিতেই তাহার চক্ষুও বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আর কোন কথা হইল না, সন্ন্যাসিনীর দ্বিতীয় আদেশে দুইজনই নিকটের নির্ঝরজলে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

(২৩)

"শোন বারি!"

উহারা রাজপথের অনতিদূরে শ্যামল পত্র বহুল একটী গুল্মান্তরালে বসিয়াছিল, সন্ন্যাসিনীর আহ্বানে দুইজনেই তাঁহার নিকটে আসিল। সাবিত্রী প্রশ্ন করিল, কি দেখিলে মা?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ভালই দেখিলাম! কিন্তু মা বারি! এইবার তোমায় কিছুদিন পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে বোধ হয়!"

"ছদ্মবেশ?" বারির চমকিত প্রশ্নের সহিত সাবিত্রীও বলিয়া উঠিল—"পুরুষের ছদ্মবেশ?"—

"হাঁ পুরুষের ছদ্মবেশ! আমি সাহস করিতে পারিলাম না লাইকার নিকট তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে, মাত্র এইকথা

বলিয়াছি যে একটি নিরাশ্রয় বালক আমার কাছে উপস্থিত কিন্তু আমি রাখিতে পারিব না, আর ঠিক্ তোমার ন্যায় প্রকৃতি বলিয়া সে তোমারই সেবা করিতে চায়—অতএব তুমি তাহাকে সঙ্গে লও! এ কথাতেও সে ইতস্তত করিয়াছিল তাহার পর,—আমাকে ভার মুক্ত করিবার জন্যই হোক্ অথবা যে কোন কারণে সে এখন সম্মত হইয়াছে!"

বারি বলিল, "আমার প্রকৃত পরিচয় দিতে সাহস কেন করিলেন না মা?"—

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"সাহস করিলাম না কেন? তবে শোন বারি! লাইকাকে আমি বুঝিতে পারিলাম না এবার! সম্প্রতি তাহার হৃদয় যে কোন পথে চলিয়াছে তাহা আচরণে কিছুই বোঝা যায় না, যদি স্ত্রীলোক সঙ্গে লইতে অসম্মত হয়—কিম্বা—"

সন্ন্যাসিনী নীরব হইলেন। বারি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তবে তাঁহার অপ্রীতিজনক কাজ করিতে আমি যাইব কি—মা?"

চিন্তাপূর্ণ চক্ষুদ্বয় তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"আমিও ও কথা ভাবিয়াছি মা! যদিই বা অপ্রিয় হয়—কিন্তু স্ত্রী পরিত্যাগের তাহার কি অধিকার আছে? সে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নয়,—কোন ব্রতধারীও নয়,—তবে পরিব্রতা পত্নীকে চিরজন্ম শোক সাগরে ভাসাইবার প্রয়োজন কি তার? শুধু কোন মিথ্যা আশঙ্কায় সে রাজভবনে প্রবেশ করে না,—নতুবা তুমিত বলিয়াছিলে যে,—সে তোমাকে আনিতে গিয়াছিল! কিন্তু আমি যে এখন সহসা তোমাকে স্বমূর্ত্তিতে লইয়া যাইতে পারিতেছিনা তাহার কারণ এই যে যদি প্রথম হইতেই সে তোমার প্রতি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয়,—সেই জন্য! এখন তুমি এইভাবে তাহার কাছে থাক গিয়া, পরে তাহার স্বভাব আচরণ ও মনোভাব বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করিও!—"

বারি ভাবিতেছিল—"সত্য! তাঁহার বাধাস্বরূপ বা কষ্টকর হইলেও হইতে পারি বটে। তাহাই সম্ভব! যদি তাই হয়?" তখন তাহার অন্তরের দ্বার সহজে মুক্ত করিয়া কে বলিল যেন—"যদি তাই হয়! তাহা হইলেই বা এত ভয় কি! এমন ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন যে বহিয়া চলিতে হইবেই এমন প্রতিজ্ঞাও ত নাই! ছিছি! এখনও ভবিষ্যৎ চিন্তা?"

কিন্তু সন্ন্যাসিনীর বাক্যাবসানে সাবিত্রী বলিল, "আর যদি দেখে লাইকা যথার্থই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট তবে?"

তখন সবেগে বারি বলিল,—"তখনকার কথা তখন দিদি! এখন মা যাহা বলিলেন তাহাই ভাল!"

তাহার কথায় সন্ন্যাসিনী যেন বিস্মিত হইলেন, 'বলিলেন "না মা! তাহা নহে,—এবিষয়ে তুমি এখনও ভাবিতে পার,—বিবেচনা করিয়া যদি—"

বাধা দিয়া বারি বলিল, "বিবেচনা আর কি করিব মা? আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই ভাল!"

সন্ন্যাসিনী বারির শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন—"ইহা তোমার মনোমত হইয়াছে ত? ভাল, তোমরা ঐ ঝোপের কাছে থাক গিয়া, আমি তোমার ছদ্মবেশের সমস্ত আয়োজন লইয়া যাইতেছি।"

পথ পার্শ্ব বহিয়া নামিয়া তাহারা সেই সমনিম্ন ভূমিখণ্ডে আসিয়া বসিল। অন্য পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝর জলধারা গড়াইয়া আসিয়া সেইস্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে; অন্যত্র অপেক্ষা সেইগুলি যেন অধিক তৃণ সমাচ্ছন্ন—লতাগুল্মবহুল। বর্ষাপুষ্ট ঘনশ্যামকান্তি একটি প্রকাণ্ড জামগাছ স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই তলে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে তাহারা আসিয়া বসিল।

বসিয়াই সাবিত্রী বলিল,—"তাহার পর বারি। এইত সাক্ষাতের শেষ! একটি কথা বলিব কি?"

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল বটে কিন্তু বারির মুখ ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতেছিল। সে অস্পষ্ট ভাবে বলিল,—"কেন বলিবে না ভাই? তুমি—"

বারির স্বর রুদ্ধ প্রায়! তখন সাবিত্রী বলিল, "পরে—পরে একটুখানি পরে রে বারি! আমার কাঁদিবার যথেষ্ট সময় আছে—প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব! কিন্তু একটি কথার উত্তর তুই সত্য বল দেখি,—তুই এখন কি ভাবিতেছিস্? বল বারি! তোর মনে এখন কি হইতেছে?"

বারি স্থির ভাবে দূরের তৃণশিরে বায়ুর খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল,—"বলিব দিদি! সংসারে একা তোকেই সে কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—জিজ্ঞাসা করিলি বলিয়া নয়—আমারই হচ্ছা হইতেছিল যে যাইবার সময় একবার তোকে সব—আমার সব কথাগুলি বলিয়া যাই। কিন্তু বড় বেশিকথা যে ভাই! তোকে অনেক বলিয়াছি তবু দেখিতেছি আজ—যেন সব কথাই বাকী আছে বলিতে! কতটুকু বলিব আর! দিদি! ভাই! তবু যা বলিব আর যা না বলিব সবটুকু তুই বুঝিয়া নিস্ আজ!"

বারি উঠিয়া সাবিত্রীর আসন প্রস্তরে আসিয়া বসিল,—ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে দুইজনের স্থান হয় না,—পরস্পরে জড়াইয়া যেন এক হইয়া বসিল!

তাহাদের মাথার উপর দিয়া জলপূর্ণ মেঘ খণ্ডে খণ্ডে ভাসিয়া যাইতেছিল,—বাতাসে সিক্ত বন-ভেষজের আরণ্য পুষ্পের-মিশ্র সুগন্ধ! ক্বচিৎ বহুজলভারাবনত মেঘস্তূপ বাত্যাহত হইয়া স্তম্ভিত কাতর হৃদয়ের দুই একবিন্দু জল তাহাদের মাথায় বর্ষণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এসকলে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না,—নদীতলশায়ী শিলাখণ্ডের ন্যায় আবেগদৃঢ়তায় সাবিত্রী পাষাণের মত স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল—আর সহসা বেগমুক্ত তুষারখণ্ডমিশ্র নির্ঝর ধারার ন্যায় বারির হৃদয়াবেগময় কণ্ঠস্বর-যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আহত করিয়া—চলিতে লাগিল!

বারি বলিতেছিল,—"আর একবার প্রশ্ন কর দিদি! আমার মনে এখন কি হইতেছে একথা আর একবার বল! জানি না আজ কেন আমার কথা বলিতে এত সাধ হইতেছে! আজ আমায় জিজ্ঞাসা কর একবার—; কেন আমি পিতামাতার স্নেহ—রাজসংসারের সুখ-নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—বিশ্বস্ত আশ্বাস—সকলি ত্যাগ

করিয়া নারীজন্মের বিভীষিকার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম? আবার তোর এই মর্ম্মান্তিক স্নেহ—ইহাই ত্যাগ করিয়া এখন যে আমি কোথায় যাইতেছি তাহারই স্থির কি? জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে কেবল ইহা ভাবিতেছি যে আমার অদৃষ্ট এমন কেন? মন আপনার বসে চলেনা কেন! সুখ যদি হারাইয়াই থাকি তাহার জন্য এত হায় হায় ই বা কেন করি?"

এই খানে বারি একটু থামিল,—কিন্তু সাবিত্রী কথা বলিল না। তখন আবার সে বলিতে লাগিল। "প্রাণ যেন অসহ্য হইয়াছিল দিদি! পৃথিবীতে কোথাও তাহার কোন আভাষ দেখিতে না পাইয়া এই পৃথিবীই আমার পক্ষে কণ্টকসম হইয়া গিয়াছিল! তাই বড় কষ্টে,-ও দিদি, তোরা কেউ একটু বুঝিস্ কত কষ্টে আমি আসিয়াছিলাম! মরিতেই যখন হইবে তখন একবার শেষ চেষ্টা আত্মহত্যা-পাপের হাত হইতে বাঁচিবার—জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম!

এইবার সাবিত্রী অতি অস্পষ্টভাবে বলিল, —"চুপ"!

বারী বলিল,—"না—শোন! আজ আমার বোধ হইতেছে যেন আমার সব ফুরাইয়াছে!—আমার সব কায শেষ হইয়া গিয়াছে,—বুঝি জীবনের শেষও দেখিতে পাইলাম দিদি!—আর এ পথের মাঝে তোদের কাছে দাঁড়াইব না ভাই?—আমার স্রোতের মুখে আর তুই ভাসিয়া উঠিস্ না স্নেহময়ী!—আমাকে লুকাইতে দে একেবারে চির অন্ধকারে আমি মুখ ঢাকিয়া ফেলি!—তার পূর্ব্বে দুটি কথা।—তোকে, দিদি—কেবল তোকে—"

বারি আর বলিতে পারিল না,—সাবিত্রীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সাবিত্রী বুঝিল কার্য্য ভাল হয় নাই!—চোখের জল চোখে রাখিয়া ঈষৎ তর্জ্জন স্বরে বলিল—"ওকি রে বারি! কি বলিতেছিস্ তুই?—পাগল হইবি নাকি? তুই কি ভাবিতেছিস লাইকা তোকে গ্রহণ করিবে না? কেন অত কথা বলিতেছিস্ বল দেখ? আঃ বহিন আমার! তোর কষ্ট, এত কষ্ট! এ যদি বিফলে যায় তবে ভগবান—"

"হাঁ সর্ব্বাগ্রে এই কথাই স্মরণ করিও তোমরা যে, ভগবান দয়াময়! নিজের কষ্ট বড় অধিক বলিয়া বোধ হইলে জগতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিও যে তোমার অপেক্ষাও দুঃখী লোক কত বেশি! তাহাদের তুলনায় নিজের সুখ স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও তাহা হইলে সংসারে আর কোন দুঃখ পাইবে না।"

সাবিত্রী ও বারি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনীরও চোখে জল—তিনি কি তাহাদের সব কথা শুনিয়াছেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ডারুইন

ক্রমবিবর্ত্তন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

১৮৫৯ সালে ২৪এ নভেম্বর তারিখে বিশ্ববিশ্রুত "উপগণের উৎপত্তি" (origin of species) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবং সেই দিনই যত কপি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল (১২৫০ কপি) সমস্তই বিক্রীত হইয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর ক্রমবিবর্ত্তন-বাদ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ (natural selection) এত উদাহরণ ও পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তাঁহার পূর্ব্বে ল্যামার্ক জীবজন্তুদিগের গঠনপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে সমস্ত জীবজন্তু কয়েকটি আদি জীবজন্তু হইতে সৃষ্ট। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কেহ দেখাইতে পারেন যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে উৎপন্ন জীবজন্তু পৃথক পৃথক হইয়াছে ততদিন ল্যামার্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই। ল্যামার্কের বিশ বৎসর পরে ডারুইন এবং ওয়ালেস এই বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে" বৃক্ষাদি ও জন্তুগণের মধ্যে পৃথক পৃথক উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে।* পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে প্রত্যেক প্রকারের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদেরই বংশধর আধুনিক কালের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু। ডারুইন ও ওয়ালেস বলিলেন যে তাহা হইতে পারে না। যাবতীয় বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু কয়েকটি বড় বড় গণে বিভক্ত এবং প্রকৃতির নির্ব্বাচনের ফলে সেই সকল গণ হইতে বিভিন্ন উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দুইটি মূলসূত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) প্রত্যেক বৃক্ষলতা বা জীবজন্তু বংশরক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু যদি সকল বীজই রক্ষিত হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সকল বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুকে স্থান বা আহার দান করা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য যাহারা জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ তাহারাই জীবিত থাকিবে (survival of the fittest) বাকি সব মরিয়া যাইবে। ওয়ালেস

---

* ডারুইন তাঁহার "উপগণের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার পূর্ব্বে আরও ৩৪ জন বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহারা অসম্পূর্ণরূপে এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ডারুইন এবং ওয়ালেস উহার পরিসমাপ্তি করেন।

গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া পক্ষীর যদি বৎসরে চারিটি করিয়া সন্তান হয় এবং তাহাদেরও আবার সন্তানাদি হইতে থাকে ও সকলগুলি জীবিত থাকে তাহা হইলে পনের বৎসরে একজোড়া পক্ষীর বিশ কোটি বংশধর হইবে। হাক্‌সলে সেইরূপ গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে একটি উদ্ভিদ হইতে বৎসরে মাত্র পঞ্চাশটি বীজ উৎপন্ন হইলে নয় বৎসরে তাহার বংশধরেরা—সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিবে এবং পৃথিবীতে আর অন্য কোন বৃক্ষলতার জন্য স্থান থাকিবে না। এই অসংখ্য বংশধরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারাই জীবিত থাকিবে। বলিষ্ঠ পিতার বংশরক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্ভবপর। নানা প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ বৃক্ষ ও জন্তুর সন্তানগুলি মারা যায়। জলবায়ু, কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি ইহাদের মৃত্যুর প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। এক একটা তেঁতুল গাছের বৎসরে সহস্র সহস্র বীজ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধিকাংশ বীজই গাছের নীচে পড়ে বলিয়া, আওতায় অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরই হয় না, যেগুলি হয় তাহাও অনেক মারা যায়। একস্থানে অনেক বীজ পড়িলে তাহারা আহার না পাইয়া অধিকাংশ মরিয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতে, বরফের দ্বারা আবৃত আর্টিক মহাদেশে বা মরুভূমিতে অনুপযোগী জলবায়ুর জন্য বৃক্ষলতা জন্মে না, জীবজন্তুর সংখ্যাও খুব কম। মানুষের সন্তান জননের ক্ষমতা কম, কিন্তু পঁচিশ বৎসরে মানবের সংখ্যাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

(খ) সন্তানগণ পিতামাতার দৈহিক গঠন উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের তারতম্যে কোনও দুইটি সন্তান একরূপ হয় না। নানা প্রাকৃতিক কারণে এক একটি বৃক্ষলতা বা জীবজন্তুর কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়চয় সামান্য পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বংশধরদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে থাকে।

নানা প্রাকৃতিক কারণে এইরূপে একই গণ হইতে বিবিধ উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উপগণের উৎপত্তি যে সম্ভব তাহা আমরা পশুপক্ষী পালনে মানব কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনে (selection by man) স্পষ্ট দেখিতে পাই। যাঁহারা পায়রা পোষেন তাঁহারা জানেন যে বিবিধ জাতীয় পায়রাকে একত্র রাখিয়া কত বিচিত্র রকমের পায়রার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল পায়রার কোন জাতির ঝুঁটি খুব বড় ও চিকণ, কাহারও পাখা খুব বিস্তৃত, কাহারও ঠোঁট বড় বা ছোট, কেহ বা দূরে উড়িয়া যাইতে পারে, কেহ পারে না। এই সকল বিবিধ জাতির পায়রা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের দেহের হাড়ের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনেক তারতম্য হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনের দ্বারা গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে নিউফাউল্যাণ্ড জাতীয় সুবৃহৎ কুকুর হইতে গ্রাম্য ক্ষুদ্র খেঁকিকুকুর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়া অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর মধ্যে বিবিধ উপগণের উৎপাদন

করিতে সমর্থ হন। ঘোড়া ও গাধার সহবাসে খচ্চর নামক উপগণের উৎপত্তির কথা সকলেই জানেন।

যখন দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ অল্পসময়ের মধ্যে নির্ব্বাচনের দ্বারা বিবিধ উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন প্রকৃতি যে যুগযুগান্তর হইতে গণ হইতে উপগণ, উপগণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মানব অল্পসময়ের মধ্যে উপগণে যখন এত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, তখন প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ উপগণের মধ্যে কত বৃহৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়—এত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর যে ক্রমশঃ উপগণগুলি একেবারে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ নির্ব্বাচন ও ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও বৃক্ষ লতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উপায়ে প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ কয়েকটি উপায় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।
(Natural sorroundings)

মনে করুন একস্থানে ব্যাঘ্রের দল আছে এবং তাহাদের প্রধান আহার হরিণ। এস্থলে এই সকল ব্যাঘ্রের মধ্যে যাহারা খুব দ্রুতগামী তাহারাই হরিণ বধ করিয়া সেই আহারের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ দেশে দ্রুতগামী লঘ্বাকৃতি ক্ষীণতনু ব্যাঘ্রই প্রকৃতির নির্ব্বাচনফলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্য জাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শীতদেশের জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আনীত হইলে, যেগুলি বাঁচিবে, তাহাদের অনেকগুলি নূতন স্থানের ও জলবায়ুর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা কোন কোনও স্থলে নূতন উপগণে পরিণত হইবে। অনেকে পাহাড়ে বেলগাছ দেখিয়া থাকিবেন—দেখিতে ছোট, শক্ত ও সাধারণ বেলগাছ হইতে কতকপরিমাণে ভিন্নাকৃতি। সমতল ক্ষেত্রজাত বেলের বীচিই পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা নীত হওয়াতেই এই গাছের উৎপত্তি, কিন্তু পাহাড়ে যেরূপ খাদ্য মিলে সেই খাদ্যের এবং তথাকার জলবায়ুর উপযোগী হইবার চেষ্টায় বৃক্ষটি কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্নাকৃতি হইয়াছে। এইরূপ স্থান বা জলবায়ুর দরুণ এক একস্থানের বিশেষতঃ সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে কত জটিল তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। বিলাতে হার্টইস্ ও ডাচ ক্লভার নামক দুইটি উদ্ভিদ আছে। মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের দ্বারা উদ্ভিদের পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে আনীত হইলে সেই সঙ্গমে বীজ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দুইটি ফুলে অম্‌বল-বী নামক মক্ষিকাই সঞ্চরণ করে। কিন্তু ইঁদুরে এই মক্ষিকার বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলে অপরদিকে বিড়ালে ইঁদুর ধরিয়া খায়। যে প্রদেশে বিড়াল বেশী, সেখানে ইঁদুরের সংখ্যা কম, মক্ষিকার সংখ্যা বেশী এবং সেইজন্য ফুলও সেখানে বেশী ফুটিবে।

আবার বিড়ালের সংখ্যা যেখানে কম, সেখানে ইঁদুর বেশী, সেইজন্য মক্ষিকা কম, ফুলও কম ফুটিবে। অতএব কোনও প্রদেশে উপরোক্ত দুই জাতীয় ফুলের সংখ্যা সেইস্থানের বিড়ালের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে।

ইন্দ্রিয়বিশেষের ব্যবহার ও অব্যবহার (use and disuse of parts)। অনেক ইন্দ্রিয় অব্যবহারে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও ব্যবহারে পরিবর্ত্তিত হয়। যে ইন্দ্রিয় কার্য্যোপযোগী (useful) তাহাই স্থায়ী হয়। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত আমরা গৃহপালিত পশুপক্ষীতে পাই। একই জন্তু বন্য অবস্থায় ও গৃহপালিত অবস্থায় পৃথক হয় এবং তাহাদের বংশধরগণও আরও পৃথক হইয়া পড়ে। বন্য কুক্কুট, পাতিহাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি পক্ষী বেশ উড়িতে পারে, গৃহপালিত অবস্থায় তাহাদের উড়িবার প্রয়োজন হয় না—সেইজন্য ক্রমশঃ তাহাদের পাখার হাড়গুলি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে তাহাদের বেশীদূর উড়িয়া যাইবার ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং তাহাদের সন্তানগণও আর উড়িতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পক্ষীদিগকে প্রাণভয়ে উড়িতে হয় না বলিয়া, পাখাবিহীন বা অল্প পাখাবিশিষ্ট পক্ষীও দৃষ্ট হয়। গৃহপালিত অনেক পশুর কানগুলি নিম্নদিকে বাঁকান, কিন্তু বন্য অবস্থায় তাহাদের কান সোজা দেখা যায়। গৃহপালিত অবস্থায় তাহারা তেমন ভয় আদৌ পায় না এবং সেইজন্য কান খাড়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাতে তাহাদের কাণের হাড়গুলি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে কানগুলি দোমড়ান অবস্থাতেই স্বভাবতঃ থাকে। তাহাদের সন্তানগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে এইরূপ দোমড়ান কান বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গুবুরে পোকার (beetles) চরিবার সময় পাগুলি প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য তাহাদের সন্তানগুলিতে ক্রমশঃ পা লোপ পাইয়া যায়। ওয়ালষ্টন নামক একজন সাহেব একস্থানে দেখিয়াছিলেন যে ৫৫০ প্রকার গুবুরে পোকার মধ্যে ২০০ পোকার ডানা এত ছোট হইয়া গিয়াছে যে তাহারা উড়িতেই পারে না। এইরূপ অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়ের অব্যবহার ও আবশ্যক ইন্দ্রিয়ের বহুল ব্যবহার বিবিধ উপগণ উৎপাদনের সহায়তা করে।

সুন্দর সুন্দর ফুলের যে বিচিত্র রং দেখিতে পাই, তাহা কেবল মানবের চক্ষুর আনন্দোৎপাদন করিবে বলিয়া সৃজিত হয় নাই, সেই বিচিত্র রং উদ্ভিদের জীবন ও বংশরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ফার, ওক, অ্যাশ, ঘাস প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের বীজ বায়ুর সাহায্যে উৎপন্ন হয় তাহাদের ফুল রঙ্গিন হয় না। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদের ফুলের রেণুবহনের জন্য মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের সাহায্য প্রয়োজন, উহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সেই সকল ফুলের রং বিচিত্রবর্ণের হইয়া থাকে। আম, আপেল, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ পক্ক ফলের বিভিন্ন রংও সেই সকল বৃক্ষলতার বংশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। পক্ষী ও জন্তুগণ তাহাদের

ফলের রঙের দ্বারা প্রথমে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া তাহাদের অত রং। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অনেক জন্তুর পুরুষজাতির বিচিত্র বর্ণের পাখা আছে, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, ময়ূরের প্যাখম আছে, মোরগের ঝুঁটি আছে, কিন্তু এই সকল জন্তুর স্ত্রীজাতির এ রূপ নাই। পুরুষ জন্তুদের এই সৌন্দর্য্য তাহাদের বংশরক্ষার কল্পে প্রয়োজনীয়। রূপ দেখাইয়া পুরুষ জন্তু স্ত্রীজন্তুর মন ভুলাইয়া তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করে। আবার অনেক পক্ষীর স্ত্রী ও পুরুষজাতি—দুইয়েরই পক্ষের সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য স্ত্রীপক্ষিরা পুরুষের নিকট যৌননির্ব্বাচনের (sexual selection) দ্বারা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় যে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ইন্দ্রিয় জীবনযাত্রার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে এবং নূতন উপগণের সৃষ্টি হইবে।

জারজনন (intercrossing)—। বিবিধ প্রকারের বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর মধ্যে জারজননেও উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবশ্য সকল প্রকার বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষীর মধ্যে জারজনন আদৌ সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল যে জারজননের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানগণের আর সন্তান হয় না। ডারুইন দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এই সিদ্ধান্ত অনেকস্থলে সত্য নহে। উপরন্তু অনেক স্থলে জারজননের দ্বারা সন্তান আরও বেশী সবল ও সতেজ হয়। বৃক্ষলতাদের মধ্যে এই জারজনন কীটপতঙ্গ কর্ত্তৃক রেণু বহনের দ্বারা সঞ্চারিত হয়। ডারুইন দেখিয়াছেন যে বিভিন্ন প্রকারের কপি, মূলা, পেঁয়াজ ও অন্যান্য সবজী একসঙ্গে পুঁতিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ হইতে সবজী উৎপন্ন করিলে তাহাদের অনেকগুলি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি এইরূপে ২৩৩টি কপির চারা রোপণ করিয়া দেখিলেন যে মাত্র ৭২টি চারা ঠিক আছে, বাকি চারাগুলি হইতে উৎপন্ন ফুল কতক পরিমাণে পৃথক হইয়া গিয়াছে। শশক ও খরগোসের সংযোগে যে জার উৎপন্ন হয় তাহা বন্ধ্য (sterile) নহে, শশক বা খরগোসের সংযোগে তাহার বহু সন্তান হইয়া থাকে। সাধারণ রাজহাঁস ও চীন দেশীয় রাজহাঁসকে প্রাণীবিদ্যাবিশারদেরা বিভিন্ন গণে ফেলিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গমে যে জার উৎপন্ন হয় তাহারও সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। গৃহপালিত বিবিধ প্রকারের পায়রা, কুকুর, গরু, মহিষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গে যে সন্তান হয় তাহাও আদৌ বন্ধ্য নহে। এইরূপ জারজননের দ্বারাও বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের মধ্যে অনেক প্রকারের উপগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

এইরূপ নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কারণে প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া একই গণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ল্যামার্ক স্বীকার করিয়াছেন যে পশুপক্ষীগণ কয়েকটি আদি

জন্তু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহার মত গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার কারণ, তিনি দেখাইতে পারেন নাই কেমন করিয়া একই গণ হইতে বিবিধ পশুপক্ষীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। ডারুইন এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার মধ্যে এত পার্থক্য সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি দেখাইলেন, যে উপগণের আর পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারা চিরস্থায়ী (immutable) —এই মত ভ্রান্ত। আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র উপগণের যাহা গণ, তাহাই আবার বৃহত্তর গণের উপগণ। এইরূপে ডারুইন সিদ্ধান্ত করিলেন যে পশুপক্ষী এই ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে চারি পাঁচটি বৃহৎগণ হইতে উৎপন্ন এবং বৃক্ষলতাও তদ্রূপ-ভাবেই সৃষ্ট।

ডারুইনের এই মত প্রথমতঃ কেহই গ্রাহ্য করিলেন না। যিনি একটা বড় রকমের নূতন কথা প্রথম বলেন তিনি পাগলইত বটে। ডারুইনও প্রথম প্রথম অনেক গালি খাইলেন। ক্রমশঃ লায়েল প্রমুখ বিখ্যাত ভূবিদ্যাবিৎ, হাক্সলে প্রমুখ প্রাণিবিদ্যাবিৎ, হুকারের মত উদ্ভিদবিদ্যা-বিদেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। আধুনিক কালে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা বৃক্ষলতা ও জীব সৃষ্টির যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা অটুট আছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানকে অনু-প্রাণিত করিয়াছে। সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক কত নূতন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সকল পরীক্ষার দ্বারা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বহুলপরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

মানবের উৎপত্তি (Descent of man)।

ডারুইন বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের জন্ম বৃত্তান্ত তাহার "উপগণের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। মানব শ্রেষ্ঠ জীব, তাহার উৎপত্তির বিষয় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে মানব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানব অন্যান্য জীব হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে।

প্রথমতঃ—মানবের দৈহিক গঠন অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীবের দৈহিকগঠন হইতে একেবারে পৃথক নহে। মানবশরীরের হাড়, পেশী, স্নায়ু, রক্তস্থলী. প্রভৃতি বানর, বাদুড় বা সিল মৎস্যের ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনীয়। হাক্সলে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে জীবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর সহিত বানরজাতীয় জীবগণের মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালীর অনেক সাদৃশ্য আছে, তবে ঐ সাদৃশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নহে, তাহা হইলে বানর ও মানবের বুদ্ধি বৃত্তি সমান হইত। দৈহিক গঠনে সাধারণ বানর, সিম্পাঞ্জি, ওরাং প্রভৃতি বানর জাতীয় জীবের সহিত মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী।

অপুষ্ট ভ্রূণাবস্থায় মানবভ্রূণ কুকুর প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগণের ভ্রূণ হইতে সহজে মানবভ্রূণের পার্থক্যে অনুমিত হয় না।

ক্রমশঃ একই প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পক্ষীর ডানা ও পা এবং মানুষেরো হাত ও পা বাহির হয়। ভ্রূণের পরিণতির সময়ই এই সকল জীবের পার্থক্য অনুভূত হয়। যদি এইরূপ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরীক্ষা-মূলক সত্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবিধ মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা মানব অবশ্য অন্যান্য জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ কিন্তু অন্যান্য জীবের যে বুদ্ধিবৃত্তি নাই বা তাহারা ভালবাসিতে, রাগিতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, অনুকরণ করিতে, প্রতিশোধ লইতে বা ভাবিতে একেবারেই জানে না এমন নহে। দুই একটি উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। কুকুরের প্রভুভক্তি সর্ব্বজন বিদিত। চক্রবাক চাক্রবাকীর দাম্পত্য প্রেম কবি-কল্পনা নহে, সম্পূর্ণ সত্য। জননীর সন্তানের উপর স্নেহ যেমন মানব সমাজে দেখা যায়, জীবজগতেও ঠিক সেইরূপই দৃষ্ট হয়। বৎসহারা গাভীর করুণ রোদন যিনি শুনিয়াছেন তিনি একথা অস্বীকার করিবেন না। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনেক পশুতে দৃষ্ট হয়। ময়না বা কাকাতুয়া "রাধাকৃষ্ণ" পড়ে, বানরে সাষ্টাঙ্গে সেলাম করে, বিবিধ জন্তুতে বিবিধ মানবোচিত ক্রীড়া প্রদর্শন করে। পশুদের যে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঁড়িয়াখানায় হাতীর নিকট কোনও জিনিস ফেলিয়া দিলে উহা শুঁড়ের দ্বারা না পাইলে জিনিসের অপর পারে বায়ুনিঃসরণ করিতে থাকে যাহাতে বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া জিনিসটা তাহার আয়ত্তে আসে। একজন সাহেব ভায়েনা সহরে দেখিয়াছিলেন যে একটি ভল্লুক নিকটবর্ত্তী জলে একটুকরা রুটি ভাসিতে দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য থাবা দিয়া একটি ছোট নালা কাটিয়া জল ও তাহার সঙ্গে রুটির টুকরাও নিকট আনয়ন করিয়াছিল।

ডারুইন জীবজন্তুদিগের এইরূপ বুদ্ধি বৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্তর উদাহরণ দিয়াছেন। বানর জাতির বুদ্ধিবৃত্তি মানবের অতি নিকট। অনেকে মনে করেন মানুষই কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বন্য সিম্পাঞ্জি পাথরের দ্বারা ফল ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের সাঁস খায়। রেংগার নামক এক সাহেব একটি বানরকে এইরূপ শক্ত কাঁচা তাল ভাঙ্গিয়া তাহার রস খাইতে শিখাইয়াছিলেন। হাতীরা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাছি তাড়াইতে থাকে। একবার এবিসিনিয়া দেশে একটি পার্ব্বত্য পথে কোবার্গ গোথার ডিউকের সহচরেরা পর্ব্বতের উপরিস্থিত একদল বানরের প্রতি গুলি করিতেছিলেন। বানরেরা তখন একজোটে মানুষের মাথার উপর বড় বড় প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া তাহাদিগকে পলায়নে বাধ্য করিল। স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি উচ্চ মানসিক বৃত্তিও কতক কতক পরিমাণে জন্তুদের মধ্যে আছে। ডারুইনের একটি পোষা কুকুর ছিল। তিনি ইচ্ছা করিয়া উহাকে পাঁচবৎসর বাঁধিয়া রাখিবার পর একদিন তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে প্রথম

কুকুরটা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; তাহার পর হঠাৎ তাহার স্মরণ হওয়াতে ডারুইনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বেকার মত আসিতে লাগিল। অবশ্য ভাষা মানবকে উচ্চতম জীব করিয়া রাখিয়াছে। তবে জন্তুদিগের মধ্যে ভাষার যে প্রচলন একেবারে নাই তাহা নহে। বিবিধ প্রকারের শব্দের দ্বারা তাহারা মনোভাব প্রকাশ করে। তাহাদের ক্রন্দনের ভাষা ও রাগের ভাষা যে স্বতন্ত্র তাহা বেশ বুঝা যায়। অবশ্য মানব যেরূপ তাহার সকল ভাবই ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে জন্তুরা তাহা পারে না। মানবের লিখিবার শক্তি চর্চ্চা ও আলোচনার ফলে তাহারা পশু হইতে বহু উচ্চে; কিন্তু অসভ্য জাতিদের লিখিত ভাষা নাই।

সৌন্দর্য্য জ্ঞান যে মানব সমাজেই নিবদ্ধ তাহা নহে। অন্যান্য অনেক জন্তুতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ময়ূরের সুন্দর পাখনা ময়ূরীর পছন্দের জন্য, মানবের চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নহে। অনেক পুংপক্ষী স্ত্রী-পক্ষীর মনোরঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকারের গান করিয়া থাকে। মানবের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সঙ্গীতপ্রিয়তা যে সমান নহে, তাহার প্রমাণ অসভ্যজাতির বিচিত্র পরিচ্ছদ ও বেশভূষা সভ্যজাতির নিকট আদৌ প্রিয় নহে। সকল জাতির সঙ্গীত প্রণালী আদৌ এক নহে।

ভগবানে বিশ্বাস অনেকে মানবজাতির নিজস্ব পার্থক্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশ্বাস যে মানবের অনিবার্য্য প্রবৃত্তি-মূলক তাহা নহে, কারণ ডারুইন ভ্রমণ-কারীদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে দেখাইয়াছেন যে অনেক অসভ্য জাতিদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস নাই। ভগবানে বিশ্বাস ও ধর্ম্ম মানবজাতির উন্নতি ও শিক্ষার সহিত ক্রমশঃ মানব সমাজে স্থান পাইয়াছে।

পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও সামাজিক বন্ধন কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শিকার করেন তাঁহারা জানেন যে বৃহৎ নদীর চড়ে একসঙ্গে হাজার হাজার রাজহাঁস, পাতিহাঁস, পায়রা, চক্রবাক বাস করে। বানরেরা যখন বাগান লুট করিতে যায় তখন তাহারা সাধারণতঃ একজন দলপতির আদেশে কার্য্য করিয়া থাকে। একই পালে গরু, ভেড়া, ছাগল চরিতে অনেকেই দেখিয়াছেন।

এইরূপে ডারুইন দেখাইয়াছেন যে শরীরের গঠন প্রণালী, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়াতে মানব অন্যান্য জন্তু হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে। উচ্চ মানসিক বৃত্তি মানব সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার দরুণ খুব বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়াতে মানবকে এত উচ্চ জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; নহিলে আফ্রিকার অনেক অসভ্য মানব জাতি ও উচ্চশ্রেণীর বানরজাতিতে বিশেষ তফাৎ বড় একটা নাই বলিলেও চলে। সেইজন্য ডারুইন বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে মানবই প্রথম জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে নাই। নিম্নশ্রেণীর জীব প্রথমে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চতর জীবে পরিণত হইয়াছে। মানবের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ উচ্চ বানর জাতি। এই বানরজাতির পূর্ব্বপুরুষ কোনও চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জন্তু (mammal) এবং

স্তন্যপায়ী জন্তুরা প্রাচীন কোন দ্বিগর্ভ পশু (marsupial) হইতে উদ্ভূত। তাহারা আবার নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কোনও উভচর (জলচর ও স্থলচর) জন্তু হইতে উদ্ভূত এবং এই উভচর জন্তুগণ মৎসাকৃতি জন্তু হইতে উৎপন্ন। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ এমন একপ্রকার জলজন্তু ছিল, যাহাদের শরীরে স্ত্রী এবং পুং চিহ্ন উভয়ই বিদ্যমান এবং শরীরের কার্য্যোপযোগী প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। †

এই ক্রমিক সৃষ্টি প্রকরণে অনেক বিষয়ের সমাধান হয়। প্রথমতঃ ভূবিদ্যাবিদেরা সর্ব্ব-প্রাচীন যুগের পর্ব্বতে কেবল মৎস্যাকৃতি জীবের, তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বতে ক্রমান্বয় উভচর জন্তু, পক্ষী, পশু, বানর ও মনুষ্য কঙ্কাল কেন পান তাহার মীমাংসা হয়। প্রাকৃতির নির্ব্বাচনের ফলে ক্রমশঃ উন্নততর জীব জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। যেমন সভ্যতার বৃদ্ধির দরুণ আধুনিক সমাজে কারিগর, ছুতার, দোকানদার, স্বর্ণকার প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তি রহিয়াছেন, সেইরূপ ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব জন্মগ্রহণ করাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়নিচয় বিবিধ কর্ম্মোপযোগী হইয়া ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই ক্রমিক সৃষ্টি প্রকরণ বুঝাইয়া দিতেছে—কেন মানবের হাত আর মাছের পাখনা, একজাতীয় সৃষ্ট পদার্থ। উত্তরাধিকারীসূত্রে শরীরের স্থূল স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি সকল জীব জন্তুই পাইয়াছে। সব জীবজন্তু এক ছাঁদে প্রস্তুত এরূপ মীমাংসা বিজ্ঞান সম্মত নহে।

ডারুইনের "ডিসেণ্ট অব ম্যান" নামক গ্রন্থ ১৮৭১ সালে বাহির হয়। তাঁহার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মত ইতিপূর্ব্বে অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে মানব-উৎপত্তির

† ডারুইন তাঁহার "Origin of the species" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "I believe that animals are descended from at most only four or five progeniters, and plants from an equal or lesser number. Analogy would lead me one step farther, namely, to the belief that all animals and plants are descended from one prototype. But analogy may be a deceitful guide (P. 424." কিন্তু পরে তাঁহার "Descent of man"এ তিনি ক্রমবিবর্ত্তনের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "We thus learn that man is descended from a hairy tailed quadruped, properly arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world. This creature, if its whole structure had been examined by a naturalist, would have been classed amongst the Quadrumana, as surely as the still more ancient progeniters of the Old and New world monkeys. The Quadrumana and all the higher mammals are probably derived from an ancient marsupial animal, and this through a long live of divesified forms, from some amphibian like creature and this again from some fish like animal. In the dim obscutity of the past we can see that the early progeniter of all the Vertebreta must have been an aquatic animal provided with branchiœ with the two sexes united in the same individual and with the most important organs of the body (such as the brain and heart) imperfectly or not at all developed. This animal seems have been more like the larve of the existing marine Ascidians than any other known form," (P. 609)

বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বাইবেলের উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং অনেকে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী অধার্ম্মিক বলিয়া গালি দিলেন। কিন্তু ডারুইনের শিষ্যও অনেক হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এই দুই গ্রন্থে বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর সৃষ্টিতত্ত্ব ডারুইন যেরূপ ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান নূতন আলোকে আলোকিত হইল। এখন হইতে দেখা গেল প্রত্যেক জন্তু বা বৃক্ষলতা পৃথক পদার্থ নহে, বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, বিশ্বের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটা নিগূঢ় ঐক্য আছে, তাহা সকলে বুঝিল। ভূবিদ্যাবিদ এখন হইতে গতযুগের জীবাবশেষ খুঁজিতে থাকিলেন, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদেরা প্রত্যেক বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর শারীরিক ঐক্য ও পার্থক্য এবং তাহাদের কার্য্যাবলী মানবজীবনের কার্য্যাবলীর ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ডারুইনের এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ এখন হইতে প্রত্যেক বিজ্ঞান অনুপ্রাণিত করিয়াছে। নিউটনের আবিষ্কার যেমন জড়জগতে সেইরূপ ডারুইনের আবিষ্কার জীবজগতে বিপ্লব উপস্থিত করিল।

কেঁচোর (earth worm) কার্য্য।

ডারুইন আরও অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছিলেন—যাহার দ্বারা অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়াও বিখ্যাত হইতে পারিতেন। এইরূপ কয়েকটি বিষয়ের পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৮ সালে তিনি কেঁচোর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৮১ সালে পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে কেঁচো পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে ঘাসের নিম্নেকার মাটি সমান ভাবেই থাকে। ডারুইন দেখাইলেন যে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কেঁচো ঘাসের নিম্নস্তর হইতে ক্রমাগত মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া মাটি বদলাইয়া দিতেছে। এই উত্থিত মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বায়ু বা বৃষ্টির দ্বারা নিম্নস্তরে নীত হইতেছে। এইরূপে মৃত্তিকাস্তর ক্রমাগত নূতন হইতেছে।

কীটভোজী উদ্ভিদ

(insectivorous plant)

১৮৭৫ সালে "কীটভোজী উদ্ভিদ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে তিনি ঐ প্রকার উদ্ভিদের কার্য্যবলীর বর্ণনা করেন। এই উদ্ভিদগুলির কার্য্য অতি অদ্ভুত—অনেকটা জীবজন্তুর মত। কীট পতঙ্গ তাহার পাতায় বসিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়। তাহার পর পাতা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। এই রসের সাহায্যে উদ্ভিদ পতঙ্গগুলিকে হজম করিয়া ফেলে। ডারুইন ১৮৬০ সালে সাসেক্স প্রদেশে বেড়াইতে গিয়া এইরূপ উদ্ভিদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন।

তাহা ছাড়া তিনি একখানি গ্রন্থে সমুদ্র মধ্যস্থ "প্রধান দ্বীপপুঞ্জে"র (ceval reef) উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন মত প্রকাশ করেন। অন্য একখানি গ্রন্থে জড়ান লতার (climbing plants) কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা প্রকাশ করেন। কিরূপে অরকিড (orchid) জাতীয় গাছ কীটপতঙ্গের দ্বারা বীজাক্ত (fertilised) হয় তাহা নির্ণয় করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। বৃক্ষলতার মধ্যে জারজনন (cross) ও বীজ জনন সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক লেখেন। তাহা ছাড়া আরও কয়েকখানি ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ তাঁহার অসীম কর্ম্মপটুতা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এইরূপ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিতেছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি পেটের পীড়া ও বাতে কষ্ট পাইতেছিলেন। যখন শরীর অত্যন্ত খারাপ হইত, তখন মাঝে মাঝে কাজ হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেন। বাটীতে তিনি খুব নিয়মিতাচারী ছিলেন। দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে লেখা পড়া করিতেন, মাঝে মাঝে বেড়াইয়া আসিতেন। বস্তুতঃ তিনি সারাজীবন দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। অত অধিক পরিমাণে মানসিক শ্রম না করিলে হয়ত তাঁহার শরীর ভাল থাকিত, কিন্তু তিনি লেখা পড়া না করিয়া থাকিতেই পারিতেন না। তাঁহার ব্যবহার খুব শিষ্ট ছিল এবং চরিত্রও মধুর ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি ডাউন নামক পল্লীগ্রামেই আজীবন বাস করিয়াছিলেন। সেইখানেই তিনি ১৮৮২ সালে ১৯ এ এপ্রিল তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া যান।

এই মহাপুরুষকে জীবদ্দশায় শুনিতে হইয়াছিল যে তাঁহার গবেষণার দ্বারা তিনি খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী ও অধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে উনবিংশ শতাব্দীতে মানবমন অনেকটা উচ্চ হইয়াছিল, নতুবা তাহার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে হয়ত তাঁহাকেও গ্যালিলিওর মত কারাবাস ও ব্রুনোর মত জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইত। মৃত্যুকালে ইংরাজ জাতি তাঁহার দেহ সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবীতে কবর দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি উচিত সম্মানই দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

যমালয় ও নরক সম্বন্ধে ভৌগোলিকতত্ত্ব

(কুমেরু আবিষ্কারের প্রমাণ।)

যমালয় ও নরকের ভীষণ চিত্র আমাদের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে যমালয় ও নরকের নাম শুনিয়া শিহরিয়া না উঠেন এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। সুতরাং এস্থলে যমালয় ও নরকের ভীষণতার বর্ণনা প্রদান করিয়া সেই ভীতির ভাবটীকে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি না। আমার একান্ত ভরসা যে

ইহার আলোচনদ্বারা সেই ভীতির ভাবের স্থলে বরঞ্চ কৌতূহলের ভাবই উদ্রিক্ত হইবে।

নরকের মূলসম্বন্ধে বেদে আমরা যে সন্ধান প্রাপ্ত হই তাহাতে ইহাকে প্রথম গর্ত্তরূপেই বর্ণিত দেখিতে পাই যথা—

"অভ্রাতরো ন যেষিণোব্যংতঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদং পদমজানতা গভীরম্॥" ৫

ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫ম সূক্ত।

"যে সমস্ত লোক পাপী হওয়াতে অনৃতবাদী ও অসৎ হইয়া ভ্রাতৃবিহীনা পতিবিদ্বেষিণী দুশ্চারিণী স্ত্রীর ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করে তাহাদের জন্যই এই গভীর স্থান (গর্ত্ত) উৎপাদিত হইয়াছে।

এখানে নরক যে একটী গভীর স্থান রূপে বর্ণিত হইয়াছে অন্য একটী বর্ণনা হইতে সেই গভীর স্থানটী কিরূপ তাহা আমরা বুঝিতে পারি ঃ—

"অবাসাং মঘবঞ্জহি যাতু মতীনাম্।
বৈলস্থানকে অর্ম্মকে মহাবৈলস্থে অকর্ম্মকে॥" ৩
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৩৩ সূক্ত।

"হে মঘবন্! এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর, এবং কুৎসিৎ বিলে বা মহাবিলে (ইহাদিগকে) নিক্ষেপ কর।"

এখানে শত্রু-সৈন্যদিগকে নিহত করিয়া নরকে নিক্ষেপ করার জন্যই প্রার্থনা করা হইতেছে। বিল শব্দের অর্থ গুহা। সুতরাং 'বৈলস্থান' গুহাকে ও 'মহাবৈল' গভীর গুহাকে বুঝাইতেছে। ইহা হইতে পর্ব্বত গহ্বরই যে প্রথম নরকরূপে কল্পিত হইয়াছিল তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে।

মহাভারতে উত্তরকুরুবাসিদিগের মৃতদেহ পর্ব্বতগুহাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন অতি ভয়ঙ্কর ভারুণ্ড নামক পক্ষীসকল তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।" (৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৭ম অধ্যায়।)

মৃতদেহ গুহাতে নিক্ষিপ্ত হইত বলিয়া নরকস্থান যে গর্ত্তরূপে কল্পিত হইবে তাহা বিশেষরূপেই সম্ভবপর। নরকের গুহা বা গর্ত্তরূপে কল্পনা হইতেই 'নরক কুণ্ডের' ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে। নরককুণ্ডের বর্ণনা হইতেই পূর্ব্বোক্ত কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়।—

"নরকাণাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানা বিধানিচ।
বিস্তৃতানি গভীরাণি ক্লেশদানি চ জীবিনাম্।
ভয়ঙ্করাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুৎসিতানি চ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

পূর্ব্বোক্তরূপে নরক কল্পনার সূচনা বেদে দেখিতে পাওয়া গেলেও নরক নাম বেদে পাওয়া যায় না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া ভারত হইতে বহুদূর অগ্রসর হইলেই প্রথম 'নরক' নামের প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ উপরে যে আমরা নরককুণ্ডের উল্লেখ পাইয়াছি এই সমস্ত নরককুণ্ড দক্ষিণের সংযমন পুরীতে অবস্থিত বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায় ঃ—

"ষড়শীতিশ্চ কুণ্ডানি সংযমন্যাঞ্চ সন্তিচ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।) "ষড়শীতি নরককুণ্ড সংযমনেই অবস্থিত।"

সংযমন যমপুরীর একনাম (১) জ্যোতিষে আমরা 'যমকোটি' নামক একটী স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ দেখিতে পাই যথা—

(১) "পুরী সংযমনীতস্য চিত্রগুপ্তস্ত লেখকঃ॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত জটাধরঃ।"

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥
কুরুত্তাস্তরিতানি তানি স্থানানি যজ্জোলবিদোবদন্তি।"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি।'

"লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, 'যমকোটি' ইহার পূর্ব্বে, 'রোমক নগর' ইহার পশ্চিমে, ইহার নিম্নে (পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে?) 'সিদ্ধপুর,' 'সুমেরু' উত্তরে, দক্ষিণে 'বড়বানল'। এই ছয়টী স্থান ভূগোলবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কহিয়া থাকেন।"

উপরি উল্লিখিত 'যমকোটিই' পুরাণের "সংযমনপুর" বলিয়া আমরা মনে করি। 'রোমনগর' যখন হিন্দুদিগের নিকট বিদিত হইয়াছিল তখনও যে যমকোটি বা যমপুরী বর্ত্তমান ছিল পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। লঙ্কার পূর্ব্বে যমকোটির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী স্থান বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। যমালয়ের স্থান দক্ষিণে বলিয়া যে সংস্কার প্রচলিত আছে তাহা যমপুরীর এই ভৌগোলিক অবস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। দক্ষিণ দিকের সহিত যমের যোগ হইতেই ইহার নাম 'যম্যা' 'যামী' হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে যমের পুরী বলিয়াই যে কেবল দক্ষিণ দিকের সহিত যমের যোগ হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু যম দক্ষিণদিকের অধিপতি বলিয়াও ইহার সহিত যমের যোগ হইয়াছে।

দিক্‌পতি বা দিক্‌পাল বলিয়াই যমের খ্যাতি নহে; বিশেষরূপে ন্যায়বান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে মনু ও যম উভয়ই সূর্য্যের পুত্র। যমকে শক্র ও মিত্রে সবিশেষ নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মপ্রাণ দেখিতে পাইয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে দক্ষিণদিকের পালনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করেন ঃ—

"ততঃ সূর্য্যসুতো যোঽস্যাঃ সোঽভূদ্বৈবস্বতোমনুঃ।
দ্বিতীয়স্তুযমঃ শাপাদ্ধর্ম্ম দৃষ্টিরভূৎসুতঃ॥
ধর্ম্মদৃষ্টির্যতশ্চাশু সমোমিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

এস্থলে যমের যে শাপগ্রস্ত হওয়ার কথা পাওয়া যায়—এই শাপ ইহার বিমাতা ছায়া কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। এই শাপের জন্যই যমকে দক্ষিণদিকের রাজ্য গ্রহণ করিতে হয়। যম যেমন দক্ষিণদিকের রাজত্ব লাভ করেন—মনু তদ্রূপ উত্তরদিকের রাজত্ব লাভ করেন।

যমের এই দক্ষিণদিকের রাজ্য প্রাপ্তিতে আমরা অতি গভীর ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই। উত্তরে আর্য্যদেশে মনু রাজা হইয়াছিলেন। দক্ষিণে আর্য্যাধিকার স্থাপিত হইলে তাহাতে যমই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। এইরূপে যম বৈদেশিক আর্য্যাধিকারের রাজা ছিলেন এবং মনু স্বদেশীয় আর্য্যাধিকারের রাজা ছিলেন। যমের স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে অনার্য্যদিগের মধ্যে রাজত্ব করিতে যাওয়া ইহাই তাহার শাপরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে যমের রাজত্বই আর্য্যদিগের প্রথম বৈদেশিক রাজত্ব বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। যম এই শাসনকার্য্যে এরূপ লোকোত্তর

ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্ম্মপরায়ণতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তিনি অনন্যসাধারণ ধর্ম্মরাজ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহার শাসনও যমব্রত সংজ্ঞায় রাজধর্ম্মের আদর্শরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যমব্রত বা যমের ন্যায় শাসন সম্বন্ধে পুরাণের বর্ণনা এইরূপ—

"সতু পক্ষপাতং বিনা পাপিনাং শাসনরূপঃ।"

শব্দকল্পদ্রুম।

পক্ষপাত না করিয়া পাপীদিগের শাসনই যমব্রতরূপ রাজধর্ম্ম।

যমের প্রকৃত স্বরূপ আমরা আবেস্তার যিমের বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে জানিতে পারি। যিম যে যমেরই রূপান্তর তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রমেশবাবু তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে 'যিম' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার নাম যিম, তিনি প্রথম রাজা ও সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত এবং পুণ্যবান্ মনুষ্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পায়।"

পরে অসুরের আদেশানুসারে 'যিম' একটী 'বর' নামক নূতন জগৎ সৃষ্ট করেন, তথায় কেবল পুণ্যাত্মা লোক ও উৎকৃষ্ট পশু বৃক্ষাদি থাকে।"

ঋগ্বেদানুবাদ ৮৭ পৃঃ

যিম যে মনুষ্যমাত্র এবং প্রথম রাজা ও সত্যযুগের প্রবর্ত্তক নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়:—

"Vivanhat is a mere mortal man, a saintly priest, the first who offered a Haoma sacrifice, while his son Yama is also a mortal, the first king, the ruler of a golden age" Vedic India by Z. A. Ragozin p 181.

উপরে আমরা যিমকে যেরূপ রাজা ও নূতন জগতের প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লিখিত দেখিয়াছি বেদেও আমরা তদ্রূপ যমকে নূতন জগতের অধিষ্ঠাতা ও রাজারূপে উল্লিখিত দেখিতে পাই যথা:—

"ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্ব্বীরেকমিদ্ হবং।" ১৬

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৪ সূক্ত।

"যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন; তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন।"

"উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণঞ্চ দেবম্।" ৭

"সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।"

এখানে যম ও বরুণের একত্রাবস্থানের বর্ণনা হইতে যমের বৃহৎ জগৎ যে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত ছিল তাহাই অনুমিত হয়।

আবেস্তায় যিমের নূতন জগৎ সৃষ্ট হওয়ার যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি তাহাতে বেদের উল্লিখিত যমের বৃহৎ জগৎ যে তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নূতন দেশ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যমের সহিত বরুণের একত্র বাসের উল্লেখদ্বারা যমের আবিষ্কৃত সেই নূতন দেশ যে সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দেশ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। ইহা হইতে আর্য্যদিগের মধ্যে যমই যে সমুদ্রমধ্যে প্রথম নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নূতন আর্য্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

যম অনার্য্যস্থানে রাজ্যস্থাপন করিলেও সৌন্দর্য্যে এই স্থানটি আর্য্যস্থানেরই সমকক্ষ ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত রেগোজিন্ যমরাজ্য স্বর্গরাজ্যের সহিত তুলনীয় বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন যথা:—

"But if the father has lost ground in India, the son, Yama, fills one of the most picturesque positions in the Vedic pantheon, as King of the dead, the mild ruler of an Elysium like abode." Vedic India P 181.

বরাহপুরাণে নচিকেতাকর্ত্তৃক যমালয়ের যে বর্ণনা আছে বিশ্বকোষকার তাহা উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:—

"যমপুরের এইরূপ বর্ণনায় অমরাবতীর চারুচিত্রও হীনপ্রভ হইয়া যায়।"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে যম একটী বিশেষ সমৃদ্ধ রাজ্যই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সমৃদ্ধি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরবর্ত্তীকালে বহু আর্য্যপুরুষই যমের রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পিতৃদেশ হইতে আগত ও পিতৃ জাতি অর্থাৎ আর্য্য জাতির লোক বলিয়াই ইঁহারা যমরাজ্যে পিতৃপুরুষ বা পিতৃ-গণ আখ্যা-প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে উপনিবিষ্ট পূর্ব্বপুরুষীয় আর্য্যগণ যেমন যমের প্রজা হন তদ্রূপ স্থানীয় আদিমবাসী অনার্য্যগণও যমের প্রজা হয়। আর্য্য অনার্য্য উভয় প্রকারের প্রজার শাসনভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইলেও যমরাজ আত্মপরনির্ব্বিশেষে এইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে তাহাদের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন যে তাঁহার এবম্প্রকারের ন্যায়শাসন, শাসনের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি 'ধর্ম্মরাজ' এই অনন্যসাধারণ নামে চিরযশস্বী হইয়া রহিয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে তিনি এরূপই আদর্শ সুবিচার করিতেন যে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারও এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাহাতেই ইহকালের আদর্শ বিচারকর্ত্তা হইতেই তিনি পরকালেরও আদর্শ বিচারকর্ত্তারূপে কল্পিত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্যদিগের বর্ত্তমান বৈদেশিক শাসনের ন্যায় আর্য্যদিগের বৈদেশিক শাসনে কোন বর্ণ-বিদ্বেষের (race-prejudice) অস্তিত্ব ছিল না। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই দোষগুণের যথার্থ বিচার হইত। ইহাতেই যমের বিচার দৈববিচারের গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। যমের বিচার একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে ন্যায়দণ্ডে তুলিত হইত তেমনই অপরদিকে ইহার দণ্ড কঠোরভাবে বিহিত ও প্রতিপালিত হইত। দণ্ডভোগের জন্য অপরাধীসকল যে সমস্ত স্থানে প্রেরিত হইত, তৎসমস্তই নরকনামে অভিহিত হইয়াছে। এই নরক স্থানসকল, এক প্রকার penal settlement ছিল বলা যাইতে পারে। যমপুরীর দক্ষিণদ্বার দিয়া অপরাধী-দিগকে নরকে প্রেরণ করা হইত। সুতরাং যমালয়ের দক্ষিণ হইতেই প্রকৃত নরক আরম্ভ বলা যায়। 'যমের দক্ষিণদ্বার' এই সাধারণ প্রবাদেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরাধীদিগকে একটী নদী পার করিয়া নরক স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। এই নদীই বৈতরণী নামে প্রসিদ্ধ। বেদে দৈবী নৌকাদ্বারা এই বৈতরিণী নদী পারের কথা পাওয়া যায়। (২)

(২) বিশ্বকোষ 'যম' দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর বর্ত্তমান মান-চিত্রের 'অষ্ট্রেলিয়াতে' আমরা যমালয়ের স্থান ও তদ্দক্ষিণে নরকের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চাই।

ঋগ্বেদের 'যমসূক্তের' প্রথম ঋকেই যমকে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী একটী বিশাল দ্বীপে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"ওচিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূচিদর্ণবং
জগন্বান্॥" ৬

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১০ম সূক্ত।

(যমভগিনী, যমকে কহিতেছেন): "বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর।"

দক্ষিণসমুদ্রে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় আর অন্য কোন বৃহৎ দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বেও যে ইহা তদ্রূপ উৎকৃষ্ট উপনিবেশে পরিণত হইতে পারিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। কর্কট ক্রান্তি-বৃত্ত ইহার মধ্য দিয়া যাওয়ায় ইহা অংশতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে ও অংশতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পড়িয়াছে, তাহাতে ইহা যেরূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে—অল্প স্থানই সেরূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ইহা যে স্বর্গসদৃশ স্থান বলিয়া বর্ণিত হইবে তাহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। ইহার দক্ষিণ হইতেই মেরুদেশ আরম্ভ হইয়াছে। এই অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-সীমান্ত নদী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িলেই দক্ষিণমেরু দেশে যাওয়া যায়। আমরা দক্ষিণমেরু দেশকেই নরকস্থান বলিয়া মনে করি। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী নদীই আমাদের নিকট বৈতরণী নদী বলিয়া মনে হয়। অপরাধীদিগকে নৌকায় করিয়া এই নদী দিয়া নরকস্থান বা দক্ষিণমেরু দেশে লইয়া যাওয়া হইত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী-দিগকে যেমন দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয় পূর্ব্বে সম্ভবতঃ তৎপ্রকারের অপরাধী-দিগকেই নরকস্থানে প্রেরণ করা হইত। এই স্থান হইতে প্রায় কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। তাহাতেই নরকস্থান মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান বলিয়াই কল্পিত হইয়াছে। দক্ষিণ মেরুদেশ যে বর্ত্তমানেও মনুষ্যের বাসের পক্ষে কিরূপ সাংঘাতিক আধুনিক মেরু অবিষ্কারকারী স্কটের সদলবলে বিনাশ হইতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দক্ষিণমেরু দেশকে যে আমরা নরকস্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছি বর্ত্তমান ভূগোলে তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কার করা যায় কিনা এক্ষণে আমরা তাহাই বিচার করিয়া দেখিব। অমরকোষ অভিধানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন নরকের এই সকল নাম প্রাপ্ত হই:—

"তদ্ভেদাস্তপনাবীচি মহারৌরব রৌরবাঃ।
সংহারঃ কালসূত্রশ্চেত্যাদ্যাঃ॥"

"তপন, অবীচি, মহারৌরব, রৌরব, সংহার, কালসূত্র ইত্যাদি।"

অষ্ট্রেলিয়াকেই আমরা যমপুরী বলিয়া অনুমান করিয়াছি। কর্কট ক্রান্তিবৃত্ত ইহার মধ্যচ্ছেদ করিয়া গিয়াছে। কর্কট ক্রান্তি-বৃত্তই দক্ষিণে সূর্য্যগতির শেষ সীমা। সুতরাং এই বৃত্ত ও এতৎসন্নিহিত স্থানই উষ্ণ-

তদ্দক্ষিণেই শীতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আরম্ভ। অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী উক্ত উষ্ণস্থানই 'তপন' নামক নরকস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী নদীকে যে বৈতরণী নদী বলিয়াছি তাহা উপরিউক্ত উষ্ণস্থান প্রবাহিত বলিয়া অপরাধীরা দক্ষিণে যে শীতপ্রধান স্থানে নীত হইত তাহার সহিত তুলনায় যে 'তপ্ত' বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 'যমদ্বারে মহাঘোরে বহ্বী বৈতরণী নদী" বলিয়া ইহার যে বর্ণনা পাওয়া যায়—তাহাতেও ইহাকে যমপুরীর সীমান্তবর্ত্তী নদী বলিয়াই জানা যায়।

'তপনের' পরই 'অবীচি' নামক নরক-স্থান। বর্ত্তমান ভূগোলে আমরা কর্কট কান্তবৃত্ত মণ্ডলে "নির্ব্বাত মেখলা" (Calm belt or belt of calm) নামক স্থানের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। 'অবীচি' যে ইহারই একার্থক তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বায়ুর দ্বারাই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং যেখানে বায়ু প্রবহমান না হয় সেখানে তরঙ্গ উত্থিত হইবে না। অতএব 'নির্ব্বাত' স্থান ও 'অবীচি' স্থান একই হইতেছে। ভূগোলে CaImbelt বা নির্ব্বাত মেখলা স্থানের ৪০″ হইতে ৫০″ ডিগ্রি পর্য্যন্ত আমরা 'মহারবকারী চত্বারিংশৎ' (Roaring forties) বৃত্তমণ্ডলের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। ইহাতে আমরা 'মহারৌরব' ও 'রৌরব' নামক নরকের স্থানই দেখিতে পাইতেছি। 'মহারৌরব' ও 'রৌরব' Roaring নামের স্পষ্ট অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়। কারণ এক 'রু' ধাতুই রৌরব ও Roar উভয়েরই মূল। এই সকল স্থানে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়াতেই Roaring নাম হইয়াছে। রৌরব এই প্রবল বাতাসের ভীষণ শব্দের অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়।

রৌরবের পর 'সংহার' ও 'কালসূত্র' নামক নরক। 'সংহার' নামের দ্বারা দক্ষিণ মেরুমণ্ডলের প্রচণ্ড শীতবাতে যে স্থান মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক তাহাই বুঝায় বলিয়া আমরা মনে করি। 'কালসূত্র' নামের ব্যাখ্যা অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার ভানুজিদীক্ষিত এইরূপ করিয়াছেন—"কালান্যায়োময়ানি সূত্রাণ্যত্র" —কাল অর্থাৎ লৌহময় সূত্র ইহাতে বিদ্যমান আছে বলিয়াই কালসূত্র নাম হইয়াছে। লৌহসূত্র বিদ্যমান থাকার অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমাদের নিকট বোধ হয় লৌহখনি তথায় বর্ত্তমান থাকাতেই এই নাম হইয়াছে। উত্তরমেরুকেন্দ্র চুম্বকলৌহপ্রচুর বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উত্তর মেরুর ন্যায় দক্ষিণমেরু কেন্দ্রও লৌহপ্রচুর হওয়া অসম্ভব নহে। খনিতে প্রথম উৎপন্ন ধাতুই 'সূত্র' নামে অভিহিত হইতে পারে।

'কালসূত্রের পর যে 'আদ্যশব্দের' প্রয়োগ অমরকোষে আছে ভানুজিদীক্ষিত তাহার উপর এইরূপ টীকা করিয়াছেন "আদ্য শব্দেন তামিস্রান্ধতামিস্রাসি পত্রবনাদয়ঃ" অর্থাৎ 'আদ্য শব্দের দ্বারা তামিস্র' 'অন্ধতামিস্র' ও 'অসিপত্রবন' প্রভৃতি নরক বুঝায়। এস্থলে 'তামিস্র' 'অন্ধতামিস্র' প্রভৃতি নাম সূর্য্যাস্তের ছয় মাসের সময়

দক্ষিণ মেরুমণ্ডলের যে সকল স্থান গভীর তমসাচ্ছন্ন থাকে এবং অপর সময়ে ঐ স্থানের সলিলপ্রায়ত্বাৎ যে সকল স্থল নিবিড় কুজ্ঝটিকাবৃত থাকে তৎসমস্তেরই চিত্র যেন আমাদের নিকট উপস্থিত করে।

দক্ষিণ মেরুর হিমবাতের প্রখরতা হইতে ইহা অসির সহিত তুলিত হওয়া অসম্ভব নয়। অসিপত্রবন সেই প্রচণ্ড শীতবাত প্রবাহিত স্থানকেই বুঝায় বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক সমুদ্রযাত্রিকদিগের দ্বারা দক্ষিণমেরুর যে অবস্থা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে তাহাতে আমাদের কথারই সমর্থন পাওয়া যায় ঃ—

"Frequent mists and snow squalls have been reported by all voyagers in the Atlantic seas even in the height of summer." Encyclopaedia Britanica Supplementary Volumes.

"দক্ষিণ মহাসাগরের সমুদ্রযাত্রিক সকলেই তথায় এমন কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ও সচরাচর কুজ্ঝটিকা ও তুষার ঝঞ্ঝাবাতের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।"

হেমচন্দ্রের অভিধানে ভিন্ন ভিন্ন নরক ভূমির যে সমস্ত নাম পাওয়া যায় তৎসমস্তের সহিতও, দক্ষিণমেরুর পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সকলের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় হেমচন্দ্রের উল্লিখিত নরক ভূমি সকলের নাম এইরূপ ঃ—

"ঘনোদধি ঘনবাত তনুবাত নভঃস্থিতাঃ।
রত্ন শর্করা বালুকা পঙ্ক ধূমতমঃ প্রভাঃ॥
মহাতমঃ প্রভা বেত্যেহধো নরক ভূময়ঃ॥"

প্রথম নরকভূমির "ঘনোদধি" নাম হইতে বরফাবৃত সমুদ্রই যে নরক নামে অভিহিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে দক্ষিণ সমুদ্র নরকরূপে কল্পিত হওয়ার প্রমাণই আমরা পাইতেছি। দ্বিতীয় নরকভূমির 'ঘনবাত' নামের দ্বারা দক্ষিণ মেরুর চিরনীহারাচ্ছন্ন বায়ুই বুঝাইতেছে। 'তনুবাত' নামের দ্বারা আমরা মৃদুবায়ুর স্থান অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত Calm belt বা নির্ব্বাত মেখলা স্থানেরই উল্লেখ পাইতেছি। 'পঙ্ক ধূমতমঃ প্রভা' ও 'মহাতমঃপ্রভা' প্রভৃতি নামে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্দ্দমময় মেরুস্থানেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। 'নভঃস্থিত' নামের দ্বারা পর্ব্বতময় উচ্চস্থানেরই আভাস পাওয়া যায়।

নরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বা তপ্ত কটাহে পাপীদিগের দগ্ধ হওয়ার বর্ণনা বিশেষ ভাবেই পাওয়া যায়। দক্ষিণমেরুর হিমময় মণ্ডলে অগ্নির কি সম্ভাবনা হইতে পারে এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হয়। সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। আমরা দেখিতে পাইব যে দক্ষিণমেরুর বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যেই ইহার সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুর বর্ণনায় গ্রাহাম্ল্যাণ্ড ও ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ড নামক স্থানদ্বয়ের সীমা মধ্যে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দৃষ্টিগোচর হওয়ারই বিবরণ পাওয়া যায় ঃ—

"Active volcanoes have been seen both in the Graham Land and Victoria Land areas." Encyclopaedia Britanica Supplementary Volume.

উল্লিখিত আগ্নেয় গিরি ও ইহাদের শিখর সকল অগ্নিকুণ্ড ও তপ্তকটাহ রূপে কল্পিত হওয়া অসঙ্গত নয়।

প্রথমেই আমরা সিদ্ধান্ত শিরোমণি হইতে পৃথিবীর জ্যোতিষিক চতুর্ভাগের যে

বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহাতে দক্ষিণ দিগ্‌ভাগের (যাম্য) নাম আমরা 'বড়বানল' প্রাপ্ত হই। এই বড়বানল আগ্নেয় গিরি বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। দক্ষিণ মহাসমুদ্রে আগ্নেয় গিরির প্রাচুর্য্য হইতেই দক্ষিণদিকের দক্ষিণ ভাগ 'বড়বানল' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণদিক্ যমের দিক্ বলিয়া যেমন 'যাম্য' নামে অভিহিত হয়, 'বড়বানল' স্থানও তেমনই যমের অধীন অগ্নিময় নরক স্থান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

'নরক' নামের অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা আমরা দক্ষিণ মেরুকেই ইহার স্থান বলিয়া বুঝিতে পারি। নরকপর্য্যায়ের মধ্যে আমরা এই সমস্ত শব্দ দেখিতে পাই ঃ—

"স্যান্নারকস্তু নরকো নিরয়োদুর্গতিঃ স্ত্রিয়াম্॥"
"নারক, নরক, নিরয়, দুর্গতি।"

ইহাদের মধ্যে 'নিরয়' শব্দের বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে 'নির্' ও 'অয়' এই দুই শব্দ যোগে গঠিত দেখা যায়। ইহাতে 'নির্ নাই' (নাই) অয়ঃ গতিঃ (গমন) 'যত্র' অর্থাৎ যাহাতে যাওয়া যায় না ইহার এই অর্থই লব্ধ হয়। দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া অসম্ভব বা বিশেষ কষ্টকর বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 'নারক'ও 'নরক' শব্দ হইতেও পূর্ব্বোক্তার্থ পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা মনে করি। 'নারক' শব্দ 'নঞ্' পূর্ব্বক 'ঋ' ধাতুর যোগে সাধিত হইতে পারে। ঋ ধাতুর অর্থ গমন। সুতরাং 'নারক' শব্দ যাহাতে গমন অসাধ্য এরূপ স্থানকেই বুঝাইতে পারে। 'নরক' শব্দ 'নারক' শব্দেরই ভিন্নরূপ মাত্র বলিয়া ইহার অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে।

নরকের যে 'দুর্গতি' নাম পাওয়া যায় ইহাতেও দুঃখে বা কষ্টে গমনের অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া নরক যে দুর্গম স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই 'দুর্গতি' নামের সহিত 'স্বর্গনামের' তুলনা করিলে স্বর্গস্থান যে সুখে গমনের স্থান তাহাই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সুমেরুই স্বর্গস্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে—"মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রী রত্নাসানুঃ সুরালয়ঃ॥" সুতরাং ইহার বিপরীত দক্ষিণমেরু যে স্বর্গের বিপরীত নরক বা দুর্গতির স্থানরূপে কল্পিত হইবে তাহা সহজ বোধ্য। অর্থাৎ উত্তর মেরু সুগমন স্থান বলিয়াই স্বর্গ হইয়াছে এবং দক্ষিণমেরু দুর্গম স্থান বলিয়াই 'দুর্গতির' স্থান হইয়াছে।

উত্তরমেরু সুখের স্থান বলিয়া তাহা সুমেরু নামে অভিহিত হয় এবং দক্ষিণমেরু কষ্ট বা দুর্গতির স্থান বলিয়াই তাহা কুমেরু নামে অভিহিত হয়। যম যে দুর্গতির স্থান বা নরকের রাজা হইয়াছেন এবং তাহারই নামে যে দক্ষিণদিকের 'যাম্য' ও 'যাম্যা' নাম হইয়াছে—তাহাতে আর্য্যদিগের মধ্যে যমকেই আমরা প্রথম দক্ষিণমেরুর আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এক ঢিলে দুই পাখী

(ইংরাজি হইতে)

মিঃ স্পেনীং সেদিন দুপুরবেলা ইউষ্টন ষ্টেশনে একটি প্রথম-শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ধূমপায়ী, অতএব দেখিয়া শুনিয়া যে কামরায় ধূমপানের বাধা নাই সেইখানে উঠিলেন। বেশ আরাম করিয়া গদির উপর বসিলেন। তিনি একটি বড় দোকানের বিজ্ঞাপনবিভাগে কাজ করেন। সেই দোকানের স্বত্বাধিকারী সম্প্রতি একটি নূতন পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ডেরিংহামে যাইয়া এই ঔষধের প্রচারকল্পে চেষ্টা করাই মিঃ স্পেনীংএর এই রেলযাত্রার উদ্দেশ্য। সে দেশের লোকেরা তখনও এই ঔষধ সম্বন্ধে কিছুই শুনে নাই।

মিঃ স্পেনীং একজন পরিশ্রমশীল বুদ্ধিমান লোক। তাঁহার মাসিক মাহিয়ানাও খুব মোটা। সেইজন্যই জীবনের ছোট খাট সুখস্বচ্ছন্দগুলি উপভোগ করা তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ট্রেনে তিনি সর্ব্বদাই প্রথম-শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হোটেলে আহার করিতেন। এবং বর্ত্তমান 'ফ্যাসান' অনুযায়ী বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদে নিখুঁতভাবে সজ্জিত থাকিতেন।

মিঃ স্পেনীং যখন গাড়ীতে ঢুকিলেন, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। কিন্তু ট্রেন ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে আর একজন ভদ্রলোক সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকটি মিঃ স্পেনীংএরই সমবয়স্ক; দুজনের আকৃতি ও গঠনে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। একটি চাকর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেঞ্চির উপর একটি ছোট ব্যাগ রাখিয়া গেল। তার পর সে দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

নূতন আরোহী বলিলেন,—"জনসন, যদি পারি ত দশটার গাড়ীতেই ফিরবার চেষ্টা করব! যদি আমার দেরী হয় তা হলে লেডী কার্লটনকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করো।" চাকর উত্তর করিল,—"যে আজ্ঞে।" এবং যাইবার সময় প্রভুকে বিশেষ আদব-কায়দার সহিত সেলাম করিয়া গেল। মিঃ স্পেনীং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহযাত্রী একজন "লর্ড" উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

গার্ডসাহেব টিকিট দেখিতে আসিল। সে দুজনেরই টিকিট দেখিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া গেল,—"ব্লেচলি ষ্টেসনে আপনাদের গাড়ী বদলাতে হবে।" মিঃ স্পেনীং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের দুইজনেরই গন্তব্যস্থান এক।

মিঃ স্পেনীং চুরুট ধরাইয়া একমনে নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযাত্রীও একটি সুন্দর রৌপ্যনির্ম্মিত কেস হইতে

একটি 'হাবানা' বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে দুজনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মিঃ স্পেনীং পূর্ব্বে কখন ডেরিংহামে যান নাই। তাঁহার সহযাত্রী কি কার্য্যে সেখানে যাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল, কিন্তু ভদ্রলোককে তো সে-কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না, কাজেই তিনি মনের কৌতূহল মনে চাপিয়া সংবাদপত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে পাইলেন যে, কাগজের একস্থলে লেখা রহিয়াছে, "অদ্য অপরাহ্নে ডেরিংহামের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। লর্ড কার্লটন তাহার ভিত্তি স্থাপন করিবেন।"

ইহা পড়িয়াই মিঃ স্পেনীংএর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সহযাত্রীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্ট স্বরে বলিলেন,—"ডেরিংহাম বোধ হয় একটি ছোট গ্রাম।" লর্ড উত্তর করিলেন,—"আমারও সেইরকম বোধ হয়! আমি পূর্ব্বে কখনও সেখানে যাইনি। এই প্রথম যাচ্ছি।"

মিঃ স্পেনীং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি সেখানে নূতন হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছেন বুঝি?"

লর্ড উত্তর করিলেন,—"হাঁ আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে? বোধ হয় আপনি সেখানকার লোক।"

মিঃ স্পেনীং বলিলেন, "না। আমি এ সংবাদ এইমাত্র কাগজে পড়লুম। মহাশয়ের নামই বোধ হয় লর্ড কার্লটন।"

লর্ড উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমারই নাম। এই গ্রামের নামও আমি পূর্ব্বে জানতাম না; কিন্তু এই প্রকার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে শুনে সেখানকার লোকেরা আমাকে ভারি পীড়াপীড়ি করে ধরেছে। আমি তাদের অনুরোধ এড়াতে পারিনি। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাকে একাজ করতে হচ্ছে, যদিও হাতে অনেক দরকারী কাজ আছে। তাছাড়া আমার শরীরটাও আজ তেমন ভাল নেই। খালি ঘুম পাচ্ছে!"

মিঃ স্পেনীং বলিলেন,—"আপনার শরীর অসুস্থ শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম। বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রমে এরকম হয়েছে।"



ট্রেনের কামরায়
মিঃ স্পেনীং—"একটা বড়ি নিলে বাধিত হব।"

লর্ড উত্তর করিলেন,—"না, তা নয়; আমার লিভারের দোষ ঘটেছে বলে মনে হয়। এরকম প্রায়ই আমাকে ভুগতে হয়।"

মিঃ স্পেনীং উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"এর জন্যে এতো কষ্ট! এত সহজেই সেরে যায়। আপনি "সরলভেদী বটিকা" সেবন করুন। দুচার দিনের মধ্যে একেবারেই নীরোগ হয়ে যাবেন। লিভারের পক্ষে অমোঘ ঔষধ! আমার কাছে এক বাক্স আছে; আপনি দয়া করে একটা বড়ি নিলে বিশেষ বাধিত হব।"

লর্ড ধীরে ধীরে বলিলেন,—"না মাপ করবেন। আমি পেটেণ্ট ওষুধের উপরে একেবারে চটা। ওসবে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।" কিন্তু মিঃ স্পেনীং নাছোড়-বান্দা, তিনি জিদ করিতে লাগিলেন,—"কিন্তু মহাশয়, এ বড়িগুলির গুণ অসাধারণ। এ যেমন-তেমন পেটেণ্ট ওষুধ নয়। এর বিস্তর কাটতি—একবার পরীক্ষা করে দেখুন।"

লর্ড বলিলেন,—"কই পূর্ব্বে ত এ ওষুধের নাম কখনো শুনিনি। আজ এই প্রথম আপনার নিকট শুনলুম।"

মিঃ স্পেনীং যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এঁ্যা, বলেন কি মহাশয়! এর নাম শোনেন নি? এর বিজ্ঞাপন ত সর্ব্বত্রই দেওয়া হয়েছে।"

লর্ড একটা তচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"ওঃ বিজ্ঞাপন! সে তো আমি পড়িই না;—বিশেষতঃ ওষুধের বিজ্ঞাপন। ঐসব হাতুড়ে ডাক্তারের তৈরি ওষুধের নাম শুনলেই ভয় হয়।"

এই উত্তর শুনিয়া মিঃ স্পেনীং হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন। লর্ডও চটিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর লইয়া একজন অপরিচিত লোক এমন করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা দুইজনে গুম খাইয়া গেলেন।

মিঃ স্পেনীংএর সহিত আর কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকায় বা পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যে কারণেই হউক লর্ডের তন্দ্রা আসিল। তিনি গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ট্রেণ যথাকালে ব্লেচলি ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। লর্ড কার্লটন তখনও ঘুমে অচৈতন্য।

মিঃ স্পেনীং গাড়ি থামিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঘুমন্ত লর্ডের দিকে একবার চাহিলেন, তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। পেটেণ্ট ঔষধের উপর লর্ড যে ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এ কথা তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি পেটেণ্ট ঔষধের এজেণ্ট—সেই পেটেণ্ট ঔষধকে তাচ্ছিল্য করাটা তাঁহাকেই তাচ্ছিল্য করা—এই কথাই তাঁহার বারবার মনে হইতেছিল। তিনি ইহার জন্য নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। আর বিলম্ব করিলেন না; তিনি লর্ডকে ঘুম হইতে না উঠাইয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আবার ৭০ মাইল পরে গাড়ী থামিবে। লর্ডের অবস্থা ভাবিয়া স্পেনীং উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মিঃ স্পেনীং অন্য গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ডেরিংহাম ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি দেখিলেন ষ্টেসনটি সুন্দর পতাকা ও লতাপাতায় সাজানো হইয়াছে; নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।



প্লাটফর্ম্মে
—"আপনার নামই বোধ হয় লর্ড কার্লটন?"

মিঃ স্পেনীং খানিকক্ষণ অব্যবস্থিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখানে তিনি কি প্রথম আসিয়াছেন, কোনদিকে যাইবেন কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বোধ হয় নগরাধ্যক্ষ (মেয়র) ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নামই বোধ হয় লর্ড কার্লটন।"

হঠাৎ একটা ফন্দী মিঃ স্পেনীর মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তিনি এক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে স্থির করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনিই লর্ড কার্লটন।

সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভা-মণ্ডপে লইয়া গেল। ভিত্তি স্থাপনার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও সংবাদদাতাগণের সম্মুখে এক সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃবর্গ ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল। বক্তৃতার শেষ অংশ সকলের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেটুকু আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার এখনও দরকার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আর দুদিন বাদে ইহাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না! তখন ইহা অতীতের স্মৃতিস্বরূপ আমাদের মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। সেদিন আসিবার আর বেশী বিলম্ব নাই! মানুষের ক্ষমতা ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ বিকাশের ফলস্বরূপ পারকিনের সরলভেদী বটিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই কথা আমি বলিতেছি, তাহা আপনারা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। এই ঔষধের নাম আপনারা অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কার সকলেই শতমুখে প্রশংসা করিতেছে। ইহা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার শেষ ফল যে কি হইবে, তাহা কেহই বলিতে

পারেন না। এই বড়ী সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, পেটব্যথা, অম্বল, অগ্নিমান্দ্য, মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, সর্দ্দি, কাশী, প্রভৃতি সকল প্রকার অসুখই আরোগ্য হয়। এক কথায়, ইহা মানুষকে নবজীবন দান করিবে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যাবতীয় রোগে ইহা অদ্বিতীয়। ইহার অসম্ভব কাট্‌তি। লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্র। মোটের উপর সকলে যখন ইহা সেবন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন পৃথিবীতে আর কাহারও অসুখ থাকিবে না। ধরাতল তখন সুখ ও শান্তির আগার হইবে। সকলেই চিরযৌবন ভোগ করিবে। তখন আর এরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কোন আবশ্যকতা থাকিবে না। কিন্তু আমাদের সেজন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই।

কারণ এই সকল হাঁসপাতাল-বাড়ী তখন বাড়ী লাইব্রেরী, যাদুঘর ও পাঠাগারে পরিণত হইয়া দেশবাসীকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবে। মানুষের তিমিরাচ্ছন্ন কুসংস্কার-পূর্ণ মনকে সত্য ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবে। নরনারীর স্বাস্থ্যের সহিত তাহাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট বলাই বাহুল্য। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সে শুভদিন আসিবার বেশি বিলম্ব নাই। এই "সরলভেদী বটিকা" অল্পদিনের মধ্যেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে।"

মিঃ স্পিনীং আসন পরিগ্রহণ করিলেন। ঘন ঘন করতালিতে সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল। তারপর নগরাধ্যক্ষ "লর্ড কার্লটনকে" সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তখন একজন পিওন একখানি টেলিগ্রাম লইয়া মিঃ স্পেনীং এর দিকে অগ্রসর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—"আমার টেলিগ্রাফ বোধ হয়, দেখি।" পিওন স্বহস্তে তাঁহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।



সভাস্থলে

—"সরলভেদী বটিকা অসম্ভবকে সম্ভব করিবে।"

টেলিগ্রামখানি নগরাধ্যক্ষের নামে সম্বোধন করা হইয়াছিল। লেখা ছিল,—"বড়ই দুঃখের কথা যে ট্রেণে দুর্ঘটনা ঘটায় যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না। আজ আর পৌঁছিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। সবিশেষ সংবাদ পত্রযোগে লিখিতেছি, আমার ত্রুটি আপনারা মার্জ্জনা করিবেন—ইতি লর্ড কার্লটন।"

মিঃ স্পেনীং টেলিগ্রাম পড়িয়া নগরাধ্যক্ষকে বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে লেডী কার্লটনের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম যে হঠাৎ তিনি বড়ই পীড়িত হইয়াছেন। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আপনারা কিছু মনে করিবেন না।"

পথে যাইতে যাইতে মিঃ স্পেনীংএর মনে হইতেছিল আজ আমার কি সুদিন! আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের মতো একদিনের জন্য রাজা হইয়া কতই না আদর-অভ্যর্থনা উপভোগ করিলাম। এবং আমার যে কাজ বিজ্ঞাপন প্রচার করা তাহাও চূড়ান্তভাবে হইল;—এক ঢিলে দুই পাখী যে মারিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে লর্ডের পত্র নগরাধ্যক্ষের হস্তগত হইল। তাহা পড়িয়া সকলে খুব হাসিল। তারপর যত দিন যাইতে লাগিল ক্রমেই এই মজার কথা সকলে ভুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সরলভেদী বটিকার কথা কেহ ভুলিতে পারিল না—বিশেষ লর্ড কার্লটন! যে জিনিস লইয়া তাঁহার উপর দিয়া এত বড় একটা পরিহাস হইয়া গেল তাহা কি ইহজীবনে ভোলা যায়!

লর্ড কার্লটন নিশ্চয় মিঃ স্পিনাংকে ইহার জন্য ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে সব কথায় আমাদের দরকার নাই,—সে অন্য গল্প!

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অভিসারে

সজ্জা করে গো সজ্জা করিয়া
যাইতে তুঁহার পাশ,
পারিনেক তাই মাথা ও তিলক
পরিতে গৈরি বাস।

গোপনে ভেটি গো গুপ্ত বঁধুয়া
হৃদি-মন্দির মাঝে,
নাম ধরে তুঁহা পারিনে ডাকিতে
মরমে সরম বাজে।

হাসি আসে মনে বসিতে ধেয়ানে
নয়ন মুদি গো যদি,
অন্তরে বাহিরে বহে তো সদাই
রূপের ফল্গু নদী।

গুপ্ত তুঁহার পীরিতি মধুর
ভালবাস লুকোচুরি,
চুপে চুপে তাই যাই তুয়া পাশে
দেখায়ে কিছু না পারি।

শ্রীগরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৮)

এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার নাম ছিল "সঞ্জীবনী সভা"। ছেলে-বেলাকার সেই Masonic সভার ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ! ঠন্‌ঠনের একটা পোড়ো বাড়ীতে এই সভা বসিত। এ বাড়ীতে পূর্ব্বে না কি একটা স্কুল ছিল জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এ বাড়ীর যে কে মালিক তাহা তাঁহারা তখন ত' জানিতেনই না, আজ পর্য্যন্ত জানেন না। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। বালক রবীন্দ্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আস্‌বাবপত্রের মধ্যে ছিল, একখানা ছোট ভাঙ্গা টেবিল, কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার ও ছোট টানা পাখা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় সমস্ত হিতকর ও উন্নতিকর কার্য্য এ সভায় অনুষ্ঠিত হইবে ইহাই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেইদিন, অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি। এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা করা হইবে, তাহা কাহারও প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না।

আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান' বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এ সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসান' ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্"। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ গল্প-গুজব) আরম্ভ হইত। কার্য্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় "সঞ্জীবনী সভা"কে "হাঞ্চু মু হাঞ্চ" বলা হইত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করিতে যত্নবান্ হউন!

ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ-গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত।

প্রথম প্রথম সভার কার্য্য খুব দমেই চলিতে লাগিল। নিত্য নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অনেক বিষয়ে থাকিত না। যাহার যেরূপ কল্পনা খেলিত সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ কাল্পনিক সুখে বেশ দিন কাটিয়া যাইত। একদিন সভায় জ্যোতিবাবু স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষে সার্ব্বজাতিক ঐক্য সাধন করিতে গেলে একটা সার্ব্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যক। জ্যোতিবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার নানাবিধ কল্পনা করিতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল যে মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয় ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে এরূপ একটা শোলার টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ বেশ সার্ব্বজনীন্ পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ দর্জ্জির দোকানে গিয়া মালকোঁচা-মারা কাপড় সেলাই ও পূর্ব্বোক্ত রূপ শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া হইল। পোষাক হইল, কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? জ্যোতিবাবু বাহির হইলেন। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে জ্যোতিবাবু এই হাস্যকর পোষাক পরিয়া কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলেন। লোকের পরিহাসবিদ্রূপে তিনি লক্ষ্যও করিলেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে "দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীর পুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সার্ব্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না তখন অগত্যা এ কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলেন। সর্ব্বপ্রথম দেশালাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াসে কয়েক বাক্স দেশলাই প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহার উপযোগী হইল না। একেত খরচ খুব বেশীই হইয়াছিল, ইহা ছাড়া দেশে কাঠির অভাব, সেজন্য যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দেশলাই শীঘ্র জ্বলিতও না। যখন পদে পদে এইরূপ অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন সভ্যগণ দেখিলেন যে এ অসাধ্য ব্যাপার সাধনে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

এই সুযুক্তির ফলে, সভায় এক নূতন কাপড়ের কল প্রস্তুত হইল। আবার নানা-বিধ জল্পনা কল্পনা সুরু হইল। সভ্যদের উদ্যম আবার দ্বিগুণ হইল। সভায় ইহাও স্থির হইল যে ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি তাঁত বসাইতে হইবে, এবং এজন্য একখানি বাড়ী তৈরি করিতে হইবে। সভ্যেরা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। এইরূপে যে সামান্য কিছু টাকা জমিয়াছিল তাহাতেই এইরূপ এক বিরাট কল্পনা করা হইল। দেখিতে দেখিতে নব প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একখানি গাম্‌ছা প্রস্তুত হইল। ব্রজবাবু সেই গাম্‌ছা মাথায় বাঁধিয়া তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল, আর অন্য কিছুই সে কলে বাহির হয় নাই।

এই সঞ্জীবনী সভার সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে আহারের একটি বিধি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে নানা জাতিবর্ণের

লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ী পর্য্যন্ত। কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার সভার গঙ্গার ধারের একটি বাগান বাড়ীতে ইঁহাদের একদিন প্রীতি-ভোজ হয়। জমিদার সভ্যটি একটু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও তিনি সভার সভ্যদিগের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি বোধ হয় সভার গণ্ডীকে জগন্নাথ-ক্ষেত্রের সামিল মনে করিতেন। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব একটা ঝড় উঠিল! রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া "আজি উন্মদ পবনে—" বলিয়া রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সহকারে দারুণ উৎসাহ-ভরে গানে যোগ দিলেন। সে ঝড়ের মাতামাতির চেয়ে ইঁহাদের মাতামাতিই তখন বেশী!

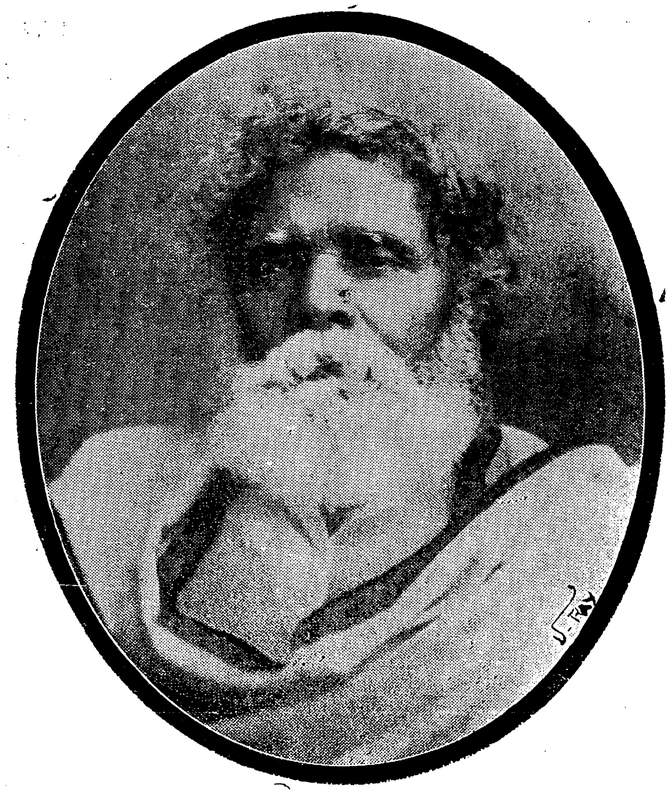

রাজনারায়ণ বসু

জ্যোতিবাবু বলিলেন "রাজনারায়ণ বাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড়; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত করিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের আধিক্য ও প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিমান ছিল না। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, আমাদের সঙ্গেও তেমনি সর্ব্বদা হাসিমুখে ছেলেমানুষী করিতে পারিতেন। তাঁহার অনেক হাসির গল্প পুঁজী ছিল—তিনি ঐরূপ একটি গল্প বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি নিজেই উপভোগ করিয়া—দুই এক সেকেণ্ড স্তম্ভিত থাকিয়া, তাহার পরেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিতেন। সেই খোলা হাসির মধ্যে একটি মধুর সরলতা ছিল।"

"তাঁহার রচিত "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" তখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের পূজার দালানে, এখন যেখানে উপাসনা হয়, একবার একটি সভা আহূত হয়। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি; রাজনারায়ণ বাবু "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। রেভারেণ্ড কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেণ্ড কালিচরণ তাহার খুব তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন,—তখন তাঁহাকে আবার বলিয়া-কহিয়া বসাইয়া রাখা হয়।

"রাজনারায়ণ বাবু যখন 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তক প্রণয়ন করেন তখন আমি ফরাসী গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষক অনেক লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। পরিশিষ্টে যে সমস্ত ফরাসী লেখা উদ্ধৃত আছে, সেগুলি আমারই সঙ্কলিত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীর সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জ্যোতিবাবু physiognomy (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "বালকে" স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ শির-সামুদ্রিক অনুসারে চরিত্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু ও রাজনারায়ণ বাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্ত-অঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ্ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে জেলের ডাক্তার Robertson সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ হইয়াছিল। এই রবার্টসন্ সাহেব পরে গিল্‌গিট্ দেশে গিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব দেখাইয়া নাইট্ (knight) উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যোতিবাবু তাঁহার মাথা দেখিয়া চরিত্র বর্ণনা করিয়া একখানি কাগজে তাঁহার চরিত্র বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি জ্যোতিবাবুর উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এইখানে জ্যোতিবাবু সাহেবের অনুমতি অনুসারে জেলের সব পায়ে-বেড়ী-পরা দাগী বদ্‌মাইস্ কয়েদীদের ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধবও তাঁহাকে মাথা দেখাইতেন। ইহাতে মাথা টিপাইবার কাযও অনেকটা হইত। স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয় কখনও কখনও বলিতেন "ভাই জ্যোতি আমার মাথাটা একবার দেখ ত?" এইরূপে তিনি মাথা টিপাইবার আরাম উপভোগ করিতেন।

জ্যোতিবাবু পণ্ডিত, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন—পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, তাঁহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকটা মেলে বটে। শেষে তিনি জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ফ্রেনলজিতে তোমার কি খুব বিশ্বাস? —ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক্?"—জ্যোতিবাবু বলিলেন, আমি ফ্রেনলজিষ্টদের সব কথা বিশ্বাস করিনে,—মোটামুটি কতকটা মেলে— এই মাত্র।"—

"তুমি যে ফ্রেনলজির গোঁড়া ভক্ত নও, এ কথা শুনে ভারী খুসী হলেম।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু একবার "ইণ্ডিয়ান মিরারের" সম্পাদক ৺ নরেন্দ্রনাথ সেনের মাথা দেখিয়া তাঁহার চরিত্র-বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিয়াছিলেন, "তাঁর ক্রোধ হইলে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।" এই কথায় সেন মহাশয় বলেন, "আপনি বোধ হয় একথা কারও কাছে শুনিয়াছেন?"—কিন্তু যখন শুনিলেন যে জ্যোতিবাবুর নিকট এ সংবাদ একেবারেই অবিদিত, তাঁহার মাতার লক্ষণ দেখিয়াই তিনি একথা বলিতেছেন তখন নরেন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

"বালক" এক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, তাহার পর "ভারতী"র সঙ্গে মিলিয়া যায়।

আবার জ্যোতিবাবু এক সভা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এবার আর দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য নহে, এবার বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য। সভার নাম হইল "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।" সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটী। প্রথম, বঙ্গভাষার অভাব মোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বর্দ্ধন; এবং তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন। তাঁহার রচিত অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে:—

(১) সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা হয় ও সৌহার্দ্দ জন্মে।

(২) পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান প্রদান হওয়ায়, একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

(৩) এই বিদ্বজ্জন সম্মিলনের উপলক্ষে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহুবিধ শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বহু ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা

আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে ও তৎসঙ্গে বঙ্গভাষায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ একখানি অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দ সমূহ বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয় তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) গ্রন্থলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(২) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ পত্রের সম্পাদকতা



বিদ্যাসাগর

করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৩) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা সভার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৯) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(১২) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে —তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনালিখিত তর্কবিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজমত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(১৩) সভার অন্যান্য কার্য্য-বিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্ত সার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায়

সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ সন্দর্ভপত্রে প্রকাশিত হইবে। সভায় যে-কোনও মত ব্যক্ত হইবে, তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন, ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ, ও



রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বক্তৃতাদির কায না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

যেমন এই কল্পনা জ্যোতিবাবুর মাথায় উদয় অমনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া তিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর সহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তোমরা বড় মানুষের ছেলে, কোনও বদ্‌খেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও ত' সে ভালই। কিন্তু বাবা একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা লোকদের এর মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হবে।" আমরা কিন্তু হোম্‌রা চোম্‌রা লোক লইয়াই কায আরম্ভ করিলাম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের প্রথম সভাপতি হইলেন। ভূগোলের ইংরাজী শব্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে সুরু করিয়া দিলেন। দুই তিন অধিবেশনে বেশ কায চলিয়াছিল—কিন্তু তার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা ফলিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণই এ সভার সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে "Accademy of Bengali Literature" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক ভারত ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

ইহাই য়ুরোপীয় সভ্যতা। এখন দেখা যাউক, এসিয়ায় ইহার বিস্তার পক্ষে কি-বাধা হইয়াছিল।

এই বাধা দুই প্রকার। কতকগুলি বাধা এসিয়ার লোকদিগের অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন, আর কতকগুলি বাধা, তাহারা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে চক্ষে দেখিত তাহা হইতে উৎপন্ন।

***

যে-বিভিন্ন জাতি হইতে এসিয়িক সভ্যতা উৎপন্ন সেই জাতিদিগের পরস্পর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্নতাই এই এসিয়িক সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ।

অবশ্য, এই সকল জাতিদিগের ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক—তাহাদের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ নির্ণয় করা আবশ্যক। আর্কেমেনিদিগের শাসনাধীনে, কালিফ্‌দিগের শাসনাধীনে, পূর্ব্বতন এসিয়িক রাষ্ট্রসকল, এক রাজার রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল; ইরাণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বরাবরই সমান চলিয়া আসিয়াছিল। অটোমান সাম্রাজ্য ও আফগানিস্থান-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতেই পারস্য, সভ্যজগৎ হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পারস্য, গ্রীস ও আরবদিগের প্রভাবাধীনে অবস্থিত ভারত, হিন্দো-চীনে ও (Sond) সন্দ-দ্বীপপুঞ্জে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

তুর্ক ও মোগলগণের সাহায্যে চীন, পুরোবর্ত্তী এসিয়ার সহিত বহুবার সম্মিলিত হইয়া —হিন্দো-চীনকে, কোরিয়াকে, ও জাপানকে সভ্য করিয়া তুলে। অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম,—স্বকীয় মত-বিশ্বাস ও শিল্প-কলার আদর্শ সমস্ত এসিয়ার মধ্যে বিস্তার করে। তথাপি পারস্য, ভারত, ও চীনকে একে একে সভ্যতার সমস্ত ধাপ পার হইতে হইয়াছিল। গ্রীস, রোম, গল ও জর্ম্মণি যেরূপ অন্য জাতি হইতে উন্নত সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, উহারা সেরূপ অন্য জাতি হইতে সভ্যতা লাভ করে নাই। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। জাপান আধুনিককালে অন্যান্য এসিয়িক জাতি হইতে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। তাই জাপান আজ এত উদ্যমশীল।

প্রাচ্য জাতিদিগের মধ্যে এই আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা হইতে কতকগুলি ফল উৎপন্ন হইয়াছে যাহা প্রণিধান-যোগ্য।

বহুশতাব্দী হইতে সভ্যতা চলিয়া আসায় এসিয়ার এই সভ্যতার মধ্যে একটা গভীরতা ও ব্যাপকতা আসিয়াছিল। টন্‌কিনে, অ্যানামে, চীনে, জাপানে, দেখা যায়. ইতরসাধারণ লোকেরা কতকটা শিক্ষা পাইয়াছে—এমন কি, চিত্তোৎকর্ষবিধায়িনী সুশিক্ষা পাইয়াছে। ঐ সব দেশে এই ব্যাপারটা য়ুরোপীয়দিগের খুব নজরে পড়ে।

এক শতাব্দীকালের মধ্যে একটা সমস্ত জাতি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে; কিন্তু ঐ জাতিকে গড়িয়া তুলিতে বহুশতাব্দী আবশ্যক। ইংরাজেরা, জর্ম্মাণেরা, ইটালীয়দিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্, অধিক ধনশালী, অধিক গর্ব্বিত, অধিক আত্মসংযমী; বিদ্যালয় তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের মনোগতি আধুনিক ধরণের; কিন্তু তথাপি ইংলণ্ড ও জর্ম্মণির ইতরসাধারণের সহিত তুলনা করিলে,—ইটালীর ইতরসাধারণ বহু প্রাচীনকাল হইতে সভ্য, আরও সম্পূর্ণভাবে সভ্য,—এইরূপ ধারণা হয়। আনাম-দেশের ও জাপানের জনসাধারণ সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। একথা সত্য, জাপানী চাষা বা চীনীয় চাষার সহিত ভারতীয় রায়তের পার্থক্য আছে। আগন্তুক তামুলদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেও, ব্রহ্মী ও সিংহলীরা তামুলদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য। হিন্দুদের যে এই নিকৃষ্টতা তাহার কারণ তাহাদের বর্ণভেদ প্রথা। তথাপি একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই সভ্য এবং সকলেরই চরিত্রে একটা মাধুর্য্য আছে। চরমপ্রান্তবর্ত্তী এসিয়ার লোকেরা খুব সভ্য, কিন্তু সেই প্রত্যেক জাতিরই একএকটা নিজস্ব সভ্যতা আছে। জটিলতাই য়ুরোপীয় সভ্যতার একটা মুখ্য লক্ষণ। Calabra বা Sicile-র রূঢ়প্রকৃতি চাষারা, হিব্রুদিগের নিকট হইতে, ইজিপসীয়দের নিকট হইতে, ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে, রোমকদিগের নিকট হইতে, গ্রীকদিগের নিকট হইতে, সারাসেনদিগের নিকট হইতে, জর্ম্মণ, নরমান, স্পেনিয়ার্ড অথবা বিজয়ী জর্ম্মণ বা

ফরাসীদিগের নিকট হইতে তাহাদের মত বিশ্বাস ও প্রথাসকল ধার করিয়াছিল। এপ্রকার এসিয়ায় দৃষ্ট হয় না। বৈদেশিকের নিকট নানাবিষয়ে ঋণী হইলেও, হিন্দুসমাজ মোটের উপর একটা হিন্দুপ্রকৃতি বজায় রাখিয়াছে; জর্ম্মাণসমাজ তাহা বজায় রাখিতে পারে নাই। ইতালীয় রীতিনীতি ততটা ইতালীর রীতিনীতি নহে—কিন্তু চীনের রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে চীনেরই রীতিনীতি। পর-সংস্রব-বর্জ্জিত হইয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকিবার ফলে প্রাচ্যজাতিদিগের সভ্যতা ঐতিহ্য-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত য়ুরোপীয় জাতিরাও একসময়ে ঐতিহ্য-ভক্ত ছিল। কিন্তু তাহাদের মতবিশ্বাসের জটিলতাই এই ঐতিহ্য-ভক্তিকে উচ্ছেদ করিয়াছে।

আধুনিক ফরাসীদিগের নৈতিক পূর্ব্বপুরুষ কাহারা? যে সেল্‌ট জাতিকর্ত্তৃক ফরাসী দেশ অধ্যুসিত, এবং অনেক ফরাসী যাহাদের বংশধর—সেই সেল্‌ট্ জাতিই কি ফরাসীদিগের নৈতিক পূর্ব্বপুরুষ? যে ইহুদি জাতি হইতে তাহারা ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, যে গ্রীক ও রোমকেরা "গল্"কে সভ্য করিয়াছে, যে জর্ম্মাণজাতি, তাহাদিগকে নারীসম্মান ও "স্বাধীন মনুষ্যের সমান স্বত্বাধিকার" সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছে,—ইহাদের মধ্যে কাহারা তাহাদের নৈতিক পূর্ব্বপুরুষ? অ-খৃষ্টান Vercengetorixকে খৃষ্টানেরা কখনই সেই ধর্ম্ম দিতে পারে না, যে ধর্ম্ম তাহারা খৃষ্টান Vercengetorixকে দিবে। যে ফরাসী জাতিকে রোমীয় জ্ঞানবিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছে সেই ফরাসীজাতি Vercengetorix অপেক্ষা Cesar-এর নিকটেই বেশী ঋণী বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে। পক্ষান্তরে, চীনীয়েরা, চীনবাসী কংফুচুর উপদেশই অনুসরণ করিয়া থাকে; জাপানীরা যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, সেই শিন্তোধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে জাপানেরই ধর্ম্ম; এবং ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ,—ভারতেরই ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই চীনীয়, জাপানী ও হিন্দুরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু আমরা তাহা পারি না।

এই ঐতিহ্য-ভক্তি হইতে অনেকগুলি ফল প্রসূত হইয়াছে। যেহেতু পিতৃপুরুষেরা সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন অতএব বিশ্বমানবের আর উন্নতি হইতে পারে না, প্রত্যুত বিশ্বমানবের অবনতি হইতেছে। ইহা হইতেই অধঃপতনের ধারণা। যেহেতু পিতৃপুরুষেরা সমস্ত বিজ্ঞানই অবগত ছিলেন, অতএব নূতন বিজ্ঞানগুলি অলীক বিজ্ঞান অথবা অনিষ্টজনক বিজ্ঞান। তাই, অনুমান-সিদ্ধান্ত বা ব্যাপ্তিগ্রহ (induction) তাহাদের নিকট একটা বিভীষিকা;—পিতৃপুরুষদের মতবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করিয়া একটা নিজের মতবিশ্বাস স্থাপন করা—এযেন শিশুর দুঃসাহসিকতা, শিশুর অনধিকার চর্চ্চা; তাই, বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কথা শুনিলে তাহাদের যেন একটা আতঙ্ক হয়; পূর্ব্বপুরুষদিগের মতবিশ্বাসের যৌক্তিকতা তলাইয়া দেখা—ইহা ত কম ধৃষ্টতা নহে। তাই, সমস্ত ভৌতিক উন্নতিসম্বন্ধে তাহাদের একটা বিষম শঙ্কা; কেননা এই সকল উন্নতি হইতে,—রীতি-নীতি, প্রথা, লৌকিক বাস্তু-শিল্প প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই ঐতিহ্য-ভক্তির পরিণাম-ফলে সেই একই

রীতিনীতির ধারাবাহিকতা, একই হৃদয়-ভাবের প্রবাহ, প্রণালীবদ্ধ কপটতা, ক্রিয়াকাণ্ডের গতানুগত্য, বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেষ, বাঁধা-নিয়মের অনুসরণ, চরিত্রের নির্ব্বীর্য্যতা, কোন একটা বৃহৎ উদ্যমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অসামার্থ্য। ইহারই পরিণাম-ফলে মনের সঙ্কীর্ণতা, কৌতূহলের অভাব, সমস্ত নূতন চিন্তাকল্পনার প্রতি দোষারোপ, কেবল একমাত্র স্মৃতি-শক্তির অনুশীলন। সমস্ত প্রাচীন শিক্ষা একমাত্র এই স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। স্মৃতিচর্চ্চার সঙ্গেসঙ্গে —অনুকরণ, আবৃত্তি, প্রাচ্যপ্রতিভা-প্রসূত রচনাবলীর যাহা বিশেষ লক্ষণ সেই অকাল-উৎপন্ন ক্লান্তি—এই সমস্ত আসিয়া পড়ে। তাই, সমস্ত এসিয়িক জাতির প্রথা ও রচনাবলী আমাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, তাহাদের নিঃসঙ্গ উদ্যম চেষ্টা তাহাদিগকে পরিক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের অতি প্রাচীন সভ্যতা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলেও যথেষ্টরূপে পরিপুষ্ট হয় নাই।

এবং রাজ্যশাসন, সামাজিক গঠন, ও আর্থিক ব্যবস্থা প্রণালীর উপরেও ঐতিহ্য-ভক্তির প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যশাসনে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা। ফলতঃ এইরূপই ঐতিহ্য;—যেমন অন্যান্য বিষয়ে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাছাড়া, ঐতিহ্য,—রাজপদের সহিত ধর্ম্মের ভাব ও পিতৃশাসনতন্ত্রের ভাব জুড়িয়া দিয়াছে। মিকাডো—দেবতাদিগের বংশধর; চীনের সম্রাট—ঈশ্বরের পুত্র ও চীন-বাসী লোকপুঞ্জের পিতা; অনেকগুলি হিন্দু রাজার পূর্ব্বপুরুষ —রাম অথবা কৃষ্ণ;—উভয়েই ভগবানের অবতার বলিয়া পরিগণিত।

এসিয়িক লোকেরা যেরূপ মৃত পিতৃপুরুষদিগকে পূজা করে সেইরূপ জীবিত পিতৃপুরুষদিগকেও ভক্তি করে; প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত জাতি এখনও পিতৃ-শাসন তন্ত্রাধীনে অবস্থিত। কংফুচুধর্ম্ম পিতার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে; জাপানীদের প্রাচীন নিয়মও এইরূপ ছিল। ভারতে, ১০০।২০০ লোক লইয়া একটি পরিবার গঠিত; আবার এই পরিবারও বর্ণভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই ব্যক্তি-বিশেষের,—কি স্থাবর, কি অস্থাবর, কোন স্বত্বাধিকার নাই; সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য সাধারণের; নিজের কোন স্বাধীনতা নাই; যাহার সহিত কখন দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই এইরূপ এক শিশুর সহিত, খুব অল্প-বয়সেই বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া যায়; সে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। তাহার রীতিনীতি স্বীয় পিতৃপুরুষ-দিগেরই রীতিনীতি, এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবসাই তাহার ব্যবসায়। (১)

পিতৃশাসনতন্ত্রের আর্থিক পরিণাম এইরূপঃ—ব্যবসায়ের কোন উন্নতি নাই; যন্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রয়োগের প্রণালী—ঐতিহ্যই

(১) ভারতে, এই পারিবারিক প্রণালীর মধ্যে কতকগুলি সীমাবন্ধন আছে, এবং সমস্ত এসিয়ায়, সামাজিক ক্রমবিকাশের ফলে; খুব আস্তে আস্তে, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্ভব হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সমাজের উপাদান-গঠনে কোন স্থিতিস্থাপকতা নাই; শ্রমশিল্পী ও বণিকের বংশ অতীব সীমাবদ্ধ; তাহারা সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ধাপ অধিকার করিয়া আছে। কোন এক ব্যবসায়ের যতই প্রাধান্য হউক না কেন, সেই ব্যবসায়ী-বংশের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে না। যদি কোন ব্যবসায় নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কেবল দুঃখ-দারিদ্র্য সেই ব্যবসায়ী-বংশকে অনুসরণ করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন কারিগর ধনশালী হইয়া উঠে, তথাপি তাহার পদের গৌরব কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, কোন বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। সে তাহার সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারিবে না, অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। যে সমাজ এইরূপ অচল, সে সমাজ কিরূপে সমৃদ্ধ হইবে, বা পরিপুষ্ট হইবে? পক্ষান্তরে, তাহাদের উচ্চাভিলাষ মরিয়া গিয়াছে, তাহারা অল্প লভ্যেই সন্তুষ্ট। খুব বুদ্ধিমান, খুব উদ্যমশীল হইলেও, তাহাদিগকে স্বীয় পৈতৃক অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। তাহাদিগের আশা করিবার কিছুই নাই, ভয় করিবারই যথেষ্ট কারণ আছে; সমাজের গঠন-বিধান এরূপ দৃঢ়বদ্ধ, বর্ণভেদের বন্ধন, ব্যবসায়-সম্প্রদায়ের বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন এরূপ পবিত্র, যে, রোগে বা আপদ-বিপদে সকল ব্যক্তিই নিশ্চয় সাহায্য পাইবে বলিয়া ভরসা রাখে। সুতরাং, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা না থাকায়, জীবনে তাহাদিগের একপ্রকার মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া, বা অত্যন্ত দ্রুতভাবে কাজ করিয়া কেহই শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে না।

***

এক্ষণে, য়ুরোপসম্বন্ধে এসিয়িকদিগের কিরূপ ধারণা, তাহার অনুসন্ধান করা যাক্। অবশ্য তাহাদের ও আমাদের সামাজিক প্রণালীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু তাহারা যদি য়ুরোপকে ভাল করিয়া জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা য়ুরোপের শক্তি-সামর্থ্যের প্রশংসা করিত; য়ুরোপীয়দের রীতিনীতির মধ্যে এমন অনেক লক্ষণ দেখিতে পাইত যাহা তাহাদের নিজের রীতিনীতি স্মরণ করাইয়া দেয়। তদ্বিপরীতে, যে-সকল য়ুরোপীয় এসিয়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়াই য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের একটা ধারণা হইয়াছিল—এবং সেই সভ্যতা যে অতীব রূঢ়ধরণের ও তাহা এসিয়া-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

প্রথমতঃ, শুধু লুটপাট করাই, হত্যা করাই ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়ীদিগের একমাত্র অভিলাষ ছিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আবির্ভাবঃ—Francois xavierএর ন্যায় উদারচরিত অনেক ধর্ম্মপ্রচারক ছিল; কিন্তু এমনও কতকগুলি ধর্ম্মপ্রচারক ছিল যাহাদিগকে স্পেনদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মোক্তার বলা যাইতে পারে; তাহারা বিদ্রোহ উত্তেজিত করিত, দেশ-

জয়ের জন্য আয়োজন করিত, বিধর্ম্মীদিগের শাসনার্থ ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন করিত।

তাহার পর বণিক সম্প্রদায়,—যাহারা দুর্ব্বলের প্রতি কঠোর, ও সবলের নিকট যোড়হস্ত,—তাহারা উপন্যাসসুলভ অপরিসীম লভ্যের চেষ্টায় থাকিত। ওলন্দাজেরা খৃষ্টধর্ম্মের ক্রুস্-চিহ্ন ধারণ করিয়া জাপানে যাত্রা করিয়াছিল; উহারা মালাই দেশের ক্ষুদ্র রাজাদিগের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। মোগল-রাজদরবারে ও দাক্ষিণাত্যের অধিপতিদিগের দরবারে, য়ুরোপীয় বণিকেরা, এমন কোন নীচতা ছিল না যাহা অবলম্বন করে নাই।

তাহার পর, যখন য়ুরোপীয়েরা ভারত-উপকূলে, হিন্দো-চীনের উপকূলে, Macao দেশে, Sondএর দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহারা প্রজাপীড়ন করিয়া দেশশাসন করিত। অসংখ্য শত্রুর মধ্যে তাহারা মুষ্টিমেয় লোক, সুতরাং তাহারা প্রজাপুঞ্জের ভীতি উৎপাদন করিয়া শাসন করিত। আবহাওয়ার প্রভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্রমাগত বিপদের মুখে অবস্থিত,—তাহারা যেনতেনপ্রকারেণ দ্রুত ধনসঞ্চয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইত; এবং এইরূপে ধনঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত কষ্ট সার্থক বলিয়া মনে করিত। এই য়ুরোপীয়েরা, এই খৃষ্টানেরা, এসিয়িকদিগকে পশু জ্ঞান করিত—অতএব তাহাদিগের যন্ত্রণা দিতে বা হত্যা করিতে তাহাদের কিছুমাত্র সংকোচ হইত না। এসিয়ায় এই সমস্ত অত্যাচার—তাহার উপর আবার অ্যামেরিকার অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেক্সিকো ও পেরুতে স্পেনবাসীদিগের বিজয়-অভিযানের ব্যাপার অবগত হইয়া Takugavaরা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের ধর্ম্মপ্রচার নিষেধ করিল, এবং সমস্ত য়ুরোপীয়দিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিল।

আরও কিছুকাল পরে, য়ুরোপীয়েরা রীতিমত শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড—ইহাদেরই হস্তগত ভারত-সাম্রাজ্য; নিষ্ঠুরতা রহিত হইল, ধনলুণ্ঠন সংযত হইল। কিন্তু যখন এসিয়িকেরা, য়ুরোপীয়দিগকে আর ভাগ্যবিধাতা বলিয়া মনে করিল না, পরন্তু তাহাদিগকে সভ্য বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইল, তখনও য়ুরোপীয় সভ্যতার দুইটি লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের মন বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। অবিরাম পরিবর্ত্তন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ব্যবসায়িক শিল্পকলা, বৈপ্লবিক কল্পনাসমূহ, রীতিনীতি, পরিচ্ছদ, বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ক্লাইভ ও ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সময়কার যে ইংরেজ, লর্ড-ড্যালহৌসি-সময়কারও কি সেই একই ইংরেজ? পক্ষান্তরে, বহুল জটিলতা। ইংরেজ, ফরাসী, পোর্ত্তুগীজ, স্পেনবাসী, ওলন্দাজ, জর্ম্মাণ; রোমান-ক্যাথলিক, আংগ্লিকার, প্রেস্‌বিটেরিয়ান, মেথডিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সব সংশয়বাদী বণিকগণ যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে সমুদ্রপথে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। মানসিক প্রকৃতিরও বৈচিত্র্য। এবং ফরাসী-বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ও নেপোলিয়ানের যুদ্ধবিগ্রহ।

অধুনা, এসিয়িকেরা য়ুরোপীয় সভ্যতার

তিনটি মুখ্য লক্ষণ দেখিতে পায়:—এই সভ্যতা, ধর্ম্মমূলক সভ্যতাও নহে, সামরিক সভ্যতাও নহে, পরন্তু ইহা শ্রমশিল্পমূলক সভ্যতা, বাণিজ্যমূলক সভ্যতা; এই সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং উন্নতিতে বিশ্বাস—ইহার নিগূঢ় ভাব। এসিয়িকেরা মনে করে,—য়ুরোপীয়েরা পরলোক বিশ্বাস করেনা, অথবা তাহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, স্বদেশের প্রতি তাহাদের মমতা নাই; কেননা তাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া আইসে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করে, ভারত ছাড়িয়া অন্যত্র যাত্রা করা একটা মহাপাতক, এবং আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার চীনেরা মনে করে,—যদি তাহাদের মৃতদেহ চীনের মাটীতে কবরস্থ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের আত্মা কখনও শান্তিলাভ করিবে না। যাহারা য়ুরোপীয় উন্নতির কথা বলে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি তাহাদের ভক্তি নাই, পরিবারের প্রতি তাহাদের আসক্তি নাই, কেননা পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া তাহারা দূরদেশে চলিয়া যায়। যদি বা পরিবার তাহা-দিগকে অনুসরণ করে, সে পরিবার আশ্রমশূন্য; নিজ নিজ পত্নী লইয়াই তাহারা ব্যাপৃত, স্বার্থ লইয়াই ব্যাপৃত, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যাপৃত। কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া, তাহাদের সন্তানসন্ততি গৃহ হইতে বাহির হয়, এবং নিজ ব্যক্তিগত মতানুসারে, নিজের স্বার্থ অনুসারে, স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিতে চাহে।

অতএব এসিয়িকেরা মনে করে যে, য়ুরোপীয়েরা কেবল নিজের জন্যই জীবন ধারণ করে, এবং অপরিসীম ধনসঞ্চয় করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ত্বরা কাহাকে বলে এসিয়িকেরা তাহা জানে না; তাহারা স্বীয় পরিবারের জন্যই পরিশ্রম করে, এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা থাকায়, তাহাদের কখনই বংশ লোপ পায় না। য়ুরোপীয়েরা নিজের জন্যই পরিশ্রম করে, সুতরাং মানবজীবনের স্বল্পতাই তাহাদের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে; এই জন্যই য়ুরোপীয়দের এতটা ধনলুব্ধতা, আপনার জন্য ও অন্যের জন্য এতটা কঠোরতা।

আবার, এসিয়িকেরা য়ুরোপীয়দিগকে বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে, অথবা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে দর্শন করে; যে সকল এসিয়িক য়ুরো-পের রীতিনীতি ও মতামত দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে তাহাদেরও মন হইতে এই সকল ভাব অপনীত হয় নাই। একজন সমসাময়িক লেখকের লেখা হইতে একটা অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হিন্দুদের সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক বলিয়া, এবং আদৌ শ্রমশিল্পমূলক নহে বলিয়া হিন্দুদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাবটা ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় যে-সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য—বৈষয়িক ও শ্রমশিল্পমূলক স্বার্থসাধন, সেই সভ্যতা এই স্বার্থের ভাবটাকে আরও বাড়াইয়া তুলে। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ খুবই স্বাভাবিক; অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবজন্তুর ন্যায় মানুষও এই স্বার্থবোধের অংশভাগী। কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধিকে উচ্চতর ধর্ম্মবৃত্তির অধীনে আনাই উন্নতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। য়ুরোপীয় সভ্যতা এই লক্ষ্যটিকে হারাইয়াছে। তদ্‌বিপরীতে য়ুরোপীয়দের মধ্যে তীব্র ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; ইহাই যে তাহাদের পরিচালক প্রবৃত্তি—এ কথা আদৌ অতিরঞ্জিত নহে। হিন্দুদের মধ্যে, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির বিলক্ষণ দমন হইয়াছে দৃষ্ট হয়; য়ুরোপীয়েরা হয়ত বলিবেন, অতটা স্বার্থদমন

বাঞ্ছনীয় নহে। বৃহৎ পরিবার-মণ্ডলীর কর্ত্তা—হিন্দু আপনার জন্য ততটা জীবনধারণ বা জীবিকানির্ব্বাহ করে না; য়ুরোপীয়েরা যে সংকীর্ণ অর্থে পরিবার শব্দ ব্যবহার করে, সেই নিজের পরিবারের জন্যও ততটা জীবনধারণ বা জীবিকানির্ব্বাহ করে না, পরন্তু যাহাদের সহিত তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই—সেই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কুটুম্বের জন্য মুখ্যত জীবনধারণ ও জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।" (২)

আবার Max Muller ও এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমরা সকলেই যুঝাযুঝি করিয়া জীবন যাপন করি; আমরা জীবনের যে উচ্চতম আদর্শ কল্পনা করিয়া থাকি—তাহা জীবনসংগ্রাম। যে মুহূর্ত্তে আমরা আর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হই না, শুধু সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা পরিশ্রম করিতে বিরত হই। এবং বৃদ্ধ অশ্বের ন্যায় আমরা সাজ-পরা অবস্থাতেই মরিবার গর্ব্ব অনুভব করি...কিন্তু আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির আর একটা দিক্ আছে; হয়ত, ভব-সমুদ্র-পারে যাত্রা করিবার জন্য মানুষের আর-একটা গতি নির্দ্দিষ্ট আছে; সেই গতিটিকে একেবারে আমলে না আনিলে নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইতে হইবে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিপীলিকাদের যুদ্ধ প্রণালী

পূর্ব্বে পিপীলিকা সম্বন্ধে অন্য কথা বলিয়াছি এবার তাহাদের যুদ্ধ প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

দাসপ্রিয় পিপীলিকারাই এই যুদ্ধাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকে। দাস বৃদ্ধি করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির সহিত স্বগৃহ, স্বজাতি ও স্বাধীনতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ কঠোর সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল সংগ্রামের বর্ণনা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দাসান্বেষী পিপীলিকা বাহিনী বিপক্ষ দুর্গের সন্ধান পাইয়া একযোগে তাহা আক্রমণ করিতে যায়। পথপ্রদর্শক সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিপক্ষদুর্গের অবস্থানাদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আক্রমণের সুযোগ নির্ণয় করে।

বৈজ্ঞানিক Lespes একবার এই প্রকার কয়েকটী দূতকে অতি সংগোপনে সতর্কতা ও যত্নের সহিত একটী শত্রুদুর্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির সন্ধান লইতে দেখিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ দুর্গদ্বারগুলি নির্ণয় করিবার প্রতিই ইহাদের বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকা গৃহের এমনি নির্ম্মাণকৌশল যে ইহার দ্বার নির্ণয় করা বড় সহজসাধ্য নহে। শুধু দুর্গদ্বার নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়াতেই অনেক সময় আক্রমণকারীদের অতি বড় বড় সুপরিচালিত অভিযানও ব্যর্থ হইয়া যায়।

লুণ্ঠন ও আক্রমণ উপযোগী শত্রুগৃহের সন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত হইয়া থাকে; এবং তাহারা শত্রুগৃহের সন্ধান লইয়া এবং সে গৃহ আক্রমণ সহজসাধ্য কি না পরীক্ষা দ্বারা তাহা জানিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেখানে পিপীলিকাসেনাপতিগণ পরস্পরে

(২) Bose, Hindu Civilization during British Rule. 1. p. LXV.

পরামর্শ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে সমর সজ্জার আদেশ ঘোষণা করে। শীঘ্রই সারি সারি অগণিত পিপীলিকা সৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রেণিবদ্ধভাবে দ্রুতগতিতে বিপক্ষ দুর্গের অভিমুখে ধাবিত হয়।

আমরা এস্থানে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পিপীলিকাদিগের যুদ্ধবিবরণের ভাবানুবাদ করিয়া দিতেছি।

বৈজ্ঞানিক বুক্‌নারের বর্ণনা,—

পশ্চাৎবর্ত্তিদিগকে দলে আসিয়া মিশিবার সময় দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে পিপীলিকা বাহিনী অভিযান বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সময় সময় বিপক্ষদুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে মত পার্থক্য বশতঃ অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রদেশে আগমন-জনিত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াও এরূপ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ফোরেল কয়েকবারই পিপীলিকা বাহিনীকে এইরূপ পথ হারাইয়া বসিতে দেখিয়াছেন। হুবার কিন্তু এরূপ ঘটনা মাত্র একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই বাহিনীতে ১০০ হইতে আরম্ভ করিয়া আড়াই হাজারের উপর পর্য্যন্ত পিপীলিকা সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মিনিটে এক মিটার পরিমিত স্থান পিপীলিকা সৈন্যেরা অতিক্রম করে। তবে ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া ফিরিবার সময় সাধারণতঃ ইহারা অল্প পথ অগ্রসর হইয়া থাকে। অত্যধিক দূরবর্ত্তী স্থানে শত্রুদুর্গ অবস্থিত থাকিলে পথশ্রমে কাতর হইয়া মধ্যপথেই আক্রমণের কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদয় পিপীলিকাবাহিনী নিজদুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করে। ফোরেল একবার একটি পিপীলিকাবাহিনীকে উক্ত কারণে ২৪০ গজ পরিমাণ স্থান অগ্রসর হইয়া পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছেন। কখনও কখনও বিপক্ষ দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াও ইহাদের হৃদয়ে এমন নিরুৎসাহ ও ভয়ের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে যে তাহারা আক্রমণে নিরস্ত হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে দ্রুত প্রত্যাগমন করিয়াছে।

বিপক্ষদুর্গ যেস্থানে অবস্থিত সেস্থানে উপস্থিত হইয়াও যদি দুর্গ দৃষ্টিপথবর্ত্তী না হয় তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকদল পিপীলিকাকে চতুর্দ্দিকে দুর্গ নির্ণয়ের জন্য পাঠাইয়া অন্য সমস্ত পিপীলিকা সৈন্য একস্থানে দাঁড়ায়। অগ্রবর্ত্তীগণ তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক খুঁজিয়া ক্রমে ক্রমে পুনরায় আসিয়া প্রধান পিপীলিকা বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ফোরেল এইরূপ এক সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ একদিন এইভাবে শত্রুগৃহের সন্ধানে ব্যাপৃত দেখিয়াছিলেন। পরদিন ইহারা শত্রু-দুর্গের সন্ধান পাইয়া পথে একটু বিলম্ব না করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। মাত্র একটি পিপীলিকা শত্রুগৃহের অবস্থান জ্ঞাত থাকিলেই সমুদয় বাহিনীকে সে পরিচালিত করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। এই কার্য্যে যথেষ্ট সংখ্যক পথপ্রদর্শকের আবশ্যক হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ই পথ ভ্রান্তি অধিক ঘটিতে দেখা যায়। সমস্ত পিপীলিকাই লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রচুর ভার বহন করিয়া চলে এই নিমিত্ত পথ-প্রদর্শকের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হয়। কিন্তু বেশী ভ্রান্তি

ঘটে অন্য কারণে। দেখা গিয়াছে, আক্রমণকারীরা যে পথে বিপক্ষ দুর্গে প্রবেশ করে, লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়া ফিরিবার সময় প্রায়ই তাহারা সে পথে না ফিরিয়া ভিন্ন পথে দুর্গনিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। এবং ইহাতেই অনেক সময় গন্তব্যপথ হারাইয়া বসে। নিষ্ক্রমণ পথের বিভিন্নতা লক্ষ্য না করিয়া ইহারা ভিন্ন পথবর্ত্তী হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অজ্ঞাত প্রদেশে আসিয়া পড়ে। তখন দলে দলে পিপীলিকা চতুর্দ্দিকে পথসন্ধানে ধাবিত হয় এবং জ্ঞাত প্রদেশে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় পিপীলিকা বাহিনী একস্থানে প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

একদিন ফোরেল দেখিলেন কতকগুলি Amazon জাতীয় পিপীলিকা F. Fusca জাতীয় শত্রুদুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ পথের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর ইহারা অতিক্ষুদ্র একটি প্রবেশপথ বাহির করিল এবং এক এক জন পিপীলিকা সৈন্য সে পথে শত্রুদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রবেশপথটি সংকীর্ণ বলিয়া অতি ধীরে ধীরে কষ্টে সৃষ্টে সৈন্য চালনা করিতে হইতেছিল। এদিকে কতকগুলি পিপীলিকা অন্য প্রশস্ত দ্বারের সন্ধানেও নিযুক্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরে বৃহত্তর একটি প্রবেশ দ্বারের সন্ধান হওয়ায় অবশিষ্ট সৈন্য অল্প আয়াসে অত্যল্পকালমধ্যে বিপক্ষ দুর্গের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইল; এবং সময়ান্তরে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন পূর্ব্বক বিজয়ী পিপীলিকা বাহিনী সগর্ব্বে শত্রুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল। তাহারা উভয় পথেই বহির্গত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের মুখেই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ছিল। বাহিরে আসিয়া সকলে পুনর্ব্বার একস্থানে মিলিত হইয়া বিজয়গর্ব্বে নিজ দুর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আর একবার একদল Amazon, F. Rufilearbis জাতীয় পিপীলিকারা দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে অগ্রবর্ত্তী পিপীলিকারা দেখিতে পাইল তাহাদের অবধারিত সময়ের পূর্ব্বেই তাহারা বিপক্ষ দুর্গের প্রান্ত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই তাহারা হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল এবং কয়েকটি দূত সংবাদ লইয়া গিয়া পশ্চাৎবর্ত্তিদিগকে অতি দ্রুতগতিতে সেস্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। ৩০ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত সৈন্য একস্থানে আসিয়া মিলিত হইল এবং একযোগে বিপক্ষ দুর্গের উপর পতিত হইল। এদিকে যে অত্যল্পকাল অগ্রবর্ত্তীরা দুর্গের সম্মুখে পশ্চাতের সৈন্যদের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল সেই সুযোগে শত্রুগণ বিপক্ষের আগমন জানিতে পারিয়া অসংখ্য রক্ষীসাহায্যে দুর্গের বাহির সুরক্ষিত করিয়াছিল। গোপনে আক্রমণ অসম্ভব হওয়ায় আক্রমণকারীরা সকলে মিলিয়া একযোগে শত্রুদের উপর পতিত হইল।

শীঘ্রই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল কিন্তু সংখ্যায় অধিক বলিয়া Amazonরাই জয়লাভ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিপক্ষ পিপীলিকারা হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হইয়া গুটী ও কীট (larva and pupa) মুখে করিয়া নিষ্ক্রমণ পথে বহির্গত হইয়া পলায়নপর হইল। কাজেই সে দুর্গে লুণ্ঠন করিবার আর কিছুই রহিল না দেখিয়া, আক্রমণকারীরা যে সামান্য পরিমাণ দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে পারিয়াছিল তাহাই মুখে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপক্ষেরা এতক্ষণে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে তাহারাও পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকারী শত্রুদিগের পা টানিয়া লুণ্ঠিত গুটীগুলি কাড়িয়া লইতে চেষ্টান্বিত হইল। পশ্চাৎদিকে আক্রান্ত হওয়ায় Amazonদের বাধ্য হইয়া গুটী ছাড়িয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে হইল এবং এই সুযোগে আক্রমণকারী গুটী লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। F. Rufilearbis দিগের সৈন্য এত বেশী ছিল যে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রান্ত Amazonদিগকে বাধ্য হইয়াই লুণ্ঠিত সামগ্রী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এমনকি কতকগুলি Amazon সৈন্য হতাহতও হইয়াছিল। অবশ্য Rufilearbes দিগের অসংখ্য সৈনিক প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তনের দশ মিনিট পরে বিপক্ষ দুর্গের নিকট আর একটি Amazonও রহিল না। দ্রুতগতিতে পলায়নপর এই সকল পিপীলিকাকে অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া অন্যপক্ষ নিরস্ত হইল। ৩০ সেকেণ্ড বিলম্বের জন্য Amazonদের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল।

অন্য একবার ফোরেল কতকগুলি গর্ভবতী Amazonকেও সংগ্রামে লিপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। ইহারাও অসংখ্য শত্রু নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শত্রুদুর্গ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং লুণ্ঠিত হইয়াছিল! এবং ফিরিবার সময় এবারও ইহারা অধিক সংখ্যক বিজিত জাতির আক্রমণে বিশেষ বিপদাপন্ন হইয়াছিল। উভয় পথেই অসংখ্য সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

আর একবার একদল সৈন্য প্রায় দশগজ স্থান অগ্রসর হইয়াই দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিল এবং অন্য দল অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ইহারাও গৃহাভিমুখী হইল। গৃহে আসিয়া দেখিল পূর্ব্বে যে দল ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা নূতন পথে অন্য দিকে অভিযান করিয়া চলিয়াছে। ইহারাও তাহাদের অনুসরণ করিল। এবং পুনর্ম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া, স্থানে স্থানে জমিয়া পুনরায় বহুদূর ঘুরিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে সম্ভবত বিভিন্ন দল বিভিন্ন দুর্গ আক্রমণের পক্ষপাতী ছিল কিম্বা কেহ কেহ আক্রমণের একেবারেই পক্ষপাতী ছিল না। তাই নানা বাদপ্রতিবাদের পর আক্রমণের কল্পনা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অথবা শুধু ব্যায়াম গ্রহণের উদ্দেশ্যেও এরূপ যাত্রা করিয়া থাকিতে পারে!

Amazonরা একবার অভিযান আরম্ভ করিলে আর কোনরূপ বাহ্যিক বাধাবিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। ফোরেল ইহাদিগকে পথে জলের উপর দিয়া অভিযান করিতে দেখিয়াছেন। যদিও সেই জলে অনেকেই ডুবিয়া মরিতেছিল। আবার বালুকাময় উচ্চভূমি দিয়াও অভিযান করিতে

দেখিয়াছেন—যদিও প্রবল বাতাসে শত শত সৈনিককে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ ফিরিবার সময় প্রচণ্ড বাতাস কিম্বা জলস্রোত কিম্বা বালুরাশি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তাহারা তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেলিয়া দেয় না। প্রাণরক্ষা করিতে পারিলে লুণ্ঠন সামগ্রীও সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা পায়।

বৈজ্ঞানিক Lespes বলিতেছেন,—

এই সকল যুদ্ধ কেবল গ্রীষ্মের শেষ ভাগে এবং শরৎকালে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সময়ে দাস জাতির (F. fusea এবং F. cuniculareа) পক্ষোদ্গত পিপীলিকারা প্রভুগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। Amazonদিগের মধ্যেও এই অকর্ম্মণ্য দাসদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া বসাইয়া খাওয়াইবার আগ্রহ মোটেই দেখা যায় না। আকাশ যেদিন বেশ পরিষ্কার থাকে সেদিন amazon দস্যুরা অপরাহ্ণ ৪টা ৫টার সময় নিজেদের দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম ইহাদের গতি কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মে পরিচালিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সকলে একত্রিত হইলে—তাহারা সারি বাঁধিয়া দ্রুতগতিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এক একদিন তাহারা এক এক দিকে অভিযান করে। পরস্পর খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকে এবং সম্মুখবর্ত্তীরা সর্ব্বদাই কিছু অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়াছে এইরূপ মনে হয়। মুহূর্ত্তে এই অগ্রবর্ত্তীদের স্থান নূতন পিপীলিকা আসিয়া অধিকার করে, এবং এইরূপে ক্রমাগত ইহাদের দলপতি পরিবর্ত্তিত হইয়া চলে। দাসজাতীয় পিপীলিকার কোনপ্রকার সংবাদ ও সন্ধান পাইবার উদ্দেশ্যেই ইহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ ঘ্রাণ দ্বারাই ইহারা এইরূপ অজানা শত্রুদুর্গে গমন করে। শিকারী কুকুরের বন্যজন্তু সন্ধানের ন্যায় ইহারাও পথ ঘ্রাণ করিতে করিতেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়—এবং একবার শত্রুর চলাফেরার সন্ধান পাইলেই অতি দ্রুতগতিতে শত্রু দুর্গাভিমুখে ধাবিত হয়। ক্ষুদ্রতম সৈন্যদলেও কয়েকশত পিপীলিকাসৈন্য অবস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহাছাড়া ইহার চতুর্গুণ—পঞ্চগুণ বৃহৎ সৈন্যবাহিনীও নয়নগোচর হইয়াছে। শত্রুদুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ইহারা যেরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়ায় তাহা সাধারণতঃ লম্বায় ৫ মিটার ও প্রশস্থে ৫০ সেণ্টিমিটার পরিমিত। * * দাস জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী F. Cunicularia‌রা অসম সাহসের সহিত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিয়া থাকে। কিন্তু Amazonদের দুর্দ্ধর্ষতার বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ সংগ্রাম করিয়াই ইহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। Amazonরা তখন জয়গর্ব্বে শত্রুদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লুণ্ঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করে—এবং কিছুক্ষণ মধ্যে ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহের বহির্ভাগে আগমন করে। Amazonরা বৃক্ষারোহণ করিতে জানে না—একথা অবগত থাকায়—বিজিত সৈন্যেরা দলে দলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উহাদের নিকট হইতে যথাসাধ্য শুটী ও কীট গুলিকে ছিনাইয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষলতাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। Amazonরা কিন্তু ইহাদের প্রতি ফিরিয়াও চায় না। তাহারা লুণ্ঠন দ্রব্য সহ যত শীঘ্র সম্ভব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে। গৃহে আসিয়াই ইহারা শুটী কীট গুলিকে দাসদাসীদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। তখন আর সেগুলির ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভুলিয়াও মনে করে না।

Buchner অন্যত্র বলিতেছেন,—Amazon দিগের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু, Sanguinea জাতীয় পিপীলিকা। ইহারাও দাসদাসী প্রতিপালন করিয়া থাকে—এবং এই সূত্রে প্রায়ই Amazonদের সঙ্গে ইহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধকৌশলে কিম্বা শারীরিক বলে ইহারা Amazonদের সমকক্ষ নয়—কিন্তু ইহাদের বুদ্ধিবল অসাধারণ। ফোরেল বলেন—'পিপীলিকা জাতির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।'

একবার F. Fuscaদের গৃহ লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে একদল Amazen অভিযান করিয়া চলিয়াছিল;—শত্রুদুর্গে পৌছিবার পূর্ব্বেই ফোরেল তাহাদের সম্মুখে এক ছালা Sanguinea জাতীয় পিপীলিকা ঢালিয়া ফেলিলেন। ফল এইরূপ দাঁড়াইল:—

Sanguinea‌রা অমিত তেজে শত্রু দুর্গ আক্রমণ করায় fusea‌রা আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অগ্রবর্ত্তী Amazonরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। Sanguinineaদের দেখিয়া ইহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া সমগ্র বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। পশ্চাৎবর্ত্তীরা এই সংবাদে বিশেষ বিচলিত হইয়াছে—এইরূপ বোধ হইল। যাহা হউক ইহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া শত্রুর প্রতি ধাবমান হইল। Sanguinineরাও একত্র হইয়া প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। Amazonরা সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করিল এবং একেবারে শত্রু সৈন্যের ভিতর যাইয়া উপস্থিত হইল।

ফোরেল কতকগুলি F. Pratansis জাতীয় পিপীলিকাকেও সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ Amazonদের আক্রমণে সকলকেই পরাজিত হইতে হইল। বিজয়ীরা কিছুক্ষণ যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিয়াই দুর্গাভ্যন্তরে লুণ্ঠনের অনুসন্ধানে প্রবিষ্ট হইল। কয়েকটী Amazon সৈন্য এতদূর উত্তেজিত ও ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে উহারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া পলায়নতৎপর বিজিত fusea, pratensis এবং Sanguinea এই তিন জাতীয় পিপীলিকাদের যাহাকে সম্মুখে পাইল বধ করিতে লাগিল।

আক্রান্ত পরাজিত ও লুণ্ঠিত rufilearbes জাতীয় পিপীলিকারা এত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা লুণ্ঠনকারীদিগকে তাহাদের গৃহ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল; এবং Amazonদিগকেও ইহাদিগের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শতে শতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও rufilearbesরা নিরস্ত হয় নাই—মনে হয় ইহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াই যেন

সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। শত্রুর আক্রমণে কতকগুলি Amazonও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইযুদ্ধে Amazonদের দুর্গস্থিত rufilearbes জাতীয় দাস পিপীলিকারাও লিপ্ত হইয়াছিল এবং প্রভুদের গৃহ ও ডিম্ব রক্ষা কল্পে স্বজাতীয় পিপীলিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তন বাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়, কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "বৈজ্ঞানিক জীবনী" নামক প্রবন্ধে, "প্রাচীন ভারতে ক্রম বিবর্ত্তনবাদ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "ডারুইনের থিওরির ন্যায় বানর হইতে মানুষ হওয়া পুরাণেরও মত।" তিনি বিষ্ণু পুরাণের উল্লেখে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ শ্লোক বিষ্ণু পুরাণে পাইলাম না। অন্যত্র এই শ্লোকটী অন্য আকারে আছে। তাহাতে "চতুর্লক্ষং য বানরাঃ" নাই। নিবন্ধ ধৃত বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে আছে, "চতুর্লক্ষং য মানুষাঃ", এবং কর্ম্মবিপাকে আছে, "চতুর্লক্ষং য মানবাঃ।" অতএব "বানরাঃ" পাঠ ঠিক নহে, "মানুষাঃ" বা "মানবাঃ" পাঠ হইবে। এ পাঠে ডারুইনের মতের সহিত পুরাণের পাঠের ঐক্য হয় না।

ডারুইন বলিয়াছেন, "বানর" হইতে "মানুষ" হইয়াছে, কিন্তু পুরাণমতে বানর পৃথক এবং মানুষ পৃথক বংশ সম্ভূত"। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্বে" একথা আমি উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে ডারুইনের মতসমর্থনকারী লোকের মত পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে এখানে সবিস্তার লিখিলাম না। আমি প্রমাণ করিয়াছি, সৃষ্টির প্রথম হইতেই দুই শ্রেণীর প্রাণী আছে—একের পরিণতি মানুষ, অপরের পরিণতি বানর বা বনমানুষ!

(১) ক। আবরণ শূন্য কীট।
খ। কঠিন আবরণ যুক্ত শম্বুকাদি।
(২) ক। আঁইস শূন্য মৎস্য।
খ। আঁইস যুক্ত মৎস্য।
(৩) ক। শল্ক শূন্য সরীসৃপ।
খ। শল্ক যুক্ত সরীসৃপ।
(৪) ক। পালক শূন্য পাখী। যথা—বাদুড়।
খ। পালক যুক্ত পাখী।
(৫) ক। বিরল লোমা স্তন্যপায়ী।
খ। লোমশ স্তন্যপায়ী।
(৬) ক। বিরল লোমা নরসিংহ।
খ। লোমশ বানর!
(৭) ক। নরসিংহের উচ্চ সংস্করণ মানুষ।
খ। বানরের উচ্চ সংস্করণ বনমানুষ।*

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্বে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব ৮৮ পৃষ্ঠ।

স্রোতের ফুল

(১৫)

বহুকাল পরে সব কয়টা পাশের এগজামিন দিয়া বিপিন বাড়ী আসিতেছে। বাড়ীর সকলেই উৎসুক চিত্তে বিপিনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। গিন্নির মন আজ মাতৃগর্ব্বে প্রসন্ন ভরপূর। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই প্রচুর উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহার বধূ-সহিত পুত্রকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন, আজিকার এ উৎসব তাহারই পূর্ব্ব-সূচনা। গিন্নির আনন্দে আজ সবাই আনন্দিত। রোহিণী আজ অকারণে চেঁচাইয়া হাট বাধাইতেছিল। বাড়ীর বৌ-ঝিরাও অতিরিক্ত ঔৎসুক্যে আপনাদের আগ্রহ দমন করিতে পারিতেছিল না।

এই আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দুটি লোকের মন দ্বিধান্বিত হইয়া ছিল—সে খুড়িমার ও মালতীর। বিপিনের আগমনের আনন্দে তাঁহারা সকলের সহিত এক হইয়া যোগ দিবেন, কি একান্তে থাকিবেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সকলের আনন্দে যোগ দিতে গেলেই লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিবেন, না, একান্তে থাকিলেই লোকের অন্যায় বোধ হইবে, ইহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। খুড়িমা বিপিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাহার আগমনে খুড়িমার হৃদয় আপনা হইতেই চাহিতেছিল তাহাকে সকলের আগে আশীর্ব্বাদ করিবে—বিপিন তাঁহার অদিনে যে উপকার করিয়াছে তাহা ত ভুলিবার নহে। কিন্তু তাঁহার সহজ আচরণের পথে অন্তরায় জুটিয়াছিল মালতী। তাহাকে লইয়া পাছে আবার নূতন গণ্ডগোল হয় এই ভয়ে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছিলেন। মালতীকে লইয়া তিনি সকলের আনন্দে যোগ দিতে পারেন না, আবার মালতীকে সঙ্গে না লইয়া একাকী যাওয়াও ভালো দেখায় না—খুড়িমার পক্ষে ইহাই মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল।

মালতীর অন্তরে সুখ ও সঙ্কোচের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নবকিশোর বলিয়াছিল বিপিন আসিলেই তাহার সকল দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিবে। সেই তাহার সুদুঃসহ-দুঃখ-ত্রাতা বন্ধু আজ আসিতেছে। তাহাকে দেখিবার দারুণ কৌতূহল মালতীকে পীড়া দিতেছিল। সে যে মনে মনে একটি কল্পিত মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে তাহার সহিত বাস্তবকে মিলাইয়া দেখিতে সাধ হইতেছিল। কিন্তু তাহার ভয় হইতেছিল পাছে লোকে আবার কিছু বলে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে খুড়িমা স্থির করিলেন মালতীকে সঙ্গে লইয়াই সকলের সহিত কিন্তু সকলের পশ্চাতে থাকিয়া বিপিনের অভ্যর্থনায় যোগ দিবেন এবং বিপিন বাড়ীতে প্রবেশ করিলে গোলমালের মধ্যে মালতীকে লইয়া তিনি সরিয়া আসিবেন।

খুড়িমা মালতীকে বলিলেন—ওলো শুনচিস, চ নীচে যাই, বিপিন আসচে আজ

শুনেচিস? সকলে যেখানে বিপিনের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে সেখেনে আমাদের না গেলে ভালো দেখাবে না। কিন্তু শুনচিস, তুই সকলের পেছনে থাকবি, বুঝলি? অমন প্যাঁট প্যাঁট করে তাকাচ্ছিস কেন? তখন যেন অমনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকিস নে। আর আমি যেই ডাকব অমনি চলে আসবি, বুঝলি?.....আ মর পোড়ারমুখী, বাক্যি একেবারে হরে গেছে নাকি, যে, মুখে একটা হ্যাঁ না জবাব নেই। হ্যাও, এখন মুখের ওপর ঘোমটাটা একটু টেনে দাও.....নাঃ বাপু তোকে নিয়ে আমি পারব না। একটা কথা কি তোর শুনতে নেই ছাই!

মালতী বলিল—আমি এক গলা ঘোমটা দিতে পারব না, সে আমার ভারি লজ্জা করে।

—আ মরি! ঘোমটা দিতে লজ্জা করে, আর মুখ দেখাতে লজ্জা করে না—কি যে কথার ছিরি! যা খুসি করগে যা, মরগে যা। —বলিয়া খুড়িমা বেগে প্রস্থান করিলেন। মালতী ধীরমন্থর গমনে তাঁহার পশ্চাতে চলিয়া গেল।

তখন গিন্নি খুড়িমা ও মালতীর কথাই জয়াকে বলিতেছিলেন। তিনি বলিতে-ছিলেন—দেখেছ জয়াঠাকুরঝি ছোট বৌটার একবার আক্কেল। আজকে আমার বিপিন বাড়ী ফিরে আসছে, আজকেও কিনা বোনঝিকে নিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা হয়েছে।

জয়া বড় চালাক মেয়ে সে খোসামোদ দিয়া গিন্নির দুর্ব্বল প্রকৃতিকে আপনার শত অনাচার অন্যায় একেবারে ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু গিন্নির কথা শুনিয়া এখন সে ঠিক ধরিতে পারিল না গিন্নির মনের বাতাস কোনমুখো বহিতেছে এবং কোন্ মুখো দাঁড়াইয়া সে কটুকাটব্যের ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিবে। আন্দাজ একটু ভুল হইলে নিজের হাতের ত্যক্ত ধূলি নিজের চোখেই পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে এবং তাহার পরিণাম যে চোখের জল সেটা জয়ার বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—তাই ত তাই ত ছোটবৌকে দেখছিনে বটে!

এমন সময় খুড়িমা আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। গিন্নি তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি জয়াকে বলিলেন—দেখছিস্ জয়া ঠাকুরঝি, বিপিন আসছে উদ্দেশেই কোটর ছেড়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু বিপিনকে পেলেন কোথা থেকে? সে এই আমা হতেই ত?

জয়া গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল —তা ত বটেই! তুমি আগে না বিপিন আগে। তুমিই ত হলে সকলকার গোড়া। আহা, বাবা আমার মাথার চুলের মতন পেরমাই পাক। দেখেছ দিদি, মালতী মেমও বেরিয়েছেন। মুখের ওপর একরত্তি ঘোমটা নেই। ইচ্ছেটা রূপ দেখিয়ে বিপিনকে বশ করবেন।

গিন্নি মালতীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন সেই বিষণ্ণ মুখশ্রীর মধ্যে কোথাও চঞ্চলতা চটুলতা নাই; সংযমের একটি ব্রীড়া মুখ-মণ্ডলে মাখানো রহিয়াছে; চোখদুটি যেন লজ্জার ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। গিন্নির তখন মনে হইল এর চেয়ে বড় ঘোমটা বুঝি আর নাই। তখন তিনি জয়াকে

একটু খোঁচা দিয়া বলিলেন—বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়; সে তার বাপের ধারা একটুও পায়নি।

জয়া এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে লজ্জিত হইয়া এই গ্লানি চাপা দিবার জন্য যখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহাকে অব্যাহতি দিয়া বাহিরে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বন্দুক ও বোম আওয়াজ হইল এবং রোহিণী হাততালি দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—দাদা বাবু এস্‌তেছে! দাদাবাবু এস্‌তেছে!

গিন্নি অমনি চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওরে ওখানে শূন্যকলসী রাখলে কে? সরা সরা...না না, ভরে দে, ভরে দে। ...আ মর, সব হ্যাকা যেন, সবাই মিলে তাল পাকিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল...শীগগির কর না, বিপিন এসে পড়বে যে।

পাঁচ-সাতজন চাকরদাসী শূন্য কলসী ভরিতে ছুটিল। অন্যান্য সকলে বিপিনের আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া স্থানে স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপিন স্মিতমুখে উঠানে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই বিনি দৌড়িয়া গিয়া বিপিনের হাঁটু দুটি জড়াইয়া ধরিল; বিনোদও দুই লাফে অগ্রসর হইয়া দাদার হাতখানিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল—'ওরে দাদা এসেছে রে! দাদা এসেছে রে!' বিনিও দাদার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিল—ওলে দাদা এচেচে লে! দাদা এচেচে-লে!

বিপিন স্মিতমুখে বিনি ও বিনোদের মুখ-চুম্বন করিয়া বিনিকে বুকে তুলিয়া লইল এবং

বিনোদের হাত ধরিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেল। গিন্নি ব্যস্তভাবে তাহার প্রণামে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে বোকা ছেলে, রোস্ রোস্! আগে পূর্ণঘটকে পেন্নাম করে ঠাকুরকে পেন্নাম কর, তবে ত আমায় পেন্নাম করবি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার চেয়ে আমার বড় ঠাকুর আর কেউ নেই মা। ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, তোমায় ত আগে প্রণাম করি।

গিন্নি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোরা সব এখন ইংরিজি পড়ে খিষ্টান হয়ে গেছিস। তবু আমরা যে-কদিন আছি আমাদের মতেই একটু চলিস।

বিপিন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, কি করতে হবে চটপট বল সেরে নি, তুমি আমার প্রণামটাকে মুলতুবি রেখে একেবারে জুড়িয়ে দিচ্ছ। কি করতে হবে বল।

গিন্নি ঘট দেখাইয়া বলিলেন—এই পূর্ণ ঘটকে পেন্নাম কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বিপিন বলিল—না মা, ঐ সব যা-তাকে প্রণাম করা আমায় দিয়ে হবে না। আমি ও ঘট ফটকে প্রণাম করব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি।

বিপিন মাতার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া মাতার পায়ের ধুলা মাথায় লইল। গিন্নি স্মিতমুখে স্নেহের অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুই কি মা ছাড়া আর কিছু জানবি নে?—এবং তারপর বিপিনের দাড়িতে হাত দিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন—বৌ ঘরে এলে দেখব, কেমন তখন মাকে মনে থাকে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—সে রকম আশঙ্কা আছে বলেই ত বৌকে ঘরে আমল দিই নি।

বিবাহের কথা উঠিতেই বিপিনের মালতীকে মনে পড়িল। বিপিন চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, খুড়িমা কৈ?

গিন্নিও চারিদিকে চাহিয়া খুড়িমাকে না দেখিয়া বলিলেন—এই ত ছিল। কোথায় গেল আবার? বোনঝিকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে বুঝি! যা ত রোহিণী, ডেকে আনগে ত।

বিপিন বাধা দিয়া বলিল—না রোহিণী, ডাকতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

গিন্নি বারণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু খুড়িমার প্রতি বিপিনের টান দেখিয়া তাঁহার মন একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

জয়া মনে করিয়াছিল বিপিন তাহাকে একটা প্রণাম করিবে, কিন্তু তাহার কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া খুড়িমার সৌভাগ্যে সেও ঈর্ষাক্ষুণ্ণ হইল।

বিপিন খুড়িমার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে ছেলে মেয়ে বৌ ঝি সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আজ বিপিনকে সবিস্ময় আনন্দে দেখিয়া দেখিয়া কাহারো তৃপ্তি হইতেছিল না। আজ যেন সে নূতন হইয়া সকলের নিকট ফিরিয়াছে।

বিপিন খুড়িমার ঘরের নিকটে গিয়াই ডাকিল—খুড়িমা!

খুড়িমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—এস বাবা এস!

বিপিন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খুড়িমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। খুড়িমা উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ অতিকষ্টে অবরুদ্ধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও বাবা।

মালতীকে দেখিবার জন্য বিপিনের কৌতূহল তাহাকে তাগিদ ও পীড়া দিতেছিল। তাই সে হাসিয়া বলিল,—খুড়িমা ঘরে চল, দরজা থেকেই বিদায় করবে নাকি?

খুড়িমা অপ্রস্তুত ও বিব্রত হইয়া বলিলেন—এস বাবা এস। কিন্তু তুমি এখানে দেরি করলে দিদি যে রাগ করবেন।

—তা হয় ত একটু করবেন। মায়ের রাগ ভুলিয়ে দিতে কতক্ষণ?—বলিয়াই বিপিন ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে প্রবেশ করিতেই বিপিন দেখিল একটি অপরূপ রূপসী নিরাভরণা তরুণী একপাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিপিনকে দেখিবামাত্রই তাহার দৃষ্টি লজ্জা কৌতূহলে চঞ্চল উজ্জ্বল হইয়া তাহার সৌন্দর্য্যের মোমবাতিতে যেন শিখা জ্বালিয়া তুলিল।

বিপিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—এই মালতী! এত সুন্দর! এমন রূপ ত সে কল্পনাতেও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। তাহার চোখ দুটি যেন শরতের আকাশ-কাটা টুকরা, তাহার গালদুটি যেন গোলাপের পাপড়ি, মুখটি যেন ডালিমের ফুল, বর্ণে যেন শুক্তির লাবণ্য! সে যেন মূর্ত্তিমতী ঊষা! সাক্ষাৎ বসন্তশ্রী!

বিপিন ও মালতীর চার চোখ এক হইল। বিপিনের স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি সবিস্ময় প্রশংসায় ভরিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মালতীর সরম-কোমল দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল। তাহার

মুখের উপর স্মিতরেখা ফুটিয়া উঠিল। বিপিন দেখিল সেই নিখুঁত মুখখানিতে সেই হাসিটি বিশ্বশিল্পীর চরমনিপুণতার তুলিকাপাত!

বিপিনকে দেখিয়া মালতীরও মন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে দেখিল বিপিন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মাঝারি আকারের মানুষটি; মুখশ্রী তাহার অতি কোমল, প্রিয়দর্শন প্রশান্ত হাস্যময়; চোখদুটি করুণা সরলতায় সর্ব্বদাই টলটল ছলছল করিতেছে; তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার কোমল প্রকৃতি উঁকি মারিয়া যাইতেছে; তাহার উন্নত নাসিকা যেন অল্পেই অভিমানে স্ফুরিত হইয়া উঠে; ললাট তাহার জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল; সে বেশভূষাতে ফিটফাট, পায়ের নখটি হইতে কুঞ্চিত কেশের বিন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটী। বিপিনের বাহিরটি যেন তাহার অন্তরেরই দর্পণ। বিপিনকে পরমাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে মালতীর চোখের দেখা ছাড়া দ্বিতীয় প্রমাণের আর অপেক্ষা রহিল না। দুটি তরুণ হৃদয় প্রথম সাক্ষাতের আনন্দেই পরস্পরের অভিমুখ হইয়া উঠিল।

বিপিন ও মালতীর এই দৃষ্টি বিনিময় খুড়িমার দৃষ্টি এড়াইল না। খুড়িমা ইহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মালতী বিপিনকে দেখিবার জন্য যেই দ্বিতীয় বার মাথা তুলিয়াছে অমনি খুড়িমার রূঢ় দৃষ্টি তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। এই তিরস্কার বিপিনেরও অগোচর রহিল না।

মালতী ঘর হইতে প্রস্থান করিবার জন্য দ্বারের দিকে গমন করিল। বিপিন অমনি 'এখন মার কাছে যাই' বলিয়া হঠাৎ অপর দিকের দ্বারের দিকে চলিয়া গেল।

প্রকাণ্ড ঘরের দুই প্রান্তের দুই দ্বারের কাছে আসিয়া মালতী ও বিপিন উভয়েই একবার ফিরিয়া চাহিল। আবার তাহাদের দৃষ্টি-বিনিময় হইল। মালতী তাহার ডাগর চোখের দীর্ঘবক্র পক্ষ্মজালের মধ্য দিয়া বিপিনের দিকে স্নিগ্ধ করুণ সরমসন্নত দৃষ্টিতে এমন ভাবে চাহিল যেন আজ সে বিপিনের মধ্যে নিজের আশ্রয়, নিজের সান্ত্বনা, নিজের বন্ধুকে দেখিতে পাইয়াছে। তারপর মালতী দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মানা পুরনারীদের ভিড়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

এই একটি চকিত দৃষ্টি দিয়া বিপিনও দেখিয়া লইল মালতীর দৃষ্টি যেন একটি ভীরু আত্মীয়তার পরিচয় জানাইয়া গেল। মালতীর সর্ব্ব-অবয়বে যৌবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ দীপ্যমান; জলস্রোতে জ্যোৎস্নাপাতের মতো একটি সম্ভ্রমসংযত সজীবতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। তাহার লজ্জা দিয়া এই ঢলঢল লাবণ্যরাশি ঢাকিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাচের আবরণে তড়িৎশিখার মতো তাহা ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিতে হাসিতে তনুলতার হিল্লোলে চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

বিপিন মুগ্ধ হইয়া ফিরিল। আতপচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে যেমন শত সূর্য্যের ছবি নাচিতে থাকে, বিশ্বচরাচর কম্পিত হইতে থাকে, তেমনি বিপিনের অন্তরে বাহিরে মালতীর রূপচ্ছবি ভরিয়া উঠিল। বিপিন যাইতে যাইতে আবার মুখ ফিরাইল, কিন্তু আর মালতীকে দেখিতে পাইল না।

বিপিনের এই এতক্ষণের প্রসন্ন মুখ সহসা এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল। মালতীর সঙ্গে কেমন করিয়া পরিচয় করা

যায় এই চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিল। বিপিনের মনে হইল এই তরুণী বিপিনেরই পরিজন দ্বারা অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত, সে এই এতবড় পরিবারের সহিত সম্পর্কশূন্য একাকী। সমবেদনায় বিপিনের চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই-সব সেকেলে ধরণের লোকেদের সঙ্গে তাহারও ত বনিবে না, নিজের পরিবারে সেও ত নিঃসঙ্গ একাকী। যদি সে কোনো প্রকারে মালতীর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে মালতীও সঙ্গ পায়, সেও সঙ্গ পাইয়া বাঁচে। এই পরিচয়ের মধ্যে উভয়েরই স্বার্থ আছে—এ বাড়ীতে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদের উভয়ের পরিচয় হওয়াই আবশ্যক।

বিপিন মালতীর সহিত আলাপ পাতাইবার শতেক উপায় উদ্ভাবন করিল কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হইল না। কেবলি মনে হইতে লাগিল সব চেয়ে যেটি ভালো অথচ সহজ উপায় সেটি নবকিশোর ফাঁকি দিয়া প্রথমেই আত্মসাৎ করিয়া খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। হায় হায়! সেদিন যদি বিপিন নবকিশোরের সঙ্গে মালতীর বাড়ীতে যাইত তাহা হইলে মালতীর সহিত পরিচয় ত তাহার হইয়াই থাকিত, আজ আর আলাপের উপায় খুঁজিতে এমন করিয়া মাথা ঘামাইতে হইত না। কেন তাহার অমন কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল! ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইতে লাগিল নবকিশোর যেন ঠকাইয়া তাহার আগে মালতীর সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছে। বিপিন নিজের কাছে স্বীকার না করিলেও নবকিশোরের সৌভাগ্যে তাহার মন ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাবপ্রবণ বিপিন ভাবের ঝোঁকে এমনি করিয়াই নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। ভাবজাল বিস্তার করিয়া মালতীকে ধরিবার জন্য যতই সে ফন্দি আঁটিতেছিল নিজেই তত জড়াইয়া গিয়া নির্গমনের পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মালতীর সহিত আলাপ করিবার জন্য যতই বেশি ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল ততই তাহার নিকট সকল উপায়ই অতিমাত্র বিসদৃশ ও লজ্জাজনক বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার মন্ত্রী নবকিশোরের শরণ লইলে সকল সমস্যার হয়ত সহজেই সমাধান হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নবকিশোরের অনায়াস-সফলতা তাহার এই দুষ্কর প্রয়াসকে উপহাস করিবে মনে করিয়া লজ্জায় বিপিন কিছুতেই নবকিশোরের পরামর্শ লইতে মনকে স্বীকার করাইতে পারিল না।

বিপিন যখন খুড়িমার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল তখন এ বিপিন যেন আর সে বিপিন নহে; যে হাসিমুখে গিয়াছিল, সে আঁধার মুখে ফিরিয়া আসিল দেখিয়া নানা জনে নানা রূপ জল্পনা করিতে লাগিল। গিন্নি মনে করিলেন নিশ্চয় ছোটবৌ তাঁহার নামে তাঁহার ছেলের কাছে একখানা কথা সাতখানা করিয়া লাগাইয়া ছেলের মন ভারী করিয়া দিয়াছে। অপর সকলে ভাবিল নিশ্চয় ঐ ডাইনি ছুঁড়ি গুণ করিয়াছে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গিন্নি খুড়িমাকে বেশ দশকথা ঝালঝাল শুনাইয়া দিলেন। বিপিন যে একবাড়ী লোকের সাক্ষাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া গেছে খুড়িমার অশ্রুজলসিক্ত ঐ কৈফিয়ৎ গিন্নিকে কিছুতেই নিঃসন্দেহ করিতে পারিল না। পুরস্ত্রীরা মিলিয়া মালতীকে উঠিতে বসিতে কটু কথায় ত্যক্ত করিয়া তুলিল। মালতী কিন্তু নীরবেই সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল।

তিন চারিদিন বিপিন বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু সেই প্রথম দর্শনের পর মালতীকে দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য তাহার আর হয় নাই। তাহার মন বিরস হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের পরই সে ভাবিয়াছিল যাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ এক মুহূর্ত্তেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিবে এবং সেই পুষ্প লইয়া একটি চিরকিশোর দেবতা যে শর তৈরি করিবে তাহার আঘাত সে একাই সহ্য করিবে না, তাহার আঘাতে ব্যস্ত হইয়া মালতীও এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখা দিবে। বিপিন দেখিল যে, সে ভুল বুঝিয়াছিল—মালতী বিপিনের ত্রিসীমানা মাড়ায় না, বিপিনের অনাবশ্যক যাতায়াতের পথেও দৈবাৎ একবার দেখা দেয় না। ঘন ঘন খুড়িমার ঘরের দিকে যাইতে বিপিন নিজের কাছেই লজ্জা অনুভব করে বলিয়াই তাহার মনে হয় অপরেও বুঝি তাহার ছল বুঝিতে পারিতেছে। তাহার আর যাওয়া হয় না। যদি বা কখনো বিশেষ চেষ্টার পর সে খুড়িমার ঘরে যায় তথাপি সেখানে মালতীকে সে দেখিতে পায় না, মালতী তাহার সাড়া পাইলেই সেখান হইতে সরিয়া যায়। যে খুড়িমার ঘর আগে তাহার সমস্ত দিনের আশ্রয় ছিল, সেই খুড়িমার ঘরেও অধিকক্ষণ বিলম্ব করার তাহার আর জো নাই—সে খুড়িমার ঘরে গেলেই খুড়িমা কেমন বিষণ্ণ সন্ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে গম্ভীর ভাবে বলেন—আমার ঘরে তুমি ঘন ঘন এস না বাবা, দিদি রাগ করে' আমার আবার খোয়ার করবেন।—ইহার পর তাঁহার ঘরে বিলম্ব করা বিপিনের পক্ষে সম্ভব হইত না। তাহার স্নেহময়ী খুড়িমার এই নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তনের কারণ অনুমান করিতে পারিলেও সে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিত।

(১৬)

মিলনের পথে বাধা পাইয়া পাইয়া একগুঁয়ে ভাবপ্রবণ বিপিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু তাহাকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল মালতীর অতিসাবধান ব্যবহার। মালতী যে সাধ্যপক্ষে বিপিনের সম্মুখে দেখা দিতেছিল না, এবং হঠাৎ সামনে পড়িয়া গেলেও খুব কুণ্ঠিত সম্ভ্রমে সরিয়া যাইত, তাহাতে বিপিন একটু নিরুৎসাহিতই হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার চৈতন্য হইতে লাগিল যে, মালতী বিধবা; বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিপিনের নিজের মত যাহাই হোক না কেন, একজন বিধবার মতামত না জানিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাহাকে অপমান করারই নামান্তর। তাহা ছাড়া মালতী তাহাদেরই আশ্রিত; এমন অবস্থায় বিপিনের দিক হইতে কিছুমাত্র অসংযত

ব্যবহার বা প্রগল্‌ভতা অবস্থার সুবিধা পাইয়া মালতীকে জালে জড়াইবার চেষ্টা বলিয়া মালতীর মনে হইতে পারে; মালতী স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে বিপিন যতখানি অসঙ্কোচে তাহার কাছে আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারিত, মালতী তাহার নিতান্ত হাতের মুঠার ভিতর আটক আছে বলিয়া সেরূপ করিবার উপায় বিপিনের মোটেই নাই। অধিকন্তু বিপিনের পরিজনেরা মালতীর প্রতি যেরূপ প্রতিকূল হইয়া আছে, তাহাতে এক্ষণে একটুমাত্রও ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিলে মালতীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করারই কারণ হইবে। তখন বিপিন সবলে আপনাকে দমন করিতে লাগিল। আপনার উদ্দাম আবেগ দমন করিবার জন্য বল-প্রয়োগ করিতে করিতে বিপিন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। সে আপনাকে নিরাশ্রয় দুর্ব্বল মনে করিতে লাগিল। এগজামিন দেওয়ার বিষম ব্যস্ততার পরে একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া একেই বিপিনের ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল, তাহার উপর এই দুর্বিপাক উপস্থিত। এখন সে নিজেকে কোনো একটা কাজে লিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

তখন বিপিনের মনে পড়িল কলিকাতা হইতে আসিবার সময় নবকিশোরের সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়াছে যে তাহার পরিবারস্থ সকল স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একটি পাঠসভা করিতে হইবে। একদিন বিপিন তাহার মাতার নিকটে বাড়ীর প্রায় সকল মেয়েদের সমবেত হইয়া অকাজে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রস্তাব করিল—দেখ মা, আমি মনে করছি, রোজ দুপুর বেলা তোমাদের ভালো ভালো বই পড়ে' পড়ে' শোনাব। দুপুর বেলা তোমাদের কারো ত কোনো কাজ থাকে না, তাস খেলে কড়ি খেলে সময় নষ্ট কর বই ত নয়। তার চেয়ে বই থেকে দুটো ভালো কথা শোনা কি ভালো নয়? কি বল তোমরা?

এই প্রস্তাবে কাহারো তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। গিন্নি ছেলের মনরাখা রকমে বলিলেন—তা বেশ ত। কাল থেকে ঐ দালানে সবাই বসে শুনবে, তুই পড়িস।

জয়া বিপিনের প্রসন্নতা লাভের জন্য বলিল—তা আমরা শুনব। তবে ইংরিজি টিংরিজি পোড়ো না বাবা; ইংরিজিতে শোনবার মতন কিছু নেই, ঐ ত গাঁচ পড়ে শুনেছি—শুধু ঘোড়া গাধা গোরু আর ঘাস কাটার গল্প।

এই বলিয়া জয়া পাঁচুর মার দিকে চাহিয়া হাসিল। পাঁচুর মা দুই আঙুলে ঘোমটা ফাঁক করিয়া চোখ মটকাইয়া জয়ার হাসিতে হাসিয়া সায় দিল—ভাবটা, বড় মিথ্যে বলনি জয়া পিসি!

ক্ষমা বলিল—না, ইংরিজি টিংরিজির গল্প আমাদের ভালো লাগবে না। বেহুলা লখিন্দর, কমলে কামিনী, গোলে বকাওলি—এইসব গল্প বেশ!

মোক্ষদা বিজ্ঞভাবে বলিল—ওসব ত মহাভারতের গল্প।

গিন্নি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বিপিন তুই মহাভারত পড়িস। সময়ও কাটবে, ধর্ম্মও হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে। কাল থেকে আমি মহাভারত পড়ব। তোমাদের কিন্তু সবাইকে বসে' শুনতে হবে।

জয়া বলিল—তা শুনব বৈ কি বাবা।

বিপিন চলিয়া গেলে একে একে সকল মেয়েই গিন্নির নিকট হইতে উঠিয়া অন্য ঘরে গিয়া জড়ো হইল। পাঁচুর মা বলিয়া উঠিল—এই এক ফ্যাসাদ জুটল দেখছি!

ক্ষমা বলিল—সত্যি ভাই, দুপুর বেলাটা একটু শুতে গড়াতে পাব না, দুটো কথা কইতে পাব না, একটু খেলতে পাব না, চুপ করে মুখ বুজে বসে থাকতে হবে। আমার ত ভাই ঢুলুনি আসবে। বিপিন দাদা এ এক বিপদ করলে!

জয়া বলিল—আরে অত ভাবছিস কেন? বিপিন ছটফটে মানুষ। দুদিনের বেশি একজায়গায় ও স্থির হয়ে থাকতে পারবে ভেবেছিস?

পরদিন দ্বিপ্রহরে বড় দালানে ফরাশ বিছাইয়া পাঠসভা বসিল এবং বিপিনের জন্য একখানি আসন পৃথক পাতা হইল। বিপিন কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য মহাভারত বগলে করিয়া পাঠসভায় আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সকলেই দালানের ফরাশে বসিয়া আছে, কেবল খুড়িমা ঘর হইতে দালানে আসিবার দরজার কাছে মাটিতে বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে দরজার আড়ালে লুকাইয়া অপর একজন কেহ আছে।

বিপিন একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পড়িতে বসিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে মহাভারতের মধ্যেকার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাসের ইঙ্গিত, সমাজতত্ত্ব, চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝাইয়া বুঝাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সে মহাভারতের ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে লাগিল প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ ছিল না, ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় ছিল না, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ ইহতে পারিত, বাল্যবিবাহ লোকের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এইসব প্রথা পরে কেমন করিয়া নিষিদ্ধ বা প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমাজের কি কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার সময় মুখচোরা বিপিনের বাগ্মিতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। বিপিন পাঠ করিতে করিতে এক একবার যখন মাথা তুলিতেছিল, তখনই দেখিতে পাইতেছিল দুটি ডাগর চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া মারিয়া যেন তাহার কথা পান করিতেছে; তাহার চোখে চোখে মিলিত হইবামাত্রই সেই কালো চোখ দুটির উৎসুক দৃষ্টি নত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল। সমস্ত শ্রোত্রীরা পুত্তলিকার মতো ভাবশূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বসিয়া আছে; কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ ঢুলিতেছে, কেহ ফিসফিস করিয়া অবিরাম কথা কহিতেছে; কিন্তু দ্বারের অন্তরালবর্ত্তিনী শ্রোত্রীটির যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহের অভাব নাই তাহা তাহার দৃষ্টি দেখিয়া বিপিন বুঝিতে পারিতেছিল।

বিপিন হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া "আজ এইখানেই থাক" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং কাহারও কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা-

মাত্র না করিয়া বই বগলে তুলিয়া হনহন করিয়া দালান হইতে ঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় আর-একবার অন্তরাল-বর্ত্তিনী শ্রোত্রীটির সলজ্জ কুণ্ঠিত দৃষ্টির সঙ্গে বিপিনের সপ্রশংস দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল।

জয়া তুড়ি দিতে দিতে সশব্দে হাই তুলিল। ক্ষমা মোক্ষদাকে ঠেলা দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'এই মুক্ষী, ঢুলে পড়ে যাবি যে।' পাঁচুর মা ঘোমটা খুলিয়া হাঁপ ছাড়িল। গিন্নি বলিলেন—এস জয়া ঠাকুরঝি, একটু তাস খেলা যাক! রোহিণী তাসজোড়া আনগে ত।

খুড়িমা আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। মালতীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, সে আগেই কখন উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘুমের পরী

ঘুম-পাড়ানি, ঘুমের পরী,
ঘুমের দেশের মেয়ে,
আর কতকাল রৈব জেগে
পথের পানে চেয়ে!
নিদ্রাবিহীন গভীর দুখে,
গর্জ্জে ওঠে বেদ্‌না বুকে,
নিমেষ তরে হাস্যমুখে,
আয় গো ঘুমের রাণী,
ক্লান্ত চোখে যারে দিয়ে
ঘুমের কাজল টানি!

সারানিশি একলা জেগে
অবশ দেহ মন,
নিঃস্ব বসে ঘরের কোণে
নেইক আপনজন!
সাঁচ্চা দিয়ে শরীর মুড়ে,
আকাশ-পাতাল সকল জুড়ে,
স্বপ্ন পরী আর ওড়েনা
মেলে রঙিন ডানা,
মসীর মতন তিমির ঘেরা
আমার জগৎ-খানা!

জাগরণের যতেক দুঃখ
ঘুমিয়ে রব ভুলি,
কে সে শাসায়, দেখ্‌ব নাকো
অলস নয়ন তুলি!
জগৎ জুড়ে কিসের তরে,
তর্ক ওঠে ঘরে ঘরে,
দেওয়া-নেওয়ার হিসাবটাতে
কিসের টানাটানি,
চাইনে কিছু, চাই গো তোরে
ঘুমের দেশের রাণী!

বুলিয়ে দে রে পদ্মহস্ত
আমার ক্লান্ত শিরে!
ছুঁইয়ে দেরে রূপার কাটি
ঘুমিয়ে পড়ি ধীরে!
সোনার কাটির পরশ পেয়ে,
আবার নূতন জনম নিয়ে,
নূতন দেশে, শুন্‌ব জেগে
নূতন আশার বাণী!
আজ্‌কে ঘুমের পরশ দেরে
তারেই ধন্য মানি!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

নবাব

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ মামান্।

সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় গেরি জুজের গৃহে হিসাব শিখিবার জন্য আসিত। বাহিরের ছোট ঘরখানিতে বসিয়া জুজ্ কাগজের উপর জমা-খরচের আঁক পাড়িয়া তরুণ শিষ্যটিকে হিসাবের কাজে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইত। গেরি যথেষ্ট অভিনিবেশের সহিত পাঠ শিখিতে বসিলেও, মন তাহার মাঝে মাঝে পাশের ঘর হইতে ললিত কণ্ঠের যে হর্ষ-কাকলী উত্থিত হইত, তাহারই মধ্যে ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। মেয়েদের প্রসঙ্গ জুজ গেরির সম্মুখে একদিনের জন্যও উত্থাপন করে নাই। পরী কাহিনীর সেই শক্তিশালী দৈত্য যেমন দুর্গবাসিনী রাজকন্যাকে সতর্কভাবে লোকচক্ষু হইতে রক্ষা করিত, বৃদ্ধ জুজও তেমনই পারির তরুণ সমাজের দৃষ্টি হইতে কন্যাগুলিকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। কিন্তু সেই প্রথম দিন বিদ্যুৎ-চমকের মত ললিত কণ্ঠের যে কলোচ্ছ্বাস গেরির বুকের মধ্যে এক বিচিত্র তালে দোল্ দিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা গেরি এক দিনের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। সপ্তাহের এই তিনটি সন্ধ্যায় প্রতি মুহূর্ত্তেই সে উদ্‌গ্রীব থাকিত, ঐ বুঝি পর্দাখানা সরাইয়া দ্বারের পাশে সুন্দর একখানা সস্মিত মুখ পাতার আড়ালে ফুলের মতই ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু আশা কোন দিনই পূর্ণ হইত না। এই মধুর সঙ্গ-লোভে নিরাশ হইয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তেই সে গৃহে ফিরিত।

যাহা হৌক, এ-সকল সত্ত্বেও হিসাবের কাজ ক্রমশঃই তাহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। জুজের শিখাইবার পদ্ধতিও যেমন সুশৃঙ্খল, শিখাইতে যত্নও তাহার তেমনই।

একদিন—রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়াছে—পাঠ শেষ হইলে গৃহে ফিরিবার জন্য গেরি গাত্রোত্থান করিলে জুজ তাহাকে সে রাত্রির ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। গেরি অবাক হইয়া গেল। সে জুজের মুখের পানে সপ্রতিভ দৃষ্টিতে চাহিতে জুজ উত্তর দিল, "এই তারিখে আমার স্ত্রী মারা যান্। তাই তাঁরই সম্মানের জন্য 'বন্ মামান্' বলছিল, দু-এক একজনকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে।"

"বন্ মামান্!"

"হাঁ। আমার বড় মেয়ে। ঐ নামেই ছেলেবেলা থেকে তাকে আমরা ডাকি। ছেলেবেলা থেকেই ও ভারী গোছানো—সংসারের সব দিকে নজর। মার কাছে আমার কিছুই এড়ায় না। লোককে যত্ন করা—আত্তি করা—এই ত আমার স্ত্রী আজ ক'বছর মারা গেছে—তা সংসারটি ঐ-ই ত মাথায় করে রেখেছে!"

গেরিকে লইয়া জুজ ভোজের টেবিলে

গিয়া বসিল। মেজ মেয়ে বলিল, "বাবা তোমরা খেতে বসো। এঁকে ত আবার অনেক দূর যেতে হবে। বেশী রাত হলে এঁর অসুবিধা হতে পারে।" গেরির মনে হইল, সে বলে, না, না, কিসের অসুবিধা! কিন্তু লজ্জায় তাহার কথা ফুটিল না। কুণ্ঠিত চিত্তে সে ভাবিল, কি সে দুর্ভাগা! এতদিন ধরিয়া সে এই ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল—এই ক্ষণ, এই কিশোরীদের সহিত পরিচয় করিবার এই মধুর অবসরটুকু! আজ যদি সহসা সে শুভ ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল, ত, তাহাকে এতখাটো করিয়া দেওয়া কেন? কিন্তু কি করিয়া সে মুখ ফুটিয়া বলিবে, না, না, কোন অসুবিধা হইবে না! হোক দীর্ঘ, কোন ক্ষতি নাই! এ মধুর সঙ্গ—

জুজ কহিল, "তুমি তা হলে—"

গেরি কোনমতে সঙ্কোচ কাটাইয়া কহিল, "এত ব্যস্ত হচ্ছেন, কেন? এঁদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই।"

মেয়েরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তরুণ অতিথির পানে চাহিয়া দেখিল। লজ্জায় গেরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সহসা দ্বারের সম্মুখে এক আগন্তুককে দেখিয়া জুজ কহিল, "এই যে আঁদ্রে। এসো। তোমারই জন্য শুধু দেরী! এলিস্, এবার তোমরা খাবারের উদযোগ কর। তারপর আঁদ্রে, এত দেরী হল কেন, বল।" আগন্তুক টেবিলের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমার নাটকখানা এইমাত্র শেষ করলুম। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা এই লিখে আসছি।" আনন্দের উত্তেজনায় আঁদ্রের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা গেরিকে দেখিয়া সে একটু কুণ্ঠিত হইল। জুজ সে ভাব লক্ষ্য করিয়া উভয়ের আলাপ করাইয়া দিল। "ইনি পল্‌তে গেরি—আর ইনি হচ্ছেন আঁদ্রে মারাঁন্।" তাহার পর আঁদ্রের দিকে চাহিয়া জুজ কহিল, "নাটকখানা তাহলে শেষ করেছ!"

"হাঁ, একদিন এইবার সকলের সুবিধামত এসে সেটা পড়িয়ে শোনাব।"

মেয়েরা সমস্বরে কহিয়া উঠিল, "আমরাও শুনবো।"

সকলেই জানিত, আঁদ্রে নাটক লিখিতেছে। একই গৃহে সকলের বাস, আলাপ-পরিচয়ও বেশ আছে। কাহারও মনে সন্দেহ ছিল না যে আঁদ্রের এ নাটক লেখা শেষ হইলে মঞ্চে দাঁড়াইবে না। ফটোগ্রাফির ব্যবসায়ে আঁদ্রের তেমন লাভ হইতেছিল না। খরিদদারের সংখ্যা অল্প; পথের লোক ষ্টুডিওর পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার পানে মুহূর্ত্তের জন্যও চাহিয়া যায় না। তথাপি কাজটায় অভ্যাস রাখিবার জন্য আঁদ্রে এখন প্রতি রবিবার বন্ধু-বান্ধবের গৃহে ঘুরিয়া সকলের ছবি তুলিয়া বেড়াইতেছে। খরিদদার জুটে না বলিয়া মনে তাহার কোন দিন অসন্তোষের চিহ্নও ফুটিয়া উঠে নাই। কেহ ব্যবসারের কথা তুলিলে আঁদ্রে হাসিয়া কহিত, "দিনকাল যে-রকম মন্দা পড়েছে, লোকে খেতেই পায় না, তা সখ করে ছবি তোলাবে কি।" ইহার অধিক একটি কথাও তাহার মুখে শুনা যাইত না। তবে তাহার মনে আশার এইটুকু ছিল যে, কোনমতে এই 'বিদ্রোহ' খানা যদি শেষ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে

তাহার আর কোন দুঃখ থাকিবে না। নূতন নাটকের নাম, 'বিদ্রোহ'।

তাহার পর সে নাত্রের মত সকলে টেবিলে বসিয়া পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। গেরি এক নূতন আনন্দের স্বাদ পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিল। নবাবের গৃহে বিলাস—ঐশর্য্যের প্রাচুর্য্য! প্রাণটা কেমন তাহার মধ্যে হাঁপাইয়া উঠে। এই বিলাসবর্জ্জিত সারল্যের মধ্যে প্রাণ তাহার এক অপূর্ব্ব শান্তি—সুধার স্বাদ পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল।

* * *

গেরির প্রাণে পারির একটি নারী, সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে নারী ফেলিসিয়া। ফেলিসিয়া যে গেরিকে একটু সহানুভূতির চক্ষে দেখিত, গেরির তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। গেরি প্রাণ দিয়া ফেলিসিয়াকে ভাল বাসিত। ফেলিসিয়াও এ ভালবাসা বুঝিত। সে গেরির নাম দিয়াছিল, "মিনার্ভা"। তাহাকে দেখিতে পাইলেই ফেলিসিয়া কহিত, "এই যে মিনার্ভা! এস মিনার্ভা, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কওয়া যাক্।" এই পরিচিত মিষ্ট সুর একটা স্নেহের আভাস দিত। গেরি বুঝিল, ফেলিসিয়া তাহাকে যে ভাবে ভালবাসে, তাহা ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় বোনের ভালবাসার মত। সে মনকে দৃঢ় করিল, না, অন্য ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না—আর অগ্রসর হওয়া নয়!

ফেলিসিয়া! বেচারী ফেলিসিয়া! জীবনের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে ভাণ ও কপটতা! চারিদিকে স্বার্থের ফাঁদ পাতা! মানুষের দুর্ব্বল চিত্ত! পদে পদে সেই ফাঁদে আপনাকে ধরা দিয়া মৃত্যুর ফাঁদে সে জড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাণটা তাহার অশ্রুতে ভিজিয়া থাকিত। মরুভূমির মত যে চিত্তটা দিন-রাত্রি খাঁ খাঁ করিত—এই অশ্রুতে ভিজাইয়াই কোনমতে তাহাকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

তাই আজ জুজের কন্যাদের সহিত মিশিতে পাইয়া গেরি এতখানি শান্তি অনুভব করিল। কি সুখে, কি পুলকে এই ক্ষুদ্র পরিবারটি উচ্ছ্বসিত রহিয়াছে।

এই ভোজের নিমন্ত্রণ হইতে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানটাও কাটিয়া গেল। গেরি আসিয়া মেয়েদের গৃহস্থালীর কথা লইয়া আলাপ সুরু করিয়া দিত, মেয়েরাও এই তরুণ শান্ত অতিথিটিকে ক্রমে একান্তই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পল যেমন জুজের গৃহ ত্যাগ করিবে, সম্মুখেই সে দেখে, আঁদ্রে।

আঁদ্রে কহিল, "গেরি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমার ঘরে একবার আসবে?"

গেরি আঁদ্রের সহিত তাহার ঘরে গেল। দ্বারটা ভেজাইয়া দিয়া আঁদ্রে কহিল, "শোন, আমাদের মধ্যে কিছু গোপনতা রাখবার দরকার নেই। স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা বলাই ভাল। তুমি লোক ভাল, তোমার টাকাকড়িও আছে। আমি গরিব—লিখে, পাগলামি করে দিন-গুজরান করি। দুজনের মধ্যে তোমাকেই লোকে আগে পছন্দ করবে,

এ তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু তবুও আমি বলি, আমার গরিবের একটি মাত্র যে সুখ আছে, সে সুখ দস্যুর মত তুমি লুটে নিও না। না, তা যদি কর ত, আমি পাগল হয়ে যাব, পাগলের মত তোমার সঙ্গে তাহলে লড়াই করব। সে সুখ তোমায় আমি নিতে দেব না। কদিন ধরে এই কথাটা যতই আমি ভাবচি, ততই যেন মাথা আমার খারাপ হয়ে উঠছে। আমার পথে এমন করে তুমি পাঁচিল তুলে দাঁড়িও না। ভাল হবে না।"

গেরি স্তম্ভিত হইয়া গেল। হতাশোদ্‌ভ্রান্তের মত এ কি চেহারা আঁদ্রের! সেই সহাস সস্মিত মুখে এ কি কালির রেখা! সে কহিল, "হেঁয়ালি ছেড়ে পষ্ট করে সব খুলে বল তুমি। কোন দ্বিধা করো না। আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।"

"বন্ধু! তবে শোন, তুমি জুজের বাড়ী হামেসা এখন আসা-যাওয়া করেছ কেন? বল—না, বলতেই হবে।"

গেরি কহিল, বলছি—জুজের মেয়েকে আমি ভালবাসি।"

"ভালবাস! কাকে? বন্ মামান্‌কে? না, না, তা হবে না। তা আমি হতে দেব না। তুমি জানো, আমার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র সাধ, বন্ মামান্‌কে পাওয়া! তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাকে ভালবেসেই আমি এ দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে সমান যুদ্ধ করে চলেছি—"

বন্ মামাম্! আলিন্! তাহাকে ভালো বাসিবার কল্পনা গেরির মনে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। সম্মুখে যখন অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী এলিস্ তাহার দীপ্ত লাবণ্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া অপর কাহারও পানে চাহিয়া দেখিবার গেরির অবসর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। সে ত আলিনকে ভালবাসে না, সে ভালবাসে এলিসকে; জুজের মেজ মেয়েকে।

গেরি বলিল, "আমি এলিসকে ভালবাসি বন্ মামান্‌কে নয়।"

আঁদ্রে কহিল, "তুমি তবে এলিসের জন্য আস? বন্ মামানের জন্য নয়?"

"না।"

"গেরি, বন্ধু, আমায় মাপ করো। আমি তোমায় ভুল বুঝে ছিলুম! শোন, বন্ মামানের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার এ নাটকখানা কোন থিয়েটারে নিলেই আমাদের বিয়ের কথা জুজের কাছে তুলবো। তখন তার আর কোন দ্বিধা থাকবে না। একজন উদীয়মান নাট্যকারের হাতে মেয়ে দিতে কোন বাধা থাকতে পারবে না।"

গেরি চলিয়া যাইবার জন্য উঠিতেই সম্মুখে প্রকাণ্ড একখানা ছবির পানে তাহার নজর পড়িল। এ মুখ কোথায় যেন সে দেখিয়াছে—হাঁ, এ যে বড় পরিচিত মুখ। সে স্থিরভাবে ছবির পানে চাহিয়া রহিল।

আঁদ্রে কহিল, "এঁকে তুমি চেনো?"

"চিনি বই কি! মাদাম জেঙ্কিন্স, না! ডাক্তারের স্ত্রী!"

"আমার মার ছবি—আমার মা।"

"মা!"

"হাঁ, আমার মা।" পরে আঁদ্রে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "তুমি অবাক হচ্ছ, গেরি। ইনিই আমার মা, মাদাম মারান্—ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে এখন বিয়ে করেছেন। তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ—যে, আমার মা অমন সুখে, অত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আছেন, আর আমার এই দুর্দ্দশা! তার কারণ, ডাক্তারের সঙ্গে আমার মোটেই বনিবনাও নেই! সে বলে, আমাকে ডাক্তারি শিখতে, কিন্তু আমি চাই লিখতে! সাহিত্য-চর্চ্চা করতে! নিত্যই তর্ক হত! শেষে সে তর্ক সহ্য করতে না পেরে আমি চলে এসেছি। জানি, মার মনে চোট্ লেগেছে—কিন্তু কি করব? নিরুপায় আমি। এমন দুর্দ্দিন আমার গেছে, গেরি, যে হাতে একটি পয়সা নেই—দু'দিন ঠায় উপোষ করে কেটেছে—কি করব, টাকা ত আমার আর নয়, টাকা জেঙ্কিন্সের। কোন মতে কায় ক্লেশে এখন দিন কাটাচ্ছি—লেখা-পড়া কিছু শেখা গেছে, কাজেই মনের বিরুদ্ধে যা তা ত করতে পারি না। তাই এই নাটক লিখতে সুরু করেছি। যদি বরাত তেমন হয় ত এতে অবস্থা ফিরতে পারে। হাতে যা-কিছু জমেছিল, তাই দিয়ে ক্যামেরা ট্যামেরাগুলো কিনে ছিলুম, কিন্তু সে ব্যবসা দাঁড়াল না। কি করব! বরাত!"

আঁদ্রের কথা শুনিবার সময় গেরির মনে একটা দৃশ্য বড় উজ্জল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই পুরাতন দৃশ্য—ফেলিসিয়া জেঙ্কিন্সকে তিরস্কার করিতেছে,—তোমার ছেলে মন্দ, না, মন্দ তোমরা—যারা এই সমাজটাকে নিজেদের খেলবার জায়গা মনে ভেবে যা-তা করে বেড়ায়! আঁদ্রের প্রতি সমবেদনায় প্রাণ তাহার ভরিয়া উঠিল। আহা, বেচারা, বেচারা আঁদ্রে! কি কষ্টেই সে দিনপাত করিতেছে! তাহার সুখ এখন নির্ভর করিতেছে, ঐ নাটকখানির উপর! ঐ নাটকের অভিনয় হইলে তবেই সে সুখী হইবে। বন্ মামান্‌কে পাইবে! ইহাই তাহার সাধ, ইহাই তাহার আশা! ভগবান, বেচারার এ আশা পূর্ণ কর, এ সাধ মিটাইয়া দাও! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে অকাল বার্দ্ধক্য।

আগামী ২২শে আগষ্ট তারিখে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন এবং সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর বয়স মাত্র পঞ্চাশ বৎসর জানিতে পারিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। দেখিতে রামেন্দ্র বাবুকে জরাজীর্ণ বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার গত সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার মস্তকে অনবরত গোলাপ জল ও ইউ-ডি কলোন দিয়া কোনক্রমে টাউন হলের উপরতলায় লইয়া গিয়া ১০ মিনিটের জন্য বিজ্ঞানবিভাগের সভাপতিত্বের আসনে তাঁহাকে উপবিষ্ট করান

হইয়াছিল। হা ভগবান! অথচ ইহার বয়স মাত্র পঞ্চাশৎ বৎসর।

বাঙ্গালায় এরূপ "বার্দ্ধক্যং জরসা বিনা" অনেককেই প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। রামেন্দ্র বাবু এম, এ পাশ করিয়াছেন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এতদিন কলেজের শিক্ষকতা করিয়াছেন—তাঁহার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে যে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" তথাপি তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশৎ বৎসর! প্রার্থনা করি অনেক দিন এখনও তিনি জীবিত থাকিবেন। কিন্তু পঞ্চাশের মধ্যে বা কিছু পরে বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বঙ্গের অনেক মহাপুরুষ স্বর্গলাভ করিয়াছেন—কে বলিতে পারে কেশব বাবু বা বিবেকানন্দ আশি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে ভারতের নর-নারীর আরও কত উপকার করিতে পারিতেন। আমাদের শাস্ত্রে লেখে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", কিন্তু আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণা করেন তাঁহারা অনেকে পঞ্চাশ পার হইলেই বনে না গিয়া একেবারে স্বর্গেই যাইয়া থাকেন। বন অপেক্ষা স্বর্গ অবশ্য খুব ভাল জায়গা, কিন্তু আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে তাঁহারা কোথাও না গিয়া "শতং জীবতু" হইয়া দেশের ও দশের কার্য্য করিতে থাকুন। দেশের এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বাঁচাইয়া রাখা একটা জাতীয় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতে দেখিতে পাই যে পঞ্চাশ বৎসরে সেখানকার মনীষীগণ যুবক থাকেন, আর আমাদের দেশে হয় তাঁহারা বৃদ্ধ না হয় গতাসু। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক স্যার এলেকজেণ্ডার পেড্‌লার সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এখনও সুস্থ শরীরে বিলাতে বাস করিতেছেন। লর্ড কেল্‌ভিন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ছিলেন—তিনি প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর শেষ মাস পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্, সার হেনরি রস্‌কো, সার জেম্‌স্ ডেয়োয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এখনও খুব প্রাচীন বয়সে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত আছেন। গ্ল্যাডষ্টোন, ডিস্‌রেলি, লর্ড মর্লি, লর্ড রিপন, লর্ড রবার্টস প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ কত বৃদ্ধ বয়সে এই জগৎব্যাপী ব্রিটিস সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন। বিলাতে এইরূপ কত শত লেখক, বীরপুরুষ, অধ্যাপক রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজসেবক সত্তর, আশি, নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া দেশের নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আর আমাদের দেশে সে দিন স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয় সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে না করিতেই অকালে মৃত্যুলাভ করিলেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের বোধ হয় চল্লিশও পার হয় নাই। কবি রজনীকান্ত ও হেমচন্দ্র

৺রমেশচন্দ্র মিত্র পঞ্চাশের আগেই বা একটু পরে গিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বোধ হয় ষাট পার হইতে পারিয়াছিলেন। সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এইরূপ অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যুতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে; বাস্তবিক পঞ্চাশ বৎসর এক প্রকার শিক্ষারও সাধনার আয়োজনের কাল মাত্র। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, সাধনা, শিক্ষা পরবর্ত্তীকালে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলে তবে দেশে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে। বিলাতের কর্ম্মীদের অধিকাংশ বৃহৎ কর্ম্মই পঞ্চাশের পরেই সাধিত হইয়া থাকে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে তাহার আরম্ভ মাত্র হয়। এই দেখুন না কেন ভারতশাসন কার্য্যে যাঁহারা গভর্ণর, লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর, গভর্ণর জেনারেল, সেনানায়ক প্রভৃতি বিলাত হইতে নিযুক্ত হন তাঁহাদের বয়স অধিকাংশই পঞ্চাশের এমনকি ষাটেরও উপর হইবে। পঞ্চাশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বড়ই অমূল্য পদার্থ। আমাদের দেশে যাঁহারা মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন, সেই সকল চিন্তাশীল কর্ম্মীদিগকে পঞ্চাশের উপর সুস্থ রাখিবার কি কোনও উপায় নাই?

আমার মনে হয়, আছে। এটা যেন বেশ বুঝা যায় যে, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অকাল বার্দ্ধক্য ও ততোধিক ভয়ানক অকাল মৃত্যুর দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান—বাল্য বিবাহ ও অপরিমিত মস্তিষ্ক চালনা।

ইহার মধ্যে বাল্যবিবাহ কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আয়ুক্ষয় করিতেছে এমন নহে, ইহা একটা জাতীয় অভিসম্পাতরূপে পরিণত হইয়াছে। অপরিণত বয়স্ক পিতা-মাতার সন্তান কখনও সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না—এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজে পুত্রকন্যার বিবাহের বয়স কেন আশানুরূপ উন্নত হইতেছে না তাহার কারণও দেখা যায় না। সকলেই বাল্যবিবাহের কুফল বোঝেন, সমাজে বাল্যবিবাহ রহিতের বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকও নাই—অথচ মেয়েদের বিবাহ ১১ বৎসরের মধ্যে দেওয়া চাইই। অনেক যুবক পঠদ্দশায় বিবাহ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক, কিন্তু পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে তাহারা নিরুপায়। আমরা সকলে নিজে নিজে যদি স্থির করি যে ভ্রাতা বা পুত্রের বিবাহ বাইশ বৎসরের বা কন্যা ও ভগিনীর বিবাহ ষোলোর কমে দিব না—তাহা হইলে সমাজ কি বলিবে? বড় জোর বাড়ীর মেয়েরা পাল্কীভাঙ্গা ক'নে" দেখিয়া একটু ঠাট্টাতামাসা করিবে। বিলাত যাইলে এখনও জাতি যায়, বিধবা বিবাহ দিলে জাতি যায়; কিন্তু ষোল বা স'তের বৎসরে কন্যার বিবাহ দিয়া কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে দেখি নাই। পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজে এইরূপ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। একটু মানসিক বল সংগ্রহ করিতে পারিলে অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ হইলে এই কুপ্রথা অচিরেই উঠিয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাল্যবিবাহ ছাড়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জীবনীশক্তি

হ্রাসের আর একটি কারণ—অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অভাব। রামেন্দ্রবাবু শরীরের উপর নিশ্চয়ই অবিচার করিয়াছিলেন, মস্তিষ্কের উপর কঠোর অত্যাচার করিয়াছেন—নহিলে আজ তিনি মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বার্দ্ধক্যের অভিনন্দন লাভ করিতে পারিতেন না, তাঁহার স্নায়ুগুলিও এত শিথিল হইত না,—যাহাতে ইউ—ডি—কলোন মাথায় দিয়াও দশ মিনিটের বেশী বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্বের কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয় যদি অপরিমিত মস্তিষ্ক চালনা না করিতেন তাহা হইলে তিনি মস্তিষ্ক-রোগে অকালে প্রাণ হারাইতেন না—আরও বিশ ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া তিনি নিজে ধন্য হইতে পারিতেন এবং বাঙ্গালা দেশকেও ধন্য করিতে পারিতেন। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে এই সকল ব্যক্তি কেবল বাঁচিবার জন্যই মস্তিষ্ক পরিচালনা বন্ধ করিয়া আহারবিহারেই জীবনপাত করুন। সেরূপে বাঁচিবার লোকের অভাব আদৌ নাই। আমার বক্তব্য এই যে পরিমিত মস্তিষ্ক চালনা এক কথা আর অপরিমিত মস্তিষ্ক পরিচালনা আর এক কথা। শরীরকে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিলে যে প্রভূত কার্য্য করা যায় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘজীবিও হওয়া যায় তাহা যেন আমরা বিলাতের কর্ম্মবীর চিন্তাশীল মনীষীগণের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা করি। আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই যেন শয়ন গৃহে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনং" এবং প্রাতে উঠিবার সময় ও রাত্রে শুইতে যাইবার সময় যেন ঐ মন্ত্রটি স্মরণ করেন। *

এইরূপে শরীরকে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার আমার নিজের কয়েকটি মুষ্টিযোগ আছে। তাহার বর্ণনায় অপরের উপকার হইবে কিনা জানি না কিন্তু ইহাতে আমি নিজে বড়ই উপকার লাভ করিয়া থাকি। যখন অধ্যাপকের কার্য্য আমার পেশা তখন অল্পাধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে আমি বাধ্য। আমি যুবক সুস্থ না থাকাই আমার পক্ষে অন্যায়। কিন্তু আমার সমবয়সী ও সমকর্ম্মী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অনিদ্রারোগ, মাথাধরা প্রভৃতি অভিযোগের অভাব দেখি না বলিয়াই মনে হয় আমার মুষ্টিযোগ গুলি নিতান্ত অকেজো নহে। বলাবাহুল্য বাঁধাবাঁধি বিধির উপর জীবন চালনা করিতে হইলে যৌবন কাল হইতেই নিয়ম-পালনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, বৃদ্ধবয়সে সেরূপ অভ্যাস হওয়া অসম্ভব।

আমার মুষ্টিযোগের সংখ্যা অল্প, চারিটি মাত্র। তাহাদের উদ্দেশ্য শরীর ও

* আমাদের দেশে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সেও যে চিন্তাশীল ব্যক্তি দেশের কাজে যোগ দিতে পারেন —তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মস্তিষ্ককে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করা। প্রথম নম্বর মুষ্টিযোগ হইতেছে—সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন মানসিক শ্রম করার পর একদিন সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম প্রদান করা। ছয় দিন খুব লেখাপড়া করুন কিন্তু ভক্ত খৃষ্টানগণের মত রবিবার দিনটা একেবারে স্যাব্যাথ ডে (Sabbath day) রূপে গণ্য করিতে হইবে; নহিলে ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরিয়া অবিরামভাবে লেখাপড়ার কার্য্য করিলে অবিলম্বে শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। অনেকে ইহার ঠিক বিপরীতাচরণ করেন। তাঁহারা সপ্তাহের ছয় দিন স্কুল, কলেজ, কাছারি, আফিস করেন, পরে রবিবার দিন যতরাজ্যের জড় করা চিঠির উত্তর লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, কবিতা রচনা করেন—এমন কি মনে করেন রবিবার দিনটাই প্রকৃত কাজের দিন। ফলে হয় এই যে, মস্তিষ্ক বেচারা মাসের মধ্যে একদিনও ছুটি পায় না। মিলের কুলিরাও যখন সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া তাহাদের হাড়ভাঙ্গা কাজ হইতে ছুটি পায়, তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে মস্তিষ্ক জিনিষটা কুলিরও অধম নহে। ছয়দিন যত পারেন লেখাপড়া করুন, বৈজ্ঞানিকগণ ল্যাব-রেটারীতে কাজ করুন, কবি কবিতা লিখুন, আর রবিবার দিন বাজার হাট করুন। অনেকে ভুল বুঝিয়া বাজার করাটা হীন কাজ মনে করেন, কিন্তু আমি দেখিতে পাই রবিবারে বাজারে যাইলে অন্ততঃ সে দিনটার খাওয়া দাওয়াটা খুবই ভাল হয়। বন্ধুবান্ধবদের বাটিতে গিয়া দেখা শুনা করুন, অল্প অল্প দূরবর্ত্তী স্থানে বেড়াইতে যান কিন্তু লেখাপড়ার ধার দিয়াও যেন না যান। বেশ দেখা যায় এইরূপে সপ্তাহের মধ্যে একদিন লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিলে পরবর্ত্তী ছয় দিনে বেশ পুরাদমে কাজ করা যায়।

আমার দ্বিতীয় মুষ্টিযোগ হইতেছে—বৈকালে ৫টা বা ৫৷৷০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কোনও মস্তিষ্কোপজীবী ব্যক্তিকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর সকলে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ুন—রাস্তায়, বাগানে বাহির হউন, মাঠে যান, জঙ্গলে যান, ময়দানে যান, নদীর ধারে বেড়ান, গড়ের মাঠে বেড়ান। মোট কথা বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন একান্ত প্রয়োজন। সাহেবেরা বৈকালে ফুটবল, টেনিস, হকি, রগেবি খেলে, সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে যায়, বিলিয়ার্ড খেলে। শুনিয়াছি মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব শারীরিক পরিশ্রম করিবার জন্য কাঠ ফাড়িতেন, কেহ কেহ মাটি কোপান, স্যাণ্ডোর ডম্বেল ভাঁজেন ইত্যাদি। আমাদের দেশে সকলেই অকাল বিজ্ঞ। আমরা ফুটবল প্রভৃতি খেলা ছেলে-দেরই উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। খেলা আমাদের দ্বারা হইবে না, বেড়ান ত হইবে? তবে দিনের মধ্যে দুই তিন ঘণ্টা বেড়াই না কেন? সমস্ত

দিনের বিষম মানসিক পরিশ্রমের পর শরীরকে একটু তাজা করা ত চাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেশী মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শারীরিক শ্রম একেবারেই নাই—ফলে ডায়েবেটিস, অজীর্ণ, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ সহজেই তাঁহাদের জীবনসঙ্গী হইয়া উঠে। যদি লাট সাহেবের কাউন্‌সিলের সব সরকারী সভ্যেরা একটা আইন পাশ করাইয়া লইতে পারেন যে ৫॥০ টার পর স্কুলমাষ্টার, প্রফেসার, জজ, হাকিম, উকিল, বারিষ্টার, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রভৃতি যে কেহ বাটীতে বসিয়া থাকিবেন তাহার জেল হইবে, তাহা হইলে বাস্তবিকই এই সকল ব্যক্তিকে পঞ্চাশের উপরেও করিয়া রাখা যাইতে পারে, নচেৎ বড়ই বিপদ।

যাঁহারা সারাদিন মানসিক পরিশ্রম করেন, রাত্রে তাঁহাদের লেখাপড়া না করাই ভাল। কারণ এরূপ অনেকস্থলে দেখা যায় যে রাত্রে লেখাপড়া করিলে সমস্ত রাত্রি আর ভাল ঘুম হয় না। তবে যাঁহাদের উদরান্নের জন্য দিনের বেলায় স্কুল, কলেজ, কাছারি বা আফিসে যাইতে হয় না, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যায় অনায়াসে পড়াশুনা করিতে পারেন। মোটের উপর দিবসের মধ্যে আট নয় ঘণ্টার বেশী মানসিক শ্রম একেবারেই অনুচিত।

আমার তৃতীয় মুষ্টিযোগ হইতেছে—বড় বড় ছুটিতে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া। দেখুন না কেন, বিলাতে যাই পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ হইল বা কোন একটা ছোট বড় ছুটি মিলিল অমনি রাজমন্ত্রী রাজকার্য্য ফেলিয়া, বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটারী ফেলিয়া, ধনী ব্যবসাবাণিজ্য ফেলিয়া, কেহ সমুদ্র স্নান করিতে যান, কেহ আল্‌পস্ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যান,—লণ্ডনের ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য—সকলেই যেন বাহির হইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন! এটা একটা ফ্যাশান নহে, এ ব্যবস্থা অনেকটা মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে—ইহাতে মনের অবসাদ ঘুচে, মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ পায়, শরীরের পরিশ্রম খানিকটা বাড়ে, স্বাস্থ্যও ভাল হয়, মানুষ অনেক সময়ে নূতন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেশে বড় ছুটির মধ্যে পূজার ও বড় দিনের বন্ধই সকলে পান, তাহা ভিন্ন হাইকোর্টের তিন মাস ব্যাপী ছুটি আছে আর স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ গরমের লম্বা ছুটি পাইয়া থাকেন। এইসব ছুটিতে বৎসরে পনের দিন, এক মাস বা দুই মাস যদি সকলে দার্জ্জিলিং, খরসান পুরী, মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে "বায়ুভক্ষণে" কাটাইয়া আসিতে পারেন, শরীরের মঙ্গল ত হয়ই, মানসিক মঙ্গল তদপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে সমুদ্রযাত্রা করিয়া দেখিয়া আসুন—অন্য দেশগুলা আমাদের দেশের মত মাটির না সোণার। শুনিয়াছি স্বর্গীয় ডব্‌লু, সি ব্যানার্জ্জি মহাশয় বলিতেন যে একবার সমুদ্রযাত্রা করিলে চারি বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অবশ্য এরূপ স্থান

পরিবর্ত্তন অর্থব্যয় সাপেক্ষ। যাঁহার অর্থ কম আছে তিনি ধার করুন। শাস্ত্রে লেখা আছে "ঋণং কৃত্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বিংশ শতাব্দীতে আর বিশুদ্ধ ঘৃত মিলে না, তাই কলিকালে এখন "ঋণং কৃত্বা বায়ুং পিবেৎ" এই মন্ত্র বলিবে। এইরূপে মানসিক বল সংগ্রহ করিতে হইবে। আগে বল সংগৃহীত না হইলে খরচ করিবে কি?

আমার চতুর্থ ও শেষ মুষ্টিযোগ সকল মুষ্টিযোগ অপেক্ষা উপাদেয়—প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা। মনে করিবেন না আমি এখানে হাইজিনের তর্ক উপস্থিত করিতেছি। সকলেই বুঝিতে পারি এক দেশের বা জাতির পক্ষে যে খাদ্য পুষ্টিকর অপর দেশের বা জাতির পক্ষে তাহা নহে। মদ্য মাংস বিলাতের শীতবায়ুর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য হইতে পারে, বাঙ্গালার জলহাওয়ায় উহা উপযোগী নহে। বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্য ডাল, মাছ, ঘি, দুধ। কিন্তু কথা হইতেছে বিশুদ্ধ ঘি, দুধ পাই কোথা? মাছও ত প্রায় দুর্লভ জিনিস হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুষ্টিকর আহারের যদি এইরূপ অপ্রাপ্তি ঘটিতে থাকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতে থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মেচনিকফ সাহেব বলেন ঘোল খাও—বুড়া হইবে না। কথাটা ঠিক, পল্লীগ্রামের লোকেরা মেলেরিয়ায় ভুগিয়াও দুধ, দই, ঘোল খাইয়া অনেক দিন বাঁচিত, এখন ত সেই পল্লীগ্রামেই টাকায় ছয় সের দরেও নির্জ্জলা দুধ মিলে না। বাটীতে চারপাঁচটি শিশু থাকিলে বাড়ীর কর্ত্তা—অর্থাৎ যিনি মস্তিষ্ক চালনা করিয়া সংসার চালাইতেছেন—দুধ, ঘির মুখও দেখিতে পান না। মাছের ঝোলের বাটীর ভিতর একটুকরা মাছ আছে কি না অনেক সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র না হইলে দেখা অসম্ভব। বাস্তবিক এই মাছ ও দুধের অভাব একটা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার আছে—দ্বিতীয় প্রতিকার নাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি মাছের চাষ ও ব্যবসা করেন আর ডায়েরী ফারম খোলেন তাহা হইলেই দেশে দুধ, ঘির অভাব ঘুচিবে, মাছ মিলিবে। যে দেশের লোকেরা গাভীকে ভগবতী বলিয়া পূজা করে সেই দেশে বিলাতী ডিনের মিল্ক খাইয়া শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক শিশু মানুষ হইতেছে ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? শিশুকে বাঁচাইতে হইবে, যুবকের মস্তিষ্ক সবল এবং বৃদ্ধের জীবনী শক্তি অটুট রাখিতে হইবে—এ হেন সমস্যার সমাধান কল্পে যেন আমরা সকলেই চিন্তা করি। এটা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না—বয়লারে জল না থাকিলে কল চলিবে না, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের সাহায্য না পাইলে মস্তিষ্কই বা ক্রিয়াশীল থাকে কিরূপে?

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমাদের দেশ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া হাহুতাশ করিয়া কোনও লাভ নাই; জীবন সংগ্রামে আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, জয়ী হইতে হইবে। দেশের চিন্তাশীল মস্তিষ্কোপজীবী মানুষ গুলিকে বাঁচাইতে হইবে, কারণ

তাঁহাদের মধ্য হইতেই দেশনায়ক, সমাজ নায়ক, সাহিত্যাচার্য্য মিলিবে। আমার মুষ্টিযোগগুলি কাহারও কাজে লাগিবে কি না বলিতে পারি না। এগুলি হাতুড়েরই মুষ্টিযোগ। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া তবেই ব্যবহার করিবেন, তবে ভরসা এই যে অনেক সময় হাতুড়ের ঔষধও ধরে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

তাতলৈ

তাতলৈ সাঁওতাল পরগণার একটি প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ। দুমকা হইতে অসমতল গিরিপথ বহিয়া ১০ মাইল যাইলে এইস্থানে পহুঁছান যায়। ভরা আশ্বিনের এক মধুর অপরাহ্নে আমি এই স্থানে উপস্থিত হই। ইহার নাম "তাতলৈ" হইবার তাৎপর্য্য কি তাহা কোনও ইতিহাসে লেখেনা। তবে আমার অনুমান হয় যে তাতল লহর হইতেই ইহার বর্ত্তমান নামকরণ। 'ভুরভুরি' নদীর পর পারে এক অনুন্নত গিরিশ্রেণীর ক্রোড়ে এই নৈসর্গিক আকরটি স্থাপিত। উপলবিক্ষিপ্তা স্বল্প বারিবিশিষ্টা, খরস্রোতা নদী অতিক্রম করিয়া আমি এক উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। পথপ্রদর্শক দূর হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাকে দেখাইয়া দিল। দেখিলাম একটি জলস্রোত দূর হইতে বহিয়া আসিয়া এই নদীতে মিশিয়াছে। এবং ঐ জলস্রোত হইতে রাশি রাশি বাষ্প ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে। আমি কৌতূহলান্বিত হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত কুণ্ড রহিয়াছে। কুণ্ডটি প্রায় ৪৷৷০ ফুট গভীর। অতি সাবধানে আমি কুণ্ডের মধ্যে অবতরণ করিলাম। ইহার অভ্যন্তরে জল অতি সামান্যই এবং ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদিও রহিয়াছে। ভিতরে বেশ গরম বোধ হইল। স্থানে স্থানে অনর্গল জল উত্থিত হইতেছে এবং ছিদ্রপথ দিয়া উহা বাহির হইয়া নদীতে গিয়া মিশিতেছে। স্পর্শ করিয়া দেখিলাম যে জলের উষ্ণতা (Temperature) বিভিন্ন প্রকারের। কোথাও কোথাও এত গরম যে হস্তদ্বারা অনুভব করা দুঃসাধ্য। আমার বিশ্বাস যে চাউল প্রভৃতি এখানে অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারে।

এই কুণ্ডের জল আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট ইহার উপরিভাগে একটি জলনিষ্কাষণের পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় যে এই প্রচণ্ড উষ্ণ জলস্রোত ইষ্টক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। যখন শ্রাবণের বিপুল জলধারা ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে নিম্ন-প্রবাহিনী তরঙ্গিনীকে আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড বন্যা এই প্রস্রবণের উপর দিয়া বহিতে থাকে তখনও সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ আশ্চর্য্য হইয়া দেখে যে বন্যার হিমস্রোতের নিম্নে উষ্ণ স্রোত সেইরূপ ভাবেই প্রবাহমান।

মাঘ মাসের প্রথম দিবস হইতে একপক্ষ কাল যাবৎ এখানে একটি মেলা বসে। তখন এখানে বহু দূর হইতে বহু প্রকার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। চর্ম্মরোগবিশিষ্ট লোকেরা ব্যাধি-মুক্তির আশায় ভক্তিভরে এইস্থানে স্নান করে এবং অবগাহনান্তে প্রস্তর খণ্ডে সিন্দুর লেপন করিয়া যুক্ত করে প্রার্থনা করে। যাহারা সন্তানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে এরূপ বহু বন্ধ্যা নর নারী—অঞ্জলিপূর্ণ বারি পান করে—তাহাতে তাহারা সফলকাম হয় কি না ভগবানই জানেন।

উষ্ণ জলস্রোতের তীরে একটি হতভাগ্য 'কুরুম্' বৃক্ষ আছে যাহার জন্ম কেবল এই কুসংস্কারাছন্ন হতভাগ্যদিগের পরিত্যক্ত, জীর্ণ, ছিন্ন চীর বহন করিবার জন্য। বায়ুভরে যখন এই মলিন বস্ত্রখণ্ডগুলি শূন্যে উড়িতে থাকে তখন মনে হয় যেন অন্ধ বিশ্বাসীর জয়ধ্বজা উড়িতেছে।

যথাসম্ভব দেখিয়া শুনিয়া আমি প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলাম। চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মধুর, বড়ই শান্ত। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তে সমস্ত বনমালা, তরঙ্গায়িত গিরিশ্রেণী, শ্যামল শষ্যক্ষেত্র, ছায়াবহুল পার্ব্বত্য পল্লী শারদসন্ধ্যার স্নিগ্ধক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিল। ঊর্দ্ধে, নির্ম্মল সুনীল গগনে দ্বাদশীর চন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল। সেই সময় 'বারা' নামক একটি সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইতেছিল। বিসর্জ্জনের করুণ রাগিনী, চির প্রফুল্ল সাঁওতাল স্ত্রীপুরুষদিগের উচ্চ হাস্যধ্বনি, তাহাদের বিচিত্র বাঁশীর সুরলহরী এবং নৈশ হিল্লোলভরা জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধ রাত্রি আমার প্রত্যাগমনের পথশ্রমকে আনন্দিত করিয়া তুলিতেছিল।

অমল চন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা

তুলির লিখন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

তুলির লিখন—কবির মৌলিক রচনা; অনেকগুলি একাত্মিকাপদ বা একোক্তি গাথা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই গাথাগুলিতে কবির কোনো ব্যক্তিগত ভূমিকা নাই;—ইহা অনেকটা "মনোলগ"এর মত। বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত; মানব-চিত্তের সহানুভূতির তন্ত্রীতে সেগুলি সহজেই ঝঙ্কার তোলে।

দেশের ইতিহাস, ইতিকথা প্রভৃতির মধ্যে অনেক সৌন্দর্য্য রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর রাজকন্যার মত অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, কবি তাঁহার সোনার কাটির পরশ দিয়া সেগুলিকে জাগাইয়া তোলেন, তখন তাহা নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন আনন্দের সৃষ্টি করে। বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেক কবিতা এই ধরণের। এই গ্রন্থে প্রাচীন কাহিনী,—অনেক দিনের শোনা কথা--কবি-চিত্তের নবীনতার ভিতর দিয়া আমাদের কাছে নূতন রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই ধরণের রচনায় একট

কাঠামো পাওয়া যায় বলিয়া, ইহা একদিকে যেমন সহজ, অপরদিকে তেমনি শক্ত—কারণ ইহাতে নবীনতার অরুণ আভা না পড়িলে ইহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়—এবং সেই আভাটুকু দেওয়া তেমন সহজ নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থে কবি একার্য্যে সফল হইয়াছেন—ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসার কথা।

এই কাব্যের প্রথম গাথা—বিদ্যুৎপর্ণা। বিদ্যুৎপর্ণা একটী অপ্সরা; কবি "হদিস" দিয়াছেন, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য এই ঐতিহাসিক গন্ধ কাব্যটিকে বিশেষ কোনো মূল্য দান করে নাই। ইহাই যথেষ্ট সে স্বর্গের অপ্সরা! ইন্দ্রের সভায়, তাহার কনক নূপুর সিঞ্জিত হয়;—মন্দাকিনীর কূলে, পারিজাতের উপবনে লীলা-অলস পরিক্রমণে তাহার চরণ অনভ্যস্ত নয়। বাকীটুকু কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—কল্পনা ও হৃদয় দিয়া।

অনন্ত সৌন্দর্য্য. ভোগ ও স্বপ্নের রাজ্য স্বর্গ কামচারী, মুক্তবন্ধন তাহার অধিবাসী। তাহার প্রাণের নিভৃততম কোণে সখেদ ক্রন্দন গুমরিয়া উঠে কেন? —কেন সে প্রাণ মর্ত্ত্যের ধূলার পানে সতৃষ্ণদৃষ্টি জাগাইয়া রাখে?—কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন এই গাথায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা কেমন পক্ষীরাজের পৃষ্ঠে আসন লইয়া উধাও হইয়াছে তাহার আভাষ দিতেছি; —নিম্নোদ্ধৃত চিত্রটি কবি শেলীর তুলির অমর্য্যাদা করিত না:—

শুক্ল শারদ রাতে জোছনার সিন্ধু,
মেঘের পদ্মপাতে মোরা মণিবিন্দু!
মেঘের ওপিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে
আঁখিজল পড়ে ভুঁয়ে
দেখে চেয়ে ইন্দু!

এই চিত্রে, শুধু নিসর্গের সৌন্দর্য্য নয়, ইহাকে মনোরম করিয়াছে অন্তঃপ্রকৃতির দ্যোতনা। সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্তলে যে গূঢ় নীরব ক্রন্দন তাহার সন্ধানই কাব্য। তাই কবি গাহিয়াছেন সৌন্দর্য্যের এই যে ক্রন্দন ইহাতে সহানুভূতি করে আর একজন;—সে সুধাকর ইন্দু! এই গাথাটিতে এরূপ অনেক মুক্তা ছড়ান আছে!

আর একটি গাথা—সূর্য্যসারথী; পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে। অরুণের জন্মকথা। মহাভারতের বিপুল আশ্রয়ে, সাধারণের অলক্ষ্যে, যে রত্নশিলা বিস্মৃতির ধূলা-মাটিতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল—কবি অবনীন কৌতূহলে তাহাকে কাটিয়া, মাজিয়া,-ঘষিয়া শিল্পীর আনন্দে ভাস্বর করিয়াছেন। মহাভারতে ছিল উপাখ্যান; যাহার মূল সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, যাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ ও আকর্ষণহীন। কবি দিয়াছেন কাব্য; যাহা সৃষ্টির মাধুরীতে রমণীয় এবং মানবচিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে ব্যগ্র। মহাভারতের উপাখ্যানরহস্য—কি সুন্দর অর্থের মধ্যে প্রস্ফূট হইয়াছে। বিনতার উপাখ্যান এখানে না বলিলেও চলে—কিন্তু এইটুকু বুঝাইলে অনালোচ্য গাথাটির মূল্য বুঝা যাইবে। মহাভারতে আছে বিনতা ইচ্ছাপূর্ব্বক অধৈর্য্য হইয়া ডিম্বের আবরণ ভেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি বুঝাইয়াছেন যে এরূপ বলিলে বিনতার ঋষিস্বামীর অমর্য্যাদা করা হয়। তাই কবি বলিলেন:—

"সতীনীর ছেলে ক্র র সর্পেরা
দ্যায় তোরে লাঞ্ছনা!"

সেই লাঞ্ছনার পুঞ্জীভূত বেদনার কাতরতার মাঝে, বিরুবা নারী সংযমের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন একমাত্র দুঃখের দোসর পুত্রের মুখদর্শনের আশায়।

"অথবা জাগালে, দুখের দোসর
বড়ই একাকী জেনে"!

মানবপ্রকৃতির নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কবিতাটি গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি গাথা স্থান পাইয়াছে—প্রত্যেকটিতে বিশেষত্ব আছে। "শোভিকায়" রূপজীবিনীর ব্যাকুল প্রেমপিপাসা; "অনার্য্যা"তে নারীর মাতৃত্ব-মহিমা; "পরিব্রাজকে"—ধর্ম্মপিপাসুর চিত্তের দুর্ব্বলতা; "রাজবন্দিনী"তে রাজকুলজাতা নারীর আত্মমর্য্যাদা; "যশমন্তে"—চিত্রকরের নিষ্কাম সৌন্দর্য্য-সাধনা; "শবাসীনে" বহিনিষ্ঠ সাধন-চেষ্টার উপর

সনাতন মানবপ্রকৃতির জয়; "পরেয়ায়"—মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ রচনা; "সতীতে" কুচরিত্রা নারীর আত্মলোপী নিষ্ঠা "দেবদাসীতে" কাল্পনিক ও বাস্তবের রূঢ় সংঘাত—এইরূপ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় "তুলির লিখন" অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ রসে পরিপূর্ণ কাব্য বিরল। কাব্যামোদীর নিকট এ অমূল্য রত্ন যে যথোচিত সমাদৃত হইবে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, প্রণীত।

এই পর্য্যায়ভুক্ত গ্রন্থাবলী বঙ্গীয় পাঠকের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে ফাহিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা টীকাসহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা না থাকিলে প্রাচীন ভারতের, বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের ভারতের, অনেক স্থানের পরিচয় বা নিদর্শন আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। আজ যে তক্ষশীলা বা পাটলিপুত্রের খননে বৌদ্ধযুগের সহস্র সহস্র কীর্ত্তিস্তম্ভ লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ চৈনিক পর্য্যটকগণের বৃত্তান্ত। এই সকল বৃত্তান্ত বহু মূল্যবান; এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানিতে হইলে এই সকল পাঠ করা অত্যাবশ্যক। বিলাতের কয়েকটি ভাষায় এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ গুলি আমাদের দেশের জিনিস হইলেও এযাবৎ আমাদের দেশীয় ভাষায় ইহার রূপান্তর হয় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়া মাতৃভাষার পরিপুষ্টি ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার ছবি। অধিকাংশ ছবি এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের কোনো কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহু মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করিয়া এই সকল ছবি দেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। এই সকল ছবির জন্য গ্রন্থকারকে বিলাতের সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট ও এখানকার ভারত ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের সৌভাগ্যবশতঃ প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের মিঃ স্পুনার ও পাটনা-কলেজের অধ্যাপক মিঃ জ্যাকসন এই গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে কতকগুলি ফটোগ্রাফ দিয়া গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা, এই গ্রন্থে যে পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রস্তুত। এ গুলি যে কিরূপ মূল্যবান তাহা বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তৃতীয়, রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় লিখিত ভূমিকা। কি প্রকারে ভারতীয় শ্রমণগণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এই ভূমিকায় তাহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি সুন্দর নির্ঘণ্ট পত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর। একখানি দ্বিবর্ণে রঞ্জিত মানচিত্র, তিনখানি বহুবর্ণে চিত্রিত ও ১৬ খানি একবর্ণে চিত্রিত ছবি আছে।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। এই শ্রেণীর গ্রন্থ যদি আমাদের দেশের পাঠক-সমাজে আদৃত না হয় তাহা হইলে আমাদের ইতিহাস-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিবে;—ভবিষ্যতে কোনো গ্রন্থকার এমন কাজে হাত দিতে হয়ত আর উৎসাহ বোধ করিবেন না।

প্রতারণা

হাসিখেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এম্‌নি করে তোমায় দেব ফাঁকি ;
—বুকে আমার যে সুর বাজে, গুঞ্জরে যা মর্ম্মমাঝে,
ভেবেছিলাম সুখের সাজে রাখ্‌ব তারে ঢাকি,
হাসিখেলার মিথ্যা ছলে তোমায় দিয়ে ফাঁকি।
প্রভাত যখন দ্বিপ্রহরে হ'ল পরিণত,
তপ্ত বায়ু ঠেকল পায়ে অগ্নিকণার মত,
শরীর যখন ক্লান্তিভরে লুটিয়ে পড়ে মাটির পরে
তোমার ছবি হৃদয় সরে গোপন করি তত,
তখন আমায় টান্‌লে কোলে, কোলের ছেলের মত।
দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের পরে, অভিমানে নয়ন ঝরে
বলিনি ত আমার তরে রাখনিক স্থান,
নয়ন-জলে চরণ-তলে ডাকাইনি ত বান।
তবুও তুমি কেমন করে জেনে নিলে আজ
যে কথাটি গোপন ছিল আমার হৃদয় মাঝ ;
কেমন করে ধর্‌লে তুমি আমার প্রতারণা,
সেই কথাটি তোমার কাছে হয়নি কেবল শোনা।
ভিজিয়ে নিয়ে অশ্রুজলে শিশির ধোয়া দূর্ব্বাদলে
অভয় দিলে চরণতলে ঘুচিয়ে আনা-গোনা
কেমন করে ধর্‌লে তুমি আমার প্রতারণা॥

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বীর বন্দনা

হে সৈনিক, মহাবীর, স্বদেশী আমার,
তোমার বীরত্বে মুগ্ধ দ্যুলোক ভূলোক ;
ক্ষুদ্র আমি মহা গণি ভাই ব'লে ডাকি,
ভুলেছি গৌরবে তব, অধীনতা শোক।

মিলায় অসীম শূন্যে নক্ষত্র যেমতি
প্রদীপ্ত মহিমা শুধু করি বিকিরণ, ;
কেহ নাহি জানে প্রতি অণু মাঝে তার
কত জ্বালা জ্বলে মহা তীব্র সুভীষণ !

তোমার এ আত্মদান আরও সমুজ্জ্বল !
এ মৃত্যু বরণ নহে আপনার লাগি,
নহে স্বদেশের তরে ,—স্বার্থ মাত্র হীন !
এ শুধু কর্ত্তব্য ব্রত, ওহে পুণ্যভাগী !

যতদিন বিশ্ব নহে প্রলয় মগন,
সূর্য্য চন্দ্র কক্ষপথে রবে ধাবমান,
তব কথা নামাবলী ধরি অঙ্গ পটে
বসুন্ধরা গাবে গর্ব্বে এই যশোগান।

কেমনে প্রশংসি তোমা ?—নাহি কোনো ভাষা,
এ মহাসমরে আশা, দেবতার তুমি,
জানিনা কি অর্ঘ্যে বীর বন্দিব তোমারে,
তব নামে দেশ ধন্য, ধন্য পরভূমি।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২১ [৯ম সংখ্যা

লাইকা

(২৪)

সন্ন্যাসিনী স্বহস্তে বারিকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিলেন।—প্রথমত চুল কাটিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সাবিত্রী মহা গোল বাধাইল! রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করিল—, অবশেষে তিনি অতি যত্নে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া দিয়া চুপি চুপি বারিকে বলিলেন,—"আজ এই থাক্, যদি প্রয়োজন বোধকর—তোমার বস্ত্রের মধ্যে ছুরি দিয়াছি, —কাটিয়া ফেলিও!—"

তাহার পর তিনজনে পথে বাহির হইলেন। বারির মুখ বর্ষাপ্রভাতের ঘোর নীলিমাচ্ছন্ন, সন্ন্যাসিনী চিন্তাকুলা,—কিন্তু সাবিত্রী প্রসন্ন কটাক্ষে বারির প্রতি চাহিতে চাহিতে চলিতেছিল! অন্যান্য দিনের ন্যায় বারি তাহার পার্শ্বে আপনাকে ঢাকিয়া চলিতেছিল—গ্রাম সম্মুখীন্ দেখিয়া সাবিত্রী বলিল—"একটু সাবধান হ বারি। আজ যে তুই পুরুষ?"—

বারির মুখে একটু হাসির আভাষ দেখা গেল—সাবিত্রী একবার অলক্ষ্যে তাহার হাত ধরিয়া টিপিল!—গ্রাম পথে নূতন দৃশ্য—দুইধারে পথিপার্শ্বে প্রভাতের হাট বসিয়াছে। তখন অধিক জনতা নাই, একে একে লোক জমিতেছে, দূর গ্রামের ফল মূল বিক্রেত্রীরা বড় বড় ডালা মাথায় করিয়া আসিয়া সহযোগী বা সহযোগিনীর সহিত স্থান লইয়া কলহ করিতেছে—কেহবা চট পাতিয়া শাক সব্জি সাজাইয়া বসিয়া আছে!—পথ দিয়া রাখাল বালকেরা গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের মুখে কজরী গীত!—ক্রমে হাটের পথ দিয়া বড় বাজারের ভিতর দিয়া তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসিনী দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল! ক্রীড়া-নিরত বালক বালিকারা দূরে সরিয়া গেল।

গ্রাম শেষ; দূরে দূরে দুই একখানি গৃহস্থের আবাস গৃহ। প্রায় প্রত্যেক গৃহের পার্শ্বেই কঞ্চির বেড়া বাঁধা ভিটায় জনরার ক্ষেত,—সদ্যোজাত শষ্য রক্ষার জন্য স্থানে

স্থানে উঁচু মাচা বাঁধিয়া এক একটি বালক বসিয়া আছে!—

গ্রাম ছাড়াইয়া পার্ব্বত্য নদীর পার্শ্ববর্ত্তী বক্রপথ বহিয়া তাহারা এক প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড দেবালয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারী সন্ন্যাসিনী গণকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনারা কি প্রবেশ করিবেন?

প্রধান মন্দিরের আশে পাশে অনেক ছোট ছোট মন্দির—দুই ধারে বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান। সবেমাত্র প্রভাতী পূজার শেষে এখনও ঘোর রোলে ঘণ্টা বাজিতেছে।—তাহারা প্রথমত গিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিল। দ্রুত চক্ষে সন্ন্যাসিনী একবার চারিদিকে চাহিলেন—লাইকা তখন নাই! তখন বিরলে একজনকে প্রশ্ন করিলেন,—ভৈরোজির ঘরে যে সাধু থাকেন তিনি কোথায়?"

সে বলিল,—"কে, লাইকাজীর কথা বলিতেছেন?"

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন "হাঁ"—

"তিনি ত এইমাত্র এখানে ছিলেন,—এখনি উঠিয়া গেলেন, বোধহয় মাঠ কি বাগানে কিম্বা কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারিনা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, সাবিত্রী তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি তাহাকে দেখিয়া আসি,—"

তিনি যাইতে উদ্যত এমন সময় মঠের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহারা অদ্য এইখানেই প্রসাদ পাইবেন না অন্যত্র যাইবেন?" তিনি সম্মতি জানাইয়া বলিলেন "হাঁ প্রসাদই পাইতে ইচ্ছা করি,—কিন্তু মহাশয়! লাইকা এখন কোথায় আছেন দেখিয়াছেন কি?"

"হাঁ দেখিয়াছি বৈ কি! তিনি ভৈরো মন্দিরের দুয়ারে আছেন তাঁর শরীর কাল হইতে কিছু অসুস্থ তাই শুইয়া আছেন এখন।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তাহা আমি কালই শুনিয়াছি; তাহা হউক এস—সাবিত্রী তোমরাও এস!" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। লোকটি বলিলেন—"মাতার সহিত কি তাহার পরিচয় আছে?"—

"হাঁ"। সাবিত্রী একবার বারির প্রতি চাহিল, কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। লোকটি বলিলেন,"—আপনারা কি স্নানও চান? তাহা হইলে চেষ্টা দেখি!—" সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"না আমরা আহ্নিক যাইব:—"

তখন তাঁহাদিকে প্রণাম জানাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া দেখিলেন সাবিত্রী ও বারি তাঁহার অনেক পশ্চাতে!—বলিলেন,—শীঘ্র চলিয়া এস তোমরা!" "যাই মা" বলিয়া সাবিত্রী বলিল, "ভৈরোজির মন্দির কোনটা?"

বলিতে চলিতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন "এই সে সম্মুখেই! আর ওই যে পার্শ্বের দেয়ালে ভর দিয়া বসিয়া আছে—দেখিতেছ কি! ওই লাইকা!"

হর্ষোৎফুল্ল বিস্ময়ে সাবিত্রী বলিল—"কৈ! কৈ মা লাইকাকে দেখিতে আমার ভারি ইচ্ছা করে! ঐ যে থামে মাথা দিয়া বসিয়া আছেন উনিই কি?—"

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ, কিন্তু

সাবিত্রী অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এ ব্যগ্রতা বা অধৈর্য্যের সময় নয়—তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে নতুবা লোকে বা লাইকা সন্দেহ করিতে পারে!"

সাবিত্রী বুঝি সেকথা ভাল করিয়া শুনিল না, মুখ ফিরাইয়া কম্পিত বিগলিত স্বরে ডাকিল—"বারি!" বারি অধোমুখী, মাথার পাগড়ীতে ক্ষুদ্র মুখখানি যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ব্যস্ত ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"ওকি সাবিত্রী! কি বল? সাবধান হও, চাঞ্চল্যের সময় নয় বুঝিতেছ না!"—তখন বারি অতি মৃদু স্বরে বলিল "আমি এইখানেই থাকি না মা?"

"না—না, সে কি হয়? এস শীঘ্র চলিয়া এস।"

লাইকা তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কি ভাবিতেছিল,—তাহার চক্ষু প্রসন্ন কিন্তু যেন উদ্দেশ্যবিহীন। তাহার সমস্ত আকৃতি হইতে এমন একটা অকাতর অনভিলাষের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যাহাতে অতি সাধারণ চক্ষুও বিস্মিত ও ব্যথিত হয়!—

সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া সে প্রথমত চমকিত পরে মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—এই কি আপনার সেই শরণ?" বলিয়া বারির অতি নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ এই সেই চির দুঃখী বালক! কেন সরিয়া যাস্ বাছা! প্রণাম কর, ইনিই লাইকা!" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীর স্বর যেন আর্দ্র হইয়া গেল,—পাছে বারি বা সাবিত্রী কোন অধীরতা প্রকাশ করে এই আশঙ্কায় তিনি স্তব্ধ হইলেন।

সত্যই বারি তখন সাবিত্রীকে এড়াইয়া অন্য একটি স্তম্ভের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের লজ্জা-বিবর্ণতা শরীরের ভীতিচাঞ্চল্য লাইকাও দেখিয়াছিল—সে বিশেষ করিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল,—সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমার এই বালকটি বড় ভীরু, লাইকা তুমি"—

বাধা দিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে লাইকা বলিল,—"তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু জননি। আমি যে আজ বড় আশ্চর্য্য হইলাম! অমন কোমল সুন্দর মুখ আমি জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। এস শরণ! আমার কাছে ভয় পাইবার কি আছে ভাই?"

বলিয়া সে বারির নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিল! তখন অতি সন্তর্পণে তাহার স্পর্শ ছাড়াইয়া বারি তাহাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। লাইকা হাসিল।

সাবিত্রী প্রফুল্ল বদনে বারির এই বিপদ দেখিতেছিল—তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, লাইকা বলিল, "আর ইনি কে মা—বালিকা সন্ন্যাসিনী?—

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ইহাকে আমার কন্যা বলিয়াই জানিবে, আমার ভগ্নীর মাতৃহীন কন্যা, বাল্যকাল হইতে আমার নিকটেই আছে!"—

"উত্তম! কৌমার ব্রহ্মচারিণী?"—

একবার সাবিত্রীর প্রতি চাহিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"কতকটা তাই বটে,—বালবিধবা! —সাবিত্রী মৃদু হাসিল!—কিন্তু মুখ তুলিবা

মাত্র যখন দেখিল লাইকার বিস্মিত করুণ চক্ষু তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রসর্পিত হইতেছে—তখন তাহার হাসি যেন ম্লান হইয়া গেল,—লজ্জিত হইয়া—দূরে বারির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।—হাসিয়া লাইকা বলিল, "সন্তানকেও লজ্জা করিতেছ মা!"—

(২৫)

বিদায় কালে সন্ন্যাসিনী বারি ও সাবিত্রীকে একটু নির্জ্জন আলাপের অবসর দিলেন। উদ্যানের এক নিভৃত অংশে মাধবীলতার ঘন বেষ্টনের অন্তরালে আসিয়া বারি সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধরিল!—"থাক দিদি—একটু চুপ করিয়া থাক্! আজ সমস্ত দিন আমি তোকে পাই নাই!" বলিয়া সে সবলে তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিল।

সাবিত্রীরও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—"না—আর আমার কোন আশঙ্কা নাই ভাই!—আজ আমার মনে হইতেছে যে তোর সকল বিপদ—আজকার এই মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গেছে!—কোন ভয় করিস্ না,—তোর কিছু ভয় নাই আর এ তুই স্থির জানিস্ বারি!—লাইকা এমন? এমন সূর্য্যের মত উজ্জ্বল—চন্দ্রের মত শীতল তাহাত জানিতাম না! আমি আজ সকালেও আশঙ্কা করিয়াছি যে না জানি তোর অদৃষ্টে কি আছে আরো—কিন্তু আর ত আমার সংশয় নাই ভগিনি!—"

বারি কোনও উত্তর দিল না,—সাবিত্রী আবার বলিল,—"সমস্ত দিনমানে তুই একবারো স্বামীর প্রতি চাহিস্ নাই! কেন এতটা সহ্য করিতেছিস্? একবার দেখিস্ বারি! তোর এত কষ্টের এত বেদনার কেমন সফলতা—তাহা আমার সম্মুখেই একবার অনুভব কর ভাই!—"

বারির বক্ষের আন্দোলন ঘন হইতেছে—তাহা সাবিত্রী বুঝিল, তাহাকে তৃণের উপর বসাইয়া বলিল,—"সর্ব্বদা এমন মন খারাপ করিয়া অধৈর্য্য হইলে চলিবে কেন বারি?—তুই—ত এমন ছিলি না—কি হইয়াছে কয় দিন তোর? কেন এমন করিস?" তাহার বক্ষের উপর সম্পূর্ণ ভাবে দেহভার রাখিয়া বারি বসিয়াছিল,—কথা শেষ হইলে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কি হইয়াছিল আমার? সে কথাটুকুই শোন্ দিদি?—আর আমি এমন অধীর হইব না—কখনো হই নাই সে কথাও সত্য, কিন্তু এখন কেন হইতাম তাহা আজ বুঝিয়াছি,—তোর বুকের ভিতর হইতে যখন আমার বুকের রক্তেরই ঠিক শব্দ টুকুর—অবিকল ব্যথা টুকুর ধ্বনি শুনিতাম তখনই না আমার প্রাণের সব স্পন্দন ঐখানে কান দিত?

দিদি আর তা কোথায় পাব? আর কেন তা হবে?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"এই কথা? বটে! তোর ব্যথায় কেবল তোর এই কুড়ানো দিদির প্রাণেই বাজিত এ ভুল বিশ্বাস টুকু—"

"না না, ভুল বলিও না? আমাকে

ভালবাসিবার অনেক লোক আছে বটে—কিন্তু আমার সব সুখ সব দুঃখ ঠিক আমারই মত ভাবে অনুভব করে এমন ত কেউ ছিল না ভাই?—আজ যখন তুমি আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়াছ তখন আর একবার আমার অন্তরকে ছুঁইয়া যাও দিদি—বুঝিয়া যাও তুমি আমার কি ছিলে?"

খানিকক্ষণ দুইজনেই নীরব থাকিল। বাহিরে বাদ্যমঞ্চ হইতে ইমনের প্রচণ্ড মধুর ধ্বনি চারিদিক ভরিয়া তুলিয়াছিল, বাতাসে, বকুলের রজনীগন্ধের সুমিষ্ট গন্ধ!—

বারির শ্রান্ত অবসন্ন দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সাবিত্রী বলিল,—"আমারও একটু শেষ কথা ছিল বারি! যদি তাহা বলিতে পারিতাম তবে বোধ হয় তোর কথার অপেক্ষা বড় বেশী অকরুণ হইত না! আমার জীবন—তার পর তুই; কিন্তু—কিন্তু ও বারি! আজ যে কিছুতেই আমার দুঃখ হয় না ভাই!

তোর লাইকার কথা শুনিয়া আমার আর কোন ক্ষোভ নাই—কোন ব্যথা নাই!—বেশ! এমন কি, তোকে ছাড়িতে হইতেছে—এত বড় একটা ব্যথা, যাহা ভাবিয়া কাল রাত্রি পর্য্যন্ত আমি লাইকার উপর দ্বেষ করিয়াছি—আজ তাহাও আমার মনে নাই! তুই সুখী হইবি—নিশ্চয় সুখী হইবি এই বিশ্বাসে আজ আমার মনে কোন আঁধারই দাঁড়াইতে পাইতেছে না! তোর ঐ শেষ আদরটুকু পাইয়া আমার কতখানি সুখ হইল কেবল, সেই টুকুই তুই বুঝিস বারি—আমি আজ বড় সুখ লইয়া এখান হইতে চলিলাম—আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে এ বিশ্বাসও রাখি—আজ—বারি! আমার এ জন্মের সার্থকতা! তুই—"

বলিতে বলিতে সাবিত্রীর স্বর গদ্গদ হইল—সে সাদরে বারির ললাটে চুম্বন করিল। বারির চোখের জলে তাহার বুকের কাপড় ভিজিতেছিল—মুছাইয়া দিয়া সে বলিল,—না কান্না নয় আজ আর এ নয়!"—

বারি বলিল—"একটা কথা দিদি!"

"বল, কিন্তু কাঁদিতে পাইবি না!"

বারি বলিল—একটা প্রণাম লও,—কখনো ত লও নাই!"—

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল—"বটে, এই কথা? তা দে না ভাই?"—বলিয়া স্কন্ধ দেশে চাপ দিয়া তাহার মাথা আনিয়া আপনার পায়ের নিকট সজোরে ঠুকিয়া দিল। বারি শশব্যস্তে ঘাড় তুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—গেলাম যে—করিস্ কি দিদি! এমনি করিয়া বুঝি কেউ প্রণাম করে?"

"করে, ঠিক এমনি করিয়াই প্রণাম করিতে হয়, কোথাও একটু ব্যথাই যদি না থাকিল তবে আর প্রণাম কি? কিন্তু সে সব ত হইল এখন দেখিয়াছিস কি? ঐ দেখ মা আর লাইকা আসিতেছেন!"

"কোথায়?" বারি চমকিয়া উঠিল।—সাবিত্রীর হাত টানিয়া বলিল—"সত্যই ত। দিদি চল ভাই! চল এখান হইতে। শীঘ্র চলিয়া আয়!"

"কেন রে ভয় কি?" সাবিত্রী এই কথা বলিল বটে কিন্তু নিজের পলাইবার উদ্যোগেই ব্যস্ত ছিল—বারি বলিল, "তুই না হয় থাক্—আমি"

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল,—"সেকি হয়? তুই যে ভাই পুরুষ সাজিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিস্—আমি পলাই, নতুবা—"

বারি বলিল—"না না, আমিও যাইব ভাই, তুই একটু থাম না দিদি!"—তখনই দুইজনেই মাধবীলতার অন্তরাল দিয়া পলাইল।—

(২৬)

বারি অতিকষ্টে লাইকার সহিত দুটি একটি কথা বলিতেছিল।—লাইকা সর্ব্বদাই তাহার যত্ন লইত নানা প্রশ্নে তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত এবং যথোচিত উত্তর না পাইয়া—"শরণ! তোমার ভাবটী যেন ঠিক স্ত্রীলোকের মত!" বলিয়া উপহাস করিত, কিন্তু তখন শিহরিত দেহে বারি পালাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা পারিত না—একা সেই জনতায় বা নির্জ্জন উদ্যানে সে থাকিতে পারিত না, সে এই ক'দিনে বেশ বুঝিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের প্রাণে পুরুষের জনতা কেমন ভীতিপ্রদ! স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত স্থানের নির্জ্জনতা কত আশঙ্কাময়!—আপনাকে লুকাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সর্ব্বদা লাইকার সঙ্গেই ফিরিত। লাইকা যখন মন্দিরে—সে তখন দুয়ারে—লাইকা যখন অলিন্দে সে তখন স্তম্ভান্তরালে,—আবার স্বামী যখন বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তানিরত, তখন অতি গোপনে নীরব চরণক্ষেপে সে আসিয়া বৃক্ষান্তরের পল্লবাবরণে লুকাইয়া থাকিত!—

সে ভাবিত লাইকা তাহা দেখে নাই —কিন্তু তাহা নহে, সে বারির এই সঙ্কোচ অথচ একান্ত নির্ভর ভাব বিশেষ করিয়াই দেখিয়াছিল,—দেখিয়া আশ্চর্য্য, চিন্তিত এবং ব্যথিতও হইয়াছিল। সে ভাবিয়া পাইত না যে এ কোন প্রকৃতির বালক,—তাহার নৈরাশ্যপ্রকাশক ম্লান চক্ষু, রক্তহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, মৃদুগতি চরণক্ষেপ, —লাইকাকে কাতর করিয়া তুলিত।—হায় দুঃখী—হায় অনাথ! তুই লাইকার —এ দগ্ধ বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলি কেন? সে ভাবিত কিছুদিনে ইহার মনোভাব বুঝিয়া কোন ধনবান বন্ধুর আশ্রয়ে রাখিয়া আসিব অথবা বারাণসীতে গিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিব!—

আরও তিন চারিদিন অতীত হইল। লাইকা উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য হইতেছিল। এ কি সেবাপরায়ণতা?—এ কি কোমল-শীলতা? এ কি গোপন প্রকৃতি?—কখন কোথায় নীরবে সে কেবল তাহারই তৃপ্তির শান্তির আয়োজন করিয়া রাখিতেছে তাহা লাইকা জানিত না পরে সহসা তৃপ্তির সহিত যখন সে সেবা উপভোগ করিত তখন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত! —বালক ফুল তুলিতেছে দেখিয়া সে ভাবিত দেবতার জন্য। কিন্তু প্রভাতে উঠিয়া যখন নিজের উত্তরীয় খানিকেই সেই পুষ্পবাসিত দেখিত তখন বুঝিত যে তাহার পুষ্প সংগ্রহ কেন?—লাইকা শিবপূজা করিতে ভালবাসে, —কিন্তু বালক আসিবার পর আর তাহাকে

পূজার আয়োজনের জন্য ভাবিতে হয় না, সাজিতে বিল্বদলের রক্তোৎপলের অপূর্ব্ব মাল্য দেখিয়া সে চমৎকৃত হইত! এমন দিব্য কারু বালক কোথায় শিখিল?—ক্রমে আহারে শয্যায় স্নানে উপবেশনে সর্ব্বত্রব্যাপী স্নেহ হস্তের আবেগ বিস্তারে লাইকা যেন সচকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কিছু বলিল না, পাছে বালক ব্যথা পায়, লজ্জা পায় এই ভয়ে সে বিনা প্রশ্নে বিনা বাধায় তাহার সমস্ত সেবা সাদরে গ্রহণ করিল। অধিক আদরেও সে ম্লান হয় দেখিয়া লাইকা তাহাকে নিজের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিল,—সে যাহাতে সুখী হয় হোক্!

লাইকা মনে মনে হাসিত। ঠিক্ কামিনী ফুলটির মত স্পর্শ অসহিষ্ণু কামিনী প্রকৃতি বালকটি এ কে? ক্রমে বিস্ময় তাহার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া তাহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিত। ইহার পরিচয় কি? এতদিন কোথায় ছিল? কি ভাবে তাহার জীবন চলিতেছিল?—কিন্তু পরম ধৈর্য্যের সহিত সে নীরবে থাকিল—বালককে কোন প্রশ্ন করিল না।

সেদিন সন্ধ্যায় মেঘের বিস্তৃত আয়োজন দেখিয়া পূজারীরা শীঘ্র শীঘ্র আরতি শেষ করিয়া গিয়াছে,—প্রধান মন্দিরে দুই চারিটি লোক থাকিলেও আর কোথাও কেহ নাই; অতি দূরে ভোগমন্দিরের পার্শ্বে ধূনী জ্বালাইয়া দুইটি সন্ন্যাসী পরস্পরে বিষম তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত! এমন সময় লাইকা দেখিল অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কূপের তলা দিয়া মেদী ঝোপের পাশ হইয়া বারি মন্দিরের একপার্শ্বে বসিল। পরিধেয় বসন সর্ব্বাঙ্গে এমন ভাবে জড়ান যে কেবল মুখখানি ও পাদুটি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। এই বালকের বস্ত্র পরিধান প্রণালীও তাহাকে অনেকখানি আশ্চর্য্য করিত! সে ডাকিল, "কোথায় ছিলে শরণ?"

বারি নিকটে আসিল—বলিল, বাগানে ছিলাম!"

"বস।"—একটু দূরে কপাটের নিকট বারি বসিল। তাহার অঙ্গসঙ্কোচ ও মুখ লুকাইবার ভাব দেখিয়া লাইকা মনে মনে হাসিতে ছিল, তাহার সেই কৌতুক-পূর্ণ মুখ ও স্থির দৃষ্টি বারি কখনো দেখে নাই—দেখিলে কি করিত বলা যায় না! অনেকক্ষণ দেখিয়া লাইকা তাহার হৃদয়ের কিছু আভাষ পাইল না,—যেন একটি মৌন বিষাদ—একটি অবিচল ধৈর্য্য!—সে মুগ্ধ হইল। ডাকিল,—

"নিকটে এস—শরণ শুনিতেছ?"

বারি আর একটু সরিয়া বসিল। লাইকা বলিল—"ওই বুঝি নিকট? এই-খানে এস!"

বারি সরিল না,—নত মুখখানি অন্ধকারে অস্পষ্ট হইলেও লাইকা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাসের শব্দ শুনিল। সে স্তব্ধ হইল,—"না এই বালক তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে! কিসের এ বেদনা কিসের এ নীরবতা—শিশু বয়সে কেন এমন মৌন প্রকৃতি? আর এত চেষ্টা করিয়াও লাইকা তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না? সে বুঝিল, হাসিতে বা

সুখে এ দুঃখী চঞ্চল হইবে না, গভীর হৃদয়ের অগাধ বিষাদমাত্রই তাহাকে সচেতন করিতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে লাইকা যেন কাঁপিয়া উঠিল!—তাহার দুঃখ—তাহার নিজের হৃদয়ের বিষম ক্ষত যেন আহত হইল,—ওহো! সে যে অবাচ্য অশ্রাব্য, অন্যের সহানুভূতির অতীত বেদনা!

দন্তে অধর দংশন করিয়া সে মুখ ফিরাইল;—সম্মুখে ঘন পুঞ্জ মেঘরাশির স্বচ্ছ অবসর মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ম্লান জ্যোৎস্না মাঝে মাঝে সেইখানে আসিয়া পড়িতেছিল,—অনেকক্ষণ কোন কথা না শুনিয়া বারি একবার লাইকার প্রতি চাহিল। কিন্তু একি? আজ এ কয়েকদিনের মধ্যে সে প্রথম দেখিল স্বামীর প্রশান্ত আকৃতি বিহ্বল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল মুখ যেন মেঘে ঢাকিয়াছে! কি হইল? তিনি কি বারির প্রতি বিরক্ত হইলেন? অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইলেন?—সত্যই বিরক্ত হইবার কথা ত! সে যে প্রতিবারই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে!—আত্মবিস্মৃত হইয়া বারি তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল—কিন্তু লাইকা ত আর কোন দিকে মুখ ফিরাইল না? সুদূর আকাশপ্রান্তে ধূমপুঞ্জবৎ মেঘশ্রেণী যেখানে বিদ্যুতের লোল অগ্নিজিহ্বা মেলিয়া শশিসনাথ নীলাকাশকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল সেইখানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ।

বারি কিছুই বুঝিল না, তাহার স্থির বিশ্বাস হইল—যে স্বামী আজ তাহার প্রতি বিরক্ত। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল—সে মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিতেছিল।

বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, সমস্ত আকাশ সজল মেঘে পূর্ণ, চাঁদ একেবারে ঢাকিয়া গেল। স্বল্পবর্ষিত জলধারা চারিদিকে ছুটিতেছিল লাইকা সরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে নিবিড় নীরবতা!—সেই কলনাদী বিহঙ্গকে নীরব দেখিয়া বারি অন্তরে অন্তরে তীক্ষ্ণশূলাঘাত বোধ করিতেছিল!

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল;—বাতাসে মেঘ উড়াইয়া ফেলিয়াছে—নীলাকাশে আবার চাঁদে মেঘে লুকাচুরী খেলা সুরু হইয়াছে দূরে কদম্বের ডালে সহসা পাপিয়া ডাকিল "হো পিয়া! হো পিয়া"

বারি চমকিত হইল,—একি লাইকা হাসিল কেন? আবার পাখী ডাকিল—পিয়া পিয়া পিয়া হো!"—লাইকা তখন মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিয়াছে,—

"সো নহি জানত নহি সমঝে—কেতে কাতরী হাম কেতে কাতরী!"

এতক্ষণ দ্বারে মাথা দিয়া সে শুইয়াছিল এবার বারি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিল—এ কি সঙ্গীত! এই কি লাইকার সেই মোহিনী কণ্ঠধ্বনি? তাহার স্মরণ ছিল না—এত মধুর তাহার স্মরণ ছিল না!—এ কয়দিন তাহার ইচ্ছা হইত স্বামীর গীত শুনিতে—কিন্তু শুনিতে পায় নাই—আজ সহসা মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিতে লাগিল।—

"আঁধিয়ারা রাত্রি পবন বহে মাতি,—
ঘন ঘন গরজত মেঘ,
বিয়াকুল চিত বচন নহি মানত—
বাঢ়ত হৃদয় আবেগ;—

বারি দুইহাতে আপনার মুখ ঢাকিল। লুকাইতে হইবে—এ ব্যাকুলতাও লুকাইতে হইবে! এতদিন যখন বচন মানিয়াছিস, ওরে হৃদয়! আজকার দিনও মান্! এত বড় কাতরতা দিয়া সে স্বামীকে আহত করিবে না! একি গান! কি গান! কেন লাইকা গাহিল? শরবিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়··· পলাইবার জন্য বারি উঠিল।

পরিপূর্ণজ্যোৎস্না চাঁদের দিকে মুখ অথচ অন্তর্নিবদ্ধদৃষ্টি লাইকার বদন চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে! চলিতে চলিতে আর বারির চরণ সরিল না,—এ কি? যেন কোন গূঢ় বেদনায় লাইকার অধর স্ফুরিত, দেহ এলায়িত—বুকের উপর দুটি করজোড় করিয়া সে গাহিতেছে—

আজু ভয়কাতর ধরণী থর থর—
আঁখিজলে মেঘ ভাসিয়ে,—
এ ডর সাগরতর পিয়াবৈমুখ জন
দুখ ভয় কোন পতিয়ায়?
অব তুম একা মোরসাথী!
হে চির শরণ? আও আও মরণ!
পোহারহ এ দুঃখ রাতি!

বারি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল ইহা শুধু গীত নহে,—মর্ম্মের গভীরতল হইতে এ মরণ কামনা উথলিয়া উঠিতেছে। এ অশ্রু কেবল আবেগের নয়, অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখে তাহা যেন হৃদয়ভেদী রক্তবিন্দুর অংশ লইয়া ঝরিতেছে। আর তাহার চলা হইল না, এ কিসের রোদন? বারির অবাধ্যতায় ত নহে। তবে কি ভগবানকে স্মরণ করিয়া? এত সকাতরে? তাই সম্ভব! কিন্তু এত সকাতরে? এত কাতরে? প্রভু দীনবন্ধু! তাহার স্বামীর সকল মনোব্যথা দূর কর! দুঃখিনীর একটী প্রার্থনা রাখ দয়াময়! ভাবিতে ভাবিতে সে স্তম্ভের অপর পার্শ্বে বসিল। লাইকা তখন গীত ছাড়িয়া অতি মৃদুভাবে সুর আলাপ করিতেছিল।

তখন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না নামিয়া প্রাঙ্গণে চলিয়া গিয়াছে,—প্রবল ঝড়ের অবসানে চারিদিক নিস্তব্ধ—বিষম গ্রীষ্ম! কিন্তু বৃহৎ মন্দিরচূড়ায় আবৃতপ্রায় পূর্ব্বাকাশ হইতে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন শোনা যাইতেছিল।—লাইকা বলিল,—

আবার জল আসিবে! এই দুর্য্যোগে কোথায় গেলে?"

লজ্জিত শঙ্কায় বারি এতটুকু হইয়া গেল,—বলিল, "কোথাও ত যাই নাই!"—

"আঃ শরণ, তুমি ওখানে?—আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি বাগানে গিয়াছ?—তা ওখানে কেন? রাত্রি হইয়াছে—শয়ন করিবে না?—এদিকে এস!—"

(২৭)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাইকা বারিকে দেখিতে পাইল না। সে অতি প্রভাতেই শয্যাত্যাগ করে বটে কিন্তু এখনও যে ভাল করিয়া আলোক উদয় হয় নাই—মেঘের ছায়ায় উষার আলোক

বড় ম্লান,—গত রাত্রির প্রচুর বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় উষাচর পক্ষীরাও কুলায় লুকাইয়া আছে। এ বৃষ্টিকর্দ্দমের মধ্যে সে কোথায় গেল!

লাইকা যেন বিস্মিত ও কিছু বিরক্ত-হইল। কি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ সে! অথবা কি গোপন রহস্য লইয়া সে এমন ভাবে জীবন সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে! আর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় ভগবান তাহাকে এই দীন দুর্ব্বল লাইকার নিকট কেন আনিয়া দিলেন? হয়ত কোন কথায় বা ব্যবহারে সে তাহাকে ব্যথিতই বা করে। এত দুঃখের উপর আবার ব্যথা। হায়!—

ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাত-সারে লাইকা উদ্যানে চলিতেছিল। কতদূর আসিয়া দেখিল দূরে সরোবর সোপানে বারি দাঁড়াইয়া আছে—হাতে কতকগুলি সনাল পদ্ম। তাহাকে দেখিবা-মাত্র লাইকা অনুশোচনা করিল! আহা! সে তাহারই জন্য ফুল তুলিতে আসিয়াছে আর সে তাহার প্রতি অবিচার করিতে-ছিল!—কিন্তু আসিতেছে না কেন—ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে?—ধীর গতিতে লাইকা সরোবরের নিকটস্থ হইল, একটি বৃহৎ স্থলপদ্ম বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সে কি করিতেছে।—

সে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হস্তের বদ্ধমুষ্টিধৃত নয়নরঞ্জন ফুলগুলির প্রতি বিবশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কিন্তু কি দেখিতেছে? পুষ্প সৌন্দর্য্য দেখিয়া মানুষের বদনে যে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে তাহাত ইহার মুখে একটুও নাই!—কম্পমান ওষ্ঠাধর ও স্ফীত-নয়ন দেখিয়া রোদনেরই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়! এ অবস্থায় সে ফুলে কি দেখিতেছে?—

কিন্তু এ সকল ঘটনা বুঝিতে লাইকার বিলম্ব হইল না। নিজের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যরাশি কোন কিছুতে আহত নষ্ট বা পরিত্যক্ত হইলে ধরণীর রূপ গন্ধ বর্ণের প্রতি এমনি গভীর আসক্তিই জন্মে বটে! প্রতি সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনার প্রাণের বিনষ্ট বা ব্যথিত বস্তুর কথা এমনি করিয়া হৃদয়ে অবসন্নতা আনিয়া দেয়।—

লাইকার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল। হতভাগ্য বালক। এই তুচ্ছ লাইকা কি তোর কোন উপকার করিতে পারে! যদি পারে--আঃ বালক এমন স্বল্পভাষী কেন? তাহার মনোব্যথা কাহাকেও খুলিয়া বলে না কেন?—অথবা এই তরুণ বয়সে তাহার এমন কি গুপ্ত বেদনা থাকিতে পারে যাহা কাহাকেও বলা যায় না?—তখন লাইকা অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে সরিয়া অতিদূরে এক প্রস্তরগ্রথিত বটবৃক্ষ তলে আসিয়া বসিল।

কতক্ষণ পরে বারি উঠিয়া আসিল, সরোবর তীরের পুষ্পবনে ফুল তুলিল,—তাহার পর তেমনি চোখ নীচু করিয়া মৃদুচরণক্ষেপে চলিয়া গেল! লাইকা একদৃষ্টে সকলি দেখিতেছিল;—সব নূতন। এই প্রভিনব প্রকৃতির মানবটির প্রত্যেক কার্য্য অসাধারণ, তাহার আকৃতি—সর্ব্বাগ্রে এইখানেই অসাধারণত্বের চরম উৎকর্ষ

প্রকটিত হইয়াছে!—হতবুদ্ধি লাইকা বারবার দেখিতেছিল, এই মেঘাবৃত করুণচ্ছটার আলোক মাখিয়া বর্ষাবারি-সিঞ্চিত বিকশিত পুষ্পরাশির মধ্যদিয়া যে বিনয়নম্র মুখখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহা পুষ্পসৌন্দর্য্য হইতে কোন অংশে অসুন্দর নয়! এতখানি রূপ যে এমন পথে লুটায়,—এত বড় আশ্চর্য্য কি সম্ভব ছিল? অন্তত লাইকা ত তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই! তাহার পর সেই বালকের দৃষ্টিগতি কার্য্য বাক্য সকলই সাধারণ মানব রীতির বিপরীত—অথচ নির্দ্দোষ! এমন কি তাহার বস্ত্রপরিধান ভঙ্গীটিও সম্পূর্ণ নূতন! তাহার এই সদ্যোস্নাত আর্দ্র বস্ত্র বেষ্টিত মূর্ত্তি দেখিলে,—ভাবিতেই লাইকা শিহরিয়া উঠিল!—অসম্ভব! তাহা অসম্ভব! ছিঃ কেন এ জঘন্য চিন্তাকে সে মনে স্থান দেয়? সংসারত্যাগী দুঃখী বালক না জানি কত স্থানে আশ্রয় হারাইয়া তাহার নিকট দয়ার আশায় আসিয়াছে, আর সে নানা কল্পনায় তাহার চিন্তাকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে!—

নিজের চিন্তাকে ধিক্কার দিয়া লাইকা স্নান করিতে গেল। শুনিল একজন সন্ন্যাসী বলিতেছে—লাইকাজির চাকরের জন্য আর জল পদ্ম পাইবার উপায় নাই, কখন ভোরে উঠিয়া সব তুলিয়া লইয়াছে!"—

তখন আর একজন বলিল,—"কেন লইবে না? তুমি অমনি রাত্রি থাকিতে উঠিয়া জলে ভিজিয়া তুলিতে পার ত তুমিও পাইবে!"

লাইকা মনে মনে হাসিল,—"তাহার আবার চাকর?"

ফিরিয়া আসিয়া লাইকা বারিকে বলিল,—"শরণ! আজ প্রভাতে তুমি ভিজিয়াছিলে কেন? অসুখ হইতে পারে না কি ইহাতে?"—

স্বরে তিরস্কারের কোন আভাষ নাই তবু বারি যেন চমকিত হইল,—ভীতিপূর্ণ চক্ষু যেন লাইকার মুখে তুলিতে গেল—কিন্তু উঠিল না!—একটু থামিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আমি ইচ্ছা করিয়া যাই নাই! দুইদিন হইতে স্নান করি নাই—সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল,—তাই স্নান করিতে গিয়াছিলাম; পথে জল আসিল!"

তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত দৃষ্টি লাইকার চক্ষু এড়ায় নাই! তাহার ভয়ে লাইকা ব্যথা পাইল। অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল,—জল আসিল ত তুমি মন্দিরে আসিলে না কেন?

"স্নানে বড় বেলা হইত—আমি,—

লাইকা হাসিল! "এও কি একটা কথা শরণ? বেলা হইত ত কি? তাই বলিয়া—" তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিল—দেখিল অনতিদূরে মন্দির দ্বারে এই দেবালয়ের কর্ত্তা—গোবিন্দনাথ আসিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া দূর হইতে হাত তুলিয়া বলিলেন—"প্রাতঃ প্রণাম লাইকাজি!"

"প্রণাম! আপনার সমস্তই কুশল ত!"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল—এখন—" ইত্যাদি।

অতঃপর প্রভাতটুকু তাঁহার সঙ্গে শেষ

করিয়া একটু অধিক বেলায় লাইকা যখন শিবপূজায় বসিল, তখন কিছু বিস্মিত হইল! অন্য দিনের ন্যায় আজ ফুলে বা মাল্যে সে নিপুণ হস্তের পারিপাট্য নাই। সমস্তেই যেন অন্যমনস্কের চিহ্ন বর্ত্তমান!

বালক কি বিরক্ত হইয়াছে? আহা না! বিরক্ত নয়—লাইকার কথায় সে ব্যথা পাইয়াছে। অথবা কল্য হইতে তাহাকে যেমন অশান্তিপূর্ণ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সে তাহার সেবা করিয়া যেটুকু তৃপ্তি বা শান্তি পাইতেছিল—আর তাহা পাইতেছে না। লাইকা ক্ষোভ লইয়াই পূজা শেষ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

লিসু

তিব্বতের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে—"সাল-উইন, মেকং ও জাঙ্‌স্তি নদীর তীরবর্ত্তী প্রশস্ত প্রদেশে লিসুগণ বসবাস করিতেছে—ইহাদের অপর নাম "যুন্নান্"। তিব্বত সীমান্তে—পর্ব্বত গাত্রে ও নিম্নে সমতল ভূমিতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের গৃহ দেখা যায়—ইহাই লিসুবসতি বা লিসুবস্তি। ইহাদের গৃহগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র,—একটী মাত্র দরজা ব্যতীত জানালার নাম গন্ধও নাই; খড় ও ঘাসের প্রাচুর্য্যে চালা খানি নিতান্ত ভারাক্রান্ত—আবার দুরন্ত শীতের প্রচণ্ড প্রভাবে অষ্ট প্রহর কুটীরগুলির মধ্য হইতে বিদ্‌ঘুটে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া মহা আরতির আয়োজন করিতেছে।

লিসুগণ বন্য হিংস্র জন্তু ও বহির্শত্রুর আক্রমণ ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত; লিসু বস্তিতে কোন অপরিচিত মনুষ্যের সমাগম হইলে সকলেই নবাগতটীকে অতি সতর্ক ভাবে সন্দেহের চক্ষে দেখে। কিন্তু তাহার মধ্যে শত্রু পক্ষের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলে তখন অতিথি সেবার ধুম পড়িয়া যায়। দলের একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক অতিথিকে অতি আদরের সহিত আহ্বান করিয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় এবং অগ্নি কুণ্ডের নিকটে একখানি বড় পাথরের উপরে তাহাকে বসাইয়া সকলে তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসে, ও গৃহ নির্ম্মিত প্রচুর মদ্যে নবাগতটীকে এক প্রকার স্নান করাইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করে। ইহারা মনে করে যে অতিথি সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণই মদ্য। ইহারা অতিথির সহিত একবার পরিচিত হইলে আর তাহাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে চাহে না।—অতিথি যাইতে চাহিলে বলে যে—কেন যাইতেছেন—আমাদের মদের ভাণ্ডার ত এখনও শূন্য হয় নাই—এখনও যে যথেষ্ট মদ রহিয়াছে।

গৃহ আসবাবের মধ্যে কেবল মাত্র

দুই চারিটী বাঁশের ঝাঁপি ও ইহাদের ব্যবহারোপযোগী শন বা পাটের মোটা বস্ত্র বুনিবার দুই একখানি তাঁত ব্যতীত বিশেষ কিছুই দেখা যায় না; তবে প্রতি ঘরেই তীরধনুক ও দা সুপ্রচুর।

শস্যোৎপাদনের দিকে ইহাদের তেমন স্পৃহা নাই, শীকার করিতেই ইহারা খুব মজবুত। বিশেষত কঙ্করময় প্রদেশে শস্যাদি আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না বলিয়া লিসুগণ—ভালুক, চিতাবাঘ হরিণ প্রভৃতি শীকারে যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত তাহার শতাংশের একাংশও করে না; কবে কাহার ভাই, বাবা, পিতামহ—বিশহাত লম্বা বাঘ কিম্বা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড ভালুক মারিয়াছিল সেই সকল আজগুবি গল্প করিয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকটী ইহারা বেশ সরগরম করিয়া তুলে, এবং পরদিন কি প্রকারে কোথায় শীকারে যাইবে তাহাও এই সান্ধ্য বৈঠকে ঠিক হইয়া যায়। শীকারের অস্ত্রশস্ত্রাদির মধ্যে তীর-ধনুক, দা এবং দুইটী হাতল বিশিষ্ট তরবারিই ইহাদের প্রধান সম্বল। বালকগণের দিগম্বর বেশ ঘুচিতে না ঘুচিতেই তাহারা শীকারে বেশ পাকা হইয়া উঠে।

পোষাক পরিচ্ছদ।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইহারা তেমন উদাসিন নহে। পুরুষগণ লম্বা কোট, খাট পাজামা, চওড়া টুপি ও একরকম বিশ্রী জুতা মোজা পরে; আবার গহনারও আদর পুরুষগণের নিকটে নিতান্ত কম নহে! অন্তত পক্ষে সাদা কড়ি বা ঘাসের এক এক গাছা মালা বা বালা প্রত্যেক পুরুষেরই চাই। লিসু রমণীগণ ছোট কোট, সাড়ী, এবং মাথায় একখানি ছোট ওড়না পরিধান করে, তবে পুরুষগণের অপেক্ষা রমণীদিগের পোষাক অনেকটা রঙবেরঙ্গের। সাড়ী ও ওড়না নীল, ধূসর হলদে, প্রভৃতি নানা রঙ্গে রঞ্জিত থাকে এবং রৌপ্যের প্রকাণ্ড কর্ণাভরণে ইহাদের কান দুটী সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত। স্ফটিক ও কড়ির মালা রমণীগণ অতি আদরের সহিত পরে। এইরূপ অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হইয়া একখানি রৌপ্যের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চটাল পাত গলার ঠিক নিম্নে কোর্ত্তার উপর পরিতে পারিলেই ইহাদের বেশভূষা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

লিসু জাতির উৎপত্তির বিবরণ বড়ই কৌতূহলপ্রদ। ইহারা বলে যে:—

সর্ব্বপ্রথম ভগবান যখন তাঁহার রাজ্যে মানুষ সৃষ্টি করিলেন—তখন মানুষ গুলি ভারী উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তাহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ভগবান তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, কিন্তু চটিলে আর কি হইবে—তিনিই ত সৃষ্টি করিয়াছেন! তাই অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে পরমেশ্বর একজন লোককে বাছিয়া লইলেন; —লোকটীর ব্যবসা নাকি ছিল—"কদু" অর্থাৎ "লাউ" ফলান এবং বাজারে সেই কদু বিক্রী করা। ভগবান তাহাকে ডাকিয়া কয়েকটী কদুর বীজ দিয়া বলিলেন—"ধর, এই নাও—এই বীজগুলি লইয়া বেশ ভাল জমীতে পুঁতিয়া দাও, যতদিন ফল না হয় ততদিন খুব ভাল করিয়া গাছ গুলিকে রক্ষা করিও কারণ পরে আর তোমার অদৃষ্টে কদু ফলিবে না।

ভগবানের আদেশমত লোকটী সেই বীজগুলিকে যত্ন পূর্ব্বক মাটীতে পুঁতিয়া দিল। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই অতি চমৎকার গাছ বাহির হইল, এমন সুন্দর সতেজ গাছ আর কখনো সে দেখে নাই। কিছুদিন পরে গাছে ফলও ধরিল—কিন্তু একটী ফলের বেশী ধরিল না; তবে সেটী সাধারণ কদুর মত হইল না, এমন প্রকাণ্ড হইল যে কেহ কখনও তত বড় কদু দেখে নাই, ক্রমে ফলটীতে রঙ ধরিল।

একদিন বড় দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা গেল; কাল মেঘে আকাশ ঘিরিয়া ফেলিল, ঘন ঘন বজ্রের শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল; পৃথিবী যায় যায়। সকলেই প্রাণ ভয়ে ভীত হইল, এক মনে এক প্রাণে ভগবানকে ডাকিত লাগিল, কিন্তু দায়ে পড়িয়া ভগবানের নাম লইলে কি হইবে—সুতরাং ভগবানের রাগ পড়িল না—তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। দেখিতে দেখিতে জলের স্রোত বহিল, বান ডাকিল, পৃথিবী জলমগ্ন হইল, লাউব্যবসায়ী তাহার ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিল—আয় বোন; আমরা এই লাউটিতে একটা ছিদ্র করিয়া ইহার মধ্যে ঢুকিয়া যাই—নইলে বানের জলে—প্রাণ যাইবে। বোনটী দেখিলেন যুক্তি ভালই—সুতরাং আর বিলম্বে প্রয়োজন কি! তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড লাউয়ের গাত্রে একটী ছিদ্র করিয়া ভাই বোন দুটীতে ঢুকিয়া গেল—লাউ জলের ঢেউয়ে নাচিতে লাগিল।

এইরূপে অনেক দিন যায় জল আর থামে না, স্রোতও থামেনা। ভাইটী ছিদ্র দিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন দূরে এক প্রকাণ্ড পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া ভাই বলিলেন—বোন! ঐ দেখ দূরে একটা উঁচু পাহাড়, যদি কপাল গুণে এই লাউয়ের ভেলা পাহাড়ে গিয়া ঠেকে তবেই রক্ষা, নইলে আর জমী পাইবার আশা নাই। তাহারা ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লাউয়ের ভেলা পাহাড়ের গায়ে আসিয়া লাগিল।

পাহাড়ের গায়ে লাগিবামাত্র ভাই বোন দুটীতে ভেলা হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দেখিল যে আর জন মানবের চিহ্নমাত্র নাই—কেবল জল—কেবল জল! কেবল তাহারা দুটীতেই বাঁচিয়া আছে।

দিন কাটিয়া গেল—ভাইটিকে বোন বিবাহ করিতে চাহিল।

ভাই বলিল "তাও কি হয়! তুমি যে আমার বোন! তোমাকে কি বিয়ে করতে আছে?"

তখন অনেকক্ষণ বসিয়া তাহারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে বিষয়টা ভগবানের নিকট জানান যাক্, কিন্তু ভগবানকে আর কোথায় পাওয়া যায়? সুতরাং ভাই বলিবেন "বোন! আয় আমরা একটা পরীক্ষা করি। এই লাউটা আমাদিগকে ভগবানই ত দিয়াছেন, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি; নইলে নিশ্চয়ই মারা যাইতাম।" ইহা বলিয়া তাহারা দুই খানি ডালভাঙ্গা যাঁতা লইয়া একটা পাহাড়ের মাথায় উঠিল। দুইখানি যাঁতার মাঝখানে দুইটী ছিদ্র ছিল, একখানিতে একটা মোটা কাঠের শাল বিঁধাইয়া ভাই বলিলেন "বোন! এখন এই দুইখানা যাঁতা এখান হইতে

ছাড়িয়া দেওয়া যাউক—যদি এই শাল কাঠি অপর যাঁতাটার গর্ত্তে ঢুকিয়া আঁটিয়া যায় তবেই জানিব যে আমাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াই ভগবানের ইচ্ছা।"

পাহাড়ের উপর হইতে যাঁতা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক যাঁতার খিল্‌টা অপর যাঁতাটার গর্ত্তে এমনি ভাবে আঁটকাইয়া গেল যে খুলিল না এবং সেইরূপ ভাবেই নীচে গড়াইয়া পড়িল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াই ভগবানের অভিপ্রায় ইহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল।

তাহার পর ভাল দিন দেখিয়া ভাই ভগ্নীকে একটা কুল গাছের নীচে বিবাহ করিলেন। ক্রমে তাহাদের নয়টী ছেলে হইল,—ছেলেরা বড় হইলে পর যে যাহার ইচ্ছামত নানা দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল এবং এইরূপে নানা জাতির সৃষ্টি হইল। কিন্তু তন্মধ্যে যে ২টী ভাইয়ের প্রাণে প্রাণে মিল ছিল,—তাহাদের আর ছাড়াছাড়ি হইল না; তাহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুড়িয়া বেড়াইয়া শীকার করিতে লাগিল, তাহাদের মত শীকারী নাকি কেহই ছিল না। একদিন একটা বানর দেখিয়া ছোট ভাইটী তীর দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাহাতে বড় ভাইটী বলিল—ভাই! তুমি সর্ব্বনাশ করিলে, এই বানরীটীকে আমি যে বিবাহ করিয়াছি।" বড় ভাইটীর কথা শুনিয়া ছোট ভাইটী বড়ই দুঃখিত হইল, এবং অপর একটী বানরী ধরিয়া তাহার দাদাকে বিবাহ করিতে দিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ছোট ভাইটী আবার ভুল করিয়া সেই বানরীটীকেও মারিয়া ফেলিল। ইহাতে বড় ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছোট ভাইটীকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। এদিকে পাহাড়ের দেবতা এই ব্যাপার দেখিয়া তাহাদিগের বিবাহের জন্য দুইটী কুমারী পাঠাইয়া দিলেন, তন্মধ্যে একটী পরম রূপবতী—অপরটী কুৎসিত। ছোট ভাইটী সেই সুন্দরী মেয়েটীর মুখে কাদা আর রঙ্ মাখাইয়া দুইটী মেয়েকেই দাদার নিকট হাজির করাইয়া তন্মধ্যে যেইটী ইচ্ছা দাদাকে নিতে বলিল।

বড় ভাইটী সেই কুৎসিৎ মেয়েটীকেই গ্রহণ করিল। তখন ছোট ভাই সেই রঙ্ মাখান মেয়ের মুখটী ধুইয়া দিবামাত্র বড় ভাই রাগে অস্থির হইয়া ছোট ভাইকে একটা পাহাড়ের গহ্বরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সুন্দরী মেয়েটীকে অধিকার করিয়া লইল।

অন্ধকার গহ্বরে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোট ভাইটী পাতালের রাস্তা দেখিতে পাইল। পাতালের রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর যাইয়া দেখিল যে আর অন্ধকার নাই, ঠিক উপরের মত চন্দ্র, সূর্য্য গাছ পাতা, ফল ফুল রহিয়াছে, তবে বাঘের উপদ্রবটা বড়ই বেশী; চারদিক হইতে প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র গুলি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল, কিন্তু সঙ্গে তীর ধনু না থাকায় কয়েকটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার আঘাতেই বাঘ গুলিকে সে মারিয়া ফেলিল। বাঘ গুলিকে মারিয়া ফেলিবামাত্র কতক গুলি কাঠবিড়াল আসিয়া তাহাকে বলিল—"আপনি বাঘ

মারিয়াছেন—সুতরাং আপনি দেবতা, কিন্তু আপনার মুখখানি মলিন কেন, মনে এত দুঃখ কেন?"

ছোট ভাইটী বলিল—"আমি পাতালে আসিয়াছি, ইহা আমার দেশ নহে, আমি মর্ত্ত্যে থাকি।"

কাঠবিড়ালগুলি বলিল "আচ্ছা! আমরা আমাদের রাজাকে ডাকিয়া আনি, তিনি নিশ্চয় আপনাকে উপরে রাখিয়া আসিতে পারিবেন! আমরা সকলেই বেশ উড়িতে পারি দেখিতেছেন—সুতরাং আপনাকে উপরে রাখিয়া আসিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইবে না।

কিছুক্ষণ পরেই কাঠবিড়ালদের রাজা আসিল। রাজাটীর নয়টী লেজ, দেখিতে ভয়ানক শক্তিশালী। রাজা বলিলেন—"হাঁ আমি তোমাকে উপরে রাখিয়া আসিতে পারি বটে, কিন্তু আমাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিতে পারিবে না, করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।"

বিড়াল রাজার কথা শুনিয়া ছোট ভাইটী বলিলেন--"তাওকি হয়! আপনাকে কি আমি ঠাট্টা করিতে পারি! আপনি হলেন পাতালের কর্ত্তা! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে কিছুতেই হাসিব না।"

তখন যাত্রার আয়োজন হইল। বিড়াল রাজার পিঠে বসিয়া ছোট ভাইটী সেই নয়টি লেজের মধ্যে একটীকে খুব চাপিয়া ধরিয়া বসিলেন। বিড়ালরাজ বাতাসের মত ছুট্ দিলেন। খানিক দূরে যাইয়া যেই সে মানবপুত্র একটু হাসিয়াছে, আর অমনি খুট্ করিয়া তাহার হস্তধৃত লেজটী খসিয়া গেল—আর একটী লেজ ধরিয়া তখন সে রক্ষা পাইয়া ভাবিল—আর হাসিবে না,—কিন্তু আবার কিছুদূর যাইতেই হাসি বাহির হইল এবং কাটবিড়ালের আর একটী লেজও এইরূপে খসিয়া পড়িল। এই প্রকারে বিড়াল রাজার আটটী লেজ ক্রমে ক্রমে খসিয়া গেল, বাকী রহিল মাত্র একটী। সেইটী গেলেই আর তাহার মর্ত্ত্যে যাওয়া হইবে না, সুতরাং ছোট ভাইটী প্রাণপণে সেই একমাত্র লেজটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, ভয়ে তাহার রক্ত জল হইয়া গেল। কিন্তু এবার নির্বাধে সে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পৌছিল!

মর্ত্ত্যে আসিয়া ছোট ভাইটী দেখিল যে তাহার দাদার মৃত্যু হইয়াছে, তখন আপন পত্নীকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। লিসুগণ ইহারই বংশধর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

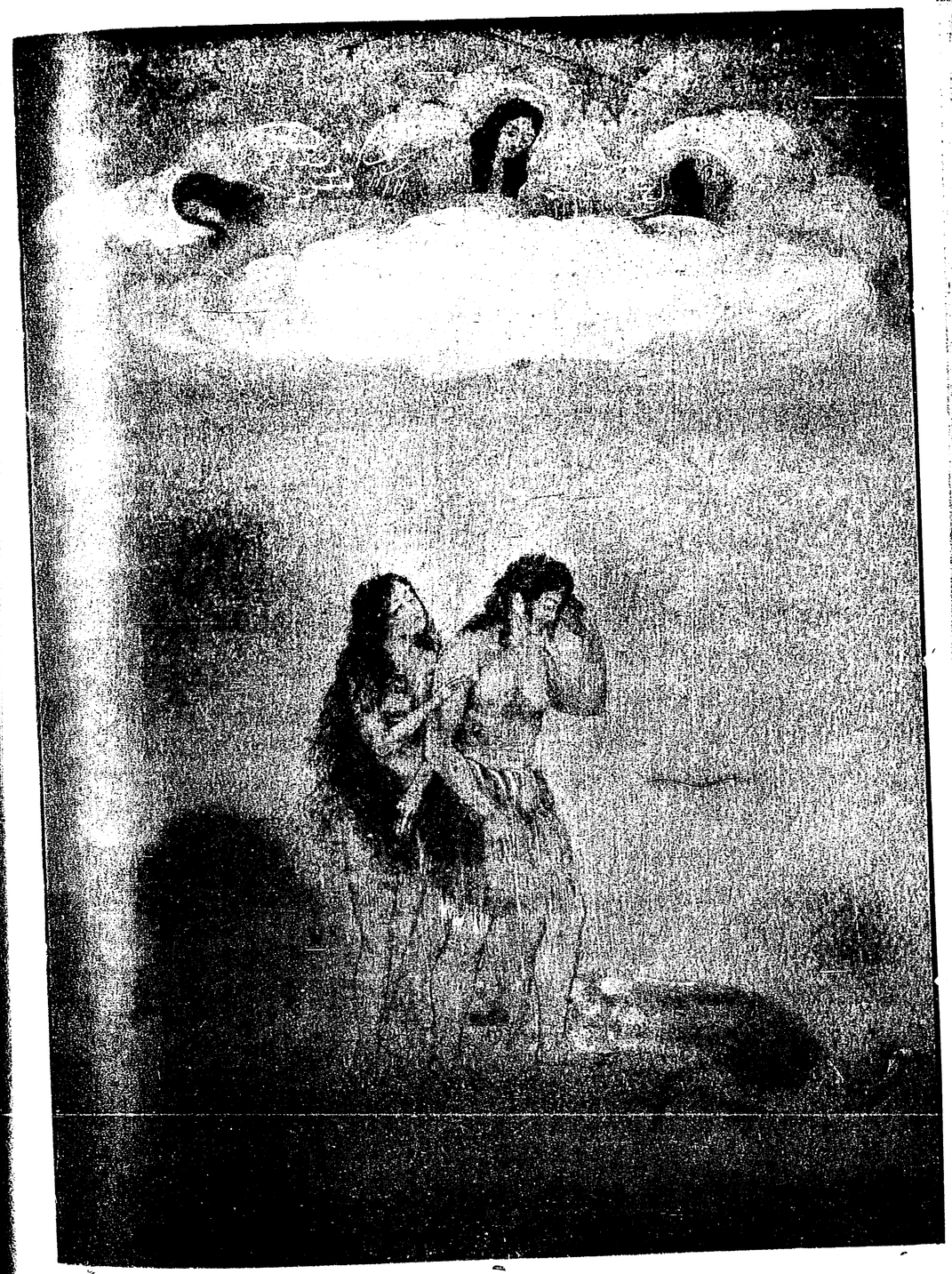

প্রথম মানব ও মানবী—আদম ও ঈভ (১৯১২ অক্টোবর)।

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ।

চন্দন-মধু

(১)

"সন্ধ্যা যে যায় যায়, এখনও ফিরিল না মিস্মা!"

ব্যাকুল বুড়া রুগ্ন দেহে, দুর্ব্বল কম্পিত পা দুইখানির উপর আস্তে আস্তে ভর রাখিয়া, দুয়ারের ঝাঁপখানা সরাইয়া দেখিল,—মস্ত একখানা কালো মেঘ আকাশের পূর্ব্বদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। ঐ সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস! বৃষ্টিও বুঝি আসে!

ঝাঁপ বন্ধ করিয়া আবার সে জীর্ণ কম্বলখানা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবনার কি কূল-কিনারা আছে—? কিন্তু, কাণ তার তবু খাড়াই রহিল। কি জানি, কখন আসিয়া সে ঝাঁপ ঠেলা দেয়!

মিস্মা বুড়ার একমাত্র পুত্র;—তা'র আর কেহ নাই।

মাটির বেদীতে তক্তা-পাতা বিছানা; মাটির রঙেই কাঠে তৈরী তক্তার বেড়া। আলো নাই, ঘর আঁধার।

লতায় ঢাকা, গাছের শুক্‌নো ডাল চাপা খড়ের চাল কাঁপাইয়া এমন সময় ধীরে ধীরে হাওয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বৃষ্টি।

কি করিবে—বুড়া! আশঙ্কায় সে ব্যাকুল; —মাথার চুল ছিঁড়িয়া বৃষ্টিকে থামিতে বলে; —কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেবতাকে ডাকে, হাওয়া বন্ধ করিবার জন্য।

হাওয়া থামিল না; বৃষ্টির বেগও বাড়িয়া চলিল।

মাম্পোর এই ছেলেটুকুই একটুক্‌রা নড়ির মতো;—তা'র কবরের পাশে দৈব পতাকা উড়াইতে শুদ্ধমাত্র সেই না থাকিলেই যে চলিবে না!—নতুবা, পরলোকে উপায় কি, ত্রাণ কিসে?

মিস্মার বাবা এমন অথর্ব্ব ছিল না। রোগে রোগেই বেচারাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে।

বস্তীর শেষে জঙ্গলে ঢাকা, শীর্ণ একটি ঝরণার পাশে তাদের ছোটখাটো ঘরটুকু। পতিত ভিটা! মাম্পোর আশা আছে, মিস্মা মানুষ হইলেই তাহাতে ঘর উঠিবে। এই বয়সে তার আর সাধ্য নাই যে, নূতন করিয়া অত বড় একটা ঘর উঠায়। ভরা সংসারের সবই গিয়াছে যদি, ঘর দিয়া আবার কি হইবে,—কা'র জন্য ঘর? মিস্মা? মানুষ হইবে, তবে তো? —সে ঢের দেরী।

বৃদ্ধের জ্বালা অনেক। বাঁচিতে তা'র আর সত্যই সাধ নাই। মরিলেই বাঁচে। কিন্তু মিস্মা একটু মানুষ হউক, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক, তা' হইলেই সে নিশ্চিন্ত।

কাঠে-পিতলে তৈয়ারী মণিপদ্‌মা ঘুরাইয়া বৃষ্টি-ঝড়েও বুড়ার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় কে ও! মুখে তার গান!

কোথা হইতে পথিক গান ধরিয়াছে—কবেই বা থামিবে।

কে যেন পূর্ব্বেই দুয়ারের দিকে আসিতেছিল, আগন্তুককে দেখিয়া ফিরিয়া পালাইল।

সংযত সাধক লামা স্ফুরিত নেত্রে চাহিল। অন্ধকার। ঐ কমলালেবু গাছগুলার ধার দিয়া, পেয়ারাগাছের পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়—ঐ, এক তরুণী!—যুবা লামা ঈষৎ অস্পষ্ট চেহারাখানি তাহার লক্ষ্য করিল মাত্র।

গানের শব্দে বৃদ্ধ বুঝিল, দুয়ারে লামা। তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অতিথিপূজা, মহাব্রত। আজীবনের পালিত সাধনা এই, আজ বুঝি তাহার বিনষ্ট হইয়া যায়। দুর্ব্বলতায় সে নিজে সম্পূর্ণ অক্ষম;—দেবতার অংশ এই লামা, বহু ভাগ্য-গুণে তাহার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছে—অনাদরে ফিরিয়া যাইবে?—হায়, এও হইবে?

ভিতর হইতে ক্ষীণ আকুল স্বরে সে বলিল, "হায়, এও হইল? বিপন্ন অতিথি ফিরিতেছে? আমিও বাঁচিয়া আছি, মিম্মাও মরে নাই!"

লামা আশ্বাস দিয়া দৈববাণীর মতো উচ্চ স্বরে কহিল, "লামার ভিতর বাহির সমান। গৃহস্থ, স্থির হও। আমি আছি। বারান্দা ছোট চালার নীচেই আমি আসন লইলাম।"

পূর্ব্ববৎ স্বরে মাম্পো বলিতে লাগিল, "কত পাপ আমার! বাবা সন্ন্যাসী, তোমরা ত সব পারো—মিম্মা কোথায়, তাকে আনিয়া দাও! রাত হইয়া গেল, সে আসিল না যে—!"

"কে সে?"

"চোখের মণি, বাবা—সে আমার ছেলে। তারও আর কেউ নাই, আমারও আর কেউ নাই। আমরা দু'টিতেই সারা পৃথিবীতে একেলা।"

ছলছল চক্ষু লামার;—সে আপন মনে কহিল, "আমরা কেমন খেলি, বাঃ! কেউ কাঁদি, কেউ কাঁদাই।"

স্মিত ওষ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণে লামা শ্বাস ত্যাগ করিল। মণিপদ্মা ঘুরিল। লামা গান ধরিল।

(২)

দুপুর রাত। আধা চাঁদের সাদা হাসি, পাৎলা কুয়াসায় মাখামাখি হইয়া সমস্ত বস্তীর গায়ে মস্‌লিনের ওড়নাখানির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ধূমল মেঘের মিহিন কোমল চাদর খানি বৃষ্টির চিকন চিকন ধারাগুলির ঝালর দুলাইয়া হাওয়ার কোলে কোলে কোন্ পাহাড়ে চলিয়া গেল। আঁধার ত পেঁচা, পাহাড়ের ফাটলেই তার ঘর; ডানা মেলিয়া উড়িয়া গিয়া সেইখানে সে ঘুমাইল।

মিম্মা আসিয়াছে। ঐ ঝাউ গাছগুলার সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া;—জোয়ান্ চেহারা। প্রত্যাখ্যান, আশঙ্কা, লজ্জা,—মিম্মার আজিকে ত্র্যহস্পর্শের রাত্রি।

ঢেধ্বা বস্তীর চেংটী ভুটিয়ানী ভারী বড় লোক। সহরে সহরে তার কারবারী গদী; পাহাড়ে পাহাড়ে তা'র জমিদারী। নেপাল ভূটান তাতার তিব্বতে তার লোক খাটে; মালের রপ্তানী-আমদানীতে মেয়েটী অসাধারণ মাথা খেলাইতে পারে। তরী-

তরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া ভুট্টা ধান প্রভৃতির চাষ কিছুই সে ঘৃণা করে না; সামান্যতেও উপেক্ষা নাই, অসামান্যের সঙ্গে বীরের মতো টক্কর লড়ে।

ভারতবর্ষেও সে সওদা পাঠাইত।

তার খাস জমিদারীর মস্ত একটা বাগান মিম্মার জিম্মায় ছিল।

বিধবা প্রৌঢ়া—এই চেংটী। যুবতী ভগ্নী তার—নীল্লি; সেও বিধবা। উভয়ে দেখিতে সুন্দরী। তবে পার্থক্য যা-কিছু বয়সের। বৃহৎ সংসার—অযাচিত আত্মীয় ও করুণা-পালিত জন-কোলাহলে মুখরিত।

মিম্মার চাকরী আজ তিন বছরের।

চেংটী যেদিন তার ভরা বাগানের কমলা লেবুগুলি কাঁচায়-পাকায় হাজারে হাজারে টুকরী বোঝাই দিয়া সহরের বাজারে পাইকারী দরে ছাড়িতে গেল,—দ্বিতীয় বছরের সেই পয়লা রঙিন সন্ধ্যায় নীল্লির সঙ্গে মিম্মার সাক্ষাৎ।

এর পর প্রায় প্রতি বৈকাল বেলায় তাহাকে নীল্লির কাছে হিসাব নিকাশ পরামর্শ করিতে যাইতে হইত। নীল্লি গম্ভীরভাবে হিসাব দেখিত, মিম্মা হাঁ করিয়া তার পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত;—খাতার হিসাব তার ঠিক ছিল কিন্তু মনের হিসাবে গোল বাধিত।

মিম্মা ছিল পিতৃ-প্রেমিক। শৈশব হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সে, পিতার বুকেই আনন্দে কাটাইয়াছে আজ সে তা'র পিতার জন্য পৃথিবীতে কি না করিতে পারিত? সুস্থ পিতামাতার অদ্বিতীয় সুস্থ সন্তান এই মিম্মা—সখ করিয়াই ঘোড়ার লাগাম্‌টাতে একটু ঢিলা দিয়াছে কি অমনি সে তাহাকে কোথায় লইয়া ফেলিল! পিতা হইতে কত দূরে!

পিতার কাছে পুত্র বংশের ইতিহাস শুনিয়াছে। এমন দারিদ্র্য চিরদিনই তাদের ছিল না। বংশও নাকি সম্ভ্রান্ত, উচ্চই ছিল! তবে কেন নীল্লির হৃদয়ের দিকে নিজ হৃদয়ের এই প্রেম পুষ্পের অভিনন্দন সে পাঠাইবে না? কী ভয়!

মাত্র প্রত্যাখ্যান? বংশ-গৌরব নত হইবে যে! করা যায়—কি? বছরের চাকা ঘুরিয়া গেল।

চেংটি বাড়ী নাই। নীল্লি আসিয়াছিল, বৈকালে বাগান দেখিতে;—অর্থাৎ?

মিম্মা মজুরদের কোলাহলের পানাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মদ্য, ও ঝালের আচারের সঙ্গে কড়া চায়ের বন্দোবস্ত।

বঁড়শী-বিদ্ধ রক্তাক্ত মূক মাছটির মতো, সে যে আপনারই ভিতর আপনি ছট্‌ফট্ করিয়াও ধৈর্য্য ধরিয়া আছে, যুবতী ইহা লক্ষ্য করিল। কিছুদূর নামিয়া গিয়া সে কহিল, "আখের ক্ষেত অপরিষ্কার রহিয়াছে।"

তাহার চোখের দিকে চাহিতে মিম্মার সাহস কম। নত নেত্রে সে উত্তর দিল, "আখের ক্ষেতের উপরই শুধু আপনার দৃষ্টি পড়ে। ওদিকে যে—"

সুন্দরী শুনিল; বুঝিল। চাপিয়া গিয়া নিষ্ঠুর প্রেমমাখা দৃষ্টিখানি তুলিয়া সে বলিল, "হাঁ, সেদিকের সে বেড়াটাও একটু ভাঙ্গো-ভাঙ্গো।"

ঈষৎ রুষ্ট করুণ কণ্ঠে ভিক্ষুকের স্বরে মিম্মাকে জবাব করিতে হইল," ভাঙ্গিবে না? কাঠেরই বেড়া ও; কত দিন টিঁকিবে, ন্নীল্লি ঠাকুরঝী!"

প্রথম আলাপ এই ভাবে।

* * *

আগামী আবাদ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার সময়, বস্তীর একটা বিবাহের বাজনা শুনিয়া মিম্মা একদা কহিল, "ওটা বিবাহের বাজনা, না ন্নীল্লি ঠাকুরুণ?"

কথাটা ঠোঁটের আগায় আসিয়াছিল। সহসা ন্নীল্লি জবাব দিয়া ফেলিল, "হাঁ; আমারও বাজিত, আপনারও বাজিবে একদিন।"

মেয়েটির বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। এক বছর পরে বিবাহের নিয়ম; পূর্ব্বেই বরের মৃত্যু হয়। তারপর সে স্বেচ্ছায় অবিবাহিতা রহিয়াছে। মিম্মা এ সব জানিত। সে বলিল—

"বাজিবে?"

"?স কথা আমি কেমন করিয়া জানিব? আমি ত আপনার অভিভাবিকা নহি।"

"কে—তবে?"

"এখানকার কাজ হইয়া থাকে, অন্য কাজে যান। ভুলিয়া বাজে সময় নষ্ট করিতেছেন।"

মিম্মা থতমত খাইয়া বাহিরে আসিয়াই দেখে, বাগানের দরজায় দাঁড়াইয়া চেংটি।

সে সহর হইতে ফিরিয়াছে; ঘরে যাইতেছিল, উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবককে দেখিয়া চেংটি ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "টুংশী সহরে তরকারীর চালান রওনা করিয়াছ?"

অভিবাদন করিয়া মিম্মা শুষ্ক মুখে উত্তর করিল, "না; কাল যাইবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে চেংটি কহিল, "কাল যাইবে! তিন দিন পূর্ব্বে যাওয়া উচিত ছিল।"

নিম্নস্বরে যুবা বলিল, "ছিল। অবসর পাই নাই।"

পরুষ ভাবে প্রৌঢ়া উচ্চারণ করিল, "অবসর পাও না! আকাশে ইমারত তৈরীর প্রচুর অবসর তোমার। মনে রেখো, তুমি চাকর। ন্নীল্লি—আমার ভগ্নী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া; আর প্রেমালাপের জন্য তোমায় মাহিনা দিই না—যাও।"

বিকৃত মস্তিষ্কে মিম্মা কি প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ক্ষিপ্ত চীৎকারে চেংটি তাহাকে বলিল "তুমি চাকর।"

সে কি ইহা জানিত না? কিন্তু আজ সে বিশেষ করিয়া শুনিল, মনে মনে পুড়িয়া পুড়িয়া বুঝিল যে, সে—চাকর। চীৎকার করিয়া কহিয়া লইল, "ওঃ, কী ভুলই করিয়াছি।"

ইহার পর কতবার চেংটি সহরে গিয়া কত দিন থাকিয়া আসিয়াছে, কতবার মিম্মা কার্য্যোপলক্ষে ন্নীল্লির কাছে গিয়াছে, ন্নিল্লীকেও কত দিন উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে, হাব ভাবে আর কোন দিন কোন রকম দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই।

তারিখের পর তারিখ কাটিয়া গেল।

চেংটী—সহরে।

বৈকালে ন্নীল্লি আজ খাবার খাইয়া হাত-পা ধুইতেছিল;—অবশিষ্ট টাকার থলি হাতে মিম্মাকে তার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। কে জানে কেন, মিম্মাও চমকিয়াছে। কোথায় পাইল, ন্নীল্লি আজিকার এই অপূর্ব্ব-সুন্দর যৌবনশ্রী—রূপে রঙে তরুণ লাবণ্যে ঝলমল, কম্পিত তনুখানি! মিম্মাও কি নূতন যৌবনের অমৃত হিল্লোলে এইমাত্র স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে? উভয়েই তো আজিকে বড় মোহন! বড় মনোমদ! মনুষ্য-জীবনে এমন রঙিল সৌন্দর্য্য—সত্য কি এ? রুদ্ধ স্রোত বুঝি থাকে না, বাঁধ বুঝি ভাঙ্গেই!

লীলাবতী ন্নীল্লী—চতুরা। ত্বরিতে সে আত্ম-সম্বরণ করিল। সেইটুকুতে কিন্তু মিম্মার বুকে প্রলয় বহিয়া গেল।

সে হিসাব নিকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যুবতী প্রতি ভুলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিল।

ভুল করিতেছে কি সে সাধে? আজ ন্নীল্লিকে সে যাহা দেখিতেছে, তাহা যে ভুবন-ভুলানো মূর্ত্তি!

ভুলের পর ভুল—সে কি! মিম্মার অবস্থা দেখিয়া সুন্দরী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে পুরুষ না! গৃহান্তরে চলিয়া যাইবার সময় রোষ-কটাক্ষে চাহিয়া ন্নীল্লি বলিল, "ছিঃ, এমন অপদার্থ আপনি!"

মিম্মা এতক্ষণ অসীম ধৈর্য্যের সহিত হিসাবে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছিল। অভাবনীয় বাক্যাঘাতে আচম্বিতে সে চমকিয়া উঠিল। ঘৃণা! সে পাইল শুধু ঘৃণা! এতদিনের সাধনার পর আজিকে তাহার উপর এই মন্তব্য!

ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাগিচায় গিয়া উপস্থিত হইল। খেয়াল নাই, বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্ষেত্র-মধ্যে পাগলের মতো ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না; পথ-রেখাগুলি হারাইয়া গিয়াছে।

পশলা পশলা দম্‌কা হাওয়া ও বৃষ্টি ধারাকে পরিপাক করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মিম্মার মনে পড়িল, কালকেও এই সময়কার কথা। সে কাল আহারান্তে এতক্ষণ তার পিতার বুকের কাছে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। রোগতপ্ত পিতার শিথিল হাত দুখানিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিজের মুখখানিকে তার বুকের কাছাকাছি রাখিয়া উভয়ের সেই পরম নির্ভরের মতো সুমধুর নিদ্রা—যুবকের মনে পড়িল।

দিগ্বিদিক-বিচার-বিহীন হইয়া সে গৃহের পানে চলিল।

(৩)

অনেক রাত পর্য্যন্ত মাম্পো ঘুমাইতে পারে নাই। একে রোগের জ্বালা,—তার উপর মিম্মার চিন্তা ঘুমের আর দোষ কি? মিম্মার আজ এ কী ঘটিল? এমন কোন দিনই তো হয় নাই! বুড়া অস্থির। এদিকে অতিথি দুয়ারে পড়িয়া রহিল;—সর্ব্বনাশ! আজীবনের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজ বুঝি সব যায়। অশক্ত বৃদ্ধ, নিরুপায়; শুধু চিন্তা করিয়া মরিতে লাগিল। ইহাতে কি আর ঘুম হয়!

পরে লামা যখন গান ধরিলেন, আকুলি বিকুলি করিয়া সে নিবিষ্ট মনে তাহাই শুনিবার চেষ্টা করিল। শুনিতে শুনিতে ঈষৎ তন্দ্রাবেশে অনুভব করিল, যেন কার স্নিগ্ধ কোমল হাতদুইখানিতে করুণ শুশ্রূষায় তাহার ভাবনা যন্ত্রণা অপসারিত হইয়া গেল। সে এবার নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

* * *

মাম্পোর বাড়ী হইতে রশিটাক দূরে, কিছু উঁচুতে ঝাউয়ের শ্রেণী। মিম্মা তাহার কাছে পৌছিয়া বাড়ী দেখিতে পাইল। আর ত পা চলে না! কি জানি, তার পিতার কি হইয়াছে, কি-বা গিয়া সে দেখিবে, কি বলিয়া কি করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে—এই সকল দুশ্চিন্তাই তাহার প্রবল হইল।

চঞ্চলা চপলা কলিকাটির মতো, কুয়াশার পাতলা ওড়নার ঘোমটাখানি একটু সরিয়া গেলে, পরিষ্কার চাঁদের আলোতে সে দেখিল, তাহাদের ঘরের বারান্দায় কে ব্রহ্মচারী বসিয়া মণি-পদ্মা হাতে মন্ত্রগীতি আবৃত্তি করিতেছে। সজাগ অবিকল উদাসীন সেই ঠাকুর মহাশয়। লক্ষ্যহীন অনন্ত শূন্যে তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্থির,—তাহারি ভিতর দিয়া সে কাহাকে তাহার হৃদয়ের আনন্দ জানাইতেছে! মিম্মা অনিমেষ নেত্রে লামাকে দেখিল। ভাব-বিহ্বলতায় অভিভূত হইয়াই সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তিটিকে সে দেখিতে লাগিল; এবং বুঝিতে চেষ্টা করিল—কোন্ জ্যোৎস্নার চুম্বন পাইয়া, কোন্ জ্যোতির আলোকোদ্ভাসিত প্রেমে এই চির-পথিকটি তৃপ্ত।

বিরত-সঙ্গীত ভিক্ষু তাহার পদ্মাসন ভাঙ্গিয়া ঘূর্ণায়মান পদ্মা হাতে আঙ্গিনাতে দাঁড়াইল। রুদ্ধ বক্ষের ভিতর হইতে তাহার নীরব গান যেন সবেগে বাহিরে আসিতে চায়। বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে তাহা বক্ষের উপর ধরিল এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিক দিয়া আরম্ভ করিয়া তদবস্থায় গৃহখানি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। আবার থামিয়া আবার প্রদক্ষিণ। কয়েকবার এইরূপ করিবার পর, ফকির সম্পূর্ণে অনুতপ্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দূর হইতে সে প্রশ্ন করিল, "কোন্ কর্ত্তব্যে এখানে আসিয়াছ?"

"এই-ই আমার বাড়ী।"

"সেবা-ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়াও, সাহসী প্রাণী, বলিতেছ ঐ তোমার বাড়ী। কেমন গৃহস্থ তুমি! ঐ শয্যাশায়ী বৃদ্ধ কি তোমার উপেক্ষা করিবার!"

"আমি—হাঁ, অপরাধী। কিন্তু আমার পিতাকে তুমি জান না সন্ন্যাসী। দেখিবে, সে কেমন ক্ষমা করে। এ নির্ভরতা না থাকিলে কি ফিরিতে পারিতাম, ভাবো?"

সার্থক—সন্ন্যাস তাহার। পিতা-পুত্রের এই অলোক-সামান্য, স্নেহ-মৌহৃদ, ক্ষমাময় সম্বন্ধের সৌরভটুকু স্মরণ করিতেই লামার লাল চক্ষু দুইটি শিশির-সিক্ত পদ্মদলের মতো অশ্রুকণিকায় ভরিয়া উঠিল।

(৪)

শেষ রাত্রি। অন্ধকার যায় যায়। মাম্পো জাগিল। অনাহারে সে দুর্ব্বল

বটে, সুনিদ্রায় কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা এখন অনেক কম। সদ্য জাগরিত, তৎ-ক্ষণাৎ কিছু ঠাহর পায় নাই। পুত্র এতক্ষণ উঠিয়া চা তৈরী করে, তাই সে অভ্যস্তভাবেই কহিল,—"মিম্মারে, বাবা আমার,—চিয়া কি বানানো হল! দে তো একটুখানি বাপ!"

কুটিরের বেড়ার দিকে মুখ রাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে বৃদ্ধ, না দেখিতে পাউক, অনুভবে বুঝিল—চা তৈয়ারি হইতেছে। ছেলে যে ঘরে নাই, সহসা সে ধারণাই তাহার হইল না।

তৈয়ারী চা-পাত্র গ্রহণ করিবে মাম্পো ঠিক এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া মিম্মা ও লামা ভিতরে প্রবেশ করিল। অবাক্ বুড়া চাহিয়া দেখে—এ কি! তাহার বুকের মধ্যে ধ্বক করিয়া উঠিল।

উল্লাস চমকে তাড়াতাড়ি হাত হইতে পাথরের খোরা ভূমিতে রাখিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল। কি বিপদে পড়িয়াছিল সে,—কি করিয়া উদ্ধার পাইল,—লামা গোঁসাইজীই তা'কে রক্ষা করিয়াছে। নতুবা বিপদের মুখে সেই বা আসিয়া পড়িবে কেন—প্রভৃতি কথাবার্ত্তার উত্তরে মিম্মার কোনো আবেগ পরিলক্ষিত হইল না। কোনটার সে উত্তর দিল, কোনটার দিল না। ছেলের গাম্ভীর্য্যে পিতা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার নিকট কথায় বার্ত্তায় চিরশিশু মিম্মা, হঠাৎ আজ এত গম্ভীর! সমাচার! সে দিতেছে, কিছু পাইতেছে না! এ একটা বেদনার মতো মাম্পোর মর্ম্মে বাজিল। তৎপরেই সে যখন তাহার জাগরণ-ক্লিষ্ট রক্তিম চক্ষু দুইটি লক্ষ্য করিল, তখন অনুমান করিয়া সান্ত্বনা পাইল—এ রাত্রি জাগিয়াই; অথবা এই অনুপস্থিতির অপ্রকাশ্য কৈফিয়তের লজ্জাতেই এ গাম্ভীর্য্য।

এদিকে আবার এ কি! মিম্মা নহে, একটি অপরিচিতা যুবতী মেয়ে তাহাকে চা দিতেছে! চিন্তানুমান-বিস্মিত বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "সারা রাত্রি মার মতো স্নেহ-হস্তে পরিচর্য্যা করিয়াছ, কে তুমি মা?"

মিম্মাই অগ্রসর হইয়া এ কথার উত্তর দিল, "এ নীল্লি। ইনি আমার মুনিবের ভগ্নী। নীল্লি ঠাকুরঝী, আপনি এখানে!"

উজ্জ্বল চক্ষে মিম্মার দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া নীল্লি জবাব দিল, "একটা নর-পশুর গার্হস্থ্য ইতিহাস পাঠ করিতে আসিয়া-ছিলাম। হাঁ, আমি এখানে।"

বুড়া কিছুই জানে না, আরো আশ্চর্য্য হইতে লাগিল; একটু শঙ্কাও মনে জাগিল।

মিম্মা একদৃষ্টে নীল্লির দিকে চাহিয়া-ছিল, প্রসন্ন শান্ত স্বরে একবার সে বলিল" বেশ, আজিকার এই সুপ্রভাতে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন; কিন্তু এখানে আপনার কর্ত্তব্য বোধ হয় শেষ হইয়াছে।"

মাতালের মতো ছলছল সরল চক্ষুতে মাদকতা জড়িত চাহনি নীল্লির। যুবকের দিকে তাকাইয়া ছিল, নত মুখে সে উত্তর দিল,"শেষ হইয়াছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

মিম্মা আপন স্বরে কহিতে লাগিল, "যান, এখনও বস্তীবাসী নরনারী শয্যা ত্যাগ করে নাই, আলোক সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে নাই! সম্ভ্রান্ত-বংশজাতা, আমার নমস্যা নীল্লি ঠাকুরঝী সকলের অজ্ঞাতসারে আপনি স্বগৃহাভিমুখে অগ্রসর হউন।"

নত মস্তকেও যুবতী যুববকে দেখিতেছিল, শুনিতেছিল; এবং তাহার স্বরকে বাক্যের ধারাকে অবিশ্বাস করিতেছিল;—এই কি সেই মিম্মা! কে দিল, এ পরিবর্ত্তন? সে প্রত্যাখান করিতেছে। এইবার তাহার নারী হৃদয়খানি কাঁপিল। একটি অস্ফুট সুচিক্কন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সুন্দরী মাটি ধরিরা একেবারে বসিয়া পড়িল। করুণ নেত্রে কতক্ষণ মিম্মার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সে স্পষ্টই বলিল, "চেংটি ভূটিয়ানীর ভগ্নী ভিক্ষায় বাহির হয় না;—দোহাই তোমার, স্বগৃহে পাইয়া তাহার অপমান করিও না।"

নীল্লি উঠিল। এবারকার চেহারাখানি তাহার নিস্তরঙ্গ শান্ত সাগরের মতো, নির্ব্বাপিত-ঝটিকায় প্রকৃতি দেবীর মতো। যেন চিরকালের মতো বিশ্রাম, যেন সমস্ত দিবা-রাত্রির জন্য সে ছুটি পাইয়াছে। লঘু হৃদয়ে বিনা বাক্য-ব্যয়ে রূপসী গৃহ হইতে বাহিরে চলিল।

বাহিরে গিয়া সুন্দরী আর নড়িতেই পারিল না।

মিম্মা আঙ্গিনার মাঝে আসিয়া নীল্লির হাত দুইখানি ধরিয়া ভরা চোখে বলিল, আমি দুর্ব্বল। "দুর্ব্বলকে চিকিৎসা করো, তহাকে পথ্য দিয়া বল দাও।"

বিমুখ হইয়াছিল নীল্লি; ফিরিয়া মিম্মার দিকে উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া বলিল,—

"এ হাত ছাড়িও না মিম্মা, ইহা বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলো। অপরাধ আমার। আমি সোনা লইয়া ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা খেলিতাম। কিন্তু সোনা—নরমই।"

পরে, কি ভাবিয়া সে আবার কহিল, "দিদিকে চেনো?"

মিম্মা কথা কহিল না।

ঈষৎ চিন্তার পর পুনরায় বলিল, "হউক। দিদিকে আমার সম্পত্তির অংশ ছাড়িয়া দিয়া তোমার প্রতি অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিলাম।"

স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ পিতা কহিল, "বিষয়-বুদ্ধিকে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছায় দুর্দ্দশা খরিদ করিলে, মনে রাখিও। আর, এ ছেলেমানুষি।"

নীল্লি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিল, "দুর্দ্দশার অবসানে ঐ শুভ প্রভাতের তরুণ সূর্য্য উঠিয়া পড়িয়াছে। এ—ত্যাগ নহে বাবা,—ক্ষুদ্রের প্রায়শ্চিত্ত। আমি অবিশ্বাসিনী নহি।"

মিম্মা ও নীল্লির দিকে চাহিয়া শ্রমণ যুবক সগদ্‌গদ প্রফুল্লতার সুরে গান করিতে লাগিলেন, "দুর্গতির মধ্যেই চন্দন জীবনের সার্থকতা। নহিলে সুগন্ধের মধু তার পাইতাম কোথা হইতে? দুঃখের আসল প্রতিকৃতি নানারঙের বটে, কিন্তু তারই মর্ম্মস্থলে—অমৃত এবং সত্য।"

(৫)

দরিদ্রোচিত আয়োজন—সম্ভারে মিম্মা ও নীল্লির বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছে।

পুরোহিত আসিয়া সেদিন তারিখের বন্দোবস্ত করিয়া গেল। আগামী হপ্তায় তেস্‌রা রোজ—রবিবার, খুব ভাল দিন। যাবতীয় পাহাড়ের জন্ম ঐ দিবসেই।

* * *

বিবাহের দিন ভোরে, চেংটী ঘরে পৌঁছিয়া দেখিল,—নীল্লি বাড়ী নাই; মিম্মা গরহাজির। ব্যাপার? প্রথমে সে বুঝিতে পারিল না। নীল্লির প্রকৃতি—তত নীচ নহে! সে বিদুষী। মিম্মা দরিদ্র। না, না, না—নহে।

মাম্পোর শুশ্রূষা-পরায়ণা নীল্লিকে যাহারা দেখিয়া আসিয়াছে, তাদের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল।

শয়তানীর মত সে চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি সত্য!

সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ তিব্বতী কুকুরটিকে সজোরে পদাঘাত করিয়া সে নীচে ফেলিয়া দিল।

দুই হাত সবলে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যতক্ষণ পারিল এই অপমান-বজ্রের সংঘাতটাকে দূরে রাখিবার সে চেষ্টা করিল।

"চেংটির ক্রোধ তাহারা জানে না—!"

"নীল্লি! নীল্লি!—"বলিয়া সে কেমন এক উচ্চ, উৎকট, উন্মাদ, দানবী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘনগুচ্ছ চুলগুলি তাহার অবিকল ধূর্জ্জটির মাথার জটা জড়িত সর্পরাশির মতো ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আরো—আরো ভয়ঙ্কর ভীষণ কালো হইয়া, মুখখানি সন্ধ্যা-সূর্য্যের আগুনের মতো লাল হইয়া, ঘামিয়া, ঐ দেবীযুদ্ধের চামুণ্ডা চণ্ডীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

মজুরদিগকে বক্‌সীস্ দিবার নিমিত্ত তাতার-জাত, ভয়ানক উগ্র কয়েক বোতল রক্সীপূর্ণ এক বাক্স মজুত ছিল। চেংটি একটা সাবল দ্বারা সেই বৃহৎ বাক্সের আবরণকাষ্ঠ চচ্চড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া ছিপি খুলিয়া অবিকৃতমুখে সম্পূর্ণ একটি বোতল শেষ করিয়া ফেলিল। দৃঢ় হস্তে অন্যটির গলা ধরিয়া শয্যার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

চীনা পেয়ালায় থরে থরে সাজানো ঝালমাখা, অর্দ্ধসিক্ত, লবণাক্ত মাংসখণ্ড গুলি কেবলমাত্র পরিচারকে রাখিয়া যাইতে ছিল, পাগলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানিস্ নীল্লির তুই, নফর!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কম্পিত পদাঘাতে তাহাকে সে দূর করিয়া দিল।

এবার চুমুকে চুমুকে সুরাপান, খণ্ডে খণ্ডে মাংস চর্ব্বণ—মত্ততায় প্রলয় ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণের মতো রৌদ্রভীমা এই ভুটিয়া রমণী বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিল।

টলিতে টলিতে, হেলিতে দুলিতে রমণী দাঁড়াইল;—ঠিক।

এখন সে স্থির। চক্ষু রক্ত জবা। ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখখানিতে তার, সিন্দূর আভাটি ফুটিয়া উঠায়, এক ভয়ানক সৌন্দর্য্যে তাহাকে রাক্ষস-সুন্দরীর মতো মায়াময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

কোন্ সোণার কাঠিটির স্পর্শে, কি

মন্ত্রের প্রভাবে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, চিররুগ্নকে সুস্থ করে?

মাম্পো আজ সম্পূর্ণ রোগ-বিমুক্ত। উৎসাহের আর তার সীমা নাই; যথাশক্তি আয়োজনের সে ত্রুটি করিতেছে না।

বৈকালেই বিবাহ-উৎসব। বৃদ্ধ পাড়া-পড়সী-নিমন্ত্রণে ব্যস্ত; মিম্মা পুরোহিত আনিতে গিয়াছে।

নীল্লি ইত্যবসরে সেই ঝাউঝাড়ের নিম্নস্থিত প্রস্তর-খণ্ডের উপর গিয়া উপবেশন করিল। এক রাশ কুয়াশায় স্থানটি আবৃত। পার্ব্বতী সুন্দরীকে এক-খানি মেঘের রাণীর মতো দেখাইতেছে।

পরিণয়-উপলক্ষে এ কয়দিন ভিতরে ভিতরে সে আনন্দে মাতোয়ারা ছিল! আজ কিন্তু তাহার হৃদয় স্বভাবতঃই দমিয়া যাইতেছে। সে আজিকে কোথায় দাঁড়াইবে? দিদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। অথচ সে—অচ্ছেদ্য রক্তের সম্বন্ধ। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া।

ভাব-গোপনের যথেষ্ট প্রয়াস-সত্ত্বেও সে ধরা পড়িয়া গেল। দূর হইতে মাম্পো তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া কহিল, "আমি তাঁহাকে আবার পিতৃ-বক্ষে টানিয়া লইতেছি, মা! এখনও সময় আছে!"

বড় সামলাইয়া নীল্লি প্রত্যুত্তর করিল, "ডোর ছিঁড়িবার সময়কার একটু আঘাত, এতটুকু বেদনা-বোধও কি বিচিত্র, বাবা?

মাম্পো কহিল, "ঠিক; কিন্তু কোন ছবিখানি সম্পূর্ণ নিখুঁত ভালো বল দেখি মা!"

একটা গর্জ্জন-শব্দে উভয়ে চাহিয়া দেখিল, দূরে চেংটি—বিপরীত দিক হইতে মিম্মাকে উঠিতে আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়াছে, "মিম্মা!—গোলাম—"

নীল্লি এত বিস্মিত যে সে শিহরিলও না।

মিম্মা অমৃতপায়ী। আজ নীল্লির উপযুক্ত সে, কাঁপে নাই।

কাঁপিল—মাম্পো। সে স্নেহাকুল, বৃদ্ধ, ভীত। জীবনের অন্তিম যুগে, শান্তির পরিবর্ত্তে এসব কেন? সমস্ত হারাইয়া দিয়া শান্তিও তাহার পাওনা হয় নাই!

চেংটিকে অভিবাদন করিয়া মিম্মা বলিল, "আমার সৌভাগ্য।"

চেংটি কহিল, "তোমার সাহসের পুরস্কার আবিষ্কার করিয়াছি!"

বক্ষঃসংলগ্ন বস্ত্রাবরণ হইতে বাম হস্তে চক্‌চকে একখানা কুক্‌রী ও ডান হাতে ভরা একটি পিস্তল টানিয়া বাহির করিয়া সে কহিল, "আফ্‌গান দেশের খাঁটি ইস্পাতে তৈয়ারী এই কুক্‌রী। আর নীল্লি! মিম্মার গর-হাজিরি জবাব-দিহি—তোমার।"

নীল্লি শান্ত রমণীর মতোই উত্তর দিল, "সুরায় তুমি মস্তিষ্ক খোয়াইয়াছ, দিদি।"

মত্তাবস্থাতেও দিদি সরল বন্য দৃষ্টিতে কনিষ্ঠাকে দেখিতেছে। সে সহোদরা। শৈশব হইতে নিজেই সে তাহাকে লালন-পালন করিয়াছে। নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী—স্নেহ, বিশ্বাস, ভরসা রাখিবার, কর্ম্ম-ক্লান্তি, চিন্তা ও শ্রান্তি আরোগ্য করিবার একটি মাত্র সন্ততি ঐ নীল্লিই তাহার—না, হউক তাহা!

"বংশ-গৌরবের এ অবনতি অসহ্য!"

বিকৃত মুখে ইহা কহিতে কহিতেই 'গ্রুম' করিয়া চেংটি নীল্লির দিকে পিস্তল ছুঁড়িল। মিম্মা নক্ষত্রবেগে গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। তাই রক্ষা। লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তন্মুহূর্ত্তেই যদি উপস্থিত বুদ্ধি-প্রণোদিত মাম্পো পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া নীচে না ফেলিয়া দিত, তাহা হইলে ভুটিয়ানীর হস্ত-চালিত কুক্‌রী তাহার মুণ্ডটিকে উড়াইয়া দিতই।

পুনঃ-পুনঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কুপিতা কামিনীর চিন্তা-শিথিল হস্ত হইতে, কুক্‌রী খানা স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল।

"সংহারের শত গবাক্ষ দিয়া রূপ যে ফুটিয়া বাহির হয়!—রূপ কত রে!"

রাসের পুতুলটির মতো সেই লামা আসিয়া পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, খুনাখুনি ব্যাপারের গোলমালে কেহ তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই।

"প্রবল-প্রতাপান্বিত, মহামহিম, দেশ-ধর্ম্ম-রক্ষক, রাজ-অধিরাজ, শ্রীশ্রীশ্রী-শ্রীলশ্রীযুক্ত ভোটান রাজ্যেশ্বরের গৌরবময় সিংহাসনের পার্শ্বস্থ প্রতিনিধি, জটিল রাজনীতি-কোবিদ্, শ্রীমান মন্ত্রীবর কর্ত্তৃক আদিষ্ট আমি, দেশের কল্যাণকামী বিপদাপন্ন রণসমূহে প্রাণ-দান-প্রতিজ্ঞ, প্রজা-সত্ত্বে রাজপ্রসাদগ্রাহী সেনাপতি, ঢেধ্বা বস্তীর জমিদারনী চেংটি ভুটিয়ানী তুমি, তোমাকে, হত্যা-প্রয়াস-অভিযোগে অভিযুক্ত, গ্রেপ্তার ও বন্দী করিতেছি;—তোমার বিচার হইবে।"

লামা ও সেনাপতির এই সুস্পষ্ট উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ও সেনাপতি সেই শিব-পন্থী বৈরাগী যুবার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! সমবেত সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ, দাঁড়াইয়া—স্থির রহিয়াছে। জনতা দেশ-ধর্ম্ম-রক্ষকের সমুচ্চ জয় ঘোষণা করিল।

ভ্রূকুটি-কুটিল চেংটি ঈষৎ বক্রগ্রীবায় সেনাপতি ও মন্ত্রীর পানে চাহিয়া দেখিল, চিনিল। বাক্য ব্যয় না করিয়া সে বস্ত্র মধ্য হইতে বোতল-গ্রহণান্তর ঢক্ ঢক্ করিয়া তাহা শেষ করিয়া ফেলিল। এবং ঘৃণা-ব্যঞ্জক বিকৃত মুখে শুধু আপন মনে অস্ফুট স্বরে কহিল, "প্রথম পরাজয়। তাও চেংটির প্রাণান্তক দুঃসহ।"

শিঙাধ্বনিতে সেনাপতির ইঙ্গিত পাইয়া সৈন্যার্দ্ধ তৎক্ষণাৎ চেংটিকে পরি-বেষ্টন করিয়া ধরিল।

মিম্মা ও নীল্লিকে দুই ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিয়া মুদিত নেত্রে মাম্পো পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়া রহিয়াছে।

লামার কটাক্ষ-সঙ্কেতে মন্ত্রী তখন মহামূল্য মণিরত্ন-খচিত শিরস্ত্রাণ লইয়া মাম্পোর সম্মুখস্থ ভূমিতলে রাখিয়া সেনাপতি-সহ সশস্ত্র তৎপ্রতি শিরোনমন করিলেন। "কর্ত্তব্য-অনুদিষ্ট, দেশ-অনুগ্রহপুষ্ট, কুশলজীবি মন্ত্রী আমি—বীরাগ্রগণ্য, মহা-তেজস্বী সেনাপতি, আপনাকে দেশ-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, অনুজ্ঞা করিতেছি—মৃত্তিকাপবিত্র ঐ শিরস্ত্রাণ উত্তোলনপূর্ব্বক সশস্ত্র রাজ পরিচ্ছদ সহকারে ইহাঁকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করুন।"

তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রীর এই

ভাষা, কণ্ঠ ও বাক্য শ্রবণে তৎপ্রতি দৃষ্টি দান পূর্ব্বক নম্র ও ব্যগ্রভাবে মাম্পো কহিল, "না, না, আমার নমস্য বৃদ্ধ, দরিদ্র কৃষককে প্রলোভিত করিবেন না। যাহার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি, সেই প্রাণ টুকুর উপর অত্যাচার করিবেন না।

সম্মানপূর্ণ স্নেহ-কঠিন বাক্যে অতি বৃদ্ধ মংথো মন্ত্রী শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "রাজবংশ সুখ-ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করে না।"

এবং তাহার ঈঙ্গিত-ক্রমে অবাঙ্মুখ ইতিহাস-গায়ক কবি সুললিত পদ-বিন্যাসে ভুটানের পূর্ব্ব বংশ-গৌরব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ রাজপুত্রের উদাসীনতা পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা সুর-সংযোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া লোকে মোহিত হইল, বিস্মিত হইল, শোকাকুল হইল—নানাভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধ মংথোর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পদাস্ফালনপূর্ব্বক লম্ফে লম্ফে ইতঃস্তত পাদচরণ করিতেছেন; সংকীর্ত্তনে তিনি মত্ত—মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারি বংশের মস্তিষ্ক পরিচালিত সুশৃঙ্খলাময় রাজ্য, প্রজাপালক রাজা, প্রত্যেক-অভিষেক প্রত্যেক-বিজয়।—বার্দ্ধক্য তাহার আবেগে অধীর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তিনি কহিতে লাগিলেন, "ভোটান-নরপতি আলস্যে, বিলাস-সম্ভোগে অভ্যস্থ নহেন। স্বার্থ-শিথিল সেই রাজকীয় দক্ষিণ হস্ত দুইখানি প্রজার হিতে চির-জাগরূক।"

সঙ্গীতের বিদ্যুত্তরঙ্গে মাম্পোর অবশ ইন্দ্রিয়রাজি প্রোজ্জীবিত, সুশীতল রক্ত-কণিকাবলী তাপোৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। সে বলিল, "রাজ্য আমারি। হাঁ, তাহার অরাজকতা দূর করা আমারি কর্ত্তব্য, হেমন্ত্রী, —প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াও।"

তৎক্ষণাৎ সেনাপতি মাম্পোকে রাজবেশে সুসজ্জিত করিয়া দিল। পীতাংশুগর্ভ-খচিত, শিরস্ত্র-শোভিত মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক তিনি যখন যুবকের মতো দাঁড়াইলেন, মণ্ডলীবদ্ধ জনসাধারণ সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিল,—ইহা তো অবিশ্বাস করিবারই নহে, রাজা ইনিই।

সমবেত প্রজা-কণ্ঠ ঐক্যতানে জয়ধ্বনি করিলে মন্ত্রী, সেনাপতি, মিম্মা, সৈন্যবৃন্দ একে একে রাজাকে নমস্কার জানাইলেন। নীল্লিকেও তৎসঙ্গে নমস্কারে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া সৈন্য-বৃত্ত-পরিবেষ্টিতা চেংটি চীৎকার করিয়া কহিল, "নীল্লি-নীল্লি! তোমার আভিজাত্য স্মরণ করো। চেংটি নীল্লি পৃথিবীতে সাধারণের সঙ্গে মিশিতে আসে নাই, ইহা মনে করো।"

সেনাপতি তাহাকে রাজ-সন্নিধানে অভিযুক্ত করিল।

মাম্পো। চেংটি, তোমার বিচার হউক।

চেংটি। এবার এস, নীল্লি! আমরা ভোটান রাজ-সম্মানের নিকট ঈষৎ অবনত হই।

দূরে দূরে উভয়ের মস্তক নিম্নপানে লঘুভাবে দুলিল। ভূমিষ্ঠজানু হইয়া মিম্মা এই আনন্দ-দিনে চেংটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"চেংটির কারবার—অন্যরূপ। ক্ষমার

দেনা-পাওনায় নয়। যুবক নীল্লির সৌভাগ্যে সুখী হইলাম; এইমাত্র। আমাদের স্বোপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ব নীল্লিকে উৎসর্গ করিয়া, চির-অপরাজিতা চেংটি, তার প্রথম পরাজয়ের এইরূপ প্রতিশোধ তুলিয়া লইল।"

জমিদারণী আপনার ইহ-জীবনের সকল বাক্যের এই শেষ পূর্ণচ্ছেদ দান করিয়া ঘুমাইয়া ফুরাইয়া গেল।

মাতৃহারা বালকের মতো—সদ্য-মাতৃহারা অনাথের মতো নীল্লি পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া দিদির বুকের উপর পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা কর্ম্মময় জীবন, সে যে নিজে বাঁচিয়াও রক্ষা করিতে পারিল না,—আর তাহাকে সে যে মাতৃ-হৃদয় ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিত, ইহাই সর্পাঘাতের মতো তাহার বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। তাহার উপর, যে কয়টি লহমা সে বাঁচিয়া ছিল, নীল্লিকে বাহুবেষ্টনে বুকে ধরিয়া যেন কত কথা কহিয়া গেল। নীল্লি যন্ত্রণা-পেষিত ক্রন্দনে হৃদয়-জ্বালা নিবারণের চেষ্টা পাইল। কিন্তু সান্ত্বনা কি আছে? নাই। তাহার সান্ত্বনা নাই রে!

অশ্রুপাত করিতে করিতে মিম্মা নীল্লিকে তুলিয়া কহিল, "আমাকে তুমি এই রাজ-দরবারে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করো,—নীল্লি!"

রাজা। সূচনায় এই রক্তপাত! মন্ত্রী, সাক্ষী থাকো।

মন্ত্রী। উষা ও সন্ধ্যা রক্তিমই হয় তো, দিন তবু চলিয়া যায়।

মন্ত্রী মংথোর দিকে চাহিয়া কহিল, "তাঁর চন্দন। তিনি ঘর্ষণ করিতেছেন, সুরভি মধুতে আমোদিত হইবার জন্য;—আমরা যেন তাহাতে ব্যর্থ বাধা প্রদান না করি।"

সকল প্রজাবৃন্দ যখন জানিল, ভোটান নৃপতি পিতৃব্যকে রাজ্যদান করিয়া জন্মশোধ চলিয়া যাইতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে তাহারা প্রতিবাদ করিল;—বৃথা। অশ্রুপাতে দৃঢ়তা এতটুকুও বিচলিত হইল না।

রাজা বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ডাকিলেন, "সন্ন্যাসী—প্রিয় বৎস, বংশমণি—স্নেহের দুলাল!"

রাজা আর বলিতে পারিলেন না।

মংথো, মিম্মা, সেনাপতি, সৈন্যশ্রেণী, প্রজা সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

নীল্লি সেখানে মিম্মার পাশে বসিয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। পাহাড় চাপা দিয়াও বিদীর্ণ হৃদয়ের আবেগোচ্ছলিত রক্তোৎসকে কিছুতেই সে দমন করিতে পারিতেছিল না। সারা কালের জন্য এ ক্ষতি কি তাহার সামান্য? পরমায়ুর প্রতি পর্দ্দায়, ভোগের প্রতি পরমাণুতে, মিলনের স্পন্দিত কিরণ-রঞ্জিত সেতুর উপর যখন চেংটির স্নেহ-স্নিগ্ধ-স্মৃতি-মাখা একখানি কালো ছায়া আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবেই, —সেই দুঃসহ পরমায়ুর অতৃপ্তি-উদ্দীপক ভোগে মিলনের শান্তিটুকু ছিপি-খোলা শিশির কর্পূরের মতো উবিয়া যাইবে; ভালোবাসার পরিণামে, চিরস্নেহের প্রতিদানে কী তীব্র অভিশাপ দিয়া গেল, তা'র উন্মাদিনী দিদি!

ছোট্ট মেঘখানির মতো লামা চলিল

পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে,—বুঝি, তাঁর করুণা-বর্ষণের জন্যই,—রস-পানের নিমিত্তই।

তন্দ্রাহীন মণিপদ্মা মূক নিয়তির মতো ঘুরিতেছেই, জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্রাগ্রগুলি উড়িতেছেই। নিজে খুঁজিয়া পথ বাহির করিয়াছে, আনন্দ কীর্ত্তনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া সেই পথে সে চলিল।

এক পাহাড় লোক পলক-হীন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল,—ঐসঞ্চালনে...ঐ স্পন্দনের প্রতি ধমনীতে গাঢ় সান্ত্বনা, বিমল প্রেমের পরিণতি, মিলন-মঙ্গলের উদ্ভাসিত দীপালোক পরিস্ফুট—গতির আবরণে স্থিতিকে সে রক্ষা করে, ভূতকাল হইতে ভাবীকে লীলায়িত করিয়া তুলে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়।

আর্য্যভট্ট

অঙ্কশাস্ত্রে প্রাচীন ভারত যে অনেক পরিমাণে জগতের শিক্ষাগুরু ছিল—এ কথা এখন অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত হইয়াছে। দশমিক ভগ্নাংশের (Decimal system) আবিষ্কার সর্ব্বসম্মতি অনুসারে ভারতে হইয়াছিল। সংখ্যালিখনের (system of numeration) পদ্ধতিও ভারতীয় আবিষ্কার। এই ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাগুলি আরবীয়গণ গ্রহণ করিলে পর তাহা ক্রমশঃ ইউরোপে গৃহীত হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশের সহিত প্রাচীন ভারত জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া গৌরব করিতে পারে। আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্যের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা শুধু ভারতের কেন, জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই কয়জন মহাপুরুষের অগ্রণী আর্য্যভট্টের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আর্য্যভট্ট বা আর্য্যভটের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তিনি ৩৬৭৭ কলাব্দে বা ৩৯৮ শকে (৪৭৬ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আর্য্যভটিয়" বা "আর্য্যভট্টতন্ত্র" রচনা করেন। তিনি গ্রীকদিগের নিকট অন্দুবেরিয়স বা অর্দুবেরিয়স এবং আরবীয়গণের নিকট অর্জভর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র (আধুনিক পাটনা) তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং এই স্থানেই তিনি "আর্য্যভটিয়" গ্রন্থ রচনা করেন।

"আর্য্যভটিয়" গ্রন্থ।

"আর্য্যভটিয়" গ্রন্থের পূর্ব্বকার জ্যোতিষ শাস্ত্র বড়ই অনিশ্চিত, সেইজন্য আর্য্যভট্টকে এক হিসাবে আধুনিক ভারতীয় জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্যাসসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষ গ্রন্থ সমূহে দেখা যায়, কিন্তু

তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রাচীন এবং আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন যে তিনি এই স্বায়ম্ভুব বা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ জানা যাইতেছে যে তিনি প্রাচীন গ্রীকগণের গ্রন্থ হইতে কোনও বিষয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অভিমতগুলি ভারতীয় এবং গ্রীক-সংস্রবশূন্য। এই গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত যথা,—গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কাল-ক্রিয়াপাদ এবং গোলপাদ। গণিতপাদে পাটীগণিত এবং বাকি তিন ভাগে জ্যোতিষ ও গোলগণিত আলোচিত হইয়াছে। (১)

পৃথিবী গোলাকার ও শূন্যে অবস্থিত।

পৃথিবীর আকারের স্বরূপ নির্ণয় করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই মানব মনকে উৎসাহিত করে। সাধারণের চক্ষে পৃথিবী সমতলক্ষেত্র কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ঋগ্বেদে কোনও কোনও সূক্তে পৃথিবীর গোলত্বের আভাস পাওয়া যায়, এমন কি পৃথিবী যে অবলম্বন শূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে তাহার সূচনাও ঋগ্বেদে মিলে। আর্য্যভট্ট অবশ্য পৃথিবীর গোলত্ব (Sphere) ও অবলম্বন শূন্য হইয়া আকাশে অবস্থিতি—এই দুইই স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি স্বীকার করিলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি বাস্তবিকই পৃথিবী নিরাবলম্বন, তবে বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, পাহাড় পর্ব্বত পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া আছে কিরূপে। তাহার উত্তরে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন যে, গোল কদম্ব পুষ্পের উপরের গ্রন্থিগুলি যেমন পুষ্পের উপর আটকাইয়া আছে, সেইরূপ গোল পৃথিবীর উপর জলজ স্থলজ পদার্থ অবস্থান করিতেছে।(২) বরাহ, ভাস্কর প্রভৃতি পরবর্ত্তী সকল জ্যোতিষীই পৃথিবীর গোলত্ব ও শূন্যে অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—পৃথিবী যদি শূন্যে অবস্থিত, তবে পড়িয়া যায় না কেন? তাঁহার সুন্দর উত্তর ভাস্কর দিয়াছেন "পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা পড়িবে কোথায়?"

পৃথিবীর আবর্ত্তন আবিষ্কার।

ভারতে আর্য্যভট্ট ভূভ্রমণের আবিষ্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে বেদেও ভূভ্রমণ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আর্য্যভট্টই উহার আবিষ্কারক বলিয়াই স্বীকৃত হন। আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ কেহই ভূভ্রমণ স্বীকার

---

(১) খৃষ্টপূর্ব্ব দুই তিন সহস্র বৎসরের ভারতীয় জ্যোতিষিক জ্ঞান সম্বন্ধে Brennand's Hindu Astronomy দেখুন।

(২) যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্ব্বসত্ত্বজলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ॥

করেন নাই! অতএব এরূপ মনে হয় যে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট একমাত্র ভূভ্রমণ আবিষ্কর্ত্তা ও পরিপোষক। গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ অতি প্রাচীনকালে একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার না করাতে উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পিথাগোরাস (৩) (খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী) সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করেন যে, পৃথিবী অচলা নহে সচলা। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে উহা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহার পর এরিষ্টারক্স (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং স্বীয় অক্ষের উপরেও ঘুরিতেছে বলিয়া দিবারাত্রি হইয়া থাকে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সকলেই অগ্রাহ্য করেন এবং এরিষ্টারকসের জন্মের প্রায় আঠার সাত বৎসর পরে সুবিখ্যাত জ্যোতিষী কোপার্ণিকাস পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের কাহিনী পুনরায় প্রচার করেন। আর্য্যভট্টের সময় গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য আর্য্যভট্টকে আমরা ভূভ্রমণবাদের একজন মৌলিক আবিষ্কারক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। আর্য্যভট্ট বলিতেছেন, "চল্লা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি" অর্থাৎ পৃথিবী স্থির বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা সচলা। তিনি আরও বলিতেছেন, "এক চতুর্যুগে (৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে) পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতিসম্ভূত ভগণ (rotation) ১৫৮২২৩৭৫০০ বার অর্থাৎ পৃথিবী ১৫৮৭২৩১৫০০ বার ঘুরিয়া আসিলে (অথবা অত দিনে) এক চতুর্যুগ বা ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আর্য্যভট্ট জানিতেন যে পৃথিবী একবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘুরিলে এক দিনমান হয় এবং এক চতুর্যুগে পৃথিবী অতবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘোরে। উপরোক্ত গণনায় পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা অনুমিত হয় না। উপরন্তু লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা আর্য্যভট্টের মত খণ্ডনকালে স্বীয় অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের উল্লেখ করেন

(৩) "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে" একজন লেখক লিখিয়াছেন (১৩১৮, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৬০) —"গ্রীসদেশবাসী পিথাগোরস প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত আর্য্যভট্টের মত ভারত হইতে নিয়া স্বদেশে প্রচার করেন।" বলা বাহুল্য পিথাগোরস আর্য্যভট্টের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "আর্য্যসিদ্ধান্তকারগণের মধ্যে আর্য্যভট্টই প্রথমে দিবারাত্র ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিয়াছিলেন। ইউরোপে শকের পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপর্ণিকস ভূভ্রমণবাদ যথোচিত প্রকাশ করেন। তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট সেই মত আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য কোপার্নিকাসের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পিথাগোরাস পৃথিবীর আবর্ত্তন আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এরিষ্টারকস পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের কথা জানিতেন। কোপার্নিকাসের সহিত আর্য্যভট্টের তুলনা চলে না। কোপার্নিকস শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জ্যোতিষের জন্ম দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্টের তুলনা পিথাগোরাসের সহিত চলে।

নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে পিথাগোরাসের মত আর্য্যভট্ট অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনের কথা জানিতেন, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ভ্রমণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না।

আর এক স্থলে আর্য্যভট্ট এই পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা বেশ সুন্দর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যেমন গতিশীল নৌকার আরোহী তীরস্থিত অচল বৃক্ষাদিকে উল্টাদিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ (পৃথিবীর গতির জন্য) স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা যায়।" (৪) নক্ষত্রবর্গের পশ্চিমদিকে গতি স্ফুটগতি (apparent motion), বস্তুতঃ পৃথিবীই পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে এবং সেই পরিভ্রমণের দরুণ নক্ষত্রবর্গকে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা যায়।

আরও কয়েকটি শ্লোকে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে লল্ল, শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লল্ল আর্য্যভট্টের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর সিদ্ধান্ত মানেন নাই। তিনি পৃথিবীর পরিভ্রমণের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে কতকগুলির নমুনা প্রদত্ত হইল :—

(ক) যদি পৃথিবীই ঘোরে তবে পক্ষীরা উড়িয়া গিয়া আবার নিজেদের বাসায় ফিরিয়া যাইবে কি প্রকারে?

(খ) পৃথিবী ঘুরিলে বাণ ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত না, কারণ বাণের পতনকালের মধ্যে পৃথিবী অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইবে।

(গ) পৃথিবী ঘুরিলে আমরা মেঘকে কখনও পূর্ব্বদিকে যাইতে দেখিতাম না।

(ঘ) যদি স্বীকার করি পৃথিবী আস্তে আস্তে চলিতেছে, তাহা হইলে আর্য্যভট্টের মতে উহা একদিনে একবার কিরূপে ঘুরিয়া আসে?

শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি সকলেই এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে যখন কোপর্নিকাস ভূভ্রমণবাদ পুনঃপ্রচারিত করেন তখনও এইরূপ যুক্তির দ্বারা তাঁহার মতও প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টাইকোব্রাহি ল্লের ন্যায় বুঝিতে পারেন নাই কেন ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত গোলাকে পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না। পাঠক দেখিতে পাইতেছেন এক কথায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। আশ্চর্য্য এই, পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও ঘুরিতেছে—এই একটা বিষয় কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই; করিলে এই সকল আপত্তি আদৌ উত্থাপিত হইতে পারিত না।

এই ভূভ্রমণবাদ ভিন্ন আর্য্যভট্ট আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক বিষয়ে মত

(৪) অনুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নক্ষত্রগণের দীপ্তির বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোলাকার পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ সূর্য্যের দ্বারা আলোকিত হয়; তাহাদের যে অর্দ্ধাংশ সূর্য্যের দিকে থাকে সেই অংশ দীপ্তি পায়, বাকি অর্দ্ধাংশ নিজের ছায়ায় অন্ধকারাবৃত। বৈদিক ঋষিগণও জানিতেন যে সূর্য্যতেজে চন্দ্র দীপ্তিশালী।

গ্রহগণের কক্ষ (orbit) সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে শনি (saturn), বৃহস্পতি (jupiter), মঙ্গল (mars) সূর্য্য, শুক্র (venus), বুধ (mercury) ও চন্দ্রের কক্ষা পর পর অবস্থিত ও সকলের অধোভাগে পৃথিবীর কক্ষা। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, আর্য্যভট্ট জানিতেন না যে, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগণ ঘুরিতেছে।

আর্য্যভট্ট গ্রহণের (eclipse) প্রকৃত কারণ জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বরাহ আর্য্যভট্টের কিছু পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গ্রহণের প্রকৃত আধুনিক কারণ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রহণ সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনাকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কেবল জ্যোতিষীই ছিলেন না, তিনি একজন প্রগাঢ় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত (Algebra) ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

সংখ্যানির্দ্দেশ (Notation)

আর্য্যভট্টের সময়ে ভারতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এই সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি সংখ্যাবাচক বর্ণ ভারতে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবীয় ব্যবসায়ীরা অষ্টম শতাব্দীতে এই ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আর্য্যভট্টের সময় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নাই. তিনি ক, খ, গ প্রভৃতি বর্ণমালা সংখ্যানির্দ্দেশকল্পে ব্যবহার করিতেন। এই বর্ণমালা ব্যবহার করিয়াও তিনি সহজে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আরবীয় অঙ্কশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বেন মুসা (৯০০ খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন এবং ক্রমশঃ অপর অপর আরবীয় বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা গ্রহণ করেন। প্রাচীন ইউরোপে I II III প্রভৃতি রোমীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা প্রথমে ব্যবহৃত হইত কিন্তু ১০০০ খৃষ্টাব্দে রিমস প্রদেশের আর্কবিশপ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্ম্মযাজক পারবার্ট এবং তাঁহার পরে রোমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার আরবীয়গণের নিকট হইতে হিন্দুদের সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া ইউরোপে প্রচলিত করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসার সুপ্রসিদ্ধ লিওনার্ডো তাঁহার গ্রন্থে প্রথম এই সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এখনও এই বর্ণমালাই জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত; পূর্ব্বেকার রোমীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা

কচিৎ বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমীয় বর্ণমালায় হিসাব রাখা বা অঙ্ককসা অপেক্ষা ভারতীয় বর্ণমালায় অঙ্ককসা সহজ বলিয়া উহা সর্ব্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা হইতে কিরূপে সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন আরবীয় ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল।(৫)

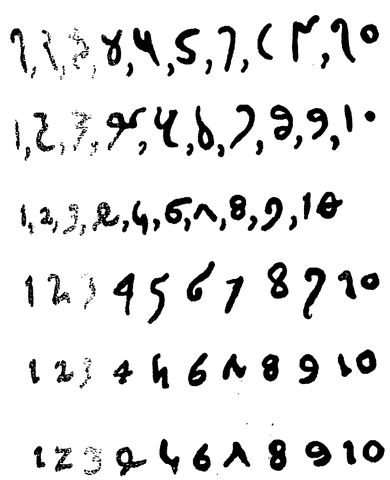

বীজগণিত (Algebra)

আর্য্যভট্ট প্রাচীন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বীজগণিতপ্রণেতা। তিনি অনেকগুলি বীজগণিত সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপে ডাইওফেন্টস বীজগণিতের প্রাচীন রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার আবির্ভাবকাল ঠিক জানা নাই—সম্ভবতঃ চতুর্থ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি এলেক্‌জেন্দ্রিয়াবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ অনেকদিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ৯৫০ খৃষ্টাব্দে ডাইওফেন্টাসের বীজগণিত আরবী-ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। ডাইওফেন্টাসের গ্রন্থ আর্য্যভট্টের সময় বা তাঁহার অনেক পর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং আর্য্যভট্টকে আমরা বীজগণিতের একজন মৌলিক আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কোলব্রুকপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আরবীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বোগ্দাদের আল মামুন, হারুণ আল রসিদ, আল মামুদ, এবং আল মতাদেদ এই চারিজন বাদসাহের আমলে প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া (৭৫৪ হইতে ৯০৪ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময়ে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষীগণের গ্রন্থও আরবী-ভাষায় অনূদিত এবং পঠিত হয়। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ আল মানসুরের সময় ভারতীয় জ্যোতিষীগণ বাদসাহের দরবারে আহূত হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষীগণের বীজগণিত সম্বন্ধে জ্ঞানও আরবীয়গণের নিকট পঁহুছে। সেই জন্য আরবীয় বীজগণিত ভারতীয় বীজগণিতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। ৯০০ খৃষ্টাব্দে বেন মুসা আরবীয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিত রচনা করেন। এই আরবীয় বীজগণিতবেত্তাগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পিসার লিওনার্ডো ১২০২ খৃষ্টাব্দে

(৫) এই তালিকাটি Ball's History of Mathematics গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বীজগণিতের বীজ ইউরোপে প্রেরিত করেন; সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ ক্রমশঃ ফলে ফুলে পরিণত হয়। যেমন সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালার জন্য পৃথিবী ভারতের নিকট ঋণী, সেইরূপ বীজগণিত সম্বন্ধেও ইউরোপ প্রাচীন আরবীয় বীজ-গণিতবেত্তাগণের মধ্য দিয়া ভারতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় বীজগণিতবেত্তাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুট্টকবিধির (Algebraic analysis) আবিষ্কর্ত্তা। তিনি বর্ণাত্মক সমীকরণ quadratic equation) জানিতেন এবং—

$$১+২+৩+৪+\cdots\cdots\cdots$$
$$১^২+২^২+৩^২+৪^২+\cdots\cdots\cdots$$
$$১^৩+২^৩+৩^৩+৪^৩+\cdots\cdots\cdots\cdots$$

এই তিন শ্রেণীর যোগফল কসিয়াছেন। তাহা ভিন্ন তিনি বীজগণিতের আরও অনেকগুলি সমীকরণের অঙ্কফল দিয়াছেন।

ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও আর্য্যভট্ট প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষীগণের অগ্রণী এবং প্রাচীন ইউরোপীয় ও আরবীয়গণের মধ্যে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ত্রিকোণমিতিতে তিনি অনেকগুলি কোণের (angle) জ্যায় (sine) একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিগুণিত কোণের অর্দ্ধ পূর্ণজ্যাকে (semichord of double the angle) জ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে বৃত্তপাদের (first quadrant of a circle) ৩৯ ডিগ্রি বা তাহার গুণিত কোণের জ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি ৯০ ডিগ্রির জ্যা ৩৪৩৮ বলিয়া স্থির করেন। এই গণনায়

তিনি $\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$ এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ৩·১৪১৬ ধরিয়া-ছিলেন, নহিলে এই অঙ্ক ঠিক হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই সংখ্যা ৩·১৪১৫৯ বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি পরিশ্রম-লাঘবমানসে ভূপরিধি গণনা কালে এই সংখ্যাকে ১০ বা ৩·১৬২৩ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ঠিক সংখ্যা যে ৩·১৪১৬ তাহাও যে তিনি জানিতেন তাহা উপরোক্ত অঙ্ক হইতে জানা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি অঙ্ক তিনি কসিয়াছিলেন। জ্যামিতি (Geometry) সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রমাণে ভুল আছে। বস্তুতঃ জ্যামিতির জ্ঞান প্রাচীন গ্রীসদেশে যেমন উন্নত ছিল, ভারতে সেরূপ ছিল না।

ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী। তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধে তাঁহাদের অগ্রণীর আবিষ্কার কাহিনীর কতক আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।



মুসলমান-প্রভাব-শূন্য হিন্দু মন্দির—এলাহাবাদ



সোমেশ্বর মন্দির—আরাইল
(এলাহাবাদের নিকটস্থ)

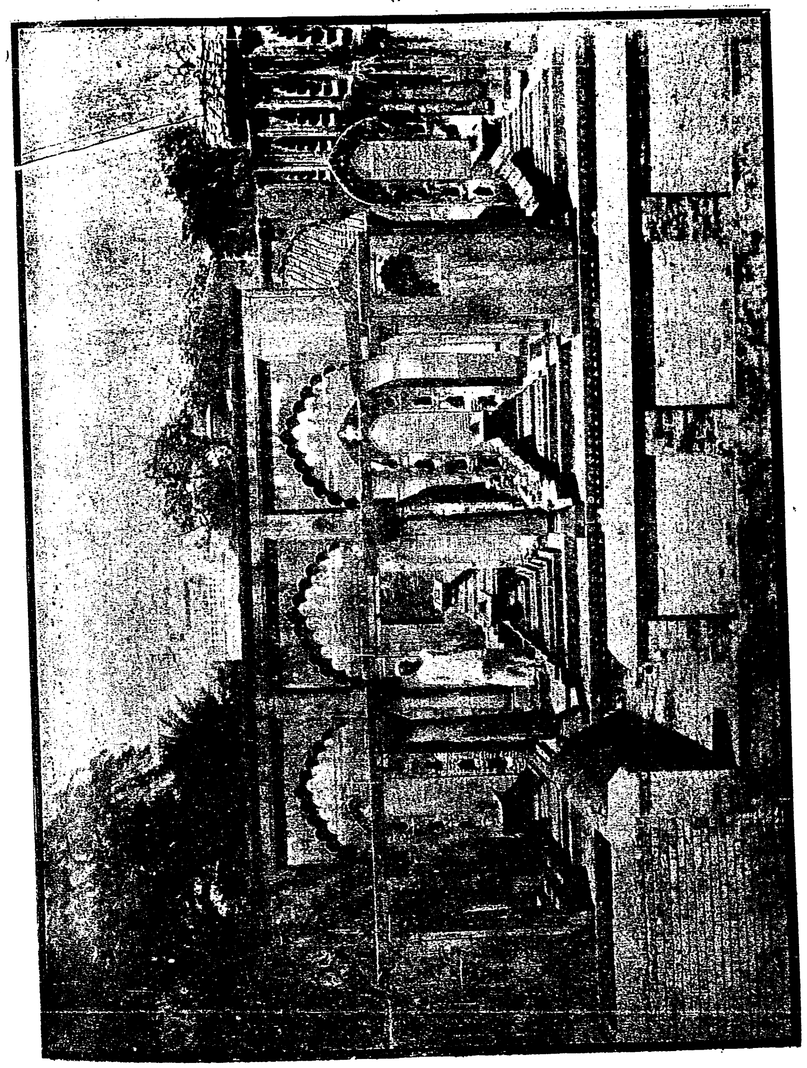

সা আজমের নিবাসস্থান—এলাহাবাদ

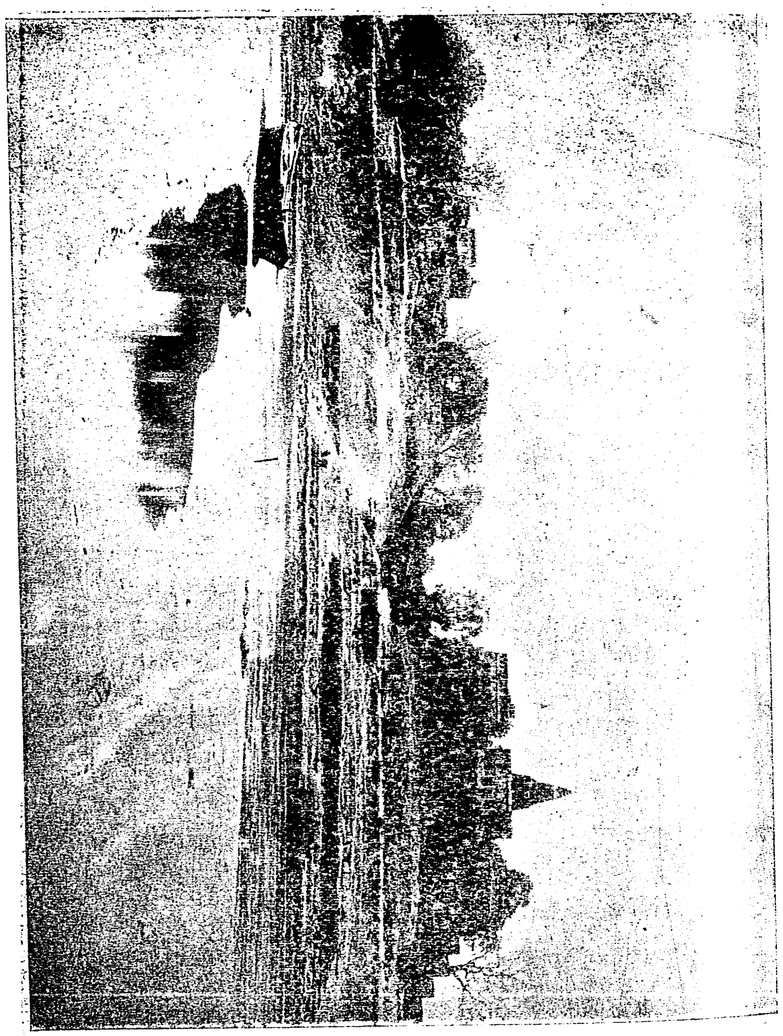

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যের একটি নিদর্শন

স্রোতের ফুল

(১৭)

বিপিন যখন মহিলাদের পাঠসভা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, নবকিশোরও তখন নিশ্চিন্ত ছিল না। সে মথুরাপুরে পিতার টোলটিকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলে মণ্ডলে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিতেছিল।

তাহার পিতার টোলের পুরাতন ছাত্র ছাড়াও তাহার বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া অনেক নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইতে লাগিল। তাহাদের কেহ ব্যাকরণ, কেহ স্মৃতি, কেহ বা বেদান্ত, এমনি এক-একটি মাত্র বিষয় পড়িবার সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে। নবকিশোর তাহাদিগকে বলিল—দেখ, আমার টোলে কেবলমাত্র একটি বিষয় কেউ শিখবে না। মানুষের জ্ঞান বহুমুখ না হলে তার চিন্তাশক্তি সজীব হয় না, সমস্ত জগৎব্যাপারের সঙ্গে তার যোগ হয় না। আমার টোলে প্রথমে নিজের মাতৃভাষা বাংলা খুব ভালো করে শিখে তার প্রধান প্রধান বইগুলি পড়ে ফেলতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেই অল্প গণিত, ভূগোল, জগতের এবং বিশেষ করে' ভারতের মোটামুটি ইতিহাস, স্থূল স্থূল বিজ্ঞানতত্ত্ব, এবং ইংরেজি ভাষাটাও শিখতে হবে। তার সঙ্গে প্রধান ভাবে শিখতে হবে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ। এই-সকল বিষয় মোটামুটি শেখা হলে ছাত্রের ইচ্ছামত সে ইংরেজিতে বা সংস্কৃতে বিশেষ বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারবে। যে সংস্কৃত জ্যোতিষ পড়তে চাইবে, তাকে সেই সঙ্গে ইংরেজি এষ্ট্রনমিও পড়তে হবে; ভারতীয় ষড়দর্শনের সঙ্গে য়ুরোপীয় দর্শনও আয়ত্ত করতে হবে; সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় একাধিক ভাষারও সাহিত্যের পরিচয় লাভ করতে হবে। এ যে না করবে সে আমার টোল থেকে উপাধি পাবে না।

অভিরাম নামক একজন ছাত্র বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া টিকি নাড়িয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হলে এ যে একেবারে স্কুল হবে। ম্লেচ্ছ রকমেই যদি শিখব তবে টোলে এলেম কেন?

নবকিশোর গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার টোল এই রকম ম্লেচ্ছ ধরণেরই হবে। যে-সব ছাত্র শিক্ষার জ্ঞানের জাতিবিচার করে তাদের জন্যে আমার এ টোল নয়। তারা স্বচ্ছন্দে বিদায় নিয়ে নিবারণ মুখুয্যের টোলে যেতে পারে।

ইহা শুনিয়া সকল ছাত্রই নীরব হইয়া রহিল। নবকিশোর বলিতে লাগিল—শিক্ষা শেষ করে প্রত্যেক ছাত্রকে আমায় গুরু-দক্ষিণা দিতে হবে, এবং সেজন্যে ভর্ত্তি হবার সময়েই একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

অভিরাম ভয়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, এ ত বড় কঠিন কথা! আপনার দাবি যদি

আমাদের সাধ্যাতীত হয় তবে ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত পাপে নিরয়গামী হবই, অধিকন্তু চাইকি আপনি চুক্তিভঙ্গের নালিশ করে জেল খাটিয়েও ছাড়তে পারেন।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ভয় নেই অভিরাম, আমি বেদ ঋষির মতন শুভশুক্লা রাণীর কানের কুণ্ডল চাইব না, আর তার জন্যে উতঙ্কের মতন তোমাদের নাগ-লোকে ছুটোছুটি করতেও হবে না; কিংবা বরতন্তুশিষ্য কৌৎসের মতো রঘুরাজারও শরণাপন্ন হতে হবে না। আমার প্রার্থনা যৎসামান্য। যাঁরা আমার টোল থেকে উপাধি নিয়ে বেরুবেন তাঁরা অন্তত তিন বৎসর আমার গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা দিয়ে যাবেন; সেই কয় বৎসরও তাঁরা ছাত্রাবস্থার মতন কেবলমাত্র খোরপোষ পাবেন। আর এক কথা বলে রাখি, আমার টোলে আমি বিবাহিত ছাত্র নেবো না; টোলে থাকতে থাকতে কেউ বিবাহ করতে পাবে না; কারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করাই আমাদের দেশের সনাতন নিয়ম।

এমন সময় নবান্দি মণ্ডল ও তাহার পুত্র আসমৎ আলি নবকিশোরের টোলের রকের নীচে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নবান্দি হরিবিহারী বাবুর একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা।

নবকিশোর তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—নবান্দি কাকা যে, এস এস। সঙ্গে আসমৎ বুঝি? ওকে ছোটবেলায় দেখেছি, এখন বড় হয়ে, চেনবার জো নেই। এস এস তোমরা ওপরে উঠে এস।

অভিরাম আপত্তির স্বরে বলিয়া উঠিল—এঁ! ওপরে আসবে কি?

নবকিশোর তাহার দিকে ফিরিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—কেন? আপত্তি কি?

অভিরাম টিকি আস্ফালন করিয়া বলিল—যবন নেড়ে টোলে উঠলে টোল অপবিত্র হবে না!

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—তা বটে। নবান্দি কাকারও আপত্তি হতে পারে তোমাদের মতন ম্লেচ্ছের সঙ্গে এক জায়গায় বসতে। তোমাদেরই শাস্ত্রে না বলে যে "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল-নানা-পথজুষাং নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বমসি পয়সাম্ অর্ণব ইব!" তোমাদেরই শাস্ত্রের না উপদেশ "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ! সর্ব্বত্রাভ্যাগতঃ গুরুঃ!" তোমরা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সুবিধামত কতক মানো কতক মানো না—অর্থাৎ কিনা নিজেরই প্রবৃত্তির বশেই চল, শাস্ত্র শুধু একটা আবরণ মাত্র। যদি তোমাদের শাস্ত্রের এ কথায় আস্থা না থাকে, তোমরা উঠে চলে যেতে পার।.....এস নবান্দি কাকা, নীচে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নবান্দি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—থাক্ বাবা, আমি এখানেই বেশ আছি.....

নবকিশোর নীচে নামিয়া গিয়া দুই হাতে দুইজনের দুই হাত ধরিয়া উপরে তুলিয়া লইয়া আসিল এবং এক রকম গায়ের জোরেই তাহাদিগকে ফরাশের উপর বসাইল।

অভিরাম প্রভৃতি বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া বসিল, কিন্তু কেহ উঠিয়া গেল না।

নবকিশোর তাহাদিগকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল—তারপর নবান্দি কাকা, তোমাদের সব ভালো ত? কি মনে করে আসা হয়েছে?

—আল্লার দোয়াতে সব খয়ের বাবা। আসছে বৎওারে আসমতের আর আমার নিকাহ্ সেটা রহমতের সাদি হবে। তাই হুজুরে এত্তেলা করতে এসেছিলাম।

নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—কাকা বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—মুলাকাৎ হয়েছে, হুজুরের হুকুমনামা পেয়েছি। ছোটবাবু কলকাত্তা থেকে এসেছেন দেখলাম, তিনি আমার গরিব-খানায় পায়ের ধূলো দেবেন কবুল করেছেন; তুমিও যদি মেহেরবানি করে একবার পায়ের ধূলো দাও ত বড় খুসি হব বাবা। রাত্রে নাচগান হবে, মুর্শিদাবাদ থেকে ভালো বাইজি আসবে।

নবকিশোর বলিল—মাপ কোরো নবান্দি কাকা। আমি ঠিক যেতাম, কিন্তু বাই-খেসটার নাচগান যেখানে হবে সেখানে ত আমি যাব না, বিপিনকেও যেতে দেবো না।

নবান্দি বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন, তাতে কি কিছু দোষ আছে?

নবকিশোর বলিয়া উঠিল—দোষ আবার নেই! ঢের দোষ! ওরা দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক, তাদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

আসমত বিনীত দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি একটা কথা বলব?

নবকিশোর বলিল—বল।

আসমত মাথা নীচু করিয়া ধীর স্বরে বলিল—আপনার বাড়ীতে একটা আলমারী টেবিল করবার দরকার হলে আপনি এমন মিস্ত্রী ডাকেন যে বেশ কাজ করতে পারে, তার চরিত্র কেমন সে খোঁজ করা দরকার মনে করেন না। সে রকম খোঁজ করে কাজ নিতে গেলে চলে না—যে তাঁতি আমাদের কাপড় বুনেছে, যে মুচি আমাদের জুতো বানিয়েছে, তাদের চরিত্র কেমন তাই কি আমরা দেখি, না তারা কেমন জিনিস বানিয়েছে তাই দেখি। যে বাইজি, সে কেমন নাচতে পারে গাইতে পারে তাই দেখা উচিত—সতী সাধ্বী যদি গাইতে নাচতে না জানে তবে এই হিসেবে তার ত কোনো মূল্য নেই। রবিবাবুর একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম, তিনি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছেন, মাতাল ইঞ্জিনিয়ারে হাবড়ার পুল বানিয়েছিল বলে কি আমরা হাবড়ার পুল দিয়ে হাঁটব না?

নবকিশোরের মুখ সন্তোষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আসমতের মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—তুমি ঠিক বলেছ, এ কথাটা আমি এমন করে ভেবে দেখিনি। কিন্তু আর একটা দিক দিয়ে তুমি বিচার করে দেখ। ঐ সব লোক ত সৃষ্টিছাড়া নয়, ওরা তোমার আমার পরিবারেরই মুখ হেঁট করে তবে না এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে। তাদের নাচ গানের পিছনে কত পরিবারের লজ্জা আর চোখের জলের ইতিহাস জমে রয়েছে। সেই তাদের নিয়ে আমোদ করা আমি নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা মনে করি।

আসমত আবার একবার মাথা তুলিয়া নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বিনীত ভাবে বলিল—নাচ গান মেয়েদেরই কাজ; আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার দোষে গৃহস্থ মেয়েরা ঐ আনন্দ দিতে পারে না; যারা সমাজেরই আনন্দের জন্যে ঐ ব্যবসা ধরে তাদের সমাজ নিন্দা করে, নিজেও লজ্জা আর দুঃখ পায়।

নবকিশোর আনন্দে উৎসাহিত হইয়া বলিল—ঠিক বলেছ তুমি। সেই সমাজের ভুল ব্যবস্থা বদল করবার জন্যেও আমাদের ঐ রকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। ধরে নাও এটা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ; তা হলেও ত এ ব্যাপারে যোগ দেওয়া উচিত নয়।

আসমত চুপ করিয়া রহিল। নবান্দি বলিল—আচ্ছা বাবা, তোমরা সন্ধ্যার সময় গিয়ে চলে এস। একবার গেলেও আমার দিলটা খুসি হবে।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই যাব।

নবান্দি পুত্রকে বলিল—দে দে, বাপ-জীকে একখান খত দে।

আসমত একখানি গোলাপী রঙের কাগজে সোনালি ছাপা নিমন্ত্রণপত্র দিল। নবকিশোর পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীহকনামজী ভরসা

করিম রহিম আল্লা খালেক গফ্‌ফার
দোন্ জাহানের বিচে মালেক সবার।
পহেলা তাঁহান নাম করিয়া ছজুদ,
দুএমেতে নবি-পরে ভেজিব দরুদ।
মহম্মদ মুস্তাফা যিনি হবিব আল্লার,
তাঁহার উপরে ভেজি দরুদ হাজার।
ছিএমেতে চার ইয়ারে কুর্নিস হাজার,
চাহারমে আমি বান্দা বড় গুনাহ্‌গার।
পরেতে আরজ এই সবার জোনাবে—
দুইটি কেবলার মেরা শুভ সাদি হবে।
২৫শে অঘ্রাণ, সন হাল, এৎওারে
নওসা দোন আসিবেন সাদি করি ফিরে।
সেই অছিলায় খোড়া তাআম গরিবানা
তৈয়ার করিব আমি ভাবিয়া রব্বানা।
এ খাতেরে আরজ ও উম্মেদ আমার
তারিখ মজকুর, ওয়থৎ শাম, এৎওার
মায় খেশ বেরাদর হামশবায় লইয়া
গরিবখানায় সবে পৌঁছিবেন আসিয়া।
মেহের নজরে তাআম তানাওল করে
সরফরাজ করাইবেন এই অধীনেরে।
কদমের ধূল যেন পাই সবাকার,
খিদমতে হইব রুজু খাহেশ আমার।
মজলিশ রওশন মেরা করিবেন আসিয়া
হসরৎ মিটিয়া যাবে দিদার দেখিয়া।
হীন শ্রীশেখ নবান্দি মণ্ডল অধীনের নাম,
মৌজা শীতলপুরে জানিবেন মেরা বাসধাম।
পত্রের দ্বারায় সকলেরে করিলাম এতাদা,
আসিতে গরীব বলে না হবে রঞ্জিদা।
এই তক্ হইল ইতি সকলে জানিবে।
আমি অধীনের কেহ খতা না ধরিবে।
আপনকার জানিবেন এই শুভ কাম,
দাওতের পত্র ইতি, বান্দারও সেলাম।

পত্র পড়িয়া নবকিশোর খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—নবান্দি কাকা, এ করেছ কি? এ না হয়েছে বাংলা, আর না হয়েছে উর্দ্দু! বাঙালীতে বাঙালীদেরই নেমন্তন্ন করছ, তখন এমন ভাষার বিশ্রী খিচুড়ি বানিয়েছ কেন?

নবান্দি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আমাদের এই রকম রেওয়াজ বাবা। ফার্সী লব্‌জ না থাকলে ভারি নিন্দে হয়।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—অদ্ভুত রীতি ত! বুঝতে পারি আর না পারি ফার্সী চাই! এ রকম রোগ শুধু তোমাদের নয়, আমাদেরও আছে—আমরাও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে নেমন্তন্ন করি।.....আচ্ছা আমরা সন্ধ্যে বেলা যাব।

নবান্দি উঠিতে উঠিতে বলিল—বাবা, শুনলাম, তুমি সব কি পাঠশালা করছ। যদি আসমৎকে একটা কাজ দাও.....

নবকিশোর বলিল—তা বেশ ত। তোমাদের শীতলপুরে, নবিনগরে পাঠশালা হবে; সেখানে বাড়ীতে থেকেই আসমৎ কাজ করতে পারবে। আসমত, তুমি কতদূর পড়েছিলে.....ফাষ্ট আর্টস পর্য্যন্ত পড়েছিলে না?

—আজ্ঞে! এগজামিনের আগে অসুখ হল বলে এগজামিন দেওয়া হয়নি।

—তুমি সংস্কৃত না ফার্সী পড়েছিলে!

—সংস্কৃত। বাড়ীতে ফার্সীও অল্প পড়েছি।

—তা বেশ। তুমি যদি কাজ নিতে রাজি থাক, তা হলে মাস তিনেক আমার কাছে এসে কি করে পাঠশালা চালাতে হবে সেটা শিখে নিতে হবে।

নবান্দি বলিল—সাদি হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দেবো বাবা। তুমি কোথাও ওর থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ো। ও নিজেই রেঁধে খেতে পারে।

নবকিশোর বলিল—কেন, আমাদের এই বাড়ীতেই থাকবে। আমাদের রান্না কি তোমরা খাও না?

—ভাত খাওয়াটা রেওয়াজ নেই.....

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের ছাত্রদের দিকে ফিরিয়া বলিল—শুনছ হে অভিরাম, তোমরা যেমন ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করে ওঁদের ছোঁয়া খাও না, ওঁরাও তেমনি ঘৃণা করে কাফেরের ছোঁয়া খান না। তোমরাই যে নাক সিঁটকে উঁচুতে বসে সকলকে দূর করে রেখেছ তা মনে কোরো না; তোমাদেরও ঘৃণা করে' দূরে ঠেলে রেখেছে দেশের বিদেশের সকলেই।.....আচ্ছা, আসমত একবেলা ভাত রেঁধে খাবে; একবেলা আমরা রুটি লুচি করে খাওয়াব। তাহলে হবে ত। কিন্তু এখানে মাংস টাংস খাওয়ার সুবিধা হবে না।

আসমত বলিল—আমি কখনো মাংস খাইনে।

নবকিশোর বলিল—তবে ত কোনো ল্যাঠাই নেই। আমি সব ঠিক করে দেবো।

নবান্দি বলিল—বহুত মেহেরবানি বাবা, তোমার বহুত মেহেরবানি। এখন তবে আসি বাবা।

—না, একটু বস কাকা, একটু জল খেয়ে যাও!—বলিয়া নবকিশোর বাড়ীর মধ্যে গিয়া মাকে বলিল—মা, নবান্দি মণ্ডল আর তার ছেলে আসমত এসেছে, কিছু জলখাবার দাও ত।

নবকিশোরের মা দুখানি পাতার টুক-রায় জলখাবার সাজাইতে লাগিলেন!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—মা, গোবরা মুখুয্যে এলে কিসে করে' জলখাবার দিতে?

গোবর্দ্ধন মুখুয্যে নিবারণের পুত্র; প্রসিদ্ধ দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মী।

নবকিশোরের মা পুত্রের কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন—হাজার হোক তবু সে বামুনের ছেলে, আর এরা মোছলমান।

—মা, নিবারণ যদি বামুন হয় ত এরাই বা বামুন নয় কেন?

—এরা সব যা-তা খায়……

—লোকে ত বলে শুনেছ, নিবারণ গোরাদের এঁটো খানা খেত। আর এরা মাংস খায় না। কে ভালো বামুন বল ত মা! একজন ভদ্রলোক তোমার বাড়ীতে এসেছেন, অতিথি, তুমি জাত বিচার করে তাঁকে যদি পাতা পেড়ে খেতে দাও ত তাঁকে অপমান করা হয় না?

নবকিশোরের পিতা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না বাবা, আমাদের দেশে রাজাকে পর্য্যন্ত পাতা পেড়ে খাবার দ্যায়; কম্বলের আসন পেতে রাজা ফকির দুজনকেই বসতে দ্যায়।

নবকিশোর বলিল—তা ঠিক, কিন্তু সে দশের সঙ্গে হলে। একলা এঁদের যদি এ রকম করে দি, এঁরা কি মনে করবেন না আমরা এঁদের একটু হীন মনে করছি?

নবকিশোরের মা হাসিয়া বলিলেন—নে থাম, তোর তর্ক রাখ। তোরা এখন আমাদের সেকেলে মতে ত চলবিনে। রেকাবি করেই খাবার দিচ্ছি। ওগুলো আলাদা থাকবে, তোর অতিথি সেবার জন্যে

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা এখন তাই হোক। পরে ক্রমে ক্রমে এ বাসনগুলো সব বাসনের সঙ্গে মিশে যাবে দেখতে পাবে।

নবকিশোর খাবার লইয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে গেল।

নবকিশোর মুসলমানকে আসন পাতিয়া থালা গেলাসে করিয়া জলখাবার খাইতে দিল, দেখিয়া টোলের ছাত্রদের ত চক্ষু স্থির। মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে করিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া উঠিয়া একে একে সকলেই প্রস্থান করিল।

নবান্দি ও আসমতকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে নবকিশোর বলিল—আসমত, তোমরা ত বাঙালী।

—আজ্ঞে বাঙালী বৈ কি।

—তবে অমন ইজের চাপকান পরে' মাথায় টুপি দিয়ে অবাঙালী হয়ে থাক কেন? ও পোষাকে সমস্ত মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যোগ হতে পারে, কিন্তু নিজের দেশবাসীর সঙ্গে ভেদ ঘটে। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চিহ্ন দিয়ে নেশনকে কেন দ্বিখণ্ডিত কর?

—আপনাদের হিন্দুরাও ত কম পার্থক্যের চিহ্ন ধারণ করেন না—শাক্তরা যে নামাবলী ব্যবহার করেন, বৈষ্ণবে তা করেন না; শাক্তের ফোঁটা, বৈষ্ণবের তিলক; শাক্তের রুদ্রাক্ষের মালা, বৈষ্ণবের তুলসীর মালা। এগুলো যদি নেশন গড়বার পক্ষে বাধা না হয়, আমাদের পোষাকটাই কি যত বৈষম্যের কারণ হবে?

—শুধু তোমাদের পোষাকে ত বৈষম্য নয়, তোমাদের চালচলন, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, সমস্ততে তোমরা দেশ থেকে স্বতন্ত্র। এ রকম হবে কেন? এমন কি তোমাদের নাম পর্য্যন্ত বাংলা নয়।

—তা বটে। কিন্তু আপনারা যেমন ঠাকুর-দেবতার নামে নাম রাখতে ভালবাসেন, আমরাও তেমনি ভালবাসি। আপনারা রাখেন হরিচরণ, কালীমোহন, রামলোচন, আর আমরা রাখি গোলাম-মহম্মদ, আবদুল-রসুল, আব্দুর্-রহমান্। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আরবীতে লেখা, আরবী কথা ব্যবহার না করে' আমাদের উপায় কি?

নবকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বেশ বেশ। তুমি আমার মনের মতন শিক্ষক হতে পারবে। তোমার সঙ্গে আমার খুব বোনে যাবে।

আসমত সেলাম করিয়া বলিল—আপনার অনুগ্রহ।

উহারা চলিয়া গেলে নবকিশোর ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল—মুরলী, এই থালা গেলাসগুলো নিয়ে যা।

মুরলী বলিল—এজ্ঞে আমি মোছল-মানের এঁটো ছোঁব না। আমার জাত যাবে।

নবকিশোর হাসিয়া নিজে সেই থালা গেলাস মাজিতে লইয়া গেল।

(১৮)

অভিরাম প্রভৃতি টোলের ছাত্রেরা মর্ম্মাহত হইয়া গিয়া নিবারণ মুখুয্যের শরণাপন্ন হইল। নিবারণ তাহাদের মুখে নবকিশোরের অনাচারের সংবাদ শুনিয়া কড়া তামাকে জোরে দম দিয়া কাশিতে কাশিতে মাথা নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কাশি সামলাইয়া করঞ্জার মতন চোখ দুটিতে ক্রূর হাসি জ্বালিয়া, একসঙ্গেই গলা হইতে সরু ও মোটা দুরকম স্বর বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—ও আমি জানতামই কিশরে ছোঁড়া এমনি বাড়াবাড়ি একদিন করবেই। তোমরা কি হরিবিহারীকে এ খবর জানিয়েছ?

—আজ্ঞে না। প্রথমে আপনার পরামর্শ না নিয়ে ত আমরা কিছু করতে পারিনে, তাই ছুটে আগে আপনার কাছেই এসেছি।

নিবারণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—ঠিক করেছ ভায়ারা, ঠিক করেছ। চুল পাকালাম তবু একটি দিনের তরে শাস্তর লঙ্ঘন করিনি। আমি যেমন নিজে শাস্তর মানি, তেমনি লোককেও মানাতে চাই বলে লোকে রাগ করে' আমার নামে কি না রটায়। তা থাকগে মরুকগে। এখন একবার হরি-বিহারীর কাছে চল—আমি যা করব তাই হবে, তবু সে গ্রামের জমিদার তাকে জানিয়ে কাজ করা ভালো।

অভিরাম জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যবস্থা করবেন দাদামশায়?

—কিশরে ছোঁড়ার মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাব, নয় ওদের জাতে ঠেলব। এর কি আর তৃতীয় পন্থা আছে হে ভাই! শাস্তর যে সব পথ মেরে রেখে দিয়েছে!…

নিবারণ একখানা ময়লা পুরাতন র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া খড়ম ছাড়িয়া একজোড়া চটি জুতা পায়ে দিল; চটি জোড়া শুকাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে, তাহার সম্মুখার্দ্ধ বাঁকিয়া ডিগবাজি খাইবার উপক্রমে

ছিল বলিয়া নিবারণের পায়ের আধখানা চটির বাহিরেই ঝুলিয়া রহিল। অগ্রে অগ্রে নিবারণ ও তাহার পশ্চাতে ছাত্রেরা হরিবিহারীর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল।

হরিবিহারী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে আলবোলার নল মুখে দিয়া ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া তামাক খাইতেছিলেন; বৃদ্ধ দেওয়ান পাশে বসিয়া জমিদারী খাতাপত্র দলিলদস্তাবেজ লইয়া হরিবিহারীকে শুনাইতেছিলেন, দস্তখত করাইতেছিলেন। নিবারণের চটির শব্দ পাইয়া চোখ একটু বিস্ফারিত করিয়া হরিবিহারী বলিলেন—এই যে খুড়ো, এস। এত চেলা চামুণ্ড নিয়ে কি মনে করে?

নিবারণ পরম হতাশভাবে ফরাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল—আরে বাপু, তোমরা ত দেখবে শুনবে না, কিন্তু তোমরা না রক্ষা করলে জাতধর্ম্ম ত আর থাকে না।

হরিবিহারী উৎসুক হইয়া বলিলেন—কেন, ব্যাপার কি?

—এইসব ভদ্রলোকের ছেলেরা গাঁ-অন্তর থেকে এসেছে, মনে করেছে কিশরে ছোঁড়া বুঝি দিগ্‌গজ পণ্ডিত। এখন এরা তার কাণ্ডকারখানা দেখে কেঁদে এসে পড়েছে, তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলতে যাবে?

—কিশোর? সে করেছে কি?

—বল্লে না পেত্যয় যাবে বাবাজী, সে টোলঘরে মোছলমানকে বাসনে করে খাইয়ে এদের দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের এঁটো খেয়েছে...

অভিরাম বাধা দিয়া বলিতে গেল—না এঁটো...

নিবারণ চোখ পাকাইয়া বলিল—আরে তুমি থাম না হে ছোকরা। তুমি কি সব গুছিয়ে বলতে পারবে, আমাকেই বলতে দাও...

হরিবিহারী আলবোলার নল ফেলিয়া বসিয়া বলিলেন—কি বলছিলে তুমি?

অভিরাম বলিল—এঁটো খেতে আমরা দেখিনি, তবে তিনি মোছলমানদের টোলের বিছানায় বসিয়ে তাদের বাসনে করে খেতে দিলেন দেখে আমরা চলে এসেছি...

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আরে নাও, তাই না হয় হল, ওকেই বলে এঁটো খাওয়া—ঐ থালা গেলাস ত আর ফেলে দেবে না, নিজেরা আবার ঐ বাসনে খাবে ত? চাই কি ঠাকুর দেবতা, গো ব্রাহ্মণ সবাইকে খাওয়াবে! রামঃ! রামঃ!

হরিবিহারী বলিলেন—কিশোরের এসব ত ভারি অন্যায়! তা আচ্ছা, আমি কিশোরকে ডেকে ধমকে দেবো 'খন, থালা গেলাসগুলো ফেলে দিলেই হবে।

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাপু, এ কি একটা কথা হল? এমন অনাচার যে করেছে তাকে উচিতমত শাস্তি দিতে হবে।

—কি করতে বল তুমি?

—ওদের একঘরে করতে হবে। তা যদি না কর তবে এ গাঁ থেকে আমাদের বাস তুলতে হবে, ম্লেচ্ছসংস্পর্শে শেষে কি নরকে পচে মরব? চোদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে যাব, তবু ধর্ম্ম ছাড়তে পারব না!

নিবারণকে চরম নিষ্পত্তি করিতে শুনিয়া ঝঞ্ঝাটভীরু হরিবিহারী হতাশভাবে তাকিয়ায় ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন—তবে যা ভালো বোঝো কর।

হরিবিহারীকে সহজে হাল ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু দেওয়ান বলিলেন—একবার স্মৃতিরত্ন-মশায়কে ডেকে এ কথা বলা উচিত। যদি কিশোর প্রায়শ্চিত্ত করে তা হলে ত আর কোনো গোল থাকবে না।

নিবারণ ভীত হইয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁঃ! রেখে দিন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। যে জেনে বুঝে ইচ্ছে করে' পাপ করে, তার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?

অভিরাম বলিল—আর তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতেও স্বীকার করবেন না। তিনি বলেন, প্রায়শ্চিত্ত মনের মধ্যে হয়, বাইরের অনুষ্ঠানে নয়। এসব অনাচার তিনি অন্যায় বলেই স্বীকার করেন না! এসম্বন্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করে এলে দিয়েছি...

দেওয়ান বলিলেন—কিশোর প্রায়শ্চিত্ত না করে যদি, স্মৃতিরত্ন মশায় পুত্রকে ত্যাগ করবেন। দোষ করেছে কিশোর, স্মৃতিরত্ন মশায়কে তবে একঘরে করা যাবে কি অপরাধে?

হরিবিহারী আশ্বস্ত হইয়া আবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—ঠিক বলেছেন দেওয়ানজী। তোমরা একজন কেউ গিয়ে স্মৃতিরত্ন মশায়কে ডেকে আনগে।

নিবারণের মন একেবারে দমিয়া গেল! স্মৃতিরত্ন ও নবকিশোরের উপর তাহার বিলক্ষণ ক্রোধ ছিল। ইহাঁরা নিবারণ-পুত্র গোবর্দ্ধনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না, ব্রাহ্মণ-ভোজনে তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও গোবর্দ্ধন যে-বাড়ীতে আছে সে-বাড়ীতে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন না। প্রকারান্তরে তাঁহারা নিবারণদের জাতে ঠেলিয়া একঘরে করিবার চেষ্টায় আছেন, ইহাই নিবারণের ধারণা। এখন তাহাদিগের শত্রুতার শোধ দিবার সুযোগ উপস্থিত, তাহাদিগকে একঘরে করিতে পারিলে তবে নিবারণের মনের খেদ যায়। কোথা হইতে বুড়া দেওয়ানটা জুটিয়া তাহার এমন পাকা চালের গুটি কাঁচাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া নিবারণ অত্যন্ত বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া হরিবিহারীকে বলিল—তা বাপু, ভটচায্যিকে ডাকতে হয় ডাক, কিন্তু ওদের সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না। অন্য লোক এমন অনাছিষ্টি অনাচার করলে আমি কিছুতেই একঘরে না করে ছাড়তাম না; কিন্তু তোমার পুরুত বলে যা রেয়াত করছি। তোমার পুরুত বলেই না ওদের এত বাড় বেড়েছে, এমন অহঙ্কার হয়েছে যে আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। মোছলমানের সঙ্গে খেতে পারেন অথচ বামুনের বাড়ী খেলে ওঁদের জাত যায়! ওরে আমার নিষ্ঠে রে! ওরা বাপ বেটায় ঘাট মানিয়ে আমার বাড়ীতে খাবে তবে আমি ছাড়ব, এ আমি তোমায় বলে রাখছি বাপু।

হরিবিহারীর মন বিষাক্ত করিবার জন্য নিবারণ অনর্গল গরল উদ্গিরণ করিয়া যাইতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরে প্রবেশ

করিয়া তাহার কথা বন্ধ করিয়া বলিলেন —হরি, আমায় ডেকেছ কেন ভাই ?

—আজ্ঞে বসুন, বলছি।

ভট্টাচার্য্য বসিলে হরিবিহারী অপ্রতিভ ভাবে মাথা নত করিয়া বলিলেন—এঁরা বলছেন কিশোর নাকি মোছলমানকে টোলে তুলে—

—হ্যাঁ, এঁরা যা বলছেন তা সত্যি।

—এখন কর্ত্তব্য ?

—এর আবার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি ?

—মোছলমানের সঙ্গে খেলে·····

—মোছলমানের সঙ্গে খায়নি। আর যদি খেয়েই থাকে তাতেই বা কি ?

—ম্লেচ্ছসংস্পর্শে ধর্ম্মহানি হল না ?

—ম্লেচ্ছ তারা যারা অপরিষ্কার নোংরা, কুৎসিত-চরিত্র, কুৎসিত কর্ম্মে লিপ্ত—তা তারা যে ধর্ম্মই স্বীকার করুক আর যে আচারই পালন করুক বা যে কুলেই জন্মাক। কোনো বাস্তবিক ভদ্রলোক ম্লেচ্ছ হতে পারে না·····

নিবারণ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা বলে যবন গোরুখোরের ছোঁয়া খেতে হবে ?

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—মুসলমানের ছোঁয়া খাননি কে ? হরিবিহারী সোডা লেমনেড বরফ খান। মুখুয্যে মশায়ও অস্বীকার করতে পারবেন না বোধহয়।

নিবারণ বলিল—সোডা লেমনেড বোতলের মধ্যে থাকে, সেটা পরোক্ষ ছোঁয়া, বরফ ত জলবিকার। প্রত্যক্ষ ছোঁয়ায় দোষ —গোরুখোরের সদ্য ছোঁয়া !

ভট্টচার্য্য বলিলেন—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা গোরু খেতেন তার প্রমাণ আছে; আজকাল আধ-জানা আধ-লুকানো রকমে হোটেলে খান এমন লোকের সঙ্গে আপনাদের আহার ব্যবহার চলে। আপনারা নিজেরা পাঁঠা ভেড়া হরিণ খান। শিং-ওলা এক রকম চতুষ্পদ যদি খেতে পারি ত অপর রকম খেতে পারব না কেন তার কারণ ত যুক্তিতে খুঁজে পাইনে: এ-সমস্ত শুধু সংস্কার আর রুচির কথা; আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না, অপরের হয়, তার জন্যে অপরকে ঘৃণা করব ?

নিবারণ বলিয়া উঠিল—শাস্ত্রের শাসন!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—শাস্ত্রের অনন্ত বিধি কি আপনারা মেনে চলেন ? শাস্ত্রে ত বিধি আছে শজারু, বনবরা, গোসাপ খাবে। খেতে পারেন ? আপনারা স্বচ্ছন্দে মাছ খান, মনে কোনো দ্বিধা বোধ করেন না; এজন্যে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা বাঙালীদের মাছ-খাউয়া বলিয়া ঘৃণা করে। আপনারা যেমন একজনের একটা অভ্যাস দেখে ঘৃণা করেন, অপরে আপনাদের একটা অভ্যাস দেখে ঘৃণা করে। এ-সমস্ত পরস্পরের সংস্কারের কথা। সংস্কার প্রায়ই যুক্তি-বহির্ভূত অভ্যাস মাত্র।

নিবারণ মাথা নাড়িয়া বলিল—সে যাই বলুন, আমাদের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কিশোর ভয়ানক অন্যায় করেছে।

—তা করেছে স্বীকার করি। সে জন্যে আপনারা কি ব্যবস্থা করতে চান।

—কিশোরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কিন্তু কিশোরকে প্রায়শ্চিত্ত করাবার আগে যাঁরা ব্যবস্থা দেবেন তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত

করে শুচি হলে তবে কিশোর প্রায়শ্চিত্ত করবে।

নিবারণ এ কথা কানে না তুলিয়া বলিল—যদি কিশোর প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে আপনাকে ত্যাগ করতে হবে তাকে।

—আমার কাছে ত সে কোনো অপরাধ করেনি। তবে আমি তাকে ত্যাগ করব কেন ?

—তবে বাধ্য হয়ে আমরা আপনাদের ত্যাগ করব।

—ইচ্ছে হয় করতে পারেন।—বলিয়া ভট্টাচার্য্য উঠিলেন। দ্বারের কাছে গিয়া বলিলেন—হরি, তাহলে আজকের লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আরতির জন্যে অন্য কিছু ব্যবস্থা কোরো।

হরিবিহারী বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—ভটচায্যি দা, এ কথাটা কি ভালো হল। একটু ভেবে দেখ।

—কি করব ভাই। আধাআধি রফা করা ত আমাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

অভিরাম প্রভৃতি ছাত্রগণ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা নবকিশোরের দোষের মাত্রা জোরালো প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিল—অধ্যাপক মশায় নিজে জাত মানেন না, আমরা মানি বলে তিরস্কার করেন, মূর্খ চিন্তাশক্তিহীন বলে গালাগালি দেন।

ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যার যা বিশ্বাস সে চায় তার ছাত্রদেরও সেইরূপ বিশ্বাস হোক। তোমাদের আপত্তি থাকে ওর মত গ্রহণ কোরো না, পার ওর মত খণ্ডন কোরো, ইচ্ছে হয় টোল ছেড়ে চলে যেতেও ত পার.....শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও যারা শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, বেদাঙ্গ তাদের কি বলেছেন জান ?—স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্ অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্—যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অথচ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে না সে কাঠের কুঁদো বা ভারবাহী গর্দ্দভের সমান.....এত শাস্ত্র পড়েও তোমরা যে এমন মূর্খ আছ তা আমি জানতাম না।···

নিবারণ পরম বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা যাই বলুন, আপনার কথা আমাদের মনে নিচ্ছে না। আপনারা শাস্ত্র পড়েছেন, দুটো বচন আওড়ে যা-তা একটা বুঝিয়ে দিলেই যে আমরা বুঝব তা আপনি মনে করবেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—না, এতখানি বুদ্ধিমান বলে আমি আপনাদের কখনো মনে করি না। আপনি হলেন সাক্ষাৎ নিবারণ—যা সত্য, যা মঙ্গল, তা আপনি নিবারণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকেন জানি। কেবল নিজের গোবরাটির বেলায় আপনি আর নিবারণ থাকেন না, তখন হন নিপাতন—নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে তখন আর বাধে না।

এই কথা শুনিয়া টোলের ছাত্রেরা আর হাসি রাখিতে পারিল না।

তাহাদিগকে হাসিতে দেখিয়া নিবারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—তা হলে আপনাদের একঘরে করলাম।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—যারা নিজেরাই একঘরে হয়ে আছে তাদের

আবার নতুন করে' একঘরে করে কার সাধ্য! আপনি আমাদের একঘরে করে' খুব একটা অপমান কি অপদস্থ করলেন মনে করে অহঙ্কার বোধ করবেন না। আজকাল দেখছি একঘরে তাঁরাই যাঁরা ধর্ম্ম বা সমাজের ভালোর জন্যে নূতন কিছু সংস্কার করতে চান; যাঁরা জগতের গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে অগ্রগামী নেতা; যাঁরা জাতীয় জড়তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন। অনেক সময় একঘরে হওয়ার মানে মূর্খতা বা অধর্ম্ম নয়; তার অর্থ সাহস, উৎসাহ, স্বার্থত্যাগ! ইচ্ছে হলে আপনারা স্বচ্ছন্দে আমাদের একঘরে করতে পারেন।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় দৃপ্তপদক্ষেপে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঘরের সকলে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে হরিবিহারী চিন্তিত ভাবে বলিলেন—তাইত! এখন লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের পূজো করাই কাকে দিয়ে?

নিবারণ উৎসাহিত হইয়া বলিল—ভাবনা কি বাপু! আমি রয়েছি! গোবর্দ্ধন আছে! যে হয় একজন এসে পূজো করে দেবো।

নিবারণ ও ছাত্রগণ যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। হরিবিহারী ঠাকুরের যা-হোক-একটা কিনারা করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তন্দ্রা-তীরে

নগরের কোলাহল ক্ষীণ হয়ে আসে ধীরে
থেমে যায় কল উতরোল,
নিখিল চেতনাখানি তন্দ্রা-সাগরের তীরে,
অচেতন ধরণীর কোল।
সমুখে অপার সিন্ধু নিবিড় তিমির ঢাকা
অনাহত, মরণ-অলস,
হেসে আসে থেকে থেকে সৈকতে অমিয়মাখা
সমীরণ শীতল পরশ।
হে চির রহস্য সিন্ধু! হে অনাদি রত্নাকর!
কবে সেই খেলিবার ছলে
আমারে ফেলিয়া গেলে চেতনা সৈকত পর
রেখে গেলে আলোকের তলে।
সেই হতে চিরদিন তোমার নিভৃত নীরে
লুকাইতে যাই সুখ দুঃখ,
কখন্ রাখিয়া যাও তুলি' জাগরণ তীরে
বুঝিতে পারি না একটুক্।
আরো কতকাল তব সুশীতল ছায়াতলে
করিব নীরব আনাগোনা,
বুকে কি লবে না টেনে পুনঃ খেলিবার ছলে,
হবে না কি চির জানাশোনা?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সভ্যতা

এইরূপ মনে হইতে পারে, এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে যখন এতটা বৈসাদৃশ্য, তখন উহাদের পার্থক্য আরও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র এসিয়া, য়ুরোপের প্রভাবে রূপান্তরিত হইল।

কিরূপে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহা অনুসন্ধান করা যাউক।

*
* *

কুলপরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ, ঐতিহ্যের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্র—এই সকল জরাজীর্ণ উপাদান এসিয়িক সভ্যতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কোন সভ্যতার চরম-গতি এবং সেই সভ্যতার অধিকারী লোকদিগের দশা ঠিক্ এক নহে। কোন এক সভ্যতা—একটি সমষ্টিবিশেষ; জীবন্ত ব্যক্তিদিগের সহিত, পুরাকালীন লোকদিগের রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, ও সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ, জীবজন্তু, দেশ, আব্-হাওয়া—সমস্তই ঐ সভ্যতার অন্তর্ভূত। সভ্যতাপ্রবর্ত্তক কোন জাতির অবনতি সত্ত্বেও, সেই জাতির প্রবর্ত্তিত সভ্যতা টিঁকিয়া আছে ও সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে অনেক সময় দেখা যায়। অন্য জাতি আসিয়া সেই অবনতিগ্রস্ত জাতিদিগের স্থান অধিকার করে। এই প্রকারে, আধুনিক য়ুরোপের নব্য জাতিরা, প্রাচীন কালের জাতিদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোন সভ্যতা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ যে জাতির দ্বারা ঐ সভ্যতা গঠিত হইয়াছিল, সেই জাতির তরুণ-ভাব বিনষ্ট হয় নাই। সেই জাতি জীবন-উদ্যমে পূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল জাতি নূতন রীতিনীতি ও মতবিশ্বাস অসঙ্কোচে গ্রহণ করে; তাহার দৃষ্টান্ত:—সীজারের শাসনাধীনে গলেরা, অষ্টাদশ শতাব্দীর রুষেরা, ১৮৬৯ হইতে জাপানীরা; এবং এই জাপানীদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য এসিয়িক জাতিও, অনিষ্টজনক প্রাচীন প্রথা সকল পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিবে।

উক্ত জরাজীর্ণ উপাদানগুলির সঙ্গে, এসিয়িক সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি ফল-প্রসূ উপাদানও আছে। কিন্তু উহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি নূতন অবস্থা ও ঘটনার সংযোগ আবশ্যক।

প্রকৃত এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতার আবির্ভাব ব্যতীত, ভারতের, জাপানের ও চীনের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কখনই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে না। ইংলণ্ডের অনুকরণ সত্ত্বেও, জাপানের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী, স্বকীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানাদিরই কার্য্যকারণঘটিত পরিণতি। আমাদেরও শাসনতন্ত্র, ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের অনুকরণ হইলেও আমাদের "Etats Generaux" "এটা জেনেরো"ই রহিয়া গিয়াছে।

সুগভীর প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, ষোড়শ শতাব্দীতে, এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সমাজের ক্রমবিকাশ সমান্তরালরেখা ধরিয়া চলিয়াছিল; ঐ সময় হইতে, অতীব দুর্ব্বলভাবে গঠিত এসিয়িক সভ্যতা, সমাজ-দেহের বিকাশ যে নিয়মে সচরাচর সংসাধিত হইয়া থাকে, সে নিয়মের অনুসরণ করিতে পারে নাই। তাই, য়ুরোপের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। ফলতঃ য়ুরোপীয় সভ্যতা, এসিয়িক সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নহে, কেবল ঐ সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এইমাত্র। য়ুরোপের যতটা উন্নতি হইয়াছে, সেই পরিমাণ উন্নতি সাধন করিবার জন্য এসিয়িক সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে সকল বাধা আছে, কেবল সেই সকল বাধা অপসারিত করাই আবশ্যক। এই সকল বাধা ঘটিবার একটিমাত্র কারণ—এসিয়িক জাতিদিগের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। পাশ্চাত্য জাতিদিগের অপেক্ষা এই সকল জাতি যে বিলম্বে অগ্রসর হইতেছে, পরস্পরের সাহায্যের অভাবই তাহার হেতু। এতদিন ধরিয়া যে সাহায্য পায় নাই, সেই সাহায্য ঊনবিংশতি শতাব্দীতে তাহারা প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইল! যে য়ুরোপ, সভ্যতার প্রাথমিক মূলসূত্রগুলির জন্য এসিয়ার নিকট ঋণী, সেই য়ুরোপ আবার একটি পরিপুষ্ট সভ্যতা এসিয়ার হস্তে আনিয়া দিল। এই আদান প্রদান হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ যেমন এক, মানব-সভ্যতা বস্তুটিও সেইরূপ এক।

ইতিপূর্ব্বে দীর্ঘকাল হইতে এসিয়া য়ুরোপের প্রভাবাধীন ছিল। এসিয়ার প্রভু ছিল মুসলমান, কিন্তু ভ্রমণকারী ও ঔপনিবেশিক ছিল য়ুরোপীয়। সেই য়ুরোপীয়দিগের প্রদত্ত শিক্ষা তাহারা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল;—এই শিক্ষার দরুণ তাহাদের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই। ভারতে, হিন্দস্থানে, চীনে, জাপানে কতকগুলি খৃষ্টান-মণ্ডলী ছিল। বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য চীনীয়েরা ফরাসী জেসুইট্‌দিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। জাপানীরাও ওলন্দাজ প্রটেষ্টান্‌টদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আসিয়াছিল। ভারতীয় প্রকৃতির ক্রমবিকাশ সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যদিও গীতগোবিন্দের গ্রন্থকার য়ুরোপ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন, এমন কি, য়ুরোপের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না, কিন্তু মুসলমান কবি, মুসলমান লেখকগণ যে ভাষায় কথা কহিতেন, সে ভাষা আমাদের পরিচিত বলিয়া মনে হয়:—খৃষ্টের নাম, হিব্রু প্রফেটদিগের নাম, প্লেটো আরিষ্টটল, আলেকজান্দর ও সীজারের নাম তাঁহাদের লেখনীমুখে পুনঃপুনঃ বাহির হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিজ্ঞানই আমাদের বিজ্ঞান, তাঁহাদের দর্শনই আমাদের দর্শন। কেবল ইস্‌লামই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে মিলন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই কার্য্য সাধন করিতে ৮ শতাব্দী লাগিয়াছিল। রামানুজ, কবীর ও নানকের আবির্ভাব না হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বড় একজন ধর্ম্মসংস্কারক

স্বামীনারায়ণ তাঁহার উপদেশগুলি ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। তিনি ইস্‌লামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের কাছাকাছি গিয়াছিলেন। আবার স্বামীনারায়ণের আবির্ভাব না হইলে, রামমোহন রায়, মুসলমানদিগের একেশ্বরবাদের উপর, খৃষ্টধর্ম্মের ধর্ম্মনীতির উপর, য়ুরোপীয় দর্শনাদির মূলতত্ত্বের উপর স্বকীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। পরন্তু রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্য্যন্ত যে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল তাহা এত স্বাভাবিক যে য়ুরোপীয় দিগ্‌বিজয় না হইলেও, রামমোহন রায়ের মতবাদটি অনিবার্য্যরূপে আবির্ভূত হইত। সেই চিন্তার উন্নতি এরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত যে, ভারতবর্ষীয়দিগের চিত্তক্ষেত্রে যে তত্ত্ববীজ প্রথম অর্পিত হইয়াছিল, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের বিনা সাহায্যেও তাহা হইতে সমস্ত ফল উৎপন্ন হইত।

য়ুরোপের প্রভাব যে ধীরে ধীরে এসিয়ার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কারণ, এসিয়ার অবনতি সত্ত্বেও এসিয়ার ক্রমবিকাশ, য়ুরোপীয় ক্রমবিকাশের সহিত সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, য়ুরোপীয় চিন্তার গতি রূপান্তরিত হইল। পদ্যের স্থান অধিকার করিল—গদ্য, অগ্নিময় ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান অধিকার করিল,—সুব্যবস্থিত ক্লাসিক রচনা সকল, কল্পনা ও ভাবোন্মত্ততার স্থান অধিকার করিল যুক্তিপ্রধান দর্শন। এইরূপ এসিয়িক চিন্তার গতিও রূপান্তরিত হইল। চীনদেশে, y'angদিগের যুগে পদ্য, পরে Sung দিগের শাসনকালে, শব্দাড়ম্বরযুক্ত ও সুরঞ্জিত গদ্য, মোগলদিগের আমলে আবেগময় নাটক, Mings'দিগের শাসনকালে বণিকপ্রভৃতি সাধারণ লোকদিগের সম্বন্ধে আখ্যায়িকা এবং বিশ্বকোষ-ধরণের বৃহৎকায় গ্রন্থ সকল উৎপন্ন হইল। আবার জাপানে, Ashikaga দিগের আমলের গীতিনাট্য ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উপদেশগ্রন্থাদির মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য আরও বেশী লক্ষিত হয়। চীন ও জাপান উভয় দেশেই নাস্তিকদর্শনের প্রাদুর্ভাব। ভারতেও এইরূপ একটা আন্দোলন লক্ষিত হয়,—তবে প্রভেদ এই, ভারতবাসীদিগের কেজো বুদ্ধি নাই, নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ দৃষ্টি নাই এবং ouralo-altaic জাতি-সুলভ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঔদাসীন্য নাই। স্বকীয় প্রাচীন পৌত্তলিকতা মূলক বিশ্বব্রহ্মবাদের স্থানে ভারত একেশ্বরবাদ স্থাপন করিল। অবিরাম সংঘটিত অলৌকিক কাণ্ডের ধারণাটা অপসারিত করিয়া, সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে স্পষ্টরূপে পৃথক করিয়া, একেশ্বরবাদ,—প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলন সম্বন্ধে, নির্দ্দিষ্ট সাধারণ জাগতিক নিয়মের সম্বন্ধে, মানব-চেষ্টার ক্রমোন্নতির সম্বন্ধে, অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত লোকদিগের সন্দেহবাদ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, ভারতবাসীরা নিজেই একেশ্বরবাদের অবনতি ও নিষ্ফলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সমস্ত এসিয়ায়, এই যুক্তিবাদঘটিত আন্দোলনের অনুরূপ একটা গণতন্ত্রঘটিত আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল। এই

আন্দোলন, জাপানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এরূপ সম্পূর্ণ বিপ্লব জাপানের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। চীনদেশে, প্রবল গুপ্তসভাসমূহ গঠিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ সেই সকল গুপ্তসভা কর্ত্তৃক উদ্দীপিত হয়। ভারতে, বৈষ্ণব ধর্ম্মসংস্কারেরা বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিল। অধিবাসী লোকের পঞ্চাংশ ছিল সাম্যবাদী মুসলমান। রাষ্ট্র-নৈতিক মিলনসঙ্ঘসমূহের (confederacy) মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিখ ও মারাঠাদিগের যে মিলনসঙ্ঘ তাহা গণতন্ত্রিক মিলনসঙ্ঘ।

পরিশেষে বক্তব্য, সমস্ত এসিয়ার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রবণতা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

তত্ত্বতঃ—চীনে ও জাপানে Wang shao Jenএর দর্শনপদ্ধতি, ভারতে যোগবাদী-দিগের মতবাদ।

কার্য্যতঃ—শিথিল রীতিনীতি, ছেলেদের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব, সন্তানের প্রতি পিতাদিগের প্রশ্রয়দান—যাহা উহাদের নাটক ও আখ্যায়িকাদিতে প্রায়ই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, আরও কিছুকাল পরে, সামুরাই জাপানী-দিগের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব সাধনের দিকে প্রবণতা। ভারতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার সুযোগে,—ভাগ্যান্বেষণকারী-দিগের ধৃষ্টতা ও সফলতা।

*
* *

তাই বলিতেছি, বাহ্যতঃ বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও, য়ুরোপীয় সভ্যতার নিকটবর্ত্তী হইবার দিকে এসিয়িক সভ্যতার প্রবণতা লক্ষিত হয়। কিন্তু অন্যথা য়ুরোপের উদ্যম চেষ্টা খুব বেশী ছিল। ভারতে, হিন্দো-চীনে, চীনে ও জাপানে, য়ুরোপ,—বাণিজ্যের কুঠী ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, অতীব দরিদ্র, অতীব লোকাকীর্ণ, অতীব বিভক্ত এসিয়া ও য়ুরোপ, তাহাদের নিজ নিজ প্রভাব-পরিসর বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে, এসিয়া ও য়ুরোপ উভয়ই যুগপৎ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে সমান, ঐ দুই সভ্যতা আসলে অসমানরূপে সমুন্নত হইয়া-ছিল। জীবন-সংগ্রামের নূতন অবস্থা ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া শিক্ষানবীশী করিয়া য়ুরোপ ধনঐশ্বর্য্যে ও শক্তিসামর্থ্যে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করিল। পক্ষান্তরে এসিয়া তেমন প্রস্তুত না থাকায়, দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; এবং এই দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ এসিয়া, য়ুরোপের উদ্যম চেষ্টার প্রবল স্রোতের মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। ইহা হইতেই য়ুরোপের অবিরাম উন্নতি ও সুনিশ্চিন্ত বিজয়লাভ।

উপনিবেশের বিস্তার হওয়ায়, এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, অসংখ্য য়ুরোপীয় আসিয়া আড্ডা গাড়িল। তাহাদের সভ্যতার জটিলতাই তাহাদের স্বভাবকে সুনম্য করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা সহজেই সেই সব দেশের প্রকৃতির সহিত আপনাদিগকে বনি-বনাও করিয়া লইল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই

এসিয়িকদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া মেলা-মেশার চেষ্টা করিতে লাগিল—এমন কি তাহাদের নকল পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। ম্যাকাও দেশে, সিংহলে, গোয়ায়, পোর্টুগিজেরা দেশীয় লোকদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং তাই তাহাদের বংশধর-দিগের মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ পরিলক্ষিত হয়; জাভার জর্ম্মান ও ওলন্দাজেরাও এইরূপ।

ভ্রমণকারীরা প্রাচ্য দেশসমূহের যেরূপ কল্পনা-রঞ্জিত বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহাতে য়ুরোপীয়দিগের কৌতূহল ও ভাবোন্মত্ততা জাগিয়া উঠিল। এসিয়িক জাতিদিগের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ হইল। ভল্‌টেয়ার ও সেটাস্‌ট্রাস্‌ উভয়ই "চীনের অনাথ" রচনা করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীনের মৃৎ-পাত্রসকল ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে "টুকি-টাকি" দ্রব্য সকল সংগৃহীত হইল। বাস্তবিক্যাও কতকগুলি চীনীয় আকার গঠনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। তাহার দৃষ্টান্ত,—Pilnitz এর ywenger ও প্রাসাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যও প্রাচ্যখণ্ডের বর্ণনায় প্রীতি লাভ করিতে লাগিল; গন্তে, বায়রণ, মুর, ভিক্টর, হুগো, লামারটিন্‌, রুখেরট, লে-কঁৎ-দে-লিল্‌, সার এডউইন আর্‌নল্‌ড্‌ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এসিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করিবার জন্য বিজ্ঞান আরও বেশী কাজ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকেরা প্রাচ্য অঞ্চলের ভাষা, সভ্যতা, শিল্পকলা, সাহিত্য ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তখন আবার স্বকীয় যথার্থ ইতিহাস জানিবার জন্য প্রাচ্যেরা য়ুরোপীয়দিগের নিকট আসিতে লাগিল।

এইরূপে এসিয়ার সমস্ত খোঁজখবর লইয়া, য়ুরোপীয়েরা এসিয়া জয় করিবার জন্য এরূপ ফলপ্রদ উপায় সকল অবলম্বন করিল যাহা তখন পর্য্যন্ত অবিজ্ঞাত ছিল।

যুদ্ধ-সজ্জার উন্নতি।

বৈষয়িক সভ্যতা:—বাষ্পীয় পোত, লৌহবর্ত্ম, যাত্রাপথ, ডাক্‌, বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ, দূর-ভাষণ যন্ত্র (telephone), বন্দর, খাল ইত্যাদি—যাহার দ্বারা শ্রমসাপেক্ষ বৃহৎ কার্য্যসকল সম্পাদিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় এবং য়ুরোপীয়দের প্রভূত মূলধন সঞ্চিত হওয়ায় এই সকল অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইয়াছিল:—

যাহার দ্বারা দেশের সীমাপ্রান্তে নিশ্চিন্ত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, এবং অভ্যন্তর প্রদেশে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এরূপ কাজের বন্দোবস্ত। আইনের বিজ্ঞান, শাসন কার্য্যের বিজ্ঞান, আয়ব্যয়ের বিজ্ঞান, চুক্তির হিসাবে একপ্রকার যুক্তিসঙ্গত ভূস্বত্বাধিকারপ্রণালী, জরিপ চিঠা, জন-সংখ্যাগণনা, দেওয়ানি-বিভাগ, এবং সর্ব্ব-প্রকার বিবরণ-লিপির দলিল-পত্র; নূতন নূতন শ্রমশিল্পের সৃষ্টি ও সমস্ত লোকের প্রতিযোগিতার দ্বারা সমাজের রূপান্তর সাধন।

জাপানের ন্যায় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন জাতি একটা উন্নত সাধারণ-সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া, স্বকীয় পুরাতন গঠন বজায় রাখিতে পারে, কিন্তু যে সকল জাতি সমস্ত

পৃথিবীর আর্থিক জীবনের অংশভাগী হয়, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির সামাজিক গঠন ক্রমশ গ্রহণ করিয়া থাকে ;—তাহা না করিলে তাহাদের অন্তর্হিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বোপরি, য়ুরোপীয় সভ্যতার ফলে এই সকল অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইয়াছিল—যথা :—বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মনের ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, সুলভ মূল্যে গ্রন্থাদি ও সংবাদ পত্র প্রচার, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অধিকার দান, রাষ্ট্রিক প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে সার্ব্বজনিক মত গ্রহণ, মতামতের স্বাধীনতা, য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের পোষণকারী কতকগুলি মূলতত্ত্বের জ্ঞান :—উন্নতি সাম্য, স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উল্টাপক্ষ সমবেত স্বার্থের প্রগাঢ় একতা যাহা মানুষকে পূর্ব্বেকার ন্যায় শুধু কৌলিক ও একান্ত সীমাবদ্ধ মিলন ক্ষেত্রে সম্মিলিত করে না—(সেই মিলন ক্ষেত্র যাহার নিয়মাবলী জীবনের সমস্ত কার্য্যকে স্পর্শ করে)—পরন্তু একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, উদার ভাবে গঠিত কোন একটি মিলন-ক্ষেত্রে মনুষ্যগণকে একত্র সম্মিলিত হইতে প্রবৃত্ত করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

তখন জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা কুষ্টিয়া অঞ্চলের জমিদারি পরিদর্শনের জন্য যাইতেন। সেখানে শিলাইদহের কুঠীতে গিয়া বাস করিতেন। বিষয় কর্ম্মের অবসর সময়ে শিকার করিয়া আত্মবিনোদন করিতেন। প্রায়ই পাখী শিকার করিতেন। তবে, জমিদারীর শিকারীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাঘ দেখা গেলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। একদিন শিকারী আসিয়া খবর দিল কোন নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে বাঘ আসিয়াছে। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জ্যোতিবাবু শিকারীকে সঙ্গে লইয়া, একটা দু-নলী বন্দুক হস্তে পদব্রজে সেই জঙ্গলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবিবাবুও দাদার পিছনে পিছনে চলিলেন। তাঁর হাতে কোন অস্ত্র ছিলনা। জঙ্গলে পৌঁছিলে, শিকারী বলিল, ঐ বাঁশ-ঝাড়ের উপর উঠিয়া তাক্ করিলে সুবিধা হইবে। জ্যোতিবাবু জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে একটা কঞ্চির উপর বন্দুক-হস্তে উঠিয়া বাঁশের গায়ে ঠেশ দিয়া গুলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তাঁর short sight —চস্‌মা নাকে। শিকারী ফিস্ ফিস্ করিয়া যত বলে "ঐ"—উনি ততই বলেন—"কৈ ?" অনেকক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, নীচে ঘাসের ভিতর একটা জানোয়ারের পিঠের রোঁয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুই গুলি ছুঁড়িলেন—গুলি বাঘের পৃষ্ঠদণ্ড ভেদ করিল। বাঘটা একটা বিকট গর্জ্জন

করিয়া সেই স্থানের ঘাস-সমেত কতটা মাটি কামড়াইয়া ধরিল। "তার পর বাঁশে বাঁধিয়া ও ঝুলাইয়া সেই মৃত বাঘটাকে আমাদের লোকজন হাল্লা করিয়া আমাদের কাছারি-গৃহে লইয়া আসিল। তখনও তার মুখে সেই ঘাস-সমেত-মাটি ছিল।"

জ্যোতিবাবু কাছারি বাড়ীর হাতায় পৌঁছিয়া আর এক কাণ্ড দেখিলেন। তাঁহার লোকেরা বন হইতে একটা প্রকাণ্ড অজাগর সর্প ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার মাথায় লাঠী মারায় মাথাটা একটু থেঁৎলিয়া গিয়াছিল। সে একটা গোটা শেয়াল গিলিয়াছিল। লাঠীর আঘাতে অজাগর সেই শেয়ালটা উগ্‌রাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অর্দ্ধ-পচিত শেয়ালের দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠনো ভার। এবার জ্যোতিবাবু কলিকাতায় ফিরিবার সময় সেই চিতাবাঘের স-মুণ্ড চর্ম্ম ও পিঞ্জরাবদ্ধ সেই জীবন্ত অজাগর—এই দুই ভীষণ হিংস্র জীবের হতাবশেষ ও জীবন্ত নমুনা—শিকারের বিজয়নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে লইয়া গেলেন। যোড়াসাঁকো বাটীতে কিছুদিন রাখিয়া অবশেষে অজাগরকে কলিকাতার পশু-উদ্যানে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। পশু-উদ্যানের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরাকার লৌহ তারের পিঞ্জরে অজাগরকে সযত্নে রাখিয়া সেই মন্দিরের গায়ে উপহার-দাতার নাম লিখিয়া দিলেন। এই অজাগর অনেকদিন উদ্যানে ছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবু তাঁহার অজাগরকে দেখিতে যাইতেন। তার পর, একবার গিয়া দেখেন সেই সুন্দর পিঞ্জরটীও নাই—সেই অজাগরও নাই। শুনিলেন, সে অজাগর মরিয়া গিয়াছে। আর একবার জ্যোতিবাবু হাতীর উপর চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই তাঁর প্রথম হাতীর উপরে চড়িয়া ব্যাঘ্র-শিকারে যাত্রা। একটা ঘন নিবিষ্ট দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের ভিতর বাঘটা আছে শুনিলেন। হাতী বড় বড় বাঁশঝাড় মড়মড়-শব্দে পদদলিত করিয়া সেই দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের মধ্য দিয়া একটা পথ করিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হাতী ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া একটু পিছু হটিল। আর অমনি একটা বাঘ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাঁশবন অতিক্রম করিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। জ্যোতিবাবু হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটা ঘটনার কথা বলিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর হাতিটি শিকারী হাতী ছিল না। হাতী চড়িয়া শিকার করিতে হইলে, অন্য জমিদারের নিকট হইতে শিকারী হাতী ধার করিতে হইত। তিনি তাঁহাদের হাতিটীকে শিক্ষা দিয়া শিকারী করিয়া তুলিবেন সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তার পৃষ্ঠদেশ হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তাহাকে বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া তিনি একদিন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। হস্তীর শিকার শিক্ষার এই প্রথম পাঠ। কিন্তু মূর্খ হস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না—শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না—সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমন গা-দোলা দিতে লাগিল যে, জ্যোতিবাবুর সমুদ্র পীড়ার মত পীড়া উপস্থিত হইল। কপাল দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। জ্যোতিবাবু বলিলেন :—

"মাহুৎ অঙ্কুশ প্রহার করিয়া "বয়েঠ" "বয়েঠ" করিয়া কত বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, হাতী কিছুতেই বসিবে না। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—অপরাহ্ণ হইল—তবু মাহুৎ হাতীকে বসাইতে পারিল না। আমি ত হাতীর উপর আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতেছি না—মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম—তখন আমি "মরিয়া" হইয়া হাতীর লেজের দিক দিয়া লাফাইয়া পড়িলাম। মূর্খ হস্তীকে শিখাইতে গিয়া আমিও হস্তীমূর্খ বনিয়া গেলাম!"

ইহার পর জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। ইঁহার অংশীদার ছিলেন জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় জানকী নাথ ঘোষাল মহাশয়। দুইজনে প্রতিদিন সকালে হাটখোলায় গিয়া আফিস্ করিতেন; কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায় একার্য্য বন্দ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিনেই এ ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল। এই টাকা লইয়া এর পর জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ইতিপূর্ব্বে এখানে একসময় অনেক নীলকর সাহেব ছিলেন ও তাঁহাদের নীলের চাষও ছিল। এইখানে যে নীলকুঠী ছিল, সেই নীলকুঠীই শেষে ঠাকুর-জমিদারের কাছারী-গৃহে পরিণত হয়। সেই নীলকুঠী সংলগ্ন কয়েকখানি ভাঙ্গাচুরা হাউজ (vat) খালি পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু সেইগুলিকেই মেরামৎ করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই হাউজে জল আনাইতে পদ্মা হইতে একটি খাল কাটান' হইল। জ্যোতিবাবু বলিলেন "তখন বুঝিয়াছিলাম চাষার ভাবনা কত! কখন' জল এবং কখন' রৌদ্রের জন্য যে কি আকুল ভাবে আমি প্রতীক্ষা করিতাম, তাহা বর্ণনাতীত,—কিন্তু এটা কবির-দৃষ্টিতে দেখা নয়। তখন ঈপ্সিত সময়ে মেঘ আসিলে মনে হইত একজন প্রাণের বন্ধু আসিয়াছে; বন্ধুকে দেখার মত আনন্দ পাইতাম। এ আনন্দে কাব্যরসের লেশমাত্র ছিল না। এইরূপে চার পাঁচ বৎসরেই আমার নীলের চাষে খুব উন্নতি হইল। কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল। শুনা গেল জার্ম্মানরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতেছে, কাযেই নীলের বাজার অনেক খারাপ হইয়া গেল। আমিও কায উঠাইয়া দিলাম। যাহাই হউক নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা লইয়া আমি কি করিব?—এই চিন্তা তখন আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল। হঠাৎ এমন সময় Exchange Gazetteএ দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নীলামে বিক্রয় হইবে। জানাই হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি করাইয়া জাহাজ চালান যাইবে স্থির করিলাম।

"এই সময়ে, আবার কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেল লাইন হইবে, কথা ছিল। তবেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত বেশ জাহাজ চালান' যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ সুযুক্তিও হইল। তৎক্ষণাৎ,—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ক্রমে ঠিক বলিতে পারি না—খোল কিনিতে ছুটিলাম।"

সেখানে খুব ভিড়। বিস্তর ক্রেতা। মাল নীলামে উঠিয়াছে, সকলেই ডাকিতেছে, জ্যোতিবাবুও ডাকিতে সুরু করিলেন। দাম হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সাত হাজারে নিষ্পত্তি হইল। জ্যোতিবাবুই সর্ব্বোচ্চ ডাকে কিনিলেন। কিনিবার পর অনেকে তাঁহাকে সাতহাজারের উপরও কিছু দিয়া এ খোলটি লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি পুনর্বিক্রয়ে স্বীকৃত হইলেন না। অস্বীকৃত হওয়ার প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক "জাহাজ চালান" প্রবর্ত্তন, এবং দ্বিতীয়তঃ সকলেই যখন এ খোলটি কিনিতে উদ্‌গ্রীব তখন নিশ্চয়ই এটি সস্তা হইয়াছে, অতএব পুনর্বিক্রয়ে তাঁহার ক্ষতি। কথাটা ঠিক! তখন লোকে যদি বলিত "না এটা ঠকা' হয়েছে" তাহা হইলে তিনি যে কি করিতেন তাহা এখন বলা কঠিন। সকলের লুব্ধ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ দরে তিনি যে জাহাজের খোল কিনিলেন, ইহাতে আর কোনও উপকার হউক বা না হউক—এই কেনার উত্তেজনার মুহূর্ত্তে একটা গর্ব্ব! যাহাই হউক তিনি খুব গর্ব্বিত অন্তরে বাটি ফিরিলেন, যেন কি একটা রাজ্যই জয় করিয়া আনিলেন।

বুশ্‌বী (Bushby) গমর্ণমেণ্টের জাহাজ সমূহের একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাকে ষোলটাকা ফী দিয়া এই খোলটী দেখান হইল, তিনি বলিলেন, "It will make a Splendid Steamer" (ইহাতে অতি সুন্দর একখানি ষ্টিমার তৈয়ারি হইবে)। আয়কি! জ্যোতিবাবু অমনি হাওড়ার King প্রভৃতি সমস্ত জাহাজের কারখানায় ঘুরিতে লাগিলেন, কে এই জাহাজখানি প্রস্তুত করিয়া দিবে! কিন্তু তাহাদের হাতে এত বেশী কায ছিল যে বড় বড় কোম্পানির কেহই একায লইতে স্বীকৃত হইল না। শেষে Kelso Stewart নামে এক কোম্পানি এই জাহাজ নির্ম্মাণের ভার লইল।—সেই খোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল তাহার নাম হইল "সরোজিনী।" জাহাজখানি খুব শীঘ্র দিবার কথা ছিল, কিন্তু Kelso কোম্পানি তাহা পারিল না। তদ্ব্যতীত জাহাজ বড় হইল বটে কিন্তু তেমন মজবুত হইল না। সে যেন এক আজন্মরুগ্ন সন্তানের মতই জন্মিল। আজ এঞ্জিন খারাপ, কাল চাকা খারাপ, পরশ্ব বয়লার খারাপ, এই রকম একটা না একটা গোলমাল প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। আর সেই সব মেরামত করাইতে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়, কাযও বন্ধ রহিয়া যায়। দেশীয় চালক যাহারা নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা কল-কব্জার বিষয়ে ভাল বুঝিত না। সামান্য একটু কিছু হলেই জাহাজ অমনি বন্ধ। তখন জ্যোতিবাবু, জাহাজের কল কব্জা বিষয়ে অভিজ্ঞ সুদক্ষ একজন কর্ম্মচারীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। একজন ফরাসীকে পাওয়া গেল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলেন। সেই জাহাজের Commander হইল। তাহার উপরেই জাহাজের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। কল খারাপ হইবামাত্র সে আস্তিন্ গুটাইয়া যেরূপ অক্লান্তভাবে কাজ করিত, সেরূপ কাজ ১০জন খালাসীও করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার একটি দোষ ছিল। মাসের

মধ্যে একবার করিয়া মাতাল হইত। তখন সে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া খালাসীদিগকে বকসিশ দিত, খয়রাৎ করিত, জাহাজের সাবানাদি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিত। তাহার পর হইতে আবার সে ভালমানুষ—যার পর নাই বাধ্য। যাই হোক্, এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া জ্যোতিবাবুর যেমন অনেক খরচ বাঁচিয়া গেল, তেমনি অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কায কর্ম্মও বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।

জ্যোতিবাবু এ লাইনে আসিবার পূর্ব্বেই বিলাত হইতে Flotilla Company নামে এক কোম্পানি আসিয়া কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছিল। জ্যোতিবাবু যখন প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তখন যদি পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম জাহাজ "সরোজিনী" নির্ম্মিত হইতে তাঁহার এত বিলম্ব হইয়া গেল যে তিনি আসিবার পূর্ব্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি কায ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে তৈরি হইত, তাহা হইলে তিনি এর অনেক আগেই কার্য্য চালাইতে পারিতেন; তখন হয়ত এ কোম্পানি এদিকে না আসিতেও পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। এখন দুই পক্ষই এই লাইনে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলেন। উভয় দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইল। একখানি মাত্র ষ্টীমার লইয়া ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ঠিক প্রতিযোগিতা হইয়া উঠিতেছিল না বলিয়া তিনি আরও চারখানি জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলেন। এ জাহাজগুলির নাম ছিল "বঙ্গলক্ষ্মী" "স্বদেশী" "ভারত" এবং "লর্ড রিপন"। তখন এই পাঁচখানি জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত। সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাতেও আসিত।

এই সময় জ্যোতিবাবু জাহাজেই থাকিতেন। বাঙ্গালীর জাহাজ চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজে এবং নব্যদলের মধ্যে একটা খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালে লিখিত জ্যোতিবাবুর একখানি পত্র হইতে তাহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানির অনেক খরচ পত্র—লোক জনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে, তবু তারা নিয়মিতভাবে সমান জাহাজ চালাচ্চে, যত্নের একটু ত্রুটি বা শৈথিল্য নাই। আর তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই। তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে' কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখনও দেখিনি! তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানির জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এইজন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের

ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন' যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাহাকে অনেক প্রকারে বুঝিয়ে এমনকি পায়ে পর্য্যন্ত ধরে' ফিরিয়ে আনেন। যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের এইরূপ বুঝাতে থাকেন: "আমাদের কথাটি একবার শুনুন্ তারপর যে-জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাকতে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নয়? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হ'ত, অপমান করা হ'ত —আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই, ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন—তখন কি আপনাদের ও জাহাজে যাওয়া উচিত?" "হাঁ বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্।" এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার-বৎসর বয়স্ক বালক, ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল: —"হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ—উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান্ হইয়া জল গর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই, ওপারে লইয়া গিয়াছে, এবং সে বাতাসে দোদুল্যমান্ হইতেছে। যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত' ভাই-সকল ঐ জাহাজে যাইবা না।"—এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হ'ল—আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক—বৃষ্টি হোক্—রৌদ্র হোক্—যে কোন বাধা হোক কিছুই না মেনে তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশীর ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন্। তাঁহারা বলেন, আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুন্তে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বল্বার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুন্লে যেমন বুঝা যায় কে-আস্চে তেমনি সিটি শুন্লেই কোন্ জাহাজ আস্চে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসচে, ঐ "লর্ড রিপন" আসচে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আস্চে, ঐ "স্বদেশী" আস্চে, ঐ "সরোজিনী" আস্চে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বল্ছিলেন, "যেমন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়।" আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটি তাঁহাদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোন দিন যাত্রী পায়—সেদিন তাঁদের আর আপসোসের সীমা থাকে না।

"সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা কর্বার জন্য এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টীমারের উল্লেখ

করতে করতে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—"তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা ত' আমাদেরই ষ্টীমার।" একথাটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার হাকিম, উকীল, জমীদার, দোকান্দার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা ছিলেন। সেদিন ছাত্রদের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়া ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখ্‌লে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

"সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্ত্তনের দল—বাবুর বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন্—যেতে যেতে রাস্তার লোকের ভিড় বাড়তে লাগল—তারপর বাজারে পৌঁছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝতে পার্‌লে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।

"নগর-সংকীর্ত্তনে যে কি মাতান' ভাব আমি সেদিন বেশ বুঝতে পার্‌লেম্। এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয় তা হলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই গানটায় লোকেরা যে কিরকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুন্‌লে শুধু কথায় বোঝা যাবে না। যাই হোক্ তবু কতকটা ভাব বুঝতে পারবে :—

কে কোথায় আছিস ভাই আয়রে সকলে গাই
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগন।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে শত কণ্ঠে এক তানে
সবে মিলে গাই গীত মৃত সঞ্জীবন॥

(একতালা।)

(ও ভাই) দেখ, সব ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে
দেশের দশা একবার করেনা স্মরণ।
(একবার চায় নারে কেউ নয়ন মিলে)
(একিরে কাল নিদ্রা এল)
(মোরা) সবারে জাগাব, দুর্দ্দশা ঘুচাব
নিদ্রাগত প্রাণে, আনিব চেতন।
(এঘোর দুঃখনিশি অবসানে)
(মহারাণীর সুশাসনে)
(ও ভাই) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন,
(মিলে প্রেম সূত্রে প্রাণে প্রাণে)
দেখবে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,
কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন।
(ওরে এমন শোভা দেখবে কোথা!

(রূপক।)

আহা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী
ভাবে মেতে কোটি কণ্ঠে কর উচ্চারণ।

(মনোহর সই—একতালা।)

শত্রু মিত্র মিলে ঘরের বিবাদ ভুলে
গলাগলি হ'য়ে গাইরে
(আজি) দেশের কাজে মোরা হয়ে মাতোয়ারা
স্বার্থের কথা ভুলে যাইরে।
(দেশের প্রেমে মত্ত হ'য়ে)
(মায়ের চরণ সেবায়)
(করি) হয়ে একমন মায়েরই কীর্ত্তন
(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাইরে।
বিংশতি জাতিতে বিংশতি ভাষাতে
মেদিনী কাঁপায়ে গাইরে।
(জয় ভারত জননী বলে')
(সমস্বরে সবে)

(রূপক।)

নব উদ্যম দেখিয়ে সবে চমকিত হয়ে ক'বে
বুঝি ভারত হবে আবার জগত ভূষণ।

(ঝুলন।)

(ওরে) চারিদিকে সবাই জেগে, তোরাই রলি'
—শুধু তোরাই ঘুমে রলি' শুধু তোরাই ঘুমে রলি'
নবীন আলোয় ভাস্‌ছে ধরা দেখ্‌রে নয়ন মেলি।
(চেয়ে দেখ দেখরে ও ভাই)
ছিছি কাযের বেলা ভোরের বেলা ঘুমে বিভোর হলি!
(জেগে আয় আয়রে ভাই)
(ওরে এমন দিন আর পাবিনারে)
হায়রে ঘুমের ঘোরে বুঝলিনারে কি ছিলি কি হলি।
(একবার ভেবে দেখরে ও ভাই)
ছিছি এতকাল ঘুমিয়ে আছিস্ তবুনা জাগিলি।
(একি হলরে ভাই)
হায়রে জেগেও বুঝি জাগ্‌লিনারে কেন এমন হলি।
(একবার উঠ উঠ সবে)
এস মহানিদ্রা ভেঙ্গে করি কোলাকুলি।
(জয় ভারত বলরে ভাই)
এস দলাদলির বাঁধন খুলি বাঁধি গলাগলি।
(ভারত মাতার নিশান তুলি)
(আর দেরি করিস্‌নারে)
(একবার আয় আয়রে সবে)

রূপক।

সবে এক প্রাণ হয়ে, ভগবানের নামটি লয়ে,
দেশের মঙ্গল সাধনে, কর প্রাণ পণ।"

এইরূপে জ্যোতিবাবুর কায বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া উন্নতির পথে চলিতেছিল। ইঁহার অবস্থিতির জন্য বরিশাল সহরও বেশ সরগরম ছিল। সভা, সমিতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপার লাগিয়াই ছিল। তিনিও বেশ মনের সুখে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু এত সুখ তাঁহার সহিল না।

ইংরাজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি জ্যোতিবাবুর বিপক্ষাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল, জ্যোতিবাবুও কমাইলেন। এই ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিবাবু প্রতি যোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। লাভ আগে যেমন হইতেছিল, এখন তেমন আর হয় না—তবুও তিনি দমিলেন না।

এই সময়ে খুল্‌না হইতে মাল বোঝাই লইয়া "স্বদেশী" কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—আলোকমালা সমুদ্ভাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওরাপুলের নীচে দিয়া যাইবার

সময় পুলে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টিমারখানি গঙ্গা গর্ভে নিমগ্ন হইল। এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না।

এতদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একবারে নিরুদ্যম ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এতদিন তবুও একটা আশা ছিল—আবার জোয়ার আসিবে। কিন্তু এইবার সে আশা একবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কায উঠাইয়া দিতেই তিনি কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। একেত' প্রতিযোগিতার জন্য তিনি কিছু দিন হইতেই ক্ষতি স্বীকার করিতেছিলেন, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়; কিন্তু এবার এই দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেই তিনি অত্যন্ত জের্‌বার্ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তবুও তিনি নিজ হইতে এ কাজ উঠান্ কিরূপে? কায বন্ধ করিবেন, মনে মনে এই মৎলব ছিল কিন্তু এ ব্যাপার তিনি ঘুণক্ষেরেও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। কায যেমন চলিতেছিল, পূর্ব্বের মত তেমনিই চলিতে লাগিল।

এমন সময় ফ্লোটিলা কোম্পানির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (এখন "রাজা") জ্যোতিবাবুর নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন "উভয় পক্ষেই আর এরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দিউন্। ফ্লোটিলা কোম্পানি আপনার সমস্ত কারবার কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছে।" জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে এ একটা মহা সুযোগ উপস্থিত—এ সুযোগ ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। তখন যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কোন দিন আপনাআপনিই কায গুটাইতে হইত, তখন হয়ত আয় কিছুই পাওয়া যাইত না। কিন্তু এখন বেশ মানে মানে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও সমস্ত ফ্লোটিলা কোম্পানিকেই বিক্রয় করিয়া দিলেন।

ফ্লোটিলা কোম্পানীর নিকট হইতে অনেক টাকা পাওয়া গেলেও, তাঁহার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইল না। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "আমি খুব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু পালিত মহাশয় (স্যার টি পালিত) সমস্ত পাওনাদের ডাকাইয়া তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া দিলেন তাহাতে আমার ঋণের বোঝা অনেক হাল্কা হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি নিজে এ ভার গ্রহণ করিয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যাহাতে আমি একবারেই ঋণমুক্ত হইয়া গেলাম। তিনি এখন দানবীর স্যর তারকনাথ পালিত, তাঁহার পরিচয় কে না জানে? কিন্তু তিনি যে আবার কেমন বন্ধুবৎসল তাহা তাঁহার এই কাজেই লোকে পরিচয় পাইবে। শুধু আমাকে নয়, এমনি কত লোককে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার "তারক" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন! তাঁহার দুই সময়ের দুইটি ছবি আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে, সেই দুই ছবি তোমার সম্মুখে ধরিলেই এক মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রকৃত চরিত্র তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম ছবি:—আমি তখন

হিন্দু স্কুলের খুব নীচের ক্লাসে পড়ি। তিনি একদিন আমাদের ক্লাসের সম্মুখ দিয়া মহেশ বাবুর ফার্ষ্ট ক্লাসে কোন এক উপলক্ষে গিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষু ব্যাণ্ডেজ কাপড়ে বাঁধা। শুনিলাম, মেডকাল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদিগের সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের মারামারি হয়—সেইদিনকার মারামারিতে প্রেসিডেন্সী কালেজের দুই একজন ছাড়া সব ছাত্র পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। যাঁরা পলায়ন করেন নাই তন্মধ্যে পালিত মহাশয় সর্ব্বপ্রধান। তিনি একাকী বহু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করিয়া আহত হইয়াছিলেন।

আর এক ছবি, যখন আমি স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বিষয় কার্য্যে লিপ্ত। সেই সময়ে একবার আমরা বজরা করিয়া গঙ্গা-বক্ষে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। পালিত মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম। আমরা কামরার পাটাতনে বিছানা করিয়া পাশাপাশি সবাই রাত্রে নিদ্রা যাইতেছি। গরমে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেখি, পালিত মহাশয় উঠিয়া বসিয়া আমাকে তালপাতার পাখার বাতাস করিতেছেন! কি স্নেহশীলতা! তাঁহার স্বভাবে কঠোরতা ও কোমলতার কি অপূর্ব্ব মিশ্রণ! ভবভূতি যথার্থই বলিয়াছেন:—

"বজ্র হতে সুকঠোর
পুষ্প হতে আরো সুকুমার
মহাজনের চিত্ত
আমাদের বুঝে ওঠা ভার॥"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নবাব

নবম পরিচ্ছেদ

রাজ-অতিথি।

ফ্রান্সের দক্ষিণে সাঁতে রুমা; এক সময়ে বিলাস-কানন ও প্রাসাদমালা-সজ্জিত এই নগরের সমৃদ্ধির কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলেও এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সেই সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্ন একখানা ইষ্টকখণ্ডও আজ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কালের বন্যায় সকলই ভাসিয়া গিয়াছে, আছে শুধু নগরের গা বেড়িয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সরীসৃপের ন্যায় পাহাড়ের শ্রেণী। শ্যামল উপত্যকা শষ্পাচ্ছন্ন; ক্লান্ত পথিকের চক্ষে একান্তই তৃপ্তি-দায়ক।

বাগানে ফুল ফুটিলেই মধুকরের ভিড় জমিয়া থাকে, যে বাগানে ফুল ফুটে না, মধুকর ভুলিয়াও সেদিকে পদার্পণ করে না। কাজেই নগরের শোভা-সমৃদ্ধির সহিতই যে সৌখীন নরনারীর দল অন্তর্হিত হইবে, সে কথা বিশেষ করিয়া না বলিয়া দিলেও চলে।

শৈশবে জাঁসুলে একবার মার সহিত এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল—

তখনই সে এই সবুজ প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শ্যাম উপত্যকা ও পর্ব্বত-পার্শ্বে প্রকৃতির অবাধ হাস্য-লহরের মতই মুক্ত নির্ঝর দেখিয়া আনন্দমুগ্ধ স্বরে বলিয়াছিল, "মা যখন আমি বড়লোক হব, তখন সাজিয়ে গুজিয়ে এই নগরখানাই তোমাকে আমি দিয়ে দেব। আর ঐ পাহাড়ের কোনে তোমার জন্য মস্ত একখানা বাড়ী করে দেব। সে বাড়ী মার্ব্বেল পাথরে তৈরি হবে, সে যা বাহার খুলবে, তখন তুমি দেখে নিও।"

তাহার পর আরব্য উপন্যাসের অলৌকিক গল্পের মতই জাঁসুলে যখন অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলেন, সকল কামনাই যখন তাঁহার পরিপূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন জাঁসুলে সর্ব্ব প্রথম শৈশবের এই অভিনব কল্পনা সত্যে পরিণত করিলেন। পাহাড়ের কোণে আলাদিনের প্রাসাদের মতই জাঁসুলের মর্ম্মর প্রাসাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া বিচিত্র রম্য কাননের সৃষ্টি হইল, সেদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে সে সংবাদ পাইয়া সৌখীন নরনারীর দল সাঁতে রুমায় আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার পর জাঁসুলের অর্থে জীর্ণ ষ্টেশনের সংস্কার ও পথ-ঘাট রচিত হইয়া উঠিল, তখন সহরের দুই-চারি জন ধন-কুবেরও তথায় বিলাস কুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। প্রাসাদ তৈয়ার করাইয়া জাঁসুলে মাকে আনিয়া তথায় বসাইলেন। তাঁহার শৈশবের সঙ্কল্প রক্ষা করিলেন।

তাহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সাঁতে রুমা আজ জনহীন নহে। জাঁসুলের নিজেরই লোকজন অসংখ্য—তদ্ভিন্ন বাগানে যখন ফুল ফুটিয়াছে, মধুকরের দলও তখন ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিবেই।

জাঁসুলের মা এই প্রাসাদে একাকিনী বাস করিতেন, দাস-দাসী প্রভৃতি সংখ্যায় বিস্তর থাকিলেও নিজে তিনি প্রত্যেক বিষয়টির উপর নিখুঁতভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। শাসি-খড়খড়িতে জিনিষ-পত্রে যত্নের গুণে এতটুকু ধূলি পাওয়া যায় না—মেজের কার্পেটটি হইতে কড়িকাঠ অবধি ঝক্ ঝক্ করিতেছে;—যেন সদ্য কে সেগুলির সংস্কার করিয়া গিয়াছে। ভোর ছয়টা বাজিতেই উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া ঘর-দ্বার দেখা—দুপরে বাগান ক্ষেত প্রভৃতি পরিদর্শন এবং সন্ধ্যায় দীন-দরিদ্র প্রতিবেশীর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া সকলের খবরাখবর লওয়া, এই প্রাচীনা নারীর নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল—এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটত না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, দেশের ক্ষুদ্র তৃণকণাটুকু অবধি এই স্নেহশীলা নারীর হস্তদুইটির মধুর স্পর্শলাভে বঞ্চিত হইত না। ছেলে আসিলে মা শুধু হাসিয়া বলিতেন, "এ কি সাদা হাতী আমায় পুষতে দিয়েছিস, বাবা? এ বয়সে কি আমার এত বড় বাড়ী রাখা পোষায়! তোরা কেউ আয়, থাক্ এখানে, সব দেখ্ শোন্।"

জাঁসুলে হাসিয়া বলিতেন, "আমার যে নানান্ কাজ মা—সহর ছেড়ে থাকবার জো নেই যে! নাহলে তোমায় ছেড়ে থাকি!" মা বলিতেন, "তবে চ, বাবা, আমাকেও সেখানে নিয়ে চল। তোদের না দেখে

আমি একলাটি এখানে হাঁপিয়ে উঠি যে, বাবা।"

জাঁসুলে জবাব দিতেন, "কিন্তু তোমার যে যাবার জো নেই, মা। দাদার শরীর সহরে একেবারে ভালো থাকবে না। এ খোলা ফাঁকা জায়গায় দাদা ভালো থাকে। দাদা ত একলাটি থাকতে পারবে না এই শরীর নিয়ে। তুমি না হলে তাকে দেখবে কে!"

"সে কথা ঠিক" বলিয়া মা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে বসিতেন!

এই দাদা জাঁসুলের বড় ভাই, বংশের বড় ছেলে, মা-বাপের আশার দীপ, তাঁহাদের গর্ব্ব, তাঁহাদের গৌরব। কি না ছিল সে! কত আশা বুকে লইয়া এই কিশোর যুবককে তাঁহারা পারির সমাজে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তাহারই কুশল মাগিয়া পিতামাতা স্বস্তি বোধ করিতেন—প্রাণের সমস্ত আদর সব ভালবাসা দিয়া এই আশার দীপটিকে তাঁহারা সাজাইয়া তুলিতেছিলেন, মনে আশা জাগিত, এই দীপটি যখন পূর্ণ তেজে জ্বলিয়া উঠিবে, তখন—! কিন্তু হায়, দশ বৎসর পরে পারি যখন সেই দীপটিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জীর্ণ দশায় মায়ের হাতে ফিরাইয়া পাঠাইল, তখন তাহার সে দীন মূর্ত্তি দেখিয়া মার প্রাণ,—বাপ নাই মরিয়া বাঁচিয়াছে—শিহরিয়া উঠিল। এ কি সেই ছেলে,—সাজাইয়া গুছাইয়া প্রাণের আশার আবেগে স্নান করাইয়া মানুষ করিবার জন্য যাহাকে তাঁহারা সহরে পাঠাইয়াছিলেন! হা অদৃষ্ট!

কিন্তু জাঁসুলে তখন টিউনিসে যথের টাকা পাইতে বসিয়াছে, সুতরাং সেবা-শুশ্রূষার ঘটায় দীপটিকে খাড়া করা গেল; কিন্তু দীপ একেবারে এমন অকেজো হইয়া গেল যে তাহাকে শুধু আদরের জিনিষ বলিয়া তুলিয়া রাখা চলে, তাহাতে কাজ চলে না। অগত্যা মার কোলেই মন-ভাঙ্গা প্রাণ-ভাঙ্গা ছেলে কোনমতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুদিন পরে হাঁসুলে পারিতে ফিরিল। মার বড় সাধ, দুটি ছেলেকেই কোলের কাছে রাখিয়া জীবনের শেষে কয়টা দিন কাটাইয়া দেন! কিন্তু দৈব বিরোধী,—তাঁহার সে সাধ পূরিবে কি করিয়া! প্রথম জীবনটা শুধুই হা অর্থ হা অর্থ করিয়া কাটিয়া গিয়াছে—অর্থ-পিপাসা কোনদিনই তৃপ্ত হইতে পারে নাই—আজ যদি দৈববশে জাঁসুলের চেষ্টায় সে পিপাসা মিটিল ত স্নেহের ক্ষুধা সর্ব্বনাশীরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে যে! সে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে কে? জাঁসুলে? কিন্তু পারিতে তাহার অনেক কাজ। সে টাকা লইয়া খুসী নহে—সে মান চায়, যশ চায়, দশজনের একজন হইতে চায়—মানুষের মত মানুষ হইতে চায়! আহা, তাই হোক। অন্ধ স্নেহে ছেলের এ সাধে মা হইয়া বাধা দেওয়া উচিত নহে!

একদিন সন্ধ্যায় জাঁসুলে হঠাৎ সাঁতে রুমায় আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে অসংখ্য বন্ধু; কেহ কাউণ্ট, কেহ মার্কুইস, কেহ আর কিছু; সকলেই সম্ভ্রান্ত। দুইখানা ব্রেকে করিয়া মালপত্র আসিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম জুড়িয়া দিল। জাঁসুলের মা এই বন্ধু-সমারোহ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন।

ব্যাপার এই—টিউনিসের বে'কে সম্প্রতি নবাব নগদ দেড়কোটি মুদ্রা ধার দিয়াছিলেন। হেমারলিঙের উচিত শিক্ষা হইয়াছিল—তাহারাই পিতাপুত্রে মিলিয়া নবাবের নামে বে'র কানে লাগাইয়া লাগাইয়া ইদানীং তাঁহার বিরুদ্ধে বেকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, নবাবের প্রতিপত্তি একেবারে ডুবিতে বসিয়াছিল। নবাব তাই বে'কে এই অজস্র টাকা ধার দিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন। কর্ণেল ব্রেহিমই এই ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বে কৃতজ্ঞ চিত্তে নবাবকে ধন্যবাদ ত দিলেনই, উপরন্তু স্বহস্তে নবাবকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, শীঘ্রই তিনি ফ্রান্সে বেড়াইতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; সেই সময় সাঁতে রুমায় নবাবের প্রসিদ্ধ প্রাসাদে দুই চারিদিন বাস করিয়া নবাবকে সম্মানিত করিবেন। নবাব এ সংবাদে এমন আনন্দোৎফুল্ল হইলেন যে, যে পিয়ন এ সংবাদ আনিয়াছিল তাহাকে মুঠি ভরিয়া অর্থদান করিলেন। ওদিকে হেমারলিঙের দল এ সংবাদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। তাহাদের এত চক্রান্ত এমনভাবে নিষ্ফল হইল!

ইহার পর নবাব সংবাদ পাইলেন, বে ফ্রান্সে আসিতেছেন। তিনিও উদ্যোগ আয়োজনের জন্য দ্রুত সাঁতে রুমায় আসিলেন। সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গকে মার কাছে পরিচিত করিয়া দিয়া নবাব কহিলেন, "মা, বে ত চারদিন এখানে থাকবেন। বাড়ী-ঘরের অবস্থা কেমন?"

মা বলিলেন, "সে আর তোকে কিছু দেখতে হবে না রে—তোর বুড়ো মার দেহে যে ক'দিন হাড় ক'খানা আছে, নিজের চোখে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারটি অবধি সে হাঁটকে দেখে বেড়ায়।"

নবাব কহিলেন, "বেশ! তার পর আমরা কি আয়োজন করছি জানো মা—নাচ গান, থিয়েটার, সার্কাস, ষাঁড়ের লড়াই, বাজী—এ-দেশী মেয়েদের নাচ! ক'দিন আর দেশে আমোদ-আহ্লাদ জুড়োতে দেব না। তার জন্য ব্যবস্থারও চূড়ান্ত করেছি। পারি থেকে বাছা-বাছা অভিনেতা অভিনেত্রী, বাছা-বাছা গাহিয়ে-নাচিয়ে কুস্তিবাজ সব আনাচ্ছি। তার পর ফুলের মালায় লতায় পাতায় সারা গাঁ একেবারে মুড়ে দেব। এমন করব যা কেউ কখনও চক্ষে দেখেনি, একটা কীর্ত্তি রাখব। এতে যত টাকা লাগে—"

বন্ধুগণ সকলেই সোৎসাহে নবাবের কথার সায় দিয়া গেলেন। মা এই এত মার্কুইস-কাউন্টের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন পুত্রের মুখে ভাবী উৎসবের আয়োজন-কল্পনার বিবরণ শুনিয়া আনন্দে তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুর বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

রাত্রে ভোজনাদির পর গেরি আসিয়া জাঁসুলের মাতার কাছে গল্প করিতে বসিল। গ্রামের কথা, অতীতের কথা, জাঁসুলের ছেলেগুলির কথা। বিচিত্র কাহিনী-গুলি মায়া-স্বপ্নের মতই উভয়ের চোখের সম্মুখে তরুণ সজীবতায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহিরে ভারী জুতার শব্দ শুনা গেল। জাঁসুলে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গেরি চলিয়া যাইবার জন্য

উঠিয়া দাঁড়াইল। জাঁসুলে কহিলেন, "না না, পল, বসো। তুমি ঘরের ছেলে, তোমায় উঠে যেতে হবে না।" পরে "মা—"বলিয়া মার কোল ঘেঁষিয়া কার্পেট-পাতা মেঝের উপর তিনি আপনার দীর্ঘ দেহ ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন। মা বলিলেন, "ও কি! আহা, ভুঁয়ে কেন? উঠে এই চেয়ারটায় বোস্।" জাঁসুলে কহিলেন, "না, মা, তোমার কোল, তোমার পা যে ও চেয়ারের চেয়েও আমার আরামের জায়গা।"

মা তথাপি সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "না, না, ছি! এখন কি তুই আর তেমনিটি আছিস্! কত মান,—"

মায়ের কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া জাঁসুলে কহিলেন, "বাইরে যাই হোক্ মা, তোমার কাছে আমি তোমার সেই জাঁসুলে। তোমার কাছে আমার জমক নেই, মান নেই—সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট জাঁসুলে আমি। তুমি যদি জানতে মা—বাইরের এই জাঁক-জমকে এতটুকু আমি সুখ পাই না, আমার সমস্ত আরাম, সমস্ত সুখ তোমার এই কোলে—"বলিয়া কুকুর যেমন প্রভুর পায়ে আপনার মুখ লুটাইয়া দেয়, তেমনি ভাবে জাঁসুলে মার দুই পায়ে আপনার মাথা রাখিয়া মুখ ঘষিয়া এক অপূর্ব্ব আরাম অনুভব করিলেন।

জাঁসুলের দীর্ঘ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে মা বলিলেন, "হাঁরে, ছেলেদের সঙ্গে আনলি না, কেন? তারাও দেখত শুনত।"

জাঁসুলে কহিলেন, "তারা যে পড়ছে-শুনছে। স্কুল কামাই করা কি ঠিক হত? তার চেয়ে এই সামনেই তাদের ছুটি আসছে, লম্বা দু মাস ছুটি। সেই সময় তাদের এখানে পাঠিয়ে দেব'খন। দুমাস তোমার কাছে থেকে যাবে। তোমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে, তোমার কোলের কাছে মাথা রেখে ঘুমে ঢুলে পড়বে—ভারী আয়েসে থাকবে তারা।"

পরদিন ভোর হইতেই এক বিরাট সমারোহের আভাস পাওয়া গেল। ট্রেনে চড়িয়া সহর হইতে থিয়েটারের দল, বাইয়ের দল, খেলোয়াড়-কুস্তিবাজের দল ভিড় করিয়া সাঁতে রুমায় আসিয়া জমিতে লাগিল। গ্রামের লোক এই সকল বিচিত্র বেশধারী অপরূপ নর-নারীর ঘটা দেখিয়া কাজ-কর্ম্ম ভুলিয়া গেল। এখানে মঞ্চ তৈয়ার হইতেছে, ওখানে কাঠের খুটি পুঁতিয়া তাহাতে লাল-নীল রঙের শালু জড়াইয়া অপূর্ব্ব বাহার করা হইতেছে, সেখানে মাটি কুপাইয়া জঙ্গল কাটিয়া ক্রীড়া-ভূমি রচিত হইতেছে! কোথাও বাদ্যকরের দল বাজনার কেরামতি সুরু করিয়াছে, কোথাও নাচের মহলা চলিতেছে, আবার কোথাও বা কুস্তিগীর মুঠি করিয়া প্রকাণ্ড বৃষের শৃঙ্গ ধরিয়া তাল ঠুকিবার উদ্যোগ করিতেছে। চারিদিকেই কলরব, চারি-দিকেই হাঁক-ডাক, চারিদিকেই ব্যস্ত অধীর লোকজন চলা-ফেরা করিতেছে। এমন কাণ্ড, চোখে দেখা দূরের কথা, কস্মিন্ কালে কোন দেশে যে ঘটিতে পারে, গ্রামের লোক স্বপ্নেও তাহা কোনদিন কল্পনা করিবার সুযোগ পায় নাই।

অবশেষে সম্ভাবিত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত গ্রাম একখানি প্রকাণ্ড উৎসব-ভবনের মতই সজ্জিত সুন্দর রূপে ভরিয়া উঠিল। যেন কোন সুন্দরী নায়িকা অপরূপ বেশে সাজিয়া নায়কের প্রতীক্ষা করিতেছে! পথের মোড়ে মোড়ে বিচিত্র তোরণ। তোরণের সম্মুখে অভিনব পট-মণ্ডপে নানা সুরে বাদ্য বাজিতেছে। পথের দুইধারে রঙিন্ থামে পাতার ঝালর, ফুলের ঝাড়, নিশানের ঘটা। সালু-মোড়া রাস্তা। দেশের দারিদ্র্য যেন নবাবের ঐশ্বর্য্যে ঢাকা পড়িয়াছে! এ যেন স্বর্গের এক কোণ ছিঁড়িয়া আনিয়া মলিন মর্ত্ত্যে নিপুণভাবে কে আঁটিয়া দিয়াছে! সে কোণটুকু মর্ত্ত্যের গায়ে বেমালুম বসিয়াছে—কোথাও এতটুকু জোড় দেখা যায় না।

অপরাহ্ণ তিনটার সময় নবাবের মর্ম্মর প্রাসাদ হইতে আট ঘোড়ার প্রকাণ্ড গাড়ী ষ্টেশনাভিমুখে চলিল, পশ্চাতে অসংখ্য গাড়ীর শ্রেণী—সবগুলিই সুন্দর, ঘোড়াগুলা ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তিমান দম্ভের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে! চারিদিকে বাদ্য বাজিল, চারিদিকে জয়োল্লাস উঠিল, "জয় বে'র জয়!"

গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের ফটকে ঢুকিল। ষ্টেশনটি ছোট—তবু নবাবের ঐশ্বর্য্য তাহাকে রমণীয় বেশে অপূর্ব্ব ছাঁদে সাজাইয়া তুলিয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের কঠিন দেহ কার্পেটে মণ্ডিত; দেওয়ালে ফুলের মালা চক্রাকারে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে—বিচিত্র বর্ণের পতাকায় চারিধার ভূষিত। নবাব প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তেজনায় তাঁহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতেছিল। ষ্টেশনের ঘরে ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, "সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে। আর আট মিনিট পরে ট্রেন এসে পৌঁছুবে।" জোয়ারের প্রথম টানে নদীর জলে যেমন একটা স্ফীতির সঞ্চার হয়, উপস্থিত সম্ভ্রান্ত জন-সঙ্ঘে তেমনই একটা চাঞ্চল্য ফুটিল। সকলেই ঝুঁকিয়া লাইনের দক্ষিণে চাহিয়া দেখিল। দীর্ঘ রেলওয়ে লাইন গিয়া দূরে ঐ একটা পাহাড়ের গায়ে মিশিয়াছে, সেখানে বাঁক। দেখিলে মনে হয়, পাহাড়টা যেন রেলওয়ে লাইনকে হাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে। দলের একজন কহিয়া উঠিল, "আর ছ মিনিট—" আবার সকলে সেই পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—ও কি! পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া গাঢ় কালো কালির মত কি ও আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে! কালিটা ক্রমে আকাশের সমস্ত তরল নীল রঙটুকুকেও ঢাকিয়া দিতেছে! ও যে মেঘ! দৈত্যের মত বেগে সে ছুটিয়া চলিয়াছে—এখনই যেন সারা বিশ্বে কি একটা প্রলয় হানিবে! নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! অধীর আগ্রহে পুনঃপুনঃ তিনি ঐ পাহাড়ের কোলে লাইন গিয়া যেখানে মিশিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় দূরে একটা বংশী-ধ্বনি শুনা গেল। সকলে সৌৎসুক্যে সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল—ঐ যে দূরে কৃষ্ণ বিন্দুর

করিয়াই যেন নবাবকে অবজ্ঞা করিতেছে, অপমান করিতেছে! নবাবের ইচ্ছা হইল, নামিয়া গিয়া সকলকে আগাগোড়া চাব্‌কাইয়া দেন—বেয়াদবির চূড়ান্ত শাস্তি হয়!

গৃহে ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া নবাব আদেশ দিলেন, "এখনই এ সমস্ত সাজসজ্জা ছিঁড়ে ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেলো—এখনই—এখনই।"

সকলে অবাক হইয়া নবাবের মুখের পানে চাহিল। নবাব তাহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন।

* * *

রাত্রি গভীর। দিনের বিরাট উত্তেজনা ও নৈরাশ্যের অবসরে সাঁতে রুমার প্রাসাদে সমস্ত জনপ্রাণী নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে অবিশ্রাম ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। শুধু আলোকোজ্জ্বল শয়ন-কক্ষে নবাব বসিয়া আছেন—মাথায় তাঁহার দুশ্চিন্তার রাশি। এই যে ত্রিশ হাজার লোকের সম্মুখে আজ দারুণ অপমানটা ঘটিয়া গেল—শত্রু হেমারলিঙের ষড়যন্ত্রে যে কথা দিয়াও তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিল না—ভাবনা ইহা লইয়া নহে। এই সকলের পিছনে অন্ধকারময় এক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি টিউনিসে—বাড়ী, কারবার, জাহাজ—সমস্তই এখন বে'র করুণার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে—আইন-কানুনহীন, কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত এক দর্পিত বর্ব্বরের কবলে! নবাব তাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন, কোনদিকেই কূল পাইতেছিলেন না।

সহসা দ্বারে কে করাঘাত করিল। নবাব কহিলেন, "কে?"

ভৃত্য নিল্ কহিল, "আমি। একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

"ভিতরে এসো।"

ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া নবাবের হাতে একখানা নীল খাম দিল। নবাব কম্পিত হস্তে মোড়ক ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম বাহির করিলেন, আলোর সম্মুখে ধরিলেন, এ কি! মোরা! মোরা টেলিগ্রাম করিয়াছে! ডিউক মোরা! কি—কি—কি খবর!

নবাব স্পষ্ট পড়িলেন, "পোপোলাস্কা মারা গিয়াছে। কর্সিকায় শীঘ্র সদস্য নির্ব্বাচন। অফিস হইতে আপনার নাম গিয়াছে।"

সদস্য! অর্থাৎ কর্সিকার ডেপুটি! তাহার অর্থ—মুক্তি—মুক্তি মুক্তি! ভয় হইতে মুক্তি, নৈরাশ্য হইতে মুক্তি, সমস্ত ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি! ডেপুটি হইলে আর ভয় নাই,—বিষয় রক্ষা পাইবে—সব রক্ষা পাইবে! বে'র সাধ্য নাই, নবাবের সম্পত্তি গ্রাস করে—উড়াইয়া দেয়! লক্ষ হেমার-লিঙ্ বিপক্ষে দাঁড়াইলেও কর্সিকার ডেপুটির সম্পত্তিতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। "ডিউক—ডিউক—" বলিয়া আনন্দের আতিশয্যে নবাব টেলিগ্রামখানা বুকে চাপিয়া ধরিলেন, পরে কহিলেন, "এ টেলিগ্রাম কে নিয়ে এল? কোথায় সে পিয়ন?"

ভৃত্য কহিল, "ঘরের বাইরেই সে দাঁড়িয়ে আছে—একটা সই দিতে হবে।"

নবাব কহিলেন, "তাকে এখানে আনো—"

পিয়ন আসিলে নবাব কহিলেন, "তুমি এই টেলিগ্রাম এনেছ?"

পিয়ন অভিবাদন করিয়া কহিল, "হাঁ, হুজুর।"

রসিদ সহি করিয়া পিয়নের হাতে তাহা দিলে সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। নবাব কহিলেন, "দাঁড়াও।" পিয়ন দাঁড়াইল। তারপর নবাব আপনার বড় জামার পকেটে হাত ঢুকাইয়া মুঠি ভরিয়া স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিলেন,—যত ধরে। পরে পিয়নের হাতে তাহা ঢালিয়া দিয়া নবাব কহিলেন, "তোমার বখশিস্—বখশিস্—যাও, নিয়ে যাও—"

পিয়ন নবাবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। রূপকথার নায়কের মতই সহসা অপ্রত্যাশিত-ভাবে এতটা বিপুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া আনন্দের আবেগে সে যেন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের বিচ্ছেদস্থানের নির্দ্দেশ

আর্য্যগণ মধ্য আসিয়াতে আসিয়াই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হন, পুরাতত্ত্বের এই সিদ্ধান্তের সহিত অনেকেই সুপরিচিত। কিন্তু মধ্য আসিয়ার ঠিক্ কোন্ স্থানে সেই বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়—তাহা বোধ হয় সকলের নিকট সুবিদিত নহে। আমরা পুরাতত্ত্বের সেই সন্ধান প্রদান করিবার জন্যই উপস্থিত প্রবন্ধের প্রবর্ত্তন করিতেছি।

মধ্য আসিয়াতে পুরাকালে সুগ্‌ডিয়ানা নামক একটী প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ ও অগ্ন্যুপাসকদিগের আদিনিবাসরূপে প্রসিদ্ধ। এই সুগ্‌ডিয়ানার আদিরূপ 'সুখ্‌দা'। ইহা 'সুখদ' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যগণ এস্থানে সুখে বাস করিতেন বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পারসীকদিগের 'বেণ্ডিডাড্' নামক গ্রন্থে ইহা স্বর্গস্থানরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গস্থান হইলেও এখানে আর্য্যদিগের বহুকাল অবস্থান ঘটে নাই—ঘটনাক্রমে তাঁহাদিগকে এখান হইতেই বিভিন্নদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হয়। 'ভারতকল্পদ্রুম' (Cyclopedia of India) নামক গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ—

"According to Bunsen (III p 584) the separatin of the Aryans was prior to their leaving Sogd. Sogdiana in Samarcand formed the first settlement of the Aryans. Sughda, afterwards spelled Sugdia and commonly Sugdiana is pre-eminently the country, as being the home of the fire-worshippers. It is described in the Vendidad as in 38th. degree of latitude, where Marakanda (Samarcand) is situated, a paradisiacal land, fertilized by the Sogd, so that Sodga and Paradise are used synonymonsly by the later writers." Cyclopaedia of India by Balfour.

"বান্‌সেনের মতে সুগড্ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই আর্য্যদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়। সমরকণ্ডের সুগ্‌ডিয়ানাই আর্য্যদিগের প্রথম অধিষ্ঠানরূপে নির্ম্মিত হয়। সুগড্ পরে সুগডিয়া রূপে লিখিত এবং সাধারণতঃ সুগ্‌ডিয়ানা রূপে খ্যাত হয়। ইহা বিশেষভাবে অগ্নিপূজকদিগের আদিস্থান। বেণ্ডিডাডে ইহা ৩৮ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তথায় মরকণ্ড বা সমরকণ্ড অবস্থিত। সুগড্ দ্বারা ইহার উর্ব্বরতা সম্পাদিত হওয়াতে ইহা স্বর্গীয় স্থান হইয়াছে। তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকগণ কর্ত্তৃক সুগ্‌ড ও স্বর্গ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

উপরে আমরা যে মরকণ্ড বা সমরকণ্ড সুগ্‌ডিয়ানার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছি; তাহাতেই আর্য্যদিগের বিচ্ছেদের ইতিহাস সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই 'সমরকণ্ড' 'সমরখণ্ড' নামেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। 'খণ্ড' শব্দ 'ভূখণ্ড' শব্দেরই সঙ্ক্ষেপমাত্র। সুতরাং 'সমরখণ্ড', নাম 'সমরের স্থান' অর্থই প্রকাশ করে। আর্য্যগণের পরস্পরের মধ্যে কলহমূলে এখানে সমর বা যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে অনেকে আহত হইয়া মৃত হয় তাহা হইতেই এই স্থানের নাম সমরখণ্ড হইয়াছে এই নামের মধ্যে এই ইতিহাসই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুতরাং এই নাম হইতে আর্য্যগণের মধ্যে ঘোর আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া তাহা যুদ্ধে পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হইয়াই যে তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত করে তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

সমরকণ্ড এখনও নিজ নামেই বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং ইহার অবস্থান দ্বারাই সুগ্‌ডিয়ানার অবস্থান আমরা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। সমরকণ্ড, হিন্দুকুশের উত্তর ও টায়েন্‌শান পর্ব্বতের পশ্চিম। ইহাতে সুগ্‌ডিয়ানাও, এতন্মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই হয়। সুগ্‌ডিয়ানা সুখ বা সুখদ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া আমরা উপরে বলিয়াছি। আমাদের পুরাণেও, আমরা এই নামের সন্ধান প্রাপ্ত হই। মৎস্য পুরাণে যেমন 'সুখোদয়' নামক বর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়—তেমনই 'সুখ' নামক ভূভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

নারদস্য চ কৌমারং তদেবচ সুখোদয়ম্॥ ২২
এতে শান্তভয়াঃ প্রোক্তাঃ প্রমোদা যেচবৈশিবাঃ॥
আনন্দাশ্চ সুখাশ্চৈব ক্ষেমকাশ্চ নবৈঃ সহ।
বর্ণাশ্রমচারযুতা দেশাস্তে সপ্তবিশ্রুতাঃ॥"

৩৮—১২২শ অধ্যায়।

"নারদগিরির বর্ষের নাম কৌমার। ইহার অপর নাম সুখোদয়"। ৩৭ "শান্তভয়, প্রমোদ, শিব, আনন্দ, সুখ, ক্ষেমক এই সাতটী বর্ণাশ্রমাচার সমন্বিত বিখ্যাত জনপদ তথায় বর্ত্তমান।"

'সুখোদয়' ও 'সুখ' উভয়ই শাকদ্বীপের অন্তর্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য আসিয়া হইতে পশ্চিমে শাকদ্বীপ প্রসারিত ছিল বলিয়া অনুমান করার যথেষ্ট কারণই বিদ্যমান আছে। সুতরাং পুরাণের 'সুখ' ও 'সুখোদয়' যে মধ্য আসিয়ায় সুগ্‌ডিয়ানারই সহিত অভিন্ন হইতে পারে তাহা মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না। পুরাণে 'সুখের' সঙ্গে অপর যে সমস্ত জনপদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—তৎসমস্তের মধ্যে অপূর্ব্ব

স্বর্গীয়ভাবই প্রকটিত। 'নব' নামে যেন নূতনাধিষ্ঠানেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই নবাধিষ্ঠানেরই সহিত একত্র উক্ত হওয়ায় 'সুখ'ও যে নবাধিষ্ঠান তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে সুগ্‌ডিয়ানা যে পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের দ্বারা প্রথম আর্য্যাধিষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহারই সমর্থন পাওয়া যায়। সুগ্‌ডিয়ানার পূর্ব্বাবস্থিত "টিয়েন্‌সান্" নামক যে পর্ব্বত আছে ইহার অর্থ স্বর্গীয় পর্ব্বত। ইহাতে সুগ্‌ডিয়ানা যে পারসীকধর্ম্মগ্রন্থে স্বর্গীয় স্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে তাহার বিশেষ পোষকতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে পুরাতত্ত্ব ও পুরাণ উভয় প্রমাণের দ্বারাই আর্য্যদিগের প্রথমোপনিবেশের স্থানরূপে পরম সুখের আধার বলিয়া যে তাহা সুখ, সুখোদয় বা সুগ্‌ডিয়ানা নামে অভিহিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার রাজধানীর সমরকণ্ড নামে সেই সুখের স্থান সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াই যে আর্য্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সুখ ও শান্তির অন্বেষণে প্রেরণ করে—তাহারই ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"জোন্ অফ্ আর্কের" চরিত্রের একদিক

(ইংরাজী হইতে)

"ঐ যে দেখিলাম, একটি লোক ওখানে হাত পা বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে ও কে?"—এই কথাজোন্ তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"একজন বন্দী।"

"তাহার অপরাধ?"

"সামরিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া সে আমার বিনা অনুমতিতেই সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।"

"এখন ইহাকে কি শাস্তি দিতে চাও?"

"মৃত্যু!"

"আমি উহার সব কথা শুনিতে চাই। ও একজন সুনিপুণ যোদ্ধা সন্দেহ নাই!"

"ও আমার নিকট কয়েক দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তখন তাহাতে সম্মত হইতে পারি নাই—; এজন্য সে আমার বিনা অনুমতিতেই সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রস্থান করে। ইতিমধ্যে আমরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়া পড়ি এবং গতকল্য মাত্র সন্ধ্যার সময় সে আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।"

"সে কি নিজের ইচ্ছায় ফিরিয়া আসিয়াছে।"

"হাঁ।"

"যাও, তাহাকে শীঘ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার

পদদ্বয়ের দৃঢ় বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাকে জোনের সম্মুখে লইয়া আসিলেন।

কি সুগঠিত চেহারা! পূরা সাত ফুট। সৈন্য হইবার উপযুক্ত বটে। সুদৃঢ় মুখাবয়ব। এক গুচ্ছ, ঘন স্বর্ণবর্ণ অমার্জ্জিত, কেশরাশি বিপুল মস্তককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অস্ত্রের মধ্যে এক গাছি বৃহৎ কাটারী তাহার চর্ম্মবন্ধনীতে বিলম্বিত। কিন্তু তাহার শোকাবনত বদন খানি তাহার জীবনের হতাশার ইঙ্গিত করিতেছে। যেন তাহার জীবনের সমস্ত সুখ সাধ, আশা, ভরসা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত। জোন্ তাহাকে ধীর, মৃদুস্বরে —কহিলেন, "তোমার হাত তোল।" এতক্ষণ সে তাহার মুখ নীচু করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ সে এইরূপ স্নেহপূর্ণ, মধুর, কোমল স্বর শুনিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে হাত দু'খানি উচু করিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে জোন্ খাপ হইতে নিজের তরবারী খানি লইয়া তাহার হস্ত বন্ধন স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার পার্শ্বস্থিত সেই কর্ম্মচারী কিছু ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন।

"আঃ মহাশয়া!"

"কি, তুমি কি বলিতেছ?"

"ও যে বন্দী।"

গম্ভীর ভাবে জোন্ উত্তর করিলেন

"হাঁ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি উহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী—কর্ম্মচারী।" এই বলিয়া তিনি তাহার হস্তের বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিলেন। এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বলিয়া উঠিলেন "ওঃ কি ভীষণ! রক্ত—রক্ত!! অসহ্য অসহ্য! আমি তাহা আর দেখিতে ইচ্ছা করি না।" আবার কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা, উহার হাত বাঁধিবার জন্য আমাকে একখণ্ড দড়ি দাও।"

প্রত্যুত্তরে সেই কর্ম্মচারী কহিলেন, "একার্য্য সেনাপতি পদের উপযুক্ত নহে। আমি ইহার জন্য অপর লোককে নিযুক্ত করিতেছি।"

"অপর লোককে? একার্য্য আমার অপেক্ষা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারে—এমন লোককে অন্বেষণ করিতে তোমার বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। আর যে ইহাকে বাঁধিয়াছে তাহার অপেক্ষা আমি সহস্র গুণে ভাল বাঁধিতে পারি। আমি যদি বাঁধিতাম তাহা হইলে ইহার হাতের মাংস রজ্জু দ্বারা এরূপ নির্দ্দয় ভাবে কাটিত না।"

যতক্ষণ জোন্ তাহার হাত দু'খানি বাঁধিয়া দিতেছিলেন সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখের দিকে এক একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

জোন্ এই কার্য্য করিতে পারিয়া মনে মনে বিশেষ প্রীতা হইলেন এবং সেই সৈনিকের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "এখন যথার্থ বল, সৈনিক, তুমি কি করিয়াছিলে?"

ধীর, নম্রস্বরে সে কহিল "তবে বলি শুনুন, আজ দুই বৎসর গত হইল আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া আমার অতি আদরের তিনটি সন্তান তাঁহার অনুগমন করিল। সে দুই বৎসর ভীষণ মন্বন্তর, ভগবানের ইচ্ছা কখনই

অপূর্ণ থাকে না; আমার চক্ষের সমক্ষে তাহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিল। আমি নিজ হস্তে তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিয়া পিতার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলাম। হায় হতভাগ্য আমি তবুও বাঁচিয়া রহিলাম। জগতে আপনার বলিতে কেবল একমাত্র স্নেহময়ী স্ত্রী জীবিত রহিল। অবশেষে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া তাহাকেও আক্রমণ করিল। আমি অভাগিনীর মৃত্যু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অধ্যক্ষের নিকট কয়েক দিনের বিদায় চাহিলাম, কিন্তু তিনি নির্দ্দয় ভাবে হতভাগ্যের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিলেন। বলুন তাহার মৃত্যুর সময় তাহাকে না দেখিয়া কি করিয়া থাকিতে পারি? হায়! সে যে আমাকে বড় ভাল বাসিত। আমি বিনা অনুমতিতেই অধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারে গৃহপানে ছুটিলাম। তাহার মৃত্যু দেখিব বলিয়াই গিয়াছিলাম; তাহাই হইল। আমি তাহাকে সযত্নে সমাধিস্থ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সৈন্যদল চলিয়া গিয়াছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে হাঁটিয়া গতকল্য রাত্রে এখানে পহুঁছিয়াছি।"

জোন্ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে অনুচ্চস্বরে কহিলেন "ইহা সত্য বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। যদি সত্য হয় তাহা হইলে ক্ষমা করা যাইতে পারে; যদি মিথ্যা হয়—আর যদি সত্যই হয়।" হঠাৎ তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন,

"আমার দিকে চাও। আমি তোমার চোখ দেখিতে চাই!"

চারি চক্ষু একসঙ্গে মিলিবামাত্র জোন তাঁহার কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আমি ইহাকে মুক্তি দিলাম, তুমি এখন নিজের কার্য্যে যাইতে পার।"

তাহার পর তিনি সেই সৈনিক পুরুষের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "অধ্যক্ষের বিনা অনুমতিতে সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে কঠোর সামরিক নিয়মানুসারে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য তাহা কি তুমি জানিতে?"

"বিলক্ষণ জানিতাম।"

"তবে কেন আসিলে?"

"মরিবার জন্য। আমার জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও সাধ নাই; আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। তুচ্ছ আমার জীবন।"

এই বলিয়া সে অতি বিনম্র ভাবে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

"ছিঃ তোমার মাতৃভূমি ফ্রান্স থাকিতে! তোমার প্রিয় জন্মভূমি এখনও শত্রুহস্তে মনে আছে? দীর্ঘজীবি হও। যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন ফ্রান্সের সেবা করিবে।"

"আমি আপনার সেবা করিব।"

"তুমি ফ্রান্সের জন্য যুদ্ধ করিবে।"

"আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করিব।"

"তুমি ফ্রান্সের সৈন্য হইবে।"

"আমি আপনার সৈন্য হইব।"

"তুমি তোমার ফ্রান্সকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবে।"

"আমি আমার মনঃপ্রাণ আপনার নিকট সমর্পণ করিব। আমার হৃদয় অন্তঃকরণ (যদি থাকে) আপনার পদে উৎসর্গ করিব। আমার বলবিক্রম আপনার মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করিব। আমার জীবনের কোনও সাধ ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমার বাঁচিয়া থাকাই প্রয়োজন। আপনিই আমার মাতৃভূমি, আপনিই আমার ফ্রাঁস্—আপনিই আমার যথাসর্ব্বস্ব। আমি আর কাহাকেও চাহি না।"

জোন্ ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার প্রতি লোকটির এরূপ প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিতা ও অতিমাত্র পুলকিতা হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

"হাঁ, তোমার নামটি কি?"

ধীর, গম্ভীর ভাবে সে বলিল "আমাকে ইহারা 'বামন' বলিয়া ডাকে; কিন্তু আমার বিশ্বাস ইহা বিদ্রূপবাক্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

জোন্ আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি আমার দেহরক্ষক বা পার্শ্বচর হইতে ইচ্ছা কর?"

"সে সৌভাগ্য কি আর আমার হইবে?"

"অবশ্যই হইবে। আজ হইতে তুমি আমার দেহরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলে এবং ইহার উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদাদিও তুমি অচিরে পাইবে।"

তৎপরে জোন্ অদূরে সজ্জিত যুদ্ধাশ্ব সমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন "তোমার মনোমত একটি অশ্ব বাছিয়া লইয়া যুদ্ধযাত্রার সময় আমার অনুগমন করিবে।"

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা

প্রাকৃতিকী। *

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। নানা মাসিক পত্রিকায় ইঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। ইনি কতকগুলি প্রকাশিত ও কয়েকটী অপ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুচ্ছাকারে "প্রাকৃতিকী" নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে বত্রিশটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি খুব সরল ভাষায় লিখিত। বর্ত্তমান যুগে যে সকল জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে, এই পুস্তকে তাহার প্রাঞ্জল বর্ণনা কিয়ৎপরিমাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

জড় বলিয়া কোন জিনিষই বিশ্বে নাই। জড়ের সূক্ষ্মতম কণা ভাঙ্গিয়া সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করিলে, অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি ইলেক্ট্রনের মূর্ত্তি গ্রহণ

* প্রাকৃতিকী—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য ২৲ টাকা।

করে। ইলেক্ট্রনগুলি খাঁটি বিদ্যুতের কণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিদ্যুতেরই রূপান্তর। জগতে জড় নাই, এক শক্তিকে লইয়াই বিশ্ব। ক্রুক্‌স্ সাহেব গত শতাব্দীর শেষে জড়ের এই যে শক্তি-মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন; তাহা "বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নে" প্রকটিত হইয়াছে।

বিপুল শক্তিরাশি খুব নিবিড়ভাবে রেডিয়মে লুক্কায়িত থাকে এবং রেডিয়ম নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, তখন ঐ শক্তিই তাপের প্রকাশ করে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এই প্রকার বিশাল শক্তি-স্তূপ সঞ্চিত আছে, এবং সেই সযত্ন-রক্ষিত শক্তিভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া প্রকৃতিদেবী জগতে ভাঙা গড়ার ভেল্কি দেখান। রেডিয়মের ন্যায় গুরু ধাতু যখন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ত্যাগ করিয়া লঘুতর বস্তুতে পরিণত হইতেছে, তখন লঘু পদার্থের উপর প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিয়া কেন তাহাকে গুরুতর পদার্থে পরিণত করা যাইবে না! এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করিতে পারিলে লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা কঠিন হইবে না, ইহা "পরশ-পাথর" প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

"রাসায়ণী বিদ্যার উন্নতি" "ধাতুর কয়েকটী গুণ;" "বর্ণচ্ছত্র," "নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা," "অদৃশ্য—কিরণ," "ডপলার সাহেবের সিদ্ধান্ত," প্রভৃতি প্রবন্ধে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নের কতকগুলি তথ্য সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

"দধি," "চা-পান," "কেরোসিন তৈল" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে অতি সহজে দধি-ভোজন, ও চা-পানের উপকারিতা ও কেরোসিনের উৎপত্তির কথা বুঝানো হইয়াছে।

"মঙ্গলগ্রহ," "পৃথিবীর শৈশব," "নূতন নীহারিকাবাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধে কতকগুলি জ্যোতিষের কথা আলোচিত হইয়াছে।

"মনুষ্য-সৃষ্টি," "জীবনটা কি?" প্রভৃতি প্রবন্ধে জীব-বিদ্যার কতক কথা লেখা হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হয় ততই সুখের বিষয়। প্রকৃতির সহিত পরিচয় করিতে হইলে প্রকৃতি-দত্ত ভাষা অবলম্বন করা উচিত—মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক সত্য আলোচনা করার প্রয়োজন। মাতৃভাষার সহায়তা ব্যতীত জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে পারে না—এবং তাহা না হইলে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুরই উন্নতি সাধিত হয় না।

এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অধিকতর প্রচলিত হইলে, বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালী শুধু বাজে বই পড়িয়া বৃথা সময়-ক্ষেপ করিতেছে না, মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে এবং জীবন-সংগ্রামের জন্যও সজ্জিত হইতেছে।

জীবন সংগ্রাম ক্রমশঃ আমাদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রামে প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃতি দেবীর অনন্ত শক্তি আমরা কি প্রকারে আমাদের কাজে লাগাইতে পারি তাহা না জানিলে, আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রকৃতির উপাসনা আবশ্যক। এমন এক সময় ছিল যখন এই স্বর্ণ-প্রসূ বাঙ্গলা দেশে জীবনে ঝঞ্ঝাবাত কম ছিল, যখন জীবন একটা সংগ্রাম বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু এখন জীবন একটী কঠোর সংগ্রাম। সেজন্য এক্ষণে আমাদের পক্ষে "গীত-গোবিন্দের" পরিবর্ত্তে "প্রাকৃতিকীর" মত গ্রন্থ পাঠ করা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। জগদানন্দ বাবু এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



সরস্বতী

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২১ [১০ম সংখ্যা

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর

বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যাপকতা ও সমস্যাবলী

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর আমাদের সকলেরই মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বৈদেশিক ঘটনাবলীর উপর এতাদৃশ ঐকান্তিক মনোযোগ বোধ হয় আর কখনও লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই প্রবল চিত্তাকর্ষণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই যুদ্ধ যেরূপ বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের কোনও যুদ্ধেই হয় নাই। প্রথমতঃ একদিকে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া অপরদিকে রুষিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও সার্ভিয়া এই সাতটী রাজ্য এই সমরে লিপ্ত। আবার জাপানও ইংলণ্ডের মিত্রতাসূত্রে জর্ম্মণির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। সম্প্রতি তুরস্ক জর্ম্মণির স্বপক্ষ হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন নয়টী রাজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই ভীষণ যুদ্ধস্রোত আরো কতদূর গড়াইবে কিছুই বলা যায় না। ইটালি আপাততঃ নিরপেক্ষতা (Neutrality) অবলম্বন করিলেও পরে কি করিবেন তাহা অনিশ্চিত। আবার বল্‌কান্ প্রদেশে রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া কি করিবেন তাহাত এখনও অবধারিত হয় নাই। অপরদিকে আমরা দেখিতে পাই যে এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে এতগুলি রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা হইয়াছে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে কখনও একই ঘটনাসূত্রে এতগুলি রাজ্যের ও জাতির ভাগ্য পরীক্ষিত হয় নাই। আমাদের সমকালীন এই বিপুল বিপর্য্যয়ের কারণ অবধারণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

যুদ্ধের ইতিপূর্ব্ব ঘটনা সমূহ।

এই যুদ্ধের ইতিপূর্ব্ব ঘটনাসমূহ সকলেই অবগত আছেন। গত ২৮শে জুন অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ও তদীয় পত্নী বস্‌নীয়া প্রদেশের সেরাজোভা নগরে হত হন। তাঁহাদের হত্যাকারিগণ সার্ভজাতীয় এবং

তাহাদের চক্রান্ত সীমান্তবর্ত্তী স্বাধীন সার্ভিয়া দেশে সংঘটিত হয় বলিয়া সংবাদ আসে। পরে ২৪শে জুলাই অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে যে সর্ত্তপালন পত্র (ultimatum) লিখেন হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে :,

সার্ভিয়া বহু কালাবধি অষ্ট্রীয়ার অধিকৃত বস্‌নীয়া ও হার্জগভিনা প্রদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন এবং তজ্জন্য উক্ত দুই প্রদেশে অনেকবার শান্তিভঙ্গ এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে। সম্প্রতি যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীর হত্যা সার্ভিয়ারাজের কর্ম্মচারিগণের প্ররোচনায় ও সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখন অষ্ট্রীয়া এই বিপদের নিরাকরণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সার্ভিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরোধী আপন প্রজাগণকে সমুচিত শাসন করিবেন, বিদ্যালয় সমূহে অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিদ্বেষোদ্দীপক শিক্ষা নিবারণ করিবেন এবং স্বকীয় রাজ্যের ভিতর অষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানতা স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত স্বীয় গেজেটে সার্ভিয়া গবর্ণমেণ্টকে একটী ক্ষমাপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই সকল সর্ত্তে সন্তোষজনক উত্তর না আসিলে যুদ্ধারম্ভ হইবে।

ইহার উত্তরে সার্ভিয়া কতকগুলি দাবিতে সম্মত হন। কিন্তু অপরগুলিতে, বিশেষতঃ স্বরাজ্যে পররাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানতা, আপন স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সার্ভিয়া অপর কাহারও মধ্যস্থতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়া ইহাতে সম্মত না হই য়াসা র্ভিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে রুষিয়া সার্ভিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এবং জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়ার স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রুষিয়া এবং তদীয় মিলিত রাজ্য ফ্রান্সকে আক্রমণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যোগ দিবার কথা উঠে নাই। কিন্তু ফ্রান্স ইংলণ্ডের মিলিত রাজ্য (allied state) না হইলেও মিত্ররাজ্য (friendly state)। বিশেষতঃ জর্ম্মণি ফ্রান্সকে বিধ্বস্ত করিলে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ। তখন ইংলণ্ডের এ যুদ্ধে যোগদান যেন অবশ্যম্ভাবী হইল। এদিকে ফ্রান্সকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত জার্ম্মণি বেলজিয়াম রাজ্যের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনী ঐ পথে চালনা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের এক সন্ধিসর্ত্তে ইংলণ্ড বেলজিয়মের রক্ষক হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং জর্ম্মণির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত ইংলণ্ডের গত্যন্তর রহিল না।

এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার কিছুদিন পরেই একদিকে জাপান এবং সম্প্রতি অপরদিকে তুরস্ক যোগ দিয়াছেন।

কতকগুলি প্রশ্ন

স্থূলতঃ ঘটনাবলী এই। এখন সাময়িক ঘটনা হইতে মন অপসৃত করিয়া সেইগুলির নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে আমাদিগের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। চিন্তা করিলেই কতকগুলি প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে উদিত হয় :—

১। বস্‌নীয়া ও হার্জগভিনার সহিত সার্ভিয়ার কি সম্পর্ক ?

২। রুষিয়ার সহিত সার্ভিয়ার কি সম্বন্ধ ?

৩। জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়ার সহায় কেন ?

৪। জর্ম্মণি ও রুষিয়ার বিবাদে ফ্রান্স কেন লিপ্ত ?

৫। ইংলণ্ড কেন রুষিয়া ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ?

এখন একে একে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আলোচনা করিতে হইবে।

(১)

সার্ভিয়া, বসনীয়া ও হার্জগভিনা

সার্ভিয়া বল্‌কান ভূভাগের একটী স্বাধীন রাজ্য। অষ্ট্রীয়া, মণ্টিনিগ্রো, গ্রীস্ এবং বুলগেরিয়া এই চারি রাজ্য ইহার সীমান্তবর্ত্তী। সার্ভিয়ার প্রজাগণ সুবিখ্যাত স্ল্যাভ জাতির বংশধর এবং সার্ভো-ক্রোট্ নামক শাখায় নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সার্ভিয়ার বর্ত্তমান সীমানার ভিতর সমগ্র সার্ভো-ক্রোট্ জাতির সমাবেশ হয় নাই। সমগ্র সার্ভো-ক্রোট্ জাতি সংখ্যায় ৮০ লক্ষ হইবে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষের স্বাধীন সার্ভিয়ার ভিতর স্থান হইয়াছে। অবশিষ্ট সার্ভো-ক্রোট্ জাতি অষ্ট্রীয়াধিকৃত বসনায়া, হার্জগভিনা, ড্যালমেটিয়া, ক্রোটিয়া স্লাভেনিয়া এই কয়টী প্রদেশের অধিবাসী। সুতরাং ইহারা অষ্ট্রীয়ার প্রজা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রবল সমজাতীয়তা ভাবের উন্মেষ হওয়ায় এখন আর ইহারা অষ্ট্রীয়ার প্রজা থাকিয়া সন্তুষ্ট নয়। এ দিকে উহাদিগকে তাহাদিগের স্বজাতীয় স্বাধীন সার্ভিয়াবাসী সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতেছে। ফলে সার্ভো-ক্রোট জাতি এখন আর বিভক্ত থাকায় প্রস্তুত নয়। সমগ্র জাতির সমাবেশ করতঃ এক বৃহৎ সার্ভিয়া (Great Servia) গঠন করাই এখন তাহাদের চরম লক্ষ্য। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। যে শক্তির প্রবল উদ্বোধনে সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে ইটালি ও জর্ম্মণি আপন আপন একত্ব (Unity) ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয়তা (Indepeedence) লাভ করিয়াছিলেন, এখানেও আমরা সেই একীকরণ শক্তির প্রবল স্পন্দন দেখিতে পাই। ইটালির ক্ষেত্রে যেমন পীড্‌মণ্ট্ এবং জর্ম্মণির ক্ষেত্রে যেমন প্রুসিয়া চুম্বকের লৌহাকর্ষণের ন্যায় অপরাপর খণ্ড রাজ্যগুলিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, এখানেও তেমনি সার্ভিয়া তাহার সমজাতীয়গণকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিতেছে। এ চেষ্টা সফল হইলে জাতীয় একীকরণ শক্তির (principle of Nationality) আরও একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

অষ্ট্রিয়া, বসনীয়া ও হার্জগভিনা

সার্ভিয়া পক্ষে কথা এই। এখন অষ্ট্রীয়ার স্বত্ব বিচার করা কর্ত্তব্য। সার্ভো ক্রোটীয় গণের সমরাষ্ট্রীয়তা (unification) ভালই হউক বা মন্দই হউক, তাহাতে যে অষ্ট্রীয়ার সমূহ ক্ষতি তাহা সুনিশ্চিত। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তুরস্ক শাসনে সার্ভজাতি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। তখন তুরস্কের বিজীগিষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং তাহার রণসামর্থ্যও তদুপযুক্ত ছিল। খৃষ্টান ইউরোপের সেই দুর্দ্দিনে একমাত্র অষ্ট্রীয়ারাজই পর্ব্বতের ন্যায় সেই বন্যাকে প্রতিহত করেন। বহু

যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ড্যালমেটিয়া ক্রোটিয়া, স্ল্যাভোনিয়া প্রভৃতি স্ল্যাভপ্রধান প্রদেশ অষ্ট্রীয়ার করতলগত হয়। বসনীয়া ও হার্জগভিনা সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা সত্য। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশ তুরস্কের অধিকৃত ছিল। কিন্তু তুরস্কের অত্যাচার ও অশাসন হেতু ঐ সময় স্থানীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। পরে বার্লিন মহাসভায় সমবেত শক্তিমণ্ডল উক্ত দুই প্রদেশের শাসন অষ্ট্রীয়ার উপর ন্যস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় তুরস্কের শাসন কেবল নামে মাত্র স্বীকৃত রহিল। কিন্তু প্রজারক্ষণের যাবতীয় কর্ত্তব্য অষ্ট্রীয়াই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি ১৯০৮ সালে অষ্ট্রীয়া এই দুই প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং অধিকারসূত্রে অষ্ট্রীয়ার স্বত্ব নিরঙ্কুশ রহিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। বস্তুতঃ প্রথম অধিকার ন্যায়তই হউক বা অন্যায়তই হউক, জগতে সকল জাতিই আপনার অধিকৃত কোনও স্থানই স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয় না।

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাচ মেদিনী।
বিনা যুদ্ধং ন দত্তামি পাণ্ডবভ্য পিতামহ।

এই কথায় দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে উত্তর দিয়াছিলেন। তাহা জাগতিক ব্যাপারে চিরদিনই সত্য।

রুষসার্ভ মিত্রতায় অষ্ট্রিয়ার বিপদ

এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য। সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি স্ল্যাভরাজ্যগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। গত বল্‌কান সমরে তুরস্ক বিজিত হইলে পর ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি প্রদেশ বিজেতাগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাহার ফলে সার্ভিয়া ও মন্টিনিগ্রো আয়তন ও জনসংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও আরও একটী গুরুতর কথা আছে। বল্‌কান প্রদেশে প্রাধান্য লইয়া অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়ার বিবাদ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। রুষিয়ার সহিত বল্‌কান রাজ্যগুলির কি সম্বন্ধ তাহা পরে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাই যে সার্ভিয়া ও মন্টিনিগ্রো রুষিয়ার বলে বলীয়ান হইয়াছে এবং সেই সাহসেই তাহারা অষ্ট্রীয়ার অধিকৃত বসনীয়া ও হার্জগভিনা প্রদেশ আপন রাজ্যান্তর্গত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। সুতরাং সব দিক হইতেই অষ্ট্রীয়াকে সাবধান থাকিতে হয়। তবে বর্ত্তমান ব্যাপারে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে বসনীয়া ও হার্জগভিনা প্রদেশে আপন অধিকার শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই অষ্ট্রীয়া সন্তুষ্ট হন নাই, বরং পূর্ব্বোক্ত খুন ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া সার্ভিয়াকে চিরদিনের মত লুপ্ত করিয়া বল্‌কান প্রদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তারেই গূঢ়ভাবে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং সার্ভিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধ যে ন্যায় যুদ্ধ, তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব।

(২)

রুষিয়া এবং বল্‌কান রাজ্যসমূহ

রুষিয়ার সহিত বলকান রাজ্যগুলির সম্বন্ধ মূলতঃ এই। প্রথম কথা,—বলকান

বাসী অধিকাংশ লোকই স্ল্যাভজাতীয়। রুষ সেই স্ল্যাভজাতির সর্ব্বপ্রধান শাখা। দেশ কাল ও দূরত্ব নিবন্ধন বহু পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও স্ল্যাভজাতীয় জনসাধারণের ভিতর এক প্রবল স্বজাতীয়তা নিরন্তর প্রবাহিত আছে। এই আভ্যন্তরীণ ভাবের বাহ্যিক প্রচেষ্টাকে Pan slav movement বলে। স্ল্যাভজাতীয় সকল লোকের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও একত্ব সম্পাদনই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এখন স্বাধীন স্ল্যাভ রাজ্যগুলির ভিতর রুষিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। সুতরাং রুষিয়া সহজেই এই স্ল্যাভ আন্দোলনের নেতা হইয়াছেন এবং বলকান প্রদেশস্থ স্ল্যাভবংশীয়গণ এই জন্যই রুষিয়ার মুখাপেক্ষী। সমধর্ম্মও এই সৌহার্দ্দ্য বন্ধনকে অধিকতর সুদৃঢ় করিয়াছে। রুষ ও বলকানবাসীগণ উভয়েই গ্রীকচর্চ্চ নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী। এই কারণেও তাহাদের সম্পর্ক এত নিকট।

এস্থলে আরও একটী বিষয় বিচারণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে সমস্ত বলকান দেশ তুরস্কের অধিকৃত এবং সমস্ত বলকান জাতি তুরস্কের প্রজা ছিল। রুমানিয়া, সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস বা বুলগেরিয়া কাহারও স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতা লাভ কতক আপন চেষ্টায় এবং কতক রুষের সহায়তায় সাধিত হইয়াছে। গত শতাব্দিতে রুষের সহিত তুরস্কের তিনটী যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধের ফলে গ্রীস ও সার্ভিয়ার স্বাধীনতা তুরস্ক কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের স্বপক্ষ হওয়ায় রুষ পরাজিত হয়। কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও দুই বৎসরের মধ্যে মোল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়া মিলিত হইয়া রুমানিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। তাহার পরই ১৮৭৭-৭৮ অব্দে রুষ-তুরস্ক যুদ্ধ। ইহার ফলে সার্ভিয়া ও গ্রীসের রাজ্যবৃদ্ধি এবং বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা লাভ রুষিয়া কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়। বিগত বলকান যুদ্ধেও রুষিয়া স্বয়ং যোগদান না দিয়াও স্ল্যাভজাতীয় রাজ্যগুলির পরম উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারই জন্য সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতির রাজ্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়া বিরোধী হইতে পারেন নাই।

পরিশেষে আমরা দেখিতে পাই যে রুষিয়ার সহিত বলকান রাজ্য সমূহের সম্বন্ধ অতি নিকট। তাহারা রুষিয়ার একজাতীয় একধর্ম্মাবলম্বী এবং অনেকেই স্বীয় স্বাধীনতা লাভে রুষিয়ার নিকট চিরঋণী। এ দিকে বহিঃস্থ শত্রুরও অভাব নাই। অষ্ট্রীয়া রুষিয়ার বিরোধী এবং বলকান রাজ্য গুলিরও সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে আক্রমণ করিলে ব্যাপার কতদূর গড়াইবে তাহা অনেকে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ সার্ভিয়া আক্রান্ত হইবামাত্র রুষিয়া সশস্ত্র দণ্ডায়মান হইলেন। মন্টিনিগ্রো সমজাতি সার্ভিয়ার সহিত যোগ দিলেন। এমন কি রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াও আপন আপন ক্ষুদ্র বিবাদ মিটাইয়া এই স্বজাতিযুদ্ধে যোগ দিবেন বলিয়া বোধ হয়।

(৩)

জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়া

অতঃপর জর্ম্মণি কেন অষ্ট্রীয়ার সহায়

হইয়াছেন দেখিতে হইবে। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া পরম শত্রু ছিলেন। তখন জর্ম্মণি নামে কোনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল না। তৎকালে জর্ম্মণভাষী জনসমূহ বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রাধান্যহেতু অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বিসমার্কের রাজনীতি কৌশলে এবং মণ্ট্‌কির রণদক্ষতায় প্রুসিয়া বিজয় লাভ করিলেন। তখন উত্তর জর্ম্মণির সমুদয় রাজ্যগুলি প্রুসিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিলে North German confederation প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ জর্ম্মণিস্থিত রাজ্যগুলিও এই যুক্তরাজ্যের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। ফলতঃ জর্ম্মণ দেশে প্রুসিয়া সর্ব্বপ্রধান হইলেন এবং অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ইহাতে অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে চিরবিরোধ হইবারই কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। বিসমার্কের ন্যায় কুশলী রাজনৈতিক জগতে অতি বিরল। তিনি অষ্ট্রীয়াকে মিত্রভাবাপন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কালক্রমে তাঁহার সাহায্যে বলকান প্রদেশস্থ বস্‌নীয়া ও হার্জগভিনা অষ্ট্রীয়ার করতলগত হইল। পরিশেষে অষ্ট্রীয়া পূর্ব্ব শত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়া জর্ম্মণির পরম মিত্র হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্ট্রীয়ার সহিত রুষিয়ার সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রীমীয় যুদ্ধের সময় যখন রুষিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও তুরস্ক কর্ত্তৃক এককালে আক্রান্ত হইলেন, তখন মিত্ররাজ অষ্ট্রীয়ার সহায়তা প্রত্যাশা করিয়া আশাহত হন্। ইহাতে রুষের মনে অষ্ট্রীয়ার উপর বিদ্বেষ-সঞ্চার হয়। পরে ১৮৭৮ সালে রুষ তুরস্ক যুদ্ধের অবসানে অষ্ট্রীয়া বস্‌নীয়া ও হার্জগভিনা অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু অশেষ লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় করিয়াও রুষিয়ার তেমন কিছু লাভ হইল না। এই ঘটনা হইতেই রুষ ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হইল। পরে অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়া উভয়ই বল্‌কান দেশীয় রাজ্যগুলির উপর স্বকীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে যত্ন আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু রুষিয়া অতিশয় প্রবল প্রতাপ। সুতরাং অষ্ট্রীয়া জর্ম্মণির সহায়তা ক্রমশঃ অধিকতর আবশ্যকীয় মনে করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে আরও একটী পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হইল। প্রুসিয়া প্রথমতঃ অষ্ট্রীয়াকে বহিষ্করণ পূর্ব্বক উত্তর জর্ম্মণীর রাষ্ট্রসমূহের একীকরণ করিলেন (১৮৬৬)। তাহার চারি বৎসর পরেই ফ্রান্সের বিজয় সাধন হইলে উত্তর ও দক্ষিণ জর্ম্মণিস্থিত সমুদয় রাষ্ট্রের একীকরণ সংঘটিত হইল। তখন জর্ম্মণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইউরোপের স্থলভাগে অদ্বিতীয়তা লাভ করিল। রুষিয়ার তৎকালীন সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেক্‌জান্দার জর্ম্মণ সম্রাটের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি বিপক্ষ হইলে জর্ম্মণ সাম্রাজ্য কখনই প্রতিষ্ঠিত হইত না। কিন্তু কিছুকাল গত হইলে রুষিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে ইউরোপে জর্ম্মণির সার্ব্বভৌমত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। পরে বলকান ব্যাপারে জর্ম্মণি রুষিয়ার বিপক্ষে অষ্ট্রীয়াকে সাহায্য

দিতে লাগিলেন। ফলে রুষিয়া ও জর্ম্মণির মিত্রতা ভাঙ্গিয়া গিয়া শীঘ্রই শত্রুতায় এবং অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণির শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হইল। সুতরাং বর্ত্তমান ব্যাপারে অষ্ট্রীয়া রুষিয়ার নিকট বিপদাপন্ন হওয়া মাত্র জর্ম্মণির সহায়তা লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

(৪)

ফ্রান্স ও জর্ম্মণি

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়া এবং তদনুচারী জর্ম্মণ রাজ্যগুলি কর্ত্তৃক ফ্রান্স পরাজিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে আল্‌সাস্ ও লোরেন্ নামক দুইটী প্রদেশ তাহার অধিকারচ্যুত হয়। ঐ দুই প্রদেশের প্রজা ফরাসিভাষী হইলেও বিদেশী জর্ম্মণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তখন ফ্রান্সের দুরবস্থা ও অপমানের সীমা রহিল না। এদিকে সমস্ত জর্ম্মণ রাজ্যসমূহ প্রুসিয়ার প্রাধান্যে এক বিশাল যুক্ত-রাজ্যে পরিণত হইল। সেই দুর্দ্দিনে ফ্রান্সের মিত্ররাজ্য ইউরোপে কেহই ছিল না। কিন্তু কালক্রমে রুষিয়ার সহিত জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়ার সৌহৃদ্য ঘুচিয়া গেল। তখন ফ্রান্স ও রুষিয়া জর্ম্মণিকে উভয়েরই শত্রু বোধ করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে আত্মরক্ষামূলক একটি সন্ধি (defensive alliance) সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধির উদ্দেশ্য ফ্রান্স আর কোন শক্তিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রুষিয়া সাহায্য করিবেন এবং রুষিয়া আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সও তথাবিধ সাহায্য করিবেন। ইহাকেই Dual Alliance কহে। রুষিয়ার সহিত এই Dual Alliance আছে বলিয়াই জর্ম্মণি ও রুষিয়ার যুদ্ধ সম্ভাবনা হইবা মাত্র ফ্রান্সও সমরে লিপ্ত হইলেন।

(৫)

ইংলণ্ডের কথা

গত শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ব্যাপারে ইংলণ্ডকে সচরাচর নির্লিপ্তই দেখা যায়। ইহাকেই policy of non intervention কহে। সার্দ্ধশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপ ভূখণ্ডে সর্ব্বসমেত ৫টী মহারণ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের কোনটীতেও ইংলণ্ড প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন নাই। তাহার কারণ এই যে এই ঘটনাবলির কোনটীতে ইংলণ্ডের স্বার্থ (interests) বা সম্মান (prestige) প্রতিহত হয় নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন জর্ম্মণি ইউরোপ ভূভাগে আপন প্রাধান্য স্থাপন করিলেন তখন ইংলণ্ড কোন বিপরীত চেষ্টা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। ক্রমশঃ ইউরোপে দুইটী দল গঠিত হইল। একদিকে জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া ও ইটালি (Triple Alliance) এবং অপরদিকে ফ্রান্স ও রুষিয়া (Dual Alliance)। ইংলণ্ড নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া ইটালিরই কিছু পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ তৎকালে ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিতই তাঁহার ক্রমাগত সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষের প্রধান কারণ মিসর দেশে ইংলণ্ডের অধিকার। রুষিয়ার সহিতও সেইরূপ আফগানিস্থান, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগর সংক্রান্ত নানাবিধ বিবাদ উপস্থিত

হয়। ১৪।১৫ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ সম্ভাবনাই সকলের বিচারণীয় ছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রাজনৈতিক জগতে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। জর্ম্মণি ইংলণ্ডের সহিত এক প্রবল ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন। জর্ম্মণির আপন উপনিবেশ সংস্থাপনের ইচ্ছা হইল। কিন্তু তদুপযোগী নাতিশীতোষ্ণ স্থানগুলি পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের অধিকৃত হওয়ায় জর্ম্মণির মনোরথ অসিদ্ধ রহিল। কালক্রমে জর্ম্মণি বুঝিলেন যে স্থলভাগে তাঁহার শক্তি অব্যাহত হইলেও জলে তাঁহার তদুপযোগী শক্তির অভাব হইয়াছে। তখন জার্ম্মণি রণপোত-নির্ম্মাণে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংলণ্ডকেও সতর্ক হইতে হইল। জর্ম্মণির শত্রুতার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ ফরাসী ও রুষের সহিত বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হইলেন। এদিকে রুষিয়া সেই সময় জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইউরোপে তাঁহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি কমিয়া গেল। ফলে ফ্রান্স ও রুষিয়ার মিলিতশক্তি জর্ম্মণি-অষ্ট্রীয়া-ইটালি হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং উভয়েই ইংলণ্ডের মিত্রতা বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। ইংলণ্ডও তাহাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। ১৯০৪ সালে ইংরাজের সহিত ফরাসীর এবং ১৯০৭ সালে ইংরাজের সহিত রুষের যাবতীয় বিবাদ মিটান হইল। অতঃপর এই তিন রাজ্যের মিত্রতা বর্দ্ধনশীল হইলে জর্ম্মণি ঐ সূত্র ছিন্ন করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯০৬ সালে মরোক্কো, ১৯০৮ সালে বসনিয়া হার্জগভিনা এবং ১৯১১ সালে পুনরায় মরোক্কো লইয়া শক্তিসমূহের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরাজ ফরাসী ও রুষের মধ্যতা ছিন্ন করিতে জর্ম্মণি অসমর্থ হন। আজ সেই মিত্রতাসূত্রে এবং আপন্ন বেলজিয়ামের রক্ষার নিমিত্তই ইংলণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগীত্রয়

(কাউণ্ট টলষ্টয় লিখিত গল্পের অনুবাদ)

আরচেন্‌জেল হইতে একজন ধর্ম্মপ্রচারক জাহাজে করিয়া সোলোভেট্‌স্কের মঠে যাইতে ছিলেন। সেই জাহাজে আরও কয়েকজন তীর্থযাত্রীও যাইতেছিল। সমুদ্র পথে জাহাজখানি বেশ নির্ব্বিবাদেই অগ্রসর হইতেছিল। বাতাস অনুকুল এবং প্রকৃতি শান্ত থাকায় জাহাজের গতির কোন বিঘ্ন হয় নাই। তীর্থযাত্রীরা ডেকের উপর বসিয়া কেহবা ভোজন করিতেছিল কেহবা পাঁচজন লোক লইয়া একটা গল্প ফাঁদিয়া

বসিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয়ও ডেকের উপর বেড়াইতেছিলেন। পদচারণা করিতে করিতে পুরোহিত মহাশয় দেখিলেন কতক গুলা লোক একটা জেলেকে ঘিরিয়া বসিয়া কি শুনিতেছে এবং জেলেটা মধ্যে মধ্যে সাগরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইতেছে। পুরোহিত মহাশয় দাঁড়াইয়া জেলের নির্দ্দিষ্ট সমুদ্রের দিকে দেখিলেন, —কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সৌরকরস্নাত ঊর্ম্মিমালা প্রেমভরে একের উপর অন্যে আসিয়া পড়িতেছে এইমাত্র দেখিলেন। তিনি জেলের কথা শুনিবার জন্য তাহার নিকট আর একটু সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু লোকটা তাঁহাকে দেখিবামাত্র টুপী খুলিয়া নীরব হইল। তাহার দেখাদেখি সমবেত অন্য সকলেও টুপী খুলিয়া পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিল।

পুরোহিত মহাশয় তাহাদের নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"না না আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসিনি তোমরা কি বলছিলে তাই শুনতে এসেচি।"

সমবেত লোকগুলির মধ্যে একজন বণিক সাহস করিয়া বলিল,—"জেলে আমাদের যোগীর গল্প ব'লছিল।"

পুরোহিত মহাশয় রেলিংএর কাছে একটা বাক্স দখল করিয়া প্রশ্ন করিলেন,— "কোন যোগী? বল না কি ব'লছিলে, আমার যে ভারি শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি দেখাচ্ছিলে কি?

আজ্ঞে, ঐ যে দ্বীপ খানা"—এই বলিয়া জেলে সম্মুখে ঈষৎ দক্ষিণ পার্শ্বে একটা কৃষ্ণ বর্ণ দাগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।—"ঐ—ঐ দ্বীপে তিনজন যোগী আত্মার নির্ব্বাণ কল্পে তপস্যা করে।"

পুরোহিত তাহার নির্দ্দেশ মত চাহিয়াও কিছু দেখিতে পাইলেন না; বলিলেন,— "কই হে দ্বীপ কোথা? আমিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না!"

"আমার কাছে দাঁড়িয়ে সোজা দেখলে দেখতে পাবেন,—ঐ—ঐ দূরে! আচ্ছা একটা মেঘের মত কিছু দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক ওর নীচেই, একটু বাঁদিকে, দ্বীপের একটা অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে।—ঐ—ঐ খানটায় দ্বীপ!"

ধর্ম্মযাজক মহাশয় বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার অনভ্যস্ত চক্ষুদ্বয় সূর্য্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রোর্ম্মি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

"কই না বাপু আমি কিছুই দেখতে পেলুম না। যাক, আচ্ছা এ যোগীরা কে?"

"ভারি পুণ্যাত্মা লোক ঠাকুর! অনেক দিন লোকের মুখে তাঁদের কথা শুনেছি কিন্তু দেখা আর ঘটে ওঠেনি; এই গেল বছর তাঁদের স্বচক্ষে দেখে এসেছি।"

এই বলিয়া জেলে গল্প আরম্ভ করিল, —"একদিন মাছ ধরতে ধরতে রাত হ'য়ে গেল, আমি ত বেগতিক দেখে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠলুম; যোগীদের আস্তানা কোথায় তা আমি কিছু জানতুম না। কোথায় যে উঠেছি তাও ঠাওর পেলুম না। সকাল বেলা জায়গা দেখবো ব'লে বেরুলুম; ঘুরতে ঘুরতে একটা মাটির কুঁড়ের কাছে এসে দেখি একজন যোগী দাঁড়িয়ে আছেন;

একটু পরেই আর দু'জন বেরিয়ে এলেন। সবাই মিলে আমায় খাইয়ে দাইয়ে নৌকায় তুলে দিয়ে গেলেন।"

"আচ্ছা তাঁদের দেখতে কেমন?"

"একজন বেঁটে খাটো মানুষটী, পিঠ নুয়ে প'ড়েছে, পরণে তাঁর একটা পুরুতের পোষাক, বয়স বোধ হয় পাঁচকুড়ি পেরিয়ে গেছে; দাড়ীগুলি ধবধবে সাদা আর মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে। দেবদূতের মতই দীপ্তিময় সে মুখ। দ্বিতীয়টী একটু ঢেঙ্গা, তিনি খুব বুড়ো; একটা ছেঁড়া কৃষেণের পরিচ্ছদ গায়ে; দাড়িগুলি খুব চওড়া ধূসর-হরিৎ রঙের। দেখলে বেশ শক্তি সামর্থ্য আছে ব'লে মনে হয়। আমার নৌকাখানা বালিতে পুঁতে গেছল, সেটা তিনি একহাতে মোচার খোলার মতই অনায়াসে জলে ঠেলে ভাসিয়ে দিলেন, আমি হাত দেবার সময়ও পেলুম না। তাঁরও মুখখানি হাসি হাসি, ভারী দয়ার শরীর। তৃতীয়টী সকলের চেয়ে ঢেঙা, সাদা ধবধবে তাঁর দাড়িগুলা, হাঁটুতে এসে ঠেকেছে। দেখলেই যেন কঠোর প্রকৃতির লোক ব'লে মনে হয়; ভ্রূ ঝুলে প'ড়েছে। তিনি এক রকম ন্যাংটাই থাকেন; কোমরে কেবল একটা ছেঁড়া মাদুর জড়ান আছে।"

"তোমার সঙ্গে কথা কইলে কেউ?"

"বেশীর ভাগই চুপ ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন; নিজেদের মধ্যেও খুব কম কথা কচ্ছিলেন। একজন অপরের দিকে চাইতেই অন্যে তাঁর মনের ভাব বুঝে নিচ্ছেলেন। সব চেয়ে ঢেঙা লোকটীকে আমি জিজ্ঞেস করলুম কত দিন তাঁরা সেখানে আছেন, লোকটী রাগের লক্ষণ প্রকাশ করলেন; তখন সবচেয়ে বুড়ো যোগী তাঁর হাত ধরে হাসলেন,—তবে তিনি শান্ত হন। তারপর বুড়োযোগী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন,—"আমাদের দয়া কর।" বস, আর কিছু না!"

জেলে যখন এই সকল বলিতেছিল তখন জাহাজটা ক্রমেই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল।

"ঐ—ঐ দেখুন, এইবার বেশ স্পষ্ট দেখতে পাবেন।" এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বণিক দ্বীপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

ধর্ম্মযাজক চাহিয়া দেখিলেন! এবার সত্যই একটা কৃষ্ণবর্ণ রেখা তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়িল।—সেটা দ্বীপের অস্পষ্ট রেখা। কিয়ৎক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি জাহাজের ডেক ত্যাগ করিয়া কল ঘরে নামিয়া আসিলেন। কলচালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দূরে ঐ যে রেখাটা দেখা যাচ্ছে ওটা কোন দ্বীপ?"

"ওর নাম নেই, এ সমুদ্রে অমন ছোট দ্বীপ আরও অনেক আছে!"

"আচ্ছা, শুনলুম ওখানে তিনজন যোগী আত্মার নির্ব্বাণকামনায় বাস করেন, কথাটা কি সত্য!"

"আমিও তাই শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানিনা। জেলেরা বলে তারা নাকি স্বচক্ষে এই যোগীদের দেখেছে;—হ'তে পারে কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ আজগুবি নয়।"

"আমি ওখানে নেবে যোগীদের দেখতে

চাই। তুমি তার একটা উপায় করে দাও।"

"জাহাজ ওখানে ভিড়োন যাবে না; তবে বোটে করে যেতে পারেন। এ বিষয়ে ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা কইলেই ভাল হয়।"

ক্যাপটেনকে ডাক পড়িল।

তিনি আসিলে ধর্ম্মযাজক মহাশয় বলিলেন,—"আমি একবার ঐ দ্বীপে যেতে চাই, আপনি বোটের বন্দবস্ত করে দিন।"

ক্যাপটেন প্রথমে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,—"অবশ্য তা করে দিতে পারি কিন্তু তাহ'লে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে আমাদের অনেক দেরী হবে। যদি অপরাধ না নেন তাহ'লে একটা কথা বলি, সে বুড়োগুলোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মজুরিই আপনার পোষাবে না। শুনেছি তারা নাকি ভারি নির্ব্বোধ। সমুদ্রের মাছের মত তারা মানুষের কোন কথা বুঝতে পারে না বা কারো সঙ্গে কথা কইতে পারে না।"

"তবু আমি তাঁদের দেখতে চাই। আমি আপনার ক্ষতি পূরণ ক'রব, আপনাকেও যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেব, অনুগ্রহ ক'রে এখন আমায় একখানা বোটের বন্দবস্ত করে দিন।"

ধর্ম্মযাজকের কথার উপর আর 'না' বলা যায় না, কাজেই ক্যাপটেন অগত্যা বোট নামাইতে আদেশ দিলেন। নাবিকগণ বোটে পাল তুলিয়া দিয়া দাঁড় ধরিয়া বসিল এবং একজন হালিয়ান হাইল ধরিল। এইভাবে ধর্ম্মযাজক মহাশয় যোগী দর্শনে যাত্রা করিলেন! একখান চেয়ারের উপর বসিয়া তিনি সেই দ্বীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরাও জাহাজের রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই দ্বীপটী দেখিতে ছিল। একটু একটু করিয়া দ্বীপের পাহাড়গুলা দেখা দিতেছিল। দাঁড়িরা বলিল তাহারা একখানি মৃৎকুটির দেখিতে পাইতেছে। তাহার পর তাহারা যোগীদের দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয় একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলেন বাস্তবিক তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। তিনি দেখিলেন, প্রথম ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তাহার পর দ্বিতীয় এবং সর্ব্বশেষে খর্ব্বকায় যোগী পরস্পর হাত ধরিয়া সমুদ্র তীরে দাঁড়াইয়া আছেন! ক্রমে তাঁহারা দ্বীপের অতি নিকটে আসিয়া পড়িলেন। এবার সাদা চোখেই ধর্ম্মযাজক দেখিলেন দীর্ঘাকৃতি যোগীর কোমরে একখানা ছেঁড়া মাদুর মাত্র জড়ান আছে; দ্বিতীয়টীর গায়ে একটা ছেঁড়া কৃষাণের পোষাক এবং খর্ব্বাকৃতি যোগীর পরিধানে একটী ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ।—তিনজনে হাত ধরিয়া পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

বোট আসিয়া তীরে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় দ্বীপে উঠিয়া গেলেন।

যোগীত্রয় তাঁহাকে নত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাঁহারা ততোধিক নত হইয়া দ্বিতীয়বার প্রণাম করিলেন।

এইবার ধর্ম্মযাজক মহাশয় আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন,—"শুনলুম দেবোপম আপনারা তিন জনে এই দ্বীপে ব'সে আপনাদের আত্মার উন্নতি কামনা আর মানুষের হিত কামনায় আমাদের প্রভু যীশু

খৃষ্টের কাছে প্রার্থনা ক'রছেন! আমি তাঁরই এক দীন ভৃত্য তাঁরই করুণায় মানুষকে সাধ্যমত উপাসনা করতে শেখাই। তাই আপনাদের মত ভগবানের দাসদের আমার দেখতে বড় ইচ্ছা সাধ্যমত উপদেশ দেবারও ইচ্ছে আছে।

যোগীত্রয় একবার পরস্পরের দিকে সহাস্য মুখে চাহিলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ধর্ম্মযাজক প্রশ্ন করিলেন,—"আগে বলুন কি ভাবে আপনারা এখানে ভগবানের প্রার্থনা করেন, কি ভাবে আত্মার মুক্তিকামনা করেন?"

দ্বিতীয় যোগী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রথম যোগীর দিকে চাহিলেন; প্রত্যুত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"ভগবানের পূজা কি করে করতে হয় তা আমরা জানিনা। আমরা শুধু নিজেদের পূজা করে, নিজেদের সেবা করি।"

"তবু আপনারা কি ভাবে উপাসনা করেন?"

"আমরা বলি,—হে ত্রিগুণময়, আমরা তিনটী, আমাদের দয়া কর!'"

সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ যোগী এই কথা বলিবা মাত্র তিনজনে উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া যুক্ত করে বলিলেন,—"হে ত্রিগুণময়, আমরা তিনটী, আমাদের দয়া কর!"

ধর্ম্মযাজক ঈষৎ হাস্য করিলেন।

"তাহলে আপনারাও ভগবানের ত্রিত্বের বিষয় জানেন? কিন্তু আপনাদের উপাসনা ত ঠিক হল না। সুপবিত্র দেবতার মত লোক আপনারা, আপনাদের উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেছে। দেখচি ভগবানের তুষ্টিসাধন ক'রতে আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছে রয়েছে কিন্তু কি কোরে যে তা ক'রতে হয় তা জানেন না। ওরকম ক'রে উপাসনা করে না! আমার কথা শুনুন, আমি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি যা আজ আপনাদের শিখিয়ে দেব তা আমার মনপদ্ধতি মনে করবেন না, ভগবান স্বয়ং এইভাবে উপাসনা করবার কথা বাইবেলে লিখে গেছেন।"

তাহার পর ধর্ম্মযাজক মহাশয় বলিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া ভগবান মানবের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন, কেমন করিয়া মানবের জন্য হুকের আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন ইত্যাদি!

তাহার পর ত্রিত্বের কথা বলিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন,—"পালনকর্ত্তা রূপে ভগবান সংসারে প্রাণী রক্ষা করতে এলেন। শুনুন এইবার উপাসনা পদ্ধতি বলি। আচ্ছা, আপনারাও ব'লে যান সঙ্গে সঙ্গে; বলুন,—"হে পিতা!"

প্রথমযোগী বলিলেন,—'হে পিতা!'

দ্বিতীয়যোগী বলিলেন,—'হে পিতা!'

তৃতীয়যোগী বলিলেন,—'হে পিতা!'

ধর্ম্মযাজক বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"হে স্বর্গবাসী পিতা!"

প্রথমযোগী বলিলেন,—হে স্বর্গবাসী পিতা!" দ্বিতীয় যোগী বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বাধিয়া গেল এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত অতি বৃদ্ধ তৃতীয় যোগী কথাটা মোটেই বলিতে পারিলেন না।

ধর্ম্মযাজক কথাটা পুনরায় আবৃত্তি করিলেন

এবং যোগীত্রয়ও তাহার সহিত কথাটা আবৃত্তি করিলেন। ধর্ম্মযাজক একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ যোগীত্রয় সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার বাক্যের আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। সারাদিন ধরিয়া ধর্ম্মযাজক মহাশয় শ্রমস্বীকার করিলেন, এক কথা দশবার বিশবার এমন কি একশত বার বলিতে হইল; যোগীরাও আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটা ভুল করিলে পুরোহিত মহাশয় তাহার সংশোধন করিয়া পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ করাইতে ছিলেন।

যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা আপনা আপনি সমস্তটুকু আবৃত্তি করিতে শিখিলেন সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজক সে স্থান হইতে নড়িলেন না। দ্বিতীয় যোগীই সর্ব্বপ্রথম আয়ত্ত করিলেন, এবং একাকী সবটুকু আবৃত্তি করিয়া গেলেন ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিলেন; ক্রমে অন্য দুইজনও প্রার্থনা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল; সম্মুখে বিশাল সমুদ্র হইতে ধীরে ধীরে চন্দ্র উদিত হইতেছিলেন। এইবার পুরোহিত মহাশয় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উঠিলেন। তাঁহাদের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনজনেই পুরোহিতমহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে তুলিয়া তিনি সস্নেহ চুম্বন দান করিয়া বলিলেন অতঃপর তাঁহারা যেন তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় উপাসনা করেন। তাহার পর তিনি বোটে করিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন।

বোটে উঠিয়াও তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলেন দ্বীপে যোগীত্রয় মিলিত কণ্ঠে ভগবান যীশুর উপাসনা করিতেছেন। জাহাজে উঠিয়া তাঁহাদের সে উচ্চ কণ্ঠ তিনি আর শুনিতে পাইলেন না বটে কিন্তু চন্দ্রালোকে তখনও তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। তখনও তাঁহারা ঠিক তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ দাঁড়াইয়া ছিলেন; খর্ব্বাকৃতি ও তাঁহার পশ্চাতে তদপেক্ষা দীর্ঘকায় যোগী সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান।

ধর্ম্মযাজক জাহাজে উঠিবামাত্র জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পালে হাওয়া লাগায় পাখীর মত দ্রুত জাহাজ ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তিনি ডেকের উপর একখানি চেয়ার পাতিয়া দ্বীপের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। আরও কিছুক্ষণ তিনি যোগীদিগকে দেখিতে পাইলেন তাহার পর ক্রমেই তাঁহাদের মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। তখনও দ্বীপটী বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল ক্রমে তাহাও অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল; অবশিষ্ট রহিল কেবল চন্দ্রকরোজ্জল ঊর্ম্মিমালার তালে তালে নর্ত্তন!

তীর্থযাত্রীরা ডেকের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; চতুর্দ্দিক নীরব। ধর্ম্মযাজকের শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি পূর্ব্বস্থলে বসিয়া সেই দৃষ্টিপথবহির্ভূত দ্বীপের অভিমুখে চাহিয়া যোগীবরের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যোগীরা আজ উপাসনাপদ্ধতি শিখিয়া নিশ্চয়ই হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছেন! এমন দেবোপম লোককে শিক্ষা

দিবার সুযোগ আজ যিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সেই ভগবানকেও তিনি প্রাণ পুরিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

যেদিকে দ্বীপটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া তিনি এইসব কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার প্রশংসমান দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রকর সাগরতরঙ্গের উপর অগ্নি কণিকার মত স্থানে স্থানে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ রজত সমুদ্রের উপর কি একটী দীপ্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। একি এ? সিন্ধুঘোটক নাকি? অথবা ক্ষুদ্র বোটের উজ্জ্বল পাইল নহে ত? বিস্মিত ভাবে পুরোহিত মহাশয় সেই দিকে চাহিয়াছিলেন।

তিনি মনে করিলেন,—"নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজের পিছু পিছু আর একখানা ছোট জালিবোট আসছে; কিন্তু খুব জোরে আসছে ত! আমাদের জাহাজ ধরে ফেল্লে বলে! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কত দূরে ছিল কিন্তু এরই মধ্যে এত কাছে এসে পড়েছে! কিন্তু না এ ত বোট নয়, কই পাল টাল কিছু দেখছি না ত'! যাই হক, ওটা নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের অনুসরণ কচ্ছে! এই ধরে ফেল্লে বলে!"

সেটা যে কি তাহা তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। মাছ বা নৌকা যে নহে তাহা ধ্রুব সত্য! মানুষের মতই দীর্ঘ, কিন্তু সমুদ্রের মাঝখানে মানুষই বা আসিবে কি করিয়া? তিনি উঠিয়া হালিয়ানকে ডাকিলেন।

"দেখ দেখি ওটা কি?—কি ও?"

এইবার তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। সেই যোগীত্রয় জলের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন। সারা অঙ্গ চন্দ্রকর-স্নাত হইয়া তুষার ধবল হইয়া গিয়াছিল। শুভ্র শ্মশ্রুগুলা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল! ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা প্রায় জাহাজ ধরিয়া ফেলিলেন। যেন সেখানকার কোনই গতি নাই, নির্জ্জীব!

হালিয়ান ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে হাইল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঠাকুর যোগীরা আমাদের পিছু পিছু সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন; সমুদ্র যেন মাটির রাস্তা!"

যাত্রীরা তাহার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া রেলিংএর ধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দেখিল যোগীত্রয় হাত ধরাধরি করিয়া জাহাজের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। সম্মুখস্থ যোগী ইঙ্গিতে জাহাজ থামাইতে বলিলেন। তিন জনে জলের উপর পদ সঞ্চালন না করিয়া অমনই অগ্রসর হইতেছিলেন। জাহাজ থামাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর মুখ তুলিয়া তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হে ভগবানের দাস, আমরা আপনার কথিত উপাসনা পদ্ধতি ভুলে গেছি; যতক্ষণ আবৃত্তি করছিলুম ততক্ষণ বেশ মনে ছিল তারপর একটু থেমে আবার যখন বলতে গেলুম তখন একটা কথা পড়ে গেল; এখন ত আর কিছুই মনে নেই; আবার আমাদের শিখিয়ে দিন।"

পুরোহিত মহাশয় বক্ষে হস্ত রাখিয়া ডেকের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন,—"হে ঈশ্বরসৃষ্ট জীব। তোমাদের কৃত প্রার্থনাই ভগবানের চরণে পৌঁছিবে। আমার সাধ্য কি তোমাদের দীক্ষা দিই! আমার মত পাপীর জন্যও প্রার্থনা কর।"

এই বলিয়া তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাদের প্রণাম করিলেন, তাঁহারা সমুদ্র পথে ফিরিয়া গেলেন। যেস্থানে গিয়া তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন উষার প্রাকাশ অবধি সে স্থান দীপ্তিময় হইয়া রহিল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিপীলিকাদের যুদ্ধ প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার শত্রুদুর্গ আক্রমণপ্রণালীও বিভিন্ন। আমরা পূর্ব্বেই এমাজন (Amazon) জাতীয় পিপীলিকার যুদ্ধপ্রণালীর কথা বলিয়াছি। স্যান্‌গুইনিয়া (Sanguinea) জাতীয় পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া শত্রু গৃহাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের অগ্রপশ্চাৎ অসংখ্য দূত ও সংবাদদাতা ছুটাছুটী করে এবং এইরূপে যাবতীয় সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকায় প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর গতিবিধি সম্পূর্ণ অবগত থাকে। প্রথম দল শত্রুদুর্গে উপনীত হইয়াই এমাজনদের মত তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে না। শত্রুদুর্গের প্রান্তদেশে ইহারা সৈন্য সংস্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে এবং সুযোগ মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আক্রমণকারীদের অভিযানের সংবাদ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলে শত্রুরা অনেক সময় উহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক অনেককে বন্দী করিয়া ফেলে; ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে আবশ্যক মত অধিক সৈন্য আসিয়া ইহাদের দলের পুষ্টি সাধন করে এবং নিয়মমত শত্রুদুর্গকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে।

অবরুদ্ধ পিপীলিকাগণ অবশেষে বাধ্য হইয়া রণসজ্জাপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হয় এবং অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদিগকে ক্রমাগত পরাজিত করিতে করিতে যখন অবরোধকারীরা বুঝিতে পারে যে উহাদের সৈন্যবল সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তখন উহারা সকলে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করে। নতুবা Amazonদের মত ইহাদিগকে কখনও হঠাৎ আক্রমণ করিতে দেখা যায় না।

প্রথমতঃ দুর্গদ্বারগুলি ইহারা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া দুর্গাভ্যন্তরস্থ শত্রু-পিপীলিকদিগকে সে দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার আদেশ করে। সম্পূর্ণ রিক্ত-হস্তে ইহারা বহির্গত হইয়া আসে।

কীট ও গুটী সমস্তই দুর্গাভ্যন্তরে থাকিয়া যায়।

এমাজনদের মত স্যান্‌গুইনিয়াদের রণকৌশলও তেমন নাই। কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত বলশালী এবং আয়তনেও বৃহত্তর।

যাহা হউক আক্রান্ত ও পরাজিত শত্রুগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাওয়ার পর অধিকাংশ সৈন্য দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া গুটী ও কীটগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার প্রতি মনোনিবেশ করে। কতকগুলি সৈন্য আবার পরাজিত ও মুক্ত পিপীলিকাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং ঘটনাচক্রে যদিই বা উহারা লুকাইয়া দুই একটী কীট বা গুটী সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে তাহাও কাড়িয়া লয়। এইরূপে ইহারা লুণ্ঠনকার্য্য যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া তবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়েও ইহারা কখনও বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েনা। কারণ ইহারা জানে তাহাদের আর কোনরূপে আক্রান্ত হইবার বা কোনরূপ বিঘ্ন লাভ করিবার মোটেই সম্ভাবনা নাই। দূরবর্ত্তী এবং বৃহৎ শত্রুদুর্গের লুণ্ঠন সম্পূর্ণ করিতে ইহাদিগের কখনও কখনও অনেকদিন অতিবাহিত হইয়া থাকে।

বিজিত পিপীলিকারা আর কখনও লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত গৃহে পুনরায় সংসার পাতিতে আসেনা।

হুবার (Huber) স্যান্‌গুইনিয়াদের (Sanguinea) যুদ্ধপ্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

প্রাতে দশটায় ইহাদের একদল সৈন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকাদুর্গাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সে স্থানে উপনীত হইয়া ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি কালো পিপীলিকা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া উহাদিগের অনেককে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ফেলিল। এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় অবশিষ্ট আক্রমণকারীরা পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্যগণের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। দলবৃদ্ধি হওয়ার পরও কিছু কাল ইহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল এবং নিজেদের দুর্গে ক্রমাগতই দূত প্রেরণ করিতে লাগিল। এইরূপ সংবাদ প্রেরণের ফলে অবিলম্বে আরও অধিকসংখ্যক সৈন্য আসিয়া ইহাদের দলপুষ্টি করিল। কিন্তু তবুও ইহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইলনা; অবশেষে কৃষ্ণপিপীলিকাগণ দুর্গ হইতে এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া বাহির হইল এবং দুই দলে শীঘ্রই কতকগুলি খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কোনও প্রকার মীমাংসা হইবার বহু পূর্ব্বেই নিগ্রোর পিপীলিকাগণ তাহাদিগের গুটী ও কীটগুলিকে—গৃহের দূরতম প্রদেশে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। এখন যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া ইহারা গুটী ও কীটগুলিকে লইয়া পলায়ন প্রয়াসী হইল। কিন্তু ইহাতে আক্রমণকারীরা বাধা প্রদান করায় অবশেষে বাধ্য হইয়া—যাবতীয় গুটী ও কীটগুলিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া যে যে দিকে পারে পলায়ন করিল। বিজেতারা সে

রাত্রি ও পর দিবস একদল সৈন্যকে পাহারায় রাখিয়া—সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজেদের দুর্গে স্থানান্তরিত করিল।

বুকনার (Buchner) বলেন—

একই জাতীয় পিপীলিকাদের ভিতর যুদ্ধবিবাদ সংঘটিত হইলে অনেক সময়ই এই আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রাম স্থায়ী সখ্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যাই যদি অল্প থাকে। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীরা এরূপ স্থলে মানুষের অপেক্ষা অনেক শীঘ্র ও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে এরূপ সংগ্রামে কেবল নিজেদেরই ধ্বংস সাধিত হইতেছে। এস্থলে সখ্যতা ও একতায় উহাদের উভয় পক্ষেরই উপকার ও মঙ্গল সংঘটিত হইবে। সময় সময় উহারা সম্পূর্ণ বন্ধু ভাবেই—অন্যকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। ফোরেল একবার একটী টেবিলের উপর স্বভাবশান্ত Lepto thorax acervoram জাতীয় পিপীলিকাদের একটী গৃহ সংস্থাপিত করেন এবং তাহার উপর অন্য একটী বিবর হইতে সেই জাতীয় অন্য কতকগুলি পিপীলিকা ছাড়িয়া দেন। ইহারা সংখ্যায় অনেক অধিক ছিল সেইজন্য শীঘ্রই সেই পিপীলিকাগৃহ হইতে পূর্ব্বের পিপীলিকা গৃহীগুলিকে বিতাড়িত করিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিল। গৃহবহিষ্কৃত পিপীলিকারা এ বিপদে কোথায় যাইবে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সুতরাং অগত্যা শত্রু অধিকৃত গৃহাভিমুখেই ফিরিয়া আসিল। প্রতিপক্ষীয়গণ তখন তাহাদিগকে এক একটী করিয়া ধৃত করতঃ যথাসম্ভব দূরস্থানে রাখিয়া আসিতে লাগিল। যতবার ইহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিল ততই তাহারা অধিক দূরে নীত হইতে লাগিল। একটী পিপীলিকা এইরূপ ভাবে একটী পরাজিত পিপীলিকাকে ধৃত করিয়া টেবিলের একেবারে প্রান্তদেশে উপনীত হইল এবং "তাহাদের পৃথিবীর" একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নির্দ্দয় ভাবে সেই পিপীলিকাটীকে একেবারে অসীম শূন্য পথে ছাড়িয়া দিল। মুহূর্ত্তেক সময় সেখানে অপেক্ষা করিয়া পিপীলিকাটী সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিয়া তবে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। ফোরেল পরিত্যক্ত পিপীলিকাটীকে মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া একেবারে নিক্ষেপ্তার সম্মুখে ছাড়িয়া দিলেন। সে ইহাকে পুনর্ব্বার ধৃত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নে নিক্ষেপ করিল। তিনি যে কয়েকবারই পিপীলিকাটীকে টেবিলে তুলিয়া দিয়াছিলেন প্রতিবারই সে একইভাবে শূন্য পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি উভয় পক্ষের পিপীলিকাগুলিকেই একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং কিছুকাল পরে উহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল।

প্রতিপক্ষীয়দের প্রতি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের একটী দৃষ্টান্ত দিলাম। অনেক সময় কিন্তু আবার দেখা যায় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক স্থলেও পিপীলিকারা শত্রুদের প্রতি ভয়ানক নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে।

অন্যস্থলে বুকনার লিখিয়াছেন—(১)

"দুর্গদ্বার গুলি সাধারণতঃ বিশেষ ভাবে নিযুক্ত রক্ষীদিগের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই রক্ষীরা নানা উপায়ে তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করে। ফোরেল একটী Colobopsis truncata জাতীয় পিপীলিকা দুর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথগুলি সৈন্যগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিতে দেখিয়াছেন। ইহারা ইহাদের স্থূল মস্তক সমূহদ্বারা এই দ্বারগুলি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—ঠিক বোতলের মুখ ছিপিদ্বারা যেরূপ আবদ্ধ থাকে। ইনি Myrmecina Latreillei জাতীয় পিপীলিকাদিগকে দ্বারদেশে এইরূপ এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাখিতে দেখিয়াছেন। উহারা দ্বারগুলি মস্তক কিম্বা উদর দ্বারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। Componotus জাতীয় পিপীলিকারাও প্রবেশ পথে মস্তক বহির্গত করিয়া দিয়া দুর্গদ্বার সংরক্ষণ করিয়া থাকে এবং এইরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক আক্রমণকারী শত্রুকেই দেহের সমুদয় বলের সহিত ধাক্কা দেয় অথবা দংশন করে। ম্যাক্ কুক্ (Mac cook) পেন্সিলভেনিয়ার স্তূপনির্ম্মাতা পিপীলিকাদের উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাদের দুর্গদ্বারে শান্ত্রীরা পাহারা দেয় এবং বিপদের একটু সন্ধান পাইলেই—অমনি ইহারা শত্রুর প্রতিরোধের জন্য ছুটিয়া বাহির হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—নিতান্ত অত্যল্প কালের মধ্যেই বিপদবার্ত্তা গৃহের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সাতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিতই যাবতীয় সৈনিকেরা একযোগে শত্রুর প্রতিরোধ করিবার জন্য দুর্গের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। Lasius জাতীয় পিপীলিকারাও সমান বিক্রমে ও সমান তৎপরতার সহিত তাহাদের সুবিস্তৃত দুর্গের প্রবেশ পথগুলি রক্ষিত করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ভীরু সম্প্রদায়ের পিপীলিকারা উহাদের গুটী ও কীট এবং গর্ভবতী রমণী পিপীলিকাদিগকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব পলায়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। Lasius রা প্রত্যেকটী প্রবেশদ্বার যথাসম্ভব শক্তিশালী শান্ত্রী কর্ত্তৃক উত্তমরূপে সুরক্ষিত ও আবদ্ধ করিয়া ফেলে, যাহাতে আক্রমণ কারীরা একযোগে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অসম্ভব রূপ অধিক না হইলে এইরূপ সুরক্ষণের ফলে যুদ্ধ বহুদিন ব্যাপিয়া সংঘটিত হইতে থাকে। এই সময় মধ্যে অতিরিক্ত শ্রামিক পিপীলিকারা দুর্গ হইতে পশ্চাৎ দিকে সুরঙ্গ কাটিয়া অগ্রসর হয় এবং দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইলে এই গুপ্তপথে যাহাতে পলায়ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে।

দাসপ্রিয় পিপীলিকাদের যুদ্ধের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। কৃষিজীবি পিপীলিকারাও সময় সময় অতি ভীষণ সমরে নিরত হয়।

Moggridge বর্ণনা করিয়াছেন,—

যত সংগ্রাম দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এক স্থলে একই জাতীয় পিপীলিকাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার মত ভীষণ ও মারাত্মক—সংগ্রাম আর কখনো দেখি নাই। ইহারা A. barbara সম্প্রদায়। শস্য লুণ্ঠনের জন্য ইহারা সেই

জাতীয়ই অন্য সম্প্রদায়ের পিপীলিকার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল।

অন্য যে সকল জাতীয় পিপীলিকাকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি—সে সকল স্থলে সাধারণতঃ অতি অল্প সময় ব্যাপিয়াই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে—কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন। কিন্তু A. barbararা দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এইরূপ একটী যুদ্ধে—এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের গৃহ আক্রমণ করিয়া প্রায় ৬০ দিন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ৮ই জানুয়ারী যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও ৪ঠা মার্চ্চ সে যুদ্ধের শেষ হয়!

অবশ্য ৬০ দিন অবিশ্রান্তই যে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারিনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে প্রতি সপ্তাহে যে দুই দিন আমি সেস্থলে উপস্থিত হইয়াছি—তখনই উহাদিগকে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়াছি।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

লাইকা

(২৮)

বেলা তিন প্রহরের পর একবার সজোরে বৃষ্টি নামিল। লাইকা তখন অন্যান্য কয়েকটী গ্রামস্থ লোকের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল। কিন্তু বালক কোথায়? এই জলের সময় সে কোথায় গেল? সন্ধান লইয়া জানিল যে সে এই মন্দিরের পশ্চাতে বসিয়া আছে।

অতি অল্প পরিসর গৃহভিত্তিরই এক অংশ,—তাহাতে কোনরূপে মাথা বাঁকাইয়া বারি বসিয়া ছিল,—লাইকা আসিয়া বলিল "এইখানে বসিয়া আছ? কেন শরণ! মানুষের কাছে তুমি থাকিতে ভালবাস না কেন?"

বারি উত্তর দিল না, সবিস্ময়ে লাইকা ভাবিল—যে জন সন্ন্যাসীর সঙ্গী ভিক্ষাই যাহার জীবিকা—সে বালক এমন অভিমানী কেন? অতি ক্ষুদ্র কথার বেগও এ সহ্য করিতে পারেনা! কথার উত্তর নাই কিন্তু শুষ্ক মুখ সহসা এমন আরক্ত হইয়া উঠিল কেন? কিন্তু তখন লাইকা আর তাহাকে কিছু বলিল না,—গৃহমধ্যে আশ্রয় লইতে বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমাগত বৃষ্টি চলিতেছিল,—সন্ধ্যার পর লাইকা ভৈরব মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দেখিল—সেখানে বড় জল আসিতেছে,—দ্বারের নিকট সঙ্কুচিত ভাবে বারিকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল, "এখানে যে আজ ভারী জলের ঝাপটা বিছানা কোথায় হইবে?"

বারি বলিল "তাহাই ভাবিতেছিলাম!"

"দুর্গামন্দিরের পাশের ঘরে আজ থাকিতে হইবে। ঘরে আমার মোটে ঘুম হয় না—কিন্তু কি করিব?" শুনিয়া বারি লাইকার শয্যা

বস্ত্রাদি তুলিয়া বলিল, "তবে আমি সেখানে যাই ?"

হাসিয়া লাইকা বলিল—"এখনি ? ভাল, যাও।"

আরতি ভোগ শেষ হইয়া গেলে লাইকা আসিয়া দেখিল বারি শুইয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া সে আজ তাহার অভ্যাসের বিপরীতে—অর্থাৎ লাইকার শয়নের পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল! তাহার আগমন জানিতে পারিলনা দেখিয়া লাইকা নীরবে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত, তাহার হাতখানিকে হাতের মধ্যে লইয়া সস্নেহে বলিল,—"আজ এত শীঘ্র শয়ন করিয়াছ কেন? কোন অসুখ বোধ কর নাই ত ?"

বারি চমকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু লাইকা তাহাতে বাধা দিল—,আর সে তাহার শয্যার এত নিকটে বসিয়া যে উঠিতে হইলে প্রায় তাহার দেহে দেহ স্পর্শ সম্ভাবনা ;—তখন সঙ্কুচিত ভাবে বারি বলিল,—আজ বড় শীত,—তাই—"

হাসিয়া লাইকা বলিল,—"তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি! যখন তুমি স্নান করিয়া ফিরিতেছিলে তখনি আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল যে তোমার শরীর আজ অসুস্থ! কিন্তু সন্ধ্যাতেও আহার করিয়াছ কেন ?"

কম্বলাবরণের মধ্যে বারির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া লাইকা হাসিয়া বলিল—"না ভয় পাইওনা সে খাদ্য তুমি আহার করিতে পার নাই তাহাও আমি দেখিয়াছি! কিন্তু এ ফাঁকিটুকু কেন শরণ? আমার কাছে যখন তুমি আছ,—তখন তোমার সকল দুঃখ সকল কথা আমায় লুকাইলে চলিবে কেন ভাই ?"

বারি নিরুত্তর ;—লাইকা তাহার উষ্ণ ললাটে করসঞ্চালন করিতে লাগিল। একবার বারি তাহাতে প্রতিবাদের ক্ষীণ প্রয়াস করিয়াছিল—কিন্তু লাইকা তাহা শুনিল না। বারির উপাধানে অশ্রুজলেরও চিহ্ন দেখা যায়—কিন্তু লাইকা সে প্রসঙ্গ করিল না। রাত্রি অধিক হইতেছিল—বারি বলিল—"আর থাক, আপনি শয়ন করুন!"

"করিতেছি,—শরণ! তোমায় কয়েকটি প্রশ্ন করিব—উত্তর করিবে কি ?—"

লাইকা তাহার এত সন্নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল যে তাহার জানুতে বারির মস্তক স্পর্শ করিল—এবং মুখ তুলিতেই বারি দেখিল স্বামীর চক্ষু প্রায় তাহার চক্ষুর উপরই স্নেহবর্ষণোদ্যত! তাহার শ্বাস প্রবল হইল—সে প্রাণের মধ্যে কি একটা ব্যথাপূর্ণ সুখানুভব করিল। লাইকা বলিতেছিল—আমার কাছে তোমার কোন আশঙ্কা নাই—কিছু ভয় নাই একটি কথার উত্তর আমায় দাও!"

বারি স্থির হইয়া ছিল—লাইকা বলিল—"কি কষ্টে সর্ব্বদা তুমি এমন কাতর হইয়া থাক ? কিসের অভাব তোমার পীড়িত করে ?—আমায় বলিতে কি তোমার কোন বাধা আছে ?"

একটু থামিয়া বারি বলিল,—"কিছু না!"

"সুখী হইলাম! বল শরণ! তোমার কি কষ্ট আমায় সব বল ; যদিও আমি

সামান্য তবু বড় ইচ্ছা করে যে তোমার এই নির্ব্বাক ব্যথাগুলি আমি দুইহাতে ঠেলিয়া ফেলি! এই বয়স তোমার, আর এত—না শরণ! তাহা হইবে না, এমন জীবনটিকে ব্যর্থ হইতে দিও না—তুমি ঠিক্ জানিও ভগবানের উদ্দেশ্য,—মানব জন্মের সার্থকতা—যে বিফল করিতে চায় সেই তাঁহার ইচ্ছা—" বলিতে বলিতে লাইকার স্বর স্তম্ভিত হইল! মাথার নিকট দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে বারি চাহিয়া দেখিল স্বামী একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন—বিশাল নয়ন তরলতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সে দৃষ্টিতে অগাধ স্নেহ আর প্রশান্ত আত্মপ্রকাশ! পুলকিত অথচ লজ্জাহত ভাবে সে বালিসে মুখ চাপিবার চেষ্টা করিল। তাহাতেও লাইকা বাধা দিল—

"না, আজ তাহা হইবে না। কেন তুমি আমায় এত সঙ্কোচ করিবে ? আমি তোমার নিকট কেবল প্রভুর সেবাই পাইব—বন্ধুর ভালবাসা পাইব না—এ ত আমার পক্ষে অসহ্য শরণ!"—

বারি উত্তর করিল না কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া যেন নিজের মস্তকটি যত্নে লাইকার স্পর্শ বাঁচাইয়া আড়ষ্ট হইয়া ছিল—এবারে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া—মস্তক ও শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রায় লাইকার পদতলে সমর্পণ করিল! তখন সযত্নে তাহাকে নিকটে লইয়া লাইকা বাহুতে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত হইল।

কিছুক্ষণ পরে লাইকা বলিল—"তোমার পিতামাতা নাই—না ?—

বারি নীরব—, লাইকা আবার বলিল, "বলিতে কি তোমার আপত্তি আছে ?"

বারি বলিল, "না"—

তখন কোমলমধুর স্বরে লাইকা বলিল—"তবে বল না ভাই ?—সব কথাতেই নীরব কেন ?"

বারি বলিল—"কি বলিব আজ্ঞা করুন।"—

লাইকা উচ্চ হাসিল ?—"আজ্ঞা করিব ?—তুমি করজোড়ে "ক্ষমা আজ্ঞা প্রভু ?" বলিতে পারিবে ত ?"—

হাসিয়া হাসিয়া একটু স্থির হইয়া লাইকা বলিল—"সত্য বল না—, তোমার কি কেহ নাই ?"

""আছেন বৈ কি! সকলেই আছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া লাইকা বলিল—"সকলেই আছেন ? মানে কি—? তোমার পিতামাতা আছেন ?"—

মৃদু অকম্পিত স্বরে বারি বলিল—"আছেন"।

পূর্ণ বিস্ময়ে লাইকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল—পরে বলিল,—"তবে তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ কেন ?"—

"আমার অদৃষ্ট!"—

ইহার পর দুইজনেই নীরব থাকিল,—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা এতক্ষণ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছিল—এইবার নিভিয়া গেল।—বাহিরে ভেক ও ঝিল্লির প্রবল শব্দ। অনতিদূরে কোন মন্দিরে কে গান ধরিয়াছে—"সীয়া সঙ্গ রামজীও মিলন ভয়ো!—"

একসঙ্গে দুই জনেরই দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ মিলিল,—মৃদু হাসিয়া লাইকা বলিল,

—"অদৃষ্ট?—সে কথা মিথ্যা নহে!—অদৃষ্টের বন্ধন কেহ ছেদন করিতে পারে না ইহা আমিও জানি!—নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও অদৃষ্ট—এই দুইটির পরস্পর দ্বন্দে আমার জীবনের কত কি যে বলি দিয়াছি—তাহা তোমায় কি বলিব বালক!—কিন্তু তবু জানিও, চেষ্টা করিয়াছি,—চির জীবনটা নিজের শান্তির জন্য—সুখের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছি!—ফল কি হইয়াছে তা জানি না—তবু কাহারো কষ্ট বা বেদনা দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয়!—"

বারি চমকিয়া স্বামীর প্রতি চাহিল;—কিন্তু অন্ধকার, কিছু দেখা গেল না। লাইকা বলিল "আজ কয়দিন তোমার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।—যদি কিছু বল—যদি আমার দ্বারা শান্তির কোন উপায় থাকে—" অথবা—

সহসা লাইকা থামিল।—একটা তীব্র বিদ্যুতালোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে দুইজনেই দুইজনার মুখ দেখিতে পাইল। বারির মুখে প্রশ্নসূচক আশঙ্কা—আর লাইকার চক্ষে অশ্রুময় করুণা!—

বাহিরে গুরু গুরু মেঘ ডাকিল,—তালের উচ্চ শিরে বাতাস বাজিতেছিল। দ্রুত কম্পিত হৃদয়াবেগের সহিত বারি বলিল,—আর যদি আমি আপনার কাছে কোন অপবাধ করিয়া থাকি,—"

বিস্ময়ত্বরিত স্বরে লাইকা বলিল,—"অপরাধ? আমার নিকট অপরাধ? তুমি হাসাইলে শরণ! আমার কাছে তুমি কোন অপরাধ কর নাই—বরং তোমার সেবা ভক্তি আমায় আশ্চর্য্য করিয়াছে। আর ধর যদি কিছু অপরাধ করিতেই—"

বাধা দিয়া বারি বলিল,—"করিয়াছি—আমি আপনার নিকট বড় দোষ করিয়াছি জানিবেন? কিন্তু আমার যেন আশা হয়—আপনার নিকট তাহার ক্ষমাও—"

আর বলা হইল না, লাইকা বেশ বুঝিল কোন বন্যায় এ বাক্যরাশি ভাসিয়া গেল!—বারির ধৃত হস্তখানি মুষ্টিমধ্যে পেষণ করিয়া লাইকা বলিল,—আমি বুঝতে পারিতেছি না তুমি কেন ও কথা বলিতেছ? কিন্তু জান কি তুমি?—না না, এই সামান্য কথা লইয়া এমন কষ্ট পাইও না শরণ! সত্যই ইহাতে আমার কষ্ট হইতেছে!—সংসারে চাহিয়া দেখিলে কি দেখা যায় দেখিয়াছ কি?—মানুষ কার্য্যশেষে কয়টাতে সাফল্য বা তৃপ্তি পায় বল দেখি?—কত অনুশোচনা কত অতৃপ্তি কত পরিতাপ!—জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী—লক্ষ্য করিয়া দেখিও পরস্পর ওতঃপ্রোত ভাবে অপরাধ করিতেছে—কিন্তু ইহার মধ্যে দণ্ডদাতা কে?—যেখানে প্রত্যেকে ক্ষমাভিক্ষু সেখানে কার অধিকার প্রবল তাহা কে বলিতে পারে?—"

বারি বোধ হয় কথাটা বুঝিল না, বলিল,—"আমার অপরাধ আপনি জানেন না,—"

লাইকা হাসিয়া বলিল,—"জানিলে তোমার দূর করিয়া দিতাম!—এইত তোমার বক্তব্য?—কিন্তু ওরে শিশু! তুইও জানিস না—যে ক্ষমা নামক বস্তুটির সম্বন্ধে

একটা পরিতৃপ্তিময় পূর্ণ মীমাংসা যদি আমি না পাইতাম তবে আমার নিজের জীবনেরই সমস্ত অপরাধ সমস্ত দণ্ড এই হতভাগ্য লাইকাকে—"

বলিতে বলিতে লাইকা একবার থামিল,—পরে আবার বলিতে লাগিল।—"হাঁ, সে কথা থাক্?—শোন শরণ!—ক্ষমা নামটি আর যে কেহ যে ভাবে উচ্চারণ করুন না কেন,—আমার নিকট উহার মূল্য অনেক!—আমি উহাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছি—এমন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই করে—তাই এই কথা বলিতে গিয়া আমার অন্তর বিচলিত হইয়া উঠে। তুমি আর অনর্থক ক্ষমা ক্ষমা বলিও না—যদি কোন দোষ থাকেই তোমার ভগবান তোমায় মার্জ্জনা করুন! আমার নিকট কেন ম্লান হও ভাই?"—

বারি আর কথা বলিতে পারিল না;—তাহার উদ্বিগ্ন-নত হৃদয়ে লাইকার সঙ্গীত-মধুর কণ্ঠস্বর—পরিপূর্ণ ক্ষমায়—ভালবাসায় বিগলিত কথাগুলি অপূর্ব্ব ধ্বনিতে বাজিতে লাগিল—"এই দেবতা কি তাহারই স্বামী?—জীবনের জন্মের এতবড় সার্থকতা কি সত্যই সে পাইয়াছে?—দেবতা! অদৃষ্ট! ভগবান! কেমন করিয়া—সমস্ত দেহে কতখানি লুটাইয়া সে তোমার চরণে প্রণাম করিবে প্রভু!—এ কৃতার্থতা সে তোমায় কেমন করিয়া দান করিবে? আর স্বামী! তাঁহাকে সে কি দিতে পারে?—এই অভিমানিনী আত্মপ্রেমগর্ব্বিতা নারী—! হায় হায়! সে এতদিন কি ইহা বুঝিত?—আজ তাহার সমস্ত দর্প সকল গর্ব্ব চূর্ণীকৃত ধূলিমুষ্টি! এস হে,—চিরবাঞ্ছিত! আজ এই দগ্ধ অভিমানের চিতা ভস্ম তোমার চরণে মাখাইয়া দিই—সদানন্দ ভোলানাথ!—এই তোমার যোগ্য—এই তোমার একমাত্র উপযুক্ত পূজার উপাদান!—

বারিকে নীরব দেখিয়া লাইকা আর কিছু বলে নাই,—অনেকক্ষণ মৌনের পর বলিল—"তোমার কি ঘুম পাইতেছে?"—

বারি বলিল—"না, কিন্তু প্রভু!"—

লাইকা উচ্চ হাসিল! "প্রভু কিরে পাগল?—কে কার প্রভু"—

বারি সত্যই অন্যমনস্কে সেকথা উচ্চারণ করিয়াছিল,—লাইকার হাসিতে লজ্জিত হইয়া মুখ লুকাইল।—তখন তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া হাসির সহিত গুঞ্জন স্বরে লাইকা বলিল—"একটি গান শুনিবি ভাই?—আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে একটু গান গাহিতে।"—

কি জানি কেমন অপূর্ব্ব সুখাবেগে বারির শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরিয়া উঠিল!—সমস্ত দেহের গ্লানি ভুলিয়া সে পাশ ফিরিল—তাহার চরণে হাত রাখিবা মাত্র পা টানিয়া লাইকা বলিল—বটে! এই বুঝি! না, তোকে আর আমি পারিব না!—কিন্তু শরণ, তুইত আমাকে তোর কোন কথাই বলিলি না?—"

হাসিয়া বারি বলিল,—"বলিব না কেন সব বলিব!"

আরও হাসিয়া লাইকা বলিল—"কেবলি ফাঁকি!—তুই বড় দুষ্ট!"—

বারির মস্তক লাইকার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিল,—লাইকা তাহাতে একটু চাপ

দিল—বারিও তাহাতে ভর দিল,—উত্তরের প্রত্যাশায় লাইকা তাহার প্রতি চাহিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল—প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস—তাহার পরে বারি বলিল—"আজি আর পারিব না!—কাল—কাল আমার কথাটুকু বলিয়া শেষ করিব—নিশ্চয় কাল শেষ হইবে,—হয় আমার—

সে নীরব হইল—এবং লাইকা বিস্মিত হইল। এ বালকচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়!"—

তথাপি লাইকা সেদিন প্রফুল্ল হইল। এই বালকের ভাবভঙ্গিতে কথায় সে বড় কৌতুক বোধ করিত আশ্চর্য্য হইত। সাধারণ লোকের অপেক্ষা সে যে অনেক খানি তাহার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে—তাহাও সে বুঝিয়াছিল। এ বালক আর তাহার বড় দূরের নয়—সহজত্যজ্য নয় উপেক্ষার নয়—হহা ভাবিতে লাইকা ব্যথা না পাইয়া এত সুখ বোধ করে কেন? ইহা ভাবিয়াও সে আশ্চর্য্য হইয়াছিল! তাই তাহাকে আজ কিছু প্রকাশিত ভাবে পাইয়া লাইকা বড় প্রফুল্ল হইল।

প্রভাতে উঠিয়া বলিল,—"তুমি আজ বাহিরে আসিও না,—বড় শীতল বাতাস!"—তাহার পর স্নানান্তে পুষ্প লইয়া পূজায় বসিয়া লাইকা আরাধ্য দেবতার নিকট বালকের কুশল প্রার্থনা করিল!—আজ তাহার প্রাণে অকারণে যে হর্ষউজ্জলতা সঞ্চিত হইয়াছে হাঁ কতকটা অকারণ বৈকি!—যদিও সংসারে কেহ কাহারও পর বা আপন নয়—নিজের স্বার্থের উপরই অনিষ্ট সম্বন্ধের বিচার নির্ভর করে—তবু এই সহসাগত তরুণ মানবটির হৃদয় লইয়া লাইকার এতখানি উৎকণ্ঠা ও তাহার কষ্ট নিবৃত্তির আশায় এমন আনন্দোদ্বেগ তাহা অকারণ বৈকি?—তবু সে ভাবিয়া পাইল না কোন্ অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে আজ সে কেবলই বালকের কাছে ছুটিতে যায়—শুধু শুধু তাহাকে দুটা কথা বলিয়া আসিতে চায়—তাহার লজ্জারুদ্ধ কণ্ঠের একটু অস্পষ্ট স্বর শুনিতে চায়!

প্রভাতের কোমল আলোক দেখিয়া আজ লাইকা বড় প্রসন্ন হইল,—পুষ্পবনের স্নিগ্ধ সুগন্ধে সেদিন যেন অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিল! সরোবরজল বুঝি আজ তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিল! আনন্দ! কারণহীন প্রসন্নতার স্বার্থগন্ধহীন স্নেহের জয়ে পরম প্রশান্তির নিরাবিল আনন্দ!—তাই আজি সে জীবনদেবতার চরণে সে সুখ নিবেদন করিয়া—তাহার কারণস্বরূপ বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করিল।—প্রসাদী ফুল আনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিল।

আহারাদির পর একবার লাইকা তাহার অন্বেষণ করিতেছিল,—কিন্তু একটু আশ্চর্য্য—আজ সে কেবলি লুকাইয়া বেড়াইতেছে—কেন? তাহার স্বভাব বিরুদ্ধে—আজ সে কেবলি মানুষের সঙ্গে ঘুরিতেছে! এতক্ষণ দুর্গামন্দিরে লোক ছিল সেও বসিয়া ছিল। আবার জনশূন্য দেখিয়া মন্দিরের ময়দা-পেষাণীর নিকট বসিয়া তাহার প্রবল চাৎকার বা গীত শুনিতেছে!

লাইকা যেন বিস্মিত হইল! আবার একটু হাসিলও!—

সন্ধ্যার পর যথারীতি পূজান্তে আসিয়া

সে দেখিল—বালক অন্ধকারে আচ্ছন্নপ্রায় কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আস্তৃত শয্যায় লাইকা শুইয়া পড়িল!—তখন সেও উঠিয়া আপনার স্থানে আসিল। বিষম গ্রীষ্ম—ততোধিক বিষম এই মৌনতা।—কেন বালক আজ এত নীরব? কেন সে অন্য দিনের ন্যায় তাহার আগমনে সচকিত হইল না? তাহাকে গ্রীষ্মপীড়িত দেখিয়া তালবৃন্ত লইয়া ছুটিয়া আসিল না? এই নবজাত মনঃক্ষোভে লাইকা যেন কাতর হইয়া উঠিল।

রাত্রি গভীর হইতেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ—বারির শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় সে নিদ্রিত!—একটি ক্ষুদ্র মেঘে লাইকার প্রাণ যেন আঁধার হইয়া গেল! হায় সে এই বালককে যতখানি আপনার ভাবিয়াছে—সেত তাহা নহে!

রজনী দ্বিতীয় প্রহর! গ্রামের কোটাল মহা চীৎকার ঘোষণা করিল—"রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর!" নিদ্রাভঙ্গে বারি দেখিল লাইকা ঘরে নাই!—বাহিরে ও কে শুইয়া? তিনিই কি? সচকিতে সে বাহিরে আসিল। মৃত্তিকায় বাহুতে মাথা দিয়া তিনিই ত—যেন কিছু অস্থির, নিদ্রাহীন! উদ্বিগ্নভাবে বারি বলিল "মাটিতে কেন? বিছানা আনিয়া দিই?"

লাইকা বলিল—"কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ঘরে বড় গ্রীষ্ম তাই এখানে আসিয়াছি! তুমি ঘরে যাও!"—বারি সেকথার উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া লাইকা ভাবিল, "কি সুদৃঢ় আচরণ এই বালকের! কোনখানেই ইহার মধ্যে প্রবেশ দ্বার নাই! কিন্তু—লাইকা কেন তাহার কথা ভাবিয়া এমন অস্থির হইতেছে? সামান্য একজন মৌনপ্রায় রহস্যময় বালকের চিন্তায় সেই বা এমন অধীর কেন? নাই বা পাইল তাহার পরিচয়—তাহাতে এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? নিজের হৃদয়ের অকারণ চাঞ্চল্যে লাইকা কিছু আশ্চর্য্য হইল—ভাবিল আর তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিবে না—সহজ ভাবে—সাধারণ মানুষের ন্যায় চলিতে হইবে।

বারি ফিরিলে লাইকা বলিল,—"আজ তুমি আছ কেমন বল দেখি? সন্ধ্যায় প্রশ্ন করিতে ভুলিয়াছিলাম!"

"আমি ত আজ বেশ ভালই আছি!"—বলিতে বলিতে বারি ঘরে গিয়া শয্যা আনিয়া লাইকার নিকট বিছাইল—এবং একখানি ব্যজনী আনিয়া নিকটে বসিয়া বীজন করিতে লাগিল। অলিন্দের পার্শ্ব দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিতেছে—সম্মুখে আমলকী তরুর পাতা কাঁপাইয়া ঝিরি ঝিরি বাতাস আসিতেছে!

সহসা লাইকা বলিল,—ভাল শরণ! "তুমি আমার কাছে কতদিন থাকিবে?"—

অতর্কিত প্রশ্ন! বারির হস্তের ব্যজনী শিথিল হইল—সে চমকিত আর্ত্তস্বরে বলিল—কতদিন থাকিব? কেন?—

এ প্রশ্ন কেন আজ? এ প্রশ্নের অর্থ কি?"

লাইকা চাহিল। সত্যই ত এ প্রশ্ন কেন করিল সে?—চাহিয়া দেখিল বালকের মুখ বেদনায় মলিন হইয়া গিয়াছে।

কণ্ঠস্বরের কাতরতাও লাইকাকে ব্যথিত করিল! বুঝিল তাহার প্রাণের গূঢ় অভিলাষ লুকাইতে গিয়া সে তাহাই প্রকাশ করিয়াছে—! আহা দুঃখি! তোর উপর রাগ কি করিতে পারা যায়!—তখন ব্যস্তভাবে ফিরিয়া লাইকা তাহার হাত ধরিল—বলিল—"ওকি শরণ! তুমি অন্য অর্থ করিলে যে? আমিত তাহা বলি নাই?—আমি ভাবিয়াছিলাম এই যে যদি আমার কাছে থাকিতে তোমার বিরক্তি বোধ হয় তাহা আমায় জানাইবে কি না তাই!"

"বিরক্ত বোধ কেন হইবে?"—বারির এই কথায় হাসিয়া বলিল—"কেন? বিরক্ত হইবার কি কিছু কারণ থাকিতে পারে না?"—বারি বলিল—"আমার থাকিতে পারে না নিশ্চয়—তবে আপনি—"

বারি থামিয়া গেল,—তখন অভিমান ভুলিয়া লাইকার হৃদয় আবার প্রফুল্ল হইতেছিল—সে সবিস্ময়ে বলিল—"আমার বিরক্তি! তাই বটে! তাই আজি দিনমান তোমার নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইয়াছি!"

লজ্জিত আনন্দে বারি মুখ ফিরাইল। সে হাসি সে ভঙ্গী লাইকার চক্ষে বড় নূতন বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল—সে বারির জানুর উপর মাথা রাখিয়া সস্পৃহ চক্ষে তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—

"সত্যই বিশ্বাস করিস ভাই—আমি তোমাকে বড়—বড় ভালবাসিয়াছি!—"

হৃদয়ের স্পন্দনে বারির মাথা নীচু ও হাসি অদৃশ্য হইল! তখন লাইকা তাহার বক্র মুখখানি ধরিয়া ফিরাইবার চেষ্টায় ছিল—সে তাহাতে আরও আড়ষ্ট হইয়া উঠিল! হাতের পাখা পড়িয়া গেল। তাহার গণ্ডদেশে আদরের আঘাত দিয়া লাইকা বলিল,—"সব তাতেই ম্লান! একটু আদরও সহ্য হয় না! এত কোমলতা লইয়া তোকে কে পুরুষ করিয়াছিল তাই ভাবি!—আর শরণ! আমি অনুমান করি তুই যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম লইতিস্,—তবে কত রাজাধিরাজ তোর পায়ে লুটাইত!" বলিতে বলিতে উচ্চ হাসিল।

কিন্তু একথায় বারি হাসিল না। তখন লাইকা বলিল—"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য পিতামাতা তোকে ছাড়িয়ে দিলেন কেন?—তোর মনে আছে কি? কাল আমার একথার উত্তর দিতে চাহিয়াছিস্ তুই!—বলিবি কি সব কথা?—ও কি! মুখ ভার করিস্ কেন? তবে থাক্!"

একটু বিষণ্ণ হাসিয়া বারি বলিল—"কেন? থাকিবে কেন? আজই সব বলিব! কিন্তু আমি ভাবিতেছি আপনি আমার ছলনার কথা শুনিয়া কি বলিবেন!"—

লাইকা বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল। এ সেই অবিচলদৃষ্টি প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি! সে মাথা তুলিয়া বলিল—"ছলনা? ছলনা আবার কি! কাকে ছলনা করিয়াছ তুমি?"—

"আপনাকেই!"—

লাইকা উচ্চ হাসিল। আবার তাহার ক্রোড়ে মাথা দিয়া বলিল—"ওঃ সেই কথা? —তা হোক, আমায় ছলনা করিলে কোন ক্ষতি নাই!—কিন্তু পিতামাতাকে ছলনা করিয়া এস নাই ত?...

বারি উত্তর করিল,—"তাহাও করিয়াছি!—নতুবা তাঁহারা আমায় ছাড়িতেন কি?"—

এবার লাইকা হাসি ছাড়িয়া বলিল,—"তাহা ত অনেকদিনই বুঝিয়াছি!—কিন্তু কেন একাজ করিলে শরণ?—এই বয়সে গৃহত্যাগ করিবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল?"—

"কি প্রয়োজন ছিল বলিব?—এই আপনাকে ছলনা করিবার জন্যই কেবল—"

বারি থামিয়া গেল। তাহার ঘনঘন শ্বাস বহিতেছিল—সে দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। লাইকা তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল,—কি আশ্চর্য্য!—এ বালক বলে কি?—তাহাকে ছলনা করিবার জন্য?—ছলনা?—ছলনা মানে?—ছলনা? সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া সে সরিয়া গেল। দ্রুত কণ্ঠে বলিল—ছলনা তুমি কাহাকে বল শরণ?—বল শীঘ্র বল তুমি কে? তুমি কি আমায় চেন? কৈ আমিত তোমায় কোথাও দেখি নাই?"

বারি আর কোন কথা বলিল না,—আপনার বুকের কাপড় হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া লাইকার নিকট ফেলিয়া দিল। তাহার অশ্রুবিবর্ণ আকৃতির প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া সে তাহা তুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আজকার জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোকে লেখা পড়া যায় না!—অথচ বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না—যদি সে পলায়ন করে? রুদ্ধস্বরে লাইকা বলিল—"আমি আলোকের নিকট যাইতেছি,—কিন্তু তুমি এইখানেই থাকিবে ত?" বারি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। লাইকা আবার বলিল—"যাইও না—মিনতি থাকিল!"—

দেবালয়ের দ্বার সম্মুখে আলোক ক্ষীণ জ্যোতিতে জ্বলিতেছিল,—লাইকা আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। পার্শ্বের দুর্গা দেবীর সেবক গঞ্জিকার কলিকা হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—স্থানটিও গঞ্জিকার গন্ধে পূর্ণ—লাইকা সে সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পত্রখানিতে দৃষ্টি ক্ষেপ করিল। ক্ষুদ্র সুন্দর পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তাক্ষরে লেখা,—

"আমি শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছি তাহা বলিব? আমি আপনাকে ছলনা করিয়াছি দেবতা।—কিন্তু আর এ পাপ আমার সহ্য হয় না!—আজ আমি সকল কথাই বলিব শুনুন! আমি আপনারই সেই সেবাবঞ্চিতা পত্নী! আর কি লিখিব? সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন। —ইতি"

বিশ্বজগতের অনুভূতি লাইকার নিকট শূন্য হইয়া গিয়াছিল—সে আবার পত্রখানি পড়িল—আবার পড়িল!—তাহার পত্নী?—রাজকুমারী বারি?—এখানে? এত কষ্টে? —তাহারই জন্য?—বিশৃঙ্খল ভাবে এই কয়টি কথাই তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ফিরিতেছিল!—তাহার বারি! তাহার জীবনসর্ব্বস্ব—বাসনার আকাঙ্ক্ষা! সেই জীবনপ্রতিমা বারি?—লাইকা যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল!—

কতক্ষণে সম্বিৎ লাভ করিয়া সে কম্পিত পদে ফিরিয়া চলিল। বারি দূর

হইতে স্বামীর মদিরামত্তের ন্যায় স্খলিত গতি দেখিতে পাইয়াছিল—সে এত অধীরতার কারণ বুঝিল না! ভাবিল বুঝি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! লাইকা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না! আমি আপনার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কায করিতে চাই না!"

লাইকার বোধ হয় সে কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল না—সে বিহ্বল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া ছিল—সে দৃষ্টিতে বারির মুখের সে কঠিন ভাব দুর হইল—সে লজ্জাবিবর্ণ ভাবে অধোবদন হইল। লাইকা বুঝি আর দাঁড়াইতে পারে না—,দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বারির রচিত শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বারি বুঝিতে পারিল না যে স্বামী এমন অস্থির হইলেন কেন,—কি একটা নিদারুণ আশঙ্কায় সে যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল—, লাইকা পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে কিন্তু নিকটে যাইতেও সাহস নাই—,এমন সময় শুষ্ককণ্ঠে লাইকা বলিল—"জল! একটু জল!"—বারির বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিতেছিল,—কেন তাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল? স্বামী কেন এত কাতর হইলেন? তখন সে দৌড়িয়া কমণ্ডলুর জল আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল—; জলপান করিয়া লাইকা যেন সুস্থ হইল। বারি নিঃশব্দে তাহার মাথায় বাতাস দিতেছিল।

কিছুকাল স্থির থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে লাইকা বলিল—"কাঁদিতেছ তুমি?—কিন্তু একটি কথা রাখ—আজিকার দিন আর কাঁদিও না! আজ তোমার চোখে জল দেখিলে আমি বাঁচিবনা!"

বারি অশ্রুমার্জ্জনা করিল।—লাইকা এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিল—"কত কষ্ট দিয়াছি! এই অভাগার জন্য নাজানি কত কষ্ট পাইয়াছ!—ওঃ সে কথা যে আমি ভাবিতেও পারিনা!" বলিয়া একটু থামিল—পরে আবার ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—"তোমার কষ্টের তুলনা নাই জানি;—কিন্তু বিশ্বাস করিবে কি আমিও বড় সুখে ছিলাম না! যতদিন তোমায় ছাড়িয়াছিলাম তখনও কষ্ট,—তার পর যখন শুনিলাম তোমায় হারাইয়াছি—,ও হো!—আমার এ পাপমুখে সে কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে?—কিন্তু সে সব কথা যদি তোমায় বলিতে পারিতাম—আমার সে নরকসহারা দিনগুলির ইতিহাস যদি তোমায় শোনাইতে পারিতাম—তবে বোধ হয় তুমিও আমায় ক্ষমা করিতে!"

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইল—বারি বুঝিল স্বামী তাহার চরণ স্পর্শে উদ্যত!—সে সরিয়া যায় লাইকা তাহার হাত ধরিল। বলিল—,"কাথায় যাও? আমার কাছে এস আরও কাছে এস!—তোমায় ভাল করিয়া দেখি আমি! জাননা ত প্রাণাধিকে! কেবল তোমায় দেখিবার কামনাই আমার অন্তর ও বহির্দৃষ্টির সম্মুখের জগৎকে কত বিসদৃশ করিয়া দিত! আজ আমায় দেখিতে দাও!"

বারি যেন জ্ঞান হারাইতেছিল,—সে বুঝিতেছিল না যে কি শুনিতেছে!—লাইকা হাত বাড়াইয়া তাহার শিরোবেষ্টনী খুলিয়া দিল,—ঘনকুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-রাশি তাহার পদ্মমুখখানি বেষ্টন করিতেছিল জ্যোৎস্নার মোহময় আলোকে লাইকা তাহা দেখিতে লাগিল।—

রোহিতাশ্ব পর্ব্বতের নির্জ্জন উপত্যকায় দুইজনে বসিয়াছিল। পদতলে রক্তশ্বেত পুষ্পাভরণবিচিত্র শ্যামল শৈবাল সজ্জা—, সম্মুখে বর্ষাবারিপুষ্টা গিরিনদীর উপল ক্রীড়া—,বাতাসে তাহারই ঝঙ্কারের প্রতি-ধ্বনি বাজিতেছে;—মাথার উপর সদ্যো-মেঘবিমুক্ত কোমল নীলাকাশে প্রভাত সূর্য্য হাসিতেছে;—লাইকা ও বারি দুইজনে দুইজনের বাহুবেষ্টনে বসিয়া অন্তরে অন্তরা-লিঙ্গনের স্বর্গানুভব সুখ উপভোগ করিতে-ছিল!

লাইকা ভাবিতেছিল—সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় সুখ,…প্রবাহিনী গতিময়ী সুখ,—বায়ু সঙ্গীতময় সুখ! আর বারি ভাবিতেছিল—এতখানি সুখের মধ্যে আজ যদি মরিতে পারি তাহা হইলে না জানি তাহা কত সুখ!

নীরবে কতক্ষণ তাহারা বসিয়াছিল—অবশেষে লাইকা সে মৌন ভঙ্গ করিল—; পত্নীর রক্তপাণিপল্লব লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সে বলিল—"এখনও একটি কায বাকী আছে! আমায় একবার মহারাজার সহিত তোমার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে!"

বারি হাসিল,—বলিল—আমারই কি তাহা ইচ্ছা করে না? কিন্তু এ মুখ দেখাইব কি করিয়া?

"এ মুখ? কেন? এমুখে কি কোন মালিন্য আছে প্রাণেশ্বরি! বলিয়া সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া লাইকা আবার বলিল,—"তাঁহাদের শোক আমার সহ্য হয় না! যদিও রাজপুরীতে বাস আমার অসহ্য তথাপি বৎসরশেষে একবার করিয়া তোমায় লইয়া সেখানে যাইতেই হইবে। কোন ভয় নাই—আমি সঙ্গে থাকিলে কেহ তোমায় কিছু বলিবে না!

বারি একটু হাসিল! আর সে হাসিতে সন্দেহহীন বাধাহীন আনন্দের মধুর বিকাশ দেখিয়া লাইকাও হাসিয়া আবার তাহার মুখ চুম্বন করিল।

সমাপ্ত

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

যুদ্ধে ব্যোমযান

(১)

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধাদি ব্যাপারে ব্যোমযানের কার্য্য বিশেষরূপে গণনা করা হইয়া থাকে। ব্যোমযানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ইহার মূল্য বিশেষরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। বিমানচারী এক একটী 'এরোপ্লেন' কিম্বা 'এয়ারসিপ' (১) শত্রুর সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকিয়া অলক্ষ্যে বজ্রনির্ঘোষে রাশি রাশি গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া শত্রুসৈন্য ছারখার

(১) 'এরোপ্লেন' এবং 'এয়ারসিপের' পার্থক্য এই প্রবন্ধের অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে।

করিয়া দিয়া যাইতে পারে—কিম্বা রাত্রির অন্ধকারে সুপ্ত নগরের উপরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা উৎপন্ন করিতে পারে; সাগর উপকণ্ঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ মুহূর্ত্তে ধ্বংস করাও ইহাদের পক্ষে একটু বিচিত্র নহে।

এতদ্ব্যতীত শত্রুর গতিবিধি নির্ণয়ে 'এরোপ্লেন' বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। কোন স্থানে কিরূপ শক্তি লইয়া শত্রু অবস্থান করিতেছে, কোন্ দিকে শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইতেছে ইত্যাদি সংবাদ সৈন্য পরিচালনায় কত মূল্যবান। অনেক সময় এ সকল সংবাদের অভাবে অনুমানে সৈন্য পরিচালনা করিতে হয়—তাহাতে বিপদ এবং বিফলতার পূর্ণ আশঙ্কা। কিন্তু ব্যোমযান শত্রুর গতিবিধির সংবাদ আনয়ন করিতে সমর্থ বলিয়া সৈন্যপরিচালনায় কত যে সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যুদ্ধে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যোমযানের ব্যবহার হইয়া থাকে। ১। শত্রুসৈন্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ। ২। গোলন্দাজ সৈন্যের কামান সংস্থাপন কার্য্যে সহায়তা—বিপক্ষীয়দের কামানের অবস্থান—এবং স্বপক্ষীয়দের অগ্নিবর্ষণের নিভ্রান্তি নিরূপণ। ৩। আকাশ যুদ্ধে বোমা, কামান, বন্দুক, কিম্বা অন্যপ্রকার অস্ত্রাদির সাহায্যে শত্রুর গুপ্তচর এবং ব্যোমযান আক্রমণ। ৪। শত্রু পরিচালিত সৈন্য বাহিনী প্রেরিত রসদ ইত্যাদি কিম্বা এয়ারসিপের আশ্রয়গৃহ, শত্রুশিবির, ইত্যাদির উপর বোমা অথবা গোলাবর্ষণ করিয়া উহাদের ধ্বংস সাধন। ৫। সৈন্য সরবরাহের জাহাজ, বাণিজ্যপোত এমনকি যুদ্ধ জাহাজের নির্ব্বিঘ্ন পরিচালনা কার্য্যে সহায়তা—আকাশে অবস্থিত থাকিয়া সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত বিপক্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের কিম্বা জলতলস্থিত সবমেরিন এবং মাইনের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়া ইহারা সঙ্কেতে নিজেদের জাহাজগুলিকে বিপদবার্ত্তা জানাইয়া রক্ষা করিতে পারে। (২)

ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ গত কয়েক বৎসরের ভিতর বায়ুরথের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন তাহাতে সকলেরই আশঙ্কা হইত, যে জাতি ব্যোমযানে যতদূর শক্তিমান হইবে বিজয় লক্ষ্মী তাঁহাদেরই অঙ্কশায়ী হইবেন; এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে বিমানবাহিনীর বলেই সংগ্রামের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইবে।

কারণ বর্ত্তমান কালে যুদ্ধের প্রকৃতি সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ এখন বহুব্যয় সাপেক্ষ এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর। সমস্ত প্রকার উন্নত প্রণালীর বিজ্ঞান যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহার করা হইতেছে—ফলে যুদ্ধের ধ্বংস কারবার শক্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সেকথা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়—কল্পনা করিলে এক বীভৎস ভীষণ চিত্র মানুষকে ভীতস্তব্ধ করিয়া ফেলে।

ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ মনে করিলেন—যে জাতি যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহার্থে যত অধিক টাকা ব্যয় করিবে তাঁহাদের জয়াশা তত বেশী। যে জাতি রাশি রাশি অর্থ ছড়াইয়া অগণিত সৈনিক বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে—কিম্বা ব্যয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রণতরী সমূহ প্রস্তুত করাইবে তাহারাই জয়মাল্যের অধিকারী হইবে। তাই কোনো জাতি যদি সৈন্য ও যুদ্ধপোত ধ্বংস করিবার কোনো নূতন উপায় উদ্ভাবন করে—প্রতিপক্ষীয়েরা যথাসম্ভব সত্বর নিজেদের যুদ্ধ সজ্জায় সেই সকল নব প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক উহাদের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করে; এবং স্বাধীন জাতিবৃন্দ নিজেদের সৈন্যবল, নৌবল এবং অর্থশক্তি ইত্যাদি হিসাব করিয়া প্রতিপক্ষীয়দের সহিত তাহার তুলনা করিয়া থাকে।*

(২) Cf. Aircraft in the German war by H. Massac Buist p. p. 14.

* See Aerial Warfare by Hearne p.p. XXXIV

সুবিখ্যাত লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল—স্যার জে, এম, হিয়ারসন বলিয়াছিলেন—"It is impossible to carry on warfare unless we have mastery of the air"

"শূন্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিলে যুদ্ধ লিপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এই বায়ুরথ সমূহের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিয়াই ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ প্রভূত উন্নত প্রণালীর বিমান-বাহিনী একত্রিত করিতেছিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এমন সব শূন্য-যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল—যাহাদের একএকটী বিশ ত্রিশজন আরোহী, কামান, বোমা নিক্ষেপের যন্ত্র, সার্চ্চলাইট (Search light) ইত্যাদি এবং কয়েক টন্ বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে এবং ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

এই সমস্ত শূন্যরথ আবিষ্কারে প্রথমতঃ ফরাসী এবং জার্ম্মেণরাই অধিক দক্ষতা দেখাইতেছিলেন। ফরাসী জাতি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—দুর্দ্দমনীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের সন্ধানে মত্ত হইলেন। অনেক ভাবনা চিন্তা এবং চেষ্টা চরিত্রের পর উহারা ব্যোম-বাহিনী প্রস্তুত করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।† আজ ফরাসী জাতির বিমানবাহিনী সকলকে অতিক্রম করিয়া আস্ফালন করিতে পারে।

জার্ম্মেন এবং ইংরেজদের ভিতর পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্যে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সামরিক প্রতিযোগিতা দেখা দিল। কিন্তু অতুলনীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনী দেখিয়া জার্ম্মেনদের সকল আশায় বালি পড়িল।‡ নৌশক্তিতে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার আশা যে আকাশকুসুম মাত্র ইহা জার্ম্মেনরা হৃদয়ে বিশেষ করিয়া অনুভব করিলেন।—কিন্তু জার্ম্মেন জাতি সহজে হতাশ হইবার নহেন—তাই তাঁহারা একদিকে যথাসাধ্য উৎসাহ উদ্যমের সহিত নৌশক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন অপরদিকে বিমান বাহিনীকেও যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবাব্রতের ফলে—জার্ম্মাণির বিমানবাহিনী আজ জগতে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছে।§

ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগণ ইঁহাদের অসাধারণ আবিষ্কারে মুগ্ধ হইয়া এবং বায়ুরথের সামরিক মূল্য বুঝিতে পারিয়া সশঙ্কিত হইয়াছিলেন। (৩) তাঁহারা

† Aerial warfare, Hearne "The airship was one of the latest of her schemes after many others had been tried, and in recent years with a declining population and internal troubles the Air-ship fleet of France has been one of her few hopes" p.p. XXV.

‡ "——and there is no more distressing no more infuriating spectacle to the ferbid German patriot of to day than the huge British fleet as it stands out proudly predominant, a marvellous demonstration of invested capital." Aerial Warfare pp. XXVI.

§ See Aerial Warfare by Hearne, Forecast.

(৩) Cf. Pearson's Magazine July, 13.
"The next war in the air"
"These dreadnoughts of the air could hover over our big cities under cover of darkness; they could smash up our arsenals, our docks, our shipping, our railway lines of communication, our public buildings. They could cripple our defences irretrievably in a single night".—"Some morning England perhaps or France or Germany or some other European power, will open its eyes to find its capitals & its armies menaced by hostile airships. It will then be called upon to decide whether to accept peace on ignonimous terms or destructive war with humiliating defeat as an almost certain result."

বুঝিতে পারিয়াছিলেন—যদি যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগণ উভয়পক্ষই বিশেষরূপে বিমানবাহিনীতে শক্তিমান থাকেন—তবেই শক্তিপরীক্ষা সম্ভব হইবে নতুবা কোনো শক্তি বিমান-বাহিনীতে নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে যুদ্ধ বাধিতে না বাধিতেই জয় পরাজয় মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সজ্জিত, ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল বেগবান, ব্যোমযানগুলিকে তেমনি শক্তিশালী বিমান-বাহিনী দ্বারা প্রতিরোধ করিতে না পারিলে পরাজয় একরূপ সুনিশ্চিত।

এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়াই ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ যথাসাধ্য তাঁহাদের নিজ নিজ বিমানচারী যুদ্ধ জাহাজের উন্নতির প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিরূপ ব্যস্ত ভাবে ইঁহারা নিজ নিজ বিমান-বাহিনী বৃদ্ধি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন—নিম্নলিখিত ব্যয়ের পরিমাণ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বিমান-বাহিনীর জন্য ব্যয় সংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ছিল ২৪৮,০০০ পাউণ্ড, ১৯১২ তে ৮০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯১৩ তে ১,৭০০,০০০ পাউণ্ড। জার্ম্মেণীতে ১৯১৩ সালে এই কারণে প্রায় ২,১৫০,০০০ পাউণ্ড খরচ মঞ্জুর হইয়াছিল!

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে Army Air Battalion সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে এবিষয়ে প্রকৃত কাজ আরম্ভ হয়। শীঘ্রই এবিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ফলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই Royal Flying Corpsএর সৃষ্টি হয় এবং বিমান-বাহিনীর বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইতে থাকে।

ফরাসী-জার্ম্মেন সীমান্তে এই সময় হইতেই বিমান-বাহিনীর অসংখ্য আড্ডা স্থাপনের কার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান কালে ফরাসী সীমান্তে টুল, ভার্ডল, বার্লেডুক্, এপিনেল ইত্যাদি স্থানে গবর্ণমেণ্টের সামরিক এরোপ্লেনের আড্ডা সংস্থাপিত আছে; এবং রিমস্, আইসি-নে-মুলিনো, প, ময়শঁ, পোট্রোভাইল ইত্যাদি স্থানে বৃহৎ বৃহৎ "এয়ারসিপের" আশ্রয়-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভার্ডুন, বেলফোর্ট, এপিনেল, টুল ইত্যাদি স্থানেও এই সকলের "সেড" (shed) বা আশ্রয়গৃহ অবস্থিত আছে। এয়ারসিপের জন্য হাইড্রোজেন উৎপাদন কল্পে প্যারী, লাইল, লেঙ্গারস্, মণ্টফোর্ট বিউভেল ইত্যাদি স্থানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হাইড্রোজেন কারখানা খোলা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সীমান্তে ইহার আয়োজন আরও অধিক। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চারিটী ভীষণাকৃতি "জেপ লিন" (Zeppeline) রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া দিবারাত্রি সীমান্ত প্রদেশ প্রহরা দিত। উহাদের মধ্যে Z উত্তরসাগর উপকূলে উইলহেমলেভেনে, Z.I. কোনিগস্বার্গে, Z.II. কলোনে এবং Z.III. মেজে (Metz) অবস্থিত থাকিয়া সে সময়ই—মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে ফরাসী সীমান্ত উত্তীর্ণ হইয়া ধ্বংসের বীজ ছড়াইবার জন্য প্রতীক্ষা করিত। (৪)

ফরাসীদের অসংখ্য এরোপ্লেন আছে—জার্ম্মেনীরও এরোপ্লেনের সংখ্যা প্রচুর। "এয়ারসিপের" সংখ্যায় জার্ম্মেনী সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। উঁহারা বলেন বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের ৮০টী "জেপ্লিন" আছে ৫০টী নির্ম্মিত হইতেছে। (Statesman, Sunday, December 6, 14) কিন্তু অনেকেই অনুমান করেন তাঁহাদের "জেপ্লিন" ২৫।৩০ টীর অধিক হইবে না। তবে অন্য শ্রেণীর "এয়ারসিপ" আরও অনেক থাকিতে পারে। এবিষয়ে সত্য সংবাদ জার্ম্মেন গবর্ণমেণ্ট অপ্রকাশ্য রাখিয়াছেন। সমস্তই অনুমানের কথা। ফরাসীদের "এয়ারসিপের" সংখ্যা অল্প। ফরাসীতে এরোপ্লেন যত ইচ্ছা নির্ম্মিত হইতে পারে—কিন্তু 'এয়ারসিপ" নির্ম্মাণ বিশেষ ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ।

ইংরেজদের বিমানবাহিনীও যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইংলণ্ডে ৮০০ সুশিক্ষিত বিমানচারী সৈন্য আছে এবং Central Flying School ব্যস্তভাবে যথেষ্ট পরিমাণ নূতন

(৪) See Pearson's Magazine, July, 1913—"Four Zeppeline built giant air dreadnoughts armed & munitioned as if war were a thing of today, keep almost constantly in the air—training their crews etc. etc."

সৈনিককে বিমানযুদ্ধে শিক্ষিত করিতেছেন। নানাস্থানে ব্যোমযানের কারখানায় দিবারাত্রি শূন্যরথ নির্ম্মিত হইতেছে—এবং ব্যোমযানের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। (৫) ইংরেজগণ "হাইড্রো-এরোপ্লেন" (অন্য নাম "সিপ্লেন") নির্ম্মাণেই অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। জলেই তাঁহাদের একাধিপত্য জলেই তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি তাই যে ব্যোমযান জল হইতেই উড্ডীন হইতে পারে এবং জলেই অবতরণ করিতে পারে—সেরূপ বায়ুরথ নির্ম্মাণের প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের দেশের অবস্থান বিবেচনায় এই শ্রেণীর ব্যোমযানই তাঁহাদের নিকট বিশেষ কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। "Brittannia rules the Waves" এই বাক্যের সার্থকতা আমরা ইংরেজদের প্রতি কার্য্যেই দেখিতে পাই।

আমরা "এয়ারসিপ" "এরোপ্লেন" এবং "শিপ্লেনের" উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যোমযান। যে সকল ব্যোমযান বায়ু অপেক্ষা লঘু—তাহাদিগকে 'এয়ারসিপ' বলে। 'এয়ারসিপ'গুলি আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে এবং ইহাদের নির্ম্মাণ ব্যয়ও অত্যন্ত অধিক। একটী লম্বা থলের (bag) ভিতর বায়ু অপেক্ষা লঘু গ্যাস্ ভরিয়া দেওয়া হয়—এবং তাহাতেই 'এয়ারসিপ' শূন্যে উড্ডীন হয়। বিশ ত্রিশজন আরোহী বৃহৎ বৃহৎ কামান এবং নানা-প্রকার আবশ্যকীয় যন্ত্র ও ব্যবহার্য্য জিনিস বহন করিবারও ইহাদের শক্তি থাকে। জলবায়ুর পার্থক্যে ইহাদের কিছু আসে যায় না। শূন্যে থাকিয়াও ইহার আরোহী সৈনিক লক্ষ্য সন্ধান করিয়া গোলা ছুড়িতে এবং বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে। অতি বেগে সে গোলাগুলি শত্রুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া—উহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে।

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিন প্রকার 'এয়ারসিপ' নির্ম্মিত হইয়াছে। এক প্রকার—ধাতু নির্ম্মিত কাঠামোর (Frame) উপর সুচিক্কণ এলুইমিনিয়াম পাতের থলে বিশিষ্ট (Rigid airships) অন্য প্রকার কোনো কাঠামো ছাড়া শুধু একটা থলের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস্ আবদ্ধ এয়ারসিপ, (Nonrigid airships)। ইহাদের একটী সুবিধা এই যে আবশ্যক মত গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিয়া থলেটী সঙ্কুচিত করিয়া রাখা যায়। তৃতীয় প্রকারের "এয়ারসিপ" মাঝামাঝি রকমের, সম্পূর্ণ কাঠামোও ব্যবহৃত হয় না আবার একেবারে কাঠামো ছাড়া শুধু থলেও নয় (Semirigid type)। প্রথমোক্ত-গুলিই অধিক প্রকাণ্ড হইয়া থাকে—জার্ম্মেনরা এই শ্রেণীর 'এয়ারসিপের' রাজা। অন্য কোনও জাতি এই শ্রেণীর 'এয়ারসিপ' নির্ম্মাণ কার্য্যে তেমন সফলতা লাভ করেন নাই। জার্ম্মেনীর কাউণ্ট জেপ্লিন প্রথম এই শ্রেণীর বৃহৎ 'এয়ারসিপ' নির্ম্মাণ করেন তাঁহার নামে এই ব্যোমযানগুলির সাধারণ নাম জেপলিন হইয়াছে।

'এরোপ্লেন' সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। 'এয়ারসিপ' এবং এরোপ্লেনের কার্য্যও ভিন্ন প্রকার। অনেক সময় এই দুই প্রকার যন্ত্রের মধ্যে বড় গোল বাধিয়া যায়। "এয়ারসিপ" গ্যাস্পূর্ণ বেলুনের দ্বারা শূন্যে উড্ডীন হয় বলিয়াছি। ইহা ছাড়া উহাদের মধ্যে মোটর শক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনও সংযোজিত থাকে—তাহারই শক্তিতে উহারা কেবল বায়ুস্রোতের অনুকূলে পরিচালিত না হইয়া স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

'এয়ারসিপের' বেলুনে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া এই গ্যাসের উত্তোলন ক্ষমতা আছে। 'এয়ারসিপে'—গ্যাসপূর্ণ বেলুন অন্যান্য কলকব্জা, ইঞ্জিন, পরিচালক, সৈন্যসামন্ত ছাড়াও বিমান-বিহারীর অত্যাবশ্যক দ্রব্য যথা—জ্বালাইবার কাঠ বা কয়লা এবং যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহার্য্য গোলা বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রাদি উত্তোলন করিবার মত—যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস্ ব্যবহার করা আবশ্যক। এই কারণে

(৫) See Aircraft in the German War p. p. 77.

সাধারণতঃ গ্যাস্-বেলুনটীকে আকৃতিতে বিশাল করিতে হয়। আবার বেলুনের আকৃতি যত বড় হইবে বায়ু ভেদ করিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে মোটরের তত অধিক শক্তির প্রয়োজন হইবে। 'গ্যাস্ বেলুনের' কেবল উত্তোলন ক্ষমতা আছে কিন্তু পরিচালন ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি কারণে এয়ারসিপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা বড় কঠিন। "জেপলিন" গুলি ৪।৫ টন বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে।

'এরোপ্লেন' গুলির একটা সুবিধা এই যে ইহাদিগকে উত্তোলন করিবার জন্য কোনও গ্যাসের প্রয়োজন হয় না। "এরোপ্লেনে" যে মোটর শক্তি সংযোজিত হয় তাহাদেরই এরূপ বেগে 'এরোপ্লেনকে' ছুটাইবার শক্তি থাকা প্রয়োজন যাহাতে পাখার নীচে বায়ুর যথেষ্ট পরিমাণ চাপের জোরে—ইহারা শূন্যে উড্ডীন হইতে পারে। বাধাপ্রাপ্ত বায়ুরাশি "এরোপ্লেনের" পাখার নীচে বেগে প্রতিহত হয়—তাহাতেই "এরোপ্লেন" শূন্যে উড্ডীন থাকে।(৬) শূন্যে থাকিতে হইলে এরোপ্লেনকে ক্রমাগত ছুটিতে হয়—নতুবা পরিচালন শক্তি বন্ধ করিলে ইহারা প্রস্তর খণ্ডেরই মত বেগে ভূমিতে পতিত হইবে। এ বিষয়ে "এয়ারসিপের" খুব সুবিধা। ইহারা একস্থানে থামিয়া দাঁড়াইতে পারে। "এরোপ্লেনের" মত মোটার শক্তির সহিত ইহাদের শূন্যে উড্ডীন থাকিবার কোনও সম্বন্ধ নাই। "এরোপ্লেন" আকারে অনেক ছোট। ইহাদের নির্ম্মাণ ব্যয়ও অনেক অল্প। একটী "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণে যে ব্যয় হয় তাহাতে ৩৫টী এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতে পারে। 'এরোপ্লেন' গুলি বায়ু অপেক্ষা ভারী। এ গুলি পেট্রোল ইঞ্জিনে পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারবহন ক্ষমতা অল্প হইলেও—"এরোপ্লেনের" কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আছে।

"সিপ্লেন" বা "হাইড্রো-এরোপ্লেন" জল হইতে শূন্যে উঠিতে এবং শূন্য হইতে জলে নামিতে পারে। কিন্তু "এরোপ্লেন" কেবল সমতল ভূমিতেই উঠা নামা করিতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে "সিপ্লেন" "এরোপ্লেনে" কোনো বিশেষ পার্থক্য নাই। ইংরেজদের বড় বড় যুদ্ধ জাহাজে "সিপ্লেন" থাকে। যে কোনও মুহূর্ত্তে ইহারা জল হইতেই শূন্যে উড্ডীন হইতে পারে এবং আবশ্যক মত জলেই অবতরণ করে। "এরোপ্লেনে" এবং "হাইড্রো-এরোপ্লেনে" সার্চ্চ লাইটেরও বন্দোবস্ত রহিয়াছে তাহার সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারেও উহারা নির্দ্ধারিত স্থানে অবতরণ করিতে পারে। কিন্তু "এয়ারসিপের" পক্ষে রাত্রে অবতরণ করিবার কল্পনা নিশ্চিত মৃত্যুরই পূর্ব্বাভাস মাত্র।

(২)

বিমানবিহারীর অতি বিচক্ষণ হওয়া দরকার। তাহাদের যেমন কঠিন দায়ীত্ব তেমনি বিপদও তাহাদের অসংখ্য। প্রাণের মায়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বিমানবিহারীকে আকাশে উড়িতে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই কঠোর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বে বিমানচারীদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদান করা হইয়া থাকে। শূন্য হইতে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি এবং অবস্থান নিরূপণ—বিমানবিহারীর একটী অতি মূল্যবান কার্য্য। কিন্তু এই প্রকার সংবাদ ঠিকমত সংগ্রহ করিতে হইলে বিমানবিহারীর বহু উচ্চ হইতে নিম্নের সমস্ত জিনিস অভ্রান্তরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রকৃষ্ট শক্তি থাকা আবশ্যক। উপর হইতে বিন্দু কিম্বা রেখাবৎ প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও বিমানবিহারীকে প্রত্যেকটী নদী, রাস্তা, রেলোয়ে, বড় বড় বাড়ী এই সমস্তই চিনিতে হইবে। অভিযানকারী বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীকেও উপর হইতেই ঠিক মত চিনিতে হইবে; যাহাতে বিমানবিহারী

(৬) পাখা যন্ত্রের দুইদিকে দুইটীও থাকে—আবার দুইস্তরে একটীর উপর অন্য একটী এরূপ ভাবেও থাকে। প্রথমোক্ত গুলিকে "মনোপ্লেন" (mono plane) এবং শেষোক্ত গুলিকে "বাইপ্লেন" (Biplane) কহে।

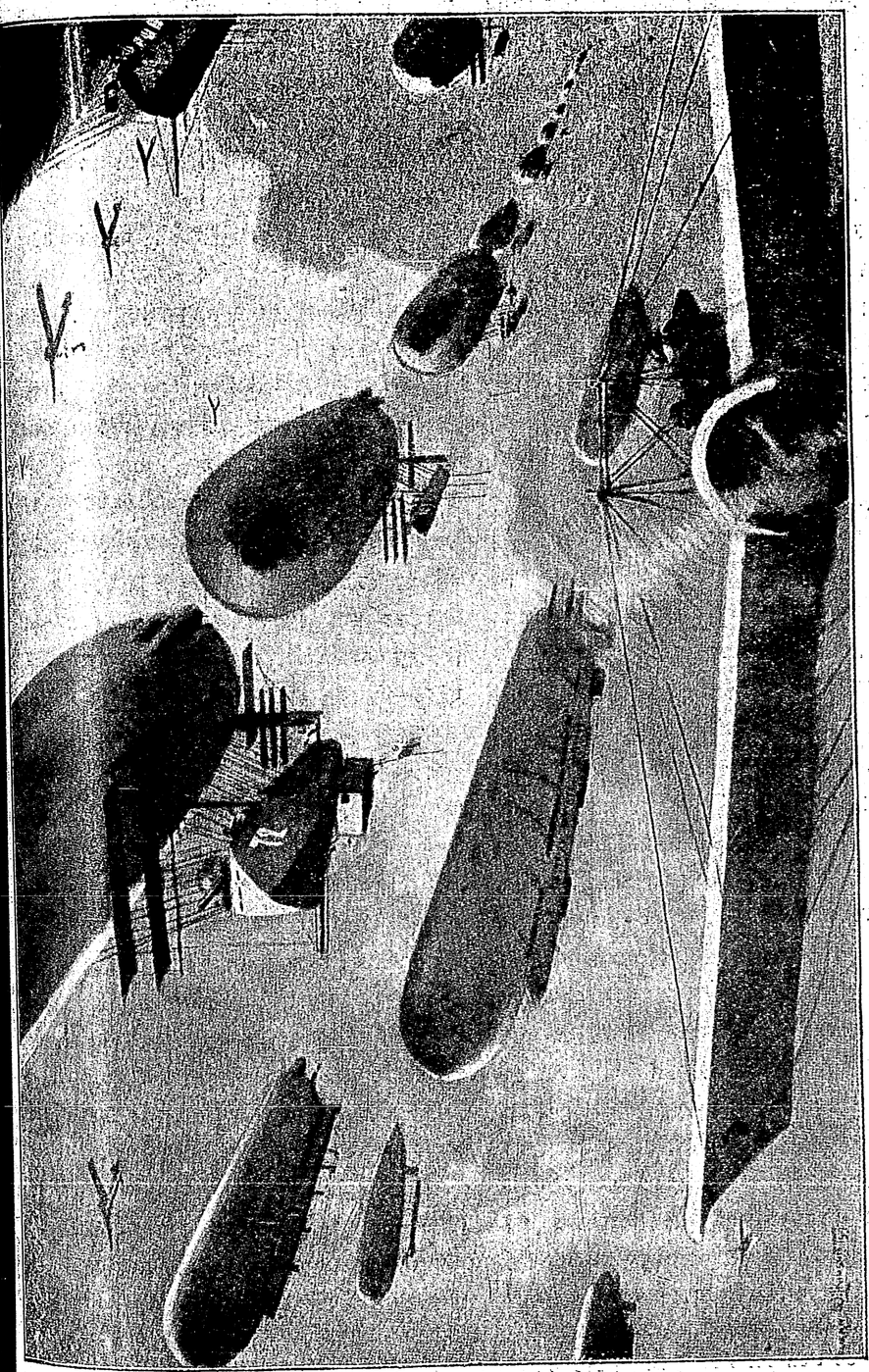

ব্যোমবাহিনী

১ চিহ্নিত কতকগুলি এরোপ্লেন এবং ২ চিহ্নিত একটী এয়ারসিপ।

তাহাদের সংখ্যা ও বল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট জ্ঞাপন করিতে পারে। এদিকে আবার শূন্য হইতে বিমান-বিহারী শত্রু যাহাতে তাহাদের গুপ্ত সংবাদ অবগত না হইতে পারে—বিপক্ষীয়গণ সেই উদ্দেশ্যে যত রকম বাধাবিঘ্ন জন্মান সম্ভব তাহার ত্রুটী করে না। ছাউনী করিয়া অবস্থান করিবার সময়—তাহারা তাঁবুগুলিকে বড় বড় গাছের ডালপালা দিয়া ঢাকিয়া রাখে—যাহাতে শূন্যস্থিত শত্রুগণ ইহাদের অস্তিত্ব না বুঝিতে পারে। উপর হইতে সহজেই ব্যোমচারী এগুলিকে বৃক্ষ-লতা বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে। ছোট কামানের সারির ভিতর বড় বড় কামান ঢুকাইয়া লওয়া হয়—পদাতিক সৈন্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অশ্বারোহী সৈন্য অভিযান করে—এবং উপরে আকাশে শত্রুর ব্যোমযানের অস্তিত্ব আশঙ্কা করিলে বড় বড় সৈন্যবাহিনী—বৃক্ষপাতার আড়ালে লুক্কায়িত থাকে। এসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যাহাতে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য বিমানচারীকে বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটিশ আকাশবিহারী মিঃ মার্কাস ডিঃ মেণ্টনের ইংলণ্ডে ব্যোমবিহার শিক্ষালয়ের—নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের বর্ণনা উল্লেখ করিতেছি। (৭)

"ভোরের আলো প্রকাশ হইতে না হইতেই সেড্‌গুলি বিমান-বহারী এবং যন্ত্রবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তিগণে পূর্ণ হইয়া পড়ে। কয়েক মিনিট পর পরই এক একটী বৃহৎ "বাইপ্লেন" কিম্বা দ্রুতগামী বার্ত্তাসংগ্রাহক ব্যোমযান সেড্ হইতে ঠেলিয়া বাহির করা হয় এবং এক একজন যন্ত্রবিদ্যাবিদ্ ইঞ্জিনগুলি পেট্রোলে পূর্ণ করে। ট্যাঙ্কগুলি (Tanks) পূর্ব্ব রাত্রিতেই পূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

"সৈনিক ব্যোমচারীরা খাকিবর্ণের পোষাক পরিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসে এবং একটু চকোলেট ইত্যাদি ভোজনের পর বায়ুসমুদ্রে সন্তরণে প্রস্তুত ব্যোমযানগুলির সঙ্কীর্ণ উপবেশন স্থলে আরোহণ করে। অবিলম্বে যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয় এবং পাঁচ ছয় জন বিমান-বিহারী—প্রাতঃভোজনের পূর্ব্বেই ৫০ মাইল স্থান পর্য্যটন করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে আকাশে উড্ডীন হয়। শীতের প্রভাতে ভীষণ ঠাণ্ডা বায়ুর ভিতরেই বহু শিক্ষানবিশ অনবরত ৮০০ ফুট উর্দ্ধে উড়িতে থাকে।

একজন অভিজ্ঞ বিমানচারী হয় ত তাহার সঙ্গে একজন শিক্ষানবিশ পর্য্যবেক্ষক লইয়া আকাশে উঠিবে। শিক্ষানবিশকে নিম্নে দৃশ্যমান সকল জিনিষেরই চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে পেন্সিল কাগজ থাকে।

"একেবারে নূতন লোক হইলে তাহার অধিকাংশ পর্য্যবেক্ষণই ভ্রমপূর্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ হয় ত টীনের ছাদে পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে—সে ভাবে উহা একটী হ্রদ। কর্ষণকরা ক্ষেত্র তাহার অনভ্যস্ত চোখে একটী উত্তম অবতরণ স্থল বলিয়া মনে হয় এবং সেই বিশ্বাস মতই সে ঐ কথা লিপিবদ্ধ করে। পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইতে—এ সকল ভ্রমও ক্রমে দূর হইতে থাকে।

"অন্য একজন বিমানবিহারী হয় ত একাই ৮০ অশ্ববেগ সমন্বিত (80 H. P.) একটী দ্রুতগামী "মনোপ্লেনে" আকাশ ভ্রমণ করিতে চলিয়াছে—এবং নানাদেশের মধ্য দিয়া কম্পাস এবং মানচিত্রের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিয়া—তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। একদেশ পার হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অন্যদেশে উড়িয়া গিয়া সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে, এইজন্য অপরিচিত স্থানের উপর দিয়া বার বার ব্যোমযান পরিচালনা করিয়া অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হয়।"

শিক্ষানবিশদের নিকট নূতন দেশের উপর দিয়া পথ চিনিয়া উড়িয়া যাওয়া বড় কঠিন কার্য্য। বিশেষতঃ যদি নদী, পর্ব্বত বা এই প্রকার বিশেষ কোনও চিহ্নের দ্বারা পথ নির্ব্বাচন না করা যায়। কেননা শূন্যে ব্যোমযান পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে অধিকক্ষণ মানচিত্রের প্রতি চাহিয়া থাকা অসম্ভব। সর্ব্বদাই

(৭) See Pearsons Magazine, November 1914. The Super Soldier

যন্ত্রটিকে আয়ত্তে রাখিতে হয়, মানচিত্র অধ্যয়ন তো পরের কথা। বায়ুস্রোতের নানারকম অবস্থায় ব্যোমযানকে সতর্কতার সহিত উত্তমরূপ পরিচালনা করিতে না পারিলে বিপদ সম্ভাবনা। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ব্যোমযান ঠিক পশ্চাৎদিকে বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে অথচ বিমানবিহারীর এইরূপ পশ্চাৎ গতি উপলব্ধি করিতে পারা কঠিন। এরূপ অবস্থায় কম্পাসের উপর নির্ভর করিলে বিমান-বিহারী প্রকৃতগতি কিছুই অবগত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেবল কম্পাস এবং মানচিত্র ভরসায় ব্যোমযানের ঠিক মত পরিচালন সর্ব্বদা হইয়া উঠে না। তাই ব্যোমচারীকে এরূপ বিচক্ষণতা অর্জ্জন করিতে হয় যাহাতে বহুনিম্নে অবস্থিত স্থানগুলি সহজেই তাহারা প্রণিধান করিতে পারে।

সংবাদ সংগ্রহ ও শত্রুসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত বিমানবিহারীর সৈনিকবিদ্যার বিশেষ জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশ দিয়া মিনিটে একমাইল বেগে উড়িয়া যাওয়া কালীন নীচের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিছু স্থির করা বড় কঠিন। এ অবস্থায় মনে হয় পৃথিবী অতিবেগে পশ্চাৎ অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এরূপ স্থলে সৈন্যের বিভিন্ন অবস্থার গতিবিধি নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব—কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চপ্রদেশে উড্ডীন হইয়া—বহুদূর বিস্তৃত সৈন্যবাহিনীর একটা ছবি (Birds eye view) চক্ষের উপর স্থাপন করিতে পারা যায়। যুদ্ধবিদ্যার কূট-নীতিতে পারদর্শী হইলে নিম্নে অবস্থিত সৈন্যব্যূহ মসীরেখাবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহাদের অবস্থানের কথা অনেকটা অনুমানে স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার বায়ুর পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বিমান-বিহারীকে ব্যোমযান আয়ত্তে রাখিতে পারার শক্তি ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়। যে সৈনিক কেবলমাত্র পরিষ্কার আকাশে এবং অনুকূল বায়ুর মধ্যেই আকাশে বিহার করিয়াছে—সে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এবিষয়ে ব্রিটিশ বিমানচারীগণ অত্যন্ত বিচক্ষণ। অত্যন্ত বিপরীত জলবায়ুর ভিতরও উহারা কর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে পারে এবং ইহার পরিচয় তাহারা বর্ত্তমান যুদ্ধেও প্রদান করিয়াছে। (৮) যদিও এরূপস্থলে সুনির্ম্মিত ব্যোমযানের সাহায্য অনেকটা মূল্যবান—তথাপি বায়ুর অবস্থা ও পরিবর্ত্তন বিষয়ে ব্যোমবিহারীর প্রভূত অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ক্রমাগত আকাশ ভ্রমণ করিতে করিতে বিমানবিহারীগণ এমন ভাবে বায়ুর অবস্থার সহিত পরিচিত হয় যে কোন্ সময় কোন্ স্থানে কি অবস্থায় বায়ুর কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা তাহারা আশ্চর্য্যরূপে পূর্ব্বেই অনুভব করিতে পারে। নৌ-বিভাগের সুদক্ষ অধ্যক্ষ যেমন আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই ঝড়ের সম্ভাবনা পূর্ব্বাহ্নেই অবগত হইতে পারেন অভ্যস্ত বিমানচারীও সেইরূপ ভাবেই বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় নিম্নে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বেই জানিতে সমর্থ হন। একটি পর্ব্বত কিম্বা জলাভূমি, কিম্বা হ্রদ, সাগর অথবা বনভূমি লক্ষ্য করিয়াই বিচক্ষণ ব্যোমবিহারী বায়ু অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল হইবে—তাহা জানিতে পারে। যদি শূন্যচারী নিম্নে আঁকা বাঁকা নদী বহিয়া যাইতেছে দেখিতে পায় অমনি তাহাকে বায়ু-তরঙ্গে নিম্নে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইবার সময় বিনা বিঘ্নে গা ছাড়িয়া দিয়া সে ভাসিয়া চলিয়া যায় কিন্তু যখনই নিম্নে কোন পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল লক্ষ্য করে অমনি সে তাহার পরিচালন যন্ত্রটি চাপিয়া ধরিয়া বেগবান ঊর্দ্ধনিম্নগামী বাত্যার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইরূপে সুদক্ষ বিমানবিহারী কোথায় নামিবার উপযুক্ত ভূমি থাকা সম্ভব তাহাও উপর হইতে

(৮) Cf. Sir JohnFrench's official dispatch in which he says that our airmen have gone up in all weathers and have reported with exactness of detail.

সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারে। যে সকল ভূমিতে গরু ঘোড়া ইত্যাদি তৃণজীবি পশু চড়িয়া বেড়ায় সে সকল ভূমি সমতল এবং ব্যোমযান নামাইবার প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া উপর হইতেই জানিতে পারে। যখন এই শ্রেণীর পশুরা একদিকে মুখ করিয়া চরিতেছে দেখা যায় তখন বুঝিতে পারে—হয় সে ভূমি একদিকে বিশেষ ঢালু অথবা প্রবল বাত্যা একদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ স্থলে বিমানবিহারীর অবতরণ তত নিরাপদ নহে। মাঠের প্রান্তদেশে নদী কিম্বা বনভূমি ব্যোমচারীর নিকট বিপদের চিহ্ন। কারণ এরূপ স্থান ঢালু হওয়ার আশঙ্কা,—সে স্থানে অবতরণ করিতে গেলে—ব্যোমযান ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অভিজ্ঞতা না থাকিলে বিমানবিহারীর বিপদ প্রতি পদে।

দৌত্য এবং পর্য্যবেক্ষণ "এরোপ্লেনের" প্রধান কার্য্য। এতদুদ্দেশ্যে বিমানবিহারী-সৈন্যদিগকে কিরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহা উপরে লিখিয়াছি। ব্যোমযানের পরিচালনা, বায়ুর স্বভাব নির্ণয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা করা ভিন্নও উহাদিগকে জল ও স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধেও পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে হয়। শূন্যে বহু উচ্চে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্যের গতিবিধি নির্ণয় করিতে হয় বলিয়া ইহাদের সম্পাদ্য কার্য্য অত্যন্ত কঠিন। শূন্যে শূন্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করিতে হইলে ৩০০০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উপরে উঠিলেই চলে কিন্তু শত্রুসৈন্যের উপর অবস্থান করিতে

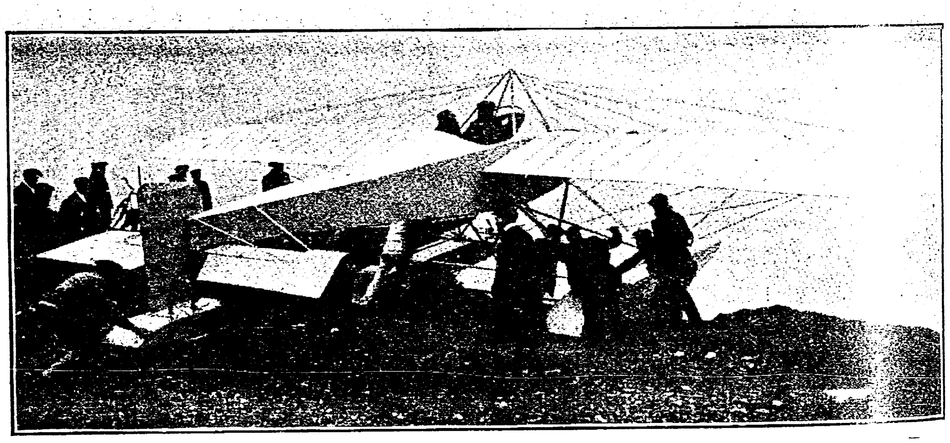

হাইড্রো এরোপ্লেন

জলে নামাইয়া শূন্যে উড়াইবার আয়োজন হইতেছে।

হইলে অন্ততঃ ৬০০০ ফিট উপরে সর্ব্বদাই থাকিতে হয় নতুবা বিশেষ বিপদের আশঙ্কা। বর্ত্তমানকালে কোনো কোনো "উর্দ্ধমুখী কামান" (High-angle gun or Anti-aircraft gun) এতদূর উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে যে শত্রুসৈন্যের উর্দ্ধে অবস্থিত বিমানবিহারীকে এই সকল কামানের আঘাত হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে অন্ততঃ ১১,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে কাপ্তান অস্‌ওয়াল্ড ঘণ্টা দুই জর্ম্মান সেনার ৬০০০ ফিট উচ্চে পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন যে জার্ম্মানদের কয়েকটি গোলা তাঁহার ব্যোমযানেরও ৩,৩০০ ফিট উপরে বিস্ফোরিত হইয়াছিল।

ব্যোমযান যথেষ্ট পরিমাণ নিম্নে (ভূমি হইতে প্রায় এক মাইল উপরে) অবস্থানকালেও তথা হইতে গরু, ঘোড়া এমন কি সমুদ্রস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজগুলিও কাল কাল বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বর্ণের পার্থক্য ত একেবারেই চোখে পড়ে না। যাহা হউক এই সমস্ত অসুবিধা দূরবীক্ষণের সাহায্যে অনেকটা বিদূরিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত খুঁটীনাটী সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইলে বিমানদূতকে অনেক সময় শত্রুর গোলার মুখে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান পর্য্যন্তও অবতরণ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে হয়। একবার সংবাদ লাভ করিতে পারিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ কামানের মুখ হইতে সরিয়া অনেক উপরে উড্ডীন হয় এবং মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া পলায়ন করে।

বিমানবিহারী দিগকে শত্রুসৈন্যের উপর অবস্থান-পূর্ব্বক খুঁটীনাটী বিষয়ের সংবাদ কি কৌশলে সংগ্রহ করিতে হয় এবং সে সকল বিবরণ কি করিয়া লিপিবদ্ধ ও অঙ্কিত করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দিবারাত্রি অসংখ্য বিমানবিহারী এই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। একজনের সংবাদ সংগ্রহে ভুল থাকিলে অন্যের বর্ণনা হইতে তাহা ধরা পড়ে।

সংবাদ আনয়নের ক্ষিপ্রতার উপর এই সকল সংবাদের মূল্য নির্ভর করে। ইংরেজরাজের অধিকাংশ "সিপ্লেনেই" তারশূন্য টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু কোনো "এরোপ্লেনে" বা 'এয়ারসিপে' এরূপ বন্দোবস্ত নাই। তবু "এরোপ্লেনে"র প্রচলন হওয়ায় শত্রু-সৈন্যের অবস্থান এবং গতিবিধির খাঁটী সংবাদ অল্পাধিক ৩।০ ঘণ্টার ভিতর প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ সৈন্যাধ্যক্ষগণ লাভ করিয়াছেন।

"এরোপ্লেনের" সংবাদদাতার চক্ষু এড়াইবার এক মাত্র উপায় বনমধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় অভিযান করা। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে এরূপ লুক্কায়িত থাকিয়া অগ্রসর হওয়ারও সুবিধা নাই কেননা বিমানচারিগণ সর্ব্বদাই আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে মুহূর্ত্তে শত্রু সৈন্য বনান্তরাল পরিত্যাগ করিবে—সেই মুহূর্ত্তেই কোনো না কোনো "এরোপ্লেনের" সংবাদদাতার চোখে উহাদের পড়িতেই হইবে।

রাত্রিকালে "এরোপ্লেনের" আকাশ বিচরণ এক-রূপ অসম্ভব ছিল। ইংলণ্ড ইত্যাদি স্থানে রাত্রি বিচরণও অভ্যাস করা হইতেছে। এবিষয়ে কিন্তু এখনও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বন্দোবস্ত হয় নাই।

বিমানবিহারীরা সংবাদপ্রেরণকল্পে মাঝে মাঝে কতকগুলি থলে (bag) ব্যবহার করিয়া থাকে। সুবিধা অনুযায়ী এই থলেগুলিতে লিপিবদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ বিবরণ এবং শত্রুসৈন্যের অবস্থান-চিত্র ভরিয়া সেগুলিকে মিত্র সৈন্যের উপর নিক্ষেপ করে।

একস্থানে স্থায়ী জিনিস (এয়ারসিপের আশ্রয় গৃহ, শত্রুশিবির, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি) ধ্বংস করিতে হইলে বোমা কিম্বা বায়ু-টর্পেডো (air torpedo) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাতে বোমা নিক্ষেপ করা কোনো কর্ম্মেরই নয় তাই বোমা নিক্ষেপের পৃথক সরঞ্জাম প্রত্যেক "এরোপ্লেন" "এয়ারসিপ ইত্যাদিতেই সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ ১ ডজন বোমা স্তরে স্তরে সাজান থাকে। এক একটী আন্দাজ ১০পাউণ্ড ওজনে এবং ২ পাউণ্ড পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থে নির্ম্মিত হয়। যখন নিশ্চিতরূপে কোনও জাহাজ বা "এয়ারসিপ সেড" (air ship shed) ইত্যাদি গোলা বর্ষণে বিধ্বস্ত করিতে হয় তখন ঐ এক ডজন বোমা এক সঙ্গে ২১ সেকেণ্ডের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বোমার বিস্ফোরণে নিম্নে ৬০০ ফিট বিস্তৃত ভূমি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইতে পারে।

শত্রুকে ঠিক মত লক্ষ্য করিবারও পৃথক যন্ত্র আছে। উহার ভিতর দিয়া চাহিলেই ঠিক মত লক্ষ্য সন্ধান করা যায়। কতকগুলি চিত্র আছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই শত্রুসৈন্য কত নিম্নে অবস্থিত, লক্ষ্য স্থির করিবার কতক্ষণ পরে বোমা নিক্ষেপ করিলে সেই গতিশীল "এরোপ্লেন" হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা লক্ষ্যসামগ্রী ঠিক আঘাত করিবে ইত্যাদি অতি সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ বোমা নিক্ষেপে শত্রুসৈন্যের প্রভূত ক্ষতি সংসাধিত হইতে পারে। নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বোমাও এতদুদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল বোমার অসাধারণ শক্তির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মেনীতে ক্রুপের কারখানায় (Krupp gunfactory) একরূপ বোমা নির্ম্মিত হইয়াছে—এগুলি শূন্য হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই এক

অতি উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিতে থাকে। নিম্নে যে কোনো পদার্থের উপর উহা পতিত হয় তাহাই জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়; এতদ্ব্যতীত উহার উজ্জ্বল আলোকে বিমানচারী রাত্রির অন্ধকারেও নিম্নের জিনিস উত্তমরূপ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে পারে। ব্যোমযান হইতে একরূপ সার্চ্চলাইটও ৫০০ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া হয় উহার আলোকে ব্যোমবিহারী ঠিক মত লক্ষ্য সন্ধান করিতে পারে। কিন্তু সার্চ্চলাইটের উজ্জ্বল আলোকে দিশাহারা হইয়া নিম্ন হইতে ব্যোমযানকে কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না।

জার্ম্মেনরা আর একরূপ বোমা আবিষ্কার করিয়াছেন এগুলি ব্যোমযান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং সেই সুযোগে ধূমের অন্তরালে থাকিয়া অলক্ষ্যে বিমানচারী শত্রুসৈন্যের অগোচরে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

আরো ভয়ানক এক প্রকার বোমা নির্ম্মিত হইয়াছে এগুলি বিস্ফুরিত হইয়া যে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীরণ করে তাহা নিম্নে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ১০০ গজ পর্য্যন্ত যে কোনও প্রাণী থাকে তাহাদিগকেই মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে।

শূন্যশত্রু নিধন কল্পে যেমন "ঊর্দ্ধমুখী কামান" (anti aircraft guns) নির্ম্মিত হইয়াছে তেমনি জাপানীরা এই উদ্দেশ্যে একপ্রকার বোমাও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। টোকিও সহরের নিকট একস্থানে একটী বেলুনে একটা কুকুর রাখিয়া সে বেলুন উপরে উড়াইবার পর একটী রাসায়নিক বোমা আকাশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বোমাটী বেলুনটীর ৩০০ ফিট নিম্নে বিস্ফুরিত হইয়াছিল। বোমা বিস্ফুরিত হওয়ার কয়েক মিনিট পর বেলুনটীকে নামাইয়া দেখা গেল কুকুরটীর জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে।

সুখের বিষয় এই ভয়ানক বোমা ২০০০ ফিটের অধিক ঊর্দ্ধে পৌছান সম্ভবপর হয় নাই। বিমানবিহারীরা পৃথিবী হইতে ৬০০০ হইতে ১০,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থান করিয়া সহজেই এই প্রকার বোমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

নবাব

দশম পরিচ্ছেদ

সদস্য-নির্ব্বাচন।

"পজোনিগ্রো। কর্সিকা।"

মস্থঁ জুজ,

আজ ক'দিন পরে আপনাকে এই চিঠিখানি লেখবার অবসর পেয়েছি। আজ পাঁচ দিন হল আমরা কর্সিকায় এসেছি, কিন্তু এসে অবধি এত কাগজ-পত্র দেখা, মিটিং করা, দলিল-দস্তাবেজে সই, পথ-ঘাট দেখা, মজলিস করার হাঙ্গামে মেতে আছি যে এক ছত্র চিঠি অবধি আপনাকে লেখবার সময় পাইনি। আপনাদের সঙ্গে প্রায় দু'হপ্তা দেখা হয়নি,—যাই হোক—আর বেশীদিন অদর্শনে থাকচি না; শীঘ্রই ফিরবো। পরশু কর্সিকা ছেড়ে একেবারে সটান্ প্যারিতেই যাব—পথে আর কোথাও নামতে হবে না।

তারপর এই নির্ব্বাচনের ব্যাপার!—সেদিকটায়, বলতে গেলে, আমাদের কাজ বেশ গুছিয়েই ফেলেছি। তবে ঐ যে এখানকার কাজ-কারবারের বিজ্ঞাপনে ওখানকার কখানা কাগজ লোককে যে রকম দম্ দিয়ে বেড়াচ্ছে—কথার ছটায় দেশের

লোকের তাক্ লাগাচ্ছে যে এখানকার কারবারে কিছু টাকা ঢাললেই একেবারে রাতারাতি লাখোপতি হবে, সে সব একেবারে ঝুটো কথা! কাজ-কারবারের যে লোভ দেখাচ্ছে, সে একেবারে ভুয়ো! খালি ফাঁকা আওয়াজ। কাজ-কারবার বলতে গেলে এখানে তার পাঠ মোটেই নেই। তা বলে খনি কি নেই? আছে—কিন্তু তার ভিতর আর-কিছু নেই, —শুধু জঙ্গল—সাপ-খোপ বিস্তর মেলে। জমি যা, তাতে চাষ চলে না—চাষের যুগ্যি করতে হলে সে জমির উপর আগে লাখো-লাখো টাকা ঢাললে তবে জমি তোয়ের হতে পারে—তার পর চাষ-আবাদ! বন আছে—কিন্তু সেখান থেকে কাঠ আনতে হলে এরিয়োপ্লেনে চড়ে গাছ কাটতে হবে, না হলে সে অজগর বনে ঢোকবারই সাধ্য নেই। ঝর্ণা কতকগুলো আছে বটে—কিন্তু সে জল মুখে দিলে সদ্য বিকার হয়! নদীতে ষ্টীমার একখানি নেই! আর রেল? রেলের কথা তুললে এ-দেশের লোক হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারা ভাবে, বুঝি কোনরকম ঠাট্টা করছি। "রেল" মানে এদেশের লোক কি বোঝে, জানেন?—"টিকটিকি পুলিশ!" এই হল দেশ, আর এই ত সে দেশে কারবারের হাল!

আসল কথা, দেশে খানকতক পুরানো তক্তা আর পাঁচ-ছ' খানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর আছে! আপনি ভাবছেন, তবে কিসের জন্য নবাব ঐ সব বাজে কাগজ দেখে এত টাকা কোথায়ই-বা ঢালছেন! এই পাঁচ মাস ধরে লোকেও ত শেয়ার কিনছে—এ কেন! লোকে যে কিনছে, এ শুধু নবাবের নাম দেখে—এ কোম্পানির ডিরেক্টার নবাব নিজে—তাই তাঁর নামে লোকে আজ বিশ্বাস করে টাকা ঢালছে। জানে না, এ টাকা তারা জলে কি কোথায় ঢালছে! যাই হোক, নবাবের নাম নিয়ে শয়তানরা এই যে টাকা-রোজগারের জন্য এক জুচ্চুরির কল পেতেছে—খালি বাজে ধাপ্পায় সকলকে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, এ আর আমি ঘটতে দিচ্ছি না। ওখানে ফিরেই নবাবকে সব আমি সাফ্ খুলে বলবো, এদের ভুয়ো চাল ধরিয়ে দেব। নবাবকে এই সব ফন্দীবাজ চোরের হাত থেকে রক্ষা করব। আজ আর বেশী কথা থাক। শীঘ্রই ত ফিরছি। আপনার মেয়েদের কাছে আমার কথা বলবেন, তাঁরা যেন আমার এ দীর্ঘ অনুপস্থিতি ক্ষমার চক্ষে দেখেন! আপনার টেবিলের এককোণে যে ঠাঁইটুকু পেয়েছি, ফিরে গিয়ে শীঘ্রই তাতে আবার দাবী বসাবো—এ কথাটুকুও তাঁদের মনে রাখতে বলবেন। আজ তবে আসি। ইতি

পল দ্যে গেরি।"

নবাবের প্রাসাদে এ দিকে অতিথি সমাগমের বিপুল ধূম বাধিয়া গিয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিথির আর বিরাম নাই। নানা আকারের, নানা বেশের লোক সাগ্রহ চিত্তে নবাবের প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে, আবার পূর্ণ পকেটে হৃষ্ট মনে ফিরিয়া যাইতেছে। নৈরাশ্যে কাতর একখানি মুখেরও দেখা মিলে না। সকলেই যেন এক কল্পতরুর সন্ধান পাইয়া সাগ্রহে ছুটিয়া আসিতেছে—আবার আগ্রহ মিটাইয়া বাসনা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে! নবাবের

প্রাসাদ যেন একটা সরাইয়ের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এক বিরাট কামনা-সত্র! যে যে কামনা লইয়া আসিতেছে, তাহার সেই কামনাই নবাবের প্রসন্ন দৃষ্টি-কিরণে, করুণার মিষ্ট ধারায় ভরিয়া পূরিয়া উঠিতেছে! এই নির্ব্বাচনের উপলক্ষে সকলেই আপনার আপনার তহবিলটিকে ভালো করিয়া ভরিয়া লইবার সুযোগ পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে!

ওদিকে বাজারের একপ্রান্ত হইতে আর একটা দুঃসংবাদও জাগিয়া উঠিয়াছে—নবাবের জয়ের আশা না কি ততটা পরিপূর্ণ নহে! ইহা সেই হেমারলিঙের চাল—নিশ্চয় ইহার মূলে হেমারলিঙের ষড়যন্ত্র! হেমারলিঙের বিরুদ্ধে নবাব তাই এই নিষ্ঠুর কঠোর অর্থ-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, চিত্রশালা সর্ব্বত্র বিরাট চাঁদা দিয়া, লোকের পকেটে টাকা ঢালিয়া—টাকায় তিনি সেই আশঙ্কা-মূলক জনরবটাকে ঢাকিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যে নবাবের চিত্ত সংক্ষুব্ধ সাগরের মত গম্ভীর থাকিত, শত সহস্র বিদ্বেষ ও হিংসার বাণে এতটুকু বিচলিত হইত না—সেই নবাব আজ মুহুর্মুহু উত্তে-জিত, বিচলিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছেন। গেরি তাহা লক্ষ্য করিল। তাহার প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। আহা, নবাব, বেচারা নবাব! রাক্ষসের মত এই পারির লোকেরা নির্দ্দয়ভাবে নবাবের অর্থ শোষণ করিতেছে! উপায় নাই—উপায় নাই! এ মারণের হাত হইতে নবাবকে রক্ষা করিবার গেরির এতটুকু সামর্থ্য নাই! দাঁড়াইয়া তাহাকে এ মারণ-যজ্ঞ দেখিতে হইবে! সে কি শুধু নবাবের নিমক খাইয়াছে? না—নবাবের স্নেহে, নবাবের করুণায় আজ যে সে ভদ্রলোকের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। তাহার প্রাণটা ত শুকাইয়াই গিয়াছিল,—নবাবই তাহাতে সহানুভূতির স্নিগ্ধ শীতল ধারা ঢালিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন! নবাব যে তাহার সব—তাহার বন্ধু, তাহার পিতা, তাহার বিধাতা! সেই নবাবের এই নির্য্যাতন কেমন করিয়া স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া দেখিবে! অথচ নবাবকে বুঝান দুষ্কর—বুঝাইলেও তিনি বুঝিবেন না যে! কতবার সে বলিবার চেষ্টা করিয়াছে—কথা ফাঁদিতে গেলেই নবাব ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠেন, "আচ্ছা, গেরি, পরে তোমার সব কথা শুনবো। এখন আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই!" বলিয়াই তিনি এই রাক্ষসদের দলে অধীর সবেগে ছুটিয়া গিয়াছেন। গেরির মনে পড়িল, সেই প্রাচীন রূপকথার গল্প। কোন্ অজগরের নিশ্বাসের এমন জোর ছিল যে সে শ্বাস গ্রহণ করিলেই চারিধার হইতে নর-নারী অধীর আগ্রহে তাহার গ্রাসে ছুটিত। সে নিশ্বাসের যাদু নবাবকেও মজাইয়াছে! নবাব না জানিয়া এই ধ্বংসের পথে আপনার মৃত্যু-গহ্বরে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন! নিরুপায় গেরি তখন আর এক পথ অবলম্বন করিল।

একদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময় নবাব বালিশের উপর একখানি পত্র পাইলেন। তাঁহারই নামে পত্র—তাহাতে গেরির নাম সহি রহিয়াছে। নবাবের

কৌতূহল হইল—তখনই তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রের প্রতি ছত্রে গেরির তরুণ হৃদয়ের নির্ম্মল সারল্য, তাহার সাধু-তার অনাবিল উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতই যেন লুটাইয়া রহিয়াছে। গেরি কোন কথা ঢাকিয়া রাখে নাই, সব—সব কথা খুলিয়া লিখিয়াছে। নবাবের বিরুদ্ধে সারা নগরের এই বিপুল ষড়যন্ত্র—নবাবের ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুর অভিযান, তাঁহার পুণ্য-নামের বিরুদ্ধে অপবাদ ও লাঞ্ছনার শরক্ষেপ—সব কথা গেরি খুলিয়া লিখিয়াছে—প্রমাণ অবধি বাকী রাখে নাই। রাক্ষসগুলার নাম পর্য্যন্ত সে ধরিয়া দিয়াছে। কোথা দিয়া কেমন করিয়া কোন্ পাষণ্ড আপনার কোন্ অভীষ্ট সাধনের সুযোগ খুঁজিতেছে, তাহাও গেরি নবাবের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে ছাড়ে নাই। কর্সিকার কারবার একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা—খনি সার-হীন, দেশ জঙ্গলময়, লোকজন বর্ব্বর! নবাবকে কি করিয়া সকলে ফাঁদে ফেলিতেছে—সমস্ত বিষয়েরই গেরি পুঙ্খানু-পুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছে। চিঠির শেষে গেরি লিখিয়াছে, "প্রমাণের সমস্ত কাগজ-পত্র আমার ঘরের টেবিলের বাঁ দিককার ড্রয়ারে পাইবেন। সেগুলি এই চিঠির সঙ্গেই রাখিতে পারিতাম—কিন্তু রাখিলাম না, কারণ আপনার বাড়ীর একটী লোককেও আমি আর বিশ্বাস করি না—আপনার চাকর নিলকে অবধি না। আমার মনে হয়, আপনার বিরুদ্ধে সকলেই কি এক ষড়যন্ত্র করিতেছে।

কাল ভোরেই আমি চলিয়া যাইব, স্থির করিয়াছি। ড্রয়ারের চাবি আপনাকে দিয়া যাইব—তখন খুলিয়া সে সকল কাগজ পত্র দেখিবেন।

কেন চলিয়া যাইতেছি, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমার এখানে কোন অভাব ছিল না, কোন অনুযোগ নয়। তবু যে যাইতেছি জানিবেন, সে বড় মনের দুঃখে। আপনি আমার কে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। তবু আমায় যাইতে হইতেছে। তাহার কারণ, আপনার কোন উপকারে লাগিতেছি না—আপনার খাইয়া, আপনার পরিয়া, দাঁড়াইয়া আপনারই সর্ব্বনাশ দেখিব, সে শক্তি আমার নাই। আপনাকে যে এই সব রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এই দুঃখই কাঁটার মত বিঁধিতেছে। কিছু করিতে পারিতেছি না—এজন্য আমার সমস্ত প্রাণ জ্বলিয়া থাক্ হইয়া যাইতেছে। হে আমার গুরু, হে আমার বিধাতা, হে আমার সব, আপনাকে এ প্রাণের কৃতজ্ঞতা না জানাইয়াই তাই চলিয়া যাইতেছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু চারিদিকে ভীষণ চক্রান্ত, এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া আমার ভয়ও হইতেছে—নিজের উপরও ক্রমে বিশ্বাস হারাইতেছি। ভয় হয়, কোন্ দিন বা আমিও এই সব নিমকহারাম শয়তানের দলে মিশিয়া যাই! সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় আজ আমি বিদায় লইলাম। এ-সঙ্গে আর বেশী দিন থাকিলে, আমিও যে আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়াইব না, তাহা কে বলিতে পারে।"

পত্রখানি ধীরে ধীরে নবাব পড়িয়া শেষ করিলেন! তাঁহার দুই চোখের

কোণে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গেরির কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

গেরি তখন কতকগুলা কাগজ-পত্র তাড়া করিয়া গুছাইয়া বাঁধিতেছিল—হঠাৎ নবাবকে দেখিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। নবাব ডাকিলেন, "পল—"

গেরি সসম্ভ্রমে নবাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—তাহার দৃষ্টি নত।

নবাব ঘরের দ্বারটা ভেজাইয়া দিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি চলে যাচ্ছ, পল?"

গেরি কোন উত্তর দিল না; তাহার বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নবাব আবার কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা, সত্য করে বল পল, এই যে পারির এক কোণে আমার নামে আজ একটা কুৎসা জেগে উঠেছে, সেই শুনেই আমার উপর ঘৃণা করে তুমি চলে যাচ্ছ, না, আর কোন কারণে যাচ্ছ? বল,—এ কথাটুকু শোনবার বোধ হয় আমার অধিকার আছে, পল—কেন না, তুমি নিজেই বলেছ, আমায় তুমি নিজের বাপের মতই ভাল বাস।"

পল বলিল, তাহার চিঠিতেই সে চলিয়া যাইবার কারণ কি তাহা খুলিয়া বলিয়াছে ত—তাহা ছাড়া যাইবার আর দ্বিতীয় কারণ নাই।

নবাব কহিলেন, "তবে শোন পল, তোমায় এক নতুন কথা বলি। তোমার চিঠি আমি পড়েছি—এ চিঠি তোমারই যোগ্য হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ, পল, এই পারি সহরটাকে আমি যে রকম ভাবতুম, সে রকম সে মোটেই নয়। এ যেন রাক্ষসীর মতই দিবারাত্র হাঁ করে আছে! চারিধারে ষড়যন্ত্র—চারিধারে ফন্দীবাজী চলেছে। আমি এখানে এমন একজন বন্ধু খুঁজছিলুম, যে আমায় এই সব দারুণ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে—এই সব ফন্দীবাজ লুঠের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভগবান তাই তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। পল, সহরের যত হতভাগা তাদের জুতোর কাদা আমার ঘরের কার্পেটে এসে মুছে গেছে, সে কাদা আমায় সাফ করতেই হবে। রাজ্যের জঞ্জালে আমার ঘর ভরে আছে—সে জঞ্জাল শক্ত হাতে সরাতে হবে। কিন্তু এ জঞ্জাল সাফ করা আমার একার কাজ নয়। তাতে তোমারও সাহায্য চাই। কিন্তু কিছুদিন সবুর কর—একবার এই ডেপুটিটা হয়ে নি,—কর্সিকার ডেপুটি। আর সেই ডেপুটিগিরি পেতে হলে এই সব চোরগুলোকে হাতে রাখা চাই—শুধু সেই কটা দিন তুমি ধৈর্য্য ধরে থাকো, তার পর সব বোঝা-পড়া হবে!

তা-ছাড়া ডেপুটি না হলেও চলবে না। কারণ আছে, শোন। তুমি জানো, বে-কে সেদিন অগাধ টাকা ধার দিয়েছি। সে টাকা শোধ করবার তার ত সম্ভবই নেই। সে টাকা চাওয়ায় উল্টে সে আশি লক্ষ টাকার দাবী করেছে—বলে, এ টাকা তার ভাইকে ঠকিয়ে ভুলিয়ে আমি আত্মসাৎ করেছি—বুঝলে? কিন্তু ভগবান জানেন, সে আমার ন্যায্য পাওনা কড়ি; গতর খাটিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা। আমি কমিশন এজেন্ট ছিলুম—বে-র ভাই আহম্মদ আমায় ভালবাসত, আমায় এ টাকা রোজগার করবার সে সুযোগ দিয়েছিল মাত্র, এই যা; এ বে-ও লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু ঐ হেমারলিঙের দল আমার নামে লাগিয়ে ভাঙিয়ে তার মন বিষিয়ে দিয়েছে। তাদেরই পরামর্শে আমার টাকা সে আজ উড়িয়ে দিতে চায়—উড়িয়ে দিয়ে উল্টো দাবী করে! তার উপর টিউনিসে আমার যথাসর্ব্বস্ব—আমার কারবার, আমার জাহাজ, আমার বাড়ী, জমি, টাকাকড়ি সমস্ত ফাঁকি দিয়ে সে নিতে চায়। নেওয়া সাজেও—নিলেই হল। কে তার বিচার করবে? আমার হকের টাকা, বিচারে কে আমায় পাইয়ে দেবে! যে বিচার করবে, সে বে'র মাইনে খায়—সে বে'র মুখের দিকেই চেয়ে আছে,—কাজেই বিচারের কোন আশা নেই। কিন্তু যদি এই ডেপুটি গিরিটা বরাতে মিলে যায়—তাহলে আমার কোন ভয় নেই—কোন ভাবনা নেই। কর্সিকার ডেপুটি, ফ্রান্সের শাসন-সভার সদস্য জাঁসুলের জিনিষে হাত দিতে বে'র সামর্থ্যও থাকবে না। বুঝলে—না হলে সর্ব্বনাশ—আমায় পথের ভিখিরী হয়ে পথে দাঁড়াতে হবে! তার মানে কি, জানো? আমি মরব!

"এখন ত সব শুনলে পল—এখন বল—এ শুনেও তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও? আমার কেউ নেই—বন্ধু বল, সহায় বল, আমার কেউ নেই। আমার স্ত্রী? সে কি মানুষ! তাহলে ভাবনা কি ছিল! ছেলেরা—? তারা ত মাটির ঢেলা। তবে আমার মা—! কিন্তু সেই মা আমার দূরে আছেন, তা-ছাড়া নানান্ দুঃখ-শোকে তিনি জর্জ্জর হয়ে পড়েছেন, বুড়ো হয়েছেন—এই মা—আর তুমি। পল, তুমি আর মা ছাড়া আমার এমন কেউ নেই যে আমার পানে চায়, দুটো পরামর্শ দেয়! এ দুঃসময়ে তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! ক্লাবে, থিয়েটারে যেখানেই আমি যাই, সেখানেই দেখি, একটা চক্রান্তের ঢেউ চলেছে—হিংসের ছুরি ঝিক্‌ঝিক করছে—হেমারলিঙের দল সাপের মত ফণা তুলে গর্জ্জে বেড়াচ্ছে, চারিধারে বিপদ। এ বিপদে তুমি চলে যেয়ো না।"

নবাবের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কাশিয়া নবাব আবার কহিলেন, "এই দেখ—ফেলিসিয়া। সে আমার মূর্ত্তি গড়ছিল, এক্সিবিশনে দেবার জন্য—যেই তার সময় এগিয়ে এল, অমনি সে বললে, কোন বিশেষ কারণে মূর্ত্তি শেষ হয়ে উঠল না, কাজেই এক্সিবিশনে দেওয়া গেল না। আমি কোন কথা বলিনি—ভাবেও দেখালুম, তার কথায় আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এ কি বিশ্বাস করবার মত কথা! আমি জানি, এ কারণ আর কিছু নয়—এ'ও পারির সহুরে চাল, পারির ফন্দী। চারিধারেই আমি দেখছি, নিরাশা! আজ যদি সালোঁয় আমার মূর্ত্তি ঠাঁই পেত— সে মূর্ত্তি আবার ফেলিসিয়ার হাতে গড়া, তাহলে আমার কম লাভ হত! কিন্তু তা হবে কেন—? আমার বরাত! যেটাকে আমি সহায় বলে অবলম্বন করছি, সেইটেই ঘুন-ধরা ঘুঁটির মত ভেঙ্গে খসে পড়ছে! পল, তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা। আমায় এ বিপদে ফেলে এখন তুমি চলে যেয়ো না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভারত অধিকারে কাহার যোগ্যতা বেশী ?

(ম্যাজ্‌লিয়েরের ফরাসী হইতে)

কোনও য়ুরোপীয় জাতির দ্বারা ভারতজয় ভারতের ক্রমোন্নতির জন্যই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এমন কোন জাতির দ্বারা ভারতে সামুদ্রিক উপনিবেশ স্থাপন করা আবশ্যক যে জাতির লোক-সংখ্যা অবিরাম নবীকৃত হইবে। কেননা, ডাঙ্গা পথ দিয়া যেকোন জাতিই আসুক না কেন, সে জাতি সমগ্র দেশকে সভ্য করিয়া তুলিতে পারিবে না; স্বীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই সেই সব আক্রমণকারীরা আব-হাওয়ার নিকট হার মানিয়া দেশীয়দিগের সহিত একত্র মিশিয়া যাইবে।

কিন্তু য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কোন্ জাতির দ্বারা ভারত অধিকৃত হওয়া উচিত? উহাদের মধ্যে অধিকাংশ জাতিই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তন্মধ্যে কাহারো-কাহারো কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প ছিল না। দেনেমারেরা অতীব দুর্ব্বল; জর্ম্মনেরা বিভক্ত, এবং অন্য স্বার্থ লইয়া পূর্ব্ব হইতে ব্যাপৃত। ইহাদের মধ্যে চারি জাতি ভারতে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রকৃতি, য়ুরোপীয়দিগের বিচিত্র মনোগতির পরিচয় দিয়া থাকে। এই চারি জাতি—পোর্টুগী, (এক শতাব্দী ধরিয়া স্পেন জাতির সহিত সংযুক্ত) ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ।

*
* *

পূর্ব্বে স্পেনজাতি মুরদিগের সহিত যুদ্ধে যে-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই ভাবের ভাবুক হইয়াই বীরধর্ম্মী খৃষ্টান ভাস্‌কো-দা-গামা, আল্‌বুকার্ক, জুয়ান-দা-কাস্ত্রো বিপদের অন্বেষণে যাত্রা করে।

সম্রাট্ Charlemagneএর সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধায় তাহারা সম্রাজ্যবিজয়ের স্বপ্ন মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিল। ক্রমে গোয়া, কালিকট্, সিংহল, মলক্কা, মাকাও তাহাদের হস্তগত হইল।

Camoens বলেন;—"আমি সেই সকল জগদ্‌বিখ্যাত বীরগণের বাহুবল কীর্ত্তন করিব যাঁহারা লুসিটানিয়ার পশ্চিম কূল হইতে, জাহাজে করিয়া অজ্ঞাত সমুদ্রপথে Trapobane ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। কি যুদ্ধবিগ্রহে, কি বিপদ-আপদে,—তাঁহাদের সাহস সর্ব্বপ্রকার মানব-শক্তির ঊর্দ্ধে স্বকীয় শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছিল। সুদূর দেশবাসীদিগের মধ্যে তাঁহারা এরূপ এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যাহার খ্যাতি দ্যুলোক পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল। আমি সেই রাজাদিগেরও মহিমান্বিত

কীর্ত্তিকলাপ গান করিব যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, আফ্রিকা ও এসিয়ার অধর্ম্মপরায়ণ দেশসমূহকে উজাড় করিয়া দিয়া অমর কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।" গোড়ায় ঐ সকল দিগ্‌বিজয়ীদিগের এইরূপ ভাবই ছিল। কিন্তু হঠাৎ প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করায় পোর্টুগাল ও স্পেনের আর্থিক জীবনটা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল! উহাদের মধ্যে যাহারা খুব শ্রমী ছিল, শ্রমের কার্য্যে তাহাদের অরুচি জন্মিল; বিপদ-অন্বেষণের কাজটা তাহারা পছন্দ করিল, এমন-কি বিপদান্বেষণের স্বপ্নও তাহাদের ভাল লাগিতে লাগিল। একটি অতিবিস্তৃত সাম্রাজ্য পোর্টুগালের ক্রমোন্নতির গতিরোধ করিল এবং তাহাদের নিজের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধিকৃত রাজ্যেরও অবনতি হইল।

তাহার পর উপনিবেশগুলির শাসনকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতেছিল না। অসংযত ক্ষমতালুব্ধ কর্ম্মচারীদিগকে উদ্ধত ও নৃশংস করিয়া তুলিল। য়ুরোপীয় (Inquisition) বিধর্ম্মীদিগের বিচারার্থ একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত হইল।

উহারা ভীরু, সন্দিগ্ধ ও কোন নূতন কার্য্য প্রবর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া উঠিল। অথচ, তরুণ উপনিবেশের পুষ্টিসাধনের জন্য, কোন উন্নতিজনক কার্য্য আরম্ভ না করিলেও চলে না। দেশীয় লোকদিগের বিরুদ্ধেও Inquisition প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতীয় ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান দেশীয় লোকেরা উহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিল; দেশীয় রাজাদিগের প্রতি, প্রটেষ্টাণ্ট ওলন্দাজদিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তাহারা পোর্টুগী নাম ধারণ করিল, য়ুরোপীয়দিগের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইল। এইরূপে একদিকে যেমন শাসনপদ্ধতির অবনতি হইল, সেই সঙ্গে সমস্ত জাতিটাই অবনতিগ্রস্ত হইল। সপ্তদশশতাব্দীতে পোর্টুগীরা তাহাদের অধিকৃত রাজ্যের অধিকাংশই হারাইল; যাহা তাহাদের বজায় রহিল, সে সমস্ত রাজ্যও শক্তিহীন ও দরিদ্র হইয়া পড়িল। কেবল ভয়ত্রাসই তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেয় নাই। অতএব ঐ জাতি এমন সকল গুণ কখন পাইতে পারে না যাহা থাকায় মানুষ বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিংবা স্থায়ী সাম্রাজ্যস্থাপনে সফলতা লাভ করিতে পারে।

*
* *

পোর্টুগীদিগের পরে ওলন্দাজ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য একচেটিয়া ছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে, বিশ হাজার য়ুরোপীয় জাহাজের মধ্যে, ষোল হাজার ওলন্দাজদিগের ছিল। উহাদের দুই কোম্পানী,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইণ্ডিয়া কোম্পানী—সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত; অ্যামষ্টার্ডামের শ্রেষ্ঠিচত্বর (Exchange) সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিত। উহাদের বেঙ্কের কোষে ৩০ কোটি ফ্লোরিণ মজুদ থাকিত। কার্পাস বস্ত্র, মসিনার সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, বুটার কর্ম্ম,

ও গালিচা—এই সমস্ত শ্রমশিল্পে উহাদের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

১৩৩৫ হইতে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ—এই কালের মধ্যে ওলন্দাজেরা, গোয়া ছাড়া পোর্টোগীদিগের প্রায় এসিয়ার সমস্ত অধিকৃত রাজ্য তাহারা কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি, উত্তমাশা-অন্তরীপ,—য়ুরোপের যাত্রাপথকে ওলন্দাজদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া দিল; আবার মলাক্কা,—চরমপ্রান্তবর্ত্তী এসিয়ার পথ উহাদের দখলে আনিয়া দিল। উহাদের রাষ্ট্রনীতি বণিকের রাষ্ট্রনীতি ছিল। সমস্ত প্রতিযোগিতা অপসারিত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত—উহারা প্রতিদ্বন্দীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না। উহারা ধন সম্পদ উপভোগ করিতেই ব্যস্ত সুতরাং উহাদের দেশবিজয়ের চেষ্টা ছিল না। উহারা দেশীয় রাজাদিগের আশ্রয় লাভ করিতেই ভালবাসিত। উহারা যতদূর পারিত দেশের ধন শোষণ করিয়া দেশীয় লোকদিগকে কুলি মজুরে পরিণত করিত।

Guexএর যুদ্ধসময়ে ওলন্দাজেরা যে সকল গুণ অর্জ্জন করিয়াছিল, সমৃদ্ধি ঐ সকল গুণ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে অপহরণ করিল। ক্রমওএলের অধীনে ইংরাজদিগের সামুদ্রিক প্রভুত্ব যে সময় পরিপুষ্ট হইতেছিল, যে সময়ে চতুর্দ্দশ লুই-র যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, সেই সময়েই ওলন্দাজদিগের প্রভুত্বের অবসান হয়। সৌণ্ডের দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া, এসিয়ার সমস্ত উপনিবেশগুলি হলণ্ডের হস্তচ্যুত হইল। প্রাচীন পোর্টুগী নগরগুলি, বড় বড় নামজাদা মেটে-ফিরিঙ্গি অধিবাসী লইয়া, গির্জ্জাগুলিকে বহুমূল্য ভূষণে বিভূষিত করিয়া, পোর্টুগী-মর্ম্মভাব কতকটা বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু ওলন্দাজেরা ভারতে সেরূপ কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে নাই—কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র বন্দরে কতকগুলি পুরাতন গৃহ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। আবার সে বন্দর গুলিও এখন প্রায় পরিত্যক্ত।

*
* *

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে, ইংরাজ ও ফরাসী—ইহাদেরই মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ চলিতে লাগিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রয়োজন, এই দুই জাতির রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন গতি নির্দ্দেশ করিল। ফ্রান্স-দেশের ব্যক্তিগত আরম্ভিক উদ্যোগ আদৌ ছিল না। রাজমন্ত্রিগণ প্রাচ্য সাম্রাজ্য স্থাপন-কল্পনায় বাণিজ্যের কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা য়ুরোপে ফরাসী প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে, ভারতীয় ব্যাপারে বহুকাল ধরিয়া মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তাহার পর Lawএর হঠাৎ নানা প্রকার খামখেয়ালী মৎলবের আবির্ভাব হইল; অভিজাতবর্গ, বেঙ্ক-কর্ত্তা, সওদাগর, এমন কি শ্রমজীবিরা পর্য্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল,—এসিয়া পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের লীলাভূমি, এবং কতকগুলি ভারতীয় বাণিজ্য-কোম্পানী স্থাপন করিলেই তাহারা অচিরাৎ ধনশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু তার পরেই

বণিক্‌সম্প্রদায় দেউলিয়া হইয়া পড়িল; তখন ভাগ্যান্বেষী বণিকেরা তাহাদের শেয়ারগুলি বিক্রয় করিতে এত ব্যস্ত হইল যে তাহার বিনিময়ে তাহারা রত্ন-অলঙ্কার ও বাসন কোষণ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং রাজ-সরকার হইতেও জহরী ও স্বর্ণকারদিগের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইল। তথাপি ফ্রান্সের স্থাপিত ভারতীয় কোম্পানী কতকগুলি গুরুতর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল—যথা,—তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায়। ঐ কোম্পানী ফ্রান্স-দ্বীপ, La Reunion, পণ্ডিচরীর বন্দর—এই স্থান গুলির অধিকারী ছিল। কিন্তু Law দেউলিয়া হইয়া যাইবার পর, উপনিবেশের কথা কেহ আর মুখে আনিত না। কিন্তু ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শাসনকর্ত্তা দুপ্লে এমন একটা মৎলব আঁটিয়াছিলেন—যাহা প্রতিভার পরিচায়ক;—

অর্থাৎ—ভারতীয় উপাদান লইয়াই একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা। তিনি বিজয়-সূত্রে এই সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন মনে করেন নাই, মোগল সম্রাট ও কর্ণাট-নবাবের প্রদত্ত অধিকার-পত্রের বলেই এই সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যই তাঁহার সৈন্য হইবে, কেবল কতকগুলি ফরাসী সেনা-নায়ক থাকিবে। তাছাড়া, তাঁহার শাসনপদ্ধতি দেশীয় লোকেরই শাসনপদ্ধতি হইবে; কেবল কতকগুলি ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তিনি মুসলমান ও হিন্দু রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে চাহিলেন না; তিনি তাহাদিগকে সামন্ত রাজা অথবা মিত্ররাজা করিয়া রাখিতে চাহিলেন। তিনি দেশীয় রাজাদিগের রাজ-কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন. উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি একজন উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়া দিতেন, এবং তাঁহার আশ্রিত উত্তরাধিকারীকে সৈন্য, অর্থ, ও যুদ্ধসরঞ্জাম প্রভৃতি যোগান দিয়া সাহায্য করিতেন। কতকগুলি রক্ষিসৈন্যের সহিত একজন ফরাসী Resident তিনি রাখিয়া দিতেন এবং সেই রেসিডেণ্ট তাঁহার মিত্র রাজাদিগের উপর নজর রাখিত। এবং সেই মিত্র রাজারাই রেসিডেণ্টের বেতন যোগাইত। এক সময়ে দুপ্লেই দাক্ষিণাত্যের প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান রাজারা, এমন কি নিজাম পর্য্যন্ত, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু দুপ্লের কার্য্য—এক ব্যক্তির কার্য্য। একার্য্যে সমস্ত ফরাসী জাতির বড় একটা হাত ছিল না, সুতরাং ফ্রান্স একার্য্যে কিছুমাত্র অনুরাগ দেখাইল না। অন্যান্য প্রধানেরা এমন কি বীরপুরুষ লাবুদোনে পর্য্যন্ত মনে করিলেন, দুপ্লের বিনাশে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বিনষ্ট হইবে মাত্র। তাহার দরুণ স্বদেশের কিছুমাত্র স্বার্থ হানি হইবে না। ফলতঃ প্রধানদের বিরোধেই ভারতে ফ্রান্সের ইষ্টসিদ্ধ হইল না। দুপ্লে, ফ্রান্সে পুনরাহূত হইলেন, দুপ্লের সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হইল।

*
* *

ইহার বিপরীতে, যে চারিত্র্যের প্রভাবে ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন

করিতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতবিজয়েও ইংরাজের সেই চারিত্র-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতকগুলি শ্রেষ্ঠ লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই, উহা সমস্ত জাতির ধৈর্য্যসহকৃত কার্য্যের ফল। ইংলণ্ডের রাজ্যবৃদ্ধির পক্ষে সমুদ্র একটি বিষম অন্তরায়। ইংলণ্ডের নৌ-বহর এবং উহার উপনিবেশগুলিই দূরবর্ত্তী রাজ্য সকল জয় করিতে পারে। লৌহ ও কয়লার খনি থাকায়, ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পে শক্তিমান হইবারই কথা। এবং বাণিজ্যই তাহার শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রীর কাট্‌তির পথ সুগম করিয়া দিতে পারে। শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদে এইরূপ সমৃদ্ধ হইয়া, ইংলণ্ড স্বকীয় অর্থ, ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য স্বভাবতই ইচ্ছুক হইবে। উপনিবেশ সমূহের যে মূলধনের অভাব, তাহাদিগকে সেই মূলধন যোগাইয়া ইংলণ্ড লভ্যজনক রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইবে।

সৌভাগ্যের অভ্যুদয়ে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায়, অতীব ক্ষুদ্রায়তন ইংলণ্ড, বসতি স্থাপনের জন্য দেশান্তরে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। এবং ইংরাজের অন্তঃপ্রকৃতিই তাহাকে আত্মনির্ব্বাসনে প্রবৃত্ত করিল। দেশীয় লোকদিগের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ না হইয়াও কিরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করা যায়, ইংরাজ তাহা বিলক্ষণ জানে। ইংরাজ বিজনতাকে ভয় করে না। Robinson Cruso—দেশান্তরবাসী ইংরাজের আদর্শ; ঝটিকার তাড়নায় একটা বিজন দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইয়া রবিন্‌সন্ ক্রুসো জীবন ধারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; একটা খাল খনন করিবার মৎলব করিয়া কত বৎসরের পর তবে সেই খাল কাটা শেষ করিল।

ইংরাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও যাহাকে প্রকৃত ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ বলে—সেই ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ইংরাজের নাই। ইংরাজ নিজের জন্য শুধু দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতা চাহে। তাহার মতে বড়কাজ মাত্রই সমবেত লোকের কাজ। ইতুর্বিদ্ যেরূপ মেক্‌সিকোর সম্রাট্ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, সেইরূপ কোন ইংরাজ, স্বতন্ত্র রাজ্য স্বরূপ কোন উপনিবেশ স্থাপন করিতে কল্পনাও করিবে না। ইংরাজ-সরকারের সাহায্য না লইয়া, রাজা ক্রুক্‌স্ ও সেসিল রোড্‌সের মত যাহারা সম্রাজ্য জয় করিয়াছিল তাহারাও রাজসরকারের আশ্রয় চাহিয়াছিল।

ব্রিটিস্ সম্রাজ্যের বৃহত্বের জন্য ইংলণ্ড উদার প্রতিষ্ঠানাদির নিকটেও ঋণী। ইংরাজ কখনই এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিকে মিশাইয়া একাকার করিতে চাহেন নাই, অথবা একই প্রকার প্রতিষ্ঠানাদি তাহাদের সকলের উপর চাপাইতে চাহেন নাই। ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানকার খুব বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যেও যাহা সেই সব জাতির স্বভাবসিদ্ধ এরূপ নানাপ্রকার শাসনতন্ত্র রহিয়াছে। হিন্দু, চিনীয়, মালাই, আরব, কাফ্রি, য়ুরোপীয়—এই সব জাতিরা স্ব স্ব আচার ব্যবহার, বিধি-ব্যবস্থা এবং অনেক পরিমাণে স্বকীয় প্রাচীন রাজনৈতিক মূলসূত্রগুলি বজায় রাখিয়াছে।

এবং যাহারা কোন এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেই প্রত্যেক উপনিবেশ তাহাদের মর্ম্মভাবটি রক্ষা করিতেছে।—হৌক তাহারা "পুরিটান্," হৌক তাহারা নগরের "বুর্জোয়া" কিংবা কাঞ্চন-অন্বেষীর দল। এই প্রকার সমন্বয়ের প্রভাবেই এই জটিলতাপূর্ণ সাম্রাজ্য সংরক্ষিত হইতেছে ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু ইংরাজেরা ওলন্দাজ- দিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নাই। ইংরাজেরা দেশীয় লোকদিগকে সভ্য করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং ইংলণ্ডের উদার প্রতিষ্ঠানাদি দ্বারাই সভ্যতা বিস্তার করিতেছে।

কলম্বস্ ভাস্কো-ডি গামা, সিজারো, ডুপ্লে ইহারা যেরূপ কীর্ত্তিসমুজ্জ্বল অপরিসীম সৌভাগ্যসম্পদ অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের উপনিবেশ বিস্তারে সেরূপ সৌভাগ্যসম্পদ অর্জ্জিত হইল না। রিশলিউর অথবা পিটর দি গ্রেটের কল্পিত দানপত্রে যে সকল ভাবী বিরাট সঙ্কল্প সমূহের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডের উপনিবেশ বিস্তারে, সেরূপ কোন সঙ্কল্পের আভাস পাওয়া যায় না। এই উপনিবেশ বিস্তারের কাজ—"দিন খাটুনির" কাজ, প্রতি দিনের কাজ। দার্শনিক-দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ইহার মধ্যে বহুল অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। কখন বা নৈরাশ্যের আবেশ, কখন বা উন্মত্ত ঔদ্ধত্য; আজ বিশ্ব-মানব-প্রীতি, কাল পাশব নৃশংসতা; কিন্তু এই আত্মচেতনাবিরহিত কার্য্য প্রকৃতির কার্য্যকলাপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অসঙ্গতির মধ্যেও বলের পরিচয়, সহজ-সংস্কারগত ধ্রুবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য জাতিরা, অনুকরণের ভাবে, গর্ব্বের ভাবে, এমন কি, স্বকীয় রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিবর্দ্ধনের অভিলাষে, স্বকীয় ভাষা ও রীতিনীতির প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায়ে, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইংরাজেরা পূর্ব্বতন ফিনিসীয়দিগের ন্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; কেননা, ইংলণ্ডের পক্ষে, অথবা প্রত্যেক দেশান্তর-যাত্রীর পক্ষে ইহা জীবন মরণের কথা!

দক্ষিণ আফ্রিকা ও এসিয়ার সমস্ত য়ুরোপীয় আবিষ্কৃত দেশ, পোর্টুগীদের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। পরে, ওলন্দাজেরা পোর্টুগীদের নিকট হইতে ঐ সকল দেশ কাড়িয়া লয়; তাহারা আবার ঐ সকল দেশ ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলতঃ এই তিন জাতির প্রণালীই উপনিবেশের তিন বৃহৎ প্রণালী। যথা:— সামরিক বিজয়-সাধন, বাণিজ্যের দ্বারা কোন দেশের ধন শোষণ, এবং দেশশাসনের সুব্যবস্থা। এই সভ্যতা যেরূপ পরপর বিকাশ লাভ করিয়াছিল, এই তিন প্রণালী সেই বিকাশের অনুরূপ। এইরূপে, যে তিন বিভিন্ন জাতির প্রকৃতি এই তিন বিভিন্ন সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, সেই তিন জাতিই পর্য্যায়ক্রমে এসিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

ইংরেজই শেষে অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিকে পরাভূত করিয়া সমস্ত জয় করিল।

ফলতঃ ইংলণ্ডই ভারতের সহিত একটা বিশেষ বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ হইল, তাহার জন্য আবশ্যক

মত ত্যাগ স্বীকার করিল, য়ুরোপীয় প্রাধান্য লাভের সঙ্কল্পকে এসিয়িক প্রাধান্য লাভের সঙ্কল্পের অধীন করিয়া রাখিল। কেননা, ভারত অধিকার করা একমাত্র ইংলণ্ডেরই নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। এসিয়া ও সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জের বিজয় সাধনের জন্য ভারত তাহাদের একটা আশ্রয়স্থান হইল, তাহাদের পণ্য দ্রব্যের কাট্‌তির জন্য ভারতই একটি তাহাদের বৃহৎ বিপনি হইল, এবং ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদিগকে মোটা বেতনে কাজ যোগাইবার জন্য ভারতের শাসনকার্য্যই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র হইল।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডই অধিক ধনশালী, সুতরাং ভারতে আবশ্যকীয় মূলধন আনিবার জন্য একমাত্র ইংলণ্ডই সমর্থ। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেও হলণ্ড সুমাত্রাদ্বীপের অন্তর্গত আচিন প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। এবং বোর্ণিও দ্বীপে যে অংশ ওলন্দাজদিগের অধিকারে অবস্থিত সেই অংশটিতে নরমাংসাশী লোকের বসতি। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ওলন্দাজেরা এই সকল দ্বীপের জঙ্গল আবাদ করিবার জন্য, জলাভূমির জল শোষণের জন্য, রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ। ইংরাজের প্রভূত অর্থই ভারতকে ইংরাজ ভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

তাছাড়া একমাত্র ইংলণ্ডই সেই মনুষ্য জাতি গড়িয়া তুলিতে পারে যাহারা ভারত জয় করিতে ও ভারত শাসন করিতে সমর্থ;—সেই সব লোক যাহারা স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কোন প্রকার সংকোচ করে না, অথচ নিজ শক্তির অহঙ্কারেও কখন উন্মত্ত হয় না। এই ভারত বিজয়ীর প্রতি অতিমাত্র ঔদ্ধত্য বা কঠোরতা আরোপ করা যায় না; কোন প্রকার অত্যাচার বা নৃশংসতার জন্য উহাদিগকে নিন্দা করিতে পারা যায় না।—সেই সব লোক যাহারা অনতিপরিমাণ বেতনের বিনিময়ে, গ্রীষ্মদেশোচিত প্রখর সূর্য্যতাপ সহ্য করে, বন জঙ্গলের জ্বররোগের আক্রমণ সহ্য করে—শুধু কতিপয় দিবসের জন্য নহে, পরন্তু খাল কাটিবার সময়ে, রেলপথ করিবার সময়, বৈদ্যুতিক তারের জাল বিস্তার করিবার সময়, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ সহ্য করিয়া থাকে;—সেই সব লোক যাহারা আবহাওয়ার দারুণ অবসাদ ও এসিয়িক সমাজের প্রচলিত ব্যসনাদির প্রলোভন অতিক্রম করিয়া থাকে। এ কথা সত্য, ইংলণ্ডের ইংরাজেরা ইঙ্গভারতীয়দের আচার ব্যবহারে বিস্মিত হয়; কিন্তু ইংরাজ চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভারতের পর একবার সুমাত্রা ও জাভায় যাত্রা করা আবশ্যক;—যেখানে ওলন্দাজেরা দেশীয় লোকদিগের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, দেশীয়দিগের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, দেশীয়দিগের মত পরিচ্ছদ পরিধান করে।

অবশেষে বক্তব্য, সমস্ত য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ইংরাজেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পথে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। এবং এই সকল বীজমন্ত্রগুলিই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্রোতের ফুল

(১৭)

বিকাল বেলা। বিপিন মহিলাদের পাঠসভায় মহাভারত পাঠ করিতেছে। এমন সময় রোহিণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—ভটচায্যি মশায়রা একঘরে হয়েছেন।

এই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত সংবাদে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিপিন অবিশ্বাস করিয়া রোহিণীর দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে চাহিল। রোহিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, সত্যি দাদাবাবু, মুখুয্যে মশায় কাছারীতে রাজাবাবুর কাছে এসে সব ঠিক করে গেছে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—ভট্‌চায্যি জ্যাঠার কি অপরাধ, কিছু শুনেছিস?

রোহিণী বলিল—দাদাঠাকুর নাকি মোছলমানের ভাত খেয়েছে।

বিপিন বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাই, দেখে আসি ব্যাপার কি।

বিপিন ঘরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় দেখিল দরজার আড়ালে আজ মালতী নাই। চারিদিকে চাহিয়া মালতীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিপিন বাহির বাড়ীতে যাইতেছিল; হঠাৎ দেখিল মালতী তাহারই পথে যেন তাহারই অপেক্ষায় তাহাকে কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন স্পন্দিত হৃদয়ে মালতীর কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যে মালতীকে দেখিবার জন্য সে ছলের পর ছল সৃষ্টি করিয়া ফিরিতে ফিরিতে কুণ্ঠিত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল সেই দুর্লভদর্শন মালতী আজ একাকিনী নির্জ্জনে একেবারে তাহার সামনে! বিপিন কোমল দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মালতী চলিয়া না গিয়া মুখ তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিল—ভটচায্যি মশায়দের খবর জেনে এসে আমায় একটু বলবেন।

মালতীর সহিত বিপিনের এই প্রথম বাক্যালাপ। বিপিনের কানে সৌন্দর্য্যের সুর বাজিতে লাগিল। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিতে পারিল—আচ্ছা।

মালতী তখন ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিয়া গেল। স্তব্ধ বিপিন একটু সম্বিৎ পাইতেই তাহার মনের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, নবকিশোরের জন্যই এই ব্যাকুলতা! মালতী তাড়াতাড়ি পাঠসভা হইতে চলিয়া আসিয়া তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং নিজে যাচিয়া তাহার সহিত প্রথম কথা বলিল—সেও নবকিশোরেরই সংবাদ পাইবার জন্য! বিপিনের মনের কানে ঈর্ষা গুঞ্জন করিয়া বলিল—ভাগ্যবান নবকিশোর!

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন বিষণ্ণমুখে নবকিশোরের বাড়ীতে

গিয়া দেখিল টোলের ঘরে একখানি শতরঞ্চ বিছাইয়া নবকিশোর বসিয়া পড়িতেছে। বিপিন বুঝিল বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিবার এই আয়োজন।

বিপিনকে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া হাসিয়া নবকিশোর বলিল—শুনেছ?

—শুনেছি। কিন্তু ব্যাপার কি?

—বস। বলছি।

বিপিনকে পাশে বসাইয়া নবকিশোর আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। শুনিয়া বিপিন হাসিয়া বলিল—এই! আমি মনে করলাম না জানি কি মহামারী ব্যাপার। কিন্তু যাই হোক, আমাদের এই প্রথম মোহড়ায় একটা এরকম বাধা ওঠা সুবিধের হল না। তুমি অতটা না করলেই পারতে; কিন্তু স্থান কাল বিবেচনা করে কাজ করা তোমার কুষ্ঠিতে লেখে না জানি। তবু অল্পে অল্পে রইয়ে সইয়ে আমাদের মত প্রচার করলে ভালো হত।

নবকিশোর জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—কক্‌খনো না। ভগবানের স্বরূপের মধ্যে প্রথমেই ঋষিরা নির্দ্দেশ করেছেন যে তিনি সত্যং। এই সত্যকে জীবনে স্বীকার করতে না পারলে কিছুই হল না। যা সত্য তা চিরকাল খাঁটি, খোলাখুলি সাদা-সিধে; তার সঙ্গে আধাআধি রফা করা চলে না। যে রফা করে' সকল দিক বাঁচিয়ে চলতে চায় সে কখনো সত্যকে ত পায়ই না, অধিকন্তু যে অসত্যের খাতিরে সত্যের সঙ্গে রফা করে সেই অসত্য তাকেই আশ্রয় করে' বেঁচে থাকে কেবল তাকেই লজ্জা আর ধিক্কার দেবার জন্যে।

নবকিশোরের বজ্রনিনাদ শুনিয়া বিপিন ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল—তা ঠিক। জ্যাঠা মশায়ের মধ্যে যে এতখানি উদারতা প্রচ্ছন্ন ছিল তা আজ তোমার দ্বারা উদ্ঘাটিত হল।

নবকিশোর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ আমি যে একটুও উদার হতে পেরেছি, তার আদি কারণ আজ আবিষ্কার হল।

বিপিন বলিল—বাবা তোমাদের এক-ঘরে করেছেন; কিন্তু আমি ত তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না; আমি ত তোমারই দোসর! আমি তোমার সঙ্গে এসেই একঘরে হয়ে থাকব।

নবকিশোর বিপিনের কাঁধের উপর হাত দিয়া বলিল—দূর পাগল! এত নিষ্ক্রিয় ভাবে একঘরে হবার সাধ কেন? যে ব্রত গ্রহণ করেছ করে যাও। আপনিই একঘরে হবে, কিছু চেষ্টা করতে হবে না।—বলিয়া নবকিশোর উচ্চরবে হাসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—চল একবার জ্যাঠা-মশায় জ্যেঠিমাকে প্রণাম করে যাই।

—যেয়ো, এত তাড়াতাড়ি কেন? একঘরের ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে ভয় হচ্ছে?—বলিয়া নবকিশোর আবার জোরে হাসিয়া উঠিল।

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি! কিন্তু মালতী তোমার খবর পাবার জন্যে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। সে সত্যি তোমায় খুব ভালোবাসে।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—সে আমায় ভালোবাসে কিনা জানিনা, তবে তুমি যে তাকে এরই মধ্যে ভালোবেসেছ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বটে।

—কখনো না! এখনো আলাপই হয়নি। সেই আজ আগে কথা কয়েছে শুধু তোমার খবর জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে।

—তা তুমি যেরকম লাজুক, এক বাড়ীতে থেকেও এ জন্মে ত আলাপ করতে পারতে না। ভালোই হয়েছে এই সূত্রে আলাপটা হয়ে যাবে। বরফ একবার ভাঙ্‌লে গলতে আরম্ভ করে। তবে বিনা আলাপেই এই, আলাপ হলে আর বাঁচবে না দেখছি।—নবকিশোর আবার হাসিয়া উঠিল।

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—ছিঃ পরনারীর সম্বন্ধে এরকম আলাপ তোমার ভারি অন্যায়।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—হুঁ! এর মধ্যেই এত দরদ হয়েছে! তা নিজনারী করে নেবে বলেই ত এই কথা বলা হচ্ছে।

—না না, কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—প্রণয়-রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

নবকিশোরের পুনঃ পুনঃ হাসিতে বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—যাও, কি যে ঠাট্টা কর! চল জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে আসি।

ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য হাত মুখ ধুইতেছিলেন। বিপিন গিয়া প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—আমরা একঘরে হয়েছি বাবা, শুনেছ!

—জ্যেঠামশায় আমাকেও শিগগীর আপনাদেরই পরিবারভুক্ত হতে হবে।

—না বাবা, কোনো রকম উদ্ধত ব্যবহার করে বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়ো না।

—না, আমি কোনো উদ্ধত ব্যবহার করব না। তাঁরা আপনারাই আমায় ত্যাগ করবেন।

—তা কি হয় বাবা, আত্মজকে ত্যাগ করা কি সহজ!

—দেখবেন তখন।

বিপিনের গলার আওয়াজ শুনিয়া নবকিশোরের মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—কে বাবা বিপিন এসেছ?

বিপিন প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যাঁ জ্যেঠিমা, দেখতে এলাম কিশোর গুণ্ডাটা কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছে।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাতে সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা জ্যেঠিমা, কিশোর একি কাণ্ডটা করলে বল দেখি? তোমার রাগ হচ্ছে না?

—রাগ হবে কেন বাবা? কিশোর ত কোনো অন্যায় কাজ করেনি। থালায় করে খাবার ত আমিই দিয়েছিলাম।

—তোমার মোছলমানকে ঘেন্না করল না?

—নিজেও ত এমন শুচি নই বাবা যে পরকে ঘেন্না করব। অশুচিতার জন্যে ত্যাগ করতে হলে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ

বাদ পড়েন না; তবে মোছলমানেরই কি যত দোষ হল বাবা?

বিপিন বলিল—জ্যেঠিমা, তোমার মতো আমাদের দেশের সব মেয়েদের জ্ঞান থাকলে আমাদের দেশের অনেক গণ্ডগোল সোজা হয়ে যেত।

নবকিশোরের মা একটু হাসিলেন।

বিপিন বলিল—তবে এখন আসি জ্যেঠিমা।

নবকিশোরের মা বলিলেন—এস বাবা।

(১৮)

বিপিন ফিরিয়া আসিয়াই খুড়িমার ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বিপিনের ডাক শুনিয়া সম্মুখে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল—মাসিমা নেই।

বিপিন থতমত খাইয়া বলিল—কোথায় তিনি?

—ঠাকুরঘরে জপ করছেন।

বিপিন ইতস্তত করিতেছিল, এই শীতের বিজন সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মালতীর সঙ্গে অধিকক্ষণ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। কিন্তু মালতীই তাহার দ্বিধা ঘুচাইয়া প্রশ্ন করিল—ভট্টচায্যি মশায়দের বাড়ী গিছলেন?

বিপিন লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া বলিল—গিছলাম।

মালতী কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিল। বিপিন তাহার প্রশ্ন বুঝিয়া বলিতে লাগিল—ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, কিশোর নিজের ঘরে মুসলমানকে বসিয়ে থালায় করে খেতে দিয়েছিল এই জন্যে তারা একঘরে হয়েছে।

মালতী আশ্বস্ত হইয়া বলিল—আপনিও কি বন্ধুকে ত্যাগ করবেন?

বিপিন জোরের সহিত বলিল—অসম্ভব! আমার শিক্ষা দীক্ষা চরিত্রের মধ্যে যতটুকু ভালো সে কিশোরের কাছেই আমার ধার করা। আমি তাকে ত্যাগ ত করতেই পারি না; অধিকন্তু আমি যে মতলবে এই পাঠসভা দিয়ে সংস্কারের গোড়াপত্তন করতে চেষ্টা করছি, তাইতে আমাকেও শিগগীর কিশোরের দলে ভিড়তে হবে। আর এসব অনুষ্ঠানও কিশোরেরই উদ্ভাবন, আমি শুধু তার হুকুম তামিল করছি মাত্র।

বিপিনের এই অকপট বন্ধুঋণ স্বীকার দেখিয়া মালতী শ্রদ্ধায় প্রীতিতে চোখ দুটিকে ভরিয়া একজোড়া আরতি-প্রদীপের মতো বিপিনের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। মুগ্ধ বিপিন আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

বিপিন পরিপূর্ণ হৃদয়ে প্রস্থানের জন্য যখন ফিরিল তখন একটা ছায়া তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। বিপিন তখন তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

বিপিন চলিয়া গেলে মালতী গিয়া বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—বেশ এই দুটি লোকের বন্ধুত্ব, কেমন অকপট, কেমন মহৎ! লোক দুটিও বেশ মজার। একজন যেন দেবদারু, সরল উন্নত সুন্দর; আর একজন যেন দ্রাক্ষা-লতা, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি জানে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া জগতে সুধা বিতরণ করিতেছে!

এই দ্রাক্ষার উপমার কথাটা মনে হইতেই মালতীর মুখে ক্ষীণ হাসির আভা ফুটিল। দ্রাক্ষারসের মধুরতার অন্তরালে যে মাদকতা আছে তাহাই মালতীর মনে পড়িল। কিন্তু সে ইহা স্পষ্ট করিয়া চিন্তা করিতে চাহিল না, চাপা দিবার জন্য অন্য চিন্তা আনিয়া ফেলিল—আঃ বেঁচেছি, ইনি আসাতে তবু দুপুর বেলাটা একরকম ভালোই কেটে যাচ্ছে; কেউ আর যা-তা বলে' বিরক্ত করবার অবসর পায় না……

হঠাৎ তাহার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া খুড়িমা হনহন করিয়া ঘরে আসিয়া চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পোড়ারমুখী, করেছিস কি? দুদিন কি তুই নিজেকে সামলে রাখতে পারিস নে? একটু গণ্ডগোল কমেছিল, আর চুপ করে থাকা সইল না, আবার আগুন উস্কে তোলা হল? শতেকখোয়ারী তোর কি মরণ হয় না। হয় তুই মর, নয় আমি মরি!

মালতী এই আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে বলিল—কেন, কি, হয়েছে কি?

খুড়িমা তাহার মুখের সামনে দুই হাত নাড়িয়া বলিলেন—হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! মরতে মাথা খেতে বিপিনের সঙ্গে কথা কইছিলি কেন লা শতেকখোয়ারী। তোর কিছুতে কি হায়া হবে না! তোর জন্যে আমার মাথামুড় খুঁড়ে রক্তগঙ্গায় ডুবে মরতে ইচ্ছে হয়!

খুড়িমা চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে মালতী হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিছানার উপর শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন যে-ছায়াটি সরিয়া যাইতে দেখিয়াছিল সেটি শ্রীমতী রোহিণীর। রোহিণী অন্ধকারে বিপিন ও মালতীকে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দেখিয়াই মনে করিল সে একটা খুব বড় রকমের কৌতুক আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে ঘরে নবীনা পুরন্ধ্রীগণ জটলা করিয়া কেহ পান সাজিতেছিল, কেহ সুপারী কাটিতেছিল, কেহ জলের ঘটীর মুখে চুল বাঁধিয়া দড়ি বিনাইতেছিল, কেহ পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতা পাকাইতেছিল, কেহ বা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া অনর্গল বকিতেছিল, রোহিণী ছুটিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেয় এলায়িত ভাবে বসিয়া পড়িয়া বেদম হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে সে একবার করিয়া পেট চাপিয়া ধরিতে লাগিল, আবার হাসিয়া উলটি পালটি খাইতে লাগিল।

পাঁচুর মা জিজ্ঞাসা করিল—কি রোহিণী, তোর হল কি, পাগল হলি, না ভূতে পেলে, যে, এত হাসছিস?

রোহিণী হাসির ধমকে সর্ব্বশরীর মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল—বাপরে! আমি আর এ বাড়ীতে চাকরি করবনি…আমি মাইনে বুঝিয়ে নিয়ে চলে যাব। বাপরে! আর হাসতে পারিনি…পেটে খিল ধরে গেল… সত্যি বলেছ বৌদি, এ বাড়ীতে থাকলে সদ্য পাগল হয়ে যাব…আজ একেবারে আস্ত সন্ধ্যেভূত দেখেছি।

ক্ষমা বলিল—ব্যাপার কি মাগী খুলেই বল না।

—রোসো রোসো, পেটে খিল ধরে গেছে, হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে গেছে।

—আ মর মাগী, এক ঘণ্টা ধরে ন্যাকরামিই করতে লাগল, বল না কি হয়েছে?

রোহিণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া একটু সম্বৃত হইয়া বসিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—ওগো তোমাদের মালতী গো মালতী!—বলিয়াই আবার সে হাসিতে লুটিতে লাগিল।

পাঁচুর মা পরম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী কি? মালতী কি করেছে রে?

মালতীর নামে সকলের মন ঔৎসুক্যে ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। সকলে হাতের কাজ ফেলিয়া রোহিণীকে আসিয়া ঘিরিয়া বসিল।

রোহিণী বলিল—মালতী ঠাকরুণ ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাদাবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কচ্ছিল।..... কাউকে বোলোনি যেন তোমরা, মাথা খাও বোলোনি।

ক্ষমা বলিল—অ্যাঁ! এমন! আমরা মনে করি মালতী বুঝি বিপিনদার সঙ্গে কথা কয় না! ওমা! এ যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া!

পাঁচুর মা হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—ওলো লোকের সামনে কয়না। কিন্তু আড়ালে আবডালে কইতে দোষ কি?

ঘরের মধ্যে হাসি বিদ্রূপ ও কুৎসার বান ডাকিয়া উঠিল।

রোহিণী এইরূপে এই কথাটি বাড়ীময় রটাইয়া বেড়াইল এবং যাহার কাছে একথা বলিল তাহাকেই মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া দিল, একথা যেন কিছুতেই প্রচার না হয়।

বাড়ীময় যখন ফিসফিস শব্দে আলোচনা হইতেছে তখন খুড়িমা ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন স্থানে স্থানে এক একটি মণ্ডলী একই কথা যেন আলোচনা করিতেছে; এবং তাঁহাকে দেখিয়া টেপাটিপি করিতেছে। খুড়িমাকে উৎসুক দেখিয়া রোহিণী গম্ভীরভাবে খুড়িমাকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যান্তরে যেন চলিয়া যাইতেছিল। খুড়িমা বলিলেন—কি রে রোহিণী, কি হয়েছে?

রোহিণী উদাসীন ভাবে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কি জানি বাবু, আমি অতশত কান দিইনি কি সব বলছে···মালতী দিদি নাকি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপচুপি দাদাবাবুর সঙ্গে কথা কইছিল,.....না কি, ঠিক জানিনে মা আমি।

রোহিণী যেন কিছুই বলিতে পারিল না এবং বলিবার তাহার ইচ্ছা ও অবসর নাই এইভাবে তাড়াতাড়ি খুড়িমার কাছ হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী আগুনটি ধরাইয়া দিয়াই যখন প্রস্থান করিল তখন ফুঁ দিবার লোকের অসদ্ভাব ঘটিল না। খুড়িমা লজ্জায় অপমানে ব্যথিত আহত হইয়া মালতীর উপর মনের ঝাল ঝাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে একথা গিন্নি ও বিপিনের কানেও গেল। গিন্নি বলিলেন, বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়; ঐ নচ্ছার

ছুঁড়িরই সমস্ত দোষ। ছুঁড়ির চোখ নয় ত যেন চরকিবাজি!

বিপিন অনুসন্ধান করিয়া জানিল এ কাজ রোহিণীর। তাহার একবার ইচ্ছা হইল রোহিণীকে তখনই তাড়াইয়া দিবে; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল যে সৌধের ভিত্তিই কুসংস্কার ও অজ্ঞানের কত স্তরসম্বদ্ধ পাহাড়ের উপরে, সেখানকার এক-টুকরা জমাট খসাইয়া কতটুকু লাভ হইবে।

বিপিন কৃতসঙ্কল্প হইল যেমন করিয়া হোক অজ্ঞানে আবদ্ধ কুসংস্কারের আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে এবং সকল সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রকাশ্যে মালতীর সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে।

বিপিন চিন্তা করিয়া দেখিল, এই যে সমস্ত নীচতা তাহার পরিবারে জমাট বাঁধিয়া আছে, তাহা পুরুষানুক্রমের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। এই পরিবার যে-সমাজের আদর্শে নিজের মনকে গড়িয়া তুলিয়াছে সে-সমাজে স্ত্রীশিক্ষা মহাপাপ; স্ত্রীস্বাধীনতা সে ত দুঃস্বপ্ন, স্বৈরিতার নামান্তর; পুরুষেরা আপনাদিগকে ও স্ত্রীলোকদের এত দুর্ব্বল ও পাপপ্রবণ মনে করে যে তাহারা নারীদিগকে পুরুষের সংসর্গে আসিতে দেখিলেই চাণক্যনীতি স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠে; নারীগণ যেন কর্পূরের মতো উবিয়া যাইবার জন্যই উন্মুখ হইয়া আছে, অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরের কোটার মধ্যে কড়া পাহারা দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা না করিলেই সর্ব্বনাশ! যুগযুগান্ত ধরিয়া পুরুষের এই কদর্য্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নারীদিগেরও মন এমন জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে, যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের আর বিশ্বাস করে না, মানুষ বলিয়া নিজেদের মনে করিতে পারে না, সমাজে তাহাদেরও যে স্থান ও কর্ত্তব্য আছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে চাহেও না। এজন্য চিরাগত সংস্কার যেখানে বাধা পায়, যেখানে নূতন কিছু দেখে, সেখানেই বিরূপ ও বিদ্রোহী হইয়া কেবলই বিপদের আশঙ্কা করিতে থাকে। অন্ধকারে যে লোক পথ চলে তাহার প্রতিপদেই আশঙ্কা হইতে থাকে গর্ত্তে পড়িবে কি সাপের ঘাড়ে পা দিবে কিংবা কোন্ দিক হইতে অলক্ষ্যে কোন্ হিংস্র পশু তাহাকে আক্রমণ করিবে। এই অকারণ ভয় নিবারণের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় জ্ঞানের আলোক। সমাজে পরিবারে যে সকল সংস্কারগত মিথ্যা আশঙ্কার আবর্জ্জনা বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহা ধ্বংস করিবারও একমাত্র উপায় তাহাতে জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়া দেওয়া। যেমন করিয়া হোক এই-সমস্ত কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতেই হইবে ইহাই এখন বিপিনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কর্ত্তব্য যখন স্থির হইয়া গেল তখন বিপিন ইহাও স্থির করিল রফা করিয়া কাজ করিলে আর চলিবে না, তাহাতে শুধু সময় নষ্ট; যাহা উচিত বলিয়া মনে হইবে তাহা জোর করিয়াই করিতে হইবে। তাহার আদর্শ ও তাহার বন্ধু নবকিশোর ত এই জন্যই তাহার শ্রদ্ধাভাজন। সেই কি শুধু আদর্শকে শ্রদ্ধামাত্র দিয়া কাজের

বেলা রফা করিয়া করিয়া চলিবে? না। যদি তাহার মতে ও কাজে এক না হয় তবে সে কখনো তাহার মতকে শ্রদ্ধা করে না, সে অমানুষ।

(১৯)

কাল হইতে যে কুৎসার কালি বিপিনের চারিদিকে ছড়াছড়ি হইতেছিল তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই বিপিন নিত্যকার মতো স্বাভাবিক ভাবেই নিজের পাঠসভায় আসিয়া দেখিল আজ কেহ পাঠসভার আয়োজন করিয়া রাখে নাই। তখনো বিছানা পাড়া হয় নাই, তখনো কোনো শ্রোত্রী আসিয়া জুটে নাই। শুধু তরুণীরা পাঠস্থানের আশে পাশে টেপামুখে হাসি চাপিয়া ঘুর-ঘুর করিতেছিল; তাহারা কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল এত কাণ্ডের পরও বিপিন নিয়মমত পড়িতে আসে কি না, আর সেই বেহায়া মেয়েটা তাহার কালামুখ দেখাইতে বাহির হইবে কিনা। বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সকলের ভারি কৌতুক বোধ হইল, একবার সকলের চোখে চোখে হাসি খেলিয়া গেল।

বিপিন বেশ সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিয়া ক্ষমাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে ক্ষমা, তোরা কি করে' বেড়াচ্ছিস? পড়বার জোগাড় করিস নি এখনো? যা বিছানা টিছানা পাড়তে বল। আমি মাকে ডেকে আনি।

বিপিন মায়ের সন্ধানে প্রস্থান করিল। তরুণীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কলহাস্যে ঘরখানিকে ধ্বনিত করিয়া পাঠ-সভার আয়োজন করিতে লাগিল।

বিপিন মায়ের ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—মা!

গিন্নি বলিলেন—কেন রে?

—তুমি আজ আমাদের পাঠসভায় যাওনি যে বড়—বলিয়া বিপিন ঘরে ঢুকিল।

গিন্নি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—না, আর রোজ রোজ পড়া শুনতে ভালো লাগে না।

বিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া বিপিনের হাঁটু দুটি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দাদা, আমি পল্‌ব। আমি ভালো মেয়ে, মা দুষ্টু।

বিপিন নত হইয়া বিনিকে চুমু খাইয়া বলিল—না, মাকেও দুষ্টু হতে দেওয়া হবে না; মাকে ধরে নিয়ে পড়তে চল।

বিনি গিয়া গিন্নির দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল—দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! পল্‌তে যেতে হবে না? পল্‌তে তল!

এই স্নেহের কৌতুকে গিন্নির গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তিনি পুত্রকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—যা তোরা, আমি পরে যাচ্ছি।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বিনিকে কোলে করিয়াই পাঠসভায় আসিয়া দেখিল, সকলে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু মালতী ও খুড়িমা আসেন নাই। বিপিনের লজ্জায় বাধো বাধো ঠেকিলেও জোর করিয়া বলিল—মালতী আসেনি? চ বিনি তোর মালতী দিদিকে ডেকে আনি।

বিনি বিপিনের গলা জড়াইয়া বলিল—না বলদা! মা বকবে!

বিপিন বিনির নিষেধ সত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া যখন মালতীকে ডাকিতে চলিল তখন তাহাতে বিনিরও আনন্দ ছাড়া আপত্তি দেখা গেল না।

বিপিন খুড়িমার ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

খুড়িমা বলিলেন—এস বাবা।

বিপিন ঘরের মধ্যে গেল। খুড়িমা বসিয়া মালাজপ করিতেছেন, মালতী চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে। মালতী একবার চকিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল, তাহার গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল।

সেই চকিত দৃষ্টিতেই বিপিনের চোখে মালতীর লজ্জা ধরা পড়িল; বিপিনেরও মুখ লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া গেল। বিপিন ঢোক গিলিয়া বলিল—খুড়িমা, আজ যে বড় আমার পড়া শুনতে যাওনি? ভালো লাগে না বুঝি?

—ভালো খুবই লাগে বাবা। একে মহাভারত, তায় তোমার মুখে শোনা, ভালো লাগবে না? কিন্তু বাবা, আমি আর কিছুর মধ্যে থাকব না; তুমি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ; তোমায় প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করে একবেলা দুটি হবিষ্যি করতে পেলেই যথেষ্ট মনে করব।

খুড়িমার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

বিপিন হাসিয়া বলিল—খুড়িমা, তোমায় আশ্রয় দিয়েছি আমি? আগে তুমি, না, আগে আমি। আগে তুমি এক বাড়ীতে ছিলে, একলাটি; সেখান থেকে এসে তোমার ছেলের কাছে আছ। এই প্রভেদ। এ বাড়ীও ত তোমারই খুড়িমা। এখানেও এসে একলাটি থাকবে? তা হবে না, চল।

খুড়িমা সজল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমি যাব না বাবা; আমি এই জপ করতে বসেছি।

—আচ্ছা, তুমি জপ সেরে যেয়ো। কিন্তু মালতীর ত মালাজপে তেমন অনুরাগ দেখছি নে। মালতী তুমি চল।

মালতী নিরুত্তরে নতমুখে বসিয়া রহিল। খুড়িমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিলেন। বিপিন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তথাপি জোর করিয়া সহজ ভাবেই বলিল—সেইজন্যেই ত আরো যাওয়া উচিত খুড়িমা। প্রকাশকে ভয় করে পাপ; নির্দ্দোষ যে সে অপবাদকে গ্রাহ্য করবে কেন।...চল মালতী, তোমায় যেতে হবে।

মালতীর মুখখানি অরুণোদয়ে শতদল পদ্মের মতো সলজ্জস্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। সে চোখের উপর দীর্ঘ-পক্ষ্মরাজির অবগুণ্ঠন টানিয়া মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

বিনি বিপিনের কোল হইতে নামিয়া মালতীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—মাতী দিদি, বল্‌দা দাকে, তল।

মালতী বিনিকে কোলে করিয়া বিপিনের পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইল। খুড়িমা নিস্পন্দ নির্ব্বাক বসিয়া মালাজপ করিতে লাগিলেন।

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সকলেই অপেক্ষা করিতেছে। গিন্নিও আসিয়াছেন; বিপিন নিজের আসনে বসিয়া বলিল—কাল

থেকে আমিই শুধু পড়ব না, তোমাদেরকেও পড়াব। তোমাদের পড়তে হবে।

গিন্নি বলিলেন—ছি, মেয়েমানুষের কি পড়তে আছে? মেয়েমানুষে পড়লে বিধবা হয়, কলঙ্কিনী হয়।

এই বলিয়া তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিলেন। এবং গিন্নির দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া সকলেই মালতীর দিকে চাহিল। মালতী চকিতে একবার বিপিনের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিয়া বিনির হাত দুখানি নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বিপিন মায়ের দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলেই বিধবা হয়, খারাপ হয়, এ কথা তোমাদের কে বল্লে? এই যে কলকাতার সব মেয়েরাই প্রায় লেখাপড়া শিখছে, পুরুষেরাই ত শেখাচ্ছে? পুরুষেরা কি তাহলে আত্মহত্যা করবার অস্ত্র তৈরি করচে?

জয়া বলিল—যারা মানে না তাদের হয় না। যারা মানে তাদের হয়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তবে ত সোজা উপায়ই রয়েছে, তোমরাও মেনো না।

গিন্নি বলিলেন—না না, ওসব অনাচার আমাদের হিঁদুদের সয় না।—ঐ ত ছোট ঠাকুরপো কিছু মানতেন না, ছোট বৌকে ত লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। তাতে ছোট-বৌয়ের ভালোটা কি হল? লেখাপড়া শিখে করবেই বা কি? জমিদারিও দেখতে হবে না, চাকরীও করতে হবে না। আরো লেখাপড়া শিখে অনেক মেয়েই খিষ্টান বিবি হয়ে যায়, চেয়ারে বসে, বই মুখে দিয়ে কাজ কর্ম্ম ভুলে যায়, রান্নাবান্না ঘরকন্না তখন ভাড়াকরা দাসদাসীর হাতে ওঠে, আর এদিকে ভিটেয় ঘুঘু চরবার জোগাড় হয়। যারা ঘরকন্না করবে, দুবেলা হাঁড়ি ঠেলবে তাদের লেখাপড়ার দরকার কি?

বিপিন বলিল—হাঁ, রান্নাবান্না ঘরকন্না করাই মেয়েদের প্রধান কাজ বটে, কিন্তু লেখাপড়া জেনে ঐসব করলে আরো ভালো করে করতে পারে; ছেলে পুলেদের সুপথে সুভাবে পালন করতে পারে। তুমি বলছ লেখাপড়া শিখলে কেউ ঘরকন্নার কাজ করে না; কিন্তু এটা কি ঠিক কথা হল? যারা করে না তারা না শিখেও করে না। বড়লোকের ঘরের মেয়েরা লেখাপড়াও শেখে না, কাজকর্ম্মও করে না। তোমার বাড়ীতে ত এতগুলি মেয়ে আছে, কে কত কাজ করছে? রাতদিন লোকের কুৎসাই আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে তবু একটা ভালো অবলম্বন ত পায়। আর শুধু কি তাই, মনটা বড় হয়, কত দিকে চোক খুলে যায়, এখন যেসব ব্যাপারের কোনো মানে বোঝে না, লেখাপড়া শিখলে তার মধ্যে কত আশ্চর্য্য অর্থ দেখতে পায়; লেখাপড়া শিখলে মন চিন্তা করতে শেখে; আসল ধর্ম্ম কি, মঙ্গল কিসে তা চিনে নিতে পারে; মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়; আর কত বলব। আর জমিদারী দেখা, চাকরি করা?—দরকার হলে তাও স্বচ্ছন্দে করতে পারে। এই ধর মালতীর মতন যার কেউ নেই তার পরের বাড়ীতে উঠতে বসতে গঞ্জনা সহার চেয়ে স্বাধীন ভাবে নিজের অন্ন নিজে উপার্জ্জন করা

কি ভালো মনে হয় না; আর খুড়িমা যদি লেখাপড়া জানতেন তা হলে তাঁর জমিদারী তিনি নিজেই দেখতেন, অন্য কাউকে কষ্ট করতে হত না।

মালতী ও খুড়িমার প্রতি তাঁহাদের দুর্ব্যবহারের কথা প্রকারান্তরে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে গিন্নি বিপিনের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোর ত রাতদিন শুধু খুড়িমা আর মালতীরই চিন্তা! সকল তাতেই তাদেরই তুলনা! তুই তাদের নিয়েই তবে থাক, তাদেরই লেখাপড়া শেখা, আমাদের নিয়ে টানাটানি করিস কেন?—বলিয়া গিন্নি মুখ ভার করিয়া বসলেন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—ওঁদের ত শেখাবই, কিন্তু তোমাদেরও টানাটানি করতে ছাড়ব নাকি। আমি তোমারই ত ছেলে, জান ত তোমারই মতন একগুঁয়ে!

বিপিনের একটু স্নেহের স্পর্শে গিন্নি আবার প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষই থাকবি?

জয়া গিন্নিকে প্রসন্ন দেখিয়া বিপিনের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য বলিল—আচ্ছা বিপিন, আমি ত বিধবা মানুষ, আমি তোমার কাছে পড়ব, আমার ত কোনো ভয় নেই!

বিপিন ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে শুধু একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—ক্ষমা, তোদের পড়তে হবে। বুঝলি? কাল থেকেই। তোরা কে কতদূর পড়েছিলি, একটু আধটু কিছু জানিস, না, একেবারে ক খ থেকে আরম্ভ করতে হবে।

বিপিনের উপেক্ষা গ্রাহ্য না করিয়া জয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—আমি আর দিদি পেরথম ভাগ থেকেই আরম্ভ করব। আর সবাই একটু আধটু তবু জানে।

বিপিন বলিল—কাল থেকে আমাদের পাঠশালা খোলা যাবে। বৌরা যদি আমার কাছে পড়তে লজ্জা করে তবে তাদের মালতী পড়াবে।...মালতী তুমি কি পড়বে? তোমার যে বই দরকার হবে যখন খুসি আমার ঘর থেকে নিয়ে এসে পড়বে।

এমনি জোর করিয়া বিপিন মালতীর সহিত আপনার পরিচয়টা সহজ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে বুঝিয়া মালতী ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিপিন তখন উৎফুল্ল ভাবে মহাভারত পাঠ আরম্ভ করিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া বলিল—মা, দুগেজি বল্লে মাইজীকো বল ঘরামি এসেছে।

—হাঁ, ঐ গোয়ালঘরের পাশে একখানা চালা তৈরি করে দিতে বলগে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে চালা কি হবে মা?

—আঁতুড় হবে। পাঁচুর মার ছেলে হবে কিনা তাই।

পাঁচুর মা আর একটু ঘোমটা টানিয়া মাথা নত করিল।

বিপিন বলিল—কি সর্ব্বনাশ! এই আজ বাদে কাল ছেলে হবে, ঐ স্যাঁতা কুঁড়ে ঘরে, গোয়ালের পাশে, পুকুর পাড়ে, বাড়ীর বড় নর্দ্দমাটার ধারে! এ যে একেবারে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা!

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন? মেরে ফেলবার ব্যবস্থা কেমন করে হল? তুই কোথায় ভূমিষ্ঠি হয়েছিলি?"—তারপর নিজের মৃত পুত্রটিকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নি বলিলেন—সেই হতভাগা পুলিন, আর বিনোদ, বিনি, সবাই ত ঐখানেই হয়েছে।

—হবে না কেন? কিন্তু তার ফল কি হয়েছে দেখ দেখি। আমাকে প্রসব করে আমার মা তিনদিন পরেই মারা গেলেন। ভাগ্যিস তুমি আমায় আঁতুড় থেকে বাড়ীতে এনেছিলে, তাই এখনও তোমার সঙ্গে তর্ক করছি, নইলে আমারই নজিরের নথি বেড়ে যেত—

গিন্নি বলিলেন—ষাট ষাট ও কি কথা বিপিন!

—না, তোমার ভয় নেই, আমার মরবার জন্যে আপাতত তত আগ্রহ নেই। আমি তোমার কোল জোড়া করে অনেক দিন এখনো বাঁচব আর জ্বালাব।...

গিন্নি সস্নেহ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা জ্বালাস, বেঁচে থেকেই জ্বালাস। যমের জ্বালা ত আমার জানতে বাকি নেই...তেমন জ্বালা যেন শত্রুরও না হয়।

গিন্নি উদাসভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যম রাজাকে ত নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আস তোমরা নিজেরা, তার পরে হা হুতাশ করে সারা হও। জগতের নূতন অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার ঘর যে পরিপাটি করে তৈরি কর, তা দেখে তাদের আত্মাপুরুষ পালাই পালাই ডাক ছাড়তে থাকে। আমি এ বাড়ীর প্রথম অতিথি, আমার ভাগ্য ভালো যে মা হারিয়েও মা পেলাম, আবার ফাঁকতালে বেঁচেও গেলাম। কিন্তু আমার পরে যারা এসেছে তাদের দেখ দেখি—পুলিনের সেই যে আঁতুড়ঘরে অসুখ হয়ে শরীর খারাপ হয়ে গেল তা আর শোধরাতে পারলে না। বারো বছর কোনো রকম করে টিকে ছিল কিন্তু সেও ত বেঁচে মরে থাকা। তার পর বিনো আর বিনিও ত তালপাতার সেপাই।

বিনি মালতীর কোল হইতে উঠিয়া বিপিনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলদা আমি সেপাই না, আমি বিনি।

বিপিন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এই-সব আনন্দের পুতুলের আরো কত স্ফূর্ত্তি হতে পারত, যদি এরা সৌন্দর্য্যের মধ্যে, সুস্থ আব-হাওয়ার মধ্যে বাড়তে পেত।

গিন্নি বলিলেন—আঁতুড়-ঘর ত চিরকাল সকলেরই অমনি জায়গায় হয়।

—যাদের হয় তাদের হয়, আর তার ফলও তেমনি হয়। কিন্তু তোমার কি ঘরের অভাব আছে যে একটা স্যাঁতা জায়গায় চালা তুলে তবে ছেলে হবে? যাদের বুকে করে রাখতে ইচ্ছে করে, তাদের অভ্যর্থনা হবে কিনা নর্দ্দমার পাড়ে আঁতুড়ের গন্ধে! ছি!

গিন্নি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তবে তোর কি মত যে ঠাকুরঘরে ছেলে হবে?

বিপিন স্থির শান্তভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠাকুরঘরে না হোক ঠাকুরঘরের মতন ভালো ঘরেই ছেলে হওয়া উচিত।

—ওসব ম্লেচ্ছপনা আমরা থাকতে ত হবে না। আমরা মরে গেলে তোর যা খুসি করিস।

—না মা, তা হবে না, তোমরা বেঁচে থাকতেই আমার যা খুসি তাই তোমাদের করতে হবে। ওরকম আঁতুড়ঘরে আমি কিছুতেই কারো ছেলে হতে দেবো না।

—আমার বাড়ীতে ত একপাশে এমন খালি ঘর নেই যেখানে ছেলে হতে পারে। ঠাকুর-দেবতার বাড়ী, ওসব অনাচার আমি দেখতে পারব না। ওসব সইবে না।

—মা, ঠাকুর দেবতাই ত ছেলে দেন, এ আশীর্ব্বাদ ত মা তাঁরই। তুমি ঘর ছেড়ে দিতে না পার আমি ঘর ছেড়ে দেবো। আমার শোবার ঘরে ছেলে হবে।

গিন্নি অতিমাত্র বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বিপিন তোর সব অনাসৃষ্টি আবদার! তুই ক্ষ্যাপা না পাগল! শোবার ঘরে ছেলে হবে কি? তুই ভবি কোথায় শুনি?

—আমি আমার পড়বার ঘরে শোব।

—সেখানে তোর বইয়ের জায়গা হয় না, খাট ধরবে?

—খাটের দরকার নেই, আমি কৌচের ওপর শুতে পারব।

গিন্নি পরাস্ত হইয়া বলিলেন—এই ঘরে দাই আসবে, হাড়িবৌ এসে সব একাকার ঘটমঙ্গলা করবে?

—হাড়িবৌ ত রোজ ওপরে আসে তোমার পাইখানা ধুতে, তাতে দোষ হয় না?

—সে ত একবারটি আসে, চলে গেলে গোবরজল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করা হয়।

—এও একবারটি এসে চলে যাবে। তারপর ইচ্ছে হয় গোবরজল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে নিয়ো।

—একবারটি এলেই হল? আঁতুড় ঘরে থাকবে কে? ঝাল, পাচন, জল খাবার দেবে কে?

—ঐ নোংরা হাড়ি বুঝি আঁতুড়ঘরে থাকবে আর খেতে দেবে? আরে রাম। তার সঙ্গে একঘরে থাকলে জাত যাবে না? ছোঁয়া খেলে জাত যাবে না?

—আঁতুর ঘর শুদ্ধ, তখন জাত যায় না।

—তোমাদের শাস্তরের মহিমা বুঝে ওঠা ভার। লোকের মনগড়া শাস্তর, যখন যেমনটি চাই তখন তেমনি বিধান প্রস্তুত। কিন্তু শাস্তর যাই বলুন, চোখে ত দেখছ যে হাড়ি ডোমেরা কত অপরিষ্কার। আর ওরা অপরিষ্কার বলেই ত ওরা অস্পৃশ্য হয়েছে। তার চেয়ে তোমাদের একজন থেকো না কেন? এই ত মোক্ষদা, ক্ষমা, জয়া ঠাকরুণ কত লোক নিষ্কর্ম্মা রয়েছে—আর দাসীও ত আছে গণ্ডা পাঁচেক। তবু ঐ হাড়িবৌটি না থাকলে চলবে না?

—আঁতুড়ঘরে কেউ ত থাকতে পারবে না; অশুদ্ধ হয়ে যাবে যে; গঙ্গা না নাইলে শুদ্ধ হবে না।

—আমি না হয় গঙ্গা নাইয়ে আনবার ভার নিচ্ছি! কে থাকবে আঁতুড়ে বল। ক্ষমা থাকবি?...মোক্ষদা তুই থাকবি?

সকলে নিরুত্তর।

তখন মালতী তাহার বড় বড় চোখ

তুলিয়া শান্ত স্বরে বলিল—আমায় থাকতে দিলে আমি থাকতে পারি।

বিপিন নিরাশার মধ্যে আশ্বাস পাইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় মালতীর দিকে একবার চাহিয়া মাকে উৎফুল্ল ভাবে বলিল—এই দেখ মা, আমি লোক পেয়েছি, আর তোমার ওজর খাটবে না।...যা রোহিণী, দুবেজীকে বলগে ঘরামি আর চাইনে।

—তোদের যা খুসি করগে যা—বলিয়া গিন্নি ক্রোধভরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন; বিপিনকে তিনি হয় ত কাবু করিতে পারিতেন, কিন্তু গায়ে-পড়া মালতী ছুঁড়ির জন্য যে তাঁহার পরাজয় ঘটিল ইহাতে গিন্নির মন মালতীর প্রতি অতিরিক্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

সেদিন আর বিপিনের পাঠসভা জমিল না। বিপিন মালতীকে বলিল—এস মালতী, তোমাকে আমার বইয়ের ঘর দেখাইগে।

মালতীর চারিদিকে সংঘাতের আবর্ত্ত যতই ফেনাইয়া উঠিতেছিল বিপিন সেই ঘূর্ণাবেগে ততই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। আজ মালতীর সহিত মতের একতায় বিপিনের অনুরাগ-পক্ষপাতী চিত্ত মালতীকে পরমাত্মীয় মনে করিতে লাগিল, এবং বিপিনের সৎসাহস ও সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি দেখিয়া মালতীরও অন্তর বিপিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে আকৃষ্ট হইতেছিল। মালতী বিপিনের সহিত প্রস্থান করিলে পুরাঙ্গনাদিগের বিদ্রূপহাস্য তাহাদের পশ্চাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

য়ুরোপে প্রলয়

আজি ঈশাণের বেজেছে বিষাণ দিক্ দিগন্ত ব্যাপিয়া,
করিছে নৃত্য বহ্নি-নাগিনী লক্ষ রসনা মেলিয়া।
বুঝি নরকের দক্ষিণদ্বার করিয়াছে কেবা মুক্ত,
দৈত্য-দানব রক্ত ধারায় করেছে ধরণী সিক্ত।
পক্ষ দাপটী উড়িছে গৃধ্র, ফেরুপাল ভ্রমে ঘুরিয়া,
ভীষণ শবদে রুদ্র সেবক নাচিছে তাথিয়া তাথিয়া।
পিতা ভুলিয়াছে পুত্রেরে তার, জননী পাসরে কন্যা।
ভগ্নী-শোণিতে তর্পিছে ভ্রাতা বহিয়া নরক-বন্যা।
অমুত যন্ত্র উগারে মৃত্যু চৌদিকে প্রতি পলকে,
নয়ন ধাঁধিয়া মরণ-রশ্মি ঝলসে কৃপাণ-ফলকে।
ধর্ম্ম-মোক্ষ ভুলেছে মানুষে ব্রহ্ম-আত্মা সুপ্ত,
অর্থেরি সাথে মিলিয়াছে কাম, পরম জ্ঞান লুপ্ত।
মাতার স্তন্য-পীযূষ প্রবাহ বহেনা শিশুর বদনে,
বক্ষ-উপরে র'য়েছে স্তব্ধ ডাকেনা সাদরে নবনে।
ইন্দ্র ভুলেছে বর্ষিতে তাঁর অমৃত-শান্তি-ধার,
শস্য-শীর্ষ শুকাল ক্ষেত্রে শুধুই হাহাহা-কার।
নন্দন বনে পশেছে পিশাচ, শিহরে প্রাণ তরাসে,
সন্তাপ হর, হে ত্রাসবারণ, উদ্ধার কৃপাপরশে।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন।

কিশোরীমোহন

কালপূর্ণ না হইতে সর্ব্বনিয়ন্তা করাল কাল কিশোরীমোহনকে করায়ত্ত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য তাঁহার আর একটি একনিষ্ঠ সেবক হারাইলেন। ভারতমাতাও কিশোরীতে তাঁহার একজন সাধক হারাইলেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনা ষ্টেটের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺গোবিন্দমোহন রায়মহাশয়ই কিশোরীমোহনের পিতা। বিদ্যাবিনোদ ঔপাধিক ৺গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় কেবল বৈষয়িক ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন না। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া 'মৃণ্ময়ী' নামে একখানি সুলিখিত পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহা আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত বা গণিত শাস্ত্রোক্ত ভূগোল বিদ্যার সার সঙ্কলন গ্রন্থ হইলেও ইহার দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৭৯৯ শকাব্দে মৃণ্ময়ীর প্রথম সংস্করণ এবং ১৫ বৎসর পরে ১৮১৪ শকাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ৺গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্নী 'মৃণ্ময়ীর' নামানুসারেই এই জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছিল।

সুপণ্ডিত গোবিন্দমোহনের উপযুক্ত পুত্র কিশোরীমোহনও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কুল কলেজে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও কিশোরীমোহন গৃহে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

কিশোরীমোহন প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন। প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং অর্থধ্বংস সুনিশ্চিত জানিয়াও তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র পাবনা হইতে "সুরাজ" নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে মফস্বলের কাগজের মধ্যে সুরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁহারা 'প্রবাসী' বা 'গৃহস্থে'র মফস্বলের প্রতিধ্বনি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন।



কিশোরীমোহন রায়

তিনি পরলোকগত সম্রাট এডওয়ার্ডের অমরবাণী সংগ্রহ করিয়া 'সুরাজ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'সুরাজে'র আয় পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের হিতার্থে দান করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকামূলক "কর্ম্মফল" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "কর্ম্মফল" দেশস্থ সকল সুধীবৃন্দের প্রশংসার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিল। কিশোরীমোহন তাঁহার পিতার এক জীবনী প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। সে পুস্তক প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন দেশের ও দশের অনেক বৃত্তান্ত যাহা এযাবৎ লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল তাহা সুপ্রকাশ হইত।

৺গোবিন্দমোহন ৺উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেক মনস্বীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কিশোরীমোহন দেশের সুসন্তান ছিলেন। বহুবার তিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রথম ৭ই আগষ্টের সভার পরে তিনি আর বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই।

কিশোরীমোহনের কথা ও কাজে প্রভেদ ছিল না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান বিনয়কুমারের বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অনেক আত্মীয় "দেশকাল" বিবেচনা করিয়া "দাঁও" মারিবার জন্য অনুরোধ করিতে বিরত হন নাই। "মুখে যাহা প্রচার করিয়াছি, কার্য্যে অন্যভাব দেখাইতে পারিব না"—পুরুষসিংহ কিশোরীমোহন এই কথা বলিতেন।

লেখকের সহিত কিশোরীমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লৌকিকতা হিসাবে, ধর্ম্মসম্পর্কে তাঁহার ভাগিনের স্থান অধিকার করিলেও, কিশোরীমোহন আমাকে আপন সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমার সাহিত্যিক জীবনে তিনি আমার প্রথম উৎসাহদাতা। অথচ তিনি এরূপ নিরভিমানী ছিলেন যে, কদাচ আমাকে এ কথা কাহারও নিকটে উল্লেখ করিতে দিতেন না। সকল বিষয়েই, সকলের সহিতই তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

পাবনার সাহিত্যপরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিশোরীমোহনের অকাল মৃত্যু যে পাবনা পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্যোতিবাবু শির-সামুদ্রিক (Phrenology) বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। এই সময় "সাধনা"য় এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল—যে-কোন ব্যক্তি জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া জ্যোতিবাবুর নিকট ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে মাথা পরীক্ষা করাইতে পারিবে। লোকে হুজুগ্ চায়। দুইটি চারিটি দশটি করিয়া ক্রমশঃ লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াও তিনি শেষ করিতে পারিতেন না।

অনেক দিন হইতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি আঁকেন ও তাঁহার মস্তক পরীক্ষা করেন, কিন্তু এ সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। "একে" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে ছবি ও মস্তক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল সেটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচলিত বাজারে বিক্রীত ছবি দেখিয়া। একদিন কোনও একটি বিবাহ-সভায় জ্যোতিবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিবাবু—তাহার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি একদিন জ্যোতিবাবুকে তাঁহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই সমগ্র বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি স্বর্গপ্রয়াণ করেন। জ্যোতি-

বাবুর এ সাধ আর পূর্ণ হইল না, এজন্য তিনি এখনও দুঃখ করেন।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, Phrenology ও ছবি আঁকাকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন বাবু একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (কবিতাটি অপ্রকাশিত) :—

"ওয়ালা কি মিঠে অমৃতের ছিঠে
ঐ হাত টিতে শুনায়,
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢং,
সেতার গুন্‌গুনায়।
মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
লাল্ যবে ছবি মনে ভাবে কবি
"হইয়াছে, থামো—আন্না,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না!"

জ্যোতিবাবু বলেন, অতিলৌকিক রহস্য-ব্যাপার জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল হইত। কোথাও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যদ্বক্তা আছে শুনিলেই তিনি বন্ধু বান্ধব সহ সেইখানে যাইতেন। কিন্তু প্রায়ই তাঁহাদের গণনার নিষ্ফলতা দেখিয়া নিরাশ হইতেন। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। তবে "প্ল্যাঞ্চেটের" কাণ্ড দেখিয়া তিনি কখনকখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন। একবার তাঁহার গুণুদাদা এবং তাঁর ভগিনীপতি যদুনাথ কর্ত্তৃক ধৃত প্ল্যানচেট-কাষ্ঠফলকে কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইল। কৈলাস মুখুয্যে বাড়ীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারী। লোকটি খুব মজলিসী ও সুরসিক ছিল। তাহার প্রেতাত্মাকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল :—"আমি কত কষ্ট করিয়া, মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা না মরিয়াই তা জানিতে চান? আপনারা ত বড় মজার লোক দেখছি।" তার পর অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে পরলোক সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা বলিয়াছিল, তা তোমাকে বলিতেছি :—

"আপনারা যাহাকে "ইস্ফীয়ার" sphere বলেন, মৃতেরা মৃত্যুর পর সেইরূপ এক এক ইস্ফীয়ারে গমন করে।"

"সকলেরই এক যাত্রা-পথ।"

"প্রথমে কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাকে।"

"এখানে মশায়, আর যাই হোক, পেটের জ্বালা নাই।"

যে ঘরে এই সব কাণ্ড হইতেছিল, সেই ঘরে একটা দরকারী কাগজ খোঁজ করিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মার কথা অনুসারে সেই কাগজ একজন জলের pipe-ওয়ালার নিকটে পাওয়া যায়। সে ভুলক্রমে তাহার bill-প্রভৃতির সহিত সেই কাগজ লইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর জ্যোতিবাবু পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি হইতে পারে এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য প্রথম প্রথম "ভারতী"তে জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি

পদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপেক্ষা আরও সহজ করিবার নিমিত্ত আকার মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবিত করিয়া "সাধনা"য় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এক্ষণে সমধিক প্রচলিত।

এই সময় জ্যোতিবাবু সত্যেন্দ্রনাথের নিকট সেতারায় গমন করেন। সেখানে গিয়া একজন মারাঠী পণ্ডিতের নিকট তিনি মারাঠা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই মারাঠী শিক্ষার ফলে তিনি তৎকালে "সাধনা"য় মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার তুলনা করিয়া সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্তাত্রয় বলবন্ত পারস্‌নীস্ প্রণীত "ঝাঁশি সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাঁচে চরিত্র" এই গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া তিনি "ঝাঁশিররাণী" লেখেন। "চল্‌রে চল্ সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" এগানটি এই সময় রচিত হয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "একদিন মেজ' বৌ ঠাকুরাণী আমায় বলিলেন—অনেকদিন তুমি নাটক রচনা কর নাই—একখানা নাটক এই খানে লিখে ফেল।" আমি বলিলাম—এখন আমার মাথার কোন প্লট্ নাই, লেখা হইবে না। তিনি শুনিলেন না; জবরদস্তি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া, তারকদাদার (সার পালিত) কন্যা লীলুকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া এইরূপে "হিতে বিপরীত" রচিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীতসমাজে অভিনীত হয়।"

পুনায় সত্যেন্দ্র নাথের নিকট অবস্থান কালে তথাকার "গায়ন সমাজ" দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভা স্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। কলিকাতা ফিরিয়া তিনি "গায়ন সমাজে"র আদর্শে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন। উদ্দেশ্য—বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন।

শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদপত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হইল। দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এরূপ একটি সমিতি বা সঙ্ঘের অভাব ও আবশ্যকতা বুঝিলেন। এই সভাস্থাপন করে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধনীদের দ্বারস্থ হইলেন। কেহ সহস্র, কেহ পঞ্চশত, কেহবা দুইশত রজত মুদ্রা দান করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু নিজ পরিবার হইতে দ্বিসহস্রেরও অধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল—"ভারত সঙ্গীত সমাজ।"

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটিতেই বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত উদ্যমে এবং ঐকান্তিক

আগ্রহে বেশ কায চলিতে লাগিল; সমাজও নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলিকাতায় আসিলেই এই সমাজে তাঁহার গান বাজনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিত ভাবে সভায় যোগদান করিতেন এবং পরস্পর বেশ মেলা মেশাও হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্য্যে দেবতার যেন-একটা অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে মতদ্বৈধ ঘটিয়া দুই দল সৃষ্টি হইল।

এবারকার দলাদলিতে বেশ গাঢ় রকমের একটু ঢলাঢলিও হইয়াছিল। একদল অন্য দলকে "সঙ্গীতসমাজ" হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চায়; বিপক্ষও "বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচাগ্রপ্রমাণ ভূমি" বলিয়া কৃত সংকল্প। ক্রমে জোর-দখল ও ফৌজদারি মোকদ্দমা!

জ্যোতিবাবু এ সময়ে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের একজন অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট্, তিনিও হইলেন সাক্ষী। তুমুল মোকদ্দমা চলিল। যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, এই গৃহবিবাদে সমস্তই প্রায় ব্যয়িত হইয়া গেল। প্রথম দল মোকদ্দামায় হারিয়া গৃহচ্যুত হইলেন।

বিজেতারা সিংহমহাশয়ের বাটিতেই আখ্‌ড়া চালাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সদ্য সদ্য মোকদ্দমা জিতিয়া যেরূপ উৎসাহ ছিল, পরে কর্পূরের মত সেটা উবিয়া গেল।

এদিকে হারিয়া অবধি প্রথম দলের উৎসাহ দ্বিগুণভাবে উদ্দীপিত হইল, অন্যত্র বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইখানে "ভারত সঙ্গীতসমাজ" নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। এখনও সেই বাড়ীতেই "ভারত সঙ্গীতসমাজ" চলিতেছে। এবার এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র। মিত্র মহোদয়ের সাহায্যেই সঙ্গীত সমাজ হারিয়াও জিতিয়াছিল, এবং আজও তাহা সেই পাষাণ ভিত্তির উপরেই দণ্ডায়মান। কুমার প্রথম হইতেই সঙ্গীত সমাজকে নানারূপে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সহানুভূতি ভিন্ন কখনই আজ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব থাকিত না, তবে সঙ্গীতসমাজ যে কতদূর আপনার উদ্দেশ্য সফল করিয়াছে—তাহা দেশের জনসাধারণ বিচার করিবেন।

সঙ্গীত সমাজে জ্যোতিবাবুর "অশ্রুমতী" "পুনর্বসন্ত" "বসন্তলীলা" "হিতে বিপরীত" "অলীকবাবু" প্রভৃতি নাটকনাটিকাগুলি বহুবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

এই সঙ্গীত সমাজের সহিত জ্যোতিবাবুর যখন খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল সেই সময়ে দোয়ার্কিনদিগের (Dwarkin and Sons) ব্যয়ে "বীণাবাদিনী" নামে সঙ্গীত-বিষয়ক একখানি মাসিকপত্র তিনি সম্পাদন করেন। এখানি বৎসর-দুই চলিয়া শেষে বন্ধ হইয়া যায়।

তাহার পর ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতি রাধাকিশোর মাণিক্য-দেববর্ম্মন্ বাহাদুর জ্যোতিবাবুকে সঙ্গীতবিষয়ক একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধক্রমেই জ্যোতিবাবু তখন "ভারত সঙ্গীত সমাজ" হইতে "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামে সঙ্গীত বিষয়ক

একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুর ইহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। কাগজখানি দশ বৎসর চলিয়াছিল তারপর মহারাজা বাহাদুরের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজার সাহায্যে কিছুদিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থসাহায্য রহিত করায় কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

জ্যোতিবাবু "সঙ্গীত সমাজের" সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই সংস্কৃত নাটক গুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বলিলেন, "একদিন জ্যেঠ বৌ-ঠাকুরাণী আমাকে "শকুন্তলা পড়িতে



কুমার মন্মথনাথ মিত্র

বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একখানিও পড়ি নাই। "শকুন্তলা" পড়িয়া আমি বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম—এ জিনিস এখনও কেন বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হয় নাই। দুই এক জনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন না। তাই আমি নিজেই শেষে আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

১৩০৬ হইতে ১৩১১ সালের মধ্যেই যথাক্রমে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" (১৩০৬), "উত্তর-চরিত" "মুদ্রারাক্ষস" "রত্নাবলী" "মালতী মাধব" (১৩০৭), "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" "বেণী সংহার" "মহাবীর চরিত" "মালবিকাগ্নিমিত্র" "বিক্রমোর্ব্বশী" "চণ্ড কৌশিক" (১৩০৮) "নাগানন্দ" (১৩০৯) "বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা" "ধনঞ্জয় বিজয়" (১৩১০) "কর্পূর মঞ্জরী" ও "মৃচ্ছকটিক" (১৩১১) অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন সভ্যতার উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব

কশ্যপ ঋষি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি যে পৃথিবীর প্রথম যুগের ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন—তিনি যে 'প্রজাপতি' বলিয়া পরিগণিত এবং পৃথিবী যে তাঁহারই নামে 'কাশ্যপী' বলিয়া অভিহিত হয় তাহাতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে কশ্যপঋষিকে দেব-দানব-নাগ প্রভৃতির পিতারূপে বর্ণিত দেখা যায়। ইহাতেই পৃথিবীর উপর তাঁহার প্রভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কশ্যপ-ঋষির পূর্ব্বোক্ত দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি সন্তান যে একই পত্নীর গর্ভজাত ছিল তাহা নহে। কথিত আছে তিনি দক্ষ প্রজাপতির সপ্তদশ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন কন্যারই গর্ভজাত। অদিতি হইতে আদিতেয় বা দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, দিতি হইতে দৈত্য ও দনু হইতে দানবগণের জন্ম হয়—কদ্রু হইতে সর্পগণের ও বিনতা হইতে গরুড় বা পক্ষিরাজের উৎপত্তি হয়।

কশ্যপের ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের উদ্ভব-আখ্যান হইতে ঐতিহাসিক অতি মূল্যবান সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। কশ্যপের পত্নী ও পুত্রদিগকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে আদিতেয় বা দেবতাদিগকে আর্য্যজাতি এবং দৈত্য-দানব-নাগ পক্ষী প্রভৃতিকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাদিগের মাতাদিগকেও আর্য্যজাতীয়া ও আর্য্যেতর জাতীয়া বলিয়া বুঝিতে হয়। সুতরাং ইহা হইতে কশ্যপ ঋষিই অনার্য্য সম্বন্ধের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন—তাহাই আমরা অনুমান করিতে পারি। শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের যে বিধান দৃষ্ট হয় তাহাতে এরূপ

অনার্য্য সম্বন্ধ যে সম্ভবপর ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়।

পুরাণের বর্ণনা পাঠ করিলে দৈত্য-দানব-নাগ প্রভৃতি জাতিকে যেমনই সমৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়—তেমনই সভ্যতালোক প্রাপ্তও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই ইহারা দেবতাদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কশ্যপ ঋষি ইহাদিগের পিতা হওয়াতেই আর্য্য-সভ্যতার সংস্রব ইহাদিগকে নূতন উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়া যে ইহাদিগকে আর্য্য-দিগের সমকক্ষ করিয়াছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। পুরাতত্ত্বের প্রমাণে পশ্চিম আসিয়ায় কেল্ডিয়, বেবিলনীয়, মিডীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতি সকলই দৈত্য-দানবরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। তাঁহাদিগের সভ্যতা এরূপই উচ্চসীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহাদের অধিষ্ঠিত আসিয়াভূভাগ আসিয়া মাইনর অর্থাৎ অপ্রধান আসিয়া নামে স্বতন্ত্র আসিয়া নামের গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। উল্লিখিত সুসভ্য প্রাচীন আর্য্যেতর জাতির পিতা বলিয়াই যে কেবল তাঁহাদের উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব প্রমাণিত হয় তাহা নহে কিন্তু আসিয়া মাইনরের প্রধান স্থানে যে তদীয় নামের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে তদীয় প্রভাব তদপেক্ষাও অধিক প্রখ্যাপিত হয়।

ককেসাস্ আসিয়া মাইনরের একটী প্রধান পর্ব্বত ও কাস্পিয়ান একটী প্রধান হ্রদ। এই উভয় নামই কশ্যপ ঋষির নামের সহিত সংযুক্ত। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের অনুসন্ধানের দ্বারাই এই নিদর্শনের আবিষ্কার হইয়াছে। 'কাস্পীয়ান' নামটী কাশ্যপ নামেরই যে অপভ্রংশ তাহা সহজেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 'কাস্পীয়ান' নামের আদিরূপ "কাশ্যপীয়" ছিল। ইহার 'য' লোপ হইয়াই কাস্পীয় বা কাস্পীয় এইরূপ রূপান্তর হইয়াছে। তৎপর কাস্পীয় হইতেই পাশ্চাত্যদিগের দ্বারা কাস্পীয়ান্ নাম হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিৎ—হিউইট্ (Hewitt) তদীয় "The Ruling Race of Prehistroric Times" প্রাগৈতিহাসিক সময়ের রাজবংশ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—Kashyapa * * * whose name survives in that of the Caspian sea," Vol I p 507 "কাস্পীয়ান সাগরের নামে কাশ্যপের নাম জীবিত রহিয়াছে।

'ককেসাস্' নামের মধ্যে কেহ কেহ কাশ (Kas) শব্দেরই অন্তর্ভাব দেখিতে পান। কাশ্মীর নামের পুরাতত্ত্ব ব্যাখ্যা স্থলে ভারতকল্পদ্রুম (Cyclopaedia of India) নামক গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে—"Kasmir is not the Country of the Kas but the Kasia-montes (mer) of Ptolemy the Kha (mer) Kas or Caucasus. ইহা হইতে ককেসাস্ নামটী যে 'খাকাশ' নামেরই অপভ্রংশ এবং 'খাকাশ যে কাশদিগের পর্ব্বত (খা) অর্থ প্রকাশ করে তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'কাশ'শব্দ আবার 'কাশ্যপ' শব্দেরই অপভ্রংশ। 'কাশ্যপ' কশ্যপের বংশধরদিগকেই বুঝায়, 'কাশও' সুতরাং কশ্যপ বংশীয়দিগকেই বুঝায়। এতৎ সম্বন্ধে টডের রাজস্থানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"But Kash, Khash, or Kas, a frequently recurring prefix in India, is supposed by Mr. Campbell to have its origin from Rishi Kashyapa who gave his name to Kashmir, Kashgar, and to the people originally called Kasha or Kasia.—Campbell, p 58, Tod's Rajasthan i p 303.

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে 'কাশ্মীর' ও 'কাশগড়' নামক স্থানদ্বয়ও যে 'কাশ্যপ' নামেরই সহিত সংযোগের প্রমাণ দিতেছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কাশগড় মধ্য-আসিয়ার অন্তর্গত স্থান—'কাশ্মীর' ভারতের উত্তর সীমান্তবর্ত্তী স্থান। এই প্রকারে আসিয়ার পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ তিন অংশেই কাশ্যপ নামের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে কাশ্মীর নামে কাশ্যপ নামের নিদর্শন অপেক্ষা অন্য একটী নামে কাশ্যপ নামের নিদর্শন সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত দেখা যায়। মুলতানের প্রাচীন নামে সেই নিদর্শন পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ পায়। "ভারতকল্পদ্রুম" (Cyclopaedia of India) নামক গ্রন্থে মুলতানের প্রাচীন নাম 'কাশ্যপপুর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা কশ্যপ ঋষির দ্বারা হয় বলিয়াই কিম্বদন্তী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যথা—

(Kashyapapura—the modern Multan. According to the traditions of the people, Kashyapapura, the Kasherira of Ptolemy, was by founded Kashyapa who was the father of the twelve Adityas or sun-gods by Aditi and of the Daityas or Titans by Diti." 519

এখানে গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমির লেখা হইতেও আমরা কাশ্যপপুরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতেছি। টলেমির লেখায় কাশ্যপপুর যে রূপান্তরিত হইয়া 'কাস্পিরির হইয়াছে—তাহা হইতেই 'কাশ্যপীয়, যে কি প্রকারে 'কাস্পিয়ান্' রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার যথেষ্ট আভাসই আমরা পাইতে পারি।

মূলতান নামটীও 'মূলস্থান' নামেরই অপভ্রংশ। ইহা হইতে এই স্থানই যে ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের প্রথম অধিষ্ঠান তাহাই বুঝিতে পারা যায়। কাশ্যপঋষি প্রথম এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়াই ইহার আদিনাম 'কাশ্যপপুর' হয় ইহাই কশ্যপপুর নামের প্রকৃত পুরাতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকারে ভারতবর্ষের কশ্যপপুর (মূলতান) হইতে সুদূর আসিয়া মাইনরের কাস্পিয়ান্ ও ককেসাসে পর্য্যন্ত কশ্যপ নামের নিদর্শন ব্যাপ্ত। এবং ইহা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা, মধ্য-আসিয়ার সভ্যতা ও পশ্চিম-আসিয়ার সভ্যতা যে কশ্যপ ঋষির প্রভাব দ্বারাই অনুপ্রাণিত—তাহাও প্রমাণিত করিয়া কশ্যপ ঋষির নামে পৃথিবী কেন যে 'কশ্যপী' নামে আখ্যাতা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কনগ্রেস

জাতীয় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন এবার মান্দ্রাজ সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহাসমিতির সভাপতি ছিলেন কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু; এ পর্য্যন্ত বাঙলা হইতে ৭জন সভাপতি নিয়োজিত হইলেন;—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ও

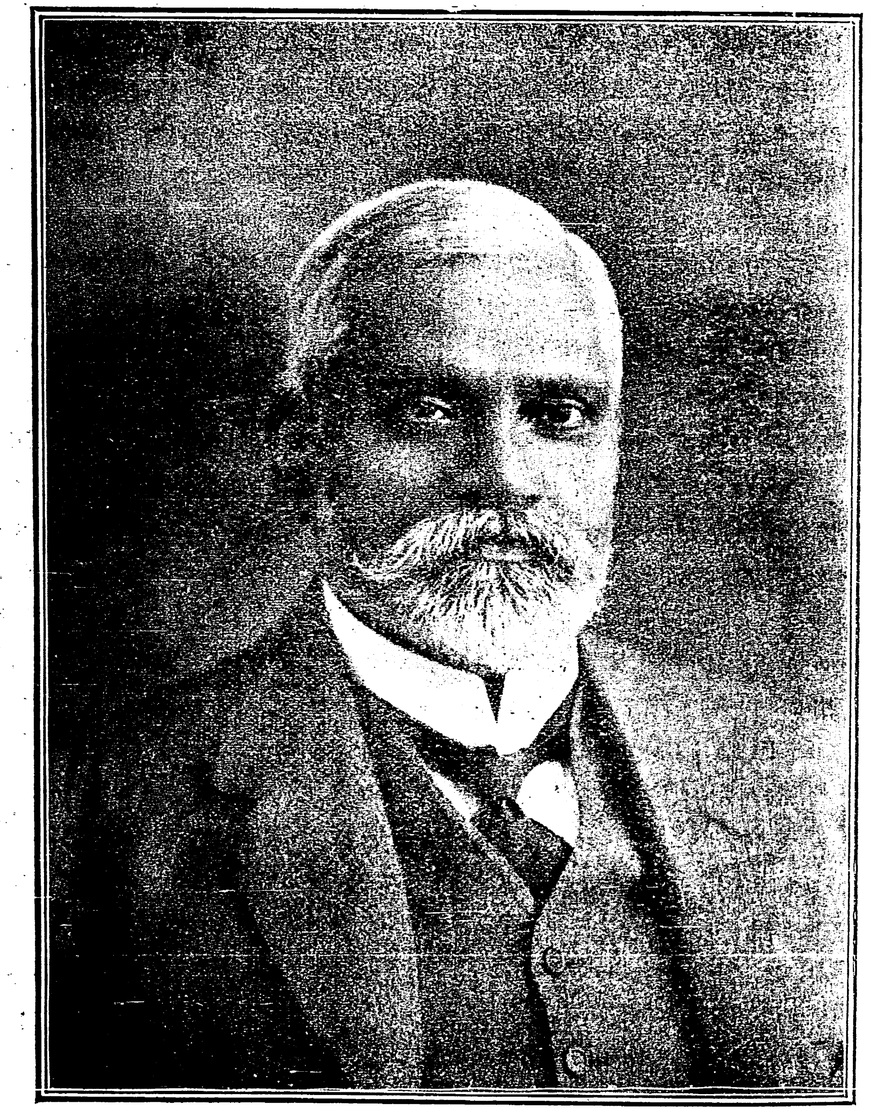

শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু; আমাদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

এবারকার কনগ্রেসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্ণর লর্ড পেন্টল্যাণ্ড কনগ্রেসের অধিবেশনকালে সভামণ্ডপে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—এতদিন পরে কনগ্রেস গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—কয়েক বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের মত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কনগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন সময়ে কনগ্রেসের পরিচালকগণ সেই সময়ের ছোট লাটকে মাত্র খানা টিকিট পাঠাইয়া দিয়া কনগ্রেসে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর আসিল যে, রাজনৈতিক মহাসমিতিতে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের যাওয়া নিষেধ। এই বলিয়া টিকিটগুলি ফেরৎ পাঠান হইল। একজন বড় লাট কনগ্রেসকে "microscopic minority" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সে সব দিনের অবসান হইয়াছে। এখন গভর্ণমেণ্ট ও কনগ্রেসের মধ্যে একটা বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা অবস্থানকালে লর্ড হার্ডিং কনগ্রেসপ্রতিনিধিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন বিলাতে লর্ড ক্রু India council Bill সম্বন্ধে কনগ্রেসের মত জানিবার জন্য প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

সুযোগ্য সভাপতি তাঁহার অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য সুন্দররূপেই প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন আমরা এখন স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ইতালি ও জাপানের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সেই সময়ের ইতালি অথবা জাপান হইতে অনেক ভাল—অথচ সেই সময়েই (১৮৬০) এই দুই জাতি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকে। ধর্ম্মবিচ্ছেদ, রাজাপ্রজায় মনোমালিন্য, স্থানে নগরে ও প্রদেশে প্রদেশে বিবাদ সেই সময়কার ইতালির প্রধান ব্যাপার ছিল; অথচ তাহার মধ্যেই অত বড় জাতির সৃষ্টি হইল। বক্তা মহাশয় বলেন আমরা যদি কানাডা কিম্বা দক্ষিণ-আফ্রিকার মত শাসনপ্রণালী প্রাপ্ত হই তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বন্ধনটী আরও সুদৃঢ় হইবে।

অস্ত্র-আইন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যও সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—লর্ড হার্ডিং ইচ্ছা করিলেই এ আইন উঠিয়া যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে তাঁহার একটি অমরকীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে।

কনগ্রেসের আনুষঙ্গিক সামাজিক সমিতি, একেশ্বরবাদীর সভা, প্রভৃতির অধিবেশনও সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীসু

শিল্প সমিতি

২৬শে ডিসেম্বর শিল্প সমিতির দশম অধিবেশন হইয়াছিল। এই শিল্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন রাজবাহাদুর মধোলকার। এবারকার বৈঠকে মাননীয় মনোমোহন দাস রামজী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় ভারতের শিল্পযুগের বর্ত্তমান অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পাবলী রামজী মহাশয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—প্রথম স্বদেশীর উত্থান এবং বিকাশ; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য এবং শিল্পের উপরে যুদ্ধের প্রভাব; তৃতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা। এক সময়ে ভারতবর্ষ কৃষি ও শিল্প এই উভয়প্রধান দেশ ছিল এবং ভারতের সকল প্রকার অভাব ভারতবর্ষ হইতেই পূর্ণ হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে রপ্তানীর প্রভাবে দেশজাত দ্রব্য হইতে আর আমাদের অভাব পূরণ হয় না। অধিকন্তু আমাদের দেশ হইতে মূল উপাদান রপ্তানী হইয়া অন্যভাবে উহা পুনর্ব্বার আমদানী হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে গতবৎসর আমাদের দেশ হইতে ৩২ লক্ষ টাকার তামাক রপ্তানী হয় এবং ঐ তামাকই চুরুট রূপে যখন আমাদের দেশে আমদানী হয় তখন উহার মূল্য দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৬ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী হয় এবং সেই চামড়াই চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্যরূপে যখন আমাদের দেশে আইসে তখন

উহার মূল্য হয় ৫৫ লক্ষ টাকা। সভাপতি মহাশয় বলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যাহাতে উপরোক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। এতদুদ্দেশ্যেই কতকগুলি কলকারখানা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি তেমন কার্য্যকারী হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে এ বিষয়ে আমাদের দেশবাসী এখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই। মিঃ রামজীর বক্তৃতাটী সাতিশয় জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল।

শ্রীযো

বর্ত্তমান অর্থসমস্যা

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে ভীষণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? বিদেশে স্বদেশী জিনিষের রপ্তানী বন্ধই ইহার প্রধান কারণ। আমাদের দেশ হইতে ইউরোপের সকল দেশে এবং আমেরিকায় নানারূপ জিনিস যায়। সেই সমস্ত মূল দ্রব্য (Raw Material) লইয়া নানা প্রকার জিনিস প্রস্তুত হইয়া আবার আমাদের দেশে আসে, আমরা তখন টাকা দিয়া সেগুলি কিনিয়া রাখি।

বাংলা দেশের প্রধান রপ্তানীর জিনিস হইল পাট; এবার পাটের বাজার বন্ধ সুতরাং টাকার বাজারও মন্দ। অনেক চাষা পাট বিক্রি করিয়া ধান, কাপড়-চোপড়, তেলনুন প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিস এবং অনেক প্রকার অনাবশ্যকীয় বিলাতী বিলাসদ্রব্যও কেনে এবং জমির খাজনা দেয়। কৃষকের অর্থে যাহারা ধনী তাহাদেরও বিলাসবাসনার চরিতার্থতা হয় ঐ উপায়ে—অর্থাৎ পাটের টাকায়।

এবার পাট ভালরূপ বিক্রি হয় নাই সেইজন্য সকল অবস্থার লোকের বিলাস ব্যয় কমিয়া আসিয়াছে। অন্নবস্ত্রের খরচকে মানুষ সংক্ষেপ করিতে পারে না; টাকায় যখন টান পড়ে তখন সৌখিনতাকেই খর্ব্ব করিতে হয়। ইহা অর্থশাস্ত্রের নিয়ম। এবার ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। অর্থাভাবে এবার চাষা জার্ম্মেনীর প্রস্তুত সস্তা জিনিসে বাবুগিরি করিতে পারে নাই;—প্রজা খাজনা দেয় নাই বলিয়া এবার মধ্যবিত্ত অবস্থার ভূস্বামীগণ যথাসম্ভব ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াছেন; জমিদার-দিগেরও এবার বিশেষ আড়ম্বর করা সম্ভবপর হয় নাই। এক পাট এত মুখ বন্ধ করিয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় কি? বুঝা যায় এই যে আমরা যে টাকার উপরে ভর করিয়া বাবুগিরি করিয়া বেড়াইতেছি তাহা আসে বিলাত হইতে। বিলাতী বণিক টাকা দিয়া আমাদের জিনিস কিনিয়া নেয়, সেই টাকা দিয়া আমরা বিলাসিতা করি। গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কোনও টাকা দেন না; যাহা কিছু দেন তাহার অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীগণের বেতনরূপে দেন; আরও কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহা সৈনিকবিভাগের জন্য। সৈন্যদের জন্য যে সমস্ত জিনিস ক্রয় করা হয় সেজন্য দেশের লোক গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু টাকা পায়।

এই টাকা যে দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় তাহা আমরা আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। বর্ত্তমানের এই অর্থসমস্যার মীমাংসা কি? যুদ্ধ থামিয়া গেলেই অর্থ কষ্ট ঘুচিবে, আপাতত ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে বটে কিন্তু আসল সমস্যার মীমাংসা হইল কই?

সমস্যার মীমাংসা ওখানে নয়। যুদ্ধ না থামিলেও দেশের অর্থকষ্ট ঘুচিতে পারে। আর যুদ্ধ থামিলেই অর্থকষ্ট দূর হইবে এমন কথা কে বলিল? যুদ্ধের পূর্ব্বে কি আমাদের দেশে অর্থাভাব ছিল না? যুদ্ধের পূর্ব্বে কি আমাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল? তাহা ত নয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেওত আমরা গরীব ছিলাম; এ দারিদ্র্যের কারণ কি? দারিদ্র্যের কারণ বুঝিতে হইলে বিদেশের সহিত আমাদের সম্পর্কটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

বিদেশ হইতে কি সত্য সত্যই আমরা টাকা পাই? আর সেই টাকাতে কি বাস্তবিকই আমাদের লাভ হয়? বিদেশী বণিক আমাদের নিকট হইতে অল্প মূল্যে Raw material কিনিয়া তাহাদ্বারা নানাপ্রকার জিনিস প্রস্তুত করে, সেই জিনিস জাহাজ বোঝাই করিয়া আবার আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেয়, আমরা তাহা বেশি মূল্যে কিনিয়া রাখি। সুতরাং বিষয়টি দাঁড়াইতেছে এই যে আমরা ত বিদেশীকে

জিনিস দিইই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে টাকাও দিই;—আমাদের দেশের সকল প্রকার মূলদ্রব্য পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতগুলি টাকাও পাঠাইয়া দেই। এই ভাবে আমাদের দেশ হইতে কেবলই অর্থ চলিয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া অনেক জিনিস আছে যাহা বিলাতী মালমশলায় বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আসে—সেই সমস্ত জিনিসে আমাদের দেশের মালমসলা কিছুই নাই, তাহার জন্য আমরা কিছুই পাই না বরঞ্চ সেই সব জিনিস খরিদ করিয়া আমরা বিদেশীকে অর্থ দিয়া থাকি।

বিদেশীর সহিত অর্থের আদানপ্রদানেও আমাদের ক্ষতি আছে। বিদেশী আমাদের ঋণ শোধ করে রূপার টাকা দিয়া, আমরা বিদেশীর প্রাপ্য দেই সোণার মোহরে। আমাদের দেশে যে টাকা প্রচলিত তাহার যথার্থ মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র সুতরাং প্রতি টাকায় আমাদের ।৶০ আনা করিয়া ক্ষতি। যে ব্যক্তি আমার নিকট ৩০৲ টাকা পাইবে তাহাকে এদেশে আমি আমাদের টাকার ত্রিশটি টাকা দিয়া ঋণ শোধ করিতে পারি। ত্রিশ টাকার যথার্থ মূল্য ১৮৲ আনা। কিন্তু এই লোক যদি বিলাতে থাকে তবে তাহাকে আমার গিনি দিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে, সেখানে ত্রিশ টাকার স্থলে তাহাকে পুরোপুরি ত্রিশ টাকার আসল মূল্য দিতে হয়।

এই ভাবে বিদেশীকে কত রকমে যে আমরা কত টাকা দিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। যে-দেশ এত রকমে শোষিত হইতেছে সে-দেশ দরিদ্র হইবে না ত কি? দেশের দারিদ্র্যের আর এক কারণ বিদেশে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি। আমাদের দেশের খাদ্য দ্রব্য অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহার ফলে আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়, অনেক সময় খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটে ও দুর্ভিক্ষ হয়।

পাট বিক্রি বন্ধ হওয়ায় আজ যে আমাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ এখনকার এ ভাবের অর্থাভাব চিরদিন থাকিবে না, বরঞ্চ যুদ্ধ যত দিন স্থায়ী হইবে ততদিন বিদেশের সহিত আমাদের সকল আদান প্রদান বন্ধ থাকিবে বলিয়া বাধ্য হইয়া নিজের অভাব দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে; যদি তাহা সত্যই ঘটিয়া উঠে তাহা হইলে এই যুদ্ধের ফলে আমাদের পরম লাভ।

আগামী বৎসর চাষাগণ আর পাট বুনিবে না সুতরাং ধানের চাষ বেশি হইবে। ফলে দেশে খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তা হইবে। টাকার যেমন অভাব হইবে খাদ্যদ্রব্যও তেমনি সস্তা হইবে। সুতরাং আমাদিগের কষ্টের মাত্রা আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। এইভাবে দেশের প্রধান অভাব যাহা তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া আসিবে।

সহসা অর্থাভাবজনিত আমাদের যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা যখন থাকিবে না,—যখন আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিব তখন অন্যান্য দিকেও আমাদের দৃষ্টি পড়িবে; বিদেশ হইতে আমাদের জন্য যে-সমস্ত জিনিস আসে তাহা যখন আসিবে না তখন আমরা সে-সমস্ত জিনিসের দরুণ দারুণ অভাব বোধ করিব। এবং সেই অভাব জাগিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টাও যদি জাগাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ঘটিবে এবং তাহারই ফলে আমাদের অর্থ কষ্ট দূর হইবার পথ পরিষ্কার হইবে।

আমাদের দেশীয় শিল্পগুলি যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না তাহার প্রধান কারণ বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা। সকল দেশেই অপরিণত শিশু-শিল্প বিদেশের বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। এজন্য সংরক্ষণ নীতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। জার্ম্মাণি এই নীতি অবলম্বন করিয়া এত বড় হইয়াছে; জাপান এই নীতি অবলম্বন করিয়া এত বড় হইয়াছে; ইংলণ্ড এই নীতিকে আশ্রয় করিয়া এত বড় হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আর একটা সুবিধা ছিল। সমগ্র ইউরোপ যখন নেপোলিয়ানিক সমরে ব্যাপৃত ছিল তখন তাহাদের শিল্প বাণিজ্য সবই বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল না কেবল ইংলণ্ডের; ইংলণ্ড তখন আপন মনে

শিল্পের উন্নতি বিধান করিতেছিল। ইউরোপের সকল অভাবের জিনিস ইংলণ্ড একা জোগাইত।

আজ আমাদের সেইরূপ সুযোগ উপস্থিত। আমাদের দেশে সংরক্ষণ নীতি নাই, সেজন্য বিদেশী শিল্পের সহিত দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ কার্য্যতঃ সংরক্ষণ-নীতির সকল সুবিধা আমাদের দেশে আনিয়া দিয়াছে। ইহার আড়ালে থাকিয়া আমরা যদি এখন কিছু করিতে না পারি তবে আর কখন পারিব?—সমগ্র পৃথিবী এখন যুদ্ধে ব্যাপৃত, আমরাও যুদ্ধের খবরের জন্য ব্যস্ত। আমাদের এই ব্যস্ততার কোনো সার্থকতা নাই; যুদ্ধের ফলাফল আমাদিগকে মুখ্য ভাবে স্পর্শ করিবে না।—যাহা আমাদিগকে মুখ্য ভাবে স্পর্শ করে বর্ত্তমানে সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত।—শিল্প বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দিবার সুযোগ এবং অবসর আসিয়াছে; বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান পন্থা। আমাদের আপাতপ্রতীয়মান অর্থকষ্ট দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া আমাদের চিরকালের অর্থ কষ্ট যাহাতে সমূলে তিরোহিত হয় সেই চেষ্টা করা দরকার; দারিদ্র্যনাশের অন্য কোনো উপায় নাই।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ।

সমালোচনা

অরণ্যবাস। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি 'উপন্যাস' নামে গত বৎসরের 'প্রবাসী' পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্তকে যদি উপন্যাস বলা যায়, তাহা হইলে "অরণ্যবাস উপন্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।" উপন্যাস হিসাবে দেখিতে গেলে "অরণ্যবাসে" অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইবে। উপন্যাসের আর্ট ইহাতে নাই বলিলেও চলে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কোন চরিত্র ইহাতে তেমন ফুটিয়া উঠে নাই—রসেরও একান্ত অভাব। তবে কাহিনী হিসাবে "অরণ্যবাসকে" সুখপাঠ্য বলিতে পারি। জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত বাঙ্গালীকে সুপথ দেখাইতে, তাহার ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত মনকে সান্ত্বনায় পুনর্জীবিত করিয়া কর্ত্তব্যে সচেষ্ট করাইবার পক্ষে 'অরণ্যবাস' বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রী হইয়াছে। ইহাতে রোমান্সের ঘটা নাই, প্রেমের উদ্ভট উদ্‌গার নাই—শান্ত সরল বাঙ্গালী জীবনের একটি অনাড়ম্বর কাহিনী লেখক বেশ গুছাইয়া বলিয়া গিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে বর্ণনা অতি-শয্যের ভারে মনকে পীড়িত করিয়া তুলে; সে সময় উপন্যাস হিসাবে ধরিতে গেলে, বহি ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্তু লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ধরিয়া লইলে তাহাতে অনেক কাজেরও কথার সন্ধান, অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানি ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য—পাঠে উপকার হইবে। তবে এইটুকু আমরা সতর্ক করিয়া দিই, উপন্যাসের রস-আস্বাদের যিনি প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। লেখক 'ভূমিকায়' সে বিষয়ে ইঙ্গিতও করিয়াছেন। এ ধরণের কাহিনীর বঙ্গদেশে যথেষ্টই প্রয়োজন আছে; সুতরাং লেখকের এ উদ্যমের আমরা বিশেষ প্রশংসা করি। বহিখানির ছাপা কাগজ ভালই হইয়াছে।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



কালীপ্রসাদ হোম করিতেছে

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত নবকাহিনী (প্রতিশোধ

THE HOMA RITE
BY
L. P. GANGULY

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২১ [১১শ সংখ্যা

আধুনিক ভারত

ইংরাজের ভারত-বিজয়ে ভারতের রূপান্তরসাধন

ইংরাজের ভারত-বিজয়ে ভারতের যে রূপান্তর সাধিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস তিন যুগে বিভক্ত ঃ—য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিস্তার, য়ুরোপীয় সভ্যতা ; হিন্দুসভ্যতার সংঘর্ষ, হিন্দুসভ্যতার পরাজয় ; এবং ঐ দুই সভ্যতার সবিলম্ব অথচ অবিরাম সংমিশ্রণ।

প্রথম যুগ

ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

এই ইতিহাসের প্রথম যুগ আবার তিনটি কাল-বিভাগে বিভক্ত।

১

প্রথম কালবিভাগ ঃ—ভারতে ইংরাজের কুঠী স্থাপন। প্রথম কাল-বিভাগের এই ইতিহাস ঃ—

স্বদেশকে কি করিয়া বড় করা যায় তাহার আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মূলসূত্র সম্বন্ধে ইংরাজেরা তখনও অনভিজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং তাঁহারা কোন সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহারা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলেন, এবং সেখানে কি করা কর্ত্তব্য তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবাসীগণ, অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের সহিত এই ইংরাজ বণিকদিগের কোন পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। এবং মোগলসম্রাটের প্রবল কেন্দ্রীভূত শাসন বিদ্যমানে, এই বৈদেশিকদিগকে উহারা বিনীত রাজসেবক বলিয়াই মনে করিল, শত্রু বলিয়া মনে করিল না।

*
* *

দুই Roseর যুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের সংগ্রামে ইংলণ্ড লোক-বিরল, দুর্ব্বল, ও নির্ধন হইয়া পড়িয়া, বিলম্বে উপনিবেশ-বিস্তারের কার্য্যে অগ্রসর হইল। পোর্টুগাল উত্তমাশা অন্তরীপের পথটা আপনার জন্য রাখিয়াছিল ; সুতরাং এসিয়ায় প্রবেশ করিবার জন্য ইংরাজনাবিকদিগকে মাগেলান খাড়ী পার

হইতে হইত। মহাসমুদ্র অথবা বেরিং খাড়ী দিয়া রাস্তা খুঁজিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারাইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা পোর্টুগী-উপনিবেশগুলি দখল করিয়া বসিল; তাহাদের খুব কড়া ও সতর্ক পাহারা ছিল। যাহারা প্রথমে ধনশালী হইয়াছিল, সহরের সেই বণিকেরা হলণ্ড দেশে প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য—বিশেষত সর্ব্বজনবাঞ্ছিত গরম-মশলাদি ক্রয় করিত। একচেটিয়া বাণিজ্যের বলে, ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রায়ই মূল্যের হার বৃদ্ধি করিত। যখন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা তিন শিলিংএর স্থলে গোলমরিচের মূল্য ১০ শিলিং চাহিল, নগরের ইংরাজ বণিকেরা তাহাতে সম্মত হইল না। কতকটা বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও, সমস্ত ঝুঁকি স্বীকার করিয়া লইয়াও তাহারা ভারত ও সৌণ্ড-দ্বীপপুঞ্জে কতকগুলি জাহাজ পাঠাইল। ইহাই ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল।

স্বকীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অপসারিত করিবার জন্য ওলন্দাজেরা কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে উহারা মলক্কা দ্বীপে, আম্বয়নার দুর্গরক্ষী ইংরাজ সৈন্যদিগকে হত্যা করিল। দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিদূরিত ইংরাজেরা ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তাহাদের কুঠী সকল তিন স্থানে সংস্থাপিত হইল। মালাবার উপকূলের কুঠীগুলি পরিপুষ্ট হইয়া বোম্বাই বিভাগ (Presidency) গড়িয়া তুলিল। করমণ্ডল উপকূলের কুঠীগুলি মাদ্রজ-বিভাগ গড়িয়া তুলিল। হুগলী প্রতিষ্ঠিত কুঠীগুলি, বঙ্গ-বিভাগ গড়িয়া তুলিল। ঐ সকল ইংরাজ-বণিক রাষ্ট্রবিপ্লব-কালের অন্তঃসার বিশিষ্ট মহৎবংশের লোক;—যাহারা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে সেই সব ধর্ম্মপরায়ণ, সচ্চরিত্র বিদেশ-যাত্রীর দল। মোগল সম্রাট তাহাদের গুণমর্য্যাদা বুঝিলেন, কিন্তু ঔরংজেবের রাজত্বকালে, তাহাদের দ্বারা কোন প্রদেশ জয় কিংবা কোন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করা—এ দুয়ের কোনটারই সম্ভাবনা ছিল না।

১৬৬০ ইংলণ্ডে রাজ্যচ্যুত রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পিউরিটান-সম্প্রদায়ের তাপসিক কঠোরতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল;—সর্ব্বত্রই লাম্পট্য, চরিত্রকলুষতা, এমন কি "খুন-খারাপি"র আবির্ভাব হইল।

ইংলণ্ডে ইংরাজদিগের এইরূপ দুষ্ট রীতি নীতি,—ভারতেও ইংরাজদিগের এইরূপ দুষ্ট রীতিনীতি দৃষ্ট হইত। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও গর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের (mysticisme) গুহ্যধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল; এবং ইহা হইতেই তাহাদের তথ্যদর্শী কাজের ভাব উৎপন্ন হয়। সেই সময়েই এই সব আধুনিক বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল; পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিস্ফুট হইল। ইংরাজ তাহার নিজের প্রকৃত কাজটি বুঝিল; সে কাজ বাণিজ্যঅনুসরণ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা।

কিন্তু সেই পুরাতন ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ইংলণ্ডের এই শিথিল রীতিনীতি ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল না। উন্নতির প্রতি অনুরাগ তাহাদের খুবই

কম ছিল। তাহারা একচেটিয়া ব্যবসায়টি খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহার অন্তরঙ্গ সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি করিতে অস্বীকৃত হইল। কোম্পানির এই প্রতিরোধিতা ভাঙ্গিবার জন্য, ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গ স্থির করিলেন যে, এই কোম্পানীর চার্টার-নির্দ্দিষ্ট মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হইলে, অন্য এক কোম্পানী রাজদত্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ইংলণ্ডে ও ভারতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ পরস্পরের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল; অবশেষে এই দুই সমাজ একত্র মিশিয়া গেল। এই সময় হইতেই ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল (১৭০৮)। সেই সময়ে ঔরংজেবের মৃত্যুতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইল। বদমাইসী, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, চারিদিকে দেখা দিল; উৎকৃষ্ট প্রদেশগুলি, স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল; সমস্ত রাজকর্ম্মচারী প্রজা-পীড়ন করিতে লাগিল; এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিত, তাহার নিকটেই তাহারা আত্মবিক্রয় করিত। ইংরাজ-রীতিনীতির দ্বারা কলুষিত ইংরাজ বণিকেরা পরে ভারতীয় রীতিনীতির দ্বারা আরও কলুষিত হইল। তখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ভারতের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু ভারত, ভারতেপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজদিগের উপর, এমন কি ইংলণ্ডেরও উপর একটা দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কেননা, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর মধ্যে যখন দারুণ বিবাদ চলিতেছিল তখন তাহারা উভয়েই নির্ব্বাচক-দিগকে ক্রয় করিতেছিল, প্রতিনিধিদিগকে ক্রয় করিতেছিল এবং এইরূপে অনেক পরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক রীতিনীতির অবনতি ঘটাইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছিল।

দ্বিতীয় যুগ

২

প্রথম যুগে আমরা দেখিতে পাইলাম, ইংরাজেরা (তখনও দুর্ব্বল) কতকগুলি কুঠী দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে দেখিতে পাই, ভারতে অরাজকতা উপস্থিত এবং ইংরাজেরা নিজ শক্তি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ভারতে প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

*
* *

শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের পরিপুষ্টি, য়ুরোপীয় উপনিবেশগুলির ক্রমোন্নতি—ইংরাজের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র কি, তাহা ইংরাজদিগকে দেখাইয়া দিল। ফরাসী ও ওলন্দাজ নাবিকদিগের উপর জয়লাভ করিয়া, তাহারা সমস্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বপ্রথমে তাহারা ভারত লইয়াই ব্যাপৃত ছিল। যেদেশে কতকগুলা ভাগ্যান্বেষী রাজ্যস্থাপন করিতে পারিত, সেখানে কোন এক য়ুরোপীয় প্রবল রাজশক্তি কেননা বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বণিক সম্প্রদায় মাত্র, তাহারা অংশীদারের প্রাপ্য ডিভিডেণ্ট লইয়াই ব্যাপৃত।

কি উপায়ে একটা ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করা যাইতে পারে, তাহা কেবল দুপ্লে নামক একজন ফরাসী বুঝিয়াছিলেন। ভারতবাসীদের লইয়াই সৈন্যগড়িয়া তোলা; ভারতীয় রাজাদিগকে সামন্তশ্রেণী বা মিত্র-

শ্রেণীভুক্ত করা; রাজ্যবিস্তার না করিয়া য়ুরোপীয় কোম্পানীর প্রভাব বিস্তার করা —ইহাই তাঁহার মৎলব ছিল। ফ্রান্সের ঔদাস্য-বশতঃ ডুপ্লে তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ক্লাইভ তাঁহার মৎলবগুলি গ্রহণ করিয়া তাহা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া ক্লাইভ বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পলাসীক্ষেত্রে (১৫৭) ৩২০০ ইংরেজ ও সেপাই সৈন্য লইয়া বঙ্গনবাবের ৫০,০০০ হাজার লোককে পরাভূত করিলেন। কোম্পানী বঙ্গদেশের প্রভু হইয়া দাঁড়াইল।

এই আকস্মিক ভাগ্যোদয়ে বনিকদিগেরে মাথা ঘুরিয়া গেল; যাহারা গরম-মশলাদি কিনিবার জন্য আসিয়াছিল, হঠাৎ তাহাদের হাতে একটা সাম্রাজ্যের কাজ আসিয়া পড়িল। কেবল একমাত্র ক্লাইবই কোম্পানীর প্রতিনিধিদিগকে বাগাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন—তাহাকেই তাহারা মানিত; আর কাহাকেও তাহারা গ্রাহ্য করিত না।

মেকেলে কি লিখিয়াছেন, দেখ :—

"ক্লাইভ চলিয়া যাইবার পর, পাঁচ বৎসর কাল ইংরাজদিগের কুশাসনের মাত্রা এতটা বাড়িয়াছিল, যে তাহাতে সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া ভার।.....

বঙ্গদেশ, ইংরাজের নীতির কথা জানিবার পূর্ব্বেই তাহার বাহুবলের কথা জানিয়াছিল। যে সময়ে বাঙ্গালীরা আমাদের প্রজা হইল এবং তাহার পর যখন আমরা বুঝিলাম তাহাদের প্রতি আমাদের কতকগুলি রাজোচিত কর্ত্তব্য আছে—এই দুইয়ের মধ্যে একটা কালের ব্যবধান ছিল। এই কাল-ব্যবধানের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব যাহাতে ২০-৩০ কোটী টাকা আত্মসাৎ করিতে পারা যায় তাহাই কোম্পানীর প্রতিনিধিদিগের একমাত্র চিন্তা হইল।..... পূর্ব্বে রোমক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা, মার্ব্বেলের প্রাসাদ ও "কাম্পানি"তে উদ্যান-ভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য, অভ্র-পাত্রে সুরাপান করিবার জন্য, গ্লাডিয়াটোর-সৈন্য প্রদর্শন করিবার জন্য, প্রত্যেক প্রদেশে প্রজাদিগকে নিপীড়ন করিয়া কত অর্থ-শোষণ করিত। আবার, স্পেনদেশের রাজ-প্রতিনিধিগণ যাহারা মেক্সিকো" বা "লিমা"র অভিসম্পাৎ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল—তাহারা স্বর্ণমণ্ডিত গাড়ীর ঠাট্ এবং জম্‌কালো সাজসজ্জাবিভূষিত ও রজত-পাদুকাবদ্ধ-খুর অশ্ববৃন্দ সঙ্গে লইয়া মাদ্রিদ্-নগরে পুনঃপ্রবেশ করে। কিন্তু এই সময়কার ইংরাজদিগের প্রজাপীড়ন ও অর্থশোষণ,—রোমক ও স্পেনীয়দিগের কথা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছিল।" (মেকেলের Warren Hastings)।

যাই হোক্, শীঘ্রই এই নেশা ছুটিয়া গেল; দায়িত্ববোধ এই সকল বণিকদিগকে নীতিকুশল রাষ্ট্রপরিচালক করিয়া তুলিল। ইহা নিশ্চয় যে, অংশীদারদিগের আদেশ পালনে বাধ্য হইয়া, রাষ্ট্রনীতিকে তাহারা আয়ব্যয় ঘটিত প্রয়োজনের অধীন করিয়া রাখিয়াছিল। অবনতিগ্রস্ত দেশে, বাণিজ্যের কখনই উন্নতি হয় না; তাই কর স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেলামী আদায় করিতে হইয়াছিল, সৈন্যদল বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, প্রদেশাদি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, রাজ্য বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।(১) কিন্তু ক্রমে অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক হইয়া, এই বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন যাহা, ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন সহকারে, একশতাব্দীকাল ভারত শাসন করিতে ইংলণ্ডকে সমর্থ করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরুলিয়ার কুষ্ঠাশ্রম

কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া ১৭৯ মাইলের পথ; রাত্রিটুকু গাড়ীতে থাকিয়া সকালে নামিতে হয়। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিব এ আশা লইয়া এখানে আসি নাই এবং তাহা দেখিও নাই। তবে কলিকাতার কোলাহল, গাড়ীর ঘড়্‌ঘড়ানী ফিরিওয়ালার চীৎকার এবং যখন শীতের প্রথমে ধূয়াঁর নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সে সময় এখানে আসিয়া খোলা মাঠ, দূরে পর্ব্বত মালার দৃশ্য দেখিয়া এবং বিশুদ্ধ বাতাস সেবন করিয়া যে কিরূপ আনন্দ এবং তৃপ্তি বোধ হয়, তাহা কলিকাতা ছাড়িয়া যাঁহারা সময়ে সময়ে মফস্বলে গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। পুরুলিয়ার রাস্তা গুলির এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জমি হইতে অনেক-খানি উচুঁ; মাটির সঙ্গে অভ্র মিশান থাকায় রাস্তাগুলিকে একেবারে শাদা দেখায়। জ্যোৎস্নারাত্রে মনে হয় যেন রূপার পাত বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক আমি পুরুলিয়ার দৃশ্য বর্ণনা করিব বলিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। পুরুলিয়ায় আসিবার সময় টাইম টেবিল খুলিয়া দেখিলাম এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে এবং তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। খৃষ্টিয়ান মিশনারির হস্তে ইহার ভার। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এখানে আসার পর সেই মিশনারি সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁহার মুখেও শুনিয়াছিলাম যে এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। কিন্তু এমন একটি মহৎ কীর্ত্তি যে তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ ভাবের কোনও কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। শুনিলাম বড় দিনে এই কুষ্ঠ রোগীদের প্রত্যেককে নূতন কাপড়

(১) ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধের পর যখন কোম্পানী বঙ্গসিংহাসনে মীরজাফরকে স্থাপন করিয়াছিলেন তখন কোম্পানী ২,৬৯৭,৭৫০ পৌণ্ড দাবী করেন; কিন্তু ইহার অর্দ্ধেকমাত্র টাকা দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং কেবল ইহার তৃতীয়াংশ, রত্নঅলঙ্কার ও বাসন-কোসন দিয়া পরিশোধ করা হয়। Warren Hastings ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া অযোধ্যার উজীরকে এলাহাবাদ ও কেরা বিক্রয় করেন; আরও কিছুকাল পরে, তিনি উজীরের নিকট আরও অধিক টাকার (৫৫ লক্ষ) দাবী করেন।

এবং অন্যান্য ছোটখাট উপহারও কিছু কিছু দেওয়া হয়। আমাদের দেখিতে যাইবার বড়ই আগ্রহ হইল। গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না।

সহরের অনতিদূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যস্থিত শালবনের মধ্যে এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। সহরের প্রান্ত হইতে বৃক্ষাভ্যন্তরস্থিত সুদৃশ্য কুটিরাবলী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উন্নত শাল তরুরাজির পশ্চাৎ হইতে একটি গির্জ্জার উচ্চ চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। সহরের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র গ্রামের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ এখানে কুষ্ঠরোগীদের জন্য স্বতন্ত্র বাজার ইস্কুল ডাক্তারখানা গির্জ্জা সমুদায়ই আছে; এবং বিশেষ সুব্যবস্থার সহিত এখানকার সমুদায় কার্য্য পরিচালিত হয়।

এখানকার অধিবাসী কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সাতশতেরও অধিক। দুই শত বিঘা জমির উপরে ইহাদের জন্য ৭৫ খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গৃহ, জলাশয়, কূপ ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ। মধ্যে ঔষধালয়, বাজার এবং গির্জ্জা। তাহার একদিকে পুরুষ এবং বালকদিকের জন্য এবং অপরদিকে স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের অংশে যাইতে পারে না এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অংশে আসিতে পারে না। পুরুষদিগের অংশে ২২টি বাসগৃহ এবং ৩টি বালকদিগের বোর্ডিং আছে এবং স্ত্রীলোকদিগের অংশে ১৮টি বাস গৃহ এবং বালিকাদিগের জন্য ৩টি বোর্ডিং আছে। প্রত্যেক গৃহে ১৫ হইতে ১৮ জন করিয়া থাকিবার নিয়ম। ইহা ভিন্ন ১০টি বিদ্যালয় এবং একটি হাঁসপাতাল আছে। হাঁসপাতালের



কুষ্ঠরোগীগণের আমোদ প্রমোদ

একদিকে পুরুষ ও অন্য দিকে স্ত্রীলোকের বাসস্থল।

কুষ্ঠরোগীদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যাহাদের রোগ স্পর্শ করে নাই তাহাদের জন্য এই আশ্রম হইতে দূরে পৃথক একটি বাল্যাশ্রম (Home) আছে। ঐখানে বালক বালিকারা একজন অভিভাবকের (Resident house father) আশ্রয়ে বাস করে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয়ও আছে সেখানে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি ব্যবসায়ও শিক্ষা করে। কেহ কেহ এই আশ্রমের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বালিকারা রন্ধন কার্য্য সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা করে।

তিন বৎসরের অধিক বয়স্ক সুস্থ শিশুকে রোগগ্রস্ত পিতা কিম্বা মাতার সঙ্গে থাকিতে দেওয়া হয় না। এরূপ বালকবালিকাদের রোগ স্পর্শ করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য প্রথমে তাহাদিগকে পরীক্ষাবিভাগে (Observation ward) রাখা হয়, এবং রোগ স্পর্শ না করিয়া থাকিলে উপরি লিখিত বাল্যাশ্রমে রাখা হইয়া থাকে।

যাহাদের রোগ স্পর্শ করে নাই এইরূপ বালকবালিকাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বাসস্থল থাকায় অনেক বালক বালিকা এই ভীষণ কুষ্ঠরোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এখানকার অধিবাসী বালক বালিকার মধ্যে অনেকে এক্ষণে বয়োপ্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আশ্রমে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছে। আশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণ, মেরামৎ ও সূত্রধরের কার্য্য এই আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসীগণই করিয়া থাকে। যে সকল বালকবালিকাদের রোগস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় অথচ যাহারা স্পষ্টরূপে আক্রান্ত হয় নাই, তাহাদিগকেও পৃথকভাবে রাখা হয়।



কুষ্ঠাশ্রমের অধিবাসী

আশ্রমে কয়টি বিদ্যালয় আছে তাহার বিবরণ ও ছাত্র সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

		ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা
১।	রোগগ্রস্ত বালিকাদের জন্য	১৪
২।	রোগ সন্দেহ এরূপ বালিকাদের জন্য	১৫
৩।	রোগ স্পর্শ করে নাই এরূপ বালিকাদের জন্য	১৬
৪।	রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের জন্য	৩৫
৫।	কিণ্ডার গার্টেন	২৩
৬।	রোগগ্রস্ত বালকদিগের জন্য	১৬
৭।	রোগ স্পর্শ করে নাই এরূপ বালকদিগের জন্য	১৯
৮।	রোগ সন্দেহ এরূপ বালকদের জন্য	১০
৯।	রোগগ্রস্ত পুরুষদিগের জন্য	৪৩
১০।	কম্পাউণ্ডারের কার্য্য শিখিবার জন্য	৩

আশ্রমের সমুদায় কার্য্য পরিদর্শনের ভার রেভারেণ্ড পল উয়েগনারের উপরে। তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে নিজের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া এই আশ্রমের সেবা করিতেছেন এবং নিঃসঙ্কোচে এই ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের সঙ্গে মিশিতেছেন তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাঁহার অধীনে কয়েকজন কার্য্যকারক আছেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বতন্ত্র গৃহের জন্য রোগীদের মধ্যেই একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী তত্ত্বাবধারক আছে। ইহাদিগকে Eldrs বলা হয়।

যতদূর সম্ভব রোগীদিগকে কোন একটি কার্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিয়া রাখা হয়। তবে এমনও অনেকে আছে যাহারা কার্য্যক্ষম নহে। তদ্ভিন্ন অপর সকলের জন্য কার্য্যের ব্যবস্থা আছে! আশ্রমে একটি শাক সবজির বাগান আছে। সেখানে প্রত্যেক অধিবাসী আপন আপন চিহ্নিত স্থানে আবশ্যকীয় শাক সবজির চাষ করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন রাস্তা পরিষ্কার, গরু বাছুরের সেবা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য আছে। কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মন প্রসন্ন থাকে সেই জন্য বালক বালিকা হইতে সকলকেই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয়। রোগীদিগকে সপ্তাহের চাউল এবং পয়সা দেওয়া হয়। এই পয়সা দিয়া তাহারা আশ্রম সংলগ্ন বাজার হইতে চাল ডাল লবণ তৈল তরকারি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। রোগীরা দোকানে জিনিষ পত্র কেনার পর যে পয়সা ফিরাইয়া দেয় তাহা ঔষধে (Strong Carbalic acid) এবং গরমজলে দিয়া ফুটাইয়া রাখা হয়। পীড়া হইলে রোগীকে চাউল ও পয়সার পরিবর্ত্তে সাগু দুগ্ধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। বালক বালিকাদিগকে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়; তাহাদের চাউল ও পয়সা দেওয়া হয় না।

বৎসরে দুইবার প্রত্যেককে কাপড় দেওয়া হয়। পুরুষদিগকে ধুতী কোট চাদর ও গামছা এবং স্ত্রীলোক দিগকে সাড়ী, ঝুলা ও গামছা। প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্রাদি ধৌত করে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেককে বৎসর অন্তর কম্বল দেওয়া হয়। চিকিৎসালয়ের জন্য একজন ডাক্তার ও একজন এপোথিকারি আছেন! স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেন ইহার তত্ত্বাবধান করেন এবং আবশ্যক হইলে রোগীদিগকে দেখিয়া থাকেন।

বড় দিন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ইহাদের জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয় তাহা আগেই বলিয়াছি। বড় দিনের দিন দেখিলাম

৭০০ লোক প্রত্যেকে নূতন কাপড় পরিয়াছে, এবং এই ৭০০ লোককেই উপহার দেওয়া হইল। কুষ্ঠরোগীরা খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিল এবং নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। ছোট ছেলে মেয়েদের অতি সুন্দর সুন্দর খেলানা, পুতুল বই ইত্যাদি দেওয়া হইল। বয়োপ্রাপ্ত দিগকে গরম কাপড় মোজা কম্ফার্টার ইত্যাদি দেওয়া হইল। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে কয়েকজন অন্ধও আছে। সেদিনকার দৃশ্য দেখিয়া সে সময় মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা বর্ণণাতীত। উপহার বিতরণের পর তাহাদিগকে কিছু বলা হইল।

দুঃখের বিষয় এই; উহাদিগকে যে সকল উপহার প্রদান করা হইল, তন্মধ্যে একটিও আমাদের দেশের লোকের দান নয়। সমস্ত জিনিষই বিদেশীয় মহিলারা নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া এবং বুনিয়া এই হতভাগাদের জন্য পাঠাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া দেশবাসী একটি ২৫ বৎসর বয়স্কা ভদ্র মহিলা—তিনি চিররুগ্ন এবং শয্যাশায়ী; তথাপি নিজের রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া ইহাদের জন্য ভাবিয়াছেন। শয্যায় শুইয়া নিজ হাতে শেলাই করিয়া অনেকগুলি গরম জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। Revd wagner প্রত্যেক রোগীর হস্তে জিনিষগুলি কত স্নেহে কত ভালবাসার সহিত তুলিয়া দিতেছিলেন, ঘৃণা বা ভয়ের লেশ মাত্র নাই! এত দিন মনে করিতাম রোগীদের সকলকেই বুঝি খৃষ্টিয়ান করা হয় কিন্তু শুনিলাম ইহাদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টিয়ান নহে। ধন্য ইহাদের জীবন। ধর্ম্ম বিশ্বাসও সার্থক। ইহাদের এই আত্মত্যাগ ও নীরব সেবা দেখিয়া আত্মধিক্কার জন্মে।

এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের পরিচালনা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আমরা তত্ত্বাবধারক মহাশয়ের মুখে শুনিলাম আশ্রমের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাদের বৎসর ৪৫০০০ হাজার টাকা আবশ্যক হয়। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত বৎসরে ১৫০০০ হাজার টাকা এবং ঔষধের নিমিত্ত ১০০ শত টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র দান ইত্যাদি হইতে সামান্য কিছু টাকা আদায় হয় অবশিষ্ট সমুদায় টাকা য়ুরোপ হইতে আসিত। আমরা অবগত হইলাম বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে য়ুরোপ হইতে সমুদায় টাকা আসিতেছে না এবং সেইজন্য আশ্রমের পরিচালকগণকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। যাঁহাদের মস্তকের উপর এই ৭০০ শত নিরাশ্রয় আতুরের প্রতিপালনের গুরু ভার রহিয়াছে তাঁহারা আজ এ অবস্থায় কিরূপ চিন্তিত তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। এই সঙ্কটে তাঁহারা একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আছেন।

আমাদের দেশে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের হস্ত নানারূপ মঙ্গল কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং যাঁহাদের প্রাণ দুঃখী আতুরের জন্য ব্যথিত। আমি কাতরে তাঁহাদের এবং আমার দেশবাসী সকলকে জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন এই সঙ্কটের

দিনে ইহাদের জন্য চিন্তা করেন। বিদেশীয় লোকেরা আমাদের দেশের অনাথ আতুরের জন্য দুঃখ ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন, এ সময় আমরা কি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব। যাঁহার যাহা ক্ষমতা বিনা সঙ্কোচে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া এই সৎকার্য্যে সাহায্য করুন:—Revd P. Wagner. Superintendent Leper Asylum. Puruija, B. N. R. । অতি ক্ষুদ্র দানও সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

স্রোতের ফুল

(২০)

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নিবারণ মুখুয্যে একটি থেলো হুঁকোয় তামাক খাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে একটি মাটির তামাকদানিতে কয়লা, তামাক, টিকে, চকমকি, সোলা এবং একটা কাঠের ছোট পিঁড়িতে দুসারে আটটা গোল গোল ফুটোর উপর আটটি সাজা কল্কে মুখ অগ্নির প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুখুয্যে মুহুর্মুহু পোড়া কল্কে নামাইয়া সাজা কল্কেতে আগুন দিয়া হুঁকার মাথায় চড়াইতেছে।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। গোয়ালঘর ও পাকশালা হইতে ধূমরাশি কুণ্ডলি পাকাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু হিমমন্থর অলস বাতাস তাহা বহন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না, উঠানের পাশের কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় দীর্ঘ ধূসর পাগড়ী পাকাইয়া জড়াইয়া দিতেছে। ঘাসের মধ্যে একটা ঝিল্লি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে করাত দিয়া চিরিতেছিল, একটা কাঠঠোকরা থাকিয়া থাকিয়া ঠক্‌ঠক্‌ঠর্‌র্‌ করিয়া মৌন সন্ধ্যার ধ্যান ভঙ্গ করিতেছিল।

নিবারণ ডাকিল—ওরে গোবরা, গোবরা!

অন্তঃপুর হইতে বিরক্তিকর্কশ কণ্ঠে উত্তর হইল—কি? কেন চেঁচাচ্ছ? কেবলই গোবরা গোবরা।

নিবারণও বিরক্ত হইয়া বলিল—ওরে সন্ধ্যে হয়ে গেল, আরতি করতে যাবি কখন?

শ্রীমান গোবর্দ্ধন গাঁজা টিপিতে টিপিতে বাহিরে আসিয়া বলিল—রোজ রোজ আমি যেতে পারব না। তুমি যাওনা কেন? আজ মুচিপাড়ায় ঝুমুর নাচ হবে; আমি দেখতে যাচ্ছি।

নিবারণ মিনতির স্বরে বলিল—ওরে ঝুমুর নাচ ত সারারাত হবে; একবার ঘণ্টাটা নেড়ে পঞ্চপ্রদীপটা ঘুরিয়ে নৈবিদ্যি শেতল জলখাবারগুলো বাড়ীতে এনে তারপর তোর যেখানে খুসি সেখানে মরগে না।

—আমি রোজ রোজ যাই, তুমি একদিন যাওনা কেন?

—আরে আমি কি ছাই আরতি টারতি করতে জানি?

—আমিই বড় জানি কিনা?

—তবু তোদের কচি হাড়, ইচ্ছে মতন ঘোরে টোরে। আমাদের হাড় আড়ষ্ট হয়ে গেছে, ঘণ্টা নড়ে ত প্রদীপ নড়ে না, প্রদীপ নড়ে ত ঘণ্টা চুপ করে।

—ন্যাও! অতশত কেউ দেখবে কি না? ঘণ্টাটা নেড়ে দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চলে এসগে।

—তুই ত বল্লি চলে এসগে। কিন্তু সত্যি কথা বলি শোন্। ঐ কিশরে আর বিপনকে দেখলে আমার হৃৎকম্প হয়; ওদের চাউনি দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। তাতে আবার ভটচায্যিকে একঘরে করেছি বলে বিপ্‌নে আমার ওপর তিরিখ্‌থি হয়ে আছে। কি জানি বাবা ঠাকুরঘরে একলা পেয়ে ঠুকে মুকে দেবে!

—তোমায় ঠুকতে পারে আর আমায় বুঝি ঠুকতে পারে না।

—তোকেও ঠুকতে পারে। কিন্তু তোদের হাড় ভাঙ্‌লে জোড়া লাগবে, আমার বুড়ো হাড় জন্মের মতন যাবে।

—না, আমার হাড় ভেঙেও কাজ নেই, জোড়া লেগেও কাজ নেই। ভট্‌চায্যিকে একঘরে করলে কি শেষে আমার হাড় ভাঙবার জন্যে। এত ভয়েভয়েই যদি থাকতে হল তবে ওদের একঘরে করে লাভ হল কি?

—লাভ আবার হয়নি? এক ঢিলে দুপাখী মরেছে দেখছিস নে? ভট্‌চায্যি জব্দ হয়েছে; আর লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আশীর্ব্বাদে সেদিন থেকে তোর গর্ভধারিণীকে উননে হাঁড়ি চড়াতে হয়নি। প্রসাদ, নৈবেদ্য, শেতল, জলপানি রোজ যা আসে খেতে খেতে পেটের অসুখ হয়ে গেল; তবু বলিস লাভ হয়নি?

—তা যাই বল, আমি আজ কিছুতেই যেতে পারব না। তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বকবক করছি, এতক্ষণ হয়ত ওদিকে ঝুমুর আরম্ভ হয়ে গেল। জানো, এ ঝুমুর ভাগলপুর থেকে এসেছে!

আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমান গোবর্দ্ধন প্রস্থান করিলেন। নিবারণ—অকালকুষ্মাণ্ড, পাজি, প্রভৃতি বিবিধ উপযুক্ত ও সম্পর্কবিরুদ্ধ বিশেষণে পুত্রকে অভিহিত করিতে করিতে হুঁকা রাখিয়া উঠিল। বাঁশের আনলা হইতে গামছা ও নামাবলি এবং ঘরের কোণে ঠেসানো একগাছি বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া ডাকিল—ওরে ছিরে, ছিরে রে!

এজ্ঞে—বলিয়া হাতে সানি মাখা ও পায়ে গোবর লেপটানো অবস্থায় ছিরে গোয়ালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নিবারণ তাহাকে বলিল—ওরে একবার লণ্ঠনটা জেলে দে ত, বাবুদের বাড়ী আরতি করতে যেতে হবে।

ছিরে লণ্ঠন জ্বালিতে চলিয়া গেল। নিবারণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—দোহাই মা কালী, জয় বাবা লক্ষ্মীজনার্দ্দন, বিপনের সামনে যেন না পড়ি। দোহাই বাবা! জয় মা! ভালোয় ভালোয় প্রাণে প্রাণে বেরিয়ে আসতে পারলে একপয়সার হরির লুট দেবো বাবা। শ্রীহরি শ্রীহরি! বিপত্তে মধুসূদন! দুর্গা দুর্গতিহারিণী!... সাধে কি ঠাকুর দেবতার ধার ধারিনে!

ঠাকুর দেবতার কথা মনে করলে মনের ভেতরটা কেমন ছমছম করতে থাকে, কোনো কাজই নির্ভয়ে করবার জো থাকে না। রামঃ!...না না, এখন ও-কথাটা ভাবা ভালো হচ্ছে না। দুর্গা দুর্গা! মধুসূদন মধুসূদন!

ছিরে একটি চৌকোণা লণ্ঠনের মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়া আনিল। লণ্ঠনটির একপাশের কাঁচ নাই, সে দিকটায় ছেঁড়া হিন্দুহিতৈষী আঠা দিয়া লাগানো; তার পাশের কাঁচখানার উপরদিকটা টিনের জোড় হইতে খুলিয়া ভিতর দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া নড়নড় করিতেছে; তার পাশের কাঁচখানা ফাটা; একখানা মাত্র কাঁচ আস্ত আছে। লণ্ঠনের ভিতরটায় গলা বাতির উপর রেড়ি কেরোসিন পড়িয়া থকথক করিতেছে। কেরোসিনের ডিবে হইতে আলোক অপেক্ষা ধূমই অধিক নির্গত হইতেছিল। ছিরে লণ্ঠনটি আনিয়া নিবারণের হাতে দিল। নিবারণ লণ্ঠন হাতে করিয়াই বলিল—এঃ! কি লাগিয়েছিস? গোবর নাকি?

ছিরে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—এঁ! গোবর ক্যানে? খোল-পচা! আমি সানি দিতেছিনু কিনা!

নিবারণ বলিল—এঃ এঃ! আহাম্মক বেটা। হাতটা ধুয়ে মুছে নিতে পারিস নি? দে দে এখন একটু ন্যাকড়া কি কাগজ দে। রামঃ! হাতময় লেগে গেল।

ছিরে একটু কাগজ আনিয়া দিল! তাহাতে হাত ও লণ্ঠন কথঞ্চিৎ মুছিয়া নিবারণ যাত্রা করিল—দুর্গা দুর্গা! মধুসূদন মধুসূদন!

বাড়ীর বাহির হইতেই বেড়ার পাশে শুকনো পাতার উপর কি খড়খড় করিয়া উঠিল; একটা শেয়াল রাস্তার একদিক হইতে অন্য দিকে ছুটিয়া গেল; একটা বাদুড় তাহার কালো দীর্ঘ ডানা মেলিয়া মুখুয্যের সামনে ছায়া ফেলিয়া উড়িয়া গেল; একটা হুতুম-পেঁচা তেঁতুল-গাছের ঘন কুঞ্জ হইতে গম্ভীর রবে ডাকিয়া উঠিল ধুতু-ধুতু-ধুতুরুম্!

নিবারণ মনে মনে বলিতে লাগিল—রাম রাম! সব অলক্ষণ! খড় খড় করল ওটা নিশ্চয় সাপ! বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল, সম্মুখে বাদুড়, ঊর্দ্ধে কালপেঁচা! একেবারে চারপোয়া অলক্ষণ পরিপূর্ণ! মধুসূদন মধুসূদন! আজ নির্ঘাত লাঞ্ছনা আছে বিপনের হাতে! দুর্গা! দুর্গা! জমিদারের ছেলে হবে নাদুসনুদুস গোবরগণেশ গোচের। তা না, যেন রঘো ডাকাতের চেলা! জমিদারের ছেলে বিছানায় শুয়ে ভুঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে তামাক খাবি, বড়জোর এক চক্কর গাড়ীতে চড়ে' মেঠো হাওয়া খেয়ে আসবি! তা না, সব অনাছিষ্টি! খেলবেন কিনা ব্যাটম্বল, ভাঁজবেন কিনা ডম্বল! আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ...দূর কর ছাই, আবার বাজে চিন্তা করছি। কেমন অনভ্যেস, কিছুতেই ঠাকুর দেবতার নাম জপ করতে পারিনে। দুর্গা দুর্গা! শ্রীহরি শ্রীহরি! মধুসূদন মধুসূদন!

অন্দরের দেউড়িতে আসিয়া নিবারণ দেখিল অন্দরের বৃদ্ধ দ্বারবান দুবেজি দুই

হাতে তাহার সুশুভ্র শ্মশ্রুরাজি চিবুকের মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া উপর দিকে তুলিয়া দিতে দিতে সুর করিয়া গাহিতেছে—

সুমিরত রামহি তজহি জন তৃণসম বিষয়বিলাসু।
রামপ্রিয়া জগজননি সিয় কছু ন আচরজু তাসু॥

নিবারণ আসিয়া ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—নমস্কার দুবেজি! ছোট বাবু কাঁহা?

—নমস্কার মুখুয্যা মাহাশে। ছোটবাবু ত আভি বাহার গিলো। ভট্চায মাহাশের বাড়ী গিয়ে উয়ে হোবে।

নিবারণ আশ্বস্ত হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রোহিণী।

রোহিণী দুধ জ্বাল দিতেছিল। উচ্ছ্বসিত দুগ্ধ আলোড়ন করিতে করিতে বলিল—কে গা?

—আমি নিবারণ। ঠাকুরের আরতি করতে এসেছি।

রোহিণীর নিকটেই একজন দাসী বাটনা বাঁটিতেছিল ও দুজন কুটনো কুটিতেছিল। রোহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—সারি, সারি, দুধটা একটু নাড় না ভাই। আমি মুখুয্যে মশায়কে ঠাকুরঘরে দিয়ে আসি..... বাবা! সবারই মুখে শুধু রোহিণী আর রোহিণী! রোহিণী ছাড়া যেন বাড়ীতে আর নোক নেই।

রোহিণী মুখুয্যের আহ্বানের প্রথম আনন্দ-উল্লাস চাপা দিয়া যেন কত অনিচ্ছায় বিরক্ত হইয়া দুধের হাতা সারদার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

নিবারণ উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। রোহিণী আসিয়া বলিল—এসুন।

রোহিণীকে অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে মুখুয্যে বলিল—কি রোহিণী, তোমাদের রাজবাড়ীর খবর কি? নতুন খবরটবর কিছু আছে?

—আমাদের তো নিত্যি নতুন খবর। দাদাবাবু মেয়েদের সব বই পড়াচ্চে; শোবার ঘরে আঁতুড় করছে,.....দেখছ কি অবাক হয়ে মুখুয্যে মশায়, সত্যি মাইরি বলছি এই তোমার গা ছুঁয়ে, এই সব হচ্ছে!

—এ্যাঁ বলিস কি? গিন্নি কিছু বলেন না।

—রাণীমা আমাদের মাটির মানুষ। নইলে আর সতীনপুতের এত আবদার সয়! তুমি একবার রাজাবাবুকে বল না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা ত বলতে হবে। এমন সব অনাচার! তারপর শুনচি, বিপনে নাকি একঘরেদের বাড়ী যায়?

—তা যায় বৈ কি! কিশোর হল গিয়ে দাদাবাবুর প্রাণের ইয়ার।

নিবারণ গম্ভীর চিন্তিত ভাবে বলিল—হুঁ!.....আচ্ছা বলতে পার রোহিণী, কার আঁতুড় বাবুর শোবার ঘরে হবে। ঐ মালতী ছুঁড়ির নাকি?

—না, না, এখনো অতদূর হয়নি; তবে হতে বিলম্বও নেই। আপাতত পাঁচুর মার পালা।

—ও! তা ওর ওপর অত দরদ কেন?

—কি জানি বাবু, ওর ভেতরে কি মতলব আছে!

—হরি হে মধুসূদন! তোমার ইচ্ছা! —বলিয়া নিবারণ পা ধুইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল।

রোহিণী বলিল—আপনি ততক্ষণ আরতি করুন, আমি জয়াপিসিকে বলে আসি ঠাকুরের শেতল আনতে।

ঠাকুরঘরে কাহাকেও না দেখিয়া নিবারণ পরম আরাম বোধ করিল। সে তাড়াতাড়ি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া খুব জোরে ঘণ্টা নাড়িতে লাগিল এবং শাঁখের জল ছড়াইয়া, এখানকার জিনিষ সেখানে রাখিয়া চটপট আরতি সম্পন্ন করিল।

ঠাকুরের জলপানি লইয়া জয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রোহিণী এখানটা একটু হাত মার্জ্জনা করে দে।

রোহিণী হাত মার্জ্জনা করিতেছে, জয়া জলখাবার হাতে দাঁড়াইয়া আছে, মুখুয্যে আসনের উপর দাঁড়াইয়া দুই হাতে ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে শাঁখে ফুঁ পাড়িতেছে, এমন সময় বিপিন ঘরে আসিয়া হা হা করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

তাহার অট্টহাস্যে চমকিত হইয়া রোহিণীর হাত হইতে জলের ঘটী, জয়ার হাত হইতে জলখাবার, মুখুয্যের হাত হইতে শাঁখ ঝন ঝন ঝন ঝন শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ! বাঃ! ঠাকুরের অদৃষ্ট ভালো! নন্দকিশোর স্মৃতিরত্নের বদলে নিবারণ মুখুয্যে, খুড়িমার বদলে জয়াঠাকরুণ ঠাকুর-সেবার ভার পেয়েছেন; আর তার ওপর রোহিণী এসে জুটেছেন! একেবারে ত্রি অস্পর্শ!

বিপিন আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঝন ঝন শব্দ শুনিয়া গিন্নি "কি হল, অ্যাঁ কি হল?" বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সকলে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

ঘোমটা টানিয়া ফিসফিস করিয়া গিন্নি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—এঁ জয়াঠাকুরঝি, এসব ফেল্লে কেমন করে? এখন কি হবে? কি দিয়ে ঠাকুরের শেতল হবে বল ত? ওলো রোহিণী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, জল নৈ থৈ করছে, মুছে নে।

কেহ একটু নড়িতেও পারিল না। উহাদের কানে বিপিনের বিদ্রূপের হাসি প্রলয়কালের ভৈরব-বিষাণের প্রতিধ্বনির মতন বাজিতেছিল হা হা হা।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, ঠাকুর এমন শুদ্ধ আচারের লোকেদের হাতে কিছু খাবেন না বলে খাবার উল্টে ফেলে দিয়েছেন। যেখানে নিবারণ মুখুয্যে পূজারী, জয়াঠাকরুণ জোগাড়ী, আর রোহিণী পাটকরণী, সেখানে মানুষেরই খেতে প্রবৃত্তি হয় না, ত ঠাকুরের! নিজেরা যদি সেবা করতে পারবে না তবে পাপের বোঝা বাড়াতে বাড়ীতে ঠাকুরের ল্যাঠা রেখেছ কেন? ঠাকুর কি তোমার জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা যে তোমার হুকুম শুনবে আর তোমার হাততোলা প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবে?

গিন্নি ফিসফিস করিয়া বলিলেন—আঃ কি অলক্ষুণে কথা বলিস বিপিন, ঠাকুর দেবতাও তোরা মানিস নে?

বিপিন উচ্চ কণ্ঠে বলিল—মানি বলেই

ত এই-সব ভণ্ডামি আর অনাচার সহ্য হয় না। যাদের মুখ দেখলে পাপ হয়.....

—আঃ কি করিস! যা যা তুই এখান থেকে যা.....

বলিয়া গিন্নি বিপিনকে ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বিপিন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

গিন্নি বলিলেন—যাও জয়াঠাকুরঝি, আলাদা দুধ সন্দেশ নিয়ে এসে ঠাকুরের জলপানি দাও।.....মুখুয্যে মশায়কে বল একটু যেন থাকেন, আমি এক্ষুনি লুচি ভাজিয়ে দিচ্ছি।

নিবারণ এদিক ওদিক চাহিয়া বিপিন আছে কিনা দেখিয়া বলিল—আমার বিশেষ কাজ আছে মা, আমি আর বিলম্ব করতে পারব না, এক্ষুনি যাব।.....মধুসূদন মধুসূদন!

সে এই যমপুরী হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার আর লুচি খাইয়া কাজ নাই। তাহার মনে হইতেছিল এখনি হয়ত কোনো দেয়াল বজ্রহাস্যে বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বিপিন তাহাকে নখে করিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

গিন্নি বলিলেন—তবে আমি দুবেজিকে দিয়ে আপনার খাবার পাঠিয়ে দেবো।

গিন্নির সঙ্গে সঙ্গে জয়া রোহিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুখুয্যে শূন্য ঘরে একাকী বসিয়া বসিয়া আড়ষ্ট হইয়া জপ করিতে লাগিল—মধুসূদন মধুসূদন!

(২১)

অন্দরের দেউড়ী পার হইয়া তবে নিবারণের চিন্তা-শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে বিপিনের শ্লেষ ও অট্টহাস্য মনে করিয়া দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—হুঁ! এর শোধ আমি না তুলি ত.....কি বলেছি।—নিবারণ শপথটা সামলাইয়া লইল। কারণ সে ভাবিল যে জমিদারের ছেলে বিপিনকে জব্দ করা খুব সহজ কাজ না হওয়াই সম্ভব।

নিবারণ ভাঙা লণ্ঠন হাতে লইয়া ফাটা লাঠি ঠরর্ ঠরর্ করিতে করিতে হরিবিহারী বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। তখন হরিবিহারী আহারে যাইবার উপক্রমণিকা-স্বরূপ বোতল ও গেলাস লইয়া হজমি আরক পান করিতেছিলেন।

হরিবিহারী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—কি খুড়ো! এত রাত্রে কি মনে করে? .....বড় শীত! হবে?

হরিবিহারী স্ফটিকপাত্রে শোণিত-লোহিত তারল্য নিবারণের সম্মুখে নাচাইল। নিবারণের মনটা প্রসন্ন ছিল না। সে অমন লোভনীয় আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বলিল—না বাপু, অত আদরে আমার আর কাজ নেই। অন্দর থেকে অপমান হয়ে এসে সদরের আদর ভেঙচানো মনে হচ্চে। আমি বলতে এসেছি, কাল থেকে ঠাকুরপূজোর জন্যে অন্য লোক দেখো। আমা হতে ও কাজ হবে না।

—কেন? হয়েছে কি?

—বুড়ো বয়সে শেষে কি মার খাব? তোমরা বড়লোক, তোমরা সব পার বাবাজী। তোমাদের বেলা লীলে খেলা, পাপ লিখেছে আমাদের বেলা।

হরিবিহারী নিতান্ত একান্তবাসী,

সংসারের কোনো খোঁজ খবরই রাখেন না, কাহারো সহিত বড় একটা মেশেনও না। খাইতে শুইতে দুইবার অন্দরে যান, আর সমস্ত দিন একলাটি বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া তামাক টানেন। সুখদুঃখের সঙ্গী তাঁহার রামধন খানসামা। জমিদারীর কাজ কর্ম্ম সব দেওয়ানজিই দেখেন; যখন দেওয়ানজির নিতান্ত দরকার বোধ হয় তখন তিনিই প্রভুর পরামর্শ লইতে আসেন। অন্যথা অলসপ্রকৃতির সঙ্গবিরক্ত প্রভুটি কোনো কর্ম্মেই কখনো নিজে হইতে হস্তক্ষেপ করিতেন না; তাঁহার ভয়, পাছে তাঁহাকে নিজে কোনো চেষ্টা করিয়া নূতন আয়োজনের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই ভয়েই কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ও সাহস হইত না। ভট্টাচার্য্যকে একঘরে করিয়া কোনো অসুবিধা হয় নাই নিবারণের জন্য। এখন সেই নিবারণ কাজে ইস্তফা দিতে উদ্যত হওয়ায় চিন্তিত হইয়া বলিলেন—আরে হয়েইছে কি তাই আগে বল শুনি।

নিবারণ বলিল—তোমার পুত্তুর, বাবাজী, গুণধর পুত্তুর! পাঁচটা পাশ করেছেন, জমিদারের ব্যাটা, তা আর অহঙ্কার ধরে না। আমার ওপর একেবারে মারমুখো! ক্যান রে বাপু—অপরাধের মধ্যে ত তোদেরই ঠাকুরের পূজো হয় না, দয়া করে পূজো করে দিতে এসেছি! তা অত কেন? না হয় আসব না!

হরিবিহারী স্তিমিত নেত্রে বলিলেন—না না, বিপিন কি তোমার অপমান করতে পারে? যদি কিছু অন্যায় করে থাকে আমি ধমকে দেবো।

নিবারণ সাহস পাইয়া বলিল—হয় না-হয় জিজ্ঞাসা করে' দেখো, সেখানে গিন্নি ছিলেন, জয়াঠাকরুণ ছিল, বোহিণী ছিল। সকলের সামনে আমায় সে কী অপমান! না ভূত না ভবিষ্যতি! এই মারে ত এই মারে! গিন্নি এসে যাই হাঁ হাঁ করে পড়লেন তাই রক্ষে! নইলে আজ তোমার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেত!

—না খুড়ো তুমি কিছু ভেব না, আমি খুব করে তাকে ধমকে দেবো। তোমরা যেমন পূজো করছ কোরো। বিপিন তোমায় আর কখনো কিছু বলবে না।

—বিপিন না বললেও ত তোমার বাড়ী আর আমাদের আসা হবে না। তুমি গাঁয়ের জমিদার, আমাদের মাথার মণি! কিন্তু বাবাজী সকলের ওপর ধর্ম্ম ত আছেন! তুমি খুসি হবে কি রাগ করবে বলে ত আর জাত ধর্ম্ম ছাড়তে পারিনে।

—কেন আবার কি হয়েছে?

—হয় নিই বা কি? তোমার বাড়ীতে মেয়ে-স্কুল বসেছে; বাড়ীর ভেতরে আঁতুড় ঘর হচ্ছে; একঘরেদের ঘরে যাতায়াত চলছে; ম্লেচ্ছপনার আর বাকি কি? তোমাদের পেয়ারের ভট্চায্যিকে একঘরে করে ভালো করিনি দেখছি, আমাদেরই একঘরে হয়ে থাকা উচিত ছিল।

—এঁ এতসব কাণ্ড হয়েছে? রামধন ডাক ত একবার বিপিনকে!

নিবারণ শশব্যস্ত হইয়া বলিল—না না বাবাজী কর কি সর্ব্বনাশ! আজ রাত্তিরে কিছু বলো না, বলো না, সাত দোহাই বাবা। তাহলেই সে ঠিক বুঝতে পারবে আমি তোমার কাছে লাগিয়েছি। আর সে যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, অমনি ছুটে গিয়ে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়ে ছাড়বে। দোহাই বাবাজী! ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি তোমায় কিছু বলি নি! আমি শুধু তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম, নিজেই আমি একঘরে হয়ে থাকব তাই বলতে এসেছিলাম। মধুসূদন মধুসূদন!

হরিবিহারী বলিলেন—আচ্ছা থাক, আমি পরেই বলব।

নিবারণ তাড়াতাড়ি আপনার ফাটা লাঠিগাছটি লইয়া উঠিল। হরিবিহারী বলিল—তোমরা যেমন পূজো করতে আসছিলে তেমনি আসবে কিন্তু।

নিবারণ একথার কোনো জবাব না দিয়া মধুসূদন-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

হরিবিহারীর তোষাখানার একতলায় সাধারণ বৈঠকখানা। সেখানে জমিদার-পরিবারের আশ্রিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে জটলা করিত, তাস পাশা খেলিত, গাঁজা গুলি মদ খাইত। নিবারণ আস্তে আস্তে একটি ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল—শিবচরণ আছ?

শিবচরণ গিন্নির বোনপো, পাঁচুর বাবা। শিবচরণ তাড়াতাড়ি মদের বোতল লুকাইয়া হাতের উল্টা পিঠটা ফস করিয়া গোঁপের উপর রগড়াইয়া লইয়া বলিল—ক্যা?

মুখুয্যে বলিল—আমি হে আমি।

—কে মুখুয্যে মশায়? এত রাত্রে কি মনে করে?—বলিতে বলিতে শিবচরণ দুই-হাতে কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে বাহির হইয়া আসিল।

নিবারণ তাহার কাঁধে হাত দিয়া একান্তে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমরা ত আমাদের বুড়ো-হাবড়া বলে একটুও মানো না; কিন্তু আমাদের কেমন দয়ার শরীর, কারুর বিপদ দেখলে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারিনে, বুক দিয়ে এসে পড়ি। আহা তুমি নিতান্ত ভালোমানুষ, কোনো কিছুরই খোঁজ রাখ না, তোমার এমন বিপদ দেখে আমি শতকার্য্য ফেলে এই দারুণ শীতের রাতে হিহি করতে করতে ছুটে এসেছি তাতে আজকে আবার হাঁপানিটা চাগিয়েছে···।—বলিয়া নিবারণ সাঁইসাঁই শব্দ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

শিবচরণের ত ভূমিকা শুনিয়াই চক্ষু স্থির। কি বিপদরে বাবা! সেদিন সে একজন প্রজার খাজনা বাবদ পাঁচ টাকা তের আনা সরকারি বাক্সে না ফেলিয়া নিজের ট্যাঁকে গুঁজিয়াছিল। সেই অবধি বেচারার মনে শান্তি ছিল না, প্রাণ ধুকপুক করিতেছিল। তাই সে মদের বোতল লইয়া বসিয়া গিয়াছিল। সেই চুরি কি ধরা পড়িয়াছে? সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। ভয়কাতর দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া মুখুয্যের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মুখুয্যে বলিল—ভায়া, শুনেছ কি তোমার

ব্রাহ্মণীর আঁতুড় হচ্ছে দোতালার ওপর বিপিন বাবুর শোবার ঘরে?

শিবচরণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাক, তবে টাকা চুরির কথা নয়। কিন্তু আঁতুড়-ঘরে আবার বিপদ কি? কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল—হ্যাঁ শুনছিলাম বটে আজ ঐরকম কি একটা কথা হয়েছে।

—হঠাৎ তোমার ব্রাহ্মণীর ওপর বিপিন বাবুর এত মমতা কেন হল কিছু বুঝতে পারছ কি? যদি জাত ধর্ম্ম বাঁচাতে চাও ত পালাও বৌকে নিয়ে দেশে। আজই বড়-বাবুকে গিয়ে বলগে, গিন্নিকে গিয়ে কেঁদে ধরগে, নইলে সর্ব্বনাশ!

মুখুয্যের কথায় শঙ্কিত হইয়া শিবচরণ বলিল—এ যে ভরা দশমাস, কেমন করে যাব?

মুখুয্যে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আচ্ছা, নাইবা গেলে, কিন্তু কর্ত্তাকে আর গিন্নিকে গিয়ে বলগে বিপিনের ঘরে কিছু-তেই ছেলে হতে পারে না; আর তোমার ব্রাহ্মণীকেও শিখিয়ে দিয়ো, সে যেন কিছুতেই রাজি না হয়।...যাও এখুনি যাও একবার কর্ত্তার কাছে, সেখানে এখন কেউ নেই।

নিবারণ শিবচরণকে টানিয়া লইয়া গিয়া সিঁড়িতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। শিব-চরণ ইতস্তত করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেল দেখিয়া নিবারণ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

শিবচরণ গিয়া দেখিল হরিবিহারী খাইতে অন্দরে যাইবার জন্য উঠিয়াছেন, দুইহাতে কোমরে কাপড়ের খুঁট গুঁজিতে গুঁজিতে চটির মধ্যে পা দিতেছেন। শিবচরণ ডাকিল—পিসেমশায়!

হরিবিহারী বলিলেন—কেন রে?

শিবচরণ ভয়ে ভয়ে আমতা-আমতা করিতে করিতে বলিতে লাগিল—বিপিন তার ঘরে আঁতুড় করবে বলছে। সে কি রকম করে হবে?

—যা যা সে আমি ঠিক করে দেবো! যেখানে চিরকাল আঁতুড় হয়ে আসছে সেখানেই হবে।

শিবচরণের আর কোনো কথা জোগা-ইল না। সে আস্তে আস্তে নামিয়া গেল।

হরিবিহারী অন্দরে যাইতেছেন। পশ্চাতে রামধন গুড়গুড়ি ও পানের ডিবা লইয়া আসিতেছে। তোষাখানা ও অন্দরের মধ্যপথে জয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে উচ্চস্বরে ডাকিল—শোনো!

হরিবিহারী হাসিয়া কাছে গিয়া বলিল—কে জয়ী! কিরে? অনেক কাল পরে আজ দেখা! কিছু বলবি?

—আমি আর তোমার বাড়ীতে থাকতে পারব না। আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও। বিপিন উঠতে বসতে আমায় অপমান করছে, টিট্‌কারি দিচ্ছে। আমি এবাড়ীতে আর এক দিনও থাকতে পারব না।

—যা যা পাগলি, আর কাশী যেতে হবে না। আমি বিপিনকে শাসন করে দেবো।

তারপর একটি দৃষ্টিতে অনেকখানি অতীত ইতিহাসের ছায়া ফেলিয়া উভয়ে সরিয়া গেল।

বারংবার বিপিনের নামে নালিশ শুনিতে শুনিতে বিরক্তমনে হরিবিহারী অন্দরে আসিয়া শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। গিন্নি আসিয়া একপাশে বসিলেন। হরি-বিহারী বলিলেন—বিপিন নাকি মেয়েদের পাঠশালা করছে, দোতালায় আঁতুড় করছে?

গিন্নি মুখভার করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ! বিপিন এবার কলকেতা থেকে এসে অবধি কেমন উদাস উদাস, সদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। যেমন খিটখিটে তেমনি একগুঁয়ে হয়েছে, নিত্যি নতুন খেয়াল নিয়েই আছে। তারপর ঐ যে ঘরজ্বালানি ছুঁড়ি মালতী এসেছে, ঐটে এসে অবধি ত বাড়ীতে একদিনের তরে শান্তি নেই। একবার নবকিশোরকে নিয়ে কত কাণ্ডটাই করলে! এখন আবার বিপিনকে পেয়ে বসেছে! সোমত্থ সব ছেলে, বিয়ে থা হয়নি, এতে ওদের মন চঞ্চল হতেই ত পারে। কিন্তু তুই বিধবা মানুষ, তোর কি অমন পুরুষ-ঘ্যাঁসা হওয়া উচিত?

হরিবিহারী স্তিমিতনেত্রে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা ঝাড়ে মূলে সব দূর করে দিলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায়।

—বাপরে! তা কি বিপিনের প্রাণে সইবে? তার ত খুড়িমা-অন্ত প্রাণ! তারপর ত আজকাল খুড়িমার খুঁটির জোর হয়েছে, বোনঝি অমনি বিপিনের চোখে চোখে ফিরছে।

—আচ্ছা, আমি বিপিনকে দিয়েই ওদের তাড়াব।

—কিন্তু বিপিনের একটি বিয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে। যেটের কোলে অতবড়টি হয়েছে, আর বিয়ে না হলে কি ভালো দেখায়?

—হুঁ! আচ্ছা কালই আমি সব ঠিক করে ফেলব। ঝিনুকপোঁতার জমিদার হরিশ চাটুয্যে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে আমায় চিঠি লিখেছে।

হরিবিহারীর স্বভাব যেমন একদিকে বিষম নিষ্ক্রিয় ছিল, অন্য দিকে আবার তেমনি একবার উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে বিলম্ব করিতে জানিত না। বিপিনের বিয়ে দেওয়া দরকার, তা কালই ঠিক হইয়া যাইবে—হরিশ চাটুয্যের মেয়ে প্রস্তুত আছে।

গিন্নি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—তা হলে ত বেশ হয়!

(২২)

প্রাতঃকালে বিপিন লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতেছে। গিন্নি আসিয়া ডাকিলেন—বিপিন!

বিপিন তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেন মা?

গিন্নি হাসিয়া বলিলেন—সকাল বেলাই তোকে একটা সুখবর দিতে এসেছি। তোর বিয়ের সম্বন্ধ করছি। আজকে উনি সব পাকা করে চিঠি লিখবেন।

বিপিন চিন্তিত হইয়া বলিল—কোথায় মা এ শুভকর্ম্ম স্থির করচ? খুকিটি এসে বিনির খেলুড়ে হতে পারবে ত?

—না না, তোর সকল তাতেই ঠাট্টা! তুই যেটের কোলে ডাগরটি হয়েছিস, তোর সঙ্গে কচি মেয়ের বিয়ে দেবো কেন?

এ বেশ ডাগর সোমত্থ মেয়ে। ঝিনুক-পোঁতার জমিদার হরিশ বাবুর মেয়ে! ওরা নিজেরাই যখন শিখেছে বয়েস ন বছর, তখন দশ এগার বচ্ছরের কম কিছুতেই হবে না!

বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল—উঃ! তবে ত অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে! কিন্তু মা আমার ত এখন বিবাহে তেমন আগ্রহ বোধ হচ্ছে না।

—আরে আগে শোন সব কথা, তারপর আগ্রহ হয় কিনা দেখব।.....মেয়েটি বাপের একমাত্র সন্তান; যদি পুষ্যিপুত্তুর না নেয় ত সব জমিদারী তোরই হবে; মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী; বেশ বিদ্বান; বিদ্যেসাগরের কি বলে কথামালা না কি তাই পড়ে; তুই যেমনটি চাস ঠিক তেমনি!

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—এত শুনেও ত বিশেষ আগ্রহ বোধ হচ্ছে না মা। তুমি বাবাকে বোলো আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

—তুই যে অবাক করলি বিপিন! সময়ে তোর বিয়ে হলে আজ যে তোর কাচ্চা-বাচ্চায় ঘর ভরে যেত! আমাদের কি তুই কোনো সাধ আহ্লাদ করতে দিবিনে? কি রকম কনে তুই চাস তাই বল? তোদের এখন মস্ত ধাড়ি মেয়ে পছন্দ, কিন্তু আমাদের হিঁদুর ঘরে তা ত আর পাওয়া যাবে না; ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটু বড়সড় দেখে বিয়ে ত করতে হবে?

বিপিন হাস্যমুখেই বলিল—বিয়েটা যে করতেই হবে এমন কি কথা আছে? আমি ঐ প্যানপেনে কচিখুকিদের কিছুতেই বিয়ে করব না।.....আর কাজ কি মা বিয়ে করে। আমরা মায়েপোয়ে বেশ আছি, ঝগড়া ঝাটি, আদর আবদার করছি; এর মধ্যে আবার আর-একজন শরিক জোটানো কেন? সেই অচেনা অজানা লোকটির মেজাজ মতলব কেমন হবে তা ত বলা যায় না; শেষকালে কি আমাদের মাঝখানে দেয়াল তুলে দাঁড়াবে।

গিন্নি বিপিনের কথায় প্রীত হইয়া বলিলেন—তা ত বটে, কিন্তু তোর মন যদি খাঁটি থাকে তবে বৌ-বেটি যেমনই হোক না, আমাদের সে কি করতে পারবে?

বিপিন হাসিয়া বলিল—কিন্তু তুমিই ত বল মা, মন না মতি, যদি বিগড়ে যায়।..... আমরা ত বেশ আছি মা, আর কোনো উৎপাত জুটিয়ো না।

—না না, তা কি হয়, যখনকার যা তখন সেটি নইলে মানাবে কেন? মায়ের খোকা হয়েই কি চিরকাল থাকবি! তুই বিয়ে করতে চাসনে, লোকে বলে—আহা মা নেই, কে বা গা'করে বিয়ের জোগাড় করবে? মা যদি থাকত.....এসব কথা শুনলে কি আমার কষ্ট হয় না। তুই-ই বল ত।

—এতে আর কষ্ট কি মা? তুমিও জান যে তুমিই আমার মা, আমিও জানি যে তুমিই আমার মা। তবে যার যা খুসি বলুক না?

—না না লোকনিন্দে বড় ভয়ানক, স্বয়ং রামচন্দ্র ভগবান হয়ে সতীলক্ষ্মী সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন।.....তুই এই বিয়ের মত দে বাবা, লক্ষ্মীটি।

—না মা, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তোমাদের যেখানে পছন্দ হবে আমার সেখানে হবে না, আর আমার যেখানে হবে তোমাদের সেখানে হবে না। তাইত বলছিলাম যে এমন অশুভ বিয়ের কথাটা না তোলাই ভালো। সবাই ত বিয়ে করে, আমি না হয় নাই করলাম।

গিন্নি বড় সাধে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া—যা খুসি তাই কর; আমি তোর কোনো কথার মধ্যে যদি থাকি। বলব ওঁয়াকে, তিনি যা ভালো বোঝেন তা করবেন।—বলিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নিধিরাম খানসামা এক বস্তা সেমিজ ও বডিস আনিয়া উপস্থিত হইল।

গিন্নি বলিলেন—ওতে কিরে?

বিপিন বলিল—এই সব সেমিজ তৈরি করে আনিয়েছি মা। এক-একজনের বারোটা করে; যতবার কাপড় ছাড়বে ততবার সেমিজও ছাড়বে; কাচা সেমিজ পরলে ত আর কোনো দোষ থাকবে না?

—এইসব সেলাই-করা কাপড় পরে ঠাকুর দেবতার কাজ করবে? তুই কি সবাইকে মালতী পেয়েছিস নাকি? সেই শতেকখোয়ারি এসেই ত তোর মাথা বিগড়ে দিয়েছে। তুই কেন বিয়ে করতে চাচ্ছিসনে এখন আমি বুঝতে পারছি। যাই দিকিন একবার ছোট বৌয়ের কাছে; ঝাঁটা মেরে শতেকখোয়ারিদের বাড়ীর বার না করে ত আমি জল খাবনা।

গিন্নি ক্রোধভরে উঠিলেন। বিপিন কাতর দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—মা, আশ্রিত নিরাশ্রয়কে অপমান করায় পাপ হয়। তাদের যদি তুমি বাড়ী থেকে তাড়াও, তোমার অকল্যাণ হবে; তাদের সঙ্গে আমিও তোমার বাড়ী থেকে চলে যাব।

গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিলেন—কী! তুই আমাকে গাল দিলি আমার পাপ হবে, আমার অকল্যাণ হবে! আমি তোর মা হলে কখনো এমন কথা মুখে আনতে পারতিসনে!

ইহার উত্তরে বিপিন কোনো কথা বলিতে পারিল না। শুধু অশ্রুবিগলিত নয়নে গিন্নির দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে ডাকিল—মা!

গিন্নি সে আহ্বানের অর্থ বুঝিলেন না; বিপিনের অশ্রুম্লান মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না। তিনি নিতান্ত বিরাগভরে চলিয়া গেলেন।

ভাবপ্রবণ ও আবেগশীল বিপিনের অভিমানী কোমল অন্তর মাতার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে সোফার উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সকল তিরস্কার অগ্রাহ্য করিতে পারে কিন্তু তাহার মাতা যে তাহার ভালোবাসা ও ভক্তির প্রতি সন্দেহের আঘাত দিয়া গেলেন ইহা মিথ্যা বলিয়াই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মনে হইল এতক্ষণ হয়ত মা খুড়িমা ও মালতীকে না জানি কত লাঞ্ছনা করিতেছেন। বিপিন তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া খুড়িমার ঘরের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিপিন যাইবার পূর্ব্বেই গিন্নি গিয়া খুড়িমাকে তর্জ্জন করিয়া শুধু "ছোটবৌ,

বোনঝিকে নিয়ে এ বাড়ীতে থাকা তোমার আর পোষাবে না। তোমরা আপনার আপনার জায়গা দেখ।”—বলিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন। খুড়িমা কারণ জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পান নাই।

বিপিন যখন গেল তখন খুড়িমা ও মালতী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। বিপিনকে দেখিয়া খুড়িমার দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মালতীও নতমুখে অশ্রুদমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপিনেরও সদ্যসংরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইবার জন্য বিপিনের মনের মধ্যে জড়ো হইয়া চোখ দিয়া বাহির হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল।

সকলেই নির্বাক। পরের গলগ্রহ যাহারা তাহাদিগকে বিদায় হইবার আদেশ হইয়াছে, ইহাতে কাহারো বিরুদ্ধে অভিযোগের ত কিছু নাই। সুতরাং খুড়িমার বিপিনকে বলিবার কিছু ছিল না। মা কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহা না জানিয়া বিপিনেরও কিছু বলা শক্ত ঠেকিতেছিল। বিপিন অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া বলিল—খুড়িমা, মা কি কিছু বলে গেলেন?

—হাঁ বাবা, আমাদের অন্যত্র যেতে বলে গেলেন '.....আমরা কাশী যাব বাবা, শুনেছি মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে কারো অন্নের অভাব হয় না।

এবার আর বিপিনের চোখের জল বাধা মানিল না। গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপিন তাড়াতাড়ি রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল—খুড়িমা, তুমি ঢের সয়েছ; আরও এক মাস আমার জন্যে সহ্য কর। এই একমাসে হয় তোমার জমিদারী তোমায় আমি ফিরিয়ে দেওয়াব, নয়ত তোমাদের সঙ্গে আমিও এ বাড়ী ছেড়ে বেরুব।

খুড়িমা অশ্রু মুছিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—ছি বাবা, আমার জন্যে তুমি বাপ মার সঙ্গে কোনো রকম বিরোধ করলে আমি সুখী হব না। লক্ষ্মী বাবা আমার, বাপ মাকে তুমি অসুখী কোরো না। আমার জন্যে তুমি ঢের করেছ। ভগবান এই হতভাগীর ওপর বিরূপ; তাকে রক্ষা করতে গিয়ে বাপমার অসন্তোষ ডেকে এনো না; আমার জন্যে তোমার এতটুকু অকল্যাণ হলে আমার বুকে শেলের মতো বাজবে যে বাবা।

বিপিন এবার দৃঢ়স্বরে বলিল—এ ত তোমার জন্যে কিছু নয় খুড়িমা, এ ধর্ম্মের জন্যে আমি করছি। এতে কাউকে দুঃখ সইতে হয় সইতে হবে! তুমি একটি মাস আর চুপ করে থাক; তারপর দরকার হয় আমিই তোমায় কাশীতে নিয়ে যাব। লেখা পড়া শিখেছি খুড়িমা, তোমাদের দুজনকে রোজগার করে খাওয়াতে পারব, সে ভরসা আছে। বাবা যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে; বাবাকে আমি কখনো ঋণী রাখতে পারব না।

খুড়িমার চিত্ত স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবানের কাছে বিপিনের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। কোনো কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।

বিপিনের বীরের মতো দৃঢ়তা ও নারীর মতো কোমলতা দেখিয়া মালতীরও অন্তর প্রীতিসরস কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মালতী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরব ভাষায় বিপিনকে অভিনন্দন করিল।

(২৩)

গিন্নি কর্ত্তাকে পুত্রের প্রতিকূলতার সংবাদ দিবার জন্য যখন অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ঘর আর বাহির করিতেছেন এবং কর্ত্তাকে খাইতে আসিবার জন্য তাগাদা করিয়া যখন ডাকিতে লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন, ঠিক তখনই বিপিনের আনন্দ-চঞ্চল চটিজুতার ফটর ফটর শব্দ তাঁহার কানে গেল। বিপিন ডাকিল—মা!

গিন্নি কোন উত্তর না দিয়া মুখখানি তোলো হাঁড়ির মতো ফুলাইয়া জানালার ধারে পুকুরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিন ঘরে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গিন্নি বিরক্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, আমি পাশ হয়েছি। খুব ভালো পাশ হয়েছি।

গিন্নির মনের মেঘ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া গেল। মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অভিমানের উপর মাতৃত্ব প্রবল হইয়া উঠিল। পুত্রের সকল অনাচার আতিশয্য তিনি ভুলিয়া গেলেন, উদ্যত অভিযোগ শান্ত হইয়া গেল, চারিদিক আবার প্রশান্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ওলো ও ক্ষ্যামা, সক্কলকে ডেকে বল আমার বিপিন পাশ হয়েছে। ও রোহিণী, রোহিণী, দুবেজিকে দশ টাকার বাতাসা আর পঁচিশ টাকার নাড়ু আনিয়ে দিতে বল; ঠাকুরের ভোগ দিয়ে হরির লুট হবে। ওলো ও হাবার মা, ঠাকুর ঘরে গিয়ে গোবর্দ্ধনকে বলগে যেন চলে না যায়...আজকে ঠাকুরের ডবল ভোগ দিতে হবে।

বাড়ীময় আনন্দ-কলরবের হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সবাই চেঁচায়, সবাই সবাইকে খবর দেয়, সবাই একটা-না-একটা ফরমাস করে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, গোবরা পূজো করলে আমার কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে।

—চুপ চুপ! অমন কথা বলতে আছে! বেরাম্ভন!...

—অমন ব্রাহ্মণের চেয়ে অটলামুচি ঢের ভালো মা। গোবরা আবার ব্রাহ্মণ!

—চুপ চুপ! শুনতে পেলে ওর মনে কষ্ট হবে। আজকে আনন্দের দিনে কারো মনে কষ্ট দিতে নেই।

—তবে মা, আজকে বাবাকে বল ভট্চায্যি জেঠা এসে পূজো করুন; খুড়িমাকে ঠাকুরঘরের ভার ফিরিয়ে দাও। উৎসব যদি করতে হয়, এমনি করে প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ দিয়ে উৎসব আরম্ভ হোক। সকল দিককার কালি ধুয়ে মুছে দাও।

গিন্নি বলিলেন—ওরে কে আছিস যা ত ছোট-বৌকে ডেকে আন ত। মালতীকেও ডেকে আনিস।

বিপিন বলিল—খুড়িমাকে আমি ডেকে আনছি মা।

বিপিন খুড়িমাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু খুড়িমা বিপিনের পাশের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া আপনিই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলের আনন্দের মধ্যে নিজেরও একটু স্থান করিয়া লইবার সঙ্কোচকুণ্ঠিত চেষ্টা করিতেছিলেন। বিপিন ঘরে গিয়া দেখিল, মালতী একাকিনী মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া আছে। তখন তাহার অবগুণ্ঠন নাই, বেশবাস শ্লথ, দীর্ঘ কেশরাশি মেঝের উপর লুণ্ঠিত। এই অনাবরণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ লজ্জিত বিপিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনাকে সম্বৃত আবৃত করিল।

এক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। লজ্জিত স্মিত হাস্যে মালতীর দিকে চাহিয়া বিপিন বলিল—খুড়িমা কোথায়?

মালতী চকিতে একবার বিপিনের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া নতমুখে ধীরস্বরে বলিল—ঐদিকে গেছেন।

—আমি পাশ হয়েছি।

—শুনেছি।

বিপিন বলিল—মা তোমাকে ডাকছেন, তুমি এস।

মালতী স্মিতপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

বিপিন আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া ঘর হইতে বিদায় লইতে ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় নবকিশোর ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল—বিপিন, বিপিন শুনেছ, কি অত্যাচার হয়ে গেছে!

নবকিশোরের রোষঘূর্ণিত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসা, উদ্ধত ভাব দেখিয়া মালতী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল; বিপিনের মুখ শুকাইয়া গেল। বিপিন শুষ্ক ওষ্ঠ জিহ্বা দ্বারা ভিজাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

নবকিশোর তেমনি আকাশভেদী রবে বলিল—তোমার কাকা, কাকা!...নিবারণ মুখুয্যের কথা শুনে কালীতারাকে পথে তাড়িয়ে দিয়েছে!

বিপিন স্তম্ভিত নির্বাক। নবকিশোর তেমনিভাবেই বলিতে লাগিল—ভাবছ কি? তোমার জ্ঞাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। কালীতারার প্রসববেদনা হয়েছে শুনে নিবারণ মুখুয্যে গিয়ে মেজবাবুকে বল্লে—'ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে না দিলে তোমাকে আমরা একঘরে করব'। আর ছোটবাবুও অমনি সুবোধ শিশুর মতন সেই অসহায়াকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দিলেন। এই সব ধর্ম্ম! এঁরা সব সমাজপতি! ধন্য তোমাদের নিবারণের ভয়, যে, সে অন্যায় করতে বললেও প্রতিবাদ করবার শক্তি কারো নেই।.....নাও, বিলম্ব করবার সময় নেই, তুমি কালীতারাকে খুঁজে নিয়ে এস, নিজের বাড়ীতে আনতে সাহস না হয় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেয়ো। আমাকে এখুনি নবিনগরে যেতে হচ্ছে, সেখানকার পুলিশ-দারোগা স্বদেশী পাঠশালায় রাজদ্রোহ শিক্ষা দেওয়া হয়, বোমা তৈরি করা হয় বলে পাঠশালা থেকে আসমতকে ধরে নিয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে পাঠশালায় ছেলে পাঠানো বন্ধ করেছে; আমায় একবার সেখানে এখনই যেতে হচ্ছে। কালীতারার ভার তোমার ওপর, দেখো যেন কর্ত্তব্য অবহেলা কোরো না।

নবকিশোর বিপিনের হাত ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। মালতী স্তম্ভিত নির্বাক একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

মালতী কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীময় একটা কি যেন অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি চকিত, বাক্য স্তব্ধ। আনন্দ-উৎসবের সূত্রপাতেই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। রাঁধুনি রাঁধিতে রাঁধিতে রান্না নামাইয়া বসিয়া আছে; যে তরকারি কুটতেছিল সে বঁটী কাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; জয়া পূজার জোগাড় করিতে করিতে চন্দনমাখা হাতেই দৌড়িয়া আসিয়া গিন্নিকে বলিতেছে—বৌ বৌ, গোবর্দ্ধন ত পূজো করতে করতে কিশোরের মুখে বাপের নাম শুনেই দৌড় দিয়েছে, ঠাকুর টাটের ওপর বসানোই আছেন! পূজো করবার, ভোগ দেবার কি হবে?

গিন্নি শুনিয়াও কাঠের মতন শক্ত হইয়া নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সমস্ত লোকের প্রাণচেষ্টা যেন মন্ত্রপ্রভাবে সংরুদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে!

বিনিও আজ অনর্গল বকিতেছে না, সে একলাটি এককোণে পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার রং-ওঠা, গা-ফাটা কাঠের পুতুলটিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে, কিন্তু ঘুমপাড়ানিয়া গান আজ মুখে সরিতেছে না।

বিনোদও আজ অকারণে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে না। সেও বিনির কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

মালতী আসিয়া বিনিকে কোলে করিল। বিনি তাহার গলা জড়াইয়া চুপিচুপি বলিল—মাতী দিদি, তুপ তুপ, দাদাঠাকুল আগ কলেছে, মালবে।

মালতী বিনোদের হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চল তোমরা আমার ঘরে, আমরা খেলা করিগে।

বিনি জোর করিয়া মালতীর গলা জড়াইয়া তাহাকে গমনে বাধা দিয়া বলিল—না না, মাতী দিদি, আবাল দাদাঠাকুল আছবে।

মালতী তাহাদের লইয়া সেইখানেই বসিল। গিন্নি অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুঁই-কুমীর

পশু জগতে যেমন এক শ্রেণীর জীব উদ্ভিদ খাইয়াই জীবন ধারণ করে। কীট জগতেও তেমনি এক শ্রেণীর জীবের উদ্ভিদই জীবনসম্বল। পশু জগতে যেমন অন্য একশ্রেণীর জীব কেবল মাংস খাইতে ভালবাসে তেমনি কীট-রাজ্যেও অন্য এক দল বিশেষ ভাবে আমিষ-ভোজী।

পশু জগতের আমিষ ভোজী জীব গুলি যেমন অত্যন্ত তৎপর ও ফন্দীবাজ কীট জগতের মাংস ভোজী জীবগণও তেমনি ধূর্ত্ত ও তৎপর। কীট-রাজ্যে মাংসভোজী অনেক শ্রেণীর কীট আছে—অদ্য যে কীটের বিষয় বলিতে যাইতেছি—তাহাকে ইংরাজীতে "The Ant-lion" বলে। বঙ্গদেশে কীট

ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণের তেমন আবশ্যকতা কোন দিন অনুভূত না হওয়ায়—কীটও পতঙ্গদের কোন নাম নাই। কেবল যেসকল কীট আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত অর্থাৎ যাহারা সব সময়ই আমাদের নজরে পড়ে তাহাদের নামকরণ আমরা করিয়া লইয়াছি—যথা গুব্‌রেপোকা গুটিপোকা মাকড়সা মশা মাছি ইত্যাদি। পর্য্যবেক্ষণের কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কীটের নামকরণ এদেশে খুব অল্প লোকেই করিয়াছেন।

ইংরাজীতে যাহাকে "The Ant-lion" বলে—বঙ্গদেশে সে কীটের অভাব খুব বেশী আছে বলিয়া ত মনে হয় না, অন্ততঃ পক্ষে এই অঞ্চলে উক্ত কীটের ছড়াছড়ি। কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া আমাদের হাতে এই কীট আসিয়া পড়ায় —আমরা ইহাদের শিকার ধরার উপায় ও প্রণালী দেখিয়া ইহাদিগের নাম দিয়াছিলাম "ভুঁই-কুমীর"। ইংরাজী গ্রন্থে পর্য্যবেক্ষণের রচনা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে উক্ত কীটের শিকার ধরার উপায় ও প্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়াই ইংরাজী পর্য্যবেক্ষক মহাশয়গণ উহার নাম "The Ant-lion" দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় বাংলায় "ভুঁইকুমীর" নামে উক্ত কীটকে অভিহিত করায় কোন দোষ হয় নাই। অবশ্য এটা খুব ঠিক যে "Ant-lion" বলিলে পিঁপড়ের সিংহ যে খুব একটা ভয়ানক হইবে এটা কখনই কেহ অনুমান করিবেন না। পক্ষান্তরে "ভুঁই-কুমীর" বলিলে কীটের ক্ষুদ্রায়তনের প্রতি কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ "ভুঁই-কুমীর" একটা বৃহৎ কোন স্থল জন্তু কল্পনা করা অসম্ভব নহে। সুতরাং "ভুঁই-কুমীর" না বলিয়া "কীট-কুম্ভীর বা "কীট-সিংহ" বলা চলে। যাহা হউক এটা একটা নাম। খুব বেশী যুক্তির মধ্য দিয়া নামকরণ না হইলে যে বিশেষ ক্ষতি আছে তাহা বোধ হয় না। নামের পরেই নামের পরিচয় পাইলে নামের প্রতি আর তেমন নজর থাকে না।

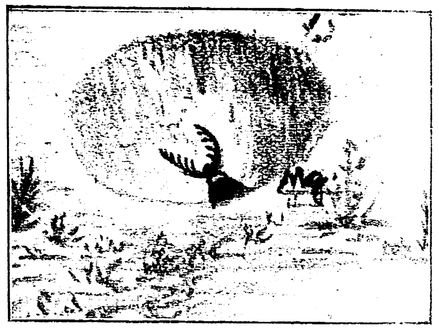

ভুঁই-কুমীর

"ভুঁই কুমীরের দেহের আয়তন খুব বৃহৎ না হইলেও তিনি যে শ্রেণীর জীবের পক্ষে কুমীর বিশেষ, সেই শ্রেণীর জীবের দেহের তুলনায় ইহাঁদের দেহ যে বড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না।

ভুঁইকুমীর এক জাতীয় ছোট কীট, অঙ্গের গড়ন অনেকটা "সিন্দুরে কীট পোকা" বা "বীরবউটির" অঙ্গের গড়নের অনুরূপ। বর্ষা ঋতুতে মাটির উপর ও ঘাসের মধ্যে "সিন্দুরে পোকা" নামে মথ্‌মলের মত পালিস সিন্দূরে বর্ণের এক জাতীয় কীটের আবির্ভাব হয়। অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেরা (ছোট বেলায় আমি নিজেও) ইহাদিগকে একটি শিশিতে ভরিয়া তন্মধ্যে কিছু ভিজা চাউল দিয়া

ছিপি দ্বারা শিশির মুখ উত্তমরূপে (পাছে কীট বাহির হইয়া যায়) বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে, পোকার গায়ের রং চাউলে লাগিয়া চাউল লাল হইয়া যায়।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কৃষকদের ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তিদের ধারণা যে এই কীট মেঘের মধ্যে জন্মলাভ করে। ক্ষেত্রে যে অনেক শস্য হইবে এই বার্ত্তা ইন্দ্রের রাজ্য হইতে ইহারা বহন করিয়া মেঘ হইতে বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ধরায় অবতরণ করে। এইজন্য যে বৎসর অতি বৃষ্টির জন্য এই কীটের সংখ্যা অধিক হয় সে বৎসর কৃষকদিগের মনে আনন্দ ধরে না। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা এই কীটকে "বীরবউটি" নাম দিয়াছেন। যাহা হউক এই কীট যে মেঘে জন্মলাভ না করিয়া মাটিতেই জন্মগ্রহণ করে আপাতত এইটুকু বলিয়া—পুনরায় আলোচ্য "ভুঁই কুমীরের কথা বলি।

কুম্ভীর জলের মধ্যে বাস করে ও জলের ভিতরেই স্বীয় বাসস্থানে নিজের শিকারকে লইয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করে—"ভুঁই-কুমীরও তেমনি বালুর অভ্যন্তরে নিজের বাসস্থানে স্বীয় শিকারকে লইয়া গিয়া উদর পূজা সমাপ্ত করে। "ভুঁই-কুমীর" বালুর মধ্যে একটি গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই গর্ত্ত ছোট ছোট পিঁপড়েদের পক্ষে ভয়ানক ও মারাত্মক।

ইহারা মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ও সাম্‌নের পায়ের সাহায্যে নীচে হইতে মুখ ক্রমাগত উপরে মাটি ছুড়িতে থাকে—এই গর্ত্তের আকার এবং গড়ন অনেকটা—কালি না পড়ে এমন একটি গোলমুখো চার পয়সা দামের দোয়াতের মুখের মত হইয়া যায়। গর্ত্তের চারি পাশের দেয়াল অত্যন্ত পালিস ও সামান্য উঁচু।

ছোট ছোট পিঁপড়ে কিম্বা ঐ রকম আয়তনের অন্য কোন কীট ভুলক্রমে একবার ঐ ভয়ঙ্কর গর্ত্তের দেয়ালের উপর উঠিয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যায়। গর্ত্তের ভিতরে বালুর মধ্যে "ভুঁই কুমীর তাহার মাথা বালুর মধ্য হইতে ঈষৎ বাহির করিয়া বসিয়া থাকে সুতরাং শীকার গর্ত্তের মধ্যে পড়িবামাত্র সে তাহাকে এক লাফে ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লয়। অনেক সময় পিঁপড়ে গর্ত্তে পড়া মাত্র জীবন রক্ষা করিবার জন্য গর্ত্তের দেয়াল বহিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, কিন্তু "ভুঁই কুমীর নীচে হইতে ক্রমাগত বালুকণা উর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করায় সে আর উপরে উঠিতে না পারিয়া জীবন হারায়। প্রদত্ত চিত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গর্ত্তের মধ্যে "ভুঁই কুমীর" চিংড়ি মাছের মত দুটি পা বাড়াইয়া শীকার ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।*

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

---

* ইংরাজ পর্য্যবেক্ষণগণ বলেন এই কীট অবশেষে জল ফড়িং জাতীয় পতঙ্গে পরিণত হয়। আমরা স্বচক্ষে এখনো তাহা দেখি নাই বলিয়া প্রবন্ধে একথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

সমুদ্রবক্ষে*

সেদিন সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠ করিলাম,—

"(বলগনী সংবাদদাতার পত্র

"২২শে জানুয়ারি

"একটা আকস্মিক ভয় অদ্য দুই বৎসর যাবৎ মৎস্যজীবিদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ক্যাপটেন জ্যাভেলের মৎস্য ধরিবার জাহাজ খানি বন্দরে প্রবেশ করিবার সময়, কি করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়া জেটীর অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আহত হইয়া শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া যায়।

"লাইফ-বোট ও লাইফ-বয়ার সহায়তায় অন্যান্য সকলে প্রাণ পাইলেও একটি বালক এবং চারিজন পুরুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এখনও পর্য্যন্ত জল-বায়ুর যেরূপ ভীষণ প্রকোপ রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ বিপদ আরও ঘটিবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে।"

এই ক্যাপটেন জ্যাভেলটি যে কে তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একি সেই ছিন্ন-হস্ত মৎস্যজীবির ভ্রাতা?

হতভাগ্যের নিজের জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া গেল এখন সে বোধ হয় সমুদ্রের লোনা জলে হাবুডুবু খাইয়া জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা করিতেছে। এই জাহাজের জাল রক্ষার জন্য তাহার ভ্রাতার হাতখানিকে ইতিপূর্ব্বে সে বলিদান দিতে সঙ্কোচ করে নাই। হা ভগবান! এ বুঝি তাহার সেই কর্ম্ম ফলেরই প্রতিশোধ! সে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ঠিক আঠার বৎসর পূর্ব্বে।

দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ জ্যাভেল তখন এক খানা জেলে-জাহাজের ক্যাপটেন ছিল। সকল প্রকার মৎস্য ধরিবার জাহাজের মধ্যে এই "জেলে-জাহাজ" শ্রেষ্ঠ; সকল প্রকার ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত। যেমন ঝড়ই হউক না কেন, এ-জাহাজ শোলাখণ্ডের ন্যায় উত্থাল সমুদ্র ঊর্ম্মির উপর নাচিয়া ফিরিত। মাথার উপর বায়ুশূন্য পাইল, নিম্নে একখানা কড়ির মত মোটা কাঠের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ একখানি জাল। সমুদ্র মধ্যে যে কোন প্রাণীই থাক্ না কেন, এ জালের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। জলমগ্ন পর্ব্বত গহ্বরের সুপ্ত প্রাণী, বালুকার উপরের রোহিত মৎস্য, তীক্ষ্ণ দাঁড়াসম্পন্ন কর্কট ও সূক্ষ্ম করাত পরিহিত গলদা প্রভৃতি নানা প্রাণীকেই জাতি ও শ্রেণী নির্ব্বিভেদে এই জালের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত।

বাতাস যখন ফুরফুরে এবং সমুদ্র যখন শান্ত সেই সময় এই জাহাজ মৎস্য ধরিতে যাত্রা করিত। জলটা তখন সেই মোটা কাঠে বাঁধা; আর দুই পাশে

* বিখ্যাত ফরাসী গল্প লেখক Guy De monpassant কর্ত্তৃক রচিত এ গল্পটি ইহার ইংরাজী অনুবাদ কর্ত্রী Mrs. Ada Galsworthyএর অনুমতি অনুসারে বাঙ্গলাতে অনূদিত।—লেখক।

চাপ রাখিবার জন্য লোহার কাঠি, দুইটী রসির সাহায্যে জাহাজের দুই পার্শ্বের দুইটি রোলারের উপর দিয়া নিম্নে নামান।

জাহাজের সম্মুখ ভাগে সমুদ্রউদ্ভিদ বিনষ্ট করিবার উপযোগী একখানা তীক্ষ্ণধার ফলক সন্নিবিষ্ট। বেগে অগ্রসর হইবার সময় ইহা তাবৎ উদ্ভিদের মূলচ্ছেদ করিত!

জ্যাভেলের সহিত চারিজন কর্ম্মচারী, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও একজন বালক ছিল। মৎস্য ধরিবার জন্য বেশ সহজ বাতাসেই সে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। শীঘ্রই কিন্তু বাতাস বেগে বহিতে লাগিল; একটা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও সে জাহাজ ফিরাইতে পারিল না, তীর বেগে জাহাজ সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল।

ইংরাজাধিকৃত তটের দিকে জাহাজ চালাইলেও উন্মত্ত সাগরউর্ম্মি জলমগ্ন শিখরে আহত হইয়া এমনি ভীমবেগে আসিয়া জাহাজে বাধা দিতেছিল যে তখন কোন বন্দরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ক্ষুদ্র জাহাজখানি সেদিকে যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া ফরাসী অধিকৃত তটের দিকে চলিতে চাহিল; কিন্তু উন্মত্ত সমুদ্র সেদিকেও জেটীর নিকট পৌঁছিতে দিল না; নিকটবর্ত্তী সকল বন্দর ফেনিল সমুদ্রের বাষ্পে অন্ধকার হইয়া গেল; একটা বিকট হুঙ্কার, প্রলয়ের বিশাল রব দিকে দিকে গর্জ্জিয়া উঠিল।

পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউগুলি একবার আকাশের দিকে তুলিয়া পরমুহূর্ত্তে পাতাল গর্ভে নামাইয়া দিতে লাগিল। এমন দুর্য্যোগেও জাহাজখানি ডুবিল না, দুইটি বন্দরের মধ্য স্থানে জোয়ারের মুখে কুটার ন্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অবশেষে তীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়া উত্থাল তরঙ্গ মুখে নৃত্য করিতে থাকিলেও ক্যাপটেন জাল নামাইতে আদেশ দিলেন।

সুবৃহৎ জালখানি নামাইবার জন্য দুই পার্শ্বে দুইজন করিয়া চারিজন লোক দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ ভারযুক্ত লৌহ সমন্বিত জালখানি নামাইয়া দিল। ভারাকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে জালখানি নামিতে লাগিল, দুই পার্শ্বের রোলারের উপর দিয়া দড়ি গুলি দ্রুত নামিতে লাগিল। এই সময় জালের একটা ঝাপটায় জাহাজখানি এক পাশ হইয়া গেল; ধারে দাঁড়াইয়া জ্যাভেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া দড়িটা ধরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারাকৃষ্ট বৃহৎ দড়ি ও রোলারের মধ্যে তাহার হাতখানি আটকাইয়া গেল। জ্যাভেলের ভ্রাতা অপর হস্তে দড়িটা তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সেই বিপুল ভারাক্রান্ত দড়ি তখন দারুণ বেগে নিম্নে নামিতে ছিল ক্ষুদ্র মানব একাকী তাহা সরাইতে পারিল না।

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। সকলে মিলিয়া সেই কাছির তল হইতে তাহার হস্ত মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না!

একজন কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিল,—"কেটে ফেলতে হবে।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানি দীর্ঘ ধারাল ছোরা বাহির করিল; সে অস্ত্রের একটী আঘাতেই জ্যাভেলের ভ্রাতার হাতখানি কাটিয়া যাইতে পারিত।

কাছিটা কাটিয়া দিলে জাল থানা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। জাল ডুবিয়া গেলে অনেকগুলি টাকায় হাত পড়িবে—প্রায় পোনের শ' ফ্রাঙ্ক। সেটা জ্যাভেলের সম্পত্তি, সে এটা ছাড়িতে চাহিল না। মর্ম্মাহত জ্যাভেল বলিল,—"না, কেটনা, দাঁড়াও। আমি জাহাজের মুখ হাওয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।" ছুটিয়া গিয়া সে হালের হাতলটা ঘুরাইয়া দিল; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। ভীষণ বায়ু বেগে পাগলের মত জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছিল সে ফিরিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না; তাহা ছাড়া জাল ফেলায় জাহাজের পাশ ফিরিবার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

জ্যাভেলের ভ্রাতা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইতেছিল না। জ্যাভেলের প্রাণে ভয় হইতেছিল পাছে তাহার কর্ম্মচারিরা জালের দড়ি কাটিয়া ফেলে! কাজেই সে জাহাজ ফিরাইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—"দাঁড়াও দাঁড়াও দড়ি কেটনা, জাহাজ এখনি নঙ্গর ক'রছি।"

তখনই নঙ্গর ফেলিয়া দেওয়া হইল; নঙ্গরের দীর্ঘ শৃঙ্খল ভীষণ শব্দে সমুদ্র গর্ভে নামিয়া গেল। এইবার দড়ি তুলিবার চাকাটা এক পাক ঘুরাইয়া দিয়া দড়ির অধোগতি নিবৃত্ত করা হইল; এতক্ষণ পরে একজন সহকারী চেষ্টা করিয়া জ্যাভেলের ভ্রাতার হস্তটা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার জামার হাতাটা রক্তে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

জামার হাতাটা গুটাইয়া দিতেই এক ভয়াবহ দৃশ্য দৃষ্ট হইল; বাহুর মাংস দড়িতে পিশিয়া পিণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়া ছিল এবং তাহা হইতে উৎসের ন্যায় রক্তধারা ছুটিতেছিল। লোকটা হস্তের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এ ত, জন্মের মত গেছে!" রক্তের স্রোত ডেকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিল,—"হাতটার শিরের মুখ গুলো বেঁধে দেওয়া দরকার, নইলে ক্রমাগত রক্তস্রাব হয়ে এখুনি ও মরে যাবে যে!" এই বলিয়া সে একটা মোটা ন্যাকড়া লইয়া তাহার ক্ষতস্থানে বাঁধিতে লাগিল। শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবার পর রক্ত স্রোত ক্রমশ কম হইতে হইতে একেবারে থামিয়া গেল।

জ্যাভেলের ভ্রাতা উঠিয়া দাঁড়াইল; পার্শ্বে তাহার ভগ্ন হস্তখানি ঝুলিতেছিল; অপর হস্তে সেখানি ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; দেখিল হস্তখানি জন্মের মত গিয়াছে, ভিতরের হাড়টা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে কেবল মাংসপেশীর জন্য সেটা তখনও দেহে লিপ্ত ছিল! যন্ত্রণা পীড়িত চিন্তিত মুখে সে হাতখানি সস্নেহে

দেখিতে লাগিল। পার্শ্বে পতিত একখানা পাইলের উপর সে বসিয়া পড়িল; একজন কর্ম্মচারীর উপদেশে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নিকটের একটা বালতি হইতে জল লইয়া পুনঃপুনঃ ক্ষতস্থান সিক্ত করিতে লাগিল।

তাহার ভ্রাতা আসিয়া বলিল,—"এখানে বসে আছিস কেন, তুই নীচেয় যা।" সে দাদার কথায় তখন নিম্নতলে চলিয়া গেল বটে কিন্তু আবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডেকের উপর আসিল; নিম্নের নির্জ্জনতা তাহার ভাল লাগিল না। আর তাজা হাওয়াটাও তখন তাহার প্রয়োজন। কাজেই সে আবার পূর্ব্বস্থানে বসিয়া ক্ষতস্থানে জল ঢালিতে লাগিল।

সেদিন যথেষ্ট মৎস্য পড়িয়াছিল। জ্যাভেলের ভ্রাতার পার্শ্বেই একটা বৃহৎ শ্বেত মৎস্য পড়িয়া মৃত্যুশ্বাস টানিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে লম্ফ প্রদান করিতেছিল। সে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া ক্ষতস্থানে জল সেচন করিতে লাগিল।

জাহাজখানা বলগনির কাছাকাছি আসিবামাত্র আবার বাতাসটা নূতন উদ্যমে বহিতে আরম্ভ করিল। বাত্যাহত হইয়া উত্থাল তরঙ্গমালার উপর নৃত্য করিতে করিতে আবার উন্মত্তের ন্যায় দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য ভাবে ছুটিয়া চলিল। নৃত্যরত জাহাজের ডেকে বসিয়া বেচারা জ্যাভেলের ভ্রাতা ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। প্রভাত পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ সমান রহিল। প্রভাত হইলে ইংরাজাধিকৃত তীরভূমি দৃষ্ট হইল; তখন সমুদ্র শান্ত হইয়া আসিতেছিল কাজেই জাহাজ সে দিকে না গিয়া ফরাসী অধিকৃত তীরের দিকেই অগ্রসর হইল।

বৈকালে ক্ষতটা দেখাইবার জন্য জ্যাভেলের ভ্রাতা কয়েকজন কর্ম্মচারীকে ডাকিল। সেটা এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে তখন সেটাকে দেহের একটা অংশ বলিয়া চিনিবার উপায় ছিলনা। কর্ম্মচারীরা দেখিয়া আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিল।

একজন বলিল,—"হুঁ পচ্ ধরেছে দেখছি।

আর একজন বলিল,—"ওতে নোনা জল ঢালা উচিত।"

বলিয়া খানিকটা সমুদ্র জল আনিয়া ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দিল। রোগী লাফাইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া একবার মুখ বিকৃত করিল কিন্তু চীৎকার করিল না।

লবণের জ্বালা একটু কম পড়িলে সে ভ্রাতাকে বলিল,—"তোমার ছুরিখানা একবার দাও ত।"

জ্যাভেল ছুরিখানা বাহির করিয়া দিল।

"হাতটা ঠিক সোজা ক'রে ধর; শক্ত ক'রে ধোরো যেন ছেড়ে যায় না।"

তাহার প্রার্থনা মতই কার্য্য হইল।

এইবার সে স্বয়ংই কাটিতে লাগিল। সেই ক্ষুরের মত ধারাল ছুরি দিয়া অবিকম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে সে ছিন্ন হস্ত কাটিয়া ফেলিল। বাকি রহিল কেবল

একটা মাংস পিণ্ড। একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল,—"কেটে ফেলতেই হ'ত; তা নইলে প্রাণ নিয়ে টান প'ড়ত।"

অতঃপর সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্ষতাংশের উপর জল সেক করিতে লাগিল।

প্রভাত হইলে জ্যাভেলের ভ্রাতা ছিন্ন হস্তটা কুড়াইয়া লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সহকর্ম্মীরা আসিয়া সেটী হাতে লইয়া নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই তাহার এই ক্ষতিতে সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

জ্যাভেল বলিল,—"এইবার ওটা ফেলে দে'না, আর কেন?"

কথাটা শুনিয়া জ্যাভেলের ভ্রাতা বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল—"না, আমি থাকতে তা হবে না। ওটা যখন আমার হাত, তখন ওতে ত তোমার কোন দাবী নেই।"

সে ছিন্ন হস্তটা লইয়া জানুর মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

জ্যেষ্ঠ বলিল,—"তা ও ত' দিন দিন পচতেই থাকবে!"

এই সময় কনিষ্ঠের মনে একটা মৎলব আসিল। জাহাজ কোন দূরদেশ হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিলে ধৃতমৎস্য লবণের জারের মধ্যে রাখা হইত। ইহাতে মৎস্য পচিত না।

সে জ্যেষ্ঠকে বলিল,—"জারের ভিতর এটা রাখতে পারি?"

"হ্যাঁ, তা পার।"

তখন কয়েকজন মিলিয়া একটা মৎস্যপূর্ণ জার খালি করিয়া ফেলিল। সর্ব্বপ্রথম ছিন্ন হস্তটা রাখিয়া তাহার উপর লবণ চাপা দেওয়া হইল, তাহার পর এক এক করিয়া মৎস্যগুলি তাহার উপর রাখিয়া দিল।

একজন কর্ম্মচারী বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"আশা করি এটাও বাজারে মাছের সঙ্গে বিক্রি হ'য়ে যাবে না!"

কথাটা শুনিয়া জ্যাভেল ও তাহার ভ্রাতা ব্যতীত আর সকলেই হাসিয়া উঠিল।

তখনও ঝড় থামে নাই। পরদিনও বেলা প্রায় দশটা অবধি বলগনির কাছাকাছি জাহাজখানা ঘুরিতে লাগিল। আহত ব্যক্তি একবারের জন্যও জল ঢালা বন্ধ করে নাই। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া সে ডেকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি পদচালনা করিতেছিল তাহার ভ্রাতা কলের কাছে বসিয়া তাহাকে দেখিতেছিল ও মস্তক আন্দোলন করিতেছিল।

অবশেষে তাহারা বন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ডাক্তার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন সেটা ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতেছে। হাতটায় ব্যাণ্ডেজ করিয়া তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। রোগী কিন্তু ছিন্নহস্তটী না লইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। তখনই সে আবার জাহাজের সন্ধানে বন্দরে আসিল যে জারটিতে তাহার হস্ত রক্ষিত হইয়াছিল সে তাহাতে একটা খড়ির দাগ দিয়া রাখিয়াছিল; কাজেই এখন বিনাক্লেশে সেটাকে বাহির করিল।

তাহার সম্মুখেই জারটা খালি করিয়া ছিন্ন হস্ত বাহির করা হইল; লবণাক্ত হইয়া সেটা কুঞ্চিত হইয়া গেলেও তখনও বেশ তাজা ছিল।

তাহার পুত্র ও পত্নী বহুক্ষণ ধরিয়া সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। নখের মধ্যে যে লবণের গুঁড়া প্রবেশ করিয়াছিল ব্রুস দিয়া তাহারা সেগুলা ঝাড়িয়া ফেলিল। তাহার পর একটা ক্ষুদ্র শবাধারের মাপ লইবার জন্য ছুতারের ডাক পড়িল।

পরদিন জাহাজের নাবিকরা সেই হস্তের শোক-যাত্রা করিল। জ্যাভেল ভ্রাতৃদ্বয়ই প্রধান শোক-কারী।

গির্জ্জার পুরোহিত শবটী বহিয়া লইয়া চলিলেন।

সেই হইতে জ্যাভেলের ভ্রাতা সমুদ্র গমন বন্ধ করিল। বন্দরে একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প-শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ইহার পর কাহারো নিকট এই দুঃখের কাহিনী বলিতে হইলে উপসংহারে চুপি চুপি তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলিত,—"দাদা যদি তখন জালের মায়া ছেড়ে দড়িটা কেটে দিত তাহ'লে আর আমাকে এমন নুলো হ'য়ে থাকতে হ'ত না। কিন্তু আমার হাতের চেয়ে জালটাই দাদার কাছে বড় হ'ল।"

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তীর্থ-স্মৃতি

ভকতের হৃদিদ্বার করি উদ্ঘাটন
প্রবাহিত ভক্তিস্রোত সঞ্চিতে মনন
করিল মানব তারে, অপূর্ব্ব কৌশলে।
কবি যথা কাব্য রচে, রচনার ছলে
রেখে যায় আপনার চিত্তের সংবাদ
ক্ষণিক আনন্দ তার ক্ষণিক বিষাদ
গাঁথিয়া অক্ষর পাতে; সেইমত জানি
ভকত হৃদয় তার সুগভীর বাণী—
প্রকাশিতে নারে যাহা মানবের ভাষা
তাহারে মূরতি দিবে করেছিল আশা,—
গড়েছিল মূর্ত্তি শত অনিন্দ্য সুন্দর
প্রস্তরে খোদিত করি আপন অন্তর।
সেই হতে শত শত তীর্থ উঠে জাগি
মানব চিত্তের সেই স্মৃতি-চিহ্ন লাগি
ক্ষুধিত মানব মন; তীর্থ দরশনে
চলেছে যাত্রীর দল, নাহি রাখি মনে
অসহ পথের ক্লেশ—রোগ মৃত্যু ভয়
মানব পুণ্যের স্মৃতি হেরিবে নিশ্চয়
আশায় করিয়া ভর।
ছিল এ কামনা
হেরিব তীর্থের সাধ, তীর্থের সাধনা;
আসিনু দেখিতে তাই তার্থ বুদ্ধ-গয়া,
স্থাপিল যাহারে ভক্ত স্মরি বুদ্ধ-দয়া—
বুদ্ধের সে মহাতপ সে মহা নির্ব্বাণ
করিবে সাধকে যাহা মহাসিদ্ধি দান
রাখিতে স্মরণে তারে। সাধকের দল
লভিত হেথায় মহা সাধনার বল
আয়োজন তারি তরে, ভকতের সাধ

সাধক লভিবে মহানির্ব্বাণের স্বাদ
বুদ্ধ-স্মৃতি-চিহ্ন ধরি, তাই অভ্রভেদী
সুকঠিন প্রস্তরের বক্ষঃপট ছেদি
মন্দির সৃজন হেন ; তাই স্তরে স্তরে
বুদ্ধের অটল মূর্ত্তি গ্রথিত প্রস্তরে
নিশ্চল আসনে বসি মহাবোধিরূপ
দেখান সবারে মহা স্থিতির স্বরূপ ;
এ শুধু তাহারি ভাব বক্ষে ধরি রয়
প্রস্তর প্রস্তরই বটে—অন্য কিছু নয়।
নির্ব্বাণ-সমাধি-স্থান, হেরি স্তূপে স্তূপে
রক্ষিত সাধক-শব, প্রস্তরের বুকে
রাখিয়া স্মৃতির চিহ্ন সমাধি বিলীন
বৌদ্ধ সাধকেরা, মহা প্রস্থানের দিন।
নিদ্রিত ভিক্ষুক দল সুপ্ত বৌদ্ধ প্রাণ
হেথায় নির্ব্বাণ উর্দ্ধে জ্বলে অনির্ব্বাণ।

শ্রীহেমলতা দেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"ক্রমে আমার বাল্যসহচর বন্ধুবান্ধব একে একে সকলেই ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণবিহারীও চলিয়া গেলেন। মধ্যে, কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু শেষাশেষি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব আবার গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আমরা ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া মুখামুখী বসিয়া দুইজনে মন খুলিয়া গল্প করিতাম। যেমন একদিকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি তাঁহার হৃদয়ও স্নেহমমতায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল। যখন তাঁহার সায়েটিকা রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিত, তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারের জন্য ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়া সেই যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস ছিল না—কিন্তু পরে সাধনার বলে, বাঙ্গলা লেখাতেও সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। তিনি পরে বাঙ্গালা ভাষায় "অশোক চরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।"

জ্যোতিবাবুর বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি একটি গান রচনা করেন, তাহাতেই তাহার মনোভাব সম্যক্ ব্যক্ত হয় :—সম্ভবতঃ তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পর নিম্নলিখিত গানটি রচিত।

ইমন্—আড়াঠেকা

কি হবে এ জীবনে সেই ধন বিনে।
সঙ্গের সঙ্গী যারা, কে কোথায় চলে গেল,
ফেলিয়ে মোরে একা শূন্য ভবনে॥"

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইতি-পূর্ব্বে কয়েক বার রাঁচী আসিয়াছিলেন। বারকয়েক রাঁচী আসা যাওয়াতে রাঁচীতে বাস করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছার ফলেই তিনি রাঁচীর "শান্তিধামে" এখন বাস করিতেছেন। জীবন কথা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "এখন এই খানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম! এবং

তোমার পাঠকেরাও হয়ত হাঁপ ছাড়িয়া বলিবেন :—"রাম বল, বাঁচ্‌লাম।"

জ্যোতিবাবুর রাঁচীর বাড়ী, শান্তিধাম, সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার একটু লিখিয়াছি * সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে তাহাতে যে কয়টি কথা লেখা হয় নাই এখানে তাহাই লিখিতেছি।

প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপর জ্যোতিবাবুর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনাআপনিই নীচে একটি ভীষণ গহ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত আট জন লোক সেখানে বসিয়া শুইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাঁধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথর গুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই যেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত।



কৃষ্ণবিহারী সেন

* অল্পিখিত "সাহিত্যরথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ"—ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৯,



শান্তিধামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

দ্বিতীয়, একটি লতামণ্ডপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মণ্ডপটি যেন আঁকা। মণ্ডপটি সমতল ক্ষেত্রভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মণ্ডপের তলাটি বেশ শান্ বাঁধান'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই লতা-গাছটিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চটি আচ্ছন্ন।

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জ্জন শৈলাবাসে সত্যেন্দ্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে দুইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এই-বার দেখিলাম। তাহার হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর-বাচ্ছাটি রূপীর স্তন পান করে, এবং দিন রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্চাটিকে লইতে গেলে রূপী এক-বারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছে তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যখন যায়, তখনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই



বাচ্ছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন-দুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্‌কারি দিত, অমনি সে একবারে সচকিত নেত্রে চাহিয়া চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে আবার ফিরিয়াছে! হায়রে মাতৃস্নেহ! আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃস্নেহের নিকট আজ সে জাতিগত পার্থক্য কোথায়? শান্তিধামে, সবই শান্ত, সবই পবিত্র!

এই জন্যই বুঝি শান্তিধামের দর্শক-সংখ্যা এত বেশী! প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা সাড়ে দশটা ও অপরাহ্নে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দর্শকের ভিড়। সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু সাহেবেরা যখন দেখিতে আসেন, তখন নীচে হইতে আগে অনুমতি লইয়া তবে উপরে উঠেন। যদিও এরূপ অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহারাও জানেন।—তথাপি একটা ভদ্রতা বা সভ্যতাসূচক কায়দার জন্য তাঁহারা বিনা অনুমতিতে কখনও উপরে আসেন না।

এই স্থানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। জ্যোতিবাবু একদিন * আমায় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "আজ-কালকার স্কুলের পড়ান'তে আমার আস্থা নাই। যে রকমে ছেলেদিগকে পড়ান হয় এ যেন অনেকটা বেগার-ঠেলা কাজ, না করিলে নয় এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছেলের কি-পড়িতে ইচ্ছা, কিসে অনিচ্ছা, কোন্‌টা তাহারা শীঘ্র শিখিবে, কোন্‌টা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তার কোন' বিচারই করা হয় না। পরীক্ষা যাহা হয় সে শুধু বানান্ ও মানে মুখস্থ, এবং ধারাপাতের আবৃত্তি। ছেলের কি ক্ষমতা বা কোন্ বিষয়টি কোন্ ছেলে শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে—এই অত্যন্ত দরকারী বিষয়টাকে একবারে উপেক্ষা করা হয়। ছেলেদের জন্য যে একটা Routine করে দেওয়া আছে, চোখ বুজে সেই রুটিনেরই তারা অনুসরণ করে।

"আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রামায়ণ মহাভারতে যতটা হয় এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আজকাল শিশুপাঠ্য নামে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক শিশুর উপযোগী কিনা একটা চিন্তার বিষয়। শিশুর নমনীয় হৃদয়খানিকে ভাবের, ধর্ম্মের, কল্পনার, জ্ঞানলিপ্সার, ধারণার উপযোগী বিষয় সে সব পুস্তকে একত্র আছে কিনা সন্দেহ। এই হিসাবে, শিশুদের উপযোগী করিয়া রচিত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অমূল্য।"

পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র নাথ এই কথা স্বীকার করিয়া জ্যোতিবাবুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীর অনুমোদন করিলেন।

* ৪টা আগষ্ট, রবিবার ১৯১৫

জ্যোতিবাবু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, আমি গতবার দেখিয়া গিয়াছিলাম। শিক্ষাপ্রণালীটি একটু অদ্ভুতপ্রকারের বলিয়া তাহার পরিচয়ও একটু এই প্রসঙ্গে দিব।

শিশু দুইটি গান শেখে, পিয়ানো শেখে, সর্ব্বদা "দাদাভাই"-এর সহিত গল্প করে—আবার পড়ে এবং অঙ্ক কষে। দুইজনের বয়সই আট বৎসরের ভিতর।

জ্যোতিবাবু সুবীরেন্দ্র ও মঞ্জুর দুই খানি খাতা বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ছেলেদের মত কয়েকটি কবিতা ও গান; প্রথমতঃ সেই কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে হয়, তারপর সেইটি পিয়ানোতে বাজাইতে হয়—তাহারও স্বরলিপি আছে। আবার যেটি যেমন কবিতা, তার পাশে তদনুরূপ একটি চিত্রও আছে। একাধারে ভাব, ছন্দ ও রূপশিক্ষার প্রণালী আমার এই নূতন দেখা। চিত্রগুলি কোনটি কালিতে, কোন'টি পেন্সিলে, কোনটি বা দুই তিন রঙের কালিতে। বলা বাহুল্য এগুলি সবই জ্যোতিবাবুর হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্র সম্পদের অভাব কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে তাহারও একটু পরিচয় এইখানে দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন সেই "দেশ দেশ" গানটা গাওত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই বোনে গায়িতে লাগিল :—

নিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই আমাদের দেশ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা ঢালা বেশ,
গাছ গাছালি ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই আমাদের দেশ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ
—ভাই আমাদের দেশ॥

সুবীর অতি নিপুণভাবে পিয়ানো বাজাইয়া গাইতে লাগিল, ছোট্ট বোন মঞ্জু দাদাটির পাশে দাঁড়াইয়া অতি চমৎকার কোরাসে গাইল। এই গানটির পাশেই ভারতবর্ষের মানচিত্র। এই এক গানেই ছেলেদের মনে স্বদেশের রূপ, ও স্বদেশের ভক্তি যে কিরূপ পরিস্ফুট হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

এর পর জ্যোতি বাবু বলিলেন, "সেই থিয়েটারটা কর' ত? অমনি একটা ত্রিপদ টেবিলের নীচে মঞ্জু বুড়ী হইয়া বসিল, আর জ্যোতিবাবু পিয়ানোতে বসিলেন, সুবীর হাত ছানিয়া তপন আহ্বান করিতে করিতে গাইতে লাগিল :—

"আয় রদ্দুর ছেনে, ছাগল দিব মেনে,
ছাগ্‌লির মা' পাগ্‌লি, ক'খান্ কাপড় পেলি?"

মঞ্জু গাইল,



সুবীর ও তাহার ভগিনীদ্বয়

"ছ'খান্ কাপড় পেলুম্, ছ' বৌকে দিলুম্ (ছয়টি পুতুল ছয়টি বৌ) (কাঁপিতে কাঁপিতে) আপনি মরি জাড়ে কলা গাছের আড়ে।"

সুবীর গাইল,

"কলা পরে টুপ্ টাপ্, বুড়ী খায় গুপ্ গাপ্।"

তার পর, দুইজনেই হাসিয়া গড়াগড়ী!

খাতাতেও এমনি একটি ছবি আছে। বুড়ী কলা গাছের নীচে উপবিষ্ট। কলা পড়িতেছে পাশে ছয়টি বৌ দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটি বালক হাত ছানিয়া রৌদ্র আহ্বান করিতেছে।

এইরূপ প্রায় ২০।২৫টি কবিতা পড়া হইয়া গিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নিজে আবাল্য সঙ্গীতানুরাগী এই জন্য সঙ্গীতকেও তিনি শিশুদের শিক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়া কৌশলে, হাসি-তামাশা গল্প-নাচের মধ্য দিয়া অধ্যাপনার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। জ্যোতিবাবুর ছাত্রেরা অল্প দিনের মধ্যে অনেকটা শিখিয়াছে।

বেশ বুঝা গেল, শিক্ষাশালায় শুধু বেত ও নীরস বানান মুখস্থের স্থান একটুও নাই।

(সমাপ্ত)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তীর্থ দর্শন

স্থান মধুপুর। শরৎকাল, বর্ষার পর শুভ্রস্বচ্ছ মেঘ, রাত্রে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলো, শেফালি ফুলে গাছতলা ছেয়ে গেছে, মধুর গন্ধে মন মাতিয়ে তুলছে, প্রকৃতির শোভা দেখে যেন আর আশা মেটে না, এই সময় আমাদের পরামর্শ হোল—আরো সুদূর পশ্চিমে গিয়ে তীর্থ দর্শন করে আসা যাক। আমরা অনেকগুলি লোক একত্র হয়ে দল বেঁধে যাত্রা করলেম। মধুপুর থেকে রাত ১০টায় ট্রেণে উঠতে হয়। গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে দেখলেম, বাইরে ঘোর অন্ধকার, আকাশ নক্ষত্রে ছেয়ে রয়েছে, জোনাকী পোকা দপ দপ করে জ্বলছে আর নিবছে, ঝিল্লি ঝিঁঝিঁরব করছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির যে কত রকম কারিগিরি! আর ইংরাজদেরই বা কি রকম বুদ্ধিকৌশল, কত দূরের জায়গা কেমন এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছে। সম্মুখের গতিশীল দৃশ্য দেখতে দেখতে কেমন যে মুগ্ধ হয়ে পড়লেম—সে রাত্রে আর ঘুম হোলনা। সূর্য্য যখন আস্তে আস্তে উদয়াচলে উঠলেন—তখন আমরা আথরাসে এসে উপস্থিত হলেম। এই খান থেকে গাড়ী বদল করে মথুরায় যেতে হয়।

আমাদের একজন আত্মীয় আমাদের জন্য মথুরার একজন শেঠের বাড়ী ঠিক করে রেখেছিলেন, মথুরায় পৌঁছে আমরা সেই বাড়িতে উঠলেম। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আসবাব পত্রেরও কোন অভাব নেই, খাবার জিনিসও আমাদের তারা দিয়ে গেল—বিদেশে এসে আর কোন বিষয়েই ভাবতে হোলনা।

ফুলসজ্জায় দেখলুম বাড়ীর বাগানটি ভরপুর, গন্ধে দিক যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল! সেদিনটা আমরা বাগানে ঘুরেই কাটিয়ে দিলেম। পরদিন মন্দির দর্শনে বার হওয়া গেল।

কংশটিলা যেখানে কংসকে কৃষ্ণ বধ করেছিলেন অনেকটা উঁচু; একটা ছোট পাহাড়ের মত স্থান; তার উপরে একটি ছোট ঘর; সেই ঘরে কংস চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন আর কৃষ্ণ বলরাম পাশে তীর ধনুক নিয়ে কংসের প্রতি লক্ষ্য করছেন। সব মূর্ত্তিই মাটির নির্ম্মিত।

ফেরবার সময় রাস্তায় এসে দেখা গেল মাটির নীচে থেকে আগেকার পুরাতন দ্রব্য সব খুঁড়ে বার করেছে। দেখবার জন্য কৌতূহল হতে লাগলো কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বলে দেখা হলো না।

একটা বসতির পাশ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ চীৎকার উঠলো "বাঙ্গালী আয়া হ্যায়।" আর অমনি যে যেখানে ঘরের কাজে রত ছিল—সব ফেলে "ভিক্ষা দাও" বলে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো, তার মধ্যে ছোট ছেলে কম নয়। আমরা অবশ্য ভিক্ষা দিলেম—তারা সন্তুষ্ট হোল কিনা জানিনা। তাদের চীৎকার ত নিবারণ হোল না। এই রকম ছোট ছেলেদের ভিক্ষা করতে দেখলে বড়

কষ্ট হয়। ভবিষ্যতে ওদের কি দশা হবে! উপার্জ্জনে আর মন দেবে না।

একদিন শেঠেদের একখানা বজরা করে যমুনার উপর আরতি দেখতে গেলেম। বড় প্রদীপের ঝাড় জেলে যখন আরতি আরম্ভ হোল তখন তার ছায়া জলে পড়ে যেন যমুনায় আলোর বিজুলি খেলতে লাগলো! সেদিন আবার রামলীলা, নৌকা করে ছোট দুটি ছেলেকে রাম লক্ষ্মণ ও একটি মেয়েকে সীতা সাজিয়ে জরির কাপড় পরিয়ে বনবাসে দিতে চলেছে। সাজসজ্জায় তাদের সুন্দর দেখাচ্ছিল।

যমুনায় কি কচ্ছপ! সিঁড়ির কাছে ছোলা ভাজা খাবার জন্য এসে তারা যেন জল ঢেকে ফেল্লে! জলে যেন কচ্ছপের মেলা লেগে গেল!

মথুরার রাস্তায় যখনই বার হওয়া যেত—দেখতে পেতেম, ছোট বাছুরগুলির কারু ঘাড়ের উপর কারু পিঠের উপর খুর সমেত পা ঝুলচে। এই রকম একটা আধটা নয়—প্রতি রাস্তাতেই প্রায় দেখা যেত। পয়সা উপার্জ্জনের বেশ একটা উপায় বটে!

একটি সুন্দর ভাব ওদেশে দেখে বড় মোহিত হয়েছি। পশু পক্ষী মানুষে এখানে এমন সদ্ভাব! ষাঁড় গরু কেমন রাস্তায় খেলা করছে, বানরের ত কথাই নাই, পালে পালে হুপহাপ করে এ বাড়ী ও বাড়ী লাফিয়ে বেড়াচ্চে, কারও কোন অনিষ্ট করতে দেখি নাই, খাবার পেলেই সন্তুষ্ট। ময়ুর ময়ূরী মনের আনন্দে মাঠে মাঠে নৃত্য করে, মানুষরা তাদের প্রতি কোনই অত্যাচার করে না।

মথুরা থেকে বৃন্দাবন বেশীদূর নয়। সকালবেলা গাড়ী করে যেতে দু তিন ঘণ্টা লাগে মাত্র; এখানেও শেঠেদের একটি বাড়ীতে গিয়ে আমরা আড্ডা করলেম। বামুন ঠাকুরকে আমাদের রান্নার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আমরা সকালেই দেবালয় দেখতে বাহির হলেম। বাড়ীর কাছেই একটি মন্দির সেইখানে গিয়ে দেখা গেল একটি ঘরে ছোট একটি সিংহাসনে কৃষ্ণরাধিকা রয়েচেন,—একজন টানা পাখার বাতাস করছে। দালানটি চকচকে মার্ব্বল পাথরের। যাঁরা মন্দির করেছেন সেই পাথরের গায়ে তাদের মুখ আঁকা রয়েছে। এক-জনের একটী চোখ কানা, সেই ছিল ম্যানেজার! তার মনিব নাকি বড় বাড়ী করতে হুকুম দিয়েছিল কিন্তু সে অল্প টাকা খরচ করে ছোট বাড়ী করে দিয়ে কানা হয়ে গিয়েছে। এই মন্দিরের আসবাব অনেক, বড় বড় রঙ্গিন ঝাড়, দেওয়ালগিরী, তার সঙ্গে অল্প দামের কতকগুলি ইংরাজি মেমদেরও ছবি!

মন্দির দেখে আমরা যমুনায় স্নান করতে গেলেম। এখানে কচ্ছপ তেমন বেশী নেই। রোদ্দুরে ঘুরে নদীতে অবগাহন স্নান করে কি যে আরাম পাওয়া গেল তা আর বলবার কথা নয়; মনে হলো এই আরাম থেকেই 'মা গঙ্গা' এই শব্দ মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে যায়।

স্নান আহার করে বিকেলে আবার আমরা মন্দির দেখতে বাহির হলেম। শেঠদের একটি মন্দিরের সম্মুখে, উঁচু থামের মত একটি সোনার গাছ; ভিতরে কৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে একদিকে রাধিকা একদিকে

বিশাখা। যত মূর্ত্তি দেখা গেল সব ছোট ছোট, কেবল লালাবাবুর লালাজি ঠাকুরটি বেশ বড়; যেন ছোটো একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। আমাদের যেতে একটু বিলম্ব হয়েছিল তখন ঠাকুরের সব ভাল সাজ খুলে তাঁকে একখানি ধুতি চাদর পরিয়ে শয়ন করাতে নিয়ে যাচ্ছিল, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেন ছোট একটি ছেলে ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার পূজারী বল্লেন তোমাদের খুব সৌভাগ্য এ রকম শয়নের বেশ দেখলে, এ বেশ সর্ব্বদা দেখা যায় না।

বৃন্দাবনের নিধুবন এখন আর কুঞ্জবন নেই, এখানে কেবল বানরেরই রাজত্ব। আমরা ছোলা ভাজা নিয়ে তাদের ছড়িয়ে দিতে লাগলেম, তবে তারা পথ করে দিলে। নিধুবনে এখন কেবল বড় বড় কতকগুলা গাছ পড়ে আছে ফুল ফল কিছুই নাই; তার শুকনা পচা পাতাতে বনভূমি আচ্ছন্ন।

একটি মন্দিরে দেখলেম রাধিকা মান করে আছেন, কৃষ্ণ পায়ে ধরে মান ভঞ্জন করছেন; বাইরে দুটা পচা জলের কুণ্ড রয়েছে। একটা বিশাখা কুণ্ড একটা রাধিকা কুণ্ড। রাধিকা ও বিশাখার একদিন রাত্রে জল তৃষ্ণা পাওয়াতে কৃষ্ণকে বল্‌লেন আমরা জল খাব বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, কৃষ্ণ কি করেন অত রাত্রিতে জল কোথায় পান তার বাঁশী দিয়ে মাটি খুঁড়ে জল বের করলেন। সে ডোবার জল সবুজ রঙ্গের। সেই পচা জল সকলকে খেতে দিয়ে পাণ্ডারা পয়সা আদায় করে। আমরা খেলেম না, মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে পয়সা নিলে।

এখানে ভিখারীর অন্ত নাই চারিদিকে যেন মাছির মত ছেঁকে ধরে। একস্থানে কৃষ্ণ কালিয়া দমন করেছেন। সাপের মাথায় কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাগকন্যারা দু পাশে দাঁড়িয়ে যোড় হাতে কৃষ্ণের স্তব করছেন। কৃষ্ণের যতরকম লীলা আছে সকলেরই মূর্ত্তি করে রেখেছে। এই সব দেখে আমরা বাড়ী ফিরে এলেম; কেবল গোকুল আর গিরি-গোবর্দ্ধনটা দেখা হলো না।

হিন্দুধর্ম্মের যে কতটা প্রভাব সাধারণ লোকদের মধ্যে এখনও আছে তীর্থ স্থানে গেলে তাহা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু মেয়েদের ভিতর ভক্তির ভাব যেরূপ প্রবল পুরুষদের মধ্যে সে রকমটা নেই। আরতির সময় মেয়েরাই দেখলেম যোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে, আরতির শেষে ভক্তিভরে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছে।

বৃন্দাবন মথুরা দেখে আমরা হিন্দুর তীর্থ থেকে একবারে মুসলমানের কীর্ত্তিরাজ্য আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেম। তাজ দেখে যে মনে কি রকম ভাব হোল তাহা অবর্ণনীয়। সম্মুখের ফটক থেকে তাজমহল যেন একখানি ছবির মত। দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তাজমহল পৃথিবীর মধ্যে সত্যিই একটা আশ্চর্য্য জিনিস। কিন্তু সাজাহান তাজ বিবিকে যে কত ভাল বাসতেন এই তাজে তার যে মূর্ত্তিমান নিদর্শন পাওয়া যায় সেইটি আরো সুন্দর। তাজবিবি মৃত্যুর সময় বলেছিলেন আমার গোর যেন চির স্মরণীয় হয় তাই সাজাহান সে আজ্ঞা পালন করে গেছেন। কি রকম পাথরের সব কারুকার্য্য! পাথর সব এখনও যেন সাদা ধপ ধপ করছে,—দেখলে মনে

হয় আজিকারই তৈরী; তাজের নানা রকম পাথরের রঙ্গে যখন জ্যোৎস্না প'ড়ে ঝকমক করে উঠে তখন যে কি চমৎকার দেখতে হয় যিনি তা না দেখেছেন তিনি বুঝতে পারবেন না।

সেকেন্দ্রাবাদে আকবর বাদসার গোরও দেখে এসেছি। অত বড় বাদসার গোরস্থানও তাজের তুলনায় নগণ্য। প্রীতির এমনই মাহাত্ম্য! একটি ঘরে তিনটি গোর রয়েছে মধ্যের বড়টি আকবর বাদসার। তার দুদিকে দারার দুটি কন্যার গোর। সম্মুখের ঘরের দেয়াল সোনার জলের লতাপাতা দিয়ে সাজান! কিন্তু একদিকটা পুড়ে কাল হয়ে রয়েছে; গোয়ালিয়ার রাজার লোকেরা এসে নাকি পুড়িয়ে দিয়েছে। আকবরের সমাধি সাদা মর্ম্মর পাথরের। উপরের সাজ সোনা দিয়ে মোড়া ছিল সোনাগুলো খুলে নিয়ে এখন গিল্‌টী করে রাখা হয়েছে। এই গোরের ফটকে ফার্সীতে অনেক বয়েদ লেখা। একটা লাইনের অর্থ এই যে, এই সব যে দেখছ এর কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একটি বস্তু যিনি আছেন তিনিই চিরস্থায়ী। এ সব লয় হয়ে যাবে তাঁর কিন্তু বিনাশ কখন হবে না।

এই সব কীর্ত্তি কাণ্ড দেখলে মন যেন কেমন উদাস হয়ে যায়, যারা এত কাণ্ড করে গেল তাদের বংশে ত কেহ দেখবার লোক রইল না!

একদিন কেল্লা দেখতে যাওয়া গেল; সেখানে অনেক দেখবার জিনিস। খাস-দরবার আমদরবার, বেগমদের স্নানের ঘর, সিশ মহল মচ্ছিভবন ইত্যাদি। মচ্ছিভবনে বাদসা বেগমদের নিয়ে মাছ ধরতেন। সিসমহলে রঙ্গিনকাচ বসান তাতে আলো পড়লে চমৎকার দেখায়। লাল নীল আলোর আভাতে ঘর উজ্জল হয়ে উঠে! উঠানে বড় বড় সব গোলাপ জলের ফোয়ারা রয়েছে তাতে বাদশারা স্নান করতেন; বাদসার এই প্রাসাদ ভবন এক সময়ে কত হাসি তামাসা আমোদ আহ্লাদে ভরপুর ছিল!

একটা ছোট অন্ধকার ঘর দেখালে বেগমদের মধ্যে কেহ কোন দোষ করলে সেইখানে তাকে শেষ করে ফেলত। সে ঘরটা দেখলে যেন আতঙ্ক হয়। আকবরের হিন্দুবেগম যোধাবায়ের মহলে তাঁর পূজা গৃহে লাল পাথরের গণেশ আর দেবদেবীর মূর্ত্তি এখনো রয়েছে। জাহাঙ্গীর যে রাস্তা দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সেটা দেখলে বোধ হয় প্রকাশ্য রাস্তা নয়। একটা ছাতে বড় একটা কাল পাথর পড়ে আছে—তার উপর বসে নাকি বাদসা হাতীর লড়াই দেখতেন। পাথরের উপর একটা গোলা এসে পড়েছিল বলে একটা গর্ত্ত হয়ে রয়েছে। জাহাঙ্গীরের পুস্তকখানার দেওয়ালে তক্তা টাঙ্গান রয়েছে তাতে পুস্তক সব সাজানো থাকত। তক্তাগুলি পোকায় কাটেনি যেমন তেমনই আছে। ঔরঙ্গজেব তার বাপকে যেখানে কয়েদ করে রেখেছিলেন সে ঘরটি দেখলে বড় কষ্ট হয়। একটী ছোট ঘর তাতে দরোজা জানলা কিছুই নাই। শীতে গ্রীষ্মে কি কষ্টই অত বড় বাদসা ভোগ করেছেন। তাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না অথচ তাঁর মত দুঃখের জীবন একজন সামান্য

লোকেরও দেখা যায় না। ওই দুঃখের মধ্যেও সাজাহানের একটি কন্যা তাঁর সান্ত্বনা স্বরূপ তাঁর কাছে ছিলেন। সাজাহান মৃত্যুর সময় বলেছিলেন আমাকে একবার তাজমহল দেখতে দাও তাজ দেখতে দেখতে আমি মরব। এ প্রার্থনা তাঁর গ্রাহ্য হয়েছিল। তাজ দেখতে দেখতে, তিনি মরেছিলেন। তাজের পাশেই তাঁর এবং তাঁর কন্যার গোর রয়েছে। মৃত্যুর পরেও দুজনে এক স্থানেই শয়ন করে আছেন।

আগ্রা থেকে তিন চার মাইল দূরে কৈলাস বলে একটা স্থান আছে সেখানে যমুনায় যোধবাই স্নান করতে যেতেন। স্নান করে উঠে তীরে একটি শিবালয়ে তিনি পূজা করতেন। যমুনার ঘাট পাথর দিয়ে বান্ধান; ঘাটে বড় বড় সিঁড়ি, সিঁড়ির দু দিকে দুটা নহবত খানা পাশে কাপড় ছাড়বার একটা ছোট ঘর, স্নান করে উঠে সেই ঘরে রাণী কাপড় ছাড়তেন; শিবালয় সংলগ্ন একটা পুরাতন বটগাছ মাটিতে প্রায় নুয়ে পড়েছে, গাছটি দেখে অনেক দিনকার গাছ বলেই মনে হয়; এমন নির্জ্জন স্থান পূজা করবারই উপযুক্ত, আমরা এসে যমুনায় স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে বসে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে সব ইতিহাস শুনতে লাগলেম।

এখন আর শিবের তেমন আদর নেই মন্দির অমনি অযত্ন অবস্থায় রয়েছে, কেহ কখন যায় ত পূজা দেয়। সে স্থানটি এমন চমৎকার নির্জ্জন যে আমাদের ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছিল না। যমুনা কুলকুলরবে বয়ে যাচ্ছেন গাছের ডালে পাখীরা কলরব করছে—বড় মধুর। আগ্রার সব জায়গাই প্রায় দেখা হয়েছে কেবল ফতেপুর সিকড়ী দেখা হলো না। সেটা হচ্ছে সাজাহানের গুরুর গোর।

আমরা আগরা থাকতে থাকতেই সেখানকার ভদ্র লোকদের সখের থিয়েটার হয়ে গেল। বিষয়টা ছিল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এত বাজে লোকের ভিড় হয়েছিল পুলিষের লোকেরা পর্য্যন্ত তাদের আটকে রাখতে পারে না, সবাই সিদ্ধি খেয়ে ষ্টেজের উপরে উঠতে যায়। যারা অভিনয় করছিল তারা অনেক করে বুঝিয়ে বলাতে কিছুক্ষণ ক্ষান্ত থাকে আবার মাতামাতি করে বেড়ায়। তারা কিছুই বুঝতে পারছিল না কেবল গোলমাল করে বেড়ানই তাদের আমোদ।

অভিনয় আমাদের মন্দ লাগল না। হিন্দুস্থানী গান সব যে বুঝতে পারলুম তা না তবে হাবভাবে অনেকটা বোঝা গেল। আলো, দোকান সাজান, গান, অভিনয় সব সমেত আমাদের দেখতে ভালই লাগল।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

নবাব

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্দ্দিনে।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই, ভারী কয়টুকরা কালো মেঘ প্রকাণ্ড কালো পাখীর মতই যেন ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। পথে বেশ কাদা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলও দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত শোচনীয় মলিন দৃশ্য! চারিধারেই একটা অপরিচ্ছন্ন নিরানন্দ ভাব যেন জমাট বাধিয়া রহিয়াছে।

এই নিরানন্দ দৃশ্য একটি প্রাণীর হৃদয়ে কিন্তু এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। বদ্ধ ঘরে সাশির পাশে সোফাটা টানিয়া আনিয়া তাহাতেই আপন দেহ-ভার লুটাইয়া দিয়া সে এই পথের কদর্য্যতা লক্ষ্য করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দুই চারি পশলা বৃষ্টি নামিতেছে—পথে ত্রস্ত পথিক সহসা অমনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেহ ছুটিয়া অদূরে কোন গাড়ী-বারান্দার তলে আশ্রয় লইতেছে, কেহ বা ভিজিতে ভিজিতেই অপ্রসন্ন মুখে দেহটাকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া দ্রুত পথে চলিয়াছে। ঘরের ভিতরকার এই প্রাণীটি এই দৃশ্যে ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিতেছিল। সহসা এক পশলা বৃষ্টি নামিলে সে নিকটোপবিষ্টা সঙ্গিনীকে কহিল, "দেখ পরী, আজকে এই বাদলাটা হয়ে ভারী চমৎকার হয়েছে। রাস্তায় লোকগুলো চলেছে, দেখ। অন্য দিন সে কি জাঁক কি জমক করেই সব পথে চলেন, আজ তেমনি জব্দ! কাদা মেখে জলে ভিজে চেহারা হয়েছে, দেখ না! এই জল-কাদার দিনগুলো আমার সুন্দর লাগে, মনটা যখন ভারী থাকে অবশ্য!"

পরী কহিল, "তুমি কি যে বল ফেলিসিয়া—আজ আবার তোমার মনের হল কি?"

"সে কথা থাক্। সে তুমি বুঝবে না, পরী!"

বাস্তবিক ফেলিসিয়াকে বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। তাহাকে সামলাইয়া বেড়ানো—এক জেঙ্কিন্স ছাড়া আর কাহারও সাধ্যে কুলাইয়া উঠে না! অথচ ঈশ্বর জানেন, জেঙ্কিন্সের প্রতি ফেলিসিয়ার মনের ভাব কেমন। বেশী দিনের কথা নহে—এই কালই জেঙ্কিন্স আসিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া ফেলিসিয়ার দরবারে হাজিরা দিয়াছে, অথচ ফেলিসিয়া তাহার সহিত একটাও কথা কহে নাই। জানি না, আজ যে সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ফেলিসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিবে!

ফেলিসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। বৃষ্টির বেগটা বাড়িয়া উঠিল। ফেলিসিয়া সঙ্গিনীকে কহিল, "তুমি ওঠো পরী—দেখগে, কতদূর কি হল। মোদ্দা আর একটা কথা মনে রেখো, কেউ যদি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ত বলো, দেখা হবে না। আমার শরীর ভালো নেই।"

সহসা বাহিরে দ্বারের পার্শ্বে হাসিয়া কে কহিয়া উঠিল, "কিন্তু আমি আজ তোমার সঙ্গে দেখা না করে নড়ছি না, ফেলিসিয়া।"

স্বর শুনিয়া ফেলিসিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কি! মিনার্ভা যে—গেরি এ সময় হঠাৎ কি মনে করিয়া! ফেলিসিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। মুখখানা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, গালে যেন গোলাপ ফুটিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়াই সে কহিল, "কিন্তু তুমি মিনার্ভা যে এ সময় আসতে পার, তা কে ভেবেছিল, বল। তা কি করে এলে?"

গেরি কহিল, "কেন, দরজা খোলা আছে, চলে এলেই হল ত!"

"দরজা খোলা! তা কন্‌স্তাঁর কাজই ত ঐ রকম—বিশেষ আজ আবার এক-জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কি না।"

"নিমন্ত্রণ! ওঃ, ঠিক ও ঘরে তাই দেখলুম বটে, ফুলের রাশ জড়ো করা রয়েছে—যেন একখানা গোটা বাগানই কে তুলে এনে ও ঘরটায় বসিয়ে দিয়েছে। তা এ সৌভাগ্যটা কার?"

ফেলিসিয়া একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "ও কিছু না, কিছু না। এর সঙ্গে প্রাণের কোন সম্পর্ক নেই—নেহাৎ ব্যবসাদারী ধরণের ভোজ এ। তা যাই হোক, বসো, বসো, এই পাশের ইজি-চেয়ারটায় বসো—তোমায় দেখে ভারী খুসী হলুম। পরী তুমি যাও।"

সঙ্গিনী চলিয়া গেল। পল ত্ব গেরি বসিল। তাহার প্রাণের ভিতরে কেমন একটা উত্তেজনাময় স্রোত বহিতেছিল। ফেলিসিয়াকে গেরি আজ বড় সুন্দর দেখিল। এত রূপ! ইহার পূর্ব্বে এমনটি তাহাকে আর সে কোন দিন দেখে নাই। সায়াহ্নের স্তিমিত আলোকে ষ্টুডিও-কামরায় সজ্জিত দৃশ্যাবলীর মাঝে সত্যই আজ ফেলিসিয়াকে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দেবী-প্রতিমার মতই দেখাইতেছিল। তাহার উপর কণ্ঠস্বরে কি এ লালিত্য! যেন বীণার সুর!

গেরিকে দেখিয়া ফেলিসিয়ারও বড় আনন্দ হইল। এতদিন কেন সে আসে নাই? কোথায় ছিল সে? বোধ হয়, একমাস, না প্রায় দেড়মাস, দুইজনের দেখা হয় নাই! কেন? গেরি কি এ বন্ধুত্ব রাখিতে চাহে না! এমনই কত কথা হইল। গেরি মার্জ্জনা চাহিল—বিশেষ কাজে সে বাহিরে গিয়াছিল, তাই আসিতে পারে নাই। না আসিলেও তাহার কথা কতদিন সে কহিয়াছে—কত দিন!

ফেলিসিয়া কহিল, "বটে! কার সঙ্গে কথাটা হচ্ছিল, শুনি।"

গেরি বলিতে যাইতেছিল, "আলিনের সঙ্গে" কিন্তু কথাটা কেমন বাধিয়া গেল। কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া মুখে চাপা দিল। কেন এ লজ্জা,—তাহাই বা কে বলিবে? তবু কেমন লজ্জা হইল। হঠাৎ এমন সময় বিদ্যুতের মত একটা কথা তাহার মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিল, একটা মিথ্যা বলিবে সে। হোক্ মিথ্যা—ইহারই সাহায্যে সে আপনার অভীষ্ট

সাধনেরও উপায় করিয়া লইবে। গেরি কহিল, "এমন একজন ভালো লোকের সঙ্গে,—যাঁর মনে অকারণ তুমি বড় বেদনা দিয়েছ! আচ্ছা, বল ত, নবাবের মূর্ত্তি কেন তুমি গড়ে শেষ কর নি? এটা করলে কতখানি তাঁকে আনন্দ দিতে তুমি! কতখানি তিনি গৌরব বোধ করতেন, যদি এই মূর্ত্তি আজ এক্সিবিসনে ঠাঁই পেত! মনে তিনি বড় আশা করেছিলেন—"

নবাবের নামোল্লেখে ফেলিসিয়ার কেমন একটা গোল বাধিয়া গেল। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সত্যি, আমি আমার কথা রাখতে পারিনি। কি যে খেয়াল থেকে থেকে আমার মাথায় চাপে। তবে দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি কাজটা সেরে ফেলবো। ঐ দেখ, কাপড়ে ঢাকা আছে,—নবাবেরই মূর্ত্তি, মাটিটা এখনও শুকোয়নি।"

"তাহলে যে দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলুম —আমি কিন্তু সেটা বিশ্বাস করিনি, জেনো।"

"তোমার ভুল, গেরি। ফেলিসিয়া মিথ্যা বলে না। সত্যই পড়ে গিয়ে মাটিটা তাল পাকিয়ে গেছল—এখনও কাঁচা ছিল, তাই আমি সেরে নিয়েছি—চাও ত এই দেখ।"

ফেলিসিয়া উঠিয়া গিয়া কাপড়ের আবরণ সরাইয়া লইল—কাদায় গড়া নবাবের মূর্ত্তি, সেই সহাস মুখচ্ছবি নিমেষেই গেরি প্রত্যক্ষ করিল। চমৎকার সাদৃশ্য! গেরি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ফেলিসিয়া কহিল, "ঠিক হয়নি? দু-চারটে আর তুলির আঁচড় টেনে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে—" বলিতে বলিতে সে কোণের টেবিলের উপর হইতে ছোট তুলিটা টানিয়া লইয়া অসম্পন্ন মূর্ত্তির উপর ধীরে ধীরে বুলাইতে লাগিল। পরে মূর্ত্তিটা আলোর দিকে ঘুরাইয়া, নিজের ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার পানে সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "ক'ঘণ্টারই বা কাজ আর! তবে এক্সিবিসনে দেওয়া—? আজ ত হল ২২শে। সবাই নিজের নিজের যা-কিছু জিনিষ পাঠিয়ে ফেলেছে, বোধ হয়! এখন কি আর পাঠানো যাবে?"

"তোমার জিনিষ আবার পাঠানো যাবে না? এত যার লোকবল—"ফেলিসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, এ কথায় ঈষৎ অপ্রসন্নও হইল। তবু কথায় একটু তীব্র জ্বালা মিশাইয়া সে কহিল, "ঠিক বলেছ! ডিউক মোরার আশ্রিত যে—না, না, কোন কথার দরকার নেই, গেরি। আমি জানি, লোকে কি বলে! আর তাদের কথা-গুলোকে আমি এমনি ঘৃণা করতেও জানি—" বলিয়া সে একটা কাদার ঢেলা লইয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর পদাঘাত করিল—"আমার নিজের মনে যদি আমি—কিন্তু থাক্—ও সব কুকথার আলো-চনাও আমি পছন্দ করি না। তবে তোমায় একটা সুখবর দি, শোন, মিনার্ভা, তোমার বন্ধুর মূর্ত্তি এবার সালোঁয় যাচ্ছে; এ তুমি নিশ্চয় জেনো—যাবেই।"

এই সময় হঠাৎ একরাশ ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরিয়া গেল। একটা ট্রেতে করিয়া বড় একটা ফুলের তোড়া লইয়া পরী আবার সেই কক্ষে আসিল, আসিয়া ফেলিসিয়াকে কহিল, "এই বড় তোড়াটা টেবিলের জন্য এল! কেমন?"

ফেলিসিয়া কহিল, "বেশ।"

তাহার পর গেরির দিকে চাহিয়া পরী কহিল, "পল, আজ ভারী সুন্দর কেক তোয়ের করেছি, আমি। দুখানা আনব,—খাবে?"

ফেলিসিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "এখন নয়, পরী—খাবার সময় দিও।"

"খাবার সময়?" পরী অবাক হইয়া গেল। বিস্মিত নেত্রে ফেলিসিয়ার পানে সে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "হাঁ, আমি মনে কচ্ছি, পলকে আটকে রাখবো। এখানে খেয়ে তবে ও যাবে। কেমন গেরি, তোমার কোন অসুবিধা হবে না ত? ছোট-খাট অসুবিধা হলেও আমি তা শুনছি না। আজ এখানে খেয়ে যাও। আমার ভারী উপকারও হবে তাতে—"

গেরি কহিল, "কিন্তু এ পোষাকে—তাই ত কত ভদ্দর লোক আসবে—"

ফেলিসিয়া কহিল, "কে ভদ্দর লোক? কেউ না—আমরা তিনজনে—শুধু তুমি, আমি আর পরী! ব্যস্—তাতে পোষাক বদলাবার কোন দরকার হবে না, পল।"

পরী বাধা দিয়া কহিল, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, ফেলিসিয়া—আজ কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করেছ। আর একটু পরেই তিনি এসে পড়বেন—"

ফেলিসিয়া কহিল, "তার জন্য ভেবো না, তুমি, পরী। আমি এখনি চিঠি লিখে তাঁকে আসতে বারণ করে দিচ্ছি—"

"ফেলি—"

"কোন ভাবনা নেই, পরী। আমি লিখে দিচ্ছি, আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ বোধ হওয়ায় নিমন্ত্রণ স্থগিত হইল। এখন মোটে এই ছটা বেজেছে। সাড়ে সাতটায় খাওয়া—ওঃ, দেড় ঘণ্টা সময় আছে।" ফেলিসিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। পরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। এ কাণ্ড কি! এমন খামখেয়ালি—

চিঠিখানা খামে মুড়িয়া পরীর হাতে দিয়া ফেলিসিয়া কহিল, "যাও, এ চিঠিখানা এখনই পাঠিয়ে দাও! হঠাৎ যদি কারও শরীর খারাপ হয়—সে ত আর মানুষের হাত ধরা নয়। যাও, বুঝলে, চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।"

ফুলের ট্রে ঘরে রাখিয়া চিঠি লইয়া পরী চলিয়া গেল। ফেলিসিয়া সোফায় আসিয়া বসিল, কহিল, "কি পল, কি ভাবছ?"

পলও অবাক হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা তাহার কাছে হেঁয়ালির মতই জটিল মনে হইতেছিল। এ যে রাজার যোগ্য আয়োজন, রাজার অভ্যর্থনার যোগ্যই সাজ-সজ্জার ঘটা! কোন্ ভাগ্যবান অতিথিকে আজ এমন ভাবে বিমুখ করা হইল! আর এ বিমুখ করা তাহারই জন্য! কে সে—কে?—যাহাকে রাখিয়া ফেলিসিয়া তাহাকে এতখানি যত্ন, এতখানি সম্মান করিতেছে—কে সে?

ফেলিসিয়া পলের ভাব দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "আমার খামখেয়ালি দেখে তুমি অবাক্ হয়ো না। যাক্, তোমাকে আর খুলে বলতে কি—তুমি ত আর আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছ না! কি বল—? আমার

মত বুনো স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চলে না, পল। স্বামী যখন চাচ্ছেন, এখনই তাঁর আনুগত্য করি, আমার ভিতরটা তখন হয়ত রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার মতই অন্য-কোথায় ছুটতে চলেছে! এই মাত্র কি একটা মনে করলুম, ঠিক তার এক মিনিট পরেই মতলব উল্টে গেল—এ-রকম স্ত্রী এক দারুণ অস্বস্তি! আমার কি প্রাণ আছে, না, মন আছে, যে তাকে বশ করব!"

পল এবার কথা কহিল—অনেক দিন ধরিয়া একটা কথা তাহার বুকের মধ্যে বলি-বলি করিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল। আজ তাহাকে জোর করিয়া সে ফুটাইয়া তুলিল। পল কহিল, "কিন্তু এইটুকুতেই আমার প্রাণে বাজে, ফেলিসিয়া। তুমি মেয়েমানুষ, সে কথা তুমি ভুলে যাও কেন? মেয়েমানুষ চিরদিনই তার মমতা তার স্নেহ তার ভালবাসা দিয়ে পুরুষকে ঘিরে রাখে, নৈলে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষের দল সান্ত্বনা শান্তি কোথায় খুঁজে পাবে? আপনাকে বলি দেওয়াতেই মেয়েমানুষের জীবনের সার্থকতা। নয় কি?"

ফেলিসিয়া আঁধার-ম্লান বাহিরের পানে চাহিয়াছিল, চোখ না তুলিয়াই সে কহিল, "হয়ত তোমার কথাই ঠিক, পল। আমারও থেকে থেকে মনে হয়, এ বুকটা একেবারে খালি—সে খালি জায়গাটা পূরণ না করতে পারলে বুঝি বাঁচবো না। থেকে থেকে কেমন হাঁপিয়ে উঠি। তখন মনে হয়, যদি আমার একটা সংসার থাকত—একজন স্বামী, যাকে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আঁকড়ে ধরতে পারি,—একটি ছেলে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে যার মঙ্গল কামনা করব—যে আমার পানে চেয়ে থাকবে! আমার এ কাজের মধ্যেও যাদের পানে চেয়ে একটু বল পাব, আশ্রয় পাব!" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "কিন্তু তা যে হবার নয়। আমার জীবনটা এমনি এলোমেলো হয়ে গেছে, যে আর তাকে নতুন করে বাঁধা যায় না—বাঁধা অসম্ভব! ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছে—বাপের কাছে আমি মানুষ হয়েছি। বাড়ীতে মেয়েমানুষ না থাকায় শুধু পুরুষের কাছে থেকে-থেকেই আমার মনটা গড়ে উঠেছে, তাই পুরুষের মতই সে জেদী হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু হাজার হোক্ আমি ত মেয়েমানুষ। তাই ওদিকেও পুরুষের মত মনটাকে একেবারে খাপ খাওয়াতে পারি নি। ভিতরে পুরুষ আর মেয়েলি ভাবে একটা যুদ্ধ চলেছে। তাই মনটা পুরুষের মত হলেও আমি পুরুষ নই, আবার নিজে মেয়েমানুষ হয়েও ঠিক তাদের মতও নই।"

গেরি কোন কথা বলিল না। তাহার বুকের মধ্যে একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। প্রাণ আজ একটা কথা বলিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, একবার সে বলে, "ওগো সুন্দরী, বীরাঙ্গনা, এস, আমার কণ্ঠে তোমার ঐ বাহুর মালা পরাইয়া দাও, আমার স্কন্ধে ও শ্রান্ত শির রক্ষা কর—আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি—তোমায় পূজা করি, তোমায় বিবাহ করিয়া, এস, আমি নিজে সুখী হই—তোমাকেও সুখী করি!" কিন্তু না, বড় লজ্জা করে। গেরি কোন কথা বলিতে পারিল না। পাছে মনের মধ্যকার এ

কথাটার আভাসও কেহ পায়, সেই ভয়ে সে কেমন শিহরিয়া উঠিল।

ফেলিসিয়া আবার কহিল, "তবে একটা জিনিষ আমি স্থির করে রেখেছি—আমার যদি কখনও মেয়ে হয় ত তাকে কখনও এমন দুর্দ্দশা পেতে দেব না। মেয়েকে মেয়ের মতই মানুষ করব—সে যেন মেয়েই হয়, পুরুষ না হয়।"

গেরি এবারও কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ফেলিসিয়া আবার কহিল, "আঃ পল, পল, তুমি আজ এসেছ—এতে আমি বড় সুখী হয়েছি, বড় সুখী! তোমার মত একজন বন্ধু আমার পাশে থাকে,—সে আমার বড় সাধ, বড় সুখ। মানুষের উপর আর ঘৃণা জন্মে গেছে—দারুণ ঘৃণা! যাদের এই দিবা-রাত্রি দেখছি, এরা কি মানুষ! যাই হোক পল, আমার সুদিনে দুর্দ্দিনে তুমি আমার পাশে থেকো—এমনি বন্ধুর মত পাশে থেকো—তাহলে আমার বুকে একটা বল পাব, কিছুতে আমি হঠবো না—কেউ আমায় হঠাতে পারবে না। কেন তোমায় এত কথা বলছি, জান, পল? তোমাকে দেখলে আর একজনকে আমার মনে পড়ে। সে আমায় বড় ভালবাসে—তার মত বন্ধুও আমার কেউ নেই। তার মুখ তোমারই মুখের মত—প্রাণটাও ঠিক এমনি! তাই কি তোমায় এত ভালবাসি? ভাবি, দুজনে এত মিল, এত—"

কথাটা শেষ হইল না। পরী আসিয়া কহিল, "একবার এদিকে এস—দেখ, কি হল না হল!"

"চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"তখনই দিয়েছি!"

* * * *

রাত্রি সাড়ে আটটা। ভোজের পর সকলে আসিয়া ঘরে বসিয়াছে। গেরি ভাবিল, এই নারীর প্রতি কি অন্যায় অশ্রদ্ধাই সে মনের মধ্যে পুষিয়া আসিতেছিল।

এমন প্রেমময়ী পবিত্রতাময়ী দেবী প্রতিমাকে সে পিশাচিনী পাষাণী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল! কি অন্যায়! এখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সব অপরাধ স্বীকার করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা চাহিবে! কি বলিবে কথাটা সে গুছাইয়া লইল। যেমন বলিবে, অমনি দ্বার খুলিয়া এক দাসী প্রবেশ করিল। দাসী সংবাদ দিল, ডিউকের ওখান হইতে লোক আসিয়াছে, মাদামোসেলের শরীরের তত্ত্ব লইতে।

ফেলিসিয়া কহিল, "বলগে, শরীর তেমনি আছে—তবে বিশেষ খারাপ নয়—ভাবনার কারণ নেই।"

গেরির বুকে সহসা যেন কে ছুরি বিঁধিয়া দিল। সে বুঝিল, এই অতিথির জন্যই আজ এতখানি আয়োজন হইতেছিল, বটে! সে কহিল, "ডিউক মোরার এখানে খাবার কথা ছিল, আজ?"

"হাঁ,—জ্বালাতনে পড়েছিলুম আমি।"

"ডচেসও আসছিলেন?"

"ডচেস? না, সে কেন আসবে? তার সঙ্গে আমার আলাপই নেই।"

গেরি এবার কঠিন হইল—কঠিন স্বরেই সে কহিল, "আমি যদি তুমি হতুম, তাহলে কি করতুম, জানো? ডচেসকে

ছেড়ে শুধু ডিউককে কখনও এ রাত্রি-ভোজে নিমন্ত্রণ করতুম না, ফেলিসিয়া। তুমি বলছিলে, তোমার বুকটা সময় সময় খালি বলে মনে হয়! নিজেই তুমি নিজেকে খালি করে দিচ্ছ? তুমি মেয়েমানুষ, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এ লোকের কুৎসাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া মেয়ে-মানুষের পক্ষে উচিত নয়। আমি তোমায় এসব কুৎসারও ঊর্দ্ধে দেখতে চাই! কথাটা শুনে তোমার কষ্ট হল, ফেলিসিয়া?"

"না, না,—তুমি ঠিক বলেছ, মিনার্ভা। তোমার এ কথা আমি মাথায় তুলে নি। এমন স্পষ্ট, এমন সরল কথাই আমি শুনতে চাই! জেঙ্কিন্সের দলের ভদ্রতার পাত-মোড়া কথায় আমার অরুচি ধরে গেছে, ঘৃণা জন্মেছে। আমি ত তোমায় বলিইছি, আমার এমন একজন বন্ধু চাই যে আমার ঠিক বিচার করবে! যাকে আমি আশ্রয়ের মত আঁকড়ে ধরতে পারব!"

তাহার পর ফেলিসিয়া উঠিয়া কাগজে মোড়া একটা ছবি আনিয়া পলের সম্মুখে রাখিল, কহিল, "এই আমার সেই বন্ধুর ছবি, যার কথা বলছিলুম। এমন সরল উঁচু মন আমি ত কখনও দেখিনি। যখনই কোন নীচ বাসনা আমার মনে আসে, তখন আমি এর কথা ভাবি! শুধু মনে হয়, এ কি বলবে। শুধু এই চিন্তাই আমায় দারুণ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেও রক্ষা করে এসেছে —এরই জন্য আজও আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি, পল!"

পল কোন কথা বলিল না। সে ছবি দেখিতেছিল। এ যে আলিনের ছবি—আলিন জুজ! সেই সুন্দর শুভ্র অমলিন মুখখানি, সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র মূর্ত্তি! আসুক এখন ডিউক মোরা—ইহার পাশে লক্ষ ফেলিসিয়াকেও গেরি তুচ্ছ করিতে পারে!

গেরি কহিল, "এ ছবিখানি আমায় দেবে?"

"স্বচ্ছন্দে। কেমন—চমৎকার মুখ নয় —সুন্দরী নয়? যেমন রূপ, গুণও তেমনি। পৃথিবীর সমস্ত নারী একদিকে, আর এই আলিন অন্যদিকে। শোন পল,—এর সঙ্গে কখনও যদি তোমার দেখা হয়, কখনও যদি এর দেখা পাও—কখনও একে জানবার—"

ফেলিসিয়া কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কে যেন কণ্ঠটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। পল ফেলিসিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—ফেলিসিয়ার দুই চোখে—সেই সস্মিত সহাস দুই চোখে বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু—মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দশকর্ম্মের ভাষা

ভারতের হিন্দু অধিবাসিগণ ভারতের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েরই এক একটি ঐশী উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্য ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহারা কেবল স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাদেশ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া মানবমণ্ডলীকে বুঝাইয়াছেন। এবম্বিধ ধারণা বশতঃ সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা, এবং সংস্কৃত লিপিমালা দেবনাগরী বা দেবতাগণের আবাসস্থল হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাধারণ্যে অভিহিত হয়। ভারতের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ই ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকলাপ সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দেবভাষা পবিত্র ভাষা; সুতরাং সমগ্র পবিত্র কার্য্য দেবভাষায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই হিন্দুর ভারতে কখনও হিন্দু মন্ত্রাবলী দেবেতর ভাষায় রচিত হয় নাই।

কিন্তু যতদিন সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল ততদিন উক্ত মন্ত্রাদির অর্থ বোধ করিতে দেশবাসীকে কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অনেক দিন হইতেই ভারতের অধিবাসীবৃন্দের সহস্রে একজনও সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে বা বলিতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা। ভারতের অনেক ভাষারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই সংস্কৃতের সহিত সংশ্রব নাই। তামিল, তেলেগু, মালয়ালান প্রভৃতি ভাষাকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। আর সমগ্র হিন্দুজাতিকে পুনরায় অষ্টাধ্যায়ী পাণিনী শিক্ষা দিয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার কল্পনাও বাতুলের আশা মাত্র। এ অবস্থায় প্রাদেশিক ভাষাই আমাদের ভাব প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। মানুষ তাহার চিন্তা রাশিকে ভাষায় গড়িয়া তুলিতে পারে বলিয়াই তাহার মহত্ব। ধর্ম্মকার্য্য প্রাণের বস্তু; কাহাকে কি বলিয়া ডাকিতেছি, তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম না হইল, তবে ত ভগবানকে ডাকিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। কার্য্যের সহিত যদি চিন্তাশক্তির উন্মেশ ও সমাবেশ না হইল, তবে জড়ে ও চৈতন্যময় মানুষে পার্থক্য রহিল কোথায়? মানুষ যদি পরের কথায় ভিন্ন নিজে চিন্তা করিতে না পারিল, তবে আর তাহার পৃথক ভাবে চিন্তাশক্তি লাভের কি প্রয়োজন ছিল? চিন্তার রাজ্য যে এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল!—দর্শন বিজ্ঞান সবই যে বৃথা! বাস্তবিক আমাদের দেশে সকলই রুদ্ধ হইতে বসিয়াছে বা পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভগবানকে ডাকিতে হইলেও, এক দুর্ব্বোধ (আমাদের পক্ষে নির্ব্বোধ) ভাষার সাহায্যে ভগবানকে ডাকিয়া থাকি। নইলে যে আমাদের 'জাতি যাইবে'। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা কল্পনাতেও আইসে না। আমাদের জাতীয় সকল ক্রিয়াই ধর্ম্মভাব প্রসূত; কিন্তু বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, আরাধনা সকল বিষয়েই এক অবোধ্য, ভাষায় ধর্ম্ম প্রেরণা জাগাইতে হয়।

নির্ব্বোধ চাষা কোন দুর্দৈব বা পাপ-

শান্তির জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ব্যবস্থা লইতে গেল। পণ্ডিত মহাশয় ১০।২০ টাকা প্রণামী পাইয়া লম্বা লম্বা কথা জোড়া দিয়া এক "পাঁতি" লিখিয়া দিলেন, কিন্তু হায়, নির্বোধ বুঝিল না, কিম্বা বুঝিবার জন্য ইচ্ছাও করিল না যে সে কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছে। কিন্তু তাহার "পাঁতি" যদি তাহার নিজের ভাষায় লিখিত হইত, তবে হয়ত তাহার অপরাধী হৃদয় আপন কর্ম্ম বুঝিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইত! কিন্তু সে যে যন্ত্র হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যন্ত্রের মত খাটিয়াই বিদায় লইবে।

ইহার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অবারিত ব্রাহ্মণপ্রভাব ভারতের বিচারশক্তি চিরদিনের জন্য সুপ্ত করিয়া দিয়াছে! লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি হীন হইয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে। তাই এই চিরন্তন ধর্ম্মকপটতা ও কর্ত্তব্যশৈথিল্য তাহার হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই বলিতে হয় যে আমরা কলকণ্ঠে সুর চড়াইয়া "আমরা ব্রহ্ম নিষ্ঠ" "আমরা সত্য প্রত্যাশী" বলিয়া যতই ঘোষণা করি না কেন ফলে কিন্তু আমরা ঘোর ভণ্ড সুতরাং নাস্তিক জাতি হইয়া বসিয়াছি। যাহারা ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে এইরূপ ভিত্তিহীন ভাবে স্থায়ী করিতে চায়, তাহারা দিন দিন ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ছুটিবে না ত কি? এই সব কারণ বশতই ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে। আমাদের শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ভাষা যুক্তি-হীনতা ও হৃদয়হীনতার আশ্রয় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Prof Hardayal বড় আক্ষেপেই বলিয়াছেন—

"We have worshipped the Goddess of Sakti (enrgy) for centuries, how is it that we have remained so weak and helpless as a nation? We are the devout worshippers of Saraswati (the Goddess of learning); and at the same time have received a scant share of her blessings. The priests who are the monopolits of the religious rites & ministrations are for the most part as innocent of the Vedic knowledge of the present day as the Sudras were in the days when the gates of knowledge were shut against them by the iron rules of castes. We offer devotions to Lakshmi (the Goddess of wealth) every year and we remain none the less a nation of paupers."

আমরা বেদের ধার ধারি না, কিন্তু, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা পার্ব্বণে বৈদিক মন্ত্রের ঘটায় এক একজন বৈদিক সাজিয়া বসি।

সকল দেশেই ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় সম্পন্ন হয়; ইংরাজ তাহার ধর্ম্মের মূল উৎস হিব্রুগ্রীক্ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষায় ভগবৎগান গাইয়া থাকে; জার্ম্মান ফরাসী নিজ নিজ ভাষায়

ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপন পিপাসা পরিতৃপ্ত করে। চৈনিক ও জাপানীয়গণ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল উৎস পালি পরিত্যাগ করিয়া চীন ও জাপানী ভাষায় ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু পারিনা শুধু আমরা! ভারতবাসীর বোধগম্য হউক বা না হউক তাহাকে সংস্কৃত ভাষাতেই ভগবানকে ডাকিতে হইবে; কারণ সে যে দেশাচার ও ব্রাহ্মণ শাসিত একটি যন্ত্রমাত্র।

দেশের পৌরোহিত্য যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাত কাহারও জানিতে বাকি নাই। সকলেই জানেন পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের আর কিছু না হইলেও "দশ কর্ম্ম" করিয়া তিনি জীবন ধারণ করেন। অথচ পুরোহিত নিজেও মন্ত্রার্থ জানেন না, অর্থশূন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেশাচার রক্ষা করেন। প্রাচীন কালে উচ্চারণ-বৈষম্য ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি করিয়াছিল। দৈব কার্য্যে দেবভাষার এরূপ নির্য্যাতন কোন ক্রমেই সমর্থিত হইতে পারে না। কাজেই মনে হয়, আমাদের দেশে দৈব কর্ম্মে আমাদের মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে সুফল ভিন্ন কুফল ফলিবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি কত শত শত বিষয়ে পতিত হইতেছে—এই একটি বিষয়ে কিছুতেই তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত তাঁহাদের কাছে—এ প্রস্তাব কখনই ভাল লাগিবে না। তাঁহারা নিজে ত সংস্কৃত জানেন। অন্যের জন্য তাঁহারা কখনও চিন্তা করেন না, বা করিতে আগ্রহও প্রকাশ করেন না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসম্প্রদায় এই বিষয়ে অভাব উপলব্ধি করিয়া মাতৃ-ভাষাকে দৈবক্রিয়ার ভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশীয় খৃষ্টানগণও আপন আপন মাতৃভাষাকে তাঁহাদের "দশ কর্ম্মের" ভাষা করিয়াছেন। হিন্দুর কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। হিন্দুর নিকট এ বিষয়ে কল্পনাও যে একটা অনাচার।

বেদের সময়ে ভারতের প্রত্যেক নিকুঞ্জ হইতেই সামগান গীত হইত; কিন্তু চিরকাল তাহা হইতে পারে না; তাই হয়ও নাই। ভক্তির পুতুল চৈতন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে, তাহার মাতৃভাষায় যে চিন্তালহরী তুলিয়া-ছিলেন, তাহা শুধু ব্রাহ্মণের মধ্যে নয়,—চণ্ডালের মধ্যেও ভগবৎভক্তি ও স্বাধীন চিন্তার স্রোত বহাইয়া ছিল। তাই আজও ধানের ক্ষেতে, হাটের পথে, খেয়ার ঘাটেও হরিনামের অমৃত ধারা শুনিতে পাওয়া যায়। বাউল নিতাই প্রভৃতিকে সংস্কৃতে গান গাইতে হইলে, বেদের দেবতার সমাচার যেমন বেদেই বাঁধা পড়িয়া আছে, সেইরূপ কাঙ্গালের ভগবানের সমাচার কাঙ্গাল পাইত না—পুস্তকের মধ্যেই লুকাইয়া থাকিত।

সংস্কৃত পবিত্র দেবভাষা,—সে ভাষা চিরকালই মানব হৃদয়ের ভক্তি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমার নিজ মাতৃভাষা ত অপবিত্র নহে। যে কার্য্য আমার মাতৃভাষায় করিতে পারি না তাহার পবিত্রতা ত উপলব্ধি করিতে পারি না। জানিনা ভারতের সহিত রক্ষণশীলতার কি এক নিগূঢ় সম্বন্ধ। ভারতের ধর্ম্ম চীন জাপানে যাইয়া, ভারতের ভাষা ত্যাগ

করিতে পারিল, মানুষের কার্য্যোপযোগী হইবার জন্য তৎ তৎ দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়া আবার রক্ষণশীলতায় বাঁধা পড়িয়া গেল। বুঝুন আর না বুঝুন, আরবী ভাষার মন্ত্রে আমাদের মত তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম রক্ষণশীলতা ভারতের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। এমন দিন কি আসিবে না যে যখন ভারতবাসী রক্ষণশীলতার বন্ধন কাটিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে!

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী।

পিপীলিকার সমাধিযাত্রা

নানা জাতীয় পিপীলিকার ভিতরই মৃতদের সমাধিস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ ভয়েই ইহারা এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অতি সত্বর শবগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলে বলিয়া অনেকে মনে করেন। পিপীলিকা সমাধির বিস্তৃত প্রণালী MacCookএর বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যাইবে। তিনি বলিতেছেন—

"আমি সকল জাতীয় পিপীলিকাদিগকেই, স্বপক্ষীয় কিম্বা বিপক্ষীয়ের মৃতদেহ সম্বন্ধে একরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। স্বপক্ষীয় আত্মীয়াদির শবগুলির প্রতি ইহাদের একটু সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যজাতীয় পিপীলিকার মৃতদেহগুলি হইতে ইহারা সমস্ত রসটুকু চুষিয়া খায় অতঃপর শুষ্ক কঙ্কালগুলিকে বাস গৃহ হইতে কিয়ৎদূরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে—কিন্তু স্বপক্ষীয়দের মৃতদেহের উপর এরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। আমার নির্ম্মিত কৃত্রিম পিপীলিকা গৃহগুলি হইতেই আমি এ বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; সচরাচর উহারা কি প্রণালীতে সমাধি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমার বাস্তবিক হয় নাই। প্রথমতঃ এইরূপ একটি পিপীলিকা-উপনিবেশে অন্যস্থল হইতে কতকগুলি পিপীলিকাকে আনিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিলাম। অনতি বিলম্বেই কতক গুলি পিপীলিকা ঐ গুলিকে মুখে করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী দিবসও এইরূপই চলিল। দেখা গেল ইতিমধ্যে তাহাদের নিজদলের যে কয়টা পিপীলিকা মরিয়াছে তাহাদের নিয়াও এইরূপই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মৃতদেহ গুলিকে লইয়া বাক্সের কোণে কোণে, উপরে নীচে, সম্মুখে পশ্চাতে অস্থিরভাবে উহারা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব মৃতদেহগুলিকে দৃষ্টির বাহিরে নিক্ষেপ করিবার আগ্রহই এই ব্যস্ততার কারণ। কিন্তু তাহাদের বাসগৃহ যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে—উহাকে বাড়াইবার ক্ষমতা যে তাহাদের

নাই এইটুক্ বুঝিতে উহাদের লাগিল সম্পূর্ণ চার দিন। এই চার দিন উহারা আর বিশ্রাম করে নাই। একজন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে নূতন একজন আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং মৃতদেহ লইয়া ছুটাছুটি করিয়াছে। অবশেষে একেবারে হতাশ হইয়া উহারা কাচের দেয়াল ঘেঁষিয়া গৃহাভ্যন্তরেই একপাশে শবগুলিকে সমাধিস্থ করিতে লাগিল। কোণে কানাচে বা গর্ত্তের মধ্যে অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টির বাহিরে সম্ভব উহারা মৃত পিপীলিকা গুলিকে রাখিতেছে দেখিতে পাইলাম।

বারবেটিস্ ও ক্রুডেলিস্ জাতীয় পিপীলিকাদের মধ্যেও ঠিক এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিলাম। মৃতদেহ যতশীঘ্র সম্ভব স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপই প্রবল। Crudelis জাতীয় পিপীলিকাদের সমাধি-যাত্রা সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা লক্ষ্য করিয়াছি Mrs. Treat প্রদত্ত বর্ণনার সঙ্গে উহার খুবই ঐক্য আছে।

ইনি Formica Sanguineaদের সমাধিযাত্রা সম্বন্ধে আমাকে একটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আবাসবাটীর সন্নিকটে এই দাসপ্রিয় পিপীলিকাদিগের এক উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল।

একদিন লক্ষ্য করিলাম ঐ পিপীলিকা গৃহের প্রবেশ-দ্বারগুলির খুব কাছেই উহারা F. Fusca জাতীয় দাস পিপীলিকাদের কতকগুলি মৃতদেহ স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখা গেল মৃত পিপীলিকা গুলি সমস্তই দাস জাতীয়। পরে মিসেস ট্রিট আমাকে জানাইলেন যে F. Sanguinearা নিজেদের মৃতদেহগুলি দাসদের সঙ্গে কখনও সমাধিস্থ করে না। বাসগৃহ হইতে অনেকটা দূরে স্বতন্ত্র ভাবে উহারা নিজেদের শব গোর দেয়। যেখানে সকলকেই মাটিতে মিশিয়া মাটি হইতে হইবে সেই সমাধি ক্ষেত্রেও যাহারা আপনাদের জাতিধর্ম্ম ও পদমর্য্যাদার গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন না তাঁহাদের সঙ্গে যে এই F. Sanguineaদের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?"

পিপীলিকার সমাধি ব্যাপার সম্বন্ধে আর একজন মহিলা কি বলিতেছেন দেখা যাউক্। মহিলাটির নাম Mrs. Hutton। কতকগুলি সৈনিক পিপীলিকার মৃতদেহ এক স্থানে রাখিয়া গিয়া ত্রিশমিনিট পর প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তিনি যাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা প্রদান করেন:—

আসিয়া দেখিতে পাইলাম এক দল পিপীলিকা মৃতদেহগুলিকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহারা কি করে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। দেখিতে পাইলাম পাঁচ সাতটি পিপীলিকা অনতিদূরবর্ত্তী একটা মাটীর স্তূপের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট কাল বিলম্ব হইল, তৎপর উহারা স্তূপ মধ্যবর্ত্তী বিবর হইতে আরও পিপীলিকা সমভিব্যাহারে লইয়া বাহির হইল। ক্রমে সমস্ত পিপীলিকাগুলি সুন্দররূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রতি শ্রেণীতে দুইটি করিয়া পিপীলিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। উহারা এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে মৃত সৈনিক পিপীলিকাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে প্রথম সারির পিপীলিকা দুইটি একটি মৃতদেহ উঠাইয়া লইল—তৎপর দ্বিতীয় সারির পিপীলিকারা অন্য একটা মৃতদেহকে লইল, তৃতীয় সারির পিপীলিকারা লইল অন্য একটাকে; এইরূপ ভাবে যখন মৃতদেহ গুলির একটাও আর অবশিষ্ট রহিল না তখন উহারা পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শববাহী পিপীলিকাসারির পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক সারি করিয়া পিপীলিকা উহাদের সাহায্যের জন্য চলিতেছিল। যখনই পূর্ব্বগামীরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল তখনই উহারা যাইয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল;—এইরূপে ক্রমে উহারা সাগর তটবর্ত্তী এক বালুকাময় স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি গর্ত্ত খোদিত হইয়া গেল—এবং মৃতদেহ গুলিকে উহাদের মধ্যে স্থাপন করিয়া পিপীলিকারা প্রাণপণ চেষ্টায় গর্ত্তগুলি আবার পূর্ণ করিয়া দিল।—এই বিস্ময়কর ব্যাপারের এই খানেই অবসান নয়। পাঁচ ছয়টি পিপীলিকা খনন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে তৎপর হইয়াছিল—অন্য পিপীলিকারা উহাদের ধরিয়া আনিয়া সেইখানেই নিহত করিল—এবং খুব তাড়াতাড়ি একটী বড় গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিল।

উল্লিখিত বর্ণনায় আমরা পিপীলিকার শ্রমবিকাশ এবং শৃঙ্খলার অন্য এক নিদর্শন পাইয়াছি। পিপীলিকার বুদ্ধির কথা অনেক শোনা গিয়া থাকে। মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের বুদ্ধির অভাব নাই। বারান্তরে পিপীলিকার বুদ্ধিবৃত্তি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

সাঙ্কেতিক ভাষা

অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোতিবাবুর সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নহি এবং এ সম্বন্ধে ভারতীর পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ভরসাও রাখি না। তবে মুটামুটি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বাঙ্গলা ভাষার		জ্যোতিবাবুর সাঙ্কেতিক ভাষার
অ	=	আ
আ	=	অ
ই	=	উ
উ	=	ই
ঈ	=	ঊ
ঊ	=	ঈ
এ	=	ও
ও	=	এ
ঐ	=	ঔ
ঔ	=	ঐ

বর্গের প্রথম অক্ষর	=	বর্গের তৃতীয় অক্ষর
বর্গের দ্বিতীয় অক্ষর	=	বর্গের চতুর্থ অক্ষর

বর্গের তৃতীয় অক্ষর	=	বর্গের প্রথম অক্ষর
বর্গের চতুর্থ অক্ষর	=	বর্গের দ্বিতীয় অক্ষর
ণ, ন	=	ম
ম	=	ন, ণ
য	=	ল
ল	=	য
র	=	ব

ব	=	র
শ; ষ, স	=	হ
হ	=	শ, ষ, স,

জ্যোতিবাবুর ভাষায় "আমি ভাত খাই" ইহার অনুবাদ হইবে—"অনী ফদা ঘউ"। এবং এই প্রকারেই সঞ্জীবনী সভা' "হাঞ্চ পামু হাঞ্চ" হইয়াছে।

শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল।

পুরাতত্ত্বে ভৃগুবংশীয়দিগের স্থান

ভৃগুবংশীয় ঋষিদিগের দ্বারাই যে অগ্নির প্রথম আবিষ্কার হয় বেদের আলোচনা করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য ভাষায় অগ্নির জ্বালা ও জ্বলন-বাচক 'flame' ও 'blaze' শব্দের মধ্যে ভৃগুদিগের অগ্নি আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস মুদ্রিত দেখিতে পাইয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত স্থল হইতে এতৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য অনুসন্ধানের মর্ম্ম জানিতে পারা যাইবে:—

"But then philology, by a careful comparative study of the name and the large family of its kindred or derived word in the Aryan languages both ancient and of later formation, has proved that the mythical Bhrigus had something to do with such things as "flame" and "blaze", if not with the lighting itself." Vedic India p p 164—5.

"ভাষাবিজ্ঞান, আর্য্যভাষার 'ভৃগু' নাম ও ইহার একধাতুমূলক বা এতদুৎপন্ন প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সময়ে গঠিত বহু স্বজাতীয় শব্দের সাবহিত তুলনা-মূলক অধ্যয়ন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে পৌরাণিক ভৃগুগণের সাক্ষাৎ বিদ্যুতের সহিত যদিবা সম্পর্ক নাই থাকে অগ্নিশিখা ও অগ্নির জ্বলনের সহিত কোননা কোন সম্পর্ক অবশ্যই আছে।"

শুক্রঋষি ভৃগুর পুত্র ছিলেন তাহাতেই তিনি "ভার্গব" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই শুক্রই প্রথম আর্য্যেতর জাতিকে আর্য্য সভ্যতায় দীক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি "শুক্রাচার্য্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পুরাণাদিতে তিনি অসুর ও দৈত্যগুরু বলিয়া পরিচিত। অসুর ও দৈত্য কোন অলৌকিক জাতি নহে। ইঁহারা পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন আর্য্যেতর সভ্যজাতি বলিয়াই বোধ হয়। শুক্রাচার্য্য ইহাদিগের মধ্যে অগ্নির প্রচলন করতঃ এবং ইহাদিগকে আর্য্যজ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করতঃ ইহাদিগকে কেবল আর্য্যদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহাদিগের সাময়িক বিজেতাও করিয়া তুলিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য যে সঞ্জীবনী বিদ্যা নামে

নূতন জীববিদ্যার উদ্ভাবনদ্বারা দৈত্যদিগকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছিলেন তাহা সুরগুরু বৃহস্পতি পুত্র কচের তাঁহার নিকট ঐ বিদ্যালাভের জন্য শিষ্যত্ব স্বীকারের আখ্যান হইতেই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়!

শুক্রাচার্য্য দৈত্য ও অসুরদিগকে এই প্রকারে নবজীবন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে যে দেব সম্মান লাভ করিবেন তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতিই অসুর ও দৈত্যনামের প্রতিপাদ্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্য একেডিয় জাতির প্রধান দেবতার নাম শুক্রেরই নামানুসারে শুকাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। ১

কেবল শুক্রেরই নাম যে পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সহিত সংযুক্ত তাহা নহে তাঁহার পিতা ভৃগুর নামও পশ্চিম আসিয়ার সভ্যতার সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগু অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া এবং ভৃগুদিগের দ্বারা অগ্নির প্রথম প্রচার হয় বলিয়া অগ্নির আবিষ্কারক ও প্রচারক রূপে যে ভৃগুগণ বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ভৃগুবংশের একশাখা পশ্চিম আসিয়ার অসুর ও দৈত্যদিগের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়; এবং আপনাদের আদি পুরুষ ভৃগু-ঋষির নামে তাঁহাদের উপনিবেশের নামকরণ করেন! পশ্চিম আসিয়ার "ফ্রিজিয়া" প্রদেশই পূর্ব্বোক্ত উপনিবেশ বলিয়া অনুমিত হয়। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ফ্রিজিয়াকে ভৃগু নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে "প্রাগৈতিহাসিক কালের রাজবংশাবলী" "The Ruling Races of Prehistoric Times" নামক গ্রন্থে হিউইট এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"They first formed themselves into a nation of the sons of fire called Briges, Bhrigu, Phrygoi, or Phleygas, in Phrygia. Vol I p 500.

"তাঁহারা ব্রিজেস্, ভৃগু, ফ্রিজিয়, বা ফ্লেগাস্ নামে অগ্নিবংশ রূপে আপনারা ফ্রিজিয়াতে এক জাতিতে গঠিত হইলেন।"

ফ্রিজিয়া হইতেই ভৃগুগণ Phleygas নামে গ্রীসে যাইয়া অধিষ্ঠিত হয়। ২

পুত্র শুক্রই যখন দেবরূপে পরিণত হন তখন পিতা ভৃগুও যে দেবরূপে পরিণত হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভৃগুকে আমরা একেডিয় ও গ্রীক্ উভয় জাতি কর্ত্তৃকই দেবরূপে পূজিত দেখিতে পাই। ভৃগু অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তিনি অগ্নি-দেব রূপেই ইহাদের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হিউইট লিখিয়াছেন :—

We thus find in the Akkadian fire-god, the same who, as the Greek Phlegyas, appears as the king of the Heraclidae or sons of the fire and the Sun-god, on their first entering into, and conquest of Greece." "The Ruling Races of Prehistoric Times", Vol I p 38.

1 See "The Ruling Races of Prehistoric Times"—by J. F. Hewitt Vol I p 6.
2 See "The Ruling Races of Prehistoric Times"—by Hewitt Vol I p 83.

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে ভৃগু 'ফ্লিজিয়াস্' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি হিরাক্লিডিদিগের রাজারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। হিরাক্লিডিদিগের গ্রীক্‌বিজয় হইতে গ্রীসের নূতন সভ্যতার পত্তন হয়। সুতরাং হিরাক্লিডিদিগের রাজারূপে বর্ণিত হওয়ায় তিনি যে গ্রীক্ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাহাই বুঝিতে পারা যায়। আরম্ভেই যে আমরা 'flame ও blaze শব্দের সহিত ভৃগু ঋষির যোগের উল্লেখ করিয়াছি—গ্রীক্ সভ্যতার সহিত ভৃগু ঋষির পূর্ব্বোল্লিখিত যোগেই আমরা তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হই। পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন যে প্রকারে 'flame' ও 'blaze' শব্দের সহিত ভৃগু শব্দের যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে গ্রীক্ ভাষার মধ্যেই যে ইহার প্রথম সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে রোগোজিনের আলোচনা উদ্ধৃত হইতেছে :...

"Bhrigu" comes from a root Bhrij —"to burn," "roast", and must have been an old name of "flame", of Lightning itself. It survives in Greek phlego, Latin flagrare, fulgere (to blaze, to flame, to flare, flash, be resplendent) with all their derivatives, chief of which is the Latin fulgur, "lightning bolt," not to speak of their numerous posterity in our modern tongues." Vedic India by Ragozin p 364 foot note.

মনুষ্যের কৃষিজীবন আরম্ভ হইতেই প্রকৃত সভ্যতার সূত্রপাত হয়। হলযন্ত্রই সেই কৃষি জীবনের প্রধান উপকরণ। হলযন্ত্র বাচক পাশ্চাত্য ভাষায় প্লাও (plough) শব্দ যে "ভৃগু" শব্দেরই অপভ্রংশ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বিদিগের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই তাহা জানিতে পারা যায় :—"

"Also, as we find the northern "r" altered into "l" in the Akkadian Bil-gi, we find a similar change in the name Phlegyas, the Greek form of Phre-gu-as, and we thus see that the German pflug and our plough are names taken from that of the Phrygian fire father-god by a race which, besides changing the r into an l, changed the ph, into a p." The Ruling Races of Prehistoric Times," Vol I p 39.

পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে ভৃগুকেই হলযন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবয়িতা বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। ভৃগু যে অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা তাহাও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং পুরাতত্ত্বের দিক্ এবং ভাষাতত্ত্বের দিক্ এই উভয় দিক্ দিয়াই ভৃগুই যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রাণদাতা তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

এই প্রকারে কেবল পশ্চিম আসিয়ার ইতিহাসেই যে প্রাচীন সভ্যতার নেতারূপে ভৃগুদিগের স্মৃতি অঙ্কিত দেখা যায় তাহা নহে, প্রাচীন গ্রীক্‌সভ্যতার নেতারূপে পাশ্চাত্য ইতিহাসেও পাশ্চাত্য ভাষাতেও, ইহাঁদিগের স্মৃতি অঙ্কিত দেখা যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যুদ্ধে ব্যোমযান

(৩)

যে পাঁচ প্রকার কার্য্যে প্রধানতঃ ব্যোমযান ব্যবহার করা হয় তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দৌত্য কার্য্যই প্রধান। অসংখ্য "এরোপ্লেন" এতদুদ্দেশ্যে যুদ্ধ-সীমান্তে দিবারাত্রি ছুটাছুটী করিয়া থাকে—এমন কি শত্রু মিত্র উভয় পক্ষীয়েরই অগ্নিবর্ষণের মুখে। এরূপ অবস্থায় শূন্যে প্রতিপক্ষীয় ব্যোম বিহারীর সাক্ষাৎ ঘটায় দ্বৈরথ-যুদ্ধও মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জার্ম্মান সমরে এই প্রকার দ্বৈরথ-যুদ্ধের বিবরণ অহরহ পাওয়া যাইতেছে। অনেকে বলেন কোনও স্থায়ী জিনিস ঠিকমত লক্ষ্য সন্ধান করিয়া আক্রান্ত করা অপেক্ষা শূন্যে শত্রু-ব্যোমযানের অল্পমাত্র উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে আঘাত করিয়া জখম করা সহজ। প্রকৃত পক্ষেও ব্রিটিশ বিমান-বিহারীগণ যত সহজে বিপক্ষীয় ব্যোমযান পিস্তল সাহায্যে আক্রান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—মেজের ফ্রেস্‌কেটি এয়ারসিপ আশ্রয়গৃহ (Frascati airship shed at Metz) কিম্বা ডাসেলডর্ফের জেপলিন সেডে বোমা নিক্ষেপ কার্য্য তত সহজ

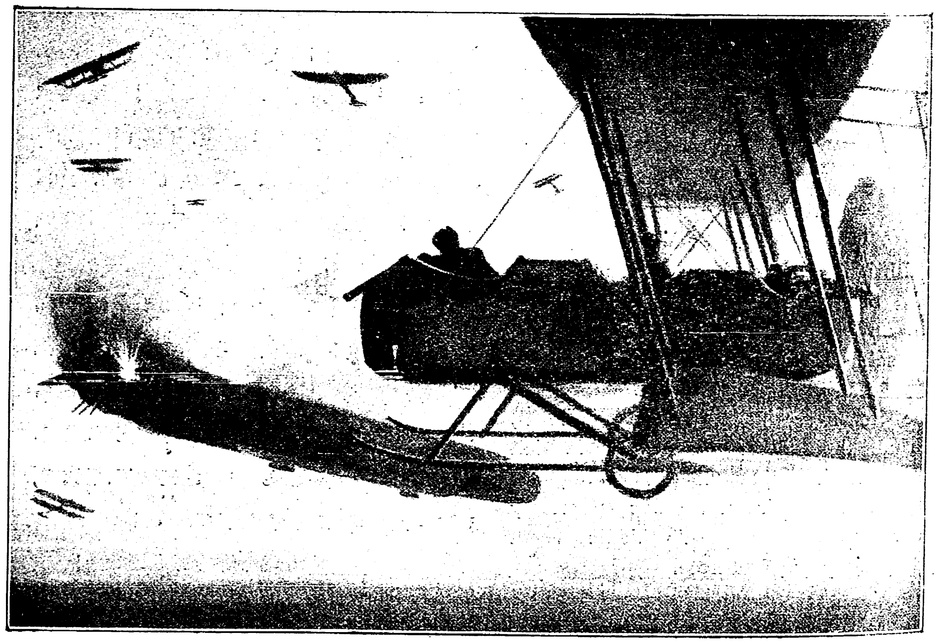

শূন্য-যুদ্ধ

"এরোপ্লেন" হইতে "জেপলিন" আক্রমণ।

হয় নাই। একেতো কোনো স্থায়ী জিনিস উপরে চলন্ত অবস্থায় থাকিয়া লক্ষ্য করাই অতি কঠিন, তাহার উপর এ সমস্ত স্থান সাধারণতঃ ঊর্দ্ধমুখী কামান ইত্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে সুরক্ষিত থাকে। ডাসেল-ডর্ফে পূর্ব্বে জার্ম্মানগণ ঊর্দ্ধমুখী কামান সংস্থাপিত করেন নাই—কিন্তু একবার উহাদের আশ্রয় গৃহ বিনষ্ট হওয়ায় নূতন আশ্রয় গৃহের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ঊর্দ্ধমুখী কামান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন কিন্তু তবুও লেপ্টেনাণ্ট মেরিক্স সেডের ছাদ হইতে মাত্র ৫০০ ফিট ব্যবধানে অবতরণ করিয়া উহার উপরে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার "এরোপ্লেন" নানা স্থানে জখম হইয়াছিল সত্য, তবু তিনি কোনও প্রকারে সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেস্থানে স্বপক্ষীয় একটী মোটরগাড়ী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইয়া যায়। জার্ম্মানদের মত বীরজন-অনুচিত প্যারী, এন্‌টোয়ার্প এবং রীম্‌সে সহরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ঐতিহাসিক ইমারৎ কিম্বা হাঁসপাতাল ইত্যাদি ধ্বংস করা অপেক্ষা উল্লিখিত কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে প্রকৃত বীরত্ব আছে।

একজন বিমানবিহারী সৈনিক রুগ্ন অবস্থায় লণ্ডন হাঁসপাতালে অবস্থান কালে, রাণী আলেকজান্দ্রার নিকট শূন্য-যুদ্ধের যে গল্প বর্ণনা করিয়াছিল তাহা এই :—

"ব্রিটিশ সৈন্য যখন পূর্ব্ব দিনের তুমুল সংগ্রামের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছিল,

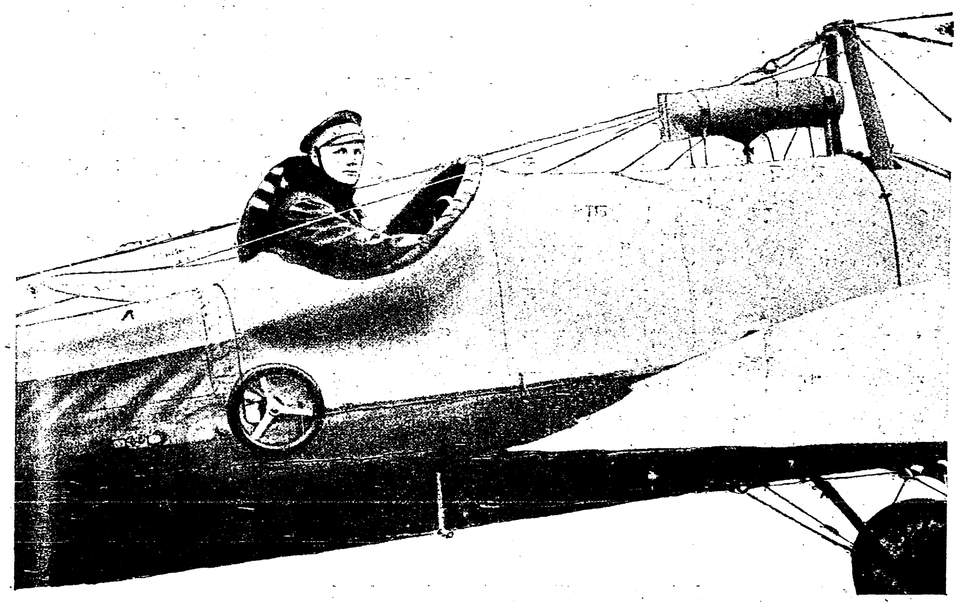

লেপ্টেনাণ্ট ভন্ হিড্‌সেন্

"এরোপ্লেনে" শূন্য হইতে প্যারীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিতেছেন।

সেই সময় শূন্যে একটী জার্ম্মান "এরোপ্লেন" দেখা দিল। ব্রিটিশ সৈন্যের ঠিক উপরে অবস্থিত থাকিয়া ইহা স্বপক্ষীয়দের নিকট তাহাদের অবস্থানের বিবরণ সঙ্কেতে জানাইতে লাগিল! তৎক্ষণাৎ দুইটী "এরোপ্লেনে" একজন ইংরেজ এবং একজন ফরাসী ব্যোমচারী আকাশে উড্ডীন হইলেন এবং যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিতে উঁহারা জার্ম্মান ব্যোমযানটী আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তদভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন।

নিম্নে সৈন্যগণ ঔৎসুক্যের সহিত নিস্পন্দভাবে ইহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অল্প একটু পরে ফরাসী ও ইংরেজ ব্যোমবিহারী এরূপ ভাবে আক্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শত্রু ব্যোমবিহারী অপেক্ষা অধিক উচ্চে উড্ডীন হইবার জন্য তাহার সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষই মনে করিতেছিল যে অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া সহজে বিপক্ষীয় শূন্যরথের উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারিবে। নীচ হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া কোনো "এরোপ্লেনকে" জখম করা—একরূপ অসম্ভব; সকল "এরোপ্লেনেরই" নিম্নভাগ কঠিন বর্ম্মে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু একবার অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থিত হইতে পারিলে তথা হইতে লক্ষ্য সন্ধান করা অনেকটা সহজ ও কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

উচ্চে, আরো উচ্চে—ক্রমে "এরোপ্লেন" দুইটী এত উচ্চে উড্ডীন হইল যে নিম্ন হইতে উহাদের ভাল করিয়া দেখিতেই পাওয়া গেল না। "এরোপ্লেন" দুইটী প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছে—এমন সময় দেখা গেল ব্রিটিশ বিমানচারী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে উঠিয়াছে। তার পর আকাশে গোলাবর্ষণের একটী অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল জার্ম্মান "এরোপ্লেনটী" অবতরণ করিতেছে। জার্ম্মান "এরোপ্লেন" ভূমিপৃষ্ঠে আসিয়া অতি জোরে প্রতিহত হইল এবং কিছুদূর ভূমিতে পরিচালিত হইয়া—থামিল। সেই স্থানে ছুটিয়া গিয়া ব্রিটিশ সৈনিকগণ দেখিতে পাইল—ব্যোমচারীর মৃত্যু হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমানচারীর অব্যর্থ সন্ধানে উহার বুক ফুটিত হইয়াছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত—সেই সৈনিক তাহার যন্ত্রটীকে আয়ত্তে রাখিয়া অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতেই ব্যোমযানটী অক্ষতভাবে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। তাহার হস্ত এখনও পরিচালন যন্ত্রটীতে রহিয়াছে।"

যুদ্ধে ব্যোমযানের আরেকটী প্রধান কার্য্য গোলন্দাজ সৈন্যের কামান স্থাপন কার্য্যে সহায়তা এবং বিপক্ষীয়দের কামানের অবস্থান এবং স্বপক্ষীয়দের অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি নিরূপণ করা। সাধারণতঃ এতদুদ্দেশ্যে "এরোপ্লেন" যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কেহ কেহ নিম্নে আবদ্ধ বেলুনও (captive balloon) শূন্যে উড্ডীন করিয়া থাকেন। দৌত্য কার্য্য দ্বারা বিপক্ষীয় কামানের অবস্থান এবং সংখ্যা নিরূপিত হওয়ার পর—সৈন্যাধ্যক্ষগণ গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অতঃপর ব্যোমযানের সাহায্যে তাহাদের অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি অবগত হইয়া থাকেন। কামানশ্রেণীর পশ্চাতে—ব্যোমবিহারী আবশ্যকমত শূন্যে উড্ডীন হয়। নানারূপ প্রণালীতে শূন্য হইতে সংবাদ প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তারশূন্য টেলীগ্রাফির ব্যবহার আজো তত সুবিধা মত হইতে পারিতেছে না। নানাপ্রকার আলোর সাহায্যে অনেক স্থলে সঙ্কেতে সংবাদ অবগত হওয়া যায়। সাধারণতঃ নিম্নে এক ব্যক্তি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়া সঙ্কেত-বার্ত্তা গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে; অন্য এক ব্যক্তি খালি চোখে দেখে ঠিক নিজেদের ব্যোমযানটী হইতেই সঙ্কেত গ্রহণ করা হইতেছে কি না। অনেক সময়ে একই স্থানে একাধিক ব্যোমযান উড্ডীন থাকায়—এ সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা। তাই এ বিষয়েও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ঠিক লক্ষ্য অভিমুখে গোলা বর্ষিত হইতেছে কি না তাহাই নির্ণীত হয়। দিক্ স্থির হইয়া গেলে নিম্ন হইতে "এরোপ্লেন"কে সঙ্কেতে বলা হয়—"এইবার 'পাল্লা' (range) নির্ণয় কর।" এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ব্যোমবিহারী আবশ্যক মত যন্ত্রের মুখটি ঘুরাইয়া লয় এবং কামানের 'পাল্লা' নির্ণয় করে।

'পাল্লা' নির্ণীত হওয়ার পর ব্যোমবিহারী সঙ্কেত-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি পর্য্যবেক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়। অনেক সময় পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তান্ত কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া নিম্নে স্থান মত নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে; আবার "আলোক-সঙ্কেতেও" সংবাদ প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের Field Artillery Training Book এ "আলোক-সঙ্কেতের" নিম্নলিখিত প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে।

"এরোপ্লেন" হইতে নিম্নে আলোক সাহায্যে নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কেতে সংবাদ জানান হইবে।

(ক) অগ্নিবর্ষণের পূর্ব্বে:

একটি শাদা আলোক—আমি লক্ষ্যের উপরে অবস্থান করিতেছি।

একটি সবুজ আলোক—আমি অগ্নিবর্ষণ পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।

(খ) পাল্লা এবং দিক্ নির্ণয় করিবার সময়:—

আলোক সঙ্কেত	দিক্‌নির্ণয়	পাল্লা
একটী লাল আলোক	দক্ষিণে	দূরে
দুইটী লাল আলোক	অনেকটা দক্ষিণে	অনেকটা দূরে
একটী সবুজ আলোক	বামে	বেশী কাছে
দুইটী সবুজ আলোক	অনেকটা বামে	অনেক বেশী কাছে
একটী লাল, একটী সবুজ আলোক	ঠিক লক্ষ্য অভিমুখে হইয়াছে	পাল্লা ঠিক হইয়াছে
একটী সবুজ, একটী লাল আলোক	দেখি নাই	দেখি নাই

লক্ষ্য হইতে ৮ ডিগ্রির বেশী দক্ষিণে কিম্বা বামে গোলা পতিত হইলেই "অনেকটা দক্ষিণে" কিম্বা "অনেকটা বামে" সঙ্কেত করিতে হয়। ৫০০ গজ কিম্বা আরো

কাছে থাকিতেই গোলা স্ফুরিত হইলে সঙ্কেত হইবে "অনেকটা বেশী কাছে" সেইরূপ লক্ষ্য হইতে ৫০০ গজের অধিক দূরে বিস্ফুরিত হইলে সঙ্কেত করিতে হইবে "অনেকটা দূরে"।

(গ) অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে :

লাল সবুজ আলোক, অগ্নিবর্ষণ কার্য্যকরী হইতেছে।

অগ্নিবর্ষণের সময় একটী শাদা আলোক দেখাইলে সঙ্কেত হইবে—"থাম, আমি সংবাদ প্রেরণ করিতে চাই।"

নিম্ন হইতে ৬ ফুট লম্বা ১ ফুট প্রশস্ত শাদা কাপড়ের তৈরি অক্ষর ভূমিতে রাখিয়া এইরূপে ব্যোমবিহারীকে সংবাদ জানান হইবে।

L—লক্ষ্যের দিক্ নির্ণয় কর।

X—পাল্লা লক্ষ্য কর।

V—অগ্নিবর্ষণের কার্য্যকারিতা পর্য্যবেক্ষণ কর।

N—যে সঙ্কেত করিয়াছ উহা আবার দেখাও। ইত্যাদি।

"হাইড্রো-এরোপ্লেন" ("সিপ্লেন") দৌত্য কার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাগর উপকূলে সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিয়া ইহারা বহুদূরে অবস্থিত বা আগমনকারী শত্রু-যুদ্ধপোতের বিষয় অবগত হইতে পারে এবং সঙ্কেতে স্বপক্ষীয়দিগকে সে সংবাদ জানাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উপর হইতে জলতলস্থিত "সবমেরিণ" বা "মাইনের" অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়া ইহারা সঙ্কেতে যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সময়ে বিপদবার্ত্তা জানাইয়া রক্ষা করিতে পারে।

'এরোপ্লেনের' মোটামুটী কার্য্য বিবৃত হইল। "এয়ারসিপ" কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যে খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়—একেবারেই ব্যবহৃত হয় না এরূপও বলা যাইতে পারে। উহাদের বিশাল দেহ এবং অপেক্ষাকৃত মন্থর গতি নিয়া দৌত্যাদি কার্য্যে ইহারা তেমন সুবিধা করিতে পারে না। গোলাবর্ষণে দুর্গ, নগর, যুদ্ধপোত এবং শত্রুব্যূহ ধ্বংস করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য—অনিষ্ট করাই ইহাদের ধর্ম্ম। প্রায় ২৪।২৫ টন গোলাগুলি, বোমা ইত্যাদি বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে বলিয়া ইহাদের ধ্বংস করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত অধিক। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানগণ জেপ্‌লিন সাহায্যে সহরে বন্দরে কত প্রাসাদ কত অট্টালিকা, কত বহুমূল্য ঐতিহাসিক স্মৃতিই না বিনষ্ট করিতেছেন। ২৫শে এবং ২৬শে অগাষ্ট এন্‌টোয়ার্পে গোলা-বর্ষণ করিয়া উহারা "এয়ারসিপের" ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই প্রকার যুদ্ধপ্রণালী সভ্যসমাজে বড় নিন্দনীয় হইয়াছে। অরক্ষিত স্থানে অলক্ষ্যে থাকিয়া গোলাবর্ষণ করিয়া ধ্বংসের বীজ ছড়ান সভ্যসমাজ কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য করিতেছেন; কত নিরীহ—শিশু বৃদ্ধ—স্ত্রীলোক রুগ্ন ব্যক্তিই না অকস্মাৎ বোমা বিস্ফোরণে জীবন হারাইতেছে, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্বিকদের চিরকালের আদরের জিনিস পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে—কে গণনা করিবে। এমনকি রুগ্ননিবাস হাঁসপাতালেও জার্ম্মানদের "জেপ্‌লিন" হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Hague Convention-এ

সমস্ত শক্তিবৃন্দ একত্রিত হইয়া নিয়ম করিয়া ছিলেন—ব্যোমযান হইতে কোনো প্রকার গোলাবর্ষণ করা যাইতে পারিবে না। ব্যোমযান কেবল দৌত্য কার্য্যে এবং সংবাদ সংগ্রহেই ব্যবহার করা যাইবে। আবার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় Hague Convention-এ জার্ম্মাণী, ফরাসী এবং ইটালী এবং আরো অনেক শক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী সমর্থন করেন নাই। সুতরাং এই নিয়মটী কেবল ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী (Contracting powers) পালন করিতে বাধ্য ছিলেন। কেবল উহাদের পরস্পরের মধ্যেই এই নিয়মের বন্ধন আছে।—কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী এবং জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফরাসার বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া কিম্বা অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে ফরাসীগণ যখন যুদ্ধ করিবেন তখন কাহারও উপর এ নিয়মের কোনও বন্ধন থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান যুদ্ধে উপরোক্ত নিয়মটীর প্রচলন নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু অরক্ষিত স্থানের উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ সর্ব্বদাই নিয়ম বহির্ভূত। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে জার্ম্মানগণ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন।

যাহাহউক "এয়ারসিপ" পরিচালনা বড়ই বিঘ্নবহুল। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষীয়ের অসংখ্য "এরোপ্লেন" দিবারাত্রি আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। ইহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাওয়া "এয়ারসিপের" পক্ষে সহজ-সাধ্য হয় না। বিশেষতঃ "এরোপ্লেন" অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং শূন্যে "এয়ারসিপ" অপেক্ষা ইহারা অধিক উচ্চে উড্ডীন হইতে পারে। ইহাদের পক্ষে "এয়ারসিপকে" আক্রমণ করাও সহজসাধ্য—ইহাদের বিশাল দেহে গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে যত সহজে ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় "এরোপ্লেন" তত সহজে বিনষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

মরণের রথ

আসিতেছে মরণের রথ
দিতে তোমা নূতন জীবন,
নিঃশব্দ চক্রনেমী তার
ধীরে ধীরে করে আগমন,
স্বর্ণময় কেতনে তাহার
নর রবি হের, উদ্ভাসিত।
শান্তিময় স্নিগ্ধ সমীরণ
চারি ধারে সদা প্রবাহিত।
পূত শ্বেত কুহেলিকা-বাসে
বিরচিত যবনিকা গুলি,
লাগিবে না পথের সন্তাপ
শত নেত্র দিবে না আকুলি!
—বিবর্ণিত-বিশীর্ণ ও তনু,
আবরিয়া জগতের চক্ষে,
স্নেহময়ী জননীর মত
নিয়ে যাবে আচ্ছাদিয়া বক্ষে।
ভীত কেন, নববধূ সম
ওরে মোর দুর্ব্বল হৃদয়,
এখন ভাবিছ যারে পর,
সেই তোর চির প্রেমময়।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

কাছে থাকিতেই গোলা স্ফুরিত হইলে সঙ্কেত হইবে "অনেকটা বেশী কাছে" সেইরূপ লক্ষ্য হইতে ৫০০ গজের অধিক দূরে বিস্ফুরিত হইলে সঙ্কেত করিতে হইবে "অনেকটা দূরে"।

(গ) অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে :

লাল সবুজ আলোক, অগ্নিবর্ষণ কার্য্যকরী হইতেছে।

অগ্নিবর্ষণের সময় একটী শাদা আলোক দেখাইলে সঙ্কেত হইবে—"থাম, আমি সংবাদ প্রেরণ করিতে চাই।"

নিম্ন হইতে ৬ ফুট লম্বা ১ ফুট প্রশস্ত শাদা কাপড়ের তৈরি অক্ষর ভূমিতে রাখিয়া এইরূপে ব্যোমবিহারীকে সংবাদ জানান হইবে।

L—লক্ষ্যের দিক্ নির্ণয় কর।

X—পাল্লা লক্ষ্য কর।

V—অগ্নিবর্ষণের কার্য্যকারিতা পর্য্যবেক্ষণ কর।

N—যে সঙ্কেত করিয়াছ উহা আবার দেখাও ইত্যাদি।

"হাইড্রো-এরোপ্লেন" ("সিপ্লেন") দৌত্য কার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাগর উপকূলে সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিয়া ইহারা বহুদূরে অবস্থিত বা আগমনকারী শত্রু-যুদ্ধপোতের বিষয় অবগত হইতে পারে এবং সঙ্কেতে স্বপক্ষীয়দিগকে সে সংবাদ জানাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উপর হইতে জলতলস্থিত "সবমেরিণ" বা "মাইনের* অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়া ইহারা সঙ্কেতে যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সময়ে বিপদবার্ত্তা জানাইয়া রক্ষা করিতে পারে।

'এরোপ্লেনের' মোটামুটী কার্য্য বিবৃত হইল। "এয়ারসিপ" কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যে খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়—একেবারেই ব্যবহৃত হয় না এরূপও বলা যাইতে পারে। উহাদের বিশাল দেহ এবং অপেক্ষাকৃত মন্থর গতি নিয়া দৌত্যাদি কার্য্যে ইহারা তেমন সুবিধা করিতে পারে না। গোলাবর্ষণে দুর্গ, নগর, যুদ্ধপোত এবং শত্রুব্যূহ ধ্বংস করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য—অনিষ্ট করাই ইহাদের ধর্ম্ম। প্রায় ২৪।২৫ টন গোলাগুলি, বোমা ইত্যাদি বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে বলিয়া ইহাদের ধ্বংস করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত অধিক। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানগণ জেপ্‌লিন সাহায্যে সহরে বন্দরে কত প্রাসাদ কত অট্টালিকা, কত বহুমূল্য ঐতিহাসিক স্মৃতিই না বিনষ্ট করিতেছেন। ২৫শে এবং ২৬শে অগাষ্ট এন্‌টোয়ার্পে গোলা-বর্ষণ করিয়া উহারা "এয়ারসিপের" ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই প্রকার যুদ্ধপ্রণালী সভ্যসমাজে বড় নিন্দনীয় হইয়াছে। অরক্ষিত স্থানে অলক্ষ্যে থাকিয়া গোলাবর্ষণ করিয়া ধ্বংসের বীজ ছড়ান সভ্যসমাজ কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য করিতেছেন; কত নিরীহ—শিশু বৃদ্ধ—স্ত্রীলোক রুগ্ন ব্যক্তিই না অকস্মাৎ বোমা বিস্ফোরণে জীবন হারাইতেছে, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের চিরকালের আদরের জিনিস পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে—কে গণনা করিবে। এমনকি রুগ্ননিবাস হাঁসপাতালেও জর্ম্মানদের "জেপ্‌লিন" হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Hague Convention-এ

সমস্ত শক্তিবৃন্দ একত্রিত হইয়া নিয়ম করিয়া ছিলেন—ব্যোমযান হইতে কোনো প্রকার গোলাবর্ষণ করা যাইতে পারিবে না। ব্যোমযান কেবল দৌত্য কার্য্যে এবং সংবাদ সংগ্রহেই ব্যবহার করা যাইবে। আবার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় Hague Convention-এ জার্ম্মাণী, ফরাসী এবং ইটালী এবং আরো অনেক শক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী সমর্থন করেন নাই। সুতরাং এই নিয়মটী কেবল ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী (Contracting powers) পালন করিতে বাধ্য ছিলেন। কেবল উহাদের পরস্পরের মধ্যেই এই নিয়মের বন্ধন আছে।—কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী এবং জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফরাসীর বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া কিম্বা অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে ফরাসীগণ যখন যুদ্ধ করিবেন তখন কাহারও উপর এ নিয়মের কোনও বন্ধন থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান যুদ্ধে উপরোক্ত নিয়মটীর প্রচলন নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু অরক্ষিত স্থানের উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ সর্ব্বদাই নিয়ম বহির্ভূত। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে জার্ম্মানগণ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন।

যাহাহউক "এয়ারসিপ" পরিচালনা বড়ই বিঘ্নবহুল। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষীয়ের অসংখ্য "এরোপ্লেন" দিবারাত্রি আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। ইহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাওয়া "এয়ারসিপের" পক্ষে সহজ-সাধ্য হয় না। বিশেষতঃ "এরোপ্লেন" অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং শূন্যে "এয়ারসিপ" অপেক্ষা ইহারা অধিক উচ্চে উড্ডীন হইতে পারে। ইহাদের পক্ষে "এয়ারসিপকে" আক্রমণ করাও সহজসাধ্য—ইহাদের বিশাল দেহে গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে যত সহজে ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় "এরোপ্লেন" তত সহজে বিনষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

মরণের রথ

আসিতেছে মরণের রথ
দিতে তোমা নূতন জীবন,
নিঃশব্দ চক্রনেমী তার
ধীরে ধীরে করে আগমন,
স্বর্ণময় কেতনে তাহার
নর রবি হের, উদ্ভাসিত।
শান্তিময় স্নিগ্ধ সমীরণ
চারি ধারে সদা প্রবাহিত।
পূত শ্বেত কুহেলিকা-বাসে
বিরচিত যবনিকা গুলি,
লাগিবে না পথের সন্তাপ
শত নেত্র দিবে না আকুলি!
—বিবর্ণিত-বিশীর্ণ ও তনু,
আবরিয়া জগতের চক্ষে,
স্নেহময়ী জননীর মত
নিয়ে যাবে আচ্ছাদিয়া বক্ষে।
ভীত কেন, নববধূ সম
ওরে মোর দুর্ব্বল হৃদয়,
এখন ভাবিছ যারে পর,
সেই তোর চির প্রেমময়।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

আরবের অজ্ঞানযুগ

ইসলামের পূর্ব্বতন সময়কে আরব পণ্ডিতরা আরবদেশের 'অজ্ঞানযুগ' (আয়াম্'ল জাহিলিয়েৎ—Days of Ignorance) বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে আরব সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ এই অজ্ঞানযুগের ভীষণ তমসাচ্ছন্ন দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন আরবদেশে সমাজ অতি কুৎসিৎ ও বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিয়াছিল—যখন ঘোর দুর্দ্ধর্ষ রক্তপিপাসু আরববাসী সামান্য উপলক্ষে বিবাদ বাধাইয়া পঞ্চাশৎ বা শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া অকারণ রক্তপাত করতঃ শত শত নরনারীর প্রাণসংহারকার্য্যে নিযুক্ত ছিল (১) যখন ঘোর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মরুবাসী আরবগণ লাম্পট্যে ও মদ্যপানে জ্ঞানহারা হইয়া জগতের যাবতীয় দুষ্ক্রিয়ায় রত ছিল —যখন আরব সমাজে 'অল-আতিয়াবন' নামে কুকার্য্যের স্রোত খরতর ধারে প্রবাহিত হইতেছিল (২) যখন আরবের নারীচরিত্র অতি হীন হইতে হীনতর ছিল—যখন শিশুকন্যার জন্ম অশুভ ঘটনা বিবেচনা করিয়া তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইত এবং শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা এমনকি ভ্রাতৃহত্যা তাহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল; যখন 'কায়নাদ' নামে অভিহিতা হতভাগিনী দাসীগণ নৃত্যগীতে অর্থোপার্জ্জন করতঃ তাহা স্ব স্ব প্রভুকে প্রদান করিত (৩) যখন দাম্পত্যপ্রণয়ানুরাগবিরহিতা রামাগণ পরপুরুষের মনোরঞ্জনার্থ আপন সতীত্বধর্ম্ম অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালনে সম্পূর্ণ উদাসিনী ছিল এবং পুরুষগণও পরদারগমনে রত ছিল এবং উদ্বাহিক নিয়মপালনে বা নিষিদ্ধ- শ্রেণীভেদে অমনোযোগী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পত্নীস্বরূপ গ্রহণ করিত, যখন আরবদেশে 'নেকা-অল-অস্তিব্বা, 'নেকা-অল-সীর') নিয়োগ সদৃশ বিবাহপ্রথা), 'নেকা-অল-সাফ' 'নেকা-অল-বাঘায়া, (বহুপুরুষের সহিত বিবাহ), 'নেকা-অল-মোক্ত' (নিন্দার্হ অর্থাৎ বিমাতৃবিবাহ), 'নেকা-অল-মোতা' (উপস্বত্বভোগী বা অল্পদিনস্থায়ী বিবাহ) প্রভৃতি

(১) বকর ও তগ্‌লব পরিবারের যুদ্ধ আরবদেশে বিখ্যাত। একটি উষ্ট্র কোন স্ত্রীলোকের শস্য নষ্ট করিয়াছিল। রমণী উষ্ট্রস্বামীর প্রতি কটূক্তি করায় বক্ষে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই পঞ্চাশবর্ষব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। ঘোড়দৌড়ের খেলা লইয়া ইহাপেক্ষা ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'হরবে ওয়াহেস'।

(২) C. F. *The Arabs before Islæm* in the History of Islamic Civilization.

(৩) Syed Ahmed. *Essays on the Life of Mohammed.*

বর্ব্বর প্রথা প্রচলিত ছিল (৪) যখন আরবদেশে স্বামী অভ্যাগতব্যক্তিকে আপন স্ত্রী ভাড়া দিত, বিদেশ যাত্রাকালে তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য বন্ধুর অনুসন্ধান করিত, এবং রাখালের মত কার্য্যের বিনিময়ে অন্যলোকের সহিত দাম্পত্য সর্ত্তে অংশীত্ব স্থাপন করিত, যখন আরবেরা ইচ্ছামত অসংখ্য অসংখ্য নারীর পাণিগ্রহণে ও তাহাদিগের বর্জ্জনে তৎপর ছিল,—যখন আরব ও তৎসন্নিহিত দেশসমূহে স্ত্রীলোক বিক্রয়যোগ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত ছিল, যখন সেখানে পৌত্তলিকতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল এবং দেবদেবীর তুষ্টির জন্য বা দেশের মঙ্গলার্থে নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত—সেই সময় হজরত মোহম্মদ ঈশ্বরের সুসমাচার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুসমাচারালোক চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার দূরীভূত করিল। তাঁহার গদ্য কবিতা 'মোয়াল্লাকা,' 'কসিদা, 'মারাসি, প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবির উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট

(৪) The History of Muslim Legue Institutions, chap. Arabia and the Arabs in the days of Ignorance. C, F. Also Robartson Smith's Kinship and Marriage of the Early Arabs.

এতদ্ব্যতীত 'মা মালাকাৎ আয়মান কো'ম (Marriage by capture– বন্দী করিয়া বিবাহ); ক্রয় করিয়া বিবাহ (Marriage by parchase), চুক্তি করিয়া বিবাহ (Marriage by contract), 'বা' আল বিবাহ (baal Marriage), বিনা বিবাহ (Bina marriage), 'নেকা-অল-তফ্‌উইজ' (Marriage by delegation), 'নেকা-অল-শেগার' Mariage of privation), 'নেকা-অল-মোবাদালা (Marriage by exchange), সাদিকা বিবাহ (Shadika marriage) প্রভৃতি আরও অনেক রকম কুৎসিত ও নীচ এবং বর্ব্বরোচিত (Left-hand, Morganatic) বিবাহপ্রথা আরব ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে প্রচলিত ছিল।

আরবদিগের মধ্যে যদিও মাতা, ভাই প্রভৃতি নিষিদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্ভূত ছিল, কিন্তু আরবের সন্নিহিত দেশে আবার এরূপ শ্রেণীভেদও ছিল না। সার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর লিখিয়াছেন যে, এরূপ নীতিভ্রষ্ট আচরণে পারস্য দেশ অগ্রগণ্য ছিল। বিবাহবিধিকে গণনার মধ্যেই ধরা হইত না। দূর সম্পর্কই হউক আর নিকট সম্পর্কই হউক আত্মীয়তার প্রতি আদৌ লক্ষ্য ছিল না। পিতার পক্ষে কন্যা বা ভ্রাতার পক্ষে ভগিনী যেরূপ বৈধ ছিল, মাতার পক্ষে পুত্রও তদ্রূপ বৈধ ছিল; বাস্তবিকই তাহাদিগকে ঠিক পশুদলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ পশুরা কোনরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী নহে।

মিশরে ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ সর্ব্ববাদী-সম্মত ছিল। স্পার্টা নগরবাসীগণ পিতার কন্যাকে এবং এথেনিয়ানেরা মাতার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত, এথেন্সে ভ্রাতৃকন্যার সহিত পিতৃব্যের বিবাহ অতীব প্রিয়তম সম্পর্কের সুখজনক (বা সৌভাগ্যশালী) মিলন বলিয়া প্রশংসিত ছিল। রোমক ব্যবস্থাপকেরা এই নিষিদ্ধ শ্রেণীর বিবাহপ্রথা রহিত করিতে মনোযোগী হন নাই বটে, কিন্তু ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ বন্ধ করেন। রোমক সম্রাট জষ্টিনিয়ানের ব্যবস্থাপনের কঠোরতা সত্বেও সম্রাট ক্লডিয়াসের ভ্রাতা জার্ম্মানিকসের কন্যা—তদীয় ভ্রাতৃকন্যা এগ্রিপার সহিত তাঁহার বিবাহ হেতু ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করা লোকের পক্ষে বিধিসঙ্গত হইল।

রচনাকে মলিন করিয়াছিল। তাঁহার চীৎকারধ্বনি মরুভূমির বড় বড় সঙ্গীতাচার্য্যকে শান্ত করিয়াছিল। তাঁহার গদ্যের অতুল মাধুর্য্যে ও অনুপম রচনাভঙ্গিতে মোহিত হইয়া এবং তাঁহার রচনাবিষয়ের (বা প্রসঙ্গের) মহত্বে বিভোর হইয়া আরবদেশীয় গায়কেরা গান করিতে ভুলিয়া গিয়া মহাগ্রন্থের (কো'রাণ-ই-মজীদের) উত্তেজক সুর উল্লাসিতভাবে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিল। তাঁহার কোরাণের প্রগাঢ় বিষয়বুদ্ধি ও নির্দ্দোষ যৌক্তিকতা অজ্ঞতা বা মুর্খতার পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া আরব কুসংস্কাররূপ লৃতাতন্তু সমূলে নষ্ট করিয়াছিল।

আব্দুল্লার পুত্র মোহম্মদের বিস্ময়জনক কার্য্যাবলী ও নাটকীয় জীবনব্যাপারের লোমহর্ষক আখ্যায়িকা বর্ণনা করা এক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

প্রেরিত পুরুষের ধর্ম্মপ্রচারের পঞ্চমবর্ষে বৈরনির্য্যাতনবিদ্বেষপ্রণোদিত কোরেশগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া যে নবতিজন মুসলমান আবিসিনিয়াদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জাফর অল তায়ার নামে একজন তৎকালীন আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজা নেগুসের নিকট যে বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও মোহম্মদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ধর্ম্মসংস্কার ও তদানীন্তন আরব সমাজের অবস্থার বিষয়ও কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন! আমরা মূর্খ ও ভ্রান্ত ছিলাম, আমরা প্রতিমা উপাসনা করিতাম, মৃতদেহ ভক্ষণ করিতাম, লম্পট ছিলাম, আমাদিগের প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতাম, বলবানেরা দুর্ব্বলের সম্পত্তি অপহরণ করিত। বহুদিন পর্য্যন্ত আমরা এই অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উচ্চবংশজাত, সত্যবাদী, সরল, ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ আসিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আসিতে, তাঁহার ও তাঁহারই কেবল উপাসনা করিতে আহ্বান করিলেন এবং আমাদিগের পিতা ও পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল দেবমূর্ত্তি ও শিলামূর্ত্তির সম্মুখে প্রণিপাত করিয়াছিলেন তাহাদের অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে এবং ঈশ্বরের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে ও অন্য কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য না করিতে আদেশ করিলেন। তিনি আমাদিগের জন্য উপাসনা আরাধনা, দান, এবং সময় বিশেষে উপবাস অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সত্য কথা বলিতে, গচ্ছিত দ্রব্য সমুদয় নিরাপদে প্রত্যর্পণ করিতে, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহশীল হইতে, প্রতিবেশীর উপর দয়ালু হইতে, নৃশংস ও দুর্বিনীত কার্য্য, লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতা-পরিচায়ক বিবাদ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য না দিতে, অনাথদিগের সম্পত্তি অপচয় বা গ্রাস না করিতে, দুরভিসন্ধি বা কুমতলব আরোপ না করিতে, এবং নারীচরিত্রে সন্দিগ্ধ না হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুযোগ ও উপদেশবাণী শ্রবণে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার সত্যবাদিতায় বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল অনুশাসন জ্ঞাত করাইয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়াছি এবং ঈশ্বরের একত্বে

বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। যাহা নিষিদ্ধ তাহা হইতে বিরত হইয়া যাহা অনুজ্ঞাত তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছি। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, মত ও কার্য্যের এই পরিবর্ত্তনে আমাদের দলের লোকেরা ক্রুদ্ধ ও সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা আমাদিগের উৎপীড়ন করিয়াছে, দেবমূর্ত্তি, প্রতিমা ও যে সকল নিষ্ঠুর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছি তাহাতে পুনঃপ্রবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করা অসাধ্য ও নির্য্যাতন যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় আমরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি এবং আপনাকে একজন উদার নৃপতি বলিয়া বিশ্বাস করতঃ আপনার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছি। (৫)

আরবে ঘোর মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রবল ছিল বলিয়াই যে আরবসমাজের ঐরূপ দুর্দ্দশা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইসলামালোক আরবের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় সমাজ হইতে প্রাগুক্ত কুনীতি ও ক্রিয়াপদ্ধতির স্রোত রুদ্ধ হইল। ইসলাম পৌত্তলিকতা, বহু দেবার্চ্চনা, মানবোপাসনা, অগ্ন্যুপসনা, উদ্ভিদপূজা ও প্রাণী উপাসনা সমূলে উৎপাটন করিয়াছে। ইসলাম ঈশ্বরাবতারবাদ, ঈশ্বরে মনুষ্যভাব আরোপ প্রভৃতি মতকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়া থাকে। ইসলাম আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism), হিতবাদ (utilitarianism), হেতুবাদ (Rationalism), প্রত্যক্ষবাদ (Positivism-নিসর্গবাদ), জড়বাদ (materialism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), সংশয়বাদ (Scepticism), অতীন্দ্রিয় সারাৎসারতত্ত্ব (Transcendentalism), প্রভৃতি তত্ত্বের (বা মতের) ঘোর প্রতিবাদী ও খণ্ডনকারী। ইসলাম ভোজনবিলাসিতা, দেহাত্মবাদ, দৈহিক পরিণামবাদ, সর্ব্বশূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, অনুমেয়-বাহ্যবস্তুবাদ, প্রত্যক্ষ বাহ্যবস্তুবাদ প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনান্তর্গত মতের পরম বিদ্বেষী।

ইসলাম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব ও মহিমা স্বীকার করে। ইসলাম সর্ব্বনিয়ন্তা অক্ষয় সনাতন, অজর, অমর, নির্ব্বিকল্প নিষ্কাম ঈশ্বরের মহিমা যেরূপ বিবৃত করিয়াছে, আর কোন ধর্ম্মমতেই এরূপ দেখা যায় না বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ঈশ্বরের এরূপ সর্ব্বশক্তিমানত্বের ব্যাখ্যা করায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন যে, মোহম্মদের ঈশ্বর যথেচ্ছচারী (Despot)।

যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তখন তাঁহার সৃষ্টবস্তুর উপর তাঁহার যে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ সাধন করিতে পারেন! তাঁহার মহিমা অপার। তবে কতকগুলি নিয়ম ও শক্তির উপর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

---

(৫) এবে অল-আসির, ও এবে হিশাম ১ম খঃ, ২১৯পৃঃ।

Cf. Contributions to the History of Islamic Civilisation. The History of Muslim League Institutions. pp 363

নৈসর্গিক নিয়ম (laws of Nature), নৈসর্গিকশক্তি (Forces of Nature), প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য (Iconomy of (Nature), মহাকষণশক্তি (Gravilation) প্রভৃতি তাঁহারই কৃত ও তাঁহারই অধীন!

মহাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার হওয়ায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না বলিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু এই মহাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণশক্তির উপর আর কি কোন মহাশক্তি নাই যাহা ইহার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে? অবশ্যই এই শক্তির এক আদিউৎপাদক ও পরিচালক আছেন, যিনিই ঈশ্বর। এজন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক মহাত্মা নিউটন বলিয়াছেন (৬) যে, মহাকর্ষণ শক্তির উপর নিশ্চয়ই একজন স্বেচ্ছাচারী পরিচালক বা কর্ত্তা (Voluntory agent) আছেন, নচেৎ ইহা বিশৃঙ্খল (Chaotic) হইয়া যাইত। এই নিমিত্তই ইসলাম এই মহাকর্ষণ শক্তির উপরতন পরিচালক ঈশ্বরকে মহাপরাক্রান্ত ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বভৌম সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে। ইসলাম এই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর বা সৃজনক্ষম সত্যের বিদ্য-মানতা স্বীকার করে না, এবং তাঁহারই আদেশ ও নিষেধআজ্ঞা পালন করিতে ও তাঁহারই উপাসনা করিতে আদেশ করে।

মোহম্মদ কে, চাঁদ।

দান

আমার এ প্রেম আকাশের মত
বিছায়ে দিলাম তোমার পরে,
আমার এ গান, বাতাস নিয়ত
নিখিলে ছড়াল তোমারি তরে।
দূরতা কেমন, বাধা সে কোথায়
ঘুচিল আড়াল দোঁহার মাঝে,
অপার সোহাগ ঘিরেছে কায়ায়
অশেষ ছন্দ হিয়ায় বাজে।
বুকের পরশ পারে নিশিদিন
যেথা যাবে তুমি রহিবে সাথে
তুমি ঘুমাইলে স্বপন প্রহরী
চন্দ্র তারকা জাগিবে রাতে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

(৬) Brewsters (Sir David) *Life of Sir Isaac Newton* Chap XV, pp. 242-265. Elsewhere he writes, "He admits that gravity might put the planets in motion, but he maintains that, without the Divine powers it could never give them such a circulating motion as they have about the sun, becouse a proper quantity of a transverse motion is necessary for this purpose, and he concludes that he is compelled to ascribe the frame of this system to an intelligent agent."

অভাগা

(ইংরাজি হইতে)

অন্ধকার। একটা রেলিং-ঘেরা বাড়ীর সামনের বাগানে, এক গাছের তলায় একটা লোক অনেকক্ষণ হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছিল। যেন একটা কিছু কুমতলব সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে অনেকক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছে! যখন সে দেখিল কেহ কোথাও নাই, বীটের পাহারাওয়ালা টহল দিয়া চলিয়া গেল, তখন ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে গাছের ছায়া হইতে সরিয়া আসিল। আর একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৌশলে, নিঃশব্দে রেলিং টপকাইয়া সেই বাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িল!

চোর সে! চুরি করিতে আসিয়াছে কি?

বাড়ীর কেহ জাগরিত আছে কিনা পরখ করিবার জন্য প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে জোরে একটা শিশ্ দিল। শিশের শব্দ নিস্তব্ধ গগনতলে প্রতিধ্বনিত হইয়া বায়ুস্তরে মিলাইয়া গেল—কাহারও জাগিয়া থাকিবার লক্ষণ সে দেখিতে পাইল না!

দিনের বেলায় লুকাইয়া সে বাড়ীর বাহির দিকটা একবার দেখিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে একটা লোহার সিঁড়ি ছিল; ধীরে ধীরে সোপানরাজি অতিক্রম করিয়া চোর দ্বিতলের খোলা বারান্দায় উঠিল। অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতরের রোয়াকে প্রবেশ করিল। পায়ে ঠেকিয়া একটা কাচপাত্র দূরে গড়াইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল—বুকের ভিতর রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল—আপনার বুকের স্পন্দন শব্দ সে যেন নিজেই শুনিতে পাইল; মনে হইল যেন শব্দটা সজীব হইয়া গৃহস্বামীকে তীব্রস্বরে সতর্ক করিয়া দিতেছে—ওঠ, ওগো ওঠ, ঘরে চোর এসেছে! চকিতে সে দুয়ারে টাঙ্গান একটি নীল পর্দ্দার পার্শ্বে সরিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। কাণ পাতিয়া শুনিল কেহ জাগিল কিনা, কেহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল কিনা! অনেকক্ষণ কাটিল—যখন সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল কেহ শয্যা ত্যাগ করে নাই—তখন সে পকেট হইতে চোরা লণ্ঠনটি বাহির করিল,—কল টিপিয়া তাহার স্বল্পোজ্জ্বল আলোকে একবার স্থানটির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইল। এই গৃহ একদিন তাহারই গৃহ ছিল, শত স্মৃতিপূর্ণ তাহার সেই গৃহখানি চোর সাজিয়া আজ সে একবার দেখিতে আসিয়াছে! হায় রে!

গৃহপ্রবেশ করিতেই দেয়ালের একখানি চিত্র তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুঠাম-সুন্দর এক যুবক, কুশল চেয়ারে উপবিষ্টা বিংশতি বর্ষীয়া এক অনিন্দিতা যুবতীর গলা জড়াইয়া দণ্ডায়মান—যুবতীর ক্রোড়ে আড়াই বৎসরের এক শিশু; কি কমনীয় তা'র মূর্ত্তি—কি মধুর তা'র কচি মুখখানিতে হাসির রেখাটি—কি সুন্দর তা'র বড় বড় ওই চোখ দুটি! কপালে কপোলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

অযত্ন-ন্যস্ত দীর্ঘ কেশরাজিতে তাহার মুখখানি পত্রপরিবৃত ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। চিত্র দেখিয়া তাহার গায়ের রক্ত বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গেল—নিশ্চল প্রস্তরের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। তীব্র স্মৃতির জ্বালায় তাহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। মনে পড়িল সে খুনে,—ভগবানের চক্ষে না হউক, লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে রাজ্যের চক্ষে সে খুনে! পুলিশের ভয়ে সে পলাতক! সতের বৎসরের পুরাতন স্মৃতি যেন তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে সবলে টানিয়া ছিঁড়িতে উদ্যত হইল। হায়! এ যে তাহারই ছবি—অনেক দিনের পুরাতন ছবি। চক্ষু দুটি তা'র অশ্রুসজল হইয়া উঠিল! তাহারই প্রিয়তমার কোল আলো করিয়া তাহাদের প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রিয়তম পুত্র 'জিম! হায়! সেই অতীত সুখের দিন! সে যে নির্দ্দোষ একথা সে কি বিশ্বাস করিবে? এই গৃহে সে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। সে যে পত্নীঘাতী নয় কাহার নিকট সে একথা বলিবে? কে তাহার বাক্য প্রত্যয় করিবে? নির্দ্দোষী হইয়াও আজ ১৭ বৎসর সে পথে পথে নিরাশ্রয়ে, অর্দ্ধাশনে, অনশনে, অনিদ্রায় সদাসশঙ্ক ভাবে দিনযাপন করিতেছে! যেদিন তাহার পত্নী আততায়ীর হস্তে (কে সে আততায়ী, নরঘাতক দস্যু কে জানে!) নিষ্ঠুর ভাবে হত হয়, যেদিন নির্ব্বোধ পুলিশের দল অন্য প্রমাণাভাবে তাহাকেই তাহার পত্নীর হত্যাকারী বলিয়া ধরিয়া চালান দেয়। সেই দিন হইতেই তাহার এই যন্ত্রণাময় জীবন আরম্ভ হইয়াছে,—পুলিশের হাজত হইতে পলাইয়া সে এই অজ্ঞাত বাস আরম্ভ করিয়াছে। প্রিয়তম পুত্র 'জিম্‌কে ছাড়িয়া, সমস্ত সম্পর্ক সুখ ত্যাগ করিয়া সে আজ সতের বৎসর এই দুঃখের জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছে,—আর যে সে পারে না! এ জীবন যে তাহার নিকট বড় দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে!"

সহসা পশ্চাতে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল; সে যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে যাইবে অমনি ব্যাঘ্রের মত এক বিংশতি বর্ষীয় যুবক তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। হস্তস্থিত গুপ্ত লণ্ঠন মাটিতে পড়িয়া গেল, অতর্কিত আক্রমণে কাবু হইয়া অবসন্নহৃদয় চোর স্বেচ্ছায় বন্দী হইল। ষোড়শ বর্ষীয়া অর্দ্ধবিকম্পিতা গোলাপের মত সুন্দরী এক কিশোরী গৃহস্থিত বৈদ্যুতালোকের কলটিপিয়া যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; বিদ্যুতের তীব্রালোকে চোর যুবকের মুখখানা একবার দেখিয়া লইল। একি! এযে সেই আড়াই বৎসরের শিশুর পরিণত বয়সেরই মুখচ্ছবি! মুখখানা যে জিমেরই মত! এ কিশোরী—তরুণী তন্বী কে? হয়ত ইহারই পত্নী! তাহার মনে হইল একবার সেই যুবককে আপনার বক্ষে জড়াইয়া ধরে, সহস্র চুম্বনে তাহার মুখখানি ছাইয়া ফেলে, বক্ষে টানিয়া বলে—"আমার বুকের ধন বুকে আয়—আমি যেরে হতভাগ্য বাপ তোর!" কিন্তু সে সাহস হইল না—কি জানি, পাছে লোকে কিছু বলে, যদি না সে চিনিতে পারে—পাছে কিছু মনে করে—যদি চোরকে সে পিতা বলিতে ঘৃণা করে! হায়, হতভাগ্য! জীবনে তাহার ধিক্কার

হইল—তাহার ঘৃণিত জীবনের পরিচয় দিতে—সেই নিষ্কলঙ্ক কুসুমের পিতৃত্ব গ্রহণ করিতে—তাহার নিজেরই লজ্জা হইল। আপনার প্রতি একটা ঘৃণা একটা ধিক্কার তাহাকে নীরব করিয়া রাখিল। * * * প্রত্যুষে,—সে বন্দী হইয়া পুলিশের করে সমর্পিত হইল। অভিযোগ চুরি!

* *
*

সপ্তাহকাল পরে যুবকের নিকট পুলিশের বড় সাহেবের একখানা চিঠি আসিল,—"বন্দী হাজতে আত্মহত্যা করিয়াছে,—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অভিযোক্তা যুবকের নামে একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে প্রেরিত হইল।" যুবক বন্দীর চিঠি খুলিয়া পাঠ করিল,—

"প্রিয়তম পুত্র,

তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, কিন্তু আমি তোমায় চিনিয়াছিলাম। আমি তোমার সেই নিরুদ্দিষ্ট, লোকসমাজে ঘৃণিত, পুলিশ প্রপীড়িত হতভাগ্য পিতা! আমি নির্দ্দোষ কিন্তু সেকথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি পার—বিশ্বাস করিও তোমার পিতা নরঘাতক দস্যু নয়,—যদিও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আজ সে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত তথাপি সে একটি দিনের জন্যও পরস্বাপহরণ করে নাই! তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে এই ভাবিয়াও আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। পৃথিবীতে কেবল তুমিই জানিলে আমি নির্দ্দোষ!

ইতি—তোমার হতভাগ্য পিতা
টম।"

যুবক আর্দ্র নয়ন মুছিয়া চিঠিখানা পেপার বাস্কেটে ফেলিয়া দিল!

শ্রীদানীশচন্দ্র সরকার।

কোথায়?

জীবনের মিছে আশা যত
ওগো তারা কোথা চলে যায়?
কোন সাগরের অতল গভীরে
কোন্ আকাশের অসীমায়?

ওগো তারা কোথা চলে যায়
পলকের হাসির বিজুলি?
কোন্ চিত্রকর তাদেরে লুকায়
বুলাইয়া আঁধারের তুলি!

কোন্ পথে পলায় কেমনে
নিমেষের কথা আর গান,
কোন জনমের বুকের মাঝারে
স্মৃতি হয়ে লভে অবসান?

ওগো ফিরে দে ফিরে দে তোরা
যত সব হারান নিমেষ,
শুধু তাই দিয়ে রচিব একেলা
আমার সে অসীমের দেশ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৫০—মৃত্যু ১৯১৫, ২৯ শে জানুয়ারী।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ও বিশেষ বন্ধু ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁর সুস্থ শরীর, আনন্দময় স্বভাব, ও যুবকের ন্যায় কাজে উৎসাহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার শরীরে কোন রোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ, চলা ফিরা এবং কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া কখনও মনে হইত না তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। সর্ব্বদাই কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। অসুখ হইয়াছে একথা তিনি কখনও বলিতেন না বা বলিতে দিতেন না। হায়! হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া—তাঁর পরিবার পরিজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহা তিনিই জানেন!

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ গাঁতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গগত পণ্ডিত রামচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। অধ্যয়ন পরে গিলক্রাইষ্ট স্কলারসিপ্ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বৎসর বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া Dr of Science উপাধি লাভ করেন। তৎকালিন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ তিনি Boxter physical Science Scholership এবং Hope Prize লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যতদূর অবগত আছি এ পর্য্যন্ত কোনও দেশীয় বা বিদেশীয় ব্যক্তি এই দুইটি বিষয়ে এক সঙ্গে পারদর্শী হইতে পারেন নাই। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার অঘোরনাথ রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষরূপ চর্চ্চা করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে গমন করেন এবং Bohn বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার মত লোক হায়দ্রাবাদ নিজাম কলেজে না থাকিলে সেখানকার কলেজ আজ এরূপ ভাবে মাথা তুলিতে পারিত কি না সন্দেহ। হায়দ্রাবাদের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তি করিত ও ভাল বাসিত।

দূর হইতে সকলে তাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু যিনি তাঁহার সহিত একবার পরিচিত হইতেন তিনিই বুঝিতেন, যে, গভীর পাণ্ডিত্যের মধ্যে কিরূপ একখানি স্নেহময় কোমল হৃদয় লুকান রহিয়াছে। সর্ব্বদাই দেখিতাম তিনি প্রফুল্ল এবং এক মুহূর্ত্তও তাঁহাকে কাজ হইতে বিমুখ হইতে দেখি নাই। বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে আসিয়া পাঁচ মিনিট বিশ্রাম না লইয়াই কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের পড়াইতেন। সে পরিশ্রমের মধ্যে

তাঁহার নিজের কোনরূপ স্বার্থ ছিল না,—জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ করা এবং পরোপকার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কখনও তাঁহাকে বিরক্ত হইতে বা রাগ করিতে দেখি নাই। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম "লোকে বলে যাদের রাগ নেই তারা মানুষই নয় এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"—তিনি উত্তর দিলেন "নিশ্চয়ই এতো সত্যি কথা"।

"আমি তবে একটা কথা বলি ক্ষমা করিবেন আপনার তো রাগ নেই।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "রাগ খুবই আছে কেবল সে জিনিষটার ব্যবহার করা হয়

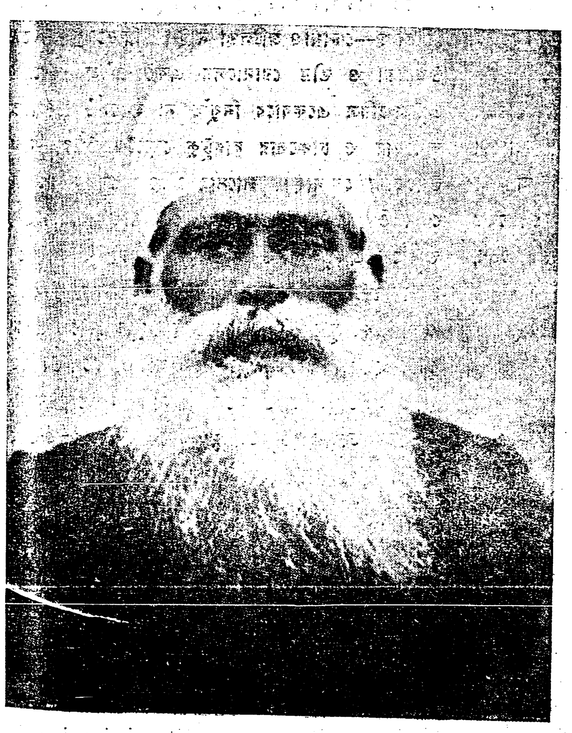

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

না।" কি সুন্দর কথা; কয়জন লোক এরূপ ভাবে ক্রোধকে জয় করিতে পারিয়াছেন।

ছোট বড় সকলেই নির্ভয়ে তাঁহার সহিত মিশিতেন। তাহার সরল শিশুর ন্যায় হাসিতেই তাঁর হৃদয়ের ছবি প্রকাশ পাইত। এমন অমায়িক এবং নিরহঙ্কার,—এমন স্নেহময় উদার হৃদয়,—এমন নির্দ্দোষ স্বভাব কমই দেখা যায়। একাধারে এরূপ জ্ঞানী ও গুণী আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত প্রত্যেককেই তিনি নিকটতর করিয়া লইতেন এবং ভালবাসিতেন। তাঁহার গুণের কথা আমি আর বিশেষ করিয়া কি বলিব। আজ কত হৃদয় তাঁহার অভাবে হাহাকার করিতেছে। তাঁহার স্নেহের ঋণ শোধ হইবার নয়, কিন্তু তাঁহার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ শতাংশের একাংশও আমরা তাঁহার জন্যে কিছু করিতে পারি নাই—এ দুঃখ জীবনেও যাইবে না।

বিধাতা তাঁহার পরিত্যক্ত পুত্রকন্যা এবং বিধবা পত্নীর অন্তরে সান্ত্বনা দিন। তাঁহার স্বনামধন্যা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কবি বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশা করি অন্যান্য পুত্র কন্যারাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

সমালোচনা

গীতগোবিন্দ। (মূল ও তাহার পদ্য অনুবাদ) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। কবি জয়দেব রচিত 'গীত-গোবিন্দ" ভাবের মহিমায় ও ছন্দের লালিত্যে বিশ্ব-সাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছে। ইহার বহু গান বহু শ্লোক লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সুকবি বিজয়চন্দ্র তাহারই সমগ্র পদ্যানুবাদ মূলসহ প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি সংক্ষেপে গ্রন্থ ও গ্রন্থ-কারের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যেমন মধুর, তেমনই সুবিন্যস্ত হইয়াছে; তাহাতে গবেষণার হুঙ্কার নাই, ভাষার প্যাঁচ নাই—পাঠকের মনে সে সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু একেবারে গাঁথিয়া যায়। বাঙ্গালা অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যও তিনি বেশ দক্ষতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। না বাছিয়া যেখান-সেখান হইতে আমরা দুই একটি অনুবাদ মূলসহ উদ্ধৃত করিলাম—তাহা হইতেই লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। জয়দেব গাহিয়াছেন,

"নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহুমনুতে তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুং।

কবি বিজয়চন্দ্র অনুবাদ করিয়াছেন,

"সঙ্গীতে তব নামে করি কত সঙ্কেত
গাহিছেন হরি মৃদু বেণুতে;
তব তনু-পূত বায়ু ধূলি দেয় অঙ্গেতে,—
তিরপিত তবু সেই রেণুতে।"

জয়দেব গাহিয়াছেন,—

"মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে॥"

বিজয়চন্দ্রের অনুবাদ,

"ললাট হইতে মুছি শ্রমজল, আঁক শুচি
ললিত-তিলক অতি যতনে;
কনক-চাঁদেতে যেন শোভিছে তিলক হেন;
ফুটিবে অমল শোভা বদনে।"

গ্রন্থের ছাপা-কাগজ প্রভৃতিও বেশ নয়নাভিরাম হইয়াছে।

ক্লিওপেট্রা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু, কলিকাতা, ৬নং ভীম ঘোষের লেন। গ্রেট ইডিন্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি 'পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক'। লেখক 'ভূমিকায়' বলিয়াছেন, "মূল ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কাল্পনিক চরিত্র-সংযোগে বাংলা রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া এই নাটকটি রচিত। ইহা কোনও বিদেশী নাটকের অনুবাদ নহে। ফেরো-চরিত্রের অনেকটা আভাষ বায়োস্কোপ হইতে লওয়া। তা-ছাড়া সমস্ত চরিত্র গুলিই আমার নিজের কল্পনা।" সুখের বিষয়, এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহাতে নাটকীয় গতিটুকু বেশ সুশৃঙ্খল ধারায় বহিয়া চলিয়াছে—কোথাও জটিলতা নাই। ক্লিওপেট্রা-চরিত্রে উদ্দামতা ও তীব্র রোমান্সের একটা ঝাঁজ আছে। এণ্টনি-চরিত্র একেবারে নিখুঁত না হইলেও তাহাতে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের দাহটুকু মোটের উপর মন্দ উপভোগ্য হয় নাই। লাসোর চরিত্রে লেখক স্বদেশ-প্রেম ও এণ্টনি-ভক্তির যে রেখাপাত করিয়াছেন, তাহাতে একটু আতিশয্য-দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল—চরিত্রটি তেমন সজীব নহে, অনেকটা পুঁথিগত ও নাটকের দৃশ্য-বর্দ্ধনের সহায়তাই শুধু করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নাটকে এ চরিত্রটি না থাকিলে কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া ত মনে হয় না। নাটকে কথা-বার্ত্তার ভাষায় ও ভঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব এতখানি পড়িয়াছে যে অনেক স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত ছত্রের পুনরাবির্ভাবও ঘটিয়া গিয়াছে; যথা ক্লিওপেট্রা এক জায়গায় বলিতেছে, "রাণীর প্রেম হিংসার চেয়েও নিষ্ঠুর—নিয়তির চেয়েও দুর্ব্বার—খড়্গের চেয়েও কঠোর।" আবার এণ্টনি বলিতেছে, "আজ আর তার হৃদয়ে সে বল নেই, বাহুতে সে শক্তি নেই—আজ তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।" ইত্যাদি। অবশ্য এমন কথা আমরা বলি না যে লেখক ইচ্ছা করিয়াই এ ছত্রগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—অপ্রতিহত

ভাবেই হয় ত আসিয়া থাকিবে। গানেও তেমনই কয়েকস্থলে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নর্ত্তকীরা গাহিতেছে, "ওগো যৌবনখানি মম—নিঙাড়ি এনেছি পাত্রে আঙ্গিকে দলিত দ্রাক্ষাসম।" লেখক সুশিক্ষিত, নাটক-রচনায় তাঁহার হাত আছে, তাঁহার ভাষাও শক্তিমানের ভাষা.—সেইজন্যই ত্রুটিগুলির প্রতি আমরা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিলাম। আশা করি, এগুলির প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। কালে তাঁহার নিকট হইতে আমরা নির্দ্দোষ-সুন্দর নাটকের প্রত্যাশা করি। ক্লিওপেট্রার ছাপা-কাগজ ভালো; কভারে এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার একখানি ক্ষুদ্র রঙ্গিন ছবি আছে।

সপ্তস্বরা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানিও কবিতা-পুস্তক। লেখক কবিতাগুলির স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পল্লীসপ্তক, বর্ণসপ্তক, পূজাসপ্তক, সুরসপ্তক, শোভাসপ্তক, নারীসপ্তক ও গীতিসপ্তক। প্রত্যেক বিভাগে সাতটি করিয়া কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'পল্লী-সপ্তকে'র কবিতাগুলিতে বঙ্গপল্লীর অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্য্যটুকুর সুন্দর রেখাপাত হইয়াছে —কবিতাগুলিতে 'নীরব দুপুরে ঘুঘুর ডাক', 'পল্লী রূপসীর কাঁকণে-কলসে বেজে ওঠা ছন্দ' যেমন বিচিত্র সুরে বাজিয়াছে, পল্লীর আনন্দ, উৎসব ও সুখ-দুঃখের রাগিণীও তেমনই তাহারই পাশে পাশে রণিয়া উঠিয়াছে। তবে কবি এখনও নবীন, তাই মাঝে মাঝে ভাষা একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে—ভাবও দুই চারি স্থলে অবাধে সাড়া দিয়া উঠে নাই—ছন্দেও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। "যুবতীরা অসংকোচে ডুবিয়ে দেহবল্লরী —ভাসিয়ে ঘড়া গা হাত মাজে ঝুমঝুমিয়ে মল চুড়ি।" এ সুরটুকু সহজ বা সরল নহে; অথচ, অপর কবিতায় "পুরুষ দেখে নাইতে যেতে গিন্নি ঝি-বউ নিয়ে—রাস্তা ছেড়ে পিছন ফিরে দাঁড়ান ঘোমটা দিয়ে"—চিত্রটুকু সুন্দর। 'নারী-সপ্তকে'র অধিকাংশ কবিতাই আমাদের ভালো লাগিয়াছে। লেখক 'বঙ্গ-বধূর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দিব্য মধুর হইয়াছে—যেমন স্বাভাবিক, তেমনই মনোরম।

"বাসন মাজা, ঘরঝাঁটান, পিদিম-সজ্জি করা
জল তোলা আর কাঁপড় কাচা, ছেলে-পিলেও ধরা
বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, রান্না-আদি কাজে
এমন নিপুণ একটু মেয়ে,—কোথায় বা আর আছে?
সবার শেষে পাতের ভাতে লাগে কাহার সুধা—
অতিথ এলে সময় গেলে কার থেকে যায় ক্ষুধা?
প্রেমের তরে প্রেমাস্পদের কোথায় এমন দাসী?
বাংলা দেশের বঙ্গবধূ—ধন্য সে-দেশবাসী!"

'নারী' কবিতাটিও ভাবৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত, মহিমায় উজ্জ্বল।

"রূপের প্রতিমা নারী পরিচয় রূপেরি কেবল
রূপেই সম্মান,
নারীত্বের এমন দুর্নাম? নহে এ ত উপাসনা
ঘোর অপমান!

* * * * *

বাহিরের চাক্‌চিক্য ক্ষণিকের এই আবরণ—
রঙ্গীন্ মলাট,—
এত তার স্তব গান! তারি হেন বিজয়-নির্ঘোষ?
এত তার ঠাট!
আনিতম্ববিলম্বিত এই ত্রস্ত চিকুর কলাপ
এ হেম বরণ,
এ বিলোল অনাবিল সলীল চাহনি ভঙ্গী
ললিত চরণ—
এর মাঝে আছে শুধু একখানি অলক্ষিত প্রাণ
সুন্দর সে কত;

* * * * *

দেখিবে এ রূপ যদি এস তবে ঝাঁপ দিয়ে পড়
মায়ের হৃদয়ে,
কি যে সে গরিমাময় সন্নত সুন্দর রূপখানি
আত্মবিনিময়ে!
ভগ্নীর হৃদয়-সৌধে আয় ওরে অনর্গল দ্বার
খোলা আছে পড়ি—

উদগ্র সে বাহুদুটি প্রসারিত দ্বারপথে অই
নিতে গলা ধরি।
দয়িতার বক্ষ-দ্রাক্ষা -কুঞ্জবনে এসে দেখ রূপ
উজ্জ্বল মধুর—" ইত্যাদি

ছত্রগুলি চমৎকার; কবি-হৃদয়তার পরিচায়ক বটে। গীতি-সপ্তকে'র কয়টি কবিতায় লেখক কৌতুক-রস অবতারণার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু কৌতুক-রসে তাঁহার শক্তির সেরূপ পরিচয় পাইলাম না। এ কবিতাগুলিতে কৌতুকরস ত উথলিতে পারেই নাই, উপরন্তু ছন্দে রীতিমত জটিলতা থাকায় বর্ণনাও পরিস্ফুট হয় নাই। 'পূজাসপ্তকে' লেখক রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল ও মাইকেল মধুসূদনের আবৃতি করিয়াছেন ও সেই প্রসঙ্গাবলম্বনে তাঁহাদের কয়খানি প্রতিকৃতিও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, সপ্তস্বরা' পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবির সাধনা সফল হৌক্, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

তৃষা। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার প্রণীত। কলিকাতা, নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয় হইতে এস, কে, বাগচি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। পুস্তকখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

খঞ্জনী। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র 'গীতি-কাব্য'; খণ্ড ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। অধিকাংশই ইংরাজীর অনুবাদ এবং 'অনেক-গুলিই লেখকের বাল্য-রচনা।' কবিতাগুলি মোটের উপর মন্দ নহে।

মুকুল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শিলচর ১৩২১। মূল্য আট আনা; বাঁধাই দশ আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক; বিশেষত্ব-হীন রচনা।

মোহ-মুদ্গর। মূল ও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য এক আনা।

খেয়াল। শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী-প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীতারকনাথ বাগচী, ৯।২ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা। অবসর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক। লেখক "মুখ-বন্ধে" বলিয়াছেন, "মনে যদি ভাব ওঠে, কে রাখে তা চেপে। যে রাখে সে বোবা হয়—নয় যায় ক্ষেপে।" তাই তিনি ছোট-খাট যে ভাবটুকু যখনই মনে আসিয়াছে, তাহাই ছন্দাকারে গাঁথিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি কবিতাই চুটকির ধরণে লিখিত—সেগুলি ভাবৈশ্বর্য্যে ও প্রকাশের সরলতায় প্রবাদের মতই লোকের মুখে মুখে চলিবার মত হইয়াছে। কবিতাগুলি আগাগোড়া ঝরঝরে; সরলতাও অধিকাংশ স্থলে নিপুণতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে, পড়িতে বাধে না। দুই-একটি চুটকি কবিতা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না;—

"প্রেম যদি চাও, তবে চেয়োনাক মান।
এক কোষে দুই অসি—কোথা বর্ত্তমান!"

"হৃদয়-বিহীন রূপ—রূপই কেবল।
ভিতরটা সব ফাঁপা, যেন ফুটবল।"

অনেক কবিতায় ব্যঙ্গও তীব্র মধুর ফুটিয়াছে যেমন,—

"তাকিয়া তামাক তাস নিয়ে তোষামুদে।
বাঙ্গালী কাটায় কাল হায়, আঁখি মুদে।"
"ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যারা চেঁচায় বেজায়।
ঘুড়ির লাঙ্গুল ধরে তারা স্বর্গে যায়।"
"তড়িৎ ও চাটুবাদ—পদার্থ এ দুটা।
শক্তিবলে এ ধরাকে করে আছে মুঠা।"

তবে চুটকি কবিতাগুলির ভাবের সহিত সর্ব্বত্র আমাদের মতের মিল নাই। আবার এমন কতকগুলি কবিতাও এই গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে, ভাবে ও ছন্দে যেগুলি নিতান্তই দীন; সেগুলি প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল। গ্রন্থে স্বনামধন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের একখানি ও গ্রন্থকারের নিজের একখানি—এই দুইখানি ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

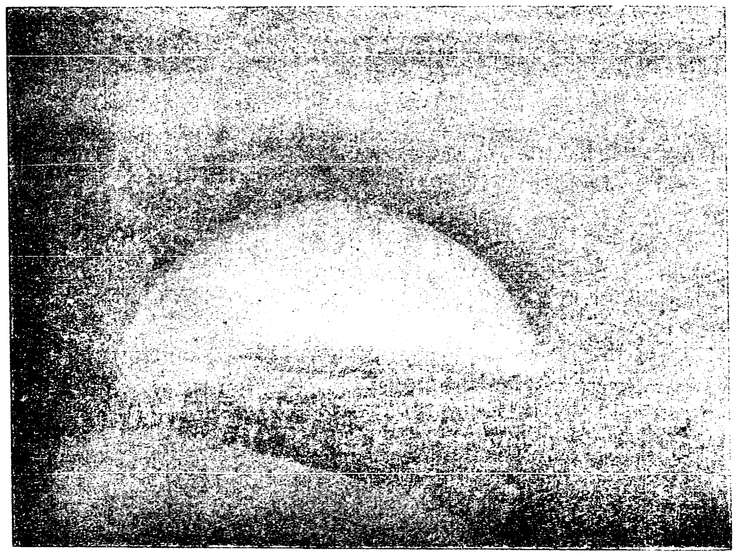

বর্ষশেষ

ভারতী

৩৮শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২১ [১২শ সংখ্যা

বর্ষবিদায়

আয়রে দলে-বলে জুটে, আয়রে ছুটে নবপ্রাণ!
এবার ভবে তোদের পালা ; মোদের খেলার অবসান।

রৌদ্রে পোড়া দুঃখে ব্যথায়,
তরু-লতার ঝরা-পাতায়
লুটিয়ে পড়ে ঐ যে অতীত, ব্যর্থ করে অর্থ, মান।
বর্ষশেষে আয়রে হেসে, ওরে শিশু বর্ত্তমান।

পরাজিত জীবন-রণে
অন্ধ বৃদ্ধ, বিজন বনে
লুকিয়ে থাকুক ; আবার জাগুক বিশ্বজনের ইষ্টগান।
মুছিয়ে অশ্রু, ফুটাও হাসি গৃহে গৃহে বিশ্বপ্রাণ!

ওগো নবীন, ওগো তরুণ!
দৃষ্টি ফেলে মিষ্ট করুণ
প্রাচীনে আজ দাওগো বিদায় ; বর্ষ হল অবসান।
নবোৎসবের বিশ্ব-বাসে এস প্রভু ভগবান।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বসন্তের কথা

শীতাকাশে ধূসর ম্লানিমা আর নাই। দিক্‌চক্রবাল অন্তরাল করিয়া কুয়াশার যে ঘন যবনিকা আমাদের উৎসুক দৃষ্টিরোধ করিতেছিল তাহাও অন্তর্দ্ধান। প্রকৃতি যোগনিদ্রাহত ছিলেন তাই জীবনের গতি যেন স্থগিত ছিল; উৎসরাজির কলসঙ্গীত হিমানী-ব্যাঘাতে নিস্তব্ধ, স্রোতস্বিনীর স্রোতধারা শ্রান্ত মন্থরগতি, ম্রিয়মান-প্রবাহ, পত্রহীন রিক্ত তরুসমূহ মর্ম্মর গান ভুলিয়া মূক হইয়াছিল। গায়ক বিহঙ্গকুল দূরান্তর প্রবাসে; আশার কাকলি আর কে শোনায়? অন্তরে বাহিরে মৌন প্রতীক্ষা বিরাজ করিতেছিল। পৌষ মাঘে যে রস-সৌন্দর্য্যধারা ফল্গুর ন্যায় অন্তরবাহিনী ছিল, ফাল্গুনে আজ তাহা দিকে দিকে উৎসারিত; ধূসর আকাশের ক্লান্ত দৃষ্টি আনীল অপরাজিতার স্নিগ্ধ বর্ণে নয়ননন্দন, নবপল্লবশোভিত বনপ্রান্তর মর্ম্মর গানে মুখর, পিক পাপিয়ার ঝঙ্কারে আনন্দময়, শ্যাম-পত্রান্তরে কুসুমসুষমা বর্ণবৈচিত্র্যে নব বসন্তের অভ্যুদয় প্রচার করিতেছে, বৎসরের এই প্রভাত কাল, এই তরুণ কৈশোর অরুণ পুষ্পের লাবণ্য বহিয়া আনে, তাই আজ অশোক কিংশুকের প্রভাব, বলভদ্রের মদবিহ্বল নেত্রের মত আরক্ত পুষ্পসম্ভারে পথের দুইধারে বলরামচূড়ার বাহার। এ যে শীতাপগমে প্রকৃতির প্রথম জাগরণ, তাই অরুণোদয়ের বর্ণমাধুরী তাঁহার অঙ্গরাগে প্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে। আজ তাঁহার আঙ্গিয়া আবীরে কুঙ্কুমে লালে লাল।

শ্রীপঞ্চমীতে অলকে নব চূতমঞ্জরী দোলাইয়া, পীত উত্তরীয়াঞ্চলে বিকাশোন্মুখ তনু অঙ্গযষ্টি আচ্ছাদন করিয়া বাসন্তী লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দেন। চারিদিকে পূজার আয়োজন পড়িয়া যায়, নবমালতী কুসুম বিকাশ চেষ্টায় উৎসুক হইয়া তাহার কোরকাবলিকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়, চারিদিকে কুঞ্চিত দল ছড়াইয়া পড়ে, সৌরভে দিক্-প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়া যায়। আম্রশাখার প্রবালরক্ত-কিশলয়ের পাশে পাশে মুখ রাখিয়া শুক-বক্ষ-পীতবর্ণ নব মুকুল ফুটিয়া ওঠে, সুগন্ধের মৌন মধুর স্বাগত জানাইয়া তাহারা মুখর কলকণ্ঠ পিক-বৈতালিক দলকে আবাহন করিয়া আনে, প্রহরে প্রহরে আনন্দের নহবৎ বাজিতে থাকে। সে সাড়ায় বনানীর তোরণাবলীতে আরক্ত পুষ্পস্তবক প্রস্ফুটিত হয়, অশোক পলাশ কিংশুক অগ্নিরাগপ্রভায় অহোরাত্রি হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখে, বর্ণে গন্ধে গীতে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

শরতের শেষ-দিনগুলির সহিত এই নবীন বসন্তের বড় একটি সাদৃশ্য আছে, আকাশ তেমনি অপার সুনীল বর্ণ, স্বচ্ছ উজ্জ্বল, মেঘলেশহীন, বসন্তের প্রারম্ভে তরুরাজির পল্লবসজ্জা তখনও সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত হয় না, প্রায় শেষ শরতে তাহার সব পাতাগুলি তখনও ঝরিয়া যায় না। শস্যশ্যামল প্রান্তর প্রচুর শিশিরপাতে অধিকতর লাবণ্যময়, পাখীর গানের তখনও বিরাম হয় না। কোকিল পাপিয়া দূরান্তর প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে, একবার প্রাণ ভরিয়া গান গাহিয়া লয়, বিদায়কে মিলনের মতই রমণীয় করিয়া তোলে! প্রভাতের অতি সুকুমার কুয়াসা সূর্য্যোদয়ে অমল শুভ্র, সন্ধ্যায় নারাঙ্গী-রাঙা হইয়া উঠে। শীত-শেষ বসন্তের সূচনা মনে জাগাইয়া তোলে। তাই শীতের ধূসর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ও আমরা বসন্তের স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হই। নব চূতাঙ্কুরের পীত লাবণ্য, অশোকের অরুণ বর্ণ থাকে না সত্য, তবে দিগন্তচুম্বি প্রান্তরে আপক্ক ধান্যমঞ্জরীতে কনক শোভা জাগিয়া ওঠে, শেফালি অজস্র ফুটিতে থাকে, এই স্নিগ্ধ সুরভি পূজার ফুলগুলির নবনীত শ্বেত কোমল দল, দীপ্ত রক্তিম সুকুমার বৃন্তের উপর ভর করিয়াই ফুটিয়া ওঠে। হায়! আমাদের জীবনের শারদ আশ্বাস জীবন কৈশোরের অশোক আশার আশ্রয় করিয়াই সঞ্জীবিত থাকে।

আমাদের দেশের প্রকৃতিতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব বড় কম, সে আসে আর যায়। অশোক ফুটিয়া উঠে, আবীরের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়, বাঁশী বাজিতে থাকে তবে সে কত দিনের জন্য? হয় এক পক্ষ, নয় বিশটি দিনের মত। তাই হোরির আমোদে একটু বাড়াবাড়ি, কিঞ্চিদধিক চীৎকার শোনা যায়। যাহা ফুরাইয়া যাইবার ভয়ে ভঙ্গুর, যাহা ক্ষণিকের আনন্দে স্বপ্নময় তাহাই লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মাঝে হইতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, বাকি থাকে শ্রান্তি গ্লানি, দীর্ঘ জাগরণের রাঙা চোখ আর ভাঙ্গা গলা!

বসন্তের এই যে অন্তরহীনতার কথা বলিলাম, আবার অন্য দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, দেখিতে পাই ঠিক বলা হইল না। মুকুলের মধ্যেই ত পরিণতির সূচনা বাস করে। মুকুলের আভাসের মত বর্ণ গন্ধ, ফলের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া, বাস্তবতা লাভ করে; শুধু তাই নয় মুকুলের মধ্যে যে স্বাদের অস্তিত্ব আমরা জানিতাম না, ফলে তাহা পরিপক্কতার মধুরতায় রসে ভরপুর হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষ না হইয়াও এই সবই তো মুকুলের ক্ষণিকতার মধ্যে জীবন্ত ছিল, অন্তরে তাহার নিঃস্ব শূন্যতা নয়, পরিপূর্ণ প্রাণ ছিল বলিয়াই এমন সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্ভব হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে সম্পূর্ণতার অপেক্ষা সূচনাই অধিক প্রাণ-সার। সম্পূর্ণতা অর্থে বিরাম, শেষ, অনন্তের অধিকার সেখানে সীমাগ্রস্ত; কিন্তু প্রারম্ভ, প্রথম বিকাশ-চেষ্টার মধ্যেই অনন্তের আবাহন, বিসর্জ্জন নহে। বসন্ত বৎসরের সূচনা বলিয়াই অন্তহীন সম্ভাবনার সঙ্গোপন আকর।

বসন্তে ফুলের বর্ণ লাবণ্য যত প্রচুর, সুগন্ধগৌরব তত নাই, এ যেন রূপের বিকাশ,—মন তখনও জাগে নাই। ইহার উৎসবের মধ্যেও মনের গভীরতার অভাব দেখিতে পাই। দোললীলা এই মধু ঋতুর আনন্দ-অনুষ্ঠান। এই দিনে আমরা যাহাদের সঙ্গে হোরি খেলা করি, তাহাদের সঙ্গে হয় কোন সম্পর্ক থাকেনা, নয়তো

কেবলমাত্র কৌতুকের সম্বন্ধ; যে রং গায়ে ছড়াইয়া দি, তাহাও ঝরিয়া পড়িয়া যায়, যে কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া খেলি,* তাহারো চিহ্ন বড় বেশী দিন থাকেনা, ধুইয়া ফেলিতে যা বিলম্ব, তাহার পর গ্রীষ্ম যায় বর্ষা গত হয়, শ্রাবণের শেষপূর্ণিমায় নীরবে দক্ষিণ হাতে এক একখানি রাখি বাঁধিয়া লই। এই বন্ধন যাহার প্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া দি তাহার সঙ্গে বড় একটি পবিত্র মধুর সম্বন্ধের স্থাপনা হয়। তিনি আমাদের রাখী ভ্রাতা। রাঙা রেশমের সুকুমার বন্ধনটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেও, সে সম্বন্ধ ঘোচেনা, রাখী ভ্রাতা বন্ধুর চিরজীবনের আর্ত্তি সহায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কোকিল

কোকিল আমাদের দেশে বেশ পরিচিত। বসন্তকালে কোকিলের প্রাণোন্মাদী কুহুধ্বনি বিরহব্যথাক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণে ব্যথা জাগাইয়া তুলে। কবি ও প্রেমিকের নিকট কোকিল বড়ই আদরের জিনিষ। ইহাদের ডিম পাড়িবার প্রথা অনন্যসাধারণ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রবন্ধের চিত্রগুলির সহিত মিলাইয়া প্রবন্ধটি পাঠ করিলে আমরা অনেক জিনিষ শিক্ষা করিতে পারিব। চিত্রগুলি মিঃ আলফ্রেড টেলর কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে অঙ্কিত।

কোকিল ডিম পাড়িবার সময় নিজে যে বাসা তৈয়ারী করে না, ইহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে তাহারা সাধারণতঃ কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। পাশা পাশি দু' তিনটি বাসা দেখিয়া জানা গিয়াছে যে, একই কোকিল ভিন্ন ভিন্ন বাসায় এক একটি ডিম পাড়িয়াছে। কোকিল একেবারে কতগুলি ডিম পাড়ে তাহা ঠিক করা দুরূহ। বোধ হয় প্রথম চারিটি পাড়ে, পরে মাসখানেক পরে আরও চারিটি পাড়ে। কাক কিম্বা অপর কোন পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া নিজের ছানাগুলির ভরণপোষণের ভার সে পালক পিতা মাতার উপর ন্যস্ত করিয়া চলিয়া যায়।

কোকিল ছোট ছোট পাখীদের বাসাতেও ডিম পাড়ে। কোকিলের ডিম আকারে খুব ছোট। সেইজন্যই অন্য পাখীরা সেগুলিকে নিজেদের ডিম বলিয়া মনে করে। কোকিল প্রথমে মাটিতে ডিম পাড়ে। তারপর ঠোঁট কিম্বা পায়ের দ্বারা সেই ডিম অন্য পাখীর বাসায় রাখিয়া আসে। সে ইহাকে নিজের ডিমের সহিত তা দেয়।

কোকিল যখন ডিম রাখিবার জন্য বাসা খুঁজিয়া বেড়ায় তখন কোন স্থানে সে শূন্য নীড় দেখিলে প্রায়ই সে একটি ডিম তাহাতে পাড়িয়া যায়। আর যে সকল বাসায় ডিম আছে, সেখানেও নিজের ডিম রাখিয়া যায়। আসন্নপ্রসবা পাখীর বাসাতেও

বোধ হয় রাখে। ডিমশূন্য বাসায় নিজ ডিম রাখিবার পূর্ব্বে বাসাটিতে অপর পাখী যে যথার্থই বাস করে, তাহা সে ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। কোকিল ডিম রাখিয়া গেলে বাসার পাখীরা হয় এই অতিরিক্ত ভার আদৌ লক্ষ্য করে না, কিম্বা জানিতে পারিলেও অপরিবর্জ্জনীয় বোধে নিজেদের ডিমের সহিত তাহাতেও তা দেয়। কোকিল নিজের ডিম এমন বাসায় রাখিয়া যায়, যাহাতে ডিম ফুটিয়া উঠিলে, ছানারা উপযুক্ত খাদ্য পাইবে। অন্য ডিমগুলি পরীক্ষা করিয়া তবে কোকিল সে বাসায় নিজের ডিম রাখে। কারণ সেই বাসার ডিমগুলি ফুটিবার সময় হইয়া আসিলে ছানাদের অঙ্গসঞ্চালনে তাহার ডিমটি ফাটিয়া যাইতে পারে। এই সব পরীক্ষা করিবার সময় কোকিল নিজ বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করে।

প্রতিপালিকা ষোল সতের দিন ডিমগুলিতে তা দিবার পর তাহাদের ফুটিবার সময় আসে। অন্য ডিমগুলি ফুটিবার দু একদিন পূর্ব্বে কোকিলের ডিম ফুটিয়া উঠে। কোকিলের ক্ষুদ্র ডিমের সহিত ছানার তুলনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ডিম হইতে বাহির হইয়া কোকিল-ছানা যেন কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বলে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। দু'তিন ঘণ্টা পরে ইহার আকার দেখিলে কেহ বলিবে না যে, সে অত ছোট ডিমের ভিতর ছিল। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ডিমটি খুব ভারী এবং খোলার ভিতর নিশ্চয়ই অদ্ভুতভাবে ঘননিবিষ্ট।

চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে, বাসার অপরাপর জিনিষ কোকিলছানার নিকট বড়ই বিরক্তিজনক লাগে। সে বেশ বুঝিতে পারে যে, অপর ডিমগুলি ফুটিয়া উঠিলে, তাহারাও তাহার খাদ্যে ভাগ বসাইবে। সেইজন্য অপর ডিম বা ছানাকে বাসা হইতে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। মাতার গুণ সর্ব্বাংশে সন্তানে বর্ত্তমান আছে। কোকিলমাত্রই অতীব স্বার্থপর ও বুদ্ধিমান।

কোকিলছানা নিম্নলিখিত উপায়ে অপর ডিম বা ছানাগুলিকে বাসা হইতে ফেলিয়া দেয়। সে প্রথমে বাসার সব নীচে চলিয়া যায় এবং ডিমগুলির ঠিক নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর একটি ডিমকে পিঠের উপর চড়াইতে চেষ্টা করে। ডিমটি পিঠে চড়াইয়া পা দুটি সোজা করিয়া দাঁড়ায়। তখন পিঠস্থ ডিমটি বাসা ছাড়িয়া উপরে যায়। এই অবস্থায় একটু নাড়া পাইলেই ইহা পিঠ হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়। কোকিল ছানা বুক ও ডানার সাহায্যে ধাক্কা দিয়াও ডিম নীচে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। নীচে যদি বা না ফেলিতে পারে ডিম-



বাচ্ছা কোকিল পিঠে করিয়া ডিম ফেলিয়া দিতেছে

গুলিকে মাঝে মাঝে বাসা হইতে একটু দূরেও ফেলিয়া দেয়। তাহার পক্ষে এই কার্য্য বিশেষ শ্রমসাধ্য নহে। এই প্রকারে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে বাসার অন্য জিনিষ-গুলি দূরীভূত হইয়া যায়। অপর ডিম ও ছানা সবই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তখন পালক পিতামাতা এই বলপূর্ব্বক অধিকারকারীর খাদ্য জোগাড় করিতে বিশেষ যত্ন সহকারে পরিশ্রম করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোকিলছানা আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে বাড়িতে থাকে। শীঘ্রই সে এত বলবান হইয়া উঠে যে পালক পিতা মাতাকে আর দু'তিন দিন মাত্র কষ্ট করিতে হয়। কোকিলছানার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়। তিন দিনের দিন কোকিলছানার দেহের আয়তনে বাসাটি প্রায় জুড়িয়া যায়। সেই সময় ইহাকে দেখিতে বড়ই বিশ্রী, কয়লার মতন কাল ও প্রকাণ্ড হাঁ বিশিষ্ট। উহাকে একটু রাগাইয়া দিলেই হাঁ এত বাড়িয়া উঠে যে, মুখের ভিতরের প্রকাণ্ড লাল গর্ত্তটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পালক পিতামাতার প্রাণে দয়া মায়া না থাকিলে, তাহারা এই অপরিচিত অদ্ভুতাকৃতি ছোট প্রাণীটির আহার যোগাইতে এত কষ্ট স্বীকার করিবে কেন? অতএব কোকিল এবং ঐ জাতীয় অপর দু'একটি পাখী ব্যতীত সকল পক্ষীই সন্তান-বৎসল ও স্নেহশীল। আমরা মোরগীকেও পাতিহাঁসের ছানার দলকে আহার দিতে ও লালনপালন করিতে দেখিয়াছি।

প্রথম আট দিন কোকিলছানার মাংসই বাড়িতে থাকে; তাহার পালক তত বেশী গজায় না। তখনও ইহা দেখিতে



কোকিল-ছানার আহার

কুৎসিত। কিন্তু শীঘ্রই সরু সরু পালক গজাইতে আরম্ভ হয়। দিন দুই বাদে, পালক এত দ্রুত গতিতে বাহির হইতে থাকে যে, তখন তাহাকে দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। এরূপ পালক-গজানো আমরা মাছরাঙ্গা পাখীতেও লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ইহার সব পালক বাহির হইলে, শরীরের ভারে বাসাটি নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। মাটীর উপর বাসা থাকিলে, সেখানে কোকিলছানা প্রথম উড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বে বাসাটি শূন্য করিয়া দিয়া ঘাসের ভিতর গুঁড়িসুড়ি মারিয়া থাকে। জমির উপর যে সকল গরু ছাগল চরে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলেই সে সতর্ক হইয়া ডানা নাড়িতে থাকে এবং সর্পের ন্যায় হিস্‌হিস্ শব্দ করে। তাহাতেই তাহারা অন্য দিকে সরিয়া যায়। অন্ধকারে ভয়জনক চীৎকার করিয়া সে আপনাকে রক্ষা করে। এ চীৎকার তাহার স্বতন্ত্র।



কোকিল-ছানার প্রথম উড়িবার অবস্থা

ডিম ফুটিবার প্রায় একুশ দিন পরে কোকিলের উড়িবার সময় হয়। হঠাৎ একদিন সে প্রথম উড়িতে যায় কিন্তু পালক পিতামাতার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। আরও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তাহারা ইহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকে! কোকিল ছানা উড়িতে থাকে আর তাহারা মুখে খাবার লইয়া ইহার পিছু পিছু দৌড়ায়।

ভাল করিয়া উড়িতে শিখিলে, ইহার ফোটোগ্রাফ তোলা আদৌ সুবিধা-জনক নহে। সেইজন্য টেলর সাহেব এই অবস্থায় একটি কোকিল ছানা আনিয়া তিন মাস রাখিয়াছিলেন এবং ইহার দেশান্তরে গমনের সময়াবধি বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে কোকিল বড় হইয়া উড়িতে শিখিলে পালক পিতামাতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় এবং অত্যধিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভ করিতে পাইয়া বাঁচে।"

কোকিলছানাকে বাড়ীতে রাখিতে হইলে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। প্রথমত ইহাকে বেশী খাইতে দিতে নাই। কারণ যত খাবার দিবে ততই সে খাইতে চাহিবে। কীট পতঙ্গই ইহার প্রধান খাদ্য। ইহাকে অল্প অল্প করিয়া অনেক বার খাইতে দিতে হয়। খাদ্য ইহার মুখে দিয়া দিতে হইবে, নচেৎ না খাইয়া মারা যাইবে তবু নিজে খাদ্য লইয়া খাইবার চেষ্টা করিবে না। খাঁচার ভিতর প্রচুর খাদ্য রাখিয়া দিলেও সে ইহার কণাও মুখে দিবে না।

টেলর সাহেবের কোকিলছানাটি বেশ পোষ মানিয়াছিল। সে সাহেবের কাঁধে ও মাথার উপর উড়িয়া বসিত। একদিন সাহেব ইহাকে গাছের ডালে বসাইয়া ইহার ফোটো তুলিতেছিলেন, পাখীটি হঠাৎ উড়িয়া গিয়া একটী উচ্চ বৃক্ষের শিরে



কোকিলের দেশান্তরে যাইবার অবস্থা

গিয়া বসিল। তাহাকে ধরিবার জন্য গাছে উঠিতেই সে আবার উড়িয়া অন্য গাছে চলিয়া গেল। এইরূপে একগাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সাহেব শেষে হতাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁহার দুঃখ হইল যে ছানাটি না খাইতে পাইয়া পাছে মারা যায়। তিনি দুই ঘণ্টা ধরিয়া কোকিল ছানাটির প্রতি নজর রাখিলেন। পরে দেখিলেন যে, ক্ষুধার জ্বালায় সে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এক জোড়া সুস্বর পক্ষী (chaffinch) আসিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল।

বাল্যকালের ন্যায় এই পরপুষ্ট পক্ষীর পরবর্ত্তী জীবনও রহস্যময়, পক্ষিজীবনের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। দেশ বিদেশের কবিরা বিভিন্ন ভাষায় ও ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিম আসিয়ার শৈবধর্ম্ম প্রচারের নিদর্শন

বৈদিক সময়ে যে কেবল শিবোপাসনার উৎপত্তি নহে কিন্তু শৈবসম্প্রদায়ের গঠনও হইয়াছিল সর্ব্বপ্রধান ঋগ্বেদেই তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৭ম ঋকে যে "শিবাসঃ" শব্দ পাওয়া যায় ইহা পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে বৈদিক ত্রিৎসু জাফীয় সুদাস রাজার সপক্ষ শিবোপাসকদিগেরই বাচক। তুগ্র নামক অনার্য্য রাজা ইহাদিগের অধিনায়ক ছিল। (১) ইঁহার সহায়তায়ই ত্রিৎসুগণ, পুরুচালিত ভরতদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিউয়েট লিখিয়াছেন—

But the Tritsu anticipated them in their policy and allied themselves with the Tugra, who ... called by Vashistha the Shiva a generic name of the cattle-breeding races, whose father-god was Shiva." (২)

সমগ্র অনার্য্য তুগ্র জাতি শিবনামে "শিব" বলিয়া কথিত হওয়ায় আর্য্যদিগের শিবোপাসনাই যে অনার্য্যগণকর্ত্তৃক প্রথম অবলম্বিত হয় তাহারই স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে দৈত্য-দানব-যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির শিবই যে অভীষ্ট-দেবতারূপে পূজিত দেখা যায় তাহাও ইহারই সমর্থন করে।

পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্য জাতি সকলই পৌরাণিক দৈত্য-দানব রূপে বর্ণিত হইয়াছে ইহাই কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত। পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতি

1 Vide "Vedic India' pp 327—28.

2. 'The Ruling Races of Prehistoric times" by J. F. Hewett p 113.

সকল যদি আর্য্যেতর দৈত্যদানব জাতিই হয়; তবে শিব তাহাদিগের পরমোপাস্য বলিয়া শৈবধর্ম্মের নিদর্শন যে বিশেষ ভাবে তাহাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমরা এক্ষণে সেই নিদর্শনের সন্ধানেই ব্যাপৃত হইব।

একাডিয়ানেরা পশ্চিম আসিয়ার সভ্যজাতি দিগের অন্যতম। ইহাদিগের দেবতারূপে শিবের (Sib or Shib) উল্লেখ পাওয়া যায়। (৩)

ইউরাল ও আল্টাই পর্ব্বতাধিবাসী ফিন্ জাতির দেবতা শৈবনামে অভিহিত। এই "শৈব" যে শিবনামেরই রূপান্তর মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। শিব যে কেবল ফিন্ জাতিরই সাধারণ দেবতা, তাহা নহে কিন্তু সমস্ত সেমিটিক্ জাতিরও তিনি দৈব-পিতারূপে স্বীকৃত—

'He is the god Saiv of the Ural Altaic Finns, meaning the protecting god, an epithet of the deity, which is according to Castren, common to all the Ural Altaic tribes. He is also the Hindu shepherd God Sib or Shiva, and the father-god of the Semitic race, who called themselves the sons of Sheva or Sheba the seven gods" 'The Ruling races of Prehistoric times by J. F. Hewett p 362.

ফিন্ দিগের দেবতার 'রক্ষার্থ' শিবনামের মঙ্গলার্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং সেমিটীক্ দিগের দেবতার 'সপ্ত' অর্থ শিবের অষ্টমূর্ত্তি নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

বাইবেলের বর্ণনাতেও আমরা শিবের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। তথায় শিব—চিয়ন্ (Chiun) নামে পরিচিত। (৪) এই চিয়ন্ চিভিন্ বা শিব নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ৪

বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণের দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদে প্রাচীন বংশাবলীর বর্ণনায় আমরা হ্যামের (Ham) বংশধরদিগের মধ্যে শিবদিগের উল্লেখ দেখিতে পাই যথা—

"6. And the sons of Ham; Cush and Mzarim, and Phut, and Canaan.

7. And the sons of Cush; Seba and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raama; Sheba and Dedan"

উপরে যে Sheba (শিব) দিগের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, আরবদেশের দক্ষিণাংশ পুরাকালে ইহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। (৬) উহারা তথায় শেবিয়ান্ (Sabaean) এই বিশেষ নামে অভিহিত হইত। 'শেবিয়ান্' নাম শেব নামেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। আরবের মক্কাস্থিত কাবামন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তর শিবেরই শিলারূপ বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে আরবে মহম্মদীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে শৈব-

3. See "The Ruling Races of Prehistoric times." by J. F. Hewett Vol I p 221.

4. See "Prophet Amos V. 26.

5. Cyclopaedia of India Vol I, p 705.

6. See "The Ruling Races of Prehistoric Times by Hewett Vol I, 427.

ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহারই আভাস পাওয়া যায়। মহম্মদীয় ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী শেবিয়ানিজম্ (Sabaeanism[7]) নামক ধর্ম্মের কথা যে পুরাতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায় তাহা শৈবধর্ম্মের নামান্তর বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

আসিয়া মাইনরের বর্ত্তমান মানচিত্রেও শিবনামের নিদর্শন অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে শিবস্ (Sibas) নামে একটী স্থান চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত শিবেরই যোগ আছে বলিয়া বিশেষরূপেই অনুমিত হয়। বেদে শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে 'শিবাসঃ' রূপে আমরা উল্লেখ পাইয়াছি মানচিত্রের 'শিবস্' যেন তাহারই অনুকরণ।

আমরা যে শিবোপাসক আর্য্যেতর জাতিদিগের অধিনায়ক তুগ্রের কথা প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, তাহার রাজ্যের নাম তুগ্র বা ত্রিগর্ত্ত ছিল।(৭) ইহা বর্ত্তমানে জলন্ধর নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ হিউইট তদীয় "প্রাগৈতিহাসিক সময়ের রাজ-বংশাবলী" The Ruling Races of Prehistoric Times") নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যে মানচিত্র সংকলিত ও সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে 'তুগ্রশিবও' ত্রিগর্ত্তের নামান্তর রূপে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে 'ত্রিগর্ত্তই' যে শৈব-দিগের আদিস্থান ছিল, তাহা বিশেষ রূপেই প্রমাণিত হয়। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতেও ইহার স্পষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায়। গ্রীক্ ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (Strabo) চেনাবের উত্তরে সিন্ধুনদের তীরেই 'শিবয়' (Seboi) নামক লোকদিগের স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"And the Shiva are one of the tribes conquered by the Tritsu in the battle of the Ten kings. They are the Seboi, placed by Strabo on the Indus north of the Chinab." The Ruling Races of Prehistoric Times by J. F. Hewett Vol I p 222.

এই প্রকারে শিবধর্ম্ম ইহার আদিস্থান সিন্ধুনদের তীরদেশ হইতেই যে ক্রমে আসিয়ার পশ্চিমসীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া-ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

7. See "The Ruling Races of Prehistoric Times" by Hewitt Vol I. p 113.

নবাব

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেলা।

"চমৎকার!"

"এমনটির তুলনা নেই, আর! সুন্দর!"

"এ যে নবাবের মূর্ত্তি! আর্টিষ্ট ফেলি-সিয়ার হাতে গড়া! বাঃ, খাসা হয়েছে ত!"

মুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী একবাক্যে শিল্পীর প্রতিভার সমাদর করিল। বিরাট মেলা, বিপুল জনতা। পথে গাড়ীর ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। ভিতরেও লোক একেবারে গিস্-গিস্ করিতেছে। বড় বড় ডিউক, কাউণ্ট, রাজ-

কর্ম্মচারী, সম্ভ্রান্ত উপাধি-ধারী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবধি সকলেই মেলায় উপস্থিত। বিবিধ শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ছবি ও ধাতুমূর্ত্তি স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে—কিন্তু সকলের চেয়ে সেরা হই-য়াছে, ফেলিসিয়ার হাতের মূর্ত্তিগুলি। বিশেষ এই নবাবের মূর্ত্তিটি! কাদার মূর্ত্তি—কিন্তু দেখিলে মনে হয়, নবাব নিজেই যেন বসিয়া রহিয়াছে। চোখের উপরকার ভ্রূর রেখা-টুকু পর্য্যন্ত এমন সূক্ষ্ম, এমন সঠিক! নবাবের মূর্ত্তিটির কাছেই তাই বিশেষ করিয়া এতখানি ভিড় জমিয়াছিল।

একদল রক্ষীর অগ্রে টিউনিসের বে আসিয়া মেলায় প্রবেশ করিল। মূর্ত্তি-মণ্ডপে ঢুকিয়াই সম্মুখে সে দেখে, ফেলিসিয়ার হাতে গড়া সেই কুকুর ও শৃগালের মূর্ত্তি। চমৎকার! দেখিয়া বে'র তাক লাগিয়া গেল। মানুষ এমন নিখুঁতও গড়িতে পারে। আশ্চর্য্য! কুকুরের পায়ের নখটি হইতে মুখ-চোখের ভাবটুকু অবধি কি পরিপাটী! মনে হয়, কুকুরটা যেন ডাকি-তেছে—এত নিপুণ হাতের টান! বে'র মুখে প্রসন্নতার একটা হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। শৃগালের পিছনে কুকুরটা ছুটিয়াছে। দেহটাকে দীর্ঘভাবে ছড়াইয়া দিয়া কি অধীর আগ্রহেই কুকুরটা ছুটিয়াছে! তাহার মুখে চোখে একাগ্রতার রেখাটুকু নিপুণ শিল্পী কি সুন্দর টানিয়া দিয়াছে। শৃগালও ছুটি-য়াছে—শৃগালের মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্নটুকু কি স্পষ্ট, কি দীপ্ত! মূর্ত্তিটির তলে, টিকিট আঁটা—টিকিটে লেখা আছে "ডিউক দ্য মোরার সম্পত্তি।" এটি ব্রোন্জের মূর্ত্তি!

নিকটেই মেলার এক তরুণ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, মূর্ত্তির বিষয়টি এক প্রাচীন উপকথা হইতে গৃহীত। হেমারলিঙও বে'র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "এটা ফেলি-সিয়ার হাতে গড়া।"

"ফেলিসিয়া! কে সে?"

হেমারলিঙ্ কহিল, "একটি স্ত্রীলোক, বয়সও বেশী নয়—"

স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকের হাতে গড়া এই মূর্ত্তি! বেশ ত! বে'র মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল,—চোখে প্রশংসার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। স্ত্রীলোকের হাতের তৈয়ারী! মৃণালের মত কোমল হাত কঠিন ব্রোন্জকে এমন বাগ মানাইয়াছে? চমৎকার! বে কহিল, "এঁর তৈয়ারী আর কোন মূর্ত্তি আছে?"

তরুণ কর্ম্মচারী কহিলেন, "হাঁ—এই লাইনের শেষেই আর একটা আছে। ঐ যে—যেখানটায় ঐ খুব ভিড় জমেছে। দেখতে পাচ্ছেন?" হেমারলিঙের সহিত বে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু আগাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে উভয়েই চমকিয়া উঠিল। নবাব! নবাবের মূর্ত্তি—এ যে একেবারে হুবহু সেই মুখ! কোন তফাৎ নাই! যেন নবাব, স্বয়ং জীবন্ত নবাব বসিয়া আছে—তাহার ঠোঁটের কোণে সেই হাসি-টুকুও লাগিয়া আছে। বে যেন জ্ঞান হারাইয়াছিল। সে চীৎকার স্বরে কহিল, "জাঁসুলে?"

একজন কহিল, "হাঁ—বার্ণার্ড জাঁসুলে—কর্সিকার নতুন ডেপুটি।"

বে হেমারলিঙের পানে চাহিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ডেপুটি?" হেমারলিঙ প্রথমটা কেমন ভড়কাইয়া গেল,—তারপর সে ভাবটা কাটিলে মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "হাঁ, আজ সকাল থেকে ডেপুটি বটে! কিন্তু এখনও পাকা রকম মঞ্জুর হয়নি।" তার পর এক নিশ্বাসেই সে কহিয়া গেল, "কিন্তু ফ্রান্স কখনই এই বোম্বেটেকে কৌন্সিলে বসতে দেবে না।"

নাই দিক—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। হেমারলিঙের উপর বের যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের উপর কে যেন প্রচণ্ড একটা ঘা মারিল! এই হেমারলিঙ কি জোর গলাতেই না বলিয়াছিল যে, নবাব কখনই ডেপুটি হইবে না! সে সম্ভাবনাও মোটে নাই—আর তাহার সেই কথার উপর বে কি অখণ্ড বিশ্বাসই না স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু আজ এ কি! সেই বোম্বেটেকে শুধু আজ ডেপুটি করিয়াই ফ্রান্স বসিয়া নাই; মেলায় ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই বোম্বেটেরই মূর্ত্তি গড়িয়া এত সম্মান, এমন গৌরব তাহাকে দান করিয়াছে! আবার এই মূর্ত্তির কাছেই যত লোক জড় হইয়াছে!

হেমারলিঙ এতটুকু হইয়া গেল। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! সে না শুনিয়াছিল, নবাবের মূর্ত্তি ফেলিসিয়া শেষ করিয়া তুলিতে পারে নাই, এবং কাল রাত্রি পর্য্যন্ত মেলার তালিকায় এ মূর্ত্তির কোন নামোল্লেখও ছিল না! আজ সহসা বিনামেঘে একি বজ্রাঘাত! এটুকু জানা থাকিলে হেমারলিঙ কখনই বেকে এমন ঘটা করিয়া এখানে আনিবার কল্পনা করিত না! আনিলেও এ ধারটায় যাহাতে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সে সতর্ক থাকিত! হায়, হায়, কি ভুলই না হইয়া গিয়াছে! আবার ফেলিসিয়াকেও এখন উড়াইয়া দিবার উপায় নাই! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিজের মুখেই সে ফেলিসিয়ার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছে! সেদিন সাঁতে-রুমা ষ্টেশনে নবাবের অত সাধ-আশায় বাজ ফেলিয়া মনে যে আনন্দের আলো ফুটিয়া ছিল, আজিকার এ ঘটনায় নিমেষে তাহা ম্লান হইয়া নিবিয়া গেল।

বে অনেকক্ষণ ধরিয়া নবাবের সেই মূর্ত্তির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুখে কথা নাই—কুঞ্চিত ভ্রূ—কি এক চিন্তা সমস্ত মনটাকে যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে! এমন সময় নিকটেই একটা উচ্চ হাস্যরব শুনিয়া বে ফিরিয়া চাহিল। নবাব আসিয়াছে। নবাব এক তরুণীর সহিত কথা কহিতেছে। কে ও তরুণী? হেমারলিঙ কহিল, "ও-ই ফেলিসিয়া।"

সেখানে আরও চারি-পাঁচজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সকলেরই বেশ সম্ভ্রান্ত ধরণের—দেখিলেই বুঝা যায়, তাঁহারা কেও-কেটা নহে। বে পরিচয়ে জানিল, ঐ যে কালো হ্যাট মাথায়, উনি ডাক্তার। জেঙ্কিন্সের মুখে একটা গর্ব্বস্ফীত দীপ্ত ভাব। তাহারই পাশে মাদাম জেঙ্কিন্স। মাদাম জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়ার কারুকার্য্যের তারিফ করিতেছিল। জেঙ্কিন্স বিশেষ করিয়াই আদেশ দিয়াছিল, "ফেলিসিয়ার সঙ্গে আলাপ করগে—তার কাজের তারিফ করগে।" বেচারী মাদাম,—কি করিবে সে?

লোকের মুখে যে কথাটা ঘুরিয়া ফিরিত, মাদামের কাণে তাহা পৌঁছিতে বাকী ছিল না। মনের মধ্যে আগুণ চাপিয়া তাই সে ফেলিসিয়ার করকম্পন করিল। সে জানিত, ডাক্তারের বুকের মধ্যে ফেলিসিয়ার প্রতি কি ভাব জাগিয়া রহিয়াছে—কিন্তু কোন দিন সে বিষয়ে সে এতটুকু ইঙ্গিত করে নাই! সে ইঙ্গিতে পরিণাম কি দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে তাহার যথেষ্টই আশঙ্কা ছিল।

তাহার পরই নবাব সবলে তাঁহার ভারী হাতে ফেলিসিয়ার কোমল হাতটি সবেগে নাড়িয়া দিল, উচ্ছ্বসিতভাবে কহিল, "আজ আমায় বড় সম্মান দিয়েছেন—বড় গৌরব। এ ঋণ কখনও আমি শুধতে পারবো না। আমার নামে যে কুৎসা আজ চারদিকে রটে বেড়াচ্ছে, আপনি আজ সমস্ত পারিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আপনি সে-সব মোটে বিশ্বাস করেন না। এ উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। এ মূর্ত্তিকে আজ যদি আমি হীরে-জহরতে মুড়ে দি, তবুও আমার এ ঋণ শোধ হয় না!"

ফেলিসিয়ার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। এতখানি প্রশংসা-সত্ত্বেও তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইল না—সে আজ আর একটি মুখের দুইটা হর্ষ-বাণীর জন্য তৃষিত হইয়া ছিল—আজ আর কাহারও পানে তাহার দৃষ্টি নাই, কাহারও কথা তাহার মনের মধ্যে উঁকি দেয় না! শুধু সেই পরিচিত প্রিয়জনটির চিন্তায় মন তাহার ভরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু কোথায় সে? কেনই বা তাহার কথা এমন করিয়া প্রাণের মধ্যে বার বার সাড়া দিতেছে? কেন? কেন? এ কি তবে ভালবাসা—এই কি প্রেম? ফেলিসিয়া কি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? সেই সরল উদার সুন্দর গেরিকে ফেলিসিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত আজ ভুলিতে পারিতেছে না—এতখানি সমাদর, এতখানি সম্মান, আজ শুধু তাহার অভাবেই নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্তই ম্লান বোধ হয়, কেন? দূরে ঐ যে তাহার মুখখানি দেখা গেল—ঐ যে ভিড়ের মধ্যে! ফেলিসিয়ার শরীরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া গেল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঐ সে আসে না! না, ও ত গেরি নহে! তবে তাহারই মত মুখখানি, তাহারই মত দীপ্ত সরল চোখদুইটি! ও যে আলিন—আলিন! গেরি নহে। ফেলিসিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইল; ভিড়ের মধ্য হইতে তাহার হাতটি টানিয়া ডাকিল, "আলিন—"

"ফেলিসিয়া…"

তাহার পর পরস্পরে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল। কত দিন—কত দিন পরে আজ উভয়ের সাক্ষাৎ! বৃদ্ধ জুজ্ সগর্ব্ব দৃষ্টিতে দুই বন্ধুর এ মিলন-দৃশ্য দেখিল।

আলিন কহিল, "আজ তোমার কি সুখ, ফেলিসিয়া! এত বড় মেলায় সকলের মুখে তোমারই জয়ধ্বনি শুনছি, শুধু! আমারও আজ বড় আহ্লাদ হচ্ছে, ফেলিসিয়া।"

"কিন্তু আমার আহ্লাদ এইজন্য বেশী যে, তোমার দেখা পেলুম, আলিন। কত দিন পরে—আলিন—"

আলিন হাসিয়া কহিল, "কিন্তু সে কার দোষ, ফেলিসিয়া?"

ফেলিসিয়ার প্রাণে কে যেন ছুরি বিঁধিয়া দিল। সত্যই ত এ-জন্য দায়ী কে? কেন সে দেখা করে নাই—কেন সে কোনই খোঁজ লয় নাই! কিন্তু থাক্ সে কথা! ফেলিসিয়া কহিল, "তারপর কেমন আছ, আলিন? খপর কি, বল।"

"কিছুই নয়। নতুন আর কি খপর থাকতে পারে আমার?"

"জানি, জানি, আলিন। শুধু আপনাকে বলি দিয়ে চলেছ, তুমি—নয় কি?"

সে কথা কিন্তু আলিনের কানেও গেল না।

সে মৃদু হাসিল মাত্র। কিন্তু দৃষ্টি তাহার উতলা হইয়া আর কাহার পানে ফিরিয়া গেল। ফেলিসিয়া চাহিয়া দেখিল, নিকটেই গেরি দাঁড়াইয়া মাদামোসেল জুজকে অভ্যর্থনা করিল।

"তাহলে তোমাদের আলাপ-পরিচয় আছে, বল।"

"কি? আমায় বলছ?" আলিন কহিল, "পলকে আমি চিনি বৈ কি! পলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কত কথা হয় যে—"

ফেলিসিয়া কহিল, "বল কি—পল এত লাজুক—"

ফেলিসিয়া সহসা থামিয়া গেল। একটা কথা বিদ্যুৎ-রেখার মত তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিল। গেরি তাহার অভ্যর্থনা করিল। সেদিকে ফেলিসিয়া লক্ষ্যমাত্র করিল না। কি একটা কথা সে চুপি চুপি আলিনের কাণে কহিল। নিমেষে আলিন অমনি লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। তাহার কাণের ডগা দুইটা লাল হইয়া উঠিল। আলিন মুখ নত করিল। তার পর নিতান্ত ধীরস্বরে সে কহিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ, ফেলিসিয়া! আমার এই বয়সে—বল কি, তুমি?" তারপর অতর্কিতে সে পিতার হাত ধরিয়া ফেলিসিয়ার দ্বিতীয় কথার আভাষ অবধি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরিয়া গেল।

ফেলিসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গেরি আলিনের হাত ধরিয়া চলিল। ফেলিসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। যে কথাটা ছায়ার মত তাহার মনের মধ্যে ফিরিতেছিল, সেটা তখনই সত্যের মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। গেরি ও আলিন—চমৎকার মানায়! কিন্তু উহারা জানে না, জানে না, হয়ত কি নিবিড় বাঁধনেই দুইজনে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—কি অসহ্যভাবেই দুইজনে দুইজনকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! প্রেমের সাড়াটুকুও বুঝি তাহাদের প্রাণে গিয়া পৌঁছায় নাই! না পৌঁছাক—প্রেম তাহার কাজ সারিয়া লইয়াছে। ফেলিসিয়ার তাহা বুঝিতে এতটুকু বাকী রহিল না। তাহাই হউক্—দুইজনে দুইজনকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসুক! এই আলিন—সুন্দর সরল আলিন—তাহার কাছে ফেলিসিয়া! চাঁদের কাছে মোমের বাতি! ধিক্, তাহার স্বার্থ-চিন্তায়! ফেলিসিয়া দুই পায়ে আপনার মনটাকে চাপিয়া ধরিল! তাহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চাহিল। অমনি ডিউক-মোরার অভিনন্দন-বাণী কাণে পৌঁছিল।

"তার পর মাদামোসেল—এ যে চমৎকার হয়েছে, চমৎকার! একটা কথা শুধু বলি—কুকুরের মূর্ত্তির নীচে ব্যাখ্যাটা দিলেই

ভালো হত। সকলে মানেটা বুঝতে পারত।"

ফেলিসিয়া কোন কথা বলিল না—পাষাণের মূর্ত্তির মতই স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি তাহার উদাস, স্থির। তাহার পর কোনমতে ধীরস্বরে সে কহিল, "কিন্তু একটা কথা—রাবেলাস মিথ্যে বলেছে—শেয়ালটাকে শেষে হাঁপিয়ে শ্রান্ত হয়ে কুকুরের কাছে ধরা দিতে হল—এ কথাটা রাবেলাস লিখতে ভুলে গেছে। কি বলেন?" কথাটা শেষ করিয়া ফেলিসিয়া মৃদু হাসিল। মোরার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। তাহার মনে হইল, পৃথিবীর বক্ষ হইতে কে যেন তাঁহাকে টানিয়া ঊর্দ্ধে আকাশ-পথে লইয়া চলিয়াছে!

সেদিন মেলায় সকলের অপেক্ষা অধিক সুখ পাইলেন, নবাব। বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত নবাব দীপ্ত উচ্চ হাস্যধ্বনিতে মেলা-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া দিলেন। এই মূর্ত্তি, ফেলিসিয়ার গড়া এই মূর্ত্তি আজিকার বিরাট মেলায় জয়মাল্য আদায় করিয়াছে! এ কি কম সুখ—কম গৌরব! তাহার উপর তিনি ডেপুটি—কর্সিকার নূতন ডেপুটি হইয়াছেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তে যেন পথের ভিখারীর হাত ধরিয়া রাজ-সিংহাসনে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছেন! এ কি শুভ মাহেন্দ্রক্ষণই না আজিকার প্রভাতে দেখা দিয়াছে! শুধুই সুখ, শুধুই সম্মান, শুধুই গৌরব! সমস্ত ধূলি-লাঞ্ছিত মলিন অতীতটাকে যেন সোনার বর্ণে কে রাঙাইয়া দিয়াছে—সমস্ত কদর্য্যতা, সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! আঃ, এ কি জয়, কি জয়—কি এ সৌভাগ্য!

ডেপুটি!

তাহার পর সকলের সহর্ষ অভিনন্দন—সকলের এই আন্তরিক শুভ-কামনা! নবাবের মনে হইল, বুঝি তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন! এত সুখ, ছোট প্রাণে ধরে না যে!

গৃহে ফিরিবার সময় আসিল। মশার্দ আসিয়া কহিল, "নবাব বাহাদুর, আপনার গাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবেন?" নবাব তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, "অসম্ভব মশার্দ—আমার গাড়ীতে আর জায়গা হবে না।"

এত-বড় একখানা প্রাসাদের মত গাড়ী! তাহাতে স্থান হইবে না?

মশার্দ করিল, "নাই হোক—আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক দরকারী কথা আছে যে—"

"হাঁ! কিন্তু গেরির কাছে আপনার কথার জবাব পাননি, আজ সকালে? আপনি যা বলেছেন, সে কথা আমি রাখতে পারব না। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক—আপনি চেয়েছেন! আস্পর্দ্ধা বটে!"

মশার্দ কহিল, "তবু আপনার জন্য যা করেছি—"

"তার চতুর্গুণ আপনি আদায় করে তবে ছেড়েছেন। আর কিছু হবে না, বুঝলেন—পাঁচ মাসে দু'লাখ ফ্রাঙ্ক আপনি নিয়েছেন—আরও চান? আপনার দাঁতে বড় ধার হয়েছে, বুঝলেন—সে ধার কিছু নরম পড়া দরকার!"

তাহার পর আরও দুইটা রূঢ় কথার পর নবাব জানাইলেন, তাঁহার নিকট হইতে আর একটি ফ্রাঙ্কও আশা করা বাতুলতা মাত্র। নবাব দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। আর একটি ফ্রাঙ্কও দেওয়া হইবে না—কোন সুপারিশ, কোন মিনতিতেও নয়!

"এই তাহলে আপনার শেষ কথা?"

নবাব তাহার দৈত্যের মতই ভীষণ চোখ দুইটার পানে চাহিয়া মুহূর্ত্ত স্থির হইলেন, পরে দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "এই আমার শেষ কথা।"

"বেশ—তাহলে দেখা যাবে—" বলিয়া মশার্দ আপনার ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

জাঁসুলে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহিরে প্রকাণ্ড গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। নবাব উঠিতে যাইবেন, এমন সময় মোরা আসিয়া সবেগে তাঁহার করকম্পন করিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "আমার অভিনন্দন, ডেপুটি সাহেব!"

উচ্চ কণ্ঠে মোরার মুখে "ডেপুটি সাহেব" কথাটা শুনিয়া নবাব মুহূর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। গৌরব-দৃপ্তভাবে তিনি সেই জন-তরঙ্গের পানে চকিতে চাহিয়া দেখিলেন। এতগুলা লোকের সম্মুখে ডিউকের মুখের আজ এ বিরাট অভিনন্দন—এ বড় গৌরবের, বড় সম্মানের কথা!

আজ তাঁহার জীবন-আকাশে এ কি নূতন সূর্য্য অপূর্ব্ব দীপ্ত রাগে উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিল, ভগবান! এত সুখ ঘটিতে পারে!

নবাব মোরাকে ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন—গাড়ী ভিড় ঠেলিয়া ছুটিয়া চলিল। মেঘ-ভাঙ্গা আকাশে সূর্য্য তখন স্নিগ্ধ শীতল কিরণ-ধারা বর্ষণ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হায়

প্রিয় মোর গিয়াছে কোথায়?
হায় শূন্য সকল জীবন,
যে আকাশ পূর্ণ ছিল লক্ষ তারকায়
সে আজিকে কুয়াশা মগন!

প্রিয় মোর গিয়াছে কোথায়?
হায় ব্যর্থ নিশীথিনী ছায়া,
হৃদয় ভরিয়া ওঠে শুধু পিপাসায়
তপ্ত নেত্রে মরীচিকা মায়া!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অকাল সমাধি

[ইংরাজী হইতে]

প্রস্ফুট গোলাপের মত সুন্দরী এমি হাউয়ার্ড যাহাকে ভালবাসিত সে ছিল এক সৈনিক যুবা।

ধনীর সন্তান সে, বিলাসলালসার ক্রোড়ে প্রতিপালিত—তথাপি তাহার চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো লক্ষণ ছিল না। জীবনের সৌন্দর্য্যবিকশিত উদ্যানের মধ্যে সে উদ্দেশ্যবিহীন মৌমাছির মত উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোনো বিশেষ-কিছুর উপর তখনও সে স্থির হইয়া বসে নাই।

এমনি সময় গ্রীষ্মের এক শুভরাত্রে পুষ্পশোভিত আনন্দনর্ত্তনের মধ্যে এমি তাহার চোখে সুন্দরতম কুসুমের সুষমা লইয়া দেখা দিল। তাহার সুচারু দেহ-লতার উপর ছিল পবিত্র শুভ্র পরিচ্ছদ আর তাহার মুখের উপর ছিল সরল নীল আঁখি। সেই আঁখির সহিত আরও দুইটি আঁখির মিলন হইল, চারি চোখের শুভ সম্মিলনে দুইটি প্রাণ পরস্পরের নিকট বাঁধা পড়িয়া গেল।

তারপর গ্রীষ্মের দিনরাত্রিগুলি যেন পাখা ধরিয়া পাখীর ঝাঁকের মত এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া চলিয়া গেল। তরুণ তরুণীর জীবন নদী তাহাদের পৃথক প্রবাহপথ পরিত্যাগ করিয়া একই খাতে বহিয়া চলিল,—প্রেমের স্রোত উভয়ের হৃদয়ে গভীর দাগ কাটিয়া গেল, তথাপি কেহ প্রকাশ করিয়া কিছু বলিল না সংসারের সহস্র নরনারীর মধ্যে তাহারাও দুইজন নরনারী মাত্র; তাহাদের মধ্যে যে প্রেমের অন্তর্গূঢ় টান রহিয়াছে তাহা অন্যে দূরে থাকুক আত্মীয়মহিলারাও কেহ টের পাইল না।

এমনি সময় ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে ক্রিমিয়ায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সেই তূর্য্যনিনাদ ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র শান্তি-কুটীরে পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হইল না। সেই ভেরী শুনিয়া মাতা কাঁপিয়া উঠিল পুত্রের জন্য, বোন কাঁপিয়া উঠিল ভাইয়ের জন্য, স্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল স্বামীর জন্য। জীবনের সুখের আলো এক ফুৎকারে নিবিয়া গেল, গল্প হাসিগান উদ্বেগাশঙ্কার মধ্যে কখন যে বিলীন হইয়া গেল তাহা টেরও পাওয়া গেল না।

যুবক ভাবিল—আর ত নীরব থাকা চলে না; এই আসন্ন বিচ্ছেদের দিনেও যদি চুপ করিয়া থাকি তবে যে এ জীবনে আর মরমের কথা বলা হইবে না। আবেগে, উদ্বেগে, লজ্জায়, আশঙ্কায় যুবক একদিন এমিকে ডাকিয়া বলিল—"এমি, তোমায় আমি ভালবাসি!"···এমি একথার কি উত্তর দিবে? ইহা যে সে বহুদিন হইতেই জানে।—এমিও যে তাহার সমস্ত হৃদয়খানি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছে।

এই বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যেও তাহাদের মনে সান্ত্বনা ছিল। এতদিনের এই দুইটি

পৃথক জীবন আজ আত্ম-প্রকাশের দ্বারা যে ঐক্য লাভ করিয়াছে তাহার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। তাহারা যে পরস্পরকে ভালবাসে এবং সে কথা যে আজ দুজনেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে—ইহাই কি ভগবানের বিশেষ এক করুণা নহে?

তারপর?—নিয়তির অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিল। যুবক ভাবিল—এ যে যশের নিমন্ত্রণ পত্র!—ইহাইত আমি চাহিতেছিলাম। সে যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।.....কিন্তু এমির কি হইবে? তাহাকে সে বিবাহ না করিয়া ত যাইতে পারে না; এমিকে বিবাহ করিবার জন্য শত শত যুবক পাগল,—তাহাদিগকে বালিকা ঠেকাইবে কি বলিয়া? পিতার মতের বিরুদ্ধে বিবাহ করা,—সেও ত এক সমস্যা।.....ভাবিয়া ভাবিয়া এ সমস্যার সুমীমাংসা হইল না; অগত্যা এক দিন সে এমিকে ডাকিয়া বলিল—'গির্জ্জায় গোপনেই আমাদের বিবাহ কাজ শেষ করিতে হইবে।' গুপ্ত বিবাহের নামে এমির নাসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল কিন্তু অবশেষে প্রেমের গৌরবের নিকট আচার সৌষ্ঠবতার গর্ব্বকে পরাজয় মানিতেই হইল। একদিন প্রাতঃকালে তাহারা গির্জ্জায় গিয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইল; পুরোহিত যখন মন্ত্র পড়িলেন এমির চোখ তখন অশ্রুবাষ্পে অন্ধপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল।...তারপর একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের পর দুইজনের ছাড়াছাড়ি হইল,—যুবক চলিয়া গেল একদিকে, যুবতী চলিয়া গেল আর এক দিকে।.....অন্তিম বিদায়ের পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে বড় দেখা সাক্ষাৎ হইল না। তাহাদের জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল সংসারের চোখে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল না; সংসারের যদি দৃষ্টিশক্তি থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যুবক এক মুহূর্ত্তে জীবনের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রৌঢ় হইয়া গিয়াছে আর এমির কৈশোর জীবনের যবনিকা ভেদ করিয়া যে মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভার্য্যার না হইলেও একটি নববধূর।

* * *

সেদিন শ্রাবণের সুবর্ণসন্ধ্যা শান্ত সমুদ্রের নীলজলে মৃত্যুর রক্তিমা ঢালিয়া দিয়াছিল। একটি জাহাজ তখন চক্রমন্থনে ফেন পুষ্পের সৃষ্টি করিয়া আকাশের গায়ে ধূম্র-কালিমা লেপন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সেই যুদ্ধজাহাজ বোঝাই করা ছিল কতকগুলি তরুণ প্রাণে; ভাগ্যদেবতা আজ তাহাদিগকে প্রতি দিবসের অবশ অলসতা ও যশহীন শান্তি হইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের উদ্দাম আনন্দ ও শোণিতরাঙা খ্যাতির পথে লইয়া চলিয়াছেন। আঙিনার শুভ্র পুষ্প ফেলিয়া আজ তাহারা প্রান্তরের রক্ত গোলাপ চয়ন করিতে চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হাত কণ্টকছিন্ন হইবে সত্য কিন্তু তাহারা আজ এই রক্তের আলিপনাকে অঙ্গের আভা করিতে চাহে।

জাহাজ যেখান হইতে অনাগত ভবিষ্যের কতকগুলি জীবন মৃত্যু ও দুঃখবেদনার বিচিত্র ভাগ্য বহন করিয়া রওনা হইয়াছিল সেখানকার শৈলসৈকতের বাগানে তখন ম্লানমৌন একটি তরুণী বালিকা বসিয়াছিল। জাহাজ যখন তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন রুমাল নাড়িয়া সে শুধু বলিল—"বিদায়, প্রিয়তম, বিদায়। জাহাজের ডেকের উপরেও তখন একটি রুমাল উড়িতেছিল।...জাহাজ যতক্ষণ দেখা গেল বালিকা ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর একটা মোড় ফিরিয়া জাহাজও অদৃশ্য হইয়া গেল, বালিকাও দুই হাতে বুক চাপিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, নীলাকাশে যখন দুটি একটি করিয়া তারা জ্বলিয়া উঠিতেছিল, এমি তখন ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিয়া গেল। বৈঠকখানায় হাসির লহর উঠিতেছিল, এমি সেদিকে গেল না—চুপি চুপি তাহার শয়ন ঘরে গিয়া বিছানার উপর ক্লান্ত শরীর বিছাইয়া দিল।

* * *

প্রকৃতির অঞ্চল হইতে হেমন্তের হেম আভাখানি যেমন ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল এমির মনেও তেমনি আশার সমস্ত আশ্বাস-বাণী নীরব হইয়া গেল। সম্মুখে শীত তাহার নগ্ন রিক্ততা লইয়া ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার, করাল ছায়া এমিকে পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এমির জীবনের সমস্ত সজীবতা আজ ঝরিয়া পড়িয়াছে, রহিয়াছে শুধু একখানি মুমূর্ষ প্রাণের ম্লান অস্তিত্ব। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছে, বর্ণ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, গালের হাড় ভাসিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সঙ্গ তাহার নিকট বিষাক্ত বোধ হয়! একমাত্র মায়ের কণ্ঠস্বরে সে বিরক্ত হয় না কিন্তু মাতাও

বহু চেষ্টা করিয়া কন্যার মনের অবস্থা জানিতে পারিলেন না,—সে এমনি চাপা!

যুদ্ধের সংবাদ আসিলে লক্ষ নরনারী তাহা শুনিতে ছুটিয়া যায়।...যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত ও আহতদের নামের তালিকা বাহির হয়, —রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ নরনারী তাহার উপর চোখ বুলাইয়া যায়,—কয়েকছত্র পড়িতে না পড়িতেই কতজনের আঁখি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে, বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে তাহারা সংসার অন্ধকার দেখে, রুমালে মুখ ঢাকিয়া দুঃসহ শোকের আঘাত দমন করিতে চেষ্টা করে!

এমিও প্রতিদিন সংবাদ জানিতে যায়, সমরশায়ী বীরগণের তালিকা পাঠ করে, পাঠ করিবার সময় তাহার হৃদ্‌পিণ্ড উন্মাদের মত উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়; তালিকায় সেই নামটি যখন দেখে না তখন বুক হইতে আশঙ্কার একটা বোঝা নামিয়া যায়!.....এমনি করিয়া দিন কাটে; তার পর একদিন,—এমি কেমন করিয়া বুঝিবে এ স্বপ্ন না সত্য? তাহার গাল লাল হইয়া উঠিল, কাণ গরম হইয়া উঠিল, অপরাজিত যৌবনের ম্লানিমা ভেদ করিয়া একটা সলজ্জ মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। এতদিন পরে আজ প্রথম তাহার খবর পাওয়া গেল; এ সুসংবাদের বিনিময়ে এমি আজ কাহাকে কি দান করিয়া তৃপ্ত হইবে? এমি যখন রণক্ষেত্রে তাহার বীরত্বের কথা পড়িল,—কামানের গোলাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেমন করিয়া সে জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, কেমন করিয়া সে একটি আহত বালককে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল,—তখন

আনন্দে তাহার জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল।...এমি চোখ বুজিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। সেনাপতি এই বীরত্বের জন্য তাহাকে রেড্ ক্রস্ উপাধি দান করিয়াছে,—এমি আজ কেমন করিয়া তাহার হৃদয় ভাব অপ্রকাশ রাখিবে।

আনন্দের সকল উচ্ছাস কিছুদিন পরেই আশঙ্কার উদ্বেগে উৎসাদিত হইয়া গেল। খবর আসিল নভেম্বরের শীতে যুদ্ধক্ষেত্রের জল স্থল দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে;—বরফে কোয়াসায় পথ চলা দুষ্কর লইয়া পড়িয়াছে; সামুদ্রিক ঝড়ে নৌ-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তীরে যুদ্ধের ঝড়ও নিতান্ত কম নয়। এত খবর আসিল কিন্তু তাঁর কোনো খবর আসিল না। অপেক্ষা করিতে করিতে এমির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না; আহারে তাহার রুচি নাই, চোখে ঘুম নাই, মনে শান্তি নাই। খাইতে বসিয়া সে ভাবে, তিনি কয়দিন অনাহারে আছেন কে জানে? ঘুমাইতে গিয়া ভাবে তিনি কয়দিন অনিদ্রায় আছেন কে জানে? সুখশয্যা তাহার কণ্টক শয্যা বলিয়া বোধ হয়।

অবশেষে সে এক দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করিবে মনস্থ করিল। পিতামাতার শাসন, বন্ধুগণের উপদেশ, কিম্বা সখিগণের অনুনয় তাহাকে কিছুমাত্র টলাইতে পারিল না। একদিন ভোরে দেখা গেল তাহার ঘর শূন্য,—বালিসের উপর একখানি চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। চিঠিতে লেখা—"মা, তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো। কর্ত্তব্য আমায় টান্‌ছে; যেখানে আমার স্বামী আছেন সেখানেই আমার যথার্থ স্থান! আমি যাই, খুঁজে দেখি তিনি এখনো বেঁচে আছেন কি না। হয়ত তাঁর এখন যত্ন শুশ্রূষার দরকার,—যদি আমি তাঁর এতটুকুও সেবা করতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করব। কি জানি কেন মনে হচ্চে আমি তাঁকে বাঁচাতে পারব;—আমার অন্তরের বাণীকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না।

* * *

এমি শুশ্রূষাকারিণীর বেশে ক্রিমিয়ার হাঁসপাতালে পৌঁছিল। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিল তাহার স্বামী বীরত্বের জন্য উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

ইহা শুনিয়া এমি স্বামীকে দেখিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে তাহাকে একখানি চিঠি পাঠাইল, তাহাতে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া লিখিল,—তাহার আচরণে যদি কোন অন্যায় হইয়া থাকে সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল, আর ভিক্ষা করিল,—যদি সম্ভবপর হয়, একটিবার তাঁহার দর্শন। এ কথাও জানাইল যে তাহা সম্ভবপর না হইলে সে এই হাঁসপাতালে সেবিকারূপেই সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিবে, তিনি যদি এমির নিকট একটী সোহাগবাণী প্রেরণ করেন তবেই সে যথেষ্ট জ্ঞান করিবে; আর কিছু সে চায় না।

কিন্তু তাহার স্বামী যখন সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার ভাবনার বোঝা ভারী হইয়া উঠিল। বালিকা বধূ সে, সংসার জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, করুণায় কোমল, কমনীয় তনুমনে কেমন

করিয়া এই মৃত্যুযন্ত্রণার দারুণ আর্ত্তনাদের বাস ভূমিতে বাস করিবে? যুবক ভাবিল, ভাগ্যে কি লেখা আছে তা' কে জানে!

এমি এমন করিয়া চলিয়া আসিয়া তাহার দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছে সত্য তথাপি তাহাকে সে কিছুই বলিতে পারিল না। এমিকে যে সে ভালবাসে। তাহারও কি একটিবার দেখিতে ইচ্ছা করে না? কিন্তু উপায় নাই যে!.....তাই একদিন দিবসের হত্যাবিনাশের কাজ যখন শেষ হইয়াছে তখন তাঁবুতে বসিয়া এমিকে সে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি প্রেমপত্র; তাহার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া উহা সে লিখিয়াছিল। চিঠির শেষ কথা কয়টি এই;—"যুদ্ধক্ষেত্রে আমি যদি আহত হই তবে উহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব কারণ তাহা হইলে তোমার সহিত মিলনের পথ সহজ হইয়া আসিবে! আর যদি মরিয়া যাই তবে ইহাই আমার বিদায় চুম্বন।"

চিঠিখানি সে যেমনি বন্ধ করিল অমনি নিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁবুর উপর একটা আগুন দেখা দিল,—সেই সঙ্গে বিদীর্ণ বোমার একটা ভীষণ শব্দ শুনা গেল;—তারপর হাতের ছিন্ন চিঠি রক্তে রঞ্জিত হইয়া হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

(২)

তৃষার্ত্ত হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যে হায় হায় করিতে লাগিল। অন্তবিহীন শ্রমক্লান্ত দিবস ও সুপ্তিহীন রাত্রির অনভ্যস্ত উদ্বেগ যে তাহাকে অধিকতর কাতর করিয়া তুলিল। এমির কষ্টের আর সীমা নাই; সে তাহার কোমল হাতে পূঁজবিকৃত ঘা পরিষ্কার করে, সেই ক্ষতে ঔষধ লাগাইয়া দেয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। রাত্রে মুমূর্ষ, রোগীর উন্মত্ত চীৎকারে শিহরিয়া উঠে। রোগীগণের শয্যায় শয্যায়, শিয়রে শিয়রে সে ঘুরিয়া বেড়ায়,.....রক্তাক্ত কলেবরে আহত হইয়া একজন সৈন্য আসে, ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করেন, অস্ত্র করেন, ওষুধ দেন, রোগীর অবস্থা খারাপ হইলে, বিকারের ঘোরে সে প্রলাপ বকে, জ্বালার যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে,—তারপর হয় শান্তি। তাহার মৃতদেহ সরাইয়া লওয়া হয়, সেখানে নূতন রোগী আসে। এইত হাঁসপাতালের ইতিহাস।.....ইহারই মধ্যে এমি বাস করে। ইহাদিগকেই এমি শুশ্রূষা করে, মনে করে, ইহাদেরও ত স্ত্রী বোন কেহই কাছে নাই, কে ইহাদের শুশ্রূষা করিবে? তাহার মনে হয়—ইহাইত স্বামীর প্রতি ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; তাঁহার সঙ্গীদিগকে শুশ্রূষা করা—সে কি তাঁকে শুশ্রূষা করার চেয়ে কম?

একদিন এমি দেখিল সুন্দর একটি বালক প্রলাপের ঘোরে তাহার স্বামীর নাম উচ্চারণ করিতেছে। জ্ঞান হইলে বালককে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে তাঁহার অজস্র প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল। তিনিইত তাহাকে আগুনের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ যখন দুর্দ্দমনীয় বেগে বহিতেছিল তখনইত তিনি তাহাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। উঃ সে কি যুদ্ধ! ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে!!

এমি যতই শুনিতে লাগিল ততই

বালকের প্রতি তাহার স্নেহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। বেশি করিয়া সে তাহার যত্ন করিতে লাগিল, দিন ওরাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, তাহার হইয়া তাহার মাকে এমি চিঠি লিখিয়া ছিল। বালককে ভাল বাসিয়া এমি বুঝিল ধনীর মত দরিদ্রদের হৃদয় আছে, তাহারাও পরস্পরকে ভাল বাসিতে জানে,—আর ইহাও তাহার মনে হইল যে মানুষে মানুষে যত পার্থক্য সকলেরই মূলে অর্থ আর মান,—আত্মাভিমানই মানুষকে মানুষের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে।

কিন্তু এমির চিঠির ত কোনো উত্তর আসিল না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় ত বহু-দিন কাটিয়া গিয়াছে। মনে এই আশঙ্কার বোঝা লইয়া আর যে সে এই আর্ত্তনাদের লীলাভূমিতে বাস করিতে পারে না।

এমনি সময় আহত সৈন্য বোঝাই একটা জাহাজ ঘাটে লাগিল। হায়, অল্পদিন হইল, সেই জাহাজই যে কতকগুলি উৎসাহ-দীপ্ত হরস প্রাণ বহন করিয়া লইয়া গিয়া-ছিল।—এমি কি যে আশা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই জাহাজে তিনি যদি আসিয়া থাকেন তবেত তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন, কত কষ্ট পাইতেছেন, কত কষ্ট পাইবেন, কিন্তু তবুত দেখা হইবে। আর যদি এ জাহাজে না আসিয়া থাকেন তবে হয়ত তিনি ভাল আছেন। কিন্তু তাহা হইলে ত পরস্পরের মধ্যে এখন দেখা হইবে না। স্বামীর মঙ্গল কামনা ও মিলন বাসনা মিলিয়া এমিকে অস্থির করিয়া তুলিল;—সে কোন্‌টা যে বেশী করিয়া চায় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

সেই জাহাজে এমির স্বামী আসিল না। আশঙ্কায় আশঙ্কায় এমির দিন কাটিতে লাগিল,—এমনি সময় তাহার হাতে একখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু এমি ত এ হস্তাক্ষর চিনে না। এ কাহার চিঠি? চিঠিখানা খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে রক্তরঞ্জিত পরিচিত হস্তাক্ষরা-ঙ্কিত একটা চিঠির টুক্‌রা পড়িয়া গেল। রক্তের অনুলেপনা দেখিয়া এমির বুকের ভিতর রক্ত প্রবাহ থামিয়া গেল। আবার পর মুহূর্ত্তে মনকে প্রবোধ দিয়া সে চিঠি খানি কুড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহা এত অসম্পূর্ণ যে সে পড়িয়া কিছুই বুঝিল না। অবশেষে যিনি পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁহার চিঠিখানি এমি পড়িল। তিনি লিখিয়াছেন—কয়েক সপ্তাহ হইল তাঁহার সঙ্গীকে তিনি তাঁবুর মধ্যে রক্তাক্ত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় পাঠাইয়া-ছিলেন; তাহার পাশে ঐ চিঠিখানি পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীরে অসংখ্য ক্ষত, শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল তাই এ জাহাজে তিনি যাইতে পারিলেন না। ঘাগুলি শুকাইয়া আসিয়াছে, আশা করা যায় পরবর্ত্তী জাহাজেই তিনি যাইতে পারিবেন।" —ইহা পড়িয়া প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় এমির চোখে জল আসিল; ভগবান তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন ইহাই এমির পরম সৌভাগ্য। ছুটিয়া গিয়া সে সেই বালককে এই খবর দিল; বালকের চোখে মুখে কিসের আলো যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরেই আহত সৈন্য বোঝাই করিয়া আর এক জাহাজ আসিল। এমি পূর্ব্বেই ঘাটে উপস্থিত ছিল, দূর হইতেই স্বামীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। জাহাজ ঘাটে লাগিলে তিনি তীরে নামিয়া আসি-লেন, এমির দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসিলেন তার পর একটি মিলন চুম্বনেই ক্লান্ত হইয়া এমির কাঁধে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিলেন। এমি তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসিল; প্রাণপাত করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল! এমির শুশ্রূষায় তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন। * * *

সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহারা সমুদ্রতীরে বেড়াইতেন তখন ভবিষ্যৎকালের কত স্বপ্ন-চিত্র যে আঁকিতেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না। উপরে নীল আকাশ, সম্মুখে নীল সমুদ্র, তাহাতে জেলে ডিঙ্গির সহস্র রঙ্গিন্ পাল; চারিদিকের এই স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে তাহারা দুইটী প্রাণী যেন স্বপ্নজগতের রাজপুত্র ও রাজকন্যা। রাজপুত্রের স্বপ্ন-রচনায় সহসা একদিন বাধা পড়িল, তিনি পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ইহাত এতদিন তিনি লক্ষ্য করেন নাই; তাঁহার শুশ্রূষায় এমি যে নিজের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল; অনিয়মের অত্যাচারে তাহার শরীর যে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অচিরেই ঝড় উঠিবে, সে দুর্য্যোগে কে কাহাকে রক্ষা করিবে?

...উদ্বেগ শীঘ্রই আশঙ্কার পরিণত হইল। এমি বাঁচে কিনা সন্দেহ। তাহার দেহলতা শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহার প্রাণ একটি ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাসের ধারায় পরিণত হইয়াছে। হায়, এত করিয়া যে তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিল তাহাকে বুঝি আর বাঁচান গেল না।

* * *

কানন বিদীর্ণ করিয়া কুসুম আবার বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, বসন্ত বাতাসে স্রোতস্বতীতে ঊর্ম্মি জাগিয়া উঠিয়াছে, বৃক্ষলতা সজীবতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এমির গণ্ডে আজ প্রাণের রং কই? তাহার তরুণ প্রাণের সবটুকু রস যে রোগযন্ত্রণা শুষিয়া লইয়াছে। এমি তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—"প্রিয়তম, বিদায় বলিতে বড় কষ্ট! তবে আমার আনন্দ এই যে আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। কর্ত্তব্যের পথ কণ্টকাকুল নহে তাহা কুসুমাকীর্ণ। আমাকে এইখানে আমার স্বদেশের বীরদের সঙ্গে কবর দিও। দেশে গিয়া পিতামাতার নিকট আমার হইয়া ক্ষমা চাহিও। আমি তাঁহাদের অবাধ্য সন্তান, তাঁহাদের নিষেধ অমান্য করিয়া তোমার সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। যুদ্ধ-শেষে যখন তুমি দেশে ফিরিবে, যখন আবার আমাদের সেই গিরিকাননে বিচরণ করিবে তখন আমার কথা স্মরণ করিয়া ছোট্ট একটি প্রার্থনা করিও। ঐ খানেইত তুমি আমার হৃদয়মন, জীবন যৌবন সব আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া-ছিলে। সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, মনে হয় যেন কাল। আমি আর কিছু চাই না, আমাদের সেই মিলনভূমিতে

তুমি একদিন তোমার এই বালিকা বধূকে আশীর্ব্বাদ করিও,—তার পর ইচ্ছা হয় আমাকে মনে রাখিও, ইচ্ছা হয় ভুলিয়া যাইও।"

এমির অন্তিম কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহার স্বামীর মনে হইল এ সংসারে তাহার আর কোনো কাজ নাই, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই, অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন নাই। মরণ সঙ্কল্প করিয়া সে রণ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু মৃত্যুকে যে আলিঙ্গনে গ্রহণ করিতে চায় মৃত্যু তাহাকে ধরা দেয় না। সে কত দুঃসাহসের কাজ করিল, সকল লোক বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল; অক্ষত দেহে সে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিল।

স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য জাহাজ প্রস্তুত।.....সে ভাবিল যাইবার আগে তাহার কবরটা একটু দেখিয়া যাই। .....তাহার কবরের উপর তখন তৃণ গুচ্ছের সবুজ আস্তরণ জমিয়াছে, কবরের চারিদিকে গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে।—হায়, মৃত্যুকে ঘিরিয়া জীবনের এই আনন্দোৎসব কেন?

.....সে যে ঐ ফুলের মতই সুন্দর শুভ্র ছিল, অমনি কোমল অমনি পবিত্র।

সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সেই সমাধির উপর সে একটি ক্রুশ স্থাপন করিল ও তাহাতে সংক্ষেপে এমির জীবনী লিখিয়া দিল।...তারপর বিদায়কালে কবর হইতে একটি গোলাপ তুলিয়া বুকে গুঁজিল।

* *

তারপর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এখনও এক বৃদ্ধ বাস করে, সুপ্তিহীন নিশাশেষে জাগিয়া জাগিয়া সে একটি বালিকার কথা ভাবে। দিনের বেলা যখন তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাতি নাতনীগুলি নৃত্য করে তখন তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর একটি মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে, বর্ত্তমানকে ভেদ করিয়া অতীত তাহার সেই বালিকাদেহের বঙ্কিম ভঙ্গী, তাহার সেই বিদায় প্রার্থনা, তাহার যত্নশুশ্রূষা ও অকাল সমাধির সমস্ত চিত্র লইয়া উপস্থিত হয়; তখায় বৃদ্ধ অতীতকালে আবার যুবক হইয়া বাস করে। স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন দেখে সে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা, চারিদিকে তাহার অসংখ্য পৌত্র পৌত্রী খেলা করিতেছে।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ।

আকাঙ্ক্ষা

ভোগের প্রসঙ্গ ঘুচালে আমার,
ত্যাগের মহিমা শিখালে না।
জ্ঞানের গরব বিনাশিলে মোর,
ভক্তির সুধা পিয়ালে না।

মিথ্যা আমার দিলে সব মুছে,
সত্যের আলোক ফুটিল না,
জীবনের সাধ গেল ভেঙ্গে চুরে,
পরাণের সাধ টুটিল না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

স্রোতের ফুল

(২৪)

বিপিন কালীতারার সন্ধানে যাইতে যাইতে শুনিল কালীতারাকে কাল সন্ধ্যার পর তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বেলা প্রায় বারোটা। এই দুঃসহ শীতজর্জ্জর পৌষরাত্রি সেই আসন্নপ্রসবা অনাথা না জানি কোথায় কাটাইয়াছে। কাল হইতে অনাহারে না জানি সে কোথায় পড়িয়া আছে। কোমলপ্রাণ বিপিনের হৃদয় করুণায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে ছাপাইয়া উঠিল; তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল তাহার খুড়াকে গিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়া আসে; নিবারণ মুখুয্যের মাথাটাকে দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলে। কিন্তু সময় নাই, সময় নাই! আগে সেই হতভাগিনীকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কী নিষ্ঠুর সব লোক! এক সঙ্গে দুটি প্রাণীকে হত্যা করিতে মমতা হইল না!

জমিদারের ছেলে বিপিন অস্নাত অভুক্ত দুপ্রহরের রৌদ্র মাথায় বহিয়া পথে পথে সেই অভাগিনীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যে সমাজের কাছে নিন্দিতা, যে সমাজের ত্যজনীয়া।

বিপিনকে ব্যাকুলভাবে পথে পথে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত অনেক লোক জুটিয়া গেল; চাকর পেয়াদা পাইক বরকন্দাজ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কোনো সন্ধান পাইল না।

রাত্রে আসন্নপ্রসবা কালীতারাকে একবস্ত্রা অবস্থায় দূর করিয়া দিলে সে আপনার মাতৃত্ব-সম্ভাবনার গুরু বেদনায় কাতর ও ভীত হইয়া বাবুদের মঠবাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানকার দারোয়ান প্রভাতে উঠিয়া কালীতারাকে মঠবাড়ীর মন্দিরচত্বরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে অতি রূঢ় ভাবে সেখান হইতেও দূর করিয়া দেয়; বেচারার ইহাতে কোনো দোষ নাই, সে মনে করিয়াছিল যাহাকে তাহার মনিবেরা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে তাহাকে তাহাদেরই মঠবাড়ীতে থাকিতে দেওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইবে! কিন্তু এখন বিপিনকে এমন ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া সে বুঝিল যে সে সেই অসহায়াকে মৃত্যুর মুখে তাড়াইয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে। ভয়ে ও পরিতাপে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। বিপিন কিছুমাত্র সংবাদ না পাইয়া এই দুপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিয়া সে যতটুকু জানে তাহা বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল; আবার নিজের অমানুষ ব্যবহারের জবাবদিহি বিপিনের কাছে কি বলিয়া করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া বলিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না।

অনেকক্ষণ নিজের দ্বিধার সঙ্গে তর্ক

করিয়া সে স্থির করিল যে, সে যাহা জানে তাহা অকপটে স্বীকার করিবে।

ভগবানদীন সুকুল জনতা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া বিপিনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বিপিন অন্যমনস্ক উদাসভাবে যন্ত্রচালিতের মতো তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল কিন্তু আজ স্বাভাবিক মধুর হাস্যে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল না।

ভগবান হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর আমার একটা কসুর হয়েছে……

বিপিন জিজ্ঞাসু নীরব দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। ভগবান বলিতে লাগিল—কাল রাতে কালীতারা মঠবাড়ীতে কখন ঢুকে মন্দিরের চাতালে শুয়ে ছিল; পাছে মঠ অশুচি হয়ে যায়, কি আপনারা রাগ করেন, এই ভেবে আমি তাকে ভোর বেলা তাড়িয়ে দিয়েছি…… এখন দেখছি আমি ভারি অন্যায় করেছি……

বিপিন ঔৎসুক্যে উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি দেখেছিলে সে কোন্ দিকে গিছল?……

—সে ঐ আম-বাগানের ভিতর দিয়ে ঐ বনের দিকে গিছল মনে হয়।

বিপিন ব্যগ্রভাবে—যাও যাও কেউ একখানা পাল্কী নিয়ে এসগে।—বলিয়া আম-বাগানের ভিতর দিয়া বনের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

শেঁয়াকুলের বনে কাপড় জড়াইয়া যাইতে লাগিল, বেতের বন নত হইয়া দুলিয়া দুলিয়া তাহার জামা আটকাইয়া ধরিতে লাগিল……বিপিনের ভ্রূক্ষেপ নাই; কাপড় জামা ছিঁড়িয়া গেল, পায়ে কাঁটা ফুটিল, গায়ে বিছুটি লাগিল, সংজ্ঞা নাই। এই বনের মধ্যেই কালীতারা আছে কিনা কেহ নিশ্চয় জানে না, তবু অনুসন্ধানের বিরাম নাই।

অকস্মাৎ বিপিনের অনুচরবর্গ চীৎকার করিয়া উঠিল—আছে আছে আছে এইখানে আছে।

বিপিন ঝোপ ঝাড় ডিঙাইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল বনের মধ্যে একটু পরিষ্কার শষ্পাবৃত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় রক্তাপ্লুত অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কালীতারা পড়িয়া আছে, আর তাহার বুকের কাছে রক্তচন্দনলিপ্ত প্রফুল্ল শতদলের মতো একটি শিশু রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; স্থানটি ছোট বড় লাল কালো বিবিধ পিপীলিকায় ভরিয়া উঠিয়াছে—শৃগাল কুক্কুর শকুনির রক্তলোলুপ দৃষ্টি এখনো এখানে পড়ে নাই, তাই রক্ষা।

বিপিন তাড়াতাড়ি আপনার জামা খুলিয়া তাহাতেই শিশুটিকে জড়াইয়া বুকে তুলিয়া লইল। তাহাকে জামা খুলিয়া শিশুকে জড়াইতে দেখিয়া পেয়াদার পাগড়ী পাইকের গামছা, বিপিনের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতে লাগিল! বিপিন ভগবানকে ইঙ্গিত করিল, ভগবান আপনার পাগড়ী দিয়া কালীতারাকে ঢাকিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। বিপিন শিশুটিকে ভগবানের কোলে দিল; কোলের গরম ও নাড়া পাইয়া শিশুটি এতক্ষণে তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন একবার শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালীতারার পাশে মাটিতে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ডাকিল—খুড়িমা!

এমন সম্মান ও করুণার সহিত কালীতারাকে কেহ কখনো ডাকে নাই। সে ক্ষীণস্বরে বলিল—কেন বাবা? তুমি কে?—তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিপিন বলিল—খুড়িমা, আমি বিপিন। পাল্কী এনেছি, বাড়ী চল।

কালীতারা কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল—বাড়ী?

—হাঁ খুড়িমা বাড়ী, আমার বাড়ীতে চল।

—আর কেন বাবা, অল্পক্ষণ পরেই ত মরণ আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিত, তুমি কষ্ট করে কেন এসেছ বাবা? এ পোড়ামুখ আমি লোকালয়ে কেমন করে দেখাব?

বিপিন ভগবানের কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া কালীতারাকে দেখাইয়া বলিল—খুড়িমা, এই নিরপরাধ অসহায়টির জন্যে তোমায় বাঁচতে হবে।

কালীতারার মাতৃহৃদয় সন্তানকে দেখিবামাত্র স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া বলিল—দাও বাবা দাও ওকে আমার বুকে! ও আমার বড় লজ্জার বড় দুঃখের বড় সুখের ধন।

বিপিন শিশুটিকে তাহার মাতৃবক্ষে শোয়াইয়া দিল। কালীতারা তাহাকে বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে সুখাবেশের অলসভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা বিপিন, কি হয়েছে?

বিপিন বলিল—ছেলে হয়েছে খুড়িমা, পদ্মফুলটির মতো সুন্দর।

কালীতারা নিমীলিত নয়নে অস্ফুট স্বরে আপন মনেই বলিতে লাগিল—তোকে আমি বধ করতে পারিনি বলে আজ আমার এই লাঞ্ছনা। হতভাগা, এসেছিস যদি ত হতভাগিনীর কোল শূন্য করে পালাস নে। তোর জন্যেই আমি বাঁচব, সকল লজ্জা, সকল নিন্দা, সকল গ্লানি মাথায় করে নিয়েই বাঁচব!

এই স্নেহকরুণ দৃশ্য দেখিয়া বিপিনের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—খুড়িমা, ওঠ, চল বাড়ী যাই।

বিপিনের ইঙ্গিতে পাল্কী কালীতারার পাশে রাখা হইল। কালীতারা উঠিতে চেষ্টা করিয়া পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিপিন তাড়াতাড়ি শিশুটিকে তুলিয়া একজন চাকরের হাতে দিল এবং চারপাঁচজনে ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিতা কালীতারাকে পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী ছুটিয়া চলিল, বিপিনও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন বলিল—ভগবানদীন, ডাক্তারবাবুকে খবর দাও, তাঁকে বড় তরফের অন্দরে নিয়ে এস।

গ্রামের পথ লোকে লোকারণ্য। স্ত্রীপুরুষ ছেলে বুড়ো কেহই আজ ঘরে নাই; পথে পথে পুরুষেরা জনতা করিয়া কোলাহল করিতেছে, অন্তঃপুরিকারা দরজার ফাঁকে চোখ দিয়া কৌতূহলী দৃষ্টি পথে পাঠাইতেছে। কেহ বিপিনের প্রশংসা করিতেছে, কেহ নিন্দা করিতেছে, কেহ উভয়ই করিতেছে; ফলে তর্কের অন্ত নাই, বিতণ্ডার বিরাম নাই।

নিবারণ ও গোবর্দ্ধনের মন কৌতূহলে

ছটফট করিতেছিল, কিন্তু সাহস করিয়া তাহারা পথে বাহির হইতে পারে নাই, কি জানি যদি বিপিন বা নবকিশোরের সম্মুখে পড়িয়া যায়; তাহারাও কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া রঙ্গ দেখিতেছিল।

বিপিনকে তাহাদের বাড়ীর দিকে তাকাইতে দেখিয়া নিবারণ তাড়াতাড়ি দরজার কপাট বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু তখন বিপিনের কোনো দিকে লক্ষ্য ছিল না, মনে অন্য কোনো চিন্তা ছিল না।

পাল্কী অন্দরের দেউড়িতে উপস্থিত হইতেই দ্বারবান দুবেজী অগ্রসর হইয়া জোড় হাতে বলিল—হুজুর, মহারাজ কিসিকে ভিতর লিয়ে যাতে মানা করিয়েসেন। হামাকে হুকুম দিয়েসেন রোকতে, আপনাকে বোলতে।

বিপিন বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি মহারাজকে গিয়ে বলগে যে ছোটবাবু মানা শুনলেন না।

তারপর সকল অনুচরের দিকে ফিরিয়া বিপিন দেখিল তাহারা মহারাজের অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছে। বিপিন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উগ্রভাবে হুকুমের স্বরে বলিল—ধর তোমরা, একে ওপরে নিয়ে যেতে হবে।

তখন সকলে ভয়ে ভয়ে শুষ্ক মুখে আসিয়া ধরিল। বিপিন নিধিরাম খানসামাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল—নিধিদা, যা যা দৌড়ে আমার বিছানা থেকে একখানা তোষক তুলে নিয়ে আয়।

নিধিরাম তোষক আনিয়া বিছাইয়া দিল। বিপিন ও অন্যান্য সকলে ধরাধরি করিয়া শিশু ও মাতাকে পাল্কী হইতে বাহির করিল, এবং তোষকের উপর শোয়াইয়া সকলে সন্তর্পণে ধরিয়া কালীতারাকে অন্দরে লইয়া চলিল।

অন্দরে সকলে পুত্তলিকার মতন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। আজ ঠাকুরের পূজা হয় নাই, ভোগ হয় নাই, রান্না হয় নাই, কাহারো খাওয়া হয় নাই। শিশুগুলি ক্ষুধায় নেতাইয়া পড়িয়াছে, কেহ কেহ বা মাটিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যেন এ রূপকথার রাক্ষসপুরী, সমস্ত উপকরণ সজ্জিত আছে, নাই শুধু কাহারো প্রাণ! এখানে কৈ সে সোনার কাঠি যাহার স্পর্শে এই প্রাণহীন পুরীর জীবনলীলা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারিবে?

বিপিনকে উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই গিন্নি বলিলেন—বিপিন বিপিন করিস কি? তোর কি আক্কেল বল দেখি, কোথাকার পাপ কোথায় এনে জোটাচ্ছিস? উনি শুনে ভারি রাগ কচ্ছিলেন... কথা শোন, ও বিপিন, বিপিন, ...যা খুসি করগে যা, ভাল বিপদেই পড়েছি বাপু!... ওরে ওরে ওকে ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ওপরে? ওমা কি ঘেন্নার কথা! ঐ নোংরা কাপড়-চোপড় নিয়ে ওকে তোরা ওপরে তুলছিস। রাম রাম! জাত ধর্ম্ম আর রইল না।... ওরে ওরে ও রোহিণী, যা যা ওঁকে বলগে যা, শিগগির যা, দৌড়ে যা, বিপিনের কাণ্ডখানা একবার দেখুন এসে।

বিপিন কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কালীতারাকে একেবারে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। তখন ক্রমশ বাড়ীর সকলে একে একে আসিয়া দ্বার-প্রান্তে ভিড় করিতে লাগিল। বিপিন দেরাজ খুলিয়া একটা এনামেলের গামলা, স্পঞ্জ, তোয়ালে বাহির করিল! তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়া নিজেই একটা কেটলি হাতে করিয়া জল আনিতে বাহির হইল—সে সকলের প্রতি এমন বিরক্ত হইয়াছিল যে কাহাকেও কোনো সাহায্য করিতে বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহাকে কেটলি হাতে করিয়া যাইতে দেখিয়া নিধিরাম কেটলি কাড়িয়া লইয়া জল আনিয়া গরম করিতে দিল।

বিপিন নিধিরামকে বলিল—নিধিদা, তোর 'দেখছি আমার ওপর একটু দয়া আছে।... জল খানিকটা গরম করে এই গামলায় দে, আর খানিকটে চা করে ফেল। আর খানিকটে দুধ গরম কর,... বাড়ীতে দুধ না দেয় কাউকে পাঠিয়ে দে গোয়ালা-বাড়ী থেকে শিগগির কিনে আনবে,... বাড়ীর দুধ দেবে নাই বা কেন, না দেয় আমি জোর করে নেব।

বিপিনের অভিমানী অথচ একগুঁয়ে তেজস্বী মন একবার অভিমানে সকলকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইতেছিল, আবার পরক্ষণেই সকলকে দমন করিয়া নিজে জয়ী হইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিতেছিল। বিপিন দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল ক্ষমা, মোক্ষদা, জয়া, পাঁচুর মা, প্রভৃতি সকলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিবার জন্য পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিতেছে অথচ বিপিনের ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিপিন তীব্র কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা, উটের মতন গলা বাড়িয়ে কি উঁকিঝুঁকি মারছিস। অত কৌতূহল হয়ে থাকে ঘরের মধ্যে আয়, এসে সেবা কর।... মোক্ষদা, যা খানিকটে দুধ গরম করে চট করে নিয়ে আয়।

মোক্ষদা সেখান হইতে পলায়ন করিবার সুবিধা পাইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কিন্তু আর সকলে না পারিতেছিল পলায়ন করিতে, আর না পারিতেছিল বিপিনের আহ্বান স্বীকার করিতে; তাহারা বিবর্ণ মুখে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

নিধিরাম গরম জল গামলায় ঢালিয়া দিল। তখন বিপিন বলিল—এঁকে পরিষ্কার করব কি আমরা পুরুষেরাই? স্ত্রীলোকের লজ্জা এতগুলি স্ত্রীলোক তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

সকলে আড়ষ্ট। কেহ একটু নড়িলও না। তখন সকলের পশ্চাৎ হইতে মালতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিপিনকে বলিল—আপনারা বাইরে যান, আমি সব করছি।

বিপিন সপ্রশংস স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল এই বিষম বিক্ষেপের মধ্যেও তাহার মুখ স্থির গম্ভীর, সে প্রবীণার মতো আত্মস্থ। বিপিন তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক খুলিয়া নিজের নূতন পুরাতন কতকগুলা কাপড় বাহির করিয়া ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করিয়া ছিঁড়িয়া একটা ব্যাণ্ডেজ তৈরি করিল। কাঁচি, সেফটি পিন, সূচসূতা, সাবান, প্রভৃতি গুছাইয়া দিয়া সে নিধি-

রামকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মালতী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বিপিন বলিল—নিধিদা, দেখ একবার ডাক্তার এল কি না।

গিন্নি বলিলেন—পোড়া কপাল! আর ডাক্তার ডাকতে হবে না! অমন লোকের মরাই ভালো!

জয়া বলিল—হ্যাঁ, তা ত বটেই, মলেই ওর লজ্জা ঢাকে।

বিপিন শুধু একবার জয়ার দিকে চাহিল, কাহাকেও কিছু বলিল না। আজ তর্ক করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া নিধিরাম আসিল। তখন সকল অন্তঃপুরিকারা অন্তরালে সরিয়া গেল। বিপিন ডাকিল,—মালতী, হয়েছে? ডাক্তার বাবু এসেছেন।

মালতী ঘর হইতে বলিল—এই হল বলে। জ্ঞান হয়েছে। আপনি একবার ঘরে আসুন, বিছানাটা বদলে দিতে হবে।

বিপিন ও ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মালতী মাতা ও শিশু উভয়কেই ধোয়াইয়া মুছাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া ফিট ফাট করিয়া ফেলিয়াছে। ময়লা কাপড় চোপড় পাশে জড়ো করা আছে।

বিপিন, ডাক্তার, নিধিরাম ও মালতী ধরাধরি করিয়া কালীতারাকে নূতন একটি বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বিপিন বলিল—নিধিদা, দেখ্ দেখ্ দুধ।

নিধিরাম দুধ আনিতে গেল, ডাক্তার রোগী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—রোগী বড় দুর্ব্বল। এঁকে খুব করে তাপ দিন, আর অল্প অল্প করে খেতে দিন। এই ওষুধটা আনিয়ে দুঘণ্টা অন্তর চার দাগ পর্য্যন্ত দেবেন। সন্ধ্যের সময় আমায় আর একবার খবর দেবেন।

ডাক্তার বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বিপিনকে ডাকিল। বিপিন বাহিরে আসিলে ডাক্তার চুপিচুপি বলিল—বড় খারাপ অবস্থা। মনের উদ্বেগ, শীত, অনাহার, রক্তহানি সমস্ত মিলে ওঁর সমস্ত দেহযন্ত্রটাকে ভেঙে চুরে দিয়েছে—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত টিকবেন কিনা সন্দেহ। শিগগির ওষুধটা আনিয়ে খাইয়ে দিন। সন্ধ্যার সময় আমায় আবার খবর দেবেন।

বিপিন ডাক্তারের সঙ্গে নিধিরামকে ঔষধ আনিতে পাঠাইল, এবং যাইবার সময় বলিয়া দিল—নিধিদা, দুবেজীকে বলে যাস বিদেশিয়ার বৌকে ডেকে দেবে, এই ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে এখানটা সাফ করে দেবে।

বিপিন মালতীকে বলিল—তুমি ওঁকে একটু একটু করে দুধ খাওয়াও, আমি আগুন নিয়ে আসি।

বিপিন বাহির হইয়া দেখিল হাবার মা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বলিল—হাবার মা, যা দৌড়ে লোহার আঙটায় করে রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে আয়, আর রামধনকে গিয়ে বল আমার এইখানে কতকগুলো কয়লা কি গুল আনিয়ে দেবে।

গিন্নি আসিয়া বলিলেন—বিপিন, নাওয়া খাওয়া করবি, না সমস্ত দিন এই নিয়েই

মেতে থাকবি? লোকদের খেতেটেতে দিবি?

বিপিন নরম সুরে বলিল—তোমরা খাওগে মা, আমার এখন খাবার অবসর নেই।

—তুই খাবিনে আর আমরা খেয়ে বসে থাকব, কারো পেটে ত তেমন আগুন ধরেনি। খেয়ে এসে যা হয় করিস। আয়, আয়!

—না মা, একজন লোক অনাহারে অযত্নে মরছে, আর আমি তাকে ফেলে খেতে যাব, তোমার ছেলেকে এমন পাষণ্ড ভেবনা মা।

মালতী ধীরস্বরে বলিল—এখন আমি ত আছি। আপনি খেয়ে আসুন।

বিপিন প্রতিবাদের স্বরে বলিল—না না, খাবার সময় ঢের পাব, সেবার ত্রুটি হলে যে প্রাণটি যাবে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

হাবার মা আগুন আনিয়া দূর হইতে কাপড়চোপড় গুটাইয়া চৌকাঠের বাহির হইতে আড়ষ্ট হইয়া ঝুঁকিয়া আলগোছে আগুনের আঙঠা ঘরের মধ্যে ধপাস করিয়া রাখিয়া দিল। বিপিন আগুন সরাইয়া দিল, মালতী তাপ দিতে লাগিল।

আহার ও তাপ পাইয়া কালীতারা একটু সুস্থ বোধ করিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল সকলকার দৃষ্টি যেন তাহার বুকের ভিতরকার লুকানো লজ্জা উদ্ঘাটন করিয়া করিয়া বড় নির্ম্মম উপহাসের সঙ্গে দেখিতেছে। তাহার মুখ দিয়া কোনো বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না।

নিধিরাম ঔষধ আনিয়া দিল, বিদেশীয়ার বৌ আসিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া ফেনাইল দিয়া ধুইয়া দিয়া গেল। রামধন এক কেনেস্তারা গুল আনিয়া রাখিল। নিধিরাম আগুন করিতে বসিল। চারিদিকে শৃঙ্খলা দেখিয়া বিপিনের সরল মন আবার প্রসন্নতায় ভরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় হরিবিহারীর খড়মের শব্দ শোনা গেল। হরিবিহারী ডাকিলেন—বিপিন!

বিপিন বাহিরে গিয়া বলিল—আজ্ঞে।

হরিবিহারী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—এসব কি? ওদের দূর করে দাও।

বিপিন ধীর ভাবেই বলিল—বোধহয় দূর করতে হবে না; আপনিই দূর হবে।

—না না, আমার বাড়ীতে ওসব মরাটরার হাঙ্গাম চলবে না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল বলে—আপনারা তা হলে মরবেন কোথায়?—কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিয়া বলিল—এ অবস্থায় ওকে কোথায় নিয়ে যাব?

—রাস্তায় ফেলে দিয়ে এস। তোমার যেমন আক্কেল! পরের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে আনলে।

—পরের বোঝা ত ঠিক নয়, আমার খুড়োমশায়ের ছেলে, তাকে রক্ষা করতে আমি লোকত ধর্ম্মত বাধ্য।

হরিবিহারী বিরক্তির স্বরে বলিল—এঁঃ লোকত ধর্ম্মত বাধ্য!... দুপাতা ইংরিজি পড়ে ভারি তর্কবাগীশ হয়েছ দেখছি?... না না, আমার বাড়ীতে ওসব খাটবে না।

বিপিন ধীরভাবে বলিল—এ বাড়ীতে আমার যেটুকু অধিকার আছে, সেইটুকুতেই খাটবে।

—এঁ্যা? আমি থাকতে তোমার আবার

অধিকার কি? তুমি কথা না শোন, আমি ওদের দরোয়ান দিয়ে বার করে দেব।

বিপিন স্তব্ধ হইয়া পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আজকের রাতটা থাকতে দিন। কাল হয়ত ওঁর মৃতদেহের সঙ্গে আমি আপনার বাড়ী ছেড়ে যাব। আর যদি ভালো থাকে তবুও আমি ওঁকে নিয়ে অন্য কোথাও যাব। আজ রাত্রে আমাদের তাড়াবেন না।

বিপিনের চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া হরি-বিহারী দমিয়া গেলেন। থতমত খাইয়া বলিলেন—তো-তো-তোমাকে কে কি বললে যে তুমি কাঁদছ?··· যা খুসি তোমাদের কর, আমি—আমি আর পারিনে।

হরিবিহারী খড়মের চটপট শব্দ তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। গিন্নি বড় আশা করিয়াছিলেন যে হরিবিহারী আসিলেই এইসব অনাসৃষ্টি অনাচারের একটা সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু যুদ্ধপ্রারম্ভেই তাঁহার যোদ্ধাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখিয়া গিন্নি হতাশ হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

বিপিন ঘরের মধ্যে গিয়া কালীতারার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমা, কেমন আছ? কেমন বোধ হচ্ছে?

কালীতারার চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করিয়া বলিল—আমার আর থাকাথাকি কি বাবা? আমার সময় হয়ে আসছে। খোকাকে আমার বুকের ওপর দাও।

মালতী খোকাকে তাহার বুকের উপর শোয়াইয়া দিল। কালীতারা—আঃ—বলিয়া একদণ্ড চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুত্রস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। তারপর চোখ মেলিয়া মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি কে মা জানিনে। যেই হও তুমি, তুমি আরজন্মে আমার মা ছিলে।··· বাবা বিপিন, তুমি আমার খোকাকে দেখো; ওর মায়ের পাপে নিষ্পাপ ও যেন কষ্ট না পায়।

বিপিন চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—খুড়িমা তোমার ছেলে তুমি দেখবে। অমন কথা বলছ কেন?

কালীতারার চক্ষু বিস্ফারিত মুখ বিকৃত হইয়া গেল। সে বলিল—উঃ বুকের মধ্যে যে কী করছে! নিঃশ্বাস যে বন্ধ হয়ে আসছে!

বিপিন তাড়াতাড়ি এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া কালীতারাকে খাওয়াইল। তখন সে আবার একটু চুপ করিল। বিপিন বলিল—নিধিদা, যা, ডাক্তারকে ডেকে আন!

কালীতারা তৈলহীন প্রদীপের মতো ক্রমশই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে তাহার চোখ মুদ্রিত হইয়া গেল, দেহ একবার হঠাৎ স্পন্দিত হইয়া নিষ্পন্দ হইয়া গেল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

মালতী তাড়াতাড়ি খোকাকে কালীতারার বুক হইতে নিজের বুকে তুলিয়া লইল। তাহার অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপিনও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভগবান!

বিপিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(২৫)

কিছুক্ষণ পরে শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। তখন বিপিনের চমক ভাঙিল। অশ্রু মুছিয়া সে সকল পুরস্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—এই অসহায় জীবটির মা ত ওকে ছেড়ে গেল। এখন তোমাদের মধ্যে কে দয়ালু আছ, কে ওর মা হবে?

সকলে নিস্তব্ধ। নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন কেহ ফেলিতেছে না। বিপিন আবার বলিল—বল বল, কে এই অনাথ শিশুর ভার নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে?

তখন গিন্নি বলিলেন—কে আবার ঐ ল্যাঠা সাধে সুখে ঘাড়ে করতে যাবে? ওকে বষ্টমদের আখড়ায় পাঠিয়ে দেবো এখন।

বিপিন একটু বেদনামিশ্র অভিমান ও তিরস্কারের স্বরে বলিল—মা, এমন নিষ্ঠুর কথা বলা তোমার সাজে না। আমার মা যেদিন মরেছিলেন সেদিন ত মা তুমিই আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলে, বষ্টমের আখড়ায় ত পাঠাও নি!

বিপিনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। গিন্নিও আহত হইয়া বলিলেন—ষাট ষাট, শোন একবার পাগলামি কথা! তোকে কোন্ দুঃখে বষ্টমের আখড়ায় দিতে যাব? তুই যে আমাদের বংশের দুলাল! বড় দুঃখের প্রথম ছেলে! তোতে আর এতে সমান হল?

—তফাৎ বড় বেশি নয় মা। এ আমার খুড়োর ছেলে। তোমরা কেউ না স্বীকার কর, আমি একে স্বীকার করব এ আমার ভাই; আমার শরীরে যে-বংশের রক্ত, এর শরীরেও তাই। আমি ওকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। ওর মা মৃত্যুকালে আমার হাতে ওকে দিয়ে গেছে। আমার প্রাণ দিয়েও ওকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমার প্রাণ দিলেও ত ওর মায়ের অভাব আমি পূর্ণ করতে পারব না। কে তোমরা দয়া করবে বল?

আবার সকলে নিস্তব্ধ। বিপিন একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিল; তাহার দৃষ্টির সম্মুখে কাহারো দৃষ্টি অসঙ্কোচে স্থির থাকিতে পারিল না; কেহই স্বীকৃত হইল না। তখন বিপিন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—এখানে কি তবে এমন একজনও নেই, যার হৃদয় এই অসহায় নিরপরাধকে আপনার স্নেহ দিয়ে রক্ষা করতে পারে? আমাকে কি শেষে মাইনে-করা দাসীর সাহায্য নিতে হবে?

তখন মালতী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে স্নেহ যেন ক্ষরিত হইতেছিল, করুণা যেন মাখানো ছিল, অভয় যেন উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল; কিন্তু তাহারই সঙ্গে সে-দৃষ্টিতে কি সঙ্কোচ, কি বিনয়, কি আত্ম-বিলোপের চেষ্টা! সেখানে করুণার আগ্রহ আছে, বাহাদুরি লইবার ব্যগ্রতা নাই বিপিনের মন আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে আশাভরে মালতীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মালতী একবার সকলের দিকে চকিতে চাহিয়া লইল; দেখিল কাহারো মুখে কিছু বলিবার মতো ব্যগ্রতা নাই। তখন সে নতমুখে ধীরস্বরে বলিতে লাগিল—আমি এ-কে মানুষ করব। আমার জীবনে ত কোনো অবলম্বনই নেই, এই আমার অব-

লম্বন হবে। কিন্তু দুধের সংস্থান ত আমার নেই, সে ভার আপনাদের নিতে হবে।

বিপিন উৎসাহিত হইয়া বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি? সে আমি ঠিক বন্দোবস্ত করে দেবো। আজ থেকে তবে এ শিশু তোমার।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হইল ভালো, যেমন সকলের ঘৃণিত আমি, আমার সম্বলও জুটিল তেমনি সকলের ঘৃণিত এই শিশু!

মালতীর মনের এই ভাব আলোচনা-ব্যগ্রা পুরস্ত্রীদের মনেও সংক্রমিত হইল। তাহারা এই বিষয় লইয়া কতবিধ আন্দোলন কতবিধ শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

শিশুর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিপিন শব সৎকারের জন্য ব্যস্ত হইল। কে এই শব লইয়া যাইবে? এই পতিতার শব কোনো সুব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে কিনা সন্দেহ। হায় হায়! এমন দিনে আজ নবকিশোর গ্রামে নাই! সে থাকিলে তাহারা দুজনেই সৎকার করিয়া আসিতে পারিত।

বিপিন নিধিরামকে বলিল—নিধিদা, যা ত দেউড়িতে আর ঠাকুরবাড়ীতে; সবাইকে বলগে শ্মশানে যেতে হবে। কাউকে ডাকিসনে, যে আপনি আসবে, আসবে। আর একবার ভটচায্যি জ্যেঠামশায়কে খবর দিস গিয়ে।

নিধিরাম চলিয়া গেল। বিপিন সেই শব কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এখনো তাহার স্নানাহার হয় নাই, বাড়ীরও কেহ তাহার জন্য খাইতে পায় নাই। বিপিনের অনাসৃষ্টি কাণ্ডের জন্য সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে অসন্তোষ মালতীর উপর। বিপিনের প্রিয় হইবার জন্যই যে সবাইকে টেক্কা দিয়া মালতী বিপিনের গায়ে পড়িয়া সকল কাজ করিতেছে এ বিষয়ে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন পুরুষের-গায়ে-পড়া মেয়ে তাহারা বাপের জন্মেও দেখে নাই।

ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল, গিন্নি বলিলেন—জয়া ঠাকুরঝি, সন্ধ্যে জ্বালোগে, একে ত ঠাকুর আজ উপুসী আছেন, আবার বাড়ীতে সন্ধ্যে উতরে যাবে……চারিদিকেই ত অলক্ষণ। যে অবধি মালতী অলক্ষ্মী বাড়ীতে পা দিয়েছে সে অবধি সংসার যেন পুড়ে ঝুড়ে যাচ্ছে।

বিপিন অনুযোগের স্বরে বলিল—মা!

গিন্নি বলিলেন—আমি অমন কারো মুখ চেয়ে কথা বলতে জানিনে। সত্যি কথা বলব, তার আবার ঢাকঢাক গুড়গুড় কি?… যা ক্ষমা, মোক্ষদা যা, ঘরে ঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে চৌকাঠে জল দিগে। শাঁক বাজাসনে যেন, বাড়ীতে মড়া রয়েছে। ভালো আপদ বাপু, বাড়ীতে এক মড়া আগলে বসে থাকা। কোথাকার ঝঞ্ঝাট কোথায় এসে পড়ল দেখ দেখি।

জয়া, ক্ষমা, মোক্ষদা, পাঁচুর মা উঠিয়া গেল। পাঁচুর মাকে যাইতে দেখিয়া গিন্নি বলিলেন—বৌমা, একটা কুটো ভেঙে খোঁপায় গুঁজে রাখগে; ভরা পোয়াতি তুমি, সাবধানে থেকো। মড়া নিয়ে যাবার সময় তুমি দেখোনা যেন। তুমি ঠাকুর-

ঘরে বসে থাকগে; একলাটি থাকতে ভয় করে ত মোক্ষদাকে বোলো কাছে বসবে।

একটু অগ্রসর হইয়াই জয়া বলিল—দেখলি তোরা মালতীর কাণ্ডখানা! কি গায়েপড়া মেয়ে রে বাবা! বিপিনের যারপরনাই মা রয়েছে, আমরাও ত মায়েরই মতন, আমরা রয়েছি, ঐ ওর নিজের খুড়ি রয়েছে, কেউ কি আর আমরা ঐ কচিছেলের ভার নিতাম না! একটা প্রাণী যত্ন-অভাবে মারা যাবে এই কি কেউ চক্ষে দেখতে পারত! কিন্তু ওঁর আর তর সইল না। অমনি টপ করে বললেন—আমি ছেলে নেব। ভ্যালা রে আমার দরদী! তবু যদি এক পয়সার মুরোদ থাকত! মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান!

ক্ষমা বলিল—সত্যি বাপু মালতীর সবই বাড়াবাড়ি। কি করে বিপিনদার সঙ্গে যে কথা কইবে সেই ছুতো খুঁজে ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়।

মোক্ষদা বলিল—ওটা বয়সের দোষ লো বয়সের দোষ!

পাঁচুর মা বলিল—মরণ আর কি? বয়স ত আর কারো ছিল না, রূপসী বিদ্যেধরীরই শুধু বয়েস হয়েছে! আমাদেরও অমনি এককালে ছিল। পাঁচু হয়ে অবধি আমার হরতেলের মতন রং একেবারে কালো ঝুল হয়ে গেছে, তোরা ত তা দেখেছিস ঠাকুরঝি। কিন্তু আমরা কত রূপের গরব করে বেড়াচ্ছি। উনি রূপের ঠ্যাকারে আর বাঁচেন না!

মোক্ষদা বলিল—তা যাই বল বৌ, মালতী সুন্দরী বটে!

ক্ষমা বলিল—ছাই সুন্দরী, চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা, নাকটা তিন হাত! ওর চেয়ে কালোতে আমাদের ছিরি আছে।

জয়া বলিল—সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা—শাস্ত্রেই বলেছে। কটা চামড়া দেখেই লোক ভুলে যায়।

মালতীর শ্রাদ্ধ করিতে করিতে প্রদীপ জ্বালা হইল। জয়া বলিল—যা ত মা ক্ষমা সব ঘরগুলোতে সন্ধ্যে দেখিয়ে আয়, আর মোক্ষদা চৌকাঠগুলোয় একটু জল দিয়ে আয়।

—না বাপু, আমরা একলা যেতে পারব না। বাড়ীতে মড়া পড়ে রয়েছে, গা কেমন ছমছম করছে। তুমিও সঙ্গে এস জয়া মাসি।

তখন চারজনেই রাম রাম বলিতে বলিতে সকল ঘরে প্রদীপ দিতে দিতে আবার বিপিনের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

গিন্নি প্রদীপের আলোক দেখিয়াই এক হাতের আঙুলের ফাঁকে উল্টা দিক হইতে অপর হাতের আঙুল শৃঙ্খলিত করিয়া কপালে বারবার ঠেকাইয়া ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—দুর্গা দুর্গা! হরিবোল হরিবোল! রাম রাম! রাম রাম!

মোক্ষদা চৌকাঠে জল দিতে যাইতেছিল। গিন্নি বলিলেন—হাঁ হাঁ হাঁ—করিস কি? এ চৌকাঠে জল দিসনে। মড়া বেরিয়ে গেলে গোবরজল ছড়া দিতে হবে। তেশুন্যে ঘরের মধ্যে মাগী মরল। ও রকম লোকের

ত এমনি মরণই হয়.....ওদের কি আর সদ্‌গতি হয়! তেশূন্যে মরে তেশূন্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

বিপিন বলিল—মা! মানুষ থাকবে ঘরে, মরবে কোথায় গিয়ে, ভাগাড়ে?

গিন্নি বিপিনের সঙ্গে তর্কে সুবিধা করিতে পারিবেন না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন।

এমন সময় নিধিরাম আসিয়া বলিল—কেউ মড়া ফেলতে আসতে চায় না; সবাই বলে জাত গেছে যার তার মড়া ফেল্লে আমাদেরও জাত যাবে। শুধু ভগবান সুকুল আর মহীপত তেওয়ারি এসেছে। ভটচায্যি মশায় পরে আসছেন।

পশ্চাৎ হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—আমি এসেছি বাবা বিপিন! শবসৎকারের কি হচ্ছে?

—লোক পাওয়া যাচ্ছে না জ্যাঠামশায়!

গিন্নি বলিলেন—বষ্টমদের আখড়ায় খবর দিলেই ত কত লোক পাওয়া যাবে। মালসা ভোগ দিয়ে তাদের একটা মচ্ছব দিতে হবে...তা খরচ হবে বলে কি করা যাবে। নিজের দরজার ময়লা নিজেকেই ত সাফ করতে হবে।

বিপিন উত্তেজিত হইয়া বলিল—না, সে কখখনো হবে না। বষ্টম ফষ্টমকে ছুঁতে দেবো না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—কেন বাবা, এতে তোমার আপত্তি কি? শবেরও কি ছুত বিচার আছে?

—তা নেই জ্যেঠামশায়, কিন্তু এটা যে শবের প্রতি অপমান! এ ত আমি কিছুতেই হতে দিতে পারিনে। এঁকে অপমান করবার অধিকার কারো নেই। আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে ইনি কোনো পাপ করেছিলেন। সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে কি মনের বলের পরিচয় দিয়েছেন! নিজের প্রাণ দিলেন, তবু অজাত সন্তানের প্রাণ নষ্ট করতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নি।...নিধিদা, ডাক তেওয়ারিদের, আমরা তিন জনেই কোনো রকম করে সৎকার করে আসতে পারব!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—চল বাবা, আমি চতুর্থ হব।

—না না, আপনি বুড়ো মানুষ আপনার কষ্ট হবে। আমরা তিন জনেই পারব।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—আমার কষ্ট হবে কি না সে কথা তোমার চেয়ে আমিই ভালো বুঝি বাবা।...আর এই মহীপত তেওয়ারিটিকেও ত আমার চেয়ে নবীন বোধ হচ্ছে না।

বিপিন মহীপতের শুভ্র শ্মশ্রু ও লোল শুভ্র চর্ম্মের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তখন চারজন ধরাধরি করিয়া কালীতারার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহার চির বিদায়ের সময় কেহ একবার বিলাপ করিয়া কাঁদিল না, কাহারো হৃদয়ে একটু বেদনা বোধ হইল না! শুধু মালতী লুকাইয়া একবার চোখ মুছিয়া শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, আর খুড়িমা শক্ত হইয়া বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(২৬)

বিপিনেরা শব লইয়া বাড়ীর বাহির

হইতে-না-হইতে শব বহনের জন্য অসংখ্য লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রামের জমিদারের ছেলেকে শব বহন করিতে দেখিয়া কাহারই উৎকট ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া আর বাধা দিতে পারিল না। শব-সৎকার বেশ সমারোহের সঙ্গেই হইয়া গেল।

এদিকে অন্দর মহল হইতে শব বাহির হইয়া গেলে গিন্নি বলিলেন—নে নে রোহিণী, তোতে আর হাবার মাতে মিলে সব পরিষ্কার করে নে।

রোহিণী নাক সিঁটকাইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আমি এই শীতকালে রাত্রে নাইতে টাইতে পারব না। হাবার মা পারে করুক।

হাবার মা বলিল—মুইও সে পারব নি, মোর জাড় করে জ্বর এসেছে।

গিন্নি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—তোরা কেউ পারবিনে তবে কি আমি করব?

মালতী বলিল—বড় মাসিমা, আমি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

গিন্নি তাহার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। মালতী তৎপরতার সহিত সর্ব্বত্র ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল!

গিন্নি বলিলেন—ওগো ও মেম সাহেব! গোবর দিলে কৈ? লক্ষ্মীচরিত্তিরে আছে—

লক্ষ্মীর বাস আমলকিতে, শঙ্খে, পদ্মে, গোবরে;
আর লক্ষ্মী বিরাজ করেন সাদা ধপধপ কাপড়ে!

তোমরা ত শাস্তর টাস্তর কিছু মানো না; কিন্তু আমরা ত তোমার মত মেম হইনি.....

মালতী অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি গোবর আনিয়া গোবরজল ছড়া দিতে লাগিল।

তখন গিন্নি বলিলেন—তুমি ঐ ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবে গো? বিপিন যা বল্লে তাই কি করলে? শোবার ঘরখানা আঁতুড়ঘর করলেই?

মালতী বলিল—এ ঘর যখন আঁতুড়-ঘর হয়েছে তখন আমি এই ঘরেই থাকব।

—বিপিন তাহলে থাকবে কোথায়?

মালতী হাসিয়া বলিল—তা তিনিই জানেন, যিনি ইচ্ছে করে নিজের শোবার ঘরটাকে আঁতুড় করেছেন।

মালতীর হাসি দেখিয়া গিন্নির গা জ্বলিয়া গেল। তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন—তোমাকে আগলাবে কে? ছোট বৌ?

খুড়িমা অমনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ! ছোট বৌয়ের ত আর কাজকর্ম্ম নেই যে আঁতুড় আগলাতে যাবে? আমার পূজো আছে আহ্নিক আছে, আমি ত আর আঁতুড় নিয়ে জয়জয়কার করতে পারব না।

মালতী বুঝিল সমস্যা জটিল। তাহাকে কেহ আগলাইবে না, অথচ একলা থাকিলেও কুৎসার অন্ত থাকিবে না। এই কথা মনে হইতেই তাহার তেজস্বী মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল—আমি এখানে একলাই থাকব।

সকলে অবাক হইয়া এই সাহসিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রোহিণী বলিল—তা থাকলেই বা, ভয় কি, দাদাবাবু ত ঐ পাশের ঘরেই থাকবে।

জয়া রোহিণীর দিকে চাহিয়া হাসিল।

তারপর সকলেরই চোখে চোখে হাসি খেলিয়া গেল।

মালতী সমস্তই বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই দিব্য নিশ্চিন্ত ও স্বাভাবিকভাবে শিশুটির শয়ন ও আহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

মালতীকে এইরূপে লোকাপবাদের ভয় উপেক্ষা করিতে দেখিয়া গিন্নি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। খুড়িমা তাড়াতাড়ি মালতীকে ঢাকা দিবার জন্য বলিলেন—তা ওকে ত এই ঘরেই থাকতে হবে, আঁতুড় নিয়ে আর কটা ঘর মজাবে। আমি না হয় ঐ পাশের ঘরে একদিন থাকব। আর দিদি তুমি বলে দিয়ো দাসীদের মধ্যে কেউ একজন এই দালানে শোবে।

গিন্নি এ কথার কোনোই উত্তর না দিয়া বলিলেন—দেখিগে ঠাকুরের কি হচ্ছে। কাকে দিয়ে তাঁর গতিমুক্তি হবে তাও জানিনে।

এই কথা শুনিয়া মালতীর এমন হাসি আসিল যে সে হঠাৎ খোকার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য হইল। ঠাকুরের ভাবনা মানুষ ভাবিয়া অস্থির কে তাঁহার গতিমুক্তি করিবে!

গিন্নি বলিলেন—যা রোহিণী, দুবেজীকে বলগে ঠাকুরবাড়ীর হারাধন পুজুরীকে ডেকে দেবে। মুখুয্যেমশায় কি গোবর্দ্ধন এবাড়ীতে ত আর পা দেবে না। ছিছি! আজ-কালকার যেমন সব ছেলেপুলে হয়েছে, বামুন দেবতা মানে না, শাপমন্যির ভয় নেই!... ওলো হাবার মা, উঠনে, বার-দরজার কাছে একটা পূর্ণ ঘট, আগুন, লোহা আর দুটি মটর ডাল রেখে দিগে। আর বংশীকে বল দুটো নিমপাতা এনে দেবে; বিপিন বাড়ী এলে ঐসব ছুঁয়ে তবে ঘরে উঠবে।...সে হয়ত ওসব মানবেই না! তা মানুক আর না-মানুক যা লক্ষণ আমায় ত তা সব করতে হবে। যা যা, কখন সে হুপ করে এসে পড়বে আবার।

সমস্ত দিনের বিষম বিক্ষেপের পর বাড়ীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ঠাকুরঘরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উনন জ্বলিল। ছেলেমেয়েগুলি আহার নিদ্রার জন্য জননীদিগকে জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, বিনি একবার সমস্ত দিনের পর মার কাছে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। গিন্নি বলিলেন—থাম, থাম, আমি একবার সব দেখে শুনে আসি, বিপিনের খাবার, ঠাকুরের শেতল তৈরি টৈরি হল কি না!

জয়া বলিল—কচি মেয়ে ভরসন্ধ্যেবেলা মা ছেড়ে কি থাকে? তুমি একে একটু নেও, আমি ওদিকে দেখছি।

জয়াকে যাইতে দেখিয়া খুড়িমা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। গিন্নি বিনিকে কোলে লইয়া বলিলেন—আমার ত তোমায় কোলে করে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। চল ঠাকুর-ঘরের দালানে গিয়ে বসিগে, সকল দিকই দেখতে শুনতে পাব।...মালতী, তুমি একলা থাকতে পারবে? এই আমরা ত সব কাছাকাছিই থাকব।

আজ এই প্রথম একটুখানি সদয় ব্যবহার পাইয়া মালতী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—তা পারব মাসিমা।

তখন গিন্নি গিয়া ঠাকুরঘরের দালানে বসিলেন।

খানিকক্ষণ পরেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। সে বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। গিন্নি বলিলেন—হাঁ হাঁ হাঁ... ঐখেনে একটু দাঁড়া। ঐ আগুন লোহা ছোঁ। একটা মটরের ডাল আর নিমপাতা দাঁতে কেটে ফেল, তার পর আয়।

বিপিনের মন তখন এমন ক্লান্ত হইয়া ছিল যে সে বিনা প্রতিবাদে এই অর্থহীন অনুষ্ঠান করিল।

গিন্নি বিপিনকে বলিলেন—বোস বোস, এইখানে বোস।

বিপিন মাতার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

গিন্নি পুত্রের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—একি! মাথা যে একেবারে শপশপ করছে, ভালো করে মাথাও পুঁছিসনি বুঝি। রাত্তিরে ভিজে মাথায় থাকলে অসুখ করবে যে

তারপর তিনি নিজের অঞ্চল দিয়া বিপিনের মাথা মুছিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপিন বলিতে লাগিল—থাক থাক হয়েছে। কিন্তু কে শুনে তাহার কথা। ঘসিয়া ঘসিয়া মাথা মুছিয়া গিন্নি বলিলেন—ছোট বৌ, বিপিনের জলখাবারটা এনে দাও।

—এখন আর জল খাব না মা, একে-বারেই খাব।

—একেবারেই খেতে পারবি কেন। সমস্ত দিন এই হটরানি, গলা যে শুকিয়ে কাট হয়ে আছে। একটু না-হয় আগে সরবৎ খা।.....ছোট বৌ, দেখ ত খাবার হল। হয়ে থাকে ত সব এক সঙ্গেই এনে দাও, খেয়ে একটু শুক গিয়ে।... কোথায় শুবি?

—কেন, আমার ঘরে।

—ও ঘরে ত মালতী ছেলে নিয়ে আছে।

—আমি তাহলে লাইব্রেরী ঘরে শোব। ...এই, কে আছিস।

রোহিণী অগ্রসর হইয়া বলিল—কেন দাদাবাবু।

—যা, নিধিদাকে বলগে লাইব্রেরী-ঘরে বড় কৌচখানার ওপর আমার বিছানা করে দেবে।

গিন্নি বলিলেন—তুই ঐ রাইবেরালীর মধ্যে কেমন করে থাকবি? চারিদিকে বই ঠাসা—গুমসো গুমসো চামসে চামসে গন্ধে ঘুম হবে কেন?

—বেশ হবে। বইয়ের গন্ধ আমাদের কাছে চন্দনের গন্ধের মতন।

গিন্নি তাঁহার একগুঁয়ে ছেলেটিকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তিনি আর কিছু বলিলেন না। বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল।

আহার সমাপ্ত করিয়া বিপিন শয়ন করিতে চলিল। শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দেখিল একাকিনী মালতী বসিয়া আছে। বিপিন বলিল—একলা আছ মালতী?

মালতী হাসিয়া বলিল—আর ত আমি একলা নই। ভগবান ত আমার সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছেন!

কল্যাণময়ী জননীর মতো শিশুটিকে কোলে ধরিয়া মালতী বসিয়া আছে, বিপিন মুগ্ধ নেত্রে তাহাই দেখিতে লাগিল।

বিপিন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মালতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—রাত হয়েছে, আপনি শুতে যান।

বিপিন ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মভূমি

১

কোথায় আমার জন্মভূমি ? কোথা, কোন্ গগনের নীচে ?
কোথা হতে এলাম মর্ত্ত্য-বাসে ?
ভুলে গেছি ; কিন্তু স্মৃতির ছায়া লেগে আছে পিছে
কত ভাবি মনে নাহি আসে।

২

দিনের আলো আস্‌ছে নিভে, আস্‌ছে সন্ধ্যা, আস্‌ছে রাতি,
নীরবতা প্রসারিছে কায়া।
এস আমার চিরদিনের মৌন কান্নার সাথের সাথী,
ছড়িয়ে দিয়ে নির্ম্মমতার মায়া।

৩

আয় তমিস্রা আয়রে নিশা, দেখি তোদের পরপারে
জাগে কিনা উষার তরুণতা।
দেখি, যদি সেই প্রভাতের পাখীগুলির নাচগানে
মনে পড়ে জন্মভূমির কথা।

—০:০—

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী

জ্যোৎস্না-নিশীথে

১

রজত-ধবল স্নিগ্ধ পূর্ণিমার তরল উচ্ছ্বাস
ঝরিয়া পড়িছে নিম্নে, পরিপ্লাবি' নিখিল আকাশ,
প্রকৃতির মুক্তবক্ষে ;—সে মোহন কোমল পরশে
কদম্ব শিহরি উঠে ব্যাকুলিয়া তরুণ উল্লাসে !
চিক্কনিয়া শিক্ত শ্যাম আকম্পিত অশ্বত্থপল্লবে
সুপ্তিমগ্ন সৌধশিরে চন্দ্রকর ঘুমায় নীরবে।
পূর্ণতোয়া স্রোতস্বতী কুলুকুলু যাইছে বহিয়া
উচ্ছ্বসিত সর্ব্ব অঙ্গে চূর্ণরশ্মি পুলকে মাখিয়া।

২

ক্ষমিয়ো আমারে, প্রভো, এই শান্ত সুপ্ত রজনীতে
দ্বিধা যদি জেগে উঠে চুপি চুপি হৃদয় নিভৃতে।
সবল দলিবে সদা পদতলে দুর্ব্বলের প্রাণ,
পিষ্টই পেষিত হবে—বিশ্বতন্ত্রে এই কি বিধান ?
স্বার্থের উলঙ্গ মূর্ত্তি লজ্জাহীন নাচিয়া বেড়ায়,
বিদ্বেষ মুখস্ পরি' ঢালে মধু দুষ্ট রসনায়,
মিথ্যা হইয়াছে দড়, প্রবঞ্চনা পর্ব্বত-প্রমাণ—
সত্যপন্থী ধর্ম্মভীরু বল, প্রভো, কোথা পাবে স্থান ?

৩

বিলাস অযথা স্ফীত শোষিয়াছে দরিদ্রের গ্রাস,
বিবেক, প্রতিভা, মেধা স্তব-তুষ্ট দাম্ভিকের দাস,
এ বৈষম্য তব রাজ্যে সাজে কি, হে রাজরাজেশ্বর ?
মূঢ়-বুদ্ধি বুঝিনাকো সন্দেহেতে ব্যাকুল অন্তর।
পুরাতন জীর্ণ পৃথ্বী আর, প্রভো, ভাল নাহি লাগে,
নিয়ন্ত্রিত নবীনের অভ্যুদয় আশা প্রাণে জাগে।
সত্য যুগ চলি গেছে বহুদিন এ মর্ত্ত্য ছাড়িয়া—
আবার ফিরিবে কবে, তারি তরে আছি তাকাইয়া।

৪

হে রুদ্র, সংহার-লীলা পুনঃ তব কর অভিনয়
ধ্বংস হৌক্ দুষ্কৃতের, ভস্ম হৌক্ পাপের নিলয়।
সেই ভস্মরাশি হ'ত দীপ্ত দৃপ্ত নবীন জীবন
ফুৎকারি' জাগায়ে তোল, ধরা হৌক্ শান্তিনিকেতন।
মহাসমুদ্রের নীরে অবগাহি' উঠুক্ ধরণী
ডুবায়ে অতল তলে অতীতের কলঙ্ক কাহিনী।
বুদ্ধের বৈরাগ্য-দীক্ষা চৈতন্যের প্রেমের বিজয়,
যীশুর উদার ক্ষমা,—আর যেন ব্যর্থ নাহি হয়!

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।



নিরুপমা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত "ফুলের মালা"

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত

জল্পেশ্বরে শিবরাত্রি

আমরা যেখানে অবস্থিতি করি তাহার পনর মাইল উত্তরে প্রসিদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলা। তাহার পশ্চিমে ভূটান দুয়ার অন্তর্গত ময়না গুড়ি পরগণার মধ্যস্থিত, জল্‌পেশ নামক স্থানে, একটি প্রাচীন বৃহদায়তন কারুকার্য্য সমন্বিত শিবমন্দির আছে। ইহা জল্লেশ্বর মন্দির নামে খ্যাত। ইহা জলপাইগুড়ি সহর হইতে পূর্ব্বদিকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি বিরল বসতি এবং জঙ্গলাকীর্ণ, তথায় যাইবার পথ অতিশয় বন্ধুর ও অসমতল। পথে কতকগুলি ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী আছে তাহার প্রশস্তি অল্প, কিন্তু তটভূমি অত্যন্ত উচ্চ। অন্যান্য সময়ে ইহার অধিকাংশই শুষ্ক বা স্বল্প জলধারা-প্রবাহিত থাকে কিন্তু বর্ষাগমে ইহাদের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সকল কারণে এ পথে যাতায়াত করিতে হইলে হস্তি অশ্ব বা গোশকট ভিন্ন অন্য যানে যাইবার উপায় নাই।

প্রতি বৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সেখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই সময়ে দেবাদিদেবকে দর্শন ও পূজা করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। আমরা ৺শিবরাত্রির দিন প্রত্যূষে গোযানে আরোহণ পূর্ব্বক ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের চাঙড়াবান্ধা নামক ষ্টেসন হইতে ট্রেণে চড়িলাম। তথা হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ভোটপাটি নামক ষ্টেসনে নামিয়া পুনরায় গরুর গাড়িতে উঠিলাম। এই গাড়িও পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তানহিলে পাইবার উপায় নাই। নিকটবর্ত্তী লোকেরা এরূপ বন্দোবস্তে কেহ যায় না। সকলেই বরাবর গোশকটে যাইয়া থাকে। এই কয় মাইল রাস্তা পুষ্পকযানের আরোহণ সুখ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আমরা এই পন্থা অবলম্বন করিলাম।

পথে দেখিলাম অসাধারণ জনতা। বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবাকিশোর ও বালক, সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীতে এই জনসংঘ গঠিত। সকলেই পরিষ্কৃত, সুবেশধারী ও প্রফুল্লচিত্ত। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা মস্তকাবরণ ব্যবহার করে না। মাথার চুল আঁচড়াইয়া পশ্চাতে ঝুঁটি বাঁধে, চুলের মধ্যে কোন অলঙ্কার পরিবার প্রথা নাই; কাপড় দুইখণ্ড ব্যবহার করে; একখণ্ড বক্ষস্থলের উপর দিয়া বাঁধে আর একখানা চাদর পুরুষ মানুষের মত ঘাড়ের উপর দিয়া গায়ে ফেলিয়া রাখে। পুরুষদের পরিচ্ছদে আধুনিক অনুকরণে কোট সার্ট পিরাণ প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে। বাড়িতে কিন্তু অধিকাংশ লোকেই কেবলমাত্র একটা কৌপিন মাত্র ব্যবহার করে। পথের ধারে শিমুল পলাস কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ। লোকে দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে আবার চলিতেছে। অনেকগুলি ছাগ মেষ কবুতর প্রভৃতিও বলিদানের জন্য নীত হইতেছে, এ প্রদেশে

সর্ব্বত্রই এই সকল উপকরণ মহাদেবের নিকটে বলিদান প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সেই অসমতল উচ্চ নীচ পথে গো শকটের মহাআন্দোলনের মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তটভূমি হইতে নদীগর্ভে মহাবেগে অবতরণের সময় শাখামৃগের মত ছই ধরিয়া ঝুলিয়া কোন মতে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এইভাবে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে সকলে সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "আমরা আসিয়া পড়িয়াছি ঐ যে ৺বাবার মন্দির দেখা যায়।"

অবশেষে খরস্রোতা ধরলা বা ধবলা নদী পার হইয়া আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। মন্দিরের নিকটেই আমাদের তাম্বু ফেলা হইয়াছিল। সম্মুখে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী, মন্দিরের অপর পার্শ্বে আরও একটি এই প্রকার পুষ্করিণী আছে। কিন্তু বহুকাল সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়াছে জল একগলা মাত্র। স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদ পচিয়া জলকে সবুজবর্ণ ও দুর্গন্ধময় করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি অদ্য সেই পুষ্করিণীর মাহাত্ম্যের সীমা নাই, অধিকাংশ লোকই তাহাতে স্নান করিয়া একেবারে জলকাদা গোলায় পরিণত করিয়াছে। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, কিন্তু কৌতূহল আমাদের বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিলনা, উঠিয়া বস্ত্রাবাসের পার্শ্ব হইতে দেখিলাম পশ্চিম ও উত্তর দিকে যতদূর দেখা যায় কেবল লোক সমুদ্র। "জয় বাবা জল্পেশ্বরের জয় মহাকালের জয়" এইরূপ শব্দে কান ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। সুবৃহৎ মন্দির মধ্য হইতে মুহুর্মুহু ঘণ্টা-ধ্বনিসহ পূজারী ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠ হইতে অবিশ্রান্ত "শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্র খুব গম্ভীরভাবে উচ্চারিত হইতেছিল। আমরা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া তখনই পূজা করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শুনিলাম, এক্ষণে সেখানে ভয়ানক ভীড়। মধ্যরাত্রে ময়না গুড়ির তহশীলদার বাবুর (মেলার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী) স্ত্রীকন্যাগণ পূজা করিতে যাইবেন, তখন সমস্ত জনতা মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব সেই সময় আমাদেরও যাওয়া ঠিক হইল। এতক্ষণ আমরা তাম্বুতে বসিয়া থাকিয়া কি করিব বলিয়া নিকটে আর কেনে কিছু দ্রষ্টব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে কিছুদূরে বনুয়া কালী, পাগলা কালী ও ধর্ম্মপাল মূর্ত্তি আছে। আমরা উৎসাহ সহকারে সেই সকল দেখিতে চলিলাম। মন্দিরের কিছু নিম্নে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত মাঠ। বারমাস এই স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাউ বৃক্ষটিও কণ্টক গুল্মে আচ্ছন্ন থাকে। মেলার কিছু দিন পূর্ব্বে পরিশ্রমী দরিদ্র ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া এই সকল বৃক্ষ গুল্মাদি কাটিয়া শুষ্ক করতঃ আটি বাঁধিয়া রাখে। মেলায় সমাগত দোকানদার ও যাত্রিবর্গ রন্ধনার্থ এই সকল কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া লয়। তাহাতে এইসকল লোকের বিলক্ষণ লাভ হয়। এবং স্থানটিও পরিস্কৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

সেই সকল কর্ত্তিত বৃক্ষের মূল ও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত কণ্টকসকল আমাদের

নগ্ন পদে বিদ্ধ হইয়া কষ্ট দায়ক হইলেও মুক্ত প্রান্তরের বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রাণে অপূর্ব্ব সজীবতা প্রদান করিতেছিল। প্রায় এক পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া আমরা মনুষ্যাবাসের চিহ্ন স্বরূপ সদ্য কর্ষিত ভূমি ও আম্রপনসাদী ফলবান্ বৃক্ষসমূহ দেখিতে পাইলাম। তাহার অল্প দূরেই একটী বৃহৎ বাঁশ ঝাড় অতিক্রম করিয়া একটি তৃণাচ্ছাদিত বাটিতে উপস্থিত হইলাম। বাটির প্রাঙ্গণে একটী কূপ কয়েকটি রক্তজবা ও করবী প্রভৃতি বৃক্ষ এবং একটি বৃহৎ বংশ দণ্ডে লোহিত বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান। ইহাই বনুয়া কালীর মন্দির। অধিকারী বা সেবাইত সেখানে সপরিবারে বাস করেন। অধিকারীপত্নী তৎকালে উদূখলে চাউল কুটিতে নিযুক্ত ছিল। আমাদের দেখিয়া আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় আমরা দেবী দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলাম। সে তখন কার্য্য বন্ধ করিয়া ব্যস্ততা সহকারে এক গাছি সম্মার্জ্জনী হস্তে পার্শ্বস্থ কুটিরে প্রবেশ করিল, আমরাও তদনুবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম সেই কুটিরেই মৃণ্ময় কালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। এক পার্শ্বে একটি রুধিররঞ্জিত যূপ কাষ্ঠ ও খড়্গ, অন্য পার্শ্বে একটি কাষ্ঠময় দীপাধার। অন্য কোন পূজার সরঞ্জাম সে গৃহে নাই। পূজা অর্চ্চনা দূরে থাকুক বোধ হয় একপক্ষ কাল সে গৃহে মনুষ্যের পদার্পণ ঘটে নাই। সম্মার্জ্জনী দ্বারা আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করিতে করিতে অধিকারী পত্নী কৈফিয়ৎ দিল যে তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সুতরাং প্রত্যহ পূজা অর্চ্চনা করিতে অসমর্থ। গোটা কতক পুষ্প ও চন্দন দিয়া নিত্য পূজা করিতে আপত্তি কি জিজ্ঞাসা করায় সে দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলিল "রক্ত না হলে কি কালীর পূজা হয়, যে দিন কেহ পাঁঠা বা পারাবত দিয়া মানসিক পূজা দেয় সেইদিনই পূজা হয়। তাহা ছাড়া অধিকারীকে চাষ বাস করিতে হয় অতএব সময় কই?"

সে স্থান হইতে দক্ষিণে পূর্ব্ব বর্ণিত পথে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মপাল ও পাগলা কালী দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। এ স্থানটি একেবারে রাজ পথের ধারে। চতুর্দ্দিক খোলা, উপরে একটু টিনের আচ্ছাদন। এইখানে একটি প্রকাণ্ড পাষাণ বেদিকার উপর একটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি তাহা তৈল ও সিন্দূরে এরূপ অনুলিপ্ত যে মূর্ত্তিটি যে কিরূপ তাহা বুঝিবার যো নাই। তাহার নিকটেই আর একটি ভগ্ন স্ত্রী দেবতার মূর্ত্তি, ইহা যে কোথায় ছিল, কি রূপেই বা এখানে এরূপ ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে তাহা কেহ বলিতে পারিল না। মূর্ত্তি গুলির উপর কিছু পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল ছিটান। প্রণামী পয়সা কুড়াইবার জন্য একটি লোক সেখানে বসিয়া আছে। প্রত্যাগমনকালে এবার রাজপথের উপর দিয়া আসা গেল, পথে পার্ব্বতী দেবী ও মহাকালের দুটি ক্ষুদ্র নূতন ও সুগঠিত মন্দির, ভিতরে মূর্ত্তিগুলি অভগ্ন এবং নিত্য পূজাদি হয়। পার্ব্বতীদেবীর নিকট অসংখ্য বলিদান পড়িয়াছে। নিকটেই বহু সংখ্যক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী আখড়া করিয়াছে, তাহারা খোল ও করতাল সহযোগে কীর্ত্তন

গায়িতেছে, শত শত নাগা সন্ন্যাসী ভস্ম-ভূষিত নগ্নদেহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূনি জ্বালাইয়া গঞ্জিকাধূমপানে নিরত। পথের নিম্নে একটি প্রশস্ত তৃণাচ্ছন্ন স্থানে কতক-গুলি মাতাল একত্র হইয়া অস্বাভাবিক বিকট চীৎকারে উল্লাস ব্যক্ত করিতেছে, গণিকারও শুভাগমন হইয়াছে। এইগুলি পুণ্যস্থানের কণ্টক স্বরূপ।

তাম্বুতে আসিয়া দেখা গেল তখনও কিছু বেলা আছে। দুই খানি শকটে আরোহণ করিয়া আমরা মেলা দেখিতে অগ্রসর হইলাম। মেলা স্থল মন্দির হইতে প্রায় দুই রশি দূরে পশ্চিম দিকে ধবলা নদীর অপর পারে। মন্দিরের নিকটে পথের দুই ধারে ছোট ছোট দোকান। তাহাতে কলার পেটো ছোট করিয়া কাটিয়া প্রত্যেক খানিতে একটি কলা কিছু আতপ তণ্ডুল দুই চারিটি পুষ্প, বিল্বপত্র আর এক খানি করিয়া বাতাসা সজ্জিত। ইহার মূল্য চারি পয়সা। আর কতকগুলি ছোট কাচের শিশিতে একটু করিয়া ঘোলা জল, শোনা গেল উহা নাকি গঙ্গাজল, মূল্য প্রত্যেকটির দুই আনা। দোকানে ক্রেতার হুড়াহুড়ি এবং পয়সার ছড়াছড়ি। কারণ অধিকাংশ লোকেই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ঐ সোপকরণ নৈবেদ্য একখানি এবং গঙ্গাজল এক শিশি সংগ্রহ করিয়া দেবাদি-দেবের পূজা করিতে যাইতেছে। পশ্চাতের পুষ্করিণী দোকানদারকে গঙ্গাজল দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিল সন্দেহ নাই। নিকটেই তেলে ভাজা, ঘিয়ে ভাজা ধূলিধূসরিত, মক্ষিকা কর্ত্তৃক অর্দ্ধ ভক্ষিত মিষ্টান্নের দোকান। এতদ্দেশীয় বালক বালিকাগণ সেই সমস্ত মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া পরমানন্দে উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিতেছে। ইহার ফলে মেলার পর প্রায়ই প্রতিগ্রামে কলেরার প্রকোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দোকান গুলি অতিক্রম করিলে সারবন্দী ভিক্ষুকের দল, অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠি প্রভৃতি, সম্মুখে ছিন্ন বস্ত্র পাতিয়া তার স্বরে চীৎকার করিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে দেখা যায়। তাহার মধ্যে দুই একটি দেবমূর্ত্তিও পূর্ব্বোক্তরূপে কাপড় বিছাইয়া বসিয়া আছেন।

তদনন্তর নদীর নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত তট ভূমিতে অসংখ্য গো ও মহিষ শকট। ভদ্র গৃহস্থ যাত্রীগণ প্রধানতঃ এইখানে আড্ডা করিয়াছেন কারণ এখানে নির্ম্মল জল পাওয়া যায়, আর এই যায়গাটি মেলা ও মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করাও সুবিধা, আবার মন্দির সন্নিকটে সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ভিক্ষুক প্রভৃতির যে উৎপাত কোলাহল তাহা হইতেও অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কোন কোন লোক শকটের নিকট ২খানা বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর শতরঞ্চ চাদর প্রভৃতি টাঙ্গাইয়া ছোট ছোট তাম্বুর আকারে আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। গো মহিষ গুলি শকটের যূপদণ্ডে আবদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে বিচালি চর্ব্বণে নিযুক্ত।

নদীর অপর পারে প্রায় এক মাইল পথ যুড়িয়া বিপণিশ্রেণী। এক এক প্রকার দোকান একটি পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির নাম সওদাগর পটি, (মনোহারীর

দোকান) কোনটির নাম জুতা পটি, এইরূপে কাপড় পটি, বাসন পটি, ঘোড়াহাটি, গরু হাটি, কুকুর হাটি ইত্যাদি। এই মেলায় প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানি ও বিক্রয় হইয়া থাকে। গো মহিষাদির আড্ডা নদীর ধারে। পূর্ব্বে এই মেলায় হস্তি পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় হইত।

তাহার পর রাত্রিকালে পূজা করিতে যাওয়া হইল। এক্ষণে জনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে গাড়ি পালকি দূরে থাক মানুষের যাতায়াতও কষ্টসাধ্য। আমরা আত্মীয় পুরুষগণের বেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বহু আয়াসে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটি দ্বার। আমরা পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। দ্বার হইতে প্রায় ৮।১০ হাত নিম্নে ভূগর্ভে দেব মূর্ত্তি, এখানে এইরূপ নিয়মেই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পাথরের অপ্রশস্ত সিঁড়ি গুলি সমস্ত দিন সিক্ত বস্ত্রে সমাগত ব্যক্তিবর্গের বস্ত্রচ্যুত জলে এবং পদচ্যুত কর্দ্দমে ভয়ানক পিচ্ছিল হইয়াছে। প্রতিপদে পদস্খলনের আশঙ্কা, অতি সাবধানে নিম্নে অবতরণ করিয়া দেখাগেল মন্দিরটি বেশ বৃহৎমেঝিয়া, শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত। ধূপ ধুনার গন্ধে আমোদিত ভিত্তি গাত্রে ছোট ছোট কুলঙ্গি, তাহাতে দেবমূর্ত্তি—তাহার পাদ দেশে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। মন্দিরের মধ্য স্থলে একটি কুণ্ড তাহার মধ্যে জল্লেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরের অর্দ্ধাংশ পুষ্প বিল্বপত্র কদলী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। উপরের গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অগণ্য তারকা রাজি সমন্বিত নীলাকাশ দেবাদিদেবের মন্দিরের চন্দ্রাতপ স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত ষণ্ড বা নন্দিকেশ্বর! তাহার পার্শ্বে ভিত্তি গাত্রে মন্দিরের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। এমন বিশাল মন্দির সমস্তই প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উপরের গম্বুজ চূড়া সহ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয়। চূড়াটি প্রায় আধমাইল দূরে পতিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি সেইখানে পড়িয়া আছে। চূড়ার নামানুসারে ঐ স্থানটির নাম হইয়াছে "চূড়া ভাণ্ডারণী।"

শোনা যায় প্রথমত কামরূপের বর্ম্মণরাজ বংশীয় জলপেশ্বর নামে রাজা স্বীয় নামানু-সারে এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। মহম্মদ শার কামরূপ আক্রমণের সময় তাঁহার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক এই মন্দির বিধ্বস্ত হয়। তাহার পর অনেক দিন এ রাজ্য নেপাল রাজের শাসনাধীন ছিল। নেপালীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী—এই কারণে এই শিব-মন্দির অযত্নে মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত ও ভীষণ অরণ্যে সমাবৃত হইয়া যায়। পরে কোচ বিহারের রাজ্যের বর্ত্তমান রাজ-বংশের দ্বিতীয় পুরুষ মহারাজ বিশ্ব সিংহ এ প্রদেশকে স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ প্রাণনারায়ণ এই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া ঘটনা ক্রমে এই মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তিনি বিপুল অর্থ ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার পুত্র মহারাজ মোদনারায়ণ

নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া পিতার ইচ্ছানুরূপ দেব সম্পত্তি দিয়া পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাহার পর দুই তিন বার রাজবিপ্লব সংঘটিত হয়। অবশেষে এ সম্পত্তি কিছুদিন হইল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট উহার বিলি ব্যবস্থা করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা বর্ষে বর্ষে পূজারীগণকে দিয়া আসিতেছেন। তাহাতেই পূজারীদিগের বৃত্তি ও পূজার্চ্চনা মন্দিরের অবশ্যক মত সংস্কারাদি একরূপ নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহাকে পূর্ব্বাবয়ব দেওয়া এক্ষণে দুরাশা মাত্র, কিন্তু মন্দিরের ছাদটি পুনর্নির্ম্মাণ ও আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক মেরামত কার্য্য সম্পন্ন হইলে এখনো কিছুদিন দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা পূর্ব্ব গৌরবের কিছু নিদর্শন দিতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যের জন্যও অন্যূন ১৫ হাজার টাকা আবশ্যক। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের রাজবংশধর কুমার জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় সাহেব এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীমতী অনুজা ঘোষ।

আর এই

প্যারিসের পুলিস

প্যারিসের পুলিস বিভাগ বিদেশীর নিকট বড়ই রহস্যময়। সেখানে ভীষণ পাপের মূর্ত্তি—দুর্বৃত্তের সংখ্যা যেমন অধিক পুলিসের কার্য্যদক্ষতাও তেমনি প্রশংসনীয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের বৃহৎ প্রদর্শনীর সময় হইতে পুলিসবিভাগে একটি নূতন দল সংযুক্ত হইয়াছে। সন্তরণপটু পুলিস কর্ম্মচারী লইয়া দলটি সংগঠিত। তাহারা প্যারিসের নিকট সীন নদীর উপকূলে সতর্কভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বেচ্ছায় দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ বা অন্য কোন কারণে জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। মেলাদর্শনে দেশ বিদেশ হইতে আগত লোক সমাগমে অনেকের জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা; দুর্ঘটনা ঘটিবার, পাপকার্য্য অধিক পরিমাণে সাধিত হইবারও সময় ইহাই। ফরাসী দুর্বৃত্তেরা হতভাগ্য ব্যক্তিগণকে খুন করিয়া বা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অধিকাংশস্থলেই তাহাদিগকে মৃত বা জীবন্ত অবস্থায় নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সেই জন্যই প্রদর্শনীর সময় পুলিস বিভাগের এই নূতন দল গঠিত হইয়াছিল।

নগরের প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী মোঁসো লেপাইন একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন; তিনি অনেক নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে দুর্বৃত্তদিগের বড় সুবিধা হইত না। তিনিই সাইকেলারোহী পুলিস-দলের স্রষ্টা, এবং জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই নূতন

দল গঠিত করেন। ইহারা নদীকূলস্থিল বাণিজ্যদ্রব্যসমূহও চোরের উপদ্রব হইতে রক্ষা করে। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের "Thames Police" বিভাগের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

এই দল গঠিত হইবার পর হইতেই ইহার কর্ম্মচারীরা তাহাদের কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিতেছে। কত হতভাগ্য লোক প্রাণধারণে বীতরাগ হইয়া চিরশান্তিলাভের আশায় স্রোতস্বতীসলিলে ঝাঁপ দিয়াছে, দুর্ঘটনাবশতঃ কত লোক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, দুর্বৃত্তেরা কত আহত লোককে জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, এই দলের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য হাসিমুখে নিজেদের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়াছেন। এই সকল সাহসী লোকের কার্য্য-বিবরণী বিশেষ তালিকাভুক্ত হইয়া নদীতীরস্থ আফিসঘরের প্রকাশ্য দেওয়ালে ঝুলান আছে। এই তালিকাপাঠে জানিতে পারা যায় যে, কত পুলিশ কর্ম্মচারী জলমগ্ন ব্যক্তিদের বাঁচাইতে গিয়া নিজেদের প্রাণ হারাইয়াছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি বেলী নামক একজন কর্ম্মচারী এই কার্য্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার মৃত্যুকাহিনী বড়ই করুণ। এই শোকসূচক ঘটনার পর হইতেই মোঁসো লেপাইন একটি নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেন। জলমগ্ন ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি একটি কুকুরের দল গঠিত করিয়া এই পুলিসবিভাগের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেন। প্রথম দুটি "নিউফাউল্যাণ্ড" কুকুর লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। কুকুর দুটির দাম চল্লিশ পাউণ্ড। ইহাদের নাম রাখা হইয়াছিল—টার্ক ও সিজার। তাহাদের গলায় পুলিসের পোষাক-স্বরূপ নিকেলের গলাবন্ধন পরাইয়া দেওয়া হইল। এবং বিশেষ যত্নের সহিত তাহারা পালিত হইতে লাগিল।

যে রক্ষকের উপর এই পুলিস ও কুকুরের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার নাম মোঁসো গিলেমিন। নদীতীরে তাঁহার একটি আফিসঘর আছে। বাড়ীর নিম্নতলায় ছোট ছোট ঘর আছে। সেখানে জলপুলিসের আড্ডা। ঘরের আসবাব পত্র সমূহ অতি সামান্য। ঘরের ভিতর এমন কোন আরাম স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা নাই, যাহার দ্বারা প্রলোভিত হইয়া কর্ম্মচারীরা জলমগ্ন ব্যক্তির অনুসন্ধানে তীরভ্রমণ ত্যাগ করিয়া সেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে আসিবে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই পুলিস দলে কুড়িজন লোক ছিল। প্রথম দুটি কুকুর লইয়া পরীক্ষা করাতে এত সন্তোষজনক ফল লাভ হইয়াছিল যে, ক্রমে তাহারা সংখ্যায় আটটি হইল। ইহাদের সংখ্যা পুলিস কর্ম্মচারীদের সংখ্যার সহিত এক হয়, কর্ত্তৃপক্ষগণের তাহাই ইচ্ছা। সেইজন্য প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারীকে নিজের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র একটি কুকুর দেওয়া হইয়াছে। কুকুরগুলি সবই শাবক; কোনটিরও বয়স এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের শিক্ষা লাভের এই প্রাথমিক অবস্থা; কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাদের বুদ্ধি অদ্ভুত বিকাশ লাভ করিয়াছে। জ্ঞানার্জ্জনে তাহাদের বলবতী ইচ্ছা ও তীক্ষ্ণ মেধা এবং অভীষ্ট কার্য্য-

সম্পাদনে তৎপরতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নচেৎ এই প্রবন্ধের চিত্রিত ছবিগুলি তোলা অসম্ভব হইত; কারণ কুক্কুরের ফ'টো-গ্রাফ তুলিতে আলোকচিত্রকরগণকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়।

কুকুরদিগকে নিয়মিতরূপে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ম্মচারীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ইহাদের শিক্ষা দেয়! ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা দেওয়া হয়।

সিজার ও টার্ক কুকুর দুটি কিনিবার কিছুদিন পরেই একটি কৃত্রিম মনুষ্যমূর্ত্তি গঠন করিবার আদেশ দেওয়া হইল। ইহার দ্বারা জলমগ্ন ব্যক্তিকে কি প্রকারে উদ্ধার করিতে হইবে তাহাই কুকুরদের শিখান হইবে। এই গঠিত মূর্ত্তিই মোঁসো ম্যানিকুইন! তাহার মূর্ত্তি ও খর্ব্বাকৃতি সত্ত্বেও তাহাকে দেখিতে জীবন্ত মনুষ্যমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। এক জন কর্ম্মচারী তাহাকে আফিসঘর হইতে নদীতীরে ধরিয়া লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়া দিল। দুটি কুকুরই ইহাকে সত্য মনুষ্য বলিয়া মনে করিল।

দুটি কুকুরই তাহাদের কৃতিত্ব দেখাই-বার জন্য উৎসুক হইল। তাহাদের উপর যে কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারা যে সে কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহারা তাহাই দেখাইতে চায়। মোঁসো লেপা-ইনের আদেশমত সিজার জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে জলে ঝাঁপ দিল। মোঁসো ম্যানিকুইন তখন স্রোতে ধীরভাবে গা ভাসাইয়া দিল। সিজার এই অদ্ভুত মূর্ত্তিটি নিরাপদে তীরের উপর তুলিল। টার্ককে যে তাহার কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে দেওয়া হইল না, সেইজন্য সে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং ভবিষ্যতে তাহাকে এই কার্য্য করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে না, এই ভয়ে সেও সিজারের সহিত জলমগ্ন ব্যক্তির জামাকাপড় কামড়াইতে লাগিল। এই কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া দর্শকগণ ভীত হইলেন পাছে তাহারা মোঁসোকে কামড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

এই ব্যাপার দেখিয়া মোসো লেপাইন বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কুকুরদের মনের ভিতরও যে লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি এরূপ আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করি-য়াছে, এবং রীতিমত সুশিক্ষার সাহায্যে এই বিকাশ যে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে এ বিষয়ে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপ প্রাণরক্ষাকারী কুকুরের দল গঠন করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

একদিন সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই কুকুরের দলের অভিনয়-পাল্লা দেওয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে কুকুরটি তাহার কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, তাহার নাম সুলতান। ইহা একটি ধীরস্বভাব বুদ্ধিমান নিউফাউল্যাণ্ড কুকুর। ইহার শিক্ষার ভার "ডুবয়" নামক একজন নিপুণ জলপুলিসের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সঙ্গে সুলতান ও তদুদ্ধৃত মোসো ম্যানিকুইনের ছবি দেওয়া হইল।



সুলতান

কি রকম করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিতে হয়, সুলতান তাহা অতীব সরলভাবে দেখাইয়া দিল। মোসো ম্যানি- কুইনকে জলে নিক্ষেপ করিবার পরই সুল-তান নদীতে ঝাঁপ দিল এবং দ্রুত সাঁতার দিয়া জলমগ্ন মূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইল। পরে দৃঢ় অথচ ধীরভাবে ইহার জামা ধরিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

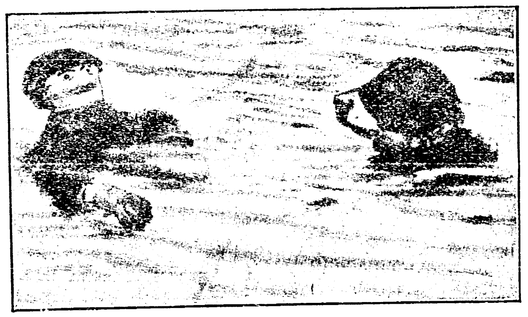

সুলতান জলমগ্ন মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে

তীরে পৌছিলে পুলিসকর্ম্মচারীরা তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিল।

কুকুরের শিক্ষার জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম রচিত হইয়াছে। রক্ষকেরা কুক্কুরদের বশীভূত করিবার সময় যে কথাবার্ত্তা কহে, তাহাও সংখ্যাবদ্ধ। জন্তুদের আদেশ করিবার সময় তাহারা কতকগুলি বাছা বাছা কথা ভিন্ন অপর কিছু বলিতে পায় না। কুকুরদিগকে প্রহার করা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ। তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার অত্যাবশ্যক। আদেশ পালনের সময় তাহাদিগকে ভয় দেখান বা কোনরকম জোর জবরদস্তি করিতে নাই। তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাদের বাধ্য করিতে হয়। বশ করিবার সময় কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রলোভন দেখান একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রত্যেক কুকুর কিনিতে কুড়ি পাউণ্ড খরচা হইয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। শীতের দিনে, নদীর জল একটু বেশী ঠাণ্ডা হইলে, সেদিন তাহাদের কার্য্যাভ্যাস বন্ধ থাকে। এবং তাহাদিগকে বিনা প্রয়োজনে নদী-

তীরে পাঠান হয় না। কোন কুকুর জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলে, তখনই তাহাকে আফিসঘরে লইয়া যাওয়া হয়। এবং তাহার গা মুছাইয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া দেওয়া হয়।

কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন অপর লোককে আক্রমণ করিতে কুকুরদের উৎসাহ না দেয়। কারণ এই কুকুরেরা কেবল যে জলমগ্নব্যক্তিকে উদ্ধার করে তাহা নহে; ইহারা রাত্রেও অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের প্রভুদের সহিত নদীতীরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পুলিস কর্ম্মচারীদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া নদীতীরে জমা রাখা হয়। মালের দাম হয়ত হাজার হাজার পাউণ্ড। ইহার লোভে অনেক চোর রাত্রিকালে চুরি করিতে আসে। জলপুলিসদিগকে দিনরাত্রি তাহা চৌকি দিতে হয়। সেই সময় চোর ও পুলিসদের মধ্যে সময় সময় মারামারিও হইয়া যায়। পুলিসের লোকেরা সশস্ত্র থাকিলেও অনেকে নিহত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীরাও নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

কুকুরদের সাহায্য এই উপদ্রব নিবারণের উপায়স্বরূপ; কারণ তাহারা দুর্বৃত্তদের সন্ধান করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক প্রভুদের সংবাদ দান করিতে পারে। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহারা চোরদের আক্রমণ করে না। আদেশ পাইলেই তবে তাহারা নিজেদের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে।

ইহাদের পালনের খরচও নেহাৎ কম নয়। হৃষ্ট-পুষ্ট নিউফাউল্যাণ্ড কুকুরের ক্ষুধা বড় বেশী। তাহাদের খাদ্যের জন্য দিনে সাত পেন্স করিয়া খরচ হয়। ঋতু অনুসারে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা বা গরম খাদ্য দেওয়া হয়। কার্য্যের অবসরে তাহারা আফিসঘরের পার্শ্ব সংলগ্ন একটি বড় বাড়ীতে বিশ্রাম করে। ইহাই তাহাদের বাসস্থান। প্রত্যেকের শয়নঘর পৃথক। তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোম্পানীর ভারত শাসন

তিনটি ধাপ।

ক্লাইভের আমলে প্রতিনিধি শাসনতন্ত্র (Protectorate)। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পুনরাগমন করিলেন; তখন মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের প্রাধান্য বঙ্গদেশের নীচে ছিল। ক্লাইভ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গদেশের দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত

হইলেন। নবাব নিজামৎ আপন হস্তে রাখিলেন, শাসনকার্য্য ও বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারীরা তখনও রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল, কিন্তু আদায় করিয়া ইংরাজের হস্তে উহা ন্যস্ত করিত। নবাবের দরবার ও শাসন-কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ইংরাজ নবাবকে ৪২০,০০০ পৌণ্ড দিত। এই প্রতিনিধিত্বের ফলে কোম্পানী একটা রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভের ইচ্ছা ছিল,—কোম্পানী বণিক না হইয়া রাজ্যের অধিনেতা হইয়া উঠে। তাই তিনি কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন এবং তাহাদিগকে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। নূতন দেশ জয় করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্লাইভ প্রদেশ ও রাজ্যাদি কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করাইয়া অথবা কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করাইয়া উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অযোধ্যা ও আলাহাবাদ এইরূপে হস্তগত হয়।

* * *

প্রথম "গভর্ণর জেনেরাল" Warren Hastings-এর আমলে, ইংরাজ আধিপত্যের দ্বিতীয় ধাপ। তিনি প্রতিনিধি শাসনতন্ত্রের স্থলে সাক্ষাৎ-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মোটামুটিভাবে তাঁহার শাসননীতির মূলসূত্রগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ফোর্ট-উইলিয়ামে অর্থাৎ বঙ্গে, বোম্বায়ে ও মাদ্রাজে তিন গভর্ণর। বঙ্গের গভর্ণর, গভর্ণর-জেনারাল এই নামে, দৌত্যকার্য্যে ও সামরিক কার্য্যে, উক্ত তিন বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার মন্ত্রিসভায় চারিজন সভাসদ্ ছিল। মতভেদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারই মতের প্রাধান্য থাকিত। দুর্ভাগ্যক্রমে পার্লেমেণ্টের দ্বারা এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। ইহা হইতেই ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হইত। অধিক সংখ্যার মত তাঁহার মতের বিরুদ্ধে হইলে, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত অবৈধ উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিতেন।

বাঙ্গলার নবাবের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বিনষ্ট হইল। তাঁহার অবসর-বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হইল। হেষ্টিংস্ নূতন কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালীর সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গদেশ বিভিন্ন জিলায় বিভক্ত হইল। ইংরাজ-কলেক্টারেরা কর আদায় করিতে লাগিলেন। দেশীয় লোকেরা বিচার ও পুলিশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

তার পর Hastings-এর রাষ্ট্র-নীতি। সম্রাট্ ও অধিকাংশ অধিপতিদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। অবৈধ অধিকারের দাবী-গুলা, সম্রাট্ ও রাজাদিগের আদেশ-পত্রের বলে, বৈধতার একটা বাহ্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু আর কিয়ৎবৎসরের মধ্যেই, ঐ সকল আদেশপত্রেরও মানমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইল। এখন, ভারতবর্ষের একজন প্রভু আবশ্যক—সেই প্রভু মারাট্টা-সংঘ হইবে, মহিশূরের সুলতান হইবে, না কোম্পানী হইবে? Warren Hastings বুঝিলেন,—কোম্পানী হয় সর্ব্বময় প্রভু হইবে, নয় কিছুই হইবে না। হেষ্টিংস্ ইচ্ছা করিলেন, কোম্পানীই সর্ব্বেসর্ব্বা হউক;—তাই মারাঠা

দিগের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ (১৭৭৮—৮১) ইংলণ্ডের ভাবী বিজয় ঘোষণা করিল।

* *
* *

কর্ণওয়ালিসের আমলে ইংরাজ আধিপত্যের তৃতীয় ধাপ। (১৭৮৬—৯৩) Hastings প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থলে সাক্ষাৎশাসন-তন্ত্র স্থাপন করিলেন। হেস্‌টিংস যে সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন, কর্ণওয়ালিস তাহাই বিধিবদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে বাঙ্গালার গভর্ণরের মত মন্ত্রিসভার অন্য সভাসদ্‌দিগের মতের উপর আধিপত্য করিবে, এইরূপ প্রচারিত হইল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙ্গালার গভর্ণরের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়ীকৃত হইল। বিচারের ভার দেশীয় লোকদিগের উপর ন্যস্ত হইল; প্রথমে কতকগুলি বিশেষ-মেজিষ্ট্রেট, আরও কিছু-কাল পরে, কলেক্‌টর নিযুক্ত হইল। ইজারদারেরা, জমিদারেরা, প্রকৃত ভূস্বামী হইল। যে সকল চাষী সরকারের খাস প্রজা ছিল, তাহারা জমিদারের প্রজা হইল। রাজস্ব ও করস্বরূপ জমিদারেরা সরকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সদর-খাজনা দিতে লাগিল। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার আয় বৃদ্ধি হইবে না, সরকার এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। এই চুক্তি বাঙ্গলায় "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে খ্যাত।

*
* *

এই দ্বিতীয় যুগে, ভারতের উপর ইংলণ্ডের প্রভাব প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়—কিন্তু তাহা ভারতীয় ধরণে। ভারতে সফলতা লাভ করিবার জন্য কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ ভারতীয় রীতিনীতি অবলম্বন করিলেন;—সেই ষড়যন্ত্রের রুচি, সেই ধন লুব্ধতা তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইল। তথাপি এই বণিকেরা স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দেশের অধিপতি হইয়া পড়িলেন, রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করা তাঁহাদের আবশ্যক হইয়া পড়িল। তাঁহারা য়ুরোপীয় ধরণে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সাধারণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে শুধু কোম্পানীই একটা প্রণালী-বদ্ধ ও সব্যবস্থিত রাজশক্তি হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তাঁহাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী হইল!

৩

তৃতীয় যুগ

তৃতীয় যুগে ইংলণ্ড সমস্ত ভারত জয় করিলেন এবং ভারতের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা চাপাইয়া দিলেন।

* *

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে, য়ুরোপের ভিতরকার ভাবটা রূপান্তরিত হইয়াছিল। লাম্পট্যের স্থলে, রাজদরবারের শুষ্কতার স্থলে, অভিজাতবর্গের সন্দেহবাদের স্থলে, প্রথমে নিসর্গপ্রীতি ও রুসোর প্রচারিত ভাবুকতা, পরে বিপ্লবের প্রতি জলন্ত অনুরাগ, পরিশেষে ঔপন্যাসিকতা, ও মধ্যযুগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত বিশ্বাসাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সময়েই মহাপরাক্রান্ত ফ্রেডেরিকের যুদ্ধবিগ্রহ, নেপোলিয়নের রাষ্ট্র-

বিপ্লব, সমস্ত খণ্ড-রাজ্যদিগকে দিগ্‌বিজয়ের নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিল।

এই য়ুরোপীয় মর্ম্মভাবের অনুরূপ ইংলণ্ডের মর্ম্মভাব বিকাশ লাভ করিল। কিন্তু এই সকল য়ুরোপীয় ভাব, য়ুরোপীয় মত ও বিশ্বাসগুলি ইংলণ্ডে একটু ইংরাজি ধরণ প্রাপ্ত হইল।

Wesleyan সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচার, ফরাসী বিপ্লবের দারুণ কাণ্ডের প্রতি একটা ভয়মিশ্র ঘৃণার ভাব, এবং ঔপন্যাসিক রুচি—এই সমস্ত কারণে ধর্ম্মশূন্যতার স্থানে গোঁড়ামী আসিল এবং নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের স্থান, উচ্চকথার "মুখস্থ বুলী" (cant) আসিয়া অধিকার করিল। এই পরিবর্ত্তনটা বণিক ও রাষ্ট্রনৈতিক লোকদিগের উপর একটা শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভাগ্যান্বেষীর পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড, সৎচরিত্র সারবান কর্ম্মচারীদিগকে ভারতে পাঠাইতে লাগিলেন—যাহারা রাজ্য চালাইতে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে বশীভূত করিতে সমর্থ।

পক্ষান্তরে, চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও নেপোলিয়ন, এই সমস্ত—সামুদ্রিক আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীময় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডকে প্রবৃত্ত করিল। আমেরিকার স্বাধীনতা হইতে ইংলণ্ডের এই শিক্ষা হইল যে, উপনিবেশগুলি সুশাসনের দাবী করে। নিজামের ও অন্যান্য মুসলমান অধিপতিদিগের দরবারে ফরাসী প্রতিনিধিগণের ষড়যন্ত্র এবং যে নেপোলিয়ন সেকান্দারের মত অভিযান আরম্ভ করিবেন বলিয়া কল্পনা করিতেন, সেই নেপোলিয়ানের কল্পনা ইংলণ্ডকে বরাবর সজাগ রাখিয়াছিল। তখন হইতেই, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তিকে কি করিয়া দূরে অপসারিত করিবেন—ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-নীতির তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই ইংলণ্ড ভূমধ্য সাগরে, জিব্রল্টার ও মাল্টা স্থাপন করিলেন, এবং ইজিপ্টে, এসিয়া-মাইনরে, ইস্তাম্বুলে ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহা হইতেই প্রাচ্য সমস্যার উৎপত্তি; প্রশান্ত সমুদ্রে সেণ্টহেলেনা ও অন্তরীপ বিজয়।

ভারতযাত্রার যে দুই পথ সেই দুইটি পথের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ড সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই বিজয় কার্য্যের ইতিহাসে দুইটি নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়:—লর্ড ওয়েলেস্‌লি (১৭৯৭—১৮০৫) এবং লর্ড ড্যালহৌসি (১৮৪৮—১৮৫৬)।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি দেখিলেন, ভারতে তিন রাজশক্তি বিদ্যমান; একটি নামমাত্রসার,—মোগল সম্রাট; দুইটি প্রকৃত রাজশক্তি;—মারাঠা-সংঘ ও মহিশূরের মুসলমান রাজ্য। এই রাজ্য বিজিত হইল: তিপু সুলতান, কামান-গোলায়-ভগ্ন সেরিঙ্গাম দুর্গের রন্ধ্রমুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মারাঠা সংঘও পরাভূত হইল। মোগল-সম্রাট ও পেশোয়া কর্ত্তৃত্বহীন রাজ্যহীন রাজা হইয়া রহিলেন; তাঁহাদের শরীরের উপর, তাঁহাদের রাজধানীর উপর ইংরাজ সৈনিকের পাহারা বসিল। (১৭৯৮—১৮০৪)

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর উত্তরবর্ত্তীরা যে যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, ওয়েলেস্‌লীর কৃতকার্য্য দৃঢ়ীকৃত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য

হইল। দুইটি প্রদেশ ইংরাজের অধিকার-ভুক্ত হইল:—আসাম (১৮২৬) ও সিন্ধুদেশ (১৮৪৩)। কিন্তু লর্ড ড্যালহৌসি শিখ সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া, এবং পাঞ্জাব (১৮৪৯) দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ (১৮৫২), নাগপুর (১৮৫৩) ও অযোধ্যা (১৮৫৬) এই সকল প্রদেশকে অধিকারভুক্ত করিয়া ভারতবিজয় সম্পূর্ণ করিলেন। যে সকল রাজার রাজ্য স্বাধীন রহিল তাহারাও ইংরাজ-রাজ্যের দ্বারা বেষ্টিত হইল। ইহারাও কার্য্যতঃ কোম্পানীর অধীন হইয়া পড়িল।

*
* *

এই নূতন সাম্রাজ্যের জন্য শাসনকার্য্যের কতকগুলি নূতন মূলসূত্র আবশ্যক হইল।

ইংলণ্ড, স্বকীয় উপনিবেশ-রাজ্যের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে এবং যে বণিক-কোম্পানী ইংলণ্ডের জন্য একটা সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছিল সেই কোম্পানীর তত্ত্বাবধান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

Pitt, ১৭৮৪ হইতে ডিরেক্টারদিগের সভা হইতে পরিচালন কার্য্য উঠাইয়া লইয়া একটা তদারক-সভার উপর সেই ভার দিলেন। এই তদারক-সভা গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। ইহার অনেকগুলি সভাসদ, রাজমন্ত্রী ছিলেন। এই সভার পঞ্চসভাসদের মধ্যে শীঘ্রই কেবল সভাপতি অবশিষ্ট রহিলেন। ডিরেক্টরগণ যে সকল বিধিব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন, সভাপতি তাহার অনুমোদন করিয়া বৈধ করিয়া দিতেন। কোন বিষয় খুব জরুরী হইলে তিনি ভারতের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎভাবে পত্রব্যবহার করিতেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কাজ করিতে পারিত না।

পক্ষান্তরে, সমস্ত দেওয়ানী কর্ম্মচারী এমন কি গভর্ণর-জেনেরাল পর্য্যন্ত মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা ডিরেক্টদিগের ছিল। ইহা হইতেই যত ষড়যন্ত্র ও কলুষাচরণের উৎপত্তি। প্রত্যেক ডিরেক্টরের কতকগুলি কর্ম্মে লোক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ছিল। দেশীয় লোকের—এমন কি মুরব্বিহীন কোন ইংরাজেরও বড় কাজ পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৮১৩ ও ১৮৩৩ অব্দের দুই আইন অনুসারে কোম্পানীর বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু কোম্পানীর ভিতরের ভাবটা বণিক-সুলভ ভাবই রহিয়া গেল। আত্মীয়স্বজন ও অনুগত লোকদিগকে মোটা মোটা বেতন দিয়া কোম্পানী পূর্ব্বেকার লভ্যের অভাব পূরণ করিতে পারিল।

ইংলণ্ডে, কোম্পানী মন্ত্রিবর্গের উপদেশানুসারে কাজ করিতে লাগিলেন। ভারতে, মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের গভর্ণর, বাঙ্গলার গভর্ণরের অধীন হইল। বাঙ্গলার গভর্ণরের নাম হইল, "ভারতের গভর্ণর জেনেরাল" (১৮৩৩ এর আইন)। এখনও গভর্ণর জেনেরাল বঙ্গবিভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন কিন্তু শীঘ্রই কতকগুলি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের অধীনে এই বিভাগ কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত হইল। শাসন ক্ষমতার সহিত ব্যবস্থাপ্রণয়ণের ক্ষমতাও সংযুক্ত হইল। ১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রিসভার সাহায্য সহকারে তিন গভর্ণরই এই অধিকার ভোগ করিতেন। কিন্তু এই

অধিকারটি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। ১৮৩৩ অব্দের আইন অনুসারে বাঙ্গলার গভর্ণর ও তাঁহার মন্ত্রিসভা সমস্ত ভারতের উপর এই অধিকার পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলেন, পক্ষান্তরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগ স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব হারাইল। (কেবল ১৮৬১ অব্দে এই বিভাগ-গুলি ব্যবস্থা প্রণয়ণের কর্ত্তৃত্ব আংশিকরূপে প্রাপ্ত হয়।) গভর্ণর জেনেরালের শাসন নির্ব্বাহক সভা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভাও ছিল।

১৭৯৬ অব্দে সামরিক বন্দোবস্ত নূতন করিয়া গঠিত হয়। ইংলণ্ড রাজধানীর সংশ্লিষ্ট সৈন্য ছাড়া দুইটি সৈন্যমণ্ডলী ছিল। একটি য়ুরোপীয়, আর একটি দেশীয়। দেশীয় সৈন্যের উচ্চপদস্থ সেনানায়ক সমস্তই ইংরেজ। নিম্নশ্রেণীর সেনানায়ক দেশীয়। এই সৈন্য কোম্পানীর নিজস্ব সৈন্য; ডিরেক্টারেরা সকল পদেরই সেনানায়ক ও সৈন্যাধ্যক্ষকে মনোনীত করিতেন। সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮০৮ অব্দে, ১৫৪,৫০০ সৈন্য, তন্মধ্যে ২৪,৫০০ ইংরেজ এবং ১৩০,০০০ ভারতবর্ষীয়। ১৮৫৭ অব্দে, ২৩৩,০০০ ভারতবর্ষীয় এবং ৪৫,৩২২ ইংরেজ সৈন্য। (১)

*
* *

রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির হিসাবে কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালীর উক্ত প্রকার মূলসূত্র ছিল। ১৭৭৪ হইতে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত, এই সকল মূলসূত্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠে—তবে অন্তর্নিহিত মূল-ভাবটির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু দেশীয় প্রজাদের সহিত কোম্পানীর সম্বন্ধ ও ব্যবহার, এই প্রকার মূলসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হইত না।

কোম্পানীর রাষ্ট্রনীতি বুঝিতে হইলে, উহার বিভিন্ন প্রকারভেদের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী-বিপ্লব হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ড অতি-উদারপন্থী হইয়া উঠেন। ভারতের স্বার্থের জন্যই ভারত শাসন করিতেছেন, এইরূপ প্রকাশ করিতেন।

ইহার জন্যই তিনটি সাধারণ নিয়ম ছিল,—প্রথম নিয়ম যথা;—যাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং তৎপ্রযুক্ত ইংরাজ শাসনের সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করে। আর অভিযান নাই, যুদ্ধবিগ্রহ বিরল, যদি বা হয় স্বল্পস্থানে বদ্ধ, স্বল্পকালব্যাপী, এবং জনাধিকারের মূলসূত্রানুসারে পরিচালিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার সময় যে সকল দস্যুদল গঠিত হইয়াছিল, সে সকল দস্যুদল নির্ম্মূলিত হইল। প্রথমে পিণ্ডারী, তার পর ঠগের

(১) দুপ্লের দেশীয় সৈন্যের আদর্শে ক্লাইভ মান্দ্রাজে ভারতীয় সৈন্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পরে বাঙ্গালায় সৈন্য গঠন করেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালার মুসলমান কৃষক শ্রেণী হইতে ও উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হইতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেন। উপনায়কগুলি দেশীয় ছিল—যথা নায়ক (Sergent) জমাদার, সুবাদার, পুরাতন সুবাদার—(Subadar-Major)।

দল। প্রবল ও ন্যায়ানুগতশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। (২)

দ্বিতীয় নিয়ম—ভারতবাসীদের সমস্ত প্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী মেথডিষ্ট খৃষ্টসম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে, যতই বর্ব্বর প্রথা হউক না কেন, কোম্পানী সে সমস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন বিধবা রমণী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে সম্মত আছে কি না, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে প্রথমে তাহার তদন্ত করিতে হইত। যদি কোন বিধবা, স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই ঐ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিত। কিন্তু আর একটি তৃতীয় নিয়ম ছিল—সেটি, কেবল ইংরেজের দ্বারাই ভারত শাসন করা। প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের উপর ছিল—দেশীয় লোকেরা অধস্তন পদে নিযুক্ত হইত। শুধু শাসনকার্য্য হইতে দেশীয়দিগকে বহিষ্কৃত করা নহে, তা ছাড়া সার্ব্বজনিক ব্যাপার হইতেও তাহাদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া; তাহাদের শ্রেষ্ঠলোক একত্র হইয়া যাহাতে একটা দল গঠন করিতে না পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা; বুদ্ধিমান লোকেরা যদি ধনশালী হইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাদের সেই চেষ্টায় বাধা দেওয়া।

কোম্পানীর এক কর্ম্মচারী এইরূপ কথা অসংকোচে লিখিয়াছিল; যথা:—

"যাহার দ্বারা মনুষ্য প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়, সেই মনের উচ্চতা, সেই স্বাধীনতা, সেই চিন্তার গভীরতাকে দমন করা ভারতে সুবিধাজনক। এই সকল ভাব ও চিন্তা আমাদের শক্তির ও আমাদের স্বার্থের একান্ত বিরোধী···আমাদের সেনাপতির আবশ্যক নাই, রাজনৈতিকের আবশ্যক নাই, আমাদের আবশ্যক কেবল ভাল কৃষক। যদি আমরা সাহসী পুরুষ চাহি, উচ্চাভিলাষী পুরুষ চাহি, অক্লান্ত কর্ম্মী চাহি, মালাবার-প্রদেশে আমরা ঐ সব লোক এত অধিক পাইতে পারি যে তাহাদের দ্বারা সমস্ত ভারতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু এই সকল লোক আমাদের পথের প্রতিবন্ধক হইবে—শুধু প্রতিবন্ধক নহে, সম্ভবত তাহা হইতে আরও খারাপ ফল হইবে। তাহাদের দ্বারা কিছুই ভাল হইতে পারিবে না। তাহারা যে কাজ সম্পন্ন করিবে, সেই পরিমাণে জনসমাজের কোন উপকার হইবে না। দায়ে পড়িয়া যাহাদিগকে পোষণ করিতে হইতেছে, ঐ সকল লোক যেন আমরা নূতন করিয়া সৃষ্টি না করি।" (৩)

(২) পিণ্ডারীর দলদিগকে মধ্যযুগের য়ুরোপের বড় বড় দলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই দলের মধ্যে সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মের লোক ছিল। প্রধানতঃ জাঠ, আফ্‌গান, ও মারাঠা। মালোয়ার তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৫ বৎসর কাল ইহারা মধ্য-ভারতের প্রভু হইয়া পড়িয়াছিল। পিণ্ডারীদিগের প্রধান নেতা আমীর খাঁর একটি সুগঠিত সৈন্যমণ্ডলী ও কামান-সরঞ্জাম ছিল। ১৮১৭ অব্দে পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে Lord Hastings ১২০,০০০ সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন। Lord William Bentinck ঠগিদের দল বিনষ্ট করেন।

* * *

১৮১৫ হইতে, ইংলণ্ডে একটা নূতন মনোভাব আবির্ভূত হইল। "টোরীরা" স্বয়ং ক্যাথলিকদের "স্বাধীনতা লাভের" প্রস্তাবে ভোট্ দিল। "হুয়িগ্‌রা" হৌস্ অফ্ লর্ডসে" "নির্ব্বাচন সংস্কারের" প্রস্তাব উপস্থাপন করে এবং এই নূতন নির্ব্বাচন-প্রণালী অনুসারে যে প্রথম নির্ব্বাচিত সভার অধিবেশন হইল, তাহাতে যে সকল মতের প্রবণতা প্রকাশ পাইল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সভাসমূহে অপরিজ্ঞাত ছিল। তাছাড়া সেই যুগে দার্শনিকেরা সকল মানবজাতির মধ্যে সাম্য-নীতি বিস্তারের উপদেশ দিতেছিলেন। সেই সময়ে Wilberforce ইংরাজ উপনিবেশগুলির মধ্যে দাসত্ব উঠাইয়া দিবার পক্ষে সাহায্য করিয়া, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে অন্তর্জাতীয় সম্মতি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতেও এই ভাবটি প্রকটিত হইয়াছিল। যে আইনের পাণ্ডুলিপিতে কোম্পানীর অধিকারপত্র আবার নবীকৃত হয়, সেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপির এক অংশে এইরূপ পরিলিখিত হয় যে, ভারতের লোক বা অধিবাসী মহারাণীর যে কোন প্রজা, কি ধর্ম্ম ঘটিত, কি জাতি ঘটিত, কি বর্ণ ঘটিত কোন কারণে সরকারের অধীনে কোন সরকারি পদে নিযুক্ত হইতে অসমর্থ বিবেচিত হইবে না। মেকলে সাহেব এই প্রস্তাবটি আরও পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"এই পাণ্ডুলিপির কতিপয় অংশ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মঘটিত, জাতিঘটিত বা বর্ণঘটিত কারণে আমাদের কোন ভারতীয়প্রজা কোন সরকারী কাজকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবে না—এই প্রস্তাবটি যে, বিজ্ঞতা হইতে, উচ্চভাব হইতে, সাধু ইচ্ছা হইতে প্রসূত হইয়াছে তাহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি হয়। অহংনিষ্ঠ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিগণ আমাকে তত্ত্ববাগীশ বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু এই সকল উপহাস সত্ত্বেও আমি এই কথা বলিব,—আমি যে এই পাণ্ডুলিপির ঐ অংশের লেখায় সাহায্য করিয়াছি তজ্জন্য আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিব।.....ভারতবাসীদিগকে ভাল করিয়া বশে রাখিবার জন্য আমরা কি তাহাদিগকে অজ্ঞ করিয়া রাখিব? অথবা ইহা কি সম্ভব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি, যে আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দিব অথচ তাহাদের কোন উচ্চাভিলাষ উদ্বোধিত হইবে না? কিংবা আমরা তাহাদিগের উচ্চাভিলাষ উদ্বোধিত করিব, অথচ আমরা তাহা বৈধরূপে পূর্ণ করিব না?.....আমাদের বর্ত্তমান প্রণালীর প্রভাবে, ভারতে একটা সার্ব্বজনিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইতে পারে,—এমন কি এতদূর পরিপুষ্ট হইতে পারে যে উহা বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীকেও অতিক্রম করিতে পারে। সম্ভবতঃ আমাদের শাসনপ্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে উহা আমাদের প্রজাদিগকে আরও এক উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালীর যোগ্য করিয়া তুলিবে। য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতবাসীরা বোধ হয় ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দাবী করিবেন।

এমন দিন কি আসিবে?—আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই এমন দিনের আবির্ভাব কে।

(৩) Wiiliam Thackeray—মান্দ্রাজ বিভাগের কর্ম্মচারী Report Select Committee East India Commission.

ক্রমেই নিবারণ করিব না, কিংবা এমন কিছু করিব না যাহাতে করিয়া উহা পিছাইয়া পড়ে। যে সময়েই এই দিনের আবির্ভাব হউক না কেন, এই দিন ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটা পরমগৌরবের দিন। যে বৃহৎ জাতি দাসত্বের ও কুসংস্কারের নিম্নতম সোপানে নিপতিত হইয়াছিল, আমাদের সুশাসনে তাহারা পৌরজনের সমস্ত অধিকার লাভ করিল ইহা কি আমাদের কম গৌরবের কথা। আমাদের হস্ত হইতে রাজদণ্ড বিচ্যুত হইতে পারে, অভাবনীয় দৈবঘটনায় আমাদের গভীর রাষ্ট্রনৈতিক অভিসন্ধি গুলি ব্যর্থ হইতে পারে, বিজয়লক্ষ্মী আমাদের প্রতি বিমুখ হইতে পারেন. কিন্তু এমন কতকগুলি জয়ের কাজ আছে যাহা সর্ব্বপ্রকার বিপর্য্যয়ের অতীত। এই সকল জয়লাভ বর্ব্বরতার উপর শান্তিময় জয়লাভ। এই সাম্রাজ্য, আমাদের সাহিত্যের, আমাদের শিল্পকলার, আমাদের ধর্ম্মনীতির, এবং আমাদের বিধিব্যবস্থার অবিশ্বর সাম্রাজ্য"।

১৮৩৩ অব্দের আইনের গূঢ় মর্ম্ম শুধু ইহাই ছিল না যে, কোম্পানীর অধীনে দেশীয় লোকেরা শাসন কার্য্যের অন্তর্গত অধিক কাজ প্রাপ্ত হইবে এবং উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইবে, পরন্তু আর দুইটি পরিণাম ইহার অন্তর্নিহিত ছিল। যথা—বর্ব্বর ও অনিষ্টজনক প্রথা নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজ-সরকার ভারতবাসীদিগের গার্হস্থ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন; উহাদিগকে এইরূপ জ্ঞানশিক্ষা দান করিবেন যাহাতে করিয়া উহারা অঙ্গীকৃত কাজকর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে। এইপ্রকার, উদারপন্থীদিগের শাসনপ্রণালী হইতে রক্ষণপন্থীদিগের শাসন প্রণালীর মূলগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হইল। কোন এক ভিন্ন জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য,—তাঁহারা আপনাদিগের অনভিমত প্রদর্শন করিতে এবং সেই জাতি যে সকল কুপ্রথার প্রতি দৃঢ়রূপে আসক্ত সেই সকল প্রথাকে উন্মূলিত করিতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

এই শাসনপ্রণালী—এই ফরাসীবিপ্লবের শাসন প্রণালী—যে সব জাতির সভ্যতা তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই সেই সব জাতির সর্ব্বনাশ করে। যে সকল জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য, এই শাসনপ্রণালী তাহাদের মধ্যেও সাবধানেও বিশেষ বিবেচনা সহকারে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়; কেননা মানব-সভ্যতা একরূপ নহে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশও একরূপ নহে। প্রত্যেক জাতির দেশ, আবহাওয়া, ঐতিহাসিক ঘটনা, তাছাড়া সম্ভবতঃ কতক গুলি স্বাভাবিক গুণ, সেই জাতির সভ্যতাকে একটা বিশেষত্ব প্রদান করে।

১৮২৯ অব্দের রাজবিধি একটা নূতন রাষ্ট্রনীতি উদ্ঘাটিত করিল। এই রাজবিধি অনুসারে বিধবার সহমরণ নিষিদ্ধ হইল। এক বঙ্গদেশেই প্রতিবৎসর ৬০০ হইতে ৮০০ বিধবা সহমৃতা হইত! যাই হউক, এই আইন জারি হওয়ায় কোন বিদ্রোহ হয় নাই এবং রাজাদের মধ্যেও অল্পলোকই এই আইন লঙ্ঘন করিতে সাহস পাইত। (৪) অন্যান্য পরোয়ানায় দ্বারা নরহত্যা,

(৪) এক পত্রে Lady Amherst এইরূপ লিখিয়াছিলেন (১৮২৫):—

ওলাওঠা রোগে এক যুবকের মৃত্যু হয়, তাহার বিধবা সহমরণের সংকল্প করিল। সহমরণের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইল, মেজিষ্ট্রেটেরও হুকুম লওয়া হইল। নিকটতম আত্মীয়েরা চিতায় অগ্নি স্থাপন করিল, কিন্তু যখন অগ্নিশিখা ঐ রমণীর গাত্র স্পর্শ করিল, তখন তাহার সাহস চলিয়া গেল। চিতার ধুমে প্রচ্ছন্ন হইয়া, জনতার কোলাহল ও ঢাক ঢোলের কর্ণবধিরকারী শব্দের মধ্যে, সে কোন প্রকারে

ধর্ম্মঘটিত আত্মহত্যা এবং অতিরাত্র আত্মনিগ্রহ নিষিদ্ধ হইল।

১৮৪৫ অব্দের আইনে সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব প্রথা রহিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সরিয়া চিতার তলদেশে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং সেখান হইতে সে নিকটস্থ কোন জঙ্গলে পলায়ন করে। প্রথমে তাঁহার পলায়নের কথা কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু যখন ধোঁয়া কমিয়া গেল, তখন লোকেরা দেখিল, সে চিতার উপরে নাই। তখন তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, জঙ্গলের মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া, বিধবা বেচারীকে দেখিতে পাইল। তাহাকে টানিয়া নদীর ধারে লইয়া গেল এবং সেখানে একটা নৌকায় উঠাইয়া, নদীর মাঝখানে লইয়া গিয়া, তাহাকে নৌকার উপর হইতে জলে ফেলিয়া দিল। সে জলমগ্ন হইল। আর উঠিল না।" (Life of Lord Amherst—(by Thackeray Ritchie and Richardson Evans)

Lord William Bentinck সহমরণের প্রথা নিবারণের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া যে মন্তব্য লিপি (১৮২৯) লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমরা সহমরণ হইতে দিই বা রহিত করি,—এই মীমাংসার উপর একটা গুরুতর দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রতি বৎসর শত শত দুর্ভাগ্য রমণীর নিষ্ঠুর ও অকাল মৃত্যু আমাদিগকে অনুমোদন করিতে হইতেছে অথচ উহা নিবারণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত—একথা ভাবিলে কাহারও অন্তঃকরণ ভীতিবিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে আবহমানকাল পর্য্যন্ত যে মত চলিয়া আসিতেছে তাহারও মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক, সে মতটি এই যে,—এতদিন যে প্রথা অবাধে চলিয়া আসিতেছে তাহা যদি রহিত করা যায়, তাহা হইলে ভারতের ইংরাজ-সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, লক্ষ লক্ষ লোকের যে উন্নতি আমরা আশা করিতেছি সে সমস্ত আশার উচ্ছেদ হইবে; কেননা, আমাদের আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আমরা এই সকল আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিব।

তাহার পর Lord W. Bentinck তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মতামত সমালোচনা করিয়াছেন, যে সকল কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, তাহাদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাহার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—যে হেতু এই নিষ্ঠুর প্রথাটি প্রধানতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত, এবং যেহেতু বঙ্গদেশের অধিবাসীরা এত হীনবীর্য্য যে তাহাদের দ্বারা বিদ্রোহ অসম্ভব, অতএব ইহার দরুণ বিদ্রোহের কোন আশঙ্কা নাই। তাছাড়া যে সকল জিলায় রাজপুরুষেরা "সতী" নিবারণ করিয়াছেন, সেখানে কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

আর এক কথা, বাঙ্গলার সৈন্য নিছক্ উচ্চবর্ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের অসন্তোষে; কোন ভয়ের কারণ নাই। Lord W. Bentinck অনেকগুলি রাজপুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন—তাঁহারা বিদ্রোহ আশঙ্কা করেন না।

উপসংহারে Lord W. Bentinck কতকগুলি উন্নত ও বিজ্ঞজনোচিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি কেবল একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করিব:—

"আমার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুদের হিতসাধন করা। বিশুদ্ধতর নীতি অবলম্বন না করিলে ভবিষ্যতে হিন্দুরা কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে সর্ব্বপ্রকার হত্যাকলুষিত নিষ্ঠুর প্রথাসকল উঠাইয়া দিতে হইবে...আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, হিন্দুদিগকে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। এ উদ্দেশ্য আমার আদৌ নহে। আমি একজন হিন্দু ব্যবস্থাপকের ন্যায় লিখিতেছি, অনুভব করিতেছি এবং আমার সন্দেহ নাই, অনেক জ্ঞানালোকসম্পন্ন সুশিক্ষিত হিন্দু এ বিষয় আমারই মতন চিন্তা করেন ও অনুভব করেন।"

Lord W. Bentinck-এর দুইটি হেতু ছিল। অনেকগুলি জ্ঞানালোকসম্পন্ন শিক্ষিত হিন্দু একজন বড় লেখক রামমোহন রায়ের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ অব্দ হইতে রামমোহন রায় সতী প্রথা রহিত করিতে চাহিতেছিলেন। পক্ষান্তরে গভর্ণরজেনারালের ঘোষণাপত্র কোন বিদ্রোহের উদ্রেক করিল না। উচ্চবর্ণের বাঙ্গালীরা প্রিভি-কৌন্সেলে আপিল করিল। স্বয়ং রামমোহন রায় লর্ডদের সভায় সাক্ষ্য দিলেন। (১১ জুলাই, ১৮৩২)

মৃত্যু-স্বয়ম্বরা

(১)

পেস্তানজী পারসিক বৈদ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে পত্নী এবং অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপটির মত এক কিশোরী কন্যা সিরিন। পারস্য দেশে এই সময় বিদ্রোহ উপস্থিত। এক দল ফৌজ ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের নিকট পেস্তানজীর বেশ পসার হইতে লাগিল। পেস্তানজীর নিকট প্রত্যহ ভৈরবজী নামে এক যুবক আসিত। ইহার কোন বিশেষ কাজ কর্ম্ম ছিল না। সুতরাং সময় পাইলেই সে পেস্তানজীর দাওয়াইখানায় আসিয়া বসিয়া থাকিত, অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত, কখনও বা বৃদ্ধের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইত, সন্ধ্যার সময় পেস্তানজী যখন কাজ সমাপ্ত করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেন, যুবক ভৈরবজী তখন ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপে বৃদ্ধ ও যুবকের সম্বন্ধ ক্রমশঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

ভৈরবজীর প্রতি পেস্তানজী যত অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, পেস্তানজীর গৃহিণী যুবকটিকে ততই বিরক্তিভরে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন বোধ হয় তাঁহার স্বামী এই অজ্ঞাত-কুলশীল ভৈরবজীর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তিনি তাই তাড়াতাড়ি কন্যার জন্য পাত্র ঠিক করিয়া ফেলিলেন,—বরপক্ষীয়দিগের সহিত কথাবার্ত্তা একরকম পাকাপাকি হইয়া গেল। ছেলেটি আসিয়া শুধু মেয়েটিকে একবার দেখিবার মাত্র অপেক্ষা। কিন্তু আজ নয় কাল বলিয়া সে আসিতে ক্রমাগতই বিলম্ব করিতেছে কেন? অবশেষে একদিন পত্র আসিল—"বিবাহ ঠিক। কন্যাকে লইয়া অবিলম্বে তাঁহারা জামাতার গ্রামে যাত্রা করুন।"

পেস্তানজী এই পত্রে মনে মনে দুঃখিত হইলেন কিন্তু গৃহিণীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি কেবল ভৈরবজীকে মনে করিয়া একটি স্নেহাকুল সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যায় যখন ভৈরবজী গৃহাভিমুখী হইত, জানালার ধারে সে প্রায়ই সিরিনকে দণ্ডায়মান দেখিত। গোধূলির আলোক তাহার মুখে পড়িয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিত। ভৈরবজীর সহিত দৃষ্টি মিলিত হইবা মাত্র সিরিন গৃহাভ্যন্তরে ছুটিয়া পলাইত। যুবক রাজপথে দাঁড়াইয়া ভাবিত "আহা! কি সুন্দর।" সুপ্ত এক অভাব বেদনা তাহার অন্তরে জাগরিত হইয়া উঠিত।

এক দিবস অপরাহ্ণে ভৈরবজী পেস্তানজীর দোকানে আসিয়া দেখিল, দোকানের জিনিষপত্রগুলি সরান হইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পেস্তানজী বলিলেন, "ভৈরব, আমার মেয়ের বিয়ে। তাই আমরা জামাইএর গ্রামে যাচ্ছি, সেখান থেকে

মেয়ের বিয়ে দিয়ে আবার এখানে ফিরে আস্‌ব।" ভৈরবজী কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শূন্য থাকিয়া পরে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কবে সেখানে যাবেন?"

"এই আসচে কাল।"

"আমি কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই!" বলিয়া বৃদ্ধ পেস্তানজী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। চিরপ্রফুল্ল ভৈরবজীর মুখ আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল। ভৈরবজী পথে আসিয়া দাঁড়াইল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মিপাতে আকাশ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। বসন্তের সান্ধ্যসমীরণ যুঁইফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল। চতুর্দ্দিকে কেবল আনন্দোৎসব। আর যুবক ভৈরবজীর মনে কিসের এ ঝড় বহিয়াছে! কি যেন দেখিবার প্রত্যাশায় ভৈরবজী জানালার দিকে চাহিল, কিন্তু হায়! শূন্য জানালা তাহার দিকে কঠিন ভাবে তাকাইয়া রহিল। যুবক পথের এক-ধারে বসিয়া পুরানো কথা ভাবিতে লাগিল। মন মাতান ফুলের গন্ধে চারিদিক পরিপূরিত; দুই একটি তারা আকাশে ঝিক্‌মিকি করিয়া উঠিল। অন্ধকারে যখন সব আচ্ছন্ন হইল, রাজপথে লোক চলাচল যখন থামিয়া গেল, ভৈরবজী বাড়ী ফিরিবার মানসে গাত্রোত্থান করিল।

(২)

আজ পেস্তানজী স্ত্রী-কন্যাদিসহ জামাতার গ্রামে যাইবেন। অতি প্রত্যুষে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হয়। নদীটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উহার জল অতিশয় চঞ্চল—তরঙ্গমুখে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। ভৈরবজীর উজ্জ্বল চক্ষু রুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে যেন অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। পেস্তানজী-গৃহিনী ভৈরবজীকে দেখিবামাত্র চটিয়া উঠিলেন—মুখে কিছু বলিলেন না, কেবল ভ্রূভঙ্গি করিয়া রহিলেন। নৌকা প্রস্তুত ছিল। সকলে উঠিতেই নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল।

তখন সবে মাত্র পূর্ব্বগগনে সূর্য্যের উদয় হইতেছিল। বিচিত্র গন্ধে বাতাস সুবাসিত। অনুকুল বায়ু পাইয়া নৌকাটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। প্রাতঃ-কালীন সূর্য্যরশ্মি নদীজলে পতিত হইয়া চারিদিক স্বর্ণময় করিয়া তুলিয়াছিল। নৌকার ছাতে চারি ব্যক্তি উপবিষ্ট। সর্ব্বপ্রথমে সিরিন তৎপরে তাহার মাতা ও পেস্তানজী এবং সর্ব্বশেষে ভৈরবজী আসীন। অন্যের অলক্ষ্যে ভৈরবজী মাঝে মাঝে সিরিনের দিকে চাহিতেছিল, চারিচক্ষুর মিলন হইলেই উভয়ে অন্যত্র দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছিল। নৌকা দ্রুত চলিতে লাগিল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই কূলে পৌঁছিবে। তীরের লোকজন অশ্ব যান সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। পেস্তানজী-পত্নীর আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু সিরিনের মুখে বিষাদ ঘনীভূত হইয়া পড়িল। অন্যমনস্ক ভাবে সরিতে সরিতে যেন সহসা সে জলে পড়িয়া গেল। যুবক ভৈরবজীও মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে ভরা

নদীর পাগল জল তাহাদের কোথায় লইয়া গেল কে তাহার ঠিকানা করিবে?

"কি হ'ল, কি হ'ল!" বলিয়া পেস্তানজী-পত্নী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

নৌকা তীরে লাগিল। কন্যাপক্ষকে সমাদৃত করিয়া লইবার জন্য লোকজন যানাদি সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বৈবাহিক তীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। নৌকামধ্যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত দ্রুতপদে তিনি নৌকায় উঠিলেন। রুদ্ধ নিশ্বাসে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা কই?"

এক উন্মত্ত আর্ত্তনাদ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল,—"জলের মধ্যে—সে জলের মধ্যে; জলের দেবতা তাকে টেনে নিয়েছেন!"

"আর আমার পুত্র? ভৈরবজী! বর? সে কোথা? সে যে এই সঙ্গেই আসবে লিখেছিল?"

"ভৈরবজী! তোমার পুত্র! সেই বর! সেই আমাদের জামাতা! হায় হায়! একথা এখন জানিলাম—এখন যখন সব ফুরাইয়া গেল! হাঃ হাঃ!"

চতুর্দ্দিকে সেই হৃদয়বিদারক শব্দ বিকট ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—হাঃ হাঃ!

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল। ইঁহাদের বন্ধুত্বের কথা বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত সমাজে বিখ্যাত। ইঁহারা যখন উভয়েই বালক তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখোচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। ইউরোপের Royal lovers দের ন্যায় ভালবাসা জন্মিল। সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত। প্রভাকরে দ্বারকানাথ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালি দিতেন, সংবাদ পত্রে উহাকে কবিতা যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল।

আমার স্মরণ আছে, বহুকালের কথা সে,—একদিন একখানি পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় হাসিয়া উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে—পত্রে কি লিখিয়াছে?" তিনি কোন উত্তর না দিয়া আবার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আবার হাসিলেন। এইরূপ বারংবার পড়িয়া পত্রখানি বাক্সের ভিতর রাখিলেন। আমি তখন 'দেখি দেখি' বলিয়া উহা তাঁহার

হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম—আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া দাদা বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। এইস্থলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, পরক্ষণেই নরমসুরে আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আপনিও গালি দিয়া লিখুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন "লিখব বই কি।"

আমি তখন দীনবন্ধুর নাম শুনিয়াছিলাম। প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন সংবাদ পত্রে কবিতার নীচে দীনবন্ধুর নামও দেখিতাম।

দীনবন্ধুর বাল্যকালের পত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্সের ভিতর থাকিত, সেগুলি কি হইল তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐ পত্রগুলি যে এক্ষণে সাহিত্য সমাজের বিশেষ আদরের হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করার অভ্যাস তাঁহাদের চিরদিনই ছিল। দীনবন্ধু কোন এক বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে স্থলের এক জোড়া জুতা, যাহা এখানে তখন পাওয়া যাইত না, বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কথার পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা—"বঙ্কিম, কেমন জুতো!" পত্রখানি আমি পড়িয়াছি, অনেকেই পড়িয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন তাহা তখন আমরা জানিতে পারি নাই। পরে দীনবন্ধুর অগ্রজের নিকট শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"তোমার মুখের মতন।"

হাস্যরসে ও বাক্‌পটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন, কেবল এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পরাভূত করিতেন। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবান্, ব্রাহ্মণ, কুলীনের সন্তান, স্বাধীন অর্থাৎ জমিজমা চাষবাস ইত্যাদিতে সচ্ছন্দে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহ হইত। ইনি ভাঁড়ামিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ভাঁড় শান্তিপুরের গুরুচরণ বাঁড়ুয্যে ওরফে গুরোহুষ্যো মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন, কিন্তু এই ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইহার নাম—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নাচ দেখিয়া নাচিতে গান শুনিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কোন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা পান নাই। ইনি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বৈঠকখানায় থাকিতেন। একদিন কাঁঠালপাড়ার বাটীতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভাটপাড়ার এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় (পণ্ডিত মহাশয় নহেন) উপস্থিত হইলেন, শিষ্যগৃহে আগমন উপলক্ষে ইঁহার সর্ব্বদা কৃষ্ণনগরে যাতায়াত ছিল। ভট্টাচার্য্যমহাশয় কথায় কথায় দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির কথা কহিতে

লাগিলেন। সকলেই আনন্দ সহকারে উহা শুনিতেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজোড়া ঘুঙ্ঘুর পায়ে দিয়া একটী গীত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। (ঘুঙ্ঘুর জোড়াটি ঐ ঘরে সংগ্রহ করা থাকিত) :—গীতটি এই—

"কালা তাই বটে, কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপফুল ফোটে।"

এই গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। দীনবন্ধুও খুব হাসিলেন। দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির পর এই গীতের অর্থ এই বুঝাইল যে দীনবন্ধু বাবলাগাছ ও তাঁহার পত্নী গোলাপ ফুল—বাবলা গাছে গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে। ঐ দিবস হইতে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে পত্নীসহোদরবাচক সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে নারাজ ছিলেন না। এই বৎসর শ্যামাপূজার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতাদ্বয় যখন কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিতে যান তখন বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে দীনবন্ধু তাঁহার পত্নীর নাম করিয়া ইঁহাকে ভাই ফোঁটার দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আহারের সময় বড় গোল বাধিল। ছাই পাঁশ গরুর চোনা ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাওয়াইবার জন্য দীনবন্ধু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। সাধ্বী পতিপরায়ণা যিনি ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন তিনি অদ্যাপি জীবিতা।

যশোহরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐস্থানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বাহাল হইয়া যান, দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোষ্ট আফিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্যের কি শুভ ফল ফলিল তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। এই মিলনের পর হইতে দুইজনে প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন। একজন বঙ্গের প্রধান নাটককার হইলেন, দ্বিতীয় প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন। প্রথম ব্যক্তি নীলদর্পণ রচনা করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্গেশনন্দিনী প্রণয়ন করিলেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ যে সাহিত্য সমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বুড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিমকোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন দীনবন্ধুর প্রথম নাটকখানি সর্ব্বাংশে শক্তিশালী এবং কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। এই নাটকখানি ইউরোপে অনেক ভাষায় অনূদিত এবং সুদূর বোম্বাই সহরে পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্য জগতে ভাষার ও ভাবের যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে প্রথমত কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গ হস্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজিওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ

একটি সামান্য ঘটনা এস্থলে প্রকটিত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোন পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার নিজের লেখনী শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সেজন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিত, ভাটপাড়ার খ্যাতাপন্ন পণ্ডিতগণও আসিতেন; এক্ষণে তাঁহারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র একজন জীবিত, তিনি কাশীবাস করিতেছেন! এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার ঠিক মনে নাই অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল, ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের নিকট পাঠারম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন. কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একটি দুইবছরের শিশু, ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া খড়্‌খড়ির পাখি টানিতে লাগিল, সঞ্জীবচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চাকরদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন, মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদের তামাক আবশ্যক হইত, তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। পণ্ডিতমহাশয়েরা নস্যের ডিবা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিনা সেটি আমি লক্ষ্য করি নাই, কেননা আমিও অনন্যমনে পাঠ শুনিতেছিলাম। একজন প্রাচীন ভদ্রলোক, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "আমরি আ,মরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন!" এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ব্যাকরণ দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?" ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (সংস্কৃত কলেজের ৺ হৃষিকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি!" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণদোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।" ভাটপাড়ার পণ্ডিতমহাশয়দিগের মতামত এস্থলে উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহারা কলিকাতার পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা কোন শাস্ত্রে খাট ছিলেন না। কিন্তু কালকাতার যে সকল পণ্ডিত বাঙ্গালাভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেন, তাঁহারাই কেবল নবীন লেখকের নবীন ভাষা অবতারণার অসমসাহসে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ৺ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সে কালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।" ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছিল, যতদিন না দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হইয়াছিল ততদিন দুর্গেশনন্দিনীরই বিক্রয় বেশী ছিল।

নবপ্রকাশিত সংকল্প মাসিকপত্রে কোন প্রসিদ্ধ লেখক "বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি উপরেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তাঁহার অনুজ ৺তারাচরণ বিদ্যারত্ন (শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণের পিতা) যিনি পাণ্ডিত্যে দেশ বিদেশে জয়ী হইয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি পাইয়াছিলেন ও চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি ১০।১২ জন ধুরন্ধর পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন; তিনি তাঁহার ইংরাজি শিক্ষিত



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুদিগের যেরূপ আদর সম্মান করিতেন ইঁহাদেরও সেইরূপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। ন্যায় কি দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন থাকাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত শাস্ত্র বিচারে হটিয়া যাইতেন। ভাটপাড়ার এক্ষণকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবরাম সার্ব্বভৌম অষ্টাদশবৎসর বয়ঃক্রমে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর ৺হৃষিকেশ শাস্ত্রী যুবাবয়সে শ্লোক

রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশা হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। একে বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তারপর দেখিতে সুপুরুষ একুশ বছরের যুবা, আবার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নামযশঃও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন; সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, পরে একটী পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন, ইনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে ছিলেন, (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে), তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেইবনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে ৩।৪ দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন, যথা।—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোলবৎসর পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায় কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন,



দীনবন্ধু মিত্র

তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম!

সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন 'যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে, দরিদ্রঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরী করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদ হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না।—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদর্শনে বিদায় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, সংসারের সুখদুঃখের ভাগী।" লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয়ই ঐ কথাই বলিতেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যশোহরে ইহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইহারা প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন, উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন; ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষ প্রচারের কিঞ্চৎ পূর্ব্বে কি সেই সময়ে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" পুস্তকখানির প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর "লীলাবতী"-তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্বহিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিলিয়াছিল কিনা, জানি না। বঙ্কিম- চন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই। তাঁহার কোন কোন পুস্তকে শিক্ষানবিশীরূপে তাঁহার অনুজ এই ক্ষুদ্র লেখক দুই এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছে বটে কিন্তু সে লেখা যে কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

কোন গৃহস্থের বাটীতে কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির এক বিখ্যাত কারিকর নাম কালাচাঁদ পাল, দুর্গোৎসবে দশভুজার প্রতিমা গড়ত। ষষ্ঠীর দিন রাত্রিকালে বিদেশ হইতে বাটীর কর্ত্তা আসিয়া প্রতিমা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কালাচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই দালানে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে, এ প্রতিমা আমি গড়িয়াছি!" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" সে লোকটি বলিল "আমি কালা চাঁদের ভাইপো।" কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া

কহিলেন, "না, তা কখনই হইতে পারে না, এ প্রতিমা কালাচাঁদ গড়িয়াছে।" সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, আমি উহাতে খড় জড়াইয়া এক মেটেমো করিয়াছি, আমার খুড়োমশাই দোমেটোমে করিয়াছেন, মুখ গড়িয়া বসাইয়াছেন।" তখন কর্ত্তা গো গো করিয়া হাসিয়া তাহাকে একটি টাকা বখশিশ দিলেন। আমি সেইরূপ দুই একটি পরিচ্ছেদে এক মেটামো করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দোমেটোমে করিয়াছিলেন। কোন পরিচ্ছেদে কি ঘটনা লিখিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন, আমি সেইরূপ লিখিতাম, পরে তিনি উহা তাঁহার লেখার সুরের সহিত মিলাইয়া লইতেন। আমি উপন্যাচক হইয়াই লিখিতাম, কখনও কখনও তিনি ইচ্ছা করিয়াও আমাকে লিখিতে বলিতেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বঙ্কিম ও দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লিখিতে লিখিতে নিজের কথা কেন! একটা বিষয়ের কৈফিয়েৎ দিবার জন্যই নিজের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

ভারতীর "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধের লেখকের সহিত কথা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে কৃষ্ণকান্তের উইলের কোন কোন পরিচ্ছেদে আর উহার উইলচুরি পরিচ্ছেদে আমার একটু আধটু লেখা আছে। এখন বুঝিতেছি, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে পরিচ্ছেদটী সমুদয় আমার লেখা। তজ্জন্য ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার ভারতীতে "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধে ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলেন যে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের হাস্যরসের কথোপকথনটি আমারই লেখা। আমি তাঁহাকে কখনও এমন কথা বলি নাই, যে ঐ অংশটুকু আমার লেখা। আমি যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার এমন সাংঘাতিক ভ্রম হইত না। তাঁহার সহিত ঐ আমার প্রথম আলাপ। "উইলচুরি" পরিচ্ছেদে আমার কতটুকু লেখা আছে তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলচুরি পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন, এমত সময়ে পাঁচটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম "কি লিখিতেছিলেন বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।" তিনি আমার আব্দার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম "ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারুঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন,—এই সুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এইস্থানে "রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম। পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণ কান্তের উইল লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত কৃষ্ণকান্তের আফিমের

ঝোঁকে কথোপকথন নূতন করিয়া লিখিলেন, আমার লেখার অবশিষ্ট অংশতে "দোমে টোমে" করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে "মাটী" লাগাইয়াছেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য কিছুকাল আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মধ্যে সাহিত্যানুশীলন অর্থাৎ literary activity জন্মিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শনের বিদায়ের সঙ্গে উহার অবসান হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে আফিসের কি সাহেবসুভার কথা কহিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই সাহেবের কথা ও আফিসের কাজ কর্ম্মের কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেন না। একরাত্রিতে কোন ডেপুটির বাড়ী একটা বড় ভোজ ছিল; ডেপুটিতে ডেপুটিতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ইহার কিছু পূর্ব্বে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এই সভাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছিলেন! তাঁহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন :—

"ধনা এক জনা হয়েছে,
পেখের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে।"

এই ডেপুটী বাবু বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য তিনি তাহাকে এরূপ ভৎর্সনা করিলেন। একজন ডেপুটী কোন বিশেষ সরকারী কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিয়াছিলেন যে ঐ কার্য্য তিন বৎসরে শেষ হইবে, কেননা ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য জেলায় জেলায় ঘুরিয়া অনেক বিষয়ের তদন্ত করিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটী বাবুটী ঐ কার্য্য দেড় বৎসরে শেষ করিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন। ডেপুটি বাবু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কি প্রকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। পরিচয় শেষ হইলে দীনবন্ধু বলিলেন "ওহে—, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিলে!"

ডেপুটি বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন, তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁসিতেন না। কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিম চন্দ্রের সহিত তাঁহারা আনুগত্য করিতেন।

দীনবন্ধু কলিকাতায় সদর আফিসে আসিলে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার একাধিপত্য জন্মিল। কত দরিদ্র সন্তানকে তিনি চাকুরী দিয়া অন্নদান করিয়াছেন তাহার গণনা হয় না। কাহাকেও কেরাণীগিরি, কাহাকেও সব পোষ্টমাষ্টারী, যে যাহার যোগ্য তাহাকে তাহাই দিতেন, সেজন্য উমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন!

একদিন আমাদের বাটীতে "গোলাম-চোর" খেলা হইতেছিল, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দীনবন্ধু বাবুর নিকট আমার এক দরখাস্ত আছে।" তিনি আমাদের পরিচিত কিন্তু স্বগ্রামবাসী নহেন, পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে তাঁহার বাস। দীনবন্ধু তখন খেলিতে

বসিয়াছিলেন, বলিলেন "একটু বসুন পরে শুনিব।"

গোলাম চোর খেলা, পল্লিগ্রামে, কি নগরে, গৃহস্থের বাটীতে কি ধনাঢ্যের বাটীতে, সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি প্রকারে সেই সামান্য খেলাতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা যদি এস্থলে উল্লেখ করি তাহা হইলে আশা করি পাঠকমহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না। আমাদের গ্রামস্থ ৭।৮ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন লোক খেলা আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যাঁহাকে দীনবন্ধু ভাই ফোঁটা দিয়াছিলেন) খেলিতে বসিলেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে এই বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর করিয়া সাজা দেন, কারণ ইনি সকলকেই গালি দিতেন, কাহাকেও ছাড়িতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ ও আমরা অনেকে দীনবন্ধু এবং সঞ্জীবচন্দ্রের দলভুক্ত হইয়া খেলা দেখিতে লাগিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিঃসহায় ছিলেন এমন নহে, তাঁহারও দলে অনেক লোক ছিল,। তন্মধ্যে একটী লোকের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের লইয়া বাটী আসিলে সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন, তাহা এই পরিচয়ে কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই লোকটি ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন কিন্তু বড় মূর্খ ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এইরূপ অভিমান ছিল যে চেষ্টা করিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় লেখক হইতে পারেন—সর্ব্বদা লিখিবার জন্য 'subjebt' খুঁজিতেন। একদিন সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আপনি চুত ফল সম্বন্ধে লিখুন বেশ ভাল 'subject'।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুত ফল কাহাকে বলে?" সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আম"।

কিছুদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাদের শুনাইলেন। প্রবন্ধটীর প্রথমাংশ আমার মনে আছে, উহা নিম্নে প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করি, যদি পাঠকমহাশয়েরা রাগ না করেন।—

"আঁব অতি মিষ্ট, আঁব আবার অতি টক, বাগাতেঁতুলের মত টক, আঁব আঁশাল, কোন কোন আঁব আঁশাল হয় না কারণ ভাল গাছের আঁব আঁজাল হয় না—ইত্যাদি।" এই প্রবন্ধটির পাঠ শেষ হইলে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু গম্ভীর ভাবে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, সকলেই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু এক ব্যক্তি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হাসিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "তবে আমার প্রবন্ধটী ছাপাইয়া দিন।" বঙ্কিমচন্দ্র উহা হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যেখানে রাখিয়াছিলেন সেইখানেই তাহা পড়িয়া রহিল। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম এবং রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে অনেককে পাঠ করিয়া শুনাইতাম, সেইজন্য

উহার প্রথমাংশ আমার স্মরণ আছে।* * * খেলা আরম্ভ হইলে দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র এবং তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকেই এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক কৌশল করিতে লাগিলেন যাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় চোর হয়; কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" দীববন্ধু সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই একজন চোর হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহানন্দে ঘুঙ্ঘুরজোড়াটী পায়ে দিয়া রূপচাঁদ পক্ষীর একটী গীত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে দীনবন্ধু তখন পূর্ব্বোক্ত উমেদার ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, অনেকগুলি বিধবা, নাবালক, নাবালিকা, প্রতিপালন করিতে হয়, দিন চলে না, তাহার এক মাত্র পুত্র যদি একটা চাকুরী পায় তাহা হইলে অনেকগুলি ব্যক্তির জীবনরক্ষা হয়। দীনবন্ধু ব্রাহ্মণটিকে পুত্রের সহিত তাঁহার আফিসে যাইতে বলিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম ব্রাহ্মণ পুত্রের পোষ্টআফিসে চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারী হইয়াছে, খালি হইলেই পাইবে, কিন্তু খালি কবে হইবে তার ঠিক নাই, একমাস হইতে পারে ছয়মাসও হইতে পারে। ইতিমধ্যে হুগলীর একটী ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার অধীনে রোডশেশ্ ডিপার্টমেণ্টে একটী চাকুরী খালি ছিল, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ চাকুরী দেওয়াইলেন। আবার মাস দুই বাদে দীনবন্ধু উহাকে সাবপোষ্টমাষ্টারি পদে বাহাল করিয়া পরওয়ানা পাঠাইলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য, এইরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের পরিচয় শুনিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কষ্ট সত্বর বিমোচন করিতে কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় স্বরূপ উহা এ স্থলে উল্লেখ করিলাম!

আমি উপরে বলিয়া গিয়াছি যে নানা প্রকৃতির লোক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। এখানে আর একটী লোকের কথা বলিলে সেকালের পল্লীগ্রামের কবির পরিচয় পাইবেন। ইঁহার নিবাস আমাদের বাটীর অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে মাদ্রালগ্রামে, নাম কৃষ্ণমোহন মুখুয্যে। ইনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। ইনি একজন উপস্থিত কবি ছিলেন। এই কবি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট আসিতেন, সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিত, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। একদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি কখনও আমায় প্রশ্ন করেন নাই, আমার ইচ্ছা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই।" বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা"। অল্পক্ষণ পরেই একটি প্রশ্ন করিলেন—

"গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

এই প্রশ্নে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি উদ্ভট প্রশ্ন? যাহা কখনও পৃথিবীতে ঘটে নাই, তাহার কবিতা কিরূপে হইবে? আকাশে কখনও কি শেয়াল উঠেছে যে গগনেতে হুয়া হুয়া করে ডাকবে?"

এইরূপে সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভৎর্সনাতে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কবিবর মস্তক নত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া একটী কবিতা শুনাইতে লাগিলেন! ঐ কবিতার প্রথম দুই চারি পংক্তি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাট হইয়াছে, আপনি অপরাজেয়"। পরে কবিবর সমুদয় কবিতাটি শুনাইলেন। উহার মর্ম্ম এই, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে ধন্বন্তরিপুত্র সুষেণের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনিতে গিয়া উহা খুঁজিয়া না পাইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত উপাড়িয়া লইয়া যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে সূর্য্যদেবকে বগলে পুরিয়া লইয়া পাহাড় মাথায় করিয়া আসিতেছিলেন; ঐ পাহাড়ে বাঘভল্লুক, পশুগণ বাস করিত তন্মধ্যে শিবাগণ ভোরের সময় তাহাদের সংস্কারসিদ্ধ হুয়া হুয়া ডাক ডাকিয়া উঠিল; দারুণ গ্রীষ্মযন্ত্রণায় এক দম্পতি গৃহছাদে শয়ন করিয়াছিল, আকাশে ঐ হুয়া হুয়া ডাক শুনিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্ত্রী বলিল,—

"কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন মাঝারে
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল, তাহার প্রথম পরিচয় নীলদর্পণ প্রচারে পাওয়া যায়। এ ত গেল একটা গুরুতর উদাহরণ। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে সর্ব্বদা উহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে ঘটনা অন্যের পক্ষে রহস্যজনক, দীনবন্ধুর নিকট উহা কষ্টকর বোধ হইত। একজন মাতাল ট'লে ট'লে খানায় পড়িতেছে, লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে, হাসিতেছে, কিন্তু দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করিলেন। এই গুণটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। দীনবন্ধুর সম্বন্ধে একটি ঘটনা, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা এখানে বলিব। বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটী ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিমদিগের ড্রেণে একটী ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জ্যোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, এই ধবল পদার্থটি কি? উহা মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল একটা গরু ড্রেণে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম উহা গরু নয় একটা বাবু মাতাল ড্রেণে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিনজনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম, একটী নবীন যুবা, পরিপাটি বেশবিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতাল বাবু বলিলেন তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাবুদের সহিত শুড়ির দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাটী যাইতে যাইতে খানায় পড়িয়া গিয়াছেন। শ্বশুরের নামধামেরও পরিচয় দিলেন। তাহার শ্বশুর সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আমরা

সকলেই তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু শ্বশুরের নাম শুনিয়া বলিলেন "আপনি অমুকের জামাই!" এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন—"You know my father-in-law sir, then you are my father-in-law, sir, yes sir son.in-law sir, I sir son-in-law sir,"—এই বুলি ধরিলেন, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেবল তাহার মুখে ঐ বুলি। দীনবন্ধু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিল কিন্তু শেষ কথাতে "Yes sir son-in-law sir." এই ধুয়া বরাররই ছিল। পৃথিবীর উপরিস্থ পদার্থের প্রতি মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন স্যার আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ঐদিন আমরা মাতালের প্রতি খানাডোবার আকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিলাম। কেননা মাতালবাবু যেদিকে খানা কেবল সেদিকেই টলিয়া টলিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্বদিকে সমতল ভূমি, সেদিকে কোনমতে টলিবেন না; ইহা দেখিয়া দীনবন্ধু কোমরে চাদর জড়াইয়া তাহার বাম হাতখানি ধরিলেন। আমি দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ড্রেণের দিকে দাঁড়াইলাম ও তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কিছুদূর যাইয়া দীনবন্ধুর কষ্ট দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি ড্রেণের দিকে আছি, কোনমতে বাবুকে খানায় পড়িতে দিব না।" তিনি বলিলেন, "না হে না"। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন না। আমার তখন ২২।২৩ বৎসর বয়স। পশ্চিমদিকে বৈদিকপাড়ার একটি গলি হইতে দুইটি বৈদিক ঠাকুর বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহারা চিনিতেন, আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু একজনের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "একি, ইনি কে!" তখন মাতালরাজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বুক চাপড়াইয়া "Son-in-law sir, yes sir son-in-law sir" বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিক-ঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টিকি উড়াইয়া দৌড়িতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটিজুতার ফট্‌ফট্ শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম—বৈদিক ঠাকুরেরা 'দাতাল মাতালকে' বড় ভয় করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ মিনিটে আমরা বাটী পৌছিলাম, পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দীনবন্ধুকে বাতাস দিতে হইল। যতক্ষণ রাস্তায় মাতালকে ধরিয়াছিলেন ততক্ষণ তিনি গম্ভীর ভাবে ছিলেন; এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন ঘামিতেছেন, হাঁপাইতেছেন, আবার হাসাইতেছেন ও হাসিতেছেন। এখানে বলা বাহুল্য মাতালবাবুকে খাওয়াইয়া পাল্কি করিয়া শ্বশুরবাটী পাঠান হইল, শ্বশুরবাটী গ্রামান্তরে।

অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি, যাহা পেশা মাতাল হইয়া খানায় পড়া তাহাকে কে এরূপ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকে? সে কেবল দীনবন্ধু। অন্য কোন ভদ্রলোক হইলে উহাকে খানা হইতে

তুলিয়া নিকটস্থ কোন দোকানে (ঐ স্থানে অনেক দোকান ছিল) রাখিয়া বাটী চলিয়া যাইতেন, আবার কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেন, কিন্তু দীনবন্ধু অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদগ্রস্ত লোককে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটী বিশেষ রোগ ছিল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যদি উহাকে নাটকোপযোগী মনে করিতেন, তাহা হইলে কোন নাটকে সে চরিত্রটী অঙ্কিত করিতেন। এই মাতাল বাবুই "সধবা একাদশীর" "ভোলা" মাতাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইঁহারা দুইজনে পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্যের সহায়" দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দনরোল উঠিল, কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে বঙ্গদর্শনের যে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন বঙ্গদর্শন বিদায়গ্রহণ করিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায়-প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের কয়েকছত্রে প্রকাশ পাইবে:—

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্য পটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুর স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় ৮।৯ বৎসর পরে "আনন্দ-মঠের" উৎসর্গ-পত্রে "কুমার সম্ভব"

হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "হে ক্ষণভিন্ন সুহৃদ আমাকে কেলিয়া কোথায় গেলে !!" বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন দীনবন্ধু "আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু"।—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় স্নেহপ্রবণ ছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে লৌহ *

সমালোচনা

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম এ, এফ সি এস, রাজসাহী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক। ইংরাজী ভাষায় Iron in Ancient India নামে তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি গবেষণায় পরিপূর্ণ, ভাষাও প্রাঞ্জল, সুবোধ্য।

পুরাকালে লৌহ-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের জ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অধ্যাপক নিয়োগী উক্ত পুস্তকে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার History of Hindu Chemistryতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে, হিন্দুদিগের লৌহ ও অন্যান্য ধাতু-সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞান ছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে, হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন গুলি দেখিলে এবং প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিলে হিন্দুদিগের লৌহ-সম্বন্ধে জ্ঞানের কতদূর প্রসার ছিল, তাহাও জানা যায়। লেখনীমুখে সেই পরিচয় প্রকটিত করিয়া পঞ্চানন বাবু ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমাদের ধারণা যে পুরাকালে যে কেবলমাত্র ভারতে নীতি ও দর্শন শাস্ত্রেরই চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা নহে; শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন নিয়োগী, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কি অর্থনীতিশাস্ত্রে, কি নৌ-বিদ্যায়, কি লৌহ-শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতবাসী যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

বহু শতাব্দী ধরিয়াই ভারতে লৌহ প্রস্তুত হইতেছে; ও ভারত হইতে পারস্য, আরব, মিশর ও য়ুরোপে সেই লৌহ রপ্তানি হইয়াছে।

বেদগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক যুগে আর্য্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিতেন। "আয়াস" লৌহ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ও অথর্ব্ব বেদে "আয়াস" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের "কৃষ্ণা-য়াস" লৌহ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতে লৌহ-ব্যবহারের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। অসি, ভল্ল, কৃপাণ, বল্লোহ, গদা, মুষল, শর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। মনু-সংহিতায় লৌহময় পাত্রের সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। সুশ্রুতে প্রায় একশত প্রকার লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের নামোল্লেখ আছে। চাণক্যের "অর্থশাস্ত্রে" "আকারাধ্যক্ষ" ও তাহার কর্ত্তব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ী আলেকজন্দরকে পুরু অর্দ্ধ মণ লৌহ উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

পুরাকালে লৌহ কেবল অস্ত্র-শস্ত্র-নির্ম্মাণেই

* Iron in Ancient India by Panchanan Neogi, M. A. F. C. S. Premchand Roychand Scholar, Professor of Chemistry, Government College, Rajsahi, Printed for, and Published by, the Indian Association for the Cultivation of Science, 210. Bow Bazar Street, Calcutta. Price Rs 2/4.

ব্যবহৃত হইত না; ভিষক-শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। নাগার্জ্জুন লৌহ জারণ মারণ ও শোধন করিবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তাম্রপর্ণী নদীর কূলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাধি-ভূমি খনন করিয়া নানাবিধ লৌহ যন্ত্র পাইয়াছেন—যাহাদের নির্ম্মাণ-কাল স্থির করা সুকঠিন—কিন্তু বোধ হয় যে দাক্ষিণাত্যে শবদাহ-প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে শব-সমাধির যুগে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়া সমাধি-মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। কপিলাবস্তুর ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে পিপ্রায়া নামক স্থলে পেপ সাহেব স্তূপ খনন করিতে করিতে দুইটী লোহার একটী লোহার গজাল ও একটী বল্লমের পাইয়াছেন; অনুমানে বোধ হয়, এইগুলি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে তৈয়ারি হইয়াছিল। বুদ্ধ প্রায়ায় একটী স্তূপ খনন করিতে করিতে কতকগুলি লৌহময় পদার্থ পাওয়া গিয়াছে; অনুমান করা যায়, সেগুলি তৃতীয় খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৈয়ার হইয়াছিল।

দিল্লীর কুতব মিনারের সন্নিকটবর্ত্তী লৌহ স্তম্ভ বাইশ ফুট ৮ ইঞ্চি; ব্যাস ১৬·৪ ইঞ্চি; ইহা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কীর্ত্তিস্তম্ভ; অন্তত ৪১৫ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুপ্রচুরনার রবার্ট হাডফিল্ড এই লৌহের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে নিম্নলিখিত মূল পদার্থগুলি আছে:

লৌহ	৯৯·৭২০ শতকরা
অঙ্গার	·০৮০ ,,
গন্ধক	·০০৬ ,,
সিলিকন	·০৪৬ ,,
ফস্ফরাস	·১১৬ ,,
ম্যানগানিস	·০০০ ,,
	৯৯·৯৬৬

উক্ত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে, যে স্তম্ভটি বিশুদ্ধ wrought ironএ নির্ম্মিত, উহাতে ম্যান্-গানিস্ (manganese) নাই। এই স্তম্ভটী হিন্দুদিগের ধাতু-বিদ্যার একটী স্থায়ী গৌরব-কীর্ত্তি। Roscoe এবং Schorlemmer লিখিয়াছেন, "It is not an easy operatIon at the present day to forge such a mass with our largest rolls and steam-hammers; how this could be effected by the rude hand-labour of the Hindus, we are at a loss to understand", ফার্গুসন লিখিয়াছেন, "Taking 400 A. D as a mean date—and it certainly is not far from the truth—it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Enrope up to a very late date, and not frequently even now."

পুরী, কণারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লোহার কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লি ব্যতীত অপর দুই স্থানে দুইটী বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে—একটী ধার নগরে, অপরটী আবু পর্ব্বতে। ধারস্তম্ভ ৪৩ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। ব্যাস ১০½ ইঞ্চি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "Outside this fort of Dhar there is a Jami Masjid and a square pillar lies in front of the Masjid with some portion imbedded in the ground. When Bahadur Shah conquered Malava he was anxious to take the pillar with him to Guzerat. In the act of digging out, it fell down and was broken into two pieces (one piece 22 feet long and the other 13 feet)"

ধারস্তম্ভ সম্ভবতঃ দ্বাদশ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধারস্তম্ভের ভগ্নাংশগুলি যদি সংযোজিত করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী-বক্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৪১২ খৃষ্টাব্দে আবু পর্ব্বতোপরি অচলেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী লৌহ-নির্ম্মিত ১২ফুট ৯ইঞ্চি উচ্চ ত্রিশূলাকৃতি স্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

যজুর্ব্বেদে "সুস্মী", রামায়ণ ও মহাভারতে

"শতাঘ্নী", "আগ্নেয়াস্ত্র", "নালিকাস্ত্র" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শুক্রনীতিতে "ক্ষুদ্রনালিকা" ও "বৃহৎ-নালিকা"র বর্ণনা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও মোগল বাদশাহদিগের লৌহ-নির্ম্মিত বৃহৎ কামান বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। রেনেল সাহেব তাঁহার "Memoir of a map of Hindoostan" নামক পুস্তকে একটী ২২ ফুট ১০½ ইঞ্চি লম্বা কামানের বর্ণনা করিয়াছেন; ঢাকায় তিনি স্বয়ং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উক্ত কামান দেখিয়াছিলেন; এখনও ঢাকায় একটী ১১ফুট লম্বা কামান দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদা "জাহানখোসা" নামক কামান ১৭ ফুট ৬ইঞ্চি ল উহা ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার জনার্দ্দন মিস্ত্রি ক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরেও অনেকগুলি পুরা কামান দেখিতে পাওয়া যায়। সুরভরে ২৪ লম্বা একটী কামান আছে; বিজাপুরে "লণ্ডা কে নামক ২১ ফিট ৭ ইঞ্চি কামান আছে; গুলবার্গা একটী বৃহৎ কামান আছে। "আইন আকবরী "বন্দুক" তৈয়ার করিবার প্রণালী লেখা আ

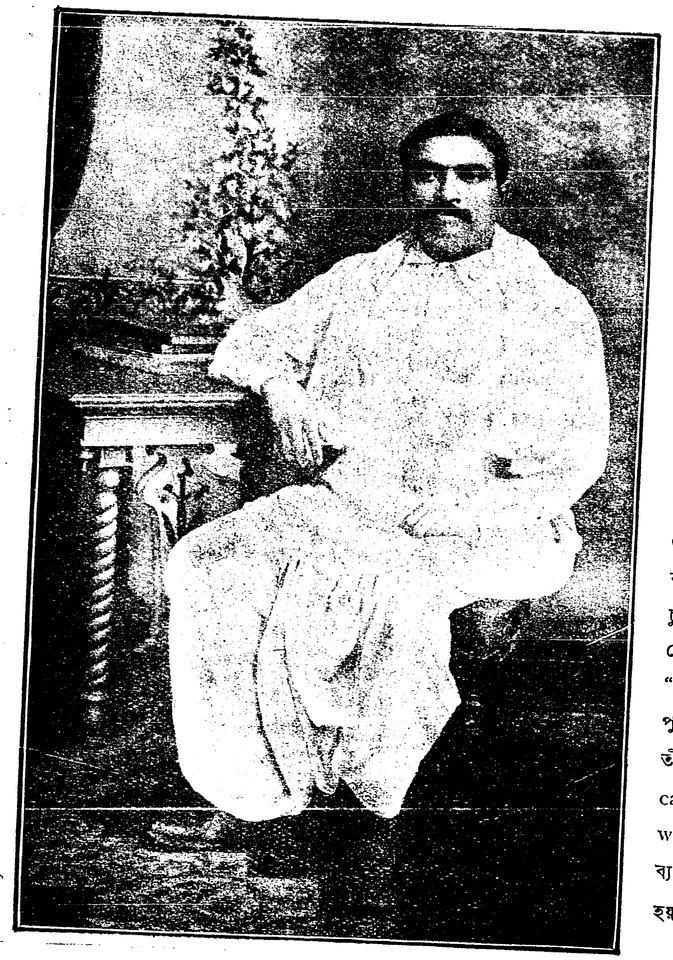

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

এখনও অনেক পুরা জমীদার ও রাজার 'মোগলাই' বন্দুক দেখি পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে ভারত লৌহকে বিভিন্ন ভাগে বিভ করা হইত, যথা, "মৃ "তীক্ষ্ণ," "কাণ্ড"; আ "মুণ্ড" লোহ তিন ভাগে বিভ করা হইত, যথা, মৃদু, কু কড়ার। 'তীক্ষ্ণ' লোহ ভাগে বিভক্ত করা হইত, য খর, সার, হুন্নাট্ট, তারাব বাজির, কাললৌহ। "কা লৌহ পাঁচ ভাগে বিভ করা হইত, যথা, ভ্রাম চুম্বক, কর্ষক, দ্রাব রোমকান্ত। "রসরত্ন-সমুচ্চয় "রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ" প্রভৃ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ-পাঠে মু তীক্ষ্ণ ও কান্ত লৌহ আধুনি cast iron, steel wrought iron অ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুম হয়।

উড়িষ্যার লোহার কা দিল্লির থাম প্রভৃতি wrough iron এ তৈয়ারী। এই সক

থাম কড়ি বোধ হয় ছোট ছোট wrought iron-এর টুকরা উত্তপ্ত করিয়া, পিটিয়া, যোড়া লাগাইয়া এক একটী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; কিন্তু এমনই নির্ম্মাণ কৌশল যে যোড় টের পাইবার কোনই উপায় নাই।

দিল্লির থাম প্রভৃতিতে অদ্যাবধি মরিচা পড়ে নাই। পঞ্চানন বাবু বলেন, "Two explanations are possible of this remarkable power of ancient specimens of iron of resisting corrosion—either there was something in the composition of the iron or that the beams were painted or both. To the author it appears that both the facts have operated in enabling the Indian iron piliars and beams to withstand the corroding influence of wind and rain... the one point remarkable regarding the composition of the Delhi iron, Singhalese iron and other specimens of ancient iron is that all these specimens of iron are free from manganese and sulphur and contain a tolerably high percentage of phosphorus."

হিন্দু বৈদ্যগণ Oxides of iron এবং sulphide of iron প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও ব্যবহার জানিতেন; chloride of iron তৈয়ার করিতে জানিতেন, কিন্তু তাহা অল্পই ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অংশে আকরাদ্ভুত ধাতু-পিণ্ড হইতে লৌহ প্রস্তুত করা হইত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে গৈরিক (hamatide), তাপ্য (iron pyrites প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আইন আকবরীতে বাজুহা, বাঙ্গালা সুবা, কেড়োয়া, কাশ্মীর সুবা কুমায়ুন নিরমল ও ইন্দোরে লোহার খনি ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

লৌহ প্রস্তুত করিবার প্রাচীন প্রণালী এখনও অশিক্ষিত লৌহকর্ম্মকারদিগের মধ্যে উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বরদা, দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটদেশ ও যুক্তপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

"যুক্তি কল্পতরু" নামক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে তরবারি অস্ত্র বারাণসী, মগধ, লঙ্কা, নেপাল, অঙ্গ, মহীশূর, সুরাট, ও কলিঙ্গে প্রস্তুত হইত।

পঞ্চানন বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অতীত গৌরবের কথা বিশদভাবেই মনে পড়ে। মনে হয় একদিন ভারত সুসভ্য জগৎকে লৌহ দান করিয়াছিল—মনে হয়, একদিন ভারতে এমন স্তম্ভ রচিত হইয়াছিল, যাহা এখনও বৈজ্ঞানিকের বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু যখন দেখি, যে প্রাচীন লৌহ-শাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমে ভারত ভূমি হইতে লোপ পাইতেছে, তখন যুগপৎ হৃদয়ে এক গভীর দুঃখও জাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার যখন মনে হয়, যে তাতা কোম্পানী আবার ভারতে লৌহ প্রস্তুত করিতেছেন, তখন এক প্রবল আশাও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই শ্রেণীর গবেষণা-মূলক গ্রন্থের যত অধিক প্রচার হয়, ততই তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। এই পুস্তক পাঠে আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারি, এবং জগজ্জনকে আমাদিগের গৌরবের পরিচয় দিতে পারি। আশা করি, গ্রন্থকার মাতৃভাষায় পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইবেন। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভালই হইয়াছে, মূল্যও অধিক নহে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল

প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত যখন শুষ্ক পত্র গুলি খসিয়া পড়ে তখন সকলেই আশায় বসিয়া থাকে আবার কবে তরুণ পত্রগুলি বসন্তলক্ষ্মীকে সুশোভিত করিয়া দিবে। কিন্তু যখন একজন মহাপুরুষ জীবনের ব্রত শেষ না হইতে হইতেই অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করেন তখন সন্দেহী সংশয়ী মানুষ কোন বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পায় না। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের অমূল্য জীবন অকালে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত মহাসিন্ধুতে গড়াইয়া পড়িল—জীবনের মধ্যাহ্নেই তাঁহাকে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইয়াছে—এইজন্যই আমাদের এত দুঃখ এত বেদনা। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকজন ভারতবাসী জন্মভূমির সেবা করিয়া নিজের জীবন ধন্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত গোখেল তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই মহারাষ্ট্রতনয়ের খ্যাতি সমস্ত ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আশা করা যায় এ খ্যাতি, চিরদিনের মত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে।

বিলাতের বিখ্যাত রাজনৈতিক লর্ড রোজবেরী কবি বার্ণসের স্মৃতি সভায় একবার বলিয়াছিলেন "poverty produces masterpieces,—wealth smothers them"—গোখেলের বাল্যজীবনে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশের কোলহাপুর সহরে একজন নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিকষ্টে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কোলহাপুর স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া গোখেল বোম্বাই সহরের এলফিনষ্টন কলেজে গমন করেন; গণিতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই জন্য বি, এ, পাশ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করিবেন, তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কোন কারণে বি, এ পাশ করিয়াও তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইল না। যাহা হউক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিয়া লাভ না করিতে পারিয়া তিনি ১৮ বৎসর বয়সে পুণায় আসিয়া নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিলক প্রভৃতি কয়েকজন মহারাষ্ট্র দেশসেবক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টীকে আশ্রয় করিয়া Deccan Education Society স্থাপিত হয়। এই সমিতির চেষ্টায় এই স্কুলটী এক্ষণে বিখ্যাত ফারুগুসন কলেজে পরিণত হইয়াছে; দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত কলেজ যে কত উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ফারুগুসন কলেজ তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত;—কতকগুলি উন্নতমনা লোকের স্বার্থত্যাগ এই শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। তাঁহারা মাসিক ৭০ টাকা মাত্র বৃত্তি লইয়া দেশহিতকর কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিনিয়র রাংলার পরাঞ্জপ্যে ও বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিদ্ বামন গোবিন্দ কেল এই সামান্য বেতনে ফারুগুসন কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন। গোখেল এইরূপে জীবন উৎসর্গ করিবেন কিনা প্রথমে কিছুই ঠিক ছিল না কিন্তু এই সৎ সংসর্গে আসিয়া তিনিও এই মহৎকার্য্যে জীবন অর্পণ করিলেন। অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস শিক্ষা দান করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িল; কলেজে শিক্ষকতা করিয়া সামান্য যাহা কিছু সময় পাইতেন তাহা অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নেই অতিবাহিত করিতেন। দেশের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের বীজ এই স্থানেই রোপিত হয়—অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ফেলেন।

এদিকে মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে পুণায় "সর্ব্বজনিক সভা" স্থাপন করিলেন। এই সভা সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। রাণাডে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইংরাজ আগমনের পর হইতে মহারাষ্ট্র দেশে সামাজিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য উন্নতির একমাত্র কারণ রাণাডে,—তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূতঃ জীবন তাঁহাকে চিরদিন দেশবাসীর নিকটে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে—তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান ও দেশপ্রাণতার পূর্ণ রশ্মিপাতে মহারাষ্ট্র ভূমির দুর্য্যোগগ্রস্ত নিশীথ-কাল কাটিয়া গেল। প্রাচীন ও নবীন যুগের মধ্যস্থলে রাণাডের স্থান যে কত উচ্চ তাহা শিক্ষিত জন মাত্রেই জানেন; সমস্ত দীনতা, খর্ব্বতা ও অপমানকে দূরে করিয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিবার জন্য এই মনস্বী, কর্ম্মবীর মহাত্মা ও সরল মহাপুরুষটী নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাণাডের কার্য্যকে বুঝিতে হইলে তাঁহার গুরুর বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে। রাণাডে যে দুইটি প্রধান শিষ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটি চির-দিন এই সর্ব্বজনিক সভার মুখপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিলেন, এখন কেবল আছেন কর্ম্মবীর নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর।

এই সর্ব্বজনিক সভার মুখপত্র সম্পাদনের জন্য একজন প্রতিভাশালী যুবকের আবশ্যক হইলে গোখেলের উপর পড়িল। রাণাডের তত্ত্বাবধানে গোখেল এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। রাণাডে গোখেলের মিলন ভারতীয় ইতিহাসের একটী স্মরণীয় দিন। রাণাডের মত শিক্ষক পাইয়া গোখলে ধন্য হইলেন তাহা নহে—ইহা ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন পন্থা খুলিয়া সমস্ত দেশকে গৌরবান্বিত করিল। রাণাডের স্পর্শে আসিয়া গোখেল রীতিমত রাজনীতি চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাই প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় মহাসমিতির পুনা অধিবেশনের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য 'ওয়েবলি' কমিশন স্থাপিত হয়—এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য মিঃ দাদাভাই সহিত গোখেল বিলাত গমন করেন। এই কমিশনের সম্মুখে তাহার প্রদত্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইলে সকলেই তাঁহার সারগর্ভ যুক্তি ও দেশের আর্থিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে,—দিন দিন অসংখ্য লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, গোখেল এই সকল দেখিয়া এই প্লেগের মধ্যেও স্বেচ্ছাসেবকরূপে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে বোম্বাইয়ের গভর্ণর লর্ড সেণ্ডাষ্ট পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বৎসর ৭০ টাকায় কাজ করিয়া ফারুগুসন কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাঁহার ৪০ টাকা মাত্র পেনসন্ হইল, ইহাই তাঁহার একমাত্র অর্থ সম্বল ছিল। স্যার ফিরোজসা মেটা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে গোখেল সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বোম্বাই প্রদেশের সভ্য মনোনীত হন। এখন হইতে গোখলের প্রকৃত দেশসেবা আরম্ভ হইল। বহু বৎসরের গভীর চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল এই স্থানে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকরী হইল, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নির্ভীক, স্বাধীনেতা ও বিজ্ঞ রাজনৈতিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। ইউনিভারসিটি বিল, বঙ্গবিভাগ ও Official Secrets Bill সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন। বজেট বিতর্কের সময় তাঁহার বক্তৃতা এত সুন্দর ও সারগর্ভ হইত যে একবার এই সময়ে গোখেলকে অনুপস্থিত দেখিয়া স্যার গাই ফ্লিটউড উইলসন বলিয়াছিলেন' আমরা 'হ্যামলেটের অংশ বাদ দিয়া 'হ্যামলেট' অভিনয় করিতে যাইতেছি'।

এই সকল কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ভারত সেবক সম্প্রদায়" স্থাপন করিলেন; এই সম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে কেবল মাত্র দরিদ্রের সেবা ও সামাজিক হিতসাধনে নিযুক্ত না থাকিয়া যুবক সম্প্রদায় যাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার

কার্য্যেও নিযুক্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা। এই সম্প্রদায় গোখেলের দেশপ্রাণতার অপূর্ব্বকীর্ত্তি; দেশের মঙ্গলের জন্য কি করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তাহা তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সমবেত ভারতসন্তানগণ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহার গৌরবান্বিত মস্তকে দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ নেতৃত্বের মুকুট পরাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত গোখেল দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় শ্রমজীবীদের দুঃখক্লেশ অবসান করিবার আশায় বড়লাটের আইন সভায় প্রস্তাব করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আর ভারতীয় মজুর পাঠান হইবে না। মহানুভব লর্ড হার্ডিং এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কোন নূতন সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানে বুয়ার গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতপ্রবাসী কর্ত্তৃক অত্যন্ত সাদরে গৃহীত হন। এতদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাল হইয়াছে তাহা গোখেল ও গান্ধীর পরিশ্রমের ফল।

গোখেলের শেষ কীর্ত্তি হইতেছে সমগ্রভারতে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার চেষ্টা; জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন, এই শিক্ষার অভাবে দেশের সমস্ত মহৎ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, সেই জন্য বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Public Services Commission-এর সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন—যাহাতে এই কমিসনের ফলে ভারতবাসীরা গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মে প্রবেশলাভ করিতে পারে সেই জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন কিন্তু সে পরিশ্রম শেষ না হইতে হইতেই তিনি চিরবিদায় লাভ করিলেন। ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

গোখেলের জীবন লীলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে তাঁহার উন্নত ললাটে জ্ঞানের প্রসারতা, স্নেহপূর্ণ আয়তনেত্রে ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ভুলিতে পারিবে না। তিনি ভারত বর্ষের নানা স্থানে ভ্রমন কালে স্বদেশহিতৈষণামন্ত্রে সকলকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেন অথচ তাঁহার কথায় বিদ্বেষ ছিল না; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দোষ গুলি দেখাইবার সময় গুণগুলি ভুলিয়া যাইতেন না, এবং ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়াই যে আমরা উন্নতির চরমশিখরে উঠিতে পারিব এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানসূচক কার্য্যে পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল কিন্তু তিনি সেবাব্রত হইতে কখনও বিরত হন নাই। কঠোর মানসিক পরিশ্রমে শনৈঃ শনৈঃ জীবনের প্রদীপ ক্ষীণ হইয়া আসিল—নিদারুণ রোগ যন্ত্রণায় শয্যাগত অবস্থার মধ্যেও তাঁহার চিরপ্রফুল্ল ও উৎসাহ দীপ্ত বদন মলিনতাপ্রাপ্ত হইল না। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্য গুলি যেন সম্পূর্ণ করা হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের দৃঢ়তা ও কমনীয়তা নষ্ট হয় নাই; যখন দেখিলেন মৃত্যুর অন্ধকার ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ভগিনী কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন—কিন্তু এক বিন্দু দুঃখের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল না—সকলকে বিদায় দিয়া প্রশান্ত—স্থির চিত্তে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তার পর এক জন বন্ধুকে বলিলেন "জীবনের এপারে আমার সময় সুখেই কাটিয়াছে—এইবার পরপারে যাইবার ও দেখিবার সময় আসিয়াছে।" তাঁহার চির প্রফুল্ল সৌম্য কান্তির কাছে মৃত্যুর বিভীষিকা ছায়াপাত করিতে পারিল না; শান্ত সমাহিত চিত্তে চির বিশ্রাম লাভ করিলেন; মহাপুরুষের চরিত্রের মত মহাপুরুষের মৃত্যুও মহৎ।

গোখেল সম্বন্ধে আর একটী কথা উল্লেখ না করিলে তাঁহার ক্ষুদ্রজীবনী অসম্পূর্ণ হইবে। তাঁহার আজীবনব্যাপী চিন্তার একটী বিষয় ছিল—ভারতের চির দুঃখী কৃষকগণকে কি করিয়া সুখস্বচ্ছন্দের দিকে লইয়া যাওয়া যায়—এই জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় নানাপ্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯০৫

খৃষ্টাব্দের বজেট বিতর্কসভায় তিনি এই দুঃখীকৃষকদের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়া ছিলেন তাহা শিক্ষিতমাত্রেই অবগত আছেন।

গোখেল দেশের সেবা করিতে গিয়া কখনও কোন দল বা মতের সৃষ্টি করেন নাই। কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন তাহা পালন করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই—এই জন্য তিনি অনেক বন্ধুর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার একমাত্র মত ছিল—"Trust no party, church or faction".

গোখেলকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার বিরাট চরিত্র ও বিপুল মনুষ্যত্বকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে; তিনি নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা যে সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য এবং যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা যে কত উচ্চ এবং কত বিপদসঙ্কুল তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার মহৎ চরিত্রের কথা ভাবিতে গেলেই মনে হয়—তিনি মঙ্গলবিশ্বাসী Optimist ছিলেন। তিনি রাজনীতি প্রচার করিতে গিয়া কখনও ক্রন্দনের অভিনয় করেন নাই—দুঃখের মধ্যে, অপমানের মধ্যে এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও যে এই দেশ আবার পূর্ব্বগৌরব লাভ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্য জাতির সহিত একাসনে বসিবে তাহা তিনি কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তিনি দেশমাতার যে অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া ছিলেন তাহাই তিনি দেশবাসীর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতেন—কারণ এ দেশে 'অদৃষ্ট' নামক একটী বিরাট পাথর সমস্ত জাতির বুকের উপর বসিয়া আছে—এখানে মানুষ নির্জ্জীবতা লইয়া এক ক্ষুদ্র পরিধি রেখার মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, সেই জন্য এখানে আশার বাণী দরকার।



গোপালকৃষ্ণ গোখেল

সরলতা তাঁহার জীবনের আর একটী ভূষণ ছিল—এই সরলতা যে কেবল তাঁহার বসনেই ফুটিয়া উঠিত তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক স্তরে স্তরে বিদ্যমান ছিল—অথচ এ সরলতার নাম শৈথিল্য নহে। এই সরলতার গুণে তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিলিতে পারিতেন, সকলের দুঃখ বেদনার গভীরতাকে বুঝিতে পারিতেন।

শুধু রাজ-নীতি চর্চ্চা করাই যে দেশসেবার একমাত্র উপায় তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সেই জন্যই ভারতসেবকসম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ভারতে এখন কোটি কোটি লোক আছে যাহারা রাজনীতির ছায়া মাত্র দেখে নাই—এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে তাহারা যদি বাঁচিয়া না উঠিতে পারে তবে রাজনীতি চর্চ্চা কাহার জন্য? এই অসংখ্য নরনারীর

জীবনে অরুণালোকের বিচিত্র রেখা প্রতিফলিত হয় নাই, দুঃখে ও দারিদ্র্যে তাহারা মৃতের মত পড়িয়া আছে—তাহাদের নিকট রাজনীতি তুচ্ছ—তাহাদের চিরশুষ্ক অন্তরে আশার বাণী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—গোখেলের মত মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি সেই দারিদ্র্যশীর্ণ বেদনাতুর ভারতবর্ষের দিকে পড়িল; তাহাদের দুঃখ মোচন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল,—কারণ :—

"তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে,
কেমন করে সইব" ?

তাঁহার চরিত্রের মধুরতা বর্দ্ধন করিত তাঁহার বিনয়; এত উচ্চ সম্মানলাভ এত যশ এত খ্যাতি লাভ করিয়াও তিনি কোন দিন অহঙ্কার অনুভব করেন নাই, সেই সরলতা ও অমায়িকতা তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল।

প্রবন্ধের শেষে তাহার বাঙ্গালী-প্রিয়তার কথা উল্লেখ করিব, কারণ দেখা যাইতেছে নানাপ্রদেশে এখন বাঙ্গালী বিদ্বেষ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—গোখেল যে আমাদিগকে কিরূপ প্রীতিগৌরব দৃষ্টিতে দে তাহা তাঁহার কথাতেই বুঝা যাইবে।

Where will you find another sci in all India to place by the of Dr J. C. Bose or Dr P. C. Ro jurist like Dr Ghosh or a poe Rabindranath Tagore ? My these men are not mere fricks of n they are the hightest products of the race is regularly capable and of such capacity can not, I repe put down by coercion ?*

গোখেল পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার আত্মার বিমলজ্যোতি প্রত্যেক ভার হৃদয়ে বিরাজ করিবে। দেহের তি সহিত তাঁহার নাম অন্তর্হিত হইবে না, অন্ধকারে তাঁহার বিমল যশঃপ্রভা বিলুপ্ত হই তাঁহার এই পবিত্র আত্মা সমস্ত লোকের হৃদয় করিয়া চির দিন আমাদিগকে সৎপথে যাইবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র

অর্ঘ্য

মরণদূতের মাল্য তোমায়
স্বর্গে নিলে টেনে,
ভারতবাসীর বক্ষে দারুণ—
বজ্র ব্যথা হেনে।
তপ্ত অশ্রু চক্ষে সবার
পড়ছে গ'লে গ'লে
"কোথায় বন্ধু ভারত বন্ধু"
এই কথাটি বলে।
সবার বক্ষে মেঘের উদয়
অশ্রু ঝরে চোখে,
তুমি-হারা ভারত মাতার
দারুণ ঘন শোকে।
তুচ্ছ করি রোগের ব্যথা
স্বার্থ পরিহরি।
দেশের কর্ম্মে সেবার ধর্ম্মে
মৃত্যু নিলে বরি।
কীর্ত্তি তোমার চির অক্ষয়
দেশের বুকে রবে;
মৃত্যু তোমায় কর্‌লে অমর
মৃত্যু-ঘেরা ভবে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চ

* Gokhale's speech in the Supreme Lagislative Council at Simla (1907) passing of the Seditious Meetings Bill.

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।